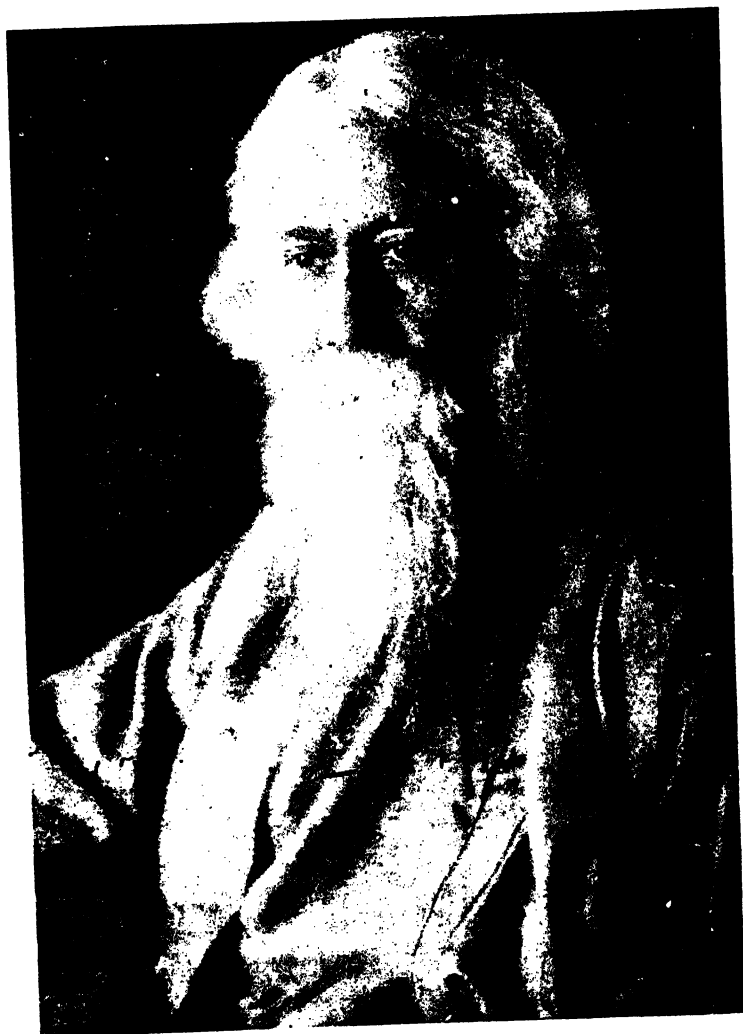
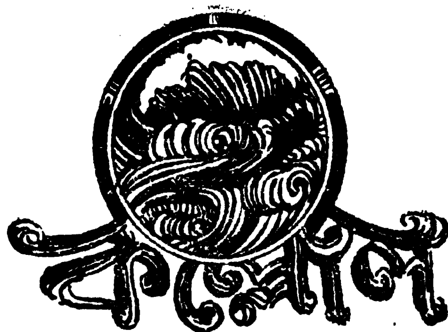


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



তৃতীয় বর্ষ

১ম সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৩২ সাল

সম্পাদক—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

সহ-সম্পাদক—শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ

কল্লোল পাবলিশিং হাউস

২৭ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মুক্তি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুক্তি নানা মূর্ত্তি ধরি' দেখা দিতে আসে জনে জনে,
এক পন্থা নহে।
পরিপূর্ণতার সাধ নানা পাত্রে ভুবনে ভুবনে
নানা স্রোতে বহে।
সৃষ্টি মোর সৃষ্টি সাথে মেলে যেথা, সেথা পাই ছাড়া,
মুক্তি যে আমারে তাই সঙ্গীতের মাঝে দেয় সাড়া,
সেথা আমি খেলা-ক্ষ্যাপা বালকের মত লক্ষ্মীছাড়া,
লিপ্ত-নিঃস্ব নগ্ন নিরুদ্দেশ।
সেথা বারে বারে মোর প্রথম জন্মের নাহি শেষ॥

খেলা-সঙ্গী বলে' যদি কোনোদিন চিনি, বিশ্বপতি,
তোমারে কোথাও,
প্রভু, যদি কভু তব প্রভুত্বের দাবী মোর প্রতি
ছেড়ে দিতে চাও,
তা' হ'লে আসুক্ সন্ধ্যা বিরামের মহাসিন্ধু তটে,
শান্তিবারি পূর্ণ হোক্ গোধূলির স্বর্ণময় ঘটে;
শিশুর মতন তুমি এঁকে দাও আকাশের পটে
আন্‌মনে যাহা-তাহা ছবি;
শিশুর মতন্ বসি একাসনে তোমা-সনে কবি॥

যে-সুর পেয়েছি গানে মাঝে মাঝে, সে সুরে, হে গুণী,
তোমারে চিনায়।
বেঁধে দিয়ো নিজ হাতে সেই নিত্য সুরের ফাল্গুনী
আমার বীণায়।
তাহলে বুঝিব আমি ধূলি কোন্ ছন্দে হয় ফুল,
বসন্তের ইন্দ্রজালে অরণ্যেরে করিয়া ব্যাকুল :
নব নব মায়াচ্ছায়া কোন্ নৃত্যে নিয়ত দোদুল
বর্ণ বর্ণ ঋতুর দোলায়।
তোমারি আপন সুর কোন্ তালে তোমারে ভোলায়॥

যেদিন আমার গান মিলে যাবে তোমার গানের
সুরের ভঙ্গীতে
মুক্তির সঙ্গম-তীর্থ পাব আমি আমারি প্রাণের
আপন সঙ্গীতে।
সেদিন বুঝিব মনে নাই নাই বস্তুর বন্ধন,
শূন্যে শূন্যে রূপ ধরে তোমারি এ বীণার স্পন্দন :
নেমে যাবে সব বোঝা, থেমে যাবে সকল ক্রন্দন,
ছন্দে তালে ভুলিব আপনা,—
বিশ্বগীত-পদ্মদলে স্তব্ধ হ'বে সকল ভাবনা॥

সঁপি দিব সুখ দুঃখ আশা ও নৈরাশ্য যত কিছু
তব বীণা-তারে,—
ধরিবে গানের মূর্ত্তি, একান্তে করিয়া মাথা নীচু
শুনিব তাহারে!
দেখিব তাঁদের, যেথা ইন্দ্রধনু অকস্মাৎ ফুটে,
দিগন্তে বনের প্রান্তে ঊষার উত্তরী যেথা লুটে,
বিবাগী ফুলের গন্ধ মধ্যাহ্নে যেথায় যায় ছুটে ;—
নীড়ে-ধাওয়া পাখীর ডানায়
সায়াহ্ন-গগন যেথা দিবসেরে বিদায় জানায়॥

সেদিন আমার রক্তে শুনা যাবে দিবস রাত্রির
নৃত্যের নূপুর ;
নক্ষত্র বাজাবে বক্ষে বংশীধ্বনি আকাশ-যাত্রীর
আলোক-বেণুর ।
সেদিন বিশ্বের তৃণ মোর অঙ্গে হবে রোমাঞ্চিত,
আমার পরাণ হবে কিংশুকের রক্তিমা-লাঞ্ছিত ;
সেদিন আমার মুক্তি, যেই দিন হে চির-বাঞ্ছিত,
তোমার লীলায় মোর লীলা,
যেদিন তোমার সঙ্গে গীতরঙ্গে তালে তালে মিলা ॥

২২ অক্টোবর
১৯২৪
স্টিমার এণ্ডিস ।

চিঠি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* * "আমার জগৎ" প্রবন্ধটির ভিতরকার কথা আপনি ঠিকই বুঝেচেন। চিনি জিনিসটাকে বিজ্ঞান অঙ্গারের তালিকায় ফেলে নিশ্চিন্ত হতে পারে কিন্তু আমার সঙ্গে যেখানে সম্বন্ধ সেখানে চিনিতে অঙ্গারে অনেক তফাৎ। এই তফাৎটা, যার কেন্দ্রস্থলে একজন আমি বস্তু আছে, এইটেই হচ্চে সৃষ্টির বৈচিত্র্য। যার সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধবশতই জগৎটা বিচিত্র, তাকে সরিয়ে ফেল্‌লেই প্রলয়—তখন সবই এক। বিজ্ঞান যখন বল্‌চে ঈথরের কম্পনই আলোক তখন সে আসল জিনিসটাকে বাদ দিচ্চে—বস্তুত আলোক আমার মধ্যে;—আমার বাইরে যে কম্পনটা সে আলোকই নয়। বাঁশির ছিদ্রে যে হাওয়া খেল্‌চে সে ত সঙ্গীত নয়—আমার বোধের মধ্যে যে একটি অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার ঘট্‌চে সেইটেই সঙ্গীত। ঈথরের কম্পন, বাতাসের চাঞ্চল্য তথ্য মাত্র, তা সত্য নয়—তা অক্ষরের বিন্যাস মাত্র তা কবিতা নয়। তা সৃষ্টি নয়, তা নির্ম্মাণ। যা নির্ম্মাণ তাকে মাপা যায় কারণ তা আংশিক। কবি, কাব্যে যে অক্ষর বিন্যাস করেচে তাকে মাপা যায় কিন্তু কাব্যকে মাপা যায় না। সেটা আমার বোধের মধ্যে পৌঁছে রূপকে পেরিয়ে অপরূপ হয়েছে। আলোক ও সঙ্গীত মাপের জিনিস নয়, কেননা তা সৃষ্টি। সৃষ্টি, কি না সজ্জন—নিজেকে দান করা। কবি তাঁর কাব্যে নিজেকে দান করেন, সেটা একটা Personal fact—কিন্তু অক্ষর বিন্যাসটা বিধি, সেটা impersonal। বিশ্বসৃষ্টির মূলেও একটা ব্যক্তিগত ইচ্ছা আছে, সেই জন্যেই সেটা আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়—এর মাঝখানে একটা পদার্থ আছে সেটা সৃষ্টি নয় সৃষ্টির নিয়ম, সেটা ঈথরের কম্পন। বিজ্ঞান সেই নিয়মকেই

বলচে জগৎ। কিন্তু নিয়ম জিনিসটা ত আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ নয়—নিয়ম একটা চরম উদ্দেশ্যের অপেক্ষা রাখে—সুর বিন্যাসের নিয়ম মিথ্যা হত যদি সেটা গানের আনন্দে পর্য্যবসিত হয়ে সার্থক না হত। জগতের নিয়ম ব্যর্থ হত যদি সে নিয়ম কোনো ব্যক্তিরই বোধের মধ্যে অনির্ব্বচনীয় উপায়ে জগৎরূপে প্রকাশিত না হত। ইতি ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুনঃ—আমার কাব্য যদি উপভোগ করতে চান তবে কোনো পাণ্ডার দ্বারস্থ হবেন না। আমার রচনা বোঝা যায় না বলে একটা বদনাম উঠেচে সেই বদনামটাই বোঝবার পক্ষে বাধা দেয়। যদি মনে কোনো সন্দেহ বা অশ্রদ্ধা না রাখেন তাহলে বুঝতে কিছুই গোল হবে না।

যাত্রা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পথের ধারে
ভাঙ্গা ঘরে
বয়স আমার কাটে,
আজকে হঠাৎ
কে দিল ডাক
বিশ্ব সভার নাটে!

ওরে আমার ভীরু,
ছিন্ন ঝুলি নে রে কাঁধে
যাত্রা হ'লো সুরু!

পথের ধুলি
পুঁজি যে তোর,—শুক্‌নো পাতার রাশি,
তাই তুলেনে, মাথার পরে!
শূণ্য-হৃদয়
ভরিয়ে দেরে
তুচ্ছ ক'রে
লোকের মিছে
নিন্দা, বিদ্রূপ—হাসি!

ফুলের কুঁড়ি,
কচি-পাতা
যৌবনেরি নবীনতা
কোথা পাবি বল?

ঝরা ফুলের
কুঁক্‌ড়ে যাওয়া পাব্‌ড়ি
যত পচা,
কে বলেরে
হয় না তাতে
পূজার অর্ঘ্য রচা!

সাগর বটে
শুকিয়ে গেছে
আছে ত' সম্বল,
ব্যথার হাঁকে
উছ্‌লে উঠা
চোখের নোনা জল।

* * *

কেউ চ'ড়েছে
চতুর্দোলায়
কেউ বা চলে গজে,
কারুর ঘোড়া
তীরের মত
ছুট্‌চে দু'চোখ বুজে!
তোমার ক্লান্ত
চরণ-দু'টি,
তপ্ত ধুলায়
চলবে লুটি
কাঁটা ভরা
আঁকা-বাঁকা পথে;
ছিন্ন-বসন
তোমায়, মাণিক,
কেউ নেবে না রথে!

তল্‌তা বাঁশের
বাঁশি তোমার
উন-পঞ্চাশ বায়ু,
নিঃশেষিয়ে
দাও রে, ফুঁকে
তপ্ত পরমায়ু!

ছেঁড়া কাঁথার
ধ্বজা তোমার
উড়ুক আকাশ-ময়
শিল্প-চারু
মিথ্যা কারু
গুঁড়িয়ে কর ক্ষয়!

তোমার চলা
তোমার পড়া
বক্ষে তোমার
পাহাড় গড়া
সেটাই হবে সবার বাড়া,
ধ্রুব-সুনিশ্চয়!

ওরে আমার
সৃষ্টি-ছাড়া
উন্‌-পাঁজুড়ে
কপাল-পোড়া,
কিসের করিস্‌ ভয়?

তোরি হবে
তোরি হবে
তোরি হবে—জয়!

স্মৃতির-আলো

(উপন্যাস)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আমাদের নদীর নাম ছিল মহানন্দা; পৌষ মাঘ মাসের পর শূন্য গর্ভ ছাড়া তার আর বড় কোন চিহ্ন থাকত না; কিন্তু বর্ষার প্রাক্কালে তাতে পাগাড়-ধোয়া ঘোলা গেরি মাটির রঙের ঢল্ নাবত; আষাঢ় শ্রাবণে কাণায় কানায় পূর্ণ হয়ে যেত; ভাদ্র আশ্বিনে তাতে শালুকের লতায় ভ'রে গিয়ে—সাদা আর লাল ফুলে চারিদিক যেন আলো ক'রে থাকত।

এই নদীর ও পারে ছিল রাজাদের হাজারি আমের বাগান; তার উত্তর দিকে ছোট্ট ডাক্তারখানা বাড়ীটি। গেটের দুধারে দুটো ত্যেড়া-বেঁকা শিশু গাছ— তার উপর সকাল থেকে বিকেল পর্য্যন্ত—ঘুঘুর এক ঘেয়ে করুণ কাঁদনি—ঠিক যেন মনে হত' শত শত রুগী রোগ যন্ত্রনায় কান্না চেপে—শুধু কাৎরাচ্ছে! এই ডাক্তার খানা বাড়ীর এক কোণে দুখানি খোড়ো ঘরে আমার বাসা। একটি রান্না ভাঁড়ার আর দ্বিতীয়টিতে একটি একজুনে-চৌকিতে আমার অনন্ত শয্যা পাতা-ই থাকত। আম কাঠের লোভ থেকে উঁইদের দূরে রাখবার জন্যে এই চৌকির বিধাতা পুরুষ তাতে আলকাৎরার প্রলেপ দিয়েছিলেন—কিন্তু তা এখন ক্রমেই পিঙ্গল-বর্ণ ধারণ ক'রে আসচে।

আমি ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডার! আমার মাইনে পনেরো টাকা; কিন্তু বাড়ীতে পঁচিশ টাকা না পাঠালে—তাদের অর্দ্ধাশনে থাকতে হ'তো! তাই কম্পাউণ্ডারের ক্ষুদ্র বাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ থাকার কোন উপায় আমার ছিল না। লোকের অজ্ঞতা, অল্প বুদ্ধি আমার কাজে লেগেছিল। তারা একজন এম, বি পাশ-করা ডাক্তার আর গো-মূর্খ কম্পাউণ্ডারের প্রভেদ জানত না; তাই বেশী সময়ে আমারই ডাক পড়ত। যারা বাহুল্যের বিরোধী তারাই আমার বন্ধু ছিল। আমাকে নিয়ে যেতে হলে—রাজ সরকার থেকে হাতি কি পাল্‌কি বন্দোবস্ত করতে হ'তো না; সময় অসময়ের বিচার করতে হতো না। ডাক দেবা মাত্রই

আমি ছোট ঘোড়াটার পিঠে কম্বল বেঁধে প্রস্তুত ; আট আনা থেকে এক টাকার মধ্যে যে কোন ফিয়েতেই রাজি ! ওষুধ স্থির করতে আমার দেরী হতো না এবং স্থল বিশেষে ওষুধের দাম মাফ্ করে দেওয়াতো' আমারি হাতে !

তবে কেনই বা না আমি বাড়ীতে পঁচিশ টাকা পাঠাতে পারবো—এবং কাপড় চোপড় জুতা ছাত্র এবং খাওয়া দাওয়ায় একটু আমিরী করব ?

আমাদের বুড়ো কিরণ ডাক্তার আমাকে স্তাবব্ বলে ডাক্তেন। সুরু সুরুতে ও কথা শুনলেই কেমন আমার মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করতো ; কিন্তু শেষ দিকে তা সয়ে গেল—তার কারণ ডাক্তার বাবু বড় দয়ালু লোক ছিলেন—আর তাঁর দেওয়া নামই—শেষ পর্য্যন্ত আমার নাম হয়ে দাঁড়াল।

* * *

বুড়ো কিরণ ডাক্তার শুধু চেহারাতেই বুড়ো ; মনে একটা কাঁচা ছোকড়া। গৌরাঙ্গের মত কাঁচা সোণার রং, চুলগুলি পেকে ধপ্‌ধবে হয়ে গেছে। দাঁত গুলো মুক্তোর মত ঝক্‌ঝক্ করচে। মুখ-খানি নিটোল—বয়সের একটা দাগও তাতে পড়ে নি !

এই ত গেল চেহারার কথা ; কিন্তু তাঁর মনের পরিচয় আমি কেমন করে দেব—সে যে একটা বিষম কঠিন কাজ ! ভাষা দিয়ে সব কথা বলা যায় না—মানুষকে বুঝতে হলে অনুভূতি দিয়ে বুঝতে হয়। আমার মনে হয়, যে এই লোকটির সঙ্গ করতে পেয়েছে—সে কত খানি সৌভাগ্যবান্! মানুষ যে বিনা আড়ম্বরে কত বড় হ'তে পারে—তা' এই কিরণ ডাক্তারের সঙ্গে ব্যবহার না করলে বুঝতে পারা যায় না। আমি চোখ বুজে আজো যখন তাঁর কথা ভাবি, তখন আমার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত ছবি ফুটে উঠে—মনে হয় শুদ্ধ গম্ভীর্য্যের সঙ্গে—মাথায় বরফের স্তূপ নিয়ে আমাদের দেশের উত্তরে—তেমনি একটি উঁচু জিনিষ আছে—যার তুলনা আর অন্য কোন দেশে নেই। সেই গৌরীশঙ্করের ছবিটিকে দু হাত তুলে প্রণাম করতে গিয়ে আজো আমার দু' চোখ জলে টল্ টল্ করতে থাকে !

কিরণ ডাক্তার বিয়ে করেন নি। সেইটেই যেন তাঁর জীবনে সব চেয়ে বড় সঙ্গতি। যাঁর অন্তরের শুদ্ধ ভালবাসার উপর প্রত্যেক লোকের সমান দাবী তিনি কেমন করে দু-এক জনকে ভাল বেসে নিজেকে খাটো করে দেবেন !

সূর্য্যোদয়ের আগে বেড়াতে বেরিয়ে গিয়ে দু চার মাইল বেড়িয়ে তিনি যখন

ডাক্তারখানায় ফিরতেন—তখন তাঁর মুখ খানি সকালের ফোটা ফুলের মতই সুন্দর দেখাত—তাতে আমি একদিনের জন্যও অবসাদের গ্লানি খুঁজে পাই নি।

বারাণ্ডার ছোট টেবিলটির উপর চায়ের জোগাড় করা থাকৃত; নিজের হাতে চা তৈরী করে, ডাক দিতেন—ন্যাবব্—ন্যাবব্।

আমি প্রণাম করে দাঁড়ালে বল্‌তেন, তোমার কাছে চা খেয়ে যে আরাম পাই—এমনটি আর কোথাও পাইনে হে—সব ঝক্-ঝক্ তক্-তক্ করচে। এই নেও, বলে এক পেয়ালা আমাকে দিতেন।

তারপর—সট্‌কার নল টেনে নিয়ে, গুণ গুণ করে গান করতেন—আর তামাকের ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন করে তুল্‌তেন!

রুগী আস্‌তে সুরু করত। সবাই যেন পরম আত্মীয়ের কাছে এসেছে। এই কাজে তাঁর একটুও বিরক্তি ছিল না। কখনো রসিকতা করচেন, কখনো সহানুভূতিতে কণ্ঠস্বর গদ-গদ হয়ে যাচ্চে।—তাই তো রে এত চেষ্টা করচি, আরাম হচ্চে না, এক কাজ কর না দিন কতক ভীমগাঁর কব্‌রেজ মশাইকে দেখা না কেন?

এজ্ঞে, পয়সা নেই।

যা—যা—কঞ্জুসি করিস নে, পয়সা হয়ে যাবে—আগে প্রাণ, না আগে পয়সা? সঙ্গের লোকটি নির্লজ্জ-প্রগল্‌ভতায় বল্লে, এজ্ঞে গরীবের পয়সাই বড়, ডাগ্‌তার বাবু। তুই কে ডা লাগ্‌চিস্—জেঠা।

তার পরিচয় বাক্যেই তোমার স্পষ্ট পাওয়া যায়। কবরেজ মশাইকে আমার নাম বলিস্।

রুগী জোড় হাতে বল্লে, একডা পৎ দিয়েন।

ন্যাবব বাবা, দাও ত' একটা চিঠি লিখে—বলে দাও ওরা বড় গরীব।

আমি চ'টে উঠে বলতাম—কেমন করে জানলেন আপনি ওরা গরীব?

ডাক্তার বাবু হাস্‌তেন—ওরা যে বল্‌চে হে—ও কথা যে মুখে স্বীকার করে—সে যে বড় গরীব—তার দৈন্যের অবধি নেই!

আপনার সবই ভেতরের মানে!

সেই চির পরিচিত স্নিগ্ধ শুভ্র হাসি! নিত্য উৎসারিত হচ্চে, অন্তরের মাধুর্য্য এবং স্বচ্ছতার বারতা বহন ক'রে!

তিন-চিন বছরে ডাক্তার বদলি হবার কথা; কিন্তু কিরণ ডাক্তার আছেন

বারো বছর। রাজারা কিছুতেই ছাড়েন না। বড় সায়েবকে ধরে বদলি রদ হয়ে যায়।

আমরা জানি এবারেও তাই হবে! ডাক্তার বাবু হেসে বল্লেন, না হে, না। এবারে তোমাদের মায়া কাটাতে হলো দেখচি!

আমাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। এ হতেই পারে না; রাজ ভাণ্ডারে টাকার কমি নেই—রাজা রাণী সবাই বল্লেন, কিরণ ডাক্তার চলে গেলে আমাদের চলবেই না!

রাজ বাড়ীর আনাচে কানাচে এই তর্ক; সবাই হা-হুতাশ করচে।

পাত্র মিত্র দেওয়ান পরিষদ নিয়ে রাজা এসে বল্লেন, আপনি চলে যাবেন—এত বিশ্বাস করিনে!

সেই শিশুর হাসি!

ধীরে ধীরে ডাক্তার বাবু বল্লেন, আপনার অনুগ্রহে আমার টাকার অভাব নেই, একলা মানুষ—তার পক্ষে আমার যে প্রচুর আছে।

তবে?

এই বারো বছরে যা কিছু জানতুম ভুলে গেছি। এবার কলেজেই দিয়েছে, বিদ্যেটাকে আর একবার ঝালিয়ে নেওয়া দরকার বোধ করচি।

দুঃখে সকলের মুখ কালো হয়ে গেল। মনে মনে সবাই জানলে—এ আর ফেরবার নয়!

রাজা বল্লেন, তা হ'লে আমাকে গিয়ে কলকাতায় বাস করতে হবে।

সেই হাসি;—কি যে বলেন; আমার চেয়ে ভাল লোকই আসবে।

* * *

যিনি এলেন, হয়ত তিনি ভাল লোকই, কিন্তু আমরা মূর্ত্তিমান দুর্ভাগ্য বলে দেখলাম।

কালো চামড়ার উপর কোট প্যাণ্ট টাই হ্যাট্। মুখে চুরুট লেগেই আছে। ডান হাতে রূপো বাঁধান লাঠি বন্-বনিয়ে ঘুরচেই! বাঁ হাতের কব্জিতে একটা ঘড়ি বাঁধা। ঢং দেখে আমরা ত' আর হেসে বাঁচিনে!

মুখে যেন তপ্ত খোলায় ইংরাজি কথা চারি দিকে চড় বড়িয়ে ঠিক্‌রে যাচ্চে। বুক পকেটে কলম। পাশ পকেটে এক রাশ রবারের নল।

সুস্থ মানুষ যাকে দেখে আঁৎকে উঠে, রুগী তাকে দেখলে খাবি খেতে থাকবে—তাতে আর কারু বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না।

কিন্তু সবাই যতখানি দমে গেল, আমি তা গেলুম না! মনের ভিতর আমার যেন বেশ একটু ফুর্‌তির হাওয়া বইতে লাগ্‌লো!

ডাক্তার সরকারের ভাব-গতিক অত্যন্ত হাল ফেশনের—রক্ষনশীল গ্রামের লোক তাতে সহজে দীক্ষিত হবে না—তাতো জানা কথা; অতএব তাঁর প্রতিষ্ঠা হতে যতই দেরী হবে ততই আমার সুবিধা। লোকের ওষুধের দরকার হবেই—তাঁকে বাদ দিলে, আর আমি ছাড়া থাকে কে? ভবিষ্যতের এই মোহন মুরলি-ধ্বনি শুনে—কে না খুসী হয়?—তাই বল্‌ছিলাম, লোকে তাঁর উপর যতখানি চেটলো আমি কিন্তু ততখানি চটবার কারণ খুঁজে পেলাম না।

কিরণ ডাক্তার যেন গভীর জলের রাঘব বোয়াল—আর ইনি? হাঁটু জলের পুঁটি; ফরফরানির শেষ নাই! শঙ্খ চিল, আর ফিংএ! ব'সে আছে ত বসেই আছে—উড়চে ত' উড়চেই; আর ইনি? ফুড়ুক্-ফাড়ুক—ছট্-ফট্, ছট্-ফট্!

একটু ফাঁক পেয়ে আমি প্রায় কেঁদে ফেলবার মত ক'রে বল্লাম, ডাক্তার বাবু আমার দশা কি হবে? মনে হচ্চে, আমি ত টিক্‌তে পার্‌বো না।

সস্নেহে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লেন, ভাবব্ ভয় কি?

অমন ধাঁ ক'রে একজন লোকের বিষয় একটা বদ্ধমূল ধারণা করা ভাল নয়। সরকার ত' লোক মন্দ নয়।

অত সায়েবী আমার ধাতে বরদাস্ত হবে না।

ঠোঁটের ফাঁকে শাদা দাঁতগুলি অকপটে বেরিয়ে পড়ল,—সায়েবী মন্দ মনে কর কেন? ওটাত সরকারের মস্ত গুণ হে। আমি নিজে লজ্জিত হচ্চি—ঢিলে ঢালা—গয়ং গচ্ছ ভাব ত' আমার স্বভাবেই মারাত্মক ত্রুটি। ঐ জিনিষটা ওর কাছে শিখে নেও।

নিরহঙ্কার অভিমানশূন্য মানুষটির পায়ের তলায় মাথা যে আপনি নুয়ে পড়ে!

কি একটা কথায় তাঁদের মতের মিল হলো না। সরকার বল্লেন, ওটা আপনার ভুল?

ডাক্তার বাবু বল্লেন, তা বুঝেছি—একেত সেকেলে লোক, তার উপর এই বারো বছরের বনবাসে আমি সব ভুলে গেছি—তাই ভাবচি, ভারি মুস্কিল হবে গিয়ে কলেজে!

সরকার একটুও নরম না হয়ে বল্লেন,—সেটা আমিও বুঝেছি।

কি বলেন, পেন্‌সেন্ নেবো নাকি?

তাই কি হয়? চল্‌বে কিসে?

আমার আর চলা, এক মুঠো ভাত, আর দুখানা মোটা কাপড়।

ব্যাপারটা বুঝতে দেরী হচ্চে দেখে আমি বল্লাম, উনি বিবাহ করেন নি!

চোক দুটো বড় বড় ক'রে সরকার বল্লেন -তাই নাকি! ভারি আশ্চর্য্য ত!

ডাক্তার বাবুর মুখটা লাল হয়ে উঠল; অপ্রতিভ হয়ে বল্লেন, যাক্‌গে ওসব কথা!

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় রাজবাড়ীতে বিদায় বৈঠকে চোখের জল বাণ ডেকে গেল। আগে জানতুম পুরুষের চোখের জল অত সস্তা নয়; কিন্তু সেদিন আর কেউ বাদ গেলেন না, কেঁদে আমাদের গলা ভারী হয়ে গেল—মন হ'লো যেন থস্‌থসে গোবর—আর তার মধ্যে উচ্চিংড়ের মত তুড়িলাফ্ খেতে লাগ্‌লেন—নবাগত ডাক্তার সরকার! আমাদের কিরণ ডাক্তার রাজহাঁসটির মত মাঝখান-টিতে শান্ত হয়ে বসে আছেন—আর চতুর্দ্দিকে শিখীপুচ্ছ নেড়ে ঘুরে বেড়াচ্চেন—থাক্, আর বল্‌বো না।

আগে এলো রাণীমার উপহার—একখানা সোণার ডিসের উপর টগরের কুঁড়ির মত ডাগোর এবং সাদা একছড়া মুক্তোর মালা। রাজা দিলেন, ম্যাকেবর সোনার ঘড়ি—আর জড়োয়া চেন।

তাই দেখে সরকারের চক্ষু আলু-চেরা হয়ে গেল।

আমি ভাবলুম আমি কি দিই? তাঁদের দেওয়াত সেই রাত্রেই শেষ হয়ে গেছে; কিন্তু আজো আমার দেওয়া ফুরোয় নি—এখনো ত' আমার চোখে তাঁর জন্য তপ্ত অশ্রুর ফোঁটা নিত্য ঝরে!

সকালে এসে বল্লেন, জাবব আজ যে আমি যাবো, একটু গোছ গাছ ক'রে দিও।

মুক্তোর মালাটা দিয়ে বল্লেন, একটা ছোট কাঠের বাক্সে এটা প্যাক করে দাও, ইন্‌সিওর করতে হবে।

কি ভাল লাগতে লাগলো—এই সব ছোট খাট কাজগুলি ক'রে দিতে! বাক্স তৈরি করে তুলোর মধ্যে মালা ছড়া দিয়ে বল্লাম, বন্ধ করে দেব?

রোস, রোস, একটু লিখে দিই।

কি দু'কলম লিখে দিলেন।

কাপড় দিয়ে, গালা দিয়ে শিল মোহর ক'রে দিয়ে হাতের কাছে এগিয়ে দিলাম।

ওটার কত দাম হবে জাবব ?

কি জানি !

শ' দুই ?

আড়চোখে সরকার সবই দেখছিলেন, শুনছিলেন, বল্লেন, ঠিক তার দশগুণ।

ডাক্তার বাবু অবাক হয়ে বল্লেন, বলেন কি ডাক্তার সরকার ?

আমি তখুনি খবর নিয়েছি—সবশুদ্ধ ওঁরা দিয়েছেন চার হাজার।

চার হাজার !

বেশী ত' কম নয়।

ডাক্তার বাবু কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে বল্লেন, তাই ত, এত বেশী—এর কি দরকার ছিল।

সরকারের চোখ দুটো যেন চক্‌চক্ ক'রে উঠলো !

ডাক্তার বাবু, বাক্সটার উপর ধীরে ধীরে লিখলেন Sm. N. Ray M.A, Editor, Woman's Magazine, Lahore (Punjab).

সরকার বল্লেন, উনি কে ?

আমার একজন নিকট আত্মীয়া। ঘড়ি চেনটা আমার ক্যাশ বাক্সে দিয়ে দিও।

হঠাৎ ঘরের হাওয়াটা যেন একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গের আনন্দ হিল্লোলে কাঁপতে লাগ্‌লো। গম্ভীর অথচ লঘু, শান্ত অথচ আবেগময়।

যেন মনে হলো—এমনটি রোজকার ঘরের জিনিষ নয়- যেন লক্ষ লক্ষ যুগ পরে—আজ একটা কি ঘটেচে।

সরকার তাড়াতাড়ি দেশলাই জ্বেলে সিগার ধরিয়ে ধোঁয়ার এক ফুৎকারে সবটাকে আচ্ছন্ন ক'রে দিলেন—যেন সবটাই তাঁর আগা-গোড়া অসহ্য বোধ হচ্ছিল।

আমি বল্লাম, কখন বেরুতে হবে ?

সকাল পাঁচটার সময় ; ঘণ্টা বারো লাগে ; সন্ধ্যা সাতটার গাড়ী—দিনে দিনে যাওয়াই ভাল।

তবে কালকের খাওয়ার কি হবে ?

কিছু একটা জুটেই যাবে ;—তুমি ত জান আমি দুধ খেতে ভালবাসি—লতিপুরে কিছু দুধ জ্বাল দিইয়ে নেব।

আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ যেন বেরিয়ে গেল, আজ সন্ধ্যার সময় আমার এখানে আপনারা—

তোমার বাসায় ?

সরকার তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—তোমার কে জোটায় তার নেই ঠিক—

ডাক্তারবাবু সকল কথাকে চাপা দিয়ে বল্লেন,—নিশ্চয়, তোমার আতিথ্য ত' গ্রহণ করতেই হবে, ন্যাবব। সরকারের দিকে ফিরে বল্লেন, আমি গোড়ায় এসে ওর মামার কাছে এক বচ্ছর ছিলাম, তারপর আহা সে মারা গেল ;— তখন নিজের বাসা করি।

দেহের সমস্ত রক্ত যেন বুকের মধ্যে ঠেলে জমাট বেধে গেলে ;—চোখ দুটো জলে ভরে গিয়ে—সমস্ত পৃথিবী যেন মিশে ধোঁয়ার মত হয়ে গেল!

দুপুর বেলা চাষাদের বাড়ী থেকে কাঁচা-ধানের সদ্য ফোটা চাঁদের-আলো চিড়ে নিয়ে এলাম; গয়লা বাড়ীতে বলে এলাম, সন্ধ্যা না হ'তেই কালী গাইয়ের দুধ দিয়ে যেতে। হাট থেকে কলা আর নারকল নিয়ে এসে মনে হলো এতদিনে আমার উপার্জ্জনের পয়সা সার্থক হলো! আমি জানি, আমার ইষ্ট দেবতা এতেই সব চেয়ে বেশী তুষ্ট!

অপরাহ্ণে ডাক্তারখানার তলায় এসে ছোট বজরাখানি লাগলো। এ খানি রাজা-রাণীর খাস ব্যবহারের জন্য। অতি চমৎকার ক'রে তৈরী।

ভিতরে পরিপাটি করে সাজানো; একজন মানুষের যা কিছু দরকার সব আছে;—খুঁট নাটি ক'রে আছে। শুধু তাই নয়, কি দরকার হ'তে পারে সেটিকে এমন নির্ভুল ক'রে দেখেনে ভেবে রাখা হয়েছে যে তাই অবাক হ'য়ে যেতে হয়।

পাতার মালা ফুলের তোড়া দিয়ে মনোরম করে উপরটিও সাজিয়ে দেওয়া হয়েচে। কত লোক এসে দেখে গেল।

হাজারি বাগানের দক্ষিণে রাস্তার উপর চৈতন্যমহাপ্রভুর মন্দির। সন্ধ্যা-আরতির সময় কিরণ ডাক্তার নিত্য সেখানে যেতেন। আজ ত যাবেনই।

ঘণ্টা-কাঁসর বেজে উঠতে আমি সেই দিকে ছুটে গেলাম। সরকার মন্দিরের প্রাঙ্গণে দ্রুত পায়চারি করচেন। ডাক্তারবাবু ভিতরে জোড় হাত ক'রে দাঁড়িয়ে ;—ভক্তি-স্তিমিত-লোচন!

আরতির শেষে ঢাক বেজে উঠল; পূজারি ঠাকুর চরণামৃত এবং প্রসাদ বণ্টন ক'রে ডাক্তারবাবুর দিকে চেয়ে বল্লেন, আজই যাওয়া ?

তিনি প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিয়ে বল্লেন, হাঁ, আজই শেষ দেখা!

মন্দিরের মস্ত গম্বুজের মধ্যে তখনো যেন ঢাকের আওয়াজ কাঁপছে, পঞ্চপ্রদীপের শিখাগুলো পর্য্যন্ত যেন আবেগ-চঞ্চল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডাক্তারবাবু উন্মুক্ত আকাশের নীচে এসে দাঁড়িয়ে বল্লেন, বড় শক্ত বিদায় নেওয়া। হাড় পাঁজরার সঙ্গে যেন জড়িয়ে গেছে!

সেদিন তিথি কি ছিল মনে নেই; চাঁদ উঠ্তে একটু দেরি হয়েছিল; বজরার উপর থেকে নদীর উপরকার শালুকের ফুলের উপর নজর পড়াতে যেন মনে হলো সেগুলো অতিরিক্ত ফেকাসে দেখাচ্চে। আকাশে দু'একখানা ভাঙ্গা মেঘ চাঁদের আলোর মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে; কিন্তু নীচের হাওয়া এত মন্থর যে জল একটুও নড়চেনা, কেবল থেকে থেকে ফুলগুলো কেঁপে কেঁপে উঠ্‌চে!

সেই ক্ষীণ চাঁদের আলোতে দুজনের খাবার দিয়ে পাশে চুপটী ক'রে বসে রইলাম। ডাক্তারবাবু বল্লেন, ন্যাবব তুমি কি শুন্‌তে চান? আমি ভয় করছিলাম, তুমিও বুঝি কালকের রাজ-বাড়ীর ভুলটা ক'রে ব'সবে; কিন্তু কিছু বলিওনি—তোমার ইচ্ছাতে বাধা দিতে চাইনে বলে; বাস্তবিক আমি মন দিয়ে যা' চাইছিলাম সব ক'টির জোগাড়ই কি করেছ!

সরকার বল্লেন, বাঃ কি সুন্দর মল্লিকে ফুলের গন্ধ আস্‌চে—কাছাকাছি কোথাও ফুটেছে বুঝি?

ডাক্তারবাবু হাস্‌লেন, বল্লেন, শরৎকালে বৃন্দাবন ভিন্ন আর কোথাও মল্লিকা ফোটে না। ভগবানের রাসের দিন ফুটেছিল। এ গন্ধ এই চাঁদের-আলো চিঁড়ের গন্ধ। দেখুন চেয়ে, সাধে কি আমি ওকে ন্যাবব বলি, বলিহারি ওর পছন্দ—দুনিয়ার শুভ্রতার সমাবেশ, চিঁড়ে সাদা, দুধ সাদা, চিনি সাদা, কলা সাদা, নারকল সাদা।

সরকার বল্লেন, আরো দু-একটা বাকি র'য়ে গেল যে, চাঁদের আলো সাদা এবং যিনি খাচ্চেন তিনি তুষার-ধবল।

ডাক্তারবাবুর হাসিতে সাদা দাঁতের পাটিটা চাঁদের আলোতে ঝক্ ঝক্ করতে লাগ্‌লো!

ভাল ক'রে তামাক সেজে গুড়গুড়ির নলটি তাঁর হাতে তুলে দিলাম। তিনি গম্ভীর স্নেহ ভরে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন,—খেয়ে এসো, তোমাকে কিছু বল্‌তে আমার মন চাইছে।

আনন্দে আমার আর যেন পা পড়ে না! নীচে এসে নাকে-মুখে গুঁজে এক নিমেষে খেয়ে নিয়ে উপরে গিয়ে তাঁর কাছে বস্‌লাম।

তিনি বল্লেন, এইখানে এসো,—কাছে বসো।—

আমি তাঁর কাছে গিয়ে বস্‌তেই ডান হাতখানি পিঠে বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লেন, ন্যাবব, আমার ছেলেপুলে নেই, আমার মনে হয় কি ক'রে মানুষকে স্নেহ করতে হয়, ভালবাসতে হয়, সে শিক্ষা আমার জীবনে হলো না—সেই দিক দিয়ে হয়তো কত ত্রুটি হয়েচে; তবুও আমি জানি তুমি আমাকে কত ভালবাস, আমিও তোমাকে খুব ভালবাসি—তোমাকে ভুলে যাবো, এমন দুর্দ্দিন আমার জীবনে যেন না আসে!

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লেন, না; সে সম্ভব নয়—এখেনে আমার যে আনন্দে দিন কেটেচে—তাতে কাউকে আমি ভুল্‌তে পারিনে।

একটু চুপ ক'রে থেকে বল্লেন, আমার বয়স হয়েছে, এ বয়সে মানুষকে উপদেশ দেবার একটা লোভ হয়; বুড়োর অক্ষমতাকে মার্জ্জনা ক'রো—তোমার বন্ধুর পরামর্শ বলে ধরে নিও।

তোমাকে অনেকদিন তোমার এই কাজটিকে ছোট বলে ক্ষুব্ধ হ'তে দেখেচি; কিন্তু আমার কি বিশ্বাস জান?

পৃথিবীর কোন কাজই ছোট নয়। মানুষকে ছোট ক'রে দেয় তার মনটা! এর সত্যি মিথ্যে আমি জানিনে, এই আমার বিশ্বাস।

যতই কেন ছোট হোক না তোমার কর্ত্তব্যটি—তাতে যদি তুমি দেহ মন প্রাণ দিয়ে কাজ কর ত' দেখ্‌বে একদিন, সে আর ছোট নেই এবং তুমিও লোকের অবহেলার পাত্র নও। প্রত্যেক মানুষ এমন কিছু না কিছু রেখে যেতে পারে যার জন্ত চিরদিন পৃথিবী কৃতজ্ঞ হয়ে থাক্‌বে। আমরা নিজে নিজেকেই, ছোট করি, দরিদ্র করি, রিক্ত করি। এটি একটি মনে রাখবার কথা। এই মনে ক'রে নিজের কাজটিকে যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ক'রে সম্পন্ন করে—তার ক্ষোভ করবার কিছুই থাকে না।

এই বলে তিনি চুপ্ করে বসে ভাবতে লাগলেন। আমি বারংবার আবৃত্তি করে মনের মধ্যে কথাগুলিকে দৃঢ় ক'রে নিতে লাগলুম।

তিনি একটু হেসে আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন, আমাদের ভ্রান্ত ধারণা যে একজন অপরের ক্ষতি করতে পারে। এ জগতে কেউ কারুর সত্যি ক'রে ক্ষতি ক'র্ত্তে পারে না—সব চেয়ে বড় ক্ষতি করি আমরা নিজেই নিজের।

আমাদের দোষ, আমরা স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে একদিন যাকে সাধুতার সিংহাসনে বসিয়ে পূজা করি খেয়ালের বশে অন্যদিন তাকে মাটিতে ফেলে পদাঘাত করতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করি না! এ-সবই স্বার্থের খেলা। অন্যকে ছোট করবার চেষ্টায় মানুষ অনুক্ষণ নিজেকেই ছোট করতে থাকে।

আর একটি কথা মনে রেখ, শ্যামল, লোকের উপকার করতে কোন সময়ে পশ্চাৎ-পদ হ'য়ো না; কিন্তু কোন দিন প্রত্যাশা করে কারুর উপকার করতে যেও না।

সরকার এতক্ষণ সিগারের শ্রাদ্ধ করছিলেন, বল্লেন, বুঝেছেন কিরণবাবু, এই উপদেশগুলি আজ থেকে আমিও শিরোধার্য্য করলাম। এখন বেশ বুঝতে পারচি যে এই বারো বৎসর আপনি বনে বাস করেন নি—এ আপনার তপোবন ছিল।

ডাক্তার সরকার যেটা কল্পনার চোখ দিয়ে দেখেছিলেন সেটা আমি যে এই চামড়ার চোখে দেখেচি—এই কথাটায় ভাই, আমার সমস্ত মন সাড়া দিয়ে উঠে সমস্ত দেহ রোমাঞ্চে কণ্টকিত হয়ে উঠল; চোখের জলের বাঁধ বুঝিবা আর টেঁকে না!

ডাক্তার সরকার উঠে বসে বল্লেন, দেখুন—একটা প্রশ্ন আজ সমস্ত দিনই ঘুরে ঘুরে আমার মনে এসেছে জিজ্ঞাসা করবার সাহসে কুলোয় নি; যদি মার্জ্জনা ক'রে আমার বিস্ময় দূর করেন।

ডাক্তারবাবু আকাশের দিকে চেয়ে বল্লেন, রাত দশটা প্রায় হয়; সে মস্ত কাহিনী আপনাদের ধৈর্য্য থাকবে না। আপনি জানতে চান আমি কেন বিয়ে করিনি—এই ত?

সরকার জোড়হাত করে মিনতির স্বরে বল্লেন, কিরণবাবু, বলুন দয়া ক'রে; কষ্ট হয়ত' সংক্ষেপে বলুন, ধৈর্য্য আমার থাকবে। আপনার কথাগুলি অমূল্য।

আচ্ছা, বলে ডাক্তারবাবু কি ভাবতে লাগলেন আর গুন্ গুন্ ক'রে গান করতে লাগলেন।

আমি দম বন্ধ ক'রে আরম্ভের প্রতীক্ষায় রইলাম।

(১)

তিন ভায়ের মধ্যে বাবা ছিলেন মধ্যম। জ্যেঠা মহাশয় বাবার চেয়ে অন্ততঃ দশ বছরের বড় ছিলেন। কাকা বাবার চেয়ে পাঁচ—ছ' বছরের

ছোট। জ্যেঠা মহাশয় ও বাবার মধ্যে এক বোন; এই পিসীমার এক জমিদারের ঘরে বিয়ে হয়; তাঁকে আমরা খুব কম দেখেছি। আমাদের জন্মের আগেই ঠাকুর্দ্দা-ঠাকুমার মৃত্যু হয়েছিল।

এই তিন ভায়ের তিনজনেই পৃথক মত পোষণ করতেন; কিন্তু মত নিয়ে কেউ কাউকে চাপা-চাপি করতেন না। মতামতের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখেও কি ক'রে এক অন্নে আনন্দ এবং শান্তির সঙ্গে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়—তার দৃষ্টান্ত দিতে গেলে আজও আমাদের দেশের লোক আমাদের বাড়ীর কথাই উল্লেখ ক'রে থাকে!

জ্যেঠা মহাশয় ছিলেন রক্ষণশীল লোক; তিনি বলতেন, যে সব প্রথা আবহমানকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত চলে এসেছে সেগুলোর মধ্যে কিছু না কিছু সত্য আছেই আছে; সেগুলোকে পরিত্যাগ ক'রে সম্পূর্ণ নূতনকে আশ্রয় ক'রতে যাওয়ার ভিতর এমন একটা ঝঞ্ঝাট আছে যাতে নিধন পর্য্যন্ত সম্ভব!

একদিন বাবা এই কথার উত্তরে হাসতে হাসতে বল্লেন, দাদা, আমি তোমার ও কথা খুব মন দিয়ে কোন দিনই স্বীকার করতে পারিনি।

জ্যেঠা মহাশয় খুব বিস্মিত হয়ে বল্লেন, কেন বলত?

তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাইনে; তবে যখনই তুমি ও কথা বল তখনি আমার একটা কথা মনে পড়ে;—

এই মনে কর, আবহমানকাল থেকে এই একটা কথা চ'লে আসছিল যে পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য্য ঘুরে বেড়াচ্চে—সেদিনও লোকে এই কথা বিশ্বাস করতো—আজও আমাদের দেশে বহুলোক আছে, যারা এই কথাই জানে এবং মানে; কিন্তু তুমি ত জান দাদা যে ঐ কথার মধ্যে সত্য কিছুই নেই এবং সত্য কথাটা গ্রহণ ক'রে পৃথিবী যে কোন ভয়াবহ বিপদের মধ্যে এসেছে তাও না—তবে তোমার ঐ কথাটি কেমন ক'রে মেনে নেব, বল?

জ্যেঠা মহাশয় চুপ ক'রে ভাবতে লাগলেন, তারপর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লেন;—কিন্তু আমি এ কথাও বিশ্বাস করিনে যে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা নিতান্ত অবিবেচক ছিলেন এবং তাঁরা যা স্থির করে গেছেন সেগুলোর সংজ্ঞে ওলট-পালট হতে পারে।

বাবা মৃদু হেসে বল্লেন, মানুষকে কোথাও-না-কোথাও একটা বিশ্বাসের ভূমিতে এসে দাঁড়াতে হয়ই—সেখানে যুক্তি পর্য্যন্ত হয়।

এ সব তর্ক আমার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়া নিয়ে চল্‌ছিল। জ্যেঠা মহাশয়ের বিশ্বাস ছিল যে মেডিক্যাল কলেজে ঢুক্‌লে হিঁদুর আর কোন হিঁদুয়ানী থাকে না, বাবা বল্‌ছিলেন, যে হিঁদুর-হিঁদুয়ানী ও মনের উপর নির্ভর করে; একটা বিদ্যা অর্জ্জন করতে যদি কিছুদিনের জন্য হিঁদুর সকল রীতিনীতি না মান্‌তে পারা যায় তাতে বিশেষ ক্ষতি নেই। মনে শ্রদ্ধা থাক্‌লে সেগুলো ফিরে আস্‌তে বড় দেরি হয় না।

শেষে কাকার ডাক পড়্‌ল। বাবা বল্‌লেন, আমার ঠিক মনে আছে, নরেশকে কল্‌কাতা পাঠান নিয়ে বড়দাদা তুমি ঐ রকম হাঙ্গামা করেছিলে। তোমার যত ভয় সেত' সব মিছে হয়ে গেছে—তাকে ঘরে বসিয়ে রাখলে কি ফল হতো ?

নরেশ আমাদের বড় দাদা। তিনি এম-এ পাশ ক'রে ডেপুটী হন; এখন পেন্‌সেন নিয়ে ঘরে আছেন।

অবশেষে জেঠা মহাশয় মত দিলেন। আমাকে নিভৃতে ডেকে বল্লেন, দেখ বাবা, শুনেছি সেখানে মেথরের চেয়েও ইল্লুতে কাজ করতে হয়। যথাসাধ্য সে গুলো না করতে হয়, তাই চেষ্টা করবে।

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম !

বাবা আমাকে কোন উপদেশ দিলেন না। ছোট হোক, বড় হোক, সকল মানুষকে তিনি বড় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন; তিনি বল্‌তেন, বাইরের উপদেশের আজ্ঞা এবং নিষেধ মানুষের ভালর চেয়ে মন্দ করে। তার পথ, তাকেই নির্দ্দেশ করতে দাও; তোমার ছায়া ফেলে অন্ধকার করে দিও না।

এ যে কত বড় দামী কথা সে যেন এই পরিণত বয়সে সবে বুঝতে আরম্ভ করচি। কেউ অন্যায় করলে বাবা আমার তাকে তিরস্কার করতেন না, তাঁর মুখের এমন একটা ভাব হ'তো যাতে বুঝতে পারা যেত যে তিনি বড় ব্যথা পাচ্ছেন। কোন ভাল কাজের পুরস্কার ছিল, তাঁর শান্ত প্রফুল্ল হাসিটি !

কাকার কথা পরে বলবো। এখন আমার মার কথা বেশী মনে হচ্চে—তাঁর কথাই বলি।

আমি তাঁর এক মাত্র সন্তান। আমাকে বিদেশে পাঠিয়ে দিতে তাঁর যে কি হচ্ছিল তা ত' বেশ অনুমান করা যায়; কিন্তু তিনি সেটি সম্পূর্ণ গোপন ক'রে প্রসন্নতার মূর্ত্তি ধারণ ক'রে ছিলেন পাছে আমি দুঃখ পাই। মার কথা মনে ক'রে আমি আজো মনের মধ্যে কেমন একটা আরাম অনুভব করি।

বাবার ইচ্ছার কোন চাপ তাঁর স্বভাবের কোন দিকটি কুণ্ঠিত করে দেয় নি। তাঁর ভিতরকার সমস্ত শক্তি পরিপূর্ণ ভাবে বিকসিত হয়ে উঠবার পুরো সুযোগ পেয়েছিল।

তোমরা হয়ত হাস্‌বে তবুও আমি বল্‌বার লোভ সামলাতে পারচিনে—মা কে মনে হ'লে আমার মনে একটা অপূর্ব্ব ছবি জেগে উঠে। হেমন্ত কালের শিশিরে ভেজা ঝলমলে সকালে ঘন সবুজের মধ্যে লাল স্থল পদ্ম ফুটে থাকৃতে দেখে থাকবে—মা যেন ঠিক তাই ছিলেন!

বাবার ভিতরের মানুষটি চিন্তার সাধনায় এমন সাধুত্ব লাভ করেছিল যে আর তাঁর প্রকৃত স্বরূপটিকে খুঁজে পাওয়া যেত না। সংযমের কবচে যেন নিত্য আবৃত! কিন্তু মার তেমনটি হয়নি; রাগ করবার প্রয়োজন হ'লে তিনি খুব রাগ করতেন; দৃঢ় হবার দরকারে মার দৃঢ়তার কথা মনে ক'রে আজো আমার যেন ভয় ভয় করে। তাঁর প্রকৃতির মধ্যে মানুষের সব প্রবৃত্তিগুলিই ছিল—কিন্তু তাদের সামঞ্জস্য কি ক'রে যে এমন একটা সুন্দর পরিমাণের মধ্যে এসেছিল তা' আজও আমি ভেবে ঠিক করতে পারি নি। বাড়ীতে বোধ করি মাকে ভয় করতেন না, এমন কেউ ছিলেন না, আবার মাকেই আমরা সব চেয়ে ভাল বাসতাম।

মা বল্‌লেন, প্রত্যেক মানুষের পর্দ্দার দরকার আছে; কিন্তু মেয়েদের জন্যে যে বিশেষ একটা পর্দ্দার ব্যবস্থা সমাজে আছে সেটা কোন দিক দিয়েই সমাজের কল্যাণের নয়। নিজের সম্ভ্রম নিজে যদি রাখতে না পারি তার জন্যে পাঁচিল তুলে পরের পাহারার উপর নির্ভর করতে হয়ত'—তার চেয়ে বড় লজ্জার পরিচয় আর কি থাকৃতে পারে! যে পুরুষ মেয়েদের পর্দ্দার জন্য চিন্তাকুল তাকে তিনি সন্দেহের চক্ষে দেখতেন, বল্‌তেন, ও মনে করে যে মেয়েদের আত্ম-সম্ভ্রম জ্ঞান নেই। তিনি হেসে বল্‌তেন, যে নিজের মর্য্যাদা নিজে রাখতে পারবে না—তার মর্য্যাদা রক্ষা করবে—পাঁচিল আর অন্দর মহল!

মা জেঠা মশায়ের সঙ্গে অসঙ্কোচে কথা কইতেন। বল্‌তেন, বাড়ীর যিনি কর্ত্তা তাঁর সঙ্গে কথা না কইবার অধিকার যদি না থাকেত—সে বাড়ীতে থাকবো কেন? তিনি আমাকে জানবেন না; আমি তাঁকে জানবো না—তবে সংসার চল্‌বে কি করে? আর ছেলে পুলেরাই বা তাঁকে কি মনে করবে—আমাকেই বা কি মনে করবে?

বাবা হাস্‌তেন, আমি কি কোন দিন তোমাকে মানা করেছি?

মা অহঙ্কারে ডগমগ হয়ে বল্‌তেন; সেই ত' আমার জীবনের সব চেয়ে সৌভাগ্য!

জেঠাইমাকে আমি দেখিনি; শুনেছি তিনি নরম প্রকৃতির লোক ছিলেন, যাকে আদর করে জাঁদরেল বলে ডাকতেন। জাঁদরেল—বোধ হয় ইংরাজি জেনারেলের অপভ্রংশ। জেঠাইমার নাকি খুব রসবোধ ছিল।

কাকিমা আমার ঝরে পড় পড় চামেলির মত অমনি ক্ষীণ, অমনি ভঙ্গুর কিন্তু নিজের ছোট গণ্ডীর মধ্যে কাব্যের পরিমলে ভরপুর। গৃহ কর্ম্মের কোন ধার ধারতেন না। কবিতা লিখতেন, সেতার বাজাতেন আর কাকার ছবি গুলোর কঠোর সমালোচনা করতেন। কাকা গোঁফ জোড়াটা পাকিয়ে ইন্দুরের ল্যাজের মত করে কাণে গুঁজে দিয়ে বল্‌তেন, মন্টু, পরাধিকার চর্চ্চা ভাল নয়—তার চেয়ে সেতারে একটা হাম্বির আলাপ কর, শুনি।

কাকিমার সেতারের ঝঙ্কার শুনে বাবা এসে রোয়াকের উপর লম্বা লম্বা পায়-চারি করতেন। জেঠা মশাই বাইরে উৎকর্ণ হয়ে হিসাব লিখ্‌তে বস্‌তেন—আর আমাদের মনগুলো যেন আনন্দে মেতে যেত। অঙ্ক কষতে কষতে শেষ পর্য্যন্ত শ্লেটে পেনসিল্‌ দিয়ে টোকা দিচ্চি!

ডাক্তার বাবু একটু থামলেন, বল্লেন, বুঝেছ ন্যাবব, এই সব কথা আমার মনে করতেও ভারি একটা আনন্দ হয়—জানিনে তোমাদের কেমন লাগ্‌বে।

সরকার আগ্রহ ভরে উঠে ব'সে বল্লেন, কেমন লাগ্‌বে? আমি যেন গিল্‌চি!

আমরা তিন জনেই তাঁর কথা শুনে হাস্‌তে লাগলুম।

ডাক্তার বাবু আবার আরম্ভ করলেন,—একটা কি রকম পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে যে আমরা মানুষ হয়েছি আজ তা' মনে করলে যেমন আনন্দ হয় তেমনি বিস্ময়ও হয়—তখন সমাজের কি অবস্থা ছিল আর কি করেই বা এমনটি সম্ভব হয়েছিল।

জেঠামশাই যেন গঙ্গা, অতীতের গৌরব অতীতের ধুলামাটি—কিছুই বাদ না দিয়ে তাঁর জীবনের গৈরিকধারা বইত; বাবা স্থির ধীর স্বচ্ছ-তোয়া যমুনা—সব সংস্কার যেন থিতিয়ে তলিয়ে গেছে, আর কাকার গুপ্ত-ধারা সরস্বতীর যেখানে প্রকাশ—সেখানে নন্দন-কানন সৃষ্টি করতো কিন্তু বেশীর ভাগই অপ্রকাশ! এই ত্রিবেণী তীর্থোদকে পুণ্য-স্নান করে আমরা যেন জীবনের পথে যাত্রা করে ছিলাম। আজ জীবনের সন্ধ্যায় সে গুলো ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে আস্‌চে—কিন্তু যত দূরে যাচ্চে ততই যেন মনোরম হয়ে উঠ্‌চে।

জীবনে তার আগে আর কখনো কলকাতায় যাইনি তাই আমার মনের মধ্যে বুকের কাছে কি যেন গুর্ গুর্ করচে, মা তা কেমন করে জান্‌তে পেরেছেন, বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বল্লেন,—ওগো এই রাক্ষুসী মার এত ভয় তরাসে ছেলে! ভয় কি তোর?

আমি, ভাদ্র মাসের মেঘের ফাঁকে ডুবে-যাবার সময়ে সূর্য্য যেমন করে একটু খানি হেসে যায় তেমনি করে হাসতে লাগলুম। মা বল্লেন, দুষ্টু আমার, হাসি দিয়ে কি কান্না ঢাকা যায়?

তারপর, আঁচলের খুঁটে বাঁধা নোটখানি খুলে বল্লেন, কর্ত্তাদের টাকার তোর হিসেব দিতে হবে; কিন্তু এটাকার কেউ হিসেব নেবে না। এই দিয়ে তুই তোর যা ভাল লাগ্‌বে কিন্‌বি খাবি; আর একটি কাজ করিস্ বাছা; মাঝে মাঝে থিয়েটার দেখিস্ আমি ভারি ভালবাসি, তোর মন ভাল থাকবে।

কল্‌কাতায় গিয়ে মার কথা মনে ক'রে আজো আমি একদিন ক'রে থিয়েটার দেখি!

কপালে চন্দন আর দইএর ফোঁটা দিয়ে মা বল্লেন, এই ঘটকে প্রণাম কর, হাতে বিল্বপত্র দিয়ে বল্লেন, ওই শুঁকতে শুঁকতে তোমার গুরুজনদের প্রণাম ক'রে গাড়ীতে এসো গিয়ে।

তাঁকে প্রণাম ক'রে তাঁর আজ্ঞামত গাড়ীতে গিয়ে ব'স্‌লাম।

বাড়ী থেকে প্রায় এক ক্রোশ ষ্টেশন; রেলগাড়ীতে টিকিট ক'রে তুলে দেবার জন্য সঙ্গে কাকা চল্‌লেন।

খানিকক্ষণ শিশ্ দেওয়ার পর হঠাৎ কাকার যেন চটক ভাঙ্গলো, কিরণ, তুই বুঝি আর কোন দিন ক'লকেতা যাসনি?

না, আমি ঘাড় নাড়লুম।

কাকা বিরক্ত হয়ে বল্লেন, কি যে সব করেন; তাইতো! একটু চিন্তা ক'রে বল্লেন, আচ্ছা তোকে সব বুঝিয়ে দিচ্চি। মনে কর হাওড়ায় নাব্‌লি, বুঝেছিস্?

আমি ঘাড় নাড়লুম।

সেখানে অনেক গাড়ী পাওয়া যায়, বুঝেচিস্?

আমি ঘাড় নাড়লুম।

কাকা অপ্রসন্ন হয়ে বল্লেন, কথা কইচিস্ নে কেন?

হুঁ।

সোজা চলে এসে হ্যারিসন রোড্ আর কলেজ ষ্ট্রীট যেখেনে কেটেছে সেখেনে কৃষ্ণদাস পালের ষ্ট্যাচু, ডান হাতি মোড় নিলেই ভবানীচরণ দত্তের গলি, সেই গলির মধ্যে খানিকটা গেলেই ১০ নম্বর বাড়ী, বুঝেছিস্ কি না?

হুঁ।

বেশ বড় তেতালা বাড়ী দেখ্‌লেই চিন্‌তে পারবি।

আমি মনে মনে হাস্‌লুম।

একটু পরে বল্লেন, আর যদি পোল খোলা থাকে?

কাকা একটু অধীর হয়ে উঠ্‌লেন। একটা উৎকণ্ঠা যেন তাঁর মনকে ব্যাকুল করে তুল্‌লে।

ষ্টেশনে পৌঁছে দু'তিন মিনিটের মধ্যেই ট্রেনটা এসে পড়ল! আমাকে একটা গাড়িতে তুলে দিয়ে কাকা হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ট্রেনটা ছাড়্‌চে এমন সময় দেখলাম গার্ডকে তিনি ব'লে আমাদের গাড়ীর দরজা খুলে ভিতরে লাফিয়ে উঠ্‌লেন।

আমি অবাক্ হ'য়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম। তিনি গম্ভীর হয়ে বল্‌লেন, আর কিছু ভয় নেই আমি এমন ক'রে তোকে একলা ছেড়ে দিতে পারিনে আমারও ত' একটা কর্ত্তব্য বোধ আছে!

গাড়ী ক্রমেই খুব জোরে চল্‌তে লাগ্‌লো।

—ক্রমশ

রাত্রি

শ্রীসুনীতি দেবী

স্বপ্নালসা সন্ধ্যার কপালে সিঁদুরের টিপটি পরিয়ে দিয়েই সূর্য্যদেব উষার সন্ধানে চলে গেলেন। ঐটুকু সোহাগের চিহ্নের গর্ব্ব নিয়েই সন্ধ্যা মহিয়সী হ'য়ে উঠল।

প্রিয়ের মনোরঞ্জন করবার জন্য বিচিত্র বেশভূষা তার সারা না হতেই সে বুঝি জানতে পারল্ যে প্রিয় তার বহুদূরে। সে তখনই সব সজ্জা দূর করে ফেলে দিয়ে, ব্যথায় আচ্ছন্ন দেহ নিয়ে তার অনাদিকালের সখী রাত্রির কোলে ঢ'লে পড়ল।

রাত্রি তার সারা অঙ্গন ভ'রে প্রদীপ জ্বালিয়ে বিশ্বের প্রতীক্ষায় বসে রইল। থেকে থেকে মূর্চ্ছিতা সখীর ললাটের উজ্জ্বল সন্ধ্যাতারাটির দিকে চেয়ে তার বুক বেদনায় টনটন্ ক'রে উঠ্‌ছিল। আহা, ওটুকুও যদি সে পেত।

তবু নিজের সব ব্যথা অন্ধকারে ঢেকে রেখে, সন্ধ্যাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তাকে আরও নিবিড় করে নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিল। দণ্ড পল কেটে যেতে লাগ্‌ল, অন্ধকার গভীরতর হ'য়ে উঠ্‌ল, অজানার প্রতীক্ষা তবু ফুরাল না।

সন্ধ্যার টিপ্‌টির দিকে চেয়ে আবার রাত্রি ভাবতে লাগ্‌ল। এতখানি পেয়েও সন্ধ্যার মন ওঠে না। আর আমি যে প্রতিদিন ছুটে আসি তাকে দেখ্‌ব ব'লে, অনন্তকালে একদিনও দেখা পেলাম না, সামনে অনন্ত ভবিষ্যতেও পাব না, তবু আমি বাঁচি কি করে? কেন এ আকর্ষণ? তাকে দেখি না, দেখি তার সোহাগ স্পর্শ সখীর ললাটে ভাস্বর হ'য়ে থাকে। তার প্রতিফলিত আলোয় আমার ঘরের চাঁদ জ্বলে ওঠে, শুধু আমার অন্তরই চির-অন্ধকারে ঢাকা থাকে। কেন এ শাস্তি কে ব'লে দেবে?

পৃথিবীর চাপা কান্না কানে পৌঁছাতেই রাত্রি ক্ষণেকের জন্য নিজেকে ভুলে, শান্তি-শীতল স্পর্শ মানবের সর্ব্বাঙ্গে বুলিয়ে মায়ের স্নেহে তাদের ঘুম পাড়িয়ে ফেল্‌ল।

আবার তার হৃদয় ভেদ ক'রে দীর্ঘশ্বাস ছুটল। তার মনে প্রশ্ন উঠ্‌ল—আমার মত দুঃখী কে আছে? অথচ আমাকে সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই! আমিই বিশ্বের বেদনার বোঝা বুকে ব'য়ে বেড়াই কেন?

ভাবতে ভাবতে তার করুণ চোখের ঘন-কৃষ্ণ-পল্লব থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল শিশিরের মত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল।

কখন্ প্রহর কেটে গেল। রাত্রি চম্‌কে শুন্‌ল,—সর, সর,—তোমার বিরাট অন্ধকার নিয়ে সরে যাও। আলোর উৎসব হবে।

রাত্রি আকুল সুরে বল্‌ল—ওগো আলো, তুমি অন্ধকারকে শুধু ঘৃণাই কর। জান না, আলোর একটু কণা পাবার জন্য অন্ধকারের প্রাণ ভরা কি পিপাসা? একটিবার আলোর রাজাকে দেখ্‌তে দাও,—একটিবার শুধু,—কেবল একটি পলক।—

কারও কানে তার মিনতি পৌঁছাল না।

আসন্ন-প্রিয়-মিলন-সুখ কল্পনায় অধীরা উষার লজ্জারক্ত দেহের দিকে চেয়ে, ঘোমটায় বেদনা-কাতর মুখ ঢেকে রাত্রি আলোক-পারাবারের ওপারে চলে গেল।



নববর্ষের গান

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

একান্তে বিদীর্ণ করি,'
স্বপ্নমায়াজাল,
প্রকাশো দুঃসহ তেজে
হে রুদ্র, ভয়াল !

জ্বলন্ত জ্যোতিকে জ্বালো
সত্যের সুতীব্র আলো,
নিমেষে নিঃশেষ হোক্
তমিস্র করাল !

চাহিনা কাতর চিত্তে
মুগ্ধ সুখাবেশ,
অনন্ত আহ্বানে প্রাণ
হোক্ নিরুদ্দেশ !
জাগ্রত চৈতন্যে হানি'
শাশ্বত শক্তির বাণী,
সুন্দরের দীক্ষা দেহ
উদাত্ত বিশাল।



(দুই)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ক্রিসতফ-এর পূর্ব্বপুরুষদের আদিবাসস্থান এন্তোয়ার্প। কিন্তু বৃদ্ধ জাঁ মিশেল দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসেন; কারণ তিনি ছিলেন অত্যন্ত বদরাগী, কলহপ্রিয়; বালক সুলভ ঝগড়াঝাঁটির ফলে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে রাইন নদীর তীরে একটি ক্ষুদ্র শহরে আসিয়া বাসা বাঁধেন। বাড়ীগুলির লাল চূড়া, ছায়াশীতল বাগান, একটি সুন্দর পাহাড়ের কোলে যেন ছবির মত আঁকা, রাইনের সবুজ আয়নার বুকে তার প্রতিবিম্ব যেন খেলা করিতে থাকে। স্থানটিকে সঙ্গীত-শিল্পীদের রাজ্য বলা চলে এবং জাঁ মিশেল সঙ্গীতে এমনি প্রতিভাশালী ছিলেন যে, সেই দেশেও তাঁহার যশোরাশি ছড়াইয়া পড়ে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি স্থানীয় রাজার প্রধান ওস্তাদের অবর্ত্তমানে তাহার স্থান অধিকার করিয়া মৃত ওস্তাদের কন্যা ক্লেরাকে বিবাহ করেন এবং এই দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করিয়া দেন। ক্লেরা ছিলেন আদর্শ জার্ম্মেন রমণী;—একদিকে যেমন শান্ত অন্যদিকে আবার তেমনি দুইটি বিষয়ে পাগল—রন্ধন আর সঙ্গীত ছিল যেন তাঁহার নেশা। তাঁহার শৈশবের পিতৃভক্তি যেন বর্ত্তমানের স্বামী-ভক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া দেখা দিল। জাঁ মিশেলও পত্নীকে গভীরভাবে ভাল বাসিতেন। এমনিভাবে পনর বৎসরের দাম্পত্য জীবন অনাবিল শান্তির মধ্যে কাটিল। চারটি সন্তান রাখিয়া ক্লেরা পরলোক গমন করিলেন। জাঁ মিশেল পাঁচমাসকাল পত্নীর উদ্দেশে শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া ওতিলী স্যাটজ্-কে বিবাহ করিয়া বসিলেন। ওতিলীর—বয়স আন্দাজ বিশ, সদাহাস্যময়ী, স্বাস্থ্য

সমুন্নত দেহ। জাঁ মিশেল ক্লেরার মধ্যে যত সদ্‌গুণ দেখিতেন, সবগুলিই প্রায় ওভিলীর মধ্যে আবিষ্কার করিয়া বসিলেন এবং সমান উদ্দামতায় নব পরিণীতাকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন! আট বৎসর বিবাহিত জীবন যাপন করিবার পর ওভিলীও সাতটি সন্তান রাখিয়া মারা গেলেন। এই দুই সংসারের এগারটি সন্তানের মধ্যে মাত্র একটি সন্তান বাঁচিয়া রহিল। জাঁ মিশেল সন্তানদের অত্যন্ত ভালবাসিতেন, তবুও তাহাদের অকাল মৃত্যুতে তাঁহার স্বাভাবিক স্ফূর্তি কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তাঁহার শেষ বয়সে সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর আঘাত, মাত্র তিন বৎসর পূর্ব্বে ওভিলীর মৃত্যু। এ বয়সে আর নূতন করিয়া সংসার পাতা চলে না। কিছুদিনের জন্য চিত্তবিক্ষোভ তাঁহাকে অভিভূত করে কিন্তু কালক্রমে তিনি এমনি প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠেন যে, আর কোন দুর্ব্বিপাকই তাঁহাকে টলাইতে পারে নাই।

জাঁ মিশেল স্বভাবতই স্নেহশীল কিন্তু তাঁহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল—তাঁহার স্বাস্থ্য। বেদনা বিমর্ষতার প্রতি তাঁহার যেন একটা দৈহিক বিতৃষ্ণা ছিল। স্ফূর্তির ক্ষুধা, ফ্লেমিসদের জাতিগত অফুরন্ত স্ফূর্তির আকাঙ্খা, শিশুর মত অবুঝ সুখস্পৃহা এবং অসংযত অট্টহাস্যই যেন জাঁ মিশেল-এর প্রকৃতির বিশেষত্ব! দুঃখ শোক যত গভীর হইয়াই আসুক না কেন তাঁহার পানভোজনে এক রতিও কম পড়িত না এবং তাঁহার সঙ্গীতের আখড়া একদিনের জন্যও বন্ধ থাকিত না। তাঁহার পরিচালনায় স্থানীয় রাজার অরকেষ্ট্রা-টি রাইন প্রদেশের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল। জাঁ মিশেল তাঁহার বিরাট বপু, তাঁহার অকারণ কোপ এবং তাঁহার মনীষা লইয়া প্রায় রূপকথার নায়ক হইয়া উঠিলেন। প্রচণ্ড চেষ্টাতেও তিনি আত্মসংবরণ করিতে পারিতেন না, চাহিতেনও না; কারণ প্রায় সমস্ত বদরাগী লোকের মতই ভিতরে ভিতরে তিনি ছিলেন ভীরু স্বভাব। এবং সর্ব্বদা আশঙ্কা করিতেন, কোথায় তাঁহার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। বস্তুত বাহিরের মান মর্য্যাদার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট আসক্তি ছিল এবং লোকনিন্দাকে তিনি বেশ ভয় করিতেন; কিন্তু সময় সময় তাঁহার রক্তটা বেশ গরম হইয়া উঠিত, তখন তিনি রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন। শুধু রিহার্শেলের সময়ই নয়, এমন কি কনসার্টের মধ্যেও রাজার সম্মুখে তিনি তাঁহার লাঠি ছুঁড়িয়া ভূতগ্রস্তের মত লাফাইয়া চীৎকার করিয়া যন্ত্রীদের 'মধুর' সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতেন। রাজা দৃশ্যটি বেশ উপভোগ করিতেন কিন্তু যন্ত্রীরা আন্তরিক বিদ্বেষ ভাবই পোষণ করিত। ক্রোধ প্রশমিত হইলে লজ্জিত

মিশেল অতিরিক্ত ভদ্রতার আড়ম্বর করিয়া তাঁহার খামখেয়ালী ঢাকিবার বৃথা চেষ্টা করিতেন। কিন্তু আবার এক সময় সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া তাঁহার স্বভাব প্রকাশ হইয়া পড়িত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন অতিমাত্রায় বদরাগী হইয়া উঠিতে লাগিলেন, শেষে তাঁহার অধিকারীর পদ বজায় রাখা কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি নিজেই তাহা অনুভব করিলেন এবং একদিন যখন তাঁহার ক্ষিপ্ততায় সমস্ত অর্কেষ্ট্রা ধর্ম্মঘট করিবার ভয় দেখায় তখন মিশেল আপনা হইতেই চাকুরীতে ইস্তফা দেন। আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অতীতের কার্য্যকারিতা ও খ্যাতির অনুরোধে তাহারাই আবার তাঁহার পদত্যাগ না-মঞ্জুর করিবে এবং থাকিবার জন্ম খোসামোদ করিবে। কার্য্যত কিন্তু এমন কিছুই ঘটিতে দেখা গেল না এবং যেহেতু মিশেল-এর অত্যুগ্র গর্ব্ব পুনরাবেদনের অন্তরায় হইল, তিনি ভগ্নহৃদয়ে মানুষের অকৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে স্থানে অস্থানে উপদেশ দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

তখন হইতে সময় যেন আর কাটে না। মিশেল ভাবিয়া পান না যে, কি দিয়া দিনগুলি ভরাইবেন। সত্তরের কোটা পার হইয়াছেন, তবুও স্বাস্থ্য অটুট। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শহরের বাড়ী বাড়ী সঙ্গীতশিক্ষা দিয়া, মানুষের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করিয়া, উপদেশের বন্যায় সকলকে অভিভূত করিয়া এবং সকল বিষয়েই সন্দাবী করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। নানা বিষয়েই তাঁহার মাথা খেলিত; সুতরাং তাঁহার কাজের অভাব ঘটিত না। তিনি বাদ্যযন্ত্রাদি মেরামত করিতেন এবং নানা রকম পরীক্ষার ফলে যন্ত্রাদির উন্নতি করিতে লাগিলেন। এমন কি, মধ্যে মধ্যে নিজে সঙ্গীত রচনা করিয়া বসিতেন এবং নিজের রচনায় নিজেই প্রায় মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। এক সময়ে তিনি একটি রচনা লইয়া মাতিয়া উঠেন এবং মনে করিতেন যে, ইহা তাঁহাদের বংশের স্থায়ীকীর্ত্তি। এই রচনায় তিনি এক সময়ে মাথা এত ঘামাইয়াছিলেন যে, তাঁহার বেশ কঠিন রকমের মস্তিষ্কের অসুখ হইবার উপক্রম হয়। এই রচনার মধ্যে অভূতপূর্ব্ব মনীষার ছাপ আছে বলিয়া তিনি নিজেকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু মনে মনে তাহার অসারতা এবং শূন্যতা বেশ বুঝিতেন, তখন আর সেই রচনার দিকে তাঁহার চাহিতেও সাহস হইত না; কারণ তাহার প্রত্যেক পংক্তিতে প্রত্যেক স্বরবিন্যাসের মধ্যেই দেখিতেন অন্য রচয়িতাদের সৃষ্টির জোড়াতাড়া; নিজের বলিয়া গর্ব্ব করিবার কিছুই তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেন না। ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের সব চাইতে বড় দুঃখ। সময়ে সময়ে অবশ্য এমন

ভাব আসিত যাহা তাঁহার কাছে সত্যই মনোরম বলিয়া মনে হইত, তখন বৃদ্ধ ছুটিয়া গিয়া লিখিতে বসিতেন। কম্পিত বক্ষে ভাবিতেন, এবার সত্য প্রেরণা আসিল নাকি ?—কিন্তু কলম স্পর্শ করিবা মাত্র অনুভব করিতেন, যেন নিস্তব্ধতার অতলে তাঁহার সমস্ত অগীত সঙ্গীত, তাঁহার অলিখিত রচনা তলাইয়া যাইতেছে। বিলীয়মান সঙ্গীত-রস-মূর্ত্তিগুলিকে আকুল প্রাণে বৃদ্ধ আহ্বান করিতেন; কিন্তু তাহারা কোথায় মিলাইয়া যাইত এবং শুধু মেণ্ডেল্‌সন্‌ ও ব্রামস্‌-এর অতি পরিচিত সঙ্গীত কণাগুলি তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইত।

জর্জ সাঁ বলিয়াছেন,—এ পৃথিবীতে এমন অনেক হতভাগ্য মনীষী আছেন যাঁহাদের আত্মপ্রকাশের কোন ভাষা নাই, যাঁহারা তাঁহাদের চিন্তাকে রূপ দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া এজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। জাঁ মিশেলও এই মহান মূক-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ;—কথা এবং সঙ্গীতে তাঁহার নিজেকে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা সমান! তবু সান্ত্বনার জন্য আত্মপ্রতারণা আবশ্যক। ভাল করিয়া কথা বলিতে, লিখিতে, সঙ্গীত রচনা করিতে, প্রশান্ত বাগ্মী হইতে তাঁহার আকাঙ্খা হইত এবং সেই অপূর্ণ ইচ্ছাই ছিল তাঁহার হৃদয়ের গোপন ক্ষত। কাহাকেও ইহা বলিতেন না, এমন কি নিজেও ইহা অস্বীকার করিতে চেষ্টা পাইতেন। এই চিন্তা মন হইতে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেন; কিন্তু তাঁহার আত্মরক্ষার সমস্ত বর্ম্ম চূর্ণ করিয়া এই দারুণ নিষ্ফলতার বেদনা তীরের মত আসিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিত। তাঁহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইত।

বৃদ্ধ মিশেল! কোন বিষয়েই নিজের প্রতিষ্ঠা-ভূমি যেন খুঁজিয়া পায় নাই। শক্তি এবং সৌন্দর্য্যের কত বীজ তাঁহার মধ্যে সুপ্ত ছিল, একটিও অঙ্কুরিত হইবার সুযোগ পাইল না! একদিকে শিল্পের মহিমায় গভীর ও সকরুণ বিশ্বাস এবং জীবনে কল্যাণ-প্রবৃত্তির প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা, অন্যদিকে কি অসংযত ও হাস্যকর সেই ভাবের প্রকাশ! একদিকে গভীর আত্মমর্য্যাদা, অন্য দিকে মনিবদের প্রতি দাসমনোভাব! একদিকে উদার স্বাধীনতা-প্রিয়তা, অন্যদিকে অসম্ভব রকমের বশ্যতা! একদিকে চিত্তকে সতেজ ও উন্মুক্ত রাখিবার স্পর্দ্ধা, অন্যদিকে অসংখ্য অন্ধ বিশ্বাস! সৎসাহস ও বীরত্বের প্রতি অনুরাগ এবং পর্ব্বতপ্রমাণ ভীরুতা—ইহাই জাঁ মিশেল! প্রকৃতি যেন মনীষার বিকাশ করিতে করিতে মধ্য পথে থামিয়া গিয়াছেন!

* * *

জাঁ মিশেলের সমস্ত আশা আকাঙ্খা ক্রমশ তাঁহার পুত্রকে আশ্রয় করিয়া বসিল এবং মেলশিয়োর প্রথমে তাহা পূরণ করিবার আভাষ দিতেছিল। শৈশবেই সে আশ্চর্য্য সঙ্গীত-কৌশলের পরিচয় দিয়াছিল। এত সহজে সে সঙ্গীত-কলা আয়ত্ত করিয়া বসিল, বিশেষত বেহালা বাদনে এমন নিপুণতা দেখাইল যে, প্রিন্সের কনসার্ট দলের মধ্যে সে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় যন্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হইল। বেহালা ছাড়া পিয়ানো প্রভৃতি যন্ত্রও সে বেশ বাজাইত। তাহার কথা ছিল সুন্দর এবং তাহার দেহ ঈষৎ স্থূল হইলেও জার্ম্মেন দেশে 'ক্লাসিক' ছাঁচের রূপ বলিয়া প্রশংসা পাইত। তাহার ললাট ছিল প্রশস্ত কিন্তু কেমন যেন কিছুই প্রকাশ করিত না, বিশাল সুগঠিত বপু, কুঞ্চিত শ্মশ্রু—যেন রাইন নদীর জুপিটার মূর্ত্তি! বৃদ্ধ জাঁ মিশেল পুত্রের উন্নতিতে খুশী হইতেন। নিজে কখনও ভাল করিয়া কোন যন্ত্রই বাজাইতে পারিতেন না বলিয়া পুত্রের যন্ত্র চালনার দক্ষতায় মুগ্ধ হইতেন। মেলশিয়োর যাহা প্রকাশ করিতে চাহিত তাহা অবলীলাক্রমেই প্রকাশ করিত; কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য যে প্রকাশ করিবার তাহার কিছুই ছিল না। এবং সে অভাবটাও সে বুঝিতে পারিত না। সে ছিল যেন নিতান্তই সাধারণ প্রতিভাহীন অভিনেতা, যে বাহির হইতে অঙ্গভঙ্গী স্বরসংযম ইত্যাদির অভ্যাস করে কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া কি প্রকাশ করিবে তাহা সে জানে না। অথচ বেশ গর্ব্ব ও ঔৎসুক্যের সহিত প্রতীক্ষা করে এবং ভাবে দর্শকবৃন্দ একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল!

সাধারণের প্রশংসা কুড়াইবার এই নাটকে প্রয়াস পিতা এবং পুত্র—দুই-জনের মধ্যেই সমান দেখা যায়। উভয়ের মধ্যেই লোকভয় ও সামাজিক পৌত্তলিকতা প্রবলভাবেই ছিল। কিন্তু তাহার সঙ্গেই এমন কতকগুলি অদ্ভুত আকস্মিক এলোমেলো উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিও উঁকি মারিত যে, মানুষ ভাবিত, ক্রাফ্‌ট্‌-বংশের সবারই কিছু কিছু ছিট্ আছে। ইহাতে মেলশিয়োর-এর প্রথমে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই, বরং এই সব খামখেয়ালীকে মানুষ তাহার প্রতিভার নিদর্শন স্বরূপেই গ্রহণ করিত। কারণ, জগতের অধিকাংশ সাদাসিধে লোকদের বিশ্বাস যে, শিল্পীর মধ্যে সাদাসিধা ভাবের স্থান নাই। কিন্তু মেলশিয়োর-এর খামখেয়ালীর উৎসটি আবিষ্কার করিতে লোকের বেশী দেরী হইল না, সে উৎস তাহার মদের বোতল! নিট্‌স্-এর মতে বারুণীর প্রিয়তমদেব ব্যাকাস্-ই সঙ্গীতের দেবতা এবং মেলশিয়োর এবিষয়ে নিট্‌শ-এর সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত; কিন্তু তাহার প্রতি ব্যবহারে দেবতার অকৃতজ্ঞতা প্রকট হইয়া উঠিল।

সঙ্গীতের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার মত কোন নূতন উদার ভাবপ্রেরণা দেবতা ত দিলেনই না, বরং যাহা ছিল তাহাও নিষ্ঠুর পরিহাসে হরণ করিয়া লইলেন। তাহার উপর বিবাহটা হইল অদ্ভুত; প্রথমে লোকে বলিয়াছিল অদ্ভুত এবং ক্রমে সে নিজেও তাহাই বিশ্বাস করিয়া বসিল এবং মদের বন্যায় নিজেকে ভাসাইয়া দিল। যন্ত্রের সাধনায় ঢিলা পড়িল। নিজেকে এত শ্রেষ্ঠ ভাবিতে লাগিল যে, শীঘ্রই শ্রেষ্ঠতা হারাইয়া ফেলিল, প্রতিদ্বন্দ্বিরা ক্রমশ সাধারণের চিত্ত অধিকার করিয়া বসিল। মেল্‌শিয়োর-এর মন তিক্ততায় ভরিয়া উঠিল কিন্তু এই সব আঘাত অপমান তাহার সুপ্ত প্রতিভাকে না জাগাইয়া আরও যেন আচ্ছন্ন করিয়া দিল। সে নীচ প্রতিশোধ লইতে আরম্ভ করিল। একগ্লাসের ইয়ারদের কাছে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্বন্ধে কুৎসা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অসম্ভব দেমাকের বশে সে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া বসিল যে, তাহার পিতার পদটি সেই পাইবে। কিন্তু অর্কেষ্ট্রার অধিনায়ক হইল আর একজন! অমনি সে এমন ভাব দেখাইতে লাগিল যেন সকলেই তাহাকে নিগ্রহ করিতেছে! তাহার অসাধারণ প্রতিভাকে ইচ্ছা করিয়াই বুঝিবে না। পিতার খাতিরে বেহালা-বাদকের পদটি বজায় রহিল কিন্তু মানুষ তাহাকে বাড়ীতে শিক্ষা দিবার জন্য ডাকা বন্ধ করিয়া দিল। এ ঘটনা তাহার অহঙ্কারকে ত আঘাত করিলই, তাহার অর্থাগমের দিয়েও কম জখম করিল না। কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহার পরিবারের আয়ের দিকটা নানা দুর্বিপাকে কমিয়া আসিতেছিল। প্রাচুর্যের স্থান অভাব আসিয়া অধিকার করিয়া বসিল। অভাব বাড়িয়াই চলিল। মেল্‌শিয়োর দেখিয়াও দেখিতে চাহিল না। তাহার আমোদ প্রমোদ ও পোষাকের ব্যয় এক কপর্দকও কম করিল না।

মেল্‌শিয়োর মানুষটা আসলে মন্দ ছিল না। তবে কেমন যেন আধা ভাল, সেটাই বোধ হয় বেশী মারাত্মক। তাহার মনের কলের কব্জা যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাই সে অন্য সবই পারে, কেবল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ ছাড়া। এইখানেই তাহার দুর্বলতা। তাহার নৈতিক তেজের অভাব অথচ পিতা হিসাবে, পুত্র হিসাবে, স্বামী হিসাবে এমন কি মানুষ হিসাবেও লোকটা ভালই। সে নিজেও তাহাই বিশ্বাস করিত এবং বস্তুত এইবিষয়ে খানিক ভাল বলিয়া তাহাকে স্বীকার করিতেই হয়;—যদি প্রিয়জন ও পরিজনপ্রীতি ভাল মানুষীর পরিচয় হয়। তাহার হৃদয়ভরা সহজ ভালবাসা সহজেই উদ্রিক্ত হইত। কতকটা যেন জন্তুদের মত, সে তাহার গোষ্ঠিকে নিজেরই অংশ বলিয়া ভাবিত। সে যে

খুব স্বার্থপর ছিল তাহাও নহে, স্বার্থপর হইতে হইলে যতখানি ব্যক্তিত্বের আবশ্যক তাহা তাহার ছিল না। সে ছিল যেন শূন্য—কিছুই না! এই সব মানুষ জীবনকে ভয়ঙ্কর করিয়া তুলে, তাহারা যেন একটা বস্তুপিণ্ড, যেন বাতাসে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে... আপনার বেগেই পড়িতেছে, পড়িবেই এবং সেই পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সঙ্গে যাহাকিছু জড়িত আছে সকলকেই শূন্যতার অতলে টানিয়া লইবে।

ক্রাফ্‌ট্‌ পরিবারের আর্থিক অবস্থা এইরূপে যখন বেশ জটিল হইয়া উঠিয়াছে তখন শিশু ক্রিস্তফের যেন চোখ ফুটিল এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনার কতকটা সে বুঝিতে আরম্ভ করিল।

সে-ই এখন সংসারের একমাত্র সন্তান নয়। মেলশিয়োর প্রায় প্রতি বৎসরই তাহার পত্নীকে একটি করিয়া সন্তান উপহার দিয়া আসিয়াছে। পরে তাহাদের দশা কি হইবে সে সম্বন্ধে কোন দুশ্চিন্তার লক্ষণই তাহার মধ্যে দেখা যায় নাই। দুইটি সন্তান শৈশবেই মারা যায়, আর দুইটির বয়স মাত্র তিন চার বৎসর, তাহাদের লইয়া মেলশিয়োর আদৌ মাথা ঘামাইত না। লুইসাকে কাজের জন্য বাহিরে যাইতেই হইত এবং ছয় বৎসর বয়সের ছেলে ক্রিস্তফের উপরই তাহাদের ভার পড়িত।

শিশু ক্রিস্তফের পক্ষে সে ভারটিও বড় কম নয়। এই কর্তব্য বিকাল-বেলা মাঠে মাঠে খেলার আনন্দ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিত কিন্তু সে গম্ভীর-ভাবে আপন কর্তব্য পালন করিয়া যাইত। তাহাকে আর যে কেহ ছেলেমানুষ ভাবে না, মানুষের মত সকল কাজে অংশ লয় এবং তাহাতে সে বেশ গর্ব অনুভব করিত। নানা রকম খেলা দেখাইয়া সে শিশুগুলিকে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিত; তাহাদের মাতা তাহাদের সঙ্গে যেভাবে কথা বলিত, সেইভাবে ক্রিস্তফ্‌ও তাহাদের সঙ্গে কথা বলিতে চেষ্টা করিত। তাহার মাতার মতই একবার একটিকে, আরবার অন্যটিকে কোলেপিঠে লইত, তাহাদের ভারে সে প্রায় বাঁকিয়া যাইত, তবু দাঁতে দাঁত চাপিয়া ছোট ভাইটিকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিত, পাছে সে পড়িয়া যায়; কিন্তু শিশুরা সমস্তক্ষণ কোলে চড়িয়া থাকিতে চায়, মানুষের ঘাড়ে চড়িতে তাহাদের যেন শ্রান্তি নাই। ক্রিস্তফ্‌ যখন আর তাহাদের বহিতে পারিত না, তাহারা অবিশ্রাম কান্নার পালা সুরু করিয়া দিত। তাহারা ক্রিস্তফ্‌কে কষ্ট ত যথেষ্ট দিতই, সময় সময় দস্তুর মত বিপদেও ফেলিত।

ছেলেগুলি নোংরামিতে একেবারে স্বভাবসিদ্ধ! এখানেও মায়ের মত উদারক দরকার কিন্তু ক্রিস্তফ্ জানিতই না যে কি করতে হইবে। শিশুরা তাহাকে একেবারে নাস্তানাবুদ করিত এবং চাঁটি দিয়া তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিবার ইচ্ছা তাহার মনে বেশ প্রবল হইয়া উঠিত কিন্তু আবার ভাবিত, "ওগুলো বাচ্ছা, কিছু বোঝে না" এবং আশ্চর্য্য উদারতার সঙ্গে ক্রিস্তফ্ তাহাদের নানা অত্যাচার, চিমটি এবং মার অবাধে সহ্য করিত। ভাইটা থামকা চেঁচায়, পা ছোঁড়ে, রাগে গড়াগড়ি দেয়; তাহার সকল রকম বেয়াড়ামি ক্রিস্তফ্‌কে সহিতে হইত কেননা মা বলিয়া দিয়াছেন, সে রুগ্ন ছেলে! অন্য ভাইটা দুষ্ট বুদ্ধিতে একেবারে বাঁদরের মত পাকা। একটিকে কোলে লইয়া যখন ক্রিস্তফ্ বিপর্য্যস্ত, সেই সুযোগে তাহার পিছন হইতে অপরটি কত রকমে যে জ্বালাতন আরম্ভ করিয়া দিত তাহা বলা যায় না। খেলনা ভাঙ্গিয়া, জল ছড়াইয়া, কাপড় নোংরা করিয়া বাসন কোসন আছড়াইয়া সে যেন ঘরসংসার সব ওলটপালট করিয়া দিত।

লুইসা গৃহে ফিরিয়া সেই সমস্ত বিপর্য্যয় দেখিয়া ক্রিস্তফ্‌কে বকিত না, কিন্তু প্রশংসাও করিত না, বরং যেন একটু ক্ষুন্ন হইয়াই বলিত—তোর একটু বুদ্ধি কম বাছা, তা আর কি হবে!

ক্রিস্তফ্ মর্ম্মান্তিক আহত হইত, অভিমানে তাহার বুকটা ভারী হইয়া উঠিত।

* * *

লুইসা সুবিধা পাইলেই প্রতিবেশীদের গৃহে বিবাহ বা জন্মদিন উপলক্ষ্যে রন্ধনাদির কার্য্য করিয়া কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিত। মেল্‌শিয়োর বুঝিত কিন্তু এমন ভাব দেখাইত যেন সে জানিয়াও জানে না, তাহার আত্মগরিমায় আঘাত লাগিত—কিন্তু ইহার জন্য সে বিরক্ত হইত না, কারণ সে ত এ সম্বন্ধে কিছু জানে না! জীবনের দুঃখ সংগ্রাম সম্বন্ধে কোন ধারনাই বালক ক্রিস্তফের ছিল না; তাহার মাতা পিতার ইচ্ছা ছাড়া তাহার নিজের ইচ্ছার সীমা নির্দ্দেশ করিবার মত বিশেষ কিছু আছে বলিয়া সে জানিত না। এবং তাহারাও ক্রিস্তফকে বড় একটা বাধা দিত না, তাহার যেমন খুশী তাহাকে বাড়িতে দিত। ক্রিস্তফের তখন একমাত্র চিন্তা কোনমতে বড় হইয়া উঠা, তাহা হইলেই সে যাহা খুশী করিতে পাইবে। প্রত্যেক পদক্ষেপেই কত বাধা যে অপেক্ষা করিয়া থাকে তাহা তাহার কল্পনায়ও আসিতনা, বিশেষত তাহার

মাতা পিতা যে সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নহেন তাহা সে ভাবিতেও পারিত না। যেদিন সে প্রথম বুঝিল যে, পৃথিবীতে একদল মানুষ হুকুম করিতেই জন্মায় আর একদল কেবল হুকুম পালন করিতেই আসে, যেদিন সে বুঝিল যে, প্রথম দলের জীব তাহারা নয়, সেদিন কি প্রচণ্ড আঘাতই না তাহার সমস্ত হৃদয়কে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল। তাহার অন্তর্জীবনের প্রথম সঙ্কট এ ভাবেই আসে।

সে এক বিকেলবেলা। তাহার মাতা তাহার সর্ব্বাপেক্ষা পরিচ্ছন্ন পোষাকটি পরাইয়া দিয়াছে। বেচারা জানে না যে, লুইসা অসীম ধৈর্য্য ও উদ্ভাবনী শক্তি দিয়া অপরের দেওয়া পুরাতন কাপড়গুলি নূতন করিয়া তুলিয়াছে! ক্রিস্তফ্ মাতার সঙ্গে তাহার কাজের বাড়ীতে দেখা করিতে যাইতেছে। একা প্রবেশ করিতে যাইয়াই কেমন তাহার সঙ্কোচ আসিল, ফটকের কাছে একজন চাকর সর্দ্দারী করিতেছে, সে বালককে থামিতে বলিল। মুরুব্বিয়ানা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বালক কাহাকে চায়। ক্রিস্তফের মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। চাপাগলায় সে কোন মতে বলিল (যেমন তাহাকে শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছিল) সে ক্রাফট্-গৃহিণীকে দেখিতে চাহে।

ক্রাফট্-গৃহিণী! তার সঙ্গে তোর কি দরকার?—'গৃহিণী' কথার উপর বেশ তিক্ত বিদ্রূপের ঝোঁক দিয়া চাকরটা বলিয়া চলিল,—তোর মাকে চাস্? ওই দিকে যা। ওই লেনের শেষে রান্নাঘরে লুইসাকে দেখতে পাবি।

ক্রিস্তফ চলিতে লাগিল। তাহার চোখ মুখ লাল, তাহার মাতাকে অতি-পরিচিত অবজ্ঞায় ভৃত্যটা নাম ধরিয়া ডাকিল ইহাতে যেন সে লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। অসহ্য অপমানে তাহার ইচ্ছা হইল তাহার সেই প্রিয় নদীটির ধারে ছুটিয়া চলিয়া যায়।

রান্না ঘরে আসিতেই কতকগুলি ঝি-চাকর অতদ্র উচ্ছ্বাসের ভরে তাহাকে আপ্যায়িত করিতে গেল। উনানের পাশে মাতা দাঁড়াইয়া আছে—অতি সঙ্কোচ ভরা স্নেহে তাহার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল. ক্রিস্তফ একেবারে ছুটিয়া গিয়া মাতার কাপড়ের মধ্যে মুখ লুকাইল, মাতার পরণে শাদা কাপড়, হাতে একখানি কাঠের হাতা, সে ক্রিস্তফের মুখটি তুলিয়া ঘরের অন্যান্য সকলকে অভিবাদন করিতে বলিয়া তাহাকে আরও বিব্রত করিয়া তুলিল। সে কিছুতেই তাহা করিতে পারিল না, দেয়ালের দিকে ফিরিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল! ক্রমশ তাহার সাহস ফিরিয়া আসিতে লাগিল! স্ফূর্ত্তিতে উজ্জ্বল চোখদুটি দিয়া যেন লুকানো

কোণটি হইতে মিটু মিটু করিয়া চাহিতে লাগিল, কিন্তু যেই কেহ তাহার দিকে চাহে, সে মুখ লুকাইয়া লয়, এমনি করিয়া সেখানকার লোকেদের চুরি করিয়া দেখিতে লাগিল। মা যেন বেজায় গম্ভীর, ভয়ানক ব্যস্ত, মায়ের এ মূর্ত্তি ত সে দেখে নাই। কত হাঁড়ির পর হাঁড়ি সে পরীক্ষা করিয়া চলিয়াছে, কখনো চাখিয়া দেখিতেছে, কখনো উপদেশ দিতেছে কখনও বেশ স্থির কণ্ঠে রন্ধনের পদ্ধতি বলিয়া দিতেছে। বাড়ীর রাঁধুনিরা শ্রদ্ধাসঙ্গে তাহার কথা শুনিতেছে। ইহা দেখিয়া বালকের অন্তর গর্ব্বে ভরিয়া উঠিল। সোনা রূপার কত অপূর্ব্ব আসবাবে সাজান সেই প্রকাণ্ড ঘরখানিতে তাহার মাতা কত বড় স্থান অধিকার করিয়া আছে, কেমন সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করিতেছে, তারিফ করিতেছে!

হঠাৎ সমস্ত কথাবার্ত্তা থামিয়া গেল। একটি দরজা খুলিয়া একটি মহিলা তাঁহার পোষাকের খস্ খস্ শব্দে চারিদিক সন্ত্রস্ত করিয়া প্রবেশ করিলেন চারিদিকেই যেন তাঁহার সন্দেহের দৃষ্টি, তিনি মোটেই তরুণী নহেন, তবুও তাহাদেরই মত হাল্কা সাজগোজ করিয়াছেন। পোষাকটি সন্তর্পণে হাতে গুটাইয়া তিনি নড়েন, পাছে কিছুতে লাগিয়া যায়! তবুও তিনি উনানের কাছে যাইতে লাগিলেন, পাত্রাদি পরীক্ষা করিয়া একটু একটু চাখিতেও লাগিলেন, একবার হাত উঠাইতে তাঁহার জামার আস্তিন উল্টাইয়া গেল, হাতের অনেকখানি নগ্ন হইতেই ক্রিস্‌তফ্-এর মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। কি অশোভন! কি কদর্য্য! লুইসার সঙ্গে কথায় তাঁহার না আছে কিছু রসকস, না আছে ভদ্রতা, তবুও কেমন বিনীতভাবে লুইসা উত্তর দিতেছে! ক্রিস্‌তফের অসহ্য বোধ হইল, পাছে তাহাকে কেহ দেখিতে পায়, সেই ভয়ে সে এক কোণে লুকাইতে গেল কিন্তু সবই নিষ্ফল হইল। মহিলাটি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, ছেলেটি কে? লুইসা তাঁর সম্মুখে ক্রিস্‌তফ্‌কে আনিয়া উপস্থিত করিল, বালক মুখ লুকাইতেছে দেখিয়া তাহাকে বাধা দিল এবং যদিও সে পলাইতে পারিলেই বাঁচিত তবু সে মনে মনে অনুভব করিল, এখানে জোর চলিবে না। মহিলাটি বালকের মুখের দিকে চাহিলেন এবং অল্পক্ষণের জন্য মাতৃজনোচিত স্নিগ্ধ হাস্য তাঁহার মুখে ফুটিলেও পরক্ষণেই তাঁহার মুরুব্বিয়ানার মুখোস কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি বালকের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। বালক একটারও জবাব দিল না। বালকের জামাকাপড় মাপের মত হইয়াছে কিনা সে বিষয়েও প্রশ্ন করিলেন এবং লুইসা যেন সকৃতজ্ঞ ঔৎসুক্যের সঙ্গে বলিল,—চমৎকার হয়েছে! জামার ভাঁজগুলি সিধা করিয়া দিবার জন্য টানিয়া দিল, জামাটা

এত কথা যে ক্রিস্তফ প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার মাতা যে কেন এমন করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে তাহা সে কিছুই বুঝিল না।

মহিলাটি তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন,—আমার ছেলে মেয়ের সঙ্গে খেলা করবে এস। ক্রিস্তফ্‌ গভীর নৈরাশ্যের সঙ্গে একবার মাতার মুখের দিকে তাকাইল কিন্তু তাহার মাতা গৃহ-কর্ত্রীর দিকে এমনই আগ্রহ ভরে হাসিল যে, সে বেশ বুঝিল মায়ের কাছে কোন উত্তর আশা করিবার নাই। বলির পশুর মত সে কাঁপিতে কাঁপিতে মহিলাটির অনুবর্ত্তন করিল। তাহারা একটি বাগানে আসিয়া পড়িল। দুটি বদমেজাজী শিশু—একটি বালক একটি বালিকা, প্রায় ক্রিস্তফের সমবয়সী—যেন বোধ হইল ঝগড়া করিয়াছে, ক্রিস্তফ্‌ আসিতেই তাহাদের নূতন একটা আমোদের সম্ভাবনা হইল। নবাগতটিকে দুইজনেই পরীক্ষা করিতে আসিল। মহিলাটি ক্রিস্তফ্‌কে তাহাদের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, সে পথের মধ্যে একেবারে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, চোখ তুলিয়া চাইতেও যেন তাহার ভরসা হইতেছিল না। শিশু দুটি কিছু দূরে স্তব্ধ হইয়া তাহার আপাদ মস্তক দেখিতে লাগিল। তাহাদের উস্‌খুস্‌ কানাঘুসার মধ্য দিয়া যেন ক্রিস্তফ্‌ সম্বন্ধে একটা মতলব স্থির করিয়া ফেলিল। কে সে, কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহার পিতা কি করে ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে লাগিল। ক্রিস্তফের মুখে জবাব নাই, সে যেন পাথর হইয়া গিয়াছে। আতঙ্কে তাহার যেন কান্না আসিতেছে, বিশেষত ঐ খালি পা, খাটো পোষাক সুন্দর চুলওয়ালা মেয়েটিকে দেখিয়া।

যাহাহউক তাহারা খেলা করিতে আরম্ভ করিল। ক্রিস্তফ সবেমাত্র একটু স্ফূর্ত্তিতে উৎফুল্ল হইতেছে, এমন সময় ঐ খুদে নবাব পুত্রটি গম্ভীর হইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। এবং জামাটা টানিয়া ধরিয়া বলিল, আরে, এত আমার জামা! ক্রিস্তফ্‌ কিছুই বুঝিল না। তাহার জামাটা অপরে দাবী করিতেছে ইহাতে সে যেন ক্ষেপিয়া গেল। ভীষণ জোরে মাথা নাড়িয়া সে প্রতিবাদ করিল। ছেলেটা বলিয়া উঠিল,—আমি বেশ জানি এ আমার সেই পুরোনো জামাটা, এই ত এখনো দাগ লেগে রয়েছে! বলিয়াই তাহার উপর আঙুল দিল। তাহার পরই ক্রিস্তফের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—এই, কার জুতো মেরামত ক'রে পরেছিস? ক্রিস্তফ্‌ লাল হইয়া উঠিল। সে শুনিতে পাইল মেয়েটা মুখ বাঁকাইয়া ভাইয়ের কানে কানে ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বলিতেছে,—ও একটা গরীবের ছেলে! রাগে তাহার মুখ ছুটিল, ভাবিল, এই

অপমানের যোগ্য প্রতিবাদ সে করিবে, এবং যেন জয়দর্পে চাপা গলায় শুধু বলিয়া উঠিল, আমি মেলশিয়োর ক্রাফ্‌ট্‌-এর ছেলে, আমার মা, লুইসা এবাড়ীর রাঁধুনি।

সে ভাবিয়াছিল যে, তাহার মাতার এই পদবীটি যে কোন পদ-গৌরবের সমতুল্য এবং সে ঠিকই ভাবিয়াছিল, কিন্তু ছেলে দুটি এই পরিচয় পাইয়া একটুও বেশী শ্রদ্ধা দেখাইল না বরং বেশ একটু মুরুব্বিয়ানা চালে তাহাকে দেখিতে লাগিল। প্রশ্ন করিল,—কিরে, তুই কি হবি?—রাঁধুনি না গাড়োয়ান?

ক্রিস্‌তফের বাক্‌শক্তি যেন আবার লোপ পাইয়া বসিল। তাহার বুকের রক্ত যেন জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে!

তাহার নিস্তব্ধতায় ধনী-সন্তান দুইটির উৎসাহ বাড়িয়া গেল। গরীবের ছেলেকে শিশুসুলভ উৎপীড়ন করিবার অকারণ নিষ্ঠুর আগ্রহ তাহাদের যেন পাইয়া বসিল, তাহারা বেশ মজা করিয়া ক্রিস্‌তফের নির্য্যাতনের খেলা সুরু করিয়া দিল! মেয়েটিকে এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী দেখা গেল। সে লক্ষ্য করিয়াছিল যে, ক্রিস্‌তফের পোষাক একটু কষা হওয়ার দরুণ হাঁটিতে ছুটিতে সে বেশ অসুবিধা বোধ করে। সুতরাং লাফালাফি খেলায় তাহাকে উৎসাহ দিয়া বিপর্য্যস্ত করিবার মতলব আঁটিয়া বসিল। ছোট ছোট বেঞ্চি সাজাইয়া তাহারা বেড়া তৈরী করিতে লাগিল এবং সেই বেড়া ডিংগাইতে ক্রিস্‌তফ্‌কে উৎসাহী করিয়া তুলিল। বেচারা বলিতে সাহসই পাইল না যে, কিসে তাহার লাফাইতে অসুবিধা হইতেছে। সে প্রাণপণে শক্তি সঞ্চয় করিল, লাফ দিল এবং চীৎপাত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তাহার চতুর্দ্দিকে হাসির হড়রা পড়িয়া গেল, তবু আবার চেষ্টা করিতে হইবে, সাশ্রুনয়নে উঠিয়া সে আবার লাফ দিল; এবং ডিঙাইয়া গেল, কিন্তু তাহার নির্য্যাতনকারীরা মোটেই তৃপ্ত হইল না। তাহারা বলিয়া বসিল,—ও বেড়াটা তেমন উঁচু হয় নি। এবং এবারে এমন উঁচু করিয়া তুলিল যে, ঘাড়-মোড় ভাঙিয়া পড়া একেবারে অনিবার্য্য। ক্রিস্‌তফ্‌ বিদ্রোহ করিতে চেষ্টা করিল, বলিল সে আর লাফাইবে না। তখন মেয়েটি তাহাকে বলিয়া উঠিল—কাপুরুষ! ভয় পাও, স্বীকার করলেই হয়!

ক্রিস্‌তফ আর সহ্য করিতে পারিল না! সে যে পড়িবেই ইহা নিশ্চিন্ত জানিয়াই লাফ দিল এবং পড়িয়া গেল।

বেঞ্চিতে তাহার পা আটকিয়া গিয়া সমস্তটা হুড়মুড় করিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল, হাত ছড়িয়া গেল, মাথা প্রায় ভাঙিয়াছে, কিন্তু তাহার চরম দুর্ভাগ্য যে

তাহার পাজামা নানা স্থানে ছিঁড়িয়া গেল। লজ্জায় সে অধীর হইয়া উঠিল! তাহার সঙ্গী দুইটি তাহার চতুর্দ্দিকে আনন্দে নৃত্য করিতেছে। অসহ্য তাহার যন্ত্রণা! তাহাদের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণায় সে অন্ধ হইয়া গেল। তখন মরিতে পারিলে যেন সে বাঁচে। অপরের মধ্যে অকারণ শয়তানী প্রথম আবিষ্কার করিয়া শিশু যে কষ্ট পায় তাহার চাইতে নিষ্ঠুর আঘাত আর কিছুই হইতে পারে না। তাহার মনে হয় যেন সমস্ত পৃথিবী তাহাকে ধরিয়া মারিতেছে, নির্ভয় দিবার কোথাও কেহই নাই—কিছুই নাই—সব ফাঁকা, . .

ক্রিস্তফ্ উঠিতে চেষ্টা করিল, ছেলেটা তাহাকে এক ধাক্কায় ফেলিয়া দিল এবং মেয়েটা আসিয়া তাহাকে লাথি মারিয়া বসিল। সে আবার উঠিতে গেল কিন্তু দুইজনে তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহার পিঠের উপর চড়িয়া বসিয়া তাহার মুখ মাটীতে চাপিতে লাগিল। তখন হঠাৎ তাহার খুন চাপিয়া গেল। . . . যথেষ্ট নির্য্যাতন হইয়া গিয়াছে! হাত ছড়া, জামা ছেঁড়া, কি দুর্ঘটনা! লজ্জা, ঘৃণা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ, সমস্ত দুঃখ নিপীড়ন যেন এক সঙ্গে উন্মত্ত ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। হামাগুঁড়ি দিয়া সে উঠিল এবং কুকুরের মত এক ঝাঁকুনিতে তাহার নির্য্যাতনকারীদের ছিটকাইয়া ফেলিয়া দিল, তাহারা পুনরায় আক্রমণ করিতে আসিবামাত্র সে মাথা নীচু করিয়া মেয়েটাকে ডিঙাইয়া এক ঘুসিতে ছেলেটাকে ফুলের কেয়ারীর উপর আছড়াইয়া ফেলিল। চীৎকারের ঐক্যতানবাদন সুরু হইল, ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তাহারা বাড়ীর দিকে ছুটিল। দরজার দুম্‌দাম্ শব্দ, এবং ভিতর হইতে তর্জ্জন গর্জ্জন শোনা যাইতে লাগিল। গৃহকর্ত্রী তাঁহার পোষাক সামলাইয়া যতটা জোরে সম্ভব, ছুটিয়া আসিলেন। ক্রিস্তফ্ দেখিয়াও পলাইতে চেষ্টা করিল না। যাহা করিয়াছে তাহার জন্য আতঙ্ক হইয়াছে বটে (এত বড় অপরাধ যেন কেহ করে নাই, কেহ শোনে নাই) কিন্তু এতটুকু অনুশোচনা দেখা দিল না। সে চুপ করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার দফা রফা হইয়াছে—ভালই হইয়াছে! পূর্ণ নৈরাশ্যেই সে যেন শক্ত হইয়া পড়িল। মহিলাটি যেন বাঘিনীর মত তাহার উপর পড়িলেন। ক্রমাগত মার সে খাইতেছে, শুনিতেছে ভীষণ কর্কশ একটা গলা কি সব বলিতেছে—সে কিছুই বুঝিতে পারে না! তাহার শিশু শত্রু দুটি তাহার এই অপমান দেখিবার জন্য আসিয়াছে, আনন্দে চীৎকার করিতেছে। ঝি চাকর সার দিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে, যত গলার একি

অদ্ভুত গোলমাল! তাহাকে একবারে গুঁড়া করিয়া দিবার জন্যই লুইসার ডাক পড়িল। মা আসিল কিন্তু ছেলের পক্ষ হইয়া লড়া ত দূরের কথা, তাহাকে মারিতে সুরু করিল এবং কিছুই না-জানিয়া না-শুনিয়া মাতাই কি না ক্ষমা চাহিতে বলিল! রাগে জ্বলিয়া ক্রিস্তফ্ অস্বীকার করিয়া বসিল। লুইসা তাহাকে আবার ঝাঁকানি দিয়া মহিলা এবং তাঁহার ছেলেদের কাছে টানিয়া লইয়া গেল, তাহাকে হাঁটু গাড়িয়া বসিতে বলা হইল কিন্তু সে হাত-পা ছুঁড়িয়া চীৎকার করিয়া মায়ের হাত কামড়াইয়া চাকরদের দিকে ছুটিয়া গেল। সকলে হাসিয়া উঠিল। রাগে এবং আঘাতে মুখ জ্বলিতেছে, হৃদয় যেন দারুণ অপমানে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। সে বাহির হইয়া পড়িল। সমস্ত ভাবনা চিন্তা মন হইতে তাড়াইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিল। রাস্তায় পাছে কাঁদিয়া ফেলে সেজন্য যেন ছুটিয়া চলিল। সে বাড়ীতে আসিতে চাহে; কাঁদিয়া মনকে শান্ত করিতে চায়, তাহার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। মাথার শিরাগুলি যেন ফাটিয়া পড়িতে চাহিতেছিল।

অবশেষে সে বাড়ীতে পৌঁছিল। এক ছুটে নদীর উপরকার জানলাটির কোণের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল। রুদ্ধ নিশ্বাসে সেখানে আছড়াইয়া পড়িয়া কান্নার বন্যা বহাইয়া দিল। কেন কাঁদিতেছে, সে জানে না। কিন্তু সে ক্রন্দন চাপিয়াও রাখিতে পারিতেছে না। প্রথম ঝোঁক কাটিয়া গেল, সে আবার কাঁদিতে সুরু করিল, কারণ সে রাগে নিজেকে ব্যথায় নিপীড়িত করিবার জন্যই কাঁদিতে চাহে, যেন তাহা হইলে অপরেও তাহার সঙ্গে শাস্তি পাইবে। পরে মনে পড়িল তাহার বাবা এখনই বাড়ীতে আসিবে, মা তাঁহাকে সব কথা বলিয়া দিবে। তাহার দুঃখের আর শেষ নাই! সে স্থির করিয়া বসিল, সে পালাইবে, যেখানে দুইচক্ষু যায়, আর ফিরিবে না।

সিঁড়ি বাহিয়া সে নামিতেছে, আর ধাকা খাইয়া তাহার পিতার ঘাড়ের উপর পড়িল! সে তখন উঠিতেছিল।—কি রে, কি কর্‌ছিস, কোথায় যাচ্ছিস?—মেলশিয়োর জিজ্ঞাসা করিল।

ছেলে কোনই জবাব দিল না।

কিছু বাঁদরামি করেছিস বুঝি? কি করেছিস?

ক্রিস্তফ্ একগুঁয়ের মত চুপ করিয়া রহিল।

বল্ কি করেছিস? জবাব দিবি কি না? বলিয়া মেলশিয়োর গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

ক্রিস্তফ্ কাঁদিয়া ফেলিল। মেলশিয়োর চীৎকার করিতে লাগিল। এবং দুইজনে যেন পাল্লা দিয়া চীৎকারের মাত্রা বাড়াইতেছে এমন সময় শোনা গেল, লুইসা তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছে। তখনো সে বেশ বিক্ষিপ্ত, আসিয়াই আবার গালাগালি আর নূতন করিয়া চড়চাপড় সুরু করিল। মেলশিয়োর কতক বুঝিয়া এবং হয়ত বুঝিবার পূর্ব্বেই এমন প্রহার সুরু করিল যে, ষাঁড়ও জখম হইয়া যায়! ছেলে চেঁচায় একদিকে, মা-বাপ চেঁচায় আর একদিকে। শেষে উভয়েই সমান রাগে তর্ক জুড়িয়া দিল। ছেলেকে মারিতে মারিতেই মেলশিয়োর বলিল,—ছেলেটার কোন দোষ নাই। যারা টাকা আছে বলেই সব করতে পারে ভাবে তাদের চাকরি করতে গেলেই এই দশা ঘটে।

লুইসাও ছেলেকে মারিতে মারিতে স্বামীকে বলিল,—একটা আস্ত খুনে তুমি, ছেলেকে আর আমার ছুঁতে দেবো না। বেচারার হাড়গোড় ভেঙে দিয়েছ!

ক্রিস্তফের নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছিল, কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। ভিজা কাপড় দিয়া মা রক্ত বন্ধ করিতে আসিল বলিয়া ক্রিস্তফের মনে এতটুকু কৃতজ্ঞতাও জাগিল না। কারণ মা সমানে বকিয়া মারিয়া চলিয়াছে! শেষে একটা অন্ধকার ঘরে তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখিয়া অনাহারের শাস্তি-বিধান হইল।

মা বাপ দুই জনেই চীৎকার করিতেছে সে শুনিতে পাইল। কাহার প্রতি বেশী বিরাগ, ক্রিসতফ্ বুঝিতে পারিতেছিল না। মনে হইল মায়ের উপরই যেন বেশী, কারণ মায়ের কাছ থেকে এরকম দুর্ব্যবহার সে একেবারেই আশা করে নাই। সারাদিনের যত দুঃখ তাহাকে যেন এখন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ছেলেদের অন্যায়, মহিলাটির অন্যায়, মাতাপিতার অবিচার, যাহা কিছু সে সহ্য করিয়াছে—বিশেষভাবে তাহার পিতামাতার সম্বন্ধে সে এত গর্ব্ব অনুভব করিত!—ঐ ঘৃণ্য জঘন্য মানুষগুলির সম্মুখে তাহাদের দীনতা যেন ক্রিস্তফের হৃদয়ে শেলের মত বিদ্ধ হইল। এই কাপুরুষতা প্রথম অস্পষ্টভাবে অনুভব করিতে করিতে তাহার মন তিক্ততায় ভরিয়া গেল, তাহার কাছে সব ওলট-পালট হইয়া গেল। নিজের লোকেদের সম্বন্ধে গৌরব বোধ, তাহাদের সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা তাহাকে ধর্ম্মভাবের মত অনুপ্রাণিত করিত। নিজের প্রাণশক্তিতে বিশ্বাস, ভালবাসিবার ও ভালবাসা পাইবার স্বাভাবিক ক্ষুধা, আত্মিক শক্তিতে অন্ধ ও একান্ত নির্ভর—সমস্তই যেন বিনষ্ট হইয়া যায়। ভিত্তি পর্য্যন্ত যেন

সব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। যেন একটা পাশব শক্তি তাহাকে বিধ্বস্ত করিতে আসিতেছে। আত্মরক্ষার বা পালাইবার কোন উপায় নাই, তাহার শ্বাস যেন রোধ হইয়া আসিতেছে, সে বুঝি মরিয়া যাইবে। নিষ্ফল বিদ্রোহে তাহার সমস্ত দেহ যেন পাষাণ হইয়া উঠিল, হাত পা মাথা সে দেয়ালে ঠুকিতে ঠুকিতে গর্জ্জাইতে গর্জ্জাইতে যেন ধনুষ্টঙ্কারে আক্রান্ত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

মাতা পিতা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। তখন কে বেশী স্নেহ দেখাইবে এই লইয়া যেন দুইজনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা বাধিয়া গেল। মা তাহার পোষাক খুলিয়া দিয়া তাহাকে বিছনায় শোয়াইয়া দিল এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে শান্ত হইল, একটুও নড়িলনা। তবুও ক্রিসতফের অভিমান বিন্দুমাত্র কমিল না। মাতার অবিচার সে কিছুতেই ক্ষমা করিবে না এবং তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সে ঘুমের ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিল। মাতার সৎসাহসের অভাব ও মানসিক দীনতা তাহাকে কঠিন করিয়া ফেলিল।—কি যন্ত্রণা সহ্য করিয়া পরিবারের কিছু আয় বৃদ্ধি করিতে হইতেছে এবং নিজের পুত্রের বিরুদ্ধেও দাঁড়াইতে হইয়াছে তাহা ক্রিস্তফ্ ঘুণাক্ষরেও বুঝিল না।

শিশুর চক্ষে যে অসম্ভব অশ্রুর উৎস আছে তাহা যেন শেষ কণায় উজাড় করিয়া দিয়া তবে ক্রিস্তফ্ একটু শান্ত হইল। সে বেশ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু অত্যধিক স্নায়বিক উত্তেজনায় ঘুমাইতে পারিতেছিল না। আধঘুমে স্বপ্নের মত নানা জিনিষ তাহার মাথায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে যেন বিশেষভাবে দেখিতে লাগিল সেই ছোট্ট মেয়েটিকে :—তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টি, তাহার অবজ্ঞাকুঞ্চিত নাসিকা, তাহার চুল পিঠে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার খালি পা এবং ছেলেমানুষের মত "ন্যাকা" "ন্যাকা" কথা। তাহার বোধ হইল যেন মেয়েটার কথা সে শুনিতে পাইতেছে। সে কাঁপিয়া উঠিল। মেয়েটির সম্মুখে সে কি রকম নির্ব্বোধের মত ব্যবহার করিয়াছে তাহা মনে পড়িয়া গেল এবং মর্ম্মান্তিক ঘৃণায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল। তাহাকে এরকম ভাবে অপদস্ত করিবার জন্য সে কিছুতেই মেয়েটিকে ক্ষমা করিতে পারিল না। মেয়েটিকে অপদস্ত করিবার, তাহাকে কাঁদাইবার ইচ্ছায় ক্রিস্তফ্ যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল। নানা উপায়ের সন্ধান করিতে লাগিল কিন্তু কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। মেয়েটি যে তাহার ভয়ে মূর্চ্ছা যাইতেছে এমন কোন চিহ্নই দেখা গেল না! তবু নিজেকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সে ভাবিল তাহার ইচ্ছামতই সব ঘটিয়া উঠিতেছে। সে কল্পনা করিল—যেন সে অসীম যশ ও শক্তিতে পূর্ণ হইয়া

উঠিয়াছে এবং তাহার প্রেমে পড়িয়াছে ; এই ভাবে নিজেকেই নিজে যত অসম্ভব গল্প শুনাইতেছিল—সে সব অনেক সম্ভব জিনিষের চাইতেও তাহার কাছে বেশী সত্য বলিয়া সে বিশ্বাস করিয়া ফেলিল।

তাহার প্রেমে মেয়েটি মৃতপ্রায়, তবু ক্রিস্তফের অবজ্ঞার অন্ত নাই, সে তাহাদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যায়, মেয়েটি পর্দ্দার আড়ালে লুকাইয়া তাহাকে দেখে, ক্রিস্তফ জানে একজন তাহাকে দেখিতেছে কিন্তু যেন কিছুই না দেখিবার ভাণ করে। প্রবল স্ফূর্ত্তিতে কথা বলিয়া যায়, তাহার যন্ত্রণা বাড়াইবার জন্য সে যেন দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়—বহু দূর দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। সে বড় বড় কাজ করে, যশস্বী হইয়া উঠে, (এই জায়গায় তাহার দাদুর বীরত্বের কাহিনী হইতে নানা গল্পের টুকরা তাহার নিজের জীবনে গাঁথিয়া দেয়।) এদিকে মেয়েটি শোকে বিষম অসুস্থ হইয়া পড়ে। সেই গর্ব্বিতা মহিলা বালিকার মাতা তাহাকে মিনতি করিয়া ডাকিতে আসে,—আমার বাছা মরে যাচ্ছে, তুমি একটিবার এস।

ক্রিস্তফ যায়। মেয়েটি বিছানায় পড়িয়া আছে। তাহার মুখ পাংশুবর্ণ ও অত্যন্ত শীর্ণ। মেয়েটি তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া দেয়, কথা বলিতে পারে না, শুধু ক্রিস্তফের হাতটি ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হাতে চুম্বন দিতে থাকে। তখন এক নিমেষে ক্রিস্তফ যেন অসীম দয়া ও স্নেহে ভরিয়া উঠে! তাহাকে আশ্বাস দিয়া সারিয়া উঠিতে বলে এবং তাহার ভালবাসা গ্রহণ করিতে রাজী হয়। গল্পের এই অংশে আসিয়া তাহাদের পুনর্মিলনের দৃশ্যটি নানান কথায় ও অভিনয় ভঙ্গির পুনরাবৃত্তিতে প্রকাশ করিতে গিয়া সে ঘুমে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং ঘুমের মধ্যে শান্তি পায়।

জাগিয়া উঠিয়া দেখে বেলা বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বেকার দিনগুলি যেমন ভাবশূন্য দুশ্চিন্তা শূন্য হইয়া আসিত তেমন আর আসিল না! জগতের উপর যেন কি এক প্রচণ্ড পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছে! ক্রিস্তফ বুঝিয়াছে, অন্যায় বলিয়া একটা জিনিষ এখানে আছে, এবং তাহার অর্থ কি ?—

—ক্রমশ

অনুবাদক—শ্রীকালিদাস নাগ ও শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ।

উদ্বেলিত যৌবনের সিন্ধুতীরে

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

সুন্দর প্রভাতে
একদিন, জীবনের নীল পারাবার তীরে,
অকলঙ্ক পাল তুলি
করেছিল শৈশব আমার
চলিলাম যৌবনের দেশে।
সুপ্তিহীন সমুদ্রের গান
অহরহ তারে ঘিরে ঘিরে
ওঠে উচ্ছ্বসিয়া;
সেথা নিত্য আনন্দের মেলা
সেথা চির নন্দনের খেলা।

তার পর একদিন পথহীন পারাবারে দিক্‌ভ্রান্ত
কৈশোর আমার
করেছিল কাঁদি
—কবে উত্তরিব সেই যৌবনের দেশে
যেথা মায়া, যেথা সব বস্তুহীন ছায়া
যেথা শুধু স্বপনের মেলা;
যেথা মোর সব কান্না শুধু বিরহের,
সব হাসি মিলনের শুধু;
যেথা প্রিয়া
ব্যাকুল নয়ন মেলি
জাগে চির প্রতীক্ষায়
অন্তহীন যুগযুগান্তর;
বিরহের দীর্ঘশ্বাসে নিত্য উদ্বেলিয়া ওঠে অশান্ত সাগর।

যেথা দিন ক্লান্তিহীন তন্দ্রাহীন রাত,
যেথা কথা অশ্রান্ত প্রলাপ।
—আনন্দ যে ক্ষণে ক্ষণে পরিপূর্ণ আপনারে সহিতে না পারি
গলে যায় আঁখিজলে,
আঁখিজল মুক্তা হয়ে হাসে—
প্রিয়া বিনা যেথা কিছু নাই।
তাহারি প্রসাদে প্রেম ফুটে আছে
জলে স্থলে নিখিল ভুবনে
অক্ষয় সৌরভে ভরা
একটী অপূর্ব্ব চাওয়া—
পরিপূর্ণ পদ্ম একখানি।
আজ সূর্য্য অস্ত যায় পশ্চিমের ছিন্ন রক্ত-মেঘের আড়ালে
রক্তসিন্ধু স্থির অচঞ্চল
মূর্চ্ছাহত সীমাহীন বালুচর!
মন্দবায়ে
ছিন্ন পাল তুলি ভগ্ন নায়ে
ফিরে চায় জীবন আমার
ফিরে চায় পশ্চাতের পানে।
পূর্ব্বের সীমান্ত রেখা মুছে যায়
অন্ধকারে ধীরে
—জীবনের যাত্রা হল শেষ।
কি কহিতে চাহে আজি জীবন আমার—
হিম-ওষ্ঠে কি কথা বাধিয়া যায় কঠিন নীহারে—
আরবার ফিরে চল হোথা
ফিরে চল যৌবনের দেশে,
প্রিয়ারে খুঁজিতে যেথা বিফলে কাটিয়া গেল দিন
তবু প্রিয়া দেখা নাহি দিল
চিনিতে হল না চেনা।
যেথা তার সাথে
বারবার নানা মত পরিচয় হল পলে পলে

অনন্ত অশেষ ;
তবু তৃপ্তি হল নাক হায়।

ফিরে চল উদ্বেলিত যৌবনের সিন্ধুতীরে
হাসি কান্না ভুল ভ্রান্তি ভরা
দীর্ঘ-নিশ্বাসের দেশে ;
স্বপ্ন সত্য যেথা সত্য প্রিয়া
যেথা প্রণয়ের জয় নিত্য ওঠে গানে গানে
মৃত্যুর কল্লোল উল্লঙ্ঘিয়া।
—দীর্ঘ জীবনের মোর সমস্ত আশ্বাস
ধন্য হল যে যৌবনে
একটী ছোঁয়ায় শুধু একটী চাওয়ায়
প্রাণের প্রিয়ার।



গমের দানা ডিমের মত বড়

(Count Leo N. Tolstoy) *

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

(জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের এই অপ্রকাশিত রচনাটি তাঁহার মৃত্যুর পর পাওয়া গিয়াছে)

কতকগুলি ছেলে খেলিতে খেলিতে মাটির একটা ফাটলের ভিতর একটা অদ্ভুত জিনিস দেখিতে পাইল। জিনিসটা ঠিক্ একটা ডিমের মত, কেবল গমের গায়ে যেরকম খাঁজ-কাটা থাকে সেই রকম খাঁজ-কাটা। একজন পথিক ইহার কৌতুহলত্বে আকৃষ্ট হইয়া, ইহার বদলে ছেলেদিগকে একটা পয়সা দিল। তাহার পর উহা নগরে লইয়া গিয়া রাজাকে বিক্রয় করিল। রাজা তাঁহার সভাপণ্ডিত-দিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা গমের দানা, না কুঁকড়োর ডিম। পণ্ডিতেরা খুব গভীরভাবে এই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারিলেন না!

কিন্তু প্রশ্নটার সমাধান শীঘ্রই হইয়া গেল। এই অদ্ভুত জিনিসটা জানলার আলিসার উপর ছিল; একটা পাখী উড়িয়া আসিয়া উহার পাশে বসিল ও আগ্রহের সহিত ঠোকর মারিতে লাগিল, এইরূপে উহার মাঝখানে একটা গর্ত্ত হইয়া গেল। যারা নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল যে সত্যই উহা একটা গমের দানা। তখন পণ্ডিতেরা আবার রাজার কাছে গিয়া বলিল উহা গমের দানা। রাজা যারপরনাই বিস্মিত হইলেন এবং পণ্ডিতদিগকে অনুসন্ধান করিবার জন্য আদেশ করিলেন—কোন্ স্থানে ও কোন্ সময়ে এই বৃহৎ দানা-বিশিষ্ট গমের চাষ হইয়াছে।

পণ্ডিতেরা এই বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরামর্শ করিতে লাগি-লেন; তাঁহাদের পুস্তকাগারের বড় বড় কেতাব পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইল। তাঁহারা রাজার নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিলেন:—মহামহিম

---

* টলষ্টয়, সাহিত্যিক জীবনের আরম্ভ হইতেই—জীবনে প্রথমার্দ্ধকাল,—যখন তাঁহার নৈতিক উপদেশ দানা বাঁধিয়া উঠে নাই তখন তিনি ছোট-ছোট গল্প লিখিতেন।

মহারাজ, আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলাম না, এই জিনিস সম্বন্ধে আমাদের কেতাবে কিছুই লেখা নাই। চাষাদিগকে একবার জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হয়, এই রকম গমের কথা তাদের বাপ-দাদাদের নিকট শুনিয়াছে কি না।

রাজা হুকুম দিলেন, সবচেয়ে বুড়ো একজন চাষার মোড়লকে তাঁহার নিকট এখনই আনা হয়।

দুই লাঠির উপর ভর দিয়া, টলিতে টলিতে বৃদ্ধ অতি কষ্টে রাজার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মুখ সাদা, দন্তহীন, চোখেও ভাল দেখিতে পায় না। রাজা গমের দানাটা তাহার হস্তে অর্পণ করিলেন। বৃদ্ধ উহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল, সমস্তটার উপর হাত বুলাইতে লাগিল; অবশেষে ইহার সম্বন্ধে তাহার একটা অস্পষ্ট ধারনা হইল।

রাজা বলিলেন:—বৃদ্ধ তুমি কি জানো, এই রকম শস্য কোথায় পাওয়া যায়? তুমি কি কখন এই রকম গমের চাষ করেছ, কিম্বা কখনও কিনেছ বলে তোমার কি মনে পড়ে?

বৃদ্ধ অনেকক্ষণ কোন উত্তর করিল না। তাহার শ্রবণশক্তি প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল এবং তাহার মনন ক্রিয়া খুব মন্থর গতিতে চলিত। অবশেষে আর একটু উচ্চৈস্বরে বলিল:—না, মহারাজ, এই রকম শস্যের চাষও কখনো করিনি ফসলও কখনো তুলিনি, বাজারেও কখনো খরিদ করি নি। আমাদের ছোট-দানা শস্যেরই চাষবাস ছিল। তবে, আমার বাবা হয়ত এইরকম শস্যের কথা শুনে থাকবে। মহারাজ তাকেই জিজ্ঞাসা করুন।

তখন রাজা বৃদ্ধের পিতাকে আনিতে হুকুম দিলেন। তাহাকে তাঁহার সমীপে আনা হইল। এই শ্রদ্ধাস্পদ বৃদ্ধ শুধু একটি লাঠি ব্যবহার করিত এবং তাহার চোখের দৃষ্টিও ভাল ছিল। রাজা গমের দানাটা তাহার সম্মুখে ধরিলেন;—এক দৃষ্টিতেই সে বুঝিতে পারিল।

রাজা বলিলেন,—বৃদ্ধ তুমি কি জানো, এই রকম গমের চাষ কোথায় হয়েছে; তুমি কি কখনো এই রকম গমের চাষ করেছ? কিংবা বাজারে খরিদ করেছ?"

বৃদ্ধ কানে একটু কম শুনিত, কিন্তু তার ছেলের মতো কালা নয়। সে উত্তর করিল না মহারাজ, আমি কখনো এই রকম গমের চাষ করিনি; বাজারে খরিদও করিনি; কেননা আমাদের কালে টাকাকড়ির কথা-আমরা কিছুই জানতুম না। সকলেই নিজের নিজের জমিতে চাষ ক'রে সংসার চালাতো, এবং প্রতিবাসীরা-বা প্রয়োজন তাও তারা যোগাতো। আমি জানিনে, এই রকম গমের

চাষ কোথায় হ'ত। আমাদের বড়দানার গম ছিল, এবং এখনকার চেয়ে ফসল বেশী উৎপন্ন হ'ত। এরকম গমের দানা আমি কখনো দেখিনি। কিন্তু আমার মনে আছে আমার বাবা বল্‌তেন, তাঁদের কালে গম এখনকার চেয়ে ভাল হত, দানা বড় হত। তাঁকে ডেকে পাঠালে ভাল হয়।

তখন রাজা ঐ বৃদ্ধের পিতাকে আনিবার জন্ত হুকুম দিলেন। এই প্রাচীন লোকটি লাঠি না লইয়াই আসিল; তাহার পদক্ষেপ বেশ চটুল, তাহার চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল, তাহার কথা খুব স্পষ্ট। রাজা গমের দানাটা তাহার হাতে দিলেন।

প্রাচীন ঠাকুরদাদা একবার চাহিয়া দেখিল, আঙ্গুল দিয়া একটু ঘষিল তারপর বলিয়া উঠিল—অ'রে এযে সেই প্রাচীন কালের গমের দানা!

দানাটা একটু দংশন করিয়া চাখিয়া দেখিল। তারপর বলিল "এ সেই দানা রে—এ সেই দানা।

রাজা বলিলেন;—প্রাচীন ঠাকুরদাদা, তুমি কি বল্‌তে পার, কোন্ স্থানে ও কোন সময়ে এই গমের চাষ হোত? তুমি কি কখনো চাষ করেছিলে কিংবা বাজারে খরিদ করেছিলে?

প্রাচীন লোকটি বলিল!—"আমার কালে মহারাজ, সবসময়ই এই রকমের হত। আমি সপরিবারে এই গম খেয়েই জীবন ধারণ করেছি। আমার সমস্ত যৌবনকাল এই গমেরই চাষ করেছি, ফসল উঠিয়েছি ও ঝেড়ে-ঝুড়ে গোলাজাত করেছি।"

তখন রাজা উত্তর করিলেন:—"বৃদ্ধ তুমি কি এই শষ্য খরিদ করেছিলে, না তোমার পুরোনো ক্ষেতে এর চাষ করেছিলে?"

প্রাচীন লোকটি বলিল:—সেকালে, শষ্য খরিদ বিক্রীর পাপ-কথা কারও মনেও আস্‌ত না! আমাদের মধ্যে টাকাকড়ির কথা কেউই জান্‌তোই না। যতটা দরকার ততটা গম প্রত্যেক লোকের ঘরেই থাকতো।

আর একবার বল দেখি বৃদ্ধ, এই রকম গম তুমি কোন জমিতে বুনেছিলে; তোমার ক্ষেত কোথায় ছিল?

তখন প্রাচীন ঠাকুরদাদা উত্তর করিল:—ভগবানের দুনিয়া যত বড় আমার ক্ষেতও তত বড়! যেখানেই আমি লাঙ্গল চালাতুম সেইটিই আমার জমি হত। সব জমিই সকলের আয়ত্তের মধ্যে। কেহই একথা বল্‌ত না, 'এটা আমার জমি'! নিজের হাতে চাষ করা জমি ছাড়া কোন জমিকে কেহই 'আমার জমি' বল্‌ত না।

রাজা অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন:—আরও দুটো কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবার আছে। তোমরা যদি তোমাদের কালেই এই রকম গমের চাষ করতে পারতে, আমাদের কালে আমরা কেন তা পারি না? দ্বিতীয়তঃ—তোমার নাতীর দু'টো লাঠির ও তোমার ছেলের একটা লাঠির দরকার কেন—আর তুমি প্রবীণ বৃদ্ধ, তোমার ত লাঠির দরকার হয় না—তুমি বেশ লঘু ও দৃঢ় পদক্ষেপে চল্‌তে পার, তোমার চোখ বেশ উজ্জ্বল, তোমার দাঁত বেশ মজবুত ও সুশ্রী, তোমার কথা বেশ স্পষ্ট, তোমার কণ্ঠস্বর বেশ শ্রুতিমধুর। বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা তুমি কি আমাকে বল্‌তে পার,—এই সমস্তের অর্থ কি? আর এসব ব্যাপার আমাদের একালে কেন হয় না?

প্রাচীন লোকটিও উত্তর করিল:—এ রকম গমের দানা আর জন্মায় না, আর বৃদ্ধেরা এখন সব রকম দুঃখ ক্লেশে ক্লিষ্ট; কারণ এখন আর লোকেরা নিজের হাতে কাজ করে না; তার বদলে তারা তাদের প্রতিবাসীর ধনসম্পদে লোভ করে। সেকালে তারা সম্পূর্ণ আলাদা রকমে চল্‌ত। সেকালে তারা ভগবানের সঙ্গে বিচরণ করত, নিজ নিজ গৃহে শান্তভাবে কর্তৃত্ব করত; আর, অন্যের জিনিষে তাদের লোভ ছিল না।

———

কেয়ার কাঁটা

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

প্রথম অঙ্ক

[আকাশ সবে পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। বিগত-জ্যোতি পাণ্ডুর চাঁদ পশ্চিমে নুইয়া পড়িয়াছে বিবর্ণ বেদনায়। পাখীদের গানের ফোয়ারা এখনো ঝরিয়া পড়িতে সুরু হয় নাই। প্রভাতের আর্দ্র শিশির, বাতাস গাছের পাতাগুলি কাঁপাইয়া বহিতেছিল।

কলিকাতার প্রান্তবর্ত্তী একটি গাঁ।

ছোট একতলা একখানা দালান,—বার্দ্ধক্যের জীর্ণতায় কুঁজো হইয়া পড়িয়াছে। তাহার অপরিসর মেঝে-ওঠা বারান্দায় একটি আধা-বয়সী ভদ্রলোক —বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হইবে—দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত মুখে ঘৃণার ও কদর্য্যতার বিষ যেন ঠিকরিয়া পড়িতেছে। তাঁহার পা, দুই দীর্ঘ বাহুতে জড়াইয়া ধরিয়া একটি তরুণী মেয়ে সমস্ত বসন ও চুল বিস্রস্ত করিয়া লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিল। পাশে মাথায় হাত দিয়া অর্দ্ধ-অচেতন মূর্চ্ছাহত অবস্থায় বসিয়া ছিলেন একটি কাঁচা বয়সী-মহিলা, বয়স ত্রিশের বেশী হইবে না। পাড়ার কয়েকজন টিকি-ওয়ালা আমুদে মাতব্বররাও এই সকালে ঘুম ভাঙিয়া খড়ম খট্‌খটাইয়া কাঁধা মুড়ি দিয়া আসিয়া হাজির হইয়াছেন।

অস্ফুট ফুলের ঘুম ভরা চোখের পাতায় সান্ত্বনার চুমু দিয়া এক দমক বাতাস আবার বহিয়া গেল। পূবের আকাশে রঙের ছোঁয়াচ্ একটু লাগিয়াছে। একটি তারা শেষ বারের মতন একটি দুষ্টু ইসারা-হাসিয়া চোখের উপর ঘোমটা টানিয়া দিল।]

মেয়ে। (কাতর করুণ কণ্ঠে) কিন্তু বাবা, আমার ত কিছু অপরাধ নেই। আমাকে দুর্ব্বল পেয়ে কেউ যদি . . . বাবা! (কান্নায় গলার স্বর বুজিয়া আসিল।)

পিতা। (কঠোর স্বরে) তা আমি বুঝি না।

মেয়ে। (তার আয়ত অশ্রুভারাতুর দুটি চোখ বাপের মুখের কাছে তুলিয়া) কি বোঝ না? আমি নির্দ্দোষ, এই কথাটা বিশ্বাস কর না তুমি? গভীর রাত্রে নৃশংস দস্যুর দল আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, সে কি আমার অপরাধ?

পিতা। (পা মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া) আমি তবু তোকে গ্রহণ করতে পারি না, ছেড়ে দে।

মেয়ে। (ব্যাকুল আগ্রহে পিতার পা জড়াইয়া ধরিয়া সকাতরে) না বাবা, ছাড়্‌ব না তোমার পা। বল, আমায় কেন তুমি নেবে না?

[বৃষ্টির মতো তাহার চোখের দুই কোণ দিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল]

পিতা। (কটু কণ্ঠে) তুই এখন অস্পৃশ্যা কুলটা। সমাজে তোর স্থান নেই। আমি সমাজকে ডিঙিয়ে যেতে পার্‌বো না। যা, ছাড়্‌ ছাড়্‌ পা।

(পাড়ার একজন মাতব্বর) এই ত মরদের মতো কথা বলেছ বটে খোচন। সমাজকে ডিঙোবনা আমরা। এ-পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া ভীষণতর পাপ। এই ত আদৎ হিন্দুর মতো কথা। (আর একজনকে ইসারা করিয়া) দেখলে, পিতৃত্বের অভিমানে নিজের ধর্ম্ম খোয়ায় না,—সেই ত খাঁটি মানুষ।

পিতা। (মেয়েকে লক্ষ্য করিয়া) তা ছাড়া তুই ত এখন অ'ওকুড-ছুঁড়ি, ছাড়্‌ পা! হতচ্ছাড়ী নচ্ছার!

মেয়ে। (কাকুতি করিয়া) নাই বা নিল সমাজ, কিন্তু তোমার ঐ পিতৃ-স্নেহ যে-বুকে বাস করছে, সে-বুকে কি এই হতভাগিনীর জন্য একটুও স্থান নেই বাবা? . . . মা! . . .

[যে মহিলাটি এতক্ষণ হতবাক্ হইয়া চেতনাহীনের মত বসিয়াছিলেন, তিনি সহসা আগাইয়া আসিয়া মেয়েটিকে ব্যগ্র কম্পিত বাহুবন্ধনে বাঁধিলেন। তাঁহার সমস্ত বুক দিয়া আকাশের মত মেয়েটিকে যেন নিশ্চিহ্ন লুপ্ত করিয়া দিতে চান—তাঁহার আলিঙ্গনের সেই ভাষা।]

মা। (উদ্বেল কণ্ঠে) না না আমি তোকে ছাড়্‌ব না। আমি পাখীর ডানার মতো আমার সমস্ত স্নেহ প্রসারিত করে তোকে ঢেকে ফেল্‌ব, তোর সমস্ত কালিমাকে। আমি তোর মা, নারী! . . .

[মেয়েটি মা'র তপ্ত বুকের মধ্যে অশ্রুসিক্ত আর্দ্র মুখখানা লুকাইয়া বাদলের মেঘের মত ফুঁপিয়া উঠিতে লাগিল।]

আর একজন মাতব্বর। (ব্যস্ত হইয়া) এ আপনি কী করছেন? ছি ছি! সহধর্ম্মিনী হয়ে এই আপনার ব্যবহার? যার স্বামী পুণ্যবান, দেবতার মতো ধর্ম্মের

জন্য সমস্ত দুর্ব্বলতা জলাঞ্জলি দিলে, তার স্ত্রী হয়ে আপনার এ কাজ একেবারে শোভা পায় না। ধর্ম্মের পথ যে বড় কঠোর। কি বল হে রামহরি?

[আর একজন মাথা নাড়িল]

মা। (অশ্রুভেজা আকুল সুরে) না, আমি ধর্ম্ম বুঝি না। আমার মেয়ে ও, আমার পুতুল! ও অসতী নয়, কলঙ্কিনী নয়। ওকে আমি ঘিরে রাখ্‌ব অন্ধকারের মতো। মাতৃস্নেহই আমার ধর্ম্ম।

[দু-একটা কাক তন্দ্রালু কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিতেছে। সামনের দীঘির জলে অন্ধকারের শেষ স্মৃতিটুকু তখনো একেবারে ধুইয়া যায় নাই। অনেক দূরের মন্দির হইতে প্রভাতী সানাইয়ের অস্পষ্ট সুর ভাসিয়া আসিতেছে।]

পিতা। (বিরক্তি পূর্ণ কণ্ঠে) এ যে একেবারে নাটুকে ভাব আরম্ভ কর্‌লে দেখ্‌ছি। দাও ছেড়ে ওটাকে। ওটাকে ত কেউ নেবে না,—ও যে এখন পতিতা। আর এই ত তোমার একটামাত্র নয়, গণ্ডেপিণ্ডে ত জন্ম দেওয়া হয়েছে কাল নাগিনীর গুষ্টি! ও-গুলোও ত পার কর্‌তে হবে! ছাড় নর্দ্দমাটাকে।

[এই বলিয়া তিনি সিংহবিক্রমে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কঠোর শক্তিতে স্ত্রীকে ছিনাইয়া আনিলেন। মহিলাটি মূর্চ্ছিতার মত মাটিতে মুখ থুব্‌ড়াইয়া পড়িয়া রহিল।]

একজন মাতব্বর। (গৌরবের সুরে) ঠিক, এই ঠিক সত্যিকারের মানুষের কাজ।

[আর সকলে কেহ ঘাড় কেহ টিকি নাড়িয়া সায় দিল।]

[মেয়েটি দাঁড়াইল। তাহার অপর্য্যাপ্ত ঘন কালো চুল তাহার কাঁধের ওপর দিয়া বুকের কাছে লুটাইয়া পড়িয়াছে। চোখের অশ্রু প্রচণ্ড জ্বালার নিশ্বাসে যেন শুকাইয়া গিয়াছে। সে তাহার বসন বিন্যস্ত করিয়া লইল]

মেয়ে। (উদ্দীপ্ত রূঢ় কণ্ঠে) তুমি পিশাচ, ঐ দস্যুদের চাইতেও নৃশংস। আমার বাবা তুমি নও। সে অত পাষাণ নয়, কশাই নয়। নারী বলেই আমার এ অবিচার এ অত্যাচার সইতে হবে? আর তোমরা, পুরুষেরা? যে দুর্ব্বল নারীকে রক্ষা করতে পারে না, অথচ যাদের হাতেই নারীর সমস্ত জীবন ন্যস্ত, তাদের আবার কিসের বড়াই?

মাতব্বরেরা। অসহ্য, অসহ্য!

মেয়ে। আইন শুধু ডাকাতদের শাস্তি দেবে। কিন্তু তোমরা যে তাদের চেয়েও নৃশংস ডাকাত। তারা শুধু একরাত্রির অত্যাচারী, আর তোমরা অত্যাচারী

করছ সমস্ত জীবন ধরে'। আস্ফালন করতে লজ্জা হয় না তোমাদের? যে কাপুরুষেরা স্ত্রী কন্যার ইজ্জৎ রক্ষা করতে পারে না, তারা কোন্ মুখে তাদের গলার ওপর পা তুলে দেয়? ভেবেছ এ অত্যাচারের শাস্তি নেই? আছে। আমার অভিশাপ ব্যর্থ হবে না।

[মেয়েটির কণ্ঠস্বর হইতে আগুন ঝরিয়া পড়িতে লাগিল]

পিতা। (ক্ষিপ্ত হইয়া মেয়ের গলা চাপিয়া ধরিয়া) বেরো হারামজাদী। (বলিয়া তাহাকে সাম্‌নের দিকে ধাক্কা মারিয়া দিলেন।)

[মেয়েটি আর ফিরিয়া দাঁড়াইল না। ধূলা থেকে শাড়ীর আঁচলটি বুকে তুলিয়া লইয়া গাঁয়ের ঘুমন্ত পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। তাহার পিঠে অগোছাল দীর্ঘ চুলগুলি বাতাসে কাঁপিতেছিল। তখন ফর্সা হইয়াছে। সহস্র নামহারা পাখীর কণ্ঠে কণ্ঠে গান জাগিয়াছে। ভোরে পাড়ার মেয়েরা ফুল চয়ন করিবার জন্য সাজি হাতে প্রজাপতির মতন স্বচ্ছন্দে ছুটাছুটি করিতেছে। মেয়েটি ধীরে ধীরে ধানের ক্ষেত পার হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। একটি রৌদ্রকণা একটি শিশির সিক্ত ঘাসের ডগার উপর নাচিতেছিল। একটি শাদা পাখী ফুরফুরে হাওয়ায় দুই পাখা মেলিয়া উড়িয়া গেল। মা একবার সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—পুতুল, আমার পুতুল!]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[তেরোবছর পরে। . . .

কলিকাতার সঙ্কীর্ণ অপরিসর একটা রাস্তা। দুই ধারে পাশাপাশি বাড়ীর সারি। তাহাদের দরজার ধারে ধারে দেহের বেসাতি লইয়া অসংখ্য নানা বয়সের মেয়েরা, কেহ দাঁড়াইয়া কেহ বসিয়া পথযাত্রীদের দৃষ্টির অভিনন্দন পাইবার আশায় উৎসুক হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে।

শ্রাবণের রাত্রি। ন'টা বাজিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা হইতেই টিপিটিপি বাদল নামিয়াছে। বৃষ্টির জলে পথে কাদা হইয়াছে চূড়ান্ত; কাদা বাঁচাইয়া অথচ মেয়েগুলির মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া চলিতে-চলিতে পথযাত্রীরা একে অন্যের গায়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িতেছে। কেহ ছাতার শিক্ দিয়া মাথায় ঠোকর হানিতেছে। লোক-চলাচলের বিরাম নাই। মাঝে মাঝে হুঙ্কার দিয়া মোটর আসিতেছে। স্থান সঙ্কীর্ণ বলিয়া মোটরকে জায়গা ছাড়িয়া দিয়া দুই পাশের লোক কিনারের বাড়ী গুলিতে গিয়া উঠিতেছে। যেখানে কোন মেয়ে, পাছে

আলোকের জৌলুসে তার মুখের খড়ির গুঁড়া কিম্বা বিকৃত কদর্য্যতা ধরা পড়ে বলিয়া অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে, সেখানে যাহারা আশ্রয় লইতেছে, তাহারা তাহাদের মুখের সিগারেট্‌টা খুব জোরে টানিয়া একটু আলো করিয়া দেখিয়া লইতেছে—এটি কত সুন্দরী !

বৃষ্টির মধ্য দিয়া হার্ম্মোনিয়াম নূপুর ও বিকৃত ভাঙা গলার সুর বিশ্রী হইয়া সকলের কানে লাগিতেছিল।

বৃষ্টি বেশ দমকে নামিয়া আসিয়াছে। পাহারওয়ালারা গায়ে ওয়াটার-প্রুফ্ চাপাইয়া ক্রমে ক্রমে সরিয়া পড়িতেছে,—কেহ রাস্তা ছাড়িয়া, কেহ বা কাহারো ঘরের তলায় আশ্রয় লইয়া। ইহার মধ্যে একটি কুঁজো বৃদ্ধ চটি-জুতার কল্যাণে পথের প্রায় অর্দ্ধেক কাদা ছেঁড়া লম্বা-ঝুল শার্টটার গায়ে তুলিয়া লইয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে একটা ঘরের ভিতরকার বারান্দার উপর উঠিয়া আসিল। সেখানে বসিয়া একটি ম্লান শুক্‌নো রোগা মেয়ে ধূমপান করিতেছিল। তাহার পরনে রঙ-চুপানো নীল একটা পাৎলা শাড়ী, সারা গায়ে গিল্‌টির গহনা, পায়ে পাম্প্-সু। বৃদ্ধকে ঢুকিতে দেখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ চোখ দিয়া ইসারা করিয়া তাহাকে ডাকিল। মেয়েটি দরজা থেকে একটু দূরে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধের সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করিয়া কি কথা বলিয়া লইল। পরে জলচৌকিটা লইয়া দোতলায় নিজের ঘরের মধ্যে বৃদ্ধকে লইয়া আসিল।]

দৃশ্যান্তর

[ছোট একটি ঘর। ফিট্‌ফাট সাজানো। দেয়ালে নানান্ দেব-দেবীর ছবি —কৃষ্ণ রাধা মহাদেব পার্ব্বতী, দিল্লীর দরবার এমন কি জীস্বান ও বিলিতি ক্যালেণ্ডারেরও ছবি টাঙানো। এক পাশে একটা ব্রাকেট্ ঝুলিতেছে। তাহাতে একখানি ময়লা শাড়ী কোঁচানো। দেয়ালের সঙ্গেই একটা প্রকাণ্ড তাক গাঁথা। আয়না চিরুণী ইত্যাদি, রবীন্দ্রনাথের একখানি গীতাঞ্জলি ও নবরাম শীলের খান কয়েক বটতলার উপন্যাস ও গানের কেতাব। নীচের তাক গুলিতে বিস্তর কাঁচের বাসন ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। পানের আস্‌বাব। এক জোড়া ডাবি-জুতা, বোধ হয় কেহ ফেলিয়া গিয়াছে, কিম্বা পরিয়া যাইতে পারে নাই।

ঘরের আধ খানা জুড়িয়া প্রকাণ্ড একটা উঁচু খাট পাতা, তাহাতে পরিষ্কার করিয়া বিছানা পাতা। নীচে মেঝের উপরে আর একটা বিছানা পাতা রহিয়াছে।]

[বৃদ্ধ ঘরে ঢুকিয়া খাটের উপর বসিল।]

মেয়ে। (বাধা দিয়া) না না ওখানে বস্‌বেন না, নীচে বসুন।

বৃদ্ধ। (কুটিল মুখভঙ্গী করিয়া) কেন বাবু, চেহারাটা বুঝি পছন্দ হচ্ছে না? না হয়, দোব আরো একটাকা বেশীই দোব'খন। এই বাদ্‌লা রাতে কে ওই স্যাৎসেঁতে মেঝের ওপর বসে?

মেয়ে। (আগাইয়া আসিয়া) পান খাবেন ত?

বৃদ্ধ। (তাহার খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলি হাসিতে উদ্ভাসিত করিয়া) ছাই পান! বলি টান্‌বেনা?

মেয়ে। টাকা ফেল্‌লেই টান।

বৃদ্ধ। হ্যাঁ, ক'টাকা চাই বল। ডাক না তোর রামধনিয়াকে। নে' আসুক গে।

[বৃদ্ধ জুতা ছাড়িয়া আরাম করিয়া উঠিয়া বসিলেন। মেয়েটি একটু দূরে সরিয়া বসিল। বারে বারে কুতূহলী হইয়া বৃদ্ধের মুখের পানে তাকাইয়া অকারণে শিহরিয়া উঠিতেছিল। উহার মুখটা কি জঘন্যই না দেখাইতেছে! লোল দেহে কি লোলুপতা!

বৃষ্টি তখন খুব জোরে নামিয়া আসিয়াছে। ঘরে ঘরে মাতালেরা তার স্বরে বর্ষা মঙ্গল সুরু করিয়াছে। তৃষার্ত্ত ধরিত্রীর এই নোংরা অশুচি স্নায়ুটা যেন বৃষ্টির আশীর্ব্বাদে আর্দ্র ও পবিত্র হইয়া উঠিল।]

বৃদ্ধ। (জড়িতস্বরে) বেড়ে বৃষ্টিটাই নেমেছে। ফুর্ত্তি জমানোর রাত বটে! হেঁঃ, দেখ ফুলি—তোমার নাম কি? আরে বলই না।

মেয়ে। (হাসিয়া) শুকুনি।

বৃদ্ধ। খাসা নাম!... দেখ, এমনটি ছিলাম না। সাতবছর হল গেল বৌটা মরে'। চরিত্র থাকে কি ক'রে,—হল ভয়! সবাই বল্‌লে বিয়ে কর। মেয়েও ঠিক কর্‌লাম বিয়ের।... হাঁ, ঐ যে একটা বাজ্‌না দেখা যাচ্ছে ঢাকনি-দেওয়া, একটা গান গাওনা ফেমকরী!

মেয়ে। গান পরে হবে'খন। আপনি বলুননা তারপর কি হল?

বৃদ্ধ। হাঁ,—বিয়ে কর্‌তে রওনা হয়েছি চন্দন করে', ওমা পাড়ার যত সব গুণ্ডো ছোঁড়ার দল এল আমাকে তেড়ে লাঠি-সোটা হাতে নিয়ে। বল্‌লে, বেটা সাতশ ভিখের বাপ—বেটা বিয়ে কর্‌বে ছোট্ট নোংকপরা খুকীকে। হাঃ হাঃ! শালারা দিলেনা বিয়ে কর্‌তে। সব ভেঙ্গে দিলে। একটা ছোঁড়া আমার মাথা

থেকে টোপরটা কেড়ে নিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বস্‌ল। শালারা চরিত্তিরটা আর রাখ্‌তে দিলে না . . . কি গো, ডাকনা তোমার রামহৃদয়কে !

মেয়ে। জলটা ধরুক।

বৃদ্ধ। আর ধরেছে ! জামাটা খুলি। (আস্তে আস্তে সন্তর্পণে জামাটা খুলিতে-খুলিতে) গেছে জামাটা ছিঁড়ে। সব পয়সা এই অন্নপূর্ণাদের পায়ে ঢেলেই ফতুর হলাম। (জামাটা খুলিয়া ফেলিল।)

[মেয়েটি কি যেন দেখিয়া সহসা অস্ফুট আর্ত্তকণ্ঠে গোঙাইয়া উঠিল। তাহার পায়ের নীচে সমস্ত মেঝেটা যেন কিল্‌বিল্‌ করিতেছে। সাপ কি হিংস্র শ্বাপদ দেখিলেও সে যেন এতখানি চম্‌কাইত না।]

মেয়ে। (আগাইয়া আসিয়া, ভীত ত্রস্ত শুষ্ক কণ্ঠে) এ তাবিজ তুমি কোথায় পেলে—এ মকর তাবিজ ? . . .

বৃদ্ধ। (একটু হাসিয়া) কেন, এ তাবিজটার ওপর লোভ হল নাকি ? এ যে-সে চীজ্‌ নয় হে ভাল্লুক-সুন্দরী ! এতে আমার প্রাণ। অনেকদিন আগে জ্বর-সন্নিপাতে মরেছিলাম আর কি ! বৌটা বড্ড ভালোবাসত আমাকে। মা কালীর দরজায় গিয়ে হত্যা দিয়ে পড়ে' রইল রাতদিন না খেয়ে। শেষে মা দয়া করলেন। দয়া না করে' আর কি করেন ? ওষুধ বলে দিলেন একটা শেকড় ; বল্‌লেন রাত দুপুরে বনে গিয়ে আপন হাতে গাছের শেকড় কেটে সতেরো ভরি সোণার তাবিজে পুরে হাতে বেঁধে দিলে সোয়ামী বেঁচে উঠ্‌বে। বেঁচে উঠ্‌লাম সত্যি-সত্যিই। বড্ড লক্ষ্মী সতী বৌই ছিল। বড় মেয়ের শোকটাই বাজ্‌ল কিনা বেশী ! আর আমিই বা তখন, . . . হেঁ, আমার চরিত্র রাখ্‌তে দিলেনা ত কি ? . . . যাক্‌গে ও তাবিজ-ফাবিজের কথা, এসো ধনি কাছে, ভারী শীত করছে যে !

[বলিয়াই বৃদ্ধ দুই লোভাতুর ব্যগ্র বাহু দিয়া মেয়েটিকে জড়াইয়া ধরিল। চাহিয়া দেখিল তাহার গলার হারের মধ্যখানে একখানি ধুক্‌ধুকি, ও তাহার মধ্যে কাহার একখানি মুখের ছবি। দেখিয়াই বৃদ্ধ সচকিত হইয়া আলিঙ্গন ছাড়িয়া দিয়া ভীত আর্ত্ত কণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিল। তাহার সমস্ত দেহ তখন কাঁপিতেছে। আগুনের স্পর্শকেও সে এত জ্বালাময় মনে করে নাই।]

বৃদ্ধ। (পাগলের সুরে) এ কার ফটো তোর বুকের মধ্যে, মা ? কার ফটো বল্‌ ? . . . সৌদামিনীর ? তোর মা'র ? . . . বল্‌ তুই কে ?

[মেয়েটি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।]

বৃদ্ধ। (উন্মত্তের মত) বল্ তুই কে? তুফান—তুফান মেতেছে বাহিরে। বল্ আমি এ কোথায় এসেছি। তোল্ মুখ মা পুতুল! ঐ যে, তোর ঘাড়ের ওপর সেই পোড়ার দাগ—সেই, সেই! এঁ্যা . . . বৃষ্টি না আগুন! . . .

মেয়ে। (চাপা মথিতস্বরে) বাবা, . . . আমার মা! . . .

[অক্লান্ত বর্ষণ চলিতেছে। মেঘের গর্জ্জনেরও বিরাম নাই। কলিকাতার রাস্তায় জল উঠিয়াছে। গাড়ী ঘোড়া সব বন্ধ।

বৃদ্ধ খোলা দরজা দিয়া ঝড়ের ঝাপটার মত ছুটিয়া বাহির হইয়া রাস্তায় কাদার মধ্যে একেবারে মুখ থুবড়াইয়া পড়িল। আবার সেখান হইতে উঠিয়া উগ্র উন্মত্তের মত লক্ষ্যহীন উদ্দামতায় দৌড়িয়া ছুটিল। তখনো ঘরে ঘরে গানের আলাপের সঙ্গে সঙ্গে কাঁচের পেয়ালার শব্দ জাগিতেছে। নূপুরের আওয়াজ বৃষ্টির ছন্দের সহিত বেশ মিলিতেছিল। প্রচুর অন্ধকারের তলায় অভিমানাহত ব্যথিত আকাশ মেঘে-মেঘে ফুঁপিয়া উঠিতেছে।

তেমনি এই পরিত্যক্ত ঘরটিতে মেঝের উপর বুকটা কঠিন করিয়া চাপিয়া এই হতভাগিনী মেয়েটি আর্ত্তকণ্ঠে ক্ষণে ক্ষণে কাঁদিতেছিল—মা, আমার মা . . .]

পঞ্চশর

(চিত্রা)

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

এই রকম এক সন্ধ্যায় মনে হয় যেন কালের গতি থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি, যেন শুধু আমি আছি, আমার সন্ধ্যা আছে আর আছে মানসলোকের চিত্রপটে একরঙা জীবনের ছবি—শুধু স্থির ছবি, সে ছবির তলায় যেন কোনদিন জীবনের বুক ধুক ধুক করেনি, তার পেছনে পরিণতির বেগ ও উদ্বেগ যেন ছিল না। যারা এসেছে ও চলে গেছে তারা যেন হৃদয়ের শোণিতে তাদের চোখের জল মেশায়নি, যেন আনন্দের বেগ দেয়নি বুকের স্পন্দনে, শিরার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিকড় জড়িয়ে, যাবার সময়ে গভীর চিরস্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করে যায় নি।

শুধু মনে হয় তারা এসেছিল ও গেছে। এই ধূমবরণ সন্ধ্যার অনতিগাঢ় অন্ধকারে যেন চেতনার গতির অনুভূতিটি নষ্ট হয়ে যায়। অন্তরের স্বচ্ছ গভীরতায় শুধু দেখি—অতীতের স্মৃতি পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, রক্তের দাগ যেখানে লেগেছিল সেখানে সমস্ত ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, সমস্ত যা কিছু উত্তপ্ত শীতল হয়ে গেছে, যা কিছু ব্যথায় অস্থির শান্ত হয়ে গেছে। মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন এই সন্ধ্যার অন্ধকার প্রবেশ করে সমস্ত ভার লঘু করে দিয়েছে।

আজ অনেক কথা নির্ব্বিকার চিত্তে বলতে পারি বোধ হয়। সে কথাকে হয়ত অন্য সময় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করবার বেদনা সহ্য করতে পারতাম না কিংবা চাইতাম না।

শেষের দিন তাকে বলে এসেছিলাম "তোমার বুকের একটি কোণে একটি চিরন্তন বেদনার কাঁটা হয়ে রইলাম এই আমার সান্ত্বনা।" বলেছিলাম কিন্তু নিজে বিশ্বাস করিনি। সেও হেসেছিল।

আজ দশবছর বাদে বিগতযৌবনা একটি মেয়ের কাছ থেকে চিঠি এসেছে—"এতদিন নিজেকে ভুল সান্ত্বনা দিয়েছ, তোমার সান্ত্বনা অসার মিথ্যা; হৃদয়ের কোনখানে একটি আঁচড়ও তুমি রেখে যেতে পারনি—তোমার অযথা দর্প

এখনও ওই সান্ত্বনার আশ্রয় করে খাড়া হয়ে আছে হয় ত ভেবেই এতদিন বাদে এইটুকু লিখলুম . . .।" মনে মনে বল্লাম, হায় সেদিনের দর্পিতা! তোমার নিষ্ঠুরতা সহ্য করতে পেরেছিলাম কিন্তু তোমার দীনবৃত্তি দেখে যে কান্না পায়, এতদিন বাদে সান্ত্বনা ভাঙতে আসার ছলে এই করুণ কাতরতা দেখান কি তোমার শোভা পায়! এই সামান্য ছল টুকুর আড়ালে অমন করে এতদিন বাদে ভিক্ষা করতে আসতে তোমার সঙ্কোচ হল না? লজ্জা হল না? তোমার আঘাত ভুলে গেছি কিন্তু তোমার অহঙ্কারকে এখনো শ্রদ্ধা করতাম, সে শ্রদ্ধাটুকুও হারালে। হতভাগিনী! তোমার এই অধঃপতনে কান্না আসে—।"

তাকে কোন উত্তর দিইনি—। সত্য উত্তর দিতে হ'লে লিখতে হ'ত "হায় সুন্দরী, সান্ত্বনা দেবার সময় পাইনি; নব নব হৃদয়ের দেশে নানা অভিযানে বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম। আজ তুমি যখন এত অনাবশ্যক আগ্রহ সহকারে বিস্মৃত সান্ত্বনার ভিত্তি ভাঙতে এসেছ, তখন না হয় সে সান্ত্বনা একবার স্মরণ করতে পারি অনুশোচনারূপে।" কিন্তু আজ আর তা লেখা সম্ভব নয়। যে তার দর্পটুকুও হারিয়ে এমন দীনা কাঙালিনীর বেশে এল তাকে আঘাত করবার মত নিষ্ঠুরতা সমস্ত অতীত অপমান লাঞ্ছনা আঘাত বেদনার জ্বালা নতুন করে জ্বালিয়ে তুলতে পারলেও আমার মনে জাগাতে পারবে না। তার চিঠিটি ছিঁড়ে ফেলেছি। তার ঠিকানা দেওয়া ছিল, না পড়ে পুড়িয়ে ফেলে দিলাম। কোন দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে সে অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে সেতু নির্ম্মাণের হাস্যকর চেষ্টা করবার লোভ হলেও উপায় যেন না থাকে। আমার অন্তরের একটি যৌবন-ক্ষতের মাঝে যে দর্পিতার শূন্য বেদী আছে তাকে অপমান করতে পারব না।

ছেলেবেলা খেলা করতে করতে ঝগড়া করলে মা বলতেন "ছি ঝগড়া করতে নেই, তোমার সঙ্গে যে চিত্রার বিয়ে দেব।" মার পিঠের ওপর পড়ে চুলের খোঁপা ঘাঁটতে ঘাঁটতে বলতাম "মাগো ওই পেত্নিটা কে—" চিত্রা বোকার মত বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে থাকত। মা বলতেন আহা, অমন টুকটুকে মেয়েটি! যাও ত মা চিত্রা, ভাল করে চুল বেঁধে কাপড় পরে এস ত নইলে তোমার বরের পছন্দ হবে না।"

চিত্রা তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে কান্নাকাটি করে একটা রঙীন কাপড় গায়ে জড়িয়ে এসে বলত "মাসিমা এসেছি।"

ছেলেমানুষ হলেও তখন আমার চিত্রার বোকামিতে হাসবার মত বুদ্ধি হয়েছিল। আমি খিল্ খিল্ করে হাসতাম। মাও মেয়ের হাসি চাপতে চাপতে

বিমূট্ চিত্রাকে কাছে টেনে বলতেন "বা দিব্যি বৌটি"। চিত্রা ফিক্ করে একটু আনন্দের হাসি হাস্ত—।

কিন্তু একদিন হঠাৎ সে এমন করে সেজে আসতে অস্বীকার করেছিল মনে আছে। সে হাস্য মুখ গম্ভীর করে বলেছিল "আমি ত তোমাদের কেউ হব না।"

মা বলেছিলেন "কেনরে পাগ্‌লি ?"

সে বলেছিল "তোমরা বড় লোক, আমরা গরীব, তোমাদের কত টাকা, আমরা ত তোমাদের ভাড়াটে, তোমাদের বৌ হব না।"

মা হেসে তাকে কোলের মধ্যে টেনে বলেছিলেন "কে তোকে বল্লে তোরা গরীব ? না তুমি আমাদের বৌ হবে কেমন ?"

সে জোর করে মার হাত ছাড়িয়ে মুখ ভার করে চলে যেতে যেতে বলেছিল "না ও কেন আমায় পেত্নি বলে, আমার কথায় হাসে, আমি ওকে কিছুতেই বিয়ে করব না।"

তখন চিত্রার বয়স সাত হবে।

আমি খুব হেসেছিলাম কিন্তু একটু বোধ হয় বিস্মিত হয়েছিলাম সেই বয়সেই।

শৈশব কৈশোর পার হয়ে তার পর একদিন হঠাৎ দারুণ গ্রীষ্মের তপ্ত কর্ম্মহীন দুপহরে হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলাম যে আমার বাড়ীর এক পা দূরেই একটি পুরাতন অতিপরিচিত একতলা বাড়ীর প্রতি ইটখানি অসীম রহস্যে পরিপূর্ণ, তার প্রতি দ্বার ও প্রতি বাতায়নে অসীম রহস্যের অস্পষ্ট হাতছানি। সেটি আমাদেরি ভাড়াটে বাড়ী। তার অন্তরের মায়া-প্রকোষ্ঠে একটি অতি পরিচিত বালিকাকে চিনতাম আজ সেখানে যে দুর্জ্ঞেয় নবযৌবনা থাকে তাকে চিনিনি—কিন্তু তার জন্যে কৌতুহলের আর অন্ত নেই।

উত্তপ্ত বৈশাখের দুপহরের শিথিল স্তব্ধতার মাঝে সময়ে সময়ে একটি ছোট খেয়ালি ঘুর্ণিবায়ু হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। এখানকার শুকনো খড় কুটো ওখানে নেড়ে রাখে, একটি পর্দ্দা ঈষৎ সরিয়ে কৌতুকভরে ক্ষণিকের জন্য উঁকি দিয়ে যায় ও একটি দ্বারে অকারণে একটু মৃদু আঘাত করে' সরে যায়। এমনি একটি খেয়ালি বাতাস সেদিন বৈশাখের অলস দুপহরে সামনের বাড়ীর একটি পর্দ্দা ঈষৎ সরিয়ে ক্ষণিকের জন্য একটি গৃহকর্ম্মরতা নবযৌবনাকে এমন করে আমায় দেখিয়েছিল যেমন করে তাকে কোনদিন অতি নিকটে বহুক্ষণের জন্যে

পেয়েও দেখিনি। অনেক অদৃশ্য পর্দ্দা সেদিন সে হাওয়ায় দুলে উঠেছিল, অনেক গোপন দ্বারে মৃদু আঘাত লেগেছিল এবং সে বাতাসের খামখেয়ালিতে অনেক কিছু অলক্ষিতে স্থানচ্যুত হয়েছিল।

মাস পাঁচেক পরে বিকেল বেলা মাসিমার সঙ্গে তাঁদের দাওয়ায় বসে গল্প করছিলাম। বলছিলাম "আপনাদের উত্তরের ঘরটার পিছনে অতখানি জায়গা মিছিমিছি পড়ে আছে। ভাবছি ওখানে একটা ঘর তোলাবার বন্দোবস্ত করব আপনাদেরও ত এই ঘরটায় ভাঁড়ার আর শোবার ব্যবস্থা এক সঙ্গে করতে বেশী অসুবিধা হয়। মাসিমা বল্লেন "তাত হয়ই বাবা, কিন্তু উপায় কি? আমরা ত আর ভাড়া বেশী দিতে পারব না, ঘর তৈরী করতে বলি কোন মুখে।"

চিত্রা তাঁর ঘর থেকে ডেকে বল্লে "একটা কথা শুনে যেওত।" কয়েক মাস ধরে মাসিমার সঙ্গে বিকেল বেলা আলাপটা বিশেষ রুচিকর অনুভব করতে আরম্ভ করেছিলুম। মাসিমাও বিশেষ খুসী হতেন দেখতাম এবং প্রায়ই আমায় শুনিয়ে দিতেন যে বড় লোকের ছেলে হয়েও অমায়িক ও নিরহঙ্কার তিনি কখন দেখেননি। চিত্রা মাঝে মাঝে সে আলাপে যোগ দিত। কোন কোন দিন মা এলে তাস খেলাও চলত। তখন চিত্রার ডাক পড়ত। চিত্রা কোন দিন অসম্মতি জ্ঞাপন করত না। কিন্তু বোধ হয় দু'একদিন অসম্মতি জ্ঞাপন করলে আমি খুসী হতাম। দুর্ভেদ্য দুর্গের মত তার চারিধারে যে প্রচ্ছন্ন অটুট ব্যবধান আমার সমস্ত অগ্রসর হবার প্রয়াস ব্যর্থ করে দিচ্ছিল, সে ব্যবধান ভেদ করবার মত একটি দুর্ব্বলতার ছিদ্র পেতাম। চিত্রা মাত্র দু'একবার একটু মৃদু হাসা ছাড়া কোন দিন বিশেষ কিছু বলেছে বলে আজ মনে পড়ে না। আমার শৈশবের অবজ্ঞাত খেলার সাথী, প্রগল্‌ভা চিত্রা কেমন করে এই চিরমৌন আত্মস্থ নবযৌবনার মাঝে এমন রূপান্তরিত হল ভেবে আমি আশ্চর্য্য হতুম। আর রাগ হ'ত একটি লোকের উপর। সে চিত্রার দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি ভাই শুনতাম। মাঝে মাঝে এসে আমাদের খেলায় যোগ দিত। তারও চারিধারে অর্দ্ধ দুর্ভেদ্য মৌনতার প্রাকার। খেলার মাঝে সমস্ত সশব্দ উচ্ছ্বাস, উল্লাস ও আক্ষেপ আমার ও মাসিমার দিক থেকেই হ'ত। এক একদিন তার নীরব গাম্ভীর্য্য অসহ্য মনে হ'ত, মনে হ'ত চিত্রার এই নির্লজ্জ অনুকরণ করে' সে শুধু আমার উচ্ছ্বাসের আতিশয্যকে ব্যঙ্গ করতে চায়, ইচ্ছে হ'ত তার মাথাটা সবলে ঝাঁকি দিয়ে জিজ্ঞাসা করি "আপনি কি বোবা?"

উৎসুক হয়ে চিত্রার ডাকে উঠে গেলাম। চিত্রা টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে

একটা কলম নিয়ে অকারণে নাড়াচাড়া করছিল। আমি ঘরে ঢোক্‌বা মাত্র মুখ না ফিরিয়েই জিজ্ঞাসা করলে "আমায় চল্লিশটা টাকা দিতে পার?" বিস্মিত হ'য়ে কাছে সরে বল্লুম "পারব না কেন? এখনি চাই?"

সে বল্লে "হ্যাঁ, পকেটেই আছে নাকি?" কথাগুলোর ভেতর বোধ হয় ক্ষীণ বিদ্রূপের সুর ছিল কিন্তু তখন বিপুল বিস্ময়ে আমার বোধশক্তি বোধ হয় ছিল না।

"না, এখনি এনে দিচ্ছি" বলে আমি বেরিয়ে গেলাম।

চল্লিশটা টাকা এনে যখন তার ঘরে ঢুকলাম, তখনও চিত্রা একভাবেই টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে পেপারওয়েট্‌টা অন্যমনস্কভাবে টেবিলের ওপর আঘাত কর্‌ছিল।

টেবিলের ওপর টাকাগুলো রেখে স্বরকে যথাসাধ্য সহজ কর্‌বার চেষ্টা করে বল্লাম, "এখনি এতটাকা কি হবে চিত্রা?"

হঠাৎ আমার মুখে অগ্নি দৃষ্টি ফেলে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বরে চিত্রা বল্লে "এত বেশী টাকা হল কি? গরু ঘোড়ারও ত দাম এর চেয়ে বেশী।" তারপর একটু থেমে বল্লে "ও, তুমি ত আরো অনেক ঘুস দিয়েছ বটে! বাবাকে ঘোড়দৌড়ের জন্য ধার দিয়েছ; দু-মাসের ভাড়া নিজের পকেট থেকে বাড়ীতে দিয়েছ, মাসের বাজার করে এনে দিয়ে টাকা নিতে ভুলে গেছ—আজকাল তোমার বিশেষ অনুগ্রহ এ বাড়ীর উপর; আমার বাপ মা আধ্‌খুটে গরীব দুর্ব্বল, লোভী, তাই তোমার অনেক দয়া আমাদের ওপর, তুমি বড় লোক, তবু কি অমায়িক, কি মুরুব্বি! মা তোমার টাকা তোমার অমায়িকতায় ভুলে গেছেন, তুমি অসন্তুষ্ট হও বলে জিতেনদার এ বাড়ীতে আসা নিষেধ হয়ে গেছে, তার তোমার মত টাকা নেই, তোমার মত রূপ নেই, তার বাপ তার জন্যে লাখ টাকার সম্পত্তি উইল করে যাবেন।"

আমি বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। চিত্রা আবার আরম্ভ করলে, "তা এখন হিসেব করে দেখ চল্লিশ টাকা কি খুব বেশী হবে, যা দিয়েছ তার ওপর? আটঘাট বেঁধে চার ফেল্‌তেত কিছু গিয়েই থাকে অমন, এই শেষ চল্লিশ টাকা দিয়ে নারীর ভালবাসা কিনে নিতে পারলে বিশেষ লোকসান হবে কি তোমার? ভালবাসা কেনার জন্যে নানা রকমে ঘুস দেবার ফন্দি খুঁজে হয়রাণ হচ্ছিলে দেখে নিজেই টাকাগুলো একবারে চেয়ে তোমার সুবিধে করে দিলাম না কি?"

জীবনে এরকম বিস্মিত, স্তম্ভিত ও আহত আর কখন হইনি বোধ হয়। চিত্রার দীর্ঘ কৃশ দেহ কল্পিত অপমানের বিরুদ্ধে ক্রোধের উত্তেজনায় কাঁপছিল।

সেদিন ইচ্ছা করলে অনেক কথা বল্‌তে পারতাম। বল্‌তে পারতাম, তোমার ভালবাসা যদি সত্যি কেনার জিনিষই হ'ত, আমি দুঃখিত হতাম না চিত্রা! তোমার ভালবাসা পাবার সামান্য আশাও তবু তাহলে আমার থাকত। আমার হীনতাকে আমার নির্ব্বুদ্ধিতাকে, তুমি যত পার ভৎর্সনা কর চিত্রা, আমার স্পর্দ্ধাকে যত পার বিদ্রূপের কশাঘাত কর, কিন্তু তোমায় আমি ভালবেসেছি এই কথাটি অবিশ্বাস কোর না। তোমার সমস্ত অমূলক অপবাদের মধ্যে এই টুকুই সত্যি যে আমি তোমার ভালবাসা চাই। সে কি এত অন্যায় চিত্রা? ভাগ্যক্রমে আমার বাপ ধনী, সেটা কি আমার একটা অপরাধ চিত্রা? ভাগ্যক্রমে হয়ত আমি অপ্রিয়-দর্শন নই তার জন্য কি আমি ভালবাসার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়?" হয়ত সেদিন নিজের অন্তরের বিপুল আকুলতার পরিচয় দিয়ে এই অপরূপ চিরমৌন মেয়েটির দুর্ভেদ্য অন্তরে কয়েক মুহূর্ত্তের এই উত্তেজিত অসাবধানতার অবসরেই প্রবেশাধিকার পেতে পারতাম।

কিন্তু তখন শিরায় শিরায় আদিম প্রপিতামহদের রক্ত টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটছিল। আঘাতের বদলে প্রতিঘাত দিতে হবে। অপমানের প্রতিশোধ চাই।

শুষ্ক কঠিন ব্যঙ্গ-স্বরে বল্লাম "তুমি বুদ্ধিমতী চিত্রা, আমার মতলবটা বুঝতে তোমার দেরী হয়নি। কিন্তু একটু ভুল করেছ তোমার অহঙ্কারের দরুণ; তোমার ভালবাসা কেনার জন্যে মূল্য দিচ্ছি মনে করে নিজকে একটু অযথা সম্মান দিয়েছ। ভালবাসা কেনা যায় না সে আমিও জানি তুমিও জান। যার জন্য মূল্য দেওয়া যায় তার জন্যই মূল্য দিয়েছি। তোমার ভালবাসার জন্য এক কাণাকড়ি দেওয়াও আমি অপব্যয় মনে করি।"

চিত্রা চীৎকার করে বল্লে "কী বল্লে?"

যথাসাধ্য স্বর সহজ ও কঠিন করে বল্লাম "অত আহত বিস্ময়ের ভান দেখিও না চিত্রা, তাতে দর বিশেষ বাড়বে না, বরঞ্চ এমন সুযোগটা হাতছাড়া" আমার কথা শেষ করতে পারিনি। চিত্রা উন্মত্তের মত চীৎকার করে সীসের পেপার-ওয়েটটা তুলে নিয়ে সবলে আমার দিকে নিক্ষেপ করলে। আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও অস্ফুট চীৎকার করে বসে পড়লাম। ডান চোখের ঠিক ওপরে বিপুল বেগে পেপারওয়েটটা লেগেছিল। ফিন্‌কি দিয়ে রক্তের ধারা ছুটছিল, চোখের ভেতর

অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করছিলাম। চশমার কাঁচ ভেঙে চোখের ভেতর বিঁধে গেছল। সে চোখের দৃষ্টি আর ফিরে পাইনি!

বিস্মিত আতঙ্কে মাসিমা ছুটে এলেন, বাড়ীর আরও অনেকেই এল ভিড় করে। কিন্তু সব চেয়ে এই কথাটি মনে করে বিস্মিত হই যে সে দিন সেই আকস্মিক আঘাতের দারুণ যন্ত্রণার মাঝেও আমি একটি মর্মাহত মেয়ের নিদারুণ লজ্জাকর অসহায় অবস্থা ভেবেই অন্তরের মাঝে শিউরে উঠছিলাম! সেদিনকার সেই ঘরের কোণের অপমানে আতঙ্কে বিস্ময়ে কম্পমান চিত্রার মুখের কাতরতা স্মরণ ক'রে আজো যেন কান্না আসে। সেদিন বিশ্ব সংসারের ভ্রূকুটি কুটিল দৃষ্টিতে আমার সুস্পষ্ট ক্ষতটাই বিপুল হয়ে সেই অসহ্য অপমানে আত্মহারা অভিমানী মেয়েটির অন্তরের অদৃশ্য ক্ষতটি সম্পূর্ণ আড়াল করে দিলে...

আমার কপালের রক্তে একটি দৃপ্তা কুমারী চিরদিনের মত অকারণে কলঙ্কিত হয়ে গেল।

রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে শুনি আমাদের বিশবছরের ভাড়াটেরা উঠে যাচ্ছে। তাদের এই পরিচিত প্রতিবেশীদের মাঝে মুখ দেখান অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

মা একদিন বলে ফেল্লেন "নিজেরা মানে মানে উঠে গেল, ভালই করলে, না হলে আমাদের উঠতে বলতেই হ'ত।"

চুপ করে রইলাম। তাঁর একমাত্র পুত্রের একটি চক্ষুর বিনাশ মা যে কোন মতেই ক্ষমা করতে পারেন না। তারা কোথায় গেল জানবার কৌতূহল হলেও জিজ্ঞাসা করতে পারিনি সেদিন।

আশ্চর্যের কথা এই যে সেদিনকার সেই ঘটনা নিয়ে কেউ আমাকে কোন প্রশ্ন করাও প্রয়োজন মনে করেনি। এই ঘটনাটা যতই অসাধারণ ও ভয়ঙ্কর হোক্‌না তার হেতুটা নাকি এতই স্পষ্ট যে সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

কিন্তু বহুদর্শী সংসারের সংস্কার-কঠিন অন্ধ মন, দুটি যুবকযুবতি সংক্রান্ত এই উপাদেয় ঘটনার মীমাংসা অতি সহজে করে ফেল্লেও একটি ছোট বালিকার নির্বোধ হৃদয়ে সে প্রশ্ন উঠে ছিল।

আমারি ছোটবোন একদিন বিছানার পাশে ব'সে বাতাস কর্‌তে কর্‌তে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে ফেল্লে "দাদা, চিত্রাদি তোমায় মারল কেন?"

কেন?—সেই কথাই ত ভাবছিলাম, এমন ঘটনাই ঘটল কেন তাই রোগ-শয্যায় শুয়ে এতদিন ধরে তারি-ত কোন সদুত্তর পাচ্ছিলাম না!

চিত্রা আমার এতদিনের সমস্ত আচরণকে বিকৃত ক'রে তার নারীত্বের মর্য্যাদার প্রতি অপমানের চেষ্টা বলে ভুল করলে কেন? সে ভুলকে আমি ক্ষণিকের উত্তেজনায় সমর্থনই করলাম কেন? যেখানে কোন বাধা ছিল না সেখানে আমরা শুধু যুক্তিহীন কল্পনার প্রাচীর গড়ে এমন ক'রে পরস্পরকে দূরে ঠেলে রাখলাম কেন?

সেদিন ছোটবোনকে কি একটা উত্তর দিয়েছিলাম এবং পরদিন মাকে সাহস করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম "মা নবীনবাবুরা কি দেশে গেলেন?"

মা বিরক্ত মুখে বলছিলেন "জানিনা বাছা, আমার কি পৃথিবী-শুদ্ধ লোকের খোঁজ রাখা ছাড়া আর কাজ নেই?"

"পৃথিবীশুদ্ধ লোকের খোঁজত তোমায় রাখতে কেউ বলছে না মা, তোমার বাড়ীর পনেরো বছরের পুরোণ ভাড়াটে কোথায় উঠে গেল, সেইটুকু শুধু জানতে চেয়েছিলাম।"

মা রেগে উঠে বল্লেন 'কোথায় উঠে গেল তা আমি কোথা থেকে জানব! আমারি বড় সুখের সময় কিনা তাই আমি অহ্লাদ করে খুনেদের বাড়ী গিয়ে আলাপ করতে যাব। পুলিশে দিইনি—এই তাদের চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি।"

"কাকে পুলিশে দিতে মা—"

"জানিনা বাছা, তোমাদের সঙ্গে কথায় পারবার যো নেই—! পুলিশে দেবেনা ত কি সন্দেশ খাওয়াবে আদর করে—এমন মানুষ-খুনকরা—"

আমি বাধা দিয়ে বল্লাম "যদি খুনেই বল মা, একটা মেয়ে কি শুধু শুধু হঠাৎ অমন খুনে হয়ে ওঠে—"

"তোমরা অনেক কথা বলতে শিখেছ বাপু আজকাল, কিন্তু ওসব বাহাদুরী কথা শুনলে আমার গা জ্বালা করে। আমরা মুখ্যু সেকেলে মানুষ ওসব বুঝি না; তোমার চোখটি জন্মের মত কাণা করে দিলে আর তুমি এসেছ তার হয়ে ওকালতি করে বাহাদুরী করতে! তাহলে বলি বাপু তুমি এত বড় একটা বুড়োমদ্দ অতবড় ধাড়ী মেয়ের সঙ্গে কি কাজে রোজ রোজ আলাপ করতে যেতে?—যাই বল বাপু, তোমাদের আজকালকার ছেলেমেয়েদের মত বেহায়াপনা আমাদের জন্মে কখন দেখিনি—।"

মা রেগে আগুন হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মাকে আমি জানতাম। তবু তাঁর এই আকস্মিক আত্মপ্রকাশে সমস্তমুখ রাঙা হয়ে উঠল।

প্রায় একমাস হয়ে গেলেও ঘা শুকোতে চাইছিল না। মা ভীত হয়ে উঠছিলেন। ডাক্তারেরা বোধ হয় নালী-ঘার আশঙ্কা করছিল। কদিন থেকে বেশ জ্বরও হচ্ছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় জানলার ধারে বসে, পরিত্যক্ত জনহীন ভাড়াটে বাড়ীটির দিকে চেয়ে হঠাৎ কেমন নিজেকে অত্যন্ত ক্লান্ত অত্যন্ত অবসন্ন বোধ করলাম। অসুস্থ শরীরে সময় সময় মন সামান্য কারণে অত্যন্ত উত্তেজিত ও অস্থির হ'য়ে ওঠে বোধ হয়। এই জানলা থেকেই একদিন গ্রীষ্মের দুপহরে একটি বাতায়নের পর্দা স'রে যেতে দেখেছিলাম! আজ সে বাতায়ন বন্ধ, পরিত্যক্ত বাড়ীটির দ্বারগুলিতে তালা আঁটা। মনে হ'ল সন্ধ্যার বিষণ্ণ অন্ধকারে ওই বাড়ীটির প্রতি পরিত্যক্ত কক্ষ হ'তে নিঃসঙ্গ রাত্রির কল্পনায় নিঃশব্দ কাতর ভয়ার্ত দীর্ঘশ্বাস উঠছে। নিজেকেও যেন অমনি ব্যর্থ, নিজের বুকও যেন অমনি শূন্য মনে হ'ল, মনে হ'ল দূরের ধূসর আকাশের চোখে যে বিদায়ের ম্লান চাহনি, সে শুধু যে দিনটি অবসান হ'ল তার জন্যেই নয় আমার জন্যেও . .

নিজের জন্যই নিজের চক্ষু সজল হয়ে এল অনিচ্ছায়। এই দুর্ব্বলতায় একটু লজ্জিত হলাম কিন্তু এ অশ্রু নিবারণ করতেও ইচ্ছা হ'ল না, নিজেকে বোঝালাম যে এ অশ্রু শুধু আমার জন্যে ত নয়, দরদীর অশ্রুর পিপাসায় যত তৃষিত হৃদয় যুগে যুগে ব্যর্থ হৃদয়ে বিদায় নিয়েছে এ তাদের জন্যেও। . . .

পরিত্যক্ত বাড়ীটার মধ্যে একটা বিড়াল কি কারণে জানি না শ্রুতি-কটু একটা বিকট শব্দ করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। নীচে অমঙ্গল আশঙ্কায় মা সেটাকে তাড়া দিচ্ছিলেন শুনতে পাচ্ছিলাম। মার অমঙ্গল আশঙ্কা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ নির্বোধ বিড়ালটা কিন্তু মার আয়ত্তের বাইরে কোন ঘরের ভিতর লুকিয়ে অধিকতর উত্তেজনায় স্বর-সাধনা সুরু করলে। মা বিরক্ত হয়ে বিড়ালটাকে অকারণে নিস্ফল গালাগাল ক'রে উপরে উঠে আসছেন শুনতে পেলাম।

আবার ভাবছিলাম যুগযুগান্তরের কোটি কোটি বিরহীর পিপাসায় শুষ্ক-মরু আমার এই কয় বিন্দু অশ্রুজলে কতটুকু সরস হবে? আর সত্যি কি মূল্য আছে এই অশ্রুর? হোক্‌সে দরদীর, হোক্‌সে প্রিয়ার! যে প্রিয়া ধরা দিতে সাহস করলে না তার অগণন রাত্রির গোপন অশ্রুর চেয়ে ছলনাময়ী প্রিয়ার এক পলকের

চুম্বন যে অনেক মূল্যবান! অসুস্থ মনে অনেক অসম্ভব কল্পনাকে অনাবশ্যক দীর্ঘ করতে পারি, কিন্তু অন্তরে অন্তরে যে রক্তমাংসের শরীরী প্রিয়াকে বাহুর বন্ধনে নিষ্পেষণ করতেই চাই, তৃষিত ওষ্ঠ দিয়ে প্রিয়ার হৃদয়ের সমস্ত সুধারস শোষণ করে নিতে চাই, তার পরমসুন্দর মুখখানি তুলে ধরে দুটি ব্যাকুল নয়নের দৃষ্টি দিয়ে তার নয়নের অতলে জীবনের চরম সার্থকতা অন্বেষণ করতে চাই—তাকে যে নিকটে চাই, নিকটতম করে চাই। আজ যদি পৃথিবীর কাছে বিদায় নেবার সময়ই এল, তবে সজল চোখে ব্যর্থতার বেদনা নিয়ে যাব কেন? চিত্রার ও আমার মাঝখানকার ব্যবধানের প্রাচীর যদি সত্যই ভিত্তিহীন, তা হলে সে ব্যবধান অবজ্ঞা করবার সময় কি আজো হয় নি? আজ এই জীবনের বিদায় বেলায় কি ভুয়ো গোটাকতক কথার সম্মান রেখে অন্তরকে অপমান করে যাব?

মা ওপরে এলে হঠাৎ বল্লাম "মা, মাসীমাদের একটা চিঠিতে আসতে লিখে দাও।"

মা বিস্মিত হয়ে বল্লেন "তার মানে?"

"তার মানে শেষ পর্য্যন্ত আর নিজেকে ফাঁকি দিতে চাই না মা।"

"আমি ওসব হেঁয়ালি কিছু বুঝতে পারি না বাপু, সোজা করে বলতে হয় ত বল।"

"সোজা করেইত বলছি মা। আমি নিজে লিখলে সুবিধা হবে না বলেই তোমায় মাসীমাকে একটা চিঠিতে চিত্রাকে সঙ্গে করে এখানে আসতে লিখতে অনুরোধ করছি।"

মা খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর মৃদু ধীর কণ্ঠে বল্লেন "তোর নিজের মার সেবা কি তোর ভাল লাগছে না বাবা? সে স্বরে এত কাতরতা, এত আহত অভিমানের বেদনা ছিল যে আমি চমকে উঠ্‌লাম। মার হাতটা নিয়ে আমার কপালে বুলিয়ে ক্ষুণ্ণ স্বরে বল্লাম "কেন তুমি ভুল বুঝ্‌ছ মা, আমি কি এতই অকৃতজ্ঞ! কিন্তু যদি মরে যাই মা, তাই চিত্রাকে একবার বড় দেখতে ইচ্ছে করছে। আমার নির্লজ্জতা ক্ষমা কোরো মা।"

"ওসব অলুক্ষুণে কথা কেন বলচিস বাবা? আমি তোর সব দোষ হবার আগেই ক্ষমা করে আছি কিন্তু যার জন্যে তুই মরতে বসেছিস্ তাকেই দেখবার জন্যে এত পাগল হলি কেন ভেবে অবাক হচ্চি। ও ছাড়া কি আর সংসারে ভাল মেয়ে সুন্দরী মেয়ে নেই?"

"মরতে বসেছি বলেই আজ আর লজ্জা করব না মা। ও অত কঠিন অত সুন্দর বলেই আজকে আমার জগতে ও ছাড়া আর মেয়ে নেই। ও যদি সেদিন আমাকে অমন আঘাত না করত তাহলে হয়ত আজ ওকে দেখবার জন্যে এত ব্যাকুল হতাম না। আর আমি এটা ঠিক জানি মা, তুমি লিখলে তারা না এসে পারবে না; আমি জানি যে চিত্রা অনুতপ্তা না হয়েই পারে না। যদিও সেদিন আমি তাকে যে অপমান করেছিলাম তার বদলে এই আঘাতটুকু না পেলে নারীর ওপর চিরকালের মত অশ্রদ্ধা হয়ে যেত। আমি জানি মা, সে শুধু সঙ্কোচেই আসতে পারছে না, নিজের অহঙ্কারকে বাঁচিয়ে আসবার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না বলেই সে আসতে পারছে না, তাকে সেই সুযোগটুকু দাও মা। সে যদি অপরাধও করে থাকে মনে কর ত আমার জন্যে তাকে ক্ষমা করো।"

মা আমার মাথায় হাত রেখে বল্লেন "তোকে অত করে বলতে হবে না বাবা, আমি তাদের কালই চিঠি লিখে দেব। তুই যদি এত সবের পরও তাকে দেখবার জন্যে এমন পাগল হ'তে পারিস্ ত আমি মিছি মিছি তোর সাধে কেন বাদী হব বাবা? আমার কি অসাধ যে তুই সুখী হ'স, তবে আমাদের কালে এসব আমরা জানতুম না—"

আমি সে কথা এড়িয়ে হেসে বল্লুম "গল্পে সামান্য একটা ভুলের ওপর একটা অতি করুণ ট্রাজিডি গড়ে উঠ্‌তে দেখতে হয়ত বেশ ভালো লাগে কিন্তু জীবনে কমিডিই সব চেয়ে বাঞ্ছনীয় মা, তার জন্যে যদি সমস্ত আচরণে উপন্যাসোচিত সঙ্গতির একটু অভাবও হয় তাও ভাল।"

"ওসব বড় বড় কথা বুঝি না বাপু, আমি চিত্রার মাকে কালই চিঠি লিখছি আমার ছেলের একটি চোখ নষ্ট করিবার অপরাধে আমি তোমার মেয়েকে লোহার নোয়া পরাইয়া চিরজনমের মত আমাদের বাড়ীতে বন্দী করিতে চাই।" . . .

আমি বাধা দিয়ে বল্লাম "এটা তুমি নিশ্চয়ই সম্প্রতি কোন বটতলার ডিটেকটিভ্ উপন্যাস পড়ে বলছ মা—"

দু'জনেই হাসতে লাগলাম।

• • •

কিন্তু মাসিমারা এলেন না। আমিও অবশ্য সেরে উঠ্‌লাম। মার মুখে কয়েকদিন ধরে একটা বেদনার ছায়া গাঢ় হয়ে উঠছিল। তার কারণ আমার

অজ্ঞাত ছিল না। এই তাচ্ছিল্যের অপমান মা সহ্য করতে পারছিলেন না। কিন্তু নিজে যেচে যে অপমান ডেকে আনা হয়েছিল, সে অপমান ফিরিয়ে দেবার কোন উপায়ও ছিল না। প্রত্যেকদিন সকালে উঠে একটি ক্ষীণ আশা মনে জাগত—হয়ত . . .

মনে হ'ত তাও কি হতে পারে—চিত্রা অভিমানী, কিন্তু নির্ম্মম সেত নয়।

আর মাসীমাকে কি আমি একেবারেই ভুল বুঝেছিলাম?

মা একদিন মুখ কালো ক'রে ঘরে ঢুকে বল্লেন "এই নাও, অপমানের যেটুকু বাকী ছিল, হয়ে গেল . . ."

মাসীমার চিঠি। মাসিমা আমাদের চিঠি সময় মত পান নি। দেশ থেকে চিঠি অনেক ঘুরে তাঁদের আজকালকার ঠিকানায় পৌঁছেচে। তাঁদের এক বিশেষ দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, মেশোমশাই হঠাৎ কদিনের জ্বরে মারা গেছেন। তাঁরা এখন সহায়হীন। তাঁর একজন জ্ঞাতির দয়াতে তার বাড়ীতে এই দূর-বেহারের সহরটীতে আশ্রয় পেয়েছেন। মার অনুরোধ রাখতে না পারার দরুণ তিনি যে কি দুঃখিতা তা বলতে পারেন না, কিন্তু তাঁর অবাধ্য দুরন্ত মেয়ের ওপর তাঁর কোন হাত নেই। তিনি তাকে অনেক বুঝিয়েছেন, অনেক শাসন করেছেন কিন্তু এরকম একগুঁয়ে মেয়ের কাছে সে সবই ব্যর্থ হয়ে গেছে। এ রকম ডাকিনী মেয়ের মা হবার জন্য তাঁর লজ্জাও অনুশোচনার আর অন্ত নেই। মেয়ের জ্বালায় তাঁর গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে। সে দিনের সেই ঘটনার পরও এই প্রস্তাব ক'রে মা যে মহত্ব ও তাঁদের প্রতি দয়া দেখিয়েছেন তার একটুও প্রতিদান না দিতে পেরে ও তাঁর বহুদিনের গোপন বাসনা শুধু এই মেয়েটির ধনুকভাঙা পণের দরুণ পূর্ণ না হওয়ায় তিনি যে কি লজ্জিত ও দুঃখিত তা লিখে জানাতে পারেন না; মা যেন তাঁকে ক্ষমা বরেন।

মার হাতে চিঠিটা ফিরিয়ে দিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করলুম কিন্তু সে হাসির জ্বালায় যেন নিজের ঠোঁট দুটো পুড়ে গেল। কিছুদিন আগেই আসন্ন মৃত্যুর কল্পিত আশঙ্কা থেকে কেমন করে শেষে অমন অসম্ভব আশায় পৌঁছে মূর্খ নির্লজ্জের মত হাসতে পেরেছিলাম মনে ক'রে সমস্ত মনটা নিজের প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরে গেল।

* * * *

একদিন হঠাৎ বেরিয়ে পড়লাম। এবার দূর-মেয়ের নয় দূর-দেশের টানে। যৌবনের স্বভাব উপভোগ করা, সে ব্যর্থতা বেদনা হতাশাকেও উপভোগ করতে পারে। যৌবনের ধর্ম্ম অহঙ্কার। সে ব্যর্থতা নিয়েও অহঙ্কার করে। ফুল যদি তার না ফোটে সে ব্যর্থ মুকুলের ব্যথাকে নিয়েই হৈ চৈ বাঁধিয়ে তুলতে পারে।

যৌবনের জগতে নিত্য উৎসব; অহরহ সেখানে সমারোহ চলেছে কোলাহলে। সে উৎসব ফাল্গুনের তোয়াক্কা রাখে না। আষাঢ়ের অশ্রু-সিক্ত আকাশের তলেও সে মেতে ওঠে। তার সব সমারোহের পতাকা শুধু খুশীর রঙেই রঙীন নয়, গাঢ় বেদনার রঙেও কতক ছোপান।

সেদিন চিত্রার উপেক্ষাকে বৃথা যেতে দিইনি। সেদিন নিজের বুকের গভীর ক্ষতটির গর্ব্বে সুন্দরী পৃথিবীকে নূতন করে সম্ভাষণ করেছিলাম। বলে-ছিলাম, হে হতভাগিনী, আজ আমার ললাটে তোমার শ্রেষ্ঠ সম্মানের টীকা পরিয়ে দিলে! তোমার গোপন অন্তরলোকে যে ব্যর্থ বিরহীদের চিরন্তন সভা, সেখানে আজ আমায় বরণ করে নিলে—সেখানে শুধু নির্ব্বাপিত দীপের দেয়ালী, সেখানে বিদীর্ণ বাঁশরী বাজে, সেখানে অস্ফুট মুকুলের আর ছিন্ন কুসুমের মালা।

সেদিন সেই গভীর বেদনার প্রেরণায় জীবনকে নতুন করে ব্যাখ্যা করেছিলাম নিজের কাছে। সেদিন নিজেকে বলেছিলাম, এই মৃত্যু-সাগর ঘেরা আয়ুর দ্বীপে বেদনার মুক্তা সংগ্রহ করে ফেরাতেই জীবনের চরম সার্থকতা। জীবন দেবতাকে এই মৃন্ময়-পাত্রে অশ্রুর অর্ঘ্য নিবেদন করতে হবে দিনের পর দিন।

অনেক দিন পথে পথে মুসাফের হয়ে ঘুরে বেড়ালাম। অনেক অচেনা পথের সুন্দরীকে বন্দনা করলাম আর মনে মনে বল্লাম "তোমার ভেতর দিয়ে কোথায় আমার পূজা পৌঁছে দিতে চাই বুঝলে কি নারী?"

কেউ বোঝে নি।

একজনকে বলেছিলাম তোমার চোখ দুটি ঠিক চিত্রার মত। সে বুঝতে পারে নি কিন্তু এ একটা নতুন চাটুবাক্য মনে করে হেসেছিল। তাকে রূঢ় ভাবে হাসতে মানা করেছিলাম।

আজ যে যাই বলুক আমি জানি, সেদিন চিত্রাকে আমি অপমান করিনি। আমার সমস্ত চুম্বন আমার সমস্ত আলিঙ্গন আমি সেদিনকার সমস্ত পথের সুন্দরীদেরহাতে চিত্রার কাছেই পাঠিয়েছিলাম।

কিন্তু একদিন একটা সামান্য ষ্টেশনে হঠাৎ একটা শাখা-লাইনের টিকিট

করে গাড়ীতে বসে নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ আগে পর্য্যন্ত আমার মনের কোণেও এমন কোন ইচ্ছা ছিল বলে আমার জানা ছিল না—

বেহারের একটা নোংরা ঘেঞ্জি দুর্গন্ধ সহরের মাঝে উঠে বহুদিনের পুরাণো একটি চিঠি থেকে গাড়োয়ানকে যাবার ঠিকানা দিলাম।

এমন করে হঠাৎ তার সামনে উপস্থিত হবার সঙ্কল্প নিয়ে মন অনেক প্রশ্নই করতে চাইছিল কিন্তু জোর করে তাকে বিরত করছিলাম।

ময়লা ইজের-পরা বেহারী মেয়েটি একটি ওড়নায় তার যৌবনের প্রথম আভাসটি অসম্পূর্ণ ভাবে আবৃত করে দরজাটি ঈষৎ ফাঁক করে গাড়ীর দিকে চেয়ে কাকে ডাকছে "এ—মনুয়া মনুয়া রে—" গাড়ী থেকে মুখ বার করে আমার ভাল-লাগাটি গোপন করবার কোন চেষ্টা না করে যতদূর পর্য্যন্ত পারা যায় তার দিকে চেয়ে আছি। খোলার চাল দেওয়া মাটির ঘরের দেয়ালটিতে কোন গ্রাম্য শিল্পীর হাতের নানা চিত্রের কারু কার্য্য দেখছি। মেয়েটি আমার নির্লজ্জতায় একটু ভ্রূকুটী করে আমার দিকে চেয়ে যাচ্ছে, আমি একটু হাসলুম। সে চক্ষে কৌতুক ও মুখে বিরক্তি এনে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিলে। গাড়ী থেকেও আর দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে এখনো গাড়োয়ানকে বলে গাড়ী ফেরাবার সময় আছে। নিজের মধ্যে একবার তলিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে—কিসের প্রত্যাশায় আজ এমন অকস্মাৎ সেখানে চলেছি? মনের কোন অতলতার কি গোপন দুরাশা আজো মরেনি? সে ফিরে ফিরে আঘাত ও অপমান করলে এমন করে তার সামনে আগের নির্লজ্জ ভিখারীর মত আবার যাচ্ছি কেমন করে। না, এ যাওয়া কোন মতেই হতে পারে না। এখনো ফেরা যায়!

তবু নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছি! গাড়ী এগিয়ে চলেছে। সহরের নোংরা সরু বদ্ধপ্রায় পথ ছেড়ে এবার অপেক্ষাকৃত ফাঁকায় এসে পড়েছি। ডান দিকে দুপহরের রৌদ্রে বহুদূরে একটা উঁচু টিপির ওপরের সাদা মন্দিরটি ঝলমল্ করছে। বাঁয়ে অপেক্ষাকৃত পয়সাওলা চাষীদের বাড়ী। সামনে কিসের গোলমাল বেধেছে। পথে ভিড় হয়ে গেছে। গাড়ী ধীরে চলেছে। চার পাঁচটা লোক একসঙ্গে তাল পাকিয়ে পথের ধারের একটি বাড়ীর উঠানের একপাশ থেকে আর পাশে ক্রমাগত গড়াগড়ি করছে দেখতে পাচ্ছি আর সমবেত পুরুষ ও নারীতে মিলে চীৎকার করছে! সমবেত লোকদের মুখে চোখে উপভোগের আনন্দ পরিস্ফুট হলেও ব্যাপারটা যে শুধু তামাসা নয়—এটা বুঝতে পারছি। কৌতুহলী গাড়োয়ান ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় একজন উত্তেজিত

দর্শক বহু উচ্ছ্বসিত গালাগালির সঙ্গে হাত পা নেড়ে যা বল্লে তাথেকে এইটুকু শুধু জানতে পারলাম যে সামনের ওই মানুষের তালটিতে দুটি ভাই-এর ধ্বস্তাধ্বস্তি চলেছে—সঙ্গে দু'একজন সাহায্যকারী হিতৈষীও অবশ্য আছে। বড় ভাই কি কাজে বিদেশে যাবার সময় তার রক্ষিতা স্ত্রীলোকটিকে ভায়ের জিম্মায় রেখে গেছেল। এখন ফিরে এসে দেখে ছোট ভাই-এর গচ্ছিত ধন ফিরিয়ে দেবার মতলব বিশেষ নেই, এবং স্ত্রীলোকটিরও যাবার বিশেষ ইচ্ছা নেই। তাই থেকে বচসা—শেষে এই ধ্বস্তাধ্বস্তি।

যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই স্ত্রীলোকটি কোথায় জানতে চাইলে একজন দেখিয়ে দিলে সে-ই ওই ঘরের ভেতর বসে আছে। গাড়ী থেকে অবশ্য এই সুন্দউপসন্দের মনোহারিণীকে দেখতে পেলাম না।

কিন্তু ভাবলাম, মন্দ কি!

নারীকে জয় করবার এই প্রথা আদিম অরণ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং আজো হচ্ছে।

কেমন সহজ পন্থা! কি সুন্দর মিমাংসা করবার উপায়!

আমরা আরো সভ্য হয়ে প্রেমকে আরো ওপরের স্তরে তুলে জটিল মনের নিজেদের কাছেই দুর্বোধ আঘাত প্রতিঘাতে হায়রাণ হয়ে বিশেষ কিছু জিতেছি কি?

মনের সব গতি বিধি কি নিজেই বুঝি?

গাড়ী থামল, গাড়োয়ান নেমে দরজা খুলে বল্লে "ইয়ে মোকাম হায় জনাব—

এখানে পৌঁছেও কেমন করে তাদের সামনে গিয়ে উঠব ভেবে পাচ্ছি না। কিন্তু গাড়োয়ানের সামনে ইতস্ততঃ করা চলে না। পুরান ভাঙ্গা একটি দেওয়ালে-ঘেরা জমীতে বেল ও শিশু গাছের ফাঁকে একটি পুরাণ বাড়ীর খানিকটা দেখা যাচ্ছে; কম্পিত বুকে গাড়োয়ানের হাতে মোট দিয়ে এগিয়ে চলেছি। সামনের ইঁদারায় কে একটি মেয়ে পিছন ফিরে জল তুলছে। আমার শব্দ শুনে ফিরে তাকিয়ে চমকে উঠল।

"এই যে চিত্রা, বড় রোগা হয়ে গেছত! মাসিমা কই? এই লাইন দিয়ে দেশে ফিরছিলাম, ভাবলাম মাসিমাকে একবার দেখে আসি, মা অনেক করে বলে দিয়েছিলেন . .

মূঢ়ের মত অকারণে নিজে নিজেই হাসছি। সামনে একটি কৃশতনু নারী নিষ্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছে সেই জানে।

এ নিস্তব্ধতা অসহ্য। আর কি কথা বলা যেতে পারে . . .

"তাহলে এ বাড়ীতে এখন আছ ? খুব গাছপালা আছে ত !' . . . এতক্ষণে চিত্রা শান্ত মৃদুস্বরে বল্লে "মা ভিতরে আছেন, চল।"

"চল"

অতীতের একটি কলঙ্কিত দিনকে কি কোন মতেই জীবন থেকে মুছে ফেলা যায় না ? তা ছাড়া আজ সর্ব্বপ্রথম চিত্রার সঙ্গে ছাড়া আর কারুর সঙ্গে কি দেখা হতে পারত না !

মাসিমা আমাকে দেখে পরলোকগত স্বামীকে স্মরণ করে খানিক কাঁদলেন। তারপর মনে পড়ল যে আমি ট্রেণে ক্লান্ত হয়ে এসেছি। চীৎকার করে বল্লেন "কোথায় গেল সে হতভাগী মেয়ে—"

হতভাগী মেয়ে নিকটেই কোথায় ছিল বোধ হয়! নিঃশব্দে সামনে এসে দাঁড়াল।

"বলি, একটা লোক ট্রেণের ধকলে আক্রান্ত হয়ে এল তাকে হাত মুখ ধোবার জল দেবার কথাও কি আমায় মনে করিয়ে দিতে হবে—

মাসিমা আরো কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন কিন্তু বোধ হয় আমার উপস্থিতি স্মরণ করে চুপ করে গেলেন! এই প্রবাসে অনূঢ়া কন্যা ও তার নিরুপায় মাতার দিন তাহলে এমনি করেই কাটছে বুঝলাম।

আমার এই হঠাৎ নির্ব্বোধের মত এখানে আসাটা শুধু অশোভনই হয়নি অশুভও হয়েছে অনেকের দিক থেকে।

কিন্তু চিত্রার মুখের দিকে চেয়ে মনে হল—মানুষের মুখ সেখানে নেই—মুখোস! স্পন্দহীন, প্রাণহীন মুখোস—তাতে আনন্দ বেদনা ক্রোধ বিরক্তির এতটুকু ছায়া পড়ে না। সে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল! আর আমি ভাবছিলাম এই পাথরের কঠিন মুখোস বিচ্ছিন্ন করে এই সুদূর মেয়েটির অশ্রুর উৎসে কি কিছুতেই ঘা দেওয়া যায় না ?

মাসিমা অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করছিলেন। কিন্তু একটি দিনের কথাকে দুজনেই সাবধানে এড়িয়ে যাচ্ছিলাম! মাসীমা বলছিলেন—

"এই বিদেশে কি আর সুখে আছি বাবা! তিনি ত পুণ্যাত্মা লোক, সকল দায় এড়িয়ে স্বর্গে চলে গেলেন—আমি হতভাগী পড়ে রইলাম। একটি পয়সা নেই, গলায় অতবড় একটি মেয়ে ঝুলছে, কি যে করব...

পায়ের মৃদুশব্দ শোনা গেল।

মাসিমাকে বাধা দিয়ে বল্লাম "ডান চোখটা কিন্তু জন্মের মত নষ্ট হয়ে গেছে মাসিমা— কেটে বার করে ফেলে পাথরের চোখ বসিয়ে দিতে হ'ল।"

পাথরের মুখোস খসে গেল বটে। মাসিমা বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে রইলেন। কিন্তু নিজের নির্লজ্জ ঘৃণিত নীচতায় সমস্ত মুখ আমার কালী হয়ে গেল।

* * * *

ভাবছি কাল দুপুরের গাড়ীতেই বিদায় নেব। এ পর্য্যন্ত যত ভুল করেছি তার মধ্যে এখানে আসাটা বোধ হয় সব চেয়ে বড় ভুল! মাসিমা আমার সম্বন্ধে হতাশ হয়ে কঠিন হয়ে উঠেছেন। চিত্রাকে দেখতেই পাইনি এই দুদিন। আমার ছোট খাট দরকারের তদারক করতে মাসিমা নিজেই আসেন। চিত্রাকে পাঠাবার প্রয়োজন সম্বন্ধে তাঁর মত বদলে গেছে।

আলো নিবিয়ে দিয়ে ঘরের ভেতর পায়চারী করছি অন্ধকারে। শিশু গাছের পাতাগুলির অর্দ্ধস্ফুট মর্ম্মরের সঙ্গে কেমন করে যেন তারাদের কম্পিত দৃষ্টি মিশে রাত্রিকে অপরূপ করে তুলেছে। দশমীর চাঁদ সবে অস্ত গেছে।

চিত্রার প্রথম আঘাতের বেদনার মধ্যে একটি উদ্ধত জ্বালা ছিল যা আমাকে দগ্ধ না করলেও উন্মত্ত করে রেখেছিল, কিন্তু এখনকার এই নীরব ঔদাসীন্যে শুধু অসীম ক্লান্তিতে ও আশায় হৃদয় পূর্ণ করে তোলে। যৌবনের ব্যর্থতার অহঙ্কার করবার মত শক্তি যেন আর নাই।

বাগানের মাঝে কিসের যেন শব্দ উঠছিল! ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরুলাম। কাছেই কোথা থেকে চাপা কান্নার শব্দ আসছিল। বিস্মিত হয়ে শব্দের দিকে একটু এগিয়ে গেলাম। বাঁধান ইঁদারার পাশে মুখ নীচু করে কে প্রাণপণে যেন প্রবল কান্নার বেগ রোধ করবার চেষ্টায় ফুঁপিয়ে উঠছিল।

আরো কাছে সরে গিয়ে ডাকলাম "চিত্রা"

সে কোন কথা কইলে না। নীরবে আমার পায়ের ওপর উবুড় হয়ে পড়ে দু হাতে আমার পা জড়িয়ে ধরল। বুঝতে পারছিলাম আমার পা দুটি উত্তপ্ত অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে যাচ্ছে, তার বিশৃঙ্খল চুল আমার চরণ বেষ্টন করে ছড়িয়ে পড়েছিল। পায়ে তার কোমল মুখের স্পর্শ অনুভব করছিলাম। কিন্তু পা নাড়তে পারলাম না—শক্তিই ছিল না।

সমস্ত দেহ মন মৃত্যুর মত নিবিড়, বিপুল আনন্দের অবসাদে শিথিল হয়ে আসে।

ধীরে নত হয়ে তার মাথার ওপর একটি হাত রেখে মৃদুস্বরে ডাকলাম "চিত্রা"

সহসা সে সবেগে আমার পা ছেড়ে উঠে চলে গেল।

পরদিন ভোর না হতেই সে ঘরে এল রুক্ষ মুখ, জ্বালাময় দৃষ্টি নিয়ে। চৌকাটের কাছে দাঁড়িয়ে সে কেন জানি না ইতস্ততঃ করছিল। বল্লাম "ঘরে এস"

সে ভেতরে ঢুকে বল্লে "তুমি আরো কতদিন থাকতে চাও জানতে এলাম। 'আরো'র ওপর জোর দেওয়াটা কেমন খারাপ শোনাল। তার মুখের দিকে একটু অবাক হয়ে চেয়ে বল্লাম "আরো কতদিন থাকলে তুমি খুশী হও চিত্রা?"

"তুমি থাকলে আমি খুশী হই এ বিশ্বাসের স্পর্দ্ধা তোমার হ'ল কোথা থেকে?" তার মুখের দিকে চেয়ে বুঝলাম এ ঠাট্টা নয়, মধুর পরিহাস নয়, এ সেই দুর্জ্ঞেয় মেয়েটির আর একটি অদ্ভুত খামখেয়াল।

"সে স্পর্দ্ধা করবার ক্ষমতা তুমিই দিয়েছ চিত্রা।"

সে তীক্ষ্ণ কঠিন স্বরে বল্লে "আমি দিই নি। তুমি নিজের অহঙ্কারে নিজেকে সে ক্ষমতা দিয়ে নীচ কাপুরুষের মত তার সুবিধা নিয়েছ। তুমি নির্লজ্জ, স্বার্থপর জানতাম কিন্তু তোমায় এতটা নীচ অমানুষ ভাবতে পারি নি। তোমার এখানে আসার কি দরকার ছিল? নির্লজ্জের মত এখানে তুমি কি কাজে বসে আছ? যাই হোক এখানে তোমার থাকাটা যে বিশেষ বাঞ্ছনীয় নয়—এ কথাটা তোমায় জানাতে এলাম—যদিও এটা তুমি নিজে বুঝতে পারলে কিন্তু আত্মসম্মান বজায় রাখতে পারতে।

"আমি তোমার কথার অর্থ ভাল করে বুঝতে পারলাম না চিত্রা, কিন্তু মনে হচ্ছে কাল রাত্রের গোটা কতক ঘটনা তুমি বড় তাড়াতাড়ি ভুলে গেছ। আমায় ক্ষমা কোরো কিন্তু কাল রাতে অমন করে পা জড়িয়ে অশ্রুপাত করে অপ্রীতির পরিচয় ভাল করে তুমি দিতে পার নি!"

সে তীব্র কণ্ঠে বল্লে "হ্যাঁ জানি, আমি আর কেউ বলে তোমায় ভুল করেছিলাম; আর তুমি এত বড় নীচ অমানুষ যে সে ভুলের সুবিধা নিতে দ্বিধা কর নি—"

"আর কে বলে ভুল করেছিলে চিত্রা, জিতেন বাবু? তাহ'লে আমারই বা কি দোষ চিত্রা? তোমার যে গভীর রাত্রে এমন করে জিতেন বাবুর পা জড়িয়ে কাঁদা অভ্যাস আছে তা আমি আর কি করে জানব!"

উপযুক্ত আঘাত দিতে পেরে অন্তরের পশুটা উল্লসিত হয়ে উঠেছিল।

চিত্রার মুখ সে আঘাতের নিষ্ঠুরতায় বিবর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু সে যথাসাধ্য তীক্ষ্ণ স্বরে বল্লে "সে কথা জান আর না জান, আমার ভাবী স্বামীর বাড়ীতে বসে

আমাদের অপমান করবার অধিকার তোমার নেই এই সোজা কথাটা তোমার জানা দরকার। তুমি আজই যাও এখান থেকে. . . ”

সে বেরিয়ে যাচ্ছিল, আমি এবার শান্ত স্বরে বললাম—

“আমি আজই যাচ্ছি চিত্রা। তোমার সমস্ত আচরণে কোন সঙ্গতি আমি খুঁজে পাই নি, কিন্তু আমি জানি তোমার মনের কোণে আমি চিরকালের মত একটি গোপন বেদনার কাঁটা হয়ে রইলাম, আর সেই আমার সান্ত্বনা।”

সে বিদ্রূপের হাসি হেসে বিবর্ণ মুখে বেরিয়ে গেল।

* * *

আজ সেই মেয়েটির চিঠি এসেছে দশ বছর বাদে। এবং সে চিঠি ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলেছি। প্রেমের চেয়ে অহঙ্কারকে আমরা বড় করেছিলাম। সে অহঙ্কার আমাদের হৃদয়কে তৃপ্ত করতে পারে নি। হৃদয় হয়ত আজও তৃষিত। কিন্তু আজকের বাতাস যে দক্ষিণের নয় উত্তরের।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য

বীরবল

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট গদ্য সাহিত্যের সমালোচনার ভার আমার হস্তে ন্যস্ত করায় আপনি একটু অন্যমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত সমালোচক বাঙলাদেশে আর যিনিই হউন, বীরবল কখনো হতে পারেন না।

প্রথমেই একটি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে নিই। যে ভাষায় আমি লিখি, অনেকে তার নাম দিয়েছেন বীরবলী ভাষা। বলা বাহুল্য কিন্তু বলা আবশ্যক যে "বীরবলী ভাষা" নামক কোন সৃষ্টিছাড়া ভাষা নেই। যে ভাষায় আর পাঁচজন লেখেন, সেই ভাষাতেই আমি লিখি, এবং সে ভাষার নাম হচ্ছে বাঙলা ভাষা। অবশ্য আমার ভাষার সঙ্গে অপরের ভাষার অল্প-বিস্তর প্রভেদ আছে। সে কারণ যদি আমার ভাষার পৃথক নামকরণ করতে হয় তাহলে কোনও ভাষাকেই আর বাঙলা ভাসা বলা চলে না। লেখার কথা ছেড়ে দিন, যদি মন দিয়ে পাঁচ জন বাঙালীর মুখের কথা শোনেন, তা হলে স্পষ্ট দেখতে পাবেন যে একজন বাঙালীর মুখের ভাষা আর একজন বাঙালীর মুখের ভাষা যমজ নয়। তা সত্ত্বেও বাঙলা ভাষা বলে একটা ভাষা আছে, যেমন দুটি বাঙালীর চেহারা ঠিক এক নয়, তা সত্ত্বেও বাঙালী জাতি বলে একটা জাতি আছে।

কেন যে আমার ভাষাকে লোকে বীরবলী ভাষা বলে, তা আমি সম্পূর্ণ জানি। পৃথিবীতে এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা একটা নাম না পেলে কোনও জিনিষই বুঝতে পারে না; বোঝা ত মাথায় থাক চিনতেও পারে না। এই শ্রেণীর লোকেরাই সব নতুন জিনিষের নূতন নামকরণ করতে সদাই ব্যস্ত। আর এই নামকরণের ব্যবসা যে সমাজে চলে, তার কারণ ছোট ছেলেরা যেমন চুষী কাঠি পেলে খুসী হয় লোকসমাজও তেমনি "নাম" পেলেই খুসী হয়। ঐ নাম চুষেই তারা সাহিত্যরস আস্বাদন করে। ইতিহাসের কাছে জানা যায় যে

কালের গতিকে মানুষের আর যে ব্যবসাই থাক্ আর যাক্ খেল্‌নার ব্যবসা কখনও যায় নি ও কখনও যাবে না। যা চিরকাল আছে তা নিশ্চয়ই চিরকাল থাক্‌বে।

কাশীর বৌদ্ধধর্ম্ম গত হয়েছে, কিন্তু কাশীর খেলনা আজও বাজারে সমান কাটছে।

আমাদের দেশের দর্শনশাস্ত্র ছুটি কথার উপর গড়ে উঠেছে। সে ছুটি কথা হচ্ছে "নাম" ও "রূপ"। সংস্কৃত ভাষায় ও-ছুটি শব্দের যাই মানে হোক্ না কেন বাঙলা ভাষায় ও দু কথার মানে স্পষ্ট। "নাম" হচ্ছে যা কানে শোনা যায়, আর "রূপ" হচ্ছে যা চোখে দেখা যায়। এই চক্ষু-কর্ণের বিবাদের নামই হচ্ছে দর্শন শাস্ত্রের বিচার। আর এ বিবাদ যে কতকাল ধরে কত সরবে চলেছিল, তার পরিচয় যাঁরা নিতে চান্ তাঁরা সর্ব্বাস্তিবাদ থেকে সুরু করে সর্ব্বনাস্তিবাদ পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত দর্শনশাস্ত্র একাগ্রচিত্তে আলোচনা করুন। তারপর তাঁরা দেখতে পাবেন যে তাঁরা গোড়ায় যেখানে ছিলেন, শেষেও সেইখানে আছেন, লাভের মধ্যে এ দীর্ঘ আলোচনার ফলে তাঁদের মাথার কালো চুল সাদা হয়ে গিয়েছে। এ বিবাদ যে কস্মিনকালে মেটেনি; তার কারণ তা মিটতে পারে না। "নাম" ও "রূপ" জিনিষ ছুটি শুধু বিভিন্ন নয় পরস্পর পরস্পরের সম্পূর্ণ বিরোধী। যাঁরা "নাম" শুনেই নিশ্চিন্ত হন তাঁরা "রূপ" কখনো চোখে দেখতে পান না, কেননা দেখতে চান না। অপর পক্ষে রূপ যাঁদের চোখে পড়ে না, তাঁরাই হন নামভক্ত। আমার এ মত যদি ঠিক হয় তা হলে আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি যে বীরবলী ভাষা বলে কোনও ভাষা নেই, কিন্তু বীরবলী ঢং বলে একটা জিনিষ আছে। আমার লেখার যে গুণে পাঠকরা সে লেখার প্রতি অনুরক্ত ও বিরক্ত—সে গুন হচ্ছে তার রূপ। ইংরাজী ভাষায় তার নাম হচ্ছে manner অথবা mannerism। আমার কথার ভিতর আর যে রসই থাক্ একটি রস নেই, এবং সে রসের নাম ভক্তি-রস। এখন জিজ্ঞাসা করি, যে লেখকের বাণীকে আমি সকল মন দিয়ে ভক্তি করি—অর্থাৎ যাঁর প্রতিভার প্রতি আমার পরা প্রীতি আছে,—তাঁর কাব্যের সমালোচনা কি বীরবলী ভঙ্গিতে করা সঙ্গত না সম্ভব? আর বীরবলী ঢং বাদ দিয়ে বীরবলের লেখার কি সার্থকতা! এ কার্য্যের ভার আপনার দেওয়া উচিত ছিল আমার alter ego প্রমথ চৌধুরীর উপর। কেননা কোনও খ্যাতনামা বঙ্গ সাহিত্যিক তাঁকে "রবিকুল ধুরন্ধর" এই উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

কিন্তু তিনিও এ কার্য্যে ব্রতী হতে সাহসী হতেন কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তাঁর হাতে একখানা পুরোনো দলিল আছে, যার থেকে তিনি মনে করেন যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করবার অধিকার তাঁর কোন অনুরক্ত ভক্তের নেই। বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জনৈক বন্ধুকে লেখেন যে:—

"আপনার সমালোচনার কথাটা শুনে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছে। "সংক্ষিপ্ত" সমালোচনার একটা ডেফিনিশন তৈরি করেছি,—যে সমালোচনা সম্যক্‌রূপে ক্ষিপ্ত হলে গ্রন্থকারকে সম্যকরূপে ক্ষিপ্ত করে তোলে, তাকেই বলে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।"

রবীন্দ্রনাথের কোনও অনুরক্ত ভক্ত যদি তাঁর কাব্যের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করতে উদ্যত হন তাহলে উপরোক্ত কথা কটি শুনলে তাঁর হৃৎকম্প উপস্থিত হয় কি না, বলুন ত?

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ও কথা কটি রসিকতাচ্ছলে বলেছেন। কিন্তু রসিকতার ভিতর যে সত্য কথা থাকতে পারে না, এমন কথা আর যার মুখ দিয়েই বেরুক আমার মুখ দিয়ে কখন বেরুবে না।

একবার ভেবে দেখুন ত রবীন্দ্রনাথের গদ্য-সাহিত্য বল্‌তে কি বোঝায়? সাহিত্যের কোনও বিশেষ অংশ নয়, সমগ্র সাহিত্য তাঁর গদ্যের দখলে রয়েছে। নাটক, নভেল, প্রহসন, ছোটগল্প, জীবনচরিত, ভ্রমণবৃত্তান্ত, খেয়াল, সাহিত্য, সমালোচনা, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ তাঁর হাত দিয়ে আজীবন অনর্গল বেরিয়েছে, এমন কি prosody, philology ও তাঁর হাত এড়িয়ে যায় নি। আর তাঁর প্রতিভা যে বস্তুকেই স্পর্শ করেছে তাকেই জীবন্ত করেছে। আমি যখন রবীন্দ্রনাথের এই জগৎজোড়া মনের কথা ভাবি, তখন Faust-এর কথা চুরি করে বল্‌তে ইচ্ছা যায়—"Infinite Nature, where shall I grasp thee!"

শুনতে পাই যে চীন দেশীয় লেখকেরা—একটি পত্রকে একটি ছত্রে, এবং একটি ছত্রকে একটি পদে সংহত করবার কৌশল জানেন। বাঙলা দেশের লেখকদের রচনারীতি ঠিক এর বিপরীত। একটুখানি কথাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে যিনি যত বড় করতে পারেন তিনি তত বড় লেখক। তাই শকুন্তলা-তত্ত্ব ওজনে শকুন্তলার চাইতে দশগুণ ভারি—আর সে তত্ত্বের লেখকও সাহিত্যিক হিসেবে মহা ভারিক্কে বলে গণ্য। আমার অবশ্য অন্তরে ততটা সাহিত্যিক

গ্যাস্ নেই যার কৃপায় মনোজগতে ওরূপ বেলুন ওড়াতে পারি। অপর পক্ষে, কি আমার, কি প্রমথ চৌধুরীর, রচনারীতির দৈনিক হিক্বতও জানা নেই। ফলে রবীন্দ্রনাথের পদ্যসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আমাদেরও কারও কলম থেকে বেরুবে না।

আপনি যে আমার স্কন্ধে উক্ত ভার ভুল করে চাপিয়েছেন সে কথাটা বোধ হয় এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন। এ ভুল যে আপনি কেন করেছেন তা আমি জানি। আপনি চেয়েছিলেন প্রথমত আমার একটি লেখা এবং দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আর একটি লেখা। এই দুটি ইচ্ছার যোগ দিয়ে যে ইচ্ছাটি তৈরি হয়েছিল, আপনার অনুরোধটি হচ্চে সেই যুক্ত ইচ্ছাটিরই বাহ্য প্রকাশ। আপনার মনে এ দুটি স্বতন্ত্র ইচ্ছার কি করে যোগাযোগ ঘটেছে তাও আমি আন্দাজ করতে পারি।

দশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙলায় "বস্তুতন্ত্রতা" কথাটা নিয়ে একটা হুজুগ ওঠে এবং অনেক পণ্ডিত সাহিত্যিক তৎকালে এই বলে গৌড়ীয়রীতিতে চীৎকার করতে আরম্ভ করেন যে রবীন্দ্রনাথের লেখায় বস্তুতন্ত্রতা নেই। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ব্বোল্লিখিত বন্ধুটিকে লেখেন যে—

"আমার পালা ত প্রায় শেষ করিবার সময় হইল—এখন বকশিষ পাই আর নাই পাই আপনাদের সকলকে সেলাম করিয়া এবারকার সভা হইতে বিদায় লইব। সকল শ্রোতার মধ্যে একটি শ্রোতা অদৃশ্য হইয়া বসিয়া আছেন, তিনি যদি খুসি হইয়া থাকেন ত নিত্যকালের কাছে আমার দাবী রহিয়া গেল—কোনো প্রচণ্ড পণ্ডিত বা কোনো দাম্ভিক মূর্খ তাহা মারিতে পারিবে না।"

"আমার পালা ত শেষ করিবার সময় হইল"—রবীন্দ্রনাথের সে কালের এ ধারণাটি যে অলীক তার প্রমাণ এ চিঠি লেখবার পরেই তিনি পদ্যে "বলাকা" ও গদ্যে "ঘরে বাইরে" লিখেছেন। তাঁর পালা শেষ করবার সময় দশ বৎসর পূর্ব্বেও আসে নি আজও আসে নি, আশা করি আর দশবৎসর পরেও আসবে না।

তারপর তিনি যে অদৃশ্য শ্রোতাটির কথা বলেছেন, যিনি খুসি হলে নিত্য কালের কাছে তাঁর দাবী রয়ে যাবে, সে অদৃশ্য শ্রোতাটি ভৌতিক জগতের কোনও অজানা দেশে বসে নেই কিন্তু তিনি বসে আছেন প্রত্যেক যথার্থ শ্রোতার অন্তরে। আর আবহমানকাল শ্রোতা পরম্পরার অন্তরে সে শ্রোতাটি অদৃশ্য ভাবে অধিষ্ঠান করবেন এবং রবীন্দ্রনাথের বাণী শুনে তিনি নিত্য কাল খুসি হবেন।

"প্রচণ্ড পণ্ডিত ও দাম্ভিক মূর্খেরা যে তাহা মারিতে পারিবে না" এ কথা এতই সত্য যে তা বলাই বাহুল্য। ও জাতীয় বীর পুরুষরা যদিচ কিছুই মারতে পারে না, তা হলেও জীবনে ও মনে যা কিছু সত্য ও সুন্দর তাকে মারতে তারা নিয়ত ঘোর চেষ্টা করে। বোধ হয় তাঁদের স্বধর্ম্মমত হচ্চে এই যে, ফলে তাঁদের কদাচন অধিকার না থাকলেও কর্ম্মে ত আছে।

মরুকগে ফল, সকলেরই সকল কর্ম্মে যে অধিকার আছে এমন কথা আর যে শাস্ত্রেই বলুক গীতায় বলে না। এ মতটা হচ্চে একেলে ডিমোক্রাটিক এবং এই ডিমোক্রাটিক যুগে এ হেন কথার প্রতিবাদ করা কঠিন। তবে সত্যের খাতিরে এ কথাটা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্চি যে কাউকে প্রচণ্ড ভাবে ও দাম্ভিকতা সহকারে অনধিকারচর্চ্চা করতে দেখলে আমার হাসিও পায় বিরক্তিও ধরে। এই হাসি ও এই বিরক্তিই হচ্চে বীরবলী লেখার প্রাণ। এই বিরক্ত হাসি হচ্চে একরকম সাহিত্যিক অস্ত্র। সে অস্ত্র যার গায়ে পড়ে তার পাণ্ডিত্য ও মূর্খতা অক্ষুণ্ণ থাকলেও তার প্রচণ্ডতা ও দাম্ভিকতা কতক পরিমাণে নিস্তেজ হয়।

আপনার জানা আছে যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আততায়ীদের দেহে এ অস্ত্র নিক্ষেপ করতে আমি কখনও কুণ্ঠিত হই না। আপনার পূর্ব্বোক্ত ইচ্ছাদ্বয়ের সংপ্লবের অন্তর্নিহিত কারণ হচ্ছে আপনার এই পূর্ব্ব জ্ঞান। যারা রবীন্দ্রনাথের বাণী-যজ্ঞের বিঘ্নকারী, যে অস্ত্র দিয়ে তাঁদের উপদ্রব শান্ত করা যায়, সেই অস্ত্র কি ইচ্ছামত বীণাযন্ত্রে পরিণত করা যায়? বীণার তার অবশ্য লোকের গায়ে ফোটান যায় অর্থাৎ সে তারকে ছুঁচ করা যায়, কিন্তু ছুঁচকে বীণার তার কিছুতেই করা যায় না। আমার মতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আলোচনা তিনিই করতে পারেন যিনি সাহিত্যের বীণার আলাপ করতে জানেন। বীরবলের "অঙ্গুলি বীণাগুণে তরল" নয়।

বীরবলের কথা ছেড়ে দিন, আমার বিশ্বাস প্রচণ্ড পণ্ডিত ও দাম্ভিক মূর্খ ব্যতীত বাঙলার কোন সাহিত্যিকই রবীন্দ্রনাথের সমালোচক হতে পারেন না। কারণ আমরা পদ্যই লিখি আর গদ্যই লিখি, আমরা সকলেই রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ না করি, তাঁকে সকলেই অনুসরণ করছি। প্রথমত ভাষার কথাটাই ধরা যাক্। আমি এ যুগের এমন কোনো কবিকে জানিনে যিনি হেম নবীনের ভাষাতে কবিতা লেখেন। অপর পক্ষে আমি এমন কোনও গদ্য লেখককেও জানিনে যিনি বিদ্যাসাগরী অথবা বঙ্কিমী ভাষায় গদ্য লেখেন। এর কারণ

ভাষার রাজ্যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। সে মুক্তিলাভ করে আমরা তার সদ্ব্যবহার করি কি অসদ্ব্যবহার করি তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আমাদের মনের শক্তি ও চরিত্রের উপর। সে যাইহোক্ রবীন্দ্রনাথের দৌলতে আমরা যে বাঙলা ভাষার স্বরাজ্য লাভ করেছি সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, বাঙলার নব কবিদের কণ্ঠে নূতন সুর ও নূতন ছন্দ রবীন্দ্রনাথই দান করেছেন। আর আমাদের গদ্য লেখকদের বুকে ও মুখে নূতন প্রাণ ও নূতন স্ফূর্ত্তি তিনিই এনে দিয়েছেন। আমাদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার অর্থ আত্মবিচার। আমরা যদি মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারি যে, আমাদের মন ও ভাষার উপর রবীন্দ্রনাথের মন ও ভাষার কতটা প্রভাব আছে, আর সেই আবিষ্কৃত সত্য স্পষ্ট করে বলতে পারি, তা হলে তাই হবে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের যথার্থ সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথের এ জাতীয় সমালোচনা করবার অধিকার আমার আছে এবং ভবিষ্যতে তা করবার ইচ্ছাও আছে। অবশ্য সে সমালোচনা পড়ে অনেকে বলবেন, এ ত রবীন্দ্রনাথের আলোচনা নয় বীরবলের আত্মকথা। যে ব্যক্তি নিজের মন জানে, সেই জানে যে মানুষের "স্ব" পদার্থটি কত পর-পদার্থ দিয়ে গড়া। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে এই সত্য সম্বন্ধে অন্ধভাবেই লোকে "নিজত্ব" বলে মনে করে।

আর একটি কথা। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে আমরা সকলে তাঁর অনুকরণ না করি তাঁর অনুসরণ করছি। অনুসরণ করছি বটে কিন্তু তাঁর কত পিছনে যে পড়ে আছি সে জ্ঞানও আমাদের থাকা প্রয়োজন, নচেৎ আমাদের অন্তরে দাম্ভিকতা ঢুকে যাবে। কথাটা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

সংস্কৃত ভাষায় অলঙ্কারের একখানি গ্রন্থ আছে যার নাম "ধ্বন্যালোক।" এই নামের গুণেই আমি ও গ্রন্থের মহাভক্ত। উক্ত গ্রন্থের রচয়িতা আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য ধ্বনি ও আলোক এ দুটি শব্দ যে অর্থেই ব্যবহার করুন না কেন আমি ওদের সোজা মানে বুঝি sound and light. অলঙ্কার শাস্ত্রকে কলমের এক টানে physics এর ভিতরে এনে ফেলাটা একটি অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। জড় বৈজ্ঞানিক ইউরোপও কখনো এমন কাজ করতে সাহসী হয় নি।

এখন আমার বক্তব্য এই যে আমাদের মত লেখকদের পদ্যে যদি "ধ্বনি" থাকে আর গদ্যে যদি "আলোক" থাকে তাহলেই আমরা পরম কৃতার্থ হই। রবীন্দ্রনাথের লেখায় যুগপৎ দুটি জিনিষই সমান থাকে।

এখন যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে heat গেল কোথায়? আমি বলব,

সে বস্তু গেছে তার স্বস্থানে অর্থাৎ পলিটিকসের ভিতর, অতএব সাহিত্যের বহির্ভূত লেখায় অর্থাৎ সংবাদপত্রের ভিতর। বলা বাহুল্য যে, যার নাম পলিটিক্স তার নামই সংবাদপত্র। ওর একটির বিরহে অপরটি বাঁচে না। ওর একটি অপরটির সহমরণে যায়।

Physics আর দুটি শক্তির সন্ধান দেয়, যা আনন্দবর্দ্ধনের সময় আবিষ্কৃত হয় নি, যথা Electricity ও Magnetism। এ দুটি শক্তিও রবীন্দ্রনাথের লেখায় এক সঙ্গে বিরাজ করছে। তাঁর গদ্য ও পদ্যের ভিতর প্রভেদ এই যে তাঁর পদ্যে magnetism প্রধান, আর তাঁর গদ্যে Electricity.

ৈজ্য ক শ চ.

ট্রৈ ল্লো ল্ল ন্দ্র

'ল্ল লে ্ ?

পাষাণী

শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৫

অমরেশ আজ কয়েক দিন ধরিয়া তাহার ডাক্তারখানার জন্য একজন ভাল ডাক্তারের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল,—আজও সে নিভা ও বিভাকে গায়ত্রীর কাছে পাঠাইয়া দিয়া সেই যে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল, ফিরিল যখন—তখন সন্ধ্যা।

মৈনু গাড়ী লইয়া দরজায় তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। গাড়ী দেখিয়া অমরেশ ভাবিল, বিভা ও নিভা বুঝি-বা এতক্ষণে ফিরিয়া আসিল,—মৈনুর দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এসেছে ওরা ?

মৈনু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, জি না,—আপনি চলুন।

আসেনি ? চল্। বলিয়া অমরেশ আর ঘরে না ঢুকিয়া গাড়ীতে চড়িয়া বসিল।

গায়ত্রী ইহারই মধ্যে রান্না চড়াইয়া দিয়া তাহাদের টিনের সেই ছোট রান্না ঘরের মেঝেয় বসিয়া নিভার সঙ্গে গল্প করিতেছিল। দরজায় গাড়ী দাঁড়াইবার শব্দ হইতেই নিভা বলিয়া উঠিল, ওই ! এতক্ষণে এলেন বুঝি আমার দাদাটি !

গায়ত্রী বলিল, না, ও রাস্তার গাড়ীর শব্দ।

কিন্তু নিভার কথাই সত্য হইল। দেখিতে দেখিতে অমরেশ তাহাদের উঠানে আসিয়া ডাকিল, বংশী !

নিভা হাসিতে হাসিতে বলিল, দেখলে দিদি ?

গায়ত্রীও ঈষৎ হাসিয়া দরজার কাছে অগ্রসর হইয়া আসিতেই অমরেশ জিজ্ঞাসা করিল, বংশী কোথায় ? আছে ত বাড়ীতে ?

হাঁ। বলিয়া গায়ত্রী আঙুল বাড়াইয়া তাহার ঘরখানা দেখাইয়া দিল।

দাদাকে দেখিয়া বিভা রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল,

অমরেশের হাতে ধরিয়া বলিল, বাবা রে বাবা, কতক্ষণ থেকে বসে আছি আমরা!

অমরেশ কিন্তু তাহার সে কথার কোনও উত্তর না দিয়াই বংশীর ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

নিভা ডাকিল, বিভা এ'দিকে আয়!

দিদির রুক্ষ কণ্ঠস্বর শুনিয়া বিভা তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু সে ছোট মেয়েটা অকস্মাৎ তাহার উপর দিদির এই রাগের কারণ বুঝিতে না পারিলেও গায়ত্রী বুঝিল। বলিল, এতে ত তোমার রাগবার কারণ কিছু নেই নিভা? ভাল যদি কারও না লাগে?

নিভা হঠাৎ অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া কহিল, তোমার কাছে কিছু বলবার জো নেই দিদি,—এমন দুষ্টু মেয়ে আমি কখ্‌খনো দেখিনি।

গায়ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, কেমন?

তোমার মতন। বলিয়া নিভা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

রান্নাঘরের চৌকাঠ ধরিয়া গায়ত্রী দাঁড়াইয়াছিল, নিভার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, ভাল। কিন্তু দুষ্টু বলেও যেন একবার করে দেখা দিও।

কথাটা শুনিয়া নিভা কোনও জবাব দিল না, মুখ তুলিয়া একবার হাসিল মাত্র। সুন্দর সুস্নিগ্ধ আলোকের একটা মাদকতা আছে। বাহিরের চাঁদের আলো ফুটা টিনের প্রবেশপথে ঘরে ঢুকিয়া নিভার বস্ত্রাঞ্চলের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল,—অনতিদূরে উনানে আগুন জ্বলিতেছে,—তাহার উপর বিকসিত অম্লান পুষ্পের মত নিভার সুন্দর মুখের সে হাসিটি বড় সুন্দর দেখাইল। গায়ত্রী আনত মুগ্ধ নয়নে কিয়ৎক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল,—মুখ দিয়া তাহার একটি কথাও বাহির হইল না। এমন হাসি আর কাহাকেও কোন দিন সে হাসিতে দেখিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইল না।

এমন সময় বংশীকে সঙ্গে লইয়া অমরেশ ধীরে ধীরে রান্না ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, আমরা এবার চলি দিদি!

এসো। বলিয়া গায়ত্রী নিভার দিকে ফিরিয়া তাকাইতেই নিভা হেঁট হইয়া তাহাকে একটি প্রণাম করিল। গায়ত্রী নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ছি, ছি, এ তোমার ভারি অন্যায় ভাই,—এ কি! এ কি!

নিভা উঠিয়া দাঁড়াইলে গায়ত্রী তাহাকে দেয়ালের একটুখানি আড়ালে টানিয়া লইয়া গিয়া তাহার দুইটি হাতে ধরিয়া বলিল, অযোগ্যের পায়ে মাথা নোয়ান পাপ।

নিভা তাহার আরও বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, সে পাপটুকু অর্জ্জন যদি না করতুম দিদি, তাহলে সারারাত আজ আর হয়ত আমার ঘুম হতো না। বলিয়াই সে আর অপেক্ষা না করিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, দাদা, চল।

অমরেশ রান্নাঘরের দিকে ফিরিয়া বলিল, বংশীকে নিয়ে চলুন দিদি, ও আজ ওইখানেই খাবে।

দরজার পাশ হইতে গায়ত্রী বলিল, বা আমি যে রান্না চড়িয়েছি।

অমরেশ বলিল, বেশ করেছ। তোমরা খেয়ে ফেলো।

নিভা তাহার পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল, তাড়াতাড়ি জিব কাটিয়া অমরেশের হাতের একটা আঙুল ধরিয়া টানিয়া দিল। হিন্দু ব্রাহ্মণের বিধবা,—রাত্রে তাহাকে আহার করিতে নাই, কথাটা তাহার মনে ছিল না, এতক্ষণে নিভার ইঙ্গিতে তাহা বুঝিতে পারিয়া নিজেও একটুখানি লজ্জিত হইয়া বলিল, আচ্ছা না, এক্ষুনি ও ফিরে আসবে।

বিভা সর্ব্বপ্রথমে গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছিল, নিভা তাহার পাশে গিয়া বসিল, তাহার পর অমরেশ ও বংশী উঠিয়া বসিলে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

গাড়ী যতক্ষণ চলিতে লাগিল, একমাত্র বিভা ছাড়া আর কেহ কোনও কথা বলিল না। বিভা আপনমনেই কত কি বলিতেছিল,—সে সব কথার অর্থ এবং সঙ্গতি কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। নিভা বার কয়েক অমরেশ ও বংশীর মুখের পানে তাকাইল, কিন্তু দুজনেই গাড়ীর দরজার বাহিরে তাকাইয়া গম্ভীরমুখে বসিয়াছিল। মনে হইল, বংশী যেন কি এক গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িয়াছে।

গাড়ী হইতে নামিয়া অমরেশ বংশীকে প্রথমে তাহার বসিবার ঘরে লইয়া গিয়া দুজনে দুইখানা চেয়ারে মুখোমুখি বসিয়া পড়িল। অমরেশ বলিল, চা খাবি বংশী?

বংশী ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল। বলিল, না।

আমার কিন্তু এক পেয়ালা খেতেই হবে।—কৈলাস! কৈলাস! বলিয়া অমরেশ হাঁকিতে আরম্ভ করিল।

কৈলাসের পরিবর্ত্তে নিভা আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, কি বলছিলে দাদা?

অমরেশ বলিল, চা। বিকেল থেকে আমার খাওয়া হয়নি ভাই,—শীগ্‌গীর।

নিভা চলিয়া গেলে অমরেশ বলিল, এইবার কাজের কথা।—নে, পড়ে দ্যাখ্‌ এই চিঠি খানা। বলিয়া পকেট হইতে খামের একখানা চিঠি বাহির করিয়া সে তাহার হাতের কাছে ছুঁড়িয়া দিল।

বংশী পড়িয়া দেখিল, চিঠিখানি গিরিডি হইতে অমরেশের এক বন্ধু অমরেশকে লিখিতেছে। সেখানে অমরেশের যে বাড়ীখানি আছে, সেদিন দৈবাৎ একখানা মোটর-লরির সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া পথের ধারের একটা দেওয়ালের কিয়দংশ ভাঙিয়া পড়িয়াছে তাড়াতাড়ি সেটুকু মেরামত করাইয়া না ফেলিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। যাঁহারা ভাড়াটিয়া ছিলেন, এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁহাদের একজন চাকরের ডান পায়ে একটুখানি আঘাত লাগিয়াছে,—এবং সেই ভয়ে তাহার পরদিনই তাঁহারা বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই পত্রখানি পাইবামাত্র অমরেশের একবার সেখানে যাওয়া প্রয়োজন!

অমরেশ বলিল, শরীরটাও আমার বেশ ভাল লাগছে না, গিরিডিতে দিন কতক কাটিয়ে এলে হয়ত সেদিক দিয়েই উপকার একটুখানি হতে পারে।

চোখের সুমুখে চিঠিখানি ধরিয়া বংশী তখনও নাড়াচাড়া করিতেছিল।

অমরেশ বলিল, আমি ভাবছি কাল রাত্রের ট্রেণে চলে যাই। যেতেই ত হবে—

বেশ। বলিয়া বংশী ঘাড় নাড়িল।

অমরেশ একটুখানি খুশী হইয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল, আমি ত ভাবছিলুম বুঝি-বা তুই না বলে দিস্।—ভয় হচ্ছিল তোকে বলতে।

বংশী বলিল, কেন?

কেন? বলিয়া অমরেশ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমার বাড়ী ছেড়ে যাওয়া মানে তোর উপর কতখানি দায়িত্ব জানিস্?

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই অমরেশ একবার বংশীর মুখের পানে তাকাইল, কিন্তু তাহার মুখ হইতে কোনও জবাব না পাইয়া সে আবার বলিতে লাগিল, বাড়ীর নীচে এক ডাক্তারখানা খুললুম,—দেখেছিস্ ত? কম্পাউণ্ডার, ডাক্তার, ক্যাসিয়ার, চাকর, দারোয়ান—কাল সকাল থেকে সব কাজে লাগবে। তাদের দেখাশুনা করতে হবে তোকে।

বংশী বলিল, করব।

অমরেশ কহিল, আবার শুধু তাই নয়। নিভা বিভা রইলো বাড়ীতে। তাদের দেখ্‌তে হবে।

বংশী এবার চুপ করিয়া রহিল।

অমরেশ বলিল, ও-বাড়ীতে থাক্‌লে কিন্তু অসুবিধা হবে।

এইবার বংশী কথা কহিল; বলিল, অসুবিধা আর কি? একটুখানি আসা-যাওয়া কর্‌তে হবে—

অমরেশ কহিল, তা, না হবে না। তার চেয়ে ওই যে রাস্তার ওপরে গলির সুমুখে আমার সেই ছোট বাড়ীখানা খালি হয়েছে আজ তিন চার দিন, ওতে আর ভাড়াটে বসাব না,—ওখানে তোদের উঠে আসতে হবে কাল সকালেই।

বংশী প্রথমে রাজী হইল না, বলিল, কি দরকার,—তোর আর এমন কত দেরী হবে গিরিডিতে?

অমরেশ কিছুতেই ছাড়িল না, বলিল, দেরী যতই হোক, বাড়ীতে একটা বেটা ছেলে থাকবে না,—অতদূরে থাকা তোর চল্‌তেই পারে না।

অগত্যা বংশী রাজী না হইয়া পারিল না। চায়ের সরঞ্জাম লইয়া নিভা ঘরে প্রবেশ করিতেই বংশী উঠিয়া দাঁড়াইল।

নিভা একটুখানি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইল, কিন্তু বংশীর আচার ব্যবহারে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই,—টেবিলের উপর চায়ের আসবাবগুলি নামাইয়া দিয়া সে হেঁটমুখে পেয়ালার উপর চা ঢালিতে লাগিল।

বংশী বলিল, আজ আমি চল্‌লাম।

অমরেশ কহিল, বোস্। আরও কথা আছে।

বংশীর আর যাওয়া হইল না, পুনরায় সে ফিরিয়া বসিল।

চা যে বংশী খাইবে না নিভা সে কথা জানিত না—পূর্ব্বে সতর্ক করিয়াও কেহ দেয় নাই, কাজেই প্রথম পেয়ালাটি সে তাহার দাদার হাতের কাছে ধরিয়া দিয়া দ্বিতীয়টী বংশীর দিকে আগাইয়া দিল।

বংশীও আর কিছু আপত্তি করিল না, এবং ইহাতে সে অনভ্যস্ত নয়,—আপত্তি করিবার কিছু ছিলও না।

নিভা চলিয়া গেলে বংশী জিজ্ঞাসা করিল, কি কথা?

চায়ের পেয়ালা তখনও শেষ হয় নাই, বলিল, কাল সকালে কৈলাস যাবে। দুটো গরুর গাড়ী নিয়ে জিনিষ পত্র সব তাতে দু'তিনবারে বোঝাই করে দিস্—

বংশী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ওরে, কাজ নেই অমরেশ!

কথাটা অমরেশ ভাল বুঝিতে পারিল না, বলিল. কি ?

বংশী বলিল, ওখানে বেশ আছি আমরা, তোর কাজের কোনও ক্ষতি হবে না—তুই যা।

তাই হয় ? তাহলে যাওয়া আমার বন্ধ হলো। বলিয়া অমরেশ তাহার চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগিল।

বংশী বলিল, তবে তাই দিস্ পাঠিয়ে। বলিয়াই সে আর অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া গেল।

পরদিন জিনিষপত্র লইয়া নূতন বাড়ীতে তাহাদের উঠিয়া আসিতে বেলা প্রায় এগারটা বাজিল। আহারাদির আয়োজন হইয়াছিল অমরেশের বাড়ীতে।

রত্নেশ্বর, বংশী, অমরেশ, বিভা ইত্যাদি সকলের খাওয়া দাওয়া চুকিয়া গেলে, নিভাকে নিভৃতে পাইয়া গায়ত্রী হাসিতে হাসিতে কহিল, এ কথা কাল ত' আমায় বল্‌লেই পার্‌তে নিভা ?

নিভা বলিল, কি কথা দিদি ?

থাক্, সে কথা পরে হবে,—তুমি খেতে বসো। বলিয়া গায়ত্রী হেঁসেলে ঢুকিয়া নিজেই তাহার ভাত বাড়িতে বসিল।

নিভাও তাড়াতাড়ি একটা থালা লইয়া গায়ত্রীর জন্য যেখানে পৃথক রান্না হইয়াছিল, সেইখানে গিয়া বসিল। বলিল, আমিও তোমার খাবার সাজাই দুজনে একসঙ্গে বসব দিদি ?

তাহাই হইল। দুজনে একসঙ্গে খাইতে বসিয়া নিভা বলিল, এবার বল দিদি, কি কথা, আমি তোমায় কাল বল্‌লেই পার্‌তুম।

গায়ত্রী কোনও কথা না বলিয়া নিভার মুখের পানে তাকাইয়া একবার হাসিল।

নিভা কহিল, তোমাদের এই নূতন ঘরে আনবার কথা ?

গায়ত্রী বলিল, সে ত বটেই, তা ছাড়া আরও আছে।

নিভা হাত নাড়িয়া কহিল, কিন্তু দিদি, সত্যি বল্‌ছি আমি এর কিছু জানতুম না।

আর যেটা জান্‌তে ? বলিয়া গায়ত্রী হাসিতে লাগিল।

নিভা বলিল, তোমার কথা আমি বুঝতে পার্‌ছিনে দিদি।

বুঝ্‌বে। নাও খেয়ে নাও আগে। বলিয়া গায়ত্রী আর কোনও কথা না বলিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া ভাত মাখিতে আরম্ভ করিল।

নিভা কহিল, বেশ হলো দিদি, এমন যে হবে,—তোমায় যে এত শীগ্‌গির এত কাছে পাব, তা আমি জানতুম না।

গায়ত্রী তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, জান্‌তে হয় না নিভা, প্রয়োজন হয়েচে তাই মিলেছি। প্রয়োজনের দিন ফুরিয়ে যাবে,—আবার সরে পড়ব।

নিভা বলিল, না দিদি, এ প্রয়োজনের দিন যেন না ফুরোয়।

সে কথা মানুষে বল্‌তে পারে না নিভা।

তাহার পর আর কোনও কথা হইল না। নিঃশব্দে দুজনে বসিয়া আহার করিতে লাগিল, কিন্তু কিছু বলিবার হয়ত দুজনেরই ছিল,—উপযুক্ত কথার অভাবে কাহারও তাহা প্রকাশ করা হইল না।

আহারাদি শেষ করিয়া গায়ত্রী বলিল, এবার আমি যাই নিভা, জিনিষগুলো গুছিয়ে নিই গে।

নিভা বলিল, ভারি ত জিনিষ দিদি তাই গোছাবে! দাঁড়াও, আমিও যাব না বুঝি?

নিভাও তাহার সঙ্গে গেল। না আছে দুটা আলমারি, না আছে তসবির, না আছে ট্রাঙ্ক, চেয়ার-টেবিল খাট-পালঙ্কের ত' কথাই নাই! গরীবের সংসার,—কৈলাস আনিয়াই সেগুলি গুছাইয়া রাখিয়াছিল,—তাহাদের আর বিশেষ কিছুই করিতে হইল না।

দোতলা এই নূতন বাড়ীটিতে তাহাদের তিনটি লোকের জন্য ঘরের অভাব ছিল না। উপরের ঘরগুলা দেখিতে দেখিতে খোলা একটা জানালার সুমুখে দাঁড়াইয়া গায়ত্রী বলিল, প্রকাণ্ড ঘর।

নিভা তাহার কোনও জবাব দিল না, কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, আচ্ছা, কি কথাটা তুমি তখন বল্‌তে বল্‌তে থেমে গেলে?

কখন? বলিয়া গায়ত্রী তাহার কাঁধে হাত দিয়া ফিরিয়া তাকাইল।

নিভা বলিল, সে-ই যে আমাদের ওখানে,—মনে পড়ে না?

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া গায়ত্রী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, নাঃ!

বেশ ভোলা মন ত' তোমার? বলিয়া নিভা একবার তাহার মুখের পানে তাকাইল।

গায়ত্রী তাহার দুই কাঁধে দুই হাত রাখিয়া সস্নেহে তাহার দুইটি আয়ত দীর্ঘ চক্ষুর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া কহিল,—দুনিয়ায় মাত্র দুটো জিনিস আমার বড় সত্যি বলে মনে হয় নিভা,—ভালবাসা আর মরণ।

হঠাৎ সেকথা কেন আজ তোমার মনে হলো দিদি ?

তোমার এই চোখ দুটো দেখে'।

চোখ ? কেন ?

মানুষের চোখ দেখে আমি তার মনের কথা টের পাই। ব'লিয়া গায়ত্রী হাসিতে লাগিল।

নিতান্ত সরলা বালিকার মত নিভা প্রশ্ন করিল, সত্যি দিদি ? কই বল ত' আমার মনের কথা ?

তাই কি আর কেউ পারে নিভা ? ও এম্‌নি বললাম আমি।

গায়ত্রী আবার হাসিতে লাগিল।

নিভার মুখের হাসি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, বলিল, তুমি পার দিদি,—কিন্তু আমার কাছে বললে না। বেশ !

গায়ত্রী হাসি থামাইয়া কহিল, নিজে যে কথা জানি, সে কথা ত' অন্যের কাছে জেনে নেবার কোনও দরকার হয় না নিভা ! তবে, আমার এই একটি কথা তুমি মনে রেখো,—যে জায়গায় আজ তুমি এসে' দাঁড়িয়েছ, এখানে ভুল যেন কোন দিন কিছু করে' বসো না।

নিভা জিজ্ঞাসা করিল, ভুল সত্যি কেমন করে' জান্‌ব দিদি ?

গায়ত্রী বলিল, মনকে জিজ্ঞাসা করো।

মন যদি সত্যি না বলে ?

গায়ত্রী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, মিথ্যা বলতে সে জানে না,—সত্যই তার ধর্ম্ম।

নিভা আরও কি যেন প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, কিন্তু গায়ত্রী হঠাৎ অন্য কথা পাড়িয়া বসিল। বলিল, এত বড় ঘরে যে আমাদের টেনে আন্‌লে নিভা, কিন্তু এবার আমরা থাকি কোথায় বল ত ?

নিভা আবার হাসিল। ব'লল, থাক্‌তে যদি না-ই পার দিদি,—খানিকটা ভাড়া দেবে ?

বেশত'। নিতে চায় কেউ ?

হ্যাঁ। আমিই নেব দিদি। বলিয়া গায়ত্রীর মুখের পানে আড়-চোখে তাকাইয়া নিভা মুখ টিপিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

(ক্রমশ)।

চৈতী-হাওয়া

নজরুল ইস্‌লাম

হারিয়ে গেলে অন্ধকারে—পাইনি খুঁজে আর,
আজ্‌কে তোমার আমার মাঝে সপ্ত পারাবার।
আজ্‌কে তোমার জন্মদিন,—
স্মরণ-বেলায় নিদ্রাহীন
হাত্‌ড়ে ফিরি হারিয়ে যাওয়ার অকূল অন্ধকার।
এই-সে-হেথাই হারিয়ে গেছে কুড়িয়ে-পাওয়া হার!

অস্ত-ঘাটের হারামাণিক বোঝাই-করা না'
আস্‌ছে নিতুই ফিরিয়ে-দেওয়ার উদয়-পারের গাঁ।
ঘাটে আমি রই ব'সে—
আমার মাণিক কই গো সে?
পারাপারের ঢেউ-দোলানী হান্‌ছে বুকে ঘা,
আমি খুঁজি ভিড়ের মাঝে চেনা কমল-পা।

শূন্য ছিল নিতল দীঘির শীতল কালো জল,
কেন তুমি ফুট্‌লে সেথা ব্যথার নীলোৎপল?
আঁধার দীঘির রাঙ্‌লে মুখ,
নিটোল ঢেউএর ভাঙ্‌লে বুক,
কোন্ পূজারী নিল ছিঁড়ে? ছিন্ন তোমার দল
ঢেকেছে আজ কোন্ দেবতার কোন্ সে পাষাণ-তল?

বইছে আবার চৈতী হাওয়া, গুম্‌রে ওঠে মন,
পেয়েছিলাম এম্‌নি হাওয়ায় তোমার পরশন!
তেম্‌নি আবার মহুয়া-মৌ
মৌমাছিদের কৃষ্ণা বৌ
পান ক'রে ঐ ঢুল্‌ছে নেশায়, দুল্‌ছে মহুল-বন,
ফুল্‌-সৌখীন দ'খিণ হাওয়ায় কানন উচাটন!

পড়ছে মনে টগর চাঁপা বেল চামেলি যুঁই
মধুপ দেখে যাদের শাখা আপ্‌নি যেত নুই'!
হাস্‌তে তুমি দুলিয়ে ডাল,
গোলাব হ'য়ে ফুট্‌ত গাল,
থল্‌কমলী আঁউরে' যেত তপ্ত ও-গাল ছুঁই'
বকুল শাখা ব্যাকুল হ'ত, টল্‌মলাত ভুঁই!

চৈতী রতির গাইত গজল বুল্‌বুলি-বৌ বর,
দুপুর বেলায় চবুতরায় কাঁদ্‌ত কবুতর!
ভুঁই-তারকা সুন্দরী
সজ্‌নে ফুলের দল ঝরি'
থোপা থোপা লাজ ছড়াত দোলন্‌-খোঁপার পর,
ঝাঁজাল্‌ হাওয়ায় বাজ্‌ত উদাস মাছ্‌রাঙার স্বর!

পিয়াল-বনায় পলাশ ফুলের গেলাস-ভরা মৌ,
খেত বঁধুর জড়িয়ে গলা সাঁওতালিয়া-বৌ।
লুকিয়ে তুমি দেখ্‌তে তাই,
বল্‌তে, "আমি অম্‌নি চাই!"
খোঁপায় দিতাম চাঁপা গুঁজে, দিতাম এনে মৌ,
হিজল-শাখায় ডাক্‌ত পাখী বউ গো কথা কও!

ডাক্‌ত ডাহুক, জল-পায়রা, নাচ্‌ত ভরা বিল,
জোড়া ভুরু ওড়া যেন আস্‌মানে গাঙ্‌-চিল।
হঠাৎ জলে রাখ্‌তে পা
কাজ্‌লা দীঘির শিউরে' গা
কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ত মৃণাল, ফুট্‌ত কমল-ঝিল,
ডাগর চোখে লাগ্‌ত তোমার সাগর-দীঘির নীল!

উদাস দুপুর কখন্ গেছে, এখন বিকাল যায়,
ঘুম জড়াল ঘুম্‌তী নদীর ঘুমুর-পরা পায়।
শঙ্খ বাজে মন্দিরে,
সন্ধ্যা আসে বন ঘিরে,
ঝাউ-এর শাখায় ভেজা-আঁধার কে পিঁজেছে হায়!
মাঠের বাঁশী বন-উদাসী ভীম-পলাশী গায়।

পীত করবী ফুটল বৃথাই, আমরা শুকাতে!
আম-মুকুলের গুঁজিকাঠি দাও কি খোঁপাতে?
ডাবের শীতল জল দিয়ে
মুখ মাজ কি আর প্রিয়ে,
প্রজাপতির ডানা-ঝরা সোনার টোপাতে
ভাঙা ভুরু দাওকি জোড়া তেমনি শোভাতে?

বউল ঝ'রে ফলেছে আজ থোলো থোলো আম,
রসের-পীড়ায়-টস্‌টসে'-বুক ঝুরুছে গোলাব-জাম!
কামরাঙারা রাঙ্‌ল ফের
পীড়ন পেতে ঐ মুখের,
স্মরণ ক'রে চিবুক তোমার বুকের তোমার ঠাম
জাম্‌রুলে রস ফেটে পড়ে—হায় কে দেবে দাম?

করেছিলুম চাউনি চয়ন নয়ন হ'তে তোর,
ভেবেছিলুম গাঁথ্‌ব মালা, পাইনে খুঁজে ডোর!
ভরল আমার মানস-জল
সেই চাহনী নীল্ কমল,
কমল-কাঁটার ঘা লেগেছে মর্ম্ম-মূলে মোর,
বক্ষে আমার দুলে আঁখির সাত-নোরি-হার লোর!

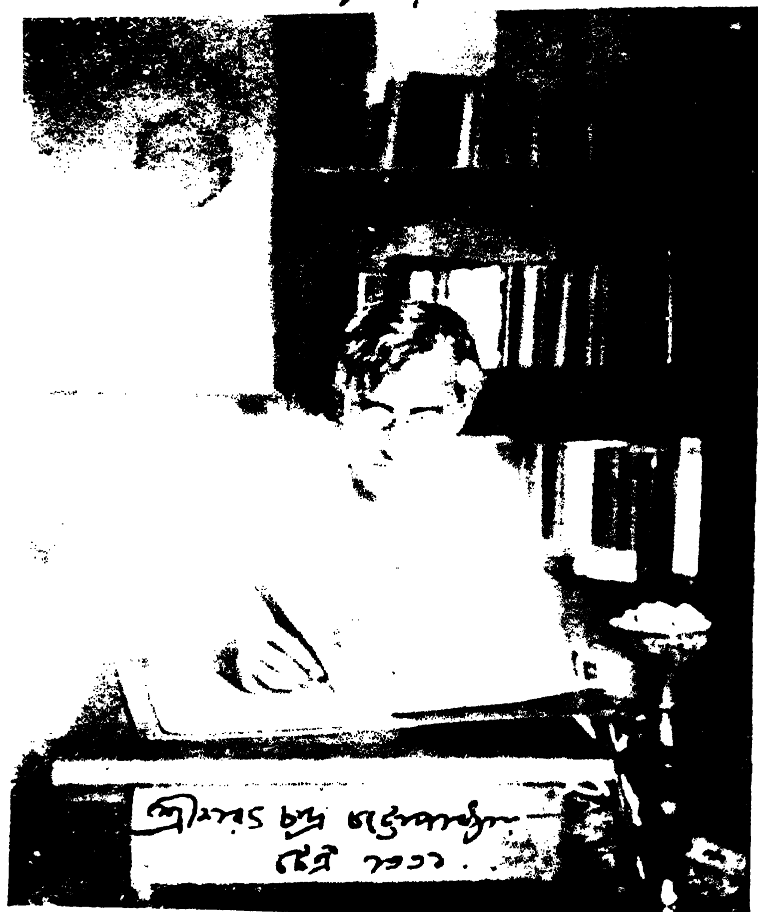
তরী আমার কোন্ কিনারায় পাইনে খুঁজে কূল,
স্মরণ-পারের গন্ধ পাঠায় কম্‌লানেবুর ফুল!
পাহাড়্‌তলীর শাল-বনায়
বিষের মত নীল ঘনায়,
সাঁজ পরেছে ঐ দ্বিতীয়ার চাঁদ—ইহুদি দুল,
হায় গো আমার ভিন্-গাঁয়ে আজ পথ হয়েছে ভুল!

কোথায় তুমি কোথায় আমি—চৈতে দেখা সেই!
কেঁদে ফিরে যায় যে চৈত, তোমার দেখা নেই!
কণ্ঠে কাঁদে একটি স্বর—
কোথায় তুমি বাঁধ্‌লে ঘর?
তেম্‌নি ক'রে জাগ্‌ছ কি রাত আমার আশাতেই?
কুড়িয়ে-পাওয়া কূলে খুঁজি হারিয়ে-যাওয়া খেই!

পারাপারের ঘাটে প্রিয় রাখ্‌নু বেঁধে না'
এই তরীতে হয়ত তোমার পড়্‌বে রাঙা পা।
আবার তোমার সুখ-ছোঁওয়ায়
আকুল দোলা লাগ্‌বে না'য়,
এক তরীতে যাব মোরা আর-না-হারা গাঁ।
পারাপারের ঘাটে প্রিয় রইনু বেঁধে না'!

হুগলি,
২৩শে চৈত্র, ১৩৩১

কল্লোল



PANI PRESS, CALCUTTA



তৃতীয় বর্ষ

২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, সন ১৩৩২ সাল

সম্পাদক—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

সহ-সম্পাদক—শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ

কল্লোল পাবলিশিং হাউস

২৭ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রেল-ঘুম

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

[কবিতাটি চলন্ত রেলগাড়ীর শব্দ অনুসরণ করিয়া আবশ্যকমত দ্রুত এবং ধীরে আবৃত্তি করা আবশ্যক]

টং টং ভোঁ ভস্
টু-ডাউন ছাড়ে, বাস্।
ভস্ ভস্ চক্কর্
চলে, খায় টক্কর।
ঘ্যোস্ ঘ্যোস্ ঘ্যেস্ ঘ্যোস্,
গদিটায় দিই ঠেস্।
ঘেস্ ঘেস্, খেটে খেটে.
ঘুমে আসে চোখ এঁটে।
হুস্ হুস্ সাঁই সাঁই,
বায়ুর বিরাম নাই;
উড়ে চলে কোন্ ঠাঁই ?
আয়ুর বিরাম নাই,
থামিবে সে কোন্ ঠাঁই ?
(ছোট ষ্টেশন)
ধকা ধাঁই ধকা ধাঁই,
এখানে থামিতে নাই।
ঝকা ঝকা ঝাঁকি ঝাঁকি,—
অমন করুণ আঁখি!
কেমনে সে দিল ফাঁকি,
আর তারে পাব নাকি ?

ধক্ ধক্ ধক্কা,
সব কিরে ফক্কা ?
ছুটোছুটি ছুটোছুটি
কাশী আর মক্কা,—
কে জানে কাহার তরে
কোথা লাগে ধাক্কা ?

(পুলের উপর)

গস্ গড়্ গুড়্ গুম্,
গুড়্ গুড়ু গুড়্ গুম্,
বর্ষার মরসুম,
নদীজলে বড় ধূম,
গুড়্ গুম্ গুড়ু গুম্,
ঝাঁপ দিয়ে পড়্লুম,
সে অতলে ডুব্লুম,
গুম্ গুম্, ঘুম ঘুম,
নদীতলে নিঝুম,
নিরঝুম, চিরঘুম।—

(পুল পার)

গুড়্ গুম—ঘচ্চো
ঘচ ঘচ ঘচ্চো—
ওখানে কি কচ্চ ?
বাঁধা পথে সচ্ছ !
ঘচাঘচ্ ঘত্তোর,
লোহাবাঁধা পথ তোর,—
কি সাত কি সত্তোর।
মাঝে মাঝে 'দোত্তোর !'

প্রলাপ সে মত্ত-র।
উঁচু নীচু গর্ত্তর
পথ, নয় পথ তোর ;
লোহাবাঁধা পথ তোর,—
লোহাবাঁধা পথ তোর !

(পয়েণ্টস্‌ ও ক্রশিং)

ঘচাঘচ্‌ ঘটা ঘাঁই,
ঘটা ঘটা ঘটা ঘাঁই,
সে পথে ত আর নাই !
পেরেছি গো, পেরেছি গো,
সে পথটা ছেড়েছি গো।
ঘস্‌ ঘাস্‌ ঘস্‌ ঘাস্‌
কি আরাম—ব্যস্‌ ব্যস্‌ ;
পায়ে মোর পথ বশ
হাতে বাঁধা হাত-বশ।—
—ঘস্‌ ঘ্যাস্‌ ঘট্‌কা,
ফের লাগে খট্‌কা।
কি বল্‌চে ? "দোস্তর—
লোহাবাঁধা পথ তোর,
লোহাবাঁধা পথ তোর।"

ঘটাঘর্‌ ঘেস্‌ ঘাস্‌,
দিতে পার ঘুস্‌ ঘাস ?
মাপ হ'তে পারে ফাঁস্‌।
ঘস্‌ ঘস্‌ ধক্কো,
কিসের কি দুঃখ ?
বিচার ত সূক্ষ্ম,

পেতে পার মোক্ষ ও,
—ঘসে' ঘসে' মোক্ষ।—

(দূরে সিগন্যাল ডাউন)

ঘস্ ঘস্ ঘস্ ঘস্,
কি আরাম বস্ বস্।—
ঘস্ ঘস্ ঘর্চ্চান্,
দূরে ছায় হাতছান।
কেমনে দিগন্তে,
কে পেরেছে জান্তে?
আগুবাড়ি আন্তে
এই পথশ্রান্তে
লাগে হাত ছান্তে!
ঘস্ ঘস্ ঘস্রাম্
কোথা চির বিশ্রাম?

(ছোট ষ্টেশন)

যেটা যায়, সেটা যায়,
হেথা নয় হেথা নয়।
যায় যায় গোটা গোটা,
হায় হায় কোথা কোথা?
যুরসা সেই ত,
আবার সে এই ত।
সেটা যায়, যেটা যায়,
হেথা নয় হেথা নয়!

ঝকা ঝকা ঝন্ ঝন্,
ওগো এ কি বন্ধন!

পথের কি বন্ধন ;
চিরসাথী ক্রন্দন !
ঝকা ঝকা ঝাঁকি,
আগাগোড়া ফাঁকি।
ঝাঁক কই, ঝাঁক কই,
এ পথের ফাঁক কই ?
হা হা হা হা ঘণ্ডোর—
লোহাবাঁধা পথ তোর,
লোহাবাঁধা পথ ভোর।

ধা তিন্ তা তিন্ তা,
কিসের বা চিন্তা,
ঝকাঝকি বকাবকি
কেটে এল দিনটা।
ধকা ধাঁই ধাত্রি,
ছেয়ে আসে রাত্রি।

(আপ্ ট্রেন পাস্ করিতেছে)

ওকি ওই সম্মুখে
ধেয়ে আসে মোর বুকে,
খুন মাখি লাল আঁখি
আনপথ যাত্রী !
ঘচাঘচ্ ঘ্যাঁচ্চ,
হাঁচি পড়ে হ্যাঁচ্চ,—
ঘরদ্বার চারধার,
ভেঙ্গে চুরে চুরদার্
ধূমকেতু দুর্ব্বার,
কোথা ছুটে যাচ্চ ?

সুনীল করুণ আঁখি
দেখ্‌তে কি পাচ্চ ?
এ প্রলয়ে এ আঁধারে
ওগো কোথা যাচ্চ ?

(পুলের উপর)

গুড় গম্ গুড়্ গম্,
গুড়্ গুড়্ গম্ গম্,
নিশীথিনী চম্‌চম্ ;
উপরে জমাট মেঘ
নীচে নদী দুর্দ্দম,—
গড়ে ভাঙে হর্দ্দম ;
তড়িৎ চাবুকে ছোটে
ঝঞ্ঝা তুরঙ্গম,
বারি ঝরে ঝম্ ঝম্ ;
পৃথ্বীটা ঘেঁটে গোটা
পায়ে ছেনে কর্দ্দম
গুড়, গম্ গুড়, গম্ :—

(পুল পার)

গুড়্ গম্—ঘচ্চ্ ই,
ঘচ ঘচ ঘচ্চ্ ই,
কোথা নেই কিচ্ছুই !
গগন ভরিয়া তারা
বাগান ভরিয়া জুঁই।
তবু ও দিগন্তে,
আমারি কি পন্থে ?

(লাল সিগ্‌ন্যাল্‌)

কে ওই রাঙায় আঁখি
কটমট দম্ভে?

(সিগ্‌ন্যাল্‌ ডাউন)

ঘস্‌ ঘাঁই ঘস্‌ ঘাঁই,
আর নাই, আর নাই,
ভয় নাই বাধা নাই,
স্থির আঁখে ওই ডাকে
সবুজের রোশ্‌নাই,
আর আপশোষ নাই।

(থামিবার পূর্ব্বে ষ্টেশনে প্রবেশ)

ঢক্কোর ঢক্কোর,
ঘটাঘটা ঢক্কোর,
চোখ্‌ বুঁজে পথ খুঁজে
কত খাই টক্কোর।
ধিকি ধিক্‌ ধিকি ধিক্‌
এই পথ ঠিক ঠিক্‌।
ধুকু ধুক্‌ ধুকু ধুক্‌,
কত ভুল কত চুক্‌!
ধুক্‌ ধুকু ধুক্‌ ধুকু
পারিনে এ পথটুকু!
ধুকু ধুকু ধক্কাৎ,
থাম্‌লাম নির্ঘাৎ
মৃত্যুর সাক্ষাৎ।
যমরাজ খোল খাতা,
—এ কি, এ যে কোলকাতা?

শরৎচন্দ্র

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ভূমিকা

"জানি"—এই কথার মধ্যে যে একটা অহঙ্কার প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যায়, বয়সের সঙ্গে তাহা উপলব্ধি করিতেছি। এখন "জ্ঞানমনন্তমের" অর্থও ক্রমেই পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে।

অনেকে মনে করেন শরৎচন্দ্রকে মানুষ-হিসাবে আমার খানিকটা জানা আছে। অপরের চেয়ে জানিবার সুযোগ হয়ত আমার কিছু বেশী ঘটিয়াছে; কিন্তু তবুও ভয় হয়; মনে হয়, হয়ত' বা যেটুকু জানি—তাহাও সত্য হয় নাই!

মানুষকে সত্য করিয়া চেনার মত কঠিন কাজ, বোধ করি আর নাই। অন্যকে জানার মধ্যে নিজস্ব ধারণা এতখানি আসিয়া পড়ে যে, যাহা বাস্তব তাহা অপ্রকাশই থাকিয়া যায়!

সৌভাগ্য বশতঃ শরৎচন্দ্র বঙ্গ-সাহিত্যের একটা দিক এখনো উজ্জ্বল করিয়া আছেন। জীবনের চরকায় সূতা কাটার কাজ এখনো তাঁর শেষ হয় নাই!

অসম্পূর্ণকে প্রকাশ করার লোভ, সকল হিসাবেই অমার্জ্জনীয় কিন্তু।

শরৎচন্দ্র আত্ম-প্রকাশ করিতেছেন ক্রমেই তাঁহার অপূর্ব্ব গ্রন্থমালার মধ্য দিয়া। সেখানে পাঠকের সহিত বোঝা-পড়া প্রত্যক্ষ। তৃতীয় ব্যক্তির সমাগম না হওয়াই ভাল। তাই তাঁহাকে ঐদিক দিয়া বুঝিবার প্রয়াস করিব না।

মানুষ হিসাবে তাঁহাকে আশৈশব যেমন পাইয়াছি—তাহারই কয়েকটি রেখা-পাত করিব মাত্র।

আমার অভিজ্ঞতার মূল্যটুকু আমার কাছে অমূল্য; কিন্তু অন্যের কাছেও ঠিক তাহাই হইবে—এমন কথা বলিবার স্পর্দ্ধাও রাখি না।

বাল্য জীবন

শৈশবে আমরা শরৎকে আমাদের খেলার দলের দলপতিরূপে পাইয়াছিলাম। ডাকাতের দলের সর্দ্দারের দোষ-গুণ বিস্মৃতিতে শিশু হৃদয় যেমন যুগপৎ আনন্দ-

বিষাদে মথিত হইয়া উঠে,—আজও আমাদের দলপতির কথা স্মরণ করিলে অন্তরের মধ্যে তেমনি যেন ওর্ষ ব্যথার সুর বাজিতে থাকে!

একদিকে ইস্পাতের মত কঠিন—অন্যদিকে নবনী-কোমল। অন্যায়কে পদ-দলিত করিবার দুর্দ্ধর্ষ সংকল্প, আবার দুর্ব্বলের পরম কারুণিক আশ্রয়দাতা!

বালক-শরৎ রুদ্র তায় বজ্রের মতই কঠোর ছিল। সময়ে সময়ে মনে হইত সে হৃদয়-হীন; যাহারা সেই দিকের পরিচয় পাইল—তাহারা তাহার শত্রুই রহিয়া গেল; কিন্তু অশেষ স্নেহ-ভাজনের দলেরও ত' অভাব নাই! শিশু-স্মৃতির মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে, শরতের একটি খেলার কথা স্পষ্ট মনে পড়ে; সেটি ফড়িং পোষার ব্যাপার।

কাঠের বাক্সের মধ্যে আকন্দ গাছের বিচিত্র-বর্ণের রাঙ্গা-ফড়িং হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গা-ফড়িং, গাধা-ফড়িং, কেরাণী-ফড়িং প্রভৃতির সমাবেশ।

প্রত্যহ বাক্স পরিষ্কার করা, ফড়িং-এর দলকে রুচিভেদে নানাবিধ আহার্য্য দান, তাহার পর তাহাদের লড়াই এবং কসরৎ দেখা।

আমরা ছিলাম জোগাড়ের দলে। ফরমাস মত ঘাস-পাতা সংগ্রহ করিয়া দিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিতাম। কাজে ভুল হইলে দল হইতে বিতাড়িত হইবার ভয় আমাদের শিশু-চিত্তকে নিত্য ব্যাকুল করিয়া রাখিত।

আর একটি খেলাও আমরা করিতাম, একটুখানি জায়গায় একখানি করিয়া বাগান করা। তাহাতে যুঁই-বেলা, চন্দ্রমল্লিকা, দোপাটি—শীতকালে থোকা থোকা গাঁদা ফুটিয়া আমাদের মন আলো করিত।

বাগানের মাঝখানে একটি ছোট্ট গর্ত্ত, তাহার উপর একখানি পাতলা ভাঙ্গা—কাচের আবরণ। গর্ত্তের মধ্যে জলে বহুবর্ণের ফুল—পাতা—কাগজের হাঁস। সাধারণতঃ কাঁচের উপর মাটি দেওয়া থাকিত। কোন বিশিষ্ট দর্শক আসিলে সেই যাদুঘরের মাটি অকস্মাৎ অপসৃত করিয়া—তাঁহাকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ ভাবিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিতাম।

আমাদের বাড়ীর কর্ত্তারা ছিলেন বড় কড়া। ছেলে-মেয়েদের স্নেহ কি আদর দিলে তাহাদের পরকাল নষ্ট হইবে মনে করিয়া শাসনের মাত্রা সকল সময়েই সপ্তমে চড়িয়া থাকিত।

তাঁহাদের প্রীতি পাইবার উপায় ছিল বই-শ্লেট লইয়া বাহিরের বাড়ীর দাওয়ায় বসিয়া প্রতি প্রভাতে তারস্বরে চীৎকার করা, এবং সন্ধ্যায় চণ্ডীমণ্ডপে একটি ম্লান প্রদীপের চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া বসিয়া পাঠ-অভ্যাস।

আমাদের খেলা-ধূলার ব্যাপার তাঁহাদের চক্ষুর অগোচরে চলিত। গোচর হইলে বয়স হিসাবে শাস্তির ব্যবস্থা হইত।

বহুদিন চণ্ডীমণ্ডপের কোণে এক পায়ে দাঁড়াইয়া চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়াছি, মনে পড়ে।

এই কড়া শাসনের মধ্যে ফাঁক বাহির করিবার প্রতিভা বোধ করি, শরতের ছিল অদ্বিতীয়। ঘুড়ি উড়ানর নিষেধ, শাস্ত্রের সমুদ্র-যাত্রার অনুশাসনের চেয়ে আমাদের বাড়ীতে একটুও কম ছিল না।

কিন্তু শরতের সুতা-ভরা 'লাটাই' আমাদের ছিল চির-কামনার বস্তু! তাহার সুতার "মান্‌ঝা" বিশ্বজয় করিত এবং তাহার "ডোরিদার" ঘুড়ি—নীল আকাশের কোলে 'লাট' খাইয়া -'গোঁৎ' মারিয়া—আমাদের হৃদয়কে বিলসিত করিয়া তুলিত।

কর্ত্তারা যে একেবারে সন্দেহ করিতেন না, তাহাও নহে; কিন্তু শরৎকে হাতে-নাতে ধরিবার কোন উপায় ছিল না। তাঁহারা ডালে ডালে যাইলে—সে পাতায় পাতায় চলিত।

ধরা পড়িলে নিঃশব্দে বীরের মতই শাস্তি গ্রহণ করিত; কিন্তু কোন দিন সে ঘুড়ি উড়াইতে পশ্চাদ্‌পদ হয় নাই!

শাসন-তন্ত্র অক্ষুণ্ণ-অব্যাহত রাখিবার ভার ছিল মুসাই-মানিকের উপর, দুটি বিশ্বস্ত প্রভু-ভক্ত পুরাতন চাকর। সূর্য্যের চেয়ে বালির তাত বেশী— একথা আমাদের শিশুকাল হইতেই বহু ব্যথার সহিত উপলব্ধি করিতে হইয়াছিল।

যাহারা শাসনের শাস্তির দিকের ভার বহন করে তাহাদের লঘু গুরু জ্ঞান থাকে না; তাহাদের বিচার করিবার রুচি পর্য্যন্ত লোপ পায় এবং তাহারা শাস্তির ভক্ত হইয়া পড়ে। তখন তাহারা নরমের যম হয়।

দলপতির তূণে দুষ্টামির শরের অভাব ছিল না। "গলির দোরের" পেয়ারা গাছটির ফলগুলির উপর কর্ত্তাদের ছিল তীব্র নজর। হিসাবের খাতায়—গাছে কয়টি ফল রহিল—এবং কয়টি পাড়া হইয়াছে—তাহাও বোধ করি নোট করা থাকিত। গাছের পেয়ারাগুলির গায়ে নেকড়ার আবরণ! এত কড়াকড়ি মধ্যেও পেয়ারা চুরি করা শরতের প্রায় নিত্য-কর্ম্ম ছিল। অপর পক্ষকে বিব্রত করায় সে আনন্দ পাইত। ধরা সে কোনদিন পড়িত না; কিন্তু চুরি যাওয়ার প্রতিবিধানের জন্য আমাদের ভাগ্যে "কুটুরি-বন্ধ" ঘটিত। এটি ছিল

"সলিটারি সেল"! অন্ধকার সেঁৎসেতে ঘর, চামচিকে এবং ইঁদুরের লীলা-ভূমি। এ ঘরে বন্ধ করিলে আমরা প্রমাদ গণিতাম।

এই ঘরে বন্ধ হয় নাই এমন সুশীল সুবোধ বালকও বোধ করি বাড়ীতে ছিল না। তবে "উধোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে" খুবই ঘটিত। এবং উধো-বাবাজি যথা-সময়ে সরিয়া পড়িয়া নিষ্কৃতি লাভ করিত!

প্রকৃত-পক্ষে, বুধো হইবার দুর্ভাগ্য বিধাতাপুরুষ আমার ললাটেও লেখেন নাই। এই গুরু-ভার বহন করিবার জন্য আমাদের এক জেঠ্‌তুতো দাদা ছিলেন।

এই নিরীহ মানুষটি সময়ে সময়ে কিরূপ বিপর্য্যস্ত হইতেন—তাহার আভাষ দিতে ইচ্ছা করিতেছে।

পাঠ-অভ্যাসের সান্ধ্য-বৈঠকে আমি তখনো পুরা-দস্তুর ভর্ত্তি হই নাই। তাহার কারণ সবে মাত্র বর্ণ-বোধ শেষ করিয়া 'কর, খল' পড়িতেছিলাম। আমার সেই নিরীহ দাদাটি কিন্তু ব্যাকরণের সন্ধি পর্য্যায়ে সন্ধি-পূজার জীবটির অবস্থা-প্রাপ্ত। দিন দুই আগে, জগৎ+নাথ এর যোজনা "জগন্নাথ" করিয়া বড়দাদার কাছে ঝাউএর চাবুকের রসাস্বাদ করিয়াছিলেন। পাঠে মন দিতে গেলেই কেমন তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইত এবং তাহা হইলেই, অভিনব উপায়ে হাতে মাথা রাখিয়া তিনি নিদ্রিত হইয়াও পাঠের কতকাংশ অনর্গল আওড়াইয়া যাইতে পারিতেন!

আমার অগ্রজ দাদা এবং শরতের সেটা ছাত্রবৃত্তির বৎসর—তাই নিরন্তর পাঠে মন আছে, এমন দেখানর প্রয়োজন হইত। বলা বাহুল্য যে এই বয়সে পাঠে মন কিছুতেই বসিতে চাহে না!

ঘরের মশা খাইতে চাম্‌চিকে আসিয়া প্রদীপের উর্দ্ধে চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকিলে এই দুই চঞ্চলমতি বালকের পক্ষে স্থির থাকা আর কিছুতেই সম্ভবপর হইত না। ফরাসের তলায় চাম্‌চিকে-শিকারের জন্য সযত্নে তৈয়ারি লাঠি লুকান থাকিত এবং সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত হইলে—তাহারা বন্‌-বন্‌ ঘুরিয়া উঠিত।

একদিন চাম্‌চিকে-বধের আগ্রহাতিশয্যে একজনের লাঠি প্রদীপে আসিয়া ঠেকিল। পলকে ঘর অন্ধকার! এবং শিকারী বীর দুইজন ঘর হইতে পা-টিপিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া সটান্ রান্না-ঘরে গিয়া পড়িতে-পড়িতে অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ করায়, খাইতে বসিয়া গেলেন।

বাহিরের দাওয়ায় নেয়ারের খাটে কর্ত্তা ঘুমাইতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মুলাইকে ডাক দিতে সে কুপি লইয়া আসিয়া দেখে,—ফর্সা

বিছানার উপর প্রদীপ উপুড়, তাহার পার্শ্বে একজন কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রিত—প্রদীপের তেল সাদা চাদরের উপর দিয়া গড়াইয়া চলিয়াছে।

ইহা তো অমার্জ্জনীয় অপরাধ! অনুমান হনুমানের মত একলম্ফে স্থির করিল যে ঘুমাইতে ঘুমাইতে ঐ দাদাটি এই সকল অপকর্ম্ম করিয়াছেন।

মুসাইএর কান মলায় গাত্রোত্থান করিয়া তিনি হতভম্ব হইয়া রহিলেন; কিন্তু সেদিনের পালা এইখানেই শেষ হয় নাই।

বাহিরের বাড়ীতে ঘোড়ার আস্তাবল ছিল। একটি ঘৃত-পক্ক পক্ষিরাজ-নন্দন সেখানে শিশুকুলের ভীতি উৎপাদন করিয়া অস্থির চাঞ্চল্যে বল্গিত-গতির প্রতিমূর্ত্তি-রূপে বিরাজ করিত।

কর্ত্তার হুকুমে সেইখানেই পাঠের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল এবং এই নিরপরাধ অপরাধীটি উদ্যত চাটের সন্নিধানে অচলের মত অটল হইয়া বক্ষের উপর গঙ্গা-যমুনার ধারা বহাইয়া, মা সরস্বতীর সেবায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিল!

ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার শাসন-পদ্ধতির স্বরূপ চিন্তা করিলে—অবাক হইয়া যাইতে হয়।

জানি না, অন্য বাড়ীতে এমন হইত কি না!

* * *

ভাগলপুরে অধ্যয়ন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে শরৎ কিছুদিন তাহাদের দেশ দেবানন্দপুরে ছিল। কয়েক বৎসর হইল শরতের সঙ্গে ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন হইতে হাঁটিয়া গিয়া তাহাদের বাড়ী-ঘর দেখিয়া আসিয়াছি। সেগুলির জীর্ণ-দশা এবং পরহস্তগত।

সেই সময়ে ঠাকুরমার অভিভাবকত্বে তাহার তথা-কথিত দুষ্ট বুদ্ধি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে স্ফূর্ত্তি পাইবার সুযোগ পাইয়াছিল। সে সকল কথা আমার প্রত্যক্ষ নয় বলিয়া এখানে বলা উচিত মনে করি না। তবে তাহার কতক পরিচয় "দেবদাসের" পাঠক গ্রন্থের আরম্ভে পাইবেন।

কর্ত্তারা তাহার বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় না লইয়াই তাহাকে একেবারে ছাত্র-বৃত্তি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিলেন। এই সময়ে পাঠ লইয়া তাহাকে কিছুদিন বিশেষ বিব্রত হইতে হইয়াছিল; কিন্তু সে কিছুতেই দমিয়া যাইবার পাত্র নয়।

এই সময়ে আমিও তাহার সহিত স্কুলে যাইতাম, সে কেবল স্কুলে যাওয়া

আসার অভ্যাস করিবার জন্যই বোধ হয়। তাই তাহাদের ঘরেই আমার দিন কাটিত। আমার জন্য একদিকে একখানি বেঞ্চ ঠিক করা ছিল। সকল সময়ে আমার কোমরে কাপড় থাকিত না, তাহা বেঞ্চের উপর পাতিয়া মধ্যে মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িতাম, মনে পড়ে!

বেশ স্পষ্ট স্মরণ হয়—শরতের তখন "ভাল ছেলের" খ্যাতি ছিল; পড়ুয়ার দলে তাহার প্রতিপত্তি অসীম ছিল। এই সময়ে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কিছু-দিন ধরিয়া এমন একটি কাজ করিয়াছিল যাহা আজকালকার স্কুলে একেবারে অসম্ভব না হইলেও একান্ত কঠিন বটে!

স্কুলে একটি জীর্ণ বাক্স-ঘড়ি (clock) ছিল। বোধকরি সেটি কাহারো দান। সেই ঘড়িটিকে ঠিক করিয়া চালানর মত হুঁসিয়ার পণ্ডিত তখন স্কুলে ছিলেন না। এ বিষয়ে তখনকার সবচেয়ে বয়সে ছোট পণ্ডিত মহাশয়ের উপর হেড্-পণ্ডিত মহাশয়ের অশেষ বিশ্বাস ছিল। তিনি নিয়মিত ঘড়িতে দম দিতেন, ঘড়ি মিলাইতেন। কিন্তু এই কাজে পণ্ডিত মহাশয়ের যেন নিজের উপর বিশেষ আস্থা ছিল না। এই ঘড়িটি লইয়া তিনি সকল সময়ে যেন ভয়ে ভয়ে একটু বিব্রত হইয়া থাকিতেন। শেষ পর্যান্ত এমন দাঁড়াইয়াছিল যে ঘড়ি চলার দোষ আর ঘড়ির দোষ বলিয়া হেড্ পণ্ডিত মনে করিতেন না—যেন ছোট পণ্ডিত মহাশয়ের অক্ষমতার পরিচয় মাত্র!

বালকদিগের বিষয়ের একেবারে মর্ম্মে পৌছিবার অসাধারণ গুণটি বোধকরি প্রকৃতি দত্ত।

ঘণ্টা দুই কাজ হওয়ার পর স্কুলের চাকর জগুয়া "পান্ শাল্লা" ঘরে ভাল করিয়া তামাক সাজিলেই পণ্ডিত মহাশয়েরা সে-যেন কিসের টানে সেই দিকে সদলে ধাবিত হইতেন। বোর্ডের উপর অজগরের মত লম্বা গুণ-ভাগ এবং টেবিলের উপর বেতের শব্দে ছাত্রকুল সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত—কিন্তু তাহার পরই মহানন্দ! তখন কে কাহাকে দেখে!

প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘরেই ঘড়িটি থাকিত। ছাত্রগণ কি জানি কাহার বুদ্ধিতে, কাঁধে চড়া-চড়ি করিয়া সেই অবসরে ঘড়িটিকে দশ পনর মিনিট করিয়া আগাইয়া দিতে লাগিল। এই ব্যাপার কয়েক দিন চলিলে তাহাদের সাহস বাড়িয়া গেল, ক্রমে আধ ঘণ্টা—পরে ঘণ্টা খানেক করিয়া আগাইয়া দেওয়া হইত।

স্কুলের ঘড়িতে তিনটার সময় চারিটা বাজিয়া যায়; অভিভাবকগণের মনে

যেন সন্দেহের ছায়াপাত হইতে লাগিল; কিন্তু হেড্‌ পণ্ডিত বলিলেন, আমি ঘড়ি ধরিয়া কাজ করি। ইহার চেয়ে অধিক কর্ত্তব্যপরায়ণতা, মানুষ মানুষের কাছে আশা করিতে পারে না।

ছোট পণ্ডিত মহাশয়ের মন কিন্তু অনির্ব্বচনীয় অশান্তিতে সংক্ষুব্ধ হইতে লাগিল। একদিন তিনি কাঁঠাল-চোর শৃগালের মত বালকদিগকে কাঁধাকাঁধি করিতে দেখিয়া তাহার সমুচিত প্রতিবিধান করিলেন। তাঁহার কিল চড় এবং বিশেষ করিয়া "রাম চিম্‌টির" কথা আজও মনে পড়িলে ত্রাস হয়।

যাহারা ধরা পড়িয়াছিল তাহাদের মধ্যে শরৎ ছিল না; কিন্তু এই ব্যাপারে সে যে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিল, একথাও বলা যায় না।

ক্রমশ



সুরেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের নিকট-আত্মীয় ও বাল্যের দরদী বন্ধু; তাই শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর লেখার দাম সব চাইতে বেশি।

শরৎচন্দ্রের বাল্য-জীবন শেষ হতেই প্রায় শ্রাবণ মাস কাটবে, তারপর যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থার বিষয় আরম্ভ হবে। শরৎচন্দ্রকে ও তাঁর লেখাকে জানবার বাংলাদেশের পক্ষে এটা পরম সুযোগ।

সূর্য্য

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

হে মার্তণ্ড,
প্রদীপ্ত প্রচণ্ড,
আজি বারম্বার
তোমারে করিব নমস্কার!

হান হান রুদ্র অগ্নিবাণ,
আকাশে আবর্ত্তি' তোল' ধ্বংসের ঝঞ্ঝনা,
রৌদ্রের প্রলয়,
হে দুর্জ্জয়!
দীপকে আন্দোলি'
খেল আজ আগুনের হোলি;
বিদ্ধ কর হে নির্ম্মম, আকাশের বুক,
হে সূর্য্য, হে সর্ব্বভুক্,
প্রলয়-উজ্জ্বল নেত্রে উদ্দীপ্ত আক্রোশে
দুর্ম্মদ সাহসে
তোমার ধনুকে দাও টান;
কর খান্ খান্
তিমিরেরে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায়;
হে জলন্ত, দুরন্ত জ্বালায়
উড়াইয়া দাও উচ্চে অগ্নির পতাকা,
বহ্নি-স্বর-স্ফুলিঙ্গ-বলাকা!
হে প্রখর,
জ্যোতির শাণিত অস্ত্রে কর হে জর্জ্জর

যাহা জড়
স্থবির অনড়
নিশ্চেতন ;
তোমার অগ্নির মন্ত্র কর উচ্চারণ
ভৈরব উল্লাসে,
ত্রাসে ত্রাসে
প্রকম্পিয়া পঙ্গু হিম কুঞ্চিত জরারে
হান মন্দ্র রুদ্র হাহাকারে,
ধ্বংসের মদিরা কর পান
বিবস্বান !
হান হান ঝনন-রণন,
ছিঁড়ে ফেল তমিস্রার সহস্র বন্ধন,
অশুচি জঞ্জাল,
হান করবাল !
হে উদ্গাতা, তোমার জ্বলন্ত নেত্র হ'তে
প্রস্রবণ-স্রোতে
পাবক-পবিত্র উদ্বোধন
ঝরিয়া পড়ুক সারাক্ষণ
প্রতপ্ত ভাষায় ;
রুদ্র রুক্ষ ভীষণ ক্ষুধায়
আগুন উদ্গারি,
বীণাযন্ত্র যন্ত্রণায় তোলহে ঝঙ্কারি
হে দীপ্ত ভাস্কর !

হে উত্তপ্ত ভয়ঙ্কর,
দিগম্বর,
আন তব তীব্র তরবারি,
আকাশের বস্ত্র নাও কাড়ি,
ধরিত্রীরে নগ্ন করি দাও,
হে নির্লজ্জ দুঃশাসন,

ছিঁড়ে ফেল কুহেলি-গুণ্ঠন,
যাহা কিছু সঙ্গোপন
মুক্ত করি তাহারে দেখাও!
তব দগ্ধ আতপ্ত চুম্বনে
যৌবন উঠুক দুলি' উচ্ছ্বসিয়া ধরিত্রীর স্তনে।
সঙ্কোচ লজ্জিত ম্লান যত ব্যথা জমেছিল শীতে,
বাষ্প হয়ে যাক্ উড়ে তব সৌম্য নয়ন-ইঙ্গিতে!
আন আন অগ্নির ঝটিকা,
মরণের সঙ্গে জ্বাল যৌবনের দীপ্ত হোমশিখা
হে পবিত্র!
রহস্যের যবনিকা
ছিন্ন কর দীর্ণ কর সব কুজ্ঝটিকা,
হে নির্ম্মম
অমিতবিক্রম!
লুক্কায়িত যা কিছু লজ্জায়,
উগ্র মত্ততায়
তাহারে প্রদীপ্ত কর তোমার জ্যোতিতে;
বুকের শোণিতে
রঞ্জিত সুন্দর কর তাহার কলঙ্ক!
নটরাজ হে উলঙ্গ,
ছন্দি তোল বহ্নিসুরে রৌদ্রের বিষাণ,
জ্যোতিষ্মান্,
নমো নমো নমো হে কল্যাণ!

রামলাল

শ্রীজলধর সেন

গণেশ আর তার ভাগ্নে রামলাল। গণেশের ঐ ভাগনে ছাড়া আর আত্মীয় কেউ নেই; রামলালের, ঐ এক মামা ছাড়া ত্রিজগতে আর কেউ নেই। তারা জাতিতে গোয়ালা।

অনেকদিন আগে রামলালের যখন বাপ ম'রে গেল, গণেশ তখন একমাত্র বিধবা বোন আর তার ছ-মাসের ছেলে রামলালকে কলিকাতায় নিয়ে এসে টালায় একখানি খোলার বাড়ীতে রাখে, গণেশ তখন একটা ছাপাখানায় কালীওয়ালা ছিল। আট টাকা মাইনে পেতো। তাই দিয়ে কেমন করে এই কলিকাতা সহরে তিনজন মানুষের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ হোতো, তা আমরা বল্‌তে পারিনে।

তার পর এই বছর ছয় আগে গণেশ বড় একটা ছাপাখানার জমাদার হয়েছে। এখন সে ৭০৲ টাকা মাইনে পায়, আর প্রায়ই ওভার-টাইম্‌ পায়। তাতে গড়ে তার মাসে একশ টাকা পুষিয়ে যায়। গণেশের বোন কিন্তু ভাইয়ের এ উন্নতির অবস্থা দেখে যেতে পারে নাই, কষ্টের মধ্যেই তার দিন কেটে গিয়েছিল।

তখন রামলাল গণেশের প্রেসেই কালীওয়ালা। সে ১২৲ টাকা মাইনে পায়।

গনেশ এখন আর টালায় থাকে না; তার অবস্থা ফিরেছে; এখন সে ইটালীতে এক বাড়ীওয়ালীর ছোট একখানি বাড়ীর একটা ঘর আর একটা রান্নাঘর নিয়ে থাকে। রামলালও সেখানেই থাকে। গণেশ কিন্তু এখনও বিবাহ করে নাই।

প্রথম যখন তারা টালা থেকে এই নূতন বাড়ীতে আসে, তখন রামলালের এ পরিবর্ত্তনে অমত ছিল; কিন্তু তার মামা তার কথা না শুনে ইটালীতেই এল।

এতদিন কিন্তু গণেশের কোন বদ্‌খেয়াল দেখা যায় নাই; যা একটু তার

পান-দোষ ছিল। তাও মদ আফিং নয়; সে একটু গাঁজা খেতো। কেউ সে কথা তুললে বল্‌ত, যে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী, গাঁজায় একটা টান না দিলে শরীর বয় না।

কিন্তু এ বাড়ীতে এসে তার এক উপসর্গ জুটে গেল। প্রথম প্রথম তারা মামা-ভাগনে রেঁধে-বেড়ে খেতো; নিজেরা হাট-বাজার করতো। মাস দুই তিন যেতে না যেতেই তাদের বাড়ীওয়ালী তাদের ধন-প্রাণের গিন্নী হ'য়ে বস্‌ল; গণেশ একেবারে মোক্ষদা বাড়ীওয়ালীর দাস হয়ে পড়ল। তখন এমন হোলো, যা করবে মোক্ষদা।

গণেশ তার মাইনের টাকা এনে সবটা মোক্ষদার হাতে দেয়; রামলালের মাইনেও গণেশই নেয়, আর তাও মোক্ষদার বাক্সেই ওঠে। ঘর-গৃহস্থালীর ভার মোক্ষদার উপর, সে যা খেতে দেবে, তাই খেতে হবে। আর মোক্ষদাও যেমন-তেমন মেয়ে নয়! বয়স যদিও চল্লিশ পার হয়েছে, কিন্তু এখনও তার দাপট আছে। পাড়ার সকলেই মোক্ষদাকে ভয় করে; তার মুখের সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্য! নইলে কি সে এমন একখানা কোঠাবাড়ী করতে পারে! পাড়ার সকলে বলে শীতল কামারের যা কিছু ছিল, সব এই মোক্ষদা হাত করে শীতলকে অবশেষে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়; সে বেচারী হাসপাতালে গিয়ে ম'রে মোক্ষদার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল! এখন সে গণেশের স্কন্ধে ভর ক'রেছে। গণেশকে একেবারে যাদু ক'রে ফেলেছে।

তা সে করুক। কিন্তু বিপদ হয়েছে রামলালের। সে কিছু রোজগারও করে; কিন্তু একটী পয়সাও সে চোখে দেখ্‌তে পায় না; গণেশ ছাপাখানা থেকে তার মাইনে নিজে নিয়ে আসে। রামলাল চাকরের মত মোক্ষদার সেবা ক'রে দু-বেলা দুমুটো খেতে পায়; অনেক সাধ্য-সাধনা করে তবে একজোড়া কাপড় কি একটা জামা পায়। একদিন একজোড়া জুতা কিন্‌বার কথা তুলতে মোক্ষদা ঝঙ্কার দিয়ে বলেছিল "কি আমার নবাবপুত্তুর রে! লাখ টাকা কামাই করেন কি না, তাই জুতো পরবার সখ হয়েছে। মাইনে ত পান বারো টাকা, তাতে দুবেলা দেড় সের চেলের ভাত আসে কোথা থেকে। ও পোড়ারমুখোকে ত বলি, যে হতভাগাকে বিদেয় কর; তা ব'লে কি না ভাগনে, কোথায় যাবে'। আজ সে আসুক, তোর জুতা পরা বার করে দেব।"

রামলাল নীরবে এই তিরস্কার, এই লাঞ্ছনা সহ্য করল; আর কোন দিন জুতার কথা ত বলেই নাই; ছেঁড়া কাপড়ে লজ্জা-নিবারণ অসাধ্য হলেও সে কাপড়

পর্য্যন্ত চাইত না ; গণেশের হঠাৎ এ-দিকে দৃষ্টি পড়লে অনেক উমেদারী ক'রে, তবে মোক্ষদাকে দিয়ে কাপড় কিনিয়ে দিত।

কিন্তু, সকলেরই সীমা আছে—রামলালেরও সহিষ্ণুতা একদিন সীমা অতিক্রম করল। সে দিন সকালেই তাকে ছাপাখানায় যেতে হয়েছিল ; সে ভেবেছিল, সাতটা থেকে দুটো পর্য্যন্ত কাজ করলেই তার ছুটী হবে। কিন্তু সে দিন ছাপাখানায় কাজের এমন তাড়া যে, সন্ধ্যা ছটার আগে আর তার ছুটী হোলো না। খিদের জ্বালায় কাতর হয়ে একবার সে তার মামার কাছে চারটে পয়সা চাইতে গিয়েছিল ; গণেশ রেগে উঠে বলেছিল ; "এই বাড়ী থেকে আস্‌বার সময় এক পেট খেয়ে এসেছিস, আবার এখনই জলখাবারের পয়সা। ও সব হবে না, আর একটু পরেই বাড়ী গিয়ে খাবি, যাঃ।"

রামলালের বল্‌তে সাহসে কুলালো না যে সে বলে, সকাল থেকে এই বেলা আড়াইটে পর্য্যন্ত কলের জল ছাড়া আর কিছু তার পেটে পড়ে নি। সে চুপ করে চলে গিয়ে নিজের কাজ করতে লাগল।

সন্ধ্যার সময় যখন তার ছুটী হোলো, তখন সে গণেশকে বল্‌ল "মামা, বাড়ী যাবে না ?" এ কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, গণেশ এখন আর সবদিন কলুটোলার ছাপাখানা থেকে হেঁটে বাড়ী যায় না, গাড়ী ক'রে যায়। আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যখন কাজ করেছে, তখন এই ক্লান্ত শরীরে সে আর হেঁটে যাবে না, গাড়ীই করবে। তা হোলে রামলালকেও এই দীর্ঘ পথ হাঁটতে হয় না। সে দিন সারাদিন অনাহারে আর এই খাটুনীর পর তার আর পা চল্‌ছিল না।

গণেশ বল্‌ল "না, আমার এখন বাগবাজারে যেতে হবে ; তুই একেলাই যা। বাড়ীতে বলিস্ আমার ফিরতে একটু রাত হবে।"

রামলাল কি করে, ধীরে ধীরে পথে নাম্‌ল। কলুটোলা থেকে ইটালী বড় কম পথ নয় ; ষোল বছরের ছেলে রামলাল এই দীর্ঘ পথ প্রতিদিন দুই বেলা অতিবাহন করেছে। আজ আর তার সে শক্তি ছিল না। সে খানিকটা যায়, আর ফুটপাথের উপর বসে ; সম্মুখে জলের কল দেখ্‌তে পেলেই আকণ্ঠ জলপান করে।

এমনই ক'রে রাত প্রায় সাড়ে সাতটার সময় সে ইটালীতে পৌঁছিল। বাসার মধ্যে গিয়ে দেখে মোক্ষদা পা-ছড়িয়ে ব'সে একটা লোকের সঙ্গে গল্প হাসি-তামাসা করছে। রামলাল বারান্দার এক পাশে ব'সে ধীরে ধীরে তার জামা

তেতালা বড় বাড়ীটিতে পিসীমা থাকেন। কাকাকে পেয়ে তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। আমি প্রণাম করতেই—আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে, চিবুক ধ'রে আদর করে চুমু দিলেন। বল্লেন, বেঁচে থাক, সুখে থাক—সোনার চাঁদ আমার।

ভাল ক'রে জ্ঞান হওয়ার পর পিসীমাকে আমি এই প্রথম দেখলুম। বেঁটে-খাটো মানুষটি।

কাকা বল্লেন,—দিদি তুমি চুলগুলো কেমন করে একেবারে পাকিয়ে ফেল্লে?

তোর যেমন কথা, চুল পাক্‌বার বয়স আমার হয়নি? আর এই বলের জলে—কালো মানুষ ফর্সা হয়ে যায়—চুল তো চুল!—ব'লে পিসীমা একটা স্নিগ্ধ করুণ হাসি হাসলেন—তাতে আমার বোধ হলো যে বুকের অনেকখানি ব্যথা লুকানো ছিল।

পরে জেনেছি সত্যই তাই; পিসীমার বড় ছেলে গুণীদার মৃত্যুর পর তাঁরা কলকাতায় এসে বাস করেছিলেন—আর এই দুর্ঘটনার পর পিসেমশাই বাতে পঙ্গু হ'য়ে যান; আর পিসীমার এই অকাল বার্দ্ধক্য দেখা দেয়।

শোক কোন কোন মানুষকে কেমন যেন একটু কটু ক'রে দেয়; কিন্তু আমার পিসীমাকে কটুর বদলে মিষ্ট ক'রে দিয়েছিল। গুণীদাকে হারিয়ে চুনির উপর সব মনটা ঝুঁকে ত পড়েইনি, বরং উল্টোই হয়েছিল; তিনি যেন বুঝেছিলেন, মানুষ যতদিন অন্ধতার সঙ্গে ভালবাসায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে থাকে—ততখানি ব্যথার আঘাত তার কপালে সঞ্চিত হ'তে থাকে;—দুর্ভাগ্যক্রমে যদি বিচ্ছেদের দিন—একদিন এসেই পড়ে—সেদিন আর কোন উপায় থাকে না নিজেকে সামলে নেবার, তাই তিনি চুনির সম্পর্কে একটা চমৎকার নির্লিপ্ততার সাধনা করতেন যা' সচরাচর স্ত্রী জাতির মধ্যে খুব অল্পই দেখতে পাওয়া যায়। সেই অবসরে তাঁর চিত্তের স্নেহ-রসের স্নিগ্ধ ধারাটি—যারা দূরের তাদের নিকটে টেনে আন্‌ত; যারা পর তাদের আপন ক'রে নিয়েছিল।

এই জিনিষ খুব স্পষ্ট বোঝা যেত আমাদের পিসেমশায়ের সঙ্গে তুলনায়। পিসেমশাই যেন চুনিকে আরো আঁকড়ে ধরেছিলেন আর সেই ধরার ব্যাপারে বাইরের সঙ্গে তাঁর যোগটা ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। যদি কোথাও সেটাকে ঝালিয়ে তোলার প্রয়োজন হ'ত ত' তিনি যেন ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌তেন।

তাঁ একই ঘটনায় একজন স্নেহের দাতাকর্ণ হ'য়ে বসেছিলেন—আর একজনের ...বলম্বন অন্ত ছিল না।

লেখা,

কাকাকে দেখে পিসেমশায়ের পূর্ব্বের ভাব কতকটা জেগে উঠলো কিন্তু তাঁর মনটাতেও বাত ধ'রে গিয়েছিল। অসুখের কথা ভুলে গিয়ে সহজভাবে উঠা-বসা করতে গিয়ে বেতো রুগী যেমন দ্বিগুণ কাতর হ'য়ে পড়ে—পিসেমশায় তেমনি কাকার সঙ্গে হাস্য পরিহাস ক'রে যেন নিঝ্ঝুম হয়ে পড়ছিলেন।

বেলা তিনটে না বাজতেই কাকা বল্লেন, চল্ চল্, তোর মেস খুঁজিগে। পিসীমা বল্লেন, সে কি হয়—চা খেয়ে, জল খেয়ে তবে বেরুতে পাবি। কাকা বল্লেন,—সে সব তুমি উদ্যোগ কর, আমি এই কাছাকাছি ঝাঁ করে ঘণ্টা খানেকের জন্যে ঘুরে আসি। এখনো হজম টজম কিছুই হয়নি।

আমরা বেরিয়ে প'ড়ে—মোড়ে এসে দেখি একটা বুড়ো লোক—কৃষ্ণদাস পালের ষ্ট্যাচুর বেড়ার শিকের উপর নানা বর্ণের নানা দেশের ছবি ঝুলিয়ে খদ্দেরের প্রতীক্ষায় ব'সে আছে। তার মেজাজ বেজায় কড়া—লোকটা জাতিতে মুসলমান্। কাকাকে দেখে সেলাম করতেই কাকা খুশী হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—কি গো বড় মিয়া, ভাল আছত? সিগারেটের ধোঁয়ায় মিশমিশে কালো দাঁতের মাঝে মাঝে দু'একটা পড়েও গেছে—দুই পাটিই বার করে বল্লে,—কর্ত্তা কবে আসচেন?

দেখলাম, কাকার সঙ্গে তার বহু পূর্ব্বের পরিচয়। একরাশ ছবি পছন্দ করে বল্লেন, ফিরবার সময় নিয়ে যাবেন।

বল্লেন, চল্ আরপুলি লেনে যাই, সেখানে বিস্তর মেডিকেল কলেজের মেস আছে।

আরপুলি লেনে ঢুকে বেঁক ফিরতেই একটি কালো-কুচকুচে লোক কাকাকে দেখে ব্যাঘ্র-লম্ফ দিয়ে উঠে ভীষণ চীৎকার ক'রে বল্লে, হ্যালো,—গোভিন্, এ তুই, না এ তোর প্রেতাত্মা!

লোকটির পরণে একটা কালো চেকের লুঙ্গি, গায়ে এণ্ড্রুক্রিস্ ফ্যাশানের হাতাহীন আধ ময়লা জামা; দাঁতের মাথা দুটো নগ্ন থাকায়—অত্যন্ত কুৎসিত দেখাচ্ছিল। গোঁফ দাড়ি কামানো, চোখ দুটো ছোট, হলদে এবং কোঠর-গত।

এগিয়ে এসে কাকার ডান হাতখানা ধ'রে একটা ঝাঁকি দিতেই—কাকা হেসে বল্লেন—তোর পাগলামি কিছুই সারেনি দেখ্ছি—হাবু; তবে আজকাল স্যায়েবি ছেড়ে মুসলমানি পোষাক ধরেছিস্, দেখছি।

দি চিপেষ্ট—বলে হাবু বাবু উচ্চ হাস্য করলেন। সেই হাসির ভিতর আমি একটা ভারি নূতন জিনিষ পেয়েছিলুম। শুনেছি, জানোয়ার থেকে মানুষ ... জামা

জানোয়ারে হাসতে পারে না; জানোয়ার জীবনের না-হাস্‌তে-পারার আপশোষ থেকে পূর্ণ খোলসার ভাব যেন এতে আগাগোড়া বিদ্যমান্‌। মানুষের কুটিলতা তাতে ছিল না; জানোয়ারের বুনো ভাব পুরো ষোল আনা!

কাকা বল্লেন, এখন কি করছিস্‌?

ভগবানের দেওয়া ফশলের দানা চর্ব্বণ! তারপর,—হো হো হো করে হাসি!

মনে আছে - সেই হেয়ার স্কুলের ভোলা মাষ্টারের- grinding God's grain?

কাকা হাসলেন।

আমাকে দেখিয়ে—এটি-blooming chap -কুটুম্ব ছোক্‌রা- এটি কে?

ও মেজদার ছেলে রে; তোর দেখছি তর্জ্জমা ভারি রপ্ত!

হাবু বাবু ভারি খুসী হলেন -বল্লেন, ওই ক'রেই ত পেট চল্‌চে। বতো ট্যাঁস বেটাদের বাংলা পড়াচ্চি!

কাকা হেসে বল্লেন, তবে ত' ভাল দেখছি, তবুও পৃথিবীর একটা কাজে এসেছিস্‌।

হাবু বাবু সেই দিল্‌-খোলসা হাসি হাস্‌লেন।

তারপর, কোথায় থাকিস্‌? বিয়ে থা' করেচিস্‌?

হাবু-বাবু মুখের একটা অদ্ভুত ভঙ্গী ক'রে বল্লেন, এতদিন পরে—আজ উনি জিজ্ঞেস করতে এলেন, বিয়ে-থা করেচিস্‌—বিয়ে-থা করেচিস্‌!

ঝুটো দাঁতের মধ্যে দিয়ে আওয়াজ চেপে বল্লেন,—ডেভিল।

পরে. সায়েবদের ঠিক ঐ রকম ক'রে গাল দিয়ে ডেভিল বল্‌তে শুনেছি—হাবু-বাবুর অনুকরণ, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়েছিল।

মেয়ে আস্‌চে বছর বিএ এক্‌জামিন্‌ দিচ্ছে--তার খবর কে রাখে!--বিয়ে-থা কোর্‌রে-ছিস্‌!

সেদিন এই আকস্মিক রাগের হেতু বুঝতে পারিনি; কিন্তু পরে বুঝেছিলাম। হাবু বাবু মনে করতেন, ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ—ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি যেমন না জানা একটা গভীর অজ্ঞতা—এমন কি বর্ব্বরতার পরিচয়—তেমনি তিনি তাঁর কোন বন্ধুকেই ক্ষমা করতে প্রস্তুত ছিলেন না, যিনি তাঁর কন্যার বি-এ পরীক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন থাকতেন। গৌরবহীন জীবনের এই একমাত্র গৌরবের অবলম্বন—তাঁর কাছে অন্ধের যষ্টির চেয়ে ঢের বেশী প্রয়ো-

লেখা,

জনীয় এবং প্রিয়তর ছিল। তা'ছাড়া রাগটা তাঁর জীবনের এবং স্বভাবগত চরিত্রের মূল রাগিনী ছিল।

কাকা বোধকরি বিস্ময়ের অভিনয় ক'রে বল্লেন, বল কি, তোমার মেয়ে! বি-এ দেবে? বাঃ!

হুঁ-হুঁ,—হাবু দত্ত সেদিক দিয়ে বড় একটা কেও-কেটা নয়; বুঝেছ কিনা গোভিন্!

There are more things—বাস্তবিক ভারি খুসী হলাম।

হাবু বাবু কাকার হাত ধ'রে বল্লেন, চল একটু চা খাবে—আর মিসেস্ দত্তর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবে।

তাতো হবে; কিন্তু আমার কাজটিও যে বড় জরুরি—এই কিরণের জন্য তাড়াতাড়ি একটা মেস খুঁজে দিতে চাই,—আমি কালই যাবো।

হাবু বাবু আমার দিকে ফিরে বল্লেন, কোন্ কলেজ?

কাকা বল্লেন,—মেডিকেল।

মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করে হাবু বাবু বল্লেন,—ছিঃ ছিঃ ছোঃ ছোঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ—মানুষ আবার ঐ আসুরিক চিকিৎসা শিখতে যায়!

কাকা দুই চোখ বিস্ফারিত করে বল্লেন, তুমি বল কি হাবু! চিকিৎসা আবার আসুরিক কি?

হুঁ-হুঁ অনেক পেছিয়ে আছ ভাই, চিকিৎসা যদি কিছু থাকেত' ঐ হোমিও প্যাথি, কাটা নেই ছেঁড়া নেই, বুঝে-সুঝে ফোঁটাটি ফেলতে পারলেই বস, সব আরাম। এই কল্‌কেতা সহরে এলোপ্যাথি ডাক্তারকে পোঁছে কে?—আর দেশ বিদেশ থেকে ডাক আসচে—ইউন্সান্, মজুমদার, ডি, এন, রায়—কত নাম ক'রবো?

কাকা বল্লেন, তাইতো হাবু, আমাদের দেখ্চি মস্ত ভুল হয়ে গেছে—এখন টু লেট্,—একটা মেস যে খুঁজে বার করতে হবে।

হাবু দত্ত থাক্‌তে তোমার ভাইপো যদি মেস না পেয়ে বাড়ী ফেরে ত আমার নামে কুকুর পুষো। চল, চল, একটু চায়ের মৌতাৎ সেরে নিয়ে—দেখিয়ে দিচ্চি হাবু দত্ত বৃথায় এ পাড়ায় বাস করে না।

অবশেষে আমরা হাবু দত্তের বাড়ীর-সামনে এসে পড়লাম। সেটা যে হাবু দত্তের বাড়ী তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না—যখন আমরা দেখ্‌তে পেলাম যে দোরে একটি ছেঁড়া নীলাম্বরী কাপড়ের পর্দা টাঙ্গান, বাঁ দিকে দোরের পাশে

কালো পাথরের শ্লাবের উপর সোণার অক্ষরে খোদা—The Paradise, নীচে বাংলায় তর্জ্জমা—স্বর্গধাম। দরজার ডানদিকে—সাদা পাথরের উপর কালো অক্ষরে খোদা—Haboo Dutt M.R. V. S.

কাকা দাঁড়িয়ে প'ড়ে বল্লেন, M. R. V. S. কি হে?

গম্ভীর গলায় হাবু বাবু বল্লেন, Member Royal Vagabond Society. সভ্য—রাজকীয়—নিষ্কর্ম্মা—সমাজ! এবার হাবু দত্ত নিজেই বল্লেন—ইংরাজি আর বাংলা যেন আমার ডান হাত বাঁ হাত—একটার সঙ্গে আর একটা আপনি বেরিয়ে আসে।

কাকা বল্লেন,—ইংরাজিটা তোমার Nature—আর বাংলাটা তোমার second nature - অর্থাৎ habit—ব্যঙ্গচ্ছলে বল্লেন, স্বভাব, আর দ্বিতীয় স্বভাব কি, না অভ্যাস।

হাবু দত্ত হাসিতে গগণমণ্ডল বিকম্পিত করে তুল্লেন!

দত্ত সাহেবের বাইরের ঘরটি আয়তনে ছোটই। একজন বাইরের লোক এসেই তা বুঝতে পারে—কিন্তু এ কথা তিনি কিছুতেই স্বীকার করেন না এবং এই নিয়ে তিনি বহুলোকের সঙ্গে বহু অন্যায় তর্ক করেছেন এবং তর্কের অবসানে —তাদের অনুপস্থিতিতে অবশ্য কটু কথায় গাল দিয়েছেন—এটিও বোধকরি তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব!

হাবু দত্তের পরের ত্রুটি দেখবার সময় শ্যেন চক্ষু ছিল—অপরকে সেই ত্রুটির কথা বলবার সময় মা স্বরস্বতী তাঁর জিহ্বাগ্রে অবতীর্ণ হতেন; কিন্তু তাঁর সমালোচনা করলেই সর্ব্বনাশ!

এখন সেদিনকার কথা বলি। সেই ছোট ঘরটির চারটি দেয়ালে একটুকুও ফাঁক ছিল না। ছবিতে পরিপূর্ণ! বুদ্ধদেব থেকে আরম্ভ ক'রে বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত—ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সংস্কারকের কেউ যে বাদ পড়েছিল বলে ত মনে হয় না। যিশুর লীলার ছবি পশ্চিম দেয়ালে; পূর্ব্ব দেয়ালে নানক, কবির, শঙ্কর, চৈতন্যদেব, রামমোহন। কিন্তু সব ছবিকে তুচ্ছ ক'রে দিয়েছিল—হাবু দত্তের নিজের প্রকাণ্ড ব্রোমাইডটা! বালখিল্য মুণিগণের সভায় যেন ভীমসেন সভাপতিত্ব করতে বসেছেন! হাবু দত্তের দক্ষিণে রবীন্দ্রনাথ এবং বামে জগদীশচন্দ্র; নীচে প্রফুল্লচন্দ্র এবং উপরে—একখানি ছবি যার রহস্য উদ্ঘাটন করা সকলের পক্ষে সহজ নয়; দুখানি ত্রিভুজের নাভি-কেন্দ্রে একটি উজ্জ্বল ওঁ লেখা, এবং ত্রিভুজ দুখানিকে বেষ্টন ক'রে আছেন, সর্পরূপী অনন্তদেব।

কাকার কি হয়েছিল জানিনে ; কিন্তু ছবিগুলি দেখে আমার মনের যা অবস্থা হয়েছিল—আজও তা' স্পষ্ট স্মরণে আছে ; বর্ষার ঘন মেঘ একটা বুক ভরা স্নিগ্ধতায় চারিদিক নিবিড় করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুতের দৃপ্ত আলো আর বজ্রের নির্ঘোষ যেমন স্থাবর জঙ্গমকে ক্ষুব্ধ চকিত ক'রে তোলে—ভারতবর্ষের অতীত ধর্ম্ম সম্পদের গৌরব তৃপ্তির মধ্যে নির্লজ্জতার দৃপ্ত নগ্নতা যেন আমার মনকে নির্দ্দয় চাবুকের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত ক'রে দিয়ে গেল।

কাকা যে চেয়ার খানিতে ব'সেছিলেন, হাবু দত্ত তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বল্লেন, এই চেয়ার খানিতে আমার বাড়ীর সম্মানিত আগন্তুক এসে প্রথমে বসে থাকেন ; এর ইতিহাস অতি অপূর্ব্ব !

আমাদের মন কৌতূহলে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল,—তারই প্রকাশ হয়ত' চোখের মধ্যে এমন ভাবে হয়েছিল—যা' বুঝতে মানুষের ভুল হয় না ; তাই হাবুদত্ত, আমরা অনুরোধ না করতেই—সেই চেয়ার খানির কাহিনী সহসা আরম্ভ ক'রে দিলেন।—

এই চেয়ার খানি, তিনি বল্লেন, আমি জোচ্চোর-বাজার থেকে আড়াই টাকা দিয়ে কিনি ; পরে জান্‌তে পেরেছি যে এখানি কুইন ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের একজন প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারককে সাদরে উপহার দেন ; তিনি এটিকে কোন ধর্ম্ম মন্দিরে অন্যান্য আস্‌বাবের সঙ্গে উপহৃত করেন। মন্দিরের চাকর উপহৃতের মর্য্যাদা রক্ষা না ক'রে এটিকে অপহৃত করে—মোটের উপর ;—এখানিকে তোমরা একটা সাধারণ যে-সে চেয়ার মনে ক'রো না।

হাবু দত্ত কাকার কাছ থেকে এই সম্পর্কে একটা তর্ক প্রতিবাদের বাক্যস্রোত আশা করছিলেন কিন্তু কাকা একটি ছোট্ট, ক্ষিপ্র 'না' ব'লে এমন ভাবে সমস্তটাকে স্বীকার ক'রে নিলেন, যা' হাবু দত্ত ছাড়া, সকলেরই ভাল লেগেছিল, কারণ মিসেস্ দত্ত দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে ঐ কথা শুন্‌ছিলেন এবং কাকার 'না' শুনে এগিয়ে এসে নমস্কার ক'রে বল্লেন, আপনি বুঝি এঁকে ছেলে বেলা থেকে জানেন ?

হাবু দত্ত বল্লেন, বিরজা—ইনি আমার বাল্য বন্ধু গোভিন্ ; কাকার দিকে ফিরে বল্লেন, মিসেস দত্ত।

দুজনেই পরস্পরকে অভিবাদন করলেন। মিসেস দত্ত ওষ্ঠাধরে একটা কঠিন হাসি চেপে বল্লেন, আপনিও কি প্রেসিডেন্সি কলেজের এম-বি-এ ?

হাবু দত্ত কেমন অপ্রতিভ হ'য়ে বল্লেন,– না, না, গোভিন্ ছিল রেঙ্গলার—ও এম-এ ও পাশ করেছিল বুঝি।

কাকা বল্লেন, না,—আমি ত' এম-এ দিয়ে উঠ্‌তে পারিনি।

বিরজা যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বল্লেন, তাই বলুন, আপনি রেঙ্গলার; —অর্থাৎ কিনা তারাদের দলে; আমাদের ইনি—একশচন্দ্রা, এঁর, ভূ-ভারতে জোড়া মেলা শক্ত!

হাবু দত্ত হঠাৎ একটা অট্ট হাসির আমদানি ক'রে ব্যাপারটাকে চেপে দেবার চেষ্টা করলেন। বল্লেন, দেখ গোভিন্, মিসেস দত্তর একটা এমন হিউমার আছে যা চট্ ক'রে নতুন লোক বুঝে উঠ্‌তে পারে না—ভুল ক'রে বসে; আশা ক'রি তুমি তা' করবে না।

আদি পর্ব্বে দাম্পত্য কলহ এবং যুদ্ধের সূচনায় আমরা কেমন একটা, কিন্তু বোধ করতে লাগ্‌লাম!

কাকা বল্লেন, তা' হলে আমরা উঠি!

হাবু দত্ত ত্বরিত পদে গিয়ে স্টোভ জ্বেলে জল গরম করতে সুরু ক'রে দিলেন। তার মুখখানা সহসা হাঁড়ির মত হয়ে গেল।

বিরজা এক খানা চেয়ারের উপর চেপে ব'সে বল্লেন,—আপনার চায়ের নেশা আছে বুঝি?

বেশ বুঝতে পারলুম, কাকা রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়লেন। হাবু দত্তের সাগ্রহ আহ্বানে আমরা চা পান করতে এসেছিলাম। চায়ের নেশা আছে কিনা তার জবাবদিহিতে পড়তে হবে—তার তিলমাত্র আভাস যদি পূর্ব্বে পাওয়া যে'ত—তা' হ'লে কাকা নিশ্চয়ই আস্‌তেন না।

কিন্তু গৃহস্বামীকে অবহেলা এবং অপমান ক'রে চ'লে যাবার কঠোরতাও কাকার মধ্যে ছিল না। অগত্যা তাঁকে শ্রীমতী দত্তের সঙ্গে কথোপকথন চালাতেই হলো।

তিনি উত্তরের দেরি দেখে আবার স্পষ্ট ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন,– আপনি কি চায়ের নেশা ক'রে থাকেন?

কাকা একটু অপ্রতিভ হয়ে বল্লেন, আমাকে মার্জ্জনা করবেন, ওই অপরাধটা জীবনে ক'রে থাকি।

নীতি বিদ্যালয়ের গুরুমার মত শ্রীমতী দত্ত বল্লেন,—এই মন্দ অভ্যাসটাকে ত্যাগ করবার চেষ্টা করেন না কেন?

কাকা মাথা চুলকে বল্লেন, এই জিনিষটাকে এমন গুরুতর ক'রে ইতিপূর্ব্বে চিন্তা করি নি—স্বীকার করচি যে সেটা আমার চরিত্রের একটা বড় ত্রুটি ঘটেচে।

শ্রীমতী দত্তর মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠ্ল; পলাশীর যুদ্ধ জয় ক'রে ক্লাইবের মুখ এতখানি হর্ষ-বিকচ হয়েছিল কিনা সন্দেহ।

অনেক মানুষেরই এই দুর্ব্বলতা আছে। এর উৎপত্তির কারণ চিন্তা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে নিজের অশেষ দুর্ব্বলতার একটা আবছায়া-জ্ঞানে মানুষকে কেমন স্বতঃই ক্ষুব্ধ করতে থাকে; সেই ক্ষোভ থেকে একটা আত্ম-বিরক্তি জেগে উঠে—তখন নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টাও আসে—সেই চেষ্টার বলে মানুষ খুঁজতে থাকে আর কে কে তার মত অপরাধী—এই অপরাধীর দলের পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের একটা তৃপ্তি!—বিরজা দত্ত—স্বামী হাবু দত্তের জোড়া পেতেন না। কাকার মধ্যে যদি পাওয়া যায়—তাঁর বোধকরি এই উল্লাস!

অপরাধীর সহজে আত্ম-সমর্পণে কিন্তু চতুর পুলিশ খুসী হয় না। শ্রীমতী দত্তের চাতুরিটা বোধকরি উঁচু দরের ছিল না।

ততক্ষণে, তপ্ত-কাঞ্চন বর্ণাভা চা হাতে হাবু দত্ত প্রবেশ করলেন। বিরজা উঠে গিয়ে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে—তাঁর দামাল স্বামীটিকে লক্ষ্য ক'রে দু' একটি বজ্র-বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন!

হাবু দত্তের কর্ম্মহীন জীবনে নেশার চাষ-আবাদ কি রকম ভয়ঙ্কর সফলতা লাভ করেচে—সেই কথা বেশ ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেওয়াই বোধকরি বিরজা দত্তের অভিপ্রায় ছিল; কিন্তু তার চেয়ে তিনি নিজের কথা এমন অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বল্‌তে লাগ্‌লেন—যা' তাঁর মুখে একান্ত অশোভন শোনাতে লাগ্‌লো।

সেই বিকেলে—এক পেয়ালা চায়ের সঙ্গে একটা খুব বড় অভিজ্ঞতা অর্জন ক'রে নিয়ে এসেছিলুম। স্বর্গেও মানুষের দুঃখ থাকে—আর তার সবটাই বোধ করি তার নিজের তৈরী।

সেদিন বেশ বুঝতে পারা গিয়েছিল যে দত্তদের স্ত্রী-পুরুষ, পরস্পরের প্রতি প্রেম কিম্বা প্রীতির আকর্ষণে একত্রিত হ'য়ে দাম্পত্য জীবন যাপন করছিলেন না। তাঁদের এক ক'রে রেখেছিল—যে কি, তা' সেদিন বুঝতে পারিনি—তবে পরে বোঝবার অনেক অবসর হয়েছিল।

ভালবাসার স্নিগ্ধ ছায়ার তলায় যদি স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ বন্ধন গ'ড়ে উঠ্‌তে না পায় ত' সেটা কি রকম হয় জান? দুটো দুষ্টু গরুকে একটা ছোট দড়ি দিয়ে গলায় গলায় বেঁধে দিলে যেমন হেঁচ্‌কা টান আর গুঁতো-গুঁতি! এক সঙ্গে থাকার

জন্যে বিবাহ বন্ধন ভাল ; কিন্তু কোন ক্রমে যদি সেটা বিগড়ে উঠে ত' বিচ্ছেদ বোধকরি তখন একমাত্র মুক্তির পথ।

এঁরা দুজনেই জবরদস্ত ; তাই বোধকরি, এক সঙ্গে থাকা যায় কিনা এবং থেকে কি সুখ এবং কি অসুখ তারই পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন!—তা' ছাড়া আর একটা কথাও বড় সত্য—মানুষের ঝগড়া করতে করতেও একটা বিচিত্র রকমের বন্ধুত্বের ঘনিষ্টতা জমে উঠে! এ ক্ষেত্রে হয়ত তেমনতর কিছু ঘটে গিয়েছিল।

শ্রীমতী দত্ত তাঁর নৈতিক বক্তৃতার উচ্ছ্বাসে সেই ছোট ঘরটি এমন গরম ক'রে তুলেছিলেন যে—আমরা যখন সেই ছোট গলিটির মধ্যে এসে দাঁড়ালাম—তখন মনে হলো যে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল।

হাবু দত্তের সঙ্গে সে তল্লাটের কোন লোকের যে অপরিচয় ছিল তা ত' বোধ হলো না। তাই সুবিধে মত মেস খুঁজে নিতে দেরি হলো না। ৩৩ নং বাড়ীর তেতালার উপর একটি মাত্র ঘর—একজনের পক্ষে বেশ—চারিদিক খোলা—ঘরের উত্তরের জানলা দিয়ে হাবু দত্তের 'প্যারাডাইসের' খতক অংশ দেখা যায়।

সেই ঘরটা নেওয়াই স্থির ক'রে, ম্যানেজারকে পাঁচ টাকা অগ্রিম দিয়ে আমরা বাড়ী ফিরলাম।

হাবু দত্ত চ'লে গেলে আমরা বোধ করলাম কানের কাছে এমনি ক'রে অবিশ্রান্ত ব'কে গেলে—মানুষের অন্তর কতখানি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠ্‌তে পারে! তাঁর কাছ থেকে অব্যাহতি পেয়ে সমস্ত দেহ মন নিমেষে নীরবতার স্বস্তিতে স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠ্‌ল।

কিছুক্ষণ পরে কাকা বল্লেন,—বাইরের লোকের কাছে নিজেদের গরমিলটা লুকোবার কথাও আর এদের মনে পড়ে না—ভারি আশ্চর্য্য!

আমার মনে হলো—শিশুদের মধ্যেও ঠিক ঐ রকম একটা জিনিষ পাওয়া যায়। অন্তরের উৎস থেকে যা কিছু বেরিয়ে আস্‌ছে—তাকে চাপা দিয়ে—আর কিছু দেখান বা বলা শিশুরা জানে না।

ডাক্তারি বিদ্যাটার মুখ্য উদ্দেশ্য মানুষকে ব্যাধি থেকে নিরাময় করা। দূরে ব'সে এই কথা মনে করলে ডাক্তারদের উপর একটা মস্ত ধারণা না ক'রে থাকা যায় না। পীড়িত আর্ত্তদের সেবা, রুগীকে যন্ত্রনা থেকে মুক্তিদান করা—এর চেয়ে বড় কাজ আর কি থাকতে পারে? কিন্তু যে কারখানায় এই ডাক্তার তৈরী হয়—সেটার খবর নিতে গেলে অবাক হয়ে যেতে হয়! সেখানে যেন একটা হৃদয়-হীনতার নিত্য-যজ্ঞ চলেচে। মানুষের প্রাণের আহুতি পেয়ে যে হুতাশন

জলচে—তা থেকে দূরে পালিয়ে যাবার যে কি প্রবল ইচ্ছা হয়—তা সাধারণ লোক কল্পনা পর্য্যন্ত ক'রে উঠ্‌তে পারে না।

মেডিকেল কলেজে ঢুকে প্রথম ক'মাস মনে অবসাদে এমন ভারাক্রান্ত হ'য়ে থাকে যে দুনিয়ার কিছুই যেন ভাল লাগে না।

মনের এই অবস্থা কম বেশী ক'রে, বোধকরি সব ছাত্রেরই হ'য়ে থাকে। তখন একলা থাক্‌তে ভাল লাগে না; তাই সে-সময় দল বেঁধে, আড্ডা জমাট ক'রে দিনগুলো হৈ হৈ ক'রে কাটিয়ে দেবার চেষ্টা সবাই ক'রে থাকে।

মেডিকাল কলেজের মেস্‌গুলোর খবর যাঁরা জানেন তাঁরা আমার এই কথায় সাক্ষ্য দিতে পারবেন। আমাদের বাসায় জন পঁচিশ ছাব্বিশ ছাত্র থাক্‌তেন। সকাল থেকে রাত্রি দুটো পর্য্যন্ত এমন একটা হট্টগোল উঠ্‌তো যে আশ পাশের বাড়ীর লোকেরা মনে মনে আমাদের উপর ভীষণ চটে থাক্‌তেন।

এতগুলি ছাত্রকে এক নিয়মে—একতালে চালান প্রায় অসম্ভব। প্রতিবেশীরা শুদ্ধ হয়ে কিছুদিন এই সব তাণ্ডব ব্যাপার সইতেন, নিত্যকার ঘটনায় তাঁদের মনে একটু একটু করে রাগ সঞ্চিত হ'তে হ'তে—একদিন হয়ত একটা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর ঘটনায় তাঁরা এমন ক্ষিপ্ত হ'য়ে যেতেন, যখন একটা রীতিমত কলহ করতে কোন পক্ষেরই আর কোন আপত্তি, কি দ্বিধা থাক্‌তো না।

আমার মেস-জীবনের প্রথম ঘটনাটি আমার বেশ মনে পড়ে, সেটা বল্লে ব্যাপারটা কি তা' হয়ত তোমরা বুঝতে পারবে।

মেরামৎ করাবার জন্য একটা হারমোনিয়াম আমাদের মেসে কি ক'রে এসে পড়ে। এই যন্ত্রটা মানুষকে বড় আসকারা দেয়, খানিকটা হাওয়া পুরে একটা চাবি টিপে দিলেই খাসা সুর বার হতেই সাধক তখন মনে ক'রে বসে যে কেল্লা ফতে করেছে।

এই বাদ্য যন্ত্রের সুযোগ প্রায় জন দশ বার যুবক একযোগে গ্রহণ করার সংকল্পের ফলে সন্ধ্যার পর ছাদের উপর একটা মহামারি ব্যাপার ঘটতে থাক্‌ত।

রাত্রের অন্ধকারের মধ্যে মানুষের অনেক কথা ভুল হয়ে যায়। ছেলেরা ভুলে যেত যে আশ-পাশের বাড়ীতে লোকগুলার কান এবং মন আছে—এবং সেই মন কেমন ক'রে নিত্য অত্যাচারে বিষিয়ে উঠ্‌চে।

হঠাৎ একদিন রাগের বোমা ফাট্‌লো। ছাদের উপর অজস্র ঢিল পাট্‌কেল পড়তে লাগ্‌লো।

চড় খেয়ে চাপড় ফিরিয়ে দেবার প্রবৃত্তি বোধকরি সব মানুষের মধ্যেই

আছে ; বিশেষ ক'রে এই একদল যুবকদের মধ্যে ! তাদের না ছিল কোন ভাব্‌না-চিন্তা, না ছিল গুরুজন অভিভাবকের ভয়। সবাই ত' একদম রুদ্রমূর্ত্তি ধ'রে উঠ্‌লো।

ছাদের উপর থেকে ঢিল ছোঁড়া; যুদ্ধ করা খুব সহজ এবং সেটা অচিরে আরম্ভ হ'য়ে গেল।

আকাশের সঙ্গে লড়াই ক'রে আকাশকে ঢিল মারলে যেমন আকাশ সেই ঢিল অবজ্ঞা ভরে যে ছোঁড়ে তার মাথায় ফিরিয়ে দিয়ে যুদ্ধের সমাপন করে—সেদিনের ব্যাপারটাও গিয়ে প্রায় তেমনি দাঁড়ালো।

নীচে থেকে একখানা থান-ইট অর্দ্ধপথ থেকে ফিরে গিয়ে পাশের বাড়ীর বুড়ী-ঝির পিঠের উপর পড়াতে সে অজ্ঞান হয়ে গেল,—তখন মার মার শব্দে কয়েকজন আমাদের মেসের দোরের কাছে এসে বল্লে, আয় দেখি শালারা!

শ্রীযুক্ত হরিলাল কুমার—আমাদের বাড়ীর ঠিক সাম্‌নের বাড়ীতে থাকতেন, তিনি ব্যারিষ্টার ; সেই লোকদের ডেকে বল্লেন, দেখো, তোমরা এই ছেলেদের সঙ্গে মিছিমিছি একটা ঝগড়া করছো। আজ আমি আগাগোড়া সমস্তটা দেখেছি। ওরা ছাদের উপর ব'সে একটু আমোদ ক'রছিল—তা' কেন ক'রবে না? ওরা ত' ঢিল ফেলেনি। নীচে থেকে ছাদের উপর ঢিল ফেলা হয়েচে। যে ঢিলে বুড়ীটা মরেচে, সেটা নীচে থেকে গিয়ে মাঝ পথ থেকে ফিরে এসে বুড়ীর ঘাড়ে পড়েচে।

একজন লোক খুব কড়া গলায় বল্লে, হাঁ মশাই হাঁ—আপনি সব জান্‌তা। যত বেটা ছোটলোকের ছেলে এসে এই মেসে আছে, আজ শালার-বেটাদের মেরে পয়লাট্ ক'রে দেবো।

হরিলাল একটু হেসে বল্লেন, তা' তোমরা পার। আচ্ছা, আমিও দেখ্‌চি তোমরা কতদূর কি করতে পার—আমি পুলিশ আপিসে 'ফোন্' করচি।

নিমেষ ফেল্‌তে কে কোথায় চলে গেল। হরিলাল আমাদের ডেকে বল্লেন, দেখো হে ছোক্‌রারা, এসব ঐ বেটা হাবু দত্তর কারসাজি। বেটার কোন কাজ নেই তাই একটা দাঙ্গা বাঁধিয়ে তুল্‌চে। তোমরা যেমন গান বাজনা করছিলে করগে—দেখি কোন ব্যাটা কি করতে পারে।

সে রাত্রে আর গান-বাজ্‌না হলো না। যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়া গেল।

পরদিন ভোরে হাবুদত্ত এসে আমাকে ডেকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন, চা এর নিমন্ত্রণ।

চা খেতে খেতে গত রাত্রের কথা তুলে বলতে লাগলেন যে—ছোটলোক কুমোর-ব্যাটা, অমন ঢের ঢের লোক গিয়ে ব্যারিষ্টার হয়ে এসেচে ; ওকে দেখে নিতাম ; কিন্তু তুমি ঐ মেসে থাক—তাই কিছু করবো না।

সব কথা শোনার পর আমি বল্লাম, কিন্তু হরিলাল বাবুকে আমার খুব ভাল লোক ব'লেই মনে হয়।

বিজ্ঞের হাসি হেসে বল্লেন, তুমি ছেলেমানুষ, সংসারের কিছুই জাননা। বেটার মুখ মিষ্টি—কিন্তু হারামজাদার পেটে-পেটে সয়তানি। থাকো কিছুদিন তখন বুঝবে।

আমার ভারি আশ্চর্য্য বোধ হলো, এরা দুজনেই দুজনের উপর ভীষণ বিরক্ত, এদিকে দুজনের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হবার কোন প্রয়োজন পর্য্যন্ত ছিল না।

আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করাতে হাবু দত্ত একটা অদ্ভুত উত্তর দিলেন, হরিলাল আমার বাল্যবন্ধু, এক সঙ্গে না পড়লেও এক স্কুলে দু'জনে বহুদিন পড়েছি। বেটার বাপের টাকা ছিল—দাঁ ক'রে বিলেত চ'লে গেল, আর আমি বেটা ফ্যা ফ্যা করতে লাগ্‌লাম।

মনে করলাম, এ থেকে ত কিছুতেই প্রমাণ হয় না যে হরিলাল খুব বদলোক।

বাপের টাকা থাকায় অপরাধ কি ?

পিছন থেকে মিসেস দত্ত বল্লেন, অনেক।

আমি দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে নমস্কার করলাম, তিনি খুসী হয়ে বল্লেন—বোস বোস ; বুঝেছ, বাপের টাকাতে মানুষের বড় বিপদ হয়।

হাবু দত্তকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বল্লেন, এই লোকটির বাপের টাকা ছিল, আর সেই টাকা আজ এঁকে অমানুষ ক'রে দিয়েছে।

আমি মাথা নীচু ক'রে রইলাম।

তোমার মারও ত' ঢের টাকা ছিল, তা হলে তুমিও অমানুষ হয়ে গেছ।

মিসেস দত্তর চোখের মধ্যে যেন রাগের বিদ্যুৎ তরঙ্গ নিমেষে চম্‌কে চ'লে গেল।

হাঁ,—অমানুষ হয়ে যেতুম, যদি সে টাকা আমার হাতে আস্‌তো ; কিন্তু তাও তুমি নষ্ট করেছ—তাই আজ আমাদের এই দুঃখ।

আমি উঠে পড়লাম। যে ঝগড়া দু-জনের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকা উচিত—তাতে এসে-পড়তে আমার বিশ্রী লাগ্‌তো, তাই হাবু দত্তের অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও

আমি তাঁদের বাড়ীতে বড় একটা যেতে চাইতাম না। এটা হয়ত তাঁরা লক্ষ্যও করেছিলেন।

বাড়ী থেকে বার হয়ে এসে হাবু দত্ত বল্লেন, দেখ, হরিলালের নামে আমি নালিশ করবো। সেকাল আমার নামে যা-তা কথা বলেছে। মানহানির মকদ্দমায় তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হবে।

আমি অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলাম।

কথা কইচ না যে?

ভাবচি।

এতেত তোমার ভাববার কিছুই নেই; যা সত্যি হয়েচে সেইটে তোমাকে বলতে হবে।

তাই বোল্‌বো কিনা, ভাবচি।

হাবু দত্ত যেন একটু গরম হ'য়ে উঠে বল্লেন, তা বলতে তুমি বাধ্য।

তাই কি?

কেন বলবে না, শুনি?

আমার বিশ্বাস, হরিলাল বাবু বড় ভদ্রলোক।

হাবু দত্ত এবার পরিষ্কার রাগ করলেন।—অর্থাৎ আমি ছোটলোক—অভদ্র—এই তো? হাবু দত্ত আর কোন কথা না বলে, খুব রাগ করতে করতে চ'লে গেলেন। আমি খানিক চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম—তাইত' কি করা যায়!

সটান্ গিয়ে হরিলাল বাবুর বাইরের ঘরে ঢুকলাম। তিনি একখানা ইজি চেয়ারে চিৎ হয়ে শুয়ে—ঠাং দুটো হাতলের উপর লম্বা ক'রে দিয়ে সেদিনের খবরের কাগজ পড়ছিলেন। কাগজ থেকে চোখ না তুলেই বল্লেন—বসো। কাছে একটা পিঠ দেওয়া বেঞ্চি ছিল, আমি তাইতে ব'সে পড়লাম।

মিনিট খানেক পরে কাগজখানা রেখে দিয়ে—আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, কি চাও?

আমি তখনো ঠিক করতে পারিনি যে কি করতে, কেন, তাঁর কাছে গিয়েছি; একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলাম। কিন্তু বুঝতে পারলাম যে বেশীক্ষণ এমন করা ভাল হবে না—তাই তাড়াতাড়ি বল্লাম, দেখুন একটু বিপদে পড়ে এসেছি।

গম্ভীর স্বরে হুঁ—ব'লে হরিলাল বল্লেন, তুমি এই সামনের মেসে থাক না?—

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি-সূচক ইঙ্গিত করলাম।

মেডিকেল কলেজে পড় ? কোন্ ইয়ার ?

এই সবে ভর্ত্তি হয়েছি।

হুঁ—বাড়ী থেকে টাকা কড়ি আসেনি বুঝি ? কলেজের ফি দিতে হবে ?

না।

তবে ?

কাল রাত্রের ঘটনা নিয়ে আমি একটু বিপদে পড়েছি—তাই আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি।

কি ? নালিশ টালিশ হলো নাকি ?

না। হাবুবাবু আজ সকালে—

বুঝেছি, সে আমার নামে ডিফেমেশানের মামলা করবে ?—করুক না কেন ?

আমাকে সাক্ষি দিতে বলচেন।

তা দাও, সত্যি যা' জান বল্‌বে—তাতে আর তোমার বিপদ কি ?

আমি আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষি দিতে প্রস্তুত নই।

হরিলাল একটা প্রাণখোলা হাসি হেসে বল্লেন ; তাতে তোমার আপত্তিই বা কি—শুনি ?

লোকের মুখের উপর সুখ্যাতি করা বড় শক্ত—একটু মাত্রার এদিক-ওদিক হ'লেই সবটা যেন খোসামুদির মত শুনাতে থাকে, আমি তাকে বড় ভয় করি—তাই চুপ ক'রে রইলাম।

খানিকটা চুপ্ চাপ্ কেটে গেল। তারপর হরিলাল বল্লেন, তোমার সঙ্গে হাবু দত্তর আলাপ হলো কি ক'রে ?

উনি কাকার সঙ্গে এক-সঙ্গে পড়েছিলেন।

হরিলাল একটা শান্ত হাসি হেসে বল্লেন, ও লোকটার বিশ্বে সকল লোকের সঙ্গে আলাপ আছে—আবার ঝগড়াও আছে। জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ্‌লে বল্‌বে, যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গেও এক-সঙ্গে পড়েছে।

আমি হেসে ফেল্লুম।

না না, আমি খুব একটা বাড়িয়ে কিছু বলিনি হে। তুমি খোঁজ ক'রে দেখ।

আমি তখনো একটা অবিশ্বাসের হাসিই হাস্‌তে লাগলুম।

হরিলাল বল্লেন, কিন্তু আমি জানি, তুমি একদিন এসে ব'লে যাবে যে আমি খুব একটা মিথ্যে কথা কিছু বলিনি।

খানিকটা পরে অনেকখানি গাম্ভীর্য্য আহরণ ক'রে আমি বল্লুম, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

কি ?

আপনি কিছু মনে করবেন না ?

হরিলাল নীরবে হাস্‌লেন।

কাল রাত্রে আপনি হাবুবাবুর বিরুদ্ধে যে সব কথা বলেছিলেন—সেগুলো কি আপনি বিশ্বাস করেন ? তিনি কি বাস্তবিকই অত খারাপ লোক ?

হরিলাল অনেকক্ষণ চিন্তা ক'রে বল্লেন, এত' ভারি একটা মজার কথা তুমি বল্লে হে। এর আগে ত' আমি ঠিক এমনি ক'রে ভেবে দেখিনি। তাইত। তোমার কথার উত্তর দিতে আমার সময় লাগবে। আচ্ছা, বলতো, তুমি কেন এই প্রশ্ন করছো ?

আমি কোন উত্তর না দিয়ে একটু হাসতেই তিনি যেন আমার মনের কথাটা ঠিক ধ'রে নিলেন।

বাঃ বাঃ ভারি সুন্দর ত' ! একজন অল্পবয়স্ক যুবকের পক্ষে এটা একটা মস্ত তারিফের কথা।

হরিলাল চেয়ারের উপর সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে বল্লেন—কি নাম তোমার ? বাড়ী কোথায় ?

নাম-ধাম, বংশের পরিচয় দেওয়াতে প্রকাশ হলো যে তিনি—আমার কাকা গোবিন্দ পুষ্করকে চেনেন। এক সঙ্গে পড়েচেন কিনা ঠিক মনে ক'রে উঠ্‌তে পারলেন না।

বড় খুসী হয়েছি—তোমার কথাতে।

আমি লজ্জিত হ'য়ে মাথা নীচু ক'রে রইলাম।

কিন্তু তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি কথায় দিতে চাইনে; কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে—একটা সম্পূর্ণ উত্তর তুমি নিজেই পেয়ে যাবে।

তাঁর কথা ঠিক মত না বুঝতে পেরে আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

তিনি বড় একটা গ্রাহ্য না ক'রে হাতবাক্সটা খুলে বল্লেন, ওরে হোরে—এই এক টাকার খুব ভাল সন্দেশ ধাঁ ক'রে নিয়ে আয় ত।

আমি মনে-মনে ভাবলুম—একি নূতন বন্ধুত্বের সওগাদ ?

হরিলাল মুচ্‌কে হেসে বল্লেন, না, তোমার অনিচ্ছায় তোমাকে জোর ক'রে খাওয়াব না ; তবে না-খেয়েও তুমি শেষ দিকে খুব তৃপ্ত হবে ব'লে ভরসা করি।

ক্যাস-বাক্স থেকে একখানা দশটাকার নোট বার ক'রে টেবিলের উপর চিৎ ক'রে রেখে পেপার-ওয়েট দিয়ে চেপে রাখ্‌লেন—যাতে হাওয়াতে না উড়ে যায়।

তারপর আর এক হুঙ্কার দিয়ে ডাক প'ড়লো—বদন, বদন।

বদনচাঁদ একটি দূর আত্মীয়ের ছেলে, পড়াশুনা ক'রতে তাঁর কাছে ছিল। বদনকে আমরা মেসের তরফ থেকে চিন্‌তাম।

ওরে বদন,—যাতো, এই স্লিপ টা হাবুকে দিয়ে আয়।

আমার দিকে ফিরে বল্লেন, এইবার তুমি এই কাগজ নিয়ে ওই ঘরে ব'সে পড়্ গে'। হাবু এলে যা কথা বার্ত্তা হয় একটু মন দিয়ে শুনো।

আমি উঠে চলে গেলাম।

পাশের ঘর থেকে সকল কথাই বেশ স্পষ্ট শোনা যায়। হরে আগে,—তার উপর হুকুম হলো:—দুটো প্লেটে সন্দেশগুলো সাজিয়ে ঐ র‍্যাকের উপর রেখে—শীগ্‌গীর চা তৈরী কর গে'।

পাঁচ-মিনিটের মধ্যেই—হাবু দত্ত এসে উপস্থিত হলেন—হরিলাল চীৎকার ক'রে বল্লেন, হ্যালো পীর সায়েব—গুড্‌ মর্নিং।

অত্যন্ত সাহেবি সুরে—হাবু দত্ত প্রতিধ্বনি করলেন, মর্নিং।

ওহে হাবু, ভাই, একটু মুস্কিলে প'ড়ে তোমাকে ডেকেছি। দেখো, এই মেসের ছোঁড়াদের জ্বালায় ত' ভাই আর টেঁকা দায়।

কেন, কেন, হয়েছে কি?—চোরা-বালির উপর পা দিতে হ'লে মানুষ যেমন সাবধান হ'য়ে পড়ে—হাবু দত্ত অনুরূপ সাবধানতার সঙ্গে—কথা আরম্ভ করলেন।

কাল রাত্তিরে ত' কুরুক্ষেত্র ব্যাপার! আমি ত' নিশ্চয় মনে ক'রেছিলাম যে এত বড় একটা হৈ-চৈ ব্যাপার—তুমি আছই; কিন্তু এখন দেখ্‌চি—তুমি কিছুই জান না; রেগে মেগে—তোমাকে খুব গাল দিয়ে তবে একটু সাম্‌লাই। জানি তুমি আমার বাল্য বন্ধু,—হাজারই বলি; রাগ করতেও পার কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ক্ষমা ত' করবেই।

নিজের এত বড় প্রশংসা শুনে বোধকরি হাবু দত্তের চোখে জল এসেছিল; তিনি ডুকরে ডুকরে হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

হাসির উচ্ছ্বাস কম্‌লে হাবু দত্ত একটু গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লেন—ঠিক; এখন বুঝতে পারচি,—সকালে মেসের এক ছোঁড়া গিয়ে বল্‌ছিল—হরিলাল বড় লোক

আছেন,—নিজের ঘরে নবাবী করুন—ত' ব'লে প্রকাশ্যে আপনাকে গালাগালি করবার কে—আপনি নালিশ করে দিন—আমরা যেস শুদ্ধ ছেলে সাক্ষ্য দেব।

তাই নাকি হে? ওদের দিকে কথা ক'য়ে এই হলো আমার পুরস্কার?

হাবু দত্ত বল্লেন—ঐ ভাই দুনিয়া—সত্যের পথে যে চলচে—এই আমাতেই দেখনা—বেশী দূরে যেতে হবে না—তার বড় দুর্গতি।

হরিলাল গম্ভীরভাবে বল্লেন,—তা তো দেখতেই পাচ্চি।

ও খাবারগুলো পচ্চে কেন হে—এই দেখ খোদার বিচার—কারুর ঘরে সন্দেশ পচে—আর কারুর খিদেতে নাড়ী পচে।

চোখে না দেখলেও অপ্রত্যক্ষে ঠিক দেখতে পেলাম যে হাবু দত্ত সেই সন্দেশগুলো গো-গ্রাসে গিলচেন।

এই অবসরে আমার মনে, মানুষের এমন একটা কুৎসিৎ ছবি ফুটে উঠলো—যা মনে করতে আজো আমি ভয় পেয়ে যাই। লোভের কালো ছোবলাতে মানুষকে কুষ্ঠ-রুগীর চেয়ে বেশী কুৎসিৎ করে দেয়; তার সর্ব্বাঙ্গ ফোলা আর ঘায়ে বীভৎস!

চায়ের সুখ্যাতি করতে করতে হাবু দত্ত নিজের টাকা কড়ির টানা-টানির কথাটা পেড়ে ফেল্লেন।

পথের কুকুরগুলো নর্দ্দমায় পচা জল জমে থাকতে দেখলেই তৃষ্ণা বোধ করে। টেবিলের উপর দশ টাকার নোটখানি হাবুদত্তকে তেমনিই হয়ত একটা অভাবের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল।

সেই নোটখানি পকেটে পুরে হাবুদত্ত বেরিয়ে গেলে—আমি এসে তাড়াতাড়ি তাঁর দু পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিলাম।

তিনি একটিও কথা কইলেন না। স্তব্ধ-গম্ভীর মন নিয়ে আমিও পথে বার হয়ে এলুম।

মানব চরিত্রের অতল-সীমাহীন সমুদ্রের এক গণ্ডুষ পান ক'রে সে দিন থেকে এই বুঝেছি—তা' তিক্তও বটে, মধুরও বটে!

ক্রমশ

ভুখা ভগবান

শ্রীযুবনাশ্ব

সারা বিকেল ঘর আর বাহির করে, সন্ধ্যের মহড়ায় ফতিমা কুঁড়ের সাম্‌নের রাস্তাটায় এসে দাঁড়াল।

দুপুর বেলা জমীদারের প্যায়াদা এসে বাকী খাজ্‌নার দায়ে স্বামী কালু সেখকে ধরে নিয়ে গেচে। ফতিমা জান্‌ত যে খাজ্‌নার কোনো সুরাহাই হবে না। কোথেকে হবে? গেল বছর দারুণ খরায় ছোট্ট জমীর ফালিটাতে একদানা শস্যও জন্মায় নি, এ বছর ত দেশ-জোড়া আকাল, পেটে দেবার দুমুঠোই জোটে না—খাজনা ত পরের কথা।

আজ তিন দিন দুজনার ঠায় উপোসে কাটচে। খিদেয় দুশ্চিন্তায় আধমরা স্বামীকে তার যখন যমদূতের মতো পাইক এসে পাকড়া করে নিয়ে গেল, ফলাফল সম্বন্ধে তখন থেকেই সে একরম নিশ্চিন্ত হয়ে ছিল। তাই সারা বিকেল তার আর উদ্বেগের সীমা ছিল না।

রাস্তায় এসে বহুক্ষণ বসে থেকেও কালুর ফেরবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। আরো কিছুক্ষণ উৎকণ্ঠিত ভাবে এদিক ওদিক চেয়ে হায়রাণ হয়ে ফতিমা ঘরে ঢুকে ছেঁড়া মাদুরটার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। নির্ব্বাক্‌ চোখের জলে তার দুগাল ভেসে যাচ্ছিল।

বাইরে রাতের স্থির অন্ধকারের মধ্যে ঝিঁঝির একঘেয়ে সারিগান ছাপিয়ে শেয়ালের দল চেঁচাতে লাগ্‌ল। মিনিট কয়েক তার-স্বরে চেঁচিয়ে তারাও থেমে গেল।

হঠাৎ বাইরে পায়ের শব্দ শুনে সে চম্‌কে উঠে বসে, চট্‌ করে চোখ মুছে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল।

অন্ধকার। কিছুই চোখে পড়ে না। ফতিমা বল্‌ল—কে?

কেউ জবাব দিল না।

ফতিমা আবার বল্‌ল—কে? এবারো জবাব না পেয়ে সে একটু অবাক্‌

হয়েই ঘরে ঢুকে কেরোসিনের ডিবেটা বার করে এনে জ্বালাল। আলোতে উঠোনটা ভালো করে দেখে সে আবার ঘরে ঢুকে ঝাঁপটা টেনে দিল।

কিসের না কিসের শব্দ,—একথা বেশীক্ষণ তার মনেও রইল না।

একলা ঘরে বসে তার মনে হতে লাগল, স্বামী এলে কি খেতে দেব তাকে। ঘরে কিছুই নেই। তৈজস পত্রও এমন কিছু নেই, যা বাঁধা দিলে একটা পয়সা পাওয়া যায়। বন থেকে ভোর বেলা এক কোঁচড় বৈচি ফল তুলে এনেছিল, তারই গোটা কয়েক অবশিষ্ট ছিল, ক্ষিদেয় তার নিজেরো সর্ব্বাঙ্গ ঝিমিয়ে আসছিল, ভারী লোভ হচ্ছিল দুটো ফল মুখে দিয়ে চিবুতে, কিন্তু অভুক্ত স্বামীর কথা মনে পড়াতে হাত উঠল না। ঘরের কোণে মেটে কলসীতে জল ছিল, ঢক্ ঢক্ করে তাই খানিকটা গলায় ঢেলে দিয়ে সে ঝাঁপ খুলে দাওয়ায় এসে খুঁটীতে ঠেস্ দিয়ে বসল।

সেইখানে বসে তার মনে হতে লাগল স্বামীর কথা। সে দোষী, খাজনা দিতে সে পারে নি তাও ঠিক, কিন্তু খাজনা দেবার মতো অবস্থা যে তাদের নয় একথাটা কেউ বোঝেনা কেন। আজ বছর খানেক প্রায় না খেয়ে, আধপেটা খেয়ে চলচে। সে মেয়ে মানুষ হয়ে এতটা বুঝচে আর মুলুকের রাজাবাবুর ঘটে কি ছাই এটুকু বুদ্ধিও নেই!

কতক্ষণ সে সেখানে বসেছিল ঠাহর নেই, চমক ভাঙল হঠাৎ খুব কাছেই পায়ের শব্দ শুনে। সচকিত হয়ে এদিক ওদিক তাকাতেই চোখে পড়ল দাওয়ার একপ্রান্তে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েচে। তার গা টা একটু ছম্ ছম্ করতে লাগল। সে বল্ল— কে দাঁড়িয়ে হোতা?

যে দাঁড়িয়ে ছিল সে কোনো কথা কইল না।

হঠাৎ পেছন থেকে আচমকা আর একজন এসে একহাতে তার মুখ আর একহাতে কোমর জড়িয়ে ধরল। এক লহমার জন্যে সে অভিভূতের মতো হয়ে পড়ল, বাধা দেবার শক্তি রইল না।

আততায়ী তাকে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। যে লোকটা আঁধারে দাঁড়িয়েছিল, সেও সাথ ধরল।

উনিশ বছরের জোয়ান মেয়ে ফতিমা, একটা মানুষের সাথে লড়বার তাগৎ খুবই ছিল! কিন্তু দুজনের মিলিত পশুশক্তির কাছে তার জোর কোন কাজেই এল না।

তিনদিনের অনাহারী, স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় অস্থির চিত্ত, কাহিল মেয়েটার

সমস্ত বাধা ও আপত্তি রক্তমাংসের খিদের আগুনের মুখে নেহাৎ খড়কুটোর মতোই পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আধ ঘণ্টাখানেক পর যখন স-ইয়ার জমীদার পুত্র চলে গেলেন তখন ফতিমা হুঁস হারিয়েছে।

দিক্‌ব্যাপী নিবিড় নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে জ্ঞানহীনা ধর্ষিতা নারীর বুকটা ম্লান তালে কেঁপে যেতে লাগল



কালু যখন ফিরল তখন অনেক রাত হয়ে গেছে।

কম্পিত পদে দাওয়ায় উঠেই সে ডাকল,—ফতি,—অ ফতি…

কেউ জবাব দিল না। ঘরে নেই ভেবে কালু একটু এগোতেই নজরে পড়ল ঝাঁপ খোলা। সে একটু অবাক হল, ঘর খোলা—অথচ ফতি নেই……! হয়ত কাছেই কোথাও গেছে…জলটল আন্‌তে কিম্বা অমনি একটা কিছু। একবার মনে হল পুকুর ধারটা ঘুরে আসে, কিন্তু কাছারী বাড়ার কাপ্যারিতের তাড়নায় সমস্ত শরীর তখনো অবসন্ন হয়েছিল, পা আর চল্‌ছিল না। যেখানেই থাক্, এখুনি আস্‌বে ভেবে সে ঘরে ঢুকল।

দু-পা যেতেই পায়ে কি ঠেকে সে চম্‌কে উঠল। ঝুঁকে পড়ে দেখ্‌তে নিতে ফতিমার হাতখানা হাতে বাধ্‌ল। সে আস্তে আস্তে গায়ে মুখে হাত বুলিয়ে ঠাহর করে নিল মানুষটা কে। তারপর উদ্বিগ্নভাবে ডাক্‌ল, ফতি……ফতিমা……

ফতিমা সাড়া দিল না।

কালু মনে মনে শঙ্কিত হয়ে আঁধারে হাৎড়ে হাৎড়ে পথে কুড়িয়ে পাওয়া একটুক্‌রো মোমবাতি খুঁজে বার করে জ্বালিয়ে ফেল্‌ল। তারপর তাড়াতাড়ি স্ত্রীর কাছে এসে বস্‌তে নিতেই চোখ পড়ল দরজার কাছে কাগজের মতো কি একটা জিনিষ। সে সেটা কুড়িয়ে এনে বাতির কাছে ধরল।

সেখানা পাঁচ টাকার একটা নোট্। কালু আকাশ পাতাল কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। নোটখানা সযত্নে কাপড়ের খুঁটে বেঁধে সে স্ত্রীর চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে বস্‌ল।

কিছুক্ষণ বাদে ফতিমা চোখ খুলে বল্‌ল,……কে…স্যাখ্ এলি?

হঠাৎ কি একটা মনে পড়তেই সে অস্ফুট শব্দ করে সঙ্কুচিত হয়ে সরে বস্‌ল।

কালু ব্যগ্র কণ্ঠে বল্ল,…ফতি, কি হয়েছে তোর? অমন কর্‌চিস্ ক্যানে? অসুক করে নি ত?

জবাব না দিয়ে ফতিমা কালুর মুখের দিকে নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। একটা রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাসের মুক্তিতে তার শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ল। সে অস্পষ্ট স্বরে বল্ল,…তোর গায়ে ও কিসের দাগ সায়েব? রক্তের না?…বলে সে স্বামীর কাছে এগিয়ে এল।

কালু দুহাতে ফতিমাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরল। তার দুচোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে বড় বড় ফোঁটা কয়েক জল গড়িয়ে পড়ল।

ফতিমা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্ল—শুয়ে পড় তুই,……আমি বাতাস করে দিই। জল দোব? এই দিচ্ছি।……আমার জন্যে মন বেজার করে থাকিস্ নে ত! কি হয়েচে আমার?…বলে সে স্বামীর অজ্ঞাতে চোখ মুছে, কলসী থেকে জল গড়িয়ে, ফল কটা দিয়ে তাই এনে স্বামীর সামনে ধরল।

কালু টাপটপ্ ফল কটা মুখে ফেলে ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা জল গলায় ঢেলে দিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বল্ল—তুই? তুই খেলিনে কিছু?

ফতিমা ম্লান হেসে বল্ল: আমার খাওয়া হয়ে গেচে।

ছেঁড়া মাদুরটার ওপর গা ঢেলে দিয়ে জোড়া তালি দেয়া কাঁথাখানা গায়ে টেনে কালু বল্ল,—কাল থেকে আর পেটের ভাব্‌না ভাব্‌তে হবে না ফতি! কি পেয়েচি দ্যাখ্……বলে সে খুঁট থেকে নোট্‌খানা বার করল।

কি করে এল খোদা জানে! কিন্তু এয়েচে যখন, তখন একে হেনস্থা করলে খোদা খুশী হবে না। দুটো জীব উপোসে মরতে দেখে তিনিই পাইয়ে দিয়েচে হয়ত!

নোট্ দেখে ফতিমার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। এক লহমায় তার সন্ধের কথা সব মনে পড়ে গেল। তার দু চোখ ছাপিয়ে জল ছুটল—অনেক চেষ্টা করেও সে থামাতে পারল না।

কালু অবাক্ হয়ে ফতিমার মুখের দিকে তাকাল। এই দুর্দ্দিনে টাকার আমদানীতে খুসীর বদলে চোখের জলের মানে সে মাথা খুঁড়েও বুঝে উঠ্‌তে পারল না। বল্ল…কাঁদতে লাগ্‌লি ক্যানে রে? হোলো কি?

ফতিমা দুহাতে মুখ ঢেকে তার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

সব শুনে কালু রুখে উঠে দাঁড়াল। নোট্‌খানা কুঁচ্‌কে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে ঘরের কোণ থেকে ধারালো দা' টা হাতে করতেই ফতিমা তার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল।

.. কোথা যাবি তুই এই রেতে ?

.. পথ ছাড়্ ফতি! দীনদুঃখীর মা বাপ্ নেই যে মুলুকে, সেথা হাতের জোরই জোর! সেই বেজন্মার মুণ্ডুটা যদি না আজ ধড়্ থেকে খসাতে পারি ত...

...যেতে হবে না তোর, শুয়ে পড়্।

ফতিমার দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনে কালু ক্ষিপ্ত হয়ে বল্‌ল...ক্যানে পথ আট্‌কাচ্ছিস্ তুই ? ওরে, উপোস করে কালু সেখের কব্জির জোর এক রতিও কমে নি রে—সে এখনো দু'চারটা দুস্‌মনের গর্দ্দান নেবার তাগৎ রাখে...

...সে হোক্...কিন্তু এই বলে এত রেতে তুই যাবি সেই বাঘের মুখে ? একা কি করবি ওদের অতগুলোর সাথে ? তার ওপর জমীদার বাড়ীর গুলি বারুদের কারবার ? তার চেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে শুয়ে পড়্ এখন, কাল বিহানে যা খুসী করিস্!

উত্তেজনার মুখে কালু অত কথা কিছুই ভেবে দেখেনি। তার ওপর নিজের যে শক্তিটুকুও ছিল শরীরে, আজকের নির্য্যাতনে তাও কাবার হয়ে গেচে। সে অবসন্ন হয়ে আবার শুয়ে পড়ল। বল্‌ল...তুইও শুবি আয়।

ফতিমা বল্‌ল,...হেথায়ই শুচ্চি আমি, তুই ঘুমো।

কালু বল্‌ল...ওসব বুঝিনে আমি, শুন্‌তেও চাইনে! তুই কি একটুও খাটো হয়ে গেচিস্ আমার কাছে যে ওরকম করে বলবি ? তুই আয়...

ফতিমা বল্‌ল,...আমার মন যে মান্‌চে না সায়েব। আজকের রাতটা যেতে দে না হয়...

কালু আর কিছু বল্‌ল না। ক্লান্তি ও ঘুম তার চোখ ভেঙে আস্‌ছিল।

রাতের বিনিদ্র অবস্থার মধ্যে ফতিমার শুধু এই কথাই বারে বারে মনে হতে লাগ্‌ল যে এর পর আর সহজভাবে স্বামীর সাথে বাস করা চল্‌বে কি না। শরীরের ওপর অত্যাচার ত শুধু দেহটার ওপর দিয়েই যায়নি, মনেও যে গভীর ক্ষতের ব্যবধান সৃষ্টি করে গেচে। তাই যুক্তি, তর্ক, বুদ্ধি বিবেচনা, সবার ওপর দিয়েই অবুঝ মন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌তে লাগ্‌ল...না, না...আর হয় না...

কান্নার বেগ সাম্‌লে নিয়ে সে আবার ভাবতে বস্‌ল...আচ্ছা, বেশ। কিন্তু তারপর ? কদিন ত আধ উপোসে চল্‌চে...আর কদিন চল্‌বে ? একা হলে

হয়ত কালু চালিয়ে নেবে, সে থেকেই ত বিপদ বাধিয়েছে। আজকের নির্যাতনের মূল কারণও যে সেই, এ সম্বন্ধেও ফতিমার কোনো সংশয় ছিল না।

ফতিমা ভাব্‌ল,...আচ্ছা, সে যদি মরে, তবে কি হয়! সব দিক্ দিয়েই ভালো হয় না? সে বেঁচে থাক্‌লে তাকে নিয়েই জমীদারের সাথে কালুর দাঙ্গা বাধ্‌বে... আর তার ফলাফল এত সুনিশ্চিত, যে ফতিমা শিউরে উঠ্‌ল। না...বেঁচে থেকে অনেক দাগা সে দিয়ে গেল স্বামী কে...

অজ্ঞাতে দুচোখ তার জলে ভেসে যাচ্ছিল, হাত দিয়ে চোখের জল কেচে সে উঠে বস্‌ল।

নিদ্রিত স্বামীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ সজল অতৃপ্ত চোখে তাকিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর আস্তে ঝাঁপ্ খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

আকাশের এক কোণে শুকতারাটা দপ্ দপ্ করে জ্বলছিল।

ভোর রাতের দিকে ঘুম ভেঙে গিয়ে কালু যখন উঠে বস্‌ল, তখন পেটের আগুনে তার বত্রিস নাড়ী হজম হয়ে যাবার যোগাড় হয়েচে।

সে ডাক্‌ল...ফতি...

সাড়া না পেয়ে সে তাকিয়ে দেখ্‌ল ফতিমা ঘরে নেই। উঠে দাওয়ায় এসে জোরে ডাক্‌ল...ফতি

দাওয়ার ওপর রাতের সেই নোটখানা কোঁচ্‌কান অবস্থায় পড়েছিল। সেটার দিকে দু একবার তাকিয়ে সে ডাক্‌ল ....ফতি ....

এবারেও কোন সাড়া না পেয়ে সে ভাব্‌ল ফতিমা নিশ্চয় পাশের বাদাড়টায় কল-পাকুরের সন্ধানে গেচে। মনে মনে খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে, সে ডোবার দিকে চল্‌ল হাত মুখ ধুতে।

ছোট্ট পানা পুকুর। ধার থেকে একটা পিটুলী গাছ জল ছুঁয়ে নুয়ে পড়েচে। তারি তলায় পানার মধ্যে কি একটা ভাস্‌ছিল। একটু নিপুণ ভাবে তাকাতেই ফতিমার ছেঁড়া ডুরেটার মতো খানিকটা কাপড় কালুর নজরে পড়ল।

বিদ্যুৎশিখা যেমন করে আকাশের বুক চিরে ঝলসে যায় কালুর মাথার মধ্যে একটা আশঙ্কা তেম্‌নি মুহূর্তে খেলে গেল। সে রুদ্ধ নিশ্বাসে পিটুলী গাছটার দিকে ছুটল।

ফতিমার মৃতদেহটা পাঁজাকোলা করে এনে কালু দাওয়ার ওপর রাখ্‌ল। চোখ তার শুকনো...অসম্ভব রকম রাঙা। হাঁটুর ওপর ফতিমার মুখটা তুলে সে আচ্ছন্নের মত বসে রইল।

অভিভূত ভাব কেটে গিয়ে যখন তার জ্ঞান হল, তখন রোদ উঠেচে, আর তার সমস্ত শরীর উত্তেজনায়, অবসাদে, শোকে, ক্ষিদেয় ঝাঁ ঝাঁ করচে।

আর একবার ফতিমার প্রাণহীন মুখের দিকে তাকিয়ে, খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে. সে হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর কম্পিত পদে দাওয়ায় পড়া নোটখানা তুলে নিয়ে খাবারের দোকানের উদ্দেশে ছুটল।



দৈববন্ধন

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

চারিটি লোকের সভা—কুমুদনাথ, তাঁহার স্ত্রী নির্ম্মলা, উভয়ের পুত্র রঘুনাথ; এই তিনজন আমাদের মতই, চতুর্থ ব্যক্তিটিই অন্য রকমের। তিনি গৃহস্থ নন, সন্ন্যাসী। সংসারে যখন ছিলেন তখন তাঁহার নাম ছিল, রামপ্রিয় গোস্বামী; এখনকার পারমার্থিক নাম তাঁর শ্রীমৎ বুধানন্দ স্বামী। কুমুদনাথ আর রামপ্রিয় বাল্যে ও যৌবনে সহপাঠী ছিলেন, উভয়ে বড়ই প্রণয় ছিল। এখন তাঁহাদের জীবনের ধারা ও আদর্শ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ও বিভিন্ন হইলেও বন্ধুতা অটলই আছে। তাই বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া বহুদিন পরে মুণ্ডিত-শির গেরুয়া পরিহিত বুধানন্দ—আজ প্রিয় বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

দেশদেশান্তরের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অনেক গল্প শুনিয়া কুমুদনাথ বলিলেন,—এমন কিছু কি তুমি পাওনি যা এ সবের চাইতেও আশ্চর্য্য?

বুধানন্দ বলিলেন,—পেয়েছি।

—একখানা চিঠিতে একবার একটা বাঁদরের থাবার কথা কি লিখেছিলে যেন?

—তারি কথাই বলছি। বলিয়া বুধানন্দ তাঁহার বিপুলবিস্তার আলখেল্লার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া সত্য শুষ্ক একটা বাঁদরের থাবা সত্য সত্যই বাহির করিয়া আনিলেন এবং সেটাকে সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া নিরুত্তম কাতরতার সহিত তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। বলিলেন,—এই সেই জিনিস।

নির্ম্মলা আগ্রহভরে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু বুধানন্দ সেটাকে চোখের সামনে রাখিতেই বস্তুটির বদর্থতায় তিনি মুখ ফিরাইয়া লইয়া সোজা হইয়া বসিলেন। রঘুনাথ পরীক্ষকের মত সোৎসুকে সেটাকে হাতে তুলিয়া লইল। কুমুদনাথ প্রশ্ন করিলেন,—তারপর এই অপূর্ব্ব সামগ্রীর অলৌকিকত্ব কি?

বুধানন্দ বলিলেন,—বলতে পার ভোজবিদ্যা, কিন্তু তা সত্য নয়। এক

মুসলমান উদাসীন ফকির এই থাবাটি মন্ত্রপূত করে' ছেড়ে দিয়েছেন। প্রমাণ হয়ে গেছে যে অদৃষ্টই মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে; সে-ই দেয়, সে-ই নেয়। তার কাজে বাধা দিলে মানুষ হাতে হাতে তার দুষ্কর্ম্মের শাস্তি পায়; অদৃষ্টের রোষ কেমন ভীষণ, সে যে খেলার জিনিষ নয়, এই থাবা তা' দেখিয়েছে। ফকিরের মন্ত্রগুণে এই থাবা তিনটি বিভিন্ন ব্যক্তির তিনটি বিভিন্ন ইচ্ছা পূর্ণ ক'রবে। ইহার ক্রিয়া অব্যর্থ।

বুধানন্দ থামিলেন, এবং আর তিনজন হাসিলেন। কিন্তু বুধানন্দের কণ্ঠস্বরে এমন সহজ একটা গুরু গাম্ভীর্য্যের বেগ ছিল যে তাঁহাদের অপ্রত্যয়ের হাল্কা হাসি তাঁহাদের নিজেরই কাণে শ্রুতি কঠোর ঠেকিল।

রঘুনাথ বলিল,—আপনি কেন তিনটি ইচ্ছা পূর্ণ করে' নেন্ না?

শুনিয়া বুধানন্দ এমনভাবে প্রশ্নকর্ত্তার দিকে চাহিলেন যেমন করিয়া অভিজ্ঞ বৃদ্ধ যৌবনের ধৃষ্টতাকে ক্লেশের সহিত মার্জ্জনা করে। তাঁর নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইল, বলিলেন,—নিয়েছি।

—সত্যই আপনার তিনটি ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছিল?

—হয়েছিল।

—আর কারো হয়েছে কি?

—প্রথম যে চেয়েছিল সে অভীষ্ট পেয়েছিল। তার দুটি আকাঙ্ক্ষা কি ছিল জানিনে, তৃতীয়টি ছিল মৃত্যু। দ্বিতীয় প্রার্থী আমি, পেয়েছি। প্রথম ব্যক্তির মৃত্যুর পরই এই কুহক আমি পাই। বলিয়া, বুধানন্দ কি যেন আবেগ দমন করিতেছেন, এমনিভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

সভা নিঃশব্দ হইয়া তাঁহার মুদ্রিত চক্ষুর দিকে চাহিয়া রহিল এবং চট্ করিয়াই তাঁহার স্বরের অহেতুক ত্রাস এবং দুঃখের সংক্রমণ যেন কাটাইয়া উঠিতে পারিল না। তাঁহাদের মনে হইল, ঐ মুদ্রিত চক্ষু দুটির পাতা দুটি যেন বিরাট একটা অন্ধকারের সম্মুখে যবনিকার মত পড়িয়া আছে, পাতা দুটি উঠিয়া গেলেই বন্ধন মুক্ত অন্ধকার হু হু শব্দে ছুটিয়া বাহির হইবে। কিন্তু বুধানন্দ চোখ খুলিতেই তাঁহারা দেখিলেন, ম্লানভাবটুকু ইতিমধ্যেই কাটিয়া তাঁহার চোখ স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে।

একটু হাসিয়া কুমুদনাথ বলিলেন,—তোমার তিনটি ইচ্ছাই যখন পূর্ণ হয়েছে তখন প্রয়োজন শেষ হয়েছে। তবে কেন সঙ্গে রেখেছ এটাকে?

—জানিনে কেন। বোধ হয় খেয়াল।

যদি আরও তিনটি ইচ্ছাপূর্ণ করবার ক্ষমতা এর থাকৃত তবে কি করৃতে?

—জানিনে।

কুমুদনাথ থাবাটা হাতে করিয়া তার আঙুলগুলি টানিতে টানিতে বলিলেন,—তোমার যদি প্রয়োজন না থাকে তবে আমাকে দেও এটা।

—না, দেব' না।

—কেন দেবে না?

বুধানন্দের চোখের উপর আবার সেই বিষণ্ণতার ছায়াপাত হইল। বলিলেন,—মানুষের অভিসম্পাতকে আমি বড় ডরাই। মর্ম্মান্তিক আহত হ'য়ে মানুষের অন্তস্থল ভেদ করে যে বাক্য বেরিয়ে আসে তা' অমোঘ, তা' কখন ব্যর্থ হয় না। মানুষের ঈশ্বরত্ব ঐটুকু।

কুমুদনাথ কথাটা ভাল বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন,—কি কথায় কি কথা বল্‌ছো হে?

অসংলগ্ন মনে হচ্ছে? আমার অনেক কথাই আজ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করনি, এটাও না হয় না করলে। এ জিনিষ আমি তোমার হাতে দেব না। দুঃখ ত' সৌখীন জিনিষ নয়। বলিয়া বুধানন্দ হাত বাড়াইয়া দিলেন।

কুমুদনাথ বলিলেন,—না, আমার কাছে থাক্। কেমন করে চাইতে হয়?

—হাতের পাতার ওপর রেখে হাত তুলে' সশব্দে।

—শুনতে ঠিক আরব্য উপন্যাসের মত, বলিয়া নির্ম্মলা হাসিলেন। বলিতে লাগিলেন,—তিনটার মধ্যে আমার ফরমাস, আমার জন্য আর দুখানা হাত।

সঙ্গে সঙ্গে কুমুদনাথ থাবা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই বুধানন্দ লাফাইয়া উঠিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া প্রাণপণ শক্তিতে নীচের দিকে টানিতে লাগিলেন। অন্ধ পথিক না জানিয়া গভীর গহ্বরের মুখের প্রান্তে পা তুলিলে দর্শক যেমন প্রাণান্তকর অস্থিরতায় হায় হায় করিতে করিতে ছুটিয়া আসে, বুধানন্দের এই নিষেধের ভিতর তেম্‌নি একটা সকরুণ ব্যাকুলতা দেখা গেল। কুমুদনাথের হাত চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াই তিনি বলিলেন,—আমার বারণ না শুনে যদি চাইবেই তবে এমন কিছু চাও যা' সম্ভব। অবিশ্বাস করো না, আমি আবার বলছি।

কুমুদনাথ বসিলেন।

বুধানন্দ বলিতে লাগিলেন,—চাইবে চাও, কিন্তু কৃতকর্ম্মের ফলের দায়ী তখন আমায় করো না। আর একটা কথা, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবেই, কিন্তু তা'

এমন অনাড়ম্বর স্বাভাবিক সহজভাবে যে মনে হবে চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার হেতুগত কার্য্যকারণ সম্পর্ক নেই।

কুমুদনাথ মনে মনে বলিলেন,—ঐ খানটাতেই তোমার ফাঁকি। প্রকাশ্যে বলিলেন,—কথাটা আমাদের মনে থাকবে।

বুধানন্দ চলিয়া গেলে কুমুদনাথ হাসিয়া বলিলেন,—বুড় সন্ন্যাসী হ'লে কি হয়, প্রকৃতি ঠিক আগের মতই আছে দেখ্‌ছি। ছেলেবেলাতেই যাদু বিদ্যার বই থেকে যত সব মন্ত্র তন্ত্র মুখস্থ করে এসে আমাদের আকাশে অদৃশ্য করে দিতে চাইত; ভস্ম আর জটা দেখলেই তার পেছনে ফেউ লেগে যেত; ঝাড় ফুক আরও কত যে কি করতো মনেও নেই। আজগুবি হিসেবে সেই রকমই আছে দেখছি।

নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার কি মনে হয়? এটা কি আজগুবি?

—নয় ত কি সত্যি?

—শুধু চাওয়ার অপেক্ষা, মুখ ফুটে চাইলেই কুবেরের ভাণ্ডার একটা সাম্রাজ্য আর স্বর্গসুখ ছাপ্পর ফুঁড়ে ঝুপ করে সাম্‌নে পড়বে। মন্দ কি?

রঘুনাথ বলিল—উনি ত' মায়ামুক্ত জীব। সশরীরে বৈকুণ্ঠে গেলেও ত পারেন।

নির্ম্মলা অন্যমনস্ক ছিলেন। বলিলেন,—কে?

—ঐ বুধানন্দ। বলিয়া রঘুনাথ পিতার দিকে চাহিল।

কুমুদনাথ বলিলেন,—আমি কি চাই তাই ভাবছি। মানুষে যা চায় সবই ত' আমার আছে। বলিয়া অপার সন্তোষ ও তৃপ্তির সহিত স্ত্রী পুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন। নির্ম্মলা সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া স্বামীর সৌভাগ্যের সন্তোষ আশীর্ব্বাদের মত গ্রহণ করিলেন। রঘুনাথ চক্ষু নত করিয়া লজ্জা লুকাইল।

নির্ম্মলা বলিলেন, পাঁচ হাজার টাকা চাও, নমুনো। আরও দুটো বর হাতে রইলো। যদি পাওয়া যায় তবে ভেবে চিন্তে বড় বড় দেখে চাওয়া যাবে।

—বেশ, তাই হোক্। বলিয়া কুমুদনাথ গাত্রোত্থান করিয়া প্রস্তুত হইলেন।

নির্ম্মলা ও রঘুনাথ কৌতুক হাস্য লইয়া চাহিয়া রহিলেন; কুমুদনাথ থাবাটা করতলের উপর সযত্নে বিন্যস্ত করিয়া লইয়া কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত স্পষ্টস্বরে উচ্চারণ করিলেন,—হে কপিহস্ত, আমি তোমার কাছে পাঁচ সহস্র মুদ্রা চাই—বলিতে বলিতেই তিনি ভীতস্বরে অস্ফুট একটা নিনাদ করিয়া শশব্যস্তে হাত

ঝাড়িয়া ফেলিলেন, থাবাটা ছিট্‌কাইয়া দূরে যাইয়া পড়িল; কুমুদনাথ একদৃষ্টে থাবাটার দিকে চাহিয়া কেমন যেন করিতে লাগিলেন।

—কি হ'ল? বলিয়া নির্ম্মলা ও রঘুনাথ অগ্রসর হইয়া আসিলেন।

নোংরা স্পর্শে যেন গা ঘিন্‌ ঘিন্‌ করিতেছে এমনিভাবে মুখ বিকৃত করিয়া কুমুদনাথ বলিলেন,—ওটা আমার হাতের উপর নড়ে' উঠেছে' কোমরভাঙ্গা সাপের মত মোচড় খেয়ে। বলিয়া দারুণ বিরাগভরে তিনি অন্যদিকে চাহিলেন।

নির্ম্মলা বলিলেন,—তোমার ভ্রম।

কুমুদনাথ জোরের সহিত বলিলেন,—না, না, ভ্রম নয়, খুব স্পষ্ট। যাই হোক আমি বড় চমক্‌ খেয়েছি।

নির্ম্মলা বলিলেন,—বসো।

কুমুদনাথ বসিলেন।

রঘুনাথ থাবাটা কুড়াইয়া আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল; কড়িকাঠের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল,—কই, টাকার তোড়া পড়লো না ত' আকাশ থেকে! কতকাল উর্দ্ধমুখে চেয়ে থাকবো?

কুমুদনাথ এই কথাটায় হাসিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু হাসি তেমন ফুটিল না।

ইহার পর কেমন একটা ছম্‌ ছমে' অস্বস্তি লইয়া তিনজনেই নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন; তিনজনেরই মনের মধ্যে বুধানন্দের উচ্চারিত কথাগুলির এবং তাহা যে দুজ্ঞের্য় অনিবার্য্য অকুশলের দিকে নানা প্রকারে বার বার নির্দ্দেশ করিয়াছিল তাহারই একটা ঢুক্ন ঢুক্ন আবর্ত্তন চলিতে লাগিল। বাহিরে ঝড়ো' হাওয়া তীব্র-বেগে বহিতেছিল; কুমুদনাথ তাহার ঝটাপটির শব্দে ভয় ভয় বোধ করিতে লাগিলেন। একবার পাশের ঘরের জানালা একটা দড়াম্‌ করিয়া পড়িল; সেই শব্দে কুমুদনাথ—"ও কি?" বলিয়া স্পষ্টই চম্‌কিয়া উঠিয়া নির্ম্মলার দিকে চাহিয়া পরক্ষণেই অপ্রতিভ হইলেন।

নীরবতা ক্রমশঃ ভারি হইয়া উঠিয়া যেন পীড়া দিতে লাগিল।

রঘুনাথ মুখ তুলিয়া বলিল,—শু'তে গিয়ে না দেখি, বিছানার ওপর টাকার থলে রেখে দিয়ে কে যেন সিন্দুকের ওদিক্‌ থেকে মাথা তুলে' তুলে' উঁকি মারছে। মা সাবধান!

এবারেও রঘুনাথের হাসিটা থম্‌ থমে নীরবতার গুমোটের মধ্যে পড়িয়া এক মুহূর্ত্তও বাঁচিল না।

কুমুদনাথ ও নির্ম্মলা শুইতে গেলেন। রঘুনাথ ব'সিয়া রহিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তন্দ্রার ঘোরে যেন সে দেখিল, নির্ব্বাপিত প্রায় আগুনের স্বল্প-বিস্তার আলোকমণ্ডলের মধ্যে পুনঃ পুনঃ রকমফের মুখের ছায়া প'ড়িয়া নাচিয়া নাচিয়া অন্তর্হিত হইতেছে; শেষ মুখখানা কপির, আর তাহা ভয়াবহ ভঙ্গী করিতেছে। চট্ করিয়াই তাহার তন্দ্রার ঘোর নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া গেল এবং কতক ভয়ে কতক বিস্ময়ে সেইদিকে চাহিয়া তাহার চক্ষু নিষ্পলক হইয়া রহিল। যেন সেই আগুনের উপর জল ঢালিয়া দিবার উদ্দেশ্যে টেবিলের উপরকার গ্লাস্টার জন্ত তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইতেই সেই থাবাটার উপরেই তাহার হাত পড়িল; শিহরিয়া হাত টানিয়া লইয়া সে কাপড়ে হাত মুছিয়া ফেলিল, এবং অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে করিতে শুইতে গেল।

(২)

পরদিন সোমবার।

ঝল্‌মল্ প্রাতরৌদ্রে তিনজনেরই মন লঘু হইয়া গেল। রাত্রের সেই স্বল্পালোক, বুধানন্দের প্রত্যয়ের দৃঢ় গাম্ভীর্য্য ও প্রত্যয় করাইবার ক্রূর ভঙ্গী এবং এ-সবের সম্মীলিত প্রভাবে তাঁহাদের তিনজনেরই ইচ্ছাবিরুদ্ধ সাময়িক একটা অনিশ্চিত অভিভূতভাব—এখন তাদের কোনটাই ছিল না।

চায়ের টেবিলে বসিয়া কুমুদনাথ নিজেরই আতঙ্কের উল্লেখ করিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন,—ভোজবাজিওয়ালারা বড় চতুর। কথার তাড়নে অপরের মনটাকে আগে অবশ করে' দিয়ে নিজেরই হাতে নিয়ে যেন তাকে খেলায়। যে যত বড় বাক্‌পটু সে তত বড় যাদুকর। বুধানন্দ স্বামী খেলিয়েছে মন্দ নয়, ব্যাক্-গ্রাউণ্ড সাজিয়েছিল ভাল। বলিয়া টেবিলের উপর হইতে সেই থাবাটা লইয়া খোলা গা-আলমারীর তাক্ বরাবর ছুঁড়িয়া দিলেন, সেটা থপ্ করিয়া সেখানে পড়িল।

রঘুনাথ বলিল,—আবহাওয়াও ছিল বুধানন্দের ইন্দ্রজালের অনুকূল। বাহিরে ঝড়, ভিতরে অস্পষ্টতা, মানুষকে ভয় দেখাবার এরা খুব উপযোগী। তার উপরে বাঁদরের শুক্‌নো হাত, তা' আবার উদাসীন ফকীর কর্ত্তৃক মন্ত্রপূত।

নির্ম্মলা বলিলেন,—সব সন্ন্যাসীই তোমার বুধানন্দের মত নাকি? এ দিনেও ও-সব চলে দেখ্‌ছি। আমি ভাব্‌তাম, অসভ্যতার অন্ধকার পাড়াগাঁয়ের ঝোপে

জঙ্গলেই বাস করে। আর পাঁচ হাজার টাকা আমাদের কি এমন ক্ষতি ক'রতে পারে যে অমন ভীষণ মুখ করে' ভয় দেখিয়ে গেল?

রঘুনাথ বলিল,—থলিটা আকাশ থেকে মাথার উপর পড়ে' জখম করতে পারে। পাঁচ হাজার টাকার ওজন ত' বড় কম নয়!

কুমুদনাথ বলিলেন,—তা' বটে।

রঘুনাথ উঠিতে উঠিতে বলিল,—আমি আসার আগেই যেন টাকা ভেঙ্গে বসে' থেক' না, মা। এখন আসি। বলিয়া রঘুনাথ প্রস্থানোদ্যত হইল।

নির্ম্মলা পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে হলের চৌকাঠ পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিলেন। চলিতে চলিতে রঘুনাথ হাস্যময়ী জননীর দিকে দুইবার ফিরিয়া চাহিয়া রাস্তার মোড়ে অদৃশ্য হইয়া গেল।

রঘুনাথ বিলাতের পাশ ইঞ্জিনিয়ার, সাত শো টাকা মাহিনার চাকরী করে।

সন্ন্যাসীরা শতকরা একশতটিই গঞ্জিকাসেবী হইলেও এবং নেশার ঝোঁকে যা' তা' বকিলেও নির্ম্মলার মনের কোণে একটা অজ্ঞাত আশার সঞ্চরণ সুরু হইয়াছিল। দরজার উপর ডাকপিয়নের করাঘাতটায় ইতিপূর্ব্বে তিনি কোন দিন ভ্রূক্ষেপও করেন নাই, কিন্তু আজ সেই শব্দটায় তিনি সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া নিজেই চিঠি আনিতে গেলেন। চিঠিগুলি সব একে একে পড়িয়া, অতি গোপনে যাহা আশা করিতেছিলেন তাহা না পাইয়া তিনি স্পষ্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন না, কিন্তু ক্ষোভের একটা দাগ যেন মনের উপর পড়িল। হাসিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন,—রঘুনাথ এসে, দেখো, টাকার কথাটাই আগে শুধোবে।

কুমুদনাথ মনের সঙ্গে তর্ক করিতেছিলেন। বলিলেন,—তোমরা যা-ই বল', বাঁদরের থাবা কিন্তু আমার হাতের ওপর মোচড় খেয়ে নড়েই উঠেছিল।

—তোমার মনে হয়েছিল যেন নড়ে' উঠ্‌লো।

—না, ভেবে দেখ্‌লাম, আমার ভুল হয় নি'। নড়েই উঠেছিল। বলিয়া কুমুদনাথ নিজের দক্ষিণ করতলটা চোখের অদূরে তুলিয়া ধরিলেন এবং সেই সঙ্গে নড়িয়া উঠার সুড়্‌সুড়ি আর সশঙ্ক ঘৃণাটা যেন তিনি পুনর্ব্বার অনুভব করিলেন। সেই স্থানে বাঁ হাতের আঙুল বুলাইয়া বলিলেন,—এখনও এ জায়গাটা কেমন কর্‌ছে।

বিকাল তিনটার সময় কুমুদনাথ ও নির্ম্মলা দেখিলেন, একটি ভদ্রলোক তাঁহাদের ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রবেশ করিবে কিনা তাহাই বিবেচনা করিতেছে, কিন্তু মন স্থির করিতে পারিতেছে না। তার থতমত ইতস্তত ভাবটা

কুমুদনাথ ভাল বুঝিতে পারিলেন না। বাজে লোক হইলে দুরভিসন্ধি আরোপ করা যাইত, কিন্তু পাত্র হিসাবে এ ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নয়। ফটকের উপর তিন-বার হাত রাখিয়া সে তিনবারই হাত টানিয়া লইল, অথচ এক মুহূর্ত্তও এক স্থানে সে সুস্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছিল না।

নির্ম্মলা সেই পাঁচ হাজারের সঙ্গে আগন্তুকের আবির্ভাব জুড়িয়া লইয়া লক্ষ্য করিলেন, লোকটার হ্যাট্ কোট্ প্রভৃতি মূল্যবান।

বহুবার অগ্র পশ্চাৎ করিয়া আগন্তুক নিজেকে সজোরে ঠেলিয়া লইয়া ফটক খুলিয়া ঢুকিয়া পড়িল। কুমুদনাথ হলের দরজা হইতে তাহাকে—"আসুন।"—বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়া বসাইলেন। কিন্তু তাহার আচরণ বড় তাজ্জব বলিয়া তাঁহাদের মনে হইল। আগন্তুক চৌকিতে বসিয়া ঘাড় গুঁজিয়া রহিল; একবার কুমুদনাথ আর নির্ম্মলার দিকে সে চোখ তুলিল বটে কিন্তু তাহা আড়ে আড়ে আর মুহূর্ত্তের জন্য।

কুমুদনাথ কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি দরকার আপনার?

আগন্তুক তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে মাথা তুলিয়া নির্ম্মলার দিকে চাহিয়া এমনই ম্রিয়মাণ হইয়া গেল যে কুমুদনাথ ও নির্ম্মলা যথেষ্ট শঙ্কিত হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন। আরও কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবেই কাটিয়া গেল। কে এ? কি বলিতে আসিয়াছে? কথা কেন বলে না? আচরণ ইহার একেবারেই স্পষ্ট নয়, তথাপি সেই অস্পষ্টতার ভিতর দিয়াই যেন একটা অনির্ব্বচনীয় কম্পনের বেগ তাঁহারা অনুভব করিতে লাগিলেন। উৎকণ্ঠা সহ্য করিতে না পারিয়া নির্ম্মলা কিছু বিরক্তির সহিতই বলিলেন,—কি কাজে এসেছেন আপনি বলুন।

কুমুদনাথের দিকে চাহিয়া আগন্তুক বলিল,—আমি ম' এ্যাণ্ড মেকিন্স কোম্পানীর অফিস্ থেকে আস্‌ছি। তাঁরাই আমাকে পাঠিয়েছেন।

—কোনো খবর আছে? সেখানে আমাদের পুত্র রঘুনাথ কাজ করে।

—জানি। তাঁরি খবর এনেছি।

নির্ম্মলা চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন,—তার খবর? কি খবর?

আগন্তুক কথা কহিল না, চক্ষু নত করিয়া রহিল।

—বলুন, বলুন, কি হয়েছে তার?

নির্ম্মলার ব্যাকুলতা দেখিয়া কুমুদনাথ বলিলেন,—আগেই ব্যস্ত হ'ও না। আপনি কি দুঃসংবাদ এনেছেন?

—রঘুনাথ, বলিয়া আগন্তুক আবার থামিল।

কুমুদনাথ বলিলেন,—আহত হয়েছে ?

—হাঁ, তবে যন্ত্রণা এখন নেই, যন্ত্রণার হাত থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন।

নির্ম্মলা বলিলেন,—খুব বেশী আঘাত লাগেনি' ত ? এখন সে কেমন আছে ? কেমন করে' সে—বলিতে বলিতেই যন্ত্রণামুক্তির নিহিত অর্থটা বজ্রাগ্নিশিখার মত দপ্ করিয়া বুকের ভিতর জ্বলিয়া উঠিয়া তাঁর মনে হইল যেন ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর অন্তরাত্মা সুখদুঃখে স্পন্দনশীল চেতনাচেতন বোধশক্তির শেষসীমা অতিক্রম করিয়া স্তম্ভিত অসাড় হইয়া গেল। জীবনের লক্ষণের মধ্যে শুধু তাঁর রক্তহীন নিম্নাধর থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিতে লাগিল।

কুমুদনাথ নির্ম্মলার ডান হাতখানা দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হয়েছিল ?

—কল যখন চল্‌ছিল তখন তার দাঁতের সঙ্গে তার গায়ের জামা আট্‌কে' গেছ্‌ল। কুমুদনাথের রক্তবর্ণ শুষ্ক চক্ষু দিয়া যেন অগ্নি নির্গত হইতেছিল। তাহারই দিকে চাহিয়া একটু থামিয়া আগন্তুক বলিতে লাগিল,—আমি কোম্পানীর ভৃত্য, তাঁদের সংবাদবাহক মাত্র। কোম্পানী এই দুর্ঘটনার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত কিন্তু দায়ী নন্। আপনাদের পুত্রের কর্ম্মদক্ষতায় কোম্পানী বড় প্রীত হয়েছিলেন। কিছু ক্ষতিপূরণ দেবার প্রস্তাবও তাঁরা করে' পাঠিয়েছেন।

কুমুদনাথ স্ত্রীর হাত ছাড়িয়া দিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁর শুষ্ককণ্ঠ দিয়া বাহির হইল,—কত ?

—পাঁচ হাজার।

নির্ম্মলার অসাড়তা শূলবিদ্ধ হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। কুমুদনাথ দৃষ্টিহীন অন্ধের মত সম্মুখে শূন্যের মধ্যে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সংজ্ঞা হারাইয়া ভূপতিত হইলেন।

(৩)

এত শীঘ্র সব শেষ হইয়া গেল যে আশার মোহ ঘুচিতে চাহিল না। মায়ের প্রাণ অনুক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া থাকে—একটি মা আহ্বান কি বিশ্বের কোনো প্রান্ত হইতে ফিরিয়া আসিবে না ? বলিবে না, আমি আসিয়াছি মা, তুমি দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিলে। এই দুর্ব্বহ দুঃসহ পর্ব্বতভার মহাশূন্যতা উত্তোলিত করিতে পারে, বিধাতার রাজ্যে এমন কি কিছুই ঘটিবার নাই ? বুকজোড়া চিতাগ্নির শিখা

মর্ম্মস্থল নিরন্তর লেহন করিতেছে—কোন্ বিধাতার চরণতলে সে জ্বালা জুড়াইবার শান্তিবারি সঞ্চিত হইয়া আছে!

আশা ক্রমশঃ নিঃশেষে বিলীন হইয়া হতাশ্বাস ও বৈরাগ্যে পরিণত হইল। স্বামী স্ত্রীতে আর কথা হয় না, বলিবার কিছু নাই। নির্জ্জন দীর্ঘ দিবস, বিনিদ্র দীর্ঘ রজনী কাটিতে চাহে না, উভয়ে ক্লান্ত অবসন্ন অচল হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

সপ্তাহখানেক পরে গভীর রাত্রে হঠাৎ তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া কুমুদনাথ দেখিলেন, নির্ম্মলা শয্যায় নাই, ঘর অন্ধকার, অন্ধকারের ভিতর অদূর হইতে চাপা কান্নার অস্ফুট শব্দ আসিতেছে। সস্নেহে ডাকিলেন,—নির্ম্মল, বিছানায় এস।

ক্রন্দনের বেগ বাড়িল।

কুমুদনাথ উঠিয়া বাতি জ্বালিলেন। দেখিলেন, নির্ম্মলা কক্ষতলে উপুড় হইয়া পড়িয়া লুটাইতেছেন। কুমুদনাথ ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া নির্ম্মলার শিয়রে বসিয়া তাঁর মাথার উপর হাত রাখিলেন। গাঢ়স্বরে বলিলেন,—ওঠো, ঠাণ্ডা লাগ্‌বে।

—ঠাণ্ডা? কোথায় ঠাণ্ডা? ঠাণ্ডা হলেই ত' বাঁচি। আমার রঘুনাথের দেহের উত্তাপ—বলিতে বলিতে সহসা উঠিয়া বসিয়া নির্ম্মলা স্বামীর গলা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন, তখনই গলা ছাড়িয়া দিয়া হাতে হাত চাপ্‌ড়াইয়া বলিতে লাগিলেন,—সেই থাবা! বাঁদরের সেই থাবা!

ভয়ে চম্‌কিয়া উঠিয়া কুমুদনাথ বলিলেন,—কোথায়? কি হয়েছে তার?

আলুথালু চুলগুলি ক্ষিপ্রহস্তে জড়াইয়া লইয়া নির্ম্মলা টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কুমুদনাথের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিলেন,—ওঠো, আনো সেই থাবা, আমি চাই! কোথাও রেখেছ ত'? নষ্ট করে' ফেলনি ত'?

কুমুদনাথের বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

—কেন? বৈঠকখানায় আছে। কি করবে তা' দিয়ে?—বলিয়া কুমুদনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে নির্ম্মলা বলিতে লাগিলেন,—নিয়ে এস সেটা। হঠাৎ আমার মনে প'ড়লো। আগে কেন আমার মনে পড়েনি? তুমি কেন মনে করনি?

—কি মনে করিনি?

—আরও দুটো ইচ্ছা সে আমাদের পূর্ণ ক'রবে যে। জানো না তা? আমাদের একটা ইচ্ছা সে পূর্ণ করেছে—

—একটাই কি যথেষ্ট হয় নি ?

—না হয়নি। যাও নিয়ে এস, এবার আমি তার কাছে রঘুনাথের পুনর্জ্জীবন চাইব।

কুমদনাথের সর্ব্বাবয়ব কম্পিত হইতে লাগিল। বলিলেন,—কি বল্‌ছ তুমি নির্ম্মল ? অসম্ভব—অসম্ভব, তা হবার উপায় নেই।

—আছে। আনো, নিয়ে এস শীগ্‌গির।

—চল, শোবে চল, যা' হবার নয়—

—কেন নয় ? আমাদের প্রথম ইচ্ছা পূর্ণ হ'য়েছে, দ্বিতীয়টা কেন হবে না ? যাও—

—তুমি জানো না নির্ম্মল। তার দেহ—তখনই সে দৃশ্য আমি সহ্য ক'রতে পারিনি। এখন—

—তুমি ভেবেছ আমি ভয় পাবো ? ভয় আমি পাবো না। সে যে রঘুনাথ, আমার পেটের সন্তান। যাও, নিয়ে এস, আর কতবার ব'ল্‌বো।

যেখান হইতে কেহ ফেরে না সেই অপরিজ্ঞাত লোক হইতে পুত্রকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিতে হইবে ইহারই দুর্নিবার দুরন্ত আগ্রহ নির্ম্মলার প্রতি অঙ্গে যেন নখদংষ্ট্রা মেলিয়া হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে। কুমুদনাথ স্ত্রীর এই মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আর প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না, নীচে নামিয়া গেলেন। নীচের ঘর অন্ধকার ছিল, আলোক হইতে আসিয়া তাহা আরও দুর্ভেদ্য মনে হইল, তবু পরিচিত স্থানে যাইয়া পৌঁছিতে তাঁর কষ্ট হইল না। থাবাটা তাকের উপর ছিল। সেটা হাতে করিতেই এই ভয়টাই তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল যে, অনুচ্চারিত ইচ্ছার আকর্ষণেই রঘুনাথ তার ছিন্নভিন্ন বীভৎস দেহ লইয়া তিনি কক্ষ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই আসিয়া না পড়ে। কুমুদনাথের প্রকৃতিই ছিল এইরূপ যে, কেহ ভয় দেখাইলে তিনি ভয় পাইতেন না, নিরপেক্ষ বিচারক সাজিয়া চুপ করিয়া কথার ওজন রক্ষা হইতেছে কিনা দেখিতেন। কিন্তু তাঁহার নিজের মনে অকারণ সংশয় বা অসম্পূর্ণ বিশ্বাসের সূত্র ধরিয়া যে ভয় জন্মলাভ করিত তাহা তাঁহাকে একেবারে দিশাহারা করিয়া দিত। তাই অন্ধকার কক্ষে মন্ত্রপুত থাবা হাতে করিয়া ভয়ের তাড়নায় তাঁহার দিক্‌ভ্রম হইয়া গেল। দরজা কোথায় তাহা ঠাহর করিতে না পারিয়া অনুমানে চলিতে চলিতে তিনি টেবিলের সঙ্গে ধাক্কা খাইলেন, তাঁহার কপাল ঘামিয়া হিম হইয়া উঠিল। টেবিলের ধার হইতে হাতড়াইতে সুরু করিয়া তিনি দেয়াল ধরিলেন এবং

দেয়াল ধরিয়া সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়া যখন তিনি দরজা পাইলেন তখন তাঁহার মনে হইল এক যুগ সময় এই ঘরে তাঁর কাটিয়াছে। শ্রান্তদেহে উপরে আসিয়া দেখিলেন, নির্ম্মলার চেহারার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কেবল অস্বাভাবিক আশার উত্তেজনায় দুই চক্ষু প্রদীপ্ত।

নির্ম্মলা বলিলেন,—বল,—পুত্র রঘুনাথ পুনর্জ্জীবন লাভ করে' আমাদের কাছে ফিরে আসুক।

কুমুদনাথ হাত তুলিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন।

—বল।

কুমুদনাথ তথাপি নির্ব্বাক্।

নির্ম্মলা তাঁহার দিকে আঙুল তুলিয়া তীব্রকণ্ঠে আদেশ করিলেন,—বল।

এ আদেশ অমান্য করিবার মত মনের বল ভয়াবিষ্ট কুমুদনাথের ছিল না। তিনি যন্ত্রচালিতের মত আবৃত্তি করিলেন,—পুত্র রঘুনাথ পুনর্জ্জীবন লাভ ক'রে আমাদের কাছে ফিরে আসুক। বলিয়াই তিনি ঘর্ম্মাক্ত দেহে কাঁপিতে কাঁপিতে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। মন্ত্রপূত কুহকবিগ্রহ সেইখানেই ধূলায় পড়িয়া রহিল।

নির্ম্মলা জানালা খুলিয়া দিয়া সম্মুখের অন্ধকারের দিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিলেন,—পুত্র আসিতেছে। তাঁহার অন্তরব্যাপী কঠিনতম তমিস্রা অবোধ আশার আলোকে স্বচ্ছ হইয়া আসিলেও গুরুভার নীরবতার ভিতর দিয়া তাঁহার প্রতি মুহূর্ত্ত বুকের অস্থি কাটিয়া কাটিয়া টানিয়া টানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ঘরে বাতি জ্বলিতেছিল, সেটা শেষ পর্য্যন্ত পুড়িয়া আসিয়া তার আধারের ভিতর হইতে দেয়ালে ও ছাতের উপর বারকতক ছায়া নাচাইয়া একেবারে নিবিয়া গেল। কুমুদনাথ উঠিয়া আসিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই অন্ধকার তাঁর অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁর মনে হইল, মৃত্যুপুরীর মত এই অন্তহীন নির্জ্জন নিঃশব্দ অন্ধকারের মধ্যে তিনি অসহায়, একা; এবং অসংখ্য প্রেতমূর্ত্তি আসিয়া প্রহরীর মত তাঁরই শয্যার চতুর্দ্দিকে সার বাঁধিয়া দাঁড়াইতেছে, পলায়নের পথ নাই। ঠিক এই সময়েই একটা ইঁদুর কোথায় খর্ খর্ শব্দ করিল। কুমুদনাথ ডাকিলেন,—নির্ম্মল! স্বর বড় কষ্টে ফুটিল।

আহ্বানের উত্তর আসিল না। তবু আর একটি লোক অনতিদূরেই আছে, নিজের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সেই কথাটি তাঁর মনে পড়িয়া গেল। একটু সাহস হইল। বাতিগুলি নীচে ছিল; তাহাই একটা আনিবার উদ্দেশ্যে কুমুদনাথ দিয়াশলাই

হাতে লইয়া উঠিলেন। একটা কাঠি জ্বালিয়া তিনি সিঁড়ির কয়েক ধাপ নামিলেন; আর একটি জ্বালিয়া শেষ ধাপে পা দিতেই কাঠির আগুন নিবিয়া গেল এবং সেই মুহূর্ত্তেই বাহির হইতে দরজার উপর যেন খট্ করিয়া একটা শব্দ হইল। শব্দ এত মৃদু যে ঠিক বোঝা গেল না। কুমুদনাথ সর্ব্বাঙ্গ নিশ্চল এবং নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া কাণ পাতিয়া রহিলেন। দ্বিতীয়বার শব্দ হইল আর একটু জোরে; কুমুদনাথ প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া অন্ধকারেই সিঁড়ি দিয়া উপরের দিকে ছুটিলেন; দিয়াশলাই সিঁড়ির উপর পড়িয়া গেল।

নির্ম্মলাও শয্যায় আসিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি?

—কিছু না, বলিয়া কুমুদনাথ শুইয়া পড়িয়া বালিশের ভিতর মুখ গুঁজিয়া দিলেন।

সেই সময়েই তৃতীয় করাঘাতের ধ্বনি ও তাহার প্রতিধ্বনি গৃহময় ব্যাপ্ত হইয়া গেল।

নির্ম্মলা সচকিতে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন,—কি ও?

কুমুদনাথ বালিশের ভিতর হইতে বলিলেন,—ইঁদুর, সিঁড়ির উপর ছুটে' বেড়াচ্ছে।

আবার শব্দ হইল, এবার আরও উচ্চতর।

ঐ রঘুনাথ এসেছে। বলিয়া নির্ম্মলা লাফ দিয়া নামিয়া দরজার দিকে ছুটিলেন; কিন্তু কুমুদনাথ তাঁহার পূর্ব্বেই দরজায় যাইয়া তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—জানো না নির্ম্মল, তুমি কি করতে যাচ্ছ।

—ছাড় ছাড়, রঘুনাথ এসেছে, নিয়ে আসি তাকে।

কুমুদনাথ নির্ম্মলার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—না, না, সে নয়।

—সে-ই, সে-ই, আমি তার ডাক চিনি না? দরজায় ঘা দিয়ে সে আমাকেই ডাকছে। পথ ছাড়—

বলিয়া তিনি কুমুদনাথকে প্রাণপণে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া নামিয়া গেলেন। কিন্তু কুমুদনাথ গেলেন না। যেখানে বাঁদরের থাবাটা ফেলিয়াছিলেন অনুমানে তিনি সেইখানে আসিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া তাহাকেই খুঁজিতে লাগিলেন। হাতড়াইতে হাতড়াইতে সেটা হাতে ঠেকিল। কুমুদনাথ থাবাটা লইয়া দ্রুতপদে যখন নীচে নামিয়া আসিলেন, তখন করাঘাত অবিশ্রান্ত ধ্বনিত হইতেছে এবং নির্ম্মলা নীচের ছিট্‌কিনি ও ডাণ্ডা খুলিয়া ফেলিয়াছেন।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে নির্ম্মলা বলিলেন,—খুলে' দাও ওপরের ছিট্‌কিনি,

আমি যে নাগাল পাইনে। বলিয়া নিজেই চেয়ার টানিয়া দরজার দিকে লইতে লাগিলেন।

দুঃসহ আতঙ্কে বাহ্যজ্ঞানবিরহিত কুমুদনাথ থাবাসমেত হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া উচ্চারণ করিলেন,—রঘুনাথ, তুমি যাও।

করাঘাতধ্বনি তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া গেল, ছিট্‌কিনিও তখনই খুলিল। নির্ম্মলার দুই ব্যগ্র বাহুর প্রচণ্ড আকর্ষণে দরজা খুলিয়া গেল—খোলা দরজার ভিতর দিয়া মুখ বাহির করিয়া তিনি দেখিলেন, জনশূন্য রাজপথের উপর কয়েকটা আলো শুধু মিটিমিটি জ্বলিতেছে।





(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ক্রাফ্‌ট পরিবারের আর্থিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। কোন মতে কায়ক্লেশে দিন গুজরান হয়। এই অবস্থা বিপর্য্যয়ের কথা অন্য সকলের অপেক্ষা ক্রিস্তফ্‌ অধিক পরিমাণে বুঝিতে পারে। মেলশিয়োর যেন 'কিছুই জানে না'। আহারের সময় সিদ্ধ আলুপূর্ণ পাত্রটি প্রথমে তাহারই সম্মুখে ধরা হয়, তাহার ভাগে কণামাত্র কম পড়ে না। চীৎকার করিয়া অনবরত বকিয়া যায়, আপনার রসিকতায় আপনি মুগ্ধ হইয়া হাসিয়া উঠে এবং সেই সঙ্গেই প্রায় সমস্ত আলু আপনার পাতে ঢালিয়া লইতে থাকে। এই সময় লুইসার মুখে যে শুষ্ক হাসির রেখা ফুটিয়া উঠে তাহা সে দেখিতে পায় না। আপনার ইচ্ছামত খাবার লইয়া সে যখন ডিস্‌টিকে লুইসার দিকে ঠেলিয়া দেয়, তখন তাহা প্রায় শূন্যই থাকে। উহা হইতে লুইসা প্রথমে তাহার শিশুপুত্র দুইটিকে খাইতে দেয়—দুইটি করিয়া সিদ্ধ আলু তাহাদের বরাদ্দ! ক্রিস্তফের ডিস্‌টি নিকটে যখন আসে তখন প্রায়ই দেখা যায় তাহাতে তিনটি মাত্র আলু রহিয়াছে; এবং তখনও লুইসা বাকী! ক্রিস্তফ পূর্ব্ব হইতেই এ বিষয়ে সতর্ক থাকে, মনে মনে হিসাব ঠিক করিয়া রাখে; লুইসা তাহার পাতে সিদ্ধ আলু দিতে আসিলে ঈষৎ উদাসীনতার সুরে বলে—একটা, মা, বেশী দিও না।

লুইসার বুক যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে। বলে—সকলে দুটো ক'রে নিল, তুইও নে—'

ক্রিস্তফ বলে—না, মা, একটা।

তোর ক্ষিধে পায়নি ?

না, ভাল ক্ষিদে নেই মা।

লুইসা নিজেও একটা মাত্র সিদ্ধ আলু আপনার ডিসে তুলিয়া লয়, তাহার পর দুইজনে অতি সাবধানে খোসা ছাড়াইয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া একটি একটি করিয়া মুখে তুলিয়া অতি ধীরে খাইতে থাকে। লুইসা ক্রিস্তফকে সমস্তক্ষণ দেখিতে থাকে, তাহার খাওয়া শেষ হইলে বলে—আর একটা দিই ?

ক্রিস্তফ উত্তর দেয়—না মা।

তোর অসুখ হয়েছে বুঝি ?

অসুখ করেনি মা, খুব খেয়েছি, তাই।

এইবার পুত্রের অবাধ্যতায় বিরক্ত হইয়া মেলশিয়োর বকিয়া উঠে এবং ডিসে রক্ষিত শেষ আলুটি আপনার পাতে তুলিয়া লয় !

পিতার এই ব্যবহার দুই একদিন দেখিয়া ক্রিস্তফ আর তাহার প্রাপ্য অংশ লইতে আপত্তি করিত না। প্রতিদিনের মত একটি আলু খাইয়া বাকীটি তাহার ছোট ভাই আর্নেষ্ট-এর জন্য রাখিয়া দিত। আর্নেষ্ট-এর ক্ষুধার শান্তি কিছুতেই হয় না। সমস্ত সময় সে ক্ষুধার্ত্ত ! ক্রিস্তফকে সে খাইতে দেখে, শেষে প্রশ্ন করে—তুই ওটা খাবি না বুঝি ? আমায় দে ভাই—'

ক্রিস্তফএর মন তাহার পিতার প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠে। কি মানুষ ! একবার আমাদের কথা ভাবে না, আমাদের মুখের গ্রাসও যে ও খেয়ে ফেলে সে কথা কি জানে না !...

অসহ্য ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া ক্রিস্তফ ভাবে, সে যে তাহার পিতাকে শ্রদ্ধা করে না তাহা তাহাকে স্পষ্ট বলিবে কিন্তু এই সময় আত্মাভিমান আসিয়া তাহার ক্ষুদ্র মনটিকে ঘিরিয়া ধরে, ভাবে তাহার ও-কথা বলিবার অধিকার নাই, সে ত উপার্জ্জন করে না ! পিতারই উপার্জ্জিত অর্থে সে পালিত। তাহার মনে হয়, সে যেন অকর্ম্মণ্য, অপদার্থ, সকলের ভার হইয়া আছে, তাহার কথা বলিবার অধিকার নাই। হয়ত পরে সে একদিন মুখ খুলিতে পারিবে—অবশ্য যদি এই 'একদিন' বলিয়া কিছু থাকে ;—কিন্তু এখন সে বাঁচে কি করিয়া ? বুঝি না খাইয়াই তাহাকে মরিতে হইবে !...

তাহার বয়সী অন্য ছেলেদের অপেক্ষা ক্ষুধাকে ক্রিস্তফ অধিক পরিমাণে উপলব্ধি করিত, অনাহারে তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইত। স্বাস্থ্যপূর্ণ তাহার শরীর, পেটের মধ্যে প্রচণ্ড বেদনা সে অনুভব করিত। সময় সময় তাহার সর্ব্ব শরীর

কাঁপিয়া উঠিত, তাহার মাথা ব্যথা করিত। তাহার মনে হইত তাহার বুকের মধ্যে যেন একটি গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে এবং সেই গর্ত্তটি যেন ক্রমাগত খোঁচা খাইয়া বাড়িয়া চলিয়াছে! কিন্তু সে কোন কথা কাহাকেও বলিত না।

লুইসার দৃষ্টি তাহার মুখের উপর পড়িয়া আছে বুঝিতে পারিয়া মুখের ভাব এমন করিয়া লইত যেন তাহার কিছুই হয় নাই।

লুইসা বুঝিত। ব্যথিত অন্তরে ভাবিত, ক্রিস্তফ নিজে না খাইয়া ভাইদের খাদ্য যোগাইতেছে! এই কথাটিকে সহস্র প্রকারে ভুলিতে চেষ্টা করিয়াও সে ভুলিতে পারিত না। এই ব্যাপারটিকে তলাইয়া দেখিবারও সাহস হইত না। ক্রিস্তফকে জিজ্ঞাসাও করিতে পারিত না যে সত্য সে ক্ষুধার্ত্ত কিনা। জিজ্ঞাসা করিয়াই বা কি লাভ হইবে? সত্যই সে ক্ষুধার্ত্ত থাকিলে সে কি তাহার ক্ষুধার শান্তি করিতে পারিবে? লুইসা নিজে বাল্যকাল হইতে এমনি সর্ব্ব বিষয়ে বঞ্চিত হইয়া আসিয়াছে। মুখ বুজিয়া সহ্য করা ছাড়া উপায় কি? যখন ঘরে খাদ্য নাই তখন সহ্য করিতেই হইবে।

কিন্তু লুইসা একবারও সন্দেহ করে নাই যে তাহার অপেক্ষা ক্রিস্তফের কষ্ট অধিক হইতেছে। লুইসার স্বাস্থ্য কোনদিনই ভাল নয়, তাহার প্রয়োজনও অত্যন্ত অল্প ছিল।

লুইসা ক্রিস্তফকে কোন কথা বলিল না কিন্তু একদিন যখন ছেলেরা পথে খেলা করিতে বাহির হইয়াছে মেলশিয়োর তাহার কাজে বাহির হইয়াছে, লুইসা ক্রিস্তফকে ঘরে থাকিতে বলিল, বলিল কিছু কাজ আছে।

ক্রিস্তফ ঘরে থাকিয়া মায়ের কাজে সাহায্য করিতেছে; গুলি-সূতার একটি তাল সে হাতে ধরিয়া আছে লুইসা জট্ ছাড়াইতেছে, সহসা সমস্ত জিনিষ দূরে ফেলিয়া লুইসা ক্রিস্তফকে বুকে চাপিয়া, তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিয়া আদর ঢালিয়া দিতে লাগিল। ক্রিস্তফ তাহার দুই হাত মা'র গলায় জড়াইয়া ধরিল, তাহার পর উভয়ের কান্না আর থামে না!

কাঁদিতে কাঁদিতে ধরা-গলায় লুইসা ডাকিল—মানিক আমার—সোণা আমার!...

ক্রিস্তফ বলিল, মাগো—মা মণি—'

তাহারা আর কোন কথা বলিল না,—পরস্পরকে যেন তাহারা বুঝিয়াছে।

* * *

এই পারিবারিক আর্থিক অনটনের বিষয় সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবার কিছু পূর্ব্বে একদিন ক্রিস্তফ সহসা আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, তাহার পিতা মাতাল!

প্রথম প্রথম মদ্যপান করিয়া মেল্শিয়োর তাহার স্বাভাবিক উচ্চ হাসি এবং চীৎকার করিয়া কথা বলার ভিতর দিয়া তাহার 'নেশার ঝোঁক' অনেকটা ঢাকিয়া লইতে পারিত এবং পাশবিক কোন বৃত্তিও সে সকলের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া ফেলিত না। নানা প্রকার অদ্ভুত এবং 'উদ্ভট্' মতামত প্রকাশ করিত, খুশীমনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেবিল চাপ্ড়াইয়া গান গাহিয়া যাইত কিম্বা লুইসা এবং ছেলেদের ধরিয়া নাচিতে সুরু করিয়া দিত।

ক্রিস্তফ দেখিত, তাহার খামখেয়ালি পিতাকে যথাসাধ্য তুষ্ট করিয়া তাহার মা পুনরায় তাহার কাজে মন দিতেছে। তাহার মুখ ম্লান! মেল্শিয়োরের দৃষ্টি যথাসাধ্য এড়াইতে চেষ্টা করিতেছে বা মেল্শিয়োর হাসিয়া ঠাট্টার কোন কথা বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিলে অত্যন্ত নম্রভাবে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইতেছে।

কিন্তু ক্রিস্তফ ঠিক বুঝিতে পারিত না, কেন তাহার মা ইহাতে যোগ দেয় না! তাহার নিজের আনন্দ করিবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল ছিল। মেল্শিয়োর গৃহে ফিরিয়া হাসি গানের স্রোত বহাইয়া দিলে সেই দিনেতে সে উৎসবের আনন্দ অনুভব করিত। তাহাদের গৃহটি সর্ব্বদাই যেন গভীর বিষাদ সলিলে পূর্ণ থাকিত, তাহার মধ্যে এই পাগ্লামী বা ছেলেমানুষী ভাব আসিলে সে যেন অত্যন্ত আরাম অনুভব করিত।

সে, পিতার ঐ সমস্ত কথা শুনিয়া চীৎকার করিয়া হাসিত, তাহার সহিত গান গাহিত, নাচিত এবং লুইসা ক্রুদ্ধভাবে যখন তাহাকে ঐ সমস্ত হইতে বিরত হইতে আদেশ দিত তাহার মন অশান্তিতে ভরিয়া যাইত।– কেন? ইহাতে অন্যায় কি আছে? পিতাও ত করিতেছে!

ক্রিস্তফ সমস্ত বিষয় অত্যন্ত সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিয়া যায়, শুনিয়া বুঝিতে ও মনে রাখিতে চেষ্টা করে এবং তাহার পিতার ঐরূপ ব্যবহার তাহার কাছে ঈষৎ অদ্ভুত ঠেকিলেও সে মুগ্ধ হইয়া যায়।

শিশুদিগের ভালবাসিবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল, ভালবাসিবার মানুষকে তাহাদের অত্যন্ত প্রয়োজন। সম্ভবত ইহাই তাহার আপনাকে ভালবাসারই চিরন্তন আর একটি দিক বা প্রকাশের পথ।

মানুষ যখন জানিতে পারে, আপনার ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিয়া তাহার

আত্মসম্মান রক্ষা করিবার শক্তি তাহার নাই, সে দুর্ব্বল, তখন সে অসহায় শিশুর মতই তাহার মাতা পিতার আশ্রয় লয়, কিম্বা যখন সে আপনার ভুল-ত্রুটি সারিয়া লইতে পারে না তখন সে তাহার শিশু পুত্রগুলির উপর সেই দোষ চাপাইয়া দেয়। কারণ সে জানে, উহারাই একদিন তাহার সমস্ত অপূর্ণ আশা, আকাঙ্খা পূর্ণ করিবে, তাহার সাহায্যকারী বন্ধু এবং তাহার শত্রুঘাতী হইবে। তাহার স্বার্থ-সিদ্ধির উপায় স্বরূপ ঐ পুত্রগুলির প্রতি এই নির্ভরতার মধ্যে যে আত্মগরীমা সে অনুভব করে তাহাকেই জোর করিয়া ভালবাসা বা স্নেহের আকারে প্রকাশ করে এবং ইহাতে সে অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করে।

ক্রিস্‌তফ তাহার পিতার প্রতি সমস্ত বিতৃষ্ণা ভুলিয়া তন্নতন্ন করিয়া তাহার সমস্ত বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিল।—সমস্তই তাহার ভাল লাগে। তাহার সুদীর্ঘ দেহ, বলিষ্ঠ বাহুদ্বয়, তাহার গলার স্বর, হাসিবার ও আনন্দ করিবার অদ্ভুত শক্তি—সমস্তই তাহার ভাল লাগে। যখন সে কোথাও শুনিতে পায় কেহ তাহার পিতার সুখ্যাতি করিতেছে, আনন্দে তাহার মুখ উজ্জল হইয়া উঠে। কিম্বা মেল্‌শিয়োর নিজ মুখে যখন আপনার গুণকীর্ত্তন করে,—কোথায় কি সম্মান সে লাভ করিয়াছে, তাহাতে সহস্র ডালপালা ও রং চড়াইয়া বকিয়া যায়; ক্রিস্‌তফ সে-সমস্ত বিশ্বাস করে, ভাবে, তাহার পিতা একজন অসাধারণ গুণী মানুষ, তাহার দাদুর গল্পের চেয়ে বড় নায়ক হইবার উপযুক্ত!

একদিন সন্ধ্যাবেলা, তখন প্রায় সাতটা হইবে, ক্রিস্‌তফ ঘরে একা আছে, তাহার অন্য ভাইগুলি জঁ। মিশেলের সহিত বেড়াইতে গিয়াছে, লুইসা গিয়াছে নদীতে কাপড় কাচিতে, সহসা দরজা খুলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই মেল্‌শিয়োর ঘরে ঢুকিল। মাথায় টুপি নাই, রুক্ষ চেহারা! চৌকাঠটি পার হইবার সময় অদ্ভুতভাবে এক লাফ দিল, তাহার পর টেবিলের কাছে একটি চেয়ারের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল!

ক্রিস্‌তফ ভাবিল, এ তাহার পিতার নিত্য রসিকতারই আর একটি রূপ, সে চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু পিতার কাছে আসিয়া তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতেই তাহার বুক শুখাইয়া উঠিল!

মেলশিয়োর চেয়ারের উপর বসিয়া আছে, তাহার হাত দুটি দুই দিকে ঝুলিতেছে, তাহার চোখের দৃষ্টি সামনের দিকে পড়িয়া আছে, কিন্তু সে যে কিছু দেখিতেছে তাহা মনে হয় না! চোখের পাতা ঘন ঘন পড়িতেছে। মুখ চোখ লাল, ঠোঁট দুইটি ঈষৎ বিভক্ত, মাঝে মাঝে বোকার মত হাসিয়া উঠিতেছে!

ক্রিস্‌তফ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, তাহার মনে আশা হইতেছিল বুঝি পিতা দুষ্টামি করিয়া অমন করিতেছে, কিন্তু যখন দেখিল তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না!—আতঙ্কে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে ভয়ে ভয়ে মেল্‌শিয়োরের কাছে আসিয়া ডাকিল—বাবা— ও বাবা!

মেল্‌শিয়োর তেমনি বকিয়া চলিয়াছে। ক্রিস্‌তফ তাহার হাত ধরিয়া প্রাণপণে নাড়া দিয়া আবার ডাকিল—বাবা—শোন লক্ষীটি আমি ডাকৃছি—'

ক্রিস্‌তফের ঝাঁকানিতে মেল্‌শিয়োর এমন করিয়া নড়িয়া উঠিল যেন তাহার শরীরে হাড় নাই! সহসা সে মাটির উপর গড়াইয়া পড়িল। তাহার পর ক্রিস্‌তফের দিকে চাহিয়া বিচিত্র সুরে ও ভঙ্গীতে কত কি বকিয়া যাইতে লাগিল, তাহার সেই ঘোলাটে জলভরা চোখের দিকে চাহিলেই ক্রিস্‌তফ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছিল। সে ছুটিয়া ঘরের কোণে তাহার বিছানায় গিয়া বালিশের মধ্যে মুখ লুকাইয়া রহিল।

মেল্‌শিয়োর টলিতে টলিতে চেয়ারে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার মুখ দিয়া অনবরত জড়িত অর্থহীন শব্দ বাহির হইতেছিল!

ক্রিস্‌তফ কাণে আঙ্গুল দিয়া পড়িয়া রহিল, ঐ শব্দকে সহ্য করিতে পারিতেছিল না। তাহার বুকের মধ্যে যে কি হইতেছিল তাহা প্রকাশ করা যায় না। দুঃখে আতঙ্কে তাহার বুকের মধ্যে যেন ঝড় বহিতেছিল, যেন তাহার কোন অতি প্রিয় এবং শ্রদ্ধার মানুষ এইমাত্র মারা গিয়াছে।

রাত্রি হইয়া আসিল, ঘরে তখনও কেহ ফিরিল না! সে একা ঐ মাতাল পিতার সহিত রহিয়াছে। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার ভয় বাড়িয়া চলিয়াছে, সে শুনিতে চাহে না, তবুও মেল্‌শিয়োরের সেই প্রলাপ উক্তি তাহার কাণে আসিতেছে, তাহার শরীরের রক্ত জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে। চারি পাশের নিস্তব্ধতা তাহার মনে গভীর আতঙ্কের রেখা টানিয়া দিতেছিল—ঘড়িটা টিক্ টিক্ করিয়া শব্দ করিয়া চলিয়াছে, কি বিশ্রী সে শব্দ! সে আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল সে ছুটিয়া ঘর হইতে পলাইয়া যায়, কিন্তু কি করিয়া সে যায়! যাইতে হইলে মেল্‌শিয়োরের নিকট দিয়াই তাহাকে যাইতে হইবে। কথাটি ভাবিতেই তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। সেই ঘোলাটে চোখ দুটো যদি সে আবার দেখিয়া ফেলে!—সে নিশ্চয়ই মারা যাইবে। কিন্তু সে চুপ করিয়া আর থাকিতেও পারিল না, বুকে হাঁটিয়া অতি সন্তর্পণে দরজার দিকে চলিল। সে ভাল করিয়া নিশ্বাস লইতে পারিতেছিল না। পিতার মুখের

দিকে সে চাহিবে না—তবু টেবিলের তলায় মেল্‌শিয়োর-এর পা দুটি যখনই নড়িয়া উঠিতেছিল, ভয়ে তখনই সে থামিয়া যাইতেছিল।

এই ভাবে কোন মতে সে দরজার কাছে আসিয়া কম্পিত হাতে 'হাতল'টি ধরিয়া ঠেলিল কিন্তু দরজা অল্প একটু খুলিতে না খুলিতেই সে ভয়ে তাহা ছাড়িয়া দিল, দরজা আবার বন্ধ হইয়া গেল।

মেল্‌শিয়োর শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া তাকাইল এবং সেই সঙ্গেই টাল্ সামলাইতে না পারিয়া পুনরায় চেয়ার শুদ্ধ মাটির উপর আছাড় খাইয়া পড়িল।

ক্রিস্তফের পলাইবার শক্তিটুকুও যেন আর ছিল না। সে দেওয়ালের ধারে তাহার পিতাকে দেখিতে দেখিতে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

চেয়ার হইতে মাটিতে আছাড় খাইয়া মাতাল মেল্‌শিয়োরের নেশার ঘোর কিছু পরিমাণে কাটিয়া গিয়াছিল। সে চেয়ারটিতে লাথি, চড়্, ঘুসি মারিয়া নানা অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়া পুনরায় উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু পারিল না। অবশেষে মাটির উপর পা ছড়াইয়া টেবিলের পায়ায় ঠেস্ দিয়া কোন মতে বসিয়া, চারিদিকে তাকাইয়া সব যেন চিনিতে পারিল। সে ক্রিস্তফকে দেখিতে পাইয়া কাছে ডাকিল।

ক্রিস্তফ পলাইতে পারিলে বাঁচে, ভয়ে সে নড়িতে পারিল না। মেল্‌শিয়োর তাহাকে পুনরায় ডাকিল এবং সে তখনও তাহার কাছে না আসাতে বিষম রাগিয়া বকিতে সুরু করিয়া দিল। ক্রিস্তফ কাঁপিতে কাঁপিতে অতি ধীরে এক পা এক পা করিয়া তাহার কাছে আসিলে মেল্‌শিয়োর তাহাকে ধরিয়া আপনার কোলের উপর বসাইয়া তাহার কাণ মলিয়া জড়ান গলায় বকিয়া 'সহবৎ' শিক্ষা দিতে লাগিল। তাহার পর সহসা তাহার মতির পরিবর্ত্তন হইল। সে ক্রিস্তফকে ধরিয়া তাহার শরীরের নানাস্থানে কাতুকুতু দিয়া হাতের উপর লোফা-লুফি করিতে করিতে অজস্রভাবে নানা নির্ব্বোধ বিদ্রূপের কথা বলিয়া যাইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই হাসিয়া সে নিজেই লুটাইয়া পড়িতেছিল।

কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিবার পর আবার তাহার খেয়ালের পরিবর্ত্তন হইল। যেন গভীর দুঃখে তাহার মন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে! সে ক্রিস্তফকে এমন করিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল, তাহাতে তাহার প্রায় শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল; চোখের জলে ও চুম্বনে তাহার সর্ব্ব শরীর ভরিয়া দিয়া তাহাকে কোলে লইয়া মেল্‌শিয়োর ধীরে ধীরে দোলা দিতে লাগিল।

ক্রিস্তফ নিজেকে মুক্ত করিবার কোন চেষ্টাই করিল না। তাহার শরীর

ভয়ে যেন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। সে তাহার পিতার বুকে মাথা রাখিয়া পড়িয়া রহিল। মদের উৎকট গন্ধ, মুখ নিসৃত লালা ও অজস্র চুম্বনে তাহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। মেল্‌শিয়োরের দুর্গন্ধ উদ্গার, তপ্ত নিশ্বাস এবং চোখের জল অনবরতই সে তাহার মুখের উপর পাইতেছিল। ঘৃণায়, বেদনায় তাহার শরীর মন যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার শুষ্ক কণ্ঠ দিয়া কোন শব্দই বাহির হইল না।

কতক্ষণ তাহাকে এই নরক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে তাহার মনে নাই, বোধ হইল যেন যুগ যুগান্তর।

সহসা ঘরের দরজা খুলিয়া গেল—এবং লুইসা ভিজা কাপড়ের ঝুড়িটি হাতে লইয়া ঘরে ঢুকিয়া ঐ বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিল, তাহার হাত হইতে কাপড়ের ঝুড়িটি মাটিতে পড়িয়া গেল, আত্ম বিস্মৃত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া জোর করিয়া মেল্‌শিয়োরের হাত হইতে ক্রিস্তফকে ছিনাইয়া লইয়া গুমরিয়া উঠিল—মাতাল—জানোয়ার'—

তাহার চোখ দুইটি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিতেছিল।

ক্রিস্তফ ভাবিল, এইবার তাহার মাকে মেল্‌শিয়োর মারিয়া ফেলিবে কিন্তু স্ত্রীর এই দুর্জ্জয় ক্রোধের মূর্ত্তিটি তাহার কাছে এত নূতন লাগিল এবং তাহাকে এত অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল যে সে কোনই উত্তর দিতে পারিল না এবং সহসা কাঁদিয়া ফেলিল! কাঁদিতে কাঁদিতে মাটির উপর গড়াইয়া হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল, চেয়ার টেবিলের পায়ায়, বাক্স পেঁটরার গায়ে মাথা ঠুকিয়া বলিতে লাগিল—তুই—তুই ঠিক বলেছিস্ লুইসা, আমি—আমি একটা মাতাল—জানোয়ার—সত্যিই আমি জানোয়ার—আমার ছেলেপুলেদের খেতে দিতে পারি না—সংসারে খালি দুঃখের বোঝাই বাড়িয়েছি—আমি ম'লে তোদের হাড় জুড়োয়—আমিও বাঁচি!—

লুইসা তাহার মাতাল স্বামীর কথায় কাণ না দিয়া ক্রিস্তফকে লইয়া পাশের ঘরে আসিয়া তাহার সর্ব্বশরীরে হাত বুলাইয়া আদর করিয়া কথা বলিয়া তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

এপর্য্যন্ত ক্রিস্তফ্ মায়ের কোলে শুইয়া শুধু ভয়ে কাঁপিতেই ছিল, কোন উত্তর দেয় নাই, এইবার ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

লুইসা তাহার মুখ মুছাইয়া বুকে চাপিয়া মুখে চুমা দিতে দিতে অস্ফুট কথায় তাহাকে আদর করিতে লাগিল। তাহার চোখ দিয়াও জল ঝরিতেছিল।

তাহার পর মেঝের উপর জানুপাতিয়া বসিয়া ক্রিস্তফকেও নিজের পাশে ঐভাবে বসাইয়া তাহাকে দিয়া দেবতার নিকট প্রার্থনা জানাইল—মেল্‌শিয়োরের মন ভাল করে দাও ঠাকুর, সমস্ত বদ্ অভ্যাস সে যেন ছাড়্‌তে পারে, সে যেন ভাল হয়—

প্রার্থনা শেষ হইলে লুইসা ক্রিস্তফকে খাওয়াইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

ক্রিস্তফ বলিল—আমার কাছে একটুখানি থাক মাগো—

লুইসা তাহার শিশুপুত্রের হাতখানি ধরিয়া অর্দ্ধেক রাত্রি তাহার পাশে বসিয়া রহিল। তাহার জ্বর হইয়াছে!

ঘরের মেঝের উপর মাতাল স্বামী পড়িয়া পড়িয়া গভীর সুরে নাক ডাকাইতেছিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন স্কুলে ক্রিস্তফ্ অন্যমনস্কভাবে দেওয়ালের গায়ে মাছিগুলির দিকে তাকাইয়া মধ্যে মধ্যে তাহার সহপাঠীদের ঠেলা দিয়া পাঠে অমনোযোগী করিয়া তুলিতেছিল তাহা দেখিতে পাইয়া শিক্ষকমহাশয় ক্রিস্তফকে বিদ্রূপ করিয়া সে যে পরে কি হইবে এবং কোন্ ব্যক্তি বিশেষের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সে চলিয়াছে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। ক্রিস্তফকে তিনি একেবারেই দেখিতে পারিতেন না; সে সর্ব্বদা ছট্‌ফট্ করে, হাসে, কোন কিছু মনে রাখে না, কিছু পড়াশুনাও করে না—'

ক্রিস্তফ্-এর প্রতি শিক্ষকমহাশয়ের উক্তি শুনিয়া অন্য ছাত্রগুলি চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহাদের মধ্য হইতে একজন, শিক্ষক মহাশয়ের কথাগুলিকেই বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া ক্রিস্তফকে শুনাইয়া দিল।

ক্রিস্তফ কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর কালিভরা দোয়াতটি হাতে-লইয়া তাহার নিকটে যে বালকটি তখনও খিল্-খিল্ করিয়া হাসিতেছিল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল।

শিক্ষকমহাশয় ছুটিয়া আসিয়া ক্রিস্তফকে প্রহার করিতে লাগিলেন—বেতের উপর বেত্—সে ঘরের কোণে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কিছুক্ষণ শাস্তি গ্রহণ করিল তাহার পর রাশিকৃত কাজের ভার তাহার উপর চাপান হইল!

ছুটির পর-সে যখন গৃহে ফিরিল তখন সে রাগে ফুলিতেছে কিন্তু তাহার অন্যায় শাস্তি সম্বন্ধে কোন কথাই সে বলিল না, শুধু সকলকে গম্ভীরভাবে বলিয়াছিল, সে আর স্কুলে যাইবে না। একথায় অবশ্য কেহ সেদিন কর্ণপাত করে নাই।

পরের দিন লুইসা যখন বলিল—স্কুলে যাবার সময় হ'ল এখনও বসে রইলি যে? যা—

ক্রিস্তফ্ উত্তর দিল—আমিত বলেই দিয়েছি আমি যাব না।

লুইসা অনুনয় করিল, বকিল, ভয় দেখাইল, কিন্তু ক্রিস্তফ্ অটল!

মেলশিয়োর আসিয়া তাহাকে তাহার একগুঁয়েমির জন্য প্রহার করিল, ক্রিস্তফ চীৎকার করিয়া কাঁদিল, কিন্তু যখনই তাহারা তাহাকে স্কুলে যাইতে বলে সে রাগিয়া উত্তর দেয়—না যাব না।

মেলশিয়োর বলে—কেন যাবি না? কারণ কি বল্?

ক্রিস্তফ্ উত্তর দেয় না।

অবশেষ মেলশিয়োর তাহাকে ধরিয়া স্কুলে আনিয়া শিক্ষকের জিম্মায় তাহাকে রাখিয়া গেল। আপনার যায়গায় বসিয়া ক্রিস্তফ্ তাহার হাতের কাছে যাহা কিছু পাইল তাহাই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিতে লাগিল। দোয়াত কলম ভাঙ্গিল, বই খাতা ছিঁড়িল, এবং এই সমস্ত কাজের সময় সে বেশ অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি দিয়াই তাহার শিক্ষকে দেখিতেছিল।

তাহাকে অন্ধকার ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা হইল এবং অল্পকিছুক্ষণ পরে শিক্ষক মহাশয় সেই ঘরে আসিয়া দেখিলেন ক্রিস্তফ গলায় রুমাল জড়াইয়া দুই হাতে দুই কোণ্ ধরিয়া প্রাণপণে টানিয়া আপনার শ্বাস রোধ করিতেছে!

শিক্ষক মহাশয় ভয়ে ভয়ে ক্রিস্তফকে তাহার গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

ক্রমশ

নীচের সমাজ

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

(১)

গ্রীষ্মের প্রখর তাপে মানুষের প্রাণ ভাজা ভাজা হইয়া যাইতেছে! ঘরের খ'ড়ো চালগুলি পর্য্যন্ত বুঝি পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়!

সারাটা সকাল কঠোর পরিশ্রমের পর সোয়ামী ও দেওররকে খাওয়াইয়া কৃষকবধূ ক্ষ্যান্তমণি এইমাত্র একটু বিশ্রাম করিতেছিল। সকাল হইতেই তাহার একটু জ্বরভাব হইয়াছিল। তাহার উপর এই গরমে আগুনের তাতে তাহাকে আরও কাহিল করিয়া দিয়াছে। এখনও কত কাজ বাকি। কিন্তু আর সে ভাবিতে পারে না। ময়লা আঁচলখানি মাটির দাওয়ার উপর পাতিয়া সে তাহার ক্লান্ত দেহটা এলাইয়া দিল। কিন্তু সেখানেও শান্তি নাই, পৃথিবীর যত মাছি আসিয়া তাহাকে অতিষ্ঠ করিতে লাগিল।

স্নান শেষ করিয়া কাপড় নিঙড়াইতে নিঙড়াইতে শ্বশ্রু ঠাকুরাণী বাপ্‌রে বাপ্‌রে করিতে করিতে দৌড়িয়া আঙিনার লাউমাচার তলায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তপ্ত বালু-মাটির তাপে তাঁহার পায়ে গোটা দুই ফোস্‌কা হইয়া গিয়াছে। বধূমাতাকে দাওয়ার উপর নিশ্চিন্ত মনে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া সমস্ত রাগটা পুঞ্জিভূত হইয়া তাহার উপর পড়িল। তিনি গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, হ্যালা বৌ, কখন তোকে কাপড় ক'খানা কেচে নিয়ে আস্‌তে বলেছি না? নাক্ ডাকিয়ে ঘুমচ্ছিস্! শাশুড়ির হুকার শুনিয়া বধূটি ধড়্ মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, এই মা যাচ্ছি, গাটা বড় ম্যেজ ম্যেজ্ কর্‌ছিল তাই—

তবে রে আবাগীর বেটি, ছেনালী? বাবুদের বাড়ী কাল কাপড় দিতে হবে,—ওঁর এখন গা ম্যেজ্ ম্যেজ্ করছে; বলিয়া শাশুড়ী ঠাকরুণ উঠান হইতে গরু বাঁধিবার একটি গোঁজা উপড়াইয়া লইয়া বধূটির মাথায় পিঠে বেশ ঘা' কতক বসাইয়া দিতে লাগিলেন।

পুকুরের জল সব শুখাইয়া গিয়াছে যা একটু আছে তাহাতেই কাপড়-কাচা, গা-ধোয়া সবই সারিয়া লইতে হয়। বগলে কাপড়ের একটা বড় বোঁচ্‌কা ও হাতে

এক গোছা বাসন লইয়া ক্যান্তমণি ঘাটে নামিল। হাত দিয়া আটকাইতে গিয়া হাতেই তাহার বেশী লাগিয়াছিল। সমস্ত হাতখানা তাহার ফুলিয়া উঠিয়াছে। হাত যে নাড়িতেই পারে না—কাজ সে করিবে কি করিয়া। তাল গাছের কাঠের পৈঠার উপর বসিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। সেই কবে আট বছর বয়সে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। তাহার পর হইতে সে সংসারের বলদটীর মতই খাটিয়া আসিয়াছে। কাহারও মুখে সে একটী সান্ত্বনার কথাও শুনে নাই। প্রহার—প্রহার ত রোজকার পাওনা। কি শাশুড়ী, কি সোয়ামী, কি দেবর যে যখন ছুতা পাইয়াছে তাহাকে পিটাইয়া দিয়াছে। অনেক কথাই তাহার মনে আসিতেছিল। মনে আসিতেছিল বাড়ীর কথা—মা'র কথা—সে স্নেহ কি সে আর পাইবে?

(২)

কাঁদিস্ কেন রে ক্যান্ত। আবার বুঝি মেরেছে—বলিয়া একটি ছোকরা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

হাঁ হিরু দা. আজ শুধু শুধু মারলে—বলিয়া ক্যান্তমণি আরও কাঁদিয়া উঠিল।

এই হিরুদার মাতুলালয় ছিল ঠিক ক্যান্তমণিদের বাড়ীর পাশে। ছেলেবেলা থেকেই তাহাদের মধ্যে একটা গাঢ় সৌহৃদ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ক্যান্তমণির মার ইচ্ছা ছিল হিরুর সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দেয়। হিরুও তাহাই জানিত। কিন্তু ক্যান্তর বাপ যখন পয়সার লোভে ভিন্‌-গাঁয়ে মেয়ের বিবাহ দিল; হিরুকে সেটা খুব আঘাত দিয়াছিল। সে বিবাহ ত করিলই না—গ্রামেও থাকিতে পারিল না। কয় বছর নানা জায়গায় ঘুরিয়া সে ক্যান্তদের শশুরবাড়ীর গ্রামেই চাকুরী লইয়াছিল। আজ ক্যান্তমণির মা নাই, সেই সঙ্গে কেহই নাই—আছে আজ হিরু দা—কিন্তু সে নিকটে থাকিয়াও অনেক দূরে।

ওঃ—তোকে বড্ড মেরেছে ত। ও ভাঙা হাত নিয়ে কি করে কায করবি?—সহানুভূতির স্বরে কথা কয়টি বলিয়া হিরু নিজেই কাপড় কখানা কাচিতে লাগিল। ক্যান্তমণি অনেক বারণ করিল। সে তাহাতে কাণ দিল না। রৌদ্রে কেহ বড় একটা বাহির হইতেছে না। শুখনা পাতা পড়ার টুপ্‌টাপ্‌ শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না। অনেক আগেই হাতাহাতি করিয়া কাজগুলি সারিয়া, পারে হেলে-পড়া একটি বকুল গাছের তলায় বসিয়া তাহারা দুপুরটা কথায় কথায় কাটাইয়া দিতেছিল।

চমকিয়া ক্যান্তমণি দেখিল, বেলা পড়িয়া আসিতেছে। সে বলিয়া উঠিল,

আসি হিরু দা। আবার ধান ক'টা ভাণতে হবে। না হলে আজকেও খেতে দেবে না।

আচ্ছা যা, আবার যেন মারে না—বলিয়া হিরুও উঠিয়া পড়িল

বাড়ী ঢুকিতেই ক্ষ্যান্তমণি শুনিল, শাশুড়ী ঠাকুরাণী বলিতেছেন, ওরে আবাগীর বেটি, ও লাগরটা কে লা? আসুক বাড়ী। তোর শতেক খোয়ারী না করি ত কি বলেছি।

ক্ষ্যান্তমণি আর থাকিতে পারিল না, সে বলিল—যা তা বলবিনে মা।

চুপ কর হারামজাদী চুপ কর—অন্যায় কব্বি আবার—কথা কয়টা শেষ না করিয়াই শাশুড়ী ঠাকরুণ ছুটিয়া গিয়া বধুর মাথাটা চালের খুঁটির উপর বার কতক ঠুকিয়া দিল। তাহার পর বধুকে কৃত অপকর্ম্মের জন্য আরও শাস্তি দিবার আগে তাহার অপরাধটা পাড়ায় একবার জাহির করিয়া দিবার জন্য গজ্‌ গজ্‌ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

(৩)

তুলসী মঞ্চে মাটীর দীপটি জ্বালিয়া দিয়া, একটি প্রণাম করিয়া ক্ষ্যান্তমণি দেবতার স্থানে হৃদয়ের বেদনা জানাইয়া বলিতে যাইতেছিল, ঠাকুর . . .। হটাৎ সে ফিরিয়া দেখিল সোয়ামী তাহার চুলে ধরিয়া বলিতেছে—শালী . . .।

মোড়লদের ওখান থেকে গাঁজা খাইয়া রাধু মণ্ডল ফিরিতেছিল। পথে মাতার মুখে স্ত্রীর কীর্ত্তি শুনিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। ছুটিয়া গিয়া আধ ঘন্টা ধরিয়া কিল্ চড় লাথি সুবিধা মত যত পারিল মারিল। তাহার পর গলা ধরিয়া ধাক্কা দিতে দিতে তাহাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিয়া আসিল।

আজকের প্রহারটা ক্ষ্যান্তমণির সহ্য হইতেছিল না। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টা যেন সমস্ত বিশ্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে সোজা মুখুয্যেদের বড় পুকুরের পারের উপর বাঁশ বাগানটা যেখানে খুব ঘন হইয়া গিয়াছে, তাহার কাছে গিয়া বসিয়া পড়িল। পারের নীচেই একটা পরিষ্কার জায়গার উপর বসিয়া হিরু বাঁশী বাজাইতেছিল। উপরে চাপা কান্নার শব্দ শুনিয়া সে ছুটিয়া আসিল। একি—ক্ষ্যান্ত—তুই এখানে!—বলিয়া সে তাহার কাছে বসিল।

সামনে হিরুদাকে দেখিয়া তাহার সব বাঁধ ভাঙিয়া গেল, হাঁ, হিরুদা।—বলিয়া সে দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অঘোরে কাঁদিতে লাগিল।

ক্যান্তর মুখখানি দুই হাতে ধরিয়া নিজের মুখের কাছে তুলিয়া আনিয়া হিরু বলিয়া উঠিল—এ কি রে? জোছনার স্পষ্ট আলোকে ক্যান্তমণির মাথার জমাট রক্তের চাপ দেখা যাইতেছিল। কি ভাবিয়া হিরু বলিল—চল্, আমরা চলে যাই।

এ কথা ক্যান্ত আরও অনেকবার হিরুর মুখে শুনিয়াছিল। সে রাজী হয় নাই। আজ কিন্তু হিরুকেই তাহার সব চেয়ে আপনার বলিয়া বোধ হইতেছিল। একটু ভাবিয়া সে বলিল—চল।

(৪)

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বাহিরের ঘরে বসিয়া নওগাঁয়ের জমীদারের ছেলে হরিশ, পাড়ার শিরমণি ঠাকুরের সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন। রাঘুমণ্ডল ও তাহার ভাই ঘরে ঢুকিয়া বলিয়া উঠিল—দোহাই হুজুর মোদের ঘরে রক্ষা করুন।

হরিশ বাবু বলিলেন—কি চাও?

রাঘু বলিতে লাগিল, আপনকার রাওয়ত সদানন্দের ছেলে হিরু আমার ইস্ত্রিকে বার ক'রে এনেছে। আপনি দয়া না করলে—শিরমণি ঠাকুর গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, বেরো হারামজাদা বেটারা বেরো।—ও সব ছোট লোকের কথায় থেক না খোকা বাবু।

কি বলেন ঠাকুরদা, এত বড় একটা অত্যাচার এ যুগেও হবে?

শিরমণি ঠাকুর বলিলেন, ওত আখছার হচ্ছে।

না, এর একটা বিহিত করবই—বলিয়া জমীদারের ছেলে হরিশ একটা হাণ্টার চাবুক লইয়া বাহির হইল।

জমীদারের ছেলের কথায় হিরু সত্য কথাই বলিতে যাইতেছিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, আজ যদি উহারা ক্যান্তকে লইয়া যাইতে পারে;—উঃ কি শাস্তিই না দিবে, তপ্ত লৌহ শলাকার আঘাত, উপবাস, কাঁচা কঞ্চির চাবুক; মথাগ্রে বেল কাঁটা ফুটাইয়া দিয়া……। আর সে ভাবিতে পারিল না। বলিয়া ফেলিল, হুজুর ও আমারই ইস্ত্রি। ওদের সব মিছে কথা।

জমীদারের ছেলে ফাঁপড়ে পড়িলেন। একটু ভাবিয়া তিনি বলিলেন, নিয়ে আয় তোর ইস্ত্রিকে। আমি নিজে পুছ্‌ব।

ক্যান্তকে ডাকা হইল। হিরুর কথা শুনিয়া সে প্রথমে চমকিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সেও তাহার মতন অনেক কথাই ভাবিয়াছিল। একটা দারুণ ঘৃণা, ভয় ও

লজ্জায় তাহার মনটাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কি ভাবিয়া সেও ঘোমটার ভিতর হইতে ক্রন্দনের সুরে বলিয়া ফেলিল—হিরুদাসের কথাই ঠিক্।

জমীদারের ছেলে কোন রায় দিতে পারিল না। ঠিক হইল মেয়েটির বাপ ও তাহার গ্রামের মোড়লদের ডাকাইয়া আনাইয়া সব জিজ্ঞাসা করা হইবে।

শিরমণি ঠাকুর চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, দেখ্‌লে খোকাবাবু, আবার ক'জনে বেটির বাপ হয়ে আসে দেখ!

মোড়লরা বলিয়া গেল, মেয়েটি রাধু মণ্ডলের ইস্ত্রী। হিরুদাসের সঙ্গে পালিয়েছিল। সকলে অবাক। প্রমাণ হইবা মাত্র রাধু মণ্ডল তাহার স্ত্রীর কেশগুচ্ছ ধরিয়া টানিতে টানিতে বাহিরে আনিয়া বলিল,—আগে হুজুর, বেটীকে লিয়ে যাই। মাঝে মাঝে প্রবল মুষ্টাঘাত ন্যাস্তমণির পিঠে পড়িতেছিল—গুম্ গুম্। ভিড়ের মধ্য হইতে কে বলিয়া উঠিল—অমন বউকে আবার ঘরে জায়গা দিস্। উত্তর আসিল, বেটীকে কিন্‌তে সাড়ে ছয় গণ্ডা টাকা পণ লাগ্‌ছে, দা-ঠাকুর। এখনও শুধ্‌তে পারছি না।—চল্—বেটী।



কবির উত্তরাধিকারী

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যে মৃত্যুমাধুরী নিরাশার মুহূর্তে বাংলার কবি অমিতাভ কতবার কতরূপে ছন্দে ও সুরে রূপদান করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, একদিন সেই মাধুরী উপভোগ করিবার জন্য শরতের সোনার আলো আর শেফালির মায়া কাটাইয়া তিনি অনন্তের পথে যাত্রা করিলেন।

তাঁর মৃত্যুতে কলিকাতায় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সপ্তাহখানেক ধরিয়া, নানা সাময়িক পত্রে, প্রথমে সুদীর্ঘ প্রবন্ধে এবং পরে ছোট ছোট প্যারাগ্রাফে মৃত কবির বহু স্তুতিবাদ প্রকাশিত হইল। পদ্মাতীরের নিরালায় তাঁর বাংলা-বাড়ীখানি ছিল ছবির মত সুন্দর! সেই বাংলায় তুচ্ছতম জিনিসটিতেও সুন্দরের উপাসক কবির মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়! এমনি সব নানা সম্বাদের মধ্যে অলকা সম্বন্ধে যে-খবর বাহির হইল, সেইটিই সবচেয়ে জবর। উক্ত অলকা ছিলেন কবির 'ইন্স্‌পিরেসন', তাঁর নাম কবির অনেক রচনার মধ্যেই পাওয়া যায়! অলকা কিন্তু উর্ব্বশী রম্ভার মত কাল্পনিক জীব নহেন, তিনি রক্তমাংসের শরীরে, যদিও ভিন্ন নামে, নিকটস্থ এক গ্রামে থাকেন! আসলে তিনি এক কর্ম্মকার-কন্যা, কবি তাঁহাকে মাত্র দু'এক বারের বেশী দেখেন নাই, এমন কি তাঁহার বাড়ীর বাহিরে তাঁহাকে দেখিলে খুব সম্ভব চিনিতেও পারিতেন না!

এই সংবাদ রোমান্টিক্ বাঙালী পাঠকের চিত্তে বেশ একটু দোলা দিল। আর, বৈষ্ণবকবি চণ্ডীদাসের প্রণয়িনী রজকিণী রামীর কথা যাহারা শুনিয়াছিল তাহারা কবি অমিতাভর অকুণ্ঠিত প্রেমের উদারতায় মুগ্ধ না হইয়া পারিল না।

দুদিনের বিস্ময় কাটিয়া গেলে পর 'ঝরাপাতা'র কবিকে সকলে ভুলিয়া গেল। মনে করিয়া রাখিল কেবল কলিকাতার বাহিরের কয়েকজন সেন্টিমেন্টাল্ পাঠিকা। এমনি করিয়াই রাজধানী যে খ্যাতির সৃষ্টি করে, তাহা স্মরণ করিয়া রাখে দেশের পল্লীভুবন।

কবির বাংলা নিলামে বিক্রী হইয়া গেল। উহা কিনিলেন লোহালক্কড়ের

ভূতপূর্ব্ব ব্যবসায়ী গণেশবাবু। কবির নাম সেই প্রথম শুনিলেও সেজন্য তিনি কিছুমাত্র লজ্জিত হইলেন না! দীর্ঘকাল ব্যবসায়ের পর অবসর গ্রহণান্তে নিশ্চিন্ত মনে বাংলার নিভৃতে বসিয়া গুড়গুড়ি টানিতে পারিবেন এই চিন্তায় তিনি বেশ একটু তৃপ্তি অনুভব করিলেন।

বাংলাখানি মনের মত, কিন্তু কবির সুকুমার রুচি গণেশবাবু বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। রাজপুত ও মোগলযুগের মূল্যবান ক্ষুদ্রাকার জল-চিত্র এবং জয়পুরের মর্ম্মরের মর্ম্মে কোথায় সৌন্দর্য্য? তাই সেগুলি এক চোরা কুঠ্‌রির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া গণেশবাবু দেয়ালময় রবিবর্ম্মার ছবি আর বিলিতি মেমেদের মুখাঙ্কিত অ্যালম্যানাক টাঙাইয়া দিলেন। বৈঠকখানার দেয়ালের মাঝখানে প্রকাণ্ড গিল্টি-করা ফ্রেমের মধ্যে নাকে নথ, ঘোম্‌টা-পুঁটলি, জবড়জং স্বর্গীয়া গণেশগৃহিণীর তৈলচিত্র শোভা পাইতে লাগিল।

একদিন স্নানের পূর্ব্বে দেহে প্রচুর সরিষার তেল মর্দ্দন করিয়া একখানি খাটো ধুতি পরিয়া বাংলার সামনে দাঁড়াইয়া গণেশবাবু খেলো হুঁকায় মৃদুটান দিতেছেন, এমন সময় এক অদ্ভুত ব্যপার ঘটিল। পায়ে জুতা, চোখে চশমা, হাতে ভ্যানিটি-ব্যাগ, মেমপ্যাটার্নের সাজসজ্জা এমনি একটি স্ত্রী জাতীয় জীব একেবারে তাঁর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া গণেশবাবু থতমত খাইয়া তাঁর প্রকাণ্ড অনাবৃত ভুঁড়িটি এক হাত দিয়া ঢাকিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া মহিলাটি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কি কবি অমিতাভ-সেনের বাড়ী?

মেমপ্যাটার্নের মেয়েলোকের এত কাছাকাছি গণেশবাবু জীবনে কখনো আসেন নাই। ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় থাকিতে মধ্যে মধ্যে বেথুন কলেজের গাড়ীতে তাদের অস্পষ্ট চকিত আভাস পাইয়াছেন, নিউমার্কেটেও কখনো কখনো তাদের জুতা খট্‌ খট্‌ করিয়া হাঁটিতে দেখিয়াছেন বটে কিন্তু একেবারে মুখোমুখি, এমন কখনো ঘটে নাই। তিনি ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া বলিয়া ফেলিলেন, কে কবি? তখনি আবার সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিলেন, ও, হাঁ, তিনি? তিনি ত মারা গেছেন!

মহিলা বলিলেন, মারা গেছেন জানি। কবির বাড়ীখানি দেখ্‌তে পারি কি?

গণেশবাবু বলিলেন, হ্যাঁ, তা পারেন। ইচ্ছে হলে পারেন বৈকি!

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গণেশবাবু মহিলাটিকে সঙ্গে লইয়া ঘরগুলি দেখাইতে

লাগিলেন। সেই অবসরে মহিলাটি বলিলেন, তিনি জলন্ধর কন্যা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী, বহুকাল দেশছাড়া, স্বদেশবাসী কবির খ্যাতি শুনিয়া অতদূর হইতে তাঁর বাড়ী দেখিতে আসিয়াছেন। কবিকে দেখা ভাগ্যে ঘটে নাই, বাড়ী দেখিয়াই তৃপ্ত হইতে হইবে ইত্যাদি।

বৈঠকখানার দেয়ালের ছবি দেখিয়া বিস্ময়ে মহিলাটির বাক্‌রোধ হইবার উপক্রম হইল।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কবির জিনিসপত্র সব ঠিক আছে কি? কিছু অদলবদল হয় নি?

গণেশবাবু একটু গর্ব্বিতভাবে বলিলেন, হয়নি আবার! রাবিশে ভর্ত্তি ছিল, সব দূর করে দিয়েছি!

মহিলা বলিলেন, রাবিশগুলো দেখতে চাই।

গণেশবাবু ত অবাক। রাবিশ আবার দেখাবে কি? দশহাত কাপড়ে যাদের কাছা নেই তাদের বুদ্ধি এমনিই বটে, হাতে ব্যাগ্ ঝোলালে আর কি হবে!

যাইহোক, চোরাকুঠরি খুলিয়া তিনি সমস্ত দেখাইলেন।

দেখিতে দেখিতে মহিলাটি একবার উঃ করিয়া উঠিলেন, তারপর আপন মনে বলিলেন, বাড়ীর লোকগুলো আচ্ছা বর্ব্বর!

গণেশবাবু নীরবে ভাবিতে লাগিলেন, বেটি পাগলী না কি? ঘর চড়াও হয়ে অপমান করা!

সদরদ্বারে আসিয়া বিদায় লইবার কালে মহিলাটি যখন ব্যাগ থেকে একটা আধুলি লইয়া বলিলেন, ধরহে তোমার বকশিস্, তখন গণেশবাবুর বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

বেটি তাহলে আমাকে এ বাড়ীর চাকর ঠাউরেছে! এই চিন্তায় গণেশবাবুর আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল, মনে হইল আধুলিটি ফেরত দিবেন। কিন্তু পরক্ষণেই সে সংকল্প ত্যাগ করিলেন, ভাবিলেন, কাজ নাই, ঝোঁকের মাথায় কিছু না করাই ভালো!

দুদিন পরে এক গুজরাতি ভদ্রলোক কবির একটি পেন-কলম একখানা গিনি দিয়া কিনিয়া লইয়া গেলেন।

সেই রাত্রে গণেশ বাবু গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। সেই চিন্তার ফলে পরদিন শহর হইতে একগাদা পেন-কলম আসিয়া পৌঁছিল। গণেশ বাবুর বড়

দয়ার প্রাণ, পেন-কলম পাইলে যদি লোকে সুখী হয়, সে সুখ হইতে কাহাকেও তিনি বঞ্চিত করিবেন না স্থির করিয়াছিলেন।

আবর্জ্জনাস্তূপ হইতে কবির সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিয়া গণেশ বাবু সেগুলি আগেকার মত সাজাইয়া ফেলিলেন। তারপর খবরের কাগজে নিম্নলিখিতরূপ বিজ্ঞাপন দিলেন।—

কবি অমিতাভ-সেনের 'বাংলার' বর্ত্তমান মালিক গণেশচন্দ্র মণ্ডল কবিভক্ত-দিগকে বাংলা পরিদর্শনের জন্য সাদর নিমন্ত্রণ করিতেছেন।

বিজ্ঞাপনের ফলে গাদা গাদা লোক কবির বাংলা দেখিতে আসিতে লাগিল। তিনমাসের মধ্যে গণেশ বাবু যে-অর্থ উপার্জ্জন করিলেন, ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া সে পরিমাণ অর্থ এক বৎসরেও উপায় করা সম্ভব ছিলনা।

কবির শতাধিক ভক্ত প্রত্যেকেই যখন কবির 'শেষ পেন-কলম'টি খরিদ করিয়া বসিল, তখন ব্যবসায়ে মন্দা পড়িল।

এখন নূতন কিছু চাই, পেন-কলমের পালা ফুরাইয়াছে!

একদিন গণেশবাবু জনৈক কবিভক্তের এক পত্র পাইলেন। পত্র প্রেরক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, অলকা নামে কবির রচনার ভিতর দিয়া যিনি দেশে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, কবির প্রণয়পাত্রী সেই কর্ম্মকার কন্যা কি এখনো নিকটবর্ত্তী গ্রামে বাস করেন?

পত্র পাঠান্তে গণেশবাবুর মুখে হাসি ফুটিল। যাক্, নূতন-কিছুর সংবাদ পাওয়া গেল! গণেশবাবু ভাবিলেন, কর্ম্মকার-কন্যাকে যদি পরিচারিকার পদে বাহাল করিতে পারি তাহা হইলে এক ঢিলে দুই পাখী মারা যায়! গৃহকর্ম্ম সে করিবে আবার কবিভক্তদিগের সম্মুখে কবির প্রণয়িণীকে খাড়া করিয়া দর্শনীও আদায় হইবে!

সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে পরদিন প্রত্যুষে গণেশবাবু গ্রামের পানে চলিলেন। অনেক কষ্টে কর্ম্মকারকে আবিষ্কার করিয়া তিনি কথাটা পাড়িলেন। প্রস্তাব শুনিয়া কামারের-পো চটিয়া আগুণ, এই মারে ত এই মারে! গণেশবাবু তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য বিশদ্‌ভাবে বুঝাইলেন, তাঁর কাছে কর্ম্মগ্রহণ করিলে কর্ম্মকার কন্যা কি পরিমাণ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে তাহা ব্যক্ত করিলেন এবং কবিপ্রিয়া বলিয়া তার খ্যাতি দেশবিদেশে রাষ্ট্র হইবার যে গৌরব তাহা স্থূলবুদ্ধি কর্ম্মকারের মস্তিষ্কে ঢুকাইবার অশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইল, ভস্মে ঘি ঢালার মত।

কবির নামোল্লেখমাত্র কামারের মুখে যে-ভাব ফুটিয়া উঠিল তাহা গণেশবাবুর চোখে বড় সুবিধার ঠেকিল না। সে চীৎকার করিয়া বলিল, কী! সেই মেনিমুখো ক্ষেপাটা, মাথায় বাবরিকাটা চুল? ভাল চাও ত তার নাম কক্‌খনো আমার সামনে বলবেনা বাবু।

গণেশবাবুর রাগ হইল। এতবড় একজন কবি, তার সম্বন্ধে এমনি কথা! গণেশবাবু কবিকে যথার্থই শ্রদ্ধা করিতে সুরু করিয়াছিলেন।

বাড়ী ফিরিয়া তিনি কবির কাব্য খুলিয়া বসিলেন, প্রথম প্রথম কিছু বুঝিলেন না, সমস্তই কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া! রম্ভা বা উর্ব্বশী কে ছিল গণেশবাবু কিছুই জানেন না। কিন্তু অলকা যে কে তিনি শুনিয়াছেন। তাহার উদ্দেশে প্রণয়ের যে অনন্ত উচ্ছ্বাস কবির লেখনীতে প্রকাশ হইয়াছে সে সমস্ত বস্তুত কর্ম্মকার কন্যার প্রতিই নিবেদিত এ তথ্য যতই তিনি ভাবিতে লাগিলেন ততই সেই মেয়েটিকে জানিবার জন্য তাঁর মনেও একটা অদম্য কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন দেশসুদ্ধ লোক কর্ম্মকার কন্যার চিন্তায় এত মাথা ঘামায় কেন?

মনে মনে কর্ম্মকারের দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া গণেশ বাবু হায়-হায় করিতে লাগিলেন। বেটা একগুঁয়েমি করিয়া কি সুযোগটাই হারাইতে বসিয়াছে! আশ্চর্য্য, বাঁদরটার কাব্যরস উপভোগ করিবার শক্তি কি এক কানাকড়িও নাই

গণেশবাবু সংকল্প করিলেন, যেমন করিয়াই হোক্ কামারটাকে পোষ মানাইতে হইবে। কিন্তু কি উপায়ে? গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে সেই কথাই তিনি ধ্যান করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া তিনি বলিয়া ফেলিলেন, ব্যস! কেল্লা ফতে! পেয়েছি, পেয়েছি!

গণেশবাবু বৈঠকখানায় ঢুকিলেন। দেওয়ালের গায়ে তাঁর সাধের শিল্প সম্পদের মধ্যে কেবল তাঁর গৃহিণীর তৈল চিত্রখানিই তখনো টাঙানো ছিল। ক্ষণকাল সেই ছবির পানে তিনি চাহিয়া রহিলেন। তারপর চেয়ারের উপর দাঁড়াইয়া সেখানি দেয়াল থেকে নামাইয়া লইলেন। পরে চোরাকুঠরির আবর্জ্জনার মধ্যে উহা নিক্ষেপ করিলেন।

একঘণ্টা পরে বেশভূষা করিয়া তিনি কামারবাড়ী গিয়া উপস্থিত। তাঁর কলপ-লাগানো চুলে টেড়িকাটা, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি ও মটকার চাদর, পরণে

শান্তিপুরের মিহিধুতি, পায়ে চকচকে পাম্পস্থ, হাতে রূপা বাঁধানো মোটা বেতের লাঠি, সর্ব্বাঙ্গে হাস্নুহানার গন্ধ।

তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, মশাই, আপনার কন্যা রত্নকে প্রার্থনা করি . . .

কামার চোখ পাকাইয়া বলিল, ফের সেই কথা! চুলোয় যাও!

গণেশবাবু না দমিয়া আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিলেন. আপনার মেয়েটিকে আমি বিয়ে করতে চাই।

কামারের চোখ কপালে উঠিবার উপক্রম হইল। লোকটা বলে কি? ক্ষেপে গেল নাকি? তারপর যখন সে বুঝিল, গণেশবাবু যথার্থই তাহাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিতে চান, তখন সানন্দে বলিল, আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন! বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? একটা দিন ঠিক ক'রে ফেলা যাক্!

তারপর অন্দরের দিকে ফিরিয়া সে হাঁকিল, ওরে ও আতুরী, একবার শুনে যা ত! *



* ফরাসী লেখক Andre Godard অনুসরণে।

পাঁকের পোকা

শ্রীসুকুমার ভাদুড়ী

রাত তখন নটা বেজে গেছে।

জনবিরল রাস্তা দিয়ে একটা বেশ মোটা আলোয়ানে আপনার দেহটাকে ঢেকে নরেশ সিগারেট টান্‌তে টান্‌তে বাসায় যাচ্ছিল।

হঠাৎ সে এক লাল ইমারতের সামনে আসতেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল, ভিতরের পানে চেয়ে দেখ্‌লো,—গেটের ভিতরে একটা দরোয়ান কাকে যেন খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ধমক দিচ্ছে—আর মাঝে মাঝে তার সঙ্গে প্রহারও চল্‌ছে। ঠিক তার সামনেই মাটির উপর ব'সে এক শীর্ণা রমণী; কোলে তার এক শিশু।—অদূরে আশে-পাশে আরও কয়েকটি পুরুষ ও স্ত্রী ব'সে ও কাৎ হ'য়ে শুয়ে আছে। তাদের পরিধানের ছিন্ন ও মলিন বেশ ভূষার পানে চাইলে অতি সহজেই বোঝা যায় যে তারা ঐ পথের ধারেরই ভিক্ষুক ভিন্ন আর কিছু নয়।

একমুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে থেকে ভিতরের পানে একটু ভাল করে লক্ষ্য করতেই পথের গ্যাসালোকে নরেশ চিন্‌লে,'—আজই সন্ধ্যায় এক গলির মোড়ে সে ঐ মেয়েটিকে ভিক্ষে করতে দেখেছে।

আরও কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করে নরেশ কি ভেবে গেটের ভিতর ঢুকে পড়ল এবং দরওয়ানদের পানে এগিয়ে এসে বললো, কেয়া হুয়া?

—কুছ্‌ নেহি! ব'লে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে দরওয়ানটা সেখানথেকে চ'লে গেল। মেয়েটি চুপ ক'রে সেইখানেই ব'সে রইল।

মেয়েটির কঙ্কালসার দেহের পানে চাইলে মনে হয় তার জীবনী শক্তি যেন প্রতিমুহূর্ত্তেই পিঞ্জরের দ্বার ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চায়। বড় বড় হলুদ বর্ণ চোখদুটির মধ্যে থেকে কাতর মিনতি যেন তার প্রতি দৃষ্টিকণাটির সঙ্গে ঝ'রে পড়ছে; অসংখ্য বিশ্রী দাগে ভরা পাণ্ডুর ও বিবর্ণ মুখের উপর দৈন্যের ম্লানছায়া ভেদ করে যেন মৃত্যুর নিবিড় কালিমা ধীরে ধীরে ফুটে উঠ্‌ছে। শীতের নিদারুণ কম্পনে তার শীর্ণ দেহখানি মুহূর্মুহূ কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছিল।

দু'বাহুর আলিঙ্গনের মধ্যে সে তার মৃত্যু-পথ যাত্রী শীর্ণ শিশুটিকে প্রাণপণে চেপে ধ'রে রেখেছিল। ক্ষুধার তাড়নায় দুগ্ধহীন স্তনটাকে টেনে টেনে নিষ্ফলতার বিরক্তিতে ও শীতের কাঁপুনিতে শিশুটিও ঘন ঘন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছিল।

খানিকক্ষণ ধ'রে নরেশ মেয়েটির পানে এক দৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লে। তারপর প্রশ্ন করল—কি হয়েছিল রে? তোকে ও যে মারছিল অত?'

মেয়েটি একবার তার কাতর চোখের অতি ম্লান দৃষ্টিটি নরেশের মুখের পানে তু'লে ধরল, তারপর আবার তাকে নামিয়ে নিল। কিন্তু কিছুই বল্‌ল না। অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় কোলের শিশুটি ককিয়ে কেঁদে উঠ্‌তেই নীরবে তা'কে তার বুকের উপর চেপে ধ'রে সে আপনার ছিন্ন বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে ঢেকে তাকে শান্ত করবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল।

হঠাৎ পাশ থেকে ঐ দলের একটা লোক বলে উঠল.—যা'নারে: বাবুর কাছে কিছু চাইলেই পাবি।

মেয়েটি তবুও তেমনি নতমুখে চুপ করে বসে রইল; মুখফুটে কিছুই বল্‌ল না।

নরেশ আবার বলল', তুই আজ সন্ধ্যের সময় মেছোবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে কর্‌ছিলি না?

এবার মেয়েটি উত্তর দিল,—হুঁ।

—কিছু হয়নি বু'ঝি?

—না!

—বাইরে একবার রাস্তায় আয় ত'!

ভয়-ব্যাকুলিতা হরিণীর মত মেয়েটি আবার একবার নরেশের মুখের পানে চাইল। কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় তার সারা মন যেন মুহূর্তের জন্য কেঁপে কেঁপে উঠ্‌লো। কিছু উত্তর না ক'রে সে তেমনি নীরবেই সেইখানে বসে রইল, যেন সে নরেশের কথাটা ভাল করে বুঝতেই পারেনি।

দিনের পর দিন একই ভাবে মেয়েটি পুরুষের কাছ থেকে এত বেশী অত্যাচার পেয়ে এসেছে যে তাদের আর তার বিশ্বাস করতে ভরসা হয় না।—সে বুঝেচে—পুরুষ শুধু নারীকে দিতে জানে—বঞ্চনার তিক্ত বিষ, অপমানের দুর্জয় বেদনা। স্নেহ, দয়া, মমতা এসব কোমল জিনিষ তাদের পাষাণ হৃদয়ে নেই।

নরেশ আবার বল্‌ল,—এই, আয় না; আমি তোকে টাকা দিচ্ছি।

আর একবার তার পানে চেয়ে কি ভেবে মেয়েটি উঠ্‌লো; তারপর নরেশের পিছনে পিছনে গেটের অদূরেই একটা গ্যাসপোষ্টের পাশে এসে দাঁড়াল।

নরেণ প্রশ্ন করলে, তুই ভিক্ষে করিস ?

ম্লান মুখে মেয়েটি জবাব দিল,—হুঁ !

—কাকে দিস্ ?

—ওদের !

—ওরা তোকে কি দ্যায় ?

—শুধু খেতে দ্যায় দু'বেলা !

—আর কাপড় চোপড় ?

—না।

—সে সব পাস্ কোথায় ?

—ভিক্ষে—করি।

—দরওয়ানটা তোকে মারছিল কেন আজ ?

—আজ কিছু পাইনি বলে।

উপর্য্যুপরি এতগুলি প্রশ্নের উত্তর ক'রে মেয়েটি যেন অত্যন্ত হাঁপিয়ে উঠেছিল। ফুটপাথের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে সারাদিনের ভ্রমণ ক্লান্ত তার পা দু'টা হঠাৎ যেন বারকয়েক কেঁপে উঠ্‌ল। সে ধীরে ধীরে ফুটপাথের একধারে ব'সে পড়ল।

পাশ দিয়ে একদল লোক যেতে যেতে নরেশের পানে একবার চেয়ে একটু বক্র হাসি হেসে চলে গেল। নরেশের তখন সেদিকে বিশেষ খেয়ালই ছিল না। সে তখন মেয়েটিকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে চলেছিল।

—ও বাড়ীটা কার ?

—একটা খুব বড়লোকের। ওদের বড়বাজারে কিসের ব্যবসা আছে।

—তোর পাশে যারা ব'সে-শুয়ে ছিল ওরাও সব ভিক্ষে করে ?

—হাঁ।

—ওরাও শুধু দুবেলা দু'টি খেতে পায় ?

—হাঁ।—সবাই নয়; কেউ কেউ এক বেলাও পায়।

—আর এক বেলা ?

—কিছু পায় না।

একমুহূর্ত চিন্তা ক'রে নরেশ আবার বল্‌ল,—কেন, দু'বেলাও পায় না কেন ?—

—তারা তেমন রোজগার করতে পারেনা ব'লে ?

—তোকে দু'বেলা খেতে দ্যায় ?

—আগে দিত ; এখন একবেলা দ্যায়।

—তোর ছেলেকে কি দ্যায় ?

—শুধু একটু ক'রে দুবেলা দুবার বার্লি দ্যায়। আগে ওকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। আমি দিই নাই ব'লে আমার একবেলা ভাত বন্ধ করেছে।

—মেরে ফেলবে ? কে !

—ঐ দরওয়ানটা!—ঐ ত' মারে সবাইকে।

—কাদের ?

—যারা বুড়ো হয়ে যায়।

—বুড়ো হ'য়ে গেলে মেরে ফেলে ?

—হুঁ।—তারা আর ভিক্ষে করতে পারে না ! ব'সে ব'সে খাওয়াতে হয় ব'লে।

—হুঁ।—কেমন ক'রে মারে ?

—তা' জানি না, ভিক্ষে করতে করতে কেউ বুড়ো হ'য়ে এলেই আর যখন ভিক্ষে করতে পারে না তখন হঠাৎ একদিন সকালে উঠেই দেখি সেই বুড়োটা মরে আছে !

অস্ফুটে নরেশ ব'লে উঠ্‌ল,—উঃ—কী অমানুষ সব !

তারপর একমুহূর্ত্ত অপেক্ষা ক'রে আবার বললে, তোরা পালিয়ে যাস্‌নে কেন এখান থেকে ?

—পারিনে ?

—কেন ?

—কি জানি।—সবাই বলে, ওরা নাকি আমাদের কি খাইয়ে বশ ক'রে রেখেছে। বুঝ্‌তে পারিনে। দুদিন একজায়গায় পালিয়ে গেনু কিন্তু পারলাম না থাক্‌তে।

—ভিক্ষে করবার আগে কোথায় ছিলি ?

একমুহূর্ত্ত মেয়েটি চুপ করে রইল। নরেশ লক্ষ্য করল—তার আনত মুখখানা কিসের ভারে যেন আরও মাটির পানে নুয়ে পড়ল। অনেকটা কষ্টে মাথাটা একটু তু'লে সে উত্তর দিল, হাঁসপাতালে।

—তার আগে ?

মেয়েটি উত্তর দিতে পারল না, শুধু নীরবে ব'সে রইল।

নরেশ অনুমানে বুঝল'—ভিক্ষুকের দলভুক্ত হওয়ার আগে সে মর্ত্ত্যের নরক

পথেই নিমজ্জিত ছিল; আর তারই বিষময় পরিণাম হয়ত তাকে হাঁসপাতালে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

নরেশ আবার প্রশ্ন করল,—তোর ছেলের বয়েস কত?

—একবছর।

—তুই ভিক্ষে করছিস্ ক'বছর?

—দেড় বছর।

উত্তরের পর উত্তর দিয়ে দিয়ে মেয়েটি অত্যন্ত হাঁপিয়ে পড়েছিল। তেমনি হাঁপাতে হাঁপাতেই সে বল্‌তে লাগলো,—আজ তিন মাস থেকে ছেলেটার জ্বর; আমারও জ্বর আজ তিন দিন থেকে। কিন্তু তবু ভিক্ষেয় না বেরুলে ওরা খেতে দ্যায় না—আজ সারা দিন ঘুরে ঘুরে মোটে দু'টো পয়সা পেইছিনু, ওকে এনে দিনু।—ও ভাব্‌লো—আমি পয়সা বুঝি লুকিয়ে রেখেছি, দিচ্ছি নি। তাই আমায় অত করে মারছিল। আগে নাকি রোজ দু টাকা আড়াই টাকা ক'রে হ'ত। আজ কাল কেউ আর পয়সা দ্যায় না। পয়সা না পেলে বড় কষ্ট দ্যায়! মারে, খেতে দ্যায় না! ছেলেটার বালিটুকু পর্য্যন্ত আট্‌কে রাখে। ছেলেটা মাই টেনে টেনে কিছু পায় না—শুধু কাঁদে, তারপর কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে।

—ও বাড়ীর বাবুরা জানে?

—ওরাই ত ওকে মাইনে দিয়ে রেখেছে। সব পয়সা ওরাই ন্যায়।

—ওরা অত পয়সা ন্যায়, আর তোদের খেতে দ্যায় না দু'বেলা?

—না!—লোকে জানে ওরা আমাদের অমনি খেতে দ্যায়।

বিহ্বল হয়ে নরেশ ভিখারিণীর জীবন কাহিনী শুনে যাচ্ছিল। পথ দিয়ে শেষ ট্রাম যাওয়ার শব্দে তার যেন জ্ঞান হ'ল। পথের পানে চেয়ে দেখ্‌লো আর একটি লোকও তখন নেই।

পকেট থেকে একটা আধুলি বের ক'রে তাড়াতাড়ি মেয়েটির সাম্‌নে ফেলে দিয়ে নরেশ বললে,—নে! তারপর সে হন্ হন্ ক'রে সেখান থেকে চ'লে গেল।

লোলুপের মত আধুলিটা কুড়িয়ে নিয়ে মেয়েটি মুখ তুলে চাইতেই আর তাকে দেখ্‌তে পেল না।

কোলের ছেলেটি ততক্ষণে বুঝি ঘুমিয়েই পড়েছিল। ধীরে ধীরে উঠতে গিয়ে হঠাৎ ছেলেটার একটা শীর্ণ হাত হিমশীতল লৌহশলাকার মত তার গায়

এসে লাগল। চম্‌কে উঠে ভিখারিণী শিশুর পানে চাইল,—গায়ে মুখে হাত দিয়ে দেখ্‌লে ছেলে তার কখন তাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে।

টল্‌তে টল্‌তে ভিখারিণী মাতালের মত গেটের মধ্যে ঢুকেই মাটির উপর ব'সে পড়ল! তারপর আধুলিটা অদূরের দরওয়ানের পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে সে আপনার মৃতপুত্রের মৃত্যু মলিন মুখের পানে চেয়ে বসে রইল। চোখে তার তখন এক ফোঁটাও অশ্রু ছিল না, ছিল শুধু তপ্ত মরুর পুঞ্জীভূত আগুণের দীপ্ত শিখা!



দীর্ঘ-নিশ্বাস ক্লাব

শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত

সমুদ্রের ধারে একা একা বেড়াচ্ছিলুম।

হঠাৎ একটা সুবৃহৎ বাড়ী, তাকে অট্টালিকা বলা যেতে পারে, আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বিস্মিত হ'য়ে ভাবলুম হয়ত কোন রাজা মহারাজার বাড়ী, কিন্তু একটু কাছে আসতেই সে ভ্রম দূর হ'য়ে গেল। দেখলুম বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে 'দীর্ঘ-নিশ্বাস ক্লাব'।

অনেক জায়গায় অনেক রকম ক্লাব দেখেছি, কিন্তু কোন জায়গায় কোনও ক্লাবের এমন অদ্ভুত নাম শুনেছি ব'লে মনে পড়ে না। ভাবলুম, সমুদ্রের ধারে কালো জলের অক্লান্ত উচ্ছ্বাসে দীর্ঘ নিশ্বাসটাই মানুষের সাধারণতঃ সাথী হয়, তাই হয়ত এই ক্লাবের সৃষ্টি। কিন্তু এটুকু ভেবেই নিশ্চিন্ত হ'তে পারলুম না, এক পা দু পা ক'রে ক্লাবের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালুম। দারোয়ান যে ব'সে ছিল, সে তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে সেলাম করে বল্লে—আসুন, ভেতরে যান।

দারোয়ানের এই আচরণটাও আমার কাছে কেমন অদ্ভুত ঠেকল। ভেতরে ঢুকলুম, কেউ আমার দিকে ফিরেও চাইল না। সকলেই নিজ নিজ গভীর চিন্তায় ব্যস্ত আছে ব'লে মনে হ'ল। আমিও কাউকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা বা কোন রকম বিরক্ত না ক'রে সোজা ম্যানেজারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম—এর মানে কি?

ম্যানেজার ভদ্রলোকটি একটু মোটা গোছের, গায়ের রঙও বেশ ফর্সা। খুব বড়লোকের ছেলে বলেই মনে হ'ল। তিনি হেসে বল্লেন—কিসের মানে?

বল্লুম, এই দীর্ঘ নিশ্বাস ক্লাবের অর্থ কি?

তিনি তেমনি হেসে বল্লেন—এর কোন অর্থ নেই। এখানে প্রধানতঃ মানুষের দুঃখের আলোচনা করা হয়, আর দুঃখী যারা তারা সকলে সব সময়েই এখানে সাদরে নিমন্ত্রিত।...এই যে মোটা মোটা খাতাগুলো দেখছেন এর সব পাতায় অনেক মানুষের অনেক দুঃখের কাহিনী লেখা রয়েছে। আপনারও যদি

কিছু লিখবার থাকে এখানে লিখে যেতে পারেন। এ ক্লাবে কোন চাঁদা লাগে না।

এই বলেই তিনি একটা কলম আমার হাতে গুঁজে দিলেন।

আমি কলমটা হাতের মুঠোর ভেতর ধ'রে ভাবতে লাগলুম। তিনি বল্লেন, বৃথা সময় নষ্ট করবেন না। মনের আনন্দে আপনার দুঃখের কাহিনী এই সব খাতার পাতায় লিখে যেতে পারেন, কেউ কোন রকম সমালোচনা বা উপহাস করবে না, যার ভয়ে মানুষ পৃথিবীর আর কারো কাছে সে কাহিনী প্রকাশ করতে পারে না।...তা-ছাড়া যারা সুইসাইড্ করে তাদের মত দুঃখী বোধ হয় দুনিয়ায় আর কেউ নেই। আমরা তাদের সমস্ত দুঃখ ব্যর্থতার কাহিনী অত আনন্দের সঙ্গে নিয়ে থাকি।...বলুন আপনাকে কোন্ খাতাটা দোব···সুইসাইড্?...না—

তাঁর কথাগুলো শুনে পলকে আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হ'ল, কলমটা হাত থেকে খসে মাটিতে প'ড়ে গেল।

তিনি কলমটা মাটি থেকে তুলে আমার হাতে দিয়ে একটা মোটা বাঁধান খাতা দেখিয়ে বল্লেন—আচ্ছা, আপনি এইটেতেই লিখুন।

আমি ঘেমে উঠ্‌লুম, বল্লুম, কি লিখব?...

তিনি আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লেন—কেন, আপনার দুঃখের কাহিনী-

তোতলা স্বরে বল্লুম—কিছু মনে পড়ে না।

তিনি আরো আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন, বল্লেন—আপনি জীবনে একটাও আঘাত পান নি?...

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় বল্লুম হাঁ, খুব ছোটবেলায় একবার ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছিলুম তার দাগটা এখনও রয়েছে।

তিনি বাধা দিয়ে বল্লেন—না, সে কথা নয়—

হঠাৎ তিনি উৎফুল্ল হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লেন—আপনি যৌবনে কাউকেও ভালবেসে ছিলেন, প্রাণ দিয়ে, বুক দিয়ে, সর্ব্বান্তঃকরণে?—

লোকটার ধৃষ্টতায় মনে মনে ভারী চটে উঠলুম। হায়, কি কুক্ষণে আজ সমুদ্রের ধারে বেড়াতে এসেছিলুম, আর কি কুক্ষণেই এই ক্লাবে ঢুকেছিলুম!—একটু গরম হয়েই বল্লাম—তাতে কি যায় আসে?

আমার উত্তর শুনে তিনি ভারী খুসী হয়ে উঠলেন, বল্লেন—তাহ'লে ত আপনার অনেক কথা লিখবার আছে।...নিন্···লিখুন···জানেন, যারা ভালবাসে তাদের মত দুঃখী আর কেউ নেই এ পৃথিবীতে।··

বল্লুম, ভালবাসলে দুঃখ কিসের?...ভালবাসা তো একটা অনন্ত আনন্দের সন্ধান এনে দ্যায়।

তিনি বল্লেন—আহা আপনি বুঝছেন না।...ঐ আনন্দের ভেতর যদি দুঃখ না থাকে, জ্বালা না থাকে, তৃষ্ণা না থাকে...তা হ'লে ত তার সবটাই ফাঁকি! ভালবাসায় বেদনা আছে বলেই তো পৃথিবী শুদ্ধ লোক পাগল হ'য়ে তার পেছন পেছন ঘুরে হয়রান হচ্ছে। দুঃখের মত অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তির

কি আর কিছু আছে! এ পৃথিবীতে দুঃখটাই হচ্ছে মানুষের একান্ত আপনার জিনিষ।......

কথাটা ব'লেই তিনি হাস্‌তে লাগলেন। তাঁর হাসি দেখে আমি থ' খেয়ে গেলুম। বিরক্ত হ'য়ে মাথাটা একবার সজোরে নেড়ে বল্লুম, বুঝলুম না আপনার কথা, আর বুঝতেও চাই না।

তিনি আমাকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু তবু আমাকে নির্ব্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবশেষে বল্লেন, এই ধরুন আপনি কাউকে ভালবাসলেন, কিন্তু তাকে পেলেন না; তা হ'লে তো আপনার বুকে একটা দুঃখের সৃষ্টি হ'ল।..

বল্লুম—তাই বা হবে কেন? ভালবাসাইত চরম পুরস্কার! আমি তাঁকে ভালবাসি এটুকু ভাবতে পারাই ত জীবনের এক মস্ত সান্ত্বনা!

তিনি হেসে বল্লেন, কিন্তু ঐ সান্ত্বনাটুকু কিসের?

আমি চুপ ক'রে রইলুম। তিনি বলতে লাগলেন—অনন্তের সঙ্গে অনন্তের যে বিরহ সে মিটবার নয়। ভালবাসার ক্ষুধা কখন মেটবার নয়, একটিকে নিয়ে তার আরম্ভ হয়, কিন্তু তারপর সে বেড়েই চলে।

বল্লুম, তা না হয় স্বীকারই করলুম, কিন্তু যদি তাকে পাওয়া গেল, তাহলে?

তিনি বিজয় গর্ব্বে ব'লে উঠলেন তা হ'লে সে তো আরো, আরো দুঃখী।...

আমি সজোরে কলমটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে বল্লুম, মিথ্যে কথা!

তিনি চটলেন না। সেই রকম নিষ্ঠুর হাসি হাসতে হাসতে বল্লেন—তর্কের ঝোঁকটা মাথা থেকে বিদায় ক'রে দিন, আর আমি প্রমাণ না পেয়ে কোন কথা বলি না।... পাওয়ার ভেতরেও যে অনেকখানি না পাওয়া রয়ে গেল; এই না পাওয়াকে পেতে হ'লে গভীর দুঃখের তপস্যার দরকার। যারা এই ক্লাবে সুইসাইড করেছে, তাদের বেশীর ভাগই বিবাহিত আর তাদের লেখা কাহিনী থেকেই সব পরিষ্কার বুঝতে পারবেন।...

এই ব'লেই তিনি অনেকগুলো মোটা মোটা বাঁধান খাতা বের করলেন।

আমি অধীর হ'য়ে ব'লে উঠলুম—দোহাই আপনার, আমায় রক্ষা করুন!

• • •

ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে চেয়ে দেখলুম বাইরের রোদ ঘরে লুটিয়ে পড়েছে। বালিসের তলা থেকে ঘড়িটা বার করে দেখলুম আটটা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসলুম,... দেখলুম টেবিলের ওপর চা ঢাকা রয়েছে। একটা চুমুক দিয়েই বুঝলুম একেবারে জলের মত ঠাণ্ডা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস বুক ছেড়ে বেরিয়ে গেল, বোধ হয় চায়ের দুঃখেই। *

---

* মোপাসাঁ। অবলম্বনে।



জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর



তৃতীয় বর্ষ

তৃতীয় সংখ্যা

আষাঢ়, সন ১৩৩২ সাল

প্রতি সংখ্যা চারি আনা

বার্ষিক মাশুলসহ তিন টাকা আট আনা

সম্পাদক—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

সহ-সম্পাদক—শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ

কল্লোল পাবলিশিং হাউস

২৭ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আখাঢ়ক মাহ

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক

১

আয়ল আখাঢ়ক মাহ।
উগাবই রাব বা-রি ন-বরিখয়ি
গগন গুমরি-সোঁ চাহ!

২

সোঙরি পিয়া-লাগ- বিরহ যে গুরুয়া,
চঞ্চল-পবন বিথার;
ঢুরয়ি দীগ-দীগ, দিঠ নহি মি-লয়ি,—
গুরুয়ত বা-রিদ ভার।

৩

ঝামর ঘন সোঁহু রোয়য়ি বিথুরত,
ধরণী বিলুণ্ঠন মাঞি,—
তবহুঁ ন-শাকয়ি, ঝারত বিজুরিকা,
ঝাঁপত গগনক ঠাঞি।

মাহ = মাস।
রাব = শব্দ [মেঘ গর্জ্জন উল্লেখ করা হইতেছে]
সোঙরি = স্মরণ করিয়া।
বিথার = বিস্তৃত হইয়া বেড়ায়।
দীগ-দীগ = সর্ব্ব দিক্।
দিঠ = দৃষ্টি, দর্শন।
ঝামর = কৃষ্ণবর্ণ।
বিথুরত = ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে।
ঝারত = জ্বালায়।
ঝাঁপত = আচ্ছাদন করিয়া ফেলে।

৪

জলধর-লাঞ্ছনে দরবিতা রাধিকা,—
নিদারুণ মাহ আখাঢ়ঁ !
'কল্লোল'ছলি ভালী, ধারোয়া-ক হিন্দোলে,—
ইহ-সোঁ বিরহক বাঢ়ঁ !

৫

শাঙনুয়া-বাদর, আহ-তু দর-দরু,
ঝুরব কানু-অরুহামঁ ;
সোহুঁ বড়ি পাহন,— তবহুঁ-মে নাগর !
কান্ত সোঁ, মেহ-জনু ঠামঁ ।

৬

"দুখিনি, সমঝিউ,— রাধে মেরি জননি,"
দীন গাথক মুঞি গাহঁ,—
"তুঁহারি-যে বেদনে কানুয়া-ক ক্রন্দন,
আ-জহুঁ আখাঢ়ক মাহঁ !"



দরবিতা=দ্রবীভূতা। ঝুরব—অশ্রু
হিন্দোলে=হিল্লোলে। পাহন—পাষাণ।
বাঢ়ঁ—বাড়ায়, বৃদ্ধি করে। মেহ—মেঘ।
শাঙনুয়া-বাদর—শ্রাবণ-ভাদ্র [শাঙন—শ্রাবণ] জনু—যেন।

বিরহ

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ওগো প্রিয়া,
শ্যামলিয়া,
মরি মরি,
অপরূপ আকাশেরে কি বিস্ময় রাখিয়াছ ধরি'
নয়নের অন্তর-মণিতে; নীলের নিতল পারাবার!
বাঁধিয়াছ কি অপূর্ব্ব লীলাছন্দে জ্যোতি মূর্চ্ছনার
সুকোমল স্নেহে!
মরি মরি কি আনন্দ রচিয়াছ তনু শ্যাম স্নিগ্ধ শুচি দেহে
সুগন্ধ নন্দিত সুষমায়!
পিপাসার দারুণ ব্যথায়
দেহের ভঙ্গুর ভাণ্ডে কি অমৃত আনিয়াছ বহি;
রহি রহি
রক্তিম চম্পক বর্ণ কি আনন্দ কম্পমান অধর-সীমায়!
যৌবনের প্রচণ্ড শিখায়
দেহের প্রদীপখানি আনন্দেতে প্রজ্বালিয়া,
সৌরভে সৌরভে,
এলে পিয়া
লীলামত্ত নির্ঝরের ভঙ্গিমা-গৌরবে
শিহরিয়া ধরিত্রীকে,
আনন্দের স্ফুলিঙ্গ স্খলিয়া দিকে দিকে
মুহুর্মুহু!
আলোক-নির্ম্মাল্য ভাসে পুণ্য তব শুভ্র করতলে,
শ্রাবণের লাবণ্যের মৌন অশ্রুজলে

মমতায় বাঁধিয়া রাখিয়া,
বক্ষের ভাণ্ডারে কোন্ দগ্ধ দুঃখ কিম্বা তৃপ্তি শান্তি স্নেহ নিয়া
এলে প্রিয়া
বৈশাখের প্রভাতের মত!

আমি শুধু ভাবি বসে' বসে'
বেদনা-বিধৌত দুঃখ মলিন প্রদোষে
আকাশের স্তিমিত তন্দ্রায়,—
অন্তহীন যে অক্লান্ত বিরহ-ব্যথায়
আচ্ছন্ন হইল মোর পৃথিবী, আকাশ,
অন্ধকার, রৌদ্র, বৃষ্টি, বাত্যা, মন্দ ফাল্গুন-বাতাস,
সমুদ্রের কল্লোল-উচ্ছ্বাস,
নক্ষত্রের জ্যোতি-স্বপ্ন-আনাগোনা পথ,
এ সৌরজগৎ,
ধ্বংসলীন নামহারা সদ্যোজাত গ্রহ,—
সে কি প্রিয়া, তোমার বিরহ?
অহরহ
বিরহের মেঘে এ যে অশ্রুর আষাঢ় ঝরে প্লাবিয়া প্লাবিয়া
সে কি শুধু তোমা তরে, প্রিয়া?
ব্যথায় লেলিহ তীক্ষ্ণ কাঁপে যে পিপাসা এই,
সে কি শুধু চায় তোমারেই?
তোমারেই করে কি বন্দনা?
মোর এই নিগূঢ় বেদনা?

আজ যদি প্রচণ্ড উৎসুকে
সৃষ্টির উন্মত্ত সুখে
তোমার ওই বক্ষখানি দ্রাক্ষাসম নিষ্পেষিয়া লই মম বুকে,
কানে কানে মিলনের কথা কই;
অধরে অধরে রাখি ধরিত্রীর অঙ্কতলে লীন হয়ে রই,

তোমার দেহের শুচি মাধুরীর মঞ্জু-সমারোহে,
আনন্দ-মদিরা-মোহে
আচ্ছন্ন করিয়া দাও স্পর্শে, গানে, চুম্বনে, ব্যথায়,
সুখঘন ম্লান-শুষ্কতায়,
তবে কি তোমার পাওয়া হয়ে যায় শেষ ?
পূর্ণিমার ইন্দ্রজালে রচিবে আবেশ
অনাদি আকাশ ;
দক্ষিণের নিমন্ত্রণ নিয়ে নিয়ে দক্ষিণা বাতাস
আসিবে মালতী চাঁপা যূথিকার বনে,
স্বপ্ন হতে জাগাইবে চুম্বনে চুম্বনে ,
বুকের গুণ্ঠন খুলি কিশোরীরা বিলাবে সৌরভ
দক্ষিণের দিকে দিকে।
তুমি, প্রিয়া, মোর পানে চেয়ে অনিমিখে
সহসা জড়াবে কণ্ঠে স্নিগ্ধ বাহু-ব্রততী পেলব,
বণ্টন করিবে সুধা বুক হতে বুকে,
কভু মত্ততায়, সুখে, ব্রীড়ায়, কৌতুকে !
তখন তোমারে পাওয়া শেষ হয়ে যাবে কি গো প্রিয়া ?
আবার কভু বা আন্দোলিয়া
ঝরঝর বরিষণ,
বৃষ্টির নূপুর বাঁধি উতলা শ্রাবণ
নামিবে নাচিবে সুখে দেবদারুবনে,
গগনে গগনে
বাজিয়া উঠিবে মত্ত যৌবনের গুরুগুরু ;
তেমনি মোদের বক্ষ আনন্দে কাঁপিবে দুরুদুরু
বর্ষার সজল সুষমায় ;
তপ্ত এই সান্নিধ্যের সুখ-মত্ততায়
আনন্দ বণ্টন লুব্ধতায়
কাটিবে রজনী বারে বারে ;
তবে, প্রিয়া সাঙ্গ হবে পাওয়া কি তোমারে ?

না না, তবু, দেখি চেয়ে অহরহ,
কি প্রকাণ্ড প্রচণ্ড বিরহ
ক'রে আছে গ্রাস
আমাদের মাঝেকার অনন্ত আকাশ!
নিদারুণ নির্ম্মম শূন্যতা
একান্তে বহিছে তার ব্যঞ্জনার ব্যথা
মুহ্যমান,
অপূর্ণ এ ব্যবধান!
এই মোর জীবনের সর্ব্বোত্তম সর্ব্বনাশী ক্ষুধা
মিটাইতে পারে হেন নাহি কোন সুধা
দেহে প্রাণে ওষ্ঠে প্রিয়া তব;
অভিনব
এ বিরহ আকাশের সমান-বয়সী!

ভাবি বসি,
তোমারেই শুধু আমি ভালবাসি নাই,
তোমারে ত সদাই হারাই;
জীবনের প্রতি রক্ত বিন্দু দিয়া যারে চাই,
যুগে যুগে চাহিয়াছি আমি যারে,
বাসিয়াছি ভাল যারে গ্রহে গ্রহে তারায় তারায়,
আজি এই নব জন্মে নব বসুধায়
বিরহের তীব্র হাহাকারে
তাহারেই বেসেছি যে ভাল!
অন্তরজ্যোতিতে দীপ্ত যে জ্বালাল
পূরবের দিক্‌প্রান্তে আনন্দের শিখা,
জ্যোৎস্নার চন্দনে স্নিগ্ধ যে আঁকিল টীকা
আকাশের ভালে,
ফাল্গুনের স্পর্শ-লাগা মুঞ্জরিত নব ডালে ডালে
সদ্যফুল্ল কিশলয় হয়ে

যে হাসে শিশুর হাসি,
কল্যাণী নারীর মত একখানি দিৎসা বয়ে
যে তটিনী কলকণ্ঠে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
বক্ষে দিয়া দুরন্ত পিপাসা,
সে আজি বেঁধেছে বাসা
হে প্রিয়া, তোমার মাঝে ;
তাই শুনি মুহুর্ম্মুহু তব দেহে ঝঙ্কারিয়া বাজে
অসীমের রুদ্র মহাগান,
ঘুচিতে চাহে না তাই এই ব্যবধান !
মরি মরি
তোমারে হয় না পাওয়া তাই শেষ করি !
চেয়ে দেখি অনিমিখ
তুমি মোর অসীমের সসীম প্রতীক,
ক্ষুদ্র ওই দেহের আড়ালে কি আশ্চর্য্য সাবধানে
বাঁধিয়াছ আকাশের ভগবানে !
তাই ওগো প্রিয়া,
শুধু আমি তোমারেই নিয়া
তৃপ্ত নাহি হই,
অহর্নিশি ব্যথা কাঁদে, কই কই
কোথায় সে ভগবান
কোথা পাব দূরের সন্ধান ?

হে প্রিয়া, তোমারে তাই
বারে বারে চাই
খুঁজিতে সে ভগবানে ;
তাই প্রাণে প্রাণে
বিরহের দগ্ধ কান্না ফুকারিয়া ওঠে অবিরাম,
তাই মোর সব প্রেম হইল প্রণাম !

নিশীথ-রাতে

শ্রীপ্রেমকুমার চক্রবর্ত্তী

নিশীথে গভীর রাতে আমি একাকী
আকাশে তারার চোখে এ আঁখি রাখি।
জীবনের সাধ যত ঘুরাল ক্ষ্যাপার মত,
একাকী বসিয়া দেখি সকলি ফাঁকি;
নিশীথে গভীর রাতে আমি একাকী।

আঁধার রজনী পারে কি জানি মায়া,
আমার হৃদয় মাঝে ফেলেছে ছায়া;
কোন্ সে রূপের দোল্ করে হেথা কলরোল
জগতে ক্ষ্যাপার দল ভুলিল কায়া,
আঁধার রজনী পারে কি জানি মায়া।

হৃদয় গোপন তলে কি যেন ব্যথা—
প্রকাশি' কেমন করে'—নাহি যে কথা;
কেন যে এমন ক'রে চেয়ে থাকি রাত ভরে,
কারে যে হৃদয় ভ'রে চেয়েছি হেথা,
প্রকাশি' কেমন ক'রে নাহি যে কথা।

জানি না কখন্ দীপ নিভিবে ধীরে;
ফুলের সুরভি ফেরে আমারে ঘিরে,
যে কথা বলিতে চাই বলা যেন হয় নাই
এখন ভাবি যে তাই নয়ন নীরে;
জানি না কখন্ দীপ নিভিবে ধীরে।

———

একখানা চিঠি

শ্রীপ্রফুল্লকুমার রায় চৌধুরী

অনিল,

তুমি বার বার এই কথাটাই জান্‌তে চেয়েছ যে, আমি আবার রাঁচী চ'লে এসেছি কেন? আমার চ'লে আসার কারণ জান্‌বার আগ্রহে তুমি অনেক কথা আমাকে জানাতেই ভুলে গেছ।

এখানে আবার আসার কারণ বল্‌তে গেলে একখানা ছোট-খাট উপন্যাস বল্‌তে হবে যার মধ্যে কমেডি, ট্র্যাজেডি, রোমান্স কিছুই বাদ থাকবে না।

আমাদের পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পরই বাড়ীতে যে দুর্ঘটনা ঘটে গেল তা' ত তুমি জানই। মাকে হারিয়ে মনের অবস্থা এমন হয়ে উঠ্‌ল যে, বাড়ী থেকে কোথাও না গেলে আমার চল্‌ছিলই না। বাড়ীতে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলুম। প্রতি জিনিষটা কেবল মায়ের স্মৃতি মনে এনে দিত। প্রতিবারেই আমি মাকে হারানোর বেদনায় ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌তুম্‌। মাকে হারিয়েই বুঝ্‌তে পারছি, মা জগতে কতখানি—যেটা আগে ঠিক্ বুঝ্‌তে পারতুম না।

যা'হোক, হাওয়া বদলাতে এসে রাঁচীতে আমাদের ছোট বাংলোটাতেই উঠ্‌লুম। দিন কয়েক কেটেছিল ভাল—একটা বৈচিত্র্যে মনটাও বেশ তাজা ছিল।

একদিন সন্ধ্যের আগেই মুরাবাদী পাহাড় থেকে ফির্‌ছিলুম। তখনো অন্ধকার হয় নি, অলসপদে বাড়ীর দিকে আস্‌ছি চারিদিক চাইতে চাইতে। বরিয়াতুর রাস্তাটা এসে যেখানে মুরাবাদীর রাস্তায় পড়েছে সেইখানে দেখা হ'ল সেই দু'জনের সঙ্গে—যাদের সঙ্গে রোজই বেড়াবার সময় পথে দেখা হত। সেই ছোট্ট চাকরটা বয়স তের হবে, তাদের সাম্‌নে সাম্‌নে চলেছে, নিজের মনে সুর ভাঁজ্‌তে ভাঁজ্‌তে। মোড়ের কাছে আস্‌তেই তরুণীটি আমার দিকে চেয়ে ব্যস্তভাবে বল্‌লেন—এই যে আপনি বাড়ী যাচ্ছেন? চলুন আপনার সঙ্গেই বাড়ী যাই।

আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম! সম্পূর্ণ অপরিচিত, অথচ এমন চির-পরিচিতের মত কথা বলার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝ্‌তে পারলুম না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা

আস্‌তে লাগ্‌লেন। কিছুদূর আসার পর একজন লোকের দিকে দেখিয়ে বল্‌লেন —ঐ লোকটা রোজ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘু'রে বেড়ায়; আজ বড় বাড়াবাড়ি কর্‌ছিল।

তাঁকে বাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলুম।

এর পর থেকে তাঁদের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়ে গেল; আমিও সঙ্গীহীন অবস্থায় সঙ্গী পেয়ে খুব খুশী হলুম।

তাঁদের বাড়ীখানা আমাদের বাড়ীর কাছেই—মিনিট পাঁচেকের রাস্তা। বৃদ্ধ বাপ্‌ মা আর মেয়ে, এই তিন্‌টি প্রাণী সেই বাড়ীতে থাক্‌ত। তাঁদের সঙ্গী পেয়ে আমার বৈচিত্র্যহীন জীবনখানা আবার বিচিত্রতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। রঁাচী আবার আমায় নতুন ক'রে মুগ্ধ কর্‌লে।

মাসখানেক যাবার পর বৃদ্ধ অনাথবাবু একদিন বল্‌লেন, তাঁদের এবার কল্‌কাতায় যেতে হবে। আর বার বার অনুরোধ কর্‌লেন, কল্‌কাতায় ফিরে গিয়ে আমি যেন তাঁদের বাড়ীতে নিশ্চয় যাই।

যাবার দিন সকাল থেকে যাওয়া পর্য্যন্ত আমি ওখানেই ছিলুম। গাড়ীতে ওঠ্‌বার কিছুক্ষণ আগে অনীতার সঙ্গে দেখা হল—একেবারে নির্জ্জনে বাগানের দিকের ঘরে। সে আমার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে কোন কথা না ব'লেই তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাড়ীতে ফিরে এসে খামখানা খুল্‌লুম। চিঠিখানায় শুধু এই টুকু লেখা ছিল।—

আমি আজ কল্‌কাতায় চল্‌লুম।

অনীতা।

অনীতা যে কি রকম মেয়ে আজো পর্য্যন্ত আমি বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। প্রথম যেদিন আলাপ হয় সে দিনও যেমন অবাক ক'রে দিয়েছিল, যাবার দিনেও তেমনি অবাক ক'রে দিয়ে গেল।

রাত্রে কতক্ষণ ধ'রে বুঝ্‌তে চেষ্টা করেছি চিঠিখানার অর্থ কি? যতবারই ভাব্‌তে গেছি ততবারই মনটা কোন্‌ সুদূরে চ'লে গেছে, কিছুই ভাবা হয় নি। একটা অজানা বেদনায় বুকের ভেতরটা বার বার ভ'রে উঠেছে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি তা জান্‌তেও পারি নি।

সকালে উঠ্‌লুম। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম—সমস্ত যেন কেমন শ্রীহীন হয়ে গেছে। রঁাচীর যে সৌন্দর্য্য, যে রমণীয়তা আমায়

মুগ্ধ ক'রে রেখেছিল তা যেন হঠাৎ কোথায় চ'লে গেল। দূরে মুরাবাদী পাহাড়টা পাষাণস্তূপ বই কিছুই মনে হ'লো না; রাঁচী পাহাড়টা, মনে হ'ল, অকারণে আমার দৃষ্টিপথ আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে আছে; একটা সাঁওতাল গান গাইতে গাইতে চ'লে গেল—কি বেসুরো, বেতালা! অনীতার চিঠি আবার পড়লুম। লেখার আড়ালে অনেক অ-লেখা কথা যেন চোখে প'ড়ে গেল। কত রকমের অর্থ মনের মধ্যে এসে হাজির হ'লো। কিছুই ঠিক করতে পারলুম না। সেদিন আর বেড়াতে বেরুনো হ'লো না। মনটা গুম্‌রে উঠতে লাগল—জীবনটা তেতো হয়ে উঠল।

এমনি ক'রে একঘেয়ে জীবনটা কেটে গেল আরো মাসখানেক। হঠাৎ একদিন খুড়োর এক পোষ্টকার্ড পেলুম—বাড়ীতে মস্ত বিয়ে। শীগ্‌গিরই এস।

ভাবনায় পড়লুম—কার বিয়ে? কল্‌কাতায় রওনা হলুম।

গলিতে ঢুকে আমাদের বাড়ীর দিকে দেখলুম—উৎসবের চিহ্নমাত্র নেই। বুঝলুম আমাকে কল্‌কাতায় আন্‌বার জন্য খুড়োর এই চালাকী। মনে মনে ভারি রাগ হ'ল। বাড়ীর ভেতর ঢুকতেই পিসী-মা তাড়াতাড়ি আমার কাছে এলেন—চেঁচিয়ে বাড়ীর সকলকে জানিয়ে দিলেন—আমি এসেছি। তারপর হাত ধরে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে গেলেন একেবারে ওপরে, দক্ষিণে মায়ের ঘরে। ঢুকেই দেখি, ঘোমটা মাথায় কে ব'সে আছেন। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আস্‌তে যাচ্ছি পিসী-মা হেসে বল্‌লেন—আর কপাল, ওকে দেখে লজ্জা করছিস, ওই ত তোর নতুন-মা হ'ল রে।

তারপর তাঁর দিকে চেয়ে বল্‌লেন—ও নতুন-বউ, এই তোমার ছেলে।

ব'লেই ঘোমটাটা খুলে দিলেন।

চোখোচুখি হতেই চম্‌কে উঠলুম। অনীতা একেবারে আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল—তার মাথার কাপড় খুলে প'ড়ে গেল!

সেদিন রাত্রেই রাঁচী চ'লে এসেছি। প্রথমবার এসেছিলুম মাকে হারিয়ে, এবার এসেছি সব হারিয়ে . . .

অনীতাকে এত কাছে পেলুম ব'লেই সে এত দূরে চ'লে গেল . . .

দিন দুই আগে খুড়োর আবার একখানা চিঠি পেয়েছি। তাতে লিখেছে—আমি বি. এ. পাশ করেছি; এম্‌. এ ক্লাশে ভর্ত্তি হতে কবে কল্‌কাতায় যাব? বাবা নাকি বলেছেন, ওর হ'লো কি, পড়াশুনো কি একেবারে ছেড়ে দিলে? রাঁচীতে আছে কি ওর?

———

শরৎচন্দ্র

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(বাল্যজীবন)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জুবিলি বৎসরে শরৎ ছাত্র-বৃত্তি পরীক্ষা পাশ করিয়া বাংলা স্কুল হইতে বাহির হইয়া যায়।

এই স্কুলটি এখনো উঠিয়া যায় নাই। ইহার অতীত কাহিনী, এই অঞ্চলের বহু প্রবাসী বাঙ্গালীর বাল্য ইতিহাসের সহিত নিবিড় ভাবে জড়িত।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্কুলের পক্ষ হইতে জনকয়েক শরৎচন্দ্রের কাছে আসিয়া এই স্কুলের সহিত তাঁহার একটা ঘনিষ্ট আত্মীয়তার দাবী করেন। উত্তরে শরৎচন্দ্র কিন্তু ভারি মজার কথা বলেন :—আমি এই স্কুলে পড়েছিলাম—এই কথা যারা আমাকে মনে করিয়ে দেয়, তাদের ওপর আমার রাগই হয়। আমার লজ্জা ক'রে যে, আমি ঐখেনে পড়ে মানুষ। আপনারা দয়া ক'রে আমাকে আর ঐ-সব কথা মনে করিয়ে দেবেন না।

ভদ্রলোকদের মনের অবস্থা অনুমেয়। এই কথা কয়টির যথার্থ অর্থ গ্রহণ করা বোধ করি একটু কঠিনও। শরৎচন্দ্রকে ঠিক ভাবে না জানিলে, ইহা হইতে তাঁহার চিত্তের দীনতা কল্পনা করাই বোধ করি সাধারণের পক্ষে স্বাভাবিক হইবে।

কিন্তু ইহার অপর একটি দিকের কথাও আমার মনে আসে :—

এই বিদ্যালয়টি অর্দ্ধশতাব্দীর আগেকার প্রবাসী বাঙ্গালীর সাধু উৎসাহের জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

বাংলা দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তখনকার বাঙ্গালীর জাতীয় বিশেষত্ব রক্ষা করা একান্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। আরো পূর্ব্বে যাহারা বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছিল তাহাদের দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়া জাতীয়তা রক্ষার জন্য নবাগত বাঙ্গালী যে সকল চেষ্টা করিয়াছিল, বোধ করি এই স্কুলটি তাহার মধ্যে প্রধানতম, অন্যতম ত বটেই।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী যে ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিল, আজ তাহারাই সংখ্যায় বহুতর ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াও ইহার বিশেষ কোন উন্নতি সাধন করিতে পারিল না, ইহা চিন্তা করিয়া শরৎচন্দ্রের মত একজন স্বদেশানুরক্ত ব্যক্তির ক্ষোভ কি নিতান্ত স্বাভাবিক নহে? মনে হয়, ঐ কথা-গুলির মধ্যে অনেকখানি চাপা অভিমান নিহিত আছে।

পরন্তু ইহাও মনে করি যে সৌভাগ্যক্রমে এই বিদ্যালয়টির প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা দেখাইবার সময় শরৎচন্দ্রের জীবনে অতিবাহিত হইয়া যায় নাই।

ইংরেজি স্কুলে গিয়া শিক্ষকগণের প্রিয় হইয়া উঠিতে শরতের কিছুমাত্র বিলম্ব ঘটে নাই। ভুবেন্দ্রী একজন দুর্দ্দান্ত শিক্ষক ছিলেন, শরতের প্রতি তাঁহার সস্নেহ ব্যবহার দেখিয়াছি এবং পরে শরতের আত্মীয় হিসাবে তাঁহার কাছে অনেক আদর যত্নও পাইয়াছি।

পাঠে মনোযোগ দিতে গিয়া শরতের খেলার দিকটায় কোনদিনই ফাঁক পড়িত না। বরঞ্চ এই সময় সে আরো কয়েকটি খেলায় বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিল। মার্ব্বেলে তাহার জুড়ি ছিল না। 'গুলি' গর্ত্তে ফেলিতে সে অদ্বিতীয় ছিল; এবং দশ-পনর হাত দূর পর্য্যন্ত তাহার সন্ধানও ছিল একেবারে অব্যর্থ। তাহার ফলে সে প্রত্যহ মাত্র দুইটি করিয়া গুলি (টল্ এবং আনটা) পকেটে করিয়া স্কুলে যাইয়া দুই পকেট পূর্ণ করিয়া বাড়ী ফিরিত।

এই 'জেতা গুলির' উপর তাহার কোন মমতা ছিল না; সেগুলি তাহার বয়ঃকনিষ্ঠদিগের মধ্যে অকাতরে বিলাইয়া দিয়া যেন ভার মুক্ত হইয়া বাঁচিত। বাল্যাবস্থা হইতে আজ পর্য্যন্ত একই ভাব; কোন বস্তুর উপর কোন মমতাই যেন নাই। দাতার গৌরবের জন্য লালায়িত নহে, পরন্তু সঞ্চিতের ভার হইতে নিজেকে সতত মুক্ত করিবার আকাঙ্খা তাহার আশৈশব একভাবেই তীব্র রহিয়া গেল!

লাট্টু ঘোরাইতেও সে ছিল এক প্রকাণ্ড ওস্তাদ। ছোট-বড় নানা রকমের লাট্টুর শেষ ছিল না। শূন্য হইতে মাটিতে পড়িতে না দিয়া একেবারে হাতে ঘুরানোর কায়দা দেখিয়া শিশুবৃন্দ বিমুগ্ধ হইয়া থাকিত। কিন্তু তাহার মোহন-কাঠের মাথা-ভারি তীক্ষ্ণ হুল লাট্টুটাই ছিল সকল লাট্টুর যম; সেটা অন্য লাট্টুর উপর বজ্র গাম্ভীর্য্যে পড়িয়া দু-চির করিয়া দিয়া খেলওয়াড়ের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

আমাদের আর একটি খেলার কথা মনে পড়িতেছে।

আমাদের উত্তর পাশের বাড়ীটি ঠিক গঙ্গার উপরেই। শৈশবে এই বাড়ীতে এক বৃহৎ পরিবারকে বাস করিতে দেখিয়াছি। কর্ত্তাদের মধ্যে কয়েকজনের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহারা এই বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যান। তাহার পর দীর্ঘ দিনের জন্য এই বাড়ী 'ভূতের বাড়ী' হইয়া পড়িয়াছিল।

এই সময়ে উহা পাড়ার ছেলেদের কুস্তির আখ্‌ড়ার কাজে আসিত। অন্দর মহলের উঠান খুঁড়িয়া মল্ল-ভূমি তৈয়ারি হইল; কিন্তু তাহাতে মন উঠে না; এক জোড়া প্যারালেল বার চাই-ই চাই।

খুড়ির "মান্‌তা" করিতে করিতে এক শনিবারের দ্বিপ্রহরে স্থির হইল যায় যাক্ প্রাণ, কিন্তু 'বার' চাই।

সেই সন্ধ্যায় বাঁশের জন্ম দা-হাতে চার-পাঁচ জন বালকের "তাল-বন্যায়" অভিযান, মনে পড়ে! রাত্রের অন্ধকারে পা ফণি-মনসার কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হইল, কাহারো বা সর্ব্বাঙ্গ কঞ্চির আঁচড়ে চিত্র-বিচিত্র হইয়া গেল; কিন্তু বাঁশ আসিল!

পরদিন বেলা বারটার মধ্যে আমরা 'বারে' ঝুলিতে পাইয়া জীবনকে সম্পূর্ণ সার্থক জ্ঞান করিলাম!

ইদানিং এই সব ব্যায়াম এবং ক্রীড়ার ব্যবস্থা ক্রমে স্কুলে স্কুলে হইতেছে; কিন্তু ছাত্রদের আকাঙ্খা-উৎসাহ যেন আর ঐ পথ দিয়া চলে না। যাহা বাহির হইতে কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়া যায়—তাহাতে যেন প্রাণের প্রকৃত সাড়া বিমুখ হইয়া যায়। আজকাল সকল স্কুলেই বার দেখিতে পাই; কিন্তু সেকালের ঝুলিবার উৎসাহ যেন আর নাই!

খেলার পর, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইবার পূর্ব্বেই আমাদের কুস্তির গোপন আখ্‌ড়াটি জমিয়া উঠিত। কেউ ডন্ ফেলিতেছে, কেউ বারে উঠিয়াছে। কেউবা দুই হাতের উপর 'পিকক্' হইয়া উর্দ্ধপদে উঠানের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিতেছে। বেশী শব্দ করিয়া হাসিবার পর্য্যন্ত উপায় ছিল না; পাছে আমাদের বাড়ীর কর্ত্তারা জানিতে পারেন।

আলো জ্বালিবার পূর্ব্বে ত্রস্ত পদে আমরা বাড়ী ঢুকিতাম। মুখে "ওঁ, হ্রীং হ্যাং হ্যাং রক্ষ রক্ষ স্বাহা"—ভয়-ব্যাকুল হৃদয়, দুর্ দুর্ করিতেছে।

উঠান দিয়া যাইতে হইলে চণ্ডী-মণ্ডপের মধ্যে কেহ বসিয়া থাকিলে দেখা যাইত—তাই খানিকটা পথ অতি সন্তর্পণে, সময়ে সময়ে প্রায় বুকে হাঁটিয়া অতিক্রম করিতে হইত। কিন্তু গলির দোয়ারে আসিয়া পড়িলেই, হাঁপ ছাড়িয়া তিড়িং-বিড়িং করিয়া নাচিতে নাচিতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতাম।

ভয় বোধ করি একটা সংস্কারের মত ; তাহার একটা নিজের ধারা থাকে। এতখানি ভয় কাহাকে করিতেছে, কেনই বা করি, এই সকল যুক্তি-তর্ক সেই স্রোতের মধ্যে স্থান পায় না ; শুধু অবিচারে তাহা উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া যায়। এক এক জনের ভীষণত্বের বদনামও বোধ করি এমনি একটি সংস্কারের ধারায় বহিতে থাকে। কর্ত্তাদের যৌবন-মধ্যাহ্নের প্রভাব প্রখর শাসন-কাহিনীর বিস্তৃত বর্ণনাই বোধ করি আমাদের এতখানি হুঁসিয়ার করিয়া দিয়াছিল। এখন ভাবিলে, ইহার এত প্রয়োজন ছিল বলিয়া যেন বিশ্বাস করিতেও ইচ্ছা হয় না।

আমাদের দলটি যে বাস্তবিক একটা ভীরু কাপুরুষের দল ছিল—তাহাও ত মনে হয় না ; অন্তত শরতের সম্বন্ধে এ কথা কিছুতেই বলা চলে না।

সে সময় "সংসার-কোষ" বলিয়া একখানি বই ছিল—যাহার তথ্যের পুঁজি সত্যই অফুরন্ত। এই বইখানি হইতেই উপরে লিখিত আমাদের বিপদের রক্ষা-মন্ত্রটি আমরা উদ্ধার করিয়াছিলাম ; এবং ইহাও অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা যে, যে-যেদিন ঐ মন্ত্র আমরা সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া জপ করিতাম, সেই-সেইদিনে অচিন্তিত উপায়ে বাঁচিয়া যাইতাম। ইহার কি কারণ তাহা হয় ত কোনদিন জানিতে পারিব না। একথা মনে করিলে নিজের হাসিও পায় ; তবুও বিশ্বাসের একটি অতি ক্ষুদ্র বীজ কোথায় যেন আজীবন নিহিত থাকিয়াই গেল।

সে যাহা হউক, এই সংসার-কোষ হইতে শরৎ আর একটি তথ্য সংগ্রহ করিয়া একদিন উল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিল। সেটি একটি সর্প-সম্মোহন-বিদ্যা। বোধ করি বইখানিতে লিখা ছিল যে, একটা একহাত প্রমাণ বেলের শিকড় যদি কোন বিষধর সর্পের ফণার সম্মুখে ধরা হয়, তাহা হইলে নিমেষে সেই সর্প মাথা নীচু করিয়া মৃতবৎ হইয়া পড়িবে।

শরতের উৎসাহের কথা মনে পড়ে। অচিরে বেলের শিকড় সংগ্রহ করা হইল ; কিন্তু সাপ কোথায় ? হঠাৎ সাপ পাওয়া দুরূহ হইলেও বহু অনুসন্ধানের পর পেয়ারা-তলার ভাঙ্গা খাপ্‌রার গাদির মধ্য হইতে একটি গোক্ষুরা সাপের শলুই পাওয়া গেল।

তখন শরতের আনন্দ দেখে কে ? সর্প-শাবক তাহার প্রচণ্ড ক্রোধ ব্যঞ্জক ফণা উত্তোলন করাতেই শরৎ বেলের শিকড়টি তাহার মুখের কাছে আগাইয়া ধরিল। গভীর বিশ্বাস ছিল যে, সাপটি মাথা নিচু করিয়া তখনি ক্ষমা প্রার্থনা

করিবে ; কিন্তু বেলের শিকড়ের উপর সেটা নির্ম্মম ভাবে ছোবল মারিয়া বসিল। আমাদের মনের অন্ধতার জমাট্-অন্ধকার নিমেষে বিদূরিত হইয়া গেল।

দাদা সাপ মারিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ; তাহার মোটা লাঠির গোটা তিন-চার চোটে সর্প-শিশু অকালে ভব-লীলা সাঙ্গ করিয়া বসিল !

এই ঘটনার মাস কয়েক পূর্ব্বে শরৎকে সাপে কামড়াইয়াছিল। শুনা যায় ঘর-পোড়া-গরু সিন্দূরে মেঘ দেখিলেও ভয়ে কাতর হয়। সেই ভয়ের লক্ষণ এই ব্যাপারের মধ্যে একটুও প্রকাশ পায় নাই।

ক্রমশ



শ্রাবণ সংখ্যায়

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সম্বন্ধে আলোচনা থাকিবে

কবর

(গ্রাম্যকবিতা)

শ্রীজসীম উদ্দীন্

এইখানে তোর দাদীর কবর ডালীম গাছের তলে,
তিরীশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।
এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ,
পুতুলের বিয়ে ভেঙ্গে গেল ব'লে কেঁদে ভাসাইত বুক।
এখানে ওখানে ঘুরিয়া ফিরিতে ভেবে হইতাম সারা,
সারা বাড়ী ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা!
সোনালী উষার সোনামুখ তার আমার নয়ন ভরি'
লাঙল লইয়া ক্ষেতে ছুটিতাম গাঁয়ের ওপথ ধরি।
যাইবার কালে ফিরে ফিরে তারে দেখে লইতাম কত,
এ কথা লইয়া ভাবী-সা'ব মোরে তামাসা করিত শত।
এমনি করিয়া জানি না কখন জীবনের সাথে মিশে,
ছোট-খাট তার হাসি ব্যথা মাঝে হারা হয়ে গেনু দিশে।
বাপের বাড়ীতে যাইবার কালে কহিত ধরিয়া পা,
"আমাকে দেখিতে যাইও কিন্তু উজানতলীর গাঁ।
শাপলার হাটে তরমুজ বেচি দু'পয়সা করি দেড়ী,
পুঁতীর মালার একছড়া নিতে কখনও হ'ত না দেরী।
দেড় পয়সার তামাক এবং মাজন লইয়া গাঁটে,
সন্ধ্যা বেলায় ছুটে যাইতাম শ্বশুর বাড়ীর বাটে!
হেস না হেস না—শোন দাদু, সেই তামাক মাজন পেয়ে,
দাদী যে তোমার কত খুশী হ'ত দেখিতিস্ যদি চেয়ে!
নথ নেড়ে নেড়ে কহিত হাসিয়া, "এতদিন পরে এলে,
পথ পানে চেয়ে আমি যে হেথায় কেঁদে মরি আঁখি জলে।"

আমারে ছাড়িয়া এত ব্যথা যার কেমন করিয়া হায়,
কবর দেশেতে ঘুমায়ে র'য়েছে নিঝঝুম নিরালায়!
হাত জোড় ক'রে দোয়া মাঙ দাদু, "আয় খোদা দয়াময়,
আমার দাদীর তরেতে যেন গো ভেস্ত নাছেল হয়।"

* * *

তারপর এই শূন্য জীবনে যত কাটিয়াছি পাড়ি
যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি।
শত কাফনের শত কবরের অঙ্ক হৃদয়ে আঁকি'
গণিয়া গণিয়া ভুল ক'রে গুণি সারাদিন রাত জাগি।
নিজ হস্তেতে কোদাল ধরিয়া কঠিন মাটীর তলে,
গাড়িয়া দিয়াছি কত সোনামুখ নাওয়ায়ে চোখের জলে।
মাটীরে আমি যে বড় ভালবাসি মাটীতে লাগায়ে বুক
আয়—আয় দাদু গলাগলি ধরি কেঁদে যদি হয় সুখ।

* * *

এইখানে তোর বাপজী ঘুমায়ে, এইখানে তোর মা,
কাঁদিছিস্ তুই? কি করিব দাদু পরাণ যে মানে না।
সেই ফাল্গুনে বাপ তোর এসে কহিল আমারে ডাকি,
বা-জান্, আমার শরীর আজিকে কি যে করে থাকি থাকি।
ঘরের মেঝেতে সপটি বিছায়ে কহিলাম—বাছা শোও,
সেই শোওয়া তার শেষ শোওয়া হবে তাহা কি জানিত কেউ?
গোরের কাফনে সাজায়ে তাহারে চলিলাম যবে ব'য়ে,
তুমি যে কহিলা—বা-জানরে মোর কোথা যাও দাদু ল'য়ে?
তোমার কথায় উত্তর দিতে কথা থেমে গেল মুখে,
সারা দুনিয়ার যত ভাষা আছে কেঁদে ফিরে গেল দুখে।
তোমার বাপের লাঙল-জোয়াল দুহাতে জড়ায়ে ধরি'
তোমার মায়ে যে কতই কাঁদিত সারা দিনমান ভরি,
গাছের পাতারা সেই বেদনায় বুনো পথে যেত ঝ'রে,
ফাল্গুনী হাওয়া কাঁদিয়া উঠিত শুনো মাঠখানি ভ'রে।
পথ দিয়া যেতে গেঁয়ো পথিকেরা মুছিয়া যাইত চোখ,
চরণে তাদের কাঁদিয়া উঠিত গাছের পাতার শোক।

আথালে দুইটি জোয়ান বলদ সারা মাঠ পানে চাহি'
হাম্বা রবেতে বুক ফাটাইত নয়নের জলে নাহি'।
গলাটি তাদের জড়ায়ে ধরিয়া কাঁদিত তোমার মা,
চোখের জলের গোরস্থানেতে ব্যথিয়ে সকল গাঁ।
উদাসিনী সেই পল্লীবালার নয়নের জল বুঝি
কবর দেশের আন্ধার ঘরেতে পথ পেয়েছিল খুঁজি'।
তাই জীবনের, প্রথম বেলায় ডাকিয়া আনিল সাঁঝ,
হায় অভাগিনী আপনি পরিল মরণ-বিষের তাজ।
মরিবার কালে তোরে কাছে ডেকে ক'হল,—বাছারে, যাই,
বড় ব্যথা রো'লো দুনিয়াতে তোর মা বলিতে কেহ নাই;
দুলাল আমার যাদুরে আমার লক্ষ্মী আমার ওরে,
কত ব্যথা মোর আমি জানি বাছা, ছাড়িয়া যাইতে তোরে।
ফোঁটায় ফোঁটায় দুইটি গণ্ড ভিজায়ে নয়ন-জলে,
কি জানি আশীষ ক'রে গেল তোরে মরণ-ব্যথার ছলে।
ক্ষণপরে মোরে ডাকিয়া কহিল—আমার কবর গায়
স্বামীর মাথার 'মাথাল'খানিরে ঝুলাইয়া দিও বায়।
সেই সে মাথাল পচিয়া গলিয়া মিশেছে মাটির সনে,
পরাণের ব্যথা মরে নাক সে যে কেঁদে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।
জোড় মাণিকেরা ঘুমায়ে রয়েছে এইখানে তরুছায়,
গাছের শাখারা স্নেহের মায়ায় লুটায়ে প'ড়েছে গায়।
জোনাকী মেয়েরা সারারাত জাগি জ্বালাইয়া দেয় আলো,
ঝিঁ ঝিঁরা বাজায় ঘুমের নূপুর কত যেন বেসে ভালো।
হাত জোড় ক'রে দোয়া মাঙ দাদু, "রহমান খোদা আয়।
ভেস্তে নাছেল করিও আজিকে আমার বাপ ও মায়।"
এইখানে তোর বু-জী'র কবর, পরীর মতন মেয়ে,
বিয়ে দিয়েছিনু কাজীদের ঘরে বনীয়াদী ঘর পেয়ে।
এত আদরের বু-জী'রে তারা ভালবাসিত না মোটে,
হাতেতে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত ঠোঁটে।
খবরের পর খবর পাঠাত দাদু যেন কাল এসে,
দুদিনের তরে নিয়ে যায় মোরে বাপের বাড়ীর দেশে।

শ্বশুর তাহার কশাই চামার, চাহে কি ছাড়িয়া দিতে,
অনেক কহিয়া সেবার তাহারে আনিলাম এক শীতে।
সেই সোনামুখ মলিন হয়েছে বাজে না হেথায় হাসি,
কালো দুটি চোখে রহিয়া রহিয়া অশ্রু পড়িছে ভাসি'।
বাপের মায়ের কবরে বসিয়া কাঁদিয়া কাটাত দিন,
কে জানিত হায়, তাহারও পরাণে বাজিবে মরণ-বীণ!
কি জানি পচানো জ্বরেতে ধরিল আর উঠিল না ফিরে,
এইখানে তারে কবর দিয়েছি দেখে যাও দাদু ধীরে।

* * *

ব্যথাতুরা সেই হতভাগিণীরে বাসে নাই কেহ ভালো,
কবরে তাহার জড়ায়ে রয়েছে বুনো ঘাসগুলি কালো,
বনের ঘুঘুরা উহু উহু করি কেঁদে মরে রাতদিন,
পাতায় পাতায় কেঁপে উঠে যেন তারি বেদনার বীণ।
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ দাদু,—"আয় খোদা দয়াময়,
আমার বু-জী'র তরেতে যেন গো ভেস্ত নাছেল হয়।"

* * *

হেথায় ঘুমায় তোর ছোট ফুপু সাত বছরের মেয়ে,
রামধনু বুঝি নেমে এসেছিল ভেস্তের দ্বার বেয়ে।
ছোট বয়সেই মায়েরে হারায়ে কি জানি ভাবিত সদা,
অতটুকু বুকে লুকাইয়াছিল কে জানিত কত ব্যথা।
ফুলের মতন মুখখানি তার দেখিতাম যবে চেয়ে,
তোমার দাদীর ছবিখানি মোর হৃদয়েতে যেত ছেয়ে।
বুকেতে তাহারে জড়ায়ে ধরিয়া কেঁদে হইতাম সারা,
সাঁঝের আকাশ কালো করে দিত মেয়ে ও বাপের ধারা।
একদিন গেনু গাজনার হাটে তাহারে রাখিয়া ঘরে,
ফিরে এসে দেখি সোনার প্রতিমা লুটায় পথের পরে।
সেই সোনামুখ গোলগাল হাত সকলি তেমন আছে,
কি জানি সাপের দংশন খেয়ে মা আমার চলে গ্যাছে।
আপন হস্তে সোনার প্রতিমা কবরে দিলাম গাড়ি'
দাদু, ধর ধর বুক ফেটে যায়, আর বুঝি নাহি পারি।

এইখানে এই কবরের পাশে আরও কাছে আয় দাদু,
কথা ক'স্ নাক জাগিয়া উঠিবে ঘুম-ভোলা মোর যাদু।
আস্তে আস্তে খুঁড়ে দেখ্ দেখি কঠিন মাটির তলে
দীনদুনিয়ার ভেস্ত আমার ঘুমায় কিসের ছলে!

* * *

ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবীরের রাগে,
অমনি করিয়া লোটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে।
মজীদ হইতে আজান হাঁকিছে বড় সকরুণ সুর,
মোর জীবনের রোজকেয়ামত ভাবিতেছি কত দূর?
জোড়হাতে দাদু মোনাজাত কর, "আয় খোদা রহমান্,
ভেস্তে নাছেল করিও সকল মৃত্যু-ব্যথিত-প্রাণ!"



মহামানব

শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত

এক দল লোক যারা নিজেদের সোসিয়ালিষ্ট ব'লে জন-সমাজে প্রচার করত ও বেশ গর্ব্ব অনুভব করত, তারা তখন পতিতাদের রক্ষার্থে বদ্ধমূল হয়ে উঠে-পড়ে লেগেছিল। রোজই খবরের কাগজে তাদের একজনের না একজনের সুদীর্ঘ বক্তৃতা, গরম গরম অনেক রকম কথা প্রকাশিত হ'ত! অনেকের কাছ থেকে অনেক বাহবা পেত, Fund-ও উঠ্ত কিন্তু তার বেশী কিছু খবরের কাগজে প্রকাশিত হ'ত না। গুজব শোনা যেত, তাদের চোখে নাকি ঘুম নেই, আহারে রুচি নেই; এমন অনেক কথা। তারা প্রায়ই বল্ত, "পাপকে ঘৃণা কর কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিও না। প্রত্যেক মানুষের দেহেই ভগবানের বাস, তাহাকে অশ্রদ্ধা দেখাইলে ভগবানকে-ও ঘৃণা করা হয়। তাহারা পাপী বলিয়া আমরা তাহাদিগকে ঘৃণা করিব না, বরং তাহারা যাহাতে সৎপথে আসিয়া আবার বিশুদ্ধ নির্ম্মল জীবন যাপন করিতে পারে, আমাদিগকে আজ তাহাই করিতে হইবে। পতিতাদের ঘরে যে সব মেয়ে জন্মাইতেছে তাহাদের এখন হইতে রক্ষা করিয়া সৎপথে আনিতে চেষ্টা না করিলে ভবিষ্যতে তাহারাও ঐ ঘৃণ্য পাপ কাজে লিপ্ত হইবে, কারণ তাহাদের আর কোন পন্থা নাই। এই শুভ্র আলোর মত নিষ্কলঙ্ক ভগ্নী-দিগকে রক্ষা করিবার ভার আজ সকল দেশবাসীর উপরেই পড়িয়াছে। আজ এই জাতীয় জাগরণের দিনে আর সনাতন পথ অবলম্বন করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবার সময় নাই। দেশকে রক্ষা করিতে হইলে......ইত্যাদি।"

অশোক এই রকম একটা কাগজ হাতে নিয়ে মানবের ঘরে ঢুকে বল্লে,—দ্যাখ্ পড়ে।...

মানব কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে বল্লে—Rot. ওরা যে এতদিন Fund তুলেচে, তার একটা হিসেব দিতে বল্‌ত, আর ওদের চা-চুরুটেই বা কত খরচ হয়েচে সেইটে আগে জেনে আয়।

অশোক একটু দুঃখিত হয়ে বল্লে—তুই বুঝ্‌চিস্ না মানব, ওরা সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই কাজে নেমেচে, এখন আমাদের সকলের সহানুভূতি না পেলে...

মানব তাকে থামিয়ে বল্লে—যথেষ্ট হয়েচে। আজ ছ' মাস ধ'রে এ রকম বক্তৃতা শুনে শুনে অরুচি ধ'রে গেছে; একটা নতুন কিছু হুজুগ চালাতে পারো ত দেখ, না হয় কয়েকদিন আবার নাচা যাবে।

এ বিদ্রূপের ইঙ্গিতটা অশোকের সহ্য হ'ল না, বিরক্ত হয়ে বল্লে—এটা হুজুগ নয়।

মানব সহজ সুরে বল্লে,—চটিস্ না অশোক, তুই-ই ভেবে দ্যাখ্ না একবার। আজ পর্য্যন্ত ওরা একটি মেয়েরও কোন ভদ্র ঘরে বিয়ে দিতে পেরেচে বলে ত শুন্‌লাম না; শুধু কথায় ত আর চিঁড়ে ভেজে না।

অশোক মানবের কথা শুনে বিস্ময়ে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। মানব আবার বল্লে,—ওরা সমাজের চোখে ঘৃণ্য অস্পৃশ্য হলেও ওদের ভেতরেও একটা প্রাণ আছে। আর যা-ই হোক ওরা মাটির পুতুল নয়, আর সেটাকে নিয়ে ছেলে-খেলা চলে না।...

ছেলে-খেলা? কি বল্‌ছিস্ মাথামুণ্ডু! এমন একটা আশ্রম গড়ার স্কীম্ হচ্চে যেখানে তারা সকলে থাক্‌বে, সৎপথে থেকে জীবন যাপন করবে, সেটা হ'ল ছেলেখেলা?

ছেলে-খেলা নয়? একটা আশ্রম গ'ড়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয়, আর সৎপথে থেকে খেয়ে-বেঁচে থাকাটাই জীবনের চরম সার্থকতা নয় অশোক। তুমি পার আজীবন অবিবাহিত থেকে একা একা কাটাতে?

সেইটেই ত সব চেয়ে সুখের জীবন।

তোমার কাছে তা হতে পারে কিন্তু কোনও নারীর কাছে তা নয়... পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম, সমাজ, প্রভৃতি সব ছেড়ে নারীর বুকে বড় হয়ে জাগে মাতৃত্ব! এই মাতৃত্বের ক্ষুধা মেটানো চাই, নইলে তারা ফের সেই পাপ পথে যাবে, কোন প্রবল শক্তিও তাদের বাধা দিতে পারবে না।

কেন, আমাদের দেশে কি বালবিধবা নেই, আর তারা কি আমরণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করে না?

বালবিধবা আছে সত্য, আর তারা অনেকেই আমরণ ব্রহ্মচর্য্য পালনও করে সত্য; কিন্তু তাদের ভেতরেও সকলে তা পারে না। যারা পারে না তারাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে, তারপর এই পাপ কাজে লিপ্ত হয়। এদের এই ব্যর্থ জীবনের জন্য সমাজও অনেকখানি দায়ী। সুতরাং তাদের ঘরে যে সব ছেলে-মেয়েরা জন্মগ্রহণ করচে তারা কেন সমাজে স্থান পাবে না বলতে পারিস?

বিধবা যারা আমরণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করে তাদের আর কিছু না থাক্ সমাজে দাঁড়াবার একটা স্থান আছে, তাই তারা অনেকেই সমস্ত দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা নির্য্যাতন চোখ বুঁজে অম্লান বদনে সহ্য করে। কিন্তু যারা মানুষের ঘৃণা কুড়িয়ে বড় হয়েছে, যাদের জীবনটাই একটা কলঙ্ক, তাদের ভেতর এসব কিছু আশা করা খুব সম্ভব নয়, সঙ্গতও নয়। তবে তাদেরও সুন্দর ক'রে তোলা যেতে পারে. তার জন্য সমাজকে অনেকখানি ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। শুধু আশ্রম গ'ড়ে দিলেই চল্‌বে না, আপন ব'লে তাদেরও বুকে টেনে নিতে হবে।

কথাগুলো শুনে অশোক ভেতরে ভেতরে ভারী চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। কিছুক্ষণ ভেবে বল্‌লে—পতিতাদের ঘরেও ত ছেলে জন্মায়, তারাই দরকার হলে একে একে এদের বিয়ে করতে পারে।

মানব হেসে উঠ্‌ল, বল্লে—অর্থাৎ এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে!...তাদের ঘরে বেশী ছেলে জন্মায় না, আর বেশীর ভাগই অতি শৈশবে মরে যায় বা মেরে ফেলা হয়; তবু যারা বেঁচে থাকে তারা পথে পথে গুণ্ডামী করে বেড়ায়। লোকের ঘৃণা কুড়িয়ে ওরাও বড় হয়, ওরাও উল্টে লোককে ঘৃণা করতে শেখে। ওদের মানুষ ক'রে তুলতে হলে আরো বিপুল শক্তির প্রয়োজন।

অশোক উত্তেজিত হ'য়ে বল্লে,—তা তুমি কি করতে চাও?

ক্ষণকাল মৌন থেকে মানব বল্লে,—আমি বসন্তকুমারীর মেয়ে নীহারিকাকে বিয়ে করব আর এই বিষয়ে সমাজের উদাহরণ হব।

এবার অশোকের হাসবার পালা, বল্লে,—প্রেমে পড়েচ, তা বল্লেই ত পারতে আগে। এত বক্তৃতা বা গৌরচন্দ্রিকার কোনই দরকার ছিল না।

মানব আর কোন কথা না ব'লে একটা সিগারেট ধরাতে মনোনিবেশ করল।

কথাটা বন্ধু মহলে ছড়িয়ে পড়্‌তে বেশী সময় লাগ্‌ল না। চারিদিক থেকে অজস্র আশীর্ব্বাদ উপদেশ আস্‌তে লাগ্‌ল, হৈ চৈ হুড়োহুড়িতে সমস্ত দিনটা মেতে উঠ্‌ল। হোটেলের দরজা জান্‌লা খুব মজবুত ছিল ব'লেই হয় ত সেগুলো অক্ষত রয়ে গেল।

শুধু অশোক এই উল্লাসে যোগ দিতে পারল না। মানব যতই অসম-সাহসের বা বীরত্বের পরিচয় দিক্ না কেন, অশোকের মনে হ'ল এর ফল খুব ভাল হবে না। মানবের জন্য তার দুঃখ হ'ল, রাগও হ'ল। সে তাই নিজের ঘরে চুপ ক'রে ব'সে কপট মনোযোগে Indian Economics-এর পাতা ওল্টাতে লাগ্‌ল।

অনেক বাধা আপত্তি সত্বেও মানবের সাথে নীহারিকার বিয়ে হ'য়ে গেল। কিন্তু বিয়েটা কোন্ মতে যে হ'ল তা ঠিক ক'রে বলা শক্ত। বন্ধু বান্ধব খুব বেশী হয় নি, সামাজিক অনুষ্ঠানও কিছু হয় নি, এমনি মানব নীহারিকাকে পত্নী রূপে গ্রহণ করল। আত্মীয় স্বজন কাউকে না জানালেও ঠিক সময়েই তাদের কাছে উড়ো খবর পৌঁচেছিল কিন্তু কথাটা কেউ-ই তখন বিশ্বাস যোগ্য ব'লে গ্রহণ করল না।

গরমের ছুটিতে কলেজ ছুট হ'লে মানব সস্ত্রীক বাড়ী যাবার জন্য রওনা হ'ল। অশোক একবার শুধু বল্লে,—কথা শোন্ মানব, ওকে নিয়ে যাস্ নি।

মানব সে কথার কোন উত্তর দিল না। সকলে দেখ্ল মানব সস্ত্রীক বাড়ী গেল।

বাড়ীটার আশ্চর্য্য রকম বদল হয়ে গেচে। সকলেরই মুখ অপ্রসন্ন। বাড়ীর চাকর দরোয়ান কুণ্ঠিতভাবে নমস্কার ক'রে চুপ করে রইল। এর বেশী কোন কথা বলতে কারো সাহস হ'ল না। ব্রজেশ্বর বাবু অপ্রসন্ন মুখে ঘন ঘন তামাকের ধোঁয়া ছাড়্তে লাগলেন, একবার চোখ তুলেও মানবকে দেখলেন না। তার মা চোখের জল ফেলে ফেলে জানালেন, তাঁর ছেলে যে এত বড় একটা গর্হিত অপকর্ম্ম করতে পারে তা তাঁর ধারণারও অতীত। মানব সবই শুন্ল, সবই বুঝ্ল কিন্তু নিজেকে সমর্থন করার মত একটা কথাও তার মুখ দিয়ে বার হ'ল না। সব চেয়ে বেশী বিচলিত তাকে করল পাশের বাড়ীর মেয়েটির বেদনা ভরা স্তব্ধ চোখ দুটি। দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে একবার তার মনে হ'ল সে এক ভারী ভুল কাজ করেচে।

রাতে ব্রজেশ্বর বাবু খেতে ব'সে অনেক্ষণ গম্ভীর হ'য়ে থেকে বল্লেন,—আমি মানবকে ঘরে জায়গা দিতে পারি না, আর ও ছোট-লোকের মেয়েটাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দাও।

মানব পাশের ঘরেই ছিল, কথাটা তার কানে গেল! সে বাইরে এসে একটু ক্রুদ্ধ হয়েই বল্লে,—সেই সঙ্গে আমাকেও তাহলে বিদায় ক'রে দিন।

মানদাসুন্দরী এই রকমই একটা কিছু আশঙ্কা করছিলেন। পুত্রের ভাবী বিপদ বুঝতে পেরে একটু নরম হয়ে বল্লেন,—আহা ছেলে-মানুষ, না বু'ঝে একটা কাজ ক'রে ফেলেচে। পুরুষ মানুষ অমন অনেক ক'রে থাকে। তা ছাড়া প্রায়শ্চিত্ত ত আছে! আর ও-মেয়েটাকে কোন রকমে বিদায় ক'রে দিলেই হবে।

ব্রজেশ্বরবাবু আর কোন কথা না ব'লে গম্ভীর হ'য়ে আহারে মনোনিবেশ

করলেন। এর লক্ষণ যে খুব ভাল নয় তা মানদাসুন্দরী বুঝ্‌তে পারলেন, মানবও বুঝল। যে দুশ্চিন্তার ঝড় মানবের বুকের ভেতর ঘনিয়ে উঠেছিল, তা এবার প্রলয় আকার ধারণ করল, উত্তেজিত হয়েই সে নিজের ঘরে ঢুকল।

নীহারিকা তার একটা হাত খপ ক'রে ধ'রে বল্লে,—তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমায় পাঠিয়ে দাও।

মানব সে কথার কোন জবাব দিতে পারল না, কিন্তু তার চোখে মুখে দারুণ একটা বিদ্রোহ ও ঘৃণার ভাব মূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠ্‌ল।

নীহারিকা আবার অনুনয় ক'রে বল্লে,—বাপ হাজার অন্যায় বল্লেও তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়ান ছেলের কর্ত্তব্য নয়।

বাইরের দিকে দৃষ্টি রেখে মানব বল্লে—পিতৃ-ভক্তিতে আমার কোন আস্থা নেই।

তার অস্বাভাবিক গলার স্বরে নীহারিকা চম্‌কে উঠ্‌ল। আর কিছু জিজ্ঞেস করবার তার সাহস হ'ল না।

(২)

কল্‌কাতায় এসে নীহারিকা সাহস ক'রে মানবের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—এখন কি করবে?

কি যে করবে তা মানবও জান্‌ত না, উদাস সুরে বল্লে,—চাকরী করব, তা ছাড়া ত আর কোন উপায় দেখি না।

তার চাইতে মা'র কাছে চল না, তার ত টাকার কোন অভাব নেই।

কথা কয়টি ব'লেই নীহারিকা বেজায় অসোয়াস্তি অনুভব করল, কারণ নীহারিকা ভাল ক'রেই জান্‌ত, মানব এই পাপ বৃত্তিকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। বিয়ে করেচে ব'লে সে পাপকে জীবনে কোন দিনই প্রশ্রয় দেবে না! কলুষে উপার্জ্জিত অর্থ গ্রহণের আগে সে মরণকে বরণ ক'রে নেবে।—কথা কয়টি ব'লেই নীহারিকা মানবের পাংশু মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে চাইল।

নীহারিকাকে কোন রকম আঘাত দেবার কোন ইচ্ছা মানবের মনে ছিল না, সে সংযত হয়ে বল্লে,—এখনো দরকার হবে না।...

এই সময় অশোকের আসল মূর্ত্তি বেরিয়ে পড়্‌ল। সে মানবের বিয়েতে যায় নি বা কোন রকম উৎসাহও দেয় নি, কিন্তু বন্ধুর এই বিপদের দিনে আর সে চুপ ক'রে বসে থাকতে পারল না। অতীতের বিবাদ অতীতেই বিসর্জ্জন

দিয়ে সে আবার ঘনিষ্ট ভাবে মানবের সাথে মিলিত হ'ল। অর্থ দিয়ে সামর্থ্য দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে যতটুকু সে করতে পারে তা সবই করল, আর মানবকে সান্ত্বনা দিল এই ব'লে যে, দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা মানুষকে যাচাই করে তোলে। মনে রেখো, সমাজের এই সঙ্কীর্ণ morality-র ওপরেও এক বিপুল বিরাট morality-র স্থান আছে। সমাজ অন্যায় বল্লেই সেই standard-এ তা অন্যায় হয়ে যাবে না। সমাজের কাছে থেকে আমরা সহানুভূতি না পাই; অভিসম্পাত পাই, ঘৃণা পাই, লাঞ্ছনা পাই তবু সেই 'না'-কেই আঁকড়ে ধ'রে আমরা বড় হব, মহীয়ান হব সুন্দর হব। সুন্দর হবার তপস্যাই আমাদের; নিন্দা, গ্লানি, প্রত্যাখ্যান, পীড়ন, এ সবই আমাদের সুন্দরের পূজার অক্ষয় নৈবেদ্য। এ সুন্দর কূলের মত ক্ষুদ্র সংকীর্ণ নয়, নয় অবাধ সীমা-হারা সমুদ্রেরই মতন।

অশোকের চেষ্টায় মানবের খুব শীগ্‌গীরই একটা চাকরী জুটে গেল। কল্‌কাতার উপকণ্ঠে ইটালিতে একটা ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া ক'রে মানব নতুন করে জীবনের পত্তন সুরু করল, আর এই দরিদ্র নিরানন্দ কুটীরে খুশীর হাওয়া বহাবার ভার নিল অশোক।

কয়েকটা মাস কাট্‌ল খুব সুখে নয়, দুঃখেও নয়। গরীবের-হালে অনভ্যস্ত মানবের শারীরিক পরিশ্রম মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে উঠ্‌ত,—নীহারিকারও। মানবের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সে-ও একদিন আবার বড় হয়ে উঠ্‌বে। এই আশাকে বুকে নিয়েই সে সেই অনাগত ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে ধৈর্য্য ধ'রে প্রতীক্ষায় থাকে, দুঃখকে আর দুঃখ ব'লে আমোল দেয় না, কষ্টকে আর কষ্ট ব'লে স্বীকারই করে না। প্রেমের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় মানুষ এমনি ক'রেই বড় হয়ে ওঠে, সব হারিয়ে সে অসীমের সন্ধান পায়, এক অনির্ব্বচনীয় মধুর তৃপ্তিতে তার বুক তখন ভরে ওঠে।

একদিন অফিস থেকে এসে অবসন্ন দেহে মানব একটা আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল। নীহারিকা কাছেই ব'সে কি একটা সেলাই করছিল, মধুর হেসে বল্লে,—বড্ড খাট্‌তে হচ্ছে,.না?

মানব নীহারিকার দিকে চেয়ে একটু হাস্‌ল, এক মধুর আনন্দে তার বুক ভ'রে উঠ্‌ল। খেটে খেটে যে এত আনন্দ পাওয়া যায় তা তারা কেউ-ই জান্‌ত না।

প্রতিদিনের মত হাজিরা দিতে এসে অশোক মানবের পিঠ্‌টা সজোরে চাপড়ে বল্লে,—আজ মস্ত সু-খবর আছে হে।

মানব হেসে বল্লে,—ভাল, বলে যাও।

অশোক দৈনিক কাগজের ভাঁজ খুলে একটা বিজ্ঞাপন মানবের চোখের সামনে ধরল।—"ফিরে আয় মানব, ফিরে আয়!"

বিজ্ঞাপনটা পড়েই মানব অতিশয় বিচলিত হয়ে উঠ্‌ল। নীহারিকা জিজ্ঞেস করল,—কি হ'ল?

অশোক স্বপ্নেও ভাবে নি যে, সে এসে মানবের দুর্ব্বল একটা জায়গায় আঘাত করবে। কাগজখানা তার শিথিল হাত থেকে খ'সে মাটিতে পড়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্য তিন জনেই নির্ব্বাক হয়ে রইল।

রাতে খাবার সময় নীহারিকা বল্লে,—একটা চিঠি এসেছিল।

মানব উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলে,—কার?

একটা ছোট্ট লেপাফা বার ক'রে বল্লে,—আমার। তুমি দেখতে চাও?

কোন দরকার আছে তার?

এ চিঠির কথাগুলো তোমার জানা দরকার।

নীহারিকা সহসা গম্ভীর হয়ে উঠ্‌ল। মানব বল্লে,—চিঠিটা রেখে দাও। তুমি মুখে বল, আমি শুনে যাই।

পারবে স্থির হয়ে শুন্‌তে?

নীহারিকার কথার সুরের গুরুত্ব উপলব্ধি না করতে পেরে বল্লে—হুঁ, বলে যাও।

নীহারিকা কিছুক্ষণ পরে বল্লে, আমি মোটা মুটি বলে যাই তুমি একটু স্থির হয়ে শোন।

—ষ্টেজে যখন নাবতুম তখন এক ভদ্রলোক খুব ঘন ঘন আমার কাছে আসা যাওয়া করতেন। সেই ভদ্র মহোদয়টি কি ক'রে যেন জান্‌তে পারলেন, আমার নাকি এক অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে হয়েচে। এখন তিনি বলচেন যে, তাঁর কয়েক হাজার টাকার বিশেষ দরকার হয়ে পড়েচে, আর আমি যদি তাঁকে সে টাকা না দি তাহলে তিনি নাকি আমার সব গুপ্তকথা প্রকাশ ক'রে ফেলবেন, ইত্যাদি।

মানব কথাগুলো শুনে এক চোট হেসে নিল, তারপর বল্লে—ও চিঠিখানা যত্ন ক'রে রেখে দাও, যখন আমাদের হাসবার দরকার হবে তখন পড়া যাবে।

নীহারিকার কাছে মানবের এই অতিরিক্ত হাসি কেমন বিসদৃশ ঠেক্‌ল, কিন্তু এর ওপর কোন কথা তার বল্‌তে সাহস হ'ল না। মানব কিছুক্ষণ পরে আবার বল্লে—তুমি এক কাজ করলে পার।

কি ?

সেই ভদ্রলোকটিকে নেমন্তন্ন করে এক চিঠি লেখ, আর আমি কোন্ সময়ে বাড়ী থাকি না তাও ভাল করে লিখে দাও।

কথাটা কি ভেবে বলা হ'ল নীহারিকা তা বুঝতে না পেরে বল্লে—তুমি কি চাও শুনি ?

বিশেষ কিছুই না। তবে সে যখন আস্‌বে তখন হঠাৎ আমার অফিস ছুটি হয়ে যাবে। বাড়ী এসে তাকে ভালো ক'রে বুঝিয়ে দেব, যে অতীতের কলঙ্ক বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতের সৌন্দর্য্যকে ম্লান করতে পারে না। এক পা ভুল চ'লে আজীবন লাঞ্ছনা কোন পুরুষের কপালে জোটে না আর মেয়েদের শাস্তির বিধানটা যে খুব অতিরিক্ত হয়েচে সেটাও পরিষ্কার হয়ে যেত। তুমি কি বল ?

লজ্জায় রাঙা হয়ে নীহারিকা বল্লে—থাক ও সবের কোন দরকার নেই।

এরই প্রায় দশ পনের দিন পরে একদিন একজন লোক মানবের সঙ্গে অফিসে দেখা ক'রে বল্লে—আপনি আমাকে হয় ত চিনবেন না, কিন্তু নীহারিকা আমাকে ভাল ক'রেই চেনে।

মানব কৃত্রিম হাসি হেসে বল্লে—ও আপনিই তা হলে সেই চিঠিখানা লিখেছিলেন ?

কিছুমাত্র লজ্জিত বা অপ্রতিভ না হয়ে লোকটি বল্লে—হাঁ, তখন কয়েক হাজার টাকার ভারী দরকার হয়ে পড়েছিল !

মানব আবার তেমনি হেসে বল্লে—তা আমাকে ছেড়ে তাকেই যে আপনি কি ভেবে মহাজন ঠাওরালেন বুঝ্‌তে পারলুম না।

লোকটি চোখ টিপে একটু হেসে বল্লে—আহা বুঝ্‌লেন না ! ঐ ধরণের মেয়ে এক চোখের ইসারাতেই হাজার হাজার টাকা রোজগার করতে পারে ; খাসা মাল, আপনি নিশ্চয়ই খুব সুখে আছেন ?

আশ্চর্য্য মানুষের ধৃষ্টতা ! মানব ক্রোধ চাপ্‌তে না পেরে বল্লে—তা অফিসে সে সব কোন কথা হতে পারে না, আপনি একদিন সময় ক'রে আমার বাড়ী যাবেন, ছেঁড়া জুতো জোড়া বাড়ীতেই থাকে।

লোকটি বিদ্যুৎ বেগে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে—ভদ্রলোককে এরকম ভাবে অপমান করবেন না বলে রাখছি।

মানব হেসে বল্লে—আহা চট্‌চেন কেন, এখনও ত আপনার গালে পড়ে নি...

(৩)

সুখ দুঃখের ভেতর দিয়ে অমনি ক'রে ছ'টা মাস কেটে গেল। শীতের প্রারম্ভেই নীহারিকার শরীর একটু একটু করে খারাপ হতে আরম্ভ করল। অবশেষে একদিন সে শয্যাগত হ'ল, আর একটা দুর্ভাবনা মানবের কাঁধে চেপে বসল। অফিস থেকে ফিরবার পথে সে একজন ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে এল।

ডাক্তার ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে ওষুধ-পত্রের উপযুক্ত ব্যবস্থা ক'রে মানবকে বল্লেন—চলুন, বাইরে আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

আশঙ্কায় উদ্বেগে মানব অস্থির হয়ে উঠ্‌ল, ব্যাকুল আগ্রহে ব'লে উঠ্‌ল—আমার কাছে কিছু গোপন করবেন না ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার হেসে বল্লেন—না না কোনরকম ভয়ের কারণ নেই, তবে একটু সাবধানে রাখবেন। জানেনই ত pregnancy অবস্থায় যখন-তখন বিপদ ঘট্‌তে পারে। পারেন ত একটি নার্স আনিয়ে রাখবেন।

মানব ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানিয়ে পকেট থেকে ভিজিটের টাকা বের করলে। ডাক্তার সহসা প্রশ্ন করলেন—আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞস করব, সত্যি বলবেন?

বলুন।

কতদিন হ'ল আপনি বিয়ে করেচেন?

প্রায় ছ' মাস।

ডাক্তার গম্ভীর হ'য়ে কিছুক্ষণ কি ভেবে হঠাৎ বলে ফেল্লেন—I happen to know this stage-beauty and I don't think it is your child.

মানবের শিথিল হাত থেকে টাকাগুলো ঝন্ ঝন্ করে মেঝের পড়ে গেল। সে কাঁপতে কাঁপতে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। ডাক্তার বাবু বেজায় রকম অপ্রস্তুত হ'য়ে তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে গাড়ীতে উঠলেন, ভিজিটের টাকার কথাও তাঁর আর মনে হ'ল না।

অশোক এসে মানবকে ঐ অবস্থায় ব'সে থাকতে দেখে বিস্মিত ও শঙ্কিত হয়ে উঠ্‌ল। অশোক আস্তে আস্তে ডাক্‌ল—মানব!

মানব যেন এক দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠ্‌ল। একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বল্লে—অশোক, এসেছিস? তোর কথাই ভাবছিলুম।

বৌ-দি কেমন আছেন?

মানব জোর ক'রে একটু হেসে বল্লে—সু-খবর আছে হে! একজন নার্স আনতে পার?

অশোক নীহারিকাকে একবার দেখে কাছের হাসপাতাল থেকে একজন নার্স ও একজন লেডি ডাক্তার নিয়ে এসে মানবকে বল্লে—আমি ভাবছি আজ রাতটা এখানেই কাটিয়ে যাব।

বেশ বেশ, সে ত খুবই ভাল হয়।

নার্সকে উপযুক্ত ব্যবস্থা দিয়ে রাত ন' দশটার সময় লেডি ডাক্তার চ'লে গেলেন। রাতের অন্ধকারও ক্রমেই নিবিড় হয়ে আসতে লাগল। একটা রাত-চরা পাখী বিশ্রী বিকট চীৎকার ক'রে ডানা ঝট্‌পট্ করতে করতে উড়ে গেল।

কিন্তু মানবের চোখে আর ঘুম আসে না। তার বুকের যে নিবিড় ব্যথায় ডাক্তার ঘা দিয়ে গেছে তাকে সে চেপে রাখে কি ক'রে? মন কিছুতেই সান্ত্বনা পায় না। ধৈর্য্য ধ'রে সে অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছট্‌ফট্ করল, তারপর উঠে জানালার ধারে এক চেয়ারে নিঃশব্দে ব'সে রইল।

ভোর বেলা অশোক মানবের অবস্থা দেখে চম্‌কে উঠল। বল্লে—হ্যাঁরে মানব, তোর কি হয়েছে বল্ ত?

ও কিছুই না।

আজ আর অফিসে না হয় নাই গেলি।

সর্ব্বনাশ, তাও কি কখন হয়! তুই ত আছিস, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে অফিস করতে পারব।

অশোক মানবকে কিছুতেই নিরস্ত করতে পারল না। অফিসের নামে বেরিয়ে মানব সমস্তটা দিন পথে পথে ঘু'রে কাটাল। তার মনে হচ্ছিল, সে বোধ হয় পাগল হয়ে যাবে। তার বিদ্রোহ, তার প্রেম, তার নিষ্ঠা এ সমস্তই মিথ্যা হবে, আর এই রক্ত-শোষক সমাজের অত্যাচারই হবে সত্য! ভগবান মঙ্গলময়—মিথ্যা কথা। মানবের একবার মনে হল, এ পৃথিবীর যেন সব শেষ হয়ে এসেছে, চার দিকে আর কিছুই দেখা যায় না, অন্ধকার, কেবল অন্ধকার। সে অন্ধকার ভেদ ক'রে একটি মূর্ত্তি ফুটে উঠল—নীহারিকার। মানব আবার সব ভুলল, এই হৃদয়হীন সমাজের সংকীর্ণতা, নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন সব ভুলে মানব আবার বাড়ীর দিকে চলল। তার মনে হ'ল, পাঁক থেকে যে ফুলটি জন্ম নিয়েছে, তা ভোরের আলোর মতই নির্ম্মল।

দুপুর রাতে নার্স এসে খবর দিল—মেয়ে হয়েছে।

মানব আর অশোক দুজনেই একসঙ্গে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠ্‌ল।

অস্ফুট স্বরে নার্স বল্লে—মরা মেয়ে।

মানবের সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়ে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেল, সে অবশ হয়ে মাটিতে বসে পড়্‌ল, তার বুক থেকে একটা মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ বেরিয়ে এল!

রাত তখন তিনটে হবে, মানব আবার উঠে দাঁড়াল। কম্পিতপদে নীহারিকার ঘরের দরজাটা ঠেলে তার শিয়রের কাছে গিয়ে চুপ ক'রে বস্‌ল। নীহারিকা চমকিত হয়ে ব'লে উঠ্‌ল—কে?

মানব তার কপালে এক সস্নেহ চুম্বন বুলিয়ে দিয়ে বল্লে—কোন দিন আমার ভগবানের ওপর বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা ছিল না, আজ আমার সেই বিশ্বাস সে শ্রদ্ধা জন্মেছে।



শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায় বিশেষ পীড়িত,
সেই কারণে তিনি—
পাল্লবীণা
লিখিতে পারিতেছেন না

কঃ সঃ



উপন্যাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৪

পূজোর ছুটির পর। সে বছর আমাদের কলেজের কাজ খুব বেড়ে গেল। দিনগুলো কেটে যেত মড়া কেটে; আর রাতগুলো রুগীর পাশে ব'সে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে।

নেশাকে তোমরা কত ছোট ক'রে দেখ, কিন্তু ঐ ত ছিল, আমাদের মুক্তি দাতা! কাজ করতে করতে কাজ করবার নেশা জন্মে যায়।

ঠিক কি রকম জান? যুদ্ধে যখন সৈনিকেরা চলেচে তখন বুকের মধ্যে হাঁকু-পাকু, ধুক্‌ধুকুনির আর অন্ত নেই। কিন্তু লড়াই-এর মধ্যে নেমে পড়লে তখন মার-মার, কাট-কাট! কাজের যত চাপ পড়তে লাগলো ততই যেন আমরা সব মরিয়া হয়ে উঠতে লাগলাম।

দু-চার জন পুঁয়ে-পাওয়া ছেলে স'রে পড়ে বেঁচে-ম'রে রইল; কিন্তু আমরা যেন কাজের উত্তেজনায় সব উন্মত্ত হয়ে গেলাম।

মানুষ যখন অবসর পায় না তখনি সে দেহ-মনে সব চেয়ে বেশী কাজ করতে থাকে। ছুটিগুলোতে মনে করা যায়—না জানি কত কি করবো; কিন্তু শেষ হলে বুঝতে পারা যায় যে, কোন কাজ না ক'রেই সেটা বেমালুম কেটে গেল!

পাড়ার লোকেদের সঙ্গেও আমাদের আর তেমন বিরোধ রইল না। বাইরে থেকে নূতন ক'রে বন্ধুত্ব না হলেও নিত্য দেখা-শোনার ফলে বেশ একটা কায়েমি

গোছের পরিচয় হয়ে গেল। পথে দেখা হলে আর কেউ বড় একটা মুখ হাঁড়ি করতো না; বরং একটু আধটু আলাপ করবার চেষ্টাই হতো—কি, আজ যে বড় সকাল সকাল?—উত্তরে একটু হাসি—একটা কিছু উত্তর—যার কোন একটা বিশেষ প্রয়োজনও নেই—হয় ত অর্থও কিছু থাকৃত না। এমনি ক'রে আমরা কাজের মধ্যে দিয়ে গজিয়ে বড় হ'য়ে উঠতে লাগলাম।

সেদিন রাত্রে আমার ডিউটি ছিল না, তাই দেহতত্ত্বের বেধড়ক মোটা বইখানা খুলে বসে যেন একটু ফুরসতের আরামটা ভোগ ক'রে নিচ্ছিলাম—এমন সময় বদনচাঁদ এসে উপস্থিত। বদন মধ্যে মধ্যে এমন এসে থাকে।

কি গো বদন বাবু, খবর কি?

আপনাকে ডাক্‌চেন।

আমাকে?—কে? তোমার বাবা?

হুঁ।

কেন হে?

কি জানি। কিন্তু সেই কি জানির মধ্যে বেশ পরিষ্কার এই কথাই প্রকাশ ছিল যে, বদন ভাল ক'রেই জানতো কেন হরিলাল আমাকে ডেকেচেন।

হরিলালের ঘরে ঢুকে একটুও আমার ভাল বোধ হলো না। সেই ইজি চেয়ারের উপর হরিলাল বসে আছেন—মুখখানা নিষ্প্রভ, কি ভীষণ ম্রিয়মান! পাশে একটা আলো জ্বলচে কিন্তু তারও যেন কোন জুৎ নেই।

ভারি বিপদে পড়েছি হে।

কি হয়েছে?

বৌ-মা বোধ করি বিষ খেয়েচেন; তাঁকে অবিলম্বে তোমাদের কলেজে নিয়ে যেতে হবে।

একটা গাড়ী চাই যে।

তার সব ব্যবস্থা ক'রে আমি নিয়ে যাচ্ছি—তুমি গিয়ে সেখেনে বন্দোবস্ত কর গে।

আমি কলেজে গিয়ে পনর মিনিটের মধ্যে সব ঠিক-ঠাক ক'রে বেরিয়ে আস্‌চি—দেখলাম গাড়ীখানা গিয়ে ঢুক্‌লো।

সঙ্গে আর কেউ নেই শুধু মিসেস দত্ত। তিনি আমাকে ডেকে বল্লেন—তুমি পায়ের দিকে ধর, আমি এদিকে ধরচি—দুজনেই নিয়ে যেতে পারবো।

তার আগেই ষ্ট্রেচার আর লোক এসে রুগীকে উপরে নিয়ে গেল।

রাত তখন একটা হবে, আমরা ঠিক বুঝতে পারলুম যে, কাকি-মাকে এ যাত্রার জন্য রক্ষা করতে পারা গেল।

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি হরিলাল একখানা বেঞ্চের উপর আসন পীঁড়ে হয়ে বসে যেন ধ্যানই করচেন, কি ইষ্টনাম জপ করচেন।

অনেকক্ষণ কথা না কওয়াতেই হবে কিম্বা চাপা কান্নার দরুণ তাঁর গলার আওয়াজ অসম্ভব গম্ভীর।

কেমন ?

আর ভয় নেই বোধ করি।

আঃ, বলে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে তিনি বেঞ্চটার উপর লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়লেন।

কাছে একখানা ছোট চেয়ার ছিল, আমি সেটার উপরে গিয়ে চুপ্‌টি ক'রে বসলাম। কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর হরিলাল বল্লেন,—এখনো জ্ঞান হয় নি বোধ-হয় ?

না, বারো তেরো ঘণ্টা পরে তবে জ্ঞান হবে।

সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরতে দু'তিন দিন লাগবে ?

আমাদের প্রফেসারের সেই রকম আন্দাজ; মিসেস দত্ত বলেন—কাল সন্ধ্যার সময় তিনি ফিরে যাবার মত সুস্থ হবেন।

ক্ষণিক চুপ ক'রে থেকে হরিলাল বল্লেন,—বদন কোথায় ?

মিসেস দত্ত আর বদন ওখানেই আছেন।

ভাব্‌চি, তোমরা না, থাক্‌লে উঃ কি বিপদেই পড়া গিয়েছিল। যাক্‌, ভগ্‌বান রক্ষা করেচেন।

আমি চুপ ক'রে চেয়ারের পিঠে মাথা দিয়ে ব'সে রইলুম। হরিলাল বল্লেন—বৌ-মা, আমি যতদূর জানি, ভারি শান্ত প্রকৃতির মেয়ে, তাই ত অবাক হয়ে যাই যে, কতখানি অত্যাচারের পর এই চাপা অভিমানের ফল !

হরিলাল একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লেন,—ঠিক আগেকার মত আর হিন্দু সমাজ চলবে না। সে আদর্শ নেই, সে শিক্ষা নেই—এ কি জোর ক'রে আর চলে ?

দোরের কাছ থেকে মিসেস দত্ত বল্লেন,—কোন্‌ সমাজেরই বা আছে ? কিন্তু না চলেই বা কি করচে বলুন।

দূরে একটা বেতের ইজি চেয়ারগোছ ছিল—সেটা এনে দিতেই মিসেস দত্ত তার উপর বসলেন।

হরিলাল বল্লেন,—এখন কেমন অবস্থা ?

ক্রমেই ভাল দাঁড়াচ্চে, নার্স টি লোক ভাল, আমাকে আর কিছুতেই থাকতে দিলে না। বলে, আপনি সেই সুরু থেকে আছেন—বাড়ী যান।

কিরণ আপনাকে দিয়ে আসুক না কেন ?

না-না—আরো খানিকটা না দেখে গেলে আমি বাড়ীতে বড় ব্যস্ত হয়ে থাকবো।

হরিলাল বল্লেন,—আপনার এই জিনিষটার আমি তুলনা পাই নে।

মিসেস দত্ত ভারি একটা সহজ ভাবে বল্লেন,—আচ্ছা আপনি থামুন, আমার স্তুতি আরম্ভ করতে হবে না।

এই দু'জনকে আমার বহুদিনের পুরোনো বন্ধু ব'লে মনে হলো। পরস্পরের ঘনিষ্ঠতা যেন বেশ নিবিড়।

মিসেস দত্ত বল্লেন,—বেশ ত, কি কথা হচ্ছিল সেইটে হোক না—কি হচ্ছিল? হিন্দু-সমাজ অচল হয়ে গেছে, না ?

হরিলাল বল্লেন,—সে খবর ত আপনাদের খুবই আছে; তা নইলে আপনারা অযথা কি সেটাকে ছেড়ে বেরিয়ে এসেচেন ?

মিসেস দত্ত একটু হেসে বল্লেন,—সব বদলায় কিন্তু মানুষের স্বভাব বদলায় না। এত সভ্য দেশ-বিদেশ ঘুরে এলেন; কিন্তু সেই ঠোক্ দিয়ে দিয়ে কথা—এটি ত দেখচি—একটুও বদলায় নি !

হরিলাল নীরবে একটু হেসে নিয়ে যেন অনেকখানি হাল্কা হলেন।

কিছুই বদলায় নি। আমার বিশ্বাস, কিছুই বোধ করি বদলায় না; সবই আছে—যেন চাপা প'ড়ে গেছে।

মিসেস দত্ত একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বল্লেন,—শুনে সুখী হলাম, তবুও ভাল !

আমার মনে হলো বর্ষাকালের দুখানা বিদ্যুৎ-ভরা মেঘ যেন একান্ত কাছাকাছি হয়েছে—যেন তাদের ভিতরের সকল কাহিনী গুমরে গুমরে উঠচে; কিন্তু দুজনেই যেন কি একটা অসাধারণ শক্তিতে আত্ম-সম্বরণ করচেন !

মিসেস দত্ত আবার বল্‌তে সুরু করলেন,—আমার মনে হয় যে, ব্রাহ্ম-সমাজ, ক্রীশ্চান-সমাজ, সব সমাজই অচল হয়ে আসচে। সমাজের মূলে ভুল হয়েছে—যাকে বলে গোড়ায় গলদ।

হরিলাল খতকটা বিস্ময়ের সঙ্গে চেয়ে রইলেন, কোন কথা বল্লেন না।

দত্ত বল্লেন,—বুঝেচি, আপনি জানতে চাইচেন—কি ভুল হয়েছে ?—সে হয়

ত আমি ঠিক ক'রে বলতে পারবো না—জানি নে ব'লে ; কিন্তু এই জীবনে, অতি কঠিন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গিয়ে আমি হাড়ে হাড়ে এইটেই বুঝেচি যে, আগা-গোড়া না বদলাতে পারলে মানুষের দুঃখের অবসানের কোন আশাই নেই।

হরিলাল খুব গম্ভীর ভাবে বল্লেন—দুঃখের অবসান আছে ব'লে আমার ত মনে হয় না। বুদ্ধদেব থেকে আর আজ পর্য্যন্ত অনেক চেষ্টা হলো কিন্তু তার ফল কতটুকু দাঁড়িয়েছে ?

মিসেস দত্ত একটু তাড়াতাড়ি বল্লেন—আচ্ছা বেশ, বুদ্ধদেবের কথাই ধরুন ; আমার মনে হয় তাঁর সকল চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা ইঙ্গিত নিহিত ছিল যাতে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, বুদ্ধদেব একটা তাসের কেল্লা বানাতেই ব'সে ছিলেন এবং যার অবশ্যম্ভাবী একমাত্র পরিণাম এই এমনি ক'রেই সব জিনিষটা ভূমিসাৎ হয়ে যাওয়া।

হরিলাল উঠে ব'সে বল্লেন,—কি বল বিরজা ! তোমার কথা কানে শুনতে নেই। তুমি বুদ্ধদেবের নিন্দা কর ?

মিসেস্ দত্ত হাসি চেপে বল্লেন,—নিন্দা আমি তাঁর করচি নে, হারু বাবু—আমি জানি যে, আমি তাঁর পায়ের নখের ধূলো কণাটির উপযুক্ত নই ; কিন্তু তাই ব'লে যা সত্যি তা বলতে কোন দিনই নিরস্ত হব না।

বুদ্ধদেবেরও যদি ভুল হয়ে থাকে—ঠিকটা করবে কে শুনি ?—এই প্রশ্ন ক'রে হরিলাল তাঁর জিজ্ঞাসু চোখ দুটো বিস্ফারিত ক'রে মিসেস দত্তর দিকে চেয়ে রইলেন।

মিসেস দত্ত গলাটা অনেকখানি মোলায়েম ক'রে বল্লেন,—আপনি এতখানি আহত হবেন জানলে আমি একথা বলতুম না। বুদ্ধদেবকে আমিও ভক্তি-শ্রদ্ধা করি ; কিন্তু অন্ধভাবে নয়। আচ্ছা হারু বাবু, দেখচি আপনি ত তাঁকে খুবই মানেন—আপনি দয়া ক'রে আমাকে কি বুঝিয়ে দেবেন—কেন বুদ্ধদেবকে এত বড় মনে করেন ?

তাঁর অসাধারণ ত্যাগ আর তাঁর অচিন্ত্যপূর্ব্ব স্বাধীন-চিন্তা। তিনিই প্রথম, যিনি বেদকে অপৌরুষেয় ব'লে স্বীকার না করতে সাহস ক'রেছিলেন।

মিসেস দত্ত বল্লেন,—ত্যাগ স্বীকার সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলতে চাই নে—আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর যেখানে যে এই ইতিহাস-কাহিনী শুনে, সে-ই অবাক হয়ে যায়। জগতের ইতিহাসে এর জোড়া নেই বোধ করি। কিন্তু বেদকে অভ্রান্ত ব'লে না মানাটা কি তাঁর উচিত হয়েছিল ?

হরিলাল উত্তেজিত হয়ে বল্লেন—আমি বলচি, একশ'বার উচিত হয়েছিল।

মিসেস দত্ত হরিলাল বাবুর উষ্মা দেখে হাসি চাপতে লাগলেন। বেদের তিনি কি মানতে চান্ নি—আগাগোড়া বেদটাই কি ?

না, তা কেন হবে। বেদের মধ্যে যে সব যুক্তিহীনতা আছে, যা অপৌরুষেয়ের দোহাই দিয়ে লোকে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল—বুদ্ধদেব সেইটে মানতে চান নি।

মিসেস দত্ত বল্লেন,—বুদ্ধদেব যা ক'রেছিলেন, ঠিক তেমনটি করবার অধিকার কি আমার আপনার নেই ?

আছে বৈকি, খুব আছে।

বুদ্ধদেবের কি নিজের কোন যুক্তিহীনতা ছিল না, ?

জানি নে; যদি থেকে থাকে ত তা মানতে আমরা বাধ্য নই।

ঐ কথাই ত আমি বলছিলুম, হারু বাবু। ব'লে দত্ত-গৃহিণী হাস্তে লাগলেন।

আমার মনে হয়, বুদ্ধদেব সমাজের মধ্যে স্ত্রী-জাতির অধিকার সম্পর্কে যেন বিচারের চেয়ে অবিচার বেশী ক'রে গেছেন। তিনি বার বার স্ত্রীজাতিকে—তাঁর ধর্ম্মানুষ্ঠান থেকে তফাৎ করবার কথাই বলেছিলেন; কিন্তু তাদের আগ্রহাতিশয্যকে যখন আর ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারলেন না, তাদের দীক্ষা দিতেই হলো, তখন তিনি কি কথা বলেছিলেন—তা কি আপনার মনে নেই ?

আছে।

ঐ কথা আপনি কি সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারেন ?

হরিলাল চুপ ক'রে রইলেন।

মিসেস দত্ত বল্লেন,—আমি খুব চিন্তাশীল নই, লেখাপড়াও যা জানি তা না জানাই বোধ করি ছিল ভাল। বিদ্যার অস্ত্র ভাল না, ভয়ঙ্করীই বটে; তাও স্বীকার করি। কিন্তু ছেলে বয়স থেকে—আমার মনটা কেমন খোলা, কোন জিনিষকে না বুঝে আঁকড়ে ধরা আমার স্বভাব নয়—তাই এই বয়সে আমি কিছু কিছু ভাবতে শিখেচি; এবং ভেবে-চিন্তে এইটুকুই বুঝেচি যে, পুরুষমানুষ যতদিন পর্য্যন্ত মেয়েমানুষের অযাচিত অভিভাবক হয়ে থাকবে ততদিন জগতে স্ত্রী-পুরুষের লড়াই চলতেই থাকবে।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর দত্ত-গৃহিণী বল্লেন,—এই কঠিন সমস্যার সমাধান যত দিন না, হবে তত দিন হিন্দু বলুন, ব্রাহ্ম বলুন, ক্রীশ্চান বলুন—সকল সমাজই

অচল হয়ে থাকবে। আমি এই সকল সমাজেই ছিলুম, সকল দিকের দুঃখ বহণ ক'রে, সকল সমাজের বিষ-পান ক'রে নিজে জলে পুড়ে মরচি—আমার কাছে যারা এসে পড়ে তাদেরও তিক্ত ক'রে তুলি—

তিনি আর কথা কইতে পারলেন না।

দেখলাম হরিলাল কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখ দুটো মুছে ফেললেন।

তারপর অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা না ব'লেই কেটে গেল। এই স্তব্ধতার একটা পরিষ্কার ভাষা ছিল। দত্ত-গৃহিণী যে সব কথা বল্লেন তার ধ্বনি তখনো ঝঙ্কৃত হচ্ছিল। তটের বুকে জলের ঢেউ লেগে কলতান ওঠে, দত্ত-গৃহিণীর সকলগুলি কথার সুরের সার্থকতা সেই স্তব্ধ গম্ভীর শ্রোতার মধ্যে নিহিত ছিল—এই অর্থ গ্রহণ করা ভিন্ন উপস্থিত ব্যক্তির তখন আর অন্য কোন পথ ছিল না।

ধীরে ধীরে দূরে স'রে গিয়ে একটা রেলিং-এর উপর ভর দিয়ে পূব দিকের আকাশে শুকতারার শুভ্র দীপ্তি দেখতে লাগলাম। মনে হলো, তাঁদের যে সব একান্ত আপন-কথা, তার মধ্যে না থাকাই ভাল।

হরিলাল ঠিক যেন আত্ম-বিস্মৃত হয়ে কথা কইতে লাগ্‌লেন—বিরজা, তোমার কথা যখন মনে করি তখন মনের কি যে অবস্থা হয়, তা আমি ভাষায় বল্‌তে পারি নে। সে সব দিনের কথা ভুলে যাওয়াই বোধ করি একমাত্র নিষ্কৃতির উপায়।

বিরজা উত্তেজিত হয়ে বল্লেন,—ভুলে যাবো! আমার জীবনের সব চেয়ে সুখের স্মৃতি, যার রস আজো আমাকে বাঁচিয়ে সরস ক'রে রেখেছে—আমার একমাত্র আদরের সম্বল—ভু'লে যাবো! পুরুষে সব ভু'লে যেতে পারে; কিন্তু আমরা ত তা পারি নে!

গম্ভীর ভাবে হরিলাল বল্লেন,—যা আর কোন কাজে লাগ্‌বে না—এই কঠিন জীবন-যাত্রার পথে তার ভার বহন করা বিড়ম্বনা মাত্র।

বিরজা বল্লেন,—আর সকলে এই কথা বলতে পারে; কিন্তু আপনি কেমন ক'রে বলেন?

হরিলাল একটু অপ্রস্তুতের মত হয়ে চুপ ক'রে রইলেন।

বিরজা বলে যেতে লাগলেন—শুনেছিলাম মানুষ বেঁচে থাকে আশা নিয়ে; সেই তত জীবন্ত যার যত বেশী আকাঙ্খা করবার শক্তি আছে; কিন্তু আমার আশা করবার কিছু নেই; আকাঙ্খা করবার সাহস নেই। এ যেন একটা জবরদস্তির জীবন,—সমাজের জুলুম! জানি নে, এমন ক'রে কতদিন কাটাতে হবে।

গম্ভীর গলায় হরিলাল ডাকলেন—বিরজা !

তারপর আর কিছু শুনা গেল না। আমার মনে হলো—দুজনে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করছেন।

অতর্কিতে আমার দুই চোখে কখন জল এসে পড়েছিল। এই দুটি মানুষ সমাজের নিষেধ মান্য ক'রে আত্ম-গোপন ক'রে নিজেদের মনের ব্যাকুল ইচ্ছাকে অস্বীকার ক'রে কি বেদনার জীবনই না অতিবাহিত করচেন! জীবনের কোন এক তরুণ সরসতার মধ্যে তাঁরা পরস্পরকে ভাল বেসেছিলেন—পরস্পরকে চেয়ে ছিলেন—তারপর ?—কি হয়েছিল, জানি নে। তবে আজ এইটুকুই জানা যে, হরিলালের গাম্ভীর্য্যের পাহাড়ের তলায় গোপনে একটি নির্ঝরিণী ব'য়ে চলেচে—হয় ত এ জীবনে তার স্রোত অচল হবে না। দত্ত-গৃহিণীর কর্কশ ব্যবহারের নীচে একটি প্রশান্ত সমুদ্র আছে—অদৃষ্টের পরিহাসে তার জল পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে; কিন্তু সময়ে তা গ'লে উচ্ছল হতেও পারে!

অতি সন্তর্পণে বারান্দার অপর প্রান্ত দিয়ে আমি, যে ঘরে কাকি-মা ছিলেন সেই ঘরে প্রবেশ করলাম। বদন পাশে একটি টুলে ব'সে ঝিমুচ্চেন, নার্স আমাকে পাশের একখানা চেয়ারে বসবার ইঙ্গিত ক'রতে আমি ব'সলাম।

রোগী ঐ বাবুর কে ?

ছোট ভাই-এর স্ত্রী।

বাবুটি কি করেন ?

ব্যারিষ্টারি—

নার্স মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ ক'রে বল্লে—আমাকে মিথ্যা প্রতারণা ক'রো না।

কেন ?

যে একবার বিলেত গিয়েছে—তার ঐ রকম চেহারা হ'তেই পারে না। তুমি মিছে তর্ক আমার সঙ্গে ক'র না বলচি—ও আমি কিছুতেই বিশ্বাস করবো না।

বেশ, সে কথা ভাল।

এই মেয়েটি কি বিবাহিতা ?

হুঁ—ইনি বিধবা।

নার্স নিজে নিজেই বল্লে,—বয়সটা খুব কাঁচা রয়েচে—এর আবার বিয়ে দেওয়া উচিত।

আমি হাসতে লাগলাম। আমাদের সমাজে বিধবার বিয়ে হয় না।

নার্স রাগ ক'রে বল্লে,—তোমাদের সমাজ গণ্ড-মূর্খের সমাজ।

তুমি কেন বিয়ে কর নি মেম-সায়েব?

মেম-সায়েব বল্লে এরা ভারি খুশী হয়!

আমি? আমি?—ডেভিল;—তুমি তা' জান না?—আমায় কে বিয়ে করবে?

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বেচারি বল্লে,—এমনি করেই আমাদের জীবন কেটে যাবে—আমরা সমাজের মরুভূমি—আমাদের রিক্ততার জীবন!

ঝড়াক্ ক'রে তিনখানা ছবি পাশা-পাশি আমার চোখের সাম্‌নে যেন দুল্‌তে লাগ্‌লো! একজন মাতৃত্ব চায় কিন্তু সমাজের কঠোর ব্যবস্থা তাকে তা থেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেচে। য়ুরোপের সমাজ, জীবন-যাত্রার ব্যাপারটার মূল্য এমন উঁচু ক'রে তুলেচে যে, তাতে এই মেয়েটি সাহসই ক'রে উঠতে পারে না যে, তার একটি বর মিলবে। টাকা চাই, রূপ চাই, বংশ চাই। তা' যার নেই, তাকে এমনি ক'রে জীবনটা কাটিয়ে দিতে হবে।

আর একখানি ছবি—সব ছিল, অদৃষ্ট তাকে পরিহাস ক'রছে—সেই পরিহাস তার অসহ্য হয়ে উঠেছে, তাই আর অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা নেই, ইহলোক পরলোকের কথা চিন্তা করবার আর ধৈর্য্য পর্য্যন্ত নেই—এক নিমিষে, এক ফুঁয়ে যদি প্রদীপটা নিবে যায় ত যাক্ না কেন? সেখেনেও অদৃষ্টের পরিহাস—প্রদীপ নিবল না!

আর শেষটি? আমার কানে এখনো ধ্বনিত হচ্ছিল—আমার আশা করবার কিছু নেই, আকাঙ্খা করবার সাহস নেই!—শুক্‌নো ধূলো উ'ড়ে-যাওয়া মাঠের মধ্যে দিয়ে মড়্‌কে দুটো বলদ একখানা জীর্ণ গাড়ী টেনে নিয়ে চলেচে। তার চালক মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েচে! অজস্র ধূলো আর অসহ্য ক্যাঁচ্‌ক্যাচানির শব্দ কতক্ষণে থেমে যাবে। পরিহাস-রসিক ভাগ্য-দেবতা উপরে ব'সে হাসচেন। আহা! কবে পথ ফুরবে!

মনে হলো, মানুষ এখনো জীবনের সত্যের একটুও অনুসন্ধান ক'রে বার করতে পারে নি। পরীক্ষার পর পরীক্ষা চলেচে—কেবল গরমিলের উপর গরমিলই জমা হয়ে উঠলো। নিয়ম নিষেধ, আইনের লোহার শিকল, ক্ষ্যাপার কোমরে হয় ত একদিন সোনা হয়ে উঠেছিল; কিন্তু সে পরশ-পাথর হারিয়েই র'য়ে গেল; হয় ত কোন দিনও তার খোঁজ পাওয়া যাবে না।

কাকি-মা ঘুমন্ত বল্লেন,—জল দাও।

নার্সের মুখানা হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠলো—বাবু, সত্যি সত্যি এ বড় ভাল লক্ষণ।

এই শুভ সংবাদ জানাতে গিয়ে তাঁদের অলক্ষ্যে আমি পিছিয়ে এলুম। কানে হরিলালের এই কথাগুলো এসে পড়ল।—

বিরজা, ইঁদার কোন ভারই ত হাবুর উপর নেই। ওর জীবনটাকে কল্যাণময় ক'রে তোলবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার—একথা আমি একদিনের জন্যেও বিস্মৃত হই নি; তুমি মিছে ভয় পেও না।

ঠিক সেই সময় সূর্য্যের সোনালী কিরণ দত্ত-গৃহিণীর সজল চোখের উপর প'ড়ে ঝক্ ঝক্ ক'রে উঠ্‌লো। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে আকাশের দিকে চেয়ে বল্লেন—বেলা হয়ে যাবে বাড়ী যাই।

গম্ভীর গলায় হরিলাল ডাক্‌লেন—কিরণ, ও কিরণ—

আজ্ঞে।

মিসেস দত্তকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এসো বাবা!

(৫)

সে বছর লক্ষ্ণৌ-এ ভারি প্লেগ হচ্ছিল ব'লে স্কুল-কলেজগুলো আর বড়দিনের ছুটির অপেক্ষা ক'রে উঠতে পারে নি। ডিসেম্বরের গোড়াতেই ছুটি হওয়াতে মিস ইলা দত্ত কল্‌কাতায় চ'লে এসেছিলেন।

সেই উপলক্ষে একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমার চা খাবার ডাক ছিল। কলেজের ফেরত দত্ত-সাহেবের প্যারাডাইসে গিয়ে উত্তীর্ণ হলাম।

মিস দত্ত আমায় চিনতেন না; কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয়ের পূর্ব্বেই অনেক পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। তবুও স্বীকার করতেই হবে যে, আমার হার হয়েছিল। লম্বায় সাত ফুট না হলেও ইলা দত্ত, মেয়ে-মানুষের হিসাবে বেশ ঢ্যাঙ্গা। ছিপ্-ছিপে দেহ, মুখের নীচের দিকে হয়ত কোন একটা অসঙ্গতি ছিল কিন্তু তার সমালোচনা করবার আগেই দর্শকের দৃষ্টি চোখেই আবদ্ধ হয়ে যেত। উজ্জল চোখ দুটো দেখলেই মনে হত মেয়েটি অসাধারণ বুদ্ধিমতী।

দত্ত-গৃহিণী আমাকে এমন সস্নেহ আহ্বান দিলেন যে, তাঁর কন্যা, আমাকে তাঁদের যে কেবল একজন বন্ধু ব'লেই মনে ক'রে ছিলেন তা নয়, আমার সঙ্গে প্রথম থেকেই আত্মীয়ের ব্যবহারই করেছিলেন।

সেদিন শনিবার ছিল, তাই স্বর্গের অধিদেব হাবু দত্ত বাড়ী ছিলেন না, তিনি ব্যারাকপুরে রেশ খেলতে গিয়েছিলেন।

টেবিলের উপর একখানা গানের বই পড়েছিল, আমি সেখানা তু'লে নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে লাগলাম। সেটা গানের সংগ্রহ-বই।

ইলা দত্ত বল্লেন,—আপনি কি ভালবাসেন, গান না ছবি?

টেবিলের দিকে চেয়েই বল্লুম,—দুই-ই।

হাসির লঘু তরঙ্গে ঘরটার বাতাসকে মুখর ক'রে ইলা বল্লেন,—আপনি ত খুব চালাক লোক দেখ'চি!

হাসি চেপে বল্লাম,—যাঁরা চালাকদের চালাকি এত অল্প সময়ের মধ্যে ধ'রে ফেলেন তাঁদের আপনি কি বলেন?

তাই ত, সুন্দর উত্তর দিয়েছেন! এই বলে চেঁচিয়ে ইলা বল্লেন,—মা, মা, ওমা, শুনে যাও, কি মজা—

বাইরের বারান্দায় ষ্টোভের গর্জ্জন চলছিল—তাই শোনা গেল না।

ইলা কিন্তু তখনো সামলাতে পারেন নি—উতলা শরতের হাওয়াতে কেশের গুচ্ছ যেমন লুটিয়ে এক-একবার মাটি ছুঁতে থাকে, আবার উঁচু হয়ে উঠে, ইলা চেয়ারের উপর ব'সে ঠিক তেমনি ক'রে হাসির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হচ্ছিলেন—ওমা—আপনি কি মজার লোক—উঃ—এমন ত' কখনো শুনি নি—উঃ—

সেদিন এই জিনিষটা আমার মনে বিস্ময়-জড়িত একটা ব্যথা বিরক্তির ভাবই এনেছিল। মানুষের মন সকল জিনিষের মধ্যেই সঙ্গতি খুঁজতে থাকে—আতিশয্যের যদি কোন সঙ্গতি না পাওয়া যায় ত তখন মন অধীর হয়ে উঠে প্রশ্ন করে—কেন এই অপব্যয়?

এমন ক'রে খুঁটিয়ে না ভাবলেও সেদিন ইলার এই প্রগল্‌ভতা আমার ভাল লাগে নি।

কিন্তু আমার মনে আর একটা প্রশ্নও খুব জোর ক'রেই সেদিন জেগে ছিল। হাব-ভাবে কথায়-বার্ত্তায় একথা কিছুতেই বলতে পারা যায় না যে, সেই মেয়েটির বুদ্ধি কম। একজন নূতন লোকের কাছে এমন যে করতে নেই, তা সে নিশ্চয়ই জানে। তবে?

পরে জেনেছি।

একদল লোকের এই বিশ্বাস যে, প্রতিভার অনুপাতে মানুষের মনের মধ্যে সুখ-দুঃখ হাসি-অশ্রুর তার-তম্য হয়। প্রতিভাহীনের দুঃখও কম, আনন্দও

কম ;—আনন্দের অভিব্যক্তির উচ্ছ্বাসও কম হয়। এর সত্য মিথ্যা এখনো বুঝতে পারি নি—তবে আর দলের কথাও জানি—যাদের বুকের মধ্যে দুঃখের অশ্রু জমাট বেঁধে পাথর হয়ে থাকে, যাদের হাসি মেঘে-ঢাকা জ্যোৎস্নার মতই !

বিরজা ঘরে ঢুকে দেখ্‌লেন, একজন আড়ষ্ট হয়ে ব'সে আছে আর একজন যে কি করবে তা বুঝে উঠ্‌তে পারচে না।

তোর হলো কি, ইলা ?

সব কথা শুনে বল্লেন,—ঠিক বাপের মত—একটুতে যেন একেবারে অধীর !

এই কথাগুলো আমার কানে তীব্র পরিহাসের মত ঠেক্‌লো। লজ্জায় দত্ত-গৃহিণীর মুখের দিকে চাওয়াই যেন মুস্কিল হয়ে গেল।

ইলা আমার মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে বল্লে,—দেখুন, মা'র কথা শুন্‌চেন ?—আচ্ছা আপনি বলুন ত—আমার সঙ্গে বাবার কি মিল আছে ?

বিরজা হাসতে হাসতে বল্লেন,—খুব লোককেই সাক্ষী মেনেচিস ইলা, কিন্তু তোর বাহাদুরি !

কেন ?

আমি চুপ ক'রে অপ্রতিভের মত ব'সে রইলাম। বিরজা বল্লেন,—কিরণ কি তোকে জানে ? তুই কার মত ঠিক, তার খবর আমার কাছে নিতে হয় ত নে।

ইলা উঠে বিরজার ঘাড়ের উপর দু-হাত দিয়ে আদর এবং আব্‌দারের সুরে বল্লে,—না মা, তা হবে না, আমি তোমার মত, আমি যে তাই হতে চাই।

বিরজা হেসে বল্লেন—আচ্ছা—আচ্ছা, তাই হলো।

একগাল হাসি নিয়ে অত্যন্ত প্রফুল্ল এবং প্রসন্ন মনে ইলা এসে চেয়ারের উপর ব'সে বল্লে,—দেখ্‌লেন ত মাকে কেমন এক কথায় হারিয়ে দিলাম ?

আমি হাস্‌বার চেষ্টা ক'রলাম।

এইবার আপনার পালা, প্রথম দিনেই যে আপনি আমাকে হারিয়ে দিয়ে যাবেন, তা কিছুতেই হতে পারে না—

বিরজা চা নিয়ে এসে বল্লেন,—আচ্ছা তোদের বাক-যুদ্ধ পরে হবে, এখন কিরণকে একটু চা খেতে দে—বাছার হয় ত কত গলা শুকিয়ে আছে।

ইলা চায়ের বাটিতে একটা চুমুক দিয়ে বল্লেন,—অপ্রস্তুত শত্রুকে আমি কখনো আক্রমণ করি নে।

ষাট্‌ বালাই, শত্রু কিলা ?—কথার ছিরি দেখ !

ইলা আমোদ বোধ ক'রে হাসতে লাগলো—মা, তোমার বিশ্বাস যে, শক্র বল্লেই বুঝি মানুষ শক্র হয়ে যায় ?

তা যায় বৈকি ?—তুই এ সংসারের কতটুকু জানিস, কি বুঝিস, বল্ ত ? মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্বের যে বাঁধনটুকু তার সুতোটা কত সূক্ষ্ম, কত ক্ষণভঙ্গুর, তা বয়স না হলে, ধারণাই হয় না। জীবনে শক্র খুঁজে বার করতে হয় না—বন্ধুর মত বন্ধু মেলা কত সৌভাগ্যের কথা!—আমাদের যে কপাল!

শেষদিকে বিরজার মুখটা রীতিমত গম্ভীর হয়ে উঠলো।

ইলা একটু উত্তেজিত হয়ে বল্লে,—যদি অত সহজেই ভেঙ্গে যেতে পারে ত তাকে পুতু-পুতু ক'রে রাখবার দরকার কি ?

চা খাওয়া শেষ ক'রে সে নিজের এস্‌রাজটা নাবিয়ে নিয়ে আমার দিকে ফিরে বল্‌লে -একটা গান মনে হয়ে গেছে—গাই ?

নিশ্চয়।

সে টুংটাং ক'রে এসরাজে সুরগুলো বেঁধে নিতে লাগলো।

গান সুরু করবার আগে ইলা বল্লে—এই গানটা যে গইচি—এর কথার মর্য্যাদায়; সুরটা কিন্তু খাঁটি সকালের, তা হোক্—কিন্তু ভাবটা বড় উপযোগী—কিছু মনে করবেন না।

ছড় টেনে সে গাইতে লাগলো।

কেন ধরে রাখা ও যে যাবে চলে
মিলন যামিনী গত হলে!
ওরে মিলন যামিনী গত হলে!
স্বপন শেষে নয়ন মেলো,
নিব-নিব দীপ নিবায়ে ফেলো,
কি হবে শুকানো ফুলদলে
মিলন যামিনী গত হলে—
ওরে মিলন যামিনী গত হলে।

এসরাজখানা রেখে দিয়ে বল্লে—বাকিটা থাক, আর ভাল লাগ্‌চে না।

বিরজা বল্লেন,—এ গান কবে শিখলি ইলা ? এটা ত সেবার কোন দিন গাস নি ?

আমার মনে নেই। বাবা! সন্ধ্যার সময় ঘরের মধ্যে আটকা থাক্‌তে ভারি কষ্ট হয়—তাইতেই ত আমি লক্ষ্ণৌ ছাড়তে চাই নে।

যা না, কিরণের সঙ্গে একটু ইডেন গার্ডেনে বেড়িয়ে আয় না।

উনি আমাকে নিয়ে যাবেন কেন? বাঃ তোমার যেমন কথা!

তাতে কি?

ওঁর কত কাজ আছে হয় ত।

আমার কেমন ভয় করছিল, কিন্তু না বল্‌তেও লজ্জা বোধ হলো।

অবশেষে ইলাকে সঙ্গে ক'রে আমার বেরুতেই হলো।

যাবার আগে ইলা মাকে শাসিয়ে গেল,—ফিরে এসে আমি কিন্তু আর এক কাপ চা খাবো।

তার আবার বল্‌চিস্ কি—তোদের বাড়ীতে ত সমস্ত দিনই চা চল্‌চে।

ট্রামের পথটা কোন কথা বল্‌তে আমার সাহস হলো না। মনে হলো যেন লক্ষ পরিচিত চক্ষু চারিদিকে বিস্ফারিত হয়ে রয়েচে। সবাই যেন প্রশ্ন করচে—এ আবার কি হে!

কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলে দেখ্‌লাম, অপরিচিতের দলও বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে। অবশ্য আমার দিকে নয়। ইলা অত্যন্ত বিরক্তি ভরে মুখ ফিরিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে রয়েছে।

দর্শকবৃন্দের মুখে বিস্ময়ের চেয়ে আর একটা ভাবই বোধ করি স্ফুটতর হয়েছিল। আমার ভারি লজ্জা করতে লাগ্‌লো। মনে হলো, মানুষ কেমন ক'রে এমন অসংযত হয়! কোন দিক দিয়েই যেন আমার মনের মধ্যে একটুও স্বস্তি বোধ হচ্ছিল না।

গাড়ীটা থাম্‌তে একজন ইংরেজ মহিলা গাড়ীতে উঠে ইলার পাশে বসলেন। লোকের কটাক্ষ তাঁর উপরও পড়ল; কিন্তু সে আর এক রকম। তাতে রাগ করবার কিছুই নেই।

একজন প্রৌঢ় বাবু কোলের উপর একটি আধ-ময়লা ক্যাম্বিসের ব্যাগ রেখে সময়ের সদ্ব্যবহার করবার অভিপ্রায়ে মধ্যে মধ্যে ঝিমিয়ে নিচ্ছিলেন। হঠাৎ জাগ্রত হয়ে উঠে মেম-সায়েবের গলার কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কি যেন নিরীক্ষণ করতে লাগ্‌লেন। সকলে ত অবাক হয়ে গেল।

মেমটি ভীষণ বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে বল্লেন—টুম্ কেয়া ডা'কটা—পুলিশ—পুলিশ!

বাবুটি চম্‌কে, পড়ে যাবার মত করে ইংরিজিতে উত্তর দিলেন—Looking your clock Sir—catching train শেয়ালদা Sir.

গাড়ীখানা সেই সময়ে বৌবাজারের মোড়ে এসে লাগ্‌তেই বাবুটি নেমে প'ড়ে হাত জোড় ক'রে বল্লেন—My Sir, mistake madam, excuse Sir no—no—madam.

একটা উত্তাল হাসির তরঙ্গে আমাদের সকলের কান যেন কালা হয়ে গেল। মেম-সায়েবের মুখখানা দেখে মনে হলো—তার প্রতি রন্ধ্র দিয়ে রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে ছুটে আর কি!

তারপর ভীষণ স্তব্ধতা!

গাড়ী থেকে নেবে ইলা আমার বাঁ-কাঁধের নীচে মুখখানা চেপে ধ'রে হিষ্টিরিয়া রুগীর মত হাসতে লাগ্‌লো। তাকে কিছুতে থামান যায় না।

তখন আলো জ্বলে গেছে, ব্যাণ্ড সুরু হয়েছে, আমরা ধীরে ধীরে গিয়ে একখানা বেঞ্চের উপর বসলাম।

ঠিক মনে আছে যে, তেমন ক'রে বস্‌তে আমার খুব ভাল লাগ্‌ছিল না। তেমন ক'রে কখনো বসি নি, তাই ভয় ভয় করছিল। মনে হচ্ছিল, যারা আমাদের দেখ্‌চে তারা কত না কি মনে করচে। কিন্তু একথাও মনে পড়ে যে, ভিতর দিক দিয়ে একটা যেন আরাম পাচ্ছিলাম।

এমন একটি মেয়ের সঙ্গে মেশবার আমার সাহস ছিল না। চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্ছি—সায়েব-মেমেরা কত গা ঘেঁসা-ঘেঁসি ক'রে ব'সে আছে—বেড়িয়ে বেড়াচ্চে—তাদের ত লজ্জাও নেই, সঙ্কোচও নেই। তবে আমার এত কুণ্ঠা কিসের?

ইলা আমার গাম্ভীর্য্য দেখে হয় ত কিছু মনে ক'রে বল্লে,—দেখুন, আমি একটু ঘুরে বেড়াই ততক্ষণ, আমি ঐ বাজনা চুপ ক'রে ব'সে শুন্‌তে পারি নে।

ইলা উঠে যাওয়াতে আমার মনটার প্রসার যেন অনেকখানি বেড়ে গেল। আমি তখন স্বস্তির সঙ্গে সব কথা চিন্তা করবার অবসর পেয়ে যেন বেঁচে গেলুম।

বাগানের হাওয়া ব্যাণ্ডের ড্রামের আঘাতে যেন গুর্ গুর্ করচে, আলোর ছড়াছড়ির মধ্যে রূপ-যৌবন, অলঙ্কার-ঐশ্বর্য্য যেন আত্মবোধের আনন্দ-গৌরবে ডগমগ্ করচে—এক নিশ্বাসে আমার মনের চাপটা স'রে গিয়ে অন্তর থেকে চিত্ত নাচ্‌তে নাচ্‌তে বার হয়ে এসে এই উৎসবের আনন্দ-দোলায় চ'ড়ে ব'সে

দুলতে লাগলো। আমার মনে হলো, জীবনকে এমন ক'রে উপভোগ করবার একটা প্রকাণ্ড সার্থকতা আছে, য়ুরোপ তারি সন্ধান যেন পেয়ে গেছে!

ইলা ফিরে এসে আমার খুব কাছে দাঁড়িয়ে—আমার গায়ে নাড়া দিয়ে বল্লে—শুনছেন?

কি?

আমার একটা অনুরোধ—

আমার কান দুটো নিমেষে গরম হ'য়ে যেন আগুন ছুটতে লাগলো, চোখে আলো দেখতে পেলাম না, কেবল দেখলাম দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে কোটি কোটি জোনাক পোকা উড়ে বেড়াচ্ছে।

মনে হলো নরকের দোর বুঝি এইবার তার প্রকাণ্ড কপাট দুটো একেবারে উন্মুক্ত করেই দিলে—

বাঃ আমার কথা শুনচেন না বুঝি?

আমি সন্ত্রস্ত হয়ে বল্লাম—বলুন কি বলচেন।

না—বল, কি বলচো—এর পর থেকে—আর আপনি আপনি নয়—তুমি-তুমি।

অত্যন্ত বেরসিকের মত আমি বল্লাম—আচ্ছা সে বিবেচনা করা যাবে।

ইলা উচ্চ হাস্য ক'রে বল্লো—বাপ্‌রে! এ একটা এমন কথা যার রায় এখুনি দেওয়া যায় না—বিবেচনা করতে হবে! আচ্ছা তুমি ব'সে বিবেচনা কর, আমি তোমার সঙ্গে কিছুতেই বাড়ী ফিরব না—যদি আমাকে আজ 'তুমি' না বল।

সেই শীতের সন্ধ্যায় আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হ'য়ে উঠলো—আমি দাঁড়িয়ে উঠে বল্লাম—ইলা, আচ্ছা তোমারি জিত্‌!

ইলা ফিরে এসে বল্লে,—ভয় কি—চল বাড়ী যাই—ব'লে আমার হাত ধ'রে বাড়ী ফিরতে লাগলো।

এমন সহজ সুন্দর ভাবে সে আমার হাতখানি ধরেছিল যে, আমার মন থেকে নিমেষে বহুদিনের আবর্জ্জনার মত জমা কুসংস্কারটা ফুৎকারে ধূলিকণার মত চ'লে গেল; আমি তখন বেশ দৃঢ়ভাবে বুঝলাম যে, তাতে কোন দোষ হয় না। একজন যুবকের হাত একটি যুবতী কোন কু-মতলব না ক'রেও ধরতে পারে।

এই সহজ সত্যটি সেদিন আমি লাভ ক'রেছিলাম—তাই সেদিনকে আমি কোনদিনই ভুলে যাবো না। যার কাছে থেকে আমি এটি পেয়েছিলাম, তাকে আজও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রাখি।

হঠাৎ সে আমার হাতখানা টেনে ধরে বল্লে,—বাঃ ওদিকে কোথায় যাচ্চেন ?

কেন ? ঐখানেই ত ট্রাম পাবো।

ইলা আবদার ক'রে বল্লে—না, ট্রামে নয় ; লোকগুলো বড় অসভ্য,—একটা গাড়ী ডাক।

আমি একটু ইতস্তত করতে লাগলুম, মনে করলুম—এত খরচ!

ইলা ঠোঁট দুখানি চেপে বল্লে,—না হয় ভাই, আমার জন্য একদিন দুটাকা বাজে খরচই করলে—ট্রামে আমার চেয়ে তুমিই ত বেশী লজ্জা পাও।

একখানা গাড়ী ডেকে দুজনে তাতে চ'ড়ে বস্‌লাম ; আমি সাম্‌নের সিটে বস্‌তেই ইলা আপত্তি করলে।

কেন তুমি ওখানে বস্‌বে ?

আমি গম্ভীর স্বরে বল্লাম—মহিলার মর্য্যাদা রক্ষার জন্যে !

ইলা বল্লে—মিথ্যা কথা ; ওতে মর্য্যাদা হয় না,—অমর্য্যাদা। তুমি কি শুধু গ্যালাণ্ট্ ?

ক্ষতি কি ?

সে বল্লে—আমি কিন্তু এমনি রাগ ক'রবো যে, শেষ-কালে তুমি বুঝতে পারবে বলচি—ভাল চাও ত এদিকে এসে ব'সো !

আগে শুনেই নি না—যদি কথা না শুনি ত কি শাস্তি আমার হ'তে পারে ?

অভিমান ভরে সে বল্লে—শাস্তি ?—তোমাকে শাস্তি দেবার আমার অধিকার কি ?

তার কথা ভার হয়ে এলো—সত্যি কিনা জানি নে, যেন মনে হলো, চোখ দুটো ছল্ ছল্ করচে।

আমি জায়গা বদলে বস্‌লুম।

ইলা আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বল্লে,—একটা কথা চুপি-চুপি বলচি, শোন।

আমি হেসে ফেলে বল্লাম—আর কে আছে, চুপি চুপি কেন ?

একথা চেঁচিয়ে বল্‌তে নেই যে, ব'লে কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বল্লে,—এত সহজে হার স্বীকার পুরুষদের করতে নেই।

আমি হাসতে লাগলাম।

বিশ্বাস করচো না ? আচ্ছা একদিন বুঝতে পারবে—এ কত বড় সত্যি কথা !

উত্তরেও আমি হাস্‌লুম।

সে কথাটা চট্‌ ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে বল্লে—আমার ভারি আশ্চর্য্য লাগে, কেন যে গান আমার এত ভালো লাগে—ঐ ব্যাণ্ডের সুরটা ঠিক যেন আমাকে পেয়ে বসেচে—আবার হাসি! অবিশ্বাস করছ?—আচ্ছা তবে শোন আমি শিশ্‌ দিয়ে ওটা তোমাকে আবার শুনিয়ে দিচ্চি।

শিশে ইলা অবিকল সেই সুরটা বাজিয়ে গেল—আমি অবাক হয়ে শুন্‌তে শুন্‌তে তন্ময় হয়ে গেলুম!

বৌবাজারের মোড়ে এসে ইলা বল্লে,—ইস্‌, একটা ভারি ভুল হয়ে গেছে ত, আমার একজন বন্ধু আসবার কথা ছিল—হয় ত এসে ব'সে আছে, তুমি এক কাজ কর, নেবে গোটাকয়েক ভীমনাগের রসোগোল্লা নিয়ে এস; আমি কিন্তু আর অপেক্ষা করতে পারচি নে, এগিয়ে যাচ্চি;—ব'লে গাড়ীকে যাবার হুকুম ক'রে আমার দিকে ফিরে বল্লে,—কিন্তু তাই ব'লে বেশী দেরী ক'রো না যেন।

আমি অত্যন্ত বিস্মিত হলুম, একটু রাগও হ'ল ইলার ভাবগতিক দেখে। সে যেন মানুষকে কিছু একটা অনুরোধ করতে একটুও দ্বিধা বোধ করে না। তার যখন প্রয়োজন তখন যে কাছে আছে সে যদি না করবে তা চলে কেমন ক'রে?

রসোগোল্লার পাত্রটি বহন করতে করতে আমি মনের মধ্যে এই মেয়েটির সম্বন্ধে বোধ করি একটু কঠোর সমালোচনাই করছিলাম। এতটা গায়ে-পড়া ভাব যেন আমার বরদাস্ত হচ্ছিল না; মনে হচ্ছিল নিজেকে ভারি যেন খাটো করা হচ্ছে, এমন করা আমার পোষাবে না। মনের আরও তলায় কিন্তু আর একরকমের স্রোত বইছিল; সেখানে যেন কে বলছিল—অমন ধাঁ ক'রে না জেনে-শুনে লোকের সম্বন্ধে বিচার করলে ঠক্‌তে হয়।

আমি তাতেই সায় দিয়ে বল্লুম,—আচ্ছা সেই ভালো—এখন রায়টা মুলতুবি রাখা গেল।

—ক্রমশ



জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

একটী বংশের সহিত একটী জাতির ভাগ্য জড়াইয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাত্মা পুত্রগণ বাঙলার রেনাসাঁসের সৃষ্টিকর্তাদিগের অন্যতম। ঠাকুর বাড়ীর প্রাঙ্গণ হইতে বাঙালী মেয়েরা স্বাধীনতা ও শিক্ষার প্রথম স্বাদ লাভ ও ভোগ করিয়াছিলেন—ঠাকুর-বাড়ীর প্রাঙ্গণ হইতে বাঙলার রঙ্গমঞ্চের প্রথম যবনিকা উঠিয়াছিল—ঠাকুর-বাড়ীর প্রাঙ্গণ হইতে একটী বাঙালী প্রথম সমুদ্র পারপার হইতে যশস্বী হইয়া ফিরিয়া আসিল—সমুদ্রের এ-পারে ও পারে মানুষ মানুষের সহিত প্রজ্ঞায় মিলিত হইবার সাহস পাইল—ঠাকুর-বাড়ীর প্রাঙ্গণ হইতে অতীত ভারতের তপোবনের হোমাগ্নি-শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল—প্রাচীন আর্য্যঋষির উদার বিশ্ব অনুভূতি লইয়া এই প্রাঙ্গণে বিশ্ব-কবি সুরের মন্ত্রে সমুদ্র মেখলা বিশ্বকে বরণ করিয়া লইয়াছেন—এইখানে অতীতের যত গুহায় লুপ্তরেখার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভারতের চিত্রকলা জাগিয়া উঠিয়াছে—এই প্রাঙ্গণ হইতে একটী জাতি জাগিয়া উঠিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছে।

এই অগ্রদূতদিগের অনেকেই বিপুল পরমায়ুর সৌভাগ্য ও বলিষ্ঠ জীবন ভোগ করিয়া অমৃতলোকগামী হইয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও পর্য্যাপ্ত বয়সে স্বর্গগামী হন।

তাঁহার জীবনী লইয়া আলোচনা এখানে করিব না। তিনি বাঙলা-সাহিত্যে কি দিয়া গিয়াছেন তাহারই ঈষৎ আলাপ করিব মাত্র।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত বাঙলার নাট্য-সাহিত্য ও অনুবাদ-সাহিত্য ঘনিষ্ট ভাবে যুক্ত। তিনি অনুবাদ সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, নাট্য-সাহিত্যেরও অন্যতম সৃষ্টিকর্ত্তা। দূর ভবিষ্যতে যদি কোনদিন বাঙলার নাট্য-সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চ কাব্যকলার পর্য্যায়ে উন্নত হইয়া জাতির ভাগ্যবিধাতার আসন গ্রহণ করে তাহা হইলে বাঙলার রঙ্গমঞ্চের অনাগত ঐতিহাসিককে বারে বারে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের জীবনের দিকে চাহিতে হইবে।

যৌবনের আরম্ভে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক লেখার জন্য একটী নাট্যসমিতির

সৃষ্টি করেন। এই সমিতির নাম দেওয়া হইয়াছিল Committee of five; কারণ পাঁচজন সভ্যকে লইয়া এই সভা। এই Committee of five হইতে প্রথম নাটক অভিনীত হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের কৃষ্ণকুমারী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কৃষ্ণকুমারীর জননীর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। প্রথম অভিনয় রজনী সফল হওয়াতে তাঁহাদের উৎসাহ বাড়িয়া যায়। তাহার পর হইতে বাড়ীর নীচের ঘরে রাত্রিদিন নাচ, গান, বাদ্য, কিংবা Committee of five এর দারুণ বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। তাহার পরে মাইকেলের "একেই কি বলে সভ্যতা" অভিনীত হয়। জ্যোতিবাবু সার্জ্জন সাজিয়া ছিলেন। বাড়ীর লোকেরা প্রথম প্রথম এই Committee of five-কে বিশেষ আমল দিতেন না। কিন্তু তাঁহারা ক্রমশ দেখিলেন যে, এই পাঁচজনের বাদানুবাদের মধ্য দিয়া বাঙলা সাহিত্যের একটী দিক মূর্ত্তি লইয়া উঠিতেছে।

আজ বাঙলায় অনেক নাটকীয় পুস্তক রচিত হইয়াছে সত্য কিন্তু এখনও বাঙলায় প্রকৃত নাটকের অত্যন্ত অভাব সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু তখন সবে মাত্র অভিনয় উপযোগী তিনচারখানি নাটক। নাটকের অভাব দেখিয়া এই Committee of five হইতে কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল যে, বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি লইয়া একখানি উৎকৃষ্ট সামাজিক নাটক যিনি রচনা করিতে পারিবেন তাঁহাকে দুইশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

কিন্তু যে কয়েকখানি নাটক আসিল তাহা মনোনীত হইল না। তখন বাঙলা দেশে লেখক অল্প, নাট্যকারের ত কথাই নাই। "কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব" লিখিয়া তখনকার দিনে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহারই উপরে এই ভার প্রদত্ত হইল। পুরস্কার পাঁচশত টাকা ধার্য্য হইল। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন "নব-নাটক" রচনা করিলেন। বাঙলার নাট্য-সাহিত্যের শৈশবে দু'একটি দিনকে চিরদিন স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে। প্রাচীন গ্রীক, রোম, তাহাদের কাব্য-কলার শ্রেষ্ঠ দিনগুলিকে স্মৃতিতে জিয়াইয়া রাখিবার জন্য পরমসুন্দর উৎসবের সৃষ্টি করিয়াছিল। বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি—সে তাহার কাব্যকলার জীবনের সুন্দর মুহূর্ত্তগুলিকে ভুলিয়া যায়। বাঙালীর পৌত্তলিকতা হইতে কাব্য-দেবতা চলিয়া গিয়াছেন। যেদিন পণ্ডিত রামনারায়ণকে পুরস্কার বিতরণ করা হয় সে একটি স্মরণীয় দিন। কলিকাতার সমস্ত ভদ্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে জোড়াসাঁকোয় নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া একটা রূপার থালায় নগদ পাঁচশত টাকা

সাজাইয়া রাখা হইল। সভাস্থলে নাটক পঠিত হইল। পাঠান্তে ঐ টাকা পণ্ডিত মহাশয়কে প্রদত্ত হইল।

রামনারায়ণ তর্করত্ন ইংরেজি জানিতেন না। খাঁটি বাঙলায় এই সর্ব্বপ্রথম বিয়োগান্ত নাটক।

জ্যোতি বাবু বাঙালীর মধ্যে স্বদেশ প্রেম আনিবার জন্য হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা করেন। এবং শেষে ঠিক করিলেন যে, ভারতের বীরত্বগাথা লইয়া নাটক সৃষ্টি করিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। হয় ত এই একই প্রেরণা পরবর্ত্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে ছিল। এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি "পুরুবিক্রম" লেখেন। পরে তিনি "সরোজিনী" "অলীক বাবু" "অশ্রুমতী প্রভৃতি নাটক লেখেন। সরোজিনী পঞ্চম সংস্করণ ও অশ্রুমতী তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছিল।

তখন রবীন্দ্রনাথ ছেলেদের জন্য "বালক" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত করেন। ইহাতে জ্যোতি বাবু physiognomy ও phrenology বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং রামগোপাল ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির মাথার Sketch আঁকিয়া তাহার রেখা-বিচার করিয়া সমস্ত সিদ্ধান্ত গড়িতেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন বাঙলা ভাষার পুষ্টিসাধনে মন দিলেন। তিনি কৈশোরে ফরাসী ভাষা শিখিয়াছিলেন। তাঁহার ফরাসী ভাষার গুরু ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংস্কৃত ও অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এবং সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি মহাপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। পরে তিনি ফরাসী সাহিত্য হইতে অনুবাদের পর অনুবাদ করিয়াছেন। সেই প্রকার সংস্কৃত নাটকও তিনি বহুল পরিমাণে বাঙলাভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। প্রায় সমস্ত বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকের তিনি অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদ করিবার সময় তিনি প্রাণপণ করিয়াছেন সংস্কৃত কাব্যের রস, রূপ ও প্রাণ দিবার জন্য; কিন্তু দুর্ব্বল বাঙলাভাষায় গুরুগম্ভীর সংস্কৃত ভাষার অনুকরণ অসম্ভব। তবুও মাঝে মাঝে অনুবাদ অতি সুন্দর। শকুন্তলার প্রথম অঙ্কে,—

"দেহ যায় চলি আগে
পিছে পড়ি রহে মোর অস্থির পরাণ,
ধ্বজা যায় পুরোভাগে
উল্টা উড়ে বায়ু-মুখে ধ্বজের নিশান।

কিংবা—

নিতম্বের গুরুভারে
মন্থরগামিনী যবে ধীরে ধীরে যায়—
মনে হয় বুঝি বালা
বিলম্বিছে গতি শুধু বিভ্রম-লীলায়।

কিংবা তৃতীয় অঙ্কের শেষ কথা,—

"ওরে চক্রবাক্-বধূ, চক্রবাকের নিকট বিদায় নে—রজনী সমাগত"—মূলের রসকে সুন্দরভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

নীচে তাঁহার অনুবাদিত সংস্কৃত নাটকের একটী তালিকা দিলাম।—

অভিজ্ঞান-শকুন্তলা—কালিদাস
বিক্রমোর্ব্বশী—
মালবিকাগ্নিমিত্র
উত্তর রাম চরিত—ভবভূতি
কর্পূর-মঞ্জরী—রাজশেখর
বিদ্ধশালভঞ্জিকা—,,
চণ্ডকৌশিক— ?
ধ্যান ভঙ্গ—কালিদাস
কুমারসম্ভব ৩য় সর্গ
নাগানন্দ—শ্রীহর্ষ
প্রিয়দর্শিকা—,,
বেণীসংহার—ভট্টনারায়ণ
মুদ্রারাক্ষস—বিশাখদত্ত
মৃচ্ছকটিক—রাজা শূদ্রক
রত্নাবলী—শ্রীহর্ষ

প্রথম যৌবনে জ্যোতি বাবু নিত্য সন্ধ্যাকালে বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের লইয়া ইংরেজী হইতে তর্জ্জমা করিয়া গল্প শুনাইতেন। এই সময় হইতেই বোধ হয় তাঁর তর্জ্জমা করিবার অসীম শক্তি জন্মগ্রহণ করে। তখন শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী অবিবাহিতা। এই তর্জ্জমার গল্প শুনিয়াই তিনি গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন।

অনুবাদ-সাহিত্য আজ জগতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

ইংরেজী ভাষা অনুবাদের বলে এত প্রকাণ্ড ও বলশালী হইয়াছে যে, তাহার তুলনা নাই। ইউরোপে অনুবাদের সাহায্যে এক জাতি অন্য জাতির সহিত ভাবের আদান প্রদান করিতেছে।

বাঙলায় অনুবাদ সাহিত্য নাই। অবশ্য তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথম কারণ, ইউরোপ ধরা যাক্, যে সব ঘটনা রুষিয়ায় ঘটে ও রুষসাহিত্যে প্রকাশ পায় তার অনুকৃতি জার্ম্মাণী বা ইংলণ্ড বা ফ্রান্সেও ঘটে। এবং প্রত্যেক জাতির ভাষা-বিভাগ অন্য জাতির ভাষা-বিভাগেরই অনুরূপ, কারণ তাহারা প্রত্যেক জাতিই এক সভ্যতারই অঙ্গ। বাঙলা ভাষায় সেই সব কথা বা ভাব রূপান্তরিত করিতে হইলে প্রথম পরিভাষার অভাব ঘটে। দ্বিতীয়, ঘটনার পারিপার্শ্বিকতার খোলস বা প্রভাব থাকে না—এবং তৃতীয়ত বাঙলায় সাধারণ পাঠকের মন। Raskolnikoff বা Christophe-এর নাম শুনিলে তাহারা সাধারণত কেমন অন্যমনস্ক হইয়া যায়—সমস্ত অনুরাগ হারাইয়া ফেলে—intellectual acclimatization এখনও সাধারণ বাঙালীর শক্তির আয়ত্তের মধ্যে আসে নাই। তাই বাঙালী সাহিত্যিক বাঙলার এই মনোবৃত্তি সবিশেষ জ্ঞাত হইয়াই আপনার খেয়ালমত এবং সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য Raskolnikoff-এর স্থানে কোন বীরেন্দ্র ধীরেন্দ্র নাম দিয়া চালান। তাহাতে মূল গল্পের বিকৃতি যতই কেন হউক না—তাহাতে কিছু আসে যায় না।

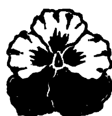
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কখনও এই সহজ পথে সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য নামেন নাই। তিনি হয় ত বুঝিয়াছিলেন যে, বাঙলা অনুবাদ-সাহিত্য বলশালী করিতে হইলে প্রথমত বহুলোককে শহীদ্ হইয়া মরিতে হইবে। তাহাদের ক্রমাগত চেষ্টার ফলে পরিভাষা বৃদ্ধি পাইবে—পারিপার্শ্বিকতার সৌন্দর্য্য অব্যাহত থাকিবে—অনুবাদের অঙ্গে কুঞ্চিতকুণ্ঠা তিরোহিত হইবে, তাই তিনি কখনও মূল হইতে বিচ্যুত হইতেন না। ভঙ্গী ও ভাব বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেন। যে কেহ Pierre Loti হইতে অনুবাদগুলি পড়িয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন—তিনি অনুবাদে কতদূর সুন্দর নিপুণ ছিলেন।

তিনি ক্রমাগত নির্ঝরিণীর ধারার মত বিভিন্ন ভাষা হইতে বিভিন্ন কথা ও গল্প অনুবাদের পর অনুবাদ করিয়া বাঙলা সাহিত্যে অনুবাদের গরিমা বাড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। এখনো আমাদের লেখকদিগের ও সাধারণের মধ্যে একটী ধারণা আছে যে, অনুবাদ করা শুধুই শ্রমসাধ্য তাহাতে কোন যশ নাই। জ্যোতিবাবু বহুপরিমাণে সে ভ্রান্তি দূর করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি

শেষ বয়সে মারাঠী ভাষা হইতে বালগঙ্গাধর তিলকের বিখ্যাত গীতার অনুবাদ করেন।

ইউরোপে এক একজন লোক অনুবাদ লইয়া এমনি জীবন কাটাইয়া দিয়াছেন—যশস্বী হইয়াছেন—সেই সব সাহিত্য দিয়া স্ব স্ব সাহিত্যের সীমানা বাড়াইয়াছেন। Alfred Sutro, Constance Garnett, Garret Underhill—Maeterlinck, Turgenieve, Dosteofisky, Benavante-এর সহিত বাঁচিয়া আছেন। জ্যোতিবাবুর অনুবাদের বিষয়গুলি বড়ই বিক্ষিপ্ত। যদি তিনি Constance Garnett কিংবা Sutro ইত্যাদির মতন কোন একটী বিশেষ সাহিত্যিকের সমস্ত রচনা অনুবাদ করিতেন—তাহা হইলে হয় ত অনুবাদ-সাহিত্য তাঁহার জীবদ্দশাতেই স্থায়ী মূর্ত্তি গ্রহণ করিত। বাঙালী হয় ত ভুলিয়া যাইবে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কি অনুবাদ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহাই স্মরণ রাখিবে।

অনুবাদ-সাহিত্যে তিনিই প্রথম শহীদ। তিনি এই কারণে পূজ্য। সাহিত্যে অনুবাদকে স্থান দিতেই হইবে। তাহা না হইলে বাঙলা সাহিত্য অপরিপুষ্ট হইয়া থাকিবে। বাঙলার মাটী বড় উদার, সে সকল বীজকে আশ্রয় দেয়। বাঙালীর অন্তরে এক অতিকুটুম্ব আছে—যে অপরকে আপনার করিতে বেশী সময় চাহে না—বাঙালীর ভাষা কবে দূরকে নিকটে আনিবে,—তাহার প্রয়াগ-তীর্থে বিশ্বরাজের দেউল উঠিবে।



স্মৃতির পরশ

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'শান্তিনিকেতন' আর শান্তিধাম—এক বীরভূঁইয়ে, আর এক রাঁচীতে। এই দুটি জায়গা গুটিকতক দিনের সঙ্গে আমার মনে জড়িয়ে আছে।

পর্ব্বত-শিখরে একগাছি মালতী মালার মতো জড়ানো "শান্তিধাম', আর উদয়াস্ত দিকচক্রবাল স্পর্শ ক'রে শান্তিনিকেতনের অবাধ উদার প্রান্তর—এ এক ভাবে মনকে টানে, ও এক ভাবে মনকে টানে। ঘর এবং বাহির এই দুয়ের সম্পর্ক নিয়ে দুটি জায়গা মধুর হয়েছে আমার কাছে। শান্তিধামে ঘরের একটি মানুষের হাসিমুখ দুঃখ ভুলিয়ে দিলে, শান্তিনিকেতনে ঘর-বাহির দুয়ের স্পর্শে এক হয়ে প্রাণে লাগলো। 'শান্তিধাম'—তার একটি মানুষ, একটি হরিণ, একটি ময়ূর নিয়ে বিচিত্র হল আমার কাছে, আর শান্তিনিকেতন' তার অনেক মানুষ অনেক কর্ম্ম অনেক বিচিত্রতা নিয়ে একটি ঘরের মতো ঘিরে ধরল আমাকে। দুটি জায়গা স্বতন্ত্র হলেও শান্তির মধ্যে দু'জায়গাতেই ডুব দিয়ে ফিরল মন।

শান্তিধামে গিয়ে দেখলেম, আমার পিতৃব্য (৺ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর) আমি যা ভালবাসি তাই নিয়ে বসে আছেন—পাহাড়, পাহাড়ের উপর মন্দির, সেখানে হরিণ রয়েছে, ময়ূর রয়েছে, পর্ব্বতের একটি গুহা রয়েছে—যেখানে চুপটি ক'রে সারাদিন ব'সে থাকি, ঘর রয়েছে পাহাড়ের উপরে, সেখানে ছবি আছে গান আছে, ঘরের ধারে বাঁধানো গাছ-তলা আছে। ঘরে রয়েছেন যাঁকে ভালবাসি যাঁদের ভালবাসি সেই সব আপনার লোক! চাকর-বাকর কর্ত্তাবাবুর এতটুকু ভাইপো বলেই আমাকে দেখে, অচেনা একজন বয়স্থ বাবু ব'লে মনেই করে না। আমাকে সঙ্গে নিয়ে তারা কর্ত্তাবাবুর পোষা হরিণ দেখায়, পাখী দেখায়, নদী দেখায়, মাঠ দেখায়, ফলের গাছ দেখায়, ফুলের তোড়া বানিয়ে দেয়। তাদের দেখে বোধ হয়, যেন আমাকে রূপকথা শোনাতে পেলে মনটা তাদের খুসি হয়। তাদের চোখের দৃষ্টিতে আমার বয়সের অনেকখানি আমায় ছেড়ে পালায়, মনে হয় আমি যেন ছোট ছেলে, কোন একটা স্কুলের ছুটিতে ঘরে ফিরেছি। দুষ্ট ছেলে পাছে পাহাড়ে দৌড়ে উঠতে প'ড়ে যাই, দুইবেলা কাকামশায় সাবধান করেন—যাছে উঠো পাহাড়ে! ছবি আঁকা শেখা হচ্ছে

কেমন, কাজকর্ম ঠিক করছি কিনা এও বার বার প্রশ্ন হত। ওজায়গাটা ভাল, ওখানে বেরিয়ে এসো, মস্ত একটা মন্দির দেখবে, ওই ওদিকে মস্ত একটা রাজার বাড়ি আছে, বুড়ো রাজার মস্ত দাড়ি, সে হুকো খায়; ওপাশটায় যেও না জায়গা ভাল নয়, রাতে ওপাগড়টার কাছে বাঘ আসে—এমনি ছোটছেলের মতো আমায় ডেকে কথাবার্তা। বয়স ভুলিয়ে দেয় এমন আদর, জীবনের ক্লান্তি মিটিয়ে দেয় এমন বাতাস আর আলোর মধ্যে আমার পিতৃব্য ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি মনে এখনো জড়িয়ে আছে।

শান্তিনিকেতন—সেখানেও এমনি আয়োজন আমার জন্যে—পথ চলতে বয়েসটা ধুলো হয়ে হাওয়াতে উড়ে পালায়, হরিণের বদলে ছুটে আসে হরিণচোখ ছোট ছোট ছেলেরা—আমার ছাতা কেড়ে নেয়, লাঠি ধরে টানাটানি করে, নিয়ে চলে আম-বাগানের মধ্যে দিয়ে শাল গাছের বেড়া ঘেরা ছোট ছোট ঘরের মধ্যে—সেখানে ছবি আছে, গান আছে, হাসি আছে, গল্প আছে ছেলেতে বুড়োতে নয়—ছেলের সঙ্গে আর একজনের—স্কুলের ছুটী-পাওয়া ঘরে-ফেরতার। মা বসে আছেন সেখানে—ঠিক সময়ে খাবার ঠিক সময়ে স্নান না করলে চাকর ছোটে মাঠের থেকে আমায় ধরে আনতে! শুকনো নদীতে নুড়ি কোড়াব সে কত, চাঁদনী রাতে ছাতে বসে রূপকথা, তাও শেষ হয় না। ওস্তাদজীকে ধরি, ওস্তাদজী গান গান্—অমনি ওস্তাদজী তানপুরো নিয়ে বসেন, মাষ্টার মশায় দরজার পাশ দিয়ে একবার উঁকি দিয়ে যান, ভয় হয় বুঝি বলে দেবেন! পুরোনো চাকর এসে বলে, কর্ত্তাবাবু ডেকেছেন। কাপড়ের ধুলো ঝেড়ে সেখানে ভাল-মানুষটি হয়ে গিয়ে বসতে হয়, বাড়ীর খবর দিতে হয়, কে কি করছে কেমন আছে, তন্ন তন্ন খবর, তারপর বৌ-ঠাকরুণ থালা সাজিয়ে জল খেতে ডাকেন। এর উপরে আবার পাঠশালার গুরু মশাই হয়ে খেলা, সুরুল গাঁয়ে গিয়ে চাষি-চাষি খেলা—তরকারি তোলা, ফল পাড়া! গাছের উপরে ঘর আছে, সেখানে কাঠ-বেরালের মতো ওঠা-নামা, দাওয়ায় বসে তেপান্তর মাঠের দিকে চেয়ে, যেমন ছেলেবেলায়, তেমনি আজও মাদুরে পড়ে থাকা, গুরু-পত্নীর ঘরে ঘরে খেয়ে বেড়ানো! শহর ছাড়া গ্রাম ছাড়া রাঙামাটির পথে বাঁশি বাজছে কোন্‌খানে, খুঁজে খুঁজে বাঁশিওয়ালাকে গিয়ে ধরা। দিক বিদিক বিস্তৃত শান্তিনিকেতনের উদার প্রসারের মধ্যে আপন-পর—দুয়ের সঙ্গে সুখে থাকা শান্তিতে থাকা। এই দুটি পরশ এখনো অনুভব করছে মন, শান্তিপারের পরশ আর শান্তিনিকেতনের পরশ।

পঞ্চশর

(কসৌলিয়া—দরদিয়া)

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

সর্দ্দার ফিন মাতোয়ালা ভইল বা!

সত্যি নাকি ?

হাম্ ক্যা ঝুট্ বোলি! ছোটকীকেত মারত বা।

এই রাস্তাটির নাট্যখানি তাহলে আরম্ভ হয়েছে! সময় হয়েছে বটে! সুরকীর চৌবাচ্চা ভর্ত্তি হয়ে গেছে। পেষাই-জাঁতা নীরব হয়েছে। খোয়া ভাঙা শেষ হয়েছে। গাড়োয়ানরা শেষক্ষেপ দিয়ে এসে গাড়ী খুলে দিয়েছে। নদীতে মজুর-নারীদের প্রসাধন সারা হল। আর কাজ নেই। জীবনটা বড় একঘেয়ে নয় কি ?

সুতরাং সর্দ্দার তার দুই পত্নীর একজনের ওপর মৌতাতের তাতটুকু সঞ্চারিত ক'রে দিয়ে সন্ধ্যাটা একটু সরস ক'রে তুলতে চেয়েছে বই ত নয়!

আমারো জীবনটা একঘেয়ে হয়ে এসেছিল, তাই একটু মুখ বদলাবার চেষ্টা করেছি।

বন্ধু যে দু'একজন এখনো আসে যায়, তারা জিজ্ঞাসা করে—একি ছেলে মানুষী হচ্ছে!

বলি—অনেকদিন কাগুজে জীবন কাটালুম, এবার মাটি থেকে—সত্যিকারের মাটি থেকে রস টেনে ফুটে উঠ্তে চাই।

তারা বলে—কিন্তু এ যে নোংরা মাটি।

তবুও পাথরের চেয়ে সরস সত্য।

সত্যি এ রাস্তাটি ভালো লাগে। যে সব অগণন নাড়ীতে নগরের প্রাণধারা বইছে, তার একটার ওপর হাত রেখেছি মনে ক'রে একটা অকারণ গর্ব্ব অনুভব করি। মনে হয়, যেখানে সত্যিকারের মানুষের সংযোগে ও সংঘাতে এই বিপুল নগরের প্রতিদিনের কাহিনী বিচিত্র হয়ে উঠেছে, সেখানে ব'সে এত দিনের জড়তা থেকে মুক্তি পেয়ে বাঁচলুম।

বন্ধুরা বলে—তুমি এমন গোঁড়া ব্যবসাদার হয়ে বসবে কখনো আশা করি নি। সেই মামুলি উত্তর দিই—পৃথিবীতে একমাত্র আশাতীতই আশা করা সার্থক হয়।

কিন্তু সর্দ্দার যেন একটু বাড়াবাড়ি করছে মনে হল। গিয়ে দেখলাম, বেশ ভীড় জমে গেছে। সর্দ্দারের দ্বিতীয় পক্ষ প্রাণপণে তার পা জড়িয়ে ধ'রে উচ্চস্বরে যে সব সম্ভব ও অসম্ভব বিশেষণ তার প্রতি প্রয়োগ করছে সেগুলির সঙ্গে পা জড়িয়ে ধরার মত পতিপ্রাণতার নিদর্শনের সামঞ্জস্য করা একটু কঠিন বটে! কিন্তু একান্ত স্বামী ভক্তিতে যে, সে পা জড়িয়ে ধরে নি এবং গলা জড়িয়ে ধরে সমান ধস্তাধস্তি করবার ক্ষমতা থাকলে শুধু পা জড়িয়ে ধ'রে দুর্ব্বল প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা সে যে করত না, তা এ পাড়ার বাসিন্দা না হলেও বুঝতে বেশী দেরী হয় না: শুধু নিরুপায় আক্রোশেই সে স্বামীর চরণ, মারের ওপর মার খেয়েও, ছাড়তে চাইছিল না। সর্দ্দার এই অনন্যশরণা প্রেয়সীর আলিঙ্গন স্পর্শ থেকে মুক্ত হবার নিষ্ফল হাস্যোদ্দীপক চেষ্টায় সমবেত দর্শকের প্রচুর স্ফূর্ত্তির খোরাক জোগাচ্ছিল। সর্দ্দারের মাত্রাটা বোধ হয় আজ একটু বেশী পড়েছিল। এখন বাধা দিতে যাওয়া নিষ্ফল।

পাশেই পাঁচু-শা তার শীর্ণ শয়তানের মত দেহ যথাসম্ভব লম্বা ক'রে খয়ড়া গাড়োয়ানের ঘাড়ের ওপর দিয়ে সাপের মত ফণা উঁচিয়ে এই উপাদেয় তামাসা—ছানি-পোড়া চোখের ক্ষীণদৃষ্টিতে যথাসম্ভব গ্রাস করছিল। জিজ্ঞাসা করলাম—আজকের মামলাটা কি?

বুড়ো একবার আমার দিকে ফিরে চেয়েই আবার মুখ ফেরালে। আমার প্রশ্ন তার কানেই যায় নি, তা ছাড়া এই রসাল তামাসার একটি মুহূর্ত্ত থেকেও সে বঞ্চিত হতে চায় না। এর জন্য সে তার ভুসির দোকান পর্য্যন্ত ছেড়ে এসেছে। কিন্তু পেছন থেকে কে উত্তর দিলে—

মাতাল হয়ে সর্দ্দার আজ নাকি ছোট্‌কীর ঘরে উপস্থিত হয়ে তাকে বাতাস করতে বলে এবং ছোট্‌কী এতদিনের অবহেলার প্রতিশোধস্বরূপ তাকে বড়্‌কীর ঘরে যেতে সদুপদেশ দেয়। দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যক্রমে বড়্‌কী আজ অনুপস্থিত। তাই থেকে বচসা ইত্যাদি।

সর্দ্দারের কনিষ্ঠা স্ত্রীর চেয়ে জ্যেষ্ঠার প্রতি একটা অস্বাভাবিক পক্ষপাতিত্বের সংবাদ শুনেছিলাম বটে কিন্তু আপাতত সর্দ্দারের গৃহ-বিবাদের কারণ সম্বন্ধে কোন কৌতূহল আমার ছিল না।

যে অযাচিতভাবে কৌতূহল নিবারণ করতে দ্বিধা করে নি তাকে হঠাৎ দ্বিধা পরিত্যাগ ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে ফেল্লাম—তুমি কি এই পাড়ায় থাক নাকি?

কুলি-রমণী হলেও এতখানি রূপকে কিছু মর্য্যাদা না দিয়ে পারলাম না।

সে এবার একটু সপ্রতিভ হাসি হেসে স'রে গেল। দৃষ্টির ভাষা বোঝবার জন্যে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। ট্যাণ্ডেল কাছে এগিয়ে এসে চোখের ইসারা করে বল্লে—

ও আক্কুর বাড়ী থাকে হুজুর।

আক্কুর আবার বাড়ী হল কবে? লোকের গদি-ঘরের রকে শুয়ে ত চিরকাল কাটালে!

হাঁ হুজুর, ও আজ কাল পাঁচু-শা'র দোকানের পাশের ঘর দুটো নিয়ে আছে।

রাত্রে দোতালার বারান্দায় বসে অন্ধকারে নদীর ঘাটে-বাঁধা ইটের ভরায় চুল্লির ক্ষীণ রক্তাভ আলোয় মাঝিদের রান্না বাড়ার ব্যস্ততা অন্যমনে লক্ষ্য করছিলাম। এই মাটির দোতালাটি সুরকী মিলের সাবেক মালিক ঝাঁকড়া অশ্বত্থ গাছটির তলায় ঠিক নদীর ওপরেই তৈরী করেছিল। দোতালার বারান্দায় বসলে এই বাঁকা ছোট্ট নদীটি বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায় এবং ওপারে মাড়োয়ারী ধনীর সুবৃহৎ বাগানের স্নিগ্ধ রূপগন্ধ ও বায়ু বিনামূল্যে উপভোগ করা যায়। অশ্বত্থ গাছটির তলায় নদীর কিনারায় এই অনাড়ম্বর মাটির দোতালাটি ভারী চমৎকার মানায়। এই রসবোধ থাকার জন্যেই বোধ হয় ভূতপূর্ব্ব কলের মালিক ব্যবসায় ফেল হয়ে আমাদের ঋণশোধ করতে পারেন নি। শেষে কলটি আমাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। তারপর নদীর ধারের এই মাটির দোতালাটিই একদিন আমায় আকৃষ্ট করে এবং এই লাভহীন ব্যবসার স্বত্ব বিক্রী না ক'রে ফে'লে একদিনের খেয়ালে এই দোতালায় উঠে আসি। তারপর থেকে এই কলের নাভিশ্বাসটুকু কোন রকমে বজায় রাখবার চেষ্টাই করছি। মিশির-জি গদি-ঘরের রকে ব'সে ডিবিয়ার আলোয় সুর ক'রে রামায়ণ পড়ছে। নিকটের সেড্ থেকে শ্রান্ত বলদ ও মোষেদের নিঃশ্বাস শোনা যাচ্ছে।

অন্যদিন এই মৃদু নিঃশ্বাসধ্বনি আর অন্ধকারের ভেতর দিয়ে দূরের মিণ্টো ব্রীজের ওপরকার আলো ও চলন্ত ট্রাম মোটর গাড়ির অস্পষ্ট শব্দ, আর ওপারের বাগানের গাঢ় কালো ছায়া, এই সমস্ত মিলে আমার বিশ্রামটিকে বেশ একটি সুমধুর সঙ্গীতের মত ঘিরে থাকে। আজ কিন্তু কেন জানি না বড় অস্বস্তি বোধ হচ্ছে।

গাড়োয়ান, কুলি ও ঠিকাদারের সঙ্গীতের মজলিশ আরম্ভ হল। শুনি হিন্দুস্থানীরাই এককালে ভারতবর্ষে সঙ্গীতের চরমউৎকর্ষ সাধন করেছে—কথাটা সত্যি হতে পারে কিন্তু এ কথাটাও সত্যি, সঙ্গীতকে এমনভাবে খুনখুন করতেও আর কোন জাত পারে নি। এই বিকট চামড়া-ঢাকা কাঠের খোলের আওয়াজের তালে তালে শার্দ্দূল ত্রাসস্বরে যে বীভৎস নিদ্রাহরণ সুরের আলাপ চলছে, তা সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আর্ত্তনাদ ছাড়া আর কিছু নয়।

আরো অস্বস্তিবোধ হচ্ছে বোধ হয় এই গুমোটের জন্য। অশ্বত্থগাছের পাতা-গুলি গভীর আলস্যের শিথিলতায় স্থির স্তব্ধ হয়ে আছে। কতকগুলিতে পথের গ্যাসের বাতির আলো এসে পড়েছে।

হঠাৎ মনে হল, গত আষাঢ় থেকে আশ্বিন পর্য্যন্ত অম্বু গোপার জমীতে তার বলদ ও গাড়ী রেখেছে, তার ভাড়া এখনো আদায় করা হয় নি। কাল সকালেই অকর্ম্মা সরকারটাকে ধমকে দিতে হবে।

খানিকবাদে কিন্তু নিজের মনেই হাসলাম। নিজের সঙ্গে ধাপ্পাবাজি চলে না।

সকালে গদীতে বসেছিলাম, হঠাৎ দরজার দিকে চেয়ে খাড়া হ'য়ে ব'সে সরকারকে জিজ্ঞাসা করলাম—রায় কোম্পানীর মাল পাঠান হয়েছে?

বাবু!—দরজা থেকে ডাক্ এল।

সরকার খাতা থেকে মুখ তু'লে দরজার দিকে চাইতেই ধমক দিয়ে বল্লাম—আমি যা জিজ্ঞাসা করলাম, কানে গেল?

সরকার একটু বিমূঢ় হয়ে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা কল্লে—আজ্ঞে?

আজ্ঞে কি?—রায় কোম্পানীর মাল পাঠান হয়েছে?

দরজা থেকে আর একবার ডাক এল—বা—বু!

সরকার একবার সেদিকে চাইতে গিয়েই অপ্রস্তুত হয়ে আমার দিকে ফিরে বল্লে—হয়েছে, আজ্ঞে এইমাত্র পাঠালাম।

তার বিব্রত বিমূঢ় ভাব দেখে হাসি আসছিল। কিন্তু গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে বল্লাম—আর আশুবাবুদের সুরকী পাইল করবার লোক পাঠান হয়েছে?

এবার সে দরজার দিকে চাইবার লোভ সংবরণ ক'রে উত্তর দিলে—আজ্ঞে না, এখনি হ'বে।

এর আগেই পাঠান উচিত ছিল। ব'লে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

সে ঘাড় বাঁকিয়ে অসীম কৌতুকভরা দৃষ্টিতে একবার আমার যাবার পানে তাকিয়ে ঈষৎ হাসল মনে হ'ল। ... বোধহয় আমার গাম্ভীর্য্যকে বিদ্রূপ করল।

সরকার বেচারীর স্খলনটুকু ক্ষমা করা যেতে পারে। নারীর একটা রূপ আছে, তাকে ঘৃণা করা হয় ত যায়, কিন্তু তার প্রতি উদাসীন হওয়া যায় না। এ সেই রূপ।

কিন্তু তাই ব'লে নিজেকে নত করব না। কল-ঘরের দিকে চল্লাম।

খানিক দূর গিয়ে মনে পড়ল লাঠিটা গদিতে ফেলে এসেছি। সত্যি এ ভুল অনিচ্ছাকৃত। একবার মনে হ'ল, গিয়ে কাজ নেই কিন্তু তারপরই মনে হ'ল শেষকালে ওই একটা কুলি-নারীর রূপকে ভয় করতে হ'ল!

সরকার তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কি কথাবার্তা বলছিল। আমাকে দেখে অকারণে থত মত খেয়ে বল্লে—এই যে বাবুকেই বল না।

কি হয়েছে?

সরকার কম্পিতস্বরে বল্লে—কসৌলিয়া বলছে কি—

কে কসৌলিয়া?

আজ্ঞে এই আন্তুর বৌ—

সরকারের অসহায় বিব্রত অবস্থা দেখে করুণা হচ্ছিল। কসৌলিয়া সরকারের সাহায্যে এগিয়ে এসে বল্লে—মেরে নাম কসৌলিয়া হ্যায় বাবু-সাব। হ্যাম আন্তুকে পাশ . . .

তারও দৃষ্টি নত হয়ে এল। আমি বাধা দিয়ে বল্লাম—

আচ্ছা বুঝেছি, তা আমার সঙ্গে কিসের দরকার?

—পাচু-শা'র জমির পেছনে আমার কাঠাতিনেক জমি পড়ে আছে। দুধের ব্যবসা করবার জন্যে কসৌলিয়া সে জমি ভাড়া নিতে চায়। সেখানে গোয়াল-ঘর হবে। এই দরকার।

আন্তুর প্রতি এতই দরদ, এর মধ্যে তার পয়সার সুসার করবার চেষ্টা!

তবু ভাবলাম আপত্তি করব না, কিন্তু সরকার ওকালতি করতে এল।

ও জমিটা বাবু অনেক দিনই ত অমনি পড়ে আছে, তাই বলছিলাম যে, বাবুর কোন আপত্তি হবে না।

কসৌলিয়ার দিকে ফিরে বল্লাম—সরকারকে কত ঘুস্ দিয়েছ বল ত?

সরকার নির্ব্বোধের মত আমার দিকে চেয়ে রইল। কসৌলিয়া একটু মুচকে হাসলে।

না, ও জমিতে আমার 'আধ্লা' জমা করতে হবে। ভাড়া হবে না।

ছড়িটা নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে মনে মনে বল্লাম, তোমাদের, কলা-কৌশলের অন্ত নেই কিন্তু নিজেদের শক্তিতে অত দৃঢ় বিশ্বাস থাকা ভাল নয়। আজকের হাসিটা তোমার বৃথাই অপব্যয় হল কৌসলিয়া!

পাঁচু-শা দোঁকানের সামনে ব'সে বুক ভ'রে কাশ্‌ছিল। ও নাকি বিশ বচ্ছর ধ'রে এই রকম ক'রে কাশ্‌ছে, তবু ওই শীর্ণ বুকের পাঁজরাগুলোর জোড় খুলে যায় নি! আমায় দেখতে পেয়ে কাশির মধ্যেই একটা হাত তুলে থামতে ইসারা করলে।

পাঁচু-শা'র কাছে ভদ্রতা আশা করা আহাম্মুকি, সুতরাং আপনা হতেই দোকানের টুলটা টেনে নিয়ে বসলাম, তার কাশি থামবার অপেক্ষায়। রাস্তার ওপারের কলে পেতলের কলসীতে জল তুলতে তুলতে লেটুয়ার কিশোরী বৌটা এ-দিক ও-দিক চাইছিল একটু চঞ্চল ভাবে। ক'দিন থেকেই বোধ হয় একটু চঞ্চলতা ওর লক্ষ্য করছি।

ও-দিকের কলঘর থেকে ট্যাণ্ডেল ডাক্‌লে—এ দরদীয়া!

ট্যাণ্ডেল আমায় এখনো দেখতে পায় নি বোধ হয়।

দরদীয়া কলসীটা কাঁখে তু'লে নিয়ে ভ্রূকুটি ক'রে বল্লে—কাহেলা?

তোহার বহিন্ হও?

বহিন্ লেকে কা ভই?

হাম সাদী কর্‌ব।

দরদিয়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে আমার দিকে ফি'রে একবার বোধ হয় নীরবে নালিশ জানিয়ে কলসীর ভারে ভারকেন্দ্র পরিবর্ত্তনের ফলে অসমমাত্রিক ছন্দে চল্‌তে চল্‌তে বল্লে—এগ্‌গো বকরী হও।

ট্যাণ্ডেল গলা একটু চড়িয়ে বল্লে—"উ ত তোহার শাস লাগি।

লেটুয়ার বৌ আরো জোরে উত্তর দিলে—তোহার নানী!

পাঁচু-শা কাশি থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—তুম্ মুসলমান হ্যায়, না হিন্দু হ্যায়?

পাঁচু-শা তার বার্দ্ধক্য তার রোগ ও তার দুর্মুখের জোরে সাধারণ ব্রিটিশ প্রজার আইনসঙ্গত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সীমা মাঝে মাঝে লঙ্ঘন ক'রে যায় এবং সে বিষয়ে তাকে সাবধান করতে যাওয়া মূর্খতা।

হেসে বল্লাম—হিন্দু হ্যায়।

তব্ উ মুসলমান শালেকো উঠা দেতো নেহি কেঁও ?

বুঝলাম কাল যে খয়রার পিঠে ভর দিয়ে তামাসা দেখতে পাঁচুর বাধে নি, আজ পথের ওপারে তারই গৃহের অবস্থিতিটা কোন মতে পাঁচুর বরদাস্ত হচ্ছে না।

বল্লাম—ও মুসলমান যদি তোমার শালাই হতে পারল তবে ওকে আর ওঠাবার প্রয়োজনটা কি ?

কথাটা ভাল ক'রে বোধ হয় পাঁচুর বোধগম্য হল না, বল্লে—

নেই উঠাওগে ! উ শালা কল্‌কো পানী ছু দেতা, হামলোগোঁকা জাত্ মার দেতা, তব্ ভি নেই উঠাওগে ?"

বুঝিয়ে বল্লাম যে, আমার জমি থেকে উঠিয়ে দিলেও সরকারী কল থেকে জল নেবার অধিকার তার কেড়ে নিতে ত পারি না। পাঁচু এবার অন্য সুর ধরলে। বল্লে—ও যা তা মাংস রাঁধে, তার গন্ধ দোকানে আসে।

বল্লাম—হাওয়ার গতি এদিকে হ'লে গন্ধ ত আসবেই।

এবার পাঁচু চটে গিয়ে সমস্ত বাঙালী জাতটারই ওপর তার বহুদিনের গবেষণামূলক মন্তব্য প্রকাশ করলে—

বঙ্গালী লোক ত সব খৃষ্টান্ হো গয়া। আচার বিচার কুছ্ হ্যায় তুম লোগোঁকো ! আব্রাণসে অর্দ্ধভোজন হোতা কি নেই ?

এর আর কি উত্তর দেব ? বল্লাম—উঠি তা হ'লে পাঁচু। আপাতত খয়রাকে তুলতে পারলুম না।

পাঁচু-শা উত্তেজিত হয়ে উঠে বল্লে—উঠাওগে নেই ? তব্ ইয়াদ রাখ্‌না, হাম পাঁচু-শা হ্যায়, উস্‌কো ঘরমে হাম আগ্ লাগা দেঙ্গা।

আমায় হাসতে দেখে আরো চটে বল্লে—ইয়ে জবান্ সে ঝুট্ নেই নিকাল্‌তা; জরুর আগ্ লগা দেঙ্গা।

খসৌলিয়া দোকানের সম্মুখ দিয়ে চলে গেল।

'আগ লগা দেঙ্গা'-টুকু বোধ হয় সে শুনতে পেয়ে ছিল, অন্তত তার চক্ষের দৃষ্টিতে ব্যঙ্গের আভাষ ছিল।

কলঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম। ট্যাণ্ডেল সেলাম ক'রে উঠে দাঁড়াল।

আর কলটল বেগ্‌ড়ায় নি ত ?

না হুজুর।

কি 'আর্মেচার' মেরামত করতে দিয়েছিলে, হয়েছে ?

হাঁ হুজুর, তার বিল হয়েছে পঞ্চাশ টাকা।

তোমার কাজ ত দেখি বেশ সুখের ; ব'সেই থাক সারাদিন।

তা আগের চেয়ে হ্যাঙ্গাম কম বলতেই হবে। কয়লার ইঞ্জিনে যখন কাজ করেছি তখন এক দণ্ডের সোয়াস্তি ছিল না হুজুর। একটা না একটা ফ্যাসাদ আছেই। আজ ধোঁয়া চিম্নি দিয়ে ভালো করে না বেরিয়ে কলঘরেই জমছে, কাল বয়লারের 'সেফ্‌টি ভাল্‌ভ' খারাপ হ'ল। আর এই গ্রীষ্মে আগুনের তাতে রোজ ছ'সের ক'রে রক্ত জল হয়ে গেছে, তার চেয়ে এ ঢের সুখের কাজই বলতে হবে। তবে কি জানেন হুজুর—

এবার ট্যাণ্ডেল আবার সামলে নেবে বুঝলাম।

—এই ইলেক্‌ট্রিকের কাজে বিপদ্‌ আছে, প্রাণ নিয়ে টানাটানি—একটি তার অসাবধানে ছুঁয়েছ কি আর দেখতে হবে না . . . নইলে কি আর অমনি এত গুলো টাকা মাইনে খাই হুজুর !

'একাজ বেশ সুখের' বলার ভেতর মাইনে কমাবার প্রস্তাব ট্যাণ্ডেল কোথায় খুঁজে পেল বুঝলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি কতদিন এখানে কাজ করছ ?

সে একটু ভেবে বল্লে -আমার বড় ছেলের বয়স হুজুর, এই তেরো বছর। তার ভেতর কত কিছুই না দেখলাম হুজুর, কত বেটা ন্যেড়ো নেংটি প'রে এসে এখন বড়লোক হয়ে গেছে। এই যে আস্তু, হুজুর, প্রথম যেদিন এল—

ট্যাণ্ডেল একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নিল।

ওই সাতফুট দেহে দু'ফুট কাপড়ও ছিল না। তখন কেশববাবু গোলার মালিক। একদিন সকালবেলা কলের ফিতে ছিঁড়ে গেছে, আমি আর কেশব বাবু কুলি লাগিয়ে ফিতে লাগাচ্ছি। আস্তু এসে বল্লে—নোকরী মিলে গা বাবু-সাব ?

কেশববাবু বোধ হয় শুনেও ভ্রূক্ষেপ করেন নি।

আস্তু বার দুই তিন বল্লে—নোক্‌রী মিলে গা বাবু-সাব ?

শেষে বিরক্ত হয়ে কেশববাবু তার দিকে ফিরে বল্লেন—হাঁ মিলে গা, এই জাঁতাঠো ঘুমানে হোগা, শকেগা ?

আমরা হেসে উঠ্‌লাম্‌। কিন্তু খাঁটি ন্যেড়ো, ঠাট্টা বুঝল না। বল্লে—জরুর শকেঙ্গে।

আমরা আবার হাসলুম।

আমাদের হাসতে মানা ক'রে কেশববাবু তার দিকে ফিরে বল্লেন—তব্ ঘুমাও। দেখি ডাল রুটির চাল্লিটা।

হাঁ ক্ষমতা আছে বটে আঙ্কুর! ঘুরিয়ে দিলে জাঁতাটা।

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—একলা?

হাঁ হুজুর, এক্লা। তারপর আঙ্কু পাঁচআনা রোজে চামচ ধরার কাজে বাহাল হ'ল। সেই আঙ্কু আজ ঠিকাদার হয়ে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে ধরাটাকে সরা দেখছে হুজুর। সত্যি হুজুর, ওর বারফট্টাই আর সহ্য হয় না।

ট্যাণ্ডেলের এই আলাপের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটুকু বুঝতে পারা সত্বেও এবং এই আলাপ কোথায় গিয়ে শেষ হবে তা একটু আভাষে জানলেও এ আলাপ বন্ধ ক'রে দেবার মত মনের জোর খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

ট্যাণ্ডেল বোধ হয় চকিতে আমার মুখের ওপর তার দৃষ্টিটা বুলিয়ে কিছু পড়ে নেবার চেষ্টা করলে, তারপর গলা নামিয়ে আর একটু কাছে স'রে এসে বলতে লাগল—আপনারা ত খোঁজ রাখেন না হুজুর, ওই যে কসৌলিয়া ব'লে একটা মেয়েলোককে বাড়ীতে এনে রেখেছে তার ওপর কি জুলুমটাই না করে। কসৌলিয়াও কি থাকতে চায় হুজুর; শুধু একশ'টা টাকা আঙ্কু কবে ওকে দিয়েছিল, সেইটে শোধ না ক'রে চ'লে গেলে আঙ্কু ওকে কেটে ফেলবে শাসিয়েছে। সেই ভয়েই। . . . আর একবার মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে ট্যাণ্ডেল বললে—আমায় একশটি টাকা দিন হুজুর, ওই আঙ্কুর দাড়া ভেঙে কসৌলিয়াকে এনে দিতে . . .

আমার কঠিন দৃষ্টির সামনে সঙ্কুচিত হয়ে ট্যাণ্ডেল সুর বদলে বল্লে—পঞ্চাশ হলেও . . .

ধমক দিয়ে বল্লাম—চুপ ষ্টুপিড, ভবিষ্যতে যদি সাবধান হয়ে কথা কইতে না পার তাহলে এখানে তোমার চাকরি চলবে না,—বুঝেছ?

ট্যাণ্ডেল মাথা নীচু ক'রে হাত জোড় ক'রে বল্লে—আজ্ঞে হাঁ হুজুর!

•

মিণ্টোব্রীজের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে বসেছিলাম। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে ব্রীজের আলোগুলি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

অন্যমনে এই দুই অন্ধকার তীরের মাঝে স্বল্পালোকিত সেতুতে মানুষের ব্যস্ত চলাচল থেকে বোধ হয় জীবনের একটা রূপক টানবার চেষ্টা করছিলাম। রূপকটা কত দূর সয় তাই দেখছিলাম—

হুজুর!

আজ বারান্দায় না ব'সে বেতের চেয়ারটা টেনে এনে নদীর ধারে এসে বসেছি। বল্লাম—কি দরকার? এস।

ট্যাণ্ডেল কাছে এসে সেলাম ক'রে দাঁড়িয়ে বল্লে—হুজুরের একটু ভুল হয়েছে, তাই জানাতে এলুম।

খানিক চুপ ক'রে থেকে উত্তর না পেয়ে ট্যাণ্ডেল বল্লে—হুজুর, আর্শ্বেচার মেরামতের জন্যে পঞ্চাশ টাকার বদলে একটা একশ' পঞ্চাশ টাকার চেক্ দিয়েছেন ভুলে।

তাতে কি হয়েছে?

অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না। খানিক দাঁড়িয়ে থেকে ট্যাণ্ডেল বল্লে—সেলাম হুজুর, আসি তাহলে।

ট্যাণ্ডেল চ'লে গেল।

এতক্ষণ স্থির হয়ে বসেছিলাম। ট্যাণ্ডেলের দিকে মুখ পর্য্যন্ত ফেরাই নি। কিন্তু এবার ব'সে থাকা আর হল না, উঠে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে লাগলাম। আজ গুমোট কেটে গেছে, অশথ গাছের পত্রপুঞ্জের মাঝে অস্থিরতা জেগেছে। তবু কপালে অত্যন্ত উত্তাপ অনুভব করছিলাম। কয়েকবার পায়চারি ক'রে বেড়ালাম। হঠাৎ মনে হল, অশথ গাছের গোড়ায় অন্ধকারে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। এদিকটা একেবারে নির্জ্জন। সন্ধ্যার পর এই বাড়ীর এলাকার মধ্যে আমি ছাড়া জনপ্রাণী থাকে না; সুতরাং একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কে?

সে দাঁড়িয়েছিল, সে একটু নড়ল বোধ হয়, কিন্তু উত্তর দিল না।

আরো কাছে এগিয়ে গেলাম।

কে দাঁড়িয়ে? এ কি দরদিয়া! এত রাতে এখানে কি করছিস?

দরদিয়া একটু স'রে এল। তারপর থেমে থেমে বল্লে—

হাম গোইঠা লেনে . . .

সে জায়গার ত্রিসীমানায় গোইঠা অর্থাৎ ঘুঁটে ছিল না।

গোইঠা? এখানে গোইঠা কিসের?

দরদিয়া নীরবে নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ এই দরদিয়ার ক'দিনের অদ্ভুত আচরণগুলি মনে প'ড়ে গেল। এই আগের দিনই বিকালে সে খোয়া ভাঙা শেষ হলে এই নদীর ঘাট দিয়ে নেমে

আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে গেছে এবং আমি তার নিকটে গোলার ঘাট থাকতে এত দূরের ঘাটে স্নান করতে আসায় একটু বিস্মিত হয়েছি।

মনে পড়ল, ক'দিন ধরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎটা কিছু বেশী বার হয়ে গেছে, এবং অনেক সময়ে এমন স্থানে ও এমন সময়ে হয়েছে যেখানে ও যে সময়ে তার উপস্থিতি একটু বিস্ময়কর।

যৌবনের ছল ও কামনাকে আমি কৈশোরের চঞ্চলতা ও কৌতূহল ব'লে ভুল করেছি। বল্লাম—ওপরে আয়।

সে পেছনে পেছনে ওপরে এসে উঠ্‌ল এবং ঘরের আলোয় এসে চোখ নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

তার দিকে চেয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম—দরদিয়া, রুপেয়া নিবি?

সে আমার দিকে চোখ তুলে চাইল এবং খানিক বাদে ঘাড় নেড়ে জানালে যে নেবে।

একটা দশ টাকার নোট তার হাতে দিলাম। বিস্মিত হবারই কথা এবং সে বিস্ময় লুকোবার চেষ্টা করলে না। বল্লাম—এইবার বাড়ী যা, তোর শাস্ আবার খুঁজবে।

দশ টাকার নোট পেয়েও সে এত বিস্মিত হয় নি। কিন্তু খানিক বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে নির্ব্বোধের মত আমার দিকে চেয়ে থেকে সে মুচকে হাসল এবং তারপর চক্ষে কটাক্ষ হেনে আমায় বুঝিয়ে দিলে, সমস্ত রাত ঘরে না গেলেও তার শাশুড়ি তাকে খুঁজবে না, তাছাড়া আজত শাশুড়ি তার ভাতিজার বাড়ী গেছে।

গম্ভীর হয়ে বল্লাম—আচ্ছা শাস না খুঁজুক, এত রাত্রে আর বাইরে থাকতে নেই, বাড়ী যা। আর আমি এখুনি দরজা বন্ধ ক'রে বেড়াতে বেরুব কিনা।

সে এবার মুখ ভার ক'রে বল্লে—হাম ন যাই। হম তোহার কাম করি।

না, আমার কাম করবার লোক আছে, তুই টাকা নিয়ে বাড়ী যা। কাল হাঁসুলি গড়াতে দিস, আমি আরো কিছু টাকা দেব'খন।

আমি চাবির গোছাটা তুলে নিলাম।

তোহার রুপয়া তু লেহ্‌ল। তোহার রুপয়া কোন্ মাঙত?

নোটটা আমার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে আরক্ত মুখে সে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত পদে নীচে নেমে গেল। আমি নিজের মহত্ত্বে একটু হাসলাম।

এই নবযৌবনার কোন অঙ্গের সঙ্গে কোন অঙ্গেরই সৌষ্ঠব সম্বন্ধে মতের ঐক্য ছিল না।

সকালে ঘুম থেকে উঠে কিসের যেন একটা অভাব অনুভব করলাম, কোথায় যেন মস্ত বড় একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। বেলা বেশ হয়েছে। অশথ গাছের কটিদেশ পর্য্যন্ত সুরকি মিলের টিনের চাল ডিঙিয়ে রৌদ্র এসে পড়েছে। সুরকি মিলের দিকে চেয়ে বুঝলাম, এই ফাঁকটা মানসিক নয়,—'বাস্তবিক,' অর্থাৎ দু'বৎসর ধরে প্রতিদিন প্রভাতে ওঠবামাত্র যে বিপুল বিকট ঘর্ঘর ধ্বনি কর্ণপটাহকে অভিনন্দন করেছে সেই ধ্বনির অভাব। কল চলছে না।

এত বেলাতেও কল না চলার কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে তাড়াতাড়ি বেশ বদলে নীচে নেমে গেলাম। কলের সামনে দু'একজন কুলি চাম্চের ওপর ভর দিয়ে জটলা করছিল। জিজ্ঞাসা করলাম—কল চলছে না কেন?

ট্যাণ্ডেল জখম হুয়া হুজুর।

ট্যাণ্ডেল নাকি কাল রাত্রে কোথা থেকে প'ড়ে গিয়ে হাত ভেঙে শয্যাগত হয়ে প'ড়ে আছে।

ট্যাণ্ডেলের বাড়ী তখুনি যেতে হ'ল। সে ডান হাত ব্যাণ্ডেজ ক'রে বিছানায় প'ড়ে আছে। আমাকে ঢুকতে দেখে একটু মৃদু হেসে বল্লে—বসুন হুজুর। এ গরীবের বাড়ী, আপনার বসবার উপযুক্ত জায়গা কি আমরা দিতে পারি! দোষ নেবেন না হুজুর।

ব'সে বল্লাম—ব্যাপারটা কি?

আক্কেল সেলামী হুজুর! টাকাগুলো, আর এই হাতটা ফাউ।

খানিক চুপ ক'রে থেকে সে আবার বল্লে—কাল রাত্রেই গিয়ে ওই সয়তানীর সঙ্গে দেখা করি হুজুর। বেটি শোনবামাত্র রাজী হল। অনেক বেগ পেতে হবে ভেবেছিলাম। এত সহজে হবে আশা করি নি। তারপর সয়তানী আমায় একটু দাঁড়াতে ব'লে ভেতরে গেল আর আক্কুকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এসে বল্লে—আক্কুর সঙ্গে একটু পরামর্শ করলে ভাল হয় না কি?

ট্যাণ্ডেল চুপ করল।

তারপর?

তারপর আর কি হুজুর! আক্কু বল্লে—উ-বন্দোবস্ত তো ঠিক হ্যায়, আভি রুপেয়া দেখলাও।

ভাবলাম টাকা দিয়ে যদি আজ ত্রাণ পাই। টাকাটা তার হাতে দিলাম। টাকাটা নিলে হুজুর, সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের হাড়টা কাঁধ থেকে খুলে এল।

খানিক হেসে ট্যাণ্ডেল বল্লে—আর একটা কথা বলেছে হুজুর চ'লে আসবার সময়, কিন্তু সে আপনাকে আমি বলতে পারব না।

না বলতে পার, চুপ ক'রে থাক।

সব চেয়ে রাগ হচ্ছিল এই কাপুরুষ নীচটার ওপর।

কিন্তু আপনাকে সাবধান না করলে আমার অন্যায় হবে হুজুর, সময়ে বলতেই হবে। আক্কু শেষকালে বল্লে—নৌকর কা হাঁত তোড়া, আউর মনিবকো শির বাকী হ্যায়।—আমায় মাপ্ করবেন হজুর।

আচ্ছা! ব'লে বেরিয়ে এলাম।

খয়রা ঘরেই ছিল। বল্লাম—তোরা কি মরে আছিস্ নাকি রে?

সে লাফ দিয়ে উ'ঠে বল্লে—মরে আছি হুজুর! কার মাথা আনতে হবে বলুন না।

ঢের বাহাদুরী হয়েছে, থাক্। তোর ঘরের সামনে ব'সে তোকে অপমান করেছে, তাই কিছু করতে পারলি না আর মাথা এনে কাজ নেই।

বলুন না হুজুর, কোন্ বেটা অপমান করেছে, জ্যান্ত মাটির ভেতর পুতে ফেলব।

তার আগেই তোর ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে যে রে। তুই মুসলমান, তবু তোকে আমি উঠোব না, তাই তোর ঘর পুড়িয়ে দেবে।

কে? সে কোন্ বেটা?

এই আক্কু।

নিজের নীচতায় ও সস্তা দড়িবাজিতে হাসি পাচ্ছিল, ঘৃণাও হচ্ছিল। কিন্তু খয়রার উৎসাহ যেন কমে এল।

কিরে, আক্কু নাম শুনে ভয় পেলি নাকি?

খয়রা আগের চেয়ে নরম গলায় বল্লে—ভয় কি পাব হজুর, দুনিয়ায় কাউকে ভয় করি না কিন্তু আক্কুর চেয়ে দোষ আছে বাবু পাঁচু-শা'র। আমার মনে হয় বাবু, ওই পাঁচু শয়তান আসল বদমাস্। পাঁচুকে আমি একবার দেখে নেব।

আর খয়রার কাছে ভরসা নেই, তবু বল্লাম—হ্যাঁ, ওই বুড়ো অথর্ব্ব পাঁচুর আর কতটুকু জান্! আক্কুকে জব্দ করতে পারিস্ তবে বুঝি!

কেন পারব না হজুর, ওই পাঁচু-শা'কে ঠ্যাং উঁচু ক'রে কড়িকাঠে ঝুলিয়ে বিচুটি লাগাব, তবে আমার নাম খয়রা।

বিরক্ত হ'য়ে খয়রার দরজার দিকেই ফিরতেই পথের ওপর থেকে শুনলাম —বাবু, একটু মেহেরবানি ক'রে যদি পায়ের ধুলো দেন।

আস্তু তার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে।

ট্যাণ্ডলের কথা মনে প'ড়ে বুকটা অনিচ্ছায় একটু কেঁপে যে উঠেছিল এ কথা অস্বীকার করতে পারি না।

বল্লাম—এখন বসতে পারব না, একটু কাজ আছে।

আস্তু হাসি মুখে এগিয়ে এসে বল্লে—আজ্ঞে বেশীক্ষণ বসতে হবে না, দুটো বাৎ'চিৎ করবার ইচ্ছা আছে আপনার সাথে।

আস্তু ভাল করেই বাঙলাভাষা শিখেছিল কিন্তু উচ্চারণের দোষ তার যায় নি। সেই বিকৃত বাঙলায় তার বিদ্রূপ তীক্ষ্ণতর লাগছিল।

ভয় হ'ল পাছে ব'লে বসে—ভয় পাচ্ছেন নাকি বাবু!

বল্লাম—চল তাহ'লে। বেশীক্ষণ বসব না কিন্তু।

আস্তু ভেতরে ঢুকে চীৎকার ক'রে ডাক্‌লে—আরে কসৌলিয়া, জল্‌দি কুর্শি লে আও, বাবু মেহেরবানি কর্‌কে—

কসৌলিয়া একটা টুল এনে সামনে রেখে আস্তুর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় ক'রে মুচকে হাসলে।

বৈঠিয়ে বাবু।

বস্‌লাম এবং নিজের কাছে নিজের সম্মান বজায় রাখবার জন্যে সহজ স্বরে নিজের কথা পাড়লাম—তোমার ভাড়াটা ত অনেকদিন বাকী প'ড়ে আছে, কবে দিচ্ছ আস্তু! আষাঢ় থেকে আশ্বিন পর্য্যন্ত তোমার গাড়ী গরু সব ছিল গোলার জমিতে, মনে আছে ত?

খুব মনে আছে বাবু; কিন্তু ভাড়াটা মাফ্ কোরে দেবেন না বাবু?

কেন?

আমার আওরং ভি নেবেন আবার ভাড়া ভি নেবেন?

কসৌলিয়া দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, উচ্চস্বরে হেসে উঠ্‌ল।

বলবার কিছুই ছিল না। চুপ ক'রে ব'সে সইতে লাগলাম।

আস্তু বলতে লাগল—তা আপনি আমীর লোক। আপনি যদি চান বাবু, আমরা আর কি কোরতে পারি—আপনাদের মেহেরবানিতেই ত বেঁচে আছি।

বিদ্রূপের আঘাতের ওপর কসৌলিয়া একটু ক'রে হাসির বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

আমি উঠি আল্লু, আমার বসবার সময় নেই, তুমি ভাড়াটা দিতে ভুলো না।

ভাড়াটা তবু মাফ কোরলেন না বাবু? তা নিয়ে যান কসৌলিয়াকে। আমীরের ঘরে তবু সুখে থাকবে, তবে বাবু নোকর পাঠিয়ে ভালো কোরেন নি, ও ত বাবু পহেলা নিজের জন্যেই নিতে চেয়েছিল! আপনি আমীর লোক চান সে আলাহাদ কথা। আর ও নোকর, তাই ব'লে চাইবে! ওর হাতটা বাবু একটু মুচড়ে দিয়েছি। মোচড় খেয়েই ত বোলে দিল যে, আপনি পাঠিয়েছেন, ওর কোনো দোষ নেই।

তার বিদ্রূপগুলি কি রকম উপভোগ করছি, দেখবার জন্যে বোধ হয় আল্লু স্মিতমুখে আমার দিকে চাইল। তারপর কসৌলিয়ার দিকে চেয়ে বল্লে—বাবুর নজর খুব ভালো আছে, কসৌলিয়া ত বড়ী খপসুরৎ আছে!

আমি উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। কসৌলিয়া পেছন থেকে হেসে বল্লে—আরে বাবু ত হাম্‌কো ছোড়্‌কে চলা যাতা হ্যায়!

সে কি বাবু, চোলে গেলেন যে, তাহলে টাকাগুলো নিয়ে যান। মাল নেবেন না তবু টাকা দিয়ে যাবেন, সে কি হয়?

কসৌলিয়া মুখ বেঁকিয়ে হাসতে হাসতে টাকার তোড়াটা হাতে দিয়ে গেল!

বেরিয়ে পড়লাম। আল্লু পেছন থেকে বল্লে—ভাড়াটা আমি দিয়ে আসব বাবু।

এর চেয়ে ডান হাত স্কন্ধচ্যুত করে দিলে ভালো ছিল।

* * * *

দরদিয়াকে গোইঠা দিয়ে যাবার জন্তে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। সে আসে নি।





(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জন্মাবধি ক্রিসতফ-এর স্বাস্থ্য অত্যন্ত সুন্দর ছিল। কোন রোগ বড় সহজে তাহাকে কাবু করিতে পারিত না। উত্তরাধিকারসূত্রে এই অটুট স্বাস্থ্য সে তাহার পিতা এবং পিতামহের নিকট হইতে পাইয়াছিল। এই ক্রাফট বংশের কেহই ক্ষীণকায়, দুর্ব্বল, প্রাণশক্তিহীন জড়পিণ্ডবৎ ছিল না। জাঁ মিসেল এবং মেলশিয়োর কোন দিন আপনাদের স্বাস্থ্য লইয়া মাথা ঘামাইত না। অসুস্থ হইলেও তাহাদের প্রতিদিনের কাজের কোন ব্যতিক্রম ঘটিত না। শীত গ্রীষ্ম সমস্ত ঋতুতেই তাহারা ক্রোশের পর ক্রোশ হাটিয়া বেড়ায়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দারুণ বৃষ্টি বা রৌদ্রের মধ্যে অর্দ্ধ অনাবৃত শরীরে কাটায় এবং গর্ব্ব করিয়া যেন তাহারা মানুষকে দেখাইতে চায়, এ বিষয়ে যেন তাহাদের কোন খেয়ালই থাকে না। এই সমস্ত খেয়াল-ভ্রমণের সময় চিররুগ্ন লুইসা তাহাদের সঙ্গে থাকিলে করুণা এবং অত্যন্ত সহানুভূতির চোখে তাহারা তাহার দিকে তাকায়। লুইসা কোন কথা বলে না, কিন্তু চলিতে চলিতে শ্রান্ত ভাবে সে থামিয়া যায়, তাহার শরীর যেন রক্ত শূন্য হইয়া আসে, বক্ষের স্পন্দন বাড়িয়া যায়, পা দুইটি ফুলিয়া উঠে।

ক্রিসতফও তাহার মাতাকে পিতা ও পিতামহের মত কৃপার চক্ষে দেখিত। সে কিছুতেই বুঝিতে পারে না—মানুষ কেন অসুস্থ হয়! যখন সে চলিতে চলিতে হোঁচট খায় বা পড়িয়া যায় কিম্বা কোন প্রকারে শরীরের কোন অংশ কাটিয়া বা পুড়াইয়া ফেলে, সে কোন দিন কাঁদে না। কিন্তু যে সমস্ত জিনিষের দ্বারা আহত হইয়াছে, সেই সমস্তের উপর সে বিষম চটিয়া যায়।

পিতার নির্ম্মমপ্রকৃতি, সঙ্গী এবং খেলার সাথীগণের দুর্ব্যবহার, পথের নীচ-জাতীয় বালকগণের সহিত কলহ এবং মারামারি প্রভৃতির ফলে ক্রিস্তফ্ দিনে দিনে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। মারপিটের প্রতি তাহার মনে কোন ভয় ছিল না। এবং বহুবার সে ঐ কলহের অবসানে রক্তাক্ত নাসিকা এবং ক্ষত বিক্ষত মুখে গৃহে ফিরিয়াছে। একদিন এইরূপ একটি ভীষণ দ্বন্দ্ব হইতে শ্বাস-রুদ্ধ অবস্থায় পথের লোক ক্রিস্তফ্‌কে জোর করিয়া ছাড়াইয়া লয়। ক্রিস্তফ্-এর ঘুসি খাইয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী তখন তাহার মাথাটা ধরিয়া বিষম জোরে মাটিতে ঠুকিয়া দিতেছিল। এই মার খাওয়া তাহার কাছে একেবারেই অস্বাভাবিক বোধ হইত না, কারণ অপরের প্রতি সে নিজে যেরূপ ব্যবহার করে, তাহার প্রতিদান বা প্রতিশোধ লইতে সে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

তবু সমস্ত জিনিসের প্রতি কেমন এক প্রকার ভয় সর্ব্বদাই তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত! কিন্তু কেহ তাহা জানিতে পারিত না, কারণ আপনার সম্বন্ধে সে অত্যন্ত গর্ব্বিত ছিল, কিছুতেই আপন মনোভাব কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না। তাহার শৈশবাবস্থায় নানা জাতীয় ভয় হইতে এখনকার ভয়গুলি তাহাকে অধিক দুঃখ দিত। প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া এই অজ্ঞাত আতঙ্কগুলি দুরারোগ্য ব্যাধির মত তাহার শরীর-মনকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিতেছিল; ইহা হইতে কিছুতেই সে আপনাকে মুক্ত করিতে পারে নাই।

তাহার সর্ব্বদাই মনে হয়, যেন ঐ অন্ধকারের মধ্যে অদ্ভুত অজ্ঞাত রহস্যময় কত কি সব জীব ঘুরিয়া বেড়ায়! ভৌতিক শক্তি তাহার জীবন নাশের উদ্দেশ্যে যেন সমস্ত স্থানে ওৎ পাতিয়া আছে! ভীষণকায় জীবের চীৎকার এবং তাহাদের বীভৎস ছবি যেমন আপনা হইতেই শিশুদিগের মনে জাগে, এবং কোন কিছু অদ্ভুত জিনিষ দেখিলেই যেমন তাহারা উহার মধ্যে সে সমস্ত ভয়কে স্পষ্ট দেখিতে পায়, ক্রিস্তফ্‌ও সেইরূপ রহস্যপূর্ণ ভয়কে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিত। এ ভয় যেন অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে শব্দময় জগতে ভূমিষ্ঠ নবজাগরিত মানব-প্রাণের মত কিম্বা সদ্য প্রসূত জীবাণু বা কীটের মত!—

ক্রিস্তফ্ তাহাদের গৃহের সেই চোরা কুঠুরীটিকে বিশেষ ভয়ের চক্ষে দেখিত, ইহারই পাশ দিয়া নীচে নামিবার পথ, ইহার দরজা প্রায় সমস্ত সময় বন্ধই থাকে। কোন সময় ইহার ভিতর দিয়া তাহাকে যাইতে হইলে সে আপনার হৃদয় স্পন্দন বেশ স্পষ্ট ভাবে শুনিতে পাইত। কত সময় ছুটিয়া বা লাফাইয়া সে এই ঘর পার হইয়া যাইত, তাহার স্পষ্ট মনে হইত যেন উহার মধ্যে কাহারা

রহিয়াছে! দরজা বন্ধ থাকিলেও সে স্পষ্ট ভাবে শুনিতে পায়, যেন কি সব উহার মধ্যে নড়িয়া বেড়াইতেছে! অবশ্য ইহা বিশেষ কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, কারণ এই অন্ধকার ঘরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইঁদুর সর্ব্বদাই ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায় কিন্তু ক্রিস্তফ্ ভাবে কোন অতিকায় জীবের কথা, যাহার শরীরের হাড়গুলি তাহার চলার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ করিতে থাকে এবং তাহার দেহের মাংসরাশি চারি পাশে ঝুলিয়া পড়িয়াছে!

শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন, বিকৃত এবং ভীষণ চক্ষুবিশিষ্ট একটি ঘোড়ার মুণ্ড যেন তাহার দিকে চাহিয়া আছে!—সে এ সমস্ত ছবি ভাবিতে চাহে না, তবুও ঐ সব মনে পড়ে! কিছুতেই মন হইতে উহাদিগকে তাড়াইতে পারে না। কম্পিত হস্তে বার বার করিয়া সে ঐ ঘরের দরজা বন্ধ আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখে, তবু তাহার ভয় যায় না। সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার সময় মাঝে মাঝে পিছন ফিরিয়া তাকায়!

রাত্রি হইলে গৃহের বাহিরে থাকিতে সে অত্যন্ত ভয় পাইত। কোন কোন দিন হয় ত তাহাকে জাঁ মিশেলের সহিত গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত কাটাইতে হইত, কোন দিন হয় ত কোন কাজে সন্ধ্যার পর তাহাকে জাঁ মিশেলের নিকট যাইতে হইত।—জাঁ মিশেল থাকিতেন শহরের বাহিরে কোন রাস্তার শেষ বাড়ীটিতে। এখান হইতে শহরের প্রথম যে গৃহের জানালা দিয়া আলো দেখা যাইত তাহার দূরত্ব দুই বা তিন শত গজের অধিক হইবে না—তবু অন্ধকারের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে ক্রিস্তফ-এর মনে হইত—এ পথ বুঝি অফুরন্ত! মাঝে মাঝে পথটি ঘুরিয়া এমন ভাবে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে যে, সেখান হইতে কিছুই দেখা যায় না। পথে লোক চলা-চল সন্ধ্যার পূর্ব্বেই থামিয়াছে, সমস্ত গ্রামখানি নিবিড় অন্ধকারে ভরিয়া উঠিয়াছে, পৃথিবী এক গভীর অন্ধকারে আবৃত এবং আকাশে ভীষণ পাণ্ডুর আভা! পথের দুই পাশের ঘন ঝোপের আড়াল হইতে বাহির হইয়া ক্রিস্তফ্ যখন উঁচু পথটি ধরিয়া চলিত তখনও সে দেখিতে পাইত আকাশের কোলে সেই পাণ্ডুর আভা যাহা আলো দেয় না এবং অন্ধকার হইতেও ভীষণ মনে হয়। সে যেন অন্ধকারকে নিবিড়তর করিয়া তুলে। সেটা যেন মৃত্যুর আভা! আকাশের মেঘ ধীরে ধীরে যেন মাটীতে নামিয়া আসিতেছে। ঝোপগুলি প্রকাণ্ড বলিয়া মনে হয় এবং যেন তাহারা নড়িয়া নড়িয়া বেড়াইতেছে! সরু সরু গাছগুলি যেন জীর্ণ শীর্ণ বহু পুরাতন বৃদ্ধের মত দেখাইতেছে। বনের পিছনে আকাশের রং যেন শাদা দেখাইতেছে এবং চারি ধারের অন্ধকারও যেন

চলিয়া বেড়াইতেছে!—ক্রিস্তফ ভাবে, পথের ধারের গর্ত্তের মধ্যে বামনের মত অদ্ভুত শরীরবিশিষ্ট কাহারা সব বসিয়া আছে! যাদের মধ্যে যেন কি এক প্রকারের আলো দেখা যাইতেছে! অন্ধকার আকাশের গায়ে ভীষণ কি সব জন্তু যেন উড়িয়া বেড়াইতেছে। নানা জাতীয় কীট-পতঙ্গের তীব্র চীৎকার যেন কোন্ অদৃশ্য লোক হইতে আসিতেছে।

ক্রিস্তফ সর্ব্বদা কম্পিত অন্তরে প্রকৃতির কোন্ একটা বিকট খেয়াল বা ভীষণ একটা কিছু দেখিবার প্রত্যাশায় থাকিত; এবং সময় সময় এই সমস্ত তাহার নিকট এত অসহ্য হইয়া উঠিত যে, সে না ছুটিয়া থাকিতে পারিত না। ছুটিতে ছুটিতে সে যখন জাঁ মিশেলের গৃহের আলো দেখিতে পাইত, তাহার সাহস ফিরিয়া আসিত। কিন্তু তাহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে সেই দিন, যেদিন সে দেখে জাঁ মিশেল গৃহে নাই! আতঙ্কে তাহার শরীরের রক্ত যেন জমাট হইয়া উঠে। ঐ পুরাতন গৃহটি যেন গ্রামের নির্জ্জনতার মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। দিনের বেলায়ও এখানে একা থাকিতে গা ছম ছম করে।

অবশ্য জাঁ মিশেল গৃহে থাকিলে ক্রিস্তফ তাহার সহস্র কল্পিত ভয় হইতে অনেকখানি নিষ্কৃতি পাইত। সময় সময় হয় ত জাঁ মিশেল ক্রিস্তফকে না বলিয়াই বাহির হইয়া যাইতেন। ক্রিস্তফ অবশ্য দিনের বেলা এখানে একা থাকিতে ভয় পাইত না, তাহা ছাড়া এই গৃহটি তাহার ভাল লাগিত, ইহার সমস্তই তাহার পরিচিত।

ঘরের এক পাশে সাদা কাঠের প্রকাণ্ড একটি শয্যা, তাহার এক ধারে ছোট একটি সেল্‌ফের উপর বৃহৎ একখানি বাইবেল, তাকের উপরে নানা প্রকারের কাগজের ফুল, জাঁ মিশেল-এর স্বর্গগত দুই পত্নী এবং এগারটি সন্তানের ফটোগ্রাফ সজ্জিত আছে। এই ছবিগুলির নীচে প্রত্যেক্যের জন্ম এবং মৃত্যুর তারিখ তাঁহার নিজের হাতের লেখা, দেওয়ালে বাইবেলের বহু সাধু উক্তি এবং মোজার্ট ও বিতোফেন-এর অতি নিকৃষ্ট দুইখানি রঙিন ছবি ফ্রেমে আঁটা। একটি ছোট পিয়ানো ঘরের এককোণে রাখা হইয়াছে আর এককোণে প্রকাণ্ড একটি বেহালা, রাশিকৃত ছড়ান বই খাতাপত্র, তামাকের পাইপ, এবং জানালার উপর জেরানিয়ম্ ফুলের ছোট ছোট টব্।

এই সমস্তই যেন পরিচিত বন্ধুর মত ক্রিস্তফ-এর মনকে ঘিরিয়া রাখিত। হয় ত কোন দিন ক্রিস্তফ্ শুনিতে পাইত, পাশের ঘরে জাঁ মিশেল চলিয়া বেড়াইতেছেন বা কোন বিষয় লইয়া বকিয়া যাইতেছেন। কোন কিছুর উপর ঘুসি

চড় মারিয়া আপনাকেই নির্ব্বোধ, গাধা এমন কত নামে ভূষিত করিতেছেন। কখনও বা খেয়াল অনুযায়ী ধর্ম্ম-সঙ্গীত, প্রেম-সঙ্গীত, যুদ্ধযাত্রা বা মাতালের গান উচ্চকণ্ঠে গাহিয়া উঠিতেছেন।

এখানে আসিয়া ক্রিস্তফ্ মনে অত্যন্ত আরাম অনুভব করে। যেন সে আশ্রয় পাইয়াছে। জানালার নিকট তাহার পিতামহের প্রকাণ্ড আরম্ চেয়ারটি টানিয়া লইয়া সে একখানি বই কোলের উপর মেলিয়া বসিয়া থাকে। পাতার পর পাতা উল্টাইয়া যায়। ছবিগুলির মধ্যে আপনার সমস্তই যেন সে হারাইয়া ফেলে।

ধীরে ধীরে দিনের আলো ম্লান হইয়া যায়, তাহার চোখ দুইটি শ্রান্ত হইয়া পড়ে, তবু সে আরও ছবি দেখার নেশা কাটাইতে পারে না—ধীরে ধীরে স্বপ্নস্রোতে ভাসিয়া যায়।

পথ দিয়া গাড়ীর চাকার গম্ভীর শব্দ ছুটিয়া যায়, মাঠে হয় ত একটি গাভী ডাকিয়া উঠে, দূর গ্রামের গির্জ্জার ঘণ্টা-ধ্বনির ভিতর দিয়া সন্ধ্যাবন্দনা ধীর বাতাসে শ্রান্তভাবে ভাসিয়া বেড়ায়—এই সমস্ত শব্দ শুনিতে শুনিতে অর্দ্ধসুপ্ত ক্রিস্তফ-এর মনে কত কি অজ্ঞাত বাসনা, যেন অতি সুখকর কিছু তাহার জীবনে ঘটিবে প্রভৃতি স্বপ্ন ধীরে ধীরে তাহার মনে প্রবেশ করিতে থাকে।

সহসা তাহার তন্দ্রা টুটিয়া যায়, মনের মধ্যে কেমন অশান্তি অনুভব করে। চোখ মেলিয়া চারি দিকে তাকায়—রাত্রি! কান পাতিয়া শোনে—সমস্ত নীরব, নিঝুম। জাঁ মিশেল গৃহে নাই। কখন তিনি বাহিরে গিয়াছেন তাহাও সে জানে না! ভয়ে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠে। জানালার উপর ঝুঁকিয়া বাহিরের অন্ধকারের মধ্যে সে তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা করে। পথ জনশূন্য। ধীরে ধীরে সমস্তই যেন তাহার চোখে ভয়ঙ্কর ঠেকে। ভাবে—এবার যদি ওটা ঘরের মধ্যে এসে ঢোকে!...কিন্তু কি যে আসিবে তাহাও সে জানে না। শুধু মনে হয়, ভয়ঙ্কর একটা কিছু। ঘরের দরজা বুঝি ভাল করিয়া বন্ধ করা হয় নাই, কাঠের সিঁড়িটা যেন কাহার শরীরের ভারে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করিয়া উঠিল।... ক্রিস্তফ্ তাড়াতাড়ি উঠিয়া চেয়ার টেবিল যাহা কিছু পাইল তাহাই টানিয়া ঘরের এক কোণে আনিয়া শত্রুর আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য যেন তাহার চারি পাশে বেড়া দিতে লাগিল!—আরম চেয়ারটি রহিল দেওয়ালের গায়ে, ডাহিনে ও বামে রহিল অন্য দুই খানি চেয়ার, সাম্‌নে রহিল একটি টেবিল। মাঝখানে ছোট দুইটি ফুট-টুল পাতিয়া সে বই খাতাপত্র লইয়া তাহার উপর চাপিয়া

বসিল, যেন শত্রুপক্ষের অবরোধ হইতে আত্মরক্ষার জন্যই এই আয়োজন। তাহার মনে আবার সাহস ফিরিয়া আসে, শিশুসুলভ কল্পনার চোখে সে দেখিতে পায় শত্রু তাহার রচিত এই ব্যূহ ভেদ করিতে পারিবে না।

কিন্তু সহসা যেন মায়াবলে শত্রুদল তাহার বইগুলির পাতার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিতে থাকে! এই সমস্ত পুস্তক অত্যন্ত পুরাতন এবং জাঁ মিশেল-এর দ্বারা সংগৃহীত। ইহাতে যে সমস্ত ছবি ছিল তাহা ক্রিস্তফ প্রতিদিন দেখিত এবং সেই সমস্ত তাহার মনকে আকৃষ্ট করিত এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আকুল করিয়া তুলিত। সে সমস্ত ছবি স্বপ্নের মত রহস্যপূর্ণ। কিন্তু তাহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ছিল—সাধু এণ্টনির প্রলোভন চিত্রখানা, যাহার মধ্যে বোতলে রক্ষিত পাখীর পচাহাড়, হাজার হাজার ডিম্ যেন ব্যাঙাচির মত নড়িয়া নড়িয়া উঠিতেছে! মাথা আছে দেহ নাই, কি সব জীব পায়ে হাঁটিয়া চলিয়াছে। গৃহের তৈজস-পত্র, হাঁস্-মুরগী গরু-ছাগলের হাড় মোটা মোটা শাদা চাদরে শরীর ঢাকিয়া কুব্জা বৃদ্ধা নারীর মত চলিয়া বেড়াইতেছে। ক্রিস্‌তফ্‌ সে সমস্ত ছবি দেখিয়া ভয় পায় কিন্তু সেই ভয় ও বিতৃষ্ণাই আবার তাহাকে ছবির দিকে টানিয়া আনে। এই সমস্ত ছবি সে বহুক্ষণ ধরিয়া দেখে এবং সময় সময় তাহার চারি পাশে তাকায়, পর্দ্দার উপর যেন কিছু নড়িতেছে তাহার মনে হয়।

শরীর-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় কোন পুস্তকে মৃত মানুষের চর্ম্মহীন শরীরের ছবি তাহার নিকট অধিক বীভৎস মনে হয়। সে তাড়াতাড়ি পাতা মুড়িয়া ফেলে। তাহার মনে হয় ঐ বিকৃত জঘন্য নর-শরীরের চিত্রটি তাহাকে যেন নিষ্ঠুরভাবে পীড়া দিতে থাকে। শিশুর স্বাভাবিক সৃজনী শক্তি ঐ কঙ্কালসার শরীরের বীভৎস দারিদ্র্যকে কল্পনায় যেন পূর্ণ করিয়া তুলিতে চাহে, জীবন্ত শরীর ও তাহার এই বিকট পরিহাসের মধ্যে পার্থক্য সে যেন দেখিতে পারে না! দিনের বেলা সে যে সমস্ত জিনিষ দেখে তাহাদের অপেক্ষা রাত্রিকালে তাহার স্বপ্নের মধ্যে ইহারা অধিক আতঙ্ক আনিয়া দেয়।

রাত্রে সে ভাল ঘুমাইতে পারে না। বৎসরের পর বৎসর এই সমস্ত কাল্পনিক ভীতি তাহার বিশ্রাম সুখ নষ্ট করিয়া দিয়াছে। সে ছবি দেখার সঙ্গেই কল্পনায় অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসে। সে মৃত মানুষের অনুকরণ করিয়া গভীর ভূগর্ভে নামিয়া যায়, স্যাঁৎ-সেঁতে অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে চলিতে চলিতে সহসা তাহার সম্মুখে মুখামুখি হইয়া দাঁড়ায়! ঠিক এই সময়ে হয় ত ঘরের বাহিরে কাহার মৃদু পদশব্দ সে শুনিতে পায়, সে ছুটিয়া আসিয়া দরজায় চাপিয়া দাঁড়ায় এবং সবে মাত্র

সে হয় ত চাবিটিতে হাত দিয়াছে কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই যেন কে বাহির হইতে সেটি ঘুরাইয়া দিল! চাবি বন্ধ করিবার তাহার আর শক্তি থাকে না, সে চীৎকার করিয়া উঠে।

তাহার পর হয় এক অদ্ভুত ব্যাপার! বাবা মা ঘরে ছুটিয়া আসে কিন্তু ক্রিসতফ-এর চোখে তাহাদের মুখ অন্য রকম ঠেকে। তাহারা সকলেই যেন প্রলাপ বকিতেছে। পড়িতে পড়িতে সহসা তাহার মনে হইয়াছে যেন অদৃশ্য জীব তাহার চারি পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে!—সে উড়িয়া পলাইতে চেষ্টা করিয়াছে, পারে নাই, তাহার হাত পা যেন বাঁধা! কাঁদিতে চেষ্টা করিল, পারিল না, তাহার মুখও বন্ধ করা হইয়াছে! যেন কাহার বজ্র-কঠিন অথচ নোংরা ঠাণ্ডা হাতের আঙুল তাহার গলাটিকে চাপিয়া ধরিয়াছে! —সে জাগিয়া উঠিল। নিশ্বাস প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, দাঁতে দাঁত লাগিয়াছে! সম্পূর্ণ জাগিয়াও বহুক্ষণ তাহার ঘোর কাটে না, এই কাল্পনিক ভীতির বেদনাও তাহার বুকে চাপিয়া থাকে।

ক্রিসতফ্ যে ঘরটিতে শুইত সেটিকে একটি গর্ত্ত বলিলেও চলে। তাহার জানালা বা দরজা কিছুই ছিল না। তাহার বাবা ও মা'র ঘর হইতে এখানে আসিবার যে ফাঁকটুকু ছিল সেটিকে একটি অতি পুরাতন ও জীর্ণ পর্দ্দা দিয়া ঢাকা দেওয়া হইয়াছিল। এইখানকার অবরুদ্ধ বাতাসে তাহার নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিত। তাহার ছোট খাটটিতে তাহার একটি ভাইও শুইত, ঘুমের ঘোরে লাথি মারিয়া সে ক্রিসতফকে অস্থির করিয়া তুলিত। তাহার ঘুম আসিত না, মাথার ভিতর যেন জ্বালা করিতে থাকিত, ইহার উপর দিনের যাহা কিছু অপ্রীতিকর ঘটনার কথা সহস্র ডালপালার সহিত বর্দ্ধিত হইয়া তাহার মনে অশান্তির ঝড় তুলিত।

এই প্রকার স্নায়বিক উত্তেজনার মুহূর্ত্তে, যখন তাহার মধ্যে বিকারের পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে তখন অতি সামান্য আঘাতেই সে গভীর বেদনা উপলব্ধি করিত। ঘরের মেঝের কাঠে কোন শব্দ হইলে সে ভয়ে শিহরিয়া উঠে। তাহার পিতার নাসিকা ধ্বনি যেন ক্রমশ বিকট হইয়া উঠে। উহা মানুষের নিশ্বাস পতনের শব্দ বলিয়া কিছুতেই তাহার মনে হয় না। সে শব্দ অতি ভয়ঙ্কর বলিয়া তাহার মনে হয়, যেন সত্য সত্যই কোন বীভৎস জীব ঐ ঘরের মধ্যে ঘুমাইতেছে!

রাত্রি যেন তাহার শরীর মনকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতে থাকে। তাহার মনে হয় যেন ইহার শেষ নাই। সে যেন মাসের পর মাস এমনি অসহায় ভাবে

রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে পড়িয়া আছে ; সে হাঁপাইতে থাকে, কাঁপিতে কাঁপিতে বিছানার উপর উঠিয়া বসে, হাত দিয়া মুখের ঘাম মুছে, ছোট ভাই রডল্‌ফ্‌কে ঠেলিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। সে বিচিত্র সুরে চীৎকার করিয়া গায়ে দিবার লেপ সব নিজের দিকে টানিয়া পাশ ফিরিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়ে।

ক্রিস্তফ্ সমস্ত রাত এইরূপ অসহ্য যন্ত্রনার মধ্য দিয়া কাটায়, তাহার পর তাহার পর একসময় উষার ম্লান আলো পর্দার নীচে দিয়া তাহার ঘরের মেঝেয় আসিয়া পড়ে। রাত্রি শেষের এই অস্বাভাবিক পাণ্ডুর আভা দেখিতে পাইলেই তাহার মন সহসা শান্ত ভাব ধারণ করে, যদিও তখনও আলো অন্ধকারের পার্থক্য বুঝা কঠিন, তবুও সে দেখিতে পায় যেন আলো ধীরে ধীরে তাহার ঘরে প্রবেশ করিতেছে। তাহার দেহের উত্তপ্ত ভাবটা কমিয়া যায় ; চঞ্চল রক্তস্রোত শান্ত হইয়া আসে, যেন বন্যার ক্ষিপ্ত নদীটি শান্ত হইয়া পুনরায় তাহার পুরাতন তটভূমিতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে! রাত্রি জাগরণক্লিষ্ট তাহার চোখ দুটি ধীরে মুদিয়া আসে।

সন্ধ্যা হইলেই তাহার মন আবার অশান্তিতে ভরিয়া যায়। সে বার বার প্রতিজ্ঞা করে, ঐ সমস্ত কাল্পনিক ভয় এবং স্বপ্নকে মনে ঠাঁই দিবে না। কিন্তু রাত্রি বাড়িয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে সে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়ে এবং কখন ঐ সমস্ত স্বপ্নের সূত্রপাত হয় তাহা সে জানিতে পারে না!

রাত্রি কি ভয়ঙ্কর! আবার তাহারই মত কত শিশুর নিকট এই রাত্রিই কত মধুর রূপে দেখা দেয়! . . . ক্রিস্তফ্ ঘুমাইতে পারে না।—ঘুমাইতে সে ভয় পায়, ঘুমাইতে না পারাকেও ভয় করে।

জাগরণের মধ্যে বা নিদ্রিত অবস্থায় সমস্ত সময় সে আপনার কল্পনাপ্রসূত আতঙ্কের দ্বারা বেষ্টিত থাকে। ব্যাধিগ্রস্থ মানুষের মনে মৃত্যুর উৎকট ছায়ার মত এই সমস্ত কল্পনা শৈশবের সমস্ত আনন্দের উপর কালো ছায়া ফেলিয়া তাহার মনে লাগিয়াই রহিল।

কিন্তু এই সমস্ত কাল্পনিক ভয় একদিন জীবনের বিরাট ভয়ের সংঘাতে তুচ্ছ ও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এ ভয় সব মানুষের বুকে বাসা বাঁধিয়া আছে। ইহা সেই ভয় যাহাকে মানুষ তাহার জ্ঞান বা বুদ্ধির দ্বারা ভুলিতে বা অস্বীকার করিতে চেষ্টা করে—মৃত্যু।

—ক্রমশ

ডাকঘর

তুমি জান্‌তে চেয়েছ, আজকাল বাঙলায় এত কাগজ বেরিয়েছে, তার সবগুলিই চল্‌বে কিনা? একথার উত্তর আজই দেওয়া যায় না। আজ যে কাগজ চল্‌ছে, সে কাগজ কালও চল্‌বে কিনা সে সব কথা বলা শক্ত। কিন্তু বাঙলার পাঠকসাধারণ যতই মানসিক বৃত্তিগুলিতে উৎকর্ষ লাভ করছেন ততই কোন্ কাগজে কি থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য কর্‌তে আরম্ভ করেছেন। তাতে ক'রে এক এক কাগজের পাঠকের শ্রেণী-ভাগ হ'তে সুরু হয়েছে। তা ব'লে এ কথা বলা চলে না যে, আজ যাঁরা বাজে কাগজ পড়ছেন, কাল তাঁরা আরও ভাল কাগজের দিকে আকৃষ্ট হবেন না; সুতরাং মনে হয়, যে সব কাগজ উচ্চ আদর্শের উপযুক্ত হ'য়ে না চল্‌বে, সে সব কাগজ বাঙলার পাঠকসাধারণকে বহুকাল মোহাচ্ছন্ন ক'রে রাখ্‌তে পারবে না। সকল চেষ্টার মূলেই উদ্দেশ্য যা' থাকুক, ফলে বাঙলা ভাষা ও বাঙালীর পক্ষে ভালই হচ্ছে এ কথা আমি বল্‌ব। বাঙালী পড়তে চাইছে, জানতে চাইছে, তার মধ্যে যে আরেকটি মানুষ প্রতিদিন বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌বার জন্য প্রতীক্ষায় স্পন্দমান হ'য়ে আছে, সে কথা এখন বেশ ভাল ক'রেই বোঝা যায়।

হ্যাঁ, নতুন বই আরো অনেক বেরিয়েছে। দু'একখানা আমাদের হাতেও এসে পৌঁছেছে।

তোমার মনে আছে বোধ হয়, কিছুকাল পূর্ব্বে পরশুরাম রচিত ও প্রসিদ্ধ রেখা-চিত্রী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন বিচিত্রিত কতকগুলি চমৎকার লেখা ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে দু'একখানা ছবি, মনে মনে ভাব্‌তে গেলেও দম্-ফেটে হাসি পায়।

ঐ সব লেখাগুলি বইয়ের আকারে বেরিয়েছে, নাম হয়েছে—গড্ডলিকা। দাম পাঁচসিকা মাত্র। মলাট দেখ্‌লেই কিন্‌তে ইচ্ছে করে। ভিতরের কাগজ, ছাপা, ছবি—ভারী সুন্দর। তার পর লেখাগুলি ত অমূল্য। বাঙলাদেশে বহুকালের মধ্যে এমন রুচিকর, কৌতুকপূর্ণ লেখা বেরিয়েছে ব'লে মনে নেই।

এই লেখাগুলি নাটক আকারে পরিণত ক'রে অভিনয় করতেও চমৎকার।

এর মধ্যে চিকিৎসা-বিভ্রাট ব'লে লেখাটিকে অভিনীত হ'তে দেখেছি। অনেক বাজে প্রহসনের চাইতে ভাল লেগেছিল।

বইখানা একবার প'ড়ে দেখো, না হয় ত কিনে ফেলো, পয়সা সার্থক হবে।

তার পর, তোমার বোধহয় ধারণা, প্রবর্ত্তক কাগজখানা চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে! তা নয়। একালে সত্যি কথা বল্‌তে গেলে অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হয়। প্রবর্ত্তকেরও অনেক 'হালাকানি' সইতে হয়েছে। যাই হোক, সেদিন এর নূতন বৈশাখ সংখ্যা দেখে খুব আনন্দ হোল। ১৩৩২-এর বৈশাখ থেকে, ৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীমতিলাল রায় মহাশয়ের সম্পাদনে আবার নূতন কলেবরে **প্রবর্ত্তক** প্রকাশিত হচ্ছে। প্রবর্ত্তকের আর বিশেষ পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। নগদ মূল্য হয়েছে —ছয় আনা, আর বার্ষিক মূল্য—তিন টাকা ছয় আনা। মলাটের উপরের পরিকল্পনাটি অ-তি সুন্দর হয়েছে।

আর একখানা বই, **ভারত-প্রদক্ষিণ**—শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত প্রণীত। বইখানি চারশ আটচল্লিশ পৃষ্ঠা—তা ছাড়া 'বিষয়-বিবৃতি' প্রভৃতি নিয়ে আরো প্রায় বিশ পঁচিশ পৃষ্ঠা। খুব পুরু মলাট —লাইব্রেরীতে রাখ্‌বার উপযুক্ত। ভিতরে ছবিও আছে অনেকগুলি। দাম মাত্র তিনটাকা। এমন শিক্ষাপ্রদ বইয়ের এমন শোভন সংস্করণের এই দাম খুব বেশী ব'লে মনে হচ্ছে কি? এখানি তৃতীয় সংস্করণ, অনেক পরিবর্দ্ধিত হয়েছে। ছাপা, কাগজ খুব পরিষ্কার।

অধিকাংশ লোকেরই নানা কারণে দেশ-ভ্রমণ করা ঘ'টে ওঠে না। অর্থাভাব, অবসরের অভাব, উদ্যমের অভাব—নানাবিধ কারণে দেশ-ভ্রমণের মত আনন্দদায়ক, শিক্ষাপ্রদ, মানসিক উদারতার সহায়ক কাজটি অনেকের ভাগ্যে ঘ'টে ওঠে না। তার মধ্যে অনেকে দেশভ্রমণে যান্‌ শুধু নাম-কো-ওয়াস্তে। শরীরটাকে ব'য়ে নিয়ে বেড়ান হোটেল থেকে হোটেলে, দেশ থেকে দেশে। চোখ-কান তাদের অনেক ক্ষেত্রে খোলা থাকে না। ভারতবর্ষে যে কত রকমের রীতি-নীতি, আচার, পরিচ্ছদ, কীর্ত্তি, শিল্প, ভাস্কর্য্য বিদ্যা ও বিজ্ঞানের পরিচয় রয়েছে, সেগুলি জান্‌বার জিনিষ। জান্‌তে পারলেও মনটা সাহসে আশায় দশহাত ফুলে ওঠে। দেশভ্রমণের ভাগ্য না থাক্‌লে এই বইখানা পড়লে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য জানা যায়।

মর্ম্মবাণী ব'লে কবিতার বইখানি তুমি দেখেছ কি? বোধহয় পড় নি। প'ড়ে দেখো। শ্রীবুদ্ধদেব বসুর কিছু কিছু লেখা বোধহয় আজ কাল পত্রিকার

পড়্‌ছ। মর্ম্মবাণীর কবিতা-সংগ্রহে এই কিশোর-কবির শক্তির বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। বয়সের তারুণ্য মনে না রেখে বইখানা প'ড়ে দেখো।

কবিতাও যে পড়বার জিনিষ, বাঙলা দেশে অনেকে তা স্বীকার করেন না। কিন্তু আজকালকার কয়েকজন নবীন কবির কবিতা যাঁরা অবহেলা ক'রে পড়ছেন না, তাঁরা কবিতার প্রতি একটা অকারণ, সংস্কারগত অশ্রদ্ধাই পোষণ ক'রে যাচ্ছেন মাত্র। ভাল কবিতা যে মানুষের অপূর্ব্ব সৃষ্টি, ধ্যানলোকের নিবিড় প্রকাশ, তা' আজকালকার অনেক নবীন কবির রচনা প'ড়ে অনুভব করা যায়। বইখানির দাম মাত্র দশ আনা। ২৬ নং বাঙলা বাজার, ঢাকা—শ্রীগঙ্গাচরণ দাস মহাশয় বইখানির প্রকাশক।

তারপর আর একটা সুখবর আছে। পথিক উপন্যাসখানা এতদিন পরে বেরুল। বাঙলাদেশে অনেক কাল এমন উপন্যাস আর বেরিয়েছে ব'লে কি মনে হয়? কল্লোলে যখন ধারাবাহিক ভাবে বেরুত তখন সকলেই বল্‌ত গোকুল বাবু যে উপন্যাসখানিতে এতগুলি চরিত্র এনে জড় করেছেন, এগুলিকে নিয়ে তিনি শেষকালে হাঁফিয়ে পড়বেন।

কিন্তু বাহাদুরি ঐ খানে;—ঠিক্ ক'রে সব মানুষগুলিকে গুছিয়ে চলা। খুব বড় কারিগরের হাত বল্‌তে হবে, একটা বাজে কথা নেই।

শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র নাগ বাঙালী-সমাজের যে অংশটার ছবি এঁকেছেন অনেকের মতে তা' চেয়ার-টেবিলের ঠাসাঠাসি, চায়ের পেয়ালা-পিরিচের ঠনঠনানি; সত্যিকারের বাঙলার ছবি নয়।

এ কথাগুলিও গোকুলবাবুর বইখানার একটা ভাল সমালোচনাই বল্‌তে হবে। অস্বীকার ক'রে কারুরই লাভ হবে না, সাধারণ মানুষের মনোবৃত্তিকে, সে কারা কেমন ক'রে সোনার হরিণের মত ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে চলেছে, সে কথা মুখে না বল্‌লেও কারুর অবিদিত নাই।

প্রকাশক হয়েছেন, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, দাম করেছেন আড়াই টাকা। বইখানি সব সুদ্ধ সাড়ে তেত্রিশ ফর্ম্মার উপরে।

তোমার শেষের কথাটার উত্তর দিতেই হবে?—গল্পট ছেপেছি ভালো লেখা হয়েছে ব'লে।

পড়তে বেশ লাগে, না? আচ্ছা, গল্পটির ভিতরে, লেখার ধাঁচ, প্রকাশ করবার ক্ষমতা, আখ্যানভাগ, ভাষার কোথাও খুব বেশী দৈন্য আছে ব'লে মনে হয়েছে কি? গল্প হিসাবে বেশ না? তবে লেখক যদি স্বীকার না করেন যে, তিনি

কোনও ইংরেজী সঙ্কলনের বই থেকে গল্পগুলি নিয়েছেন, তাহ'লে কি তাই নিয়ে গোলমাল করা শোভন, না মঙ্গলজনক? কি হয়েছে তাতে, তিনি যদি স্বীকার না-ই ক'রে থাকেন? বাঙলা দেশে ত সব লোকই একেবারে আকাট-মূর্খ নয়! তোমার মত যারা ঐ ইংরেজী অনুবাদ ও গল্পগুলি পড়েছে, তারা মনে মনে ঠিক জানছে, লেখক কি কাণ্ড করছেন। এমনি ক'রে তাঁর নিজের কাছেও একদিন বাইরে থেকে এর কৈফিয়ৎ চাইতে আসবে।

না হয় ত তাঁর নিজের মনেই তিনি বুঝতে পারবেন যে, অন্যের গল্প থেকে অনুবাদ করলে, বা অন্য গল্প থেকে নিজের রচনার ভিতর কিছু গ্রহণ ক'রে তা' স্বীকার করলে তাতে লেখকের নামের বা খ্যাতির একটুও কমী হয় না।

এ রকম ত অনেকেই করছেন আজ কাল, শুধু এ বেচারীকে পেড়ে ধ'রে লাভ কি? চলুক না, কতদূর যায় দেখ না। লজ্জাহীনকে লজ্জা দেওয়ার একমাত্র পথ তাকে নির্লজ্জ হ'তে ছেড়ে দেওয়া।

তাই বলছি, এ সব নিয়ে ক্ষেপে উঠো না, লোভ ত্রুটি একটু আধটু সবারই আছে, তাই নিয়ে ঘাঁটাঘাটি ক'রে কোনও লাভ নাই।

হ্যাঁ, প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের ডায়েরী একটি অমূল্য জিনিষ।

প্রবাসীতে ডায়েরীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি ছাপা হওয়াতে তাঁদের সুবিধা বিশেষ হোক্ না হোক, আমাদের বেশ সুবিধা হয়েছে। একসঙ্গে একস্থানে, রবীন্দ্রনাথের আজকালকার অধিকাংশ প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পদ্য গুলি আমরা পড়তে পাচ্ছি। এ কি কম সুযোগ?

কুড়োনো ফুল—ছোটদের জন্য বই বেরিয়েছে। দাম দশ আনা মাত্র। টলষ্টয় ও ইংরেজী থেকে কয়েকটি ছোট গল্প বাঙলায় অনুবাদ। ভাষা সহজ ও সুন্দর। দুঃখ-দারিদ্র্য-অভাবগ্রস্ত বাপ-মা'র নিরানন্দ মুখখানি হাসি ও আনন্দ দিয়ে উজ্জ্বল ক'রে রেখেছে যে সব সোনার চাঁদ ছেলে-মেয়েরা তাদেরই কোমল হাতে এই কুড়োনো ফুল গ্রন্থকর্ত্রী শ্রীমতী ইন্দুলেখা চৌধুরী সাদরে উৎসর্গ করেছেন।

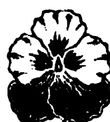
সত্যই আমাদের সোনামণিদের হাতে এই বইখানি বেশ মানাবে আর গল্পগুলি প'ড়ে তাদের মনে সোনালী আভা ছড়িয়ে পড়বে।

বইখানি, ঢাকা, বাণীমন্দির থেকে প্রকাশিত। গল্পের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকখানি ছবিও আছে।

সান-ইয়াৎ-সেন চীনের অতীত অজ্ঞানতা হ'তে উত্থান ও তার অবস্থার

সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর বাল্য জীবন হ'তে তাঁর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সান-ইয়াং সেনের জীবন কাহিনী অবলম্বন ক'রে সান-ইয়াৎ-সেন লিখিত হয়েছে। বইখানির মূল্য বার আনা। বর্ম্মন পাবলিশিং হাউস, ১৯৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হ'তে প্রকাশিত।

যে চীন শত শত বৎসর অত্যাচারিত হ'য়ে পড়েছিল, বাইরের জগতের সঙ্গে যার বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ ছিল না, মাত্র ত্রিশ বৎসরের ভিতর সেই জাতি কি ক'রে আপনার শক্তিকে যথার্থ ভাবে প্রয়োগ ক'রে সহস্র শৃঙ্খল হ'তে মুক্তি পেল তারই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই বইখানিতে আছে।



মরুর বাতাস

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার দাস

রাস্তার মোড়ের যে কোণটায় আঁধার একটু বেশী ক'রে জমাট বেঁধেছিল, সেখানে সে চোখে কাপড় দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। কয়েকজন সাদা পোষাক পরা যুবক তাকে ঘিরে পৈশাচিক আলাপ জুড়ে দিয়েছিল।...

তখন শ্রাবণের নিকষ-কালো আকাশের কোণ্ থেকে দেবতার অশ্রু গড়িয়ে তাদের মাথার উপর পড়্চে; নারীর অপমানে দেবতার রোষ গর্জ্জে উঠ্ছে বারবার গুরুম্ গুরুম্।...

পাশ দিয়ে যাচ্ছিলুম। নারীর অপমান দেখে চোখদু'টো জ্বালা ক'রে উঠ্লো।

লোকগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে বল্লুম, তোমার অবস্থা আমাকে বল ত। আমি বুঝতেই পাচ্ছি, এইমাত্র কোনো লম্পট তোমাকে এখানে রেখে গেছে। কিন্তু আমি যে আর তোমাকে এ রকম নিঃসহায় অবস্থায় রেখে যেতে পারি নে।

সে কিছু বল্লে না। তার মুখের দিকে তাকালুম, কিন্তু মুখ দেখতে পেলুম না। বস্ত্রাঞ্চলে সে মুখ ঢেকে ছিল। বোধ হয়—সে কাঁদ্ছিল।

বল্লুম, কাঁদবার ঢের সময় পাবে। তুমি আমার সঙ্গে চল—এর পরে হয় ত এখান থেকে তোমাকে উদ্ধার করা কঠিন হবে।

সে একবারে শিউরে উঠলো আমার কথা শুনে, কিন্তু এক পা নড়্লে না।

আমি বল্লুম, আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর্তে পারছ না; কিন্তু কি কর্বো—

আমর কথা শেষ না হতেই সে বল্লে, চলুন।...

* * * * *

সামান্য একটা ঘটনার ভেতর দিয়ে আমার এই ছন্নছাড়া জীবনটার এতবড় একটা পরিবর্ত্তন হ'য়ে যাবে, এ আমি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাব্তে পারি নি। মানুষের যা' চিন্তার অগোচর এমন অনেক কিছুই পৃথিবীতে প্রতি নিয়ত হয়ে যাচ্ছে, তাই বোধ হয়, যে অসহায় নারীকে আমি পথের সহস্র লোক-চক্ষুর কুৎসিৎ দৃষ্টির

সম্মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এলুম, আমার দুর্ভাগ্যবশত সে আমারই বিবাহিতা পত্নী। এর চেয়ে বড় আঘাত আমার কি থাকতে পারে—এর চেয়ে বড় অপমান আমার কি হতে পারে?

* * * *

খুব ছেলেবেলায় বাবা আমাকে আদর ক'রে বিয়ে দেন ধনীর মেয়ের সঙ্গে, কিন্তু 'বৌ' বলে কোনো একটি জীবকে তাঁর আর ঘরে আনতে হল না। বাবা গরীব হলেও 'আত্মসম্মান' ব'লে একটি পদার্থকে ভাল রকমেই চিনতেন। বিয়ের রাত্তিরেই আমার ধনী শ্বশুরের সঙ্গে কোনো একটা বিষয় নিয়ে তাঁর খুব একপালা ঝগড়া হয়ে গেল, এবং তার ফল হ'ল এই, আমার শ্বশুর মশায় প্রতিজ্ঞা করলেন, এই রকম ছোটলোকের ঘরে কিছুতেই তিনি তাঁর মেয়েকে দেবেন না; বাবাও জোর গলায় ব'লে এলেন, আমার প্রাণ থাকতে এমন অভদ্র ঘরের মেয়েকে আমি ঘরে আনবো না।

ব্যস্—এই খানেই যদি সব শেষ হয়ে যেত তাহলে আমার পক্ষ থেকে কিছু আপত্তি করবার ছিল না আর আজ তা'হলে এ রকম কেলেঙ্কারীর ভেতর গিয়েও আমাকে মাথা দিয়ে দাঁড়াতে হত না। কমলা যা বল্লে, তাতে বুঝা গেল, এর চেয়েও ভীষণ কিছু আমার শ্বশুর করতে চেয়েছিলেন। তিনি সেইদিন থেকেই কমলার হাতের নোয়া, শঙ্খ, পরনের শাড়ী ইত্যাদি সব খু'লে রেখে তাকে সাদা থান কাপড় পরিয়ে দিব্য বিধবার বেশে সাজিয়ে দিলেন। হিন্দু ঘরের বিধবার মত তাকে সমাজের হাতে-গড়া নিয়ম-কানুন—যাকে নিষ্ঠুরতা বললেও অত্যুক্তি হয় না, সে সব মেনে চলতে হত।

এক বছর এ রকম করে কেটে গেল।

মানুষ যা' চায় অনেক জায়গাতেই দেখা যায়, ঈশ্বর করেন ঠিক তার উল্টোটা। তাই কমলার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে যখন নিজের অবস্থার কথা জানতে পারলে, তখন থেকেই তার তরুণ হৃদয়টিতে বিদ্রোহের আগুন জ্ব'লে উঠলো। সে লুকিয়ে লুকিয়ে শাড়ী পরত, কপালে সিন্দুর দিয়ে আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে দেখত—তাকে কেমন মানায়, এই রকম আরো কত কি। অনেক সময় ধরা প'ড়ে তাকে এ জন্য নির্য্যাতিত হতে হয়েছে, তবু তার হৃদয়ে যে একটি অভিনব নেশার সৃষ্টি হয়েছিল, তা থেকে সে উদ্ধার পেলে না। উদ্ধার পে'তে চেষ্টাও করলে না, বরং তাতে সে মশগুল হ'য়ে ব'সে থাকতে চাইত।

…মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে, যখন সে একটা কিছু অবলম্বন চায়। এই অবলম্বনকে খুঁজতে গিয়ে যখন সে পৃথিবীর দিকে তাকায়, তখন সে সব জিনিষকেই রঙীন দেখে। ভাবে, পৃথিবী কি সুন্দর, জীবন কি মিষ্টি, মানুষ কি মহৎ! ফুলের হাসি, পাখীর গান তার বুকে সুখের শিহরণ জাগিয়ে তোলে।…

কমলার জীবনেও এই সময়টা আসতে বেশী দেরী হ'ল না।

এ রকম অবস্থায় যা স্বাভাবিক, তাই হ'ল।—অভিভাবকদের চোখে ধূলো দিয়ে অবলম্বনকে খুঁজে নিতেও তার মোটেই বিলম্ব হল না।

পরিণতি শেষটা, এই প্রকাশ্য রাজপথে!…

* * *

এ ক'দিন আমার উপর দিয়ে যেন একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। আমার চেহারাটারও যে কিছু বদল হয়েছে, বাড়ীর দাসীটার চোখ পর্য্যন্ত তা এড়ায় নি। সে বললে, আপনি এ রকম হয়ে গেলেন কেন বাবু? চুলগুলো উস্কোখুস্কো, চোখ যেন ব'সে গেছে। . . .

কিন্তু আসল কথা, এত ভেবে চিন্তেও কিছুই একটা ঠিক ক'রে উঠতে পারি নি। বেশ ছিলুম; মা-বাপ আত্মীয়-স্বজন সবাইকে হারিয়েও এই বাড়ীটার মধ্যে ছন্নছাড়া জীবনটাকে নিয়ে এক রকম কেটে যাচ্ছিল। এ রকম ঝঞ্ঝাটে পড়তে হবে—কে ভেবেছে?

ঝি ব'লে গেল, মা ঠাকরুণ এ রকম ভাবে যে কি ক'রে থাকেন, তা আমি ভেবে পাই নে বাবু। দু'বছরের মেয়ের মত দু'বেলা চাটি ভাত খেয়ে কি ক'রে মানুষ বাঁচে? আর যা চিন্তে!—সারাদিন ত ওই ঘরের ভেতরই থাকেন।—

এই বুড়ো ঝি আর আমাকে নিয়েই ছিল আমাদের এই ছোট্ট, সংসারটি।… কমলাকে দেখ্‌ছি সে আমার স্ত্রী ব'লেই গ্রহণ করেছে,—হয় ত- হয় ত বা কমলাই এ কথা তাকে ব'লে থাকবে।

এ দু'দিন কমলার সঙ্গে আমার চোখের দেখাটি পর্য্যন্ত হয় নি। কি জানি দেখা হবে ভাবলেই যেন বুকের ভেতর জ্বালা অনুভব করতুম।

আজ ভাবলুম, এ আমার পক্ষ থেকে নেহাৎ অন্যায় করা হচ্ছে। আমার আঘাত—আমার বেদনাটাই কি সব চেয়ে বেশী হল? কমলাই বা আমাকে কি মনে করছে?

তার ঘরের কাছে গিয়ে দেখ্‌লুম, দরজা ভেজানো রয়েছে। দরজার ফাঁক দিয়ে তাকে দেখা যাচ্ছে। বিছানার উপর ব'সে জানালা দিয়ে সে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। দিন-শেষের সোনালি রোদের আঁচ্ লেগে তার মুখখানা বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছিল। কিন্তু বড় বিষাদাচ্ছন্ন ব'লে মনে হল। দু'একটি চূর্ণ কুন্তল নিয়ে তার মুখের উপর বাতাস খেলা কর্‌ছিল। এই বিষাদময়ী মূর্ত্তিকে দেখে আমারও সহানুভূতিতে হৃদয় ভ'রে গেল।

ঘরে ঢু'কে কোমল কণ্ঠে ডাক্‌লুম, কমলা!

সে হঠাৎ চম্‌কে পিছনের দিকে তাকালে, পরক্ষণেই একটা বিরাট লজ্জায় সে তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় দিয়ে জড়সড় হ'য়ে বস্‌লো। মুখখানা তার একেবারে ছাইয়ের মত শাদা হ'য়ে গেল। সে হয় ত ভাব্‌লে, আমি তাকে মৃত্যু-দণ্ডের চেয়েও বড় একটা কিছু দিতে এসেছি।

তার পাশে ব'সে বল্‌লুম, ঝি বল্‌লে, তুমি নাকি খাওয়া-দাওয়া একরকম ছেড়েই দিয়েছ? ছি কমলা, এ রকম ক'রে কি শেষটা আমাকেও অপরাধী ক'রে তুল্‌বে। আর নিজের জীবনটা এ রকম ভাবে ধীরে ধীরে ফুরিয়ে ফেলেই বা লাভ কি?

সে এর উত্তরে কিছুই বল্‌তে পার্‌ল না। কেবল অসহায় ভাবে আমার দিকে একবার তাকালে। মনে হ'ল—সে চোখ দু'টির পিছনে তার বুকের সকল বেদনা যেন গ'লে গ'লে জল হ'য়ে রয়েছে।

আমি আবার বল্‌লুম, আমি এ রকম ক'রে আর থাক্‌তে চাই নে কমলা। হয় একটা আপোষ ক'রে ফেল, না হয় তোমার কি অভিমত তা আমায় খু'লে বল। চোখের উপরে তোমার এ রকম অবস্থা আর আমি দেখ্‌তে পারি নে কমলা।—

কথার ছন্দে বেদনার যে চিরন্তন সুরটি বেরিয়ে পড়ল, তা হয় ত কমলা সহ্য কর্‌তে পার্‌লে না। সে এবার কেঁদেই ফেল্‌লে।

* * * *

অনেক ভেবে চিন্তে দেখলুম, কমলাকে আমি অবহেলা কর্‌তে পারি নে। আশ্রয় দেব, এ আশা দিয়েই তাকে এনেছি। এর পরেও কি তাকে বিমুখ ক'রে দেওয়া যেতে পারে? তা' ছাড়া কমলা নেই—একথা ভাব্‌তেও যেন আমার বুকে একটা অজ্ঞাত ব্যথা বেজে উঠে। এ বেদনা আমি সইতে পার্‌বো না কক্‌খনো—সইতে চাইও নে।...

* * * *

কমল', কেন তুমি এত সঙ্কুচিত হচ্ছ? আর যাই হোক, আমার কাছে ত তুমি কিছু লুকোতে পার না?—আর আমাকে পর ব'লেও ঠেলে দিতে পার না—

একটা কৌচের উপর ব'সে ছিলুম। কমলা নীচে আমার পায়ের কাছে ব'সে ছিল। সে ধীরে ধীরে আমার পায়ের একটা আঙুল খুঁটতে খুঁটতে বল্‌ল, আর যাই হোক, আমি নিজেকে যে কিছুতেই চোখ ঠেরে ঠকাতে পারি নে। নিজের সব কথা যখন আমার একটি একটি ক'রে মনে হয়, তখন কিছুতেই আমি আপনার কাছে থাকতে পারি নে। মনে হয়, এতে আপনার যেন কোনো অমঙ্গল হবে।—

ছি কমলা, নিজেকে এতটা ছোট ক'রে রাখতে নেই! মানুষমাত্রেরই ভুল ভ্রম হ'য়ে থাকে। সংসারের পিচ্ছিল পথে চলতে চলতে পদস্খলন হওয়া ত অস্বাভাবিক নয় কমলা।

—ওগো দেবতা, তুমি কি পাথরের দেবতা? ওগো এই জন্যই ত তোমার সান্নিধ্য আমি সইতে পারি নে। যখন মনে হয়, এত বড় মহৎ একটা মানুষের বুকে দাগা দিয়েছি—আঘাত দিয়েছি, তখন আমার ভিতরটাতে যেন আগুন ধ'রে যায়। তোমাকে হারিয়ে কত বড় জিনিষকে যে আমি হারিয়েছি—ভাবতে গেলে বুকখানা আমার ফেটে যেতে চায়। আজ আমার মত সুখী ছিল কে?—ব'লে আমার পায়ের উপর মাথা রেখে কমলা চোখের জলে ভেসে ভেসে এই কথাগুলো বল্‌লে।

হাতে ধ'রে তাকে কৌচের উপর উঠিয়ে পাশে বসিয়ে বল্‌লুম, হারাও নি, তুমি কিছুই, বরং যেটুকু দূরে ছিলে, ঘটনা-বৈচিত্র্যে প'ড়ে সেটুকু কাছে এসেছ। আজ আমি যদি তোমার সমস্ত কলঙ্ক, সমস্ত অপরাধ মাথায় তুলে নিয়ে তোমাকে এম্‌নি ক'রে আমার কাছে আরো টেনে নি, তা'হলে—তা'হলে তুমি কি আবার সব ভুলে যেতে পার না কমলা?—ব'লে তাকে বুকে চেপে ধ'রে মুখের কা'ছে মুখ এগিয়ে নিতেই সে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলে—পারব না গো, পারবো না—কিছুতেই নয়। সঙ্গে সঙ্গে সে যেন কি একটা আতঙ্কে ভীতা হরিণীর মত ঘর ছেড়ে বাইরে ছু'টে গেল।

* * * *

এ রকম ভাবে সে চলে যাবে—তা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। কাল রাত্তিরেও ত সে আমার সমস্ত শাসন-বাক্যকে মাথায় তু'লে নিয়ে পোষমানা পাখীটির মত আমার বুক আঁকড়ে ধ'রে শুয়েছিল! কে ভেবেছে যে, শেষটা অভাগিনী এ রকম ক'রে শিকল কেটে চ'লে যাবে?

পরশু রাত্তিরে হঠাৎ জেগে দেখি সে আমার পা দুটো বুকে চেপে ধ'রে শুয়ে আছে। কি যে বেদনা ওর বুক জুড়ে ছিল, কিছুতেই তা আমার কাছে প্রকাশ করলে না! আমার বাহুবেষ্টনের মধ্যে সে কেবল শিউরে উঠত; আমার হাতে কেন সে এমন আগুনের স্পর্শ পেত বুঝতে পারি নে।

. . . এক পশলা বৃষ্টির পর শেষরাত্তিরে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। জাগতে একটু বেলা হয়ে গেছল। চেয়ে দেখি, বিছানায় কমলা নেই। বাইরে কোথাও তাকে খুঁজতে হল না। বিছানার উপর একখণ্ড কাগজ পড়েছিল, কুড়িয়ে দেখি, সেই কাগজটুকুর মধ্যে হতভাগিনী, তার জীবনের সেই লুকানো অংশটার একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে চিরতরে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে।—

কোথায় গেছে, তা কিছুই সে লেখে নি, তবে আমার কাছ থেকে গিয়ে সে যে পৃথিবীর আর কোথাও ঠাঁই ক'রে নিবে, এ বিশ্বাসও আমার নেই।

সে সেই কাগজটুকুর বুকে লিখে গেছে—একটা কথা আমি সব সময় তোমার কাছে লুকিয়ে এসেছি। সেই লুকানোটাই তোমার সঙ্গে মেশবার পক্ষে আমার অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল কিনা কে জানে? কেন তোমার দু'টো স্নেহের কথায় আমার চোখ ভ'রে জল আসত, কেন তোমার উদার বক্ষে মুখ রেখে আমি সোয়াস্তি পেতাম না, কেন আমার মুখে তোমার মুখের পেলব স্পর্শ পেলে আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠত, তা আমি যদি আজ তোমাকে না বলি, তা' হলে আমি কোথাও শান্তি পাব না!...জানি নে তুমি আমাকে কি ভেবে তোমার পায়ে স্থান দিয়েছিলে। কিন্তু স্থান দিলেই কি সব হল? যে স্থান পেল, তার পক্ষ থেকে কি কোনো কথাই থাকতে পারে না? সে সে-স্থানের যোগ্য হল কি না হ'ল, পূজা করবার অধিকার তার কতটুকু আছে—এ সব কি দেখতে হবে না?...

সত্যি কথা বলতে কি, আমি পতিতা। পতিতা বলতে যতটুকু বুঝায় আমি তাই। আমি জানি, একথা শুনলে তুমি আমাকে পায়ে স্থান দিতে না, কিন্তু না বললেও আমি সোয়াস্তি পেতাম না। তুমি দিলে আমাকে পূজার ভার,

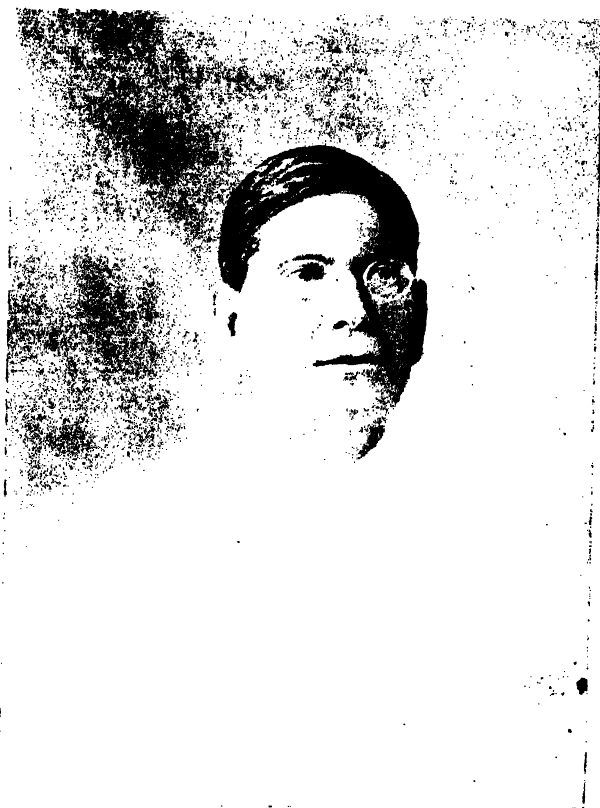
অথচ অন্তরে আমার এতখানি মলিনতা;—কি করে আমি তোমার পূজা করি? . . .

* * * *

আরো লিখেছিল, কিন্তু পড়া কোনো দরকার মনে করলুম না। সে যে আমার কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে গেছে—এইটুকু ভাবতেই আমার বুকটা একেবারে খালি হয়ে গেল।

হতভাগিনী এসেছিল একটা মরুভূমির উত্তপ্ত বাতাসের মত, চলেও গেল তেমনি ক'রে পিছনে রেখে একটি জ্বালাময় চিহ্ন। আমার সমস্ত শরীরে যে তার আগুনের স্পর্শ লাগিয়ে গেল, সেই জ্বালাটুকু যত অসহনীয়ই হোক্ না কেন, আমি তার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে চাই নে। -





রাজর্ষি চিত্তরঞ্জন



তৃতীয় বর্ষ

চতুর্থ সংখ্যা

শ্রাবণ, সন ১৩৩২ সাল

প্রতি সংখ্যা চারি আনা

মাশুলসহ বার্ষিক তিন টাকা আট আনা

সম্পাদক—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

সহ-সম্পাদক—শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ

কল্লোল পাবলিশিং হাউস

২৭ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রাজর্ষি চিত্তরঞ্জন

দাশ-পরিবার—চিত্তরঞ্জন যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তদানন্তীন বাংলায় তাহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। দুর্গামোহন দাশ, কালীমোহন দাশ ও ভুবনমোহন দাশ ব্রাহ্ম-সমাজের বাল্যইতিহাসে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ভুবনমোহন দাশ চিত্তরঞ্জনের পিতা। তিনি "Brahmo Public Opinion" ও পরে "Bengal Public Opinion"-এর সম্পাদক হন। চিত্তরঞ্জনের চরিত্রের প্রধান বিশেষত্বগুলি চিত্তরঞ্জন তাঁহার পিতা ভুবনমোহন দাশ মহাশয়ের ও তাঁহার বংশ হইতে পাইয়াছিলেন। যে উদার দানশীলতা ও যে আত্মনিগ্রহকারী সর্ব্বরিক্ততা আজ তাঁহাকে বাঙালীর হৃদ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া রাখিল, তাহার বীজ তিনি আপনার রক্তে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। আজও বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের মধ্যে শুনিতে পাই যে, ভুবনমোহন দাশ মহাশয় যখন অফিস হইতে ফিরিয়া আসিতেন তখন প্রতিবাসী বালকদিগের মধ্যে বিতরণের জন্য নিত্য সন্দেশ লইয়া আসিতেন। আত্মীয়-স্বজনের বিপদে আপদে সাহায্য করিবার জন্য তিনি আপনি ঋণে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন এটর্ণী ছিলেন। ঋণভার অত্যধিক হওয়ায় অবশেষে তিনি দেউলিয়া হইয়া যান। চিত্তরঞ্জন তাঁহার প্রথম যৌবনে পিতার সমস্ত ঋণ আপনার স্কন্ধে লইয়াছিলেন এবং স্বর্গগত আত্মার কল্যাণে আপনি সমস্ত ঋণ পরিশোধ করেন।

জন্ম ও শিক্ষা—৫ই নভেম্বর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় চিত্তরঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের পৈত্রিক ভিটা বিক্রমপুর পরগণায় তেলিরবাগ নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামে। চিত্তরঞ্জন বাল্যে ভবানীপুরে লণ্ডন মিশনারী কলেজ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। পরে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বি, এ পাশ করিয়া বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য যান। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও তিনি সিভিল সার্ভিস পাইলেন না।

বিলাতে—তখন বিলাতে দাদাভাই নওরোজী পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য হইবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন। যুবক চিত্তরঞ্জন দাদাভাই নওরোজীর সদস্য হইবার প্রচার কার্য্যে মহা-উদ্যোগী হইয়া বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত বক্তৃতার মধ্যে জাতির মঙ্গল-পুরোহিত আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তাহার পরে মিঃ জন ম্যাকলিয়ান নামক পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য কোনও বক্তৃতায় হিন্দু ও মুসলমান জাতির বিরুদ্ধে অত্যন্ত গর্হিত ভাবে কতকগুলি মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাহার প্রতিবাদের জন্য চিত্তরঞ্জন বিলাতে ভারতবাসিগণের এক সভা আহ্বান করেন এবং সেই সভায় এমন তীব্র ভাবে ম্যাকলিয়ানকে প্রতিবাদ করেন যে, তাহার ফলে ম্যাকলিয়ানকে ক্ষমা চাহিতে ও পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যের পদ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তখন গ্ল্যাডষ্টোন ইংলণ্ডের প্রধান সচিব। ভারত-সমস্যা বিষয়ে এক সভায় তিনি সভাপতি। সেই সভায় চিত্তরঞ্জনকে ভারত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করা হয়। এই বক্তৃতাই তাঁহার কর্ম্মের ধারা বদলাইয়া দিল। এই বক্তৃতার ফলে তিনি সিভিল সার্ভিস হইতে বঞ্চিত হইলেন। তখন তিনি ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য Inner Temple-এ যোগদান করিলেন এবং ১৮৯৩ সনে ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

আইনব্যবসায়ী ও অরবিন্দ ঘোষ—এই পথে তাঁহাকে সাহায্য করিবার কেহ না থাকায় নবাগত ব্যারিষ্টার হইয়া তাঁহাকে অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। অর্থোপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াই তিনি আবার তাঁহার পিতার সমস্ত ঋণ স্বেচ্ছায় আপনার স্কন্ধে বহন করিলেন। তখন বাংলা দেশে এবং বাংলার বাহিরে ভারতে কতকগুলি মরণজয়ী যুবক ভারতের মুক্তি-কামনায় আত্মনিয়োগ করিতেছিল। সাধারণের অন্তরালে বিদ্রোহী গণ-দেবতা জাগিয়া উঠিতেছিল। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ এই দলের মন্ত্রদাতা নেতাহিসাবে রাজদ্বারে দণ্ডিত হন। তখন এই তরুণ ব্যবহার-জীবি আপনার লাভ-ক্ষতির সমস্ত চিন্তা দূর করিয়া অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনের জন্য দাঁড়াইলেন। যে সময়ে এই তরুণ ব্যবহারজীবি যে অসামান্য বিচার-বুদ্ধি ও তীক্ষ্ম মনীষার পরিচয় দিয়াছিলেন, আইন-শাস্ত্রের ইতিহাসে তাহা অত্যন্ত বিরল। ক্রমশ আইনব্যবসায়ী হিসাবে তাঁহার যশ প্রতিদিন বাড়িয়া চলিল। চিত্তরঞ্জন কলিকাতায় একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার-জীবি হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মাসিক আয় ত্রিশহাজারেরও উর্দ্ধে উঠিল।

রিক্ত লক্ষ্মপতি—চিত্তরঞ্জন কোনও দিন আয়ের দিকে চাহিয়া দিন কাটান নাই। এ তাঁহার বংশের বিশেষত্ব। বালক যেমন অসীম আগ্রহে উজ্জ্বল রত্ন বা দ্রব্য অজস্র আপনার সম্মুখে পাইলে আবরণের সর্ব্বত্র ভরিয়া লয়—তারপর কিছুক্ষণ পরেই সঙ্কলনের ভারে সঙ্কলিতের কথা ভুলিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে—চিত্তরঞ্জনও তেমনি আপনার ভাণ্ডারে অজস্র অর্থ সঙ্কলন করিতেন, পরমুহূর্ত্তে পূর্ণ ভাণ্ডার শূন্য দেখিতে হইলেও কিছুমাত্র বিস্মিত হইতেন না। কত দরিদ্র পরিবার, কত কর্ম্মহীন যুবক, কত দেশ-কর্ম্মী, কত রিক্ত-ভাণ্ডার সাহিত্যিক তাঁহার উদারতার অনাবিল স্পর্শ পাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছেন তাহার আর সীমা-পরিসীমা নাই। আইন-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া যখন তিনি দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া নামিলেন তখন ভারতবর্ষ বিস্মিত হইয়া এই ত্যাগের মহত্বকে শ্রদ্ধায় স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। তার পরে তিনি আপনার আবাসবাটী পর্য্যন্তও ত্যাগ করিলেন। স্বদেশ-প্রেম যেন তাঁহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছিল।

জীবন ও কাব্য—এই উন্মাদনা ছিল তাঁহার জীবনের মূলে। তাঁহার জীবনখানি যেন একটী মহাকাব্য। কাব্যের প্রতি সর্গের মধ্য দিয়া একটী উদার উর্দ্ধগ শক্তি যেমন সকল বিভিন্ন কর্ম্মের অন্তরালে থাকিয়া কাব্যের পরিণতির দিকে সলীল আনন্দে ছুটিয়া চলে, তেমনি তাঁহার জীবনের সমস্ত কর্ম্মের মূলে দেখা যায় এক বিশাল ছন্দবিলাসী আনন্দচঞ্চল গতিবেগ—একটী উচ্ছল প্রাণধারা। তাই তাঁহার রাজনীতির একপাতায় যেমন কূট নীতি-জাল—অন্য পাতায় বিশাল ভাবপ্রবণতা। তাই রাজনৈতিক চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতায় প্রায়ই একটী কবির একতারা বাজিয়া উঠিত। স্কুল পরিত্যাগের সময় এক বক্তৃতার আরম্ভে ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :—

তোমাদের সবার মাঝে দেশমাতৃকা তাঁরই ইচ্ছা মূর্ত্তিপরিগ্রহণ ক'রে জাগে। সে নারী কে, জানি না। এই শুধু জানি, সে জননী সকল জাতির। আজ উন্নত শিরে বলি, হে জননী বঙ্গ, তোমার নদী-তড়াগ ধন্য হক্, ধন্য হক্ তোমার পুষ্পিত তরু-লতা, ধন্য হক্ তোমার সন্তান-সন্ততিরা।"

সাহিত্য ও মানবতা—এই উদার ভাবপ্রবণতা লইয়া কেহ শুধু রাজনীতি লইয়া থাকিতে পারে না। ১৯১৫ সালে তিনি "নারায়ণ" নামে মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। "নারায়ণ" বাংলা মাসিক সাহিত্যের

ইতিহাসে একটী সবিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। পরে দ্বীপান্তর হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ইহার পরিচালনা করেন। বাণীর কমলকুঞ্জের মধুগন্ধও চিত্তরঞ্জনের প্রাণকে টানিয়াছিল। সেখানেও তিনি সেই ভাবপ্রবণ রূপতান্ত্রিক কবি। তাঁহার কাব্যের দেবতা ছিলেন রূপময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।—বিলাস যাঁহার ভূষণ, লীলা যাঁহার গতিছন্দে, রূপ যাঁহার অগ্নির মত পাবক উজ্জ্বল, প্রাণ যাঁহার ভোগবিলাসী অথচ উদাসী। এই রূপময় দেবতা তাঁহার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ছিল। তাঁহার বৈষ্ণব-কাব্যের সমালোচনা পাঠে তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। এবং এই বৈষ্ণব ধর্ম্ম তাঁহার চরিত্রে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। নান্নুরের মঠের দরিদ্র কবির পদাবলী তাঁহার জীবনে এক মহান্ মানবতার ছাপ রাখিয়া গিয়াছিল, যাহাকে রাজনৈতিক চিত্তরঞ্জন ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই। এবং সেদিনও ফরিদপুরের রাজনীতি-সভায় তাঁহার শেষ-কথায় এই মানবতা মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া উঠিয়াছিল। তাহা কোন আকস্মিক উক্তি নয়। চিত্তরঞ্জনের মন কবিত্ব রসে ভরপুর ছিল। মরণের একদিন আগেও তিনি সাহিত্যচর্চ্চার আনন্দে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি সাগর-সঙ্গীতের কবি। সাগরের সঙ্গীত যুগে যুগে কত কবিকে উন্মাদ করিয়াছে। তাহার অগাধ রূপের মধ্যে কেহ ভয়ানককে দেখিয়াছে, কেহ চিরসুন্দরকে দেখিয়াছে, কেহ বা দেখিয়াছে অমর নশ্বরতাকে। চিত্তরঞ্জন দেখিয়াছিলেন চির-সুন্দরকে। যে সাগরে হিন্দুর পুরাণ-কাহিনী শুক্তির মত লুকাইয়াছিল—যাহার মন্থনে কত কাব্য-কাহিনী মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিল—ক্ষীরোদ-সিন্ধুশায়ী নারায়ণ কমলাসনে যেখানে নিত্য বিরাজমান, গভীর, অনাদি, অনন্ত, রূপময় যে সাগরের নীল রূপ একদিন নীলাচল হইতে ভগবান চৈতন্যকে রূপের আকর্ষণে আপনার নীল-নীরে টানিয়া লইয়াছিল—এ সেই সাগর। এই সাগরের তরল নীল যেন মরণের সুন্দর অঙ্গবাস। "কিশোর-কিশোরী"তে একটী সরল সহজ সুর শুধু গাহিয়াছে যে, যুগে যুগে অপরূপ রূপ-পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া একটী কিশোরের প্রেম—একটী কিশোরী-তনুকে বেড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে। প্রেম যেন জাতিস্মর হইয়া জন্মজন্মান্তরের কাহিনী বলিতেছে। "মালঞ্চ," অন্তর্যামী" ও "মালা" গাথা-কবিতার সংকলন। এবং এই সমস্ত কবিতায় বৈষ্ণব সাহিত্যের ছাপ যথেষ্ট পড়িয়াছে। তাঁহার পুস্তকের মধ্যে "সাগর-সঙ্গীত" আর "মালঞ্চ" পুনর্মুদ্রনের অপেক্ষায়

রহিয়াছে। মনে হয়, এই রূপতান্ত্রিকতা তাঁহার ধর্ম্ম-মত পরিবর্ত্তনেরও মূলে ছিল। তাঁহার পিতা ছিলেন নিরাকার একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম। চিত্তরঞ্জনের অন্তরে এই পরব্রহ্মের নিরাকার অসীমত্ব অপেক্ষা বৈষ্ণবের শরীরী ও রূপময় ভগবান্ অধিক সুন্দর লাগিয়াছিল। উপনিষদের গূঢ় তত্ত্ব অপেক্ষা বৈষ্ণব-শাস্ত্রের রূপ-রস-উন্মাদনা তাঁহার জীবনকে অধিকতর ভাবে আলোড়ন করিয়াছিল। তাই তিনি আপন কন্যার বিবাহ হিন্দু মতে নারায়ণের বিগ্রহের সম্মুখে বিবাহ দিয়াছিলেন।

রাজনীতি ও জাতীয়তা—জীবনের শেষাংশ তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে দেশের মুক্তি-কামনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্যাগী হইয়া এই সর্ব্বভোগী উদাসী রিক্ততার কমণ্ডলু হস্তে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দেহ, মন, আত্মসুখ ভুলিয়া হৃদয় ও মস্তিষ্ক দিয়া স্বদেশ-উদ্ধারের যে-কোন পথ পাইয়াছেন—তাহাই অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি শুধু রাজনীতিবিদ্ ছিলেন না। যে-কেহ এই রাজনীতি-সম্পর্কে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন তাঁহাকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, এত বড় আত্মপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব ও অমানুষ তেজ দুর্লভ। দেশকে তিনি সমস্ত বৃত্তি ও ইন্দ্রিয় দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন। এবং এমন করিয়া পাগল হইয়া ভালবাসিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া সহসা যখন তিনি তিরোহিত হইলেন তখন সমগ্রভারত জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে চিতাগ্নির দিকে চাহিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল। তাঁহার নিকট দেশসেবা শুধু রাজনীতির সূত্রের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার কাছে দেশসেবা ইউরোপীয় রাজনীতির অনুকরণ নয়। সে আমার ধর্ম্মের অঙ্গ, আমার জীবন। আমার দেশমাতৃকার মূর্ত্তির মধ্যে আমার ভগবান্ও জাগ্রত।" কংগ্রেসের ইতিহাস, আবেদন-নিবেদনের স্তুতি-মিনতি, বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের শূন্য আশার বাণী, মিঃ মণ্টেগুর ভারত-আগমন, মর্লি-মিণ্টো রিফর্ম, কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী, এ সমস্ত কথার পুনরুত্থাপন এখানে নিষ্প্রয়োজন, তবে এই সমস্তের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে চিত্তরঞ্জন দেশ-বন্ধু ও দেশ-নায়ক হইয়া উঠিলেন—জাতির অন্তরে তিনি নিঃশব্দে সিংহাসন পাতিয়া লইলেন। যখন মহাত্মা গান্ধী অহিংস আন্দোলনের প্রস্তাব আনিলেন তখন দাশ তাঁহার আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া মহাত্মার সহিত যোগদান করিলেন। এবং তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত যে ক্রমান্বয়

সংগ্রাম চলিয়াছে, আমরা তাহার মধ্যে রহিয়াছি, প্রত্যেকেই আপনার জীবন দিয়া এই সংগ্রামের সত্তা অনুভব করিতেছি। ১৯২২ সালে গভর্মেণ্ট হইতে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক দলকে আইন বিরুদ্ধ বলিয়া সাব্যস্ত করা হয় এবং তাহার ফলে বহুসংখ্যক যুবক তখন কারারুদ্ধ হন। সেই সময় গভর্মেণ্টের নিষেধ সত্ত্বেও চিত্তরঞ্জন স্বেচ্ছাসেবকের দলকে নিত্য পুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন, তাহার ফলে তিনি কারারুদ্ধ হন। কারামুক্তির পর চিত্তরঞ্জন গয়া কংগ্রেসে সভাপতি হন এবং সেই সভায় স্বরাজ্যদলের উত্থান হয়। অসহযোগীদিগের পক্ষে কাউনসিল প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। তিনি বলিলেন, আমরা কাউন্সিলে গিয়া প্রমাণ করিয়া দিব, রিফর্মের নামে যে কাউন্সিল বসিয়াছে তাহা সত্যকারের নয়। গভর্মেণ্টকে নিয়ত বাধা দিয়া তাহাকে ভাঙ্গিতে হইবে। তাহার পর তিনি স্বরাজ্যদলের নেতা হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া আপনার মত প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এবং দেখিতে দেখিতে স্বরাজ্যদল ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বলশালী হইয়া উঠিল। এবং আমরা সবাই জানি চিত্তরঞ্জন যাহা বলিয়াছেন তাহাই করিয়াছিলেন। ব্রিটীশের সমস্ত আইনের বল ও ভরসাকে উপহাস করিয়া তিনি সিংহবিক্রমে আপনার মস্তিষ্ক ও অনন্যসাধারণ তেজে কাউনসিল ও শূন্যগর্ভ রিফর্ম উঠাইয়া দিতে বাধ্য করাইয়াছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত আন্দোলনের ফলে তাঁহার শরীর একদম ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তাহাও উপেক্ষা করিয়া তিনি ফরিদপুর কনফারেন্সে আসিলেন। কিন্তু দেহের ভঙ্গুর ভাণ্ডে আঘাত বড় বেশী লাগিয়াছিল—তাই যখন সংগ্রাম ঘনাইয়া আসিতেছিল, সেনা-নায়কের মুখের দিকে চাহিয়া যখন জয়োন্মাদ সৈনিক উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল—অকস্মাত মৃত্যু আসিয়া সেনা-নায়ককে লইয়া তিরোহিত হইল। ফরিদপুর কন্‌ফারেন্সের পর তিনি নষ্ট-স্বাস্থ্যের উদ্ধারের জন্য দার্জ্জিলিঙ্গে যান। এবং ১৬ই জুন বেলা ছয় টার সময় অকস্মাৎ কলিকাতায় বজ্রপাতের মত শোনা গেল—চিত্তরঞ্জন নাই। হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হইয়া যাওয়ায় এই আকস্মিক মৃত্যু।

চিতা-দিবস—চিত্তরঞ্জন নাই, কলিকাতার কেহই বিশ্বাস করিতে পারে নাই। সেদিন অপরাহ্নে দেখিতে দেখিতে এই নিষ্ঠুর সত্য বায়ুর সহিত মিশিয়া দিকে দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। বোধ হইল প্রত্যেক ব্যক্তি যেন তাহার জীবনের সর্ব্বোত্তম কল্যাণ হারাইয়া ফেলিয়াছে। পথে, দোকানে গৃহে ক্লাবে সর্ব্বত্রই সে এক কথা—চিত্তরঞ্জন নাই। দারর্জ্জিলিঙ্গের



অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ চিত্তরঞ্জন

সমস্ত অধিবাসী এই আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদে স্তব্ধ ও ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। পরদিন বাংলার গভর্ণর সার জন কার, আব্‌দার রহিম, হিউ ষ্টিফেন্‌সন প্রভৃতি সকলেই এই সংবাদে ব্যথিত হইয়া কি রূপে মৃতকে সম্মান দেখাইতে পারেন ও ব্যথিত পরিবারবর্গকে সাহায্য করিতে পারেন তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। শত্রু, মিত্র, জাতি ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে এই মৃত্যুকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিল। পরদিবস বুধবার শব-দেহকে লইয়া গাড়ী কলিকাতার দিকে রওনা হইল। মৃতদেহকে নষ্ট না হইতে দিবার জন্য ইন্‌জেকসন্ করা হইয়াছিল। রেলের কর্ত্তৃপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিশ পর্য্যন্ত সকলেই মৃতের সম্মান রক্ষার্থ যে প্রকার সাহায্য করিয়াছিল তাহা অতীব প্রশংসনীয়। কোন দোকানদারকে বলিতে হয় নাই, আজ চিত্তরঞ্জন মরিয়াছেন, দোকান বন্ধ রাখিও। কাহাকেও বিজ্ঞাপন দিয়া ডাকিয়া আনিতে হয় নাই যে, চিত্তরঞ্জন মরিয়াছেন, শবানুগমনে আসিও। বৃহস্পতিবার প্রত্যুষে দার্জ্জিলিং মেলে পুণ্য শব দেহ আসিবে। আষাঢ়ের আচ্ছন্ন উষায় সেদিন কলিকাতা এক মহা-দৃশ্য দেখিয়াছিল। অগণিত জনসমুদ্র স্তম্ভিত সমুদ্রের মত সেদিন ষ্টেশনের সম্মুখে সমবেত হইয়াছিল।—সেদিন সমস্ত একাকার হইয়াছিল। চিত্তরঞ্জন সারাজীবন ধরিয়া আপনার মর্ম্মকোষে যে মহামূর্ত্তিকে কল্পনায় লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, চিত্তরঞ্জনের অকস্মাৎ মৃত্যু সেই মূর্ত্তিকে বাস্তব করিয়া তুলিয়াছিল। সমগ্র জাতি এই মৃত্যুর মহাপ্রেরণায় মিলিত হইয়াছিল। শবাধার ষ্টেশনে নামান হইল। মহাত্মা গান্ধী হইলেন প্রধান শব-বাহক। বাক্‌হীন উন্মাদ জনসমুদ্র দুলিয়া দুলিয়া উঠিল। কোথা হইতে কে আসিল স্বেচ্ছাসেবকের দল। শিয়ালদা হইতে শ্মশান পর্য্যন্ত সমস্ত পথ যে দৃশ্য দেখিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। পথে প্রত্যেক বাতায়নে বাতায়নে পুরনারীগণ অশ্রুজল ফেলিয়াছে। উন্মাদ জনসমুদ্র হাসি-কান্নার ঊর্দ্ধে এক আচ্ছন্ন ভাবে চলিয়াছে। সমস্ত পথে রক্তপদ্ম, শ্বেতপদ্ম যূঁই, জবা, যে যাহা পাইয়াছে তাহাই দিয়া মৃতকে পূজা করিয়াছে। পথে পুরনারীগণ আসিয়া জাতির অন্তর-লক্ষ্মীর মত মৌনক্রন্দনে আকাশকে মুহ্যমান করিয়াছিল। মধ্যাদিনের উত্তাপের জন্য প্রায় প্রত্যেক গৃহের উপর হইতে যে যাহা করিয়া পারিয়াছে তাহাতেই জলবর্ষণ করিয়াছে। সেদিন কলিকাতার রাজপথ প্রস্তরব্যথিত বক্ষে যে পদধ্বনি শুনিয়াছে তাহার প্রতিধ্বনি ভারতবাসীর মর্ম্মে জাগ্রত থাকিবে। পথে কাতারে কাতারে লোক চলিয়াছে—

সম্ভ্রান্ত নীচ, মধ্যবিত্ত, যে-কোন পংক্তির বা যে-কোন দলের লোক পাশাপাশি চলিয়াছে। বাঙালী, শিখ, হিন্দু, মুসলমান, গুজরাটী, মাড়োয়ারী সেদিন পথে একত্রিত হইয়া চলিয়াছিল। সারাপথে সাহেব নর-নারী বিস্মিত নয়নে সেই জনতার মধ্যে দাঁড়াইয়া মৃতকে সম্মান দেখাইয়াছিল। শ্মশানে শব পৌঁছিতে প্রায় বিকাল হইয়া আসিয়াছিল। সমগ্র জাতির সম্মুখে চিতার অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। চিতাগ্নির পূত আলোকে একটি সমগ্র জাতির মূর্ত্তি দেখা গেল। মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারিয়া আকুল জনসমুদ্র শ্মশান-ভূমির মধ্যে বিপুল বন্যার মত ভাঙিয়া পড়িল। চিতাগ্নির আলোকে মহাত্মা গান্ধী শেষ আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিলেন। তখন মনে পড়িল, একদিন কংগ্রেসের মণ্ডপে দাঁড়াইয়া চিত্তরঞ্জন যে কথা বলিয়াছিলেন, আজ এই মুহ্যমান্ জনসমুদ্র হইতে তার নিদারুণ প্রতিধ্বনি আসিতেছে:—

"আমার কি হবে জানি না, জানি না আজকের এই সব জীবন কি হবে …শুধু এই কথা জানি, জগতে জাগতে হবে। আজ আমার চোখের সামনে সেই ছবি শুধু জাগে—মিলিত ভারত—একটী উন্নত গৌরবান্বিত জাতি। তখন আমি জীবিত থাকি বা না থাকি, আমার পুত্রকন্যা জীবিত থাকে বা না থাকে, একটী জাতি জাগবে—আত্মপ্রতিষ্ঠায় আত্মপরিমায়—এ মূর্ত্তি আমার লক্ষ্য। প্রয়োজন হলে এই সাধনায় আমি জীবনের প্রিয়তম সব কিছু বিসর্জ্জন দিব। এবং এই সাধনায় যদি মরে যাই—ক্ষতি কি? যদি মরি আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আবার আমি এই মাটিতেই জন্মাব, বারে বারে, প্রতি জন্মে জন্মে, এরি মাটীর কোলে এসে এসে সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে এর পূজা ক'রে ফিরে যাব আবার আসব যতদিন না আমার আশা ও ধ্যান মূর্ত্ত হয়ে উঠবে।"

একটী বৎসরের মধ্যে বাঙালীর ভাগ্য-বিধাতা, দুই মহাপুরুষ গত হইল! সংগ্রাম যখন জয়োন্মুখ হইয়া আসিতেছিল—সেনানায়ক ভূমিশায়ী হইলেন। আদি গঙ্গার শীর্ণ-বক্ষে বাংলার আশা চিতা-ভস্ম হইয়া তাহার চিতাগ্নি-তপ্ত বালুকায় মিশাইয়া আছে। আশুতোষ নাই। আজ চিত্তরঞ্জনও নাই। জাতির এই দুর্ভাগ্য সমবেদনারও অতীত। যে দিব্য-পুরুষ জাতির ভাগ্য-বিধাতা হইয়া জাতির জীবনকে লইয়া এই নির্ম্মম ক্রীড়ায় ব্যাপৃত—হয় ত যখন তিনি দক্ষিণ করে মৃত্যু পরিবেশনে রত—তখন আবার বাম করে সংগোপনে অমৃত সঞ্চয় করিতেছেন।

জীবনাহুতি

শ্রীপঞ্চানন মজুমদার

মানুষ যখন হারায় তখন সে কেবলই হারায় না—পায়ও; অনেক সময় বেশী করিয়া, ভাল করিয়াই পায়। বুঝি ইহাই বিধাতার নিয়ম। বাংলা দেশ আজ যাহা হারাইয়াছে তাহা অমূল্য। বাংলার বন্ধু, নায়ক, বাংলার শ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীর, স্বরাজ-যজ্ঞের অন্যতম হোতা, দীনা বঙ্গজননীর প্রিয়তম সন্তান, চিত্তরঞ্জন অকালে কালগ্রাসে পতিত। চিত্তরঞ্জনশূন্য বাংলা আজ শোকের মহা অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কিন্তু যখন শোকার্ত্ত বঙ্গবাসী দেখিল, চিতার আগুন নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বেই চিত্তরঞ্জন সমগ্র ভারতবাসীর চিত্তে এক অপূর্ব্ব আভায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছেন, জাতি বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, পারশী, মারাঠী, বৌদ্ধ, জৈন, ইংরেজ, ফরাসী সকলেই তাঁহার উদ্দেশ্যে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে, তখন বাঙ্গালী অন্তরের অন্তরে বুঝিল, সে তাহার চিত্তরঞ্জনকে হারায় নাই—সমগ্র ভারতের অন্তরের মধ্যে পাইয়াছে। পীড়িত দেশের এই ঘোর দুর্দ্দিনে ইহা অপেক্ষা বড় সান্ত্বনা, বড় লাভ মানুষ কল্পনা করিতে পারে না।

মৃত্যুর পিছনে যে অমৃত প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মানুষকে সহস্র হস্তে বরাভয় দান করে, তাহা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত সময় এখনও আসে নাই। সমস্ত দেশের প্রাণ এখনও চিত্তরঞ্জনের শোকে মগ্ন। তাঁহার অভাবজনিত বিরাট ক্ষতি এখনও তাঁহার দেশবাসীকে ব্যথিত, ক্ষুব্ধ করিয়া রাখিয়াছে। দেশের প্রাণ এখনও তাঁহার অমূল্য দান শান্ত চিত্তে গ্রহণ করিবার শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে নাই। শোকের পাবন অনল এখনও মোহের ধূমে আবৃত। এই অনলে পুড়িয়া চিত্ত শুদ্ধ, জাগ্রত, নির্ম্মল হইলে ভারতবাসী দেখিবে, সেখানে চিত্তরঞ্জন অনন্ত অমর শক্তিতে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার মৃত্যু তাঁহাকে অমর করিয়াছে, ভারত-বাসীকে অমৃতমন্ত্রে সঞ্জীবিত করিয়াছে।

চিত্তরঞ্জন দেশের জন্য অতুল বিলাসবৈভব ত্যাগ করিয়াছিলেন, অবশেষে জীবন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু শুধু কি এই জন্যই তিনি আজ দেশ-বাসীর শ্রদ্ধা পূজা পাইতেছেন? দেশসেবায় জীবন বিসর্জ্জন খুব বড় ত্যাগ, মহৎ

দান সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশবন্ধু যে দান করিয়াছেন তাহার মূল্য চঞ্চল ধনৈশ্বর্য্য বা নশ্বর জীবনের পরিমাপে অবধারণ করা যায় না। চিত্তরঞ্জন মুক্তির উপাসক ছিলেন। তিনি তাঁহার দেশবাসীকে দিয়া গিয়াছেন তাঁহার মুক্তিসাধনার সিদ্ধ মন্ত্র, তাঁহার অব্যর্থ প্রেরণা, তাঁহার অপরিমেয়, অজেয় শক্তি।

তাঁহার গুরু, বর্ত্তমান ভারতের গুরু, জীবন্মুক্ত, মন্ত্রদ্রষ্টা মহাত্মা গান্ধীর মত চিত্তরঞ্জন দেখিয়াছিলেন, ভারতের অসীম দুঃখ দৈন্য দূর করিতে হইলে, ভারতের চিরঈপ্সিত মুক্তির পথ সুগম করিতে হইলে, প্রধানতঃ দুইটী প্রবল অন্তরায় দূর করা একান্ত প্রয়োজন। একটী ভারতের অন্তর্বিরোধ, অপরটী বহির্বিরোধ। বিস্মৃত ধর্ম্মের সংকীর্ণতা ভারতবাসীর ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে মলিনতা, দুর্ব্বলতা আনিয়া দিয়াছে। তাহারা সহস্র শৃঙ্খলে জীবনকে শৃঙ্খলিত করিয়া আপনাদের ক্ষুদ্র, বিচ্ছিন্ন, পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে। অপর দিকে এই অন্তর্বিরোধ নিবারণ করিয়া দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য তাহারা যে বিদেশী রাজশক্তিকে বন্ধুরূপে আহ্বান করিয়া আনিয়াছে, তাহার সংঘাতে তাহারা বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, তাহাদের নবোন্মেষিত রাষ্ট্রীয় জীবন আশ্রয়হীন, আশাহীন হইয়া উঠিয়াছে!

এই দ্বিবিধ অন্তরায় দূর করিয়া ভারতের মুক্তির পথ পরিষ্কৃত করাই চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ-সাধনার প্রকৃত তাৎপর্য্য। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে এ দেশে যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, তাহা ভারতের জাতীয় চরিত্র, জাতীয় সংস্কার, জাতীয় সাধনার অভিব্যক্তি নহে। সে আকাঙ্ক্ষা অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত উচ্ছৃঙ্খল, উদ্দাম স্বার্থপরতার নামান্তর। চিত্তরঞ্জন বুঝিয়াছিলেন, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা জাতীয় জীবনের চরম সার্থকতা নহে। পৃথিবীতে বহু অসভ্য বর্ব্বর জাতি আছে যাহাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এখনও অক্ষুণ্ণ। সভ্য জাতিগণের স্বাধীনতাও বহু দেশে দুর্ব্বলের পীড়নে কলঙ্কিত, ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে অন্ধ, সত্যচ্যুত। তিনি বুঝিয়াছিলেন সত্যভ্রষ্ট, মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত স্বাধীনতা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অনর্থের কারণ। সত্যভ্রষ্ট হইয়া ভারত যেরূপ নির্জ্জীব নরকঙ্কালসজ্জিত শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, সত্যকে উল্লঙ্ঘন করিয়া পাশ্চাত্য জগতও সেইরূপ প্রচণ্ড পশুত্বের লীলাভূমি হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবাসী যদি পশুশক্তির বলে আজ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়, কালে সে শক্তি আত্মদ্রোহী, আত্মনাশী রূপ ধারণ করিবে, কিম্বা দুর্জ্জয় প্রহারে মনুষ্যসমাজ প্রপীড়িত করিবে। বুদ্ধিবলে মানুষ পশুশক্তিকে যতই মোহন সাজে সজ্জিত করুক, তাহার

দ্বারা কখনই মানুষের একান্ত কল্যাণ সাধিত হইবে না, মানুষের মধ্যে দেবত্ব উদ্বুদ্ধ হইবে না। যদি মানুষ মানব-জীবনের সার্থকতার পরাশান্তি লাভ করিয়া দ্বন্দ্বাতীত হইতে চায়, সকল শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইতে চায়, স্বাধীন হইতে চায়, তবে তাহাকে পশুত্ব জয় করিতে হইবে, প্রেমের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা মনুষ্য-সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।,

মুক্তির এই মহান প্রাচ্য আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া চিত্তরঞ্জন স্বরাজ সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সত্য ও প্রেম তাঁহার আদর্শের, তাঁহার সাধনার মূল ভিত্তি। তাই তিনি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ভারতবাসীর জীবনের সাফল্য লাভের জন্য একান্ত প্রয়োজন মনে করেন নাই। তাই তিনি বিপ্লববাদী স্বদেশ-প্রাণ যুবকগণের বীরত্ব ও স্বদেশ প্রেমের নিন্দা না করিলেও তাহাদের ভ্রান্ত আদর্শ ও ও দ্বেষব্যঞ্জক নিষ্ঠুর কর্ম্মপদ্ধতির সমর্থন করিতে পারেন নাই। এ জন্য যাঁহারা তাঁহাকে কপটাচারী, ভীরু বিপ্লববাদী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার স্বরাজসাধনার গভীর তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে এখন অনেকেই উপলব্ধি করিতেছেন যে, তাঁহার স্বদেশ-প্রেমে বিদ্বেষের ছায়া স্পর্শ করে নাই। জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য ও স্বাভাবিক অভিব্যক্তি বাধাহীন ও অক্ষুণ্ণ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি স্বদেশবাসীকে স্বরাজ লাভে প্রবুদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যে স্বরাজ প্রার্থনা করিতেন তাহাতে ভারতবাসী মাত্রেরই সমান অধিকার—ইংরেজ, ফরাসী, দিনেমার সকলের জন্যই তাহার সিংহদ্বার উন্মুক্ত।

চিত্তরঞ্জনের সাধনার স্বরাজ রাষ্ট্রীয় জীবনে কি আকার ধারণ করিবে তাহা তিনি নিজে স্পষ্ট জানিতেন না, তাহার রূপ কল্পনার প্রয়োজনও বোধ করিতেন না। তিনি শুধু জানিতেন, ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে দিন বিদ্বেষবুদ্ধি লোপ পাইবে, যে দিন তাহাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহাদের অন্ধতা-কল্পিত সহস্র ভেদ দূর করিবে, সে দিন তাহারা যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিবে তাহার অভ্রংভেদী স্বর্ণচূড়া তাপিত, পীড়িত জগতের দিকে দিকে মুক্তির শুভ্র কিরণ বিকীর্ণ করিবে।

জীবনে যাহা কিছু মূল্যবান, যাহা কিছু প্রিয়, দেশবন্ধু তাহা স্বদেশ সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই বিরাট ত্যাগ দেখিয়া জগৎ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়াছিল। পরে যখন ভারতবাসী দেখিল, তিনি দেহের সর্ব্ব-বিধ প্রয়োজন পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া, দেশের কল্যাণের জন্য অম্লানবদনে জীবন

বিসর্জ্জন দিলেন, তখন সমগ্র দেশের চিত্ত আলোড়িত হইয়া উঠিল; একটা অননুভূত যোগের আকর্ষণে সমস্ত ভারতবাসীর প্রাণ যেন এক হইয়া গেল; যে বিরাট অসত্য ধর্ম্মের নামে, ন্যায়ের নামে ভারতবাসীকে আচ্ছন্ন করিয়া, খণ্ডিত করিয়া, জীবনহীন করিয়া রাখিয়াছিল সে প্রাণের অন্তস্তলে নবজীবনের স্পন্দন অনুভব করিল; হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টান, শিখ পারশী সকলে দেশবন্ধুর শবপার্শ্বে সমবেত হইয়া অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিল।

সেই স্মরণীয় দিনে ভারতবাসী প্রাণে প্রাণে অনুভব করিল, ধন, মান, যশ মিথ্যা—বিদ্যা বুদ্ধি অভিমান অর্থশূন্য যদি এ সমস্ত স্বদেশের কল্যাণে নিয়োজিত না করিলাম। যে দিন এই অভিনব অনুভূতি দেশের ও সমাজের কল্যাণ-কর্ম্মে প্রকটিত হইয়া সমগ্র ভারতবাসীকে এক অখণ্ড ঐক্য-সূত্রে সম্বদ্ধ করিবে, সেই দিন স্বরাজ ভারতবাসীর করতলগত হইবে, সেই দিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবন-দান সার্থক হইবে।



আজ আমি চ'লে যাই

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

আজ আমি চ'লে যাই
চ'লে যাই তবে,
পৃথিবীর ভাই বোন্ মোর
গ্রহতারকার দেশে
সাথী মোর এই জীবনের
কেহ চেনা, কেহ বা অচেনা।
তোমাদের কাছ হতে চ'লে যাই তবে ;
কোথায় দু'ফোঁটা জল শুকাইবে ভূমিতলে
একটী করুণ শ্বাস মিশাইবে উতলা বাতাসে
আজ ক'মে যাব এক সন্ধান তাহার !

নীল আকাশের গ্রহে একটী প্রার্থনা মোর রেখে যাই শুধু
রেখে যাই স্পন্দহীন বক্ষপুটে মৃত্যুম্লান মর্ম্মকোষে মোর।

যে কেহ আমার ভাই যে কেহ ভগিনী,
এই উর্ম্মি-উদ্বেলিত সাগরের গ্রহে
অপরূপ প্রভাত সন্ধ্যার গ্রহে এই
লহ শেষ শুভ ইচ্ছা মোর
বিদায় পরশ, ভালোবাসা,
আর তুমি লও মোর প্রিয়া
অনন্ত রহস্যময়ী
চিরকৌতূহল-জালা
—অসমাপ্ত চুম্বনখানিরে
তৃপ্তিহীন।

যদি প্রেম সত্য হয়
যদি সত্য হয় এই কান্নার সাধনা,
তবে আর বার
অদেখা আকাশে কোন্
কোন্ নীহারিকাপুঞ্জে
নব সূর্য্য উদ্ভাসিত সে কোন্ সুন্দরী তারকায়
হবে কিরে পরিচয়
নাহি জানি!
—নয় এই অনাহূত নিষ্ঠুর বিদায়!
আজ আমি চ'লে যাই—
যত দুঃখ সহিয়াছি
ব'হিয়াছি যত বোঝা পেয়েছি আঘাত
কাটায়েছি স্নেহহীন দিন
হয় ত বা বৃথা,
আজ কোন ক্ষোভ নাই তার তরে
কোনো অনুতাপ আজ রেখে নাহি যাই—
একটী আকাঙ্ক্ষা শুধু
ফেলে রেখে গেনু।

আজো যারা আসে নিছে
অনাগত, পৃথিবীর ভ্রূণ-শিশু যত,
তারা যেন পৃথিবীরে এমন করিয়া নাহি দেখে।
আজ যারা বাসিতে পেল না ভালো
আমাদের চারিপাশে আজ যত প্রাণ
অন্যায় দারিদ্র্যে আর হীন লালসায়
অন্ধ পঙ্গু কাঁদে উগ্র অভিশাপে,
আজিকার মানবের যত গ্লানি পাপ
—আমাদের সাথে যেন মোরা সব
মুছে লয়ে যাই
—সব শাস্তি, সকল বেদনা।

যারা আজো জন্ম লয় নাই
তাহাদের প্রেম
ব্যর্থ নাহি হয় যেন এমন করিয়া
লোভের ক্ষুধার ফাঁদে।
দেবতার দ্বার যেন তাহাদের তরে
আজিকার মত রোধ নাহি করে
স্বার্থ অসঙ্গত, কপটতা, মোহ, প্রবঞ্চনা,
হিংসা অহঙ্কার।
পৃথিবী সুন্দর হয় যেন;
দেবতার আশীর্ব্বাদ লোভ যেন নাহি কেড়ে রাখে
স্বার্থ করে অন্যায় বণ্টন।
প্রেম বিনা কারো জন্ম ব্যর্থ নাহি হয় যেন,
ছিঁড়ে যায় লালসার জাল
ধুয়ে যায় আজিকার সব ক্ষুদ্র মলিনতা।
দিকে দিকে কোটি গৃহ ভেঙ্গে পড়ে আজ
প্রচণ্ড লোলুপ এই মানবের বাসনার ঝড়ে;
উপবাসী কাঁদে মাতা মোহমত্ত নারীর অন্তরে
কাঁদে প্রিয়া উৎপীড়িতা বারাঙ্গনা বুকে
দেবতা কাঁদেন ভাঙ্গা ঘরে।

পৃথিবীর ভাই-বোন মোর—
এই বিলাপের গ্রহে মোর কান্না রেখে যাই আজ
একটী বাসনা আর,
পশ্চাতে আসিছে যারা
তারা যেন ধরণীর এ কলুষ দেখিতে না পায়—
মোদের চোখের জলে শেষ হোক সব তাপ গ্লানি
শেষ হোক্ মানব-আত্মার এই কাতর কাকুতি
আমাদের বেদনায়।
তারা যেন সবে ভালোবাসে।

দা'গোঁসাই

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পরীক্ষা পাশের পর বরাবর কল্‌কাতায় এসে আশ্রয় নিলাম আমাদের সেই পুরানো মেসে—উদ্দেশ্য চাক্‌রী দেখ্‌ব। চেষ্টা কর্‌লে কৃতকার্য্য হওয়া যায়, এই নীতি বাক্যটি আর কোন ব্যাপারে কেমন খাটে জানি না, কিন্তু চাক্‌রীর বেলায় যে এটা একেবারে অর্থশূন্য তা' নিঃসংশয়ে বল্‌তে পারি। সম্ভব-অসম্ভব সকল রকম উপায় অবলম্বন ক'রে যখন দেখ্‌লাম যে, আমি চাক্‌রী চাইলে কি হয়, চাকরী আমাকে চায় না, তখন হাল ছেড়ে দেওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর দেখ্‌লাম না। দুই চার দিন কেটে গেল চাক্‌রী খোঁজার টাল সামলাতে। কিন্তু শেষে আর সময় কাট্‌তে চায় না। কোলাহল মুখরিত কল্‌কাতার সহরে নিষ্কর্ম্মা কাটান যে কি অভিশাপ তা' ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না। খোলা জানালা দিয়ে ধূলো ধোঁয়ার মুখোস-পরা আকাশের দিকে চেয়ে কাব্য কর্‌বার যায়গা এ নয়। দৃষ্টি ক্লান্ত হ'য়ে ফিরে আসে, শান্তি পাওয়া যায় না।

সেদিন সমস্ত দিনটা গুমট ক'রে থাক্‌বার পর সন্ধ্যার দিকটায় বেশ একটু ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছিল। মনের গুমটটাও সেই হাওয়ার সঙ্গে উড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লাম একটু ঘুরে আসবার জন্যে। কিছুদূর যেতেই দেখা হ'ল এক উকিল-বন্ধুর সাথে। বন্ধুবর হাল-অবস্থা শুনে বল্‌লেন যে, একটা 'ফা:র্মে' ম্যানেজারী খালি আছে, আমি যদি করি তিনি দিইয়ে দিতে পারেন এবং আজকাল সময় যেমন খারাপ পড়েছে তা'তে যে-কোন চাক্‌রীই হোক নেওয়া উচিত, এই সম্বন্ধে কতকগুলি অমূল্য উপদেশ দিয়ে তাঁর মূল্যবান্‌ সময় নষ্ট হবার ভয়েই হোক বা কথা বল্‌বার ফাঁক পেয়ে পাছে টাকা ধার চেয়ে বসি এই ভয়েই হোক তিনি খুব শীগ্‌গিরই বিদায় নিলেন। কথাটা কিন্তু বিশ্বাস কর্‌তে প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। কোন একটা 'ফার্মে' একজন ম্যানেজার দরকার হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু তাই ব'লে আমাকে নেবে সেই যায়গায়, কেমন খট্‌কা লাগছিল। যা-হোক অদৃষ্ট পরীক্ষা করায় দোষ নাই মনে ক'রে 'দুর্গা' ব'লে বেরিয়ে পড়্‌লাম এবং চাক্‌রীও জুটে গেল।

আমার মনিবের নাম নফরচন্দ্র তরফদার কিন্তু সাধারণের কাছে তিনি দা'গোঁসাই ব'লেই বিখ্যাত। সহর ছেড়ে প্রায় দুই মাইল পূবে তাঁর বাড়ী এবং 'ফার্ম'। আমাকে সেখানে থেকেই কাজকর্ম্ম করতে হবে!

দা'গোঁসাইকে দেখে আমার হতাশ হবার কোন কারণ ছিল না; কেননা তাঁর নামে, চেহারায় আর আমার দগ্ধ অদৃষ্টে বেশ খাপ খেয়ে গিয়েছিল। লোকটি দেখ্‌তে বেশ মোটা সোটা গুরুগম্ভীর ধরণের। মাথা ও দেহটার অনুপাতে গলাটা এত সরু যে, ভয় হয় কোন্ সময় পাকা আমের বোঁটার মত দেহটা বুঝি টপ্ ক'রে খসে পড়ে। মাথাটা আবার বোঝাই ছিল কাঁচায়-পাকায় মেশানো এলো মেলো গোছের একগাদা চুলে। চুলগুলির চেহারা দেখে মনে হয় না যে, তারা কোন দিন চিরুণীর সঙ্গ লাভ করেছে। বেশ নজর ক'রে দেখ্‌লে তার মাঝে আবার আধহাত লম্বা একটি টিকির অস্তিত্বও উপলব্ধি করা যায়। তাঁর 'বলপয়েণ্টেড্' নাকের নীচে যে এক যোড়া গোঁফ আছে, তার সাথে উপমা দিতে হলে যে জিনিষটার চেহারা মনে পড়ে তার নাম করলে দা'গোঁসাই নিশ্চয়ই চটে যাবেন। তিনি প্রায়ই গামছা প'রে থাকেন এবং কদাচ যদি কাপড় পরেন ত কাছা দেন না। অন্তত যতদিন তাঁর 'ফার্মে' ম্যানেজারী করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, ততদিন ঐ রকমই দেখেছিলাম। জিজ্ঞেস্ করলে মুক্ত-কচ্ছ থাকার যে কতদূর উপকারিতা, তা বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিদ্বারা বুঝিয়ে দেন। এক কথায় লোকে যারে বলে সাধু তিনি হচ্ছেন তাই। শ্রীমদ্ভাগবত গীতা, চৈতন্যচরিতামৃত, রাজযোগ, হঠ্‌যোগ প্রভৃতি সদ্গ্রন্থগুলি তাঁর পড়া ছিল এবং থিয়েটার বায়স্কোপ দেখা, চা-চুরুট খাওয়া, নভেল-নাটক পড়া, এসবের উপরে তিনি হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন। নভেল পড়্‌লে যে লোকের দীর্ঘায়ুত্ব নষ্ট হ'য়ে যায় তা' তিনি প্রমাণ করে দিতে পারেন। সব চেয়ে বেশী ঝোঁক ছিল তাঁর ব্রহ্মচর্য্যের উপরে। একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই যে ভারত স্বাধীন হতে পারছে না আর বিদেশী এসে তার পয়সা লুটে নিচ্ছে এ সম্বন্ধে নাকি প্রবন্ধ লিখে তিনি মাসিক পত্রে ছাপ্‌তে দেন, কিন্তু তারা তার মর্ম্ম বুঝতে না পেরে ছাপায় নাই।

হিন্দুশাস্ত্র মতে পঞ্চাশ পেরিয়ে গেলে যদি বনে যেতে হয়, তবে দা'গোঁসাইর অনেক আগেই যাওয়া উচিত ছিল এবং যেতেনও বোধ হয় কিন্তু তাঁর অর্দ্ধাঙ্গিনী তাঁকে পূর্ব্বে কোন রকম আভাস না দিয়ে মানুষের দৃষ্টির পারে কোন্ এক অজানা-বনের উদ্দেশে অকালে যাত্রা ক'রে এক মহা-বিপত্তি বাধিয়ে দিলেন। গৃহশূন্য অবস্থায় থাকলে পাছে লক্ষী চপলা হন, তাই অল্পদিনের মধ্যেই এক তরুণীর

পাণি পীড়ন ক'রে আপাতত তিনি সংসার-কাননেই 'বনং ব্রজেৎ'-এর ফল লাভ করছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁর প্রথম সংস্করণের চারটি এবং শেষ সংস্করণের একটি, মোট পাঁচটি ছেলে-মেয়ে। অবশ্য চরিত্রবান্ ব'লে তাঁর সুখ্যাতির কিছু কমি নাই।

প্রথম দিন দা'গোঁসাইর সাথে ধর্ম্ম আর ব্রহ্মচর্য্য ছাড়া অন্য কোন কথাই হ'ল না। অনেক কিছু বল্‌বার পর তিনি বল্‌লেন—তা ত বটে, কিন্তু ভাই অল্প বয়েসে বড় জড়িয়ে পড়েছ।

এমন কিসে যে জড়িয়ে পড়্‌লাম বুঝ্‌তে না পেরে জিজ্ঞেস কর্‌লাম,—কিসে?

এই বিয়ে ক'রে। আচ্ছা তোমার পরিবারের বয়েস কত হ্যা?

যদিও দা'গোঁসাই ঠিক খবরটা পান নাই তবু তিনি কোথায় গিয়ে থামেন দেখবার জন্যে কোন রকম প্রতিবাদ না ক'রে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতে লাগ্‌লাম,—আজ্ঞে, এই সাড়ে এগার কি পৌনে বার।

তা'হলে তার সাথে তোমার প্রণয় হয় নাই?

মোটেই না।

বেশ একটু উৎসাহের সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন,—যাক্ তবে তোমার কোন ভয় নেই। ঠাকুর রামকেষ্ট বিয়ে করেছিলেন কিন্তু তাতে তাঁর কিছুই এসে যায় নি। আমি তোমাকে এমন সব পথ বাৎলে দেব, যাতে ক'রে তুমি মুক্ত-পুরুষের মত থাকতে পারবে।

দা'গোঁসাই কিসে যে মুক্তপুরুষের মত থাকবার তীব্র বাসনা আমার প্রাণে বলবতী দেখলেন, তা' ঠাউরে উঠতে পারলাম না। যা'হোক, হাঁ না ক'রে অনেক কথার জবাব দিয়ে যেতে লাগলাম আর দা'গোঁসাই ব'লে যেতে লাগলেন, প্রাণ বায়ু ঈড়া আশ্রয় কর্‌লে কি হয়, অপান বায়ু পিঙ্গলায় থাকে কেন, সহস্র দল পরমাত্মার আধারস্থল, জীবাত্মা দ্বাদশ দলেই বাস করেন, ষট্‌চক্র ভেদ কর্‌তে পার্‌লে ঈশ্বরকে হাতে হাতে পাওয়া যায় ইত্যাদি।

এখন চাকরী করতে এসে যোগের যাঁতাকলে প'ড়ে মনটা একটু তেতো হয়ে উঠল। দা'গোঁসাইও বেশ ধ'রে ফেল্‌লেন যে, যোগ-বিয়োগের উপর আকর্ষণ আমার কমই আছে। কিন্তু তিনি ছাড়বার পাত্র নন্, আমাকে যোগ অভ্যাস করিয়েই ছাড়বেন। আমার নেহাৎ অনিচ্ছা দেখে আপাতত কথার ধারাটা অন্যদিকে বদলে দিয়ে অনেক অমূল্য আধ্যাত্মিক উপদেশ দিলেন এবং শেষে

বিয়ে ক'রে যখন মাটি খেয়ে ফেলেছি তখন আমার পক্ষে স্ত্রীকে 'ত্যজ্য পুত্তুর' করা ভিন্ন আর উপায় নাই ব'লে উপসংহার করলেন।

থাক্‌বার যায়গা এবং খাওয়া বাদে আমার মাইনে ঠিক হয়েছিল মাসে তিরিশ টাকা ক'রে। খাবার সম্বন্ধে দা'গোঁসাইর অতিবড় শত্রুও কিছু বলবার ফাঁক পাবে না। এবিষয়ে তাঁর অন্তঃকরণ বড় উদার। তাঁর বাড়ীতে মাছ খাওয়া দূরে থাকুক নামটি পর্য্যন্ত মুখে আনবার যো নাই। একদিন কি একটা কথায় যেন ব'লে ফেলেছিলাম, আপনারা গঙ্গার ইলিশের বড়াই করেন, যদি একবার আমাদের দেশের ইলিশ খান—আর বলা হ'ল না। দা'গোঁসাই জিব কামড়ে ব'লে উঠলেন,—রাধে কেষ্ট,—কি এমন মহাপাপ করেছি যে মাছ খেতে যাব!

রাজসিক কি তামসিক খাদ্য খেয়ে শেষে জরাসন্ধ কি লঙ্কার রাবণ হ'য়ে যাই এই ভয়ে দা'গোঁসাই 'সাত্বিক' আহারের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। 'সাত্বিক' আহার মানে হচ্ছে কল্‌কাতার সহরের পাঁচ টাকা মণ চালের ভাত, কলায়ের ডাল আর মোগলাই 'চিড়িংচি' অর্থাৎ আলু পটোলের খোসার তেলবিহীন চচ্চড়ি। তবে একটা কথা হলপ্‌ ক'রে বল্‌তে পারি যে, এই 'সাত্বিক আহারের ফলস্বরূপ দা'গোঁসাইর ঐ তেল কুচ্‌কুচে ভুঁড়িটুকু নয়।

একদিন দা'গোঁসাই জিজ্ঞেস করলেন,—কেমন হে, খাওয়া দাওয়ার ত কোন অসুবিধা হচ্ছে না?

হচ্ছে আবার না! কয়েক বেলার 'সাত্বিক' আহারের ধাক্কায় আমার আমাশা দেখা দিয়েছিল। কাজেই চুপ ক'রে থাকাটা নেহাৎ সুবিধাজনক নয় দেখে ব'লে ফেল্‌লাম,—অসুবিধা আর কি! তবে তরকারীটা একটু অদল-বদল হ'লে মন্দ হয় না।

একটু মিষ্টি মধুর হেসে আমাকে খুশী ক'রে দিয়ে দা'গোঁসাই বল্‌লেন,—তোমরা কেবল কয়েকখানা পুঁথিই মুখস্থ করেছ, কাণ্ডজ্ঞান তোমাদের কিছুই হয় নি। যদি 'ন্যাচর ষ্টডি' করতে শিখতে তা'হলে আর একথা বলতে না। হাতী ঘোড়া, গোরু, মোষ এদের দেখেছ ত? এরা এক ঘাস জাতীয় খাবার খায় ব'লেই এদের গায়ে এত জোর। আর তোমরা মাছ মাংস. ডাল, তরকারী, দুধ, ঘি, ফল, পাকাড় ইত্যাদি দুনিয়ার যথাসর্ব্বস্ব খেয়ে ফেল ব'লে তোমাদের পেট পীলে-লীবারে পুরে গিয়ে এক একটা 'ঢাকাই জালার' সামিল হ'য়ে দাঁড়ায়। এখন বুঝেছ ত কি জন্যে আমার বাড়ীতে একরকম তরকারীর বন্দোবস্ত।

তা' আর বুঝি নাই! এমন অকাট্য যুক্তির বিরুদ্ধে তর্ক করা, আর পাহাড়ে

ঢিল মারা একই কথা। কাজেই চুপের বালাই নাই, এই মহাজন বাক্যের অনুসরণ ক'রে চুপ ক'রেই গেলাম।

দা'গোঁসাইর বাড়ী ব'সে হপ্তাখানেক কেটে গেল, ব্যবসার গোপন ব্যাপারগুলো আয়ত্ত ক'রে নিতে আর হিসাব-পত্তর রাখবার ধরণ-ধারণ শিখতে। কাজেই এর মধ্যে আর ফার্মের কোন খোঁজ খবর নেওয়া হল না। একদিন সকালে দা'গোঁসাই নিজেই উদ্যোগ ক'রে 'ফার্মে' নিয়ে গেলেন। প্রথমে আমার দায়িত্ব পূর্ণ পদের গুরুত্ব অনুমান ক'রে বড় ভয় হয়েছিল। কত বড় ব্যবসার মাথার উপরে আমাকে বস্‌তে হবে তা মনে ক'রে, নিজের কর্ম্মদক্ষতার উপর একটু সন্দেহও হয়েছিল। কিন্তু 'ফার্ম' দেখে সে সব দুর্ভাবনার হাত এড়িয়ে গেলাম। খালধারে খানিকটা পড়ো জমি, তার এক পাশে একখানি ঘর, আর সেই ঘরের সাম্‌নে দুইটি বিচালির টাল্। ঘরখানির যে রকম অবস্থা তাতে কুটীর না ব'লে কুঁড়েই বল্‌তে হবে; কারণ আজকাল হালফ্যাসানে আবার কুটীর মানে ইমারৎও বুঝায়। ভেতরে ঢুক্‌তেই দুইখানি জীর্ণ বাঁশের মাথায় ততোধিক জীর্ণ একখানি কেরাসীনের তক্তার উপর আলকাতরা দিয়ে হাতে ছোট-বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে :—

The Calcutta Fodder Supply & Co.

Office and Godown.

এতক্ষণে 'ফার্ম' মানেটা হৃদয়ঙ্গম কর্‌লাম এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের অবস্থাটাও বেশ স্বচ্ছ হয়ে এল! পদগর্ব্বে স্ফীত বুকটা নুয়ে পড়্‌ল। বন্ধুবরের উপর রাগটা বড় কম হ'ল না। দা'গোঁসাইকে তিনি বহুদিন থেকেই চিন্‌তেন এবং তাঁর আভ্যন্তরিক অবস্থাও জানতেন। এক্ষেত্রে সহজ সরল ভাষায় বিচালী গোলার সরকারী করতে হবে, না ব'লে কেন যে অমন গালভরা 'ফার্মের ম্যানেজারীর' নাম বল্‌লেন তা' বুঝতে পারলাম না।

মনের ভাব-বৈচিত্র্যটা বোধ হয় একটু বেশী ক'রেই প্রকাশ হ'য়ে পড়েছিল মুখের উপরে, সুচতুর দা'গোঁসাইর সেটা ধরতে বড় বেশী দেরী হ'ল না। আমাকে উৎসাহিত করবার জন্যে তিনি তাড়াতাড়ি ব'লে ফেল্‌লেন,—'ফার্মের' অবস্থা দেখে তুমি বোধ হয় একটু ঘাবড়ে গেছ; কিন্তু আজকাল সবারই এক অবস্থা, কারো ফার্মে এক তড়্‌পা মাল নেই। যখন মাল আমদানী হবে তখন পা ফেল্‌বার

যায়গা হবে না। আর তখন কি খাটুনীটাই পড়বে। একা ত পেরে উঠবেই না, দিন কয়েকের জন্যে একজন 'য়্যাসিষ্টণ্ট' রাখতে হবে।

গোলায় ঢুকেই একটা বিশ্রী রকমের বোকশা গন্ধ পাচ্ছিলাম সেটা এতই অসহ্য হয়ে উঠেছিল যে, দা'গোঁসাইর কথাগুলিতে ভাল ক'রে কান দিতে পারি নাই। তাঁর কিন্তু সেদিকে মোটেই লক্ষ্য ছিল না। তিনি অক্লেশে খাতার পাতা উল্‌টে যাচ্ছিলেন, আর বিড় বিড় ক'রে বক্‌ছিলেন! শেষে একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে ব'লে ফেল্‌লাম,—বড় খারাপ একটা গন্ধ আস্‌ছে যে!—

তাচ্ছিল্যভাবে দা'গোঁসাই উত্তর কর্‌লেন,—ও কিছু না। ট্যানারী থেকে কি হাড়-কল থেকে আস্‌ছে।

মাঝে মাঝে এইরকম আসে নাকি?

হ্যাঁ, তা অল্প বিস্তর আসে বৈ কি!

গন্ধটা ত বড় বিশ্রী।

বিশ্রী হ'লে আর কি করছি বল।

অর্থাৎ এখানে চাকরী করতে হ'লে ও-গন্ধটুকুতে অভ্যস্ত হ'তে হবে। আমিও অগত্যা সেটা মেনে নিলাম।

তারপর কাছে কিনারায় কেউ আছে কি না দেখবার জন্যে বেশ উঁকি মেরে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দা'গোঁসাই বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন যে, আমার সুমতি দেখে তিনি বড় খুশী হয়েছেন, কারণ আজকালকার হতচ্ছাড়া ছেলেগুলো দুই পাতা ইংরেজি পড়েই ছুটে বেরিয়ে পড়ে পঁচিশ টাকা মাইনের চাকরীর জন্যে। ব্যবসার মধ্যে যে পয়সা ছড়ান রয়েছে তা' তাদের চোখেই পড়ে না। এই যে ইংরেজ জাত, এরা ত প্রথমে এদেশে এসেছিল তেজপাতা আর পাঁচফোড়ণ নিয়ে। তাতেই কামড়ে ছিল ব'লে ত আজ তারা দেশের রাজা!

দা' গোঁসাইর সবে-সুরু বক্তৃতা শীগ্‌গীর শেষ হবে এমন কোন লক্ষণ না দেখে জিজ্ঞেস করলাম,—দেখুন, অনেক কাজের কথাই ত জান্‌লাম, কিন্তু আমার কর্ত্তব্য যে কি তা' কিন্তু এখনো বলেন নি।

ও হ্যাঁ, তা বটে, একটা দরকারী কথাই বাদ পড়ে যাচ্ছিল। তা' এমন বিশেষ কিছুই না। সকালে এসে কোথায় কি মাল-পত্তর যাবে দেখে শুনে পাঠিয়ে দিতে হবে। দুপুর বেলায় সহরে বেরুতে হবে বিলগুলো তাগিদ কর্‌বার জন্যে। ফিরে এসে যদি সময় থাকে, নতুন বিলগুলো ক'রে ফেলো, না হয় সে গুলো সন্ধ্যের পর বসেও কর্‌তে পার। আর দেখ, ফাঁকে-ফোঁকে তোমাকে

একটু বাজারও করতে হবে। ঐ যে হাড়সর্ব্বস্ব ঝি-মাগীকে দেখ, ওর মত বজ্জাত এ দুনিয়ায় আর একটি মিলবে না। মাগী একেবারে ডাকাত। এক টাকার বাজার কর্‌তে দিলে টাকাটা ভাঙ্গিয়েই আট আনা আলাদা ক'রে রাখে, আর বাকী আট আনায় বাজার এনে বলে এক টাকার বাজার। চুরি বিদ্যেটে এমন আর্ট হিসেবে শিখেছে যে, এক পয়সার জিনিষ কিনতে দিলেও তা' থেকে চুরি কর্‌তে পারে। শুনবে একদিনের এক মজার ব্যাপার?

দৈনিক কর্ত্তব্যের লিষ্টি শুনে মগজের ভেতরে পোকা হাঁটছিল। কাজেই উদগ্রীব হয়ে মজার ব্যাপার শুন্‌বার মত মানসিক অবস্থা আমার তখন ছিল না। সুতরাং একটু অন্যমনস্ক হয়েও পড়েছিলাম। দা'গোঁসাই সেটা লক্ষ্য ক'রে বল্‌লেন,—কি হে, কি ভাবছ?

কিছু না! ব'লে যান আপনার গল্প।

গল্প কি বল্‌ছ হে?—সত্য ঘটনা!

তাই হোক, বলুন!

মাগী যে একজন ওস্তাদ চোর তা' অনেক দিন থেকেই জান্‌তে পেরেছি। একদিন খেয়াল হ'ল দেখি ও এক পয়সার জিনিস থেকে কি ক'রে চুরি করে। তাই অনেক ভেবে চিন্তে পাঠিয়ে দিলাম এক পয়সার একটা রসগোল্লা আন্‌তে। নিজেও একটু পরে বেরিয়ে পড়লাম ওর পিছনে। এত-জিনিষ থাক্‌তে রসগোল্লা কিনতে দেবার মানে হচ্ছে যে, একটা রসগোল্লা থেকে চুরি করা এক রকম অসম্ভব। কিন্তু দেখ, মাগী কি ফন্দিবাজ! রসগোল্লা নিয়ে ঐ রাস্তার বাঁক অবধি এসে এদিক ওদিক বেশ একবার তাকিয়ে দেখল। তারপর চোখ দুটো উল্‌টিয়ে এমন চোষাটাই চুষল যে, সেটাকে একেবারে বাদড়-চোষা সুপুরীর মত ছাবনা-সার ক'রে তবে ছাড়ল। বাছাধন কিন্তু জানতে পারলেন না যে, আমি তখন সশরীরে ঐ বটগাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে।

এই ব'লেই নিজের রসিকতায় নিজেই মুগ্ধ হয়ে বেশ একগাল হেসে নিলেন।

মহাপুরুষেরা নাকি জাতিস্মর-পূর্ব্বজন্মের ব্যাপারটা নাকি তাদের চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে। দা'গোঁসাইর সুরক্ষিত 'বাড়ীর মধ্যে'র দিকে তাকালে মনে হয় যেন এমন সুন্দর অন্তঃপুর গঠন প্রণালীটা বোধ হয় তিনি তাঁর পূর্ব্ব জন্মে কোন নবাব-হারেমে খোজা প্রহরীর অভিজ্ঞতাস্বরূপই পুনরায় প্রবর্ত্তিত করতে

পেরেছেন। বস্তুত এটা ছিল একটা গোলক-ধাঁধা। হঠাৎ গিয়ে যে কেউ এর পথ আবিষ্কার করবেন তেমন বান্দা আজও জন্মেছেন কিনা সন্দেহ। আগে এর চারিপাশ ঘিরেছিল মাটির দেওয়াল, কিন্তু সেটা যথেষ্ট দৃঢ় মনে না ক'রে দা'গোঁসাই সেটাকে হালে পাকা ক'রে ফেলেছেন।

আমার পক্ষে বাড়ীর মধ্যে যাওয়া নিষেধ ছিল। কিন্তু এই জায়গায় দা'-গোঁসাই মস্ত একটা ভুল ক'রে ফেল্‌লেন। যে দিন থেকে জান্‌লাম যে, 'বাড়ীর মধ্যে' যাওয়া আমার বারণ, সেই দিন থেকেই আমার পাগল মনটা একেবারে ক্ষেপে গেল ঐ 'বাড়ীর মধ্যে' কি অসীম রহস্য আছে জানবার জন্যে! সঙ্গে সঙ্গে ফাঁকও খুঁজতে লাগলাম। দা'গোঁসাইর বাড়ীর সাথে আমার সম্বন্ধ ছিল মাত্র খাওয়া নিয়ে। আগে কথা হয়েছিল যে, আমি বাড়ীর একটা ঘরেই থাকব কিন্তু কি জন্যে জানি না শেষে আমাকে 'ক্যাম্পে'ই যেতে হ'ল। যে যায়গায় ব'সে আমি খেতাম সেটা জরীপ কর্‌লে 'বাড়ীর মধ্যে'র ভেতরে পড়ে কি বাইরে পড়ে বল্‌তে হ'লে আমাকে কিছু সময় ভাব্‌তে হবে। কাজেই 'বাড়ীর মধ্যে'র তথ্য জানবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেও শুকোতে-দেওয়া একখানা লালপেড়ে শাড়ীর একটা অংশ, হঠাৎ জানালা দিয়ে বেরিয়ে পড়া ধব্‌ধবে সাদা একখানা হাত ছাড়া আর কিছুই আবিষ্কার কর্‌তে পারি নাই।

দা'গোঁসাইর একটু একটু আফিং খাওয়া অভ্যাস ছিল। আজকাল যেন কি একটা কবিরাজী ওষুধ খাচ্ছিলেন, তাই কবিরাজ ব'লে ছিল আফিং ছাড়্‌তে। কিন্তু আফিং ছাড়া অসম্ভব ব'লে তিনি মাত্রা কমিয়ে ছিলেন। তাতেও আবার এক মুস্কিল হ'ল—সুনিদ্রার ব্যাঘাত হ'তে লাগল। শেষে সব দিক বজায় রাখ্‌বার জন্যে তিনি মাঝে মাঝে একটু মাত্রা চড়িয়ে দিতেন। সে দিন সন্ধ্যা বেলায়ও বোধ করি একটু মাত্রা চড়িয়ে বৈঠকখানা ঘরে একটা রেড়ীর প্রদীপ জ্বেলে পুরানো একখানা খেরো বাঁধানো খাতার উপর ঝুঁকে তিনি একটা হিসাব মিলাবার বৃথা চেষ্টা কর্‌ছিলেন আর মাঝে মাঝে হাঁকছিলেন—কে যায়? কে যায়?

এমন সময় আমি গিয়ে হাজির। অভ্যস্ত ডাক এল,—কে যায়?

আমি নীরেন।

তোমার আগে কে গেল?

কোন্ দিকে?

ঐ 'বাড়ীর মধ্যে'র দিকে?

কৈ না, কাউকে ত দেখি নি!

তুমিও যাও নি?

বাঃ। আমি ত এই কেবল আস্‌ছি! দেখে আস্‌ব কেউ গেল নাকি?

না, না তোমার যেতে হবে না, আমিই যাচ্ছি!

দা' গোঁসাই উঠে গিয়ে ডাকলেন—তোমার ভাত দেওয়া হয়েছে হে।

যেতে যেতে শুন্‌তে পেলাম কে যেন মিহি গলায় বল্‌ছে,—এতদিন ত দেখলে, ভদ্দর নোকের ছেলে আর কত দিন বাইরে বসে খা'বে? কিন্তু পর পক্ষের কোন উত্তর আমার কানে এল-না। ভাতে হাত দিতেই যেন কেমন একটু বোধ হ'ল! নাকের কাছে হাত নিয়ে যে জিনিষটার তৃপ্তিসুখকর গন্ধটা পেলাম, তাতে নাকি প্রাণীবিশেষের লোম নাশের আশঙ্কা আছে, যা' হোক ভাতটা ভেঙ্গে নিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাণ্ড দুই দাগা মাছ মেঘমুক্ত সূর্য্যের মত হঠাৎ আত্মপ্রকাশ ক'রে আমাকে একেবারে অভিভূত ক'রে ফেল্‌ল।

* * * * *

রবিবার বেশী কিছু কাজ কর্ম্ম থাকে না ব'লে একটু আয়াস ক'রে ঘুমোবার সংকল্প করেছিলাম। কিন্তু দা'গোঁসাইর ডাক-হাঁকে একটু সকাল ক'রেই উঠ্‌তে হ'ল। বিশেষ জটিল কোন কাজ করাতে হ'লে দা'গোঁসাই আমার নৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে একটু বেশী রকম সতর্ক হ'য়ে পড়্‌তেন। সূর্য্যোদয়ের পর মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিছানায় থাকাতে আমার যে কতটুকু ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হ'ল এবং তার ফলে যে আমি কতদিন কম বাঁচব, তার একটা হিসাব তিনি আমাকে তক্ষুণি দিয়ে দিলেন। তারপর পাড়লেন তাঁর আসল কথা। এঁড়ে বাগানের গো-খানায় আজ মাল পাঠাবার দিন, কিন্তু মাল না পাঠিয়ে চালানটা সাহেবকে দিয়ে সই করিয়ে আন্‌তে হবে আমাকে, আর তাঁর এই অসামান্য দয়ার জন্যে দশটা টাকা 'পান' খেতে দিয়ে আস্‌তে হবে। দা'গোঁসাইর মতে ব্যবসাটা হচ্ছে কতকটা গরুকে ঘাস খাওয়াবার মত। যখনই গরু নিয়ে মাঠে যাও না কেন সন্ধ্যেবেলায় উঠ্‌তেই হবে। এর মধ্যে যে যত পার পেট ভরিয়ে নিতে। এ যায়গায় ধর্ম্ম পুত্তুর যুধিষ্ঠির হ'য়ে সরকারী দাওয়াইখানা খুলে দিলে চল্‌বে না। তবে আজকের কাজটা তিনি নিজেই সেরে আস্‌তেন কিন্তু কর্ম্মচারী থাকতে মালিকের যাওয়াটা ভাল দেখায় না ব'লেই আমাকে পাঠাচ্ছেন।

কয়েকদিন আগে দা'গোঁসাই ৪৮৫ দিয়ে একখানা গাড়ী কিনে খরচটা

ঘর মেরামত বাবদ 'গোলাখাতে' ফেল্‌তে বল্‌লেন। এর একটু কারণ ছিল। আয় ব্যয় কাছাকাছি দেখাতে পার্‌লে তাঁর প্রেয়সীর যে সহোদরেরা 'ইনকম্‌ট্যাক্স' ধরবার জন্যে ওৎ পেতে বসে থাকে, তাদের মুখে নাকি চুণ-কালী দেওয়া যায়। তাই অন্যান্য সব খরচ নামান্তর গ্রহণ ক'রে গোলাখাতেই বস্‌ত। কিন্তু মানুষের একটা বদ্‌অভ্যাস আছে—মিথ্যা কথাটা সে খুব শীগ্‌গিরই ভুলে যায়। আমিও সে অভ্যাসটার হাত এড়াতে পারলাম না। খাতা তদারক করতে সেটা ধ'রে ফেলায়, দা'গোঁসাই আমার সম্বন্ধে হতাশ হ'য়ে ত গেলেনই, পরন্তু এই স্মরণ-শক্তি নিয়ে আমি আদপেই যে এম,এ, পাশ করেছি, সে বিষয়েও তাঁর একটু সন্দেহ হ'ল। তিনি বেশ সহজেই ব'লে ফেল্‌লেন, আমার কিছুই হবে না। এটা অবশ্য আমার কাছে নতুন নয়। তাঁর অনেক আগেই আমার কয়েকটি শুভানুধ্যায়ী এ ভবিষ্যৎ বাণীটি করে রেখেছেন।

যা'হোক, খাতার পাতাটা বদ্‌লাবার উপদেশ দিয়ে দা'গোঁসাই যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন,—হ্যাঁ দেখো, নব্‌নে এলে তাকে বলো যে আজ আর কিছুই হবে না, আমি একটা জরুরী কাজে সহরে যাচ্ছি।

কোন্ নব্‌নে?

দা'গোঁসাই মুখ্‌খানা যথাসম্ভব বিকৃত করে বল্‌লেন, আরে নব্‌নে, নব্‌নে! ঐ নব্‌নে স্যাক্‌রা!

আচ্ছা।

দা'গোঁসাই যাবার পরেই নবীনচন্দ্র উদয় হলেন। আজকার মত আর দা'গোঁসাইকে পাওয়া যাবে না শুনে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে তিনি এক করুণ কাহিনীর আবৃত্তি করতে ব'সে গেলেন। তার মর্ম্ম এই যে, প্রায় ছয় মাস আগে তিনি অনেক টাকার গয়না গড়ে দেন, তার মধ্যে হাত নাগাদ ৩১৮/১৫ এখনো বাকী। এ টাকার জন্যে তিনি যথেষ্ট তাগিদ করেছেন কিন্তু দা'গোঁসাই উপুড় হস্তের নামটি করেন নাই। এখন আমি যদি দয়া ক'রে একটি ফন্দি বাৎলে দেই তা'হলে তিনি আমার 'কেনা' হয়ে থাকেন।

ফন্দি বাৎলাবার জন্যে গম্ভীর হ'য়ে মুখে হাত দিয়ে না ব'সে চট্‌ ক'রে মাথায় যেটা এল ব'লে দিলাম। স্যাক্‌রার-পোও খুশী হ'য়ে আমার বুদ্ধির তারিফ করতে করতে বিদায় নিলেন।

দুপুর বেলায় খেতে গিয়ে শুন্‌লাম যে, 'বাড়ীর মধ্যে' দীপকের মহল্লা চল্‌ছে। ব্যাপারটা যে স্বর্ণকার-নন্দনের শুভ আগমনের জের, তা বুঝ্‌তে আর বাকী রইল

না। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম। অনধিকার চর্চ্চার জন্যে প্রাণে যে ভয় না হয়েছিল তা নয়। কিন্তু দা'গোঁসাইকে ঠাণ্ডা করবার মত কৈফিয়ৎও আমার জোগান ছিল। যে যায়গাটায় দাঁড়ালাম সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে রঙ্গমঞ্চটা সম্পূর্ণ দেখা যায়। সিঁড়ির উপরেই দরজা। তার চৌকাঠের উপরে মুখোমুখী ব'সে গিন্নী আর দা'গোঁসাই। গিন্নীর চোখ্ ছুটো ফুলো ফুলো, মুখখানা মেঘলা-আকাশের মত ভার। দেখ্লেই বোঝা যায় যে, বেশ একটি মান-ভঞ্জনের পালা চলছে। দা'গোঁসাই সাধাসাধি করছেন আর গিন্নী ব'সে আছেন গোঁজ হ'য়ে, কিছুতেই টল্ছেন না। শেষে নিরুপায় হ'য়ে সুকোমল কর কি উদার পদ-পল্লবের উদ্দেশে হাত বাড়াতেই গিন্নী, ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত লাফিয়ে উঠে এমন এক ওজনে ভারী ধাক্কা মারলেন যে, তার টাল সাম্লাতে না পেরে দা'গোঁসাই ঝড়ে-পড়া কলাগাছের মত পড়্লেন এসে একেবারে বাইরে তুলসী বেদীর কোলে। গিন্নী সে দিকে ভ্রূক্ষেপও না ক'রে বুঝি বা শয্যা আশ্রয় করবার জন্যে সোজা ভেতরে চলে গেলেন।

দা'গোঁসাই পড়্লেন একেবারে নিশ্চিন্ত হ'য়ে, ওঠ্বার আর নাম নাই! এ অবস্থায় একজন লোককে পড়তে দেখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। ছুটে গেলাম। আমাকে ও যায়গায় দেখে তাঁর চোখ ছুটো যে ভাবে জ্বলে ওঠ্বার কথা, তা' কিছুই হ'ল না। তিনি দেশ ভক্তি গদ্গদ্ ভাবে দীর্ঘ সরল রেখার অভিনয় ক'রে কপালটা মাটিতে ছোঁয়ালেন, যেন তুলসীমঞ্চে দণ্ডবৎ করছেন। আমিও বার চারেক খুব ঘন ঘন হাঁপিয়ে, যেন—খুব ছুটে এসেছি এই ভাব দেখিয়ে আহ্লাদের সঙ্গে ব'লে উঠ্লাম,—দা'গোঁসাই, দা'গোঁসাই, বড় জবর একটা সুখবর নিয়ে এসেছি!

বিষণ্ণভাবে দা'গোঁসাই আমার দিকে চেয়ে বল্লেন,—চল বাইরে, সব শুন্ছি।

শান্ত পোষ-মানা কুকুরটির মত দা'গোঁসাই আমার পিছনে পিছনে চল্লেন। ওদিকে জানালার আড়াল থেকে একটা ক্ষুধাতুর দৃষ্টির খোঁচা আমাকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুল্ছিল।

* * * *

হালখাতার আর দেরি নাই—মাত্র তিনদিন বাকী। কয়েক দিন থেকে সমস্তদিন এবং রাত্রির কতকটা কেটে যাচ্ছিল 'জাবেদা' আর 'খতিয়ান' নিয়ে। এই অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত বছরের 'পক্ষ' উদ্ধার করতে হবে।

সন্ধ্যা থেকেই কাল-বোশেখীর আয়োজন চলছিল বজ্রের হুঙ্কার আর বিদ্যুতের চমকানি নিয়ে। রাত একটু বেশী হ'তেই মুষল ধারায় বৃষ্টি এসে তার সাথে যোগ দিল। আমার খাটুনি দেখে বুঝি দা'গোঁসাইর একটু করুণার উদ্রেক হয়েছিল, তাই সে দিন আমাকে সাহায্য করতে এসে দয়া ক'রে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছিলেন। হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা দম্‌কা হাওয়া ঘরের ভেতর ঢুকে তাঁর ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি চমকে উঠে তিনি জিজ্ঞেস্ করলেন,—ক'টা বাজে?

স'দশটা।

এত রাত্তির হয়ে গেছে! তা' আমাকে ডাক নি কেন?

ডেকে কি করব? এ অবস্থায় ত আর যেতে পারবেন না। বরং এক কাজ করুন, আমি খাবার এনে দিচ্ছি, খেয়ে কোন রকমে একটা রাত্তির এখানেই কাটিয়ে দিন!

দা'গোঁসাই একটু হেসে বললেন,—ভায়া হে, জীবনে উন্নতি করতে হ'লে অনেক সময় পাহাড় পর্ব্বত ডিঙ্গুতে হয়, আর এ ত সামান্য একটু ঝড় বাতাস!

দা'গোঁসাই ক্রমেই অস্থির হয়ে পড়ছিলেন। যুক্তি তর্কের জালে তাকে ধ'রে রাখা যাবে না দেখে শেষে আমার আলোটা জ্বেলে দিলাম। রাস্তার জমাট অন্ধকার ভেদ ক'রে তিনি জীবনের উন্নতির পথ দেখতে চ'লে গেলেন।

* * * *

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ একটা বাজ পড়ার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই দা'গোঁসাইর ডাক শুনতে পেলাম,—নীরেন, দরজাটা একটু খোল না ভাই!

কে, দা'গোঁসাই?

হ্যাঁ ভাই, আজকের মত একটু যায়গা দে!

উঠ্‌তে উঠ্‌তে জিজ্ঞেস করলাম,—আপনি ফিরে এলেন যে?

কি করব, দরজা বন্ধ!

ডেকে খুলিয়ে নিলেন না কেন?

ডেকেছিলাম কিন্তু খুলল না। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল—এত রাত্তিরে বিরক্ত করতে না এসে, এতক্ষণ যেখানে ছিলে সেখানে ফিরে যাও।

তা ত বুঝলাম। কিন্তু কাজটা আপনি ভাল করেন নাই। এমন রাতে দিদি গোঁসাই একা থাকবেন কি ক'রে!

দিনের বেলায় যে তক্তাটার ওপর ব'সে আমি হিসাব লিখ্‌তাম, কোন কথা না ব'লে দা' গোঁসাই তারই ওপর শুয়ে পড়্‌লেন, সঙ্গে সঙ্গে সেটা তাঁর শরীরের ভারে ক্যাঁচ্‌ ক্যাঁচ্‌ করে উঠল! তারপর বৃষ্টি আর বাজের শব্দের সঙ্গেই আমার অন্ধকার ঘরটিতে একটা গোঙানির শব্দ শুনতে পেলাম, বলছেন, —ঠিক একা নয়…দেশ থেকে তাঁর ভাই না কে আজ ক'দিন ওখানে এসে উঠেছে!…



সুদূর

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত

হে অবগুণ্ঠিত মৌনী, অনাদ্যন্ত, বিরহ-বিধুর,
অপরূপ সুন্দর সুদূর!
মোরে তুমি ডাক দিলে নিদ্রাহীন নক্ষত্রের নিঃশব্দ ভাষায়,
যেথা রাত্রি বিরহিনী প্রেমোজ্জ্বল প্রভাতের জ্যোতির আশায়
চলে' যায় দিগন্তের শেষে,
যেথা নব-জীবনের বিদ্যুৎ খেলিছে সদা নৃত্যপরা মরণের বেশে,
যেথা বাজে এক সঙ্গে নৃত্যচ্ছন্দ জীবন মৃত্যুর,
সেথা ডাক দিয়েছ, সুদূর!

অতৃপ্তির অগ্নিশিখা জ্বালাইলে মর্ম্মের প্রদীপে,
ক্ষুদ্র এ আয়ুর দুঃখ-দ্বীপে।
সীমায় সঙ্কীর্ণ যাহা, সরল সহজলভ্য তাহে নাহি সুখ,
তাই ক্ষুদ্র বাহু মেলি নিরন্তর আলিঙ্গিতে রয়েছি উৎসুক,
হে আকাশ নিঃসঙ্গ বিরহী,
তাই শুধু ইচ্ছা হয় সুদূর নীলিমা হয়ে তোমার মহিমাটুকু বহি,
নব নব বর্ণে বর্ণে আঁকি মোর বিরহ-বারতা,
ঘুচাইয়া লই নিঃসঙ্গতা!

সেথা যাব তব ডাকে বন্ধহীন নিত্য নিরুদ্দেশ,
ওগো মোর চঞ্চল, অশেষ!
আকন্দ কুন্দের গন্ধ মৃত্যুর আনন্দে যেথা মেশে অন্ধকারে,
যেথায় তারার দল লক্ষ্যহীন পথে ছোটে দূর অভিসারে,
যেথা সব দীপ নির্ব্বাপিত,
রহস্য-রজনী যেথা করিয়াছে নব নব বিস্ময়ের অঞ্চল বিস্তৃত;

প্রাণের বুদ্বুদ যেথা সৃষ্টি করে সৃষ্টির খেয়ালি,
যেথা নিত্য মৃত্যুর দেয়ালি!

তা ডাকে নিকটেরে ব্যঙ্গ করি, যাব বন্ধহীন,
ওগো দূর চির-সম্মুখীন!
হেরিব তোমার রূপ, হে অরূপ, মরণের খুলিয়া গুণ্ঠন,
আমার বিরহ দিয়া তোমার বক্ষের দ্বার করি উদ্‌ঘাটন,
সেথা দেখি বিপুল বেদনা,
সেথা নিত্য বিরহের গুঞ্জরণে মোর তরে উচ্ছ্বসিছে তোমার প্রার্থনা;
সেথা আমি তব কাছে অমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য, সুদূর,
অনাদ্যন্ত, বিরহ-বিধুর!

দিকে দিকে লিখে রাখ তব গাঢ় বিরহ-লিপিকা,
হে মধুর দূর-মরীচিকা!
মোরে চাও এই কথা আঁক, কবি, সে সৃষ্টির রহস্য অক্ষরে,
তাই আমি দিবারাত্রি চঞ্চল অশান্ত, তাই চলি তব তরে
বিরহিনী বধূ স্বয়ম্বরা,
বক্ষে নিয়া আকাঙ্ক্ষা-দুলানো দুঃখ-স্রোতস্বিনী নিত্য উদ্বেলিত খরস্বরা;
তবু হে অদৃশ্য দূর, নাহি পাই মিলনের সাড়া,
শুধু কর চলার ইসারা!

তাই যাত্রা, যাত্রা তাই নব নব জীবন-মৃত্যুতে,
গান গাহি বিরহ-বেণুতে!
প্রাণের প্রাচুর্য্য নিয়া তুণ যেথা যাত্রী হল প্রবল বিদ্রোহী,
জ্যোতিষ্কেরা যাত্রী যথা এ-যাত্রার অনন্ত আনন্দধ্বনি বহি,
তেমনি আমার অভিযান,
অনিশ্চিত চলিয়াছি বক্ষে জ্বালি চিররাত্রি দুঃখের প্রদীপ অনির্ব্বাণ;
মম চিত্তে তব তরে তাই নিত্য ব্যথার উৎসব,
হে সুদূর, দুর্লভ বল্লভ!

শরৎচন্দ্র

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(বাল্যজীবন)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই সময়ের আরো একটা খেলার কথা মনে পড়ে। ঘোষেদের পোড়ো-বাড়ীর একধারে উত্তরদিকে গঙ্গার উপরেই একটা ঘরের পিছনে কয়েকটা নিম আর দাঁত রাঙ্গা গাছে একটুখানি ছোট জায়গাকে অন্ধকারে নিবিড় করিয়া রাখিয়াছিল। নিমের গোলঞ্চ মদনের কাঁটা লতা চারিদিক হইতে এই স্থানটিকে এমনভাবে বেড়িয়া থাকিত যে, তাহার মধ্যে মানুষ প্রবেশ করিতে পারে এ বিশ্বাস বড় কেহ করিতে পারিত না। এক একদিন দলপতি কোথায় উধাও হইয়া যাইত; জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "তপোবনে" ছিলাম।

হঠাৎ একদিন আমার সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল বোধ করি। আমাকে তপোবন দেখান হইবে জানিতে পারিয়া আমার হৃদয় আনন্দে গুর্ গুর্ করিতে লাগিল। কিন্তু অবশেষে শরৎ বলিল, তুই যদি আর কাউকে ব'লে দিস্? পূর্ব্বদিকে ফিরিয়া সূর্য্য সাক্ষ্য করিয়া বলিলাম, কাউকে বল্‌বো না। কিন্তু তাহাতে সে নিরস্ত হইল না, বলিল, উত্তরদিকে ফের্—ফিরে গঙ্গা আর হিমালয়কে সাক্ষ্য করে বল্। তাহাও করিলাম। তখন সে আমাকে সঙ্গে করিয়া অতি সন্তর্পণে লতার পর্দ্দা সরাইয়া একটি সুপরিচ্ছন্ন জায়গায় লইয়া গেল। সবুজ পাতার মধ্যে দিয়া সূর্য্যের কিরণ প্রবেশ করার জন্য একটা স্নিগ্ধ হরিতাভ আলোর সেই জায়গা চক্ষু এবং মনকে নিমেষে শান্ত করিয়া স্বপ্নলোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। প্রকাণ্ড একখানা পাথরের উপর উঠিয়া বসিয়া স্নেহভরে ডাক দিল—আয়! তাহার পাশে বসিয়া নীচে চাহিয়া দেখিলাম—খরস্রোতে গঙ্গা বহিয়া চলিয়াছে। দূরে—গঙ্গার ও-পারে—নীলাভ গাছপালার ধোঁয়াটে ছবি পাতার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায়। শীতল বাতাস ঝির ঝির্ করিয়া বহিতেছিল। সে বলিল, এইখানে ব'সে ব'সে আমি সব বড় বড়

কথা ভাবি। উত্তরে বলিলাম—তাইতে বুঝি তুমি অঙ্কতে একশোর মধ্যে একশোই পাও? সে অবজ্ঞাভরে বলিল, দূৎ।

ফিরিবার সময় সে বলিল, কোন দিন এখেনে একলা আসিস্ নে।

কেন?

ভয় আছে।

ভূত?

সে গম্ভীর স্বরে বলিল, ভূত-টূত কিছু নেই।

তবে?

এখেনে সাপ থাকে।

* * * *

সে বৎসর সে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ডবল প্রমোশন পাইল। তাই বোধহয় পড়াশুনায় অধিক মন বসিল।

অন্দর-মহলের একটি দালানের এককোণে সে নিজের পড়ার স্থান করিয়াছিল। একটি 'ডেক্সো' (Desk); খান কয়েক বই। কিন্তু এই জায়গাটিকে এমন পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া ধূলা ঝাড়িয়া রাখিত যে, দেখিলেই বুঝিতে দেরী হইত না, পড়ুয়ার মন কতখানি পড়ায় ঢালিয়াছে।

এই নূতন ক্লাসের মাষ্টার ছিলেন যমরাজার বৈমাত্র ভাই, বিশ্বেশ্বর রায়। তাঁহার নাম শুনিলে ছাত্রগণের হৃদ্-কম্প উপস্থিত হইত। তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া পাঠগ্রহণের সুবিধা আমার জীবনে না ঘটিলেও পাশের ঘরে থাকিয়া হুঙ্কার এবং সুদীর্ঘ বেত্র খণ্ডের আস্ফালনজনিত ছাত্রবর্গের আর্তনাদে আমাদের দাঁত-কপাটি লাগিয়া যাইবার উপক্রম হইত। করজোড়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতাম—তাই বোধ করি অন্যত্র গিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছিলাম। শরৎ কিন্তু তাঁহাকেও বশ করিয়াছিল।

তাঁহার ছাত্রগণের উপর প্রতি সোমবারে একখানি করিয়া ম্যাপ আঁকিয়া আনিবার বরাৎ থাকিত। শনিবার অপরাহ্ণে শরতের ম্যাপ আঁকিবার নিবিড় অভিনিবেশ, ম্যাপটি পরিপূর্ণ সুন্দর করিয়া তুলিবার ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে তাহার প্রতিষ্ঠা জমিয়া উঠিয়াছিল।

বাংলা স্কুলে ছোট একটি লাইব্রেরি ছিল। সেখান হইতে বই আনিয়া, অভিভাবকগণের চক্ষের অন্তরালে পাঠ করা, এই সময়ে শরৎ এবং দাদার

অভ্যাস ছিল। নবীনচন্দ্রের কাব্য এবং বঙ্কিমের নভেলগুলি বারবার করিয়া তাঁহারা পড়িতেন—এবং মধ্যে মধ্যে আলোচনাও চলিত। তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইত; আমাদের ঘরে মধ্যে মধ্যে মাতৃদেবীর উৎসাহে যে সাহিত্য-বৈঠক বসিত তাহার মধ্যে।

প্রথমে মাতৃদেবীর একটু পরিচয় দিব। তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে একদিন বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের যে-কথা বলিয়াছিলাম তাহারই কতক কতক এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"মা কি ছিলেন তোমাদের অনেকদিন বলেছি। আবার ক'রে বল্‌তে আমার ক্লান্তি না হ'য়ে আনন্দই হয়। এই বিশেষ দিনে তাঁর অপ্রগল্‌ভ স্নিগ্ধ জীবনের শান্ত-মূর্ত্তি, আমার মনের সাম্‌নে প্রতিভাত হয়েছে—তারই খানিকটা তোমাদের দিতে চাই। . . .

"মাকে বুঝতে হ'লে আমাদের সেই বিরাট একান্নবর্ত্তী পরিবারের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম্মের বিচিত্র গতি-বিধির ব্যাপারটি বোঝা দরকার।

"একেবারে বাইরের বাড়ীতে একদল পেয়াদা থাকৃতো। তাদের কাজ-কর্ম্ম এবং জীবন ধারণের পদ্ধতি সংসারে পেয়াদাকুলের যেমন হইয়া থাকে—ঠিক তাই ছিল। নিমতলার পূর্ব্বদিকে রসুইঘরে, ধোঁয়া, ময়লা এবং অন্ধকারের মলিনতায়, বেলা দশটার মধ্যে মোটা ডাল-ভাতে উদর-পূর্ত্তি ক'রে তারা উর্দ্দি-চাপরাস চড়িয়ে কাছারি চ'লে যেত। দুপুরে সব ভোঁ-ভাঁ। বিকেলে সিদ্ধি-ঘোটার ধুমধাম। সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে ডাল-রুটির শ্রাদ্ধ ক'রে এই অসুরের দল নাক ডাকাতে সুরু ক'রে দিত।

"বর্ণনা এখেনে শেষ করলে বাইরের বাড়ীর ভৃত্যের-নৃত্যের কথাই কেবল বলা হয়! কিন্তু সেখানেও শিবম্ বিরাজ করতেন—অপূর্ব্ব শান্তের নিস্পন্দ মাধুর্য্যে!

"গৌরী-সিং-এর কথা একটু বলি। . . .

"গভীর রাত পর্য্যন্ত মিটমিটে প্রদীপের ঢিমেআলোয়, ছিন্ন খাটিয়ার ওপর ব'সে বুড়ো সীতাপতি রামচন্দ্রের পবিত্র-জীবনের লীলা-কাহিনী সুর ক'রে ক'রে প'ড়ে কণ্ঠ গদগদ ক'রতো—তার দু'চোখ বেয়ে প্রেমাশ্রু ঝ'রে পড়তো!

"তার পরের মহলের কথা ত' তোমরা "শ্রীকান্ত"র কাছে আগেই শুনেছ। . . .

"অন্দর-মহলের কথা একবার বলি। . . .

"মেয়েদের প্রধান কাজ ছিল আহারের যোগাড় করা, অর্থাৎ রান্না এবং তার সব আনুসঙ্গিক ব্যাপারগুলো। তারপর, তাঁদের প্রাণ তাজা রাখবার জন্যে কলহ ছিল অন্যতর, প্রায় নিত্যকর্ম্ম। লেখা-পড়া কি কোন কারুশিল্পের বালাই ছিল না . . . যার ধারা আজো চ'লে আসচে। দুপুরে দিবা-নিদ্রা এবং সন্ধ্যার পর অবসর জুট্‌লো ত' ফের এক চমক্ ঘুম! . . .

"যে রাতে তাঁর রাঁধবার পালা থাকৃতো না, সে দিন মা অন্য ঘরে গিয়ে পরচর্চ্চা ক'রে সময় বৃথা নষ্ট করতেন না। সে দিন সাহিত্যের বৈঠক ব'সতো আমাদের ঘরে, "পালদোটের"* পাশে, ম্লান প্রদীপের আলোতে—ছেঁড়া মাদুরের উপর। . . .

"ঘোর সাংসারিকতার কুরুক্ষেত্রের মধ্যে মা আমাদের বাণীর নিগূঢ় মন্ত্র উচ্চারণ ক'রেছিলেন—তার রেশ আজো সাহিত্য-কুঞ্জবনে সপ্ত-স্বরে উদ্গীত হচ্ছে। . . .

"সেই নিগূঢ় মন্ত্রটি কি?—আলোচনা না করলে স্পষ্ট হবে না আমার বক্তব্যটি।

"নিত্যকার জীবনে মানুষ খায়-দায়, হাসে-কাঁদে; কিন্তু এ সবই যে অনিত্য তাও জানে। এই অনিত্যের লীলা-খেলার মধ্যে মন অন্বেষণ ক'রে বেড়ায় নিত্য বস্তুর; যা চিরদিন ধ'রে আছে, যা মানুষের সত্যদিকের পরিচয় অভ্রান্ত ভাবে পরিস্ফুট ক'রে দেয়, যা মৃত্যুতেই শেষ হ'য়ে যায় না, যা ঠিক আটপৌরেও নয় এবং যা কৃত্রিমতার অতি-ভার শৃঙ্খল থেকে নিত্যমুক্ত—এই যে মানুষের "সীমার মাঝে" অসীমের রস-বোধ—এরই কথা বলৃচি। . . .

'তাঁর শেষ জীবনের একদিনের ঘটনা বল্লে, বোধহয় অনেক বেশী কথা বলার দায় থেকে রক্ষা পাবো। . . .

"যে দিনের কথা ব'লছি—সে দিন বাবার মৃত্যু হয়।...মৃত্যুর সময়ের পরীক্ষা বড় কঠিন; সে সময়ে কপটতা করা সম্ভব হয় না। . . .

"বাবার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল গঙ্গাতীরে দেহরক্ষা করা। সে সাধ তাঁর পূর্ণ হয়েছিল। . . .

"আমরা ছ'-ভাই-এ মিলে চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে তারকব্রহ্ম নাম শোনাচ্চি এমন সময় এলেন আমাদের এক বিজ্ঞ আত্মীয়। যা'র খোঁজ ক'রে

---

* বোধ করি 'সাইড বোর্ডে'র শিশু-তর্জ্জমা।

বল্লেন, সেকি, এমন সময় তিনি আসেন নি? তখন নিজেই গেলেন মাকে আন্‌তে।

"মা কিন্তু আসেন্‌নি। উত্তরে যে কথা বলেছিলেন, মনে ক'রলে আজও চোখের জল সাম্‌লাতে পারি নে। মা ব'লেছিলেন, আমার জীবনে ত' তিনি অমর হয়ে আছেন। কি হবে তাঁর ও মুখ দেখে? আমি যাবো না।

ঠিক এমনিতর কথাই কি 'গৃহদাহে' শরৎচন্দ্র মৃণা'লের মুখে তার অনেকদিন পরে দেন্ নি?

"ঈশ্বরচন্দ্র, ভূদেবচন্দ্র, মাইকেল, বঙ্কিম, দীনবন্ধু এবং নবীনচন্দ্রকে তাঁর সাহিত্য-বৈঠকে নিত্য আহ্বান ক'রে মা'র আমাদের জীবনে এই পরম লাভটি ঘটেছিল।"

এই কথাগুলি বলিয়াই যদি এই প্রসঙ্গ শেষ করি তাহা হইলে এমন মনে হইতে পারে যে আমাদের স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর সাহিত্যিক প্রভাবেই শরৎচন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিলেন। হয় ত' বা ইহা আংশিক সত্য; কিন্তু আর একজনের কথা না বলিলে মনে হয় সত্যকে বহুল পরিমাণে ক্ষুন্ন করা হইবে।

—ক্রমশ



আমার গোয়েন্দাগিরি

শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ছেলেবেলা হইতে রাশি রাশি রোমাঞ্চকারী ডিটেক্‌টিভ্‌ উপন্যাস পড়িয়া এবং কোনান ডয়েল ও লেব্‌লোর বই পড়িয়া অনেকদিন হইতেই আমার মনে গোয়েন্দাগিরি করিবার একটা প্রবল ইচ্ছা লুক্কায়িত ছিল, বই পড়িয়া ভাবিতাম ডিটেক্‌টিভ্‌রা কি অদ্ভুত জীব! ডাকাতে গুলি ছুঁড়িল ডিটেক্‌টিভের কানের পাশ দিয়া সোঁ করিয়া চলিয়া গেল কিন্তু যেমন ডিটেক্‌টিভ্‌ গুলি ছুঁড়িল অমনি ডাকাত কুপোকাত। যত বড়ই বিপদে পড়ুক না কেন, ডিটেক্‌টিভ্‌ অক্ষত শরীরে বাঁচিয়া আসিবেই আসিবে। এই সব পড়িয়া ডিটেক্‌টিভ্‌ নামক অদ্ভুত জীবটির উপর আমার একটা শ্রদ্ধা জন্মিয়া গিয়াছিল, কোনও ডিটেক্‌টিভ্‌ আসিয়া যদি আমায় বলিত, ওহে আমার বাড়ীতে চাকরের কাজ করবে চল, আমি তোমাকে আমার চেলা ক'রে নোব। তা'হলে বোধ হয় আমি অসঙ্কোচ চিত্তে সম্মত হইতাম। আমার সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যবশতই হোক কোনও ডিটেক্‌টিভ্‌ আসিয়া এরূপ প্রস্তাব করে নাই, করিলে কি করিতাম তাহা বলিতে পারি না। ডিটেক্‌টিভ্‌গিরি করবার ইচ্ছাটা আমায় এমন পেয়ে বসেছিল যে, পথে ঘাটে যখন তখন সার্লক হোম্‌সের মত পর্য্যবেক্ষণ করিতাম, রাস্তায় যেতে যেতে রঙ্‌-বেরঙের লোকের মুখ দেখে তাদের সম্বন্ধে এক একটা ধারণা করিতাম, মাঝে মাঝে কোনও লোকের পিছনে পিছনে যাইতাম,—সে কি করে, অবস্থা কেমন ইত্যাদি নানা বিষয়ে অনুসন্ধান করিতাম। এই রোগটা আমার এমন সংক্রামক হ'য়ে উঠেছিল যে, যখন শুনলাম প্রতিবেশী-পুত্র শৈলেন কাহাকেও না বলিয়া কাল বিকালে হঠাৎ গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তখন মনে মনে একেবারে ঠিক করিয়া ফেলিলাম যে, শৈলেনকে খুঁজিয়া বাহির করিবই করিব। এমন সুযোগ আর পাব না, তাড়াতাড়ি শৈলেনদের বাড়ী উপস্থিত হইলাম। শৈলেনের মাকে মাসী-মা ডাকিতাম। তাঁকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, মাসী-মা, শৈলেনের কোনও খবর পেলে? মাসী-মা শুষ্কমুখে বলিলেন, না বাবা, কোথায় গেল ছেলেটা?

আমি তখন মাসী-মাকে রীতিমত পাকা ডিটেক্‌টিভের মত প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলাম, বাড়ীতে কোনও ঝগড়া হ'য়েছিল ?

মাসী-মা বলিলেন, না !

তার কেউ শত্রু আছে কি ?

মাসী-মা এবারেও আমায় নিরাশ করিয়া বলিলেন, কই না, তার ত কোনও শত্রু ছিল না।

অবশেষে শেষঅস্ত্র প্রয়োগ করিয়া বলিলাম, তার নামে কাল কোনও চিঠি এসেছিল কি ?

মাসী-মা বলিলেন, কাল ত কোনও চিঠি আসে নি—তবে দিন চারেক আগে একখানা এসেছিল বটে।

রহস্যের সূত্র পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলাম, চিঠিখানা কোথায় আমায় দেখাতে পার ?

কেন পারব না, সে যে আমার বোন সরী শৈলের নামে আমায় চিঠি দিয়েছিল।

হতাশ হইয়া বলিলাম, থাক, চিঠি দেখ্‌তে চাই নে। শৈলেনের শোবার ঘর কোন্‌টে ?

মাসী-মা আমাকে তার শোবার ঘর দেখিয়ে দিলে আমি তাহা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, ঘরের এককোণে একটা টেবিল, টেবিলের উপর খানকতক বই, একটা ব্লটিং প্যাড্, সামনে একটা চেয়ার, হঠাৎ ব্লটিং প্যাডের উপর নজর পড়িল, প্যাডের উপরকার ব্লটিংখানা প্রায় নূতন, খালি গোটাকতক অক্ষরের ছাপ তাতে লেগে রয়েছে। আশান্বিত হৃদয়ে প্যাড থেকে ব্লটিংখানা খুলে নিয়ে একটা আয়নার সামনে ধরিলাম। আয়নার উপর গোটা কতক অসংলগ্ন কথার ছাপ পড়িল। কথাগুলি এইরূপ :—

প্রিয় . . . দি

. . . মা...নেক ক . . . র আছে . . . তেছি।

. . . কী পুব ক্সায় . . . ন . . . মরা কে...আছে . . .

বাসা লইনে। ইতি

. . . লেক্সনা . . . ত্র

কিছু বুঝিতে পারিলাম না। একটা কাগজে কথা কয়টা লিখিয়া লইয়া শূন্য

স্থানের পূরণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, অনেক কাটা-কাটির পর এইরূপ দাঁড়াইল

প্রিয় অনাদি—

তোমাকে অনেক কথা বলিবার আছে, শীঘ্র যাইতেছি, বাঁকীপুর জায়গা কেমন? সেই মরা কেমন আছে? নির্জ্জনে বাসা লইবে। ইতি

শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র

চিঠিখানার রহস্য এইরূপে উদ্ঘাটন করিয়া মনে মনে একটা মীমাংসা করিয়া লইলাম, শৈলেন নিশ্চয়ই কোনও কুকর্ম্ম করিয়াছে, তাই ভয়ে বাঁকীপুরে পলায়ন করিয়াছে। "মরার" রহস্য ভেদ করিতে পারিলাম না, ভাবিলাম বাঁকীপুরে যাওয়া যায় ত দেখা যাবে ব্যাপার কি। মাসী-মাকে ডাকিয়া এই সব বলাতে তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, কোনও ভয় নেই মাসী-মা আমি আজ বিকেলের গাড়ীতেই বাঁকীপুর যাচ্ছি।

মাসী-মা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, দেখ্ বাপ, যদি কিছু করতে পারিস্, তোরাই আমার ভরসা।

বাড়ীতে আসিয়া যাবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। হঠাৎ বেলা দুটোর সময় শুনিলাম, শৈলেনের বাড়ী হইতে আনন্দের কোলাহল উঠিয়াছে। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া তাহাদের বাড়ী গিয়া দেখি শৈলেন ফিরিয়া আসিয়াছে। সে বিকালে দিদির বাড়ী বেড়াতে গিয়াছিল, দিদি রাত্রে ফিরিয়া আসিতে দেয় নাই, আজ খাওয়া দাওয়া করিয়া আসিয়াছে। আমায় দেখিয়া শৈলেন হাসিয়া উঠিল—মাসী-মা কি বলিতে যাইতেছিলেন, আমি ছুটিয়া পলাইয়া আসিলাম। বুঝিলাম মাসী-মা শৈলেনকে সব বলিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে শৈলেন আসিয়া আমায় ডাকিতে লাগিল, সাড়া দিলাম না। সে আমার সমবয়সী, তারপর রাস্তায় বাহির হইলেই সে আমায় বলিত, কিগো ডিটেক্‌টিভ্ মশাই, বাঁকীপুর যাচ্ছ নাকি?

সেই থেকে ডিটেক্‌টিভ্ নভেল আর পড়িতাম না।

পান্থবীণা

শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নূতন বাড়ীতে আসিয়া দিন তাহাদের মন্দ কাটিতেছিল না। এখানে তাহাদের আনিয়া দিয়াই অমরেশ গিরিডি চলিয়া গেছে। ডাক্তারখানাও খোলা হইয়াছে।

নিভা ও গায়ত্রীর সম্বন্ধটা দিনে দিনে বেশ পাকা হইয়া উঠিতেছিল। উভয়েই প্রায় অধিকাংশ সময় কাছাকাছি থাকে, নিভা কখনও গায়ত্রীর কাছে আসে, আবার গায়ত্রী কখনও তাহার কাছে যায়। এম্‌নি করিয়াই দিন কাটে। কিন্তু দিনকতক পরেই নিভার এই আসা-যাওয়ার দিকে গায়ত্রী একটুখানি সতর্ক হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ দিবস-রাত্রির যে মুহূর্ত্ত মানুষের কাছে মানুষের দীনতা দৈন্য ঢাকিবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়—নিজেদের মধ্যাহ্ন এবং সায়াহ্ন ভোজনের সেই নির্দ্দিষ্ট সময়টিতে সহাস্যময়ী নিভার আনন্দময় সাহচর্য্যের আনন্দ হইতে গায়ত্রী সর্ব্বদাই নিজেকে বঞ্চিত করিয়া রাখে। অথচ নিভা তাহা বুঝিতে পারে না। গায়ত্রীর কষ্ট হয়।

সেদিন বৈকালে একটা ঝাঁটা হাতে গায়ত্রী উপরের ঘরগুলা পরিষ্কার করিতেছিল, এমন সময় হাসিতে হাসিতে নিভা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। গায়ত্রী বলিল, এসো। নিভা কোনও কথা না বলিয়া প্রথমেই অতর্কিতে গায়ত্রীর হাত হইতে ঝাঁটাটা কাড়িয়া লইল এবং শুধু কাড়িয়া লইয়াই ক্ষ্যান্ত হইল না, রীতিমত কোমর বাঁধিয়া কাজে লাগিয়া গেল। গায়ত্রী ঈষৎ হাসিল।

নিভা বলিল, হাস্‌চো যে?

অনভ্যস্ত হস্তে ঝাঁটা তাহার হাতে ভাল চলিতেছিল না। গায়ত্রী বলিল, হাস্‌বো না? জানিস্‌ ঝাঁটা ধর্‌তে? ধরেচিস্‌ কখনও?

নিভা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সত্যি হচ্ছে না দিদি?

খুব হচ্ছে। দে, তুই দাঁড়িয়ে দ্যাখ। বলিয়া গায়ত্রী ঝাঁটাটা পুনরায় কাড়িয়া লইয়া নিজেই ঝাঁট দিতে সুরু করিল।

নিভা বলিল, কারও বাড়ী গিয়ে ঝাঁটা যদি আমায় আবার ধরতেই হয়, তার চেয়ে কাজটা হাতে কলমে শিখে রাখাই ভাল দিদি।

কথাটার অর্থ গায়ত্রী টের পাইল। বলিল, আমার মত ননদ যদি থাকে, এম্‌নি করেই ঝাঁটা তোর কেড়ে নেবে হাত থেকে। ভাবিস্ নে।

কিন্তু এত বড় স্পষ্ট ইঙ্গিত নিভার অসহ্য হইয়া উঠিল। মুখে এক প্রকার শব্দ করিয়া সে জানালার কাছে গিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

এই অভিমানিনীকে গায়ত্রী কি যেন বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় নীচে বংশীর গলার আওয়াজ শুনিতে পাওয়া গেল। ডাকিল, দিদি! দিদি!

অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া সে ডাকিতেছিল, ডাক শুনিয়াই গায়ত্রী তাহা বুঝিতে পারিল এবং হাতের ঝাঁটাটা মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া সে সিঁড়ি ধরিয়া নীচে নামিতে লাগিল।

সিঁড়ির মাঝামাঝি আসিয়া পৌছিতেই, নীচে বারান্দার উপর বংশীকে সে দেখিতে পাইল। বলিল, কি রে?

বংশী জিজ্ঞাসা করিল, নিভা রয়েছে এখানে?

হ্যাঁ, রয়েছে। কেন?

বংশী ধীরে ধীরে দিদির কাছে আগাইয়া আসিয়া বলিল, আছে কাজ। ঘর হইতে নিভা তখন বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বংশী বলিল, গরীব দুঃখী লোকদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতে তুমি কি নিষেধ করেছ?

নিভা ঘাড় হেঁট করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল, কোথায় শুনলেন এ-কথা?

সে-কথার কোনও জবাব না দিয়া বংশী বলিল, একবার যেতে হবে।

কোথায়?

ও-বাড়ী।

নিভা মুখ তুলিয়া বলিল, কেন বলুন ত', ডাক্তারবাবু কি আপনার কথা শোনেন নি?

কিন্তু সে কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই গায়ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে বংশী?

বংশী কহিল, হয় নি কিছু। স্বামী স্ত্রী দুজনের বসন্ত,—ঘরে একটি কচি ছেলে আর একটি আট-ন' বছরের মেয়ে। মেয়েটি ডাক্তারখানায় কেঁদে এসে পড়েছিল। ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন। বল্‌লেন, হুকুম নেই মালিকের।

গায়ত্রী বলিল, কিসের হুকুম?

বংশী চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু গায়ত্রীর সে প্রশ্নের জবাব দিল নিভা। বলিল, মানুষকে দয়া করবার হুকুম, দিদি।

এই বলিয়া দুজনেই হাসিল।

দরজার কাছে আসিয়া বংশী জিজ্ঞাসা করিল, গাড়ী ডাকব?

নিভা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তাহার পর রাস্তাটা পার হইয়া আসিয়া নিভা সরাসর ডাক্তারখানায় ঢুকিতে যাইতেছিল, বংশী নিষেধ করিল, বলিল, বাইরের রুগী আছে।

নিভা সে-কথা শুনিল না, একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, থাক্। বলিয়াই সে ডাক্তারখানায় প্রবেশ করিল।

তাহার এই অপ্রত্যাশিত আগমনে দরজার দারোয়ান হইতে কম্পাউণ্ডার, কেসিয়ার, ডাক্তার সকলেই একটুখানি শশব্যস্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। ডাক্তারবাবু একটি রুগীর প্রেস্‌ক্রিপসন্ লিখিতেছিলেন, তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিলেন।

নিভা জিজ্ঞাসা করিল, সে মেয়েটি কোথায় গেল?

ডাক্তারবাবু বলিলেন, কোন্ মেয়েটি?—এবং পরক্ষণেই দরজার কাছে বংশীর দিকে তাঁহার নজর পড়িতেই কথাটা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল এবং শুধু মনে পড়াই নয়, ব্যাপারটা আগাগোড়া বুঝিয়া লইতে তাঁহার বিশেষ বিলম্ব হইল না। বংশীর উপর মনে-মনে অসন্তুষ্ট হইলেও বাহিরে তাহা গোপন করিয়া তিনি কহিলেন, সে ত' চলে গেছে অনেকক্ষণ।

নিভা এইবার একটুখানি বিপদে পড়িল, কি যে বলিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না,—এতগুলা লোকের সাক্ষাতে তাঁহাকে কিছু বলাও চলে না, কাজেই বলিবার মত আর কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া নিভা বলিল, যাবার আগে আমার সঙ্গে একবার দেখা করে' যাবেন।

এই বলিয়া সেখান হইতে সে চলিয়া আসিতেছিল, দরজার কাছে বংশী বলিল, মেয়েটির ঠিকানা আছে আমার কাছে।

ও। বলিয়া নিভা আবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এঁর কাছে ঠিকানা নিয়ে যান, একবার আপনি দেখে আসুন।

বেশ। বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া ডাক্তারবাবু বংশীর দিকে বক্র কটাক্ষে একবার তাকাইলেন, নিভা তাহা দেখিয়াও দেখিল না, ধীরে-ধীরে সেখান হইতে বাহির হইয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

কিন্তু বংশী নিজেও যে ডাক্তারের সঙ্গে সেই বসন্ত রোগীর কাছে যাইবে এবং শুধু যাওয়াই নয়, নিজের সব কাজ ফেলিয়া মরণাপন্ন অসহায় সেই রোগীগুলির সেবাশুশ্রূষায় নিজেকে নিয়োজিত করিয়া দিবে, নিভা তাহা প্রথমে বুঝিতে পারে নাই। পরদিন বেলা প্রায় তিনটার সময় নিভা যখন গায়ত্রীর কাছে গিয়া দাঁড়াইল, দেখিল গায়ত্রী বারান্দার উপর এক থালা ভাত ঢাকা দিয়া তাহারই পাশে আঁচল বিছাইয়া শুইয়া আছে। নিভা জিজ্ঞাসা করিল, কার খাবার ঢাকা রয়েছে দিদি ?

গায়ত্রী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, এসো।

নিভা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, কার খাবার দিদি ?

গায়ত্রী বলিল, বংশীর। কাল ফিরেছিল রাত দুপহরের পর, আজ আবার কখন ফেরে কে জানে !

নিভা কহিল, কোথায় গেছে ?

সেই রুগীর কাছে। বলে, আহা তাদের কেউ নেই।

নিভা চুপ করিয়া রহিল।

দিন দুই তিন পরে এমনি আর একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিভা আসিয়া দেখিল, প্রতিদিনের মত সে-দিনও বংশীর খাবার ঢাকা রহিয়াছে। নিভা বলিল, এমনি কি রোজই হচ্ছে নাকি দিদি ?

গায়ত্রী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

হঠাৎ নিভার কি কৌতূহল হইল, বলিল, তুমি কি রান্না করেছ দেখব দিদি। বলিয়া সে বংশীর জন্য ঢাকা-দেওয়া ভাতের থালাটা তুলিয়া দেখিতে যাইতেছিল, গায়ত্রী হাঁ হাঁ করিয়া নিষেধ করিল, বলিল, কি আর দেখবে নিভা, অমনি যাহোক দুটো রেঁধেছি। কিন্তু নিভা তাহার সে নিষেধ শুনিল না, ভাতের থালাটা তুলিয়া ধরিতেই তাহার মুখখানা কেমন যেন বিবর্ণ মলিন হইয়া গেল। মোটা চালের কতকগুলা ভাতের পাশে খানিকটা সিদ্ধ আলু,—বিরি-কলায়ের একবাটি ডাল, আর কিসের না জানি একটুখানি অম্বল ব্যতীত আর কিছুই নাই।

নিভা বলিল, একি দিদি ? এমনি রান্না কি তোমাদের রোজ হচ্ছে আজকাল ?

লজ্জা সংমের প্রথম ধাকাটা সামলাইতে পারিলে মানুষের দ্বিধা সঙ্কোচ তখন অনেকটা কম হইয়া আসে। গায়ত্রীরও তাহাই হইল। বলিল, হাঁ।

নিভা কহিল, কেন ? ডাক্তারখানা থেকে কি কিছুই নেওয়া হয় না ?

ঘাড় নাড়িয়া গায়ত্রী বলিল, না।

অথচ অমরেশ যাইবার দিন নিভাকে বার-বার করিয়া বলিয়া গিয়াছিল, বংশী যেন ডাক্তারখানা হইতে টাকা লইয়া সংসার চালায়, কিন্তু বংশীকে নিভা সে-কথা বলে নাই, ভাবিয়াছিল, অমরেশ তাহাকেও নিশ্চয়ই বলিয়া গেছে। অথচ বংশী যে এ-দিকে এমনি করিয়া দিন কাটাইতেছে, নিভা তাহার কিছুই জানে না,—আজ এই রান্না দেখিবার কৌতূহল তাহার না হইলে সে-কথা হয় ত সে কোনদিন জানিতেও পারিত না।

নিভা একদৃষ্টে সেই থালাটার দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল, গায়ত্রী হাসিয়া বলিল, কি ভাবছ নিভা ? মুখখানি যে হঠাৎ অমন ভারি হয়ে গেল তোমার ? এসো। বলিয়া সে অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটাকে থামাইয়া দিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবার জন্য গায়ত্রী উঠিয়া বসিল।

গায়ত্রীর মুখের পানে তাকাইয়া নিভা কহিল, তার কি তুমি একাই বয়ে বেড়াবে দিদি, কাউকে ভাগ দিবে না ?

গায়ত্রী হাসিয়া কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, হঠাৎ সিঁড়ির উপর কাহার পায়ের শব্দ হইতেই পিছন ফিরিয়া দেখিল, বংশী আসিতেছে। কিন্তু তাহার কাপড় জামা ভিজা দেখিয়া সে প্রশ্ন করিল. এই অবেলায় চান্ আবার তুই কোত্থেকে করে' এলি বংশী ?

বংশী সরাসর তাহার ঘরের দরজায় আসিয়া বলিল, সেই মেয়েটা মরে', পড়েছিল কাল রাত্রি থেকে, সকালে তাকে পুড়িয়ে ফিরে' দেখি তার মাও ম'রে গেছে। এইবার বাকী রইলো সেই বছর-খানেকের কচি ছেলেটি আর তার বাবা।

গায়ত্রী ও নিভা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। গায়ত্রী একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আহা ! কি যে হবে তাদের—

নিভা হেঁটমুখে চুপ করিয়াই রহিল।

এমন সময় ছুটিতে ছুটিতে বিভা তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

নিভা মুখ তুলিয়া তাহার দিকে তাকাইতেই বিভা হাসিয়া বলিল, আমায় একলা রেখে তুমি যে ভারি চলে এসেছ দিদি ? বা!

নিভারও এইবার সেখান হইতে উঠিবার প্রয়োজন হইয়াছিল, বলিল, যাই চল্,—সঙ্গে কে এসেছে তোর ?

বিভা বলিল, কৈলাস। চল নীচে, দাঁড়িয়ে আছে সে।

আজ তবে আসি দিদি। বলিয়া নিভা উঠিয়া দাঁড়াইল।

গায়ত্রীও আর বাধা দিল না, বলিল, আবার এসো।—বলিয়াই তাহাদিগকে সিঁড়ি পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া সে ফিরিয়া আসিয়া বংশীর দরজায় গিয়া দাঁড়াইল। বংশী তখন কাপড় জামা ছাড়িয়া মাথা মুছিতেছে। বলিল, এখন আর কিছু খাব না দিদি, ভারি শীত করছে।

অবেলায় চান করে অমন হয়। আয়, যেমন পারিস চারটি মুখে দে। বলিয়া গায়ত্রী বাহিরে তাহার থালার কাছে আসিয়া আসন বিছাইয়া দিল।

বংশী বলিল, না দিদি, বড্ডো শীত,—একটুখানি চা পেতাম যদি।

তবে একটু বোস্। বলিয়া গায়ত্রী নীচে নামিয়া গেল।

কিন্তু আধঘণ্টাখানেক পরে চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া যখন সে বংশীর ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল, দেখিল আপাদ-মস্তক ঢাকা দিয়া বংশী তখন তাহার বিছানার উপর শুইয়া পড়িয়াছে।

গায়ত্রী ডাকিল, বংশী ওঠ্! চা এনেছি।

মাথার কাপড়টা ধীরে ধীরে খুলিয়া বংশী তাহার দিদির মুখের পানে তাকাইয়া অপরাধীর মত অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে বলিল, আমার জ্বর আসবে দিদি। চোখ দুইটা তাহার ছল্ ছল্ করিতেছিল!

পার্শ্বে টেবিলের উপর চায়ের পেয়ালাটা নামাইয়া গায়ত্রী তাড়াতাড়ি তাহার মাথায় গায়ে হাত দিয়া দেখিল, আগুনের মত সর্ব্বাঙ্গ তখন গরম হইয়া উঠিয়াছে।

গায়ত্রীর মাথাটা তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া গেল। স্পষ্ট দিবালোকে মনে হইল তাহার চোখের সুমুখে অন্ধকারে যেন অজস্র জোনাকি পোকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একটুখানি সামলাইয়া লইয়া ধীরে সে তাহার শিয়রের কাছে বসিয়া পড়িল।

ক্রমশ—

মিনতি

শ্রীকুসুমকুমারী দেবী

তপস্যার গাম্ভীর্য্য যেথায়
বাসনার চাঞ্চল্য নীরব
হৃদয়ের দৈন্য বৃত্তিগুলি
মঙ্গলেতে পরিপূর্ণ সব।
সুখময় শান্তির বাতাস
বহিতেছে যেথা অনুক্ষণ,
সেথা আজি ব্যকুল উচ্ছ্বাসে
ছুটে যেতে চায় মোর মন।
জগতে তো চিনিল না কেহ
তুমি মোরে চিনিয়াছ যদি,
তবে কেন কঠিন বিচ্ছেদে
রাখিয়াছ দূরে নিরবধি ?
নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকারে
ব্যাপ্ত আজি হৃদয় আমার,
সংঘাতের দারুন পরশে
আসিয়াছি চরণে তোমার।
জ্বলিতেছে শোকের অনল
নিরন্তর বুকের ভিতরে
যাতনা। দীর্ণ অভিশাপ
বহিতেছি অভিশপ্ত শিরে।
জগতের ভুলে যা'ক সব
তুমি মোরে ভুলিও না সখা,
অন্ধকার হৃদয়-আকাশে
জ্বাল দীপ্ত উজলিত শিখা।

জ্ঞানহীন বুদ্ধিহীন আমি
তাই ওগো পরমুখ চেয়ে,
বসেছিনু দুর্ব্বল ভিখারী
আপনার দুঃখ ব্যথা লয়ে ;
টুটিয়াছে সে ভ্রম এখন
আর নাহি সে আকাঙ্ক্ষা মম,
দাও আজি আশ্রয় আমায়
ওগো সখা, ওগো প্রিয়তম !
মুছে দাও মরমের ব্যথা
হৃদয়ের অন্ধকার ঘোর।
মিটাও গো নিখিল জীবনে
জীবনের শেষ সাধ মোর !





উপন্যাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৬)

হরিলাল বাবুর ছুটী ছাটার সময় কলকাতা থেকে সরে যাবার মত একখানি বাড়ী ছিল; সেখানির নাম দিয়েছিলেন—বিশ্রাম ভবন। হাওড়া থেকে বি-এন-আর লাইনে ঘণ্টাখানেক গিয়ে ষ্টেশন, ষ্টেশন থেকে ক্রোশখানেক গেলে রূপনারাণের উপর এই বাড়ীখানা। দূর থেকে বাড়ীখানাকে বাড়ী ব'লে মনে হয় না, মনে হয় যেন নদীর উপর একখানা ষ্টীমার—ডাঙ্গায় ভিড়ে আছে।

বড়দিনের ছুটি আমাদের মোটে পাঁচ-ছ দিন, তাতে বাড়ী যাবার সুবিধা হবে না:—তাই হরিলাল আমাকে অনুরোধ করলেন যে, চল আমার বিশ্রাম-ভবনে গিয়ে ক'দিন কাটিয়ে আসবে।

শীতকালে কলকাতার হাওয়া আমার বড় বিশ্রী লাগতো। চিমনির ধোঁয়ার বালিতে যেন ফুসফুস ভরে গিয়ে মানুষের দম আটকে দেয়!

ফাঁকা নদীর তীরে বাড়ীখানা—গ্রাম থেকে একটু দূরে; এইসব মনে ক'রে আমার যেন একটু লোভ হলো। আমি চট্ করে রাজী হয়ে গেলুম।

হাই কোর্টের ছুটী আগেই হয়েছিল, তিনি আমাকে যাবার জন্তে বিশেষ অনুরোধ করে চলে গেলেন—বল্লেন, তোমার পড়াশুনার কোন ক্ষতি হবে না—তুমি ছুটী হলেই চলে আসবে।

সেদিন সকাল বেলা, গাড়ীর উপর জিনিষ পত্র চড়িয়ে হাওড়া যাবার পথে হাবু দত্তের সঙ্গে দেখা হলো। সব শুনে হাবু দত্ত বল্লেন,—তাহলে বেড়ে ফুর্ত্তিতেই

দিনগুলো কাটাবে দেখচি—আমিও যেতুম; কিন্তু যাওয়া শক্ত—হাতে অনেক কাজ—তা ছাড়া দু' একটা ডিনারের নেমন্তন্ন ফাঁক পড়ে যায়। সেই হাসি!

এই হাসি যারা দেখেচে—তারা হাবু দত্তের জীবনের সব ত্রুটি অপরাধ সহজেই ক্ষমা করবে।

মানুষ যে একটা জানোয়ার তাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না। দেহ এবং বংশ রক্ষার ক্ষুধাগুলো যেন আদিম তেজের সঙ্গে তাঁর ভিতর রয়েচে—সেগুলোর গণ্ডী অতিক্রম করার কোন কল্পনাও যেন তাঁর ভিতর স্থান পায় না। বড়দিনে ফিরিঙ্গী বাড়ীর ডিনার!—হাবু দত্তের পক্ষে তাকে ছাড়িয়ে উঠার মত শক্ত কাজ বোধ করি আর দুনিয়াতে দুটো নেই।

বিশ্রাম ভবনে পৌছে দেখলাম খুড়ি-মা সেখানে থাকেন। সংসারের সংক্ষোভ থেকে তাঁকে বাঁচাবার জন্যে এই স্তব্ধ গম্ভীর লোকটির নীরব ব্যবস্থাটি আমার বড় ভাল লেগেছিল।

প্রাতঃস্নান করে একখানি মটকার সাদা ধুতি পরে তিনি গৃহ-কর্ম্ম করে বেড়াচ্ছিলেন। সেই নিরাভরণা রমণীটিকে দেখে মনে হলো জগতের কল্যাণ শ্রী বুঝি এমনি করেই নির্জ্জন নিভৃত লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখেন! তাঁর মুখে স্নিগ্ধোজ্জ্বল শুভ্র হাসি;—অলঙ্কারহীন করপুট যেন আদর-আহ্বানের পূত রসে পরিপূর্ণ! আমি প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলাম। বদন আমার পরিচয় দিয়ে বল্লে,—ইনিই কিরণশঙ্কর। খুড়ি মা বল্লেন,—এসো বাবা আমার।

একখানি কার্পেটের আসনের সামনে কয়টি ভাজা পুলি, খেজুরে গুড় আর খেজুরে গুড়ের সন্দেশ, একটি চকচকে খাগড়াই গ্লাসে একগ্লাস জল। খুড়ি-মা বল্লেন,—একটু মিষ্টিমুখ কর বাবা, এখেনে ত দোকান-পাট নেই—তোমাদের এ-সব খেতে কত কষ্ট হবে।

আমি বদনের দিকে চেয়ে বল্লুম, কি বদন, এই সব খেয়ে দেয়ে বড় কষ্টেই আছ এই পাড়াগাঁয়ে! তাই ভাবি বদন আর দেখা সাক্ষাৎ দেয় না কেন,—তুমি যে এখেনে বসে আছ তা—কে জানে বল!

খুড়ি-মা স্মিতহাস্য করে বল্লেন,—তা বাছা বদনের দোষ নেই, ও কি আর থাকতে চায়? কিন্তু কেমন করে আমি থাকি, একজন কেউ না থাকলে আমার যে মন কেমন করে?

খুড়ী-মা'র এই কথাগুলোর মধ্যে বৈধব্য-জীবনের করুণ কাহিনীটুকুই নিহিত ছিল।

আশৈশব যে শিক্ষা পেয়ে এলো যে, নিজের দু'পায়ে দাঁড়ালে সমাজকে অতিক্রম করা হয়, আজ সে নির্ভয়ের আশ্রয়টুকু কপাল-দোষে খুইয়ে ব'সে মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে কি কথা বল্‌চে তা' শোন্‌বার লোক এ পৃথিবীতে নেই! সমাজ তার দু'কানে তুলো গুঁজে ব'সে আছে; এদিকে কঠিন প্রকৃতি তার দেহ-মন নিয়ে এমনি একটা খেলা জুড়ে বসেচে—যাকে ঠেকিয়ে রাখবার সাধ্য কোন মানুষের নেই!

বিধবা ঘর চায়, দোর চায়, স্বামী-পুত্র চায়! নিজের ইচ্ছাতে চাইবার তার সাহস নেই, তেমন চাওয়া পাপ তাও তাকে বার বার শেখান হয়েচে; কিন্তু তবু অন্তরের ভিতর থেকে এই চাওয়ার ধ্বনি তার সমস্ত মনকে ক্ষত বিক্ষত ক'রে শাণিত ছুরির মত উঠ্‌চে। বিধবা জানে যে পাপ পুণ্য মানুষের জবরদস্তি—তাই তাকে মন দিয়ে সে মানে না; যদি মানে ত' সে লোক-ভয়ে!

সমাজ পাশে দাঁড়িয়ে দু'চোখ রক্তবর্ণ করে শাসন কর্‌চে—সাবধান বিধবা, সাবধান, তোমার প্রবৃত্তিগুলোকে নিঃশেষে দমন ক'রে তুমি পাথর হয়ে যাও, যে মরেছে তাকে আমরা পুড়িয়ে অঙ্গার করেচি, সেই অঙ্গারে তুমি পুড়ে মরবে—এই আমাদের ব্যবস্থা!

হিন্দু-ঘরের পবিত্র বৈধব্যের ছবির নীচে এই যে মর্ম্মভেদী কাহিনীর করুণ ক্রন্দন নিত্য উঠচে—তার কথা ক'জন হৃদয়বান হিন্দু না জানেন?

বাংলার হৃদয়-কোরক ভেদ ক'রে যে বিশ্ববিশ্রুত বিদ্যা এবং দয়ার সাগর জন্ম লাভ করেছিলেন—তাঁর মূর্ত্তিখানি আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো।

দু'হাত তুলে প্রণাম করে দেখি আমার বুকের কাপড় ভিজে গেছে।

তাড়াতাড়ি বাহিরের ঘরে চলে এলুম।

পশ্চিমের ছোট ঘরখানিতে আমার সব ব্যবস্থা করা রয়েচে। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম, রূপনারাণের বিস্তৃত বুকের উপর ছোট ছোট নৌকা-গুলো ছুটে চলেছে—ওপারে বালুর হটে উতলা বাতাস ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে ছেঁড়া পাতা আর ধূলো-বালির স্তম্ভ তৈরী করে নেচে ফিরচে।

আমি পাড়াগাঁয়ের দূর সব ছেলে—এই শোর মধ্যেই মানুষ হয়েচি—তাই

মা'র কোলে ফিরে গিয়ে ছেলে যেমন একটা স্বস্তির আনন্দে তৃপ্ত হয়ে শান্ত হয়ে যায়—ঠিক তেমনি স্নিগ্ধতায় আমার মনটা যেন পূর্ণ হয়ে গেল!

সকাল বেলা নিজের পড়াশুনায় মন দিলাম।

বেলা নটা দশটার সময় হরিলাল ডাক দিয়ে আমার হাতে একখানা চিঠি দিলেন—সেখানা ইলার চিঠি। ইলা লিখচে:—

বাবার কাছে শুনলুম যে, কিরণ বাবু আপনার কাছে বড়দিনের ছুটী যাপন করতে গেছেন। আমি আর মা দিনকতকের জন্যে আপনার বিশ্রাম ভবনের অতিথি হব। তাই কাল দেড়টার গাড়ীতে রওনা হব। সংবাদটা আপনাকে দেওয়া দরকার তাই এই চিঠি। প্রণাম নেবেন। ইতি।

আপনাদের স্নেহের

ইলা।

বিকেলে আমরা রূপনারায়ণের তীরে গিয়ে সূর্য্যাস্ত দেখলাম। আগুনের গোলার মত রক্তবর্ণ সূর্য্য পাটে বসলেন। তার পরেই নদীর উপর মেটো মশারির মত একটা সূক্ষ্ম পর্দার আস্তরণ ঝুলতে লাগলো।

হরিলাল আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। তিনি বল্লেন,—এইটে মানুষের কাছে কোনদিনই পুরোণো হ'ল না। সূর্য্যাস্ত রোজই হয়, কিন্তু প্রত্যহই তাতে একটা কিছু অভিনবত্ব থাকেই থাকে।

ইলা বল্লে, কাকা, সব জিনিষেই ত তাই।

তিনি গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন, সে কথা সত্যি ইলা, মানুষ যেটা একান্ত পরিচিত, তাতে তত বেশী আকৃষ্ট হয় না; কিন্তু আমরা শহরে থাকি, এমন করে সূর্য্যাস্ত দেখার সুবিধা হয় না—তাই এটা আমাদের এত সুন্দর লাগে—অভিনিবেশের ফলে আমরা এর অভিনবত্বটা দেখতে পাই।

ইলা তাঁর দিকে ফিরে বল্লে, আপনি নিশ্চয়ই অন্য একটা কিছু ভাবচেন কাকা। আপনি গোড়ায় যে কথা বলেছিলেন তার খেই হারিয়ে গেছে। ব'লে সে খুব যেন আমোদ অনুভব করে হাসতে লাগলো।

হরিলাল ইলার মাথাটা দুই হাতের মধ্যে নিয়ে আদর করে বল্লেন, বুড়ো মানুষদের অমন সব ভুল হয়ে যায় মা, তাদের ক্ষমা করতে হয় বৈকি!

তা'হলে আপনি হার স্বীকার করচেন?

ক্ষতি কি?

বেশ,—বলে সে আমার দিকে ফিরে বল্লে, তোমার যেন মনে থাকে যে, একজন হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার আমার কাছে হার স্বীকার করলেন।

আমি কথা কইলুম না।

ইলা হরিলালের দিকে ফিরে বল্ল, কাকা, উনি আমাকে সে-দিন একথায় হারিয়ে দিয়েছিলেন—তাই আমি ওকে বলে রাখচি যে, আমি সব সময়ে হেরে যাই নে।

হরিলাল বল্লেন, হারিয়েচ ত আমাকে, ত ওর কি দোষ হলো?

উনি বলুন যে, উনি আপনার চেয়ে বুদ্ধিমান।

হরিলাল উচ্চ-হাস্য করিলেন।

আমি তোমার কাছে হেরেচি ত?

হু।

তুমি ওর কাছে হেরেচ?

হুঁ।

তবেই ত প্রমাণ হলো—উনি আমার চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধিমান আর তোমার চেয়েও বুদ্ধিমান।

বাঃ, ফাঁকি দিয়ে উনি জিতে যাবেন!—সে হচ্চে না—উনি আজকে আমাকে হারান,—দেখি কেমন!

আচ্ছা—আমি তোমাদের পরীক্ষা নিচ্চি—দেখি কে হারে।

ইলা বল্লে—বেশ ত।

হরিলাল বল্লেন, একদিন জনসন আর গোল্ডস্মিথে টেবিলে খেতে বসেছিলেন। গোল্ডস্মিথ জনসনকে এই প্রশ্ন করলেন, কটা চিংড়িমাছ উপর্য্যুপরি রাখলে পৃথিবী থেকে চাঁদ ঠেকে যায়? এই প্রশ্ন আমিও তোমাদের করচি—ইলা, প্রথমে তোমাকে উত্তর দিতে হবে, কেননা চ্যালেঞ্জ তোমার।

ইলা একটু ছট-ফট ক'রে বল্লে, বাঃ, এ মস্ত একটা অঙ্কের প্রশ্ন—কাগজ-পেনসিল চাই—মুখে মুখে কেমন ক'রে হবে?

হরিলাল হেসে বল্লেন, জনসন প্রায় ঐ রকমের একটা উত্তর দিয়েছিলেন।

ইলা উৎফুল্ল হ'য়ে বল্লে, তা ত আমি ঠিক বুঝতে পারচি—কাগজ পেনসিল না হ'লে কি করে হয়?

হরিলাল আমার দিকে ফিরে বল্লেন, কি হে? তোমার ক'দিতে কাগজ চাই বল ত?

আমি কিছু না ব'লে হাসতে লাগলুম।

উত্তর হয়ে গেছে?

হরিলাল বল্লেন, ওর মুখ দেখে বুঝতে পার না! এই রে—ইলাকে আবার বুঝি হারিয়ে দেয়!

ইলা দুই কানে হাত দিয়ে ছুটে বাড়ীর দিকে যেতে-যেতে বলে গেল—আমি ও কথা শুনতে চাই নে—শুনব না।

একটা কাঠের একদিকে নিজে ব'সে হরিলাল আমাকে ব'সতে বল্লেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি বল্লেন,—কিরণ, ইলাকে তোমার কেমন লাগে?

আমি প্রায় বলে ফেলেছিলুম—বেশ; কিন্তু আমার খাঁ ক'রে মনে হলো যে, ও-কথা এখেনে বল্‌তে নেই।

বল্লুম, আমার পরিচয় বড় অল্প।

তিনি বল্লেন, আমারও খুব বেশী নয়; তবে ওকে আমি বড় স্নেহ করি।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে কাটার পর তিনি বল্লেন, তুমি বোধ করি, মেয়ে মানুষের এমন একটা খোলা-মেলা ভাব ইতিপূর্ব্বে আর কখনো দেখ নি, এ তোমার কেমন লাগে?

বল্লাম, অভ্যস্ত নয় ব'লে আমার যেন ভয়-ভয় করে।

ঠিক বলেচ। আমাদের সংস্কার এর বিরুদ্ধে, এমন দেখ্‌লে—আমরা স্ত্রী-লোককে ব্যাপক মনে করে ভাল চোখে আর দেখি নে। তাই নয় কি?

তাই বোধ হয়।

তিনি বল্লেন, এক ধরণের গম্ভীর প্রকৃতির লোক আছেন, তাঁরা এই চাঞ্চল্য ছেলেদের মধ্যেও পছন্দ করেন না—এমন কি সহ্য পর্য্যন্ত করতে পারেন না। জানি নে, সে ধরণের লোক তুমি দেখেচ কিনা!

বল্লুম, দেখেচি, আমাদের কলেজের একজন প্রফেসার ঠিক অমনি।

বটে! সায়েব?

না, তিনি বাঙালী।

তাই আমি মনে ক'রেছিলুম। এ বিষয়ে আমাদের চেয়ে তারা ঢের বেশী উদার।

হরিলাল কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন:—

আমাদের দোষ হয় সেইখেনে—যখন ভুলে যাই যে, জীবনের গ'ড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে তার আদর্শটাও গ'ড়ে উঠ্‌তে থাকে;—যতই কেন মানুষ অগ্রসর হোক্, বাস্তব আর আদর্শের দূরত্বটা থেকেই যায়। অনেক দূরে তাকিয়ে দেখি যে,

পৃথিবী আর আকাশ মিলে গেছে ;—সেই অনেক দূর অতিক্রম ক'রে দেখি যে, আরো দূরে ঐ মিলন—তাই বল্‌তে হয় যে, মানুষ অনন্ত পথের যাত্রী। আদর্শের একটা মোহ আছেই—তার আকর্ষণ আমাদের চলার শক্তিকে উদ্বোধিত করে ; কিন্তু তার আতিশয্য—বাস্তবকে ভুলিয়ে দেয়—তখন আমরা বাস্তবের সত্যকে অস্বীকার ক'রে ভুল করি, গোলে পড়ি!

আমাদেরই সৎ হ'তে হবে, সুন্দর হ'তে হবে, আনন্দময় হ'তে হবে—এই তিনের মধ্যে আমাদের মানুষও হ'তে হবে। মনুষ্যত্বকে বর্জ্জন ক'রে এগুলো হ'তে যাওয়া কি বিড়ম্বনা নয়?

প্রতিমার আদর্শটি যে গড়্‌ছে, তার মনের মধ্যে আছে,—সেটি প্রতিফলিত হচ্ছে মাটির মূর্ত্তিতে—মাটি বাদ দিলে থাকে কি?—মাটি কালো ব'লে হাত উঁচু ক'রে বসলে প্রতিমা গড়া বন্ধ হয়ে যায়!

সমাজ বল্‌তে নিশ্চয়ই পুরুষের সমাজ নয় ; কিন্তু মানুষ তাই ক'রে বসেচে। নারীকে বাদ দিয়ে সমাজ গ'ড়ে তোলবার প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হয়েচে—তাতে আর সন্দেহ নেই ; এখন ভেঙ্গে প'ড়তে হবে। পাশ্চাত্য দেশের সেই শিক্ষা আমদের নিতে হবে।

আমি বল্লুম, পাশ্চাত্য দেশ যা' ক'রেচে, তা' ঠিক ক'রেচে—তাই বা কেমন ক'রে বুঝব?

. ঠিক কথা। তাই নিয়ে বহু তর্ক হতে পারে। তাই করতুম, যদি তর্ক করা আমাদের উদ্দেশ্য হতো, কিন্তু তা ত নয়! তর্ক ক'রে সত্যে ক্বচিৎ উপনীত হওয়া যায় ;—বেশীর ভাগ সময়ে তর্কই সার হয়ে যায়। কিন্তু যেটা খাঁটি সত্য সেটাকে ধ'রে ফেলার একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা আমাদের মনের আছে। কতগুলো সত্য স্বতঃসিদ্ধ, তার প্রমাণের দরকার হয় না—তাকে পেলেই আমরা স্বীকার ক'রে নিই।

বুঝেছ? দৃষ্টান্তস্বরূপ ধর—এই সমাজের কথা, তার দুটো অপরিত্যাজ্য উপকরণ—স্ত্রী এবং পুরুষ—যেমন জল হ'তে হ'লে হাইড্রোজেন আর অক্‌সিজেন চাই, তেমনি সমাজ গ'ড়ে তুল্‌তে হ'লে নারী এবং পুরুষ চাই-ই চাই। এ বিষয়ে কারুর দ্বিমত হয় না ; যদি কেউ তাতেও তর্ক করে ত' আমরা তার কথা আর গ্রাহ্য করি না!

নীরবে হেসে আমি সম্মতি জানালুম।

তিনি আবার আরম্ভ করলেন,—আমি নিজেদের সমাজের অনেকখানি জানি,

ওদের সমাজের কতকটা জানার সুবিধা আমার জীবনে হয়েচে—তা থেকে এই বুঝেচি যে, যতদিন পর্য্যন্ত সমাজের মধ্যে স্ত্রী জাতির সত্য প্রতিষ্ঠা না হচ্ছে ততদিন কোন সমাজেরই কল্যাণ নেই। অনেককে বলতে শুনেছি যে, আমাদের সমাজে স্ত্রীজাতির দাসীত্ব ছাড়া আর কোন প্রতিষ্ঠা নেই আর ওদের সমাজে স্ত্রীলোকদের হাতে বহু কর্ত্তৃত্বের ভার আছে; কিন্তু এ কথা সত্য নয়। আমার মনে হয়, সত্যকার প্রতিষ্ঠা কোন সমাজেই নেই। ওদের যা আছে, তা' ভারি উপরের জিনিষ, আমাদের যা আছে—তা' বড় পল্‌কা—পুরুষ ইচ্ছা করলে তাকে একটুতেই না ক'রে দিতে পারে। দুই সমাজেই পুরুষ আপনার স্বার্থ এবং ক্ষমতাকে অব্যাহত রাখ্‌বার ব্যবস্থাই করেছে।

বল্লুম, সেটা কি খুব স্বাভাবিক নয়!

স্বাভাবিক হ'তে পারে; কিন্তু ন্যায়সঙ্গত নয়। মানুষ স্বভাবতই স্বার্থপর; কিন্তু যাঁরা জগতের কল্যাণের জন্য কোন ব্যবস্থা করবার আসনে বসেন, তাঁদের কি এ সব ক্ষুদ্রতার বহু উর্দ্ধে থাকা উচিত নয়? তাঁরা যদি ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার কথা চিন্তা করেন, যদি অন্যের কথা বিস্মৃত হন ত' কেমন ক'রে একটা সর্ব্ববাদীসম্মত নিয়ম প্রবর্ত্তিত হতে পারে?

বল্লুম, কিন্তু এ বিষয়ে সকলের একমত হওয়া ত' প্রয়োজন? নইলে যেমন চলে যাচ্চে, তেমনিই ত চল্‌বে।

তিনি হাস্‌লেন,—যেটা চলে যাচ্চে সেটা কি মানুষের ইচ্ছাতে চল্‌বে না? মানুষের মন প্রথমে একটা জিনিষ বোঝে। এই বোঝাটাকে বড় কথায় জ্ঞান বলে। এই জানাটা, বোধটা, মানুষের মনে ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ ইত্যাদি নানা অনুভূতির সঙ্গে জড়িত হয়ে মানুষকে কর্ম্মের পথে প্রবর্ত্তিত করতে থাকে।

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ এখন এই জানে যে, স্ত্রীজাতির উপর কর্ত্তৃত্বের ভার দিলে সমাজের ক্ষতি হবে; তাই সব ব্যবস্থাই এই জানার অনুবর্ত্তী হয়েচে। আবার যদি এমন একদিন আসে, যে দিন সর্ব্বসাধারণে বিশ্বাস করে, স্ত্রীজাতির উপর কর্ত্তৃত্বের ভার না থাকলে সমাজের সমূহ ক্ষতি হয়—তখন আবার সকল ব্যবস্থা ফিরে যাবে।

এই বিশ্বাস কি ফিরে যেতে পারে? আমি বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করলুম।

তা ত যাচ্চেই, নিত্য নিয়ত যাচ্চে। ভারতবর্ষে মুসলমান এবং ক্রীশ্চান ধর্ম্মের আগমনে, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে দেশের প্রকৃত উপকার হয়েচে; ইংরিজি শিক্ষা অনেক সংস্কার দূর ক'রেচে—এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

কিন্তু অনেকে ত' উল্টোই বলেন ?

উত্তরে হরিলাল বল্লেন, তাঁরাও একদিক দিয়ে কতকটা সত্যই বলেন। এই জগতের কিছুই ত' পূর্ণাঙ্গ নয়, সম্পূর্ণতা ইহসংসারের নয়, তাছাড়া মানুষ বিভিন্ন আদর্শের জন্য, সংকীর্ণ দৃষ্টির জন্য, সকল জিনিষে এক মত হতে পারে না।

সেদিন একটা বড় মজার ঘটনা হয়েছিল, বলি শোন :—

ভাটপাড়ায় এক তর্করত্ন পণ্ডিত মশায় বল্‌ছিলেন যে, দেশের সর্ব্বনাশ হলো ইংরিজি শিক্ষার জন্য—মানুষ আর মা-বাপকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে না, ধর্ম্মে আস্থা নেই।

একজন লোক বল্লেন, পণ্ডিত মশায়, যা বল্‌চেন, তাই না হয় ঠিক হলো ;—আমার পাঁচ ছেলে, ইংরিজি ইস্কুলে না দিয়ে করি কি বলুন ?— সে টোলও নেই আর সংস্কৃত পণ্ডিতের কদরও নেই আর তাতেও চাকৃরি মেলাও শক্ত।

পণ্ডিত মশায় বল্লেন, সব দোষ দেশের লোকের, হতভাগা না হ'লে কি ভাগ্যলক্ষ্মী ছাড়ে ?

একজন ঠোঁটের মধ্যে হাসি চেপে বল্লেন, আপনার বড় ছেলেটি কি করচেন ?

তর্করত্ন মাথা চুল্‌কোতে লাগলেন :—হুঁ বেটা একেবারে গোল্লায় গেছে—বলে কিনা উকিল হবে !—এবার আইনের শেষ পরীক্ষা দেবে।

তখন সকলে হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লো।

হরিলাল বল্লেন, এসব লোকের মতামতে কি কোন মূল্য আছে ?

কিন্তু এই ধরণের লোক খুব বেশী নেই।

তা ত বটেই ! ঐ পণ্ডিত মশায়টির বড় ছেলের মতই ত অন্ধ হয়ে গেছে। ওরা সেই কথা-মালার শেয়ালের আঙুর টক বলার দলে! কিন্তু ইংরিজি শিক্ষার দোষ আছে এ কথা আমি স্বীকার করি।

এরা বণিক জাতি, এদের মূল আদর্শ বৈশ্য-আদর্শ। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণের আদর্শ ছিল সেটা যে বৈশ্য-আদর্শের চেয়ে একটা খুব বড় এবং উঁচু জিনিষ ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইংরেজের প্রভাবে আজ যদি সেটা আমাদের দেশ থেকে সরে যায় ত' স্বীকার করতেই হবে যে, দেশের সমূহ ক্ষতি হলো।

ব্রাহ্মণ-আদর্শ যাকে বল্‌চেন, তাতেও কি দেশের ক্ষতি হয় নি ?

হয়েচে বই কি ! খাঁটি গরুর দুধ খুব ভাল খাদ্য—তোমরা ডাক্তার এ ত

স্বীকার করবেই ; কিন্তু এ-কথা কি তোমরা বলবে না যে, অতিরিক্ত খাঁটি দুধ খেলে পেটের অসুখ হয়। পেটের অসুখের জন্য কিছুতেই চিরন্তন ব্যবস্থা হতে পারে না যে, দেশ থেকে খাঁটি দুধ দূর ক'রে দেওয়া !

হরিদাস হাসতে লাগলেন।—

ব্রাহ্মণ-আদর্শ, ত্যাগ, লোক-সেবা, লোক-শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। সভ্য সমাজের এগুলো যেন মেরুদণ্ড। এই ত্যাগের আদর্শ দেশের মধ্যে ক'মে গেছে।

আমি অবাক দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।

বুঝতে পারছ না ? এই ধরে নেও, একজন লোক আমার বাড়ীতে এক মুঠো খাবার জন্যে এসেছে—আমি বল্লুম, দেখ, তোমাদের জন্যই দেশের এই অবস্থা হয়েচে। তোমাদের হাত-পা সব আছে কিন্তু তোমরা পরিশ্রম করতে কাতর—আমি এই রকম কুড়ে লোকদের পেট ভরাতে রাজী নই।

একদিন ছিল যখন মানুষ সত্যিকার বিপদে না পড়লে কিছুতেই লোকের দ্বারস্থ হত না—তাই গৃহস্থও অতিথিকে নারায়ণ ব'লে সেবা করত। এই সবই তখন মানুষের ঐশ্বর্য্যের বিলাসিতা ছিল, এতেই মানুষ তৃপ্তিলাভ ক'রতো। কিন্তু আমরা এখন অতিরিক্ত হিসেবী হয়েচি—সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনটা ছোট হয়ে গেছে। নিজের জন্য দিনে কেবল সিগারেট আর চায়েতে হয় ত একটাকা দেড় টাকা ব্যয় করতে কাতর হই নে, কিন্তু অন্যকে চার গণ্ডা ছ গণ্ডা দিতে হলে চক্ষু রক্ত বর্ণ করি। অল্পদিনের মধ্যে এই দানশীলতার আদর্শের কি রকম পার্থক্য হয়েচে বুঝে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয় !

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই দাতা ছিলেন—তাঁর দান আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ত—যেমন ক'রে মেঘের জল বৃষ্টি হয়ে ক্ষেতের উপর ছড়িয়ে পড়ে ! বৃষ্টির ছোট বিন্দুটি দীনতম তৃণটিকেও অবহেলা করে চলে না !

এই ছিল এক দান !—বিদ্যাসাগর কোন হিসেবের মধ্যে দিয়ে চলতেন না—তাই কোনদিন বড় লোক হন নি—দেশের দরিদ্রকে বাঁচাতেই তাঁর টাকা ফুরিয়ে গেল !

কিন্তু আজকাল আর এক দানের পদ্ধতি দেশের মধ্যে এসে পড়েচে। কৃপণের শোণিতবিন্দুর চেয়ে প্রিয়তর অর্থ, হিসেবের গণ্ডীর মধ্যে জমে সমুদ্র প্রমাণ হয়ে উঠলো ! তাতে কত ব্রাহ্মণের ভিটেমাটি লয় পেয়েচে—কত বিধবার কাণা-কড়িটি পর্য্যন্ত তলিয়ে গেছে। চিরকৃপণ একদিনে দানবীরের উপাধি অর্জ্জন

ক'রে নিলেন ! বিদ্যাসাগর মরলে দেশের দরিদ্র বিধবা কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিল কিন্তু এঁরা মরলে খবরের কাগজে—মাছ মরেছে বিড়াল কাঁদে !

কিছুক্ষণ ভেবে তিনি বল্লেন, আমাদের শুভঙ্করীতে কড়া-ক্রান্তির হিসাব আছে, কিন্তু এই হিসাবটা আমাদের বণিক-প্রভুদের সঙ্গে এদেশে পদার্পণ করেচে !—আমাদের চিত্তের প্রসারতা কমে যাচ্চে—এইটে যে মারাত্মক ব্যাধি !

প্রদোষের অন্ধকার ঘন নিস্তব্ধ আকাশে আমার কানে যেন বার বার ধ্বনিত হ'তে লাগ্‌লো সেই শেষ কথা—আমাদের চিত্তের প্রসারতা কমে যাচ্চে—ঐটে যে মারাত্মক ব্যাধি ! —ক্রমশ





রম্যাঁ রলাঁ

[অনুবাদক— শ্রীকালিদাস নাগ ও শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

একদিন জামা-কাপড়ের আলমারি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ক্রিস্তফ্ কয়েকটি অদ্ভুত আকারের জিনিষ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। ইহা পূর্ব্বে সে কোনদিন দেখে নাই। সে গুলি দেখিতে ঠিক্ ছোট ছেলে-মেয়ের ফ্রক্ ও বনেট্-এর মত! সে মহা আনন্দে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া লুইসার কাছে আসিয়া বলিল— মাগো, দেখ কত কি সব পেয়েছি!—

লুইসা কিন্তু সেগুলি দেখিয়া হাসিল না। বিমর্ষ এবং বিরক্তিপূর্ণ মুখে ক্রিস্তফ্কে বলিল—যা দস্যি ছেলে, ওসব যেখান থেকে এনেছিস্ ফের্ সেখানে রেখে আয়।

ক্রিস্তফ্ কিছু বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিল—কেন মা?—

লুইসা তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া তাহার হাত হইতে ঐ সমস্ত কাড়িয়া লইয়া সেগুলিকে এমন জায়গায় রাখিয়া আসিল যেখান হইতে ক্রিস্তফ্ আর কোন দিন না সেগুলিকে টানিয়া বাহির করিতে পারে।

কিন্তু ক্রিস্তফ্-এর মনে শান্তি নাই। এই ব্যাপারটি তাহার নিকট অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ বলিয়া মনে হইতে লাগিল, অবশেষে সে লুইসাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া অস্থির করিয়া তুলিল। লুইসা শেষে বলিতে বাধ্য হইল যে, ক্রিস্তফ্-এর জন্মের পূর্ব্বে তাহার একটি সন্তান হইয়া মারা গিয়াছে।

ক্রিস্তফ্ স্তম্ভিত হইয়া গেল।—কেহ কোন দিন তাহার সেই ছোট দাদাটির কথা ত তাহাকে বলে নাই! কিছুক্ষণ সে এই চিন্তার মধ্যে ডুবিয়া

রহিল, তাহার পর সব কথা ভাল করিয়া জানিবার জন্য লুইসাকে আবার প্রশ্ন করিতে লাগিল।

লুইসা বলিল—তার নামও ক্রীস্তফ্ ছিল, কিন্তু সে তোর মত দুষ্টু হ'ত না।

ক্রিস্তফ্ আরও জানিতে চায় কিন্তু লুইসা আর বিশেষ কিছু বলিল না, শুধু তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বলিল—সে এখন স্বর্গে আমাদের সকলের জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে।

ইহা ছাড়া ক্রিস্তফ আর কিছুই জানিতে পারিল না। লুইসা বিরক্ত হইয়া বলে, অত বক্‌তে হবে না, চুপ করে ব'সে থাক্, আমায় কাজ করতে দে।

লুইসা গভীর মনযোগের সহিত সেলাই করিয়া যাইতে লাগিল কিন্তু তাহার মুখে গভীর দুঃখের চিন্তার রেখা যেন ফুটিয়া ছিল, সে আর একবারও মুখ তুলিয়া ক্রিস্তফ-এর দিকে চাহিল না।

ক্রিস্তফ্ অভিমান করিয়া ঘরের এককোণে আশ্রয় নিল; লুইসা মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—ওখানে ব'সে ব'সে কি করছিস্ ক্রিস্তফ্? যা না বাইরে একটু খেলা কর্ গিয়ে।

লুইসার সহিত ঐ কয়েকটি কথা হইতেই ক্রিস্তফ্-এর মনে নানা চিন্তার উদয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে।—আমার আগে আর একজন এসেছিল! সেও আমারই মত মা'র ছেলে। তার নামও ছিল ক্রিস্তফ্—আমারই নাম। হয় ত ঠিক আমারই মত তাকেও দেখতে ছিল! কিন্তু সে মারা গেছে! . . . সে বেঁচে নেই।—

এত দূর ভাবিয়াও ব্যাপারটি যে কি তাহা যেন সে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছিল না। শুধু এই সম্বন্ধে এক দারুণ বিস্ময় তাহার মনে জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল।—সে যেন ভয়ানক একটা কিছু ঘটনা!

সর্ব্বাপেক্ষা তাহার আশ্চর্য্য লাগিতেছিল এই কথাটি মনে করিয়া যে, কেহ তাহার কথা ভাবে না, সকলেই তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে।...

ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাহার চিন্তার ধারা ভিন্ন পথ অবলম্বন করে—আজ যদি তার মত আমিও মারা যাই, তা হলে তারই মত সকলে আমাকে ভুলে যাবে?...

এই চিন্তা সমস্ত সন্ধ্যাটি তাহার মনকে ঘিরিয়া রাখিল। রাত্রে আহারের সময় সকলকে কতরূপে কথা বলিতে এবং হাসি তামাসা করিতে দেখিয়া

সে ভাবিল—নিশ্চয়ই তাই হবে। আমি মারা গেলে এমনি সহজ আনন্দের ভিতর দিয়েই এরা দিন কাটাবে। আমার কথা এরা মনে রাখবে না!...

কিন্তু কিছুতেই সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না যে, তাহার মৃত্যুর পর তাহার মা ছোট ছেলেটকে ভুলিয়া আর সকলের মত আত্ম-সর্ব্বস্ব হইয়া হাসিয়া দিন কাটাইবে।

সকলের প্রতি ঘৃণায় তাহার মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল। আপনার মৃত্যুর পূর্ব্বেই, শুধু মৃত্যুর কথা ভাবিয়া, তাহার নিজের প্রতি সমবেদনা উছলিয়া উঠিতে ছিল, তাহার কান্না পাইতেছিল এবং এই সঙ্গেই সকলকে বহু প্রশ্ন করিবার বাসনাও তাহার মনে উঠিতে ছিল। কিন্তু তাহার সাহস হইল না। লুইসা যে সুরে তাহাকে চুপ করিতে বলিয়া ছিল, তাহা তাহার মনে ছিল। কিন্তু একদিন সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সেদিন রাত্রে সে বিছানায় শুইয়া আছে, লুইসা গৃহের কাজ সারিয়া তাহার কাছে আসিয়াছে তাহাকে চুম্বন করিয়াছে, ক্রিস্তফ্ প্রশ্ন করিল—আচ্ছা মা, সে কি আমার এই বিছানাতেই শু'ত?

লুইসা অন্তরে বাহিরে কাঁপিয়া উঠিল। তবু ক্রিস্তফ-এর কথায় বিশেষ মনোযোগ দিবার ভাণ্ না করিয়া সহজ সুরে কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—কে? কার কথা বল্‌ছিস?

ক্রিস্তফ্ মা'র খুব কাছে সরিয়া আসিয়া চুপি চুপি বলিল—যে মারা গেছে—

ক্রিস্তফ্‌কে বুকে চাপিয়া লুইসা গুমরিয়া উঠিল, চুপ্ কর্ চুপ্ কর্ হতভাগা ছেলে—'

তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল।

ক্রিস্তফ্-এর মাথাটি লুইসার বুকের উপর পড়িয়া ছিল, সে তাহার বক্ষের দ্রুত স্পন্দন শুনিতে পাইতেছিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া লুইসা বলিল, ও-কথা আর কোন দিন মুখে আনিস নি বাবা. . . নে, ঘুমিয়ে পড়্ . . . না, তাকে এ বিছানায় শুতে হয় নি।

লুইসা পুনরায় তাহাকে চুম্বন করিল। ক্রিস্তফ্-এর মনে হইল যেন তাহার মা'র মুখখানি চোখের জলে ভিজিয়া উঠিয়াছে, তাহার গালেও যেন চোখের জল পড়িল! কিন্তু সে ইহা সত্য কি না তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তবু সে অনেকখানি শান্তি পাইল। মা'র মনে সন্তানের জন্য দুঃখ তা হ'লে আছে!

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত যাইতে না যাইতেই তাহার মন আবার সন্দেহের দোলায় দুলিতে লাগিল। পাশের ঘরে লুইসা তখন অন্য সকলের সহিত সহজভাবে কথা বলিতেছে। এই কথার সুর ক্রিস্তফ্-এর নিকট ভাল লাগিল না। সে ভাবিতে লাগিল—তার মা'র কোন্ ভাবটি ঠিক? যখন আমার সঙ্গে কথা বল্‌ছিল সেইটা, না এখনকারটা?

বিছানায় পড়িয়া সে শুধু ছট্‌ফট্ করে, তাহার প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। সে চায় তাহার মাও তাহার মতই অশেষ মানসিক যন্ত্রনায় অভিভূত হইয়া থাক্। মা কষ্ট পাইবে ইহা ভাবিয়া সে যে কষ্ট পায় না তাহা নয়, কিন্তু তার সঙ্গে মা'র কষ্ট পাওয়াটা যেন দরকার! তাহা হইলে সে যেন অনেকখানি শান্তি পাইবে, তাহা হইলে নিজেকে আর এমন একা মনে হইবে না. . .

ভাবিতে ভাবিতে ক্রিস্তফ্ ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু পরের দিন এ বিষয়ে সে আর কিছুই ভাবিল না।

দিন যায়। ক্রিস্তফ্ যে সমস্ত বালকদিগের সহিত পথে খেলা করিত তাহাদের মধ্যে একজন একদিন আসিল না! একজন বলিল,—তার অসুখ করেছে। তাহার পর তাহারা প্রতিদিনের মত খেলায় মাতিয়া উঠিল এবং তাহাদের বন্ধুর অনুপস্থিতি ক্রমেই সকলের কাছে সহিয়া আসিল। সকলেই ইহাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়া ধরিয়া লইল।

সেদিন সন্ধ্যা বেলায়ই ক্রিস্তফ্ তাহার সেই অন্ধকার কুঠুরির ছোট বিছানাটিতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। সেখান হইতে সামনের ঘরের আলোর দিকে সে একদৃষ্টে তাকাইয়াছিল, এমন সময় কে যেন বাহিরের দরজায় ধাক্কা দিল! অল্পক্ষণ পরেই ক্রিস্তফ্ বুঝিতে পারিল,কোন প্রতিবেশী গল্প-গুজব করিতে আসিয়াছে। সে আপনার সহস্র কল্পনার মধ্যে তাহাদিগের বাক্যালাপ অন্য-মনস্কভাবে শুনিতে লাগিল। অনেক সময় মৃদু গুঞ্জন ছাড়া তাহাদের কথার কিছুই সে শুনিতে পাইতেছিল না। সহসা বিকৃত কণ্ঠের একটু সুর তাহার মর্মে আসিয়া বিঁধিয়া গেল। আহা সে বেচারী মারা গেছে—

ক্রিস্তফ্-এর শরীরের রক্ত-চলাচল যেন বন্ধ হইয়া আসিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল, কাহার কথা হইতেছে। সে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া সমস্ত মন দিয়া শুনিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন সময় মেল্‌শিয়োর গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিয়া বলিল—ক্রিস্তফ্, শুনছিস, বেচারী ফ্রিট্‌জ মারা গেছে—

ক্রিস্তফ্ বহুকষ্টে সংযত হইয়া শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, হাঁ বাবা।

কথাটুকু বলিবার সময় কে যেন তাহার বুকটা যাঁতার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়াছিল।

মেল্‌শিয়োর রাগিয়া মুখ বিকৃত করিয়া বলিল,—হাঁ বাবা!—এ ছাড়া তোর আর কোন কথা বল্‌বার নেই?—

লুইসা ক্রিস্‌তফ-এর কণ্ঠস্বর হইতে তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল। সে বলিল,—আহা ও ঘুমাচ্ছে, ঘুমাতে দাও না গো—

তাহার পর সকলে মিলিয়া আবার আপনাদের মধ্যে কথা বলাবলি আরম্ভ করিল। ক্রিস্‌তফ্ কান খাড়া করিয়া তাহাদের কথা শুনিয়া লইতে লাগিল। টাইফয়েড জ্বর। বাবা! সে কি তার ছটফটানি! জ্বর আর নাম্‌তেই চায় না, শেষে ডাক্তাররা তাকে ঠাণ্ডা জলে চোবাতে লাগল... সঙ্গে সঙ্গেই ভুল বকা—আর তার বাপ-মায়ের কি কান্না... সে দেখলে বুক ফেটে যায়...'

ক্রিস্‌তফ-এর নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। তাহার গলার মধ্যে যেন কি সব গুটি পাকাইয়া উঠিয়া তাহার শ্বাসরোধ করিয়া দিতেছিল। তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিতেছিল। মৃত্যু সম্বন্ধে ঐ সমস্ত বর্ণনা তাহার মনে ছবির মত স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। তাহার মনে পড়িল সে শুনিয়াছে যে, ঐ রোগ অত্যন্ত ছোঁয়াচে। হয় ত সেও ঐ রোগে মারা যাইবে... ভয়ে তাহার বুক শুকাইয়া উঠিল। সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল, শেষ যে দিন ফ্রিট্‌জ-এর সহিত তাহার দেখা হয় সেদিন সে বহুক্ষণ তাহার হাত ধরিয়াছিল, এমন কি তাহার মৃত্যুর দিনও সে তাহাদের বাড়ীর পাশ দিয়া বেড়াইয়া আসিয়াছে। ভয়ে আধমরা হইয়া উঠিলেও সে কোন শব্দ করিল না, পাছে আবার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। তাহার পর প্রতিবেশী চলিয়া গেলে মেল্‌শিয়োর পুনরায় যখন তাহাকে ডাকিয়া বলিল, ক্রিস্‌তফ ঘুমালি নাকি?—

সে কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ পরে শুনিতে পাইল মেলশিয়োর লুইসাকে বলিতেছে,—এই ছেলেটার মনে একটুও দরদ নেই, একেবারে পাষাণ!

লুইসা কোন উত্তর দিল না, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে ক্রিসতফ-এর ঘরে আসিয়া মশারি তুলিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল। ক্রিস্তফ চোখ বন্ধ করিয়া ঘুমের ভাণ্ করিয়া পড়িয়া রহিল। লুইসা আবার পা টিপিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু সমস্ত সময় ক্রিস্তফ-এর মনে হইতেছিল, মাকে সে ধরিয়া রাখে, তাহার যে ভয় করিতেছে সে কথা তাহাকে বলে! এই আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে

বাঁচিবার জন্য তাহার কোলে সে আশ্রয় লয়—অন্তত মা'র মুখে সান্ত্বনা এবং আশ্বাসের কথা শুনিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এখানেও সেই দুর্জ্জয় আত্মাভিমান! তাহার মনে হইল তাহার কাল্পনিক ভয়ের কথা শুনিয়া সকলে হাসিবে। তাহাকে ভীরু কাপুরুষ ভাবিবে। তাহার আরও মনে হইল, মানুষের কোন সান্ত্বনার কথাই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যায়, ক্রিস্তফ্ বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ভাবে, যেন টাইফয়েড রোগের কীটাণু তাহার শরীরের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে—মাথার মধ্যে যেন কি এক তীব্র বেদনা সে অনুভব করিতে লাগিল, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছে! . . . আতঙ্কে শিহরিয়া সে ভাবে, এই বুঝি শেষ . . . আমি পীড়িত, আমার মরতে হবে!—আমি ম'রে যাব।

সে ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া ভীত কণ্ঠে ডাকিল, মা—

সকলেই তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন, ক্রিস্তফ-এর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর তাহারা শুনিতে পাইল না। সেও আর তাহাদিগকে জাগাইতে সাহস পাইল না।

এই দিন হইতে তাহার শিশু-জীবনে মৃত্যুভয় আসিয়া আশ্রয় লইল। তাহার শৈশবের সমস্ত আনন্দকে বিষাক্ত করিয়া দিল। সমস্ত সময়েই সে যেন ঐ সমস্ত ভিত্তিহীন কাল্পনিক রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াই থাকিত! অবসাদ তাহার মন হইতে কিছুতেই দূর হইত না। এই অবসাদের মধ্যেই আবার সে সহসা এত উত্তেজিত হইয়া উঠিত যে, তাহাতে তাহার শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিত। সমস্ত সময় তাহার মনে ভীষণ সংশয়ের ঝড় বহিত। সে ভাবিত, যত প্রকারের ব্যাধি আছে, সে সমস্ত একজোট হইয়া তাহার শরীরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে—তাহাকে শেষ না করিয়া তাহারা নড়িবে না। কত সময় সে তাহার মাতার অতি নিকটে বসিয়াও এমনি গভীর দুশ্চিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে, লুইসা তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই। কারণ, সে ভীত হইলেও তাহার ভয়কে অন্যের কাছে ব্যক্ত করিতে অত্যন্ত লজ্জা বোধ করিত। সে কাহারও সাহায্য লইতে চায় না, সে যে ভীত তাহা শুধু অন্যের নিকট নয়, আপনার কাছে স্বীকার করিতেও সে কুণ্ঠিত এবং তাহার কাল্পনিক ভয় বা দুঃখ বেদনা দিয়া মা'র মনকে ভারাক্রান্ত না করিবার মত সৎ বিবেচনাও তাহার মনে ছিল। কিন্তু তাহার চিন্তার ধারা সমান বহিয়া চলিল।—এইবার—এইবার আমি নিশ্চয়ই সাংঘাতিক ভাবে পীড়িত হইয়াছি—এটা নিশ্চয়ই ডিপথিরিয়া। . . .

এই ডিপথিরিয়া শব্দটি কোন প্রকারে কোন সময়ে সে হয় ত শুনিয়াছিল

এবং সেই অবধি ডিপথিরিয়া তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। বালিশের মধ্যে মুখ লুকাইয়া চাপাকণ্ঠে সে বলে, এইবারটি আমায় ক্ষমা কর ভগবান—আমায় বাঁচ্‌তে দাও।

এই অল্পবয়সেই তাহার মনে ধর্ম্ম ভাবও প্রবেশ করিয়াছে। লুইসা তাহাকে যখন বলিত যে, মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা ভগবানের নিকট গিয়া উপস্থিত হয় এবং সে যদি যথার্থ পুণ্যাত্মা হয় তাহা হইলে চিরকাল স্বর্গভোগ করিতে পায় ইত্যাদি, ক্রিস্‌তফ্‌ সে সমস্ত বিশ্বাস করিত।

কিন্তু স্বর্গ তাহার নিকট লোভনীয় হইলেও 'স্বর্গ-যাত্রার' কথা ভাবিয়া সে বিশেষ ভীত হইয়া উঠিত। সে তাহার মা'র মুখে শুনিয়াছে, কত শিশুকে ঘুমন্ত অবস্থায় ভগবান তাঁহার নিকট ডাকিয়া লইয়াছেন এবং তাহারা একেবারে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করে নাই। তবু ঐ সমস্ত শিশুদিগকে হিংসা করিবার কোন কারণ সে খুঁজিয়া পাইত না এবং প্রতিরাত্রে শুইতে যাইবার সময় তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিত।—ভাবিত, যদি এই খেয়ালী ভগবানটি হঠাৎ তাহাকে স্মরণ করিয়া বসেন ... এমন সুখের শয্যা এবং পরিচিত যাহা কিছু সব ছাড়িয়া অসীম শূন্যতা এবং অন্ধকারের ভিতর দিয়া তাহাকে যদি ভগবানের নিকট যাইতে হয়—সে কি ভয়ানক!

ক্রিস্‌তফ্‌ ভাবে, ভগবান সূর্য্যের মত উত্তাপশালী, বজ্রের মত তাঁহার কণ্ঠস্বর! তাঁহার সামনে গিয়া দাঁড়াইলে তাহার চোখ ঝলসিয়া যাইবে, কানে শুনিতে পাইবে না, সর্ব্ব শরীর, তাহার আত্মাও পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। তাহার পর ঈশ্বর শাস্তিও দেন ... এ শাস্তির কথা কেহ জানে না।

এই সমস্ত চিন্তার সহিত ক্রিস্‌তফ্‌ তাহার শোনা নানা ভয়ের কথাও মিশাইয়া আপনার মনেই ভীত হইয়া উঠিতে থাকে।—একটা কাঠের বাক্সে মরা মানুষটাকে বন্ধ ক'রে তাকে মাটির নীচে পুঁতে রাখা হয় ...

তাহার পর তাহার মনে পড়ে, এই সিমেট্রি বা শ্মশানে তাহাকে প্রার্থনা করিতে আসিতে হয়।—বাগো কি বিশ্রী, কি জঘন্য এই সমস্ত ব্যাপার ...

ক্রিস্‌তফ্‌ মরিতে ভয় পায় কিন্তু বাঁচিয়া থাকারও বিশেষ প্রলোভন বা সার্থকতা সে দেখিতে পায় না! প্রতিদিন তাহাকে দেখিতে হয়, মাতাল অবস্থায় তাহার পিতা গৃহে ফিরিতেছে—তাহার হাতে মার খাওয়া বা অন্য কোন ভাবে লাঞ্ছিত হওয়া, ক্ষুধার তাড়না, সঙ্গীদিগের মন্দ ব্যবহার এবং বয়স্কদের নিকট হইতে লজ্জাজনক সহানুভূতি, ইহাই তাহার প্রাপ্য ...

কেহ তাহাকে বুঝে না, এমন কি তাহার মাও নহে!

সে ভাবে, কেউ আমাকে ভালবাসে না সবাই শুধু লজ্জাই দেয়, অপমান করে।—আমি একা অসহায়... কিন্তু তা'তে কার কি ক্ষতি?—

কিন্তু এই অসহায় ভাবটিই আবার তাহাকে বাঁচিবার জন্য উৎসাহ দেয়! আপনার মধ্যে দুর্জ্জয় এক ক্রোধের সাড়া সে অনুভব করে। তাহার মনে হয়, যেন আশ্চর্য্য বিপুল এক শক্তি তাহার সর্ব্ব শরীরে জাগিয়া উঠিতেছে। যদিও এই শক্তি এখনো কিছুই করিতে পারে না, এই শক্তিকে যেন বাঁধিয়া পঙ্গু করিয়া রাখা হইয়াছে, তবুও সে একদিন সমস্ত বন্ধন মুক্ত করিয়া পূর্ণ তেজে জাগিয়া উঠিবেই... তখন!

—ক্রমশ



ডাকঘর

তোমাদের সকলের সব কথার উত্তর এবার আর দেব না। মন একটা মহা-শান্তিতে ভরপুর হ'য়ে আছে। মনের দিগন্তে আজ কোনও উচ্ছ্বাস নেই, চিন্তার অতল তলে গভীর স্তব্ধতা।

মৃত্যু অচেতন জীবনকে জাগ্রত করে, অসম্ভবকে সম্ভব করে। বারে বারে এই মৃত্যু এই পৃথিবীর জীবনস্রোতে নিরবচ্ছিন্ন আকুলতা রক্ষা করছে। তার মধ্যে আমরা সবাই, যাদের মনে শান্তি ও আনন্দ আছে তারাও আছি, যাদের মন অশান্ত, জীবন আশাহীন তারাও আছে। মৃত্যু এই জীবন হ'তে জীবনকে একের সঙ্গে আর এককে সূক্ষ্ম সূত্রের মত গেঁথে যাচ্ছে। তাই মানুষের ভাবের বোঝা মানুষ মাথায় তুলে নেয়, মানুষের অসম্পূর্ণ কাজ মানুষ হাতে ক'রে নেয়, এক মানুষের জীবনের বিজয়-শ্রী অন্য মানুষের শোকতাপের ক্লান্ত মুহূর্ত্তকে নূতন উৎসাহে পরিপূর্ণ ক'রে তোলে।

জীবনে কি দেখ নি, কত মানুষের ভাষা আমাদের মুগ্ধ করল, কত মানুষের আশা আমাদের আশা দিল? যে মরণকে শোক ও দুঃখের ভিতর আমরা স্বীকার করছি, সে মরণ কোটি কোটি ভারতবাসীকে জাগ্রত করল, অবসাদ হ'তে মোহ হ'তে মুক্ত করল। তাঁর আশা, তাঁর ভরসা শতকোটি মানুষের মনে বাসা নিল, তাঁর পরিত্যক্ত কাজ সহস্রের কর্ম্মজীবনকে পরিচালিত করল, তাঁর ত্যাগ মোহাচ্ছন্নকে আকুল করল, তাঁর মমতার কাহিনী অসংখ্য নির্ম্মমকে আঘাত করল, এই একটি মৃত্যু অযুত মৃতকে নূতন জীবন দিল।

তাঁকে এই অনন্ত জীবন-যাত্রায় এগিয়ে দিয়ে আজও আমরা, যারা পৃথিবীর পথে চলেছি, তারা মৃত্যুর এই পবিত্র মূর্ত্তি সম্মুখে দেখে আশায় উৎসাহে জীবনময় হ'লাম।

তাঁর মৃত্যু তাই তাঁর জীবনের পরিণাম ব'লে বল্‌তে পারি। তাঁর দৃশ্য-মূর্ত্তি হারাণ ছাড়া আমরা কিছুই হারাই নি। তাঁর মত ত্যাগী, তেজস্বী, মহৎ হব এই আকাঙ্খা আমরা প্রত্যেকে করতে পারি; এই আকাঙ্খা জীবনে পরিপূর্ণ করতে যে সাধনার প্রয়োজন, হয় ত সেই সাধনার প্রথম ক্ষণেই আমরা অনেকে এই জীবনের সীমান্ত-রেখা পার হ'য়ে যাব।

তা ব'লে জীবনের প্রতিক্ষণটি কি আমরা চেতনাময় ক'রে রাখ্‌তে পারি না? যা' বলি, যা' আশা করি, যা' অপরে করুক এই ইচ্ছা আমরা করি তা' আমাদের জীবনে সাধন করতে পারি না? ব্যক্তিগত জীবনে নিজের ভাষা ও আশাকে মূর্ত্তি দিতে পারলেই ত অনেকখানি হ'ল। সেই সঙ্গে এই তপস্যার সহজক্ষেত্রে যে আসে তারই সঙ্গেই ত চিরমিলনের পরিচয় হয়। এক মানুষ বহুর জীবনে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে, বহুর জীবন অসংখ্য নরনারীর হৃদয়বিহারী হয়।

এই স্রোতের পর স্রোত, গতির পর গতি, অবনতি হ'তে উন্নতি, উন্নতি হ'তে পরিণতি—এই নিয়েই জীবন ও মৃত্যুর অপরূপ লীলা চলেছে।

চিত্তজয়ী মহামানব চিত্তরঞ্জনকে ভুলে যাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব কিন্তু ঐ জীবনের প্রভাবকে মানুষের জীবন থেকে মুছে ফেলা খুব সহজ হবে না। এই প্রভাব যুগ হ'তে যুগান্তরে, দেশ হতে দেশান্তরে, জন্ম হ'তে জন্মে, জীবনে জীবনে চিরন্তন্ আশীর্ব্বাদের মত মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হয়েছে।

আরও যারা নিজ স্বার্থের অন্বেষণে তাঁর আরব্ধ কাজে ব্রতী হয়েছে, মনে হয় না কি, তাদের মনের সে ক্ষুদ্রতা আর থাক্‌বে না? মনে আশা হয় না কি, যারা এই মানুষটিকে সম্মান ক'রে মুকসাধারণের কাছে শ্রদ্ধা অর্জ্জন করল, তারা সত্য সত্যই আপন আপন জীবনে এই মানুষটির চরিত্র ও আদর্শকে সম্মান করতে প্রস্তুত হবে? ভিক্ষার নামে যারা ভোগ করল, শোকের নামে যারা প্রতিপত্তি লাভ করল, শ্রদ্ধার নামে যারা অর্থ উপার্জ্জন করল, তারা সকলেই এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীচতাকে জীবন হ'তে পরিত্যাগ করবে, এ-কথা কি আশা করতে পার না? আমি ত খুব আশা করি, এত বড় চরিত্রের প্রখরতা সমস্ত ধ্বংসকারী অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে নিস্তেজ ক'রে দেবে। ইনিও মানুষ ছিলেন, সুখে দুঃখে, মোহে লোভে আমাদেরই মত জড়িত হ'য়ে ছিলেন। সহস্রের বেদনা তাঁকে ডাক্‌ল, জাতির ব্যথা তাঁকে আকুল করল, ঈশ্বরের অম্লান আশা তাঁকে আহ্বান করল, তাই নর হ'য়ে তাঁর নারায়ণ হওয়া অসম্ভব হ'ল না।

গত ১লা জুলাই ১৭ই আষাঢ় তাঁর সর্ব্বশেষদান রসারোডের বাড়ীতে পুরুষ ও মহিলার জনতা দেখে মনে হ'ল, তীর্থযাত্রী তীর্থ দর্শনে এসেছে। মুখে শোকের ম্লান ছায়া নাই, কিন্তু এক অপরূপ স্নিগ্ধতা মাখান। সবাই যেন বাক্যহারা,—মানুষ আসছে যাচ্ছে, কেউ কারুকে কিছু বলে না, কোথায় যাবে জিজ্ঞাসা করে না। কোথাও বাধা নাই,—সমাধি, বাসগৃহ, প্রাঙ্গন—সবই যেন অবারিত; আগন্তুকের

মনে কোনও সঙ্কোচ নাই, অভিমান নাই, আপন মনে তারা আপন আকাঙ্খা পূর্ণ ক'রে আপনার পথে ফিরে চলুন।

কীর্ত্তন, কথকতা, আশার বাণীতে সে-দিনকার বায়ুমণ্ডল পবিত্র [illegible] উঠেছিল।

সেদিন সভাও হয়েছিল অনেক যায়গায়। ময়দানে খুব বড় এক সভা হয়েছিল, লোক অসংখ্য, সকল জাতির নর-নারী সেখানে শ্রদ্ধাবিনত চিত্তে সমবেত হয়েছে, অনেকেই নিজ সাধ্যমত চিত্তরঞ্জনের অন্তত একখানি আলেখ্য কিনে চলেছে—তৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদে মানুষের চোখ্ ছল্ ছল্। বৃষ্টি নাই, রৌদ্র নাই, বিশাল চন্দ্রাতপের মত আকাশ জুড়ে মেঘের রাশি মানুষের মাথার উপর প্রসারিত হয়ে' রয়েছে।

সভা ভাঙল, পথিক পথের ধূলা উড়িয়ে যাত্রা করল ; মনে হ'ল, এ-পথ যেন সে-পথে গিয়ে মিশেছে—বুঝি এইটুকুই সব চাইতে বড় আশা।

ময়দানের সভাতে মহাত্মা গান্ধী বললেন, এই চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে, ছোট বড় ধনী-নির্ধন সকলেই গভীর শোক প্রকাশ করছেন। কিন্তু এখন যা' প্রয়োজন তা' শুধু শোক করা নয়। বীরপুরুষ এক একটা আদর্শ নিয়ে এ জগতে আসেন, এবং সেই আদর্শকে পরিপূর্ণ করতে তাঁরা জীবনের শেষ পর্য্যন্ত প্রয়াস করেন। তাঁরা যখন জীবন সমাপন করেন, তখন অন্যেরা তাঁদের সূচিত কাজ মাথায় ক'রে নেয়। রাজপুত বীর যখন রণক্ষেত্রে জীবন হারায়, বীরের মৃত্যুতে তখন সে সংগ্রাম ক্ষান্ত হয় না। ইস্লাম সংহিতায় এই জন্যই বুঝি মৃতের জন্য কান্না নিষিদ্ধ। লর্ড চেমস্ফোর্ড তাঁর পুত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে একঘণ্টার জন্যও তাঁর কর্ত্তব্য কার্য্য হ'তে অবসর গ্রহণ করেন নি। * * * * চিত্তরঞ্জনের বিশ্বাস ছিল, ভারতবর্ষ সমগ্রজাতি ও অবস্থা-নির্ব্বিশেষে একতা লাভ না করলে কখনই তার ঈপ্সীত প্রতিষ্ঠালাভ করবে না। আজ তাই জাতির কর্ত্তব্য, সকল মানুষের সম্মিলন, খাদি ব্যবহার এবং চিত্তরঞ্জনের পল্লী-সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হওয়া।

কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে যে মহতী সভা হয়, সেখানেও মহাত্মা বলেন, জাতির আজ এক আদর্শ হোক্। নর-নারী পরস্পরের সহায় হোক।

দেশীয় খৃষ্টানদেরও এক সভা হয়। তাতে তাঁরা চিত্তরঞ্জনের মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য চরমনিষ্ঠা ও মহান্ ত্যাগের কথা শ্রদ্ধাপূর্ণ অন্তরে গ্রহণ করেন।

ইউরোপীয়ান্ এসোসিয়েসনের যে সভা হয়, সেখান থেকে শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে চিত্তরঞ্জনের অকাল মৃত্যু ও তাঁর অতিপ্রিয় দেশের কায হতে বঞ্চিত হবার জন্য সমবেদনা জানান্।

টাউনহলে যে বিরাট সভা হয়, তার সভাপতি হয়েছিলেন মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান অধিপতি।

এই সভায়ও বর্দ্ধমানের মহারাজা, মিষ্টার থর্ণ, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, বিপিনচন্দ্র পাল, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়, মজিবর রহ্মান, প্রভাসচন্দ্র মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়, জয়লাল, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, এইচ, বি, মরিনো, ওয়াহেদ হোসেন প্রভৃতি তাঁদের নিজ নিজ অন্তরে ও জীবনে কি ভাবে চিত্তরঞ্জনকে পেয়েছিলেন এবং বাইরে কি ভাবে দেখেছিলেন সে বিষয়ে কিছু কিছু বলেন।

আরম্ভ অসংখ্য ছোট-বড় সভা, পূজা, কীর্ত্তন প্রভৃতি সে-দিনের সন্ধ্যাকে পরিপূর্ণ করেছিল।

রাত্রি প্রায় বারটার পর যখন শেষ যাত্রী আপন গৃহে ফিরে চলেছিল, তখন দেখ্লাম, দেবতার আশ্বাসের মত গভীর কৃষ্ণ মেঘান্তরালে বাঙলার আকাশে এক্খানি চাঁদ সেই ঝড়ের মেঘের বুক চিরে বেরিয়ে আসছে।

মনে হ'ল, মানুষ হ'তে চাইলে—আশা আছে, আশা আছে!



রাজ-ভিখারী

(গান)

নজরুল ইস্‌লাম

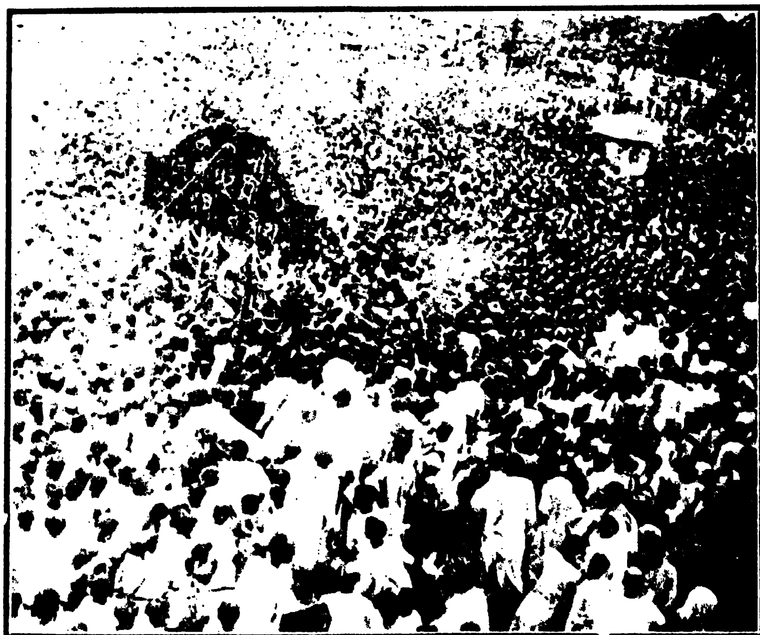
কোন্ ঘর-ছাড়া বিবাগীর বাঁশী শুনি' উঠেছিলে জাগি'—
ওগো চির-বৈরাগী !
দাঁড়ালে ধূলায় তব কাঞ্চন-কমল-কানন ত্যাগি'—
ওগো চির-বৈরাগী !
ছিলে ঘুম-ঘোরে রাজার দুলাল,
জানিতে না কে সে পথের কাঙাল
ফেরে পথে পথে ক্ষুধাতুর-সাথে ক্ষুধার অন্ন মাগি',
সুধার দেবতা 'ক্ষুধা ক্ষুধা' ব'লে কাঁদিয়া উঠিলে জাগি,—
ওগো চির-বৈরাগী !

আঙিয়া তোমার নিলে বেদনার গৈরিক রঙে রেঙে,
মোহ-ঘুমপুরী উঠিল শিহরি' চমকিয়া ঘুম ভেঙে।
জাগিয়া প্রভাতে হেরে পুরবাসী
রাজা দ্বারে দ্বারে ফেরে উপবাসী,
সোনার অঙ্গ পথের ধূলায় বেদনার দাগে দাগী।
কে গো নারায়ণ নর-রূপে এলে নিখিল-বেদনা-ভাগী—
ওগো চির-বৈরাগী!

"দেহি ভবতি ভিক্ষাম্" বলি' দাঁড়ালে রাজ-ভিখারী,
খুলিল না দ্বার, পেলে না ভিক্ষা, দ্বারে দ্বারে ভয় দ্বারী !
বলিলে—'দেবে না ? লহ তবে দান
ভিক্ষাপূর্ণ আমার এ প্রাণ !'
দিল না ভিক্ষা, নিল না ক' দান, ফিরিয়া চলিলে যোগী !
যে-জীবন কেহ লইল না তাহা মৃত্যু লইল মাগি' !



শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে শবদেহ বহন করিয়া আনা হইতেছে



শিয়ালদহের বাহিরে পুষ্পতোরণ শোভিত শব-যাত্রায় শোকার্ত্ত
নরনারীর বিপুল-জনতা

দেশবন্ধু

(গান)

শ্রীনিরুপমা দেবী

গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঈশান বিষাণ বাজে
ধবল অদ্রি কাঞ্চন-গিরি মলিন ধূসর সাজে।
ছড়ায়ে গগনে মহা জটাজাল
ত্রিশূল হস্তে দাঁড়াইয়া কাল
বঙ্গ-চিত্তরঞ্জন-মণি দীপিছে অঙ্কের মাঝে।
পদতলে পড়ি মূর্চ্ছিতা দীনা
জননী বঙ্গ শোক-মলিনা
বক্ষে নিহিত তীব্র বেদনা ললাটে অশনি গাজে।
চরণে সাগর ঘোষিছে উথলি
উঠ মা উঠ মা দেখ আঁখি মেলি
কালজয়ী আজি সন্তান তব দীপ্ত তপন সাজে।
মৃত্যুর মাঝে অমৃত হইয়া
রঞ্জন তব বলিছে হাসিয়া
"আছি আছি র'ব চিত্তে তোমার সকল কর্ম্মে কাজে।"
জাগো জাগো আজি বঙ্গের প্রাণ
গেয়োনা গেয়োনা শুধু শোক-গান
বন্ধুরে তব বরণ করিয়া লহ বক্ষের মাঝে।
চল চল সবে চেয়ে তাঁরি পথে
দাও দাও প্রাণ সেই মহাব্রতে
নহিলে এ গান শুধু মিছা তান মিলাইবে চির লাজে।
ফুকারি বিষাণ হাঁকিছে ঈশান
তোদেরি জাগাতে এ মহা আহ্বান
"ওঠো জাগো, কেন এখনো শয়ান" সঘনে বজ্র গাজে।

নবীন বুদ্ধ

শ্রীবীণাপাণি দেবী

তপঃ শেষ করি, কে এল রে ফিরি, হিমগিরি হ'তে নেমে।
গঙ্গা-প্রবাহ বন্ধ হ'ল কি, বাতাস গেল কি থেমে?
যোগীর ভূষণ ত্যাগ ক'রি তুমি পরেছ প্রেমিক বেশ,
তোমার প্রেমের শেষ-কণা পেতে ছুটেছে পাগল দেশ!
ক্ষুধা তৃষা নাই, নাই কোন লাজ, আঁখিতে বহিছে লোর,
হে প্রেমিকবর, তোমার প্রেমেতে সারাদেশ হ'ল ভোর!
হে দেশ-বন্ধু, দেশের বন্ধু, ভারত-মুকুট মণি,
ওগো বাঙ্গলার রিক্ত পুরুষ, অন্তর-ধনে ধনী!

কুবেরের ধন নিঃশেষ করি, লক্ষ্মী দিলেন আনি,
আপন বীণার মধু-ঝঙ্কার সাদরে দিলেন বাণী,
ধন-মান এল, যশ-গাথা আর বিভব আপন হ'তে,
তবু সব ত্যাগি' বাহিরিলে যোগী, ধূলামাটি-মাখা পথে!
দেশ-জননীর অনুপম বাণী পশিয়া তোমার কাণে
হে নব-বুদ্ধ কোথা হ'তে তোমা কোন্ পথে টেনে আনে!
হে দেশ-বন্ধু, দেশের বন্ধু, ভারত-মুকুট-মণি,
ওগো বাঙ্গলার মুক্ত পুরুষ, অন্তর-ধনে ধনী!

ডান হাত পেতে নিলে যাহা তুমি বাম হাতে দিলে ছুঁড়ি,
মণি-মাণিক্য হীরা-জহরৎ পথে যায় গড়াগড়ি।
আপনার গৃহ বিশ্বে বিলায়ে খুলিলে বিশ্ব-দ্বার,
কারাগার কিবা কারার বাহির [illegible] গেল একাকার!
চকিত জগত অপলক হেরে বিস্ময় মনে মানে।
মুগ্ধ ভারত ভক্তি-অর্ঘ্য তব পদতলে আনে!
হে দেশ-বন্ধু দেশের বন্ধু, ভারত-মুকুট-মণি,
ওগো বাঙ্গলার নবীন বুদ্ধ, অন্তর-ধনে ধনী!

মায়ের আপন করেতে রচিত দিব্য-বসন পরে'
দেশ-জননীর পূজা-গৃহে, সাধু, প্রবেশিলে নতশিরে।
হৃদয়-বহ্নি সঞ্চারি তব জ্বালালে হোমের শিখা।
মায়েতে ছেলেতে হ'ল জানাজানি, হ'ল দুজনের দেখা।
গুরু-গম্ভীর নির্ঘোষে ওঠে বিশ্ব-ভুবন ভরি
কিবা সে মন্ত্র, পেলে তুমি ঋষি কোন্ গুরুপদ স্মরি!
হে দেশ-বন্ধু, দেশের বন্ধু, ভারত-মুকুট-মণি,
ওগো বাঙ্গলার সিদ্ধ-পুরুষ, অন্তর-ধনে ধনী।

হোমের সে শিখা দেখিতে দেখিতে আগুন জ্বালাল দেশে,
মন্ত্রের বাণী নির্ঘোষের মাঝে বজ্রের স্বরে ঘোষে!
কার তেজে ভবে বাসুকী আকুল, মেদিনী কাঁপিয়া ওঠে,
কাহার দৃপ্ত অভয়ের বাণী উল্কার মত ছোটে?
কাপুরুষ ভয়ে কাঁপে থর থর, মুখে বাণী নাহি সরে,
অত্যাচারীর পীড়ন-দণ্ড চকিতে খসিয়া পড়ে!
হে দেশ-বন্ধু, দেশের বন্ধু, ভারত-মুকুট-মণি,
ওগো বাঙ্গলার সত্য পুরুষ, অন্তর-ধনে ধনী!

তপ শেষ তব হ'য়ে গেল কিগো চকিতের মাঝে আজ,
তাই দেশে ফেরো বিশ্ব-বিজয়ী মানব-হৃদয়-রাজ?
তোমার রথের বিজয়-চক্র যেথা যেথা দিয়ে চলে,
সেথায় তোমার ব্যাকুল সেবক অশ্রু-অর্ঘ্য ঢালে।
নাই আজ দিশা, নাই কোন জ্ঞান, মনে নাহি আজ লাজ,
পাগলের পারা ছোটে তব তরে, মুকুট-বিহীন-রাজ!
হে দেশ-বন্ধু, দেশের বন্ধু, ভারত-মুকুট-মণি,
ওগো বাঙ্গলার ভক্ত পুরুষ, অন্তর-ধনে ধনী!

বাংলার ছেলে বাংলার মেয়ে, মুছহ নয়ন-বারি
এ মহান্ শোক ত্যাগ কর আজ শির তব নত করি!
এ বিরাট মহামানবের কাছে দুঃখের নাহি স্থান,
স্বদেশ-প্রেমের আগুনে আপনি আহুতি যে করে দান।

সাড়ে শরীর হ'ল অনন্ত, এক হ'ল আজ কোটি
দৃপ্ত বীরের অমর সে বাণী দিকে দিকে ওঠে রটি !
হে দেশ-বন্ধু দেশের বন্ধু ভারত-মুকুট-মণি,
ওগো বাঙলার নিত্য পুরুষ অন্তর ধনে ধনী ।

বাঙলার দিক-চক্রে আজিকে ডুবিল বঙ্গ-রবি,
পুড়ে এক সাথে বৈষ্ণব, প্রেমী, স্বদেশ-ভক্ত কবি ।
মহামানবের চিতা-বেদী হ'ক বাঙলার মহাতীর্থ,
হেথা বাঙলার নর-নারীগণ তর্পণ ক'রো নিত্য !
মুছ আঁখি লোর বাঁধগো হৃদয় কঠিন বর্ম্ম দিয়া
চিতার আগুনে রাঙাইয়া লও, তোমার আর্ত্ত হিয়া !
হে দেশ-বন্ধু, দেশের বন্ধু, ভারত-মুকুট-মণি,
ওগো বাঙলার চিত্ত-দুলাল, অন্তর-ধনে ধনী !



বন্ধু-হারা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

বন্ধু গো, আজ তোমার কথাই সবার মনে জাগে!
তোমার অভাব বিপুল ব্যথায় বক্ষে যেন শেলের মত লাগে!
এই তো সে-দিন ঘুচিয়ে দিয়ে দুর্ব্বলেদের সকল বিসম্বাদ
পদ্মা-তীরে মুখর হ'য়ে উঠ্‌ল তোমার জোরে অভয়, সিংহনাদ,
আজ মনে হয় কোথায়? ওগো কত যুগের পার—
সে ধ্বনি হায়, হারিয়ে গেছে,—শুন্‌বে না কেউ আর
সৌম্য, শান্ত, স্নিগ্ধ, সতেজ, সেই যে মূর্ত্তিখানি,
পার্‌তো না যা টলিয়ে দিতে নিন্দা শ্রবণ স্তুতি কিম্বা গ্লানি
সেই যে তোমার দীপ্ত মুখের শিষ্ট সরল হাসি,
দেশের প্রতি সেই যে প্রীতি—অপ্রমেয়—উগ্র—অবিনাশী,
জাতির অসাড় জীবন-বীণায় দীপক-রাগে সেই যে নূতন তান
শিকল-ভাঙার গান,
শুন্‌তে বোধ হয় পাবো না আর হাজার বছর ধ'রে!
হায় বন্ধু, হঠাৎ এমন ক'রে
পালিয়ে যাবে তুমি
ভাসিয়ে দিয়ে প্রাণের অধিক তোমার জন্মভূমি!
স্বপ্নে কভু ভাবি নি কেউ সেটা
বিনা মেঘের বজ্রসম এটা
বেজেছে আজ সবার বুকে তাই,
তুমি যে আজ নাই,
এ কথা হায় মানতে চায় না মন,
তাই ত অনুক্ষণ,
কান পেতে সব ব'সে আছি দীর্ঘ পথের এই সীমানার পাশে,
তোমার পায়ের শব্দ পাবার আশে,

সজাগ হ'য়েই থাকবো দিবা-নিশি।
ওগো স্বরাট্ ঋষি!
হিমালয়ের শৈল-গুহায় কোন্ সাধনায় মাত্‌লে অভিনব,
সিদ্ধ বুঝি এ জীবনের তপস্যা আজ তব,
মুক্তি এল মরণ-রথে জীবন-পথে নেমে,
অধীনতার সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিতে প্রেমে!
তোমার বিরাট—শ্মশান-প্রবেশ—চিতার ধূমে অগ্নি-শিখার সনে
কৃষ্ণ-মেঘের বক্ষে যেন ক্ষণপ্রভার মতো তড়িৎ আলিম্পনে
এই কথাটাই লিখলে সে-দিন লক্ষ লোকের দুঃখ-বিভল মনে—
মরে নি এই দেশটা আজও, মরে নি এই জাত, ডাক শুনেছে তোমার জনে জনে!

* * *

সজল হ'য়ে উঠেছে ওই আষাঢ়ের আজ আঁখি,
মেঘ ওঠে ওই গুরু গুরু গভীর ব্যথায় কাতর হ'য়ে ডাকি,
বর্ষারাণী বিরহিনীর অঝোরে হায় ঝরে নয়ন ধারা
আছড়ে যেন পড়ছে সে আজ পাগলিনীর পারা!
ব্যাকুল হ'য়ে উড়ছে বাতাস এলো-মেলো মেঘলা কালো চুল
সিক্ত সাড়ীর সবুজ আঁচল চখের জলে মরি! ভূমে লুটায় ছিন্ন মালার ফুল!
ভিজে শীতল পূবের হাওয়ায় শিউরে ওঠে নীপ,
আঁধার আকাশ দুঃসময়ে নিভিয়ে দেছে তার নীল চাঁদোয়ার লক্ষ তারার দীপ;
কাতর হ'য়ে উঠ্‌ছে শোনো কেকা,
ঝাপ্‌সা হ'য়ে আস্‌ছে চ'খে আজ কেবলই যেন দিগন্তের ওই রেখা,
কেতকী হায় গুমরে কাঁদে লুকিয়ে নিবিড় বনে
মর্ম্মভেদী তোমার ব্যথা কোকিয়ে ওঠে আজ সর্ব্বজনের মনে।

* * *

মৃত্যু-জেতা বন্ধু দেশের, ওগো মহান্ স্বাধীনতার কবি,
আচম্বিতে বিদায় তব হতাশ্বাসে হায়, ছায় বুঝি আজ ভবিষ্যতের ছবি!
তুমিই শুধু স্ব-পৌরুষে জাতটা তোমার একা, তুলছিলে যে সকল বাধা ঠেলে,
আচম্‌কা তোমায় এমন অসময়ে হঠাৎ হারিয়ে ফেলে

কী অসহায় অনাথ হয়েই পড়ল' এ দেশ আজ ;
হে নির্ভীক শ্রেষ্ঠ পুরুষ, সর্ব্বলোকের হৃদয়-অধিরাজ,
কে চালাবে আজকে মোদের লক্ষ্য-পথে যত্নে দু'হাত ধরি ?
কে বাঁচাবে এমন ক'রে আগলে নিয়ে বুকে, সকল দিকে নিজেই শুধু মরি
হায় বন্ধু, মুছবে না ত এ বেদনার দাগ, এ আঘাতের চিরস্থায়ী ক্ষত ;
তীব্র ব্যথার অনুভূতি বক্ষ সবার চিরে যুগে যুগেই জাগবে অবিরত !
আজকে মনে পড়ছে বারম্বার,
তোমার জীবন-কথার সাথে অসাধারণ শক্তি প্রতিভার,
সত্য যেটা—ন্যায্য যেটা—মানতো কেবল সেটাই তোমার প্রাণ,
নবযুগের ওগো তাপস, দৃপ্ত সত্যবান !
তোমার হাতের ন্যায়ের তরবার
কঠোর হ'য়েই পড়তো এসে, মিথ্যা যেথা ছদ্মবেশে ক'রতো অত্যাচার !
হায় বন্ধু, যে দেশ দারুণ দুর্ব্বলতার দাস
তোমার মত মানুষ তারা হারায় যদি এই অকালে—তেমন সর্ব্বনাশ
হয় না বুঝি আর কিছুতে কারও—
তোমার অভাব তাই ত' বাজে আরও
সারা দেশের বুকে ;
খুইয়ে তাদের 'পরশ-পাথর' 'সোনার কাঠি' আজ
গোটা জাতটাই মুসড়ে গেছে দুখে !



মহাপ্রয়াণ

(সঙ্গীত)

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

বাংলামায়ের কোলজোড়াধন—
বাংলা ছেড়ে যায় নি গো,—
মোছ্‌রে তোরা মোছ্‌রে তোরা অশ্রুজল !
মায়ের স্নেহ-পরশ ছেড়ে—
স্বর্গ সে ত চায় নি গো—
কেমন ক'রে স্বর্গ তারে বাঁধবে বল্ !

বাংলা দেশের হাওয়ার সাথে,
অণুপরমাণুর সাথে,
মিশিয়ে গেছে আত্মা যে তার—
একটু ছাড়া পায় নি গো !
বাংলামায়ের কোলজোড়াধন
বাংলা ছেড়ে যায় নি গো !

জননী আর জন্মভূমি স্বর্গ হ'তে ঢের বড়,
এ কথা সে জান্‌ত যেগো সব চেয়ে ;
স্বর্গ ছেড়ে তাইতে সে যে—
বাংলা দেশেই রইল গো—
অনল-অনিল-শূন্য-সলিল সব ছেয়ে।

বাঙালীদের সুখে দুখে,
বাঙালীদের বুকে বুকে—
মিশিয়ে গেছে কামনা তার,
স্বর্গ কিছুই পায় নি গো।
বাংলামায়ের কোলজোড়াধন
বাংলা ছেড়ে যায় নি গো !

———



পুরনারীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অপণ



চিতা

দেশবন্ধু

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভে সমবেত কৌরব ও পাণ্ডব-সেনার বর্ণনায় মহাভারতকার লিখেছেন, 'তারা পরস্পরকে দেখে পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হ'ল'। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শ্মশান-যাত্রা ও শ্রাদ্ধে আমরা—তাঁর সমবেত দেশবাসিরা-পরস্পরকে দেখে পরম বিস্মিত হয়েছি। তত্ত্বপিপাসু লোকেরা এরি মধ্যে জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করেছেন এমন ঘটনা কি করে কেন ঘটল। 'মডার্ণ রিভিউ' কাগজে সম্পাদক মহাশয় প্রশ্ন তুলেছেন—'এই যে বিভিন্ন বর্ণ, জাতি ও ধর্ম্মের লক্ষ লক্ষ লোক চিত্তরঞ্জনের শবানুগমন করেছে এ-ত সাধারণ আকর্ষণী-শক্তির ব্যাপার নয়। কারণ এ-দেশে ইতিপূর্ব্বে কোনও রাজা কি সম্রাট, রাজনীতিজ্ঞ কি সেনাপতি, জনহিতৈষী কি দেশভক্ত, সাধু কি ধর্ম্মবক্তা কারও প্রেতকৃত্যে এমন বিরাট জনসমারোহ হয় নাই। কারও জন্য দেশে বিদেশে এত স্মৃতিসভা ও শোক প্রকাশ দেখা যায় নাই।' সম্পাদক মহাশয় মনে করেন, এ ব্যাপারের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ের এখনও সময় আসে নাই। এবং তিনি আশা করেছেন যে, ভবিষ্যতে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে খুব নিকট পরিচয় ছিল এমন কেউ তাঁর জীবনচরিত লিখে তাঁর ব্যক্তিত্বের সূক্ষ্ম সমালোচনা ও বিশ্লেষণ করে' জনসাধারণের মনের উপর চিত্তরঞ্জনের অসাধারণ প্রভাবের প্রকৃত ব্যাখ্যা দেবেন। তিনি নিজে এ কাজে হাত দিলেন না, কেন না, চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকলেও সে পরিচয় খুব নিকট পরিচয় ছিল না, এবং তিনি তাঁর সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা সর্ব্বসাধারণের জানা ঘটনা থেকে অনুমান মাত্র।

পণ্ডিতের দৃষ্টি স্বভাবতই সূক্ষ্ম, অর্থাৎ স্থূল জিনিষ এড়িয়ে চলে। নইলে রামানন্দ বাবুর এটা বুঝতে কেন গোল হ'ল যে লক্ষ লক্ষ লোকের উপর এক জনের যে প্রভাব তার কারণ তাঁর চরিত্রের কোনও নিগূঢ় গোপন গুণাগুণ হতে পারে না। সেটা নিশ্চয়ই এমন জিনিষ যা সর্ব্বসাধারণের কাছে অতি সুপ্রকাশ, এবং যা পণ্ডিতের কাছে অতি প্রহেলিকা হলেও জনসাধারণের কাছে অতি সহজ বোধ্য। লক্ষ লক্ষ লোকের সঙ্গে নিকট পরিচয় ত কারও সম্ভব নয়!

তত্ত্বজিজ্ঞাসু সম্পাদক যে প্রশ্ন করেছেন, একজন তত্ত্বদর্শী লেখক তাঁর কাগজের সেই সংখ্যাতেই ইঙ্গিতে তার উত্তর দিয়েছেন। জুলাই মাসের 'মডার্ণ রিভিউ'তে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার মোটা কথা যে, চিত্তরঞ্জনের প্রভাবের কারণ যে তাঁর দেশবাসীরা হচ্ছে কর্ত্তা ভজার জাত। তাদের গুরু একজন চাই-ই চাই যার হাতে নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা তুলে দিয়ে তারা নিশ্চিন্ত হতে পাবে। অধ্যাপক মহাশয়ের মতে দেশের লোকের উপর চিত্তরঞ্জন দাশের প্রভাবের স্বরূপ আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতার প্রমাণ। কারণ সে প্রভাবের একমাত্র কারণ ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ, ইউরোপের মত কাটা ছাঁটা অপৌরুষেয় তত্ত্ব প্রচারের ফল নয়। ("It was purely personal magnitism......not, as in Europe, the official to clear impersonal principles")। অপৌরুষেয় তত্ত্বে নিবিষ্ট থাকায় বোধ হয় অধ্যাপক মহাশয়ের ভেবে দেখ্‌বার সময় হয় নাই যে, লক্ষ লক্ষ লোক যারা চিত্তরঞ্জনকে চোখেও দেখে নাই, বা কেবল মাত্র চোখে দেখেছে তাঁদের উপর তাঁর প্রভাবের মূল কোথায়? এবং Alexander the great থেকে লয়েড জর্জ পর্য্যন্ত ইউরোপের ইতিহাস মানুষে ভাঙ্গা গড়া করেছে না সেটা অপৌরুষেয় তত্ত্বের লীলা-খেলা! ইউরোপের ইতিহাস সম্বন্ধে ইংরেজ হুইগ ঐতিহাসিকেরা আমাদের চোখে যে ঠুলি পরিয়ে দিয়েছে সেটা খুলে ফেলে খালি চোখে চেয়ে দেখ্‌বার কি এখনও সময় হয় নি? অধ্যাপক মহাশয় লিখেছেন, গ্ল্যাডষ্টোন কি গ্যাম্বটাকে কি চিত্তরঞ্জনের মত আইন সভায় প্রত্যেক সভ্যকে জনে জনে Canvass করতে হয়েছে। না হবারই কথা, কেন না যে মনোভাবের লোক নিয়ে চিত্তরঞ্জনকে কারবার করতে হয়েছে তাদের তা হয় নি। এ যে পরাধীন জাতির দেশ, যেখানে লোকে কথা ও কাজে সব সময়েই ভাবে 'প্রভু কি বল্‌বেন'—এত বড় কথাটা ভুলে থাক্‌লে চল্‌বে কেন? এই পরাধীনতা যে কি মনোভাবের সৃষ্টি করে, অধ্যাপক সরকারের এই লেখাটাই তার প্রমাণ। এই এক পৃষ্ঠা প্রবন্ধের মধ্যেই সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হলেও একবার সোভিয়েট রুশিয়ার নিন্দা ও একবার বৃটিশ শান্তির প্রসংশা করতে হয়েছে।

লোকচিত্তের উপর চিত্তরঞ্জনের যে প্রভাব তা কোনও নিগূঢ় তত্ত্বের বিষয় নয়। তা সূর্য্যের মত স্ব-প্রকাশ। চোখ না বুজে থাক্‌লেই দেখা যায়। পরাধীন ভারতবর্ষে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগছে। আমাদের এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা চিত্তরঞ্জনে মূর্ত্ত হয়ে প্রকাশ হয়েছিল। সেই মুক্তির অঙ্গ যে নির্ভীকতা, যে

ত্যাগ, যে সর্ব্বস্বপণ আমরা অন্তরের অন্তরে প্রয়োজন বলে জানছি, কিন্তু ভয়ে ও স্বার্থে জীবনে প্রকাশ করতে পারছি না, সেই নির্ভীকতা, সেই ত্যাগ ও সেই পণ সমস্ত বাধা মুক্ত হয়ে চিত্তরঞ্জনে ফুটে উঠেছিল। চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ও জনসাধারণের উপর তাঁর প্রভাব দু-এরই এই মূল। আইন-সভায় যারা চিত্তরঞ্জন উপস্থিত না থাকলে এক রকম ভোট দিত, তাঁর উপস্থিতিতে অন্য রকম দিত, তারা দেশের মুক্তিকামী এই ত্যাগ ও নির্ভীকতার মূর্ত্তির কাছেই মাথা নোয়াত। চিত্তরঞ্জনের সম্মুখে দেড় শ' বছরের ব্রিটিশ শান্তির ফল প্রভু-ভয় ও স্বার্থ-ভীতি ক্ষণেকের জন্য হ'লেও মাথা তুলতে পারত না। এই যদি কর্ত্তাভজা হয়, তবে ভগবান যেন এ দেশের সকলকেই কর্ত্তাভজা করেন, অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের অপৌরুষেয় তত্ত্বের ভাবুক না করেন।

কথায় কথায় দেশের লোক গান্ধী কি চিত্তরঞ্জনের কাছে ছুটে যায় ব'লে অধ্যাপক মহাশয় বড় ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। ঐটেই নাকি প্রমাণ যে, আমরা ডেমক্রেটিক শাসনের উপযুক্ত হই নাই। এই সব 'গুরু'-মানা নাকি ডেমক্রেটিক শাসনের একেবারে বিরোধী। কথা কি ঠিক? 'ডেমসের 'গুরু' মানা ছাড়া কি উপায় আছে?

ডেমক্রেটিক শাসন অর্থাৎ 'গুরু'দের শাসন। তার ফল ভাল হবে কি মন্দ হবে তা নির্ভর করে কোন্ 'ডেমস্' কাকে গুরু মানে তার উপর। ভারতবর্ষের 'ডেমস্' যে গুরুর খোঁজে শবরমতীর আশ্রমে কি দেশবন্ধুর বিশ্রাম-আবাসেই যায়, দৈনিক কাগজের সম্পাদকের অফিসে নয়, এটা আশার কথা, মোটেই ভয়ের কথা নয়। অধ্যাপক সরকার যাকে ডেমক্রেটিক বলে চালাতে চাচ্ছেন, সে হচ্ছে সেই aristocratic শাসন, যা ইউরোপের শাসকসম্প্রদায় এতকাল democratic বলে চালিয়ে আসছে।

পণ্ডিতে না চিনুক দেশের জনসাধারণ চিত্তরঞ্জনকে যথার্থ চিনেছিল। তারা তাই তাঁর নাম দিয়েছিল 'দেশবন্ধু'। ঐ নাম দিয়ে তারা জানিয়েছে, তাদের মনের উপর চিত্তরঞ্জনের প্রভাবের উৎস কোথায়। পণ্ডিতের চোখে এটা না পড়তে পারে, কারণ এক শ্রেণীর পাণ্ডিত্য পৃথিবীর কোনও যুগে কোনও দেশেই সমসাময়িক কোনও মহত্ত্বকে চিনতে পারে নাই, কেন না তার কথা পুঁথিতে লেখা থাকে না।

শেষ সাক্ষাৎ

শ্রীশৈলেশনাথ বিশী

জুন মাসের প্রথম দিকে আমি দার্জ্জিলিঙ যাই। সে-দিন ডাকগাড়ী নির্দ্দিষ্ট সময়ের ঢের পরে যাইয়া দার্জ্জিলিঙ পৌঁছিল। সে-দিন আর 'ষ্টেপ-এসাইডে' যাওয়া হইল না। পরের দিন পাঁচটার সময় দেশবন্ধুর কাছে যাই। যাইতেই পথে চৌরাস্তায় শ্রীমতী এনি বেসান্তের সাথে দেখা। তিনি দাশ মহাশয়ের বাড়ী খুঁজিতেছিলেন। একবারে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়াই গিয়া হাজির হইলাম। দেশবন্ধু তখন বাহিরে বেড়াইতে যাইবার জন্য রিক্সতে উঠিতেছিলেন, আর বাহিরে যাওয়া হইল না। আমাদের সঙ্গে লইয়া গিয়া বারান্দায় বসিলেন—বলিলেন, তুমিও বসো।

মিসেস বেসান্ত মৃদুস্বরে বলিলেন, I have got something private. তাহা শুনিয়া দেশবন্ধু একটু ভ্রুকুঞ্চিত করিলেন, কারণ যখনই কেহ অল্-ইণ্ডিয়া লিডার বা বাহিরের কেহ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, তিনি আমাদের বাদ দিতেন না, সামনে থাকিলে ডাকিয়া লইতেন।

তাতে কি? এই বলিয়া আমি মিসেস বেসান্তের পার্শ্বচর শিবরাওকে সঙ্গে লইয়া পাশের ঘরে ঢুকিলাম।

মিসেস বেসান্তের সঙ্গে তাঁহার যে কথা হইল তাহা আমাদের শুনাইয়া শুনাইয়াই বলিতে লাগিলেন, আমাদের কোন কথাই অজ্ঞাত রহিল না। তিনি আসিয়াছেন, তাঁহার Common wealth of India Bill সম্বন্ধে দেশবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করিতে ও তাঁহার মতামত জানিতে। এক ঘণ্টার উপর তাঁহাদের কথাবার্ত্তা চলিল। যখন মিসেস বেসান্ত উঠিলেন, আমায় ডাকিলেন। আমি ছড়ি এবং টুপি তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলাম। বলিলেন, চল, এখন বেরনো যাক।

রিক্স পিছনে পিছনে চলিল। তিনি মাঝখানে, আমি ও ভাস্কর (ছোট জামাই) দুই পার্শ্বে চলিলাম। "ষ্টেপ-এসাইড" হইতে লিবং রোড দিয়া মোলে উঠিতে হয়। ঐ-টুকু পথ কেবল কুশলপ্রশ্ন ও আমাদের কে কেমন আছে

তাহা খুঁটিনাটি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। শরীর ভাল হইতেছে বলিলেন, চেহারায়ও বেশ লালিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিলাম—যেন যৌবন ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হইল। হাসি ঠাট্টা ও কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে আমরা 'ম্যেলে' আসিয়া পৌঁছিলাম। নবাব নবাবআলি হইতে আরম্ভ করিয়া রাস্তার লোকজন, আর্দ্দালী, চাপরাসী, কুলিরা পর্য্যন্ত দুই ধারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিতে লাগিল। অসংখ্য পরিচিত অপরিচিত নরনারীর স্মিত অভিবাদন ও কুশলপ্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। আমরা ম্যাকেঞ্জি রোড দিয়া সোজা চলিলাম। পথে প্রত্যেক পরিচিত ব্যক্তি ও দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া তাহাদের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

পথে ডান দিকে কতকগুলি লাল করগেটের ছাত-দেওয়া এক-প্যাটার্ণের বাড়ী দেখাইয়া আমাদের বলিলেন, এই গুলি একজন 'জার্ম্মেনের' ছিল, গেল যুদ্ধের সময় সরকার বাজেয়াপ্ত ক'রে নিয়েছে।

ক্রমে অমরা জনবিরল কাটা-পাহাড়ের পথ ধরিলাম। আমি তখন হাঁপাইয়া পড়িয়াছি, তাঁহার সাথে সামনে তাল রাখিতে পারিতেছি না, তাহা দেখিয়া বলিলেন, তুমি আমার এখানে সাতদিন থাকলে তোমার ভুঁড়ি কমে যাবে। আমি এখানে এসে প্রথম প্রথম আট দশ মাইল হেঁটেছি—এখনো চার মাইলের কম হাঁটি না।

এই বার রাজনৈতিক আলোচনা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, দেখ, মিসেস বেসান্ত-এর 'বিলের' সঙ্গে আমার সব বিষয়েই মিল আছে, কেবল ওঁরা 'সিবিল ডিস্ওবিডিয়েন্স' মানতে চান না, তা নিয়েই ত যত গোলযোগ। 'সিবিল ডিস্ওবিডিয়েন্স' আমাদের লক্ষ্য না থাকলে গবর্ণমেণ্ট কেবল মুখের কথা শুনবে না। আমি আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত (লর্ড রেডিং না ফেরা পর্য্যন্ত) দেখব, পরে সারা বাঙলা ঘুরে দেশ "সিবিল ডিস্ওবিডিয়েন্স"-এর জন্যে তৈরী করব। আমি বেসান্তকে বলেছি, তোমরা স্বরাজ্যক্রিড-এ সই কর, নইলে All-parties Conference-এ কি হবে? তার উত্তরে মিসেস বেসান্ত বলেছেন, শাস্ত্রী (শ্রীনিবাস শাস্ত্রী) ও সপ্রুকে (স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু) না জিজ্ঞাসা করে কিছু বলতে পারবেন না।—বল্লেন, ওঁদের সাহস নেই, ওঁরা "সিবিল ডিস্ওবিডিয়েন্স" এর নামে ভয় পায়।

এই বলিয়া তিনি বলিলেন, আমার ফরিদপুর অভিভাষণ নিয়ে আমি 'মডারেট' বলে খুব হৈ চৈ হচ্ছে কিন্তু আমি যা বলেছি, তা কেউ বোঝে নি।

আমি সহযোগ করতে চাই নি। যদি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হয়েছে, কাজে দেখায়, তবে আমি সাময়িক truce করতে রাজী আছি। অভিভাষণেও আমি এই কথাই বলেছি। এই কথাই তোমরা বিশেষ ক'রে বলো, নতুবা আমি সহযোগ করতে চাইছি, এগুলি আমার কথার distortion.

আর সে আগষ্ট মাস আসিল না!

পরে বলিলেন, ছ' মাস এখানে থাকলেই আমি ভালরূপ সেরে উঠব। কিন্তু ত কিছুই নেই, একজনের গলগ্রহ হয়ে (তিনি তখন ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের অতিথি) কত দিন থাকি? এখানে একটা বাড়ী না করলেই চলবে না—বই-টই লিখে চালাব।

যিনি দেশের জন্য সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াছেন, রাজার ঐশ্বর্য্য দুই হাতে বিলাইয়াছেন, শেষজীবনে তাঁহাকে টাকার কথাও ভাবিতে হইয়াছে! কথাটা আমার প্রাণে তীরের মত বিঁধিল। আমি অনেকক্ষণ কোন কথা বলিতে পারিলাম না। তাঁহার প্রশ্নে আমার চমক ভাঙিল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, শিলিগুঁড়ি কেন যাচ্ছ?

আমি বলিলাম, মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করিতে।

তিনি উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, তোমার মেয়ের বিয়ে! বয়স কত?

আমি বলিলাম, চৌদ্দয় পড়েছে।

তিনি বলিলেন, এই তোমাদের সমাজ-সংস্কার! এই তোমার বোলশেভিকবাদ লেখা! তোমরা মনে মুখে এক নও। যা ভাব, তা করতে ভয় পাও।

আমি, বাড়ীর জেদ, মায়ের পীড়াপীড়ি, ভাল বর হাত ছাড়া হইয়া যায়—এ সব কৈফিয়ৎ দিলাম।

তিনি বলিলেন, এ সব ত মামুলি জবাব, যদি বুঝে থাক যে, বাল্যবিবাহ দোষের, হাজার পীড়াপীড়িতেও তা দিতে পারবে না। ভাল বর সকল সময়েই পাওয়া যায়। যদি বামুনের মধ্যে না পাও, অন্য জাতের মধ্যে পাবে। অসবর্ণ বিবাহে দোষ কি? এই বলিয়া নিজের ও নিজের ছেলে-মেয়েদের বিবাহের দৃষ্টান্ত দিলেন।

তিনি বলিলেন, আমি যদি তিন শ' sincere বাঙালী ছেলে পাই, তবে দেশ-উদ্ধার, সমাজ-সংস্কার—সব কিছুই করতে পারি। তোমরা কাজ করবার আগে ভাব, কাজের ফলাফল বিবেচনা কর; কিন্তু আমি তা কখনো করি নি। ফলাফল

না ভেবে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। আমি কখনো আগু-পিছু ভেবে কাজ করি নে। এই বলিয়া তিনি তাঁহার রাজনৈতিক ও ব্যারিষ্টারী জীবনের কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, আমি ছিলেম কবি, হলেম ব্যারিষ্টার। তোমরা সকলে জান আমি মস্ত ব্যারিষ্টার, খুব আইন জানি। সে সব কিছুই নয়। 'ব্রিফ' পেয়েই আগে তোমরা আইনের পাতা ওল্টাতে থাক, আমি সবপ্রথমে আগাগোড়া ব্রিফখানা পড়তাম। এরূপ বারবার পড়তাম, পড়তে পড়তে তার weak point চোখের সামনে ভেসে উঠত। তারই উপর আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতাম। এই বলিয়া তিনি মুসলমান-পাড়া বোমার মামলার দৃষ্টান্ত দিলেন। পরে বলিলেন, জুনিয়র অবস্থাটা বড় কষ্টকর, সিনিয়রদের snubbing খেতে হয়। তার উল্টো জবাব দিলেই মুখ বন্ধ।

এই সময় আমরা 'gleneaden' ছাড়াইয়াছি। তিনি বলিলেন, আমরা 'West Point' পর্য্যন্ত যাব। ওই দেখ, দিঘাপতিয়ার বাড়ী দেখা যাচ্ছে, সামনেই 'Recluse.'

তখন কুয়াসা নীচে নামিতেছে, ভাস্কর তাঁহার গায়ের ওপর কোটটা জড়াইয়া দিলেন। আমাদের অনুরোধে তিনি রিক্সতে চাপিলেন, আমি 'রাগ' দিয়া তাঁহার পা-দু'খানি ঢাকিয়া দিলাম।

বিদ্যুতের আলো কুয়াশাকে দূর করিতে না পারিয়া অন্ধকারকে আরো গাঢ় করিয়া তুলিয়াছে। ঝিল্লিমুখরিত শান্ত বনানীর স্তব্ধ মৌনতা ভেদ করিয়া আমরা চলিলাম। তিনি বলিলেন, দার্জিলিঙের সবুজতায় চোখ জুড়ায়, হিমে মাথা ঠাণ্ডা রাখে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা West Point-এ আসিয়া পড়িলাম। তাঁহার ইচ্ছা তিনি কাটা-পাহাড়ে ওঠেন। আমি আর উঠিতে পারিব না বলায় সেখান হইতেই ফিরিতে মনস্থ করিলেন।

রিক্সের দুই পার্শ্বে আমরা দুজন চলিতেছি, তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন। পরে বলিলেন, দেখ, পলিটিক্সে surprise করতে হয়। আমি সব কাজেই surprise করেছি। আগাই মাস পর্য্যন্ত আমি চুপ ক'রেই থাকব। পরে ওদের দেখাব যে, আমি মডারেট্ না আর কিছু।

ফিরিবার মুখে পথ একেবারে নির্জ্জন নহে, খেলা ধূলো-ফেরতা অসংখ্য ইউরোপীয় ইউরেশীয় বালক-বালিকারা দলে দলে বনানীর নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া হাস্য মুখরিত করিয়া চলিয়াছে, সকলেই সসম্ভ্রমে তাঁহার জন্য পথ ছাড়িয়া দিতেছে।

আমি বলিলাম, আমি আর রাত্রিতে 'ষ্টেপ এসাইডে' যাইব না, ষ্টেশন হইতেই ফিরিব। কিন্তু পথ চিনি না বলায় তিনি হাসিয়া বলিলেন, ঠিক জায়গায় তোমায় ব'লে দিব।

পথে দুটি যুবকের সঙ্গে দেখা, তাঁহাদের তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ছাগলের যোগাড় হয়েছে কি না?—কারণ দু'দিন বাদেই মহাত্মাজী তাঁহার কাছে আসিবেন। ছেলে দুটি বলিলেন যে, একটি মাত্র জোগাড় হইয়াছে, আর হয় নাই। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, কাল ত তুমি শিলিগুড়ি যাচ্ছ, সেখান থেকে সোজা জলপাইগুড়ি যাবে, সেখানে গিয়ে তোমার ছাগল জোগাড় ক'রে পাঠাতে হবে।

এর পরেই আমি সে-দিনকার মত বিদায় হইলাম। আমায় বলিলেন, কাল সকাল নয়টায় অবশ্য এসো, মিসেস বেসান্তের কাছে আমায় নিয়ে যেতে হবে।

শেষ

পরের দিন সকালে নয়টায় 'ষ্টেপ এসাইডে' পৌছিলাম, তখন তিনি ভিতরে চা খাইতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, তুমি ব'স। চা-পান করিয়া বাহিরে আসিলেন। সামনে অনেকগুলি খবরের কাগজ পড়িয়া ছিল। মাদ্রাজ হইতে জনৈক মডারেট স্বরাজানীতি সমর্থন করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পড়িয়া শুনাইলেন। পরে বলিলেন, দেখবে, আজ যাঁরা আমাদের বিরোধী আছে তাঁরা আর কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের সাথে যোগ দিবেন।

এই সময় আমার সহযোগে সম্পাদিত "বাঙলা" সাপ্তাহিক পত্রখানার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে বলিলেন, ব্যক্তিগত আক্রমণ না ক'রে humourously যদি তোমরা লেখ, অনেক কাজ হবে।

এই সময় তাঁহার রিক্স আসিয়া পৌছিল, তিনি বাহিরে যাইবার জন্য জামা-কাপড় পরিয়া আসিলেন। আমরা বাহির হইতেছি, এমন সময় নাড়াজোলের কুমার ও তাঁহার সেক্রেটারী চারুবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রিক্স পিছন পিছন চলিতে লাগিল। তাঁহারাও আমাদের সঙ্গে চলিলেন। চৌরাস্তা হইতে কুমার বাহাদুর বিদায় লইলেন। আমি আর চারুবাবু তাঁহার সঙ্গে চলিলাম।

স্যানিটরিয়ামে ডাক্তার শিশিরবাবুর ওখানে মিসেস বেসান্ত উঠিয়াছেন। আমরা সেখানে চলিলাম। চৌরাস্তা হইতে সোজা পথ ধরিলাম। মিসেস



এনেছিলে সাথে ক'রে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করি গেলে দান।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর

বেসান্ত ও তাঁহার বিল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে চলিলেন। বলিলেন, দেখো, লীগ্ গিরই সপ্রু-শাস্ত্রী আমাদের দলে আসবেন। Village organisation-এ দেরী হইতেছে বলিয়া তিনি নিজে অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং এই কাজটি যাহাতে শীঘ্র আরম্ভ হয় সে জন্য নলিনীরঞ্জন সরকার ও কিরণশঙ্কর রায় মহাশয়দের বলিতে বলিলেন, আর কাজে দেরী করা সঙ্গত নয়। ইতিমধ্যে আমরা স্যানিটরিয়ামে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে প্রথমেই ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা, তাঁহাকে বলিলেন, আপনি এখানে কবে এলেন? আপনি না Recluse-এ ছিলেন?

ইতিমধ্যে শিশিরবাবু আসিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তখন প্রায় এগারটা। আমায় বলিলেন, তোমার ট্রেন দুটোয়, তোমার ত আর দেরী করা চলে না। তুমি জলপাইগুড়ি গিয়ে অবশ্য ছাগল জোগাড় করবে আর সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম ক'রে আমায় জানাবে। আমি বলিলাম, আমি জলপাইগুড়ি কাহার কাছে যাইব? তিনি বলিলেন, বার লাইব্রেরীতে গেলেই জোগাড় হবে। ডাক্তার প্রমথনাথ উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, আপনি ঠিক বলেছেন, বার লাইব্রেরীতে গেলেই ছাগল জোগাড় হবে। আমায় দেখাইয়া বলিলেন, একটির ত জোগাড় এখানেই হয়েছে, আর দুটি সেখানেই মিলবে।

তিনিও হাসিতে লাগিলেন।

আমি তখন প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। মাথায় হাত বুলাইয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলিলেন—তুমি এসো। টেলিগ্রাম করতে ভুলো না। এই বলিয়া তিনি শিশিরবাবুর সঙ্গে ভিতরে চলিয়া গেলেন!

সেই দিনই তাঁহার আদেশ মত আমি দার্জিলিঙ হইতে চলিয়া আসি এবং তাঁহার উপদেশ মত জলপাইগুড়ি গিয়া ছাগলের জোগাড় করিয়া টেলিগ্রাম করি।

তখন কে জানিত এই তাঁহার সহিত শেষ দেখা! তার দশদিন পরেই যখন এই নিদারুণ সংবাদ শুনি তখন আমরা কেহ বিশ্বাস করিতে পারি নাই।

এখনও মনে হয়, তিনি যেন কোথায় আছেন, তাঁহার সহাস্য মুখখানি আবার দেখিতে পাইব—যখন জাগিয়া থাকি, মনে হয় ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের ঘোরে যদি একবার দেখিতে পাইতাম! ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, মাঝে মাঝে মনে হয় দূর—অতিদূর হইতে তাঁহার সেই অমৃত পরশ যেন দেবতার আশীর্ব্বাদের মত অনুভব করি!

চিত্ত-স্মারক

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

(১)

ঝর্ণা সে এক এসেছিল, শুক্‌নো তৃষায় আতুর দেশে—
দুধের মতন কী মধুরিম ধারা!
তপন-তাপী মরুর বুকে, দয়ার মত যায় সে ভেসে—
সজল স্নেহে ফুটিয়ে সবুজ চারা!
মৃত্তিকার এই কল্পনাতে,
স্বর্গ-স্মৃতির গল্প গাঁথে,
এমন ভালোবাস্‌লে ধরায় আপ্‌নাকে সে বিলিয়ে দিয়ে,—
যেচেই নিলে ধূলো-মাটির কারা!
প্রেম-করুণার সুর-বাহারে দরদী প্রাণ মিলিয়ে দিয়ে,
কোন্ সায়রে আবার হলো হারা!

[২]

ঝঞ্ঝা সে এক এসেছিল ঝঞ্ঝনাতে ঝঙ্কারিয়া,
জানিয়ে দিয়ে জাগর-বাসর-তিথি,
ঝাঁপ্‌তালেতে ঝঞ্ঝা বেড়ে, শঙ্কা-ধনু টঙ্কারিয়া,
উপ্‌ড়ে ফেলে কণ্টকী-বন্‌বীথি!
টলিয়ে মৃত্যু জরার আসন
যৌবনে দ্যায় ধরার শাসন,
মৃত্যু-মাঝে জন্ম আনে, জীর্ণ যা তা চূর্ণ করে,—
—মরণ-বীণায় জীবন-মধুর গীতি!
অনাগতের শ্যামল স্বরে আকাশ-বাতাস তূর্ণ ভরে—
ধ্বংসে যে তার সৃষ্টি করাই রীতি!

[৩]

উল্কা সে এক এসেছিল ক্ষিপ্র-ভয়াল গতির স্রোতে,
বক্ষে নিয়ে তীব্র দহন-জ্বালা,
দীপ্ত হোলো সর্ব্ব-ভারত স্বপ্তি-হরণ আলোক-ব্রতে,
কণ্ঠে প'রে অগ্নি-ফুলের মালা!
আগুন-গাছে ফুল ফুটিয়ে,
তমস্বিনীর ভুল ছুটিয়ে—
সাঙ্গ করা যায় না ওরে, এমন দারুণ আচম্বিতে,
তরুণ প্রাণের জগৎ-গানের পালা!
তাই তো সে-জন সাজিয়ে গেছে বর্ষা-ব্যোমের চারি-ভিতে,
দৈত্য-দলন চিত্ত-বাজের ডালা!



ভাঙ্গিতে চাই কেন?

(অনুবাদক—শ্রীপঞ্চানন মজুমদার)

[গত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে নূতন শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত করিয়া গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষিত পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন বা স্বরাজ এই সংস্কার হইতে উদ্ভূত হইবে। কংগ্রেস সে কথা অস্বীকার করেন। কংগ্রেসের মতে এই নব প্রবর্ত্তিত শাসন-সংস্কারের মধ্যে স্বরাজের বীজ নাই। এই মতবাদ হইতেই অসহযোগ আন্দোলনের উৎপত্তি। যদিও দেশের শাসনভার কতক পরিমাণে দেশের বিশ্বস্ত প্রতিনিধিগণের নির্ব্বাচিত মন্ত্রিগণের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে, তথাপি কার্য্যতঃ এই মন্ত্রিগণের হাতে কোন প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। মন্ত্রিগণ যে কয়টী বিভাগের পরিচালন ভার পাইয়াছেন, তাহাতে প্রজার কল্যাণসাধনের উপযুক্ত কোন ক্ষমতা তাঁহাদের হাতে দেওয়া হয় নাই। তাঁহাদের অধীনস্থ কোন বিভাগে কোন প্রজাহিতকর অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিলেও তাঁহাদের সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইবার কোন উপায় নাই: কারণ রাজকোষের উপর তাঁহাদের কোন অধিকার নাই। শাসন-যন্ত্রটী গভর্ণমেণ্ট দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। এক অংশের কর্ত্তৃত্বভার এই মন্ত্রিগণের হাতে ও অপরাংশের কর্ত্তৃত্বভার গভর্ণমেণ্টের মনোনীত সদস্যগণের হাতে ন্যস্ত। বাহ্যতঃ কতকগুলি বিভাগের পরিচালন-ভার এই মন্ত্রিগণের হাতে থাকিলেও কার্য্যতঃ শাসন, সংরক্ষণ, উন্নতি বিষয়ক যাহা কিছু ক্ষমতা সে সমস্তই গভর্ণমেণ্টের অপরার্দ্ধে, অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টের মনোনীত সদস্যগণ পরিচালিত বিভাগে সম্পূর্ণভাবে অবস্থিত। এই দ্বৈতশাসন-প্রণালী দ্বারা ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজলাভের যোগ্যতা দান করা গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় এ কথা কংগ্রেস স্বীকার করেন না। এই জন্য কংগ্রেসের অন্তর্গত স্বরাজ্য দল এই দ্বৈতশাসন পদ্ধতির উচ্ছেদকল্পে মহাত্মা গান্ধীর অনভিপ্রায় সত্বেও কাউন্সিলে প্রবেশ করেন এবং অচিরে বাংলা ও মধ্যপ্রদেশে সাফল্য লাভ করেন। দেশে অনেক গণ্যমান্য লোক আছেন, যাঁহাদের বিশ্বাস তাহা সহজ—স্বরাজ্য দল এই দ্বৈতশাসন বিনষ্ট করিয়া দেশের অমঙ্গলই করিতেছেন, এই শাসন-সংস্কারে ভারতবাসী স্বায়ত্তশাসনের যে সামান্য অধিকার পাইয়াছে তাহাও স্বরাজদলের নির্ব্বুদ্ধিতায় বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করিবার জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বহুবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাঁহার শেষ চেষ্টা ও এ সম্বন্ধে তাঁহার শেষ উক্তি বাংলার কাউন্সিলে মন্ত্রিগণের বেতন মঞ্জুর করার প্রস্তাব উপলক্ষ্যে বিজয়গৌরবে ঘোষিত হয়। নিম্নে সেই সারগর্ভ, মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতার অনুবাদ প্রদত্ত হইল।]

আমার শরীর অসুস্থ ; তথাপি কাউন্সিলের সমক্ষে আজ যে প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে দুই একটী কথা না বলিয়া আমি থাকিতে পারিতেছি না। আমার কয়েক জন বন্ধু শ্রীযুক্ত ফজলুল্ হক্ মহাশয়ের বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি ও আমি বিষয়টী সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিক হইতে দেখি ; কিন্তু তাঁহার মতের ভিত্তি কি তাহা অনেকে কেন দেখিতে পান না তাহা আমি বুঝি না। আমি তাঁহার সহিত একমত নহি, তবুও তাঁহার মতবাদের ভিত্তি কি তাহা আমি বুঝি। দ্বৈতশাসন-পদ্ধতির পক্ষে আজ যে সমুদয় যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার মর্ম্ম এই—যে সকল বিভাগের কর্তৃত্ব মন্ত্রিগণের হাতে দেওয়া হইয়াছে এবং যাহা দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে পারা যায়, তাহা আমরা কেন দেশের উন্নতিকল্পে কাজে লাগাইব না ? কেন সাধারণ প্রজাগণের হিত-সাধনের, কৃষি-শিল্পীগণের কল্যাণ সাধনের সুযোগ নষ্ট করিব ? শ্রীযুক্ত ফজলুল্ হক্ মহাশয় বলিতে চান যে, মন্ত্রিগণ যতক্ষণ কায়েমী না হন, দেশের হিতসাধনের জন্য তাঁহাদের যে সামান্য ক্ষমতা আছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করার উপযুক্ত অবসর তাঁহারা যতক্ষণ না পান, ততক্ষণ সে চেষ্টা করা বৃথা। এ মতের তাৎপর্য্য আমি বুঝি, এবং আমার মত সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও, ইহাকে আমি সম্মানের সহিত আলোচনা করিতে প্রস্তুত। কিন্তু স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের মত আমার পক্ষে দুর্বোধ। তিনি কি বলিতে চান ? হক্ সাহেব দ্বৈতশাসনের উপকারিতায় বিশ্বাস করেন। মিত্র মহাশয়ের সে বিশ্বাস নাই ! সে কথা তিনি কখনও গোপন করেন নাই, আজ এই কাউন্সিলেও সে কথা বলিয়াছেন। তিনি যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন—"আমার বিবেচনায় দ্বৈতশাসন এ দেশে একদম নিষ্ফল হইয়াছে। আমার আরও বিশ্বাস যে, ভবিষ্যতে দ্বৈতশাসন পদ্ধতি চালান ক্রমেই বেশী দুরূহ হইয়া উঠিবে।" মিত্র মহাশয় মৌখিক সাক্ষ্য দিবার সময়ও বলিয়াছেন—"দ্বৈত-শাসন প্রণালী আমি পূর্ব্বেও চিরদিন অহিতকর বিবেচনা করিয়াছি।" তথাপি এখন তিনি এক অনির্দ্দেশ্য নীতির দোহাই পাড়িতেছেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, কোন্ নীতির বলে মানুষ বলিতে পারে—"আমি চিরদিন দ্বৈতশাসন অকল্যাণকর বিবেচনা করি, এ শাসন পদ্ধতিতে আমার কোন আস্থা নাই, এ যন্ত্র চালান চলে না, তথাপি ইহাকে চালাইবার ভার আমি লইতে প্রস্তুত ?" যদি আপনি দ্বৈতশাসন-যন্ত্র চালাইবার জন্য প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে ইহা হইতে আপনি যত সামান্যই হউক কিছু কল্যাণের আশা আছে মনে করেন মানিতে

হইবে। এবং যদি বিন্দুমাত্র কল্যাণের আশা আছে মনে করেন, তাহা হইলে কেন বলেন, এ শাসন পদ্ধতিতে আপনার আস্থা নাই—ইহা চালাইবার অযোগ্য? কোন্ যুক্তি বলে এরূপ অদ্ভুত পন্থা অবলম্বন করিতেছেন আমি বুঝি না। দ্বৈত-শাসন যদি সত্যই অকল্যাণকর বলিয়া আপনার ধারণা হইয়া থাকে, তাহা হইলে শুধু মুখের কথায় নয়, কার্য্যের দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করুন। আজ এই সম্পর্কে আপনারা যে ভোট দিবেন, গভর্ণমেণ্ট তাহাই আপনাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসের নিদর্শনরূপে গ্রহণ করিবেন। যদি বলেন, দ্বৈতশাসন অন্যায়, তথাপি 'যা পাওয়া যায়' এই হিসাবে ইহাতে বাধ সাধাইব—তাহা হইলে আমি বলিব, যদি কিছুমাত্র উপকারিতা থাকে—যাহা আমি সম্পূর্ণ অস্বীকার করি—তাহা হইলে ইহাকে নিন্দা করার অধিকার আপনার নাই। কিন্তু যদি ইহার উপকারিতা স্বীকার না করেন, যদি দ্বৈতশাসন দেশের পক্ষে অকল্যাণকর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে মানুষের মত জোর করিয়া বলুন—'দ্বৈতশাসনে আমার আস্থা নাই, ইহার সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব নাই, কোন যোগ নাই, আমি কোন আনুকূল্য করিতে চাই না, কারণ এ শাসন পদ্ধতি হইতে আমার দেশের কোন কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না।' মিত্র মহাশয় এ পন্থা অবলম্বন করিলে আমি তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই।

স্বরাজ্য দলের মতবাদ সম্বন্ধে শুধু আজ নয়, বহুবার এবং পুনঃ পুনঃ বহু সমালোচনার বাণ বর্ষিত হইয়াছে। আমার আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় যে, এই সমালোচকগণ ক্রমাগত নিষ্ফল সমালোচনা করিয়া ক্লান্তি বোধ করেন না। বার বার একই কথা বলায় মনে হয়, ইঁহারা স্বরাজ্য দলের মতবাদ ও সেই মতবাদের পোষকে যে সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে সে সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। ইঁহারা বলেন, স্বরাজ্য দলের একমাত্র কথা—'ধ্বংস কর, ধ্বংস কর। ধ্বংস ছাড়া এই দলের আর কোন কাজ নাই।' কিন্তু কথা এই, সমালোচকের দল স্বরাজ্যদলের কথা এত কম বোঝেন যে, ইঁহাদের সমালোচনার উত্তর দেওয়া আমি সহজ বিবেচনা করি না। আমরা ধ্বংস করিতে চাই কেন? কি ধ্বংস করিতে চাই? যে শাসন-পদ্ধতি আমার এ-দেশের কোনও মঙ্গল করে না, করিতে পারে না, আমরা তাহাকে ধ্বংস করিতে চাই। আমরা এই শাসন-যন্ত্র ভাঙ্গিতে চাই, কারণ আমাদের উদ্দেশ্য, ইহার স্থলে আমরা এমন যন্ত্র প্রস্তুত করিব, যাহার দ্বারা আমরা দেশের আপামরসাধারণের কল্যাণ সাধিত করিতে পারি। আপনারা কি শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে, বর্ত্তমান শাসন পদ্ধতির দ্বারা আমাদের দরিদ্র

দেশবাসিগণের কোনও উপকার করিতে পারেন? এই দ্বৈতশাসন-প্রণালী মানিয়া স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের মত যোগ্য ব্যক্তির মন্ত্রীত্বাধীনে দীর্ঘ তিন বৎসর কাজ করিয়া আপনারা কি দেখিয়াছেন? কি করিতে সমর্থ হইয়াছেন? দরিদ্র জনমণ্ডলীর কোন উপকার সাধন করিয়াছেন? তাহারা কি এতটুকুও বেশী শিক্ষালাভ করিয়াছে? এতটুকুও মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হইয়াছে? তাহাদের আর্থিক অবস্থার কি কোনও উন্নতি হইয়াছে? না,—এসকল কিছুই করিবার আপনাদের ক্ষমতা নাই তাহা আপনারাও জানেন; সুতরাং এই অবস্থায় আপনাদের দ্বারা দেশের কোনও উপকার হইবে না। মন্ত্রিগণের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে ইত্যাদি শুনা যায়; কিন্তু অর্থাভাবে সে ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পূর্ণ নিরর্থক। যে সকল বিভাগে জাতীয় উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে, জাতীয় জীবন-গঠণের সহায়তা করা যাইতে পারে, তাহা মন্ত্রীদের হাতে কিন্তু রাজকোষের উপর তাঁহাদের কোনও অধিকার নাই। সে অধিকার দেওয়া হইয়াছে গভর্ণমেণ্টের অপরার্দ্ধে—সরকারী সদস্যগণের হাতে। এই সদস্যগণ টাকা না দিয়া মন্ত্রিগণের দেশহিতকর সমস্ত অনুষ্ঠান নিবারিত করিতে পারেন। এই অবস্থায় দেশের লোক যদি মন্ত্রিগণকে দোষ দেয়, গভর্ণমেণ্ট অনায়াসে বলিতে পারেন—'এই দেখ বাপু, তোমাদের মন্ত্রীদের কাজ।' কি চমৎকার ব্যবস্থা! কেহ কেহ মনে করেন, এই অবস্থাতে গভর্ণমেণ্টের সহায়তা না করিলে যে সকল বিভাগের কর্ত্তৃত্বভার মন্ত্রিগণের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে গভর্ণমেণ্ট তাহা প্রত্যাহার করিতে পারেন। যদি প্রত্যাহার করেন তাহাতে দেশের কি ক্ষতি? গভর্ণমেণ্ট স্বহস্তে সেই সকল বিভাগের কাজ চালাইলে যদি দেশের কোনও উপকার না হয় তখন সেজন্য দেশ আর মন্ত্রিগণকে দায়ী করিতে পারিবে না। মন্ত্রিগণও মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারিবে—"আমাদের হাতে টাকা ছিল না, কাজেই দেশের কোনও উপকার করিবার শক্তি আমাদের ছিল না।" যাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি কেন ভাঙ্গিতে চাই, তাঁহাদের আমি বলিব, এই জীর্ণ অকর্ম্মণ্য ইষ্টকস্তূপ ভূমিসাৎ না করিলে তাহার স্থানে মনোরম সুদৃশ্য সৌধ নির্ম্মাণ করা অসম্ভব। নির্ম্মাণের আর অন্য কি উপায় থাকিতে পারে? ধ্বংস ধ্বংস বলিয়া যাঁহারা নাসিকা কুঞ্চিত করেন, আমার মনে হয়, তাঁহাদের কথার কোনও অর্থ নাই। কারণ আমরা শুধু ধ্বংসের জন্য ধ্বংস করিতে চাহি না। স্বরাজ্যদলের সভ্যগণ শুধু ধ্বংস করিতে চান, এ-কথা বলিলে তাঁহাদের উপর ঘোরতর অবমাননা প্রদর্শন করা হয়। তাঁহারা ভাঙ্গিতে চান

সত্য, কিন্তু সে কেবল গড়িবার জন্যই। বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের কাজে আমরা বাধা দিই, তাহার উদ্দেশ্য আমরা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত করিয়া, নূতন করিয়া গড়িবার অবসর খুঁজি। আমার মনে হয়, এ নীতি অতি সহজ, ইহা আমার বন্ধুগণের নিকট এত দুর্ব্বোধ বলিয়া কেন ঠেকে তাহা আমি জানি না! যে-কোন দেশের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়ুন দেখিবেন, ঠিক এই একই নিয়মে সেই সকল দেশে রাষ্ট্রীয় জীবন গঠিত হইয়াছে। অবাধ রাজশক্তিকে প্রতিহত না করিয়া কোনও দেশেরই প্রজাবর্গ রাষ্ট্রশক্তির অধিকারী হয় নাই। আমাদের দেশের শাসন পদ্ধতি অধর্ম্মমূলক ও অকল্যাণকর। যে উপায়ে ইংলণ্ডের প্রকৃতিপুঞ্জ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে যে উপায় ইংলণ্ডের পক্ষে ভাল বলিয়া বিবেচিত হয়, আশ্চর্য্যের বিষয় ঠিক সেই উপায় এই দেশে অবলম্বিত হইলে তাহা নিন্দিত হইবে। স্বরাজ্যদল তাহা অবলম্বন করিতেছে ইহাই কি তাহার কারণ?

কেহ কেহ আমাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি আপনাদের আর অধিক সময় লইতে ইচ্ছা করি না, কারণ আমি বিশেষ শ্রান্তি বোধ করিতেছি। প্রথমতঃ স্যার প্রভাস মিত্র ও আর কয়েকজন বক্তা সহযোগিতা-নীতির উচ্চ গুণগান করিয়াছেন। আমি সহস্রবার বলিয়াছি এবং এখনও পুনরায় বলিতেছি যে, আমি সহযোগিতার বিরোধী নহি; স্বরাজ্যদলের কোনও লোকই নহে। কিন্তু বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতির অধীনে গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করা অসম্ভব। সহযোগিতার অর্থ, কি দাসত্ব? গভর্ণমেণ্ট কি কিছু ত্যাগ করিতে প্রস্তুত? না, গভর্ণমেণ্ট সর্ব্ববিষয়ে নিজের জিদ বজায় রাখিবেন; কাজেই এই অবস্থায় সহযোগিতার অর্থ, ভারতবাসিগণ তাহাদের ইচ্ছা আকাঙ্খা ও নীতি জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্ববিষয়ে গভর্ণমেণ্টের নিকট মস্তক অবনত করে। আমি কিন্তু সহযোগিতার এই অর্থ জীবনে কখনও শিক্ষা করি নাই। গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে আমি প্রস্তুত কিন্তু আমি চাই, আপনারা আমাকে সত্য ও আন্তরিক সহযোগিতার পথ প্রদর্শন করুন। বর্ত্তমান অবস্থায় সে পথ আছে বলিয়া আমি মনে করি না। আমরা তখনই সহযোগিতা করিতে পারি, যখন আমরা দেখিব গভর্ণমেণ্টের সহিত আদান-প্রদান সম্ভব, যখন আমরা দেখিব গভর্ণমেণ্টের অন্তঃকরণে প্রজাগণের দুঃখ দৈন্য দূর করিবার জন্য সত্য ইচ্ছা জাগিয়াছে, যখন দেখিব, গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকার স্বীকার করিতে প্রস্তুত। বর্ত্তমানে আপনারা কি তাহার কোনও লক্ষণ দেখিতে পাইতেছেন?

আমি গভর্ণমেণ্টের সেরূপ কোন ইচ্ছার অস্তিত্ব অনুভব করি না—পক্ষান্তরে স্বাধীনতার আকাঙ্খায় ধ্বনিত প্রত্যেক কণ্ঠ রুদ্ধ, স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রত্যেক ক্ষুদ্র চেষ্টা নিন্দিত। আমাদের মুক্তির জন্য আমরা যাহা কিছু করিতে চাই, তাহা ঘৃণিত অপরাধ বলিয়া গণ্য। দেশের এই অবস্থা, আমাদের এই অবস্থা। এই অবস্থায় আপনারা আমাকে গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে বলেন? যাঁহারা বলেন আপনাদের সহিত সহযোগিতা করিতে তাঁহারা প্রস্তুত, আমার মনে হয়, তাঁহারা সত্য গোপন করেন। বর্ত্তমান অবস্থায় আন্তরিক সহযোগিতায় কোনও পথ নাই। স্বরাজ্যদল সহযোগিতার বিরুদ্ধ এ কথা মুখে আনিবেন না। যে-গভর্ণমেণ্ট সৎ, সম্মানার্হ এবং প্রজা-হিতরত, সেরূপ গভর্ণমেণ্টের সহিত স্বরাজ্যদল সহযোগিতা করিতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত।

আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—'দ্বৈতশাসন বিনষ্ট করিলে আমাদের কি লাভ হইবে?' ইহার উত্তরে পুরাকালে কৃষ্ণভক্ত জনৈক ঋষি তাঁহার শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, আজ আমার সেই কথা মনে পড়িতেছে। শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"কৃষ্ণ দর্শনে কি লাভ?" উত্তরে গুরু বলিয়াছিলেন —"কৃষ্ণ দর্শনই কৃষ্ণদর্শনের লাভ।" আমরা এরূপ রাষ্ট্রবিধান প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই যাহা প্রাণহীন হইবে না, যাহা আমাদের স্বাধীনতার সোপান হইবে, যাহার অধীনে ভারতবাসী ভিন্নদেশীয় হিতৈষিগণকে প্রকৃত বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে। আমি জোর করিয়া বলিব, আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় বিধানে সে সুযোগ নাই। আমাদের রাষ্ট্রীয়-জীবন আপদমস্তক অলীক অসত্যের ছায়ায় সমাচ্ছন্ন। দ্বৈতশাসন ধ্বংস করিতে পারিলে আমাদের এই লাভ হইবে যে, তাহার স্থলে আমরা সত্য সুন্দর রাষ্ট্র-বিধানের সৌধ নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইব। এ-কথার সত্যতা উপলব্ধি করা আপনাদের পক্ষে সহজ হইবে, যদি আপনারা আভিজাত্যের সঙ্কীর্ণ অভিমান বর্জ্জন করিয়া সমগ্র ভারতবাসীর মঙ্গল ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত হইতে পারেন। যদি আপনারা এই সহজ সত্য উপলব্ধি করিতে পারেন যে, রাষ্ট্র-বিধান বা গভর্ণমেণ্ট তখনই সার্থক, যখন তাহা জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি এবং জাতীয় কল্যাণের প্রতিষ্ঠানস্বরূপ। একথা স্বীকার করিলে দ্বৈতশাসন ধ্বংসের শুভ পরিণাম উপলব্ধি করা আপনাদের পক্ষে কঠিন হইবে না।

আর একটী প্রশ্ন উঠিয়াছে, দ্বৈতশাসন ধ্বংস করার পর আমরা কি করিতে চাই? উত্তর—তাহা অবস্থার পরিবর্ত্তন ও পরিণতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিবে। আমরা কি করিতে চাই—বা কি করিতে চাই না, সে সম্বন্ধে আমরা

কোনও কথা লুকাইতে চাই না। আজ যদি এই সভা প্রস্তাবিত বিষয় আমাদের বিপক্ষে মীমাংসা করেন তাহা হইলেও আমাদের মতের কোনও পরিবর্ত্তন হইবে না। আমাদের বিশ্বাস, বর্ত্তমান শাসন পদ্ধতি অন্যায় ও অধর্ম্মমূলক এবং কোন সৎলোক আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া এই গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে পারে না। স্বরাজ্যদলের এই সিদ্ধান্ত। এই জন্যই আজ আমি গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে আপত্তি করিতেছি। যদি প্রস্তাব গৃহীত না হয়, গভর্ণমেণ্টের সম্মুখে দুইটী পথ আছে। যে সকল বিভাগ মন্ত্রিগণের কর্ত্তৃত্বাধীনে ন্যস্ত করা হইয়াছে তাহাদিগের পরিচালন-ভার গভর্ণমেণ্ট স্বহস্তে লইতে পারেন। যদি করেন, তাহা আমাদের পক্ষে গৌরবজনক বিবেচনা করিব, কারণ এরূপ গভর্ণমেণ্ট চালাইবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও সমুদয় দোষভার গভর্ণমেণ্টের স্কন্ধে নিপতিত হইবে। এরূপ না করিয়া গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান সদস্য-সভা (Council) ভাঙ্গিয়া দিতেও পারেন। তাহা করিলে আমি সন্তুষ্টই হইব, কারণ তাহার ফলে—এবং সে কথা গভর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ জানেন—স্বরাজ্যদলের সভ্যগণ আরও অধিক সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হইয়া এই কাউন্সিলে ফিরিয়া আসিবেন। তাহাতে স্বরাজ্যদলের সুবিধা ও সুযোগ আরও বর্দ্ধিত হইবে। গভর্ণমেণ্ট যাহাই করুন, আমরা তাহাতে ভীত নহি;—আমাদের দেশবাসীগণ আমাদের সহায়। যাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে আমাকে এই সকল কথা বলিতে হইল, তাঁহারা মনে করেন, এই কাউন্সিলই আমাদের মুক্তির একমাত্র সোপান। তাহা নহে—আমি আজ জোর করিয়া বলিতেছি, তাহা নহে। আমাকে কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রক্ষণশীল গভর্ণমেণ্ট ভয় পাইয়া কিছু করিবার পাত্র নহেন। আমাদের রক্ষণশীল ইংরেজ শাসন-বিধাতাগণ ভয় পাইবেন কি না তাহা আমার আদৌ চিন্তার বিষয় নহে। ভয় দেখাইয়া তাঁহাদের নিকট কিছু আদায় করার প্রবৃত্তিও আমার নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চয়—এই রক্ষণশীল গভর্ণমেণ্টও বিলক্ষণ জানেন যে,—জাতীয় আকাঙ্ক্ষা বলিয়া যে অমরশক্তি জাতির হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে তাহার সাফল্য কোন রকমেই রোধ করা যায় না। গভর্ণমেণ্ট রক্ষণশীলই হউক, শ্রমিকই হউক বা উদারনীতিপরায়ণই হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। এ সকল নাম আমার নিকট অর্থশূন্য। ভারতবাসীর নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা ফলবতী করাই আমার একমাত্র কাজ। আমি আজ সেই আকাঙ্ক্ষা আপনাদের নিকট ঘোষণা করিতেছি। আপনারা জানিবেন, গভর্ণমেণ্টের নীতি-পদ্ধতি যাহাই হউক, ভারতবর্ষের মত মহৎ ও গৌরবময় দেশের মর্ম্মগত আকাঙ্ক্ষা রোধ করা পৃথিবীর কোনও গভর্ণমেণ্টের সাধ্যায়ত্ত নহে।

চিত্ত-তীর্থে

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার

সে দিন প্রথম তব শুভ আগমনী
গাহিল যে শুভ্রতায় পূর্ণ করি হিয়া
সঙ্গীত-সুরভি-ভরে ছাপাইয়া ধ্বনি,
শত সুর বাহিরিল শত দল দিয়া
সমীর-সোহাগ-মাখা স্নিগ্ধ পরশনে
সরসীর হৃদ্‌-পদ্ম হ'তে। গতি তার
জেগেছিল সিতাম্বরে তারার কম্পনে
সপ্তগ্রাম-ছায়াপথ দিয়া, স্তব্ধতার
ভাঙিয়া স্বপন ; কাশের প্রান্তরে তুলি
তরঙ্গ-মূর্চ্ছনা, সর্ব্ব উপবনে ঘুরি
শেফালীর কুঞ্জমাঝে আপনায় ভুলি
মূর্ত্ত করি তুলিল সে রাগের মাধুরী!
উন্মুখী অপরাজিতা সে সুরের শিখা
করে ধরি তব ভালে দিল জয়টীকা?
তারপর পলাশের বিলাস-নিকুঞ্জে
বাহিরিয়া মধুমত্ত মৃদু-লাস্য-গতি
প্রফুল্ল ফাল্গুন, কুঞ্জ হ'তে গিয়া কুঞ্জে
কোরকে কোরকে যবে জানাইল নতি
জাগাইল ফুল,—মুকুলিত বাসনার
বীথিকা হইতে দিগন্তঃপুরিকা-বধূ
উল্লসিত মনে বরমাল্য পুষ্পহার
পরাইল, পিয়াইল মরমের মধু।
সে দিন উঠিল বাজি ঝঙ্কারি যে সুর
পঞ্চমে পঞ্চমে তব কানন মুখরি,
কানায় কানায় করি হিয়া ভরপুর
সবারে বিলালে তৃপ্তি অন্তর উজরি।
সে সুর মানস ছাপি অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে
মিশাল অনন্ত-কোলে সাগর-সঙ্গীতে।

*

সহসা বহিয়া গেল বৈশাখের শাখে
শাখে জ্বলন্ত পাবক, দাহন-নিঃশ্বাস-

ভরা পশ্চিমের দুরন্ত ঝটিকা, পাকে
পাকে জড়াইল পত্রে পত্রে,—লোকত্রাণ
সে অগ্নি-আবর্ত্তে ঘুরেছিলে বীর সাজে।
মরণ গিয়াছে মরি সম্মুখ-সমরে
সুতীক্ষ্ণ শায়কে তব, বিনিময়ে লাজে
স্বীকার করিয়া গেছে সুবর্ণ অক্ষরে
তোমার জীবন-স্তম্ভে দীপ্ত লিপিকায়।
সে লিপি করিতে পাঠ যত দেশবাসী
দুর্গমের যাত্রাপথে অনন্ত আশায়
তব আতপত্র-তলে মিলেছিল আসি।
সে লিপি পড়িয়া কি গো পথের নির্দ্দেশ
পাবে না আমার এই অভিশপ্ত দেশ?

• •

আষাঢ়ের রাত্রি যবে সাশ্রুনেত্রে আসি
তোমার বিয়োগ-বার্ত্তা বহি দাঁড়াইল
শ্রবণ দুয়ারে, নয়নের নীরে ভাসি
ব্যথা-নত আশা-হত সবে সাড়া দিল
মূকের বুকের ভাষে—ডুবে গেল যেন
রিক্তের সম্বল-মাত্র ভরসার ভরা।
কাঙাল কাঙাল বুঝি হয় নাই হেন—
জীবন কঙ্কাল সম, প্রাণ আজি মরা!
তব মহামন্ত্রে জ্ঞান দাও, হে স্বরাট্,
ব্রত-উদ্যাপনে শক্তি দাও শক্তিধর,
ভোগের সন্ন্যাসী তুমি ত্যাগের সম্রাট,
সিদ্ধি লাগি প্রাণ দাও, সাধন-সুন্দর!
জানি না দেবতা কিবা তুমি অবতার—
হে মহামানব, লহ প্রণাম আমার।

দেশবন্ধু সম্বন্ধে যত রচনা পাইয়াছি তাহার সবগুলি আমাদের পক্ষে ছাপা সম্ভব হয় নাই। তবু যিনি যেভাবে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন আমরা যথাসম্ভব তাহাই [illegible] প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

—সম্পাদক, কল্লোল



কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত



তৃতীয় বর্ষ

পঞ্চম সংখ্যা

ভাদ্র, সন ১৩৩২ সাল

প্রতি সংখ্যা চারি আনা

মাশুলসহ বার্ষিক তিন টাকা আট আনা

সম্পাদক—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

সহ-সম্পাদক—শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ

কল্লোল পাবলিশিং হাউস

২৭ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পান্থ

(দার্শনিক-সন্ন্যাসী Schopenhauer-এর উদ্দেশে)

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১

জগতের বহির্দ্বারে পরিশ্রান্ত কে তুমি পথিক ?—
চলে না চরণযুগ, দাঁড়াইলে তোরণের তলে ;
যেতে মন নাহি সরে,—জীবন যে মরণ-অধিক !
মিটে না পিপাসা আর ধরণীর তিক্ত হলাহলে !
নেহারিলে উর্দ্ধাকাশে জ্যোতিষ্কের জ্যোতি অনিমিখ
শশিহীন অন্ধকারে !—অনির্ব্বাণ শীতল অনলে
জুড়াল না তপ্ত ভাল,—সুপ্তি নাই !—বিশ্ব বাঁধা স্বপন-শৃঙ্খলে !

২

যুগ-যুগান্তর ভ্রমি' ক্লিষ্ট জানু, দেহ পরিক্ষীণ—
সংসারের পুরীপ্রান্তে নামাইলে বাসনার ভার ;
লালসার স্থলপদ্ম মুঠিতলে বিবর্ণ মলিন,
রূপের রজতরাশি মনে হয় মৃত্তিকা অসার !
হাসি যে রঙীন ধূলা !—অশ্রু নয়, অভ্র সে কঠিন !
কীর্ত্তির কিরীট-মণি জঞ্জাল যে পথ-পরিখার !—
প্রাণ তবু জলে হের ধিকি-ধিকি,—ভস্মস্তূপে যেন সে অঙ্গার !

৩

জীবনের অগ্নিহোত্রে জাগিয়াছে তাই নিরন্তর
চিরমৃত্যু-নির্ব্বাণ-পিপাসা ! বেদনার বেদগান

গভীর উদাত্ত সুরে ভরিয়াছে ও চিত্ত-কুহর,
জন্মান্তর-জলধির অতিদূর কল্লোল সমান !
মৃত্যুর নেপথ্যে শুধু পুনর্ভব !—ভাবনা দুর্ভর !
লোকে-লোকে কল্পে-কল্পে কামনার দৃপ্ত অভিযান !
জন্ম-জরা-মৃত্যু-ভরা অবনীর নবনীতে এ কি বিষপান !

৪

হানিল ত্রিশূল বুকে মহাকাল ?—স্বপ্নভঙ্গে তুমি
শিহরি' উঠিলে হেরি' দীর্ণ-রেখা মর্ম্মের মর্ম্মরে !
বেদনার চেতনায় স্তব্ধ হ'ল সারা চিত্তভূমি—
সোমসূর্য্য-রথচক্র, নেমিহারা, অনন্ত অম্বরে,
জাগাইল মহাত্রাস !—সিন্ধুশেষে দিগন্তর চুমি'
অস্ত গেল বর্ণচ্ছটা ! অন্তহীন তুহিন-নির্ঝরে
ঢাকা প'ল ধরণীর শ্যামশোভা—বিধবা সে যৌবন সম্বরে !

৫

মানসের সরোবরে কলহংস ত্যজিল মৃণাল,
হেমপদ্ম মরে' গেল—সপ্তঋষি নিত্য ফিরে যায় !
ভাসে না সলিলে আর অপ্সরার মুক্ত কেশজাল,
পুষ্পহীন ধনু-তূণ—মনসিজ সভয়ে লুকায় !
সন্ধ্যা আসে ম্লানমুখ, নিশীথিনী গম্ভীর ভয়াল !—
দিবসের পরিশেষে তন্দ্রা আছে—নিদ্রা নাহি তায় !
আছে ঘোর দুঃস্বপন—সাথী নাই, নয়নের লোর সে মুছায় !

৬

সেই স্বপ্ন ভাঙ্গিবারে কি সাধনা তব, স্বপ্নহর !
কামনারে সত্য বলি' বির'চিলে তারি বিভীষিকা—
জীবন-দর্পণে তার নেহারিয়া মূরতি ভাস্বর,
আর্ত্ত-কণ্ঠে ফুকারিলে,—'নিখিলের এ মনোহারিকা
শূলহস্তা নৃমুণ্ডমালিনী !—তার প্রহারে জর্জ্জর

কাঁদিতেছে সপ্তলোক ! ভ্রান্ত পান্থ হেরি' মরীচিকা
ঘুরিতেছে দেহে-দেহে, ভালে পরি' নিত্য নব মরণের টীকা !

৭

রুধিয়া রুধির-ধর্ম্ম, হইবারে প্রাণহীন শিলা
করেছিলে জ্ঞানযোগ, এবারের দীর্ঘ পথ-বাসে !
নেহারিলে রুদ্ধমনে জীব-যজ্ঞে প্রকৃতির লীলা,
একাকী জাগিলে, যোগী ! জগতের নিদ্রা-অবকাশে !
স্বপ্ন দেখে চরাচর, শুধু তব দৃষ্টি অনাবিলা
সারারাত্রি নির্ণিমেষ !—নিরখিলে ব্যথারুদ্ধ-শ্বাসে,
সদ্যঃপাতি জীবনের বেপথু সে মরণের উদধি-উচ্ছ্বাসে !

৮

নভ নীল বেদনায় ! গূঢ়রক্ত হরিত-শ্যামল !
ধূসর উদাস কভু পৃথিবীর পঞ্জর-পাষাণ !
স্থলে জলে অন্তরীক্ষে আত্মরক্ষা করে জীবদল—
নিয়ত সংগ্রামশীল, বাজিতেছে কালের বিষাণ !
দণ্ডে ফুটি' দণ্ডে লয়—জীবাণুরা মরণ-পাগল !
সহস্র মৃত্যুর পরে জীবনের উড়িছে নিশান—
মৃত্যুর নাহিক শেষ, দুঃখময় জীবনের নাহি অবসান !

৯

ভাবনাকুঞ্চিত ভাল, ব্যথাতুর পরিশ্রান্ত হিয়া—
ললাটের স্বেদ মুছি' নেহারিলে স্তিমিতলোচন,
মানবের জীব-যাত্রা,—হেরিছে সে স্বপ্ন মোহনিয়া—
মৃত্যুর অমৃতরূপ, কামমুগ্ধ পশু অগণন !
স্মরি' হতভাগ্য নরে শুষ্ক আঁখি উঠে সরসিয়া—
আত্মঘাতী প্রেম তার ! জানে না সে কিসের কারণ
নারীর অধরে হায় পান করে কালকূট, মানে না বারণ !

১০

গ্রহ-তারা যে নিয়মে চিরদিন ভ্রমিছে আকাশ,
তারি বশে যৌবনের স্বেচ্ছা-বলি পরিণয়-যূপে—
বিধির কৌতুক একি! নিয়তির ক্রূর পরিহাস!
জীব-চক্র ঘুরাবারে মজে নর রমণীর রূপে!
তারি লাগি' হাস্যমুখ! নেত্রে তাই বিদ্যুৎ-বিভাস!
তবু হের, চায় চোর প্রেয়সীর চোখে চুপে চুপে!—
জানে মনে, আরো কত ভাগ্যহীনে মজাইবে জন্মজরা-কূপে!

১১

তাই তুমি পলাতক—রমণীরে কর নি প্রণতি?
প্রকৃতির লাস্যলীলা হেরিয়াছ শান্ত কুতূহলে!
প্রেমের দিয়েছ নাম—জীবধর্ম্ম, দেহের নিয়তি—
মোহের মঞ্জরী-ঝরা বিষ-বীজ ধরার অঞ্চলে!
হে সন্ন্যাসী, বাণী তব—বেদনার অপূর্ব্ব মূরতি—
মূরছি' পড়িছে নিত্য অনুরক্ত মোর চিত্ততলে,
কেমন আত্মীয় তুমি বুঝি না যে, তবু ভাসি নয়নাশ্রুজলে!

১২

যে স্বপ্ন হরণ তুমি করিবারে চাও, স্বপ্নহর!
তারি মায়া-মুগ্ধ আমি, দেহে মোর আকণ্ঠ পিপাসা!
মৃত্যুর মোহন-মন্ত্রে জীবনের প্রতিটি প্রহর
জপিছে আমার কানে সকরুণ মিনতির ভাষা!
নিষ্ফল কামনা মোরে করিয়াছে কল্প-নিশাচর!
চক্ষু বুজি' অদৃষ্টের সাথে আমি খেলিতেছি পাশা!
হেরে যাই বার বার, প্রাণে মোর জাগে তবু দুরন্ত দুরাশা!

১৩

সুন্দরী সে প্রকৃতিরে জানি আমি—মিথ্যা-সনাতনী!
সত্যেরে চাহি না তবু, সুন্দরের করি আরাধনা—

কটাক্ষ-ঈক্ষণ তার—হৃদয়ের বিশল্যকরণী !
স্বপনের মণিহারে হেরি তার সীমন্ত-রচনা !
নিপুণা নটিনী নাচে, অঙ্গে-অঙ্গে অপূর্ব্ব লাবণি !
স্বর্ণপাত্রে সুধারস, না সে বিষ ?—কে করে শোচনা !
পান করি সুনির্ভয়ে, মুচকিয়া হাসে যবে ললিত-লোচনা !

১৪

জানিতে চাহি না আমি কামনার শেষ কোথা আছে,
ব্যথায় বিবশ, তবু হোম করি জ্বালি' কামানল !—
এ দেহ ইন্ধন তায়—সেই সুখ ! নেত্রে মোর নাচে
উলঙ্গিনী ছিন্নমস্তা ! পাত্রে ঢালি লোহিত গরল !
মৃত্যু ভৃত্যরূপে আসি' ভয়ে ভয়ে পরসাদ যাচে !
মুহূর্ত্তের মধু লুটি—ছিন্ন করি' হৃদ্‌পদ্ম-দল !
যামিনীর ডাকিনীরা তাই হেরি' এক সাথে হাসে খল-খল !

১৫

চিনি বটে যৌবনের পুরোহিত প্রেম-দেবতারে,—
নারীরূপা প্রকৃতিরে ভালোবেসে বক্ষে লই টানি',
অনন্ত রহস্যময়ী স্বপ্নসখী চির-অচেনারে
মনে হয় চিনি যেন,—এ বিশ্বের সেই ঠাকুরাণী !
নেত্রে তার মৃত্যু-নীল !—অধরের হাসির বিথারে
বিস্মরণী রশ্মিরাগ ! কটিতলে জন্ম-রাজধানী !
উরসের অগ্নিগিরি সৃষ্টির উত্তাপ-উৎস !—জানি তাহা জানি।

১৬

এ ভব-ভবনে আমি অতিথি যে তাহারি উৎসবে !—
জন্ম-মৃত্যু—দুই দ্বারে দাঁড়াইয়া সে করে বন্দনা !
অশ্রুজলে স্নানোদক ঢালি' দেয় স্নেহের সৌরভে,
মুক্ত করি' কেশপাশ পাদপীঠ করে সে মার্জ্জনা !
নিঙাড়িয়া মর্ম্ম-মধু ওষ্ঠে ধরে অতুল গৌরবে !
পরশে চন্দন-রস ! মালাখানি দু'ভুজে রচনা !
আমারে তুষিবে বলি' প্রিয়া মোর ধূলি'পরে দেয় আলিপনা !

১৭

তবু সে মোহিনী! আহা, তাই বটে! হে জ্ঞানী বৈরাগী!
এ জ্ঞান কোথায় পেলে?—মর্ম্মে-মর্ম্মে তুমি মহাকবি!
রুদ্ধ প্রাণে কুপিতা সে প্রকৃতির অভিশাপভাগী—
কল্পনার নিশিযোগে আঁধারিলে মনের অটবী!
অভ্রভেদী চিত্ত-চূড়া মৃত্তিকার পরশ তেয়াগি'
উঠিয়াছে মেঘলোকে!—সেথা নাই নিশান্তের রবি!—
বিদ্যুৎ গর্জ্জন-গানে নিত্য সেথা নৃত্য করে ভাবনা-ভৈরবী!

১৮

কহ মোরে, জাতিস্মর! কবে তুমি করেছিলে পান
ধরণীর মৃৎপাত্রে রমণীর হৃদয়ের রস?
পূর্ব্বজন্ম-বিভীষিকা?—তারি ভার প্রেতের সমান
বক্ষে চাপি' স্মৃতিবিষে করিল কি বাসনা বিবশ?
ব্যথার চাতুরী শুধু?—মাধুরীতে ভরে নাই প্রাণ!
মধুরাতে মাধবীটি তুলে নিতে হ'ল না সাহস!
ওষ্ঠে হাসি, নেত্রে জল!—বুঝিলে না অপরূপ জ্বালার হরষ!

১৯

জীবনের দুঃখ-সুখ বার-বার ভুঞ্জিতে বাসনা—
অমৃত করে না লুব্ধ, মরণেরে বাসি আমি ভালো!
যাতনার হাহারবে পাই গান,—তৃষার্ত্ত রসনা
বলে, 'বন্ধু! উগ্র ওই সোমরস ঢালো, আরো ঢালো!'
তাই আমি রমণীর জায়া-রূপ করি উপাসনা—
এই চোখে আরবার না নিবিতে গোধূলির আলো,
আমারি নূতন দেহে, ওগো সখি, জীবনের দীপখানি জ্বালো!

২০

আর যদি নাই ফিরি—এ দুয়ারে না দিই চরণ!—'
অশ্রু আর হাসি মোর রেখে যাব তোমার ভবনে,

এই শোক এই সুখ নব-দেহে করিয়া বরণ
মন সে অমর হবে বেদনার নূতন বপনে!
পয়োধর-সুধা দানে ক্ষুধা তার করি' নিবারণ,
জীয়াইয়া তুলি' তারে পিপাসার জীবন্ত যৌবনে,
আবার জ্বালায়ে দিও বিষম-বাসনা-বহ্নি বৈশাখী-চুম্বনে!

২১

অন্তহীন পন্থচারী, দেহরথে করি আনাগোনা!—
জীবন-জাহ্নবী বহে নিরবধি শ্মশানের কূলে,
নিত্যকাল কুলু-কুলু কলধ্বনি যায় তার শোনা,
কভু রৌদ্র, কভু জ্যোৎস্না, কভু ঢাকা তিমির-দুকূলে!
জ্বলে দীপ, দোলে ছায়া, ঊর্ম্মিগুলি নাহি যায় গোণা,
ভেসে যাই তটপানে—এই দেখি, এই যাই ভুলে!
সুদ্ধরাতে তারকার পানে চেয়ে আঁখি মোর ঘুমে আসে ঢুলে!

২২

কোথা হ'তে আসি, কিবা কোথা যাই—কে কাজ স্মরণে?
চলিয়াছি—এই সুখ!—সঙ্গে চলে ওই গ্রহতারা!
ভয়, পাছে থেমে যাই গতিহীন অবশ চরণে,
নিকৃচক্র-অন্তরালে হয়ে যাই উদয়াস্ত-হারা!—
আমারে হারাই যদি!—যদি মরি সুচির-মরণে!
ব্যথা আর নাহি পাই—শেষ হয় নয়নের ধারা!—
বল, বল, হে সন্ন্যাসী! এ চেতনা চিরতরে হবে না ত' হারা?

২৩

এ পিপাসা সুমধুর—বল তুমি, বল, স্বপ্নহর!—
ঘুচিবে না?—মরণের শেষ নাই, বল আরবার!
তুমি ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা!—বলিয়াছ, এ দেহ অমর!—
সৃষ্টিমূলে আছে কাম, সেই কাম দুর্জ্জয় দুর্ব্বার!

যূপবদ্ধ পশু আমি ? ভরিতেছি মৃত্যুর খর্পর
তপ্ত শোণিতের ধারে ?—না, না, সে যে মধু'র উৎসার !
দুই হাতে শূন্য করি পূর্ণ সেই মধুচক্র প্রতি পূর্ণিমার !

২৪

তোমারে বেসেছি ভালো—কেন, জানি হে বীর মনীষী !
ব্যথায় বিমুখ তুমি, তবু তারে করেছ উদার !
করুণার সন্ধ্যাতারা !—মন্ত্রে তব সুশীতল নিশি
তাপশেষে মিটাইয়া দেয় বাদ গরল-সুধার !
স্বপ্ন আরো গাঢ় হয়, সত্য সাথে মিথ্যা যায় মিশি' !
মনে হয়, সীমাহীন পরিধি যে ক্ষুদ্র এ ক্ষুধার !—
পরম-আশ্বাসে প্রাণ পূর্ণ হয়, ধন্য মানি এ মর্ম-বিদার !

২৫

ক'বর প্রলাপ শুনি' হাসিতেছ ?—তাপস কঠোর !—
স্বপ্নহর ! স্বপ্ন কিগো টুটিয়াছে ? ধূলির ধরায়
কামনা হয়েছে ধূলি ? আর কভু নয়নের লোর
বহিবে না !—এড়ায়েছ চিরতরে জন্ম ও জরায় ?
ওগো আত্ম-অভিমানী ! এতবড় বেদনার ডোর
বুনিয়াছে যেই জন, মুক্তি তার হবে কি ত্বরায় ?
দুঃখের পূজারী যেই, প্রাণের মমতা তার সহসা ফুরায় ?

২৬

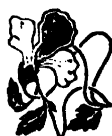
নিঃসঙ্গ হিমাদ্রি-চূড়ে জ্বলিয়াছে হর-কোপানল,
মদন হয়েছে ভস্ম, রতি কাঁদে গুমরি' গুমরি' !
উমা সে গিয়েছে ফিরে, অশ্রুচোখ ম্লান ছল-ছল—
ফুলগুলি ফেলে গেছে ঈশানের আসন-উপরি ;
আঁখিতে আঁকিয়া গেছে অধরোষ্ঠ—পক্ব বিম্বফল !
শ্মশানে পলায় যোগী তারি ভয়ে ধ্যান পরিহরি'—
বধূর দুকূলে তবু বাঘছাল বাঁধা প'ল—আহা, মরি মরি !

২৭

সত্য শুধু কামনাই—মিথ্যা চির-মরণ-পিপাসা!—
দেহহীন, স্নেহহীন, অশ্রুহীন বৈকুণ্ঠ-স্বপন!
যমদ্বারে বৈতরণী, সেথা নাই অমৃতের আশা,
ফিরে ফিরে আসি তাই, ধরা করে নিত্য নিমন্ত্রণ!
এই জন্ম-মালিকার—মৃত্যু সূচী, ডোর ভালোবাসা!—
প্রকৃতি যোগায় ফুল, নারী গাঁথে করিয়া চয়ন,
পুরুষ পরিয়া গলে, চেয়ে থাকে মুখে তার অতৃপ্ত-নয়ন!

২৮

তোমারে স্মরিনু আজ জীবনের সায়াহ্নবেলায়,
হে বিরাগী! হিন্দু বলি' পরিচয় দিলে বার-বার—
তুমি চিরমৃত্যু-লোভী, মোর ভয়—দেহের ভেলায়
কবে ডুবি, পারাপার করিতে এ জন্ম-পারাবার!
জানি না হিন্দুর কথা,—জানি শুধু, প্রাণের খেলায়
দুঃখেরে ডরে না কেহ, দুঃখে তবু হাসিছে সংসার!
তুমিও বলেছ তাই!—হে উদাসী! তাই তোমা করি নমস্কার



কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বাংলার আকাশে আবার নবীন নীল মেঘের মিছিল সুরু হল, কিন্তু বাংলার কাজরী পঞ্চাশৎ-এর কবি আর নেই। বর্ষার কবি বৃষ্টিকে সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন আবার বৃষ্টিকে সাথে ক'রে নিয়ে গিয়েছেন। জানিনা আজ বাংলার কোন্ ঘরে কোন্ ভাবুকের দু'নয়নে ব্যথার কুয়াসা জমে এল এই বিরহী আষাঢ়ের কাতর কান্না শুনে। আজ আষাঢ়কে অভিনন্দন দেবার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ নেই। মনে হয় বাংলা সত্যেন্দ্রনাথকে ভুলে আছে। তাই দেখি, পঁচিশে বৈশাখের জন্মতিথি-উৎসব শুধু শান্তিনিকেতনের শাল-শিশুর প্রাঙ্গন তলেই সারা হল, বাংলার ঘরে ঘরে সে উৎসবের বাতি জ্বল্‌ল না।

শুভ পঁচিশে বৈশাখটি সুন্দর ও পবিত্র করে তুল্‌বার জন্য বাংলার ঘরে ঘরে কল্যাণী অন্তঃপুরলক্ষ্মীরা সদ্যস্নান করে নব পুষ্পমঞ্জরীতে গৃহপ্রাঙ্গন বিভূষিত করল না, শঙ্খ-নির্ঘোষে পল্লীতে পল্লীতে কবির জন্মবার্তা প্রচার করলনা, আনন্দচ্ছটায় সমস্ত সংসারের বর্ণহীন বিরস আকাশকে রঙিয়ে দিল না। তাই যেমন দিনের পর দিন আসে তেমনি করেই লুকিয়ে লুকিয়ে দশুই আষাঢ় এসে চলে গেল। শুধু মর্ম্মাহত আকাশ একবার গুমরে উঠে স্তব্ধ হয়ে গেল। আর কিছু না; আমরা এখনো আমাদের দেশের সাহিত্যকে জাতীয় সম্পদ বলে ভাব্‌তে শিখিনি। আমরা দেশকে ভালবাসি, মিথ্যা কথা!

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার আলোচনা করবার ঠিক সময় এখনো আসে নি। কারো সাহিত্য সম্বন্ধে সত্য বিচার করতে হলে তাকে একটু দূর থেকে দেখ্‌তে হয়। বাংলার কবিতার এখন যা স্রোত চল্‌ছে সত্যেন্দ্রনাথ তার মধ্যে মিশে আছেন; তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার এখনো সময় হয়নি। তবে এটা খুব নিশ্চিন্তে বলা যেতে পারে যে বাংলা দেশে আধুনিক যুগে এমন কোন কবি জন্মগ্রহণ করেন নি, যিনি সত্যেন্দ্রনাথকে ডিঙ্গিয়ে রবীন্দ্রনাথের পাশে গিয়ে বস্‌তে পারেন। সত্যেন্দ্রনাথ যেমন একজন ওস্তাদ technician তেমনি প্রকাণ্ড আর্টিষ্ট। তাঁর

সমস্ত কবিতার সুর কথাকে উত্তীর্ণ করে অপরূপ পেয়েছে। ধ্বনিই তাঁর কবিতার প্রাণ, এবং এই ধ্বনিতেই তাঁর সমস্ত কবিতার impression। বাংলা ভাষায় পায়ের বেড়ী খুলে দিয়ে হাঁটতে শিখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ,তার পায়ে নূপুরও বেঁধে দিয়েছেন কিন্তু নাচতে শেখালেন সত্যেন্দ্র। আর সে নৃত্যের কী বিলাস! যেন বিশ্ব-উর্ব্বশী স্বর্গের সভায় তার যৌবন-পুষ্পিত তনুদেহলতা লীলায়িত ক'রে নৃত্য করছে! লোহা-ঢালাইর মত বাংলা সাহিত্যের কামার-শালায় রবীন্দ্রনাথ জড় শক্ত ভাষাকে গলিয়ে তাকে দিলেন স্রোত গতি বেগ, আর সত্যেন্দ্রনাথও সেই কারখানায় এই গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ ক'রে সেই পূর্ণ-উজানি স্রোতস্বতীকে শাখা প্রশাখায় প্রধাবিত ক'রে দিলেন। রবীন্দ্রনাথের পর আর কেউ বাংলা ভাষাকে এত নমনীয় ও এত গতিশীল করতে পারেনি, কথার ভাণ্ডারে ভাষাকে এত সম্পৎশালী কেউ করতে পারেনি সত্যেন্দ্রনাথ ছাড়া।

আমাদের দৈন্য দেশেও, ভাষায়ও। দেশের দৈন্য ঘুচল কি না জানিনা, কিন্তু ভাষার দৈন্য অনেকটা ঘুচেছে, বলতে পারি। আজ যে পরিপূর্ণ প্রচুর আবেগে বাংলা ভাষার গোমুখী বয়ে চল্‌ল সে এসে কোন্ মহাসাগরে লীন হবে কে জানে, কত শুষ্ক উষর মৃত্তিকা রসাপ্লুত হয়ে উঠবে তারও বা হিসাব কৈ? রবীন্দ্রনাথ যদি সমস্ত বাংলার মাথার মুকুট, সত্যেন্দ্রনাথ তার গলার মণিমালা!

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় আমার সহিষ্ণু সুশ্যামল বাংলার ম্লান আর্দ্র মাটির সৌরভ উঠছে! বাংলার কথায় সত্যেন্দ্রনাথের বুক ভরে আছে। বাংলার শ্রীকে এমন সহজ অনাড়ম্বর ও স্নিগ্ধ ক'রে আর কেউ আঁকেন নি।

মধুর চেয়েও আছে মধুর—
সে এই আমার দেশের মাটি,
আমার দেশের পথের ধূলা
খাঁটি সোণার চাইতে খাঁটি!
চন্দনেরি গন্ধভরা,—
শীতলকরা,—ক্লান্তি-হরা—
যেখানে তার অঙ্গ রাখি
সেখানটিতেই শীতল-পাটি!

* * *

মউল ফুলের মাল্য মাথায়,
লীলার কমল গন্ধে মাতায়,
পাঁয়জোরে তার লবঙ্গ ফুল
অঙ্গে বকুল আর দোপাটি।
নারিকেলের গোপন কোষে
অন্নপানী' জোগায় গো সে,
কোলভরা তার কনক ধানে
আটটি শীষে বাঁধা আটি।

সত্যেন্দ্রনাথের এই বাংলার কবিতাগুলি যেন নিরাভরণা কৃশতনু শ্যামা পল্লী-কিশোরীর মত! তার দুই চোখে সন্ধ্যার স্নেহ ভরা! বাংলার কথা বলতে সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ ও ভাব আহ্লাদে দুলে উঠছে মুহুর্মুহু। বাংলার ছেলেরা ছুটির পর হল্লা করতে করতে বাড়ী ফিরে চলেছে, তাদের চোখের জ্যোতি দেহের কান্তি তাদের স্ফূর্তির চাঞ্চল্য ও প্রজাপতির মত লঘু নৃত্য দেখে কবি আনন্দে বিভোর হচ্ছেন। এর মাঝে সত্যেন্দ্রনাথের প্রাণের সরসতার সন্ধান পাই। তিনি মুখ গোমরা করে, কখনো নিজের দেশ বা জাতিকে 'নির্জীব পঙ্গু ব'লে স্বীকার করেন নি, তাঁর সকল চিন্তায় ও কর্মে ছিল প্রচণ্ড নির্ভীকতা ও সুদুর্লভ তেজ। তিনি আনন্দবাদী ছিলেন। বিশ্বাসেই বিশ্বেশ্বর—এ তাঁরও জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। তাই তিনি নিজের দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিরদিন আশান্বিত ছিলেন। এবং এই আশার শঙ্খ বাজিয়ে গেছেন তিনি--

তবু ওরাই আশার খনি—
সবার আগে ওদের গণি,
পদ্ম-কোষের বজ্রমণি ওরাই ধ্রুব সুমঙ্গল;
আলাদিনের মায়ার প্রদীপ ওই আমাদের ছেলের দল।

তাঁর 'তাতারসির গানে' সত্যি সত্যিই রসের ভিয়ান উঠছে। বাঙলার প্রাণের মিষ্টি একটি গন্ধ তাতে পাচ্ছি—ঠিক তাতারসিরই মত! এমন মিঠা হাতের এত সুন্দর কবিতা আর পড়েছি ব'লে মনে হয় না।

মিঠার মিঠা! তাতারসি! তুমি কি মিষ্টি!
বিধাতার এই সৃষ্টি মাঝে বাঙালীর সৃষ্টি!
প্রথম শীতে রোদের মত
তপ্ত যত মিষ্টি তত,

মিত্তা তুমি পদ্ম-মধুর—অমৃত বৃষ্টি!
লোভের জিনিষ! তাতারসি! তুমি কি মিষ্টি!

* * *

রসের ভিয়ান্ বার করেছি আমরা বাঙালী,
রস তাতিয়ে তাতারসি, নলেন্ পাটালি।
রসের ভিয়ান্ হেথায় সুরু
মধুর রসের আমরা গুরু,
(আজ) তাতারসির জন্মদিনে ভাবছি তাই খালি—
আমরা আদিম সভ্য জাতি আমরা বাঙালী।

শব্দ-চয়ন ও সন্নিবেশে তাঁর মত নিপুণ রূপদক্ষ বড় দেখা যায় না, এক বিদেশী রসেটি ও সুইনবার্ণ ছাড়া। কয়েকটি কথার আঁচড় কেটে একটি পরিপূর্ণ সুন্দর ছবি চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলায় তাঁর অপূর্ব্ব ক্ষমতা।—'ভাদ্র-শ্রী' কবিতাটিতে বাংলার শ্যামল সুগন্ধ-স্নিগ্ধ রমণীয় মূর্ত্তিখানি কি অপরূপ করেই না ফুটেছে তাঁর নৃত্যশীল কয়েকটি কথার মোলায়েম রেখাপাতে!

ছাতিম গাছে দোল্না বেঁধে দুলছে কাদের মেয়েগুলি,
কেয়া-ফুলের রেণুর সাথে ইল্‌শে-গুঁড়ির কোলাকুলি;
আকাশ-পাড়ার শ্যাম-সায়রে যায় বলাকা জল-সহিতে,
ঝিল্লি বাজায় ঝাঁঝর, উলু দেয় দাদুরী মন মোহিতে!

তাঁর 'চিত্র-শরৎ' কবিতাটিও এমনি picturesque। দুটি সরল কথার আড়ালে একখানি ছবি টাঙানো—

তাল-বাকলের রেখায় রেখায় গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা,
সুর-বাহারের পর্দ্দা দিয়ে গড়ায় তরল সুরের পারা!
দিঘির জলে কোন্ পোটো আজ আঁশ ফেলে কী নক্সা দেখে,
শোল-পোনাদের তরুণ পিঠে আল্‌পনা সে যাচ্ছে এঁকে!

কবিতা যে শুধু কথার মিল নয়, সে যে একটা আর্ট, তা সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট। তাঁর সমস্ত ছন্দের বন্ধনের মধ্যে ভাবের মুক্তির ঐশ্বর্য্য নিহিত রয়েছে। এই সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার বড় পরিচয়! তাঁর 'কিশোরী' কবিতাটি ছন্দসম্পদে যতই সুন্দর হোক্ না কেন, কথার কেরামতি যতই থাকনা কেন, সব কিছু মিলে যে ঐ কবিতাটি একটি চমৎকার রস সৃষ্টি,

আর্ট, একখানি হীরার টুকরো তা দুটি চারটি লাইন পড়লেই বোঝা যায়। মনে হয় সত্যেন্দ্রনাথ শুধু কবিই নন, তিনি যেন water colour-এ ছবি আঁকছেন।

সে যে ঘাটে ঘট ভাষায় নিতি
অঙ্গ ধুয়ে সাঁঝের আগে,
সেথা পূর্ণিমা চাঁদ ডুব দিয়ে নায়,
চাঁদমালা তায় ভাস্‌তে থাকে!
জলের তলে খবর পেয়ে
বেরিয়ে আসে মৃণাল মেয়ে,
কলমী-লতা বাড়ায় বাহু
বাহুর পাশে বাঁধতে তাকে;
তার রূপের স্মৃতি জড়িয়ে বুকে
চাঁদের আলো ভাস্‌তে থাকে!
সে ধূপের ধোঁয়ায় চুলটি শুকায়,
বিনি সুতার হার সে গড়ে,
দোলন চাঁপার ননীর গায়ে
আলোর সোহাগ ছড়িয়ে পড়ে!
কানড়া ছাঁদে খোঁপা বাঁধে,
পিঠ-ঝাঁপা তার লুটায় কাঁধে,
তার কাজল দিতে চক্ষে আজো
চোখের পাতায় শিশির নড়ে;
সে বেনীতে দেয় বকুল মালা
বিনি সুতার হার সে গড়ে।

'ইলশে-গুঁড়ি' কবিতাটিতেও তাই। একটি অতি সাধারণ তুচ্ছ জিনিষকে কথার রঙে কি সুন্দর ক'রে ফুটিয়ে তোলা! সমস্ত ব্যাপারটি যেন একটি অপূর্ব্ব শ্রী লাভ করেছে। এই কবিতাটিতে আমরা শুধু লঘু একটি ছন্দ পাই না, এর মাঝেও আমরা শ্রীমতী বাংলার একটি অপরূপ রমণীয়তা দেখতে পাচ্ছি।

ইলশে-গুঁড়ি পরীর ঘুড়ি,—
কোথায় চলেছে?
ঝুমরো চুলে ইলশে গুঁড়ি
মুক্তো ফলেছে!

ধানের বনের চিংড়িগুলো
লাফিয়ে ওঠে বাড়িয়ে নূলো ;
ব্যাঙ ডাকে ওই গলাফুলো,
আকাশ গলেছে ;
বাঁশের পাতায় ঝিমোয় ঝিঁঝিঁ
বাদল চলেছে।

খুঁটিনাটি তুচ্ছ জিনিষগুলিকে রঙিয়ে তোলায় তাঁর ভারি ওস্তাদি। স্বামী স্ত্রীকে 'ওগো' বলে সম্বোধন করছে—সেই মিষ্টি ছোট্ট ডাকটির মাঝে কি মধুই না লুকিয়ে! সত্যেন্দ্রনাথ তাকে ভাষায় ফুটিয়ে তুললেন—

ঈষৎ মাঠো এবং ঈষৎ মিঠে
এই আমাদের অনেক দিনের 'ওগো',
চাষের ভাতে সদ্য ঘিয়ের ছিটে
মন কাড়িবার মস্ত বড় Rogue-ও!
ফুল-শেষে সেই 'মুখে-মুখের' 'ওগো',
রোগের শোকের দুঃখ-সুখের 'ওগো'!
সব বয়সের সকল রসে ঘেরা,—
নয় সে মোটেই এক পেশে এক চোখো,
বাংলা ভাষা সকল ভাষার সেরা
স্নিগ্ধ মধুর ডাকের সেরা 'ওগো!'

তাঁর 'সাড়ে চুয়াত্তর' কবিতাটির মধ্যেও একটি অনাড়ম্বর ভাবের লাবণ্য আছে। একটি অশিক্ষিতা পল্লীবধূ প্রবাসী স্বামীকে চিঠি লিখছে। চিঠিটির প্রতি ছত্রে একটি মধুর প্রীতি ও কৌতুকের নৃত্য—যা শুধু আর্দ্রহৃদয়া বাংলার মেয়ের মনেরই বাসিন্দা। সত্যেন্দ্রনাথ তাকেও ভাষায় জীবন্ত করেছেন।

কিন্তু তাঁর বাংলার প্রেমকে জাজ্বল্যমান দেখতে পাই,'গঙ্গা-হৃদি বঙ্গভূমিতে'। বাংলার প্রতিটি তৃণ প্রতিটি ধূলিকণা প্রতিটি জলবিন্দু তাঁর বুকে আনন্দের রোমাঞ্চ তুলছে। তিনি সেখানে বিশ্ব-বাংলার রাজরাজেশ্বরী মূর্তির ধ্যান করছেন সাধকের মতো—

'কামরূপা তুই কামাখ্যা তুই, দাক্ষায়নী দক্ষিণা,
বিশ্বরূপা! শক্তিরূপা! নও তুমি নও দায়হীনা!

'গম্'ধাতু তোর দেহের ধাতু গঙ্গা-হৃদি নামটি গো,
গতির ভুখে চলিস্ রুখে, বাংলা! সোনার তুই মৃগ!
চির যুবনমন্ত্র জানিস্ চিরযুগের রঙ্গিনী,
শিরীষ ফুলে পান্-বাটা তোর ফুল্ল কদম-অঙ্গিনী!

রবীন্দ্রনাথ যে প্রেমে বিভোর হয়ে 'সোনার-বাংলা'র গান গেয়েছিলেন, তেমনি সুরে সত্যেন্দ্রনাথও গেয়েছেন—

কোন্ দেশেতে তরুলতা—
সকল দেশের চাইতে শ্যামল?
কোন্ দেশেতে চল্‌তে গেলেই—
দল্‌তে হয় রে দূর্ব্বা কোমল?

বাংলার গঙ্গা পদ্মা মেঘনা তিস্তা দামোদর কর্ণফুলী সত্যেন্দ্রনাথের অন্তরে ভাবের মন্দাকিনী বইয়ে দিয়েছিল। সুদূর দার্জ্জিলিঙ থেকে সুরু করে' চট্টলা পর্য্যন্ত কিছুই তিনি বাদ দেন নি। চট্টলাকেও তিনি মহিমময়ীর মূর্ত্তিতে দেখ্‌ছেন—

সুন্দরী তুমি কোমলে-কঠিন, বিরাজিছ কিবা গৌরবে,
কঠিনতা তুমি ঢেকেছ সবুজে—সবুজ বনের সৌরভে;
নীলিম-শ্যামলে কঠিনে-কোমলে অপরূপ রূপ-স্ফূর্ত্তি গো,
চট্টলা! তুমি বঙ্গভূমির ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি গো!
হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমানের অভেদ-ধাত্রী চট্টলা!
কমনীয়া! তুমি সহ নমনীয়া রূপসী! কপাল-কুণ্ডলা!

কিন্তু বাংলার আর একটা রূপ আছে যা অনাহারে জীর্ণ, ভয়ে পাণ্ডুর, দারিদ্র্যে প্রপীড়িত, রোগে জর্জ্জর, কুসংস্কারে কলুষিত; সত্যেন্দ্রনাথ ধূলিধূসর বাংলার সেই মূর্ত্তিখানিও দেখেছেন, কিন্তু ভয় পান নি, আশা হারান নি। বাংলা তার শ্মশানের বুকে পঞ্চবটি রোপণ করেছে। শত বন্ধন দুঃখের মধ্যেও মুক্তবেণীর গঙ্গা বঙ্গের কূলে কূলে মুক্তি পরিবেশন করে যাচ্ছে। তাই তিনি লিখ্‌লেন—

মন্বন্তরে মরি নি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশীষে অমৃতের টীকা পরি'।
দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি;
আমাদের এই কুটীরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি;

ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,—
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।

সত্যেন্দ্রনাথের দেশপ্রীতি তাই বাংলার মানচিত্রেই আবদ্ধ নয়, সমগ্র ভারতকে সেই প্রেম আলিঙ্গন করেছে। এবং অবশেষে এই প্রীতি দেশ কাল পাত্র অতিক্রম ক'রে সমগ্র সৃষ্টির মাঝে এসে লীন হল। তিনি হিমালয়ের স্তব করছেন—, হিন্দুর হৃদি-গগনের চির উজ্জ্বল শশী বারাণসীর বন্দনা গান গেয়েছেন, যেখানে নব নব আত্মার সঙ্গে নব নব আত্মার নবীন আত্মীয়তা চলেছে।

শুভব্রত পূজারীর মত তিনি ভারতের আরতি করছেন চাণিক্য ছন্দের অনুসরণে। আবেগে তাঁর ভাষা গদ্‌গদ হয়ে উঠেছে। তাঁর এ ধরণের কবিতা-গুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় বৈদিক শাস্ত্রে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অপরিসীম। তিনি শুধু ভাবুক কবিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বহুবিদ্য পণ্ডিত, কৃতী সমালোচক। তিনি পুরোনো শাস্ত্র ও কাব্য মন্থন করে নূতন ভাবের অমৃত সৃষ্টি করেছেন। কাব্যে ও পুরাণে এমন কোন ছন্দ নেই যা সত্যেন্দ্রনাথ বাংলার সহজ দ্রুত গতিশীল ভাষায় গড়ে তোলেন নি। তাঁর ক্ষমতা এদিক দিয়ে কবিতায় ও ভাষায় অক্ষয় হয়ে থাকবে।

জয় জয় ভারত! বিশ্বের স্তুতা!
পৃথ্বীর তিলক! তীর্থভূতা!
মন্দার-মুকুল! নন্দন চ্যুতা! জয়! জয়!
পদ্মের মেলায় লক্ষ্মীর ছবি!
কাব্যের কবির তুই বান্ধবী!
নিষ্কাম্ যাগের নির্ম্মল হবি! জয়! জয়!

ভারতের বন্ধনের বেদনা নিরন্তর তাঁকে পীড়িত করেছে। তাই তিনি বন্দী ভারতের মুক্তির স্তোত্র রচনা করেছেন! সমসাময়িক কোন আন্দোলন বা প্রচেষ্টার কল্পনা থেকে সত্যেন্দ্রনাথ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে' রাখেন নি। এর মাঝে তাঁর প্রকাণ্ড সহানুভূতির সঞ্চয় দেখ্‌তে পাই। 'জালিনওয়ালের জ্বালা' তাঁরও মর্ম্ম স্পর্শ করেছিল। অন্যায়ের প্রতি তিনি চিরকাল ক্ষিপ্তের মত মুষল প্রয়োগ করেছেন এবং যা কিছু সত্য সুগম্ভীর বিশাল সুন্দর তার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল অনির্ব্বচনীয়। তাই তিনি বীর-বৈষ্ণব মহাত্মা গান্ধীকে

যে অপরূপ স্তোত্র রচনা করে' অভিনন্দন করেছেন, তাতে তাঁর নির্ম্মল আকাশের মত উদার মহান্ চরিত্রের, বৃহৎ স্পন্দমান প্রাণের, ও শক্তিমান্ নিরহঙ্কার প্রেমের পরিচয় পরিস্ফুট দেখ্‌তে পাই। এমন কবিতা বাংলা দেশের সাহিত্যে অতুলনীয়। কবির পরিচয় যদি কাব্যই ঘোষণা ক'রে থাকে, তবে সত্যেন্দ্রনাথ সত্যিসত্যিই সত্যেন্দ্র, দীপ্তিতে সে ভাস্কর, সীমাহীনতায় সে সমুদ্র, ঔদার্য্যে সে আকাশ!

কৃষাণের বেশে কে ও কৃশতনু—কৃশানু পুণ্যছবি,—
জগতের যাগে সত্যাগ্রহে ঢালিছে প্রাণের হবি!
কৌমুলি-কুলি করে কোলাকুলি কার সে পতাকা ঘেরি,
কার মৃদুবাণী ছাপাইয়া ওঠে গর্ব্বী গোরার ভেরী!
ক্রোর টাকা কার ভিক্ষা-ঝুলিতে, অপরূপ অবদান,
আগুলিয়া কারে ফেরে কোটি কোটি হিন্দু-মুসলমান!
আত্মার বলে কে পশু-বলের মগজে তাকায় ঝিঁ ঝিঁ
কে রে ও খর্ব্ব সর্ব্ব-পূজ্য? 'গান্ধিজী!' 'গান্ধিজী!

এবং এই দেশ পূজায় প্রণোদিত হয়ে তিনি দেশের কীর্ত্তিমান্ ত্যাগী বিদ্রোহী বৈরাগী সন্তানের যশোগাথা প্রচার ক'রে বেড়িয়েছেন। যে কেউ-ই 'ভয়-তরণের সুধা-ক্ষরণের উদাহরণের মালা' পুণ্য জ্যোতির আলায় জ্বালিয়ে রেখে গেছেন, তিনি তাঁদেরই গান গেয়েছেন প্রাণ ভরে'। তাঁর আদর্শ যে কত বড় সে যে হিমাচলের চূড়া চুম্বন করছে তা বুঝতে পাই তাঁর এই সমুদ্র-নির্ঘোষের মত উদাত্ত কবিতায়! তিলকের তিনি যে স্তোত্র রচনা করেছেন তাতে তাঁরও শক্তিব্যঞ্জক দৃঢ় দৃপ্ত কঠোর চরিত্রের পরিচয় পাই, যা ইস্পাতের মতই ধারালো ও কঠিন!

সাচ্চা পুরুষ-বাচ্চা সে যে মর্দ্দ তেজের ছবি—
নয় কোনদিন ত্রস্ত হুজুর ভয়ে;
ভিক্ষা-পন্থী নয় ভিখারী, নয় সে প্রসাদ-লোভী,
স্পষ্ট কথা বল্‌ত ঋজু হয়ে।
খোসামোদের তোষাখানায় ছিল না তার ঠাঁই,
আড়াই-কড়ার অনারেব্‌ল্ নয়,
সে ছিল লোক-মান্য তিলক, তুলনা তার নাই,
জাতীয়তার তিলক সে অক্ষয়!

তিনি এই সুরে গোখ্‌লের গান গেয়েছেন। যে কেউ চরিত্রে তেজে সাধনায় অমরত্বের অমৃত পান করেছেন তাঁদের সবাইকে তিনি প্রণাম করেছেন। রামমোহন নিবেদিতা বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর জগদীশচন্দ্র মধুসূদন দীনবন্ধু অক্ষয়কুমার দ্বিজেন্দ্রলাল গোবিন্দদাস সবাই তাঁর চিত্ত-তীর্থে আসন পেয়েছেন। তিনি বৈদীভূমক ছন্দে রাজর্ষি রামমোহনকে বন্দনা করেছেন। বিদেশিনী নিবেদিতা তাঁর দেবতার-দেওয়া পুণ্যবতী ভগিনী ছিলেন। 'বীরসিংহের সিংহশিশু'র তর্পণ করতে তিনি গাইলেন—

সেই যে চটি—দেশী চটি—বুটের বাড়া ধন,
খুঁজ্‌ব তারে, আন্‌ব তারে, এই আমাদের পণ ;
সোনার পিঁড়েয় রাখ্‌ব তারে, থাক্‌ব প্রতীক্ষায়,
আনন্দহীন বঙ্গভূমির বিপুল নন্দিগাঁয়,

'সাগরে যে অগ্নি থাকে' সত্যেন্দ্রনাথই প্রথমে তা আবিষ্কার করলেন বিদ্যাসাগরের মধ্যে। জগদীশচন্দ্রের স্তুতি গানে তিনি গাইলেন—

মরমী তুমি চরম-খোঁজা মরম শুধু খুঁজেছ গো,
লজ্জাবতী লতার কি যে সরম তাহা বুঝেছ গো ;
অজানা রাজপুত্র সম জড়ের দেশে একলাটি
পরশিয়া নৃপ-বালার ভালে ছোঁয়ালে এ কি হেমকাঠি !
হিম যা ছিল তপ্ত হ'ল মেলিল আঁখি মূর্চ্ছিত,
নূতন পরিচয়ের নব চন্দনেতে চর্চ্চিত !
বনের পরী তুলিল হাই জাগিল হাওয়া নিশ্বাসে,
জড়েরা বলে মনের কথা তোমার প্রতি বিশ্বাসে।

কিন্তু স্বদেশের মহাত্মাদেরই তিনি পূজা করেন নি খালি, পৃথিবীর যে কেউ গৌরবে ও ঔজ্জ্বল্যে মধ্যাহ্নমার্তণ্ডের মত উচ্চতম আকাশ-শিখরে আরোহণ করতে পেরেছেন তাঁদের সবারই কাছে তিনি বিনীত ভক্তের মত কাব্যের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। ম্যাক্‌সুইনির মৃত্যুতে তিনি গাইলেন—

কে তাহারে বন্দী করে ? ফন্দী এঁটে বাঁধ্‌বে কে সিন্ধুকে ?
মুক্ত পুরুষ, মুক্তি তাহার হাতের মুঠায় মুক্তো হ'য়ে আছে ;
'মুক্ত হবই' ! এ কথা যে বল্‌তে পারে জোর করে' বুক ঠুকে—
পাষাণ-কারা তাদের গৃহ, লোহার শিকল ব্যর্থ যে তার কাছে।

তিনি মৃত্যুঞ্জয় কবি মনীষি টলস্টয়, অগ্নি-সত্ত্ব তেজস্বী বিশ্ববন্ধু উইলিয়ম্‌ ষ্টেড্‌-এর

আরাধনা করেছেন। তাই তিনি 'সাত মনীষির বন্দনীয় রাখালের' জন্মদিনে ক্রুসের কাঁটার জ্বালা সহ্য করে' যে অপরূপ স্তব রচনা করেছেন তাতে তাঁর নির্ম্মুক্ত পবিত্র স্বচ্ছ চিত্তখানি দর্পণের মত প্রতিভাত হচ্ছে। তাঁর মাঝে সঙ্কীর্ণতার কুণ্ঠাক্লেদ ছিল না, তিনি ছিলেন বন্ধহীন বাউল বৈরাগী।

তাই ত তোমার জন্মদিনের নাম দিয়েছি আমরা বড়দিন,
স্মরণে যার হয় বড় প্রাণ, হয় মহীয়ান চিত্ত স্বার্থলীন
আমরা তোমায় ভালবাসি, ভক্তি করি আমরা অখৃষ্টান,
তোমার সঙ্গে যোগ যে আছে, এই এসিয়ার আছে নাড়ীর টান।
ওখানে ঠাঁই নাই প্রভু আর, এই এসিয়ায় দাঁড়াও সরে' এসে—
বুদ্ধ জনক-কবীর-নানক-নিমাই-নিতাই-শুক-সনকের দেশে ;
ভাব-সাধনার এই ভুবনে এস তোমার নূতন বাণী লয়ে,
বিরাজ করো ভারত-হিয়ার ভক্ত মালে নূতন মণি হয়ে।

এবং এই ঋষির ঋষি মহাপ্রাণ খৃষ্ট নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করলেন দৈর্ণ্যগূঢ় ভিক্ষু এই মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে।

সত্যেন্দ্রনাথের দেশপ্রীতির মধ্যে অন্ধতা ছিল না। তাই যা কিছু কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, স্পন্দনের অভাবে নিবীর্য্য নিশ্চেতন, যা কিছু চিত্তের সঙ্কীর্ণতায় অন্ধ ও সীমাবদ্ধ, তার প্রতি তাঁর বিদ্রোহ ছিল প্রচণ্ড ও প্রচুর! রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন—

অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তার পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জ্জুনের অগ্নিবাণ সম,
তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্ম্মল নির্ম্মম,
করুণ কোমল।

সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে পাই প্রাচুর্য্য, তেজ, দৃঢ়তা, শক্তি সংযম যা আর কোন কবির মধ্যে পাই না। তাঁর বিদ্রোহের মধ্যে মাতলামি নেই, তা কেন্দ্রীভূত শক্তির সাহায্যে সংযত ও স্থির ; আর এই সংযমই আর্ট ও impression—এর গোড়ার কথা। শক্তির পরিস্ফুরণই তাঁর কবিতার বিশেষত্ব। অন্যায়কে তিনি চিরকাল শাসন করেছেন। তাই 'মৃত্যুস্বয়ম্বরে' তিনি লিখ্‌লেন—

হায় অভাগ্য! বাংলা দেশের সমাজ-বিধির তুল্য নাই,
কুলটাদের মূল্য আছে কুলবালার মূল্য নাই!

…, কিশোর যারা প্রাণের টানে চাইবে তারা কিশোরী,
হায় কি পাপে রয়েছে দেশ বিধির বিধান বিসরি?
… যেদিন দময়ন্তী করেন স্বয়ম্বরে মাল্যদান,
তখন নারীর দেবতা হতে নরের প্রতি অধিক টান;
আমরা এখন দিচ্ছি ভেঙে নারীর প্রাণের সেই মোহ,
পুরুষ নারীর মাঝে এখন কুবেররূপী কুগ্রহ।

সমাজের অন্যায় উৎপীড়ন তিনি সইতে পারতেন না। রঘুনন্দনের মৌলিকত্ব-হীন উদ্বহ-সংহিতায় যে নির্জ্জলা একাদশীর বিধান রয়েছে তাতে তিনি ব্যাখ্যা-কারের নীচতা ও নিষ্ঠুরত্বেরই প্রমাণ দেখছেন। তাই তিনি বাংলার ছেলেদের ডাক্‌ছেন—

কে নেবে এই পুণ্যব্রত? কে হবে মার পুত্র গো?
একাদশীর তেপান্তরে খুলবে কে জলসত্র গো?
কে নেবে মন্দারের মালা মাতৃজাতির আশীর্ব্বাদ?
আশায় আছি দাঁড়িয়ে যে তার করতে বিজয়-শঙ্খনাদ।

সত্যেন্দ্রনাথ অভেদের বেদ রচনা করেছেন। জাতির বন্ধন তিনি অতিক্রম করতে চেয়েছেন। 'গো-ত্র আঁকড়ি গরুরা থাকুক, মানুষ মিলুক মানুষ সাথে!' জন্মের সঙ্গে যে জাতির সম্বন্ধ, সেখানে জাতির বড়াই কোথায়? জন্ম ত একটা accident। মনুষ্যত্বই জাতীয়ত্বের মাপকাঠি। পৈতা ত মোটে সিকি পয়সার সূতো। তাই তিনি আশার বাণী প্রচার করে গেছেন prophet-এর-মতো যে—

আসিছে সেদিন আসিছে সেদিন
চারি মহাদেশ মিলিবে যবে,
যেই দিন মহা-মানব-ধর্ম্মে
মনুর ধর্ম্ম বিলীন হবে।

Patel bill পাশ করবার সময় টিকি-পন্থী সনাতনীদের যে শিবা-হল্লোড় উঠেছিল তার ব্যঙ্গ করে তিনি একটী অতি comic কবিতা রচনা করেছেন 'পাতিল প্রমাদ বা প্রমত্ত প্রতিবাদ'। এমন ধারালো ও বুদ্ধিমান্ humour খুব দুর্লভ। তিনি বারাণসীকে উল্লেখ করে বল্লেন—

তুমি কি কখনো করিতে পার গো শুচি অশুচির ভেদ?
তুমি যে জেনেছ চরাচর ব্যাপী চির জনমের বেদ।

ধূম হইতে ব্রহ্ম অবধি অভেদ বলেছ তুমি,—

ভেদের গণ্ডী তুমি রাখিয়োনা, অয়ি বারাণসী তুমি!

তাই তিনি মেথরের মধ্যে দেবতাকে দেখলেন। নকর কুণ্ডুর মধ্যে তিনি খৃষ্টকে দেখলেন; যে পক্ষে অগৌরব মানে নি, অস্পৃশ্য মেথরকে বিপন্ন দেখে তার উদ্ধারের জন্ম অকাতরে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিল।

রবীন্দ্রনাথ যে আনন্দে বলাকায় যৌবনের অর্চ্চনা করেছেন, সেই আনন্দে সত্যেন্দ্রনাথও সবুজের ছত্রতলে যৌবনকে রাজটীকা পরিয়েছেন। যে পাতা শীতে জরায় পীত হয়ে গেছে, যা কিছু শুকনো নিস্তেজ নিশ্চেষ্ট তাকে তিনি ভাল বাসেন নি। তিনি সবুজ পাতার গান গেয়েছেন। যারা কাঁচা সাঁচা, যাদের মরা বাঁচার খেয়াল নেই, যারা ঝোড়ো হাওয়ার রুদ্রতালকে ভয় করে না, যারা সতেজ প্রাণের দীপান্বিতা জ্বেলে বসেছে, তাদেরই জয়গাথা তিনি রচনা করলেন। জগৎ মোক্ষলাভের যন্ত্র নয়।—

নয় সে শুধুই তত্ত্বকথা নয় সে মাত্র মত্ততা,

তরুণ যাহা তাহাই তথ্য,—বল্‌ছে সবুজপত্র তা।

কিশলয়ের হাস্তে তরুণ হয়ে তরুর দল তরুণ হতে ডাকছে। কুঞ্জবিলাসী দখিন হাওয়া তার ফুঁয়ে তুলোট-পুঁথি উড়িয়ে দিচ্ছে। এর মাঝে সাল-পহেলীতে তিনি নবীনকে আহ্বান করছেন—বৃহৎ প্রাণের রসদ জোগাতে—

জানিয়ে দে রে এই প্রভাতের নবীন প্রভার দেবতাকে

নূতন হবার শক্তি চিরন্তন,

ডুবিয়ে দেরে অনুশোচন যা কিছু আক্ষেপ থাকে—

আজকে ক্ষ্যাপা সব দে বিসর্জ্জন!

তাঁর 'জাগৃহি' কবিতাতেও এই নবযৌবনের স্তোত্র। পুরাতনের জীর্ণ স্তম্ভ বিদীর্ণ ক'রে যৌবনের সিংহমূর্ত্তি বাইরে আসছেন। সর্ষেপারা বটের বীজে ভবিষ্যতের বনস্পতি বাস করছে। পুরাতনের ডিম টুটে নূতন পাখী আঁখির আলোক দিয়ে অন্ধকারে আঁখি ফোটাচ্ছে—তারই জয়গান! তিনি জন্মাষ্টমী কবিতায় ভগ্ন-পাণ্ডু পাণ্ডবের বন্ধু-জনার্দ্দনকে অভিনন্দন দিচ্ছেন, রাসনৃত্যে যৌবনের আনন্দ হিল্লোলিত করে' লোহার ভয়ঙ্কর কবাট বিচূর্ণ করে আসতে। তাই তিনি সিন্ধু-দোলায় বিরাট্ বুকের স্পন্দনে দুল্‌বার জন্যে বন্ধুদের আহ্বান করছেন বন্দরে দাঁড়ানো ওই জাহাজে চ'ড়ে লক্ষীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়্‌তে। কাঁটার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে তিনি যৌবনকে ডাক্‌ছেন—শত অপথ আপদের মধ্যে।

মহেশ্বরের কটাক্ষেতে কাঁটা যে কুসুম শয্যা হয়। যে কাঁটাকে কোল দিতে পারে সেই ত শিব, নিষ্কণ্টক! ডোবা-জাহাজ তুলবার প্রতিজ্ঞা ত খালি যৌবনেরই। গাঁই-গোত্রের গ্রাম্য স্বার্থ ঘুচাবে ত এ যৌবনই। যমুনার কালো জলের সঙ্গে গঙ্গাজলের যে কোলাকুলি, তা শুধু জলে জোয়ার এসেছিল বলেই—যৌবনের জোয়ার!

আমরা এতক্ষণ ভাবুকতার দিক দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথকে বুঝবার চেষ্টা করেছি। এখন তাঁর ছন্দের বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা করব। সত্যেন্দ্রনাথ সারা সাহিত্য-জীবন ধরে' ছন্দের বোঝা ঘাড়ে করে বেড়িয়েছেন—এ অনেকের অভিযোগ, জানি। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দের বন্ধন ঠিক নদীর দুই পারে স্থির তীরের বন্ধনের মতন। ইন্দ্রিয়ের বেদীর ওপরই তিনি অতীন্দ্রিয়ের মন্দির রচনা করেছেন। নদী যেমন দুই কূলের সীমা বজায় রেখে আপন আনন্দে অভিসারিকা নটীর মত চলেছে দূরের যাত্রায় নব নব ছন্দে, তেমনি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা ছন্দের ক্রন্দনে অহরহ সেই যাত্রার আনন্দ বিচ্ছুরিত করে' চলেছে। তাঁর সমস্ত কবিতা চলছে। কথার তকমা এঁটে তাঁর ভাবগুলি সেপাইর মত সঙীন্ উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়নি। তিনি ব'সে ব'সে মৃদঙ্ করতাল বাজাচ্ছেন না। তিনি বাউল হয়ে চলেছেন। কখনো বাজাচ্ছেন বাঁশী, কখনো বা একতারা, কখনো বা খঞ্জনী কখনো বা নূপুর। তিনি তাঁর কবিতাকে নদীর পারে নৌকার মত বেঁধে রাখেন নি, তিনি তাঁর না' ভাসিয়ে দিয়েছেন। ছন্দ কৃত্রিমতা হতে পারে, কিন্তু তার ভেতরেই স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি, মুক্তির আনন্দ। তিনি ভাবকে ছন্দের কারাগারে বন্দী ক'রে রেখেছেন। তিনি শুধু নীরস ছন্দের ভেল্কীবাজী দেখাতেই কবিতা লেখেন নি, তাঁর অন্তরে যে রসের বেদনা বা অসীমের কাকুতি উঠেছিল সেই অরূপকে তিনি রূপ দিয়েছেন ছন্দে। ভাবের প্রতিমা হচ্ছে এই ছন্দ। পাখী যেমন উড়ে চলে নীড় ছেড়ে আকাশের পানে পাখার ঝাপট্ দিতে দিতে, সত্যেন্দ্র-নাথের কবিতাও তেমনি ছন্দের ক্রন্দন-কলরোল তুলে ছুটে চলেছে ভাবের রথে চড়ে' সেই নিত্যকালের ও নিত্যলোকের আদিম রসিকের সন্ধানে। তিনি শুধু ছন্দের পটুয়া ছিলেন না, তিনি ভাবেরই উপাসনা করেছেন ছন্দের সৌন্দর্য্যে।

আর এই ছন্দের বর্ণচ্ছটায় তিনি বাংলাভাষাকে অপরূপ সম্পৎশালী করেছেন। তার হাতে পরিয়েছেন কঙ্কন ও পায়ে বেঁধেছেন মঞ্জীর। বাংলাভাষা তাই ছন্দের অহঙ্কারে পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যের সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভের দাবী করতে পারছে।

আধুনিক যুগে যাঁরা বাংলায় কবিতা লিখ্‌ছেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের চিহ্ন প্রতিমুহূর্ত্তে পরিলক্ষিত হচ্ছে। সত্যেন্দ্রনাথও রবীন্দ্রনাথের পদতলে বসে' রসের দীক্ষা নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের গুরু, তবে ছন্দের এই স্পন্দনের জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথকেই গুরু স্বীকার ক'রে এসেছেন! বাংলার সাহিত্য-আকাশে এই দুটি সূর্য্য চন্দ্র অক্ষয় হয়ে জ্বল্‌বে।

আগেই বলেছি সত্যেন্দ্রনাথের সমস্ত ছন্দের মধ্যেই যাত্রার আনন্দ বাজ্‌ছে। সব চল্‌ছে। কেউই থেমে রয় নি। তাই তিনি গিরি দরী-বিহারিনী চঞ্চলনৃত্যা ঝর্ণায় এই যাত্রার আনন্দগান শুন্‌ছেন—যেন ঝর্ণা উতরোল সিন্ধুর সন্ধানে যাত্রা করেছে।

ঝর্ণা! ঝর্ণা! সুন্দরী ঝর্ণা!
তরলিত চন্দ্রিকা! চন্দন-বর্ণা!
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিকে স্বর্ণে,
গিরি মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,
তনু ভরি যৌবন, তাপসী অপর্ণা!
ঝর্ণা!

পাল্কীর গানেও চলার ছন্দ বেজে চলেছে। ছয় বেহারা পাল্কী নিয়ে যেমন দ্রুত তালে ছোটে, তাঁর কবিতাও তেম্‌নি তালে ছুটেছে; যথা—

পেরজা পতি
হলুদ বরণ,—
শশার ফুলে
রাখ্‌ছে চরণ!
কার বহুড়ি
বাসন মাজে?—
পুকুর ঘাটে
ব্যস্ত কাজে;—
এঁটো হাতেই
হাতের পোঁছায়
গায়ের মাথায়
কাপড় গোছায়!

যখন পাল্কী বইতে বইতে বেয়ারারা ক্লান্ত হয়ে এল, তখন তাদের সেই ক্লান্তির স্বরটি অবধি তিনি কথায় ধরে ফেল্‌লেন—

পাল্কী চলে রে!
অঙ্গ ঢলে রে!
আর দেরী কত?
আরো কত দূর?
"আর দূর কি গো?
বুড়ো শিবপুর
ওই আমাদের;
ওই হাটতলা,
ওরি পেছুখানে
ঘোষেদের গোলা।"

তিনি চরকার গানে চরকার ছন্দকে বাঁধলেন। তাঁর ছন্দের এই বিশেষত্ব যে তিনি অবিকল কবিতায় তালের সঙ্গে কথাবস্তুর সম্পর্ক রেখেছেন, চরকার গানকে পয়ারের ছন্দে লেখেন নি।

ঘর্‌কার ঝুর্‌ঝুর্‌ ফুর্‌ফুর্‌ বইছে!
চর্‌কার বুল্‌বুল্‌ কোন্‌ বোল্‌ কইছে?
কোন্‌ ধন দরকার চর্‌কার আজ গো?—
ঝিউড়ির খেই আর বউড়ির পাঁজ গো!
চর্‌কার ঘর্ঘর পল্লীর ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর ঘি'র দীপ,—আপনায় নির্ভর!
পল্লীর উল্লাস জাগ্‌ল সাড়া,—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া!°

মাঝিরা দূরের পাল্লা দিয়েছে পাল্সীতে। মাঝিদের দাঁড় ফেলার তালে তালে তিনি ছন্দ রচনা করলেন। তিনি ত্রিপদীতে পাল্সীর গান লেখেন নি।

চুপ চুপ—ওই ডুব
ছায় পান্‌কৌটি,
ছায় ডুব চুপ্‌ চুপ্‌
ঘোমটায় বউটি।
ঝক্‌ঝক্‌ কল্‌সীর
বক্‌বক্‌ শোন গো,
ঘোম্‌টায় ফাঁক রয়,
মন উন্মন গো!

এই ছন্দে চলার মধ্যে বেশ একটি ধীর ও সংযত আনন্দ রয়েছে। কিন্তু বিপদ সম্মুখীন দেখে তারা দাঁড় খুব কষে ধরে তাড়াতাড়ি নৌকা চালাচ্ছে। সেই ছন্দ—

পাঁচ পীরেরই শীর্ণি মেনে
চলরে টেনে বইঠা হেনে ;
বাঁক সমুখে, সাম্‌নে ঝুঁকে
বাঁয় বাঁচিয়ে ডাইনে রুখে
বুক দে টানো, বইঠা হানো—
সাত সতেরো কোপ-কোপানো।

আবার শ্রান্ত হয়ে সবাই চলেছে খুব আস্তে বেয়ে। বিপদ আর নেই। তখনকার ক্লান্তির সুর—

ফিরছে হাওয়া গায় ফুঁ-দেওয়া,
মাল্লা মাঝি পড়ছে ঝুঁকে ;
রাঙা আলোর লোভ দেখিয়ে
ধরছে কারা মাছ গুলোকে !

তাঁর 'ঝুর্‌নি-নদীতে'ও নদীটি তনুগাত্রী কিশোরীর মত লঘু ছন্দে ঠুমরী তালে নেচে চলেছে। তাঁর কবিতার আর কতগুলি ছন্দের নমুনা দিচ্ছি। এগুলি একদিকে যেমন তাঁর শব্দনির্ব্বাচন ও ভাবব্যঞ্জনার অসীম ক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছে অন্যদিকে তেম্‌নি ভাষার লালিত্যে কবিতার কথাস্তবকে অনির্ব্বচনীয় সুন্দর করে তুলেছে। ভাবের নগ্নতা তৃপ্ত করতে পার্‌লেও মুগ্ধ করতে পারে না। ছন্দের অবগুণ্ঠন টেনে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার রূপ-প্রভার আর অন্ত রইল না।

(১) সেথা ঝঙ্কার বীন্‌কার মঙ্গল গায় !
সেথা মেঘ্‌মল্‌ শীর্‌বন অঞ্জন ছায় !
সেথা অর্ব্বদ পর্ব্বত অদ্ভুত ঠাম !
সে যে দুর্গম দুর্দ্ধর্ষ যক্ষের ধাম !

আবার আর এক রকম

(২) আগে ঠুক্‌রিয়ে মধু- কুলকুলি
পালিয়ে গিয়েছে বুলবুলি ;—
টুলটুলে ডাকা কলের নিটোলে
টাট্‌কা ফুটিয়ে ঘুলঘুলি !

(৩) বাহুপাশে বাঁধাবাহু গৌরী ও কৃষ্ণা !
কোলাকুলি করে একি তৃপ্তি ও তৃষ্ণা !
কালো চুলে পিঙ্গলে একি বেনী- বন্ধ !
ঘুচে গেল কালো-গায় গোরা-গায় দ্বন্দ্ব !
সখী-সুখে মুখে মুখে চুম্ব নিঃ- সঙ্গা !
জয়তু য- মুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা !

(৪) Young Lochinvar-এর ছন্দ—

ওই সিন্দুর টিপ সিংহল দ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ !
ওই চন্দন যার অঙ্গের বাস তাম্বূল-বন কেশ !
যার উত্তাল তাল- কুঞ্জের বায়— মন্থর নিশ্- শাস্ !
আর উজ্জ্বল যার অম্বর, আর উচ্ছল যার হাস !

তাঁর 'হরমুকুট' কবিতাটি যেন পাহাড়ের চূড়া ক্রমশ অতিক্রম করে যাচ্ছে, ধাপের পর ধাপ্। ওঠ্বার ছন্দ !

(৫) হর মু- কুট্ ! হরমু- কুট !
ভূ-স্বর- গের সুমেরু-কূট
গগনে প্রায় ভিড়ায়ে কায়
করিতে চায় তারকা লুট !

(৬) আবার—

একি চঞ্চল তার ডানা বুন্ তে বাঁধা
একি মূর্চ্ছনা- ময় গীতি মৌ নে সাধা !
একি স্নিগ্ধদী পান্বিতা পাপ ড়ি আলোর !
একি নীল নাগি নীর মরি চক্ যেরি লোর !

সত্যেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ছন্দের মত হ্রস্ব দীর্ঘের উচ্চারণ অনুসরণ করেন নি ; বাংলায় স্বভাবত উচ্চারণের কোন ভেদ নেই, তাই তিনি বাংলা উচ্চারণকেই অনুসরণ করেছেন। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের অনেকগুলি কঠিন ছন্দকে তিনি বাংলা রূপ দিয়েছেন। একটুখানি নমুনা দিয়েই তিনি ছেড়ে দেন নি। যতদূর সম্ভব ও দরকার ততদূর তিনি সেই ছন্দে uniformity বজায় রেখে টেনে নিয়ে গিয়েছেন ; তার জন্যে ভাব তাঁর কোন কালেই খর্ব্ব হয় নি ; বরং মাঝে মাঝে চমৎকারকে লাভ করেছে। কঠিনতম পঞ্চচামর ছন্দকেও তিনি রূপ দিয়েছেন— 'সিন্ধুতাণ্ডবে'—

প্রাচীন জগৎ গুঁড়াও এবং
নূতন ভুবন গড়াও হেলায়,
উঠুক কেবল 'ববম্‌' 'ববম্‌'
চতুঃসীমায় বেলায় বেলায়।
জতুর পুতুল বসুন্ধরায়
ও নীল মুঠায় জানাও পেষণ!
জানাও সোহাগ কী ভীম ভাষায়!
প্রেমের ক্ষুধার কী অন্বেষণ!

মালিনী ছন্দের উদাহরণ—

উড়ে চলে' গেছে বুল্‌বুল্‌,
শূন্যময় স্বর্ণ পিঞ্জর;
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন,
যৌবনের জীর্ণ নির্ভর।

মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে তিনি বর্ষার বোধন করছেন—

পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল কই গো কই মেঘ উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি আজ মন্দ্র মন্থর, বচন কও;
সূর্য্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ, দাও হে কজ্জল পাড়াও ঘুম,
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি চলে যাও অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধূম।

শার্দ্দুল বিক্রীড়িত ছন্দের নমুনা—

সিন্ধুর রোল
মেঘে মিড়ল আজ,
গরজে বাজ,
বিদ্যুৎ বিলোল—
রক্ত চোখ!
ঝঞ্ঝার দোল
সারা সৃষ্টিময়,—
জাগে প্রলয়;
তাণ্ডব বিভোল্‌—
ছায় দ্যুলোক!

যে যৌবন কল্পনায় ভাবে ও অনুরাগে গোলাপের মত সুগন্ধ-আকুল ও রাগ-

ধনুকের মত রঙীন, সে যৌবন সত্যেন্দ্রনাথের ছিল না। তাঁর যৌবন ছিল মহীরুহের মত নির্ভীক বলিষ্ঠ ও দৃঢ়। তিনি যে কয়েকটি lyric লিখেছেন তা অতুলনীয়। তাঁর শুক্ল রাতী পর্‌বা একটি অপূর্ব্ব রত্ন। সেই ছন্দে লেখা, এবং বিরহের বেদনায় আকুল।

পার্‌ব না একলাটি আজ ঘরে পার্‌ব না রইতে!
চাঁদ ডাকে পাপিয়াকে দুটো কথা কইতে!
নিরালার কোল ভরা ঘুল জাগে আলো-করা,
যেচে কার খুন্‌সুড়ি সইতে।
অথই পাথার-পারা জ্যোছনায় মাতোয়ারা
দিশেহারা হল হাওয়া চৈতে।
কী ফুল ফোটায় হায় দুনিয়ায় চোখের চাওয়া!
চোখের চাওয়ায় কত হারানো, পাওয়া!
চোখে চোখে দেয়া নেয়া চোখে পাড়ি চোখে খেয়া
চাহানতে চৈতী হাওয়া!
চাহনির উড়ো পাখী মন হরে দিয়ে ফাঁকি।
চোখে-চোখে চামেলী-চাওয়া!

তাঁর 'কাজরী-পঞ্চাশৎ'-এ বর্ষার ভিজা দিনে মাটির ব্যাকুল গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় থেকে আনন্দের ব্যাকুলতা উঠেছে—

তোমরা চোখে কাজল দিয়ো
হরিণ-লোচনা!
ওই কাজলে আমরা করি
কাজ্‌রী রচনা।
ওই কাজলে হয় গো সজল
বাদল জোছনা,
ওই কাজলে উজল হিয়া
লুকায় শোচনা!

তাঁর 'কুঙ্কুম-পঞ্চাশৎ'-এ অনুরাগের গান—

—সখী আবীর গোলে বল্‌ কি জল দিয়ে?
—আঁখি গুলাব কুঁড়ি সই! নিঙাড়িয়ে!

অনুরাগের আবীর
আর জল দু'আঁখির
সঁাচা হোলির খেলা হায় ইহাই নিয়ে।

সত্যেন্দ্রনাথ চিরকাল আনন্দ ও যৌবনের তর্পণ করেছেন। তাঁর কবিতার মধ্যে ব্যর্থতা বা ব্যাকুল বেদনার সুর ছিল না। তাঁর আবেগ সমুদ্রের মত উদ্দাম নয়, হ্রদের মত প্রশান্ত।

অনেকে সত্যেন্দ্রনাথকে প্রথম শ্রেণীর কবি বলে স্বীকার করতে চান না, কারণ তাঁর বেশীর ভাগ কবিতাই দেশ বিদেশের কবিদের কবিতার অনুবাদ। কিন্তু যাঁরা তাঁর অনুবাদ-কবিতাগুলি ভাল করে পড়েছেন তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন সত্যেন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা সেই অনুবাদে নূতন শক্তিতে পরিস্ফুরিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে যা বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি—"অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তরপ্রাপ্তি। আত্মা এক দেহ হতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে ইহা শিল্পকার্য্য নহে, ইহা সৃষ্টিকার্য্য। বাংলা সাহিত্যে এ অনুবাদগুলি প্রবাসী নহে, ইহারা অধিবাসীর সমস্ত অধিকারই পাইয়াছে—ইহাদিগকে পূর্ব্বনিবাসের 'পাস' দেখাইয়া চলিতে হইবে না।" তার অল্প অনুবাদ-কবিতাতেই বিদেশের গন্ধ মিলবে, সত্যেন্দ্রনাথ অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে সেগুলিকে দেশী ছাঁচে ঢেলেছেন; এবং সেইখানেই তাঁর অনুবাদের বিশেষত্ব। এমন কি মাঝে মাঝে তিনি বিদেশী ছন্দ অবধি বজায় রেখেছেন। দু একটি নমুনা দিলেই বোঝা যাবে। পার্শী কবি অর্দেশর্ খ্যবর্দ্দার-এর গুজরাতী অঁজনী ছন্দে লেখা খোকা কবিতাটি বাংলা তেমনি ছন্দেই লেখা—কে বলবে এ অনুবাদ?

হাস্ তুই খেল্ তুই কলরব কর্ তুই,
সুমধুর হাসি দিয়ে মুখখানি ভর্ তুই
বাপ মার কোল জুড়ে থাক সুন্দর তুই
খোকা তুই ভালো থাক্ রে।

ফরাসী মেয়ে-কবি মার্সেলিন ভালমোর-এর 'খুকীর বালিশ' কবিতাটি ভারি মিষ্টি। সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ পড়ে কেউ বুঝবে না যে, এ মৌলিক নয়। এত সোজা তর্জ্জমায় এত মিষ্টত্ব লুকিয়ে রয়েছে যে বলা যায় না।

আমার ছোট বালিশটিরে! কি মিষ্টি ভাই তুই,
তোর উপরে মাথা রেখে রোজ আমি ঘুমুই।

আমার জন্যে তৈরী তুমি, কেমন তোমার গা,
তুলোয় ভরা তুলতুলে, আর কিছু ভাবি না।
আকাশ যখন ডাকছে, বালিশ! ভাঙছে ঝড়ে দেশ,
তোমার ভিতর মুখ লুকিয়ে ঘুমুই আমি বেশ।

জাপানী মেয়ে ওহারু প্রজাপতির মন্দির-কুট্টিমে জানু পেতে বসে বরের প্রার্থনা করছে। কে বলবে ও নোগু'চর লেখা? অনুবাদক যেন নিজেই কবিতা লিখছেন মন থেকে। তিনি অন্য দেশের বধূকে যেন নিজের ঘরে এনে আলতা কুঙ্কুম অবগুণ্ঠন সিন্দুর দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন—

"দাও হেন বর সাগরের মত
গম্ভীর যার বাণী,
আন্-ভুবনের অজানা সুরভি
পরাণে মিলাবে আনি,
কল্প আঙুলে ফুটাবে যে মোর
সকল পাপড়িগুলি!"
ওহারুর প্রাণে চন্দ্রমল্লি
চেরীফুল ওঠে দুলি'।
"দাও হেন স্বামী যে আমার পানে
চাহিবে সহজ সুখে,—
যে চোখে শ্যামল প্রান্তর চায়
উষার অরুণ মুখে;
চুম্বনে যার তরুণী ওহারু
নারী হবে রাতারাতি।"
ওহারুর চোখে চন্দ্রমল্লি,
দুলে চেরীফুল-পাঁতি।

সত্যেন্দ্রনাথ এমনি করে' সাহিত্য-মহাপীঠ থেকে বিন্দু বিন্দু করে তীর্থ সলিল সংগ্রহ করেছেন। তিনি যে বহু বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, অনেক ভাষায় যে তাঁর জ্ঞান ছিল, তাঁর এই রাশি রাশি বিভিন্ন ভাষা থেকে চমৎকার সুন্দর অনুবাদ-গুলি থেকেই সত্যিই বোঝা যায়। তাঁর প্রবল ও প্রচণ্ড স্বাদেশিকতা তাঁকে সঙ্কীর্ণমনা করে নি। তিনি সকল দেশের রসিক সাহিত্যিকের সঙ্গেই পরম আত্মীয়তা অনুভব করতেন। এবং এই আত্মীয়তার রাখী পরিয়ে সকলকেই তিনি বাংলার

সাহিত্য-মণ্ডপে নিমন্ত্রণ করে' এনেছেন। যে-কেউ সুন্দরের তপস্যা করে, যে-কেউ শিল্প-কলায় নিত্যকালের রসিককে বন্দনা করেছে তাকেই তিনি প্রণাম করেছেন। তাঁদের লেখা অনুবাদ করে' তিনি একদিকে যেমন তাঁর অন্তরের ভক্তি জানিয়েছেন, তেমনি বাংলা ভাষাকেও সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। তাঁর নিমন্ত্রণে পংক্তিবিভাগ ছিল না। সমস্ত কবিকেই তিনি এক ছত্রতলে স্থান দিয়েছেন। রুষিয়ায় কবি লার্মণ্টফ, রেশাইয়েফ্, টলষ্টয়; ফ্রান্সের পল্ ভার্লেন, মিস্ত্রাল, আল্‌ফ্রে দে মুসে, আঁদ্রে শেনিয়ে, ভল্টেয়ার, লেঁকং দি লিল প্রভৃতি; ইংলণ্ডের শেলী, কীট্‌স্, ব্রাউনিং, য়েটস, ব্রীজেস্, সুইনবার্ণ, প্রভৃতি; পোলাণ্ডের সিন্‌কিভিচ্, ফ্রেড্রিক নীচি; বেল্‌জিয়ামের মেটারলিঙ্ক, মস্তনাইকেন প্রভৃতি; ইতালির দান্তে বোয়ার্দো পেত্রার্ক; আমেরিকার পো, হুইটম্যান; জাপানের নোগুচি; চীনের লি-তুং; স্পেনের লোপ ডি ভেগা প্রভৃতি পৃথিবীর বহু বহু কবি ও রসিকেরা তাঁর নিমন্ত্রণে অতিথি হয়ে বাংলার সাহিত্য-সভা উজ্জ্বল করেছেন। এবং এই নিমন্ত্রণে সত্যেন্দ্রনাথই সম্মানিত হয়েছেন বেশী।

কিন্তু তিনি তাঁর প্রাণের পরিপূর্ণ প্রীতি-অর্ঘ্য স্থাপন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের পরমপদমূলে! তাঁর মত রবীন্দ্রনাথকে কোন কবি এত celebrate করেন নি। তাঁর কবিতায় রবীন্দ্রনাথের নিত্য আনন্দ-উৎসব জমেছে। তাঁর এই রবীন্দ্র-প্রীতি থেকে তাঁরই সরস স্নিগ্ধ সুন্দর প্রাণের সুগন্ধের স্বাদ পাচ্ছি। কবির মর্য্যাদা করে তিনি নিজের কবিতাকেই সৌন্দর্য্য ও মর্য্যাদা দান করেছেন। বাংলার গৌরবের নিধি সত্যেন্দ্রনাথেরও বুকের কৌস্তভমণি ছিল! রবীন্দ্রনাথের স্নেহ তাঁর ছিল প্রকাণ্ড বিত্ত। তিনি রবীন্দ্রনাথের জয়গানে নিত্য মাতোয়ালা।

জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমার করি গর্ব্ব,
বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব্ব।

তাঁর 'অর্ঘ্যে' 'আভ্যুদয়িকে' 'দিগ্বিজয়ীতে' 'মালাচন্দনে' 'পরমান্নে' 'কবি-জুবিলীতে' সব খানেই কবি-প্রশস্তি-স্তোত্র উঠছে। শ্রদ্ধা-হোমে তিনি গৌড়ী গায়ত্রী ছন্দে কবিগুরুর স্তব করছেন।

জয় কবি! জয় জগৎ প্রিয়
বরেণ্য হে বন্দনীয়!
অগমশ্রুতির শ্রোত্রিয়! জয়! জয়!
পাবনী-বাগ্‌দেবীর কবি!
পাবীর বীর গায়ন রবি!
পুণ্য পাবকচ্ছবি! জয়! জয়!

তাঁর সঙ্গে সমস্ত বাংলা বিশ্বকবি-ছত্রপতিকে নমস্কার করছে—

চারি মহাদেশ যার ভক্ত করে ভক্তিনিবেদন,
গুরু বলি শ্রদ্ধা সঁপে উদ্বোধিত আত্মা অগণন,
ভাবের ভুবনে যার চারি যুগে আসন অক্ষয়,
যার দেহে মূর্ত্তি ধরে ঋষিদের অমূর্ত্ত অভয়,
অমৃতের সন্ধানী যে ধ্যানী হে নির্দ্বন্দ্ব সাধনার—
নমস্কার! নমস্কার! বারম্বার তাঁরে নমস্কার!

'যে তারা হারাল দ্যুতি যে পাখী ভুলিয়া গেল গান,
এ সংসারে কোথা তার স্থান?'

সত্যেন্দ্রনাথের অকাল তিরোধানে বাংলা সাহিত্যের কি ভীষণ ক্ষতি হয়েছে তা আমরা আজো রবীন্দ্রনাথের ছায়ার তলায় বসে বুঝতে পারছি না। তিনি নানান গ্রাম্য ও অপভ্রংশ শব্দে বাংলা ভাষাকে পরিপুষ্ট ও বেগবান করেছেন। তিনি যে-বিষয় নিয়েই কবিতা লিখুন না কেন, তাঁর হাট-হদ্দ সমস্ত জেনে লিখতেন। তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। তাঁর 'দিল্লী-নামা' কবিতা তার সাক্ষ্য দেবে। মৃত পত্রের দল যেমন তরুণ কিশলয়ের মধ্যে আবার জন্মলাভ করে, তেমনি সত্যেন্দ্রনাথও নবীন কবিদের কবিতায় বারে বারে জন্মলাভ করবেন। যে সমুদ্রে বান ডাকালেন রবীন্দ্রনাথ ও যে সমুদ্রে পাল্সী দোলালেন সত্যেন্দ্র, সে পাল্সী চড়ে বহু বহু কবির দল বিরাট উত্তাল ঊর্ম্মি ভেদ করে সুদূরের আশায় পাড়ি জমাল বলে'! সত্যেন্দ্রনাথের অপরিপূর্ণ সাধনা ভবিষ্যতের প্রচেষ্টার মধ্যে পূর্ণতা লাভ করবে।



কবির স্মৃতি

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

* * * কবির স্মৃতি চিরদিন অম্লান হ'য়ে বিরাজ করে তাঁর কাব্য-শতদলের পাপড়ির মধ্যে। সে স্মৃতি কোনো এক বিশেষ দিনের স্মৃতি নয়—জন্ম দিনেরও নয়, মৃত্যু-দিনেরও নয়; সে স্মৃতি কবি-জীবনের অখণ্ড স্মৃতি; মৃত্যুর ব্যবধান তার মধ্যে নেই। সেই জন্যই আমরা ব'লে থাকি কবিরা অমর।

কবির এই অমরত্ব বহন কোরে নিয়ে চলে তাঁরই নিজের রচনা যুগ হ'তে যুগান্তরে বিচিত্র মানব-হৃদয়ের অন্তরে—বিচিত্র রূপে; এর গতি মন থেকে মনে—এসেছে যারা তাদের দিকে, আস্‌চে যারা তাদের দিকে, আসে নি যারা তাদেরও দিকে।

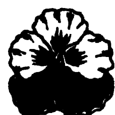
কবির এই যে স্মৃতি এ শত-শত বর্ষা-শরৎ-বসন্তের মধ্যে দিয়ে, আলো আঁধারের উজান ঠেলে, ছন্দ নির্ঝরের ধারা বয়ে নব-নব কালের মানুষের চোখে নব-নব শোভায় প্রতিভাত হয় এবং প্রত্যেক মানুষ তার নিজের মনের মতন গঠন দিয়ে কবির মানস-প্রতিমা নিজের মনের মন্দিরে স্থাপন করে। এ প্রতিমা কোনো বিশেষ শিল্পীর হাতে গড়া সুনির্দ্দিষ্ট রেখা-দ্বারা আবদ্ধ অচল অটল মর্ম্মর মূর্ত্তি নয়—এ প্রতিমা সচল সজীব সুন্দর—এর বহুরূপ; সে একধারে আত্মীয় বন্ধু, সখা, গুরু, দেবতা—ক্ষণে ক্ষণে এর রূপ হতে রূপান্তর হয়—শোকের সান্ত্বনা, আনন্দের আনন্দ, কাজের উৎসাহ, বিশ্রামের স্বপ্ন—এমনিতর বিচিত্ররূপে আমাদের মনের খেলা-ঘরে এঁর খেলা দিবারাত্র চলে।

এই যে কবির নিজের হাতে-গড়া নিজের স্মৃতি-মূর্ত্তি যা' কালাকাল ও জীবন মরণের অতীত, তার চেয়ে পাকা সঠিক স্মৃতি-মন্দির গড়তে পারে এমন গুণী-শিল্পীর নাম এ পর্য্যন্ত তো জগতে কোথাও শোনা যায় নি।

* * *

সত্যোস্ত্র ছিলেন কবি! ঘর এবং ঘরের বাইরের মানুষের সঙ্গে তাঁর সমান আত্মীয়তা। * * তাঁকে বন্ধু-রূপে পাবার সৌভাগ্য যে কত বড় সৌভাগ্য সে যিনি তা না পেয়েছেন বুঝবেন না।

সত্যেন্দ্র কবি ছিলেন, গুণী ছিলেন, মহৎ ছিলেন, সে কথা আমরা ভুলব না। কিন্তু * * বিশেষ ভাবে এই আনন্দ আমরা করব যে তিনি আমাদের অন্তরঙ্গ আত্মীয় ছিলেন; তাঁর হৃদয়ের ভালোবাসা-স্নেহ তাঁর হাতের আদর আমরা পেয়েছিলুম, তিনি আমাদেরই মধ্যে একজন ছিলেন—যাঁর দুঃখ আনন্দ, নিন্দা প্রশংসা, ভয় বিরাগ বিরক্তি—একদিন আমাদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হয়েছে। * * সেই দিনের কথা মনে কোরে আমাদের চোখে জল আস্‌ছে। * * এই চোখে জলের উৎসব আমাদের হৃদয়ের আষাঢ়ের বিরহ-উৎসব।



ব্রজ-গাথা

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক

১

ব্রজ-গাথা কবহুঁ-তো গাহ ?
দিবসু কি যামিনু,   আঁধুও কি উজরোঁ,
হিম-কিয়ে বরিখক মাহ ?

২

ব্রজ গাথা শুনয়ি   চম্পক-পঙ্কজ-   বেলিয়া-কুন্দ-সুমুঞ্জে,
ভাঙ-ভঙ্গিমক   বঙ্কিম ঠামহুঁ   হেরত-কি রাধা-কানু কুঞ্জে
কাজর উজরত   আঁখ উন মীলই, দুঁ-
দুঁহু-সো দুঁহু-লাগ মেলি,
নীপ-নিচল-বীচে   ভ্রমরক গুঞ্জনে,
আজহুঁ-কি বৈঠত ভেলি ?
কালিন্দী-ক কল্লোল   আজহুঁ-কি গর-গর,— অম্বুক মুখরিত মানঁ,
বিম্ব-অধর লোয়ি   মাধব ফুকারয়   ডাকঁ যভুঁ কম্বু-বিতানঁ

৩

ব্রজ-গাথা 'কাল'-সমানা ।
নহি-সোঁ দিন্নুয়া-রাত্তি,   চন্দ্রিমা আঁধোয়া;
সভুঁ খণ শুনু তেহুঁ গানা !

শরৎচন্দ্র

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(বাল্য-জীবন)

এই সম্পর্কে স্বর্গীয় মতিলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্বন্ধে কিছু না বলিলে চলে না।

মতিদাদা শরতের পিতা। তাঁহাকে শৈশব হইতে যেমনটি দেখিয়াছি—তাহাই বলিব।

শিশু বয়সে মনে পড়ে, মতিদাদার প্রতি আমাদের একটা প্রগাঢ় প্রাণের টান ছিল। শিশুগণকে কড়া শাসনের পাহারায় রাখিবার বালাই তাঁহার ছিল না। কর্ত্তাদের অগোচরে তিনি আমাদের পরম বন্ধু ছিলেন। তালপাতার ভেঁপু-বাঁশীর আবদার, কান-মলা না খাইয়া তাঁহার কাছেই চলিত; সন্ধ্যা বেলায় বাগান হইতে সংগোপনে ফুল চুরি করিয়া মতিদাদা আমাদের কৃষ্ণকলির বিনাসুতার হার রচনা করিয়া দিতেন। তিনি বড় হইয়াও শিশুকুলকে অবিরত তিরস্কার করেন না—এই কথা ভাবিয়া আর বিস্ময়ের অবধি থাকিত না, কারণ বড়দের কাছে তিরস্কার কিম্বা মারটাই কেবলমাত্র পাওনা বলিয়া ইতিমধ্যে আমাদের সুদৃঢ় বোধ জন্মিয়াছিল। আমাদের শিশুজীবন-মরুর মতিদাদা ছিলেন একটি ওয়েসিস্!

এখন বুঝতে পারি, শাসনের প্রচণ্ড উত্তাপে শরতের হৃদয়-রসটুকু নিঃশেষে শুকাইয়া যায় নাই কেন। পিতার অপরিসীম স্নেহের গোমুখী তাহার জীবন-ধারার প্রারম্ভে—লোকচক্ষুর অন্তরালে—মৃত সঞ্জীবণীর মতই কাজ করিয়াছিল। "কারে" পড়িয়াই বোধ হয় মতিদাদা প্রথম একটা ভাব করিয়া থাকিতেন যে মনে হইত, শরৎকে হয় ত তিনি চেনেন না এবং তাহার কল্যাণ-অকল্যাণ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন।

বোধ করি, তখনকার দিনে এমনটি না করিলেও চলিত না। একান্নবর্তীর কঠিন শাসন-তন্ত্রে পিতার পুত্রকে একেবারে অস্বীকার করিয়া থাকিতে হইত। পিতার কোলে চড়িতে না পাইবার দুঃখ শিশু-ধ্রুবকে পরমপদ দান করিয়াছিল; আমরা নিতান্ত অপদার্থ বলিয়াই হয় ত' ধ্রুব-লোকের মত কায়েমি স্থান গড়িয়া তুলিতে পারিলাম না। কিন্তু শৈশব স্মৃতির গায়ে সেই নিদারুণ ক্ষতের ব্যথা— এ জীবনে বোধ হয় আর সারিবে না!

মতিদাদার সম্পর্কে আলোচনা যে আমাদের কানে আসিত না তাহাও নহে। তাঁহার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ ছিল; সে বিষয়ে তাঁহার পরম শত্রুকেও সুখ্যাতি করিতে শুনিতাম। তাঁর দোষ সম্বন্ধে একটা সর্ব্ববাদী সম্মত মতও আমাদের বাড়ীতে প্রচলিত ছিল। এখন বুঝিতে পারি যে তাহাও নিতান্ত অসত্য নহে।

কিন্তু এই সকল সমালোচনা আমাদের ভাল লাগিত না। তাহার কারণ সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বন্ধুর সম্বন্ধে কঠোর আলোচনা যেমন আর এক বন্ধুর বরদাস্ত হয় না—ইহাও বোধকরি সেইরূপ। অবশ্য তাঁহার সুখ্যাতির দিকটা আমাদের আনন্দ দান করিত।

শিশুদের সহিত এমন অকপটে মেশা—তাঁহার সমবয়স্ক কর্ত্তাদের মর্য্যাদা এবং গাম্ভীর্য্যের হানিকর বলিয়া মনে হইত। সে যুগে বালকদের মন খুলিয়া হাসাও একটা "বেয়াদপির" মধ্যে গণ্য হইত। হঠাৎ হাসি পাইলে আমরা আত্মরক্ষার জন্ম মুখে কাপড় পুরিয়া দিয়া কিম্বা দাঁত দিয়া জিভ কামড়াইয়া হাস্য সম্বরণ করিতাম। এগুলি আমাদের কেহ শিখায় নাই। শাস্তির কাঠিন্যের উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এগুলি সহজে জন্মলাভ করিয়াছিল।

শ্লেটের উপর বড় করিয়া অ আ লিখিয়া তাহার উপর দাগা বুলাইলে হাতের লেখা সুন্দর হয়, এই ধারণাই তখন আবালবৃদ্ধের ছিল; তাই আমরা শ্লেট পেন্সিল লইয়া কেবলি ছুটিতাম মতিদাদার কাছে—কারণ মতিদাদার হাতের লেখা ছাপার চেয়ে কোন অংশে ন্যূন ছিল না। তাঁহার কাগজ কলম কালির ব্যবস্থা এবং অবস্থা বাড়ীর সাধারণ ব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল; এবং তাহা যে অনেক ভাল, সে বিচার করিবার বুদ্ধিও আমাদের ঘটে চুপেচাপে ভাল করিয়াই জন্মিয়াছিল।

মোট কথা, মতিদাদাকে লইয়া আমরা সেই বয়সেই বেশ একটু প্রতারণা করিতে শিখিয়াছিলাম—যাহা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতেছি যে দুনিয়াদারির একটা অপরিহার্য্য নিয়ম। মনে যাহাই থাকুক না কেন, মুখে তাহাকে প্রকাশ না

করিয়া ভাল ছেলে না সাজিলে তখন আমাদের দুর্গতির সীমা থাকিত না—ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

আমাদের বাড়ীর হিসাবে মতিদাদার অমার্জ্জনীয় অপরাধ ছিল সকল ললিত-কলা এবং চারুশিল্পের উপর তাঁহার একটি প্রকৃতিগত টান এবং বন্ধুত্ব। কেন জানি না, কর্ত্তাদের মধ্যে সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদিকে ছোট করিয়া দিবার চেষ্টা স্পষ্টই উপলব্ধি করিতাম। তাঁহারা ব্যবহারের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতেন যে যে-ব্যক্তি এগুলিতে আসক্ত—সে অত্যন্ত লঘু চরিত্রের লোক—তাহাকে লক্ষীছাড়া বলিতে কোথাও একটু কুণ্ঠাও তাঁহাদের মনে আসিত না।

গাম্ভীর্য্য সাধনায় কর্ত্তারা নিঃসন্দেহ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। মনের সুকুমার রসের দিকটা তাঁহারা উসর করিয়া তুলিতে কিছুমাত্র ক্রটি করেন নাই। কিন্তু সব চেয়ে বেশী গোল দাঁড়াইয়াছিল তাঁহাদের কঠোর শাসনের মধ্যে তরুণ শিশু-চিত্তগুলি লইয়া! তাহাদের আনন্দের উৎসগুলির মুখে পাথর চাপা দিলেও সেগুলি সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায় নাই; এবং তাহারই ক্ষীণ রস-ধারার অমৃতাস্বাদ তাহাদিগকে আকাঙ্খা-বিহ্বল করিলে একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইত। নিষেধ-কণ্টকিত বিবেচনার পথ হইতে অবিবেচনার মুক্তিতে উত্তীর্ণ করিবার এই গোপন বন্ধুটির প্রতি আমাদের হৃদয়ের সকৃতজ্ঞ ভক্তি তাই আজো উৎসারিত হয়!

মতিদাদার উপর মা-লক্ষীর কৃপা দৃষ্টি মোটেই ছিল না। কর্ত্তাদের পথে ইহাই ছিল অকাট্য যুক্তির দুর্লঙ্ঘ্য এবং বিরাট পাহাড়। যুক্তির নাকে দড়ি দিয়া টানাটানি করিলে তাহাকে ইচ্ছামত সকল পথেই ঘুরান যায়। তাঁহার প্রতিভার আলো ছিল আলেয়ার মত, মানুষের ইচ্ছায় জ্বলিত না; তাই তিনিও বুঝি সকল সময়ে পথ খুঁজিয়া পাইতেন না। কিছুদিন বা সকলের গোড়ে গোড় দিয়া চলিতেন—তখন লোকে হাঁপ ছাড়িয়া বলিত—যাক্ মতিলালের এতদিনে বুদ্ধি ফিরিয়াছে। তিনিও পোষ-মানা ভালছেলের মত চাকুরি-বাকুরিতে মন দিতেন। কিন্তু সে বেশী দিনের জন্য নয়। দিন কতক পরেই দেখিতাম মতিদাদা দ্বিপ্রহরে বাহিরের রোয়াকে বসিয়া একখানা বিপুলকায় পুস্তক পাঠ করিয়া কখন বা হাসিতেছেন—কখন বা বিষাদ গম্ভীর। কানাঘুষা শুনিতাম—নূতন আপিসের সাহেবের সঙ্গেও তাঁহার বনিল না!

বাড়ীর মধ্যে তিনজন নিয়মিত পুস্তক-পাঠ করিতেন। গৌরী সিং, মতিদাদা এবং মাতুদেবী। পরীক্ষা আসন্ন হইলে পুস্তক পাঠের প্রয়োজনীয়তা সকলে

বুঝিতেন ; কিন্তু অকারণে শক্তির অপব্যয়কে কেহই ভাল চক্ষে দেখিত না। গৌরী সিং ধর্ম্মালোচনায় এবং পারলৌকিক মুক্তির জন্ত যাহা করিত—তাহাতে তাহাকে ক্ষমা করা চলে ; কিন্তু অপর দুজনের অভ্যাসকে প্রশ্রয় দিবার লঘুতা বাড়ীর মধ্যে কেবলমাত্র ন-জ্যেঠামহাশয় ছাড়া অপর কাহারো বড় একটা ছিল না। শুনিয়াছি তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" গোপনে আনাইয়া পড়িবার জন্ত মাকে পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহাকে যতটুকু মনে পড়ে তাহা হইতে এই বুঝি যে, তাঁহারও অপরের আনন্দ-বিধানের চেষ্টা ছিল। শিশুদের জন্য তিনি পুতুল কিনিতেন। সেই উপহারগুলি—তাঁহার মৃত্যুর বহুদিন পর পর্য্যন্ত—আমাদের বড় আদরের জিনিষ ছিল—শিশু-চিন্তায় বারবার এই কথাই মনে পড়িত—যাঁহারা এত ভাল হন—তাঁহাদের থাকিবার স্থান এই পৃথিবী নয় ; তাই বুঝি ভগবান নিজের কাছে ডাকিয়া লইয়াছেন !

মেঘের বিদ্যুৎ যেমন মানুষের কাজে আসে না ক্ষণেকের জন্য চোখ ধোয়াইতে পারে মাত্র, মতিদাদার প্রতিভা বিশেষ কোন কাজেই আসে নাই। তিনি কবিতা আরম্ভ করিয়া কোনদিন, বোধকরি শেষ করেন নাই! ভারতবর্ষের প্রকাণ্ড মানচিত্র আঁকিতে সুরু করার সময় তাঁহার উৎসাহের মূর্ত্তি বেশ মনে পড়ে ; কিন্তু তাহা শেষ করিবার ধৈর্য্য রহিল না! তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি কিছুরই অভাব ছিল না ; অভাব ছিল, সেইগুলিকে কর্ম্ম-কেন্দ্রে নিয়োজিত করিয়া কিছু একটা গড়িয়া তোলা !

তাঁহার অসমাপ্ত লেখাগুলি পাঠ করিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই, তাই সে সম্বন্ধে মতামত দিতে পারি না। শরৎচন্দ্রের নিকট শুনিয়াছি যে, সেগুলি পাঠ করিয়া তাঁহার তখনই মনে হইত,—সবই আছে, কিন্তু যেন কিসের অভাব !

কোন কাজ শেষ করিবার ধৈর্য্য যে ছিল না, তাহার কারণ, বোধকরি তাঁর আদর্শ ছিল উচ্চাঙ্গের, যাহা মনে করিতেন, কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিয়া অতৃপ্তির তিক্ততায় সেটিকে অচিরে পরিত্যাগ করিয়া বাঁচিয়া যাইতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকগুলি তাঁহার অতি যত্নসহকারেই পড়া ছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেগুলি লইয়া আলোচনা সহজে তিনি করিতে চাহিতেন না, তাহার কারণ, সাধারণ পাঠকের মত তিনি কোন দিনই তাহার নির্জ্জলা সুখ্যাতি করিতে পারিতেন না। তাই বোধকরি, তর্ক কলহে পরিণত হইয়া বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটায়, ভয় করিতেন। তিনি এই প্রসঙ্গে সাহিত্যের উচ্চাঙ্গ-তত্ত্ব কথাই বলিতে

চাহিতেন। তেমন চিন্তা যত্ন করিয়া বাংলা নভেল সে সময়ে কেহ পড়িতেন কিনা সন্দেহ।

* * * *

একদিন শরৎ বলিল, জানিস্ আমরা আর ভাগলপুরে থাকবো না? বলা বাহুল্য যে শিশু-চিত্তে ইহা বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত আঘাত দিয়াছিল।

ক্রমে সেইদিন নিকটতর হইয়া আসিল। মেজদিদির (শরতের মা) কাছে আমরা অতিরিক্ত আদর যত্ন পাইতে লাগিলাম। আসন্ন বিচ্ছেদের শোকে সময়ে সময়ে তাঁহার দুইচোখ দিয়া জল পড়িতে দেখিয়া আমার কান্না আসিত।

শৈশবে মেজদিদির কাছে মাতৃস্নেহ পাইয়াছিলাম। স্তন্যদান করিয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে তিনি আমাকেও মানুষ করিয়া ছিলেন। তিনি বড় সদা-সাঁঠা লোক ছিলেন; কিন্তু এই নিতান্ত সাদাসিধা মানুষটির অন্তরে একটি স্নেহের সমুদ্র নিহিত ছিল। তিনি কোন দিন কাহারো সহিত সম্বন্ধের দাবির দিক দিয়া ব্যবহার করিতেন না। কর্ত্তারা তাঁহার সেবা-ভক্তিতে মুগ্ধ ছিলেন এবং আমরা ছিলাম সেই বিশুদ্ধ স্নেহের উপাসক। আজো তাঁর কথা মনে করিতে বুকের মধ্যে চাপা ব্যথার মত বোধ হয়—চক্ষু সরস হইয়া উঠে!

* * * *

সেদিনের কথা পরিষ্কার মনে পড়ে, গ্রীষ্মের প্রদীপ্ত অপরাহ্ণে শরৎ আমাকে বলিল, আজ চলে যাবো—চল্ একবার "পুরোণো বাগানে" যাই।

সেখানে একটি পেয়ারার নীচু ডালে বসিয়া দুইজনে নিস্তব্ধে আসন্ন বিদায়ের ব্যথা বোধ করিতে লাগিলাম। সে বলিল, তুই দুঃখু করিস্‌নে, আবার আমাদের দেখা হবে; আমি মাঝে মাঝে আস্‌বোইত রে!

আস্‌বে?

আস্‌বো না? ভাগলপুর কি আমার কম ভালে লাগে? প্রায়ই আসবো।

এখনো সেই কথা বলিতে শুনি? এখনো সেই বিনা আহ্বানে—কেবল মাত্র প্রাণের টানে এক একবার ভাগলপুরে ছুটিয়া আসে। এখন বয়স হইয়াছে, তবুও সেই 'পাথরের ঘাটে'র ভগ্ন স্তূপের চূড়া হইতে ঝাপ খাইয়া জলে পড়িয়া সাঁতার দিবার ইচ্ছা তার তরুণ বয়সের মতই আছে। ও-পারের ঝাউ বনের ডাক—আজো তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া এখনো সে বলে, ওঃ বড় ভাল জায়গা—এই ভাগলপুরটা!

সেদিন তাহার কাছে যে বিদ্যার দীক্ষা লাভ করিয়াছিলাম তাহার কথা বলিয়া শরৎচন্দ্রের বাল্য-স্মৃতি শেষ করিব।

সে বলিল, দেখ্‌, গাছে চড়া বড় দরকারী। মনে কর্‌, একটা বনের মধ্যে দিয়ে চলেছি—হঠাৎ সন্ধ্যা হোলো-চারিদিকে বাঘ-ভাল্লুক ডাকচে—তখন যদি গাছে চড়তে না-জানি ত কি বিপদ!

কিন্তু যদি পড়ে যাই?

পড়বি? পড়বি কেনরে? বলিয়া সে একটা গাছে উঠিয়া কোঁচার কাপড়টা গাছের ডালের সঙ্গে এবং কোমরে জড়াইয়া দিয়া শুইয়া রহিল। বলিল, এমনি করে ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে দেওয়া যায়।

গাছে চড়িতে শিখিয়াছিলাম বটে; কিন্তু গাছের উপর রাত্রিবাস করিবার মত দিন এখনো আসে নাই; জানি না কপালে কি আছে!

তাহাদের ঠিক যাইবার সময় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সকালে উঠিয়া সব খালি খালি ঠেকিল। কতদিন মনে মনে তাহাকে ডাকিয়াছি, কিন্তু দীর্ঘ দিন তাহার কোন সাড়া শব্দই ছিল না।

"প্রায়ই আসবো"—এ-কথা সে চার পাঁচ বৎসরের জন্য রাখিতে পারে নাই।

ক্রমশ



বেনামী বন্দর

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই
জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভীড়;
মাল ব'য়ে ব'য়ে ঘাল্ হ'ল যারা
আর যাহাদের মাস্তুল চৌচির,
আর যাহাদের পাল পুড়ে গেল
বুকের আগুনে ভাই,
সব জাহাজের সেই আশ্রয়-নীড়।

কূলহীন যত কালাপানি ম'থি
লোণা জলে ডুবে নেয়ে,
ডুবো পাহাড়ের গুঁতো গিলে আর
ঝড়ের ঝাঁকুনি খেয়ে,
যত হায়রাণ্ লবেজান্ তরী বরখাস্ত্ হ'ল তা
পাঁজরায় খেয়ে চিড়্,
মহাসাগরের অখ্যাত কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই
সেই অপর্ব্ব ভাঙা জাহাজের ভীড়্।

দুনিয়ার কড়া চৌকিদারী যে ভাই
হুঁশিয়ার সদাগরী,
হালে যার পাণি মিলেনাক আর, তারে
যেতে হবে চুপে সরি'।

কোমরের জোর কমে গেল যার ভাই,
ঘুণ ধরে গেল কাঠে আর যার কলজেটা গেল ফেটে
জনমের মত জখম হ'ল যে যুঝে,
সওদাগরের জেঠিতে জেঠিতে খাতাঞ্জিখানা ঢুঁড়ে
কোন দপ্তরে ভাই
খারিজ তাদের নাম পাবেনাক খুঁজে।

মহাসাগরের নামহীন কূলে,
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই
সেই সব যত ভাঙ্গা জাহাজের ভিড়।
শির-দাঁড়া যার বেঁকে গেল আর দড়াদড়ি গেল ছিঁড়ে
কব্জা ও কল বেগড়াল অবশেষে,
জৌলুষ গেল ধুয়ে যার আর পতাকাও প'ড়ে নুয়ে
জোড় গেল খুলে, ফুটো খোলে আর রইতে যে নারে ভেসে.
তাদের নোঙর নামাবার ঠাঁই
দুনিয়ার কিনারায়
যত হতভাগা অসমর্থের নির্বাসিতের নীড়।



সাহিত্যে সমস্যা

কাজী আবদুল ওদুদ

মস্ত নাম দিয়ে লেখাটির আরম্ভ হল। কিন্তু শ্রোতৃবর্গ অসহিষ্ণু হবেন না, Realism, Idealism, জাতীয়তা, সর্ব্বজনীনতা, সত্য শিব সুন্দরের সমন্বয় ইত্যাদি নামধেয় ভীতিপ্রদ সাহিত্যিক সমস্যার অবতারণা করে আপনাদের অতিষ্ঠ করে তুলবার মতলব আমার নয়।

যে কথাটি বলতে চাই তা বরং কতকটা এর উল্টো। অল্প কথায় বল্লে তা দাঁড়ায়--সাহিত্যে বাস্তবিকই এ সমস্ত সমস্যা নাই। সাহিত্য যাঁরা সৃষ্টি করেন তাঁদের দিক থেকে দেখলে সমালোচকদের এই সব সমালোচনার কারসাজি কতকটা ডনকুইক্‌সোটিক্ ব্যাপার বলেই মনে হয়।

এ কোনো নতুন কথা নয়। প্রায় কবিই এই নিয়ে দিঙ্‌নাগের বংশধরদের ঠাট্টা করে এসেছেন। তবে পুরোনো কথা হলেও পুনরুক্তিতে এর সত্য যে খুবই ম্লান বোধ হবে তা মনে হয় না।

ইমার্সন বলেছেন, মহামানব এমন সমস্ত কথার অবতারণা করেন যে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা বাদ করবার ক্ষমতাও তাঁর যুগের লোকের নাই। যথেষ্ট ভাববার বিষয় আছে তাঁর এই উক্তিতে। এর এক বর্ণও কি মিথ্যা? দূরে যাবার দরকার করে না, বাংলার কাব্যে ও ছন্দে মধুসূদন যে সমাধান করে গেলেন তাঁর যুগের কজন বাঙ্গালী তার সম্ভাব্যতাও কল্পনা করতে পেরেছিলেন?—তেমনি করে, বঙ্কিমচন্দ্রের দেশমাতৃকার পূজা, নির্জ্জীব বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিক বাঙ্গালীর জীবন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব শিল্পচাতুর্য্য এ সমস্তের কতটুকু আমরা, তাঁদের দেশবাসী, আজও বুঝে উঠ্‌তে পেরেছি? ফেরদৌসীর কৃতিত্ব সম্বন্ধে একজন উর্দ্দ সাহিত্যিক চমৎকার বলেছেন—ফারসী ছিল শিশু, আধো আধো তার বোল, পলকে সেই হয়ে উঠ্‌ল জওয়ান! আর সে জওয়ানীও যে-সে জওয়ানী নয়—রোস্তমের পাহলোয়ানীর যোগ্য।

এই যে বিশেষ ক্ষমতা সমন্বিত প্রতিভা, মূককে যা বাচাল করে, পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘন করায়, তা কখন, আর কেন, বিশেষ কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের

ভিতরে আবির্ভূত হয়, আজও আমরা বলতে বাধ্য, তার সব কারণ আমরা জানি না। ইতিহাসে মোটের উপর দেখতে পাই এর কার্য্য, আর অনেক সময় যে মূর্ত্তিতে প্রতিভা দেখা যায় বা সমাজে আবির্ভূত হল তা কতকটা অপ্রত্যাশিত অথবা অবাঞ্ছিত। ইহুদীরা প্রতীক্ষা করছিলেন এক প্রতিবিধিৎসু পবিত্রতার আগমন, এলেন সেখানে প্রেম-মূর্ত্তি যীশু। পৌত্তলিক নৃশংস আরব সমাজে একেশ্বর-তত্ত্ব যে একেবারে অবিদিত ছিল তা নয়, কিন্তু যে অমিত-তেজ-সম্পন্ন একেশ্বরবাদ আর নৈতিক জীবনের আদর্শ নিয়ে আবির্ভূত হলেন মোহম্মদ, সাধারণ আরবীর পক্ষে তা এতই অবাঞ্ছিত যে ব্যক্তিগত ভাবে অকথ্য অত্যাচার সারাজীবন তাঁকে ত সহ্য করতে হয়েছেই, তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর জাতি কোরেশকুলের অধিকাংশ ব্যক্তি বহুদিন পর্য্যন্ত সে তত্ত্ব বুঝে উঠতে পারে নাই।

এদের তুলনায় সাহিত্য-রথীদের শক্তি কিছু হীনপ্রভ মনে হতে পারে। কিন্তু ভেবে দেখলে বুঝতে পারা যায়, সমস্ত রকমের প্রতিভাই এক গোত্রের,— "অঘটনঘটনপটীয়সী" এই তার চিরকালের বিশেষণ।

এহেন শক্তির যিনি অধিকারী সামান্য মস্তিষ্ক সম্বল পাণ্ডিত্যাভিমানীর তাঁরই গতিপথ নির্দ্দেশ করবার নিয়ন্ত্রিত করবার যে দুরাশা তাকে স্পর্দ্ধা ভিন্ন আর কোনো ভদ্রনামে অভিহিত করা যায় না। অলঙ্কার আর ব্যাকরণ-সূত্রের জঞ্জাল জমিয়ে সাহিত্য-রথীর গতিপথে বিঘ্ন উৎপাদন যে হাস্যকর, আজকাল একথা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। এখন আমাদের মনের প্রধান মোহ—প্রচলিত নীতিরুচির মোহ সংস্কারের মোহ। বলছি না, আমাদের যে সমস্ত সংস্কার তা অর্থহীন, কেবলই মিথ্যা। তবে আমাদের সংস্কারের বাইরেও যে অনেক কিছু সুন্দর অনেক কিছু মঙ্গলকর থাকতেও পারে, সে খেয়াল আমাদের নাই, বা থাকলেও তা নির্জ্জীব, অকর্ম্মণ্য। তাই বলছি আমাদের এ মোহাচ্ছন্ন অবস্থা।

এক জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তির এই কথাকে মহামূল্য বলেই মানি—A healthy nature cannot be immoral. প্রতিভার ভিতরে এই স্বাস্থ্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান; এর মগ্নচৈতন্যে সত্য-শিব-সুন্দরের এক চমৎকার সমন্বয় আপনা থেকে হয় বলেই এর এই স্বাস্থ্য আর শক্তি। তাই প্রতিভার হাতে ধ্বংস খুবই হয় প্রলয়ও সে ঘটায়; কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়ে আসছে—সেই ধ্বংস আর প্রলয়েরই স্তরে স্তরে বিরাজমান মঙ্গল। —সীতা-সাবিত্রীর বা এ কালের সূর্য্যমুখীর আসনে আজ যদি উপবিষ্ট দেখি দামিনীকে, রাজলক্ষ্মীকে, তার জন্য

অস্বস্তি আফসোসের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কেন না এ সমস্ত এক নব পর্য্যায়ের মঙ্গল মূর্ত্তি—নব নব পথে প্রবহমান জীবনের নব নব আবিষ্কার।

কথা হতে পারে, প্রতিভাবান যা দেবেন তাকি কেবলই যুক্তকরে অবনত মস্তকে গ্রহণ করতে হবে? মনে যার প্রত্যয় জন্মে না সে কি আপত্তি জানাবে না? প্রতিবাদ করবে না?—নিশ্চয়ই করবে। কোনো বিশেষ প্রতিভাবান যা দিলেন তাই যে সত্যের একমাত্র রূপ এত বড় স্পর্দ্ধার কথা কি কেউ বলতে পারে? প্রতিবাদও অনেক সময়ে এক নব পর্য্যায়ের সৃষ্টির পূর্ব্বাভাস। এখানে শুধু এই কথাটুকু বলতে চাচ্ছি যে, শক্তিমানের প্রতি শ্রদ্ধা যেন আমরা না হারাই। তাঁর কথায় অর্থ আছে, সৃষ্টিতে নব মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে, মানুষের চিরনবীনতার তিনি এক নূতন প্রমাণ—এ কথা যেন আমরা না ভুলি।

বাস্তবিক প্রতিভার সৃষ্টিতে যে অপূর্ব্বতা, তা ভাবলে চমৎকৃত না হয়ে থাকা যায় না—চিরকালই মানুষ এতে চমৎকৃত হয়ে এসেছে। আর তার এমনি প্রভাব যে প্রচলিত নীতিরুচির মায়াকান্না তার সামনে যেন বেত্রাহত হয়েই স্তব্ধ হয়ে গেছে। ভিকটর হিউগোর জিন ভালজিনের সামনে "সদ্বংশ ক্ষত্রিয়োবাপি ধীরোদাত্ত গুণান্বিতে" এর সংকীর্ণ অর্থ চিরদিনের জন্য হেঁটমাথা হয়ে যায় নাই কি?

প্রতিভাবানের সৃষ্টির উপকরণও যে কোথা থেকে কি উপায়ে সংগৃহীত হয় সে ব্যাপারটিও কম বিস্ময়কর নয়। পুরোপুরিই তিনি দেশ কালের সন্তান; কিন্তু সে দেশ শুধু তাঁর স্বদেশই নয়, আর সে কাল শুধু তাঁর সমসাময়িক কালই নয়। রামমোহনের দেশ বঙ্গের এক প্রান্ত আর কাল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। অথচ তাঁর দেশবাসী হাবির মা পাগীর মা বড়াই বুড়ি রামনাথ তর্ক-পঞ্চাননই নয়; আর তাঁর মনোধর্ম্মের বিশিষ্টতার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর মত বৈদিক যুগ আর ঔপনিষদ্ যুগও তাঁর পক্ষে জীবন্ত। গুরু-বা-মনীষী পারম্পর্য্যও প্রতিভাবানের পক্ষে বন্ধন নয়। বঙ্গ সাহিত্যের আসরে নবীনচন্দ্রের সহজ সরল আলাপ শেষ হতে না হতেই কে আশা করেছিল রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে উঠবে এমন অপরূপ তাল মান সমন্বিত গীত ঝঙ্কার।

প্রতিভাবান যে Infallible নন, অসম্পূর্ণতা ত্রুটী তাঁতেও আছে তার ইঙ্গিত আগেই করা হয়েছে। কিন্তু তিনি যে শক্তিমান, সত্যের এক চমৎকার রূপ উপলব্ধি করা যায় তাঁর ভিতরে, এইটিই আসল গণনার বিষয়। সেই পরম কৌতুকীর এ এক চমৎকার কৌতুক যে অক্ষম অথচ দুরাকাঙ্ক্ষীমানুষকে নিয়ে

যুগ যুগ ধরে তিনি বাঁদর নাচের তামাসা দেখছেন। শক্তিমানের নাকে যে সময় সময় সে দড়ি না ওঠে তা নয়। কিন্তু তা নিয়ে ব্যস্ত হবার কি দরকার আছে? মানুষের অধিনায়কত্বে, বিশেষ করে সাহিত্যে, কোনো দিন অনধিকারীর আসন লাভ ঘটে না, জয় পত্র ললাটে বেঁধে যিনি মানুষের সামনে দেখা দিলেন স্বয়ং বিধাতারি দেওয়া সেই জয়পত্র—এ সব আমরা জানি, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে এই মোটা কথাটাও জানি যে সেই জয়পত্রের মেয়াদের কম-বেশ আছে।

ফাল্গুনীর যৌবনের দল গাহেন—"চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগেছে।" জীবনে, সাহিত্যে সত্যকার সমস্যা যদি কোথাও থাকে তবে সে এই গতির সমস্যা—পর্য্যাপ্ত জীবনানন্দ আর অপ্রতিহত চলার বেগের সমস্যা। বলা যেতে পারে, এই গতির অভিমুখেই ত Realism Idealism-এর সমস্যা, জাতীয়তা সর্ব্বজনীনতা সত্যশিবসুন্দরের সমন্বয় ইত্যাদির আলোচনা। —কিন্তু এ বৃষ্টির কথা ভুলে গিয়ে শুধু কুয়োর জল টেনে টেনে সমস্ত দেশকে সজীব রাখবার চেষ্টা, তাই চিরকাল বর্ষণধর্ম্মী স্রষ্টাদের কাছে হাসি তামাসার ব্যাপার।

বাস্তবিক বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট হয়ে যায় নাই, অতীত সংস্কারের জুজুর ভয়ে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ক্ষীণ কাহিল হয়ে পড়ে নাই সমস্যা নিয়ে কোনো সমস্যাই সেখানে নাই। নানা সমস্যার আলোচনা সেখানে চলতে পারে, কিন্তু সে সব খেয়ালের নামান্তর।

সমস্যা যাতে "জীবন" রাজের দরবারে মোসাহেবী করতে পারে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হবার স্পর্দ্ধা না রাখে, যদি কোনো দিকে দৃষ্টি রাখবার দরকার করে তবে সেই দিকে। [ফরিদপুর সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত]



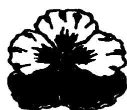
চিত্তরঞ্জন দাশ

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

যেই প্রাণ-মহানদ ছুটিয়াছে গ্রহ হতে তৃণের তরঙ্গে,
আগ্নেয় পর্ব্বতোদ্গারে, বিহঙ্গে আর শার্দ্দূলে, ভুজঙ্গে,
সূর্য্যের তূর্য্যের ছন্দে, উল্লাসিনী কল্লোলিনী-হিল্লোল-লীলায়,
নটিনী সে ঝটিকার উন্মত্ত নর্ত্তনে, তারে তুমি বেঁধেছিলে
তোমার দুর্ব্বল ক্ষীণ মৃন্ময় দেহের প্রতি স্নায়ুতে শিরায়
ক্ষুদ্র এই আয়ুকুণ্ডে ; রক্তে রক্তে আবর্ত্তিয়া তুমি তুলেছিলে
শক্তি-মুক্তধারা ! তাই শৃঙ্খলের আলিঙ্গন করি' উল্লঙ্ঘন
কৃত্রিমেরে চূর্ণ করি' বাহিরিয়া এলে হে সন্ন্যাসী বিবসন,
জ্বলন্ত জটার তলে গঙ্গার তরঙ্গ নিয়া এসেছিলে, শিব,
সে তরঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গে মূর্চ্ছাহত মৃত্তিকার নিষ্প্রভ নির্জ্জীব
যত গুল্ম তৃণ-বৎস স্তন্য পিয়া' স্কন্ধে তুলি' প্রাণের পতাকা
করেছিল যাত্রা হায় দুর্দ্ধর্ষ উদ্ধতভরে ; বীজের বলাকা
তব মুক্তি-বীজমন্ত্রে জন্ম লভি' মৃত্তিকার গর্ভ দীর্ণ করি'
রৌদ্রের প্রসাদ পেল। তোমার দৃষ্টির ত্রাসে উঠিত শিহরি'
হে বন্ধনহীন বাত্যা, হে আদিত্য, যত মিথ্যা দৈত্য-কারাগার,
হে বিহঙ্গ, তব পক্ষ-সঞ্চালনে চূর্ণ যত পিঞ্জরের দ্বার ;—
কে তোমা' রাখিবে রুধি' ? রুধিরে বারিধি তব উন্মত্ত উধাও !
হে করাল, হে কাল-বৈশাখী, অবশেষে তাই তুমি ভেঙ্গে যাও
ভঙ্গুর দেহের কারা চিরমুক্তি-তীর্থমুখে, ওগো তীর্থভূত !
মন্দার-সুগন্ধ নিয়া প্রাণানন্দে বন্ধহারা নন্দন-বিচ্যুত
এসেছিলে মর্ত্ত্যভূমে ; হিমালয় হল তব নব পীঠস্থান
হে মহেন্দ্র মানবেন্দ্র। প্রাণের আগুন জ্বালি তপ্ত লেলিহান
খাণ্ডব দাহন করি' দানবেরে দলিয়াছ তাণ্ডবে তাণ্ডবে
জ্বলজ্জটা হে ধূর্জ্জটি ! হে দুর্জ্জয় শম্ভু, তব শঙ্খ-হাহারবে

জাগালে বাত্যা ও বন্যা। হে উদাত্ত উত্তাল বিশাল অম্বুনিধি,
কে মাপিবে অঙ্ক কষি তব ভাব-উচ্ছ্বসিত প্রাণের পরিধি,
শবের শ্মশানতলে তব নগ্ন তপস্যার কে বোঝে মহিমা?
তুমি যে সমুদ্র রুদ্র, তাই লঙ্ঘি' ক্ষুদ্র দুই বদ্ধ তটসীমা
বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি' আপনারে চতুর্দ্দিকে বিচূর্ণ করিয়া
পরিপূর্ণ পান করি' প্রাণের মদিরা, এলে তুমি উৎপাটিয়া
মহীন্দ্র ও মহীরুহ। হে বিদ্রোহী মেঘনাদ, হে নিত্য-জাগ্রত
আবার প্রশান্ত তুমি নিশান্তের স্নিগ্ধজ্যোতি আকাশের মত,
তোমার নয়নে জ্বলে শত সূর্য্য আর শত শতদল সৌরভ-মাধুর্য্যে;
বুকে মরুভূর জ্বালা, আর তৃণ-মঞ্জরীর শ্যামল প্রাচুর্য্যে
নিত্য নিত্য নব নব জন্মের উৎসব! তুমি কৃষ্ণ চক্রধারী
হনি অক্ষৌহিনী সেনা, আবার প্রেমের বেণু হে কবি, ফুকারী'
আনন্দের বৃন্দাবন করিলে সৃজন; গীতার উদগাতা নব,
শিখাল ব্রহ্মণ্যতেজ অকর্ম্মণ্যে, বহ্নিদীপ্ত রুদ্র অস্ত্র তব।
ভুজঙ্গেরা তব অঙ্গস্পর্শ লভি' হয়েছে যে লবঙ্গ-লতিকা,
শৃঙ্খল হয়েছে স্বর্ণ, ধরা দেয় মায়াবিনী মরু-মরীচিকা
তোমার দৃষ্টির তলে; ওগো ক্ষিপ্ত দৃপ্তজ্বালা দীপ্ত সর্ব্বভুক,
ধূলায় নামিয়া আসি, হে সন্ন্যাসী, ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ, সেজেছ ভিক্ষুক,
কমণ্ডলু ভরিয়াছ মুক্তি-তীর্থোদকে, করিয়াছ প্রাণ-ভিক্ষা
বজ্রেতে বোধন যার, কণ্টক তপস্যা তীব্র, দুঃখ বহ্নি-দীক্ষা,
যে প্রাণ প্রহ্লাদ সম দুরন্ত আহ্লাদে নাচে উত্তপ্ত কটাহে,
তারে তুমি ডাক দিয়া ফিরিয়াছ পথে পথে অশ্রান্ত উৎসাহে
ভূষাহীন ওগো মুসাফের! অহর্নিশি ওগো তাই তুমি ঋষি-রাজ,
মুক্তি চেয়েছিলে, তাই সঞ্চিত নিস্ফল যত ঐশ্বর্য্যের লাজ
নিক্ষেপিয়া ঘৃণা আবর্জ্জনা সম সেজেছিলে নগ্ন নিঃসম্বল
মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলি; তাতেও ছিল না তৃপ্তি, তাই অনর্গল
প্রাণের পবিত্র হবি রুদ্র মুক্তি-যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিয়াছ,
দেহের বন্ধন টুটি' চিরমুক্তিতীর্থ তুমি তাই লভিয়াছ।
এ আয়ুর আয়তনে কে তোমা' করিবে বন্দী, হে দুর্দ্ধর্ষ বীর,
মৃত্যুতেও নাই নাই তোমার সমাপ্তি, কবি, তুমি যে অস্থির

সৃষ্টির যাত্রার ছন্দে মিশাইলে তব মত্ত নৃত্যের কিঙ্কিনী,
মৃত্যু-অমাবস্যা মাঝে বহাইলে বিদ্রোহের প্রাণ-প্রবাহিনী,
অজস্র অশ্রুর সাথে সহস্র আনন্দ ! তুমি বঙ্গের অঙ্গনে
আরম্ভিয়া গেলে যজ্ঞ, সেই অগ্নি উল্লঙ্ঘিয়া উঠিছে গগনে
হেরিতে তোমার মুখে সর্ব্বশেষ বিজয়ের নিঃশব্দ আহ্লাদ !
মৃত্যুতে, হে পুরোহিত, রেখে গেলে এই মন্ত্র, এই আশীর্ব্বাদ !



আশার ফাঁদ

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

অপরাহ্ন; আমার মনের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। তবু আমাকে যেতেই হোলো। আশাকে খবর পাঠিয়ে আমি তাদের বাইরের বৈঠকখানা ঘরে একখানা চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে রইলুম। চেয়ারের সাম্‌নে একটা টেবিল ছিল, তার উপর ছিল খানকতক বই আর ঝি চাকরকে ডাক্‌বার জন্যে একটা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা। আমি এত উত্তেজিত অবস্থায় ছিলুম যে টেবিলের উপর রুমাল ফেলে, ছড়িটাকে পকেটে রাখ্‌বার চেষ্টা ক'রছিলুম। হঠাৎ ভুল বুঝ্‌তে পেরে ছড়িটাকে চেয়ারে ঠেস দিয়ে রেখে, বেশ ক'রে মুখ আর কপাল মুছে রুমালখানাকে পকেটে পূরলুম।

যে সুন্দরী কিশোরীকে পৃথিবীতে সকলের চেয়ে ভালোবাসি, পরশু পর্য্যন্ত যার সঙ্গে প্রেমে, আনন্দে কেটেছে, অথচ যে কাল ব'লেছে তার আমার মুখ দেখ্‌তে চায়না, তার কাছে ক্ষমা বা বিদায় চাইতে যাওয়া মনের কি ব্যাপার তা ভুক্তভোগী ছাড়া কাউকে বোঝান যায় না। আমার সমস্ত বুক কাঁপ্‌ছিল। আশা যে প্রয়োজনকালে এমন ভাবে মানুষকে দ'ল্‌তে পারে, তা' কাল জানলুম।

হঠাৎ দরজা খুলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গেই আশা ঘরে ঢুক্‌লো। নিজকে একটু সাম্‌লে নিয়েই বল্‌লে, "তার পর কার্ত্তিকবাবু ?"

আমি কম্পিতকণ্ঠে ব'ল্‌লুম, "ক্ষমা চাইতে এসেছি"

"সত্যি ?"

"কাল আমি নির্ব্বোধের মত আচরণ ক'রেছি"

"আপ্‌নাকে আমি অভিনন্দিত ক'রছি"

"কিসের জন্যে ?"

"আপ্‌নি নিজের আচরণের যথাযথ বর্ণনা ক'রেছেন বলে"

"ও"

"আপনার কথা শুনলুম; এখন তা হ'লে আমি যাচ্ছি"

"না না; শোনো আশা, আমি অভিমান-আহত হ'য়ে কাল কড়া কথা ব'লেছিলুম সে জন্যে অনুতপ্ত হ'য়েছি"

"চল্লুম" ব'লেই আশা টেবিলের উপরকার বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতামটা দুবার জোরে টিপ্‌লে।

"কিন্তু"

"আমার চাকর আপ্‌নাকে বাড়ীর বাইরে যাবার পথ দেখিয়ে দেবে"

"কিন্তু, আশা"

সে কথায় একেবারেই কর্ণপাত না ক'রে, আশা টেবিলের সাম্‌নের অন্য একখানি কেদারায় ব'স্‌লো আর একটা বই নিয়ে প'ড়্‌তে লাগলো। আমি কঠিনভাব ধারণ ক'রে, তার সাম্‌নে গিয়ে ব'স্‌লুম আর ব'ল্‌লুম, "আমি যা ব'ল্‌তে এসেছি তা তোমাকে না শুনিয়ে এক পাও ন'ড়্‌বোনা।"

কাল তোমার বাড়ীতে আস্‌তে আমার দেরী হ'য়েছিল এই জন্যে যে আপিসে কাজ বেশী ছিল, তার উপর ট্রাম পেতে খুব দেরী হ'য়েছিল। তাই তুমি যখন ব'ল্‌লে যে আমি ইচ্ছে ক'রে দেরী ক'রেছি, আমি অভিমানে ব'লেছিলুম বেশ করেছি। কিন্তু সে কথা বলার পরই আমি মনে খুব কষ্ট পেয়েছি; আমাকে কি তুমি ক্ষমা ক'র্‌বেনা, আবার আমাদের আগেকার মত বন্ধুত্ব হ'বেনা?"

আশা পাথরের মত নীরব নিশ্চল হ'য়ে রইল।

"ক'র্‌বেনা? আচ্ছা বেশ, আমার আর কিছু বল্‌বার নেই তোমার চাকরকে ডাক্‌তে পার"

আশা আবার বারকতক ঘণ্টার বোতাম টিপে, তেম্‌নি ভাবেই বই প'ড়্‌তে লাগ্‌লো, আমি বোকার মত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম।

আরও পাঁচ মিনিট নীরবে কাট্‌লো। আমি ব'ল্লুম, "তুমি আর একবার ঘণ্টা দাও।"

আশা সেই মত ঘণ্টা দিলে।

আরও দশ মিনিট কাট্‌লো, কারুর দেখা নেই। আশাও বই থেকে মুখ তুল্‌লে না।

আমি আর সহ্য ক'রতে পারলুম না; ছড়িটা চেয়ারের গা থেকে নিয়ে বল্লুম "আমি নিজেই যেতে পার্‌বো, চাকরের কোনো দরকার নেই—বিদায়।"

আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে চেয়ে আশা ব'ল্‌লে, আপনি এখনো যান্‌ নি?

"তুমি খুব জান যে আমি যাইনি তবু চালাকি ক'রছ" বলেই খেয়াল হোলো যে আবার কড়া কথা বলেছি।—"আশা আমায় মাফ কর, বিদায় দাও।"

আশা যেন একটু নরম হোলো; বল্লে, "বিদায় নেবার আগে এই চিঠিটা নিন্; তাকেই দিতে যাচ্ছিলুম কিন্তু আপনি যখন নিজেই এসেছেন, আপনার হাতেই দিলুম। এতে লেখা আছে যে আপনার আশাকে যদি মার্জ্জনা ক'রতে পারেন তো—

আমি তার হাত দুটি ধরে ব'ল্লুম "আশা, তবে কি তুমি এতক্ষণ আমায় পরীক্ষা ক'র্‌ছিলে?"

"আপনি কি ভেবেছিলেন আশা তার হৃদয়ের আশা ভালোবাসাকে সত্যিই বিদায় নিতে দেবে?"

"তবে ঘণ্টা টিপেছিলে কেন, আর আমার কথায় কান না দিয়ে বই প'ড়ছিলে কেন?"

"ঘণ্টার ওদিকের তারটা যে কাটা, আর বই খানা যে উল্টো ক'রে ধ'রেছিলুম, অভিমানের আধিক্যে তা' আপনার নজরেই পড়ে নি।"

"তা হ'লে?"

"তা হ'লে কাপড় জামা বদ্‌লে আসি, এখুনি আমায় বেড়াতে নিয়ে চলুন।"



মেশিনের পাশে

শ্রীতারানাথ রায়

(এক)

মেশিনের পাশে বসে সেই কথাগুলো ভাবছি। কেন পাঁচীকে মারলাম! অপরাধ তার অসুখ করে কেন? অসুখ আবার মানুষের করে না? কিন্তু অমন করে সে বলবার কে? আমি মদ খাই গোল্লায় যাই ও তার বলবার কে।

ভাল লাগছে না-- মনোকাগজের রোলটা জড়িয়ে ফেলে রেখে বোতলের ছিপি খুলে—ভাবলুম না খাব না! কেন খাবনা? খাব কি? বাড়ীতে গেলে সেই ঘেনর ঘেনর—কেন বাপু—দিনে ১৮ ঘণ্টা খেটে ৫মিনিট বাড়ী যাব তাও সইবে না। ধুৎতোর মাগ-ছেলে। বোতল উড়িয়ে দিয়ে আবার মেশিনের পাশে বসে পুরাদমে কাজ চালালাম।

রাত তখন ৫টা। শিষে ফুটছে। মেশিনের ঘড়ঘড়ি চলছে। মাথার ভিতর আগুন জ্বলছে। বুকের ভিতর কেমন করছে—কেন মারলেম। আহা, ওর যে পেটে আজ কয়দিন দানা পড়ে নি। কচিগুলো,—চোখমুছে মেশিন ছেড়ে উঠলাম।

অপারেটর বল্লে, কোথায় চল্লে?

কোথায় আবার, গোল্লায়—

গোল্লায়! গোল্লায়! পাঁচী কেন বল্লে গোল্লায়। ও বলবার কে? ও বলবার কে?

আবার মেশিনে বসলুম।

সফি এসে বললে, দাদা আজ শুকনো থাক্‌বে—

না—দে—'

মাটির ভাঁড়ের ভুভাঁড় আবার খেলাম। হুস্ নেই মেশিনের পাশেই ঘুমিয়ে পড়েছি। হুস নেই—

(দুই)

সাতদিন বাড়ী যাইনি। কচি এসে সে দিন বল্‌লে, বাবা, মার বড্ড অসুখ, ঘর যাবে না?

খেয়েছিস কি?

ছোড়াটা সভয়ে মাথা নেড়ে আমার রাঙা চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে রইল।

তাকিয়ে রইল ছোট্ট চোখ দুটো কেমন করে যেন আমার চোখ দুটো পুড়িয়ে দিল!

খাসনি?—খেঁদ?

সে ও না।

খেঁদি ও না!—

দৌড়ে গিয়ে দোকান থেকে কচুরী সিঙ্গারা এনে বাছাকে খেতে দিলাম।

বাড়ী গিয়ে দেখি পাঁচী কাঁদছে, পাশে খেঁদি নেতিয়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে।

পাঁচী!—

সে আমার দিকে তাকালে না, কাঁদতে কাঁদতেই উত্তর দিল,—কি?

আমি কি সাধ করে মদ খাই বল্, তুই হলে তুইও খেতিস্।

পাঁচী চুপকরেই রইল কথা বললনা।

আমি কি হুঁসে তোকে মেরেছি রে? মনে দুঃখ করিসনি! তুই ত জানিস্ নি! অমন শিবের ভাটি—অমন খাটনি ·· ···

ফ্যাকটরী ডাক্তারকে দু'টাকা দিয়ে এনে দেখালাম সে বললে, পাঁচী বাঁচবে না।

বাঁচবে না! বাঁচবে না কি?—মাগ্ না বাঁচবেনা—বাঁচতেই হবে? ডাক্তারের উপর রাগ হল, দুটো টাকা নিল আবার বলে বাঁচ্‌বে না!

পাঁচী বললে, এরা রইল দেখো—আমি বাঁচব না!

কেন বাঁচবিনে রে! কেন বাঁচবিনে? ফুট পাথে ওরা পড়ে থেকে বাঁচে তুই বাঁচবিনে—আমি মেরেছি তাই? হাঁরে পাঁচী, তাই! যা, আর মারব না! বল বাঁচবি।

মনের সাধে খুব খাওয়ালুম। সে মাসের বেতনে আর উপর-টাইমে ত কম পাইনি! সব পাঁচীকে দিয়ে বললাম, যা খুসি তুই খরচ করিস্।

দু'দিন বাড়ী বসেছি কি পেয়াদা এসে হাজির, বলে কাজ চলে না! পাঁচী তখন ঘর নিকোচ্ছিল। কাদা-হাতে এসে বললে আবার আসচ করে? ঠোঁটে

তার একটা অতৃপ্ত ক্ষুধা, চোখে একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা। মুখে বলছে—দুটো ভাত রেঁধে দেই খেয়ে যাও!

আমার মনে কল্‌জের শাঁসটা পর্য্যন্ত নাড়া দিয়ে কি একটা ক্ষুধা জাগিয়ে দিচ্ছে।

পিয়াদার তর সইল না, পিয়াদা তথা কোম্পানীর পিতৃ-পিতামহকুল উদ্ধার করতে করতে পাঁচীর পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে বললুম—দুঃখ করিস্‌নে, আসি—

চৌকাঠ পার হতেই কচির মৃদু চীৎকারে পেছন ফিরে দেখি, পাঁচী কাদা হাতেই তাকে বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরে নিঝুম হয়ে বসে রয়েছে।

(তিন)

টাকার ভাবনা ওর কোনদিনই হয় নি। তবে রাগ ক'রে সে টাকা আর চাইত না। আমিও ফ্যাক্টরীর কাজে আর মদের ঝোঁকে এমনি বিভোর থাকতুম্ যে বাড়ীর কথা আর ভাব্‌বার ফুরসুৎ রইত না—

কিন্তু পাঁচীর চোখ দেখে আমি বেশ বুঝতাম ও যেন কি চায়, পায় না! যখন ঘরে যেতুম সে আমার খাবার দিকে তত নজর দিত না, আমার কাছে পয়সার জন্ম তাগিদ্ দিত না, এমন কি কচি-খাঁদির খাওয়ার কথা পর্য্যন্ত ভুলে যেত। বড্ড ভোলা ভোলা হয়ে থাকৃত, চোখে মুখে তার একটা মস্ত আকাঙ্খা যেন ফুটে বের হত! সময় সময় আমার নজর পড়ত কিন্তু পরক্ষণেই মেশিনের ঘচং ঘচং শব্দ কানে বাজত, শিষের ধোঁয়া চোখে নাচ্‌ত!

একদিন আমায় হঠাৎ বল্‌লে—বিয়ে করেছিলে কেন,আইবুড়ো থাকলেই হ'ত।

মন তখন ভাল ছিল না, ফ্যাকটারী ম্যানেজারের বকুনি খেয়ে তখন মেজাজ গরম! কথার উত্তরে পাঁচী আমার লোহার হাতের কিল ছাড়া আর কিছু পেল না।

আইবুড়ো থাকলেই হ'ত? তখন তুই থাকৃতিস্ কোথায়!

মার খেয়ে সে চেঁচিয়েছে, গালাগালি দিয়েছে, উনুন ভেঙেচে, ভাত শুদ্ধ হাঁড়ি আস্তাকুঁড়ে টেনে ফেলে দিয়েছে! তবু দেখেছি—ও কি চায়!

একদিন জিজ্ঞাসা করলেম, হারে পাঁচী, তোর সোনা মুখ ত একদিন দেখলুম না, আমি এলেই তুই প্যাঁচা হয়ে বসে থাকিস্ কেন বল্ ত?

গম্ভীর ভাবে সে বল্লে, ভগবান্ প্যাঁচা করেছে তাই থাকি।

একদিন গল্পে গল্পে বলেছিলুম যে ফ্যাকটারীর সবাই ত এমনি বৌ-এর মুখ দেখতে পায় না, ঘোল খেয়ে দুধের সাধ মেটায়।

প্রথমে সে বোঝে নি, তারপর বুঝে বল্লে, তুইও?

হাঁ-না কর্‌তেই, সে রাগ করে বলে উঠলে, অমন সোয়ামী মরাই ভাল।

(চার)

সে কি বিষম খাটুনি! মদ উড়েছিল বিশ টাকার। মেশিন যেমন জোরে চলেছে আমার হাতও তেমনি জোর চলেছে।—বিজলী বাতির গরম যেমন দিনের পর দিন বেড়েছে আমার চোখের রাঙা আলোও নাকি তেমনি বেড়েই চলেছে!

চোদ্দদিন পর একদিন রাতে বাড়ী এলুম। দোরগোড়াতেই পাড়ার বিজয়ের সঙ্গে দেখা। বিজয় বল্লে, আবার বুঝি ছুটি পেলি?

হাঁ!

ওর মুখে গন্ধ—মদের। বাড়ী ঢুকলুম। পাঁচীকে জড়িয়ে ধরেই ছেড়ে দিলুম—ওরও মুখে গন্ধ—মদের। পিঠে একখানা মোটা লাঠি ভেঙ্গে ফেললুম। ছেলে মেয়ে কেঁদে মাকে আগ্‌লাতে এলেই লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম।

পাঁচী কাঁদল না! খিল্ খিল্ করে হেসে বল্লে—বুঝ্‌লে—বুঝ্‌লে—আমিও মানুষ—তোমাদের ফ্যাক্‌টারীতে, রকম-সকম আছে, আমার? আমার?

তোর?—

এক ডাণ্ডায় মাথা ফাটিয়ে দিয়ে চলে এলুম। বিজয়কে একদিন পথে পেয়ে কশে ঘুঁষা দিয়ে দিয়েছিলুম। সে বলেছিল, আমায় মেরে কি করবি, নিজের ঘর সাম্‌লাতে পারিস্ না?

(পাঁচ)

পাঁচীর আর মুখ দেখিনি। সব টাকা দিয়ে মদ খাই আর ফ্যাক্‌টারীর কাজ করি। বাবুরা ভারী খুশী! বেতন বাড়িয়ে দিলে।

সেদিন ছুটি! মেশিন সাফ করে, মদের দোকানে গিয়ে ভর-পেট টেনে যেই বেরিয়েছি, অমনি পথে......

দুটো ছেলে-মেয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে! ছেলেটা ভয়ে ভয়ে মেয়েটাকে বল্‌ছে—বাবারে!

বাবা কিরে!

আমার চোখ বলে চিন্‌তে পারি পারি, মন বলে পারি না—চিনতে চাইনা, চিনতে দেবনা।

পাঁচীর কথা, বাড়ীর কথা মনে পড়ল। টলতে টলতে খানিক দূর গিয়ে একখানা বাড়ীর সিঁড়ির উপর বসে পড়লুম। বড্ড মাতাল হয়ে গেছলুম। জেগে দেখি ছেলেটা মাথার ধুলো ঝেড়ে দিচ্ছে, মেয়েটা গায়ে হাত বুলোচ্ছে। কি জানি কেন দুটোকে ধরে চুমু দিয়ে দিলাম। বুকের ভিতর হা হা ক'রে উঠ্‌ল—পাইপ ভেঙ্গে যেন গলা-শিষে বুকের মধ্যে গড়িয়ে যেতে লাগ্‌ল।

হারে, তোদের মা?

দুই জনেই একত্র বলে উঠ্‌ল--মা তোমাকে ডাকছে বাবা!

ডাকছে?

গম্ভীর ভাবে বললুম -ডাকছে! চল্‌।

পাশের একটা খোলার ঘরে, তারই তিনহাত এক কুঠ্‌রী। পাঁচী আমায় দেখেই ডুকরে কেঁদে ফেললে। আমার যে শুকনো-চোক, আমারও চোখে জল এল। আমায় জড়িয়ে ধরলে। টলছিলাম, শক্ত হয়ে দাঁড়ালুম।

আমি যে আর পারিনে—আর পারিনে!

কি পারিস্‌নে পাঁচী?

আমি খবর পেয়েছি ঢের দিনই বিজয় তাকে ছেড়ে দিয়েছে। পাঁচী উপায় ক'রে বেশ—সুখে আছে। এখন আবার পারিনে কি বলে বুঝলুম না!

কি পারিস্‌নে পাঁচী?

রোজ আট দশজন গুণ্ডা আসে, আমি পারিনে।

গুণ্ডা—আট দশজন!

আহা, চেয়ে দেখলুম সে শরীর নেই, সেই গোলগাল চেহারা শুকিয়ে গেছে!

আমায় নিয়ে চল্‌—আমি বাঁচ্‌ব না।

যাবি!—চল্‌—

নিয়ে গেলুম—আমারই স্ত্রী ত!



পান্থবীণা

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

—১৭—

দুঃসংবাদ পৌঁছিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। পরদিন নিভা আর গায়ত্রীর কাছে যায় নাই, কিন্তু কৈলাসকে বলিয়া রাখিয়াছিল সে যেন প্রতিদিন প্রাতে ডাক্তারখানা হইতে টাকা লইয়া তাহাদের বাজার করিয়া দিয়া আসে। প্রথমদিন কৈলাস আসিয়া কিছুই বলে নাই, কিন্তু দ্বিতীয় দিন প্রাতে সেখান হইতে কৈলাস যে সংবাদ বহন করিয়া আনিল, সত্যই তাহা নিদারুণ, শুনিয়া অবধি নিভার দুশ্চিন্তার আর অবধি রহিল না।

প্রথমত সংবাদটা শুনিবামাত্র কৈলাসকে নিভা আর কোনও প্রশ্ন করিতে পারিল না, কথাটা সে একবার বেশ ভাল করিয়া চিন্তা করিবার জন্য কিয়ৎক্ষণ মৌন হইয়া থাকিবার পর জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি তাঁকে নিজে দেখে এলে কৈলাস?

আজ্ঞে না দিদিমণি, সে অনেক কথা।

কিন্তু নিভাকে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে হইল না, উদ্‌গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে সে তাহার মুখের পানে একবার চোখ তুলিয়া তাকাইতেই কৈলাস বলিল, আজ আমার সেখানে যেতে একটুখানি দেরি হয়েছিল দিদিমণি, তাই আমি ভাবলাম একেবারে বাজারটা করেই নিয়ে যাই। গেলাম, দেখি, বুড়োবাবু তখন নীচের বারান্দাটার উপর থর্ থর্ করে' কাঁপতে কাঁপতে ঠিক যেন ক্ষ্যাপার মতন অস্থির হয়ে ছুটাছুটি করছেন। আপন মনেই কত-কি-সব বলছিলেন,—জোচ্চোর, পাজি, দুনিয়াটা গেল দিনে-দিনে, গেল একেবারে উচ্ছন্নে গেল। কেউ কারও কথা শোনে না, বলি, বুড়োমানুষ আমি বাবা হাতে ধরছি, আশীর্ব্বাদ করছি বাবা একটা কথা শোন্,—গরীবের একটা উপকার কর্, তা না, ব্যাটারা

সব যেন নবাব। আমি বললাম, কি বলছেন বলুন আমায়, কে আপনার কথা শুনলে না ?

কে ? কে তুমি ? ব'লে তিনি আমার মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমি বললাম, ওবাড়ী থেকে এসেছি, আমি সেই কৈলাস।

তখন তিনি আমায় চিনতে পারলেন বললেন, তুমি আমার একটি কাজ কর ত' ভাই,—এণ্ডারসন্ কোম্পানী জান ? খুব বড় কোম্পানী বড়বাজারের কাছে, ক্লাইব ষ্ট্রীটে। যাও, এক্ষুনি যাও, গিয়ে বল সেই বড় সাহেবকে যে তোমার বড় বাবু, যাকে তুমি পেন্‌সেন্ দিতে তার বাড়ীতে ভারি বিপদ, তুমি নিজে একবার এসো, এসে সব ব্যবস্থা করে যাও। বুঝলে ; পারবে ত গুছিয়ে সব কথা বলতে ? ভয় করো না, সাহেব ভারি ভাললোক হে,—এমনি সব আরও কত কি বলেই তিনি চুপ ক'রে সেইখানে বসে পড়লেন, আর বিড়্ বিড় করে আপন মনেই বকতে লাগলেন। দেখে শুনে আমি ত' অবাক্ দিদিমণি,— কি যে করব কিছু ভেবে পাচ্ছিনে, হাতে তখন আমার বাজারের থলেটা। ওবাড়ীর দিদিমণি বোধ করি উপরে ছিলেন, সেইখান থেকেই হাঁকলাম, দিদিমণি, দিদিমণি, আমার ডাক শুনে তিনি নেমে এলেন। আমাকে দেখেই বললেন, বাজার কি জন্যে আনলে কৈলাস, আচ্ছা, তুমি একটি কাজ কর লক্ষ্মী ভাইটি আমার, তোমার দিদিমণিকে গিয়ে বল, বংশীর উপর মা-শীতলার কৃপা হয়েছে। ডাক্তারবাবুকে একটিবার পাঠিয়ে দিতে বলো। সে নিজে যেন এখন আর এবাড়ীতে না আসে।

তাঁর বাবা কাছেই বসে ছিলেন। কথাগুলো শুনলেন, বল্লেন, তাহ'লে ত' এণ্ডারসন্‌কেও এখানে আসতে বারণ করে দিতে হয় মা, হোক্ না বিদেশী, তাহ'লেও ত মানুষ ! না-না, তাকে আসতে হবে না, বলো, ছ'মাসের পেন্‌সন্ একসঙ্গে পাঠিয়ে দিতে। যাও, তুমি তাহলে এক্ষুনি যাও।

বাজারের থলেটা দিদিমণির হাতে দিয়ে বললাম, সাহেবের ঠিকানাটা তাহ'লে আপনি একটা কাগজে লিখে দিন দিদিমণি—

দিদিমণি চোখ টিপে' আমায় বারণ করলেন।

আর বেশি-কিছু শুনিবার প্রয়োজন নিভার ছিল না। তাড়াতাড়ি সেখান হইতে উঠিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, শীতলা মায়ের কৃপা কি ওই ওকেই বলে নাকি কৈলাস ?

ঘাড় নাড়িয়া কৈলাস বলিল, কালিঘাটে মা শীতলার পূজো-টুজো দিলেই ও ব্যামো সেরে যায় দিদিমণি। অনেকদিন আগে আমার সেই মেজ ছেলেটার উপর মায়ের কৃপা হয়েছিল একবার—

নিভার কিন্তু সে সময় তাহার মেজছেলের কৃপার কথা শুনিবার অবসর এবং ধৈর্য্য কিছুই ছিল না, জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তারবাবু এসেছেন নীচে?

কৈলাস পুনরায় ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে তিনি আসিয়াছেন।

নিভা সে ঘর হইতে বাহির হইয়া পাশের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। কৈলাস চলিয়া গিয়াছিল, তাহাকে পুনরায় ডাকিয়া কহিল, ডাক্তারবাবুকে বসতে বল, আমি নীচে যাচ্ছি।

বিভা বলিল, কোথা যাবে দিদি, আমি যাই তোমার সঙ্গে।

অন্যদিন হইলে নিভা হয়ত তাহাকে ধমক্ দিয়া চুপ করাইত, কিন্তু আজ আর তাহার সে প্রবৃত্তি হইল না। ধীরে ধীরে তাহার কাছে গিয়া দুইহাত দিয়া বিভাকে সস্নেহে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, একটুখানি খেলা কর লক্ষ্মী দিদি আমার আমি এক্ষুনি আসছি।—বলিয়াই সে আর অপেক্ষা না করিয়া নীচে নামিয়া গেল এবং ডাক্তারবাবু ও কৈলাসকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ তাহারা তিনজনে পায়ে হাঁটিয়াই বাহির হইয়া পড়িল।

সদর দরজা পার হইয়া উঠানে পা দিতেই দেখা গেল, নীচের বারান্দায় বসিয়া রত্নেশ্বর ঝিমাইতেছেন। সুমুখে পায়ের শব্দ হইতেই তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন এবং শুধু তাহাই নয়, সাহেবী পোষাক-পরা ডাক্তারকে দেখিবামাত্র নিঃসন্দেহ তিনি তাঁহাকে এণ্ডারসন্ ঠাওরাইয়া আনন্দে সহসা যেন লাফাইয়া উঠিলেন, এবং তাড়াতাড়ি ডান হাতখানি তুলিয়া Good morning Mr. Anderson, you are so kind Sir—কি আর বলব—Sir বলিতে বলিতে অদূরে তিনি তাঁহার তক্তপোষের কাছে গিয়া কম্বলখানি তাহার উপর বিছাইয়া দিবার জন্য হাত বাড়াইয়া থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

ডাক্তার নূতন মানুষ, প্রথমে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কথঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াই নিভার দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন। দক্ষিণদিকে উপরে উঠিবার সিঁড়ি ধরিয়া নিভা কহিল, আসুন ও কিছু না। কৈলাস তুমি নীচে থাক। ওঁকে বল, উনি ডাক্তারবাবু।

শব্দ শুনিয়াই বোধকরি রোগীর ঘর হইতে গায়ত্রী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া-

ছিল। মুখখানি শুক্‌নো মনে হইল, দুশ্চিন্তায় সমস্ত রাত্রি সে ঘুমায় নাই। ডাক্তারবাবুকে দেখিয়া সসঙ্কোচে সে একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইল।

নিভা তাহার মুখের পানে তাকাইল, কিন্তু কোনও প্রশ্ন করিতে পারিল না।

ডাক্তার ও গায়ত্রীর সঙ্গে নিভাও রোগীর ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, সহসা ঘরের ভিতর হইতে মর্মান্তিক একটা করুণ আর্তনাদ তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিতেই আপাদমস্তক তাহার শিহরিয়া উঠিল এবং দরজার কাছে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ডাক্তারবাবু মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, That's it, ther's every chance of infection—you shouldn't come in.

কথাটা শুনিবামাত্র ডাক্তারের দিকে অবজ্ঞাভরা একটা রুক্ষ দৃষ্টি হানিয়া নিভা চোখ বুজিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। এবং পাশেই যে-ঘরখানা ফাঁকা পড়িয়াছিল, ধীরে ধীরে সেইখানে প্রবেশ করিয়া তাহারই একটা খোলা জানালার কাছে গিয়া শিক ধরিয়া সুমুখে একটা গলি রাস্তার দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে সে তাকাইয়া রহিল।

আবার সেই আর্তনাদ!...

নিভা ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তারবাবু নামিয়া আসিলে যেমন আসিয়াছিল তাহারা তিনজনে আবার তেমনি বাহির হইয়া যাইতেছিল, হঠাৎ পিছনের বারান্দা হইতে গায়ত্রী ডাকিল, নিভা!

নিভা ফিরিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, দুইখানা কাগজের টুকরা হাতে লইয়া নিতান্ত অসহায় ভাবে গায়ত্রী দাঁড়াইয়া আছে।

নিভা জিজ্ঞাসা করিল, ও কি দিদি?

এই নাও—যা হয় কর! বলিয়া কাগজ দুইখানি গায়ত্রী তাহার হাতে ফেলিয়া দিয়া পুনরায় রোগীর ঘরে চলিয়া গেল।

নিভা দেখিল, একখানা ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌, আর একখানার উপর মশারি ইত্যাদি রোগীর যাবতীয় প্রয়োজনের তালিকা লেখা রহিয়াছে।

কাগজ দুইটা হাতে লইয়া নিভা বাহিরে আসিয়া ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন দেখলেন ডাক্তার বাবু?

টাইপ্‌ বড় ভাল নয়। বলিয়া ডাক্তারবাবু নিভার মুখের পানে একবার তাকাইলেন, কিন্তু উত্তরে তাহার মুখ দিয়া আর কোনও কথাই বাহির হইল না দেখিয়া তিনি আপন মনেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন, সেদিন আপনি বল্লেন

বটে সেই বসন্ত-রোগীটিকে দেখে আস্‌তে,—দেখেও এলাম, কিন্তু উনি রয়ে গেলেন তাঁদের সেবা করবার জন্তে। এই রুগী ঘেঁটে-ঘেঁটেই আমাদের হাত পাক্‌লো, পরোপকার করতে হয় অন্য কোনও রকমে করুন, কিন্তু কলেরা-বসন্তের রুগীর সেবা করে' নয়। এই যে আপনি আজ এই রুগীর ঘরে যেতে ভয় পেলেন, এই ত' ঠিক্! জীবন তুচ্ছ ক'রে পরকে help করতে যাওয়া আমি ভাল বুঝি না, নিজের জীবনের চেয়ে দামী জিনিষ দুনিয়ায় আর কি আছে বলুন ত?

কিন্তু তাঁহার এই সারগর্ভ কথাগুলা নিভার কানে ঢুকিল কিনা কে জানে, ডাক্তারবাবুর দিকে একবারও সে ফিরিয়া তাকাইল না। ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া গিয়া ডাকিল, কৈলাস, শোন, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

কৈলাস বলিল, বলুন।

যে-কাগজখানার উপর রোগীর প্রয়োজনের দ্রব্যের তালিকা লেখা ছিল, সেইখানা কৈলাসের হাতে দিয়া বলিল, ধর, এতে যে-সব জিনিষ লেখা আছে, কিনে আন্‌তে হবে। আর এই প্রেস্‌ক্রিপসন্‌খানা,—না—থাক্‌। বলিয়াই কাগজখানা সে হাত দিয়া টেবিলের এক পাশে সরাইয়া রাখিল এবং কৈলাসকে সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

মিনিট-পনর পরে একখানা টেলিগ্রামের কাগজ লিখিয়া আনিয়া কৈলাসের হাতে দিয়া বলিল, দাদাকে এই টেলিগ্রামখানা পোষ্টাপিস থেকে পাঠিয়ে দাও। আর এই ধর এই নোটখানা—একশ' টাকা। এতে যা খরচ হয় দিয়ে বাকি টাকা ও-বাড়ীর দিদিমণির হাতে দিও। বলো এক্ষুনি আর একজন ভাল ডাক্তার, নার্স আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, যা খরচ হয়, সব এইখান থেকে নিতে বলো। এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া নিভা আবার বলিল, আর হ্যাঁ, তোমায় আজ থেকে ও-বাড়ীতেই থাক্‌তে হবে কৈলাস,—

কৈলাস ঘাড় নাড়িয়া বলিল, বেশ।

নিভা বলিল, তবে যাও, আর দেরি করো না, আমি ডাক্তার আর নার্সের জন্তে 'ফোন্' করে' দিচ্ছি।

কৈলাস সিঁড়ি ধরিয়া নীচে নামিতেছিল, নিভা তাড়াতাড়ি তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, শোন কৈলাস!

কৈলাস সিঁড়ির উপরেই ফিরিয়া দাঁড়াইল।

নিভা বলিল, যখন যা দরকার হবে, তুমি আমায় এসে জানিও, ভুলো না যেন! এই বলিয়া ঠোঁটে আঙুল দিয়া কি একটা জরুরি কথা সে মনে করিবার

চেষ্টা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, হ্যাঁ, তুমি যে বলছিলে কৈলাস, তোমার সেই মেজ ছেলের না কার নাকি এমনই হয়েছিল—

হ্যাঁ দিদিমণি, কিন্তু আপনি শুনলে অবাক হবেন দিদিমণি, মা-শীতলার চান-জল খাইয়ে আর গায়ে মাখিয়ে দিতেই সাতটি দিনের ভেতর ছেলেটি আমার চাঙ্গা হয়ে উঠল। ওষুধ-পত্তর ত' এ-সব রোগের কিছু নেই দিদিমণি, মা-শীতলাই এর জাগ্রত দেবতা।

নিভা মন দিয়া সবই শুনিল। কৈলাস বলিল, বলেন ত' কালিঘাটেও আমি না হয় একবার যাই দিদিমণি, শীতলার পূজো দিয়ে—

এই সব নিরুপায় দরিদ্রের দেবতা ও দৈবের উপর অগাধ বিশ্বাস দেখিয়া নিভা একটুখানি ব্যথিত ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, নাঃ তুমি যাও।

বন্ধুর এই অসুখের সংবাদ পাইবামাত্র অমরেশ গিরিডি হইতে রওনা হইয়া পড়িল। সেখানের কাজ তখনও তাহার সমাপ্ত হয় নাই, অন্যের হাতে সে কাজের ভার দিয়া যদিও সে বেশ নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না, তথাপি তাহার আর বিলম্ব করিবার উপায় ছিল না।

কলিকাতায় ফিরিয়া শুষ্ক পাণ্ডুর মুখে সে যখন তাহার মরণাপন্ন বন্ধুর রোগ-শয্যার পার্শ্বে আসিয়া বসিল, বংশীর সর্ব্বাঙ্গ তখন বসন্তের গুটিতে ভরিয়া গেছে, যন্ত্রণাক্লিষ্ট তাহার সে বীভৎস মুখের পানে তাকানো যায় না।

ডাক্তার, নার্স সকলেই নিষেধ করিল, কিন্তু অমরেশ কাহারও কথা শুনিল না, বন্ধুকে বাঁচাইবার জন্য পাগলের মত সে বহুদূর হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে, আজ আর কাহারও নিষেধ তাহার নিষেধ বলিয়া মনে হইল না। শয্যার পার্শ্বে গিয়া ডাকিল, বংশী! তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল!

বসন্তের গুটিতে তাহার চোখ দুইটাও আক্রান্ত হইয়াছিল, আবছা একটুখানি দেখিতে পাইলেও কাহাকেও সে চিনিতে পারিত না। কিন্তু সহসা এই ডাক শুনিয়া বংশী যেন চমকিয়া উঠিল, জবাব দিতে পারিল না বটে, কিন্তু মৃত্যুর এই এত কাছে দাঁড়াইয়াও, প্রাণান্তকারী এই ভীষণ রোগের অসহ্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও তাহার সেই বিকৃত মুখের উপরে কেমন যেন একটুখানি শুষ্ক ম্লান হাসি দেখা দিল। অমরেশের চোখ দুইটা এতক্ষণে জলে ভরিয়া আসিল, স্তব্ধ নির্ব্বাক হইয়া মশারির বাইরে সে যেমন দাঁড়াইয়াছিল, তখনও তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে রোগীর ঠোঁট দুইটা যেন একটুখানি কাঁপিয়া উঠিল, অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, চললাম।

খাটের পাশে মশারি টাঙাইবার একটা পায়া ধরিয়া উন্মাদের মত অমরেশ বলিয়া উঠিল, যেতে দেব না—ভাবিস্ নে বংশী, যেতে দেব না।

রোগীর মুখ হইতে আবার একটুখানি কথা বাহির হইয়া আসিল—ভাল। এবং সঙ্গে-সঙ্গে তেমনি ম্লান, তেমনি করুণ একটুখানি হাসি!

নার্স কাছেই দাঁড়াইয়াছিল, ধীরে-ধীরে বলিল, এমন রুগী আমি জীবনে কখনও দেখি নি,—'পক্সের যন্ত্রণা এমন প্রাণপণে চেপে রাখ্‌তে পারে।

অমরেশ তাহার চোখ দুইটা মুছিতে মুছিতে বলিয়া উঠিল, আমার বন্ধু—আমার ছেলেবেলার বন্ধু—।

কিন্তু সে কথার কি যে অর্থ নার্স কিছুই বুঝিতে পারিল না, ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া হাতের ইসারায় অমরেশকে সে এইবার বাহিরে যাইতে বলিল।

অমরেশের মাথার ভিতরে কেমন যেন সব গোলমাল হইয়াছিল, কি যে করিবে কাহাকে কি যে বলিবে, কিছুই যেন সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না, বাহিরে যাইবার সময় নার্সকে কাছে ডাকিয়া চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করিল, কেমন দেখ্‌ছ নার্স, সারবে ত? সারবে ত? সারিয়ে দাও তুমি নার্স, তারপর I shall give you whatever you want.

ঈষৎ হাসিয়া নার্স রোগীর কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

এমনি করিয়াই রোগীকে লইয়া নিতান্ত দুর্ভাবনায় তাহাদের দিন কাটিতে লাগিল।

উদ্বেগ আশঙ্কায় একটা সপ্তাহ পার হইয়া গেল, দশ দিনের দিন মনে হইল যেন রোগী ধীরে-ধীরে সারিয়া উঠিতেছে। নার্স আশ্বাস দিল, ডাক্তার বলিল, আর কোনও ভাবনা নেই। অমরেশের খুশী আর ধরে না!

দিনের পর দিন এমনি করিয়াই কাটিতে লাগিল।

কুড়ি-একুশ দিনের পর বংশী উঠিয়া বসিল। গায়ের ঘা-গুলা তখন প্রায় শুকাইয়া গেছে। সারিয়া সে উঠিল বটে, কিন্তু চোখদুটি তাহার চিরদিনের মত অন্ধ হইয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া অমরেশ দেখিল, একটা জানালার পাশে বিবর্ণ ম্লানমুখে বাহিরের পানে তাকাইয়া নিতা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

গত কয়েকটা দিন বংশীর অসুখ লইয়া সে এমনভাবে মাতিয়া উঠিয়াছিল

যে, কাহারও সহিত দুটা কথা বলিবারও অবসর তাহার ছিল না। ডাকিল, নিভা!

মুখ ফিরাইয়া নিভা কহিল, কি!

পাশের চেয়ারখানা দেখাইয়া দিয়া অমরেশ বলিল, অমন করে' দাঁড়িয়ে যে? আয়—বোস্।

চেয়ারটা টানিয়া লইয়া নিভা নতমুখে চুপ করিয়া বসিল।

মিনিট খানেক অমরেশ তাহার মুখের পানে সস্নেহে তাকাইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মুখখানা অমন শুকনো কেন নিভা, কি ভাবচিস্?

কই, কিছুই ভাবি নি ত! বলিয়া নিভা মুখ তুলিয়া টেবিলের উপর হাতখানা রাখিল।

বিভা কোথা?

হরিয়ার সঙ্গে বেড়াতে গেছে।

তাহার পর উভয়েই অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া রহিল। কে যে কি কথা বলিবে কেহই যেন ঠিক করিতে পারিতেছিল না কিন্তু একটা কথা অমরেশের সর্ব্বদাই মনে হইতেছিল যে, তাহার এই মুখরা চঞ্চল ভগিনীটি সহসা এমনভাবে নীরব হইতে শিখিল কেমন করিয়া!...

কিয়ৎক্ষণ পরে অমরেশ হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল, কই, তুই ত ওখানে একদিনও যাস্ নি নিভা?

কোথায়, সে কথাটা আর নিভাকে বলিয়া দিতে হইল না।

স্নেহ কোমল কণ্ঠে অমরেশ কহিল, কেন যাস্ নি দিদি, যাওয়া উচিত ছিল।

যাব।

অমরেশ বলিল, তবে এক্ষুনি চল্ নিভা, আমি তোকে রেখে আসি। বলিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কি রকম মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছিল দেখেছিস্, তুই যে যাস্ নি সে কথা আমার মনেই ছিল না।

নিভা যে অবস্থায় ছিল তেমনি ভাবেই উঠিয়া পড়িল।

তাহার পর উভয়ে পায়ে হাঁটিয়া রাস্তাটা পার হইয়া এবাড়ীর দরজায় আসিয়া পৌঁছিতেই অমরেশ বলিল, ঘণ্টা দুই বাদে হয় আমি, নয় কৈলাস এসে তোকে নিয়ে যাব,—কেমন?

দরজা খোলাই ছিল। বেশ—বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া নিভা ঘরে ঢুকিল।

নীচে আলো ছিল না, আলোর প্রয়োজনও নাই,—পূর্ণিমার রাত্রি, আকাশে

চাঁদ উঠিয়াছে। সেই চাঁদের আলোয় নিভা দেখিল, নীচের বারান্দার উপর মশারী লইয়া রত্নেশ্বর অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এককোণের একটা দড়ি ছিঁড়িয়া গিয়াছে, দেওয়ালের পেরেকে তাহাই টাঙাইবার ব্যর্থ চেষ্টা তাঁহার কোনরূপেই সফল হইতেছে না,—বাঁ হাতটা অকর্ম্মণ্য, একটা হাতের সাহায্যে মশারীর দড়ি টাঙানো চলে না, অথচ ক্রমাগত তাঁহার চেষ্টার বিরাম নাই। অবশেষে কোন প্রকারেই না পারিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন এবং তাঁহার অভ্যাসমত বিড়্ বিড়্ করিয়া আপন মনেই কত-কি-সব বলিয়া যাইতে লাগিলেন।

অনতিদূরে কবাটবন্ধ স্নানের ঘরে জলপড়ার শব্দ হইতেছিল, তাহা ছাড়া সমস্ত বাড়ীটার মধ্যে আর কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নাই। গায়ত্রী বোধকরি স্নান করিতেছিল। ইহা জানিয়াও নিভা তাহার কাছে না গিয়া নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে ধীরে-ধীরে সিঁড়ি ধরিয়া উপরে উঠিয়া গেল। পাশের ঘর দু'খানা পূর্ব্বে যেমন ফাঁকা পড়িয়া থাকিত—আজও তেমনি। বংশীর ঘরে আলো জ্বলিতেছে। তাহাই লক্ষ্য করিয়া নিভা সেইদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পা দুইটা তাহার বারে-বারে কে যেন টানিয়া ধরিতেছিল, তথাপি কোনপ্রকারেই না পারিল থামিতে, না পারিল ফিরিয়া যাইতে, কিয়ৎক্ষণ পরে, অজান্তে কে যেন তাহাকে জোর করিয়াই বংশীর সেই উন্মুক্ত দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। কিন্তু তাহার ব্যাগ্র ব্যাকুল দুইটি চক্ষু সর্ব্বপ্রথমেই ঘরের মেঝের উপর যে বস্তুটির উপর গিয়া পড়িল, তাহাতে সে যেন আর নিজেকে কোন প্রকারেই সংবরণ করিতে পারিল না। সেই বংশী,—মরণের দুয়ার হইতে সদ্য ফিরিয়া আসিয়া আজ সে তাহারই চোখের সুমুখে, নিতান্ত সন্নিকটে তাহারই দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিয়াছে, অথচ সে তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না! টেবিলের উপর লণ্ঠন জ্বলিতেছিল, তাহারই আলোকে মিনিট-খানেক নিঃশব্দে নিভা তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। সে মুখ যেন আর চেনাই যায় না,—বসন্তের দাগে সারা মুখখানি ভরিয়া গেছে, সেই চোখে, সেই উজ্জ্বল চোখের তারা,—নিষ্প্রভ, শুভ্র, জ্যোতিহীন,—চিরদিনের জন্য অন্ধ হইয়া গেছে! কথাটা সে পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল, আজ তাহাই স্বচক্ষে দেখিয়া নিভা আর স্থির থাকিতে পারিল না,—তাহার আপদ-মস্তক থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। চোখের সুমুখে বাজ পড়িলে মানুষ সহসা যেমন চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া লয়, নিভাও ঠিক তেমনি ভাবে শিহরিয়া পশ্চাৎ ফিরিল,—সেদিক পানে সে আর

তাকাইয়া থাকিতে পারিল না। যেমন আসিয়াছিল আবার তেমনি চুপচুপি পাশের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিতেই জলভারাক্রান্ত চোখ দুইটার অশ্রুবেগ সামলানো তাহার পক্ষে যেন দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল,—অন্ধকারে নিঃশব্দে সে চোখে কাপড় দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া চোখের জল যেন আর কোন প্রকারেই রোধ মানিতে চাহে না,—কাপড় দিয়া যত চাপে, নিরুদ্ধ অশ্রুবেগ যেন তত জোরে বুকের ভিতর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসে। এমনি করিয়া নিঃশব্দে কিয়ৎক্ষণ কাটিলে পর, মনের ভিতর কেমন যেন একটা জোর পাইল, প্রাণপণ শক্তিতে অত্যন্ত দৃঢ় হইয়া চোখ দুইটা বেশ করিয়া মুছিয়া লইয়া সে তাড়াতাড়ি বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। স্নানের ঘরে জল পড়ার শব্দ তখনও বন্ধ হয় নাই। নিভা ডাকিল, দিদি!

কিন্তু তাহার এই কণ্ঠস্বর পাশের ঘরে বিষম এক বিপত্তি বাধাইয়া তুলিল। হুড়্মুড়্ করিয়া ভীষণ একটা শব্দ হইবামাত্র নিভা তাড়াতাড়ি বংশীর ঘরের সুমুখে গিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, টেবিল হইতে জ্বলন্ত লণ্ঠনটা মেঝের উপর পড়িয়া গিয়াছে,—অন্ধ বংশী তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বোধ করি বা মুখখানা ঢাকিয়া ফেলিবার জন্যই তাহার শয্যার সন্ধানে আধ-আলো আধ-অন্ধকার ঘরের মধ্যে দুই হাত বাড়াইয়া দেয়ালের কাছে হাতড়াইয়া ফিরিতেছে। নিভা আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না,—দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া বংশীর সেই প্রসারিত হস্তদ্বয় নিজের দুইটি হাতের মধ্যে সাগ্রহে চাপিয়া ধরিল। কিন্তু সহসা তাহার হাতের উপর এই কোমল হস্তস্পর্শ অনুভূত হইতেই বংশী একবার শিহরিয়া উঠিয়া কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কে?

জবাব দিতে গিয়া কণ্ঠহারা নিভা স্তব্ধ মৌনীর মত নতমুখ নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সমাপ্ত



মুক্তি

শ্রীহিমাংশুপ্রভা শিকদার ([illegible])

সে ছিল পূজারিণী। তার পরিচয় কেউ জান্‌ত না। কোথায় তার্ বাড়ী, তার পিতা মাতা কে, এ সব প্রশ্নের উত্তর কেউ কোন দিন পায় নি। লোকে যেটুকু তাকে চিনেছিল—চিনেছিল শুধু তাকে তার কাজের ভেতর দিয়ে। সেই উষার আলো পাখী ডাকার সঙ্গে সঙ্গে সে জেগে উঠ্‌ত সুপ্তি থেকে—স্নান কোরে সিক্ত বসনে ফিরে যেত মন্দিরে—তারপর দিনের ঘণ্টাগুলো কি কোরে সেবার মধ্য দিয়ে কাটত তা সে নিজেই টের পেত না। এতে তার না ছিল ক্লান্তি, না ছিল অবসাদ। মনে হ'ত এই সেবার কাজই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে মরণের হাত থেকে। যেদিন এই কাজ ফুরোবে সেদিন তার জীবনও শেষ হয়ে যাবে।

কত লোক কৌতূহলি হ'ত। জান্‌তে চাইত তার জীবনের কথা। এই নীরব জীবনের, নীরব সেবা অনেকের মনে বিস্ময় এনে দিত। কোন্ ব্যথা বুকে চেপে সে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময়ী পৃথিবীর সাথে সম্বন্ধ রাখ্‌তে চায় না। কত লোক সহানুভূতি নিয়ে কাছে দাঁড়াত। পূজারিণী একটু ম্লান হাসি হেসে উত্তর দিত, "আমার এ তুচ্ছ জীবনের মূল্য কি, তার আবার কি কথা থাকৃতে পারে।" সে লোকের কাছে ধরা দিতে চাইত না। অতীতের স্মৃতিগুলোকে সে খুব উঁচু আসনেই রেখেছিল, লোকের কাছে প্রকাশ কোরে তাদের মর্য্যাদা লঘু কর্‌বে কেন? লোকে তার প্রাণের কোন সন্ধানই পেল না। লোকে ভাব্‌ত, পাষাণ দেবতার সেবা কোরে পূজারিণীর মনটা একেবারে পাষাণ হয়ে গেছে।

পূজারিণী মনের দুয়ার খুলে দিত শুধু একজনের কাছে। দেবতার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়্‌ত গভীর রাতে। যখন শুধু জেগে আছে আকাশের চাঁদ, তার চারিদিকে লক্ষ তারা—আর নীরব নিঝুম মৌন প্রকৃতি!

সারাদিনের ব্যথার ভার অশ্রু হয়ে গলে গলে পড়্‌ত। সে প্রাণের নিবেদন দেবতার চরণে উজাড় কোরে দিত। সে মুক্ত করে ভগবানকে ডাকৃত "হে ঠাকুর,

আমাকে মুক্তি দাও। মুখে হাসি বুকে ব্যথা নিয়ে আমি কত দীর্ঘ বেলা কত দীর্ঘ রজনী কাটাব? আশে পাশে কত শোভা, কত আলো কিন্তু আমার চোখে সবই ত ম্লান হয়ে গেছে। আমি এদের মধ্যে কোন রসের আস্বাদ পাই না। এ ব্যথার বোঝা আর কত দিন বইতে হবে। সে শ্রান্ত হয়ে পড়্‌ত। নিদ্রা এসে আস্তে আস্তে তার কোমল বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে তার সব ক্লান্তি দূর কোরে দিত।

দিনের পর দিন চলেছে। পূজারিণী একই ভাবে সেবা কর্‌ছে। প্রভাত এল, তার পেছনে এল সন্ধ্যা—বন্ধন এল, তার আসন নিল মুক্তি। কুয়াসা ভরা শীতের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বসন্তের সাড়া জাগ্‌ল। পূজারিণীর বৈচিত্র বিহীন জীবন কোন নূতনত্বই সৃষ্টি করতে পার্‌ল না। সে চেয়েই থাকৃত কোন সুদূরের পানে যদি মুক্তির দেখা পায়।

সেদিন ছিল উৎসবের পালা। ভোর হতে না হতে অনেক সেবার্থি মন্দিরের দরজায় এসে দাঁড়াল। দ্বার ছিল রুদ্ধ। লোকে ভাব্‌লে একি! এমন ত কখনও হয় না। বহুকাল থেকে লোকে দেখে আস্‌ছে। কোন দিন তারা নিয়মের ব্যতিক্রম দেখে নি। অনেকে অনেক কথাই ভাব্‌লে কিন্তু বাইরে থেকে ভেতরের কোন রহস্যই উদ্‌ঘাটন কর্‌তে পার্‌লে না।

মন্দিরের দরজা ভেঙ্গে ফেলা হ'ল। লোকে দেখ্‌লে দেবতার পায়ের তলায় সে ঘুমিয়ে আছে ঝরা শেফালির মত। বাসি ফুলের মৃদু গন্ধ তখনও মন্দির আচ্ছন্ন ক'রে ছিল। প্রভাতের তরুণ আভা তার পাণ্ডু মুখের ওপর পড়ে তাকে উজ্জ্বল কোরে তুলেছিল। মনে হল শিশুর মত সে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। তার মুখে চোখে ক্লান্তি অবসাদের কোন চিহ্নই নেই—একটা পরিপূর্ণ মুক্তির আস্বাদ পেয়ে তার মুখ চোখ হাসিতে ভরে উঠেছে। অমন হাসি কেউ কোন দিন তার মুখে দেখে নি।

আর একটু এগিয়ে এসে লোকে সবিস্ময়ে দেখ্‌লে তার বুকের ওপর একগাছি শুক্‌নো ফুলের মালা। সে দুই হাতে চেপে ধরে আছে হারাণ ধনের মত—বিদায়ের বেলা ও সে তাকে ছাড়্‌তে পারে নি; ঐ শুক্‌নো ফুলের পাতায় পাতায় তার অনাদৃত জীবনের মৌন ইতিহাস জড়িয়ে ছিল। কয়জন সে ভাষা বুঝ্‌তে পার্‌লে! অনেকে অনেক কথাই বল্লে, অনেক কথাই ভাবলে কিন্তু পূজারিণীর কানে কোন বাণীই পৌঁছল না। তার পূজা সার্থক আজ, তার হৃদয়-মন্দির আজ পরিপূর্ণ!



রমঁ্যা রলাঁ

[অনুবাদক—শ্রীকালিদাস নাগ ও শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কিন্তু এই শক্তি যে কি, ইহার দ্বারা সে যে কি করিবে তাহাও সে ভাবিয়া পায় না!

এই সুপ্ত শক্তিকে সে যেন তাহার সমস্ত প্রাণ দিয়া অনুভব করে। তাহার বাঁচিবার ইচ্ছাও প্রবল হইয়া উঠে!—বাঁচিতেই হইবে......ঐ সমস্ত অত্যাচার অবিচারের প্রতিশোধ লইতেই হইবে·· তাহার পর কত বড় বড় কাজ করিবার আছে—

ক্রিস্তফ্‌-এর চিন্তার রং বদলাইয়া যায়—তারপর আমার বয়স হবে যখন—কিছুক্ষণ ভাবিয়া আবার আরম্ভ করে—যখন হবে আঠার, তখন—

এই পর্য্যন্ত আসিয়া নানা বিচিত্র চিন্তার মধ্যে সে ডুবিয়া যায়। সে ভাবে আঠার হইতে একুশ বছরই মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সময়! এই বয়সেই পৃথিবীকে বশে আনিবার পক্ষে যথেষ্ট।—নেপোলিয়ানকে তাহার মনে পড়ে। এলেক্‌জাণ্ডার দি গ্রেট্‌ তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বীর। সে নিজে নিশ্চয় ইহাদের মত হইতে পারে যদি অন্ততঃ সে আর বারো বা দশ বছর বাঁচিতে পায়,...

যাহারা ত্রিশ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছে তাহাদের প্রতি তাহার মনে কোন সহানুভূতি জাগে না। সে ভাবে ওরা ত বুড়ো হয়ে গেছে, কাজ কর্‌বার পক্ষে

যথেষ্ট সময় তারা পেয়েছিল, তারা যদি কিছু না ক'রে উঠ্‌তে পারে সে দোষ তাদেরই। কিন্তু আজ যদি আমায় মরতে হয়...উঃ সে বড় বিশ্রী, বড় ভয়ানক, ছোট অবস্থায় মারা গেলে হাজার বছরেও সে মানুষের মনে ছোটই থাক্‌বে, কোনকালে সে বড় হবে না—মানুষের সঙ্গে তার বকুনি খাওয়ার 'সম্বন্ধটাই থেকে যাবে—'

রাগে সে কাঁদিয়া ফেলিল। যেন সত্যই সে মারা গিয়াছে!

এই মৃত্যুভয় এবং বেদনা তাহার শৈশব এবং কৈশোর কালকে ঘিরিয়া রাখিল! শুধু সাংসারিক জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং দৈনন্দিন জীবনের অসংখ্য দুঃখ তাহার চিন্তার ধারার মুখ ফিরাইয়া তাহাকে মধ্যে মধ্যে সচেতন করিয়া তুলিত।

* * *

জীবনের এই তমসাচ্ছন্ন দিনে, রাত্রির প্রাণান্তকারী অসীম স্তব্ধতার মধ্যে ক্রিস্তফ্ সহসা দেখিতে পাইল, এক অপূর্ব্ব আলোক কোন এক হারান নক্ষত্রের মত সমস্ত অন্ধকার ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে তাহার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে! সেই অমৃত লোকের দীপ্তি—সুরের আলো; তাহার জীবনকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিবে .....

জাঁমিশেলের কোন এক শিষ্য একটা ভাঙ্গা পুরাতন পিয়ানো তাঁহাকে দান করিয়া ছিল সম্ভবত আর্জ্জনা দূর করিবার হিসাবেই। সেই বাদ্য যন্ত্রটিকে এমন নিপুনতার সহিত তিনি সারিয়া ফেলিলেন যে তাহাতে পুরাতনের কোন চিহ্নই রহিল না! নূতন করিয়া তাহার তারগুলিতে সুর চড়াইয়া তিনি সেটিকে লইয়া আসিয়া নাতীদিগকে উপহার দিলেন।

লুইসা ভাবিল—ভাল বিপদ! একে আমার ঘরে মাথা গোঁজবার ঠাই নেই—এত বড় একটা বাজনা রাখি কোথায়?

মেল্‌শিয়োর বলিল, এটা সারতে কিছু টাকা বাবার খরচ হয়েছে নিশ্চয়ই কিন্তু এতে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হন নি—ঘরে না ধরে জ্বালানি কাঠ কর্‌লেই চল্‌বে!

কিন্তু ক্রিস্তফ্ মনে মনে অত্যন্ত খুশী হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইত এটি যেন একটি মন্ত্রপুত যন্ত্র, ইহার ভিতর লক্ষ লক্ষ অদ্ভুত কল্পনাতীত সুন্দর স্বপ্ন ভরা আছে। জাঁমিশেলের সহিত সে বহুবার আরব্য উপন্যাস পাঠ করিয়াছে, তাহার মনে হইল, এই যন্ত্রটি যেন তেমনি কোন বিরাট রহস্যের ইতিহাস!

এই যন্ত্রটি যেদিন তাহাদের গৃহে আসে সেদিন সে মেল্‌শিয়োরকে ইহার স্বর-গ্রাম পরীক্ষা করিতে শুনিয়াছিল। চকিতে যেন সহস্র মূর্চ্ছনার বর্ষণ! বাতাসের নাড়া পাইয়া ভিজা গাছের পাতা হইতে যেন বিন্দু বিন্দু জল ঝরিয়া পড়িতেছে!

মুগ্ধ অন্তরে ক্রিস্‌তফ্‌ করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল—আবার বাজাও বাবা—আর একবার—

কিন্তু মেল্‌শিয়োর পিয়ানোর ডালাটি বিকৃত মুখে বন্ধ করিয়া বলিল—আরে হো!—এ আবার বাজনা—

ক্রিস্‌তফ তাহার পিতাকে আর বাজাইবার জন্য পীড়া-পিড়ি করিল না কিন্তু সে যেন মন্ত্রের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ঐ যন্ত্রের চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়াইত। আশে পাশে কেহ না থাকিলে অতি সন্তর্পনে সে পিয়ানোর ডালাটি তুলিয়া অতি ধীরে কোন একটি পর্দ্দার উপর আঙুল টিপিতে;—যেন কোন পতঙ্গের সবুজ আবরণ সরাইয়া তার ভিতর কি আছে সে দেখিতে চায়! হয়ত উত্তেজনার মুহূর্ত্তে সে অতি জোরে পর্দ্দায় আঘাত করিয়া ফেলিত এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে শুনিতে পাইত লুইসা বকিতেছে—তোর কি সব তাতেই হাত দেওয়া চাই?—দুদণ্ড স্থির হয়ে থাকতে জানিস না?

কিম্বা কোনদিন জোরে শব্দ করিয়াই তাড়াতাড়ি ডালাটি বন্ধ করিতে গিয়া আঙুল চিপ্‌টাইয়া ফেলে তাহার পর কাঁদ কাঁদ মুখে আঙুল চুষিতে চুষিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে।

লুইসাকে কোনদিন যদি প্রতিবেশীদের কাজে সমস্তদিন বাহিরে থাকিতে হইত বা কাহারও সহিত দেখা করিতে তাহাকে শহরে যাইতে হইত, ক্রিস্‌তফ এর আনন্দের সীমা থাকিত না। সে কান পাতিয়া শুনিত, সিঁড়ি দিয়া লুইসা নামিতেছে, তাহার পর জানালায় আসিয়া দেখিত, সে পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ঘরে সে একা! সে একটি চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহার উপর বসিয়া পিয়ানোর ডালাটি তুলিয়া ফেলিত। চেয়ারে বসিয়াও তাহার কাঁধ দুটি প্রায় পিয়ানোর পর্দ্দার নীচেই থাকিত। কিন্তু তাহাতে সে বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ হইত না। পিয়ানো বাজাইবার জন্য সে নির্জ্জনতার অবসর অন্বেষণ করিত; যদিও অতিরিক্ত শব্দ না করিলে কেহ বাজাইতে বারণ করিত না তবুও অন্যের সম্মুখে তাহার কেমন বাধ বাধ ঠেকিত, বাজাইতে লজ্জা করিত সাহসও হইত না। তাহা ছাড়া তাহার সঙ্গীত চর্চ্চার সময় সকলে কথা বলে, নড়িয়া বেড়ায় ইহাতে তাহার সমস্ত আনন্দ নষ্ট হইয়া যায়। একা যন্ত্রটির কাছে থাকা কি সুন্দর

শুদ্ধতাকে নিবিড়তর করিয়া তুলিবার জন্য ক্রিস্তফ ক্ষণে ক্ষণে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকে, আবার তাহার বুক উত্তেজনায় ভরিয়া উঠে, যেন সে কামান দাগিতে যাইতেছে! সে যখন তাহার হাতের আঙুল পর্দ্দার উপর ছোঁয়ায় তখন তাহার বুক কাঁপিতে থাকে। কখন কখন সে কোন পর্দ্দায় তাহার আঙুল অল্পমাত্র চাপিয়াই অপর পর্দ্দা টিপিয়া ধরে; কে জানে অন্যটা টিপিলে কি কাণ্ড হইবে!

ক্রিস্তফ্-এর আঙুল স্পর্শে পর পর সুর বাহির হইয়া আসে—কোনটা গম্ভীর, কোনটা তীব্র, কোনটা করুণ, কোনটা যেন অশান্ত চীৎকারের মত! শিশু ক্রিস্তফ্ প্রত্যেকটির সুর গভীর মনযোগের সহিত শুনে, ধীরে ধীরে তাহাদিগকে মিলাইয়া যাইতে অনুভব করে, তাহারা যেন দূরাগত ঘন্টার শব্দের মত কিছুক্ষণ বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া পুনরায় বহুদূরে মিলাইয়া যায়। আবার যেন সহস্র বিভিন্ন সুর আসিয়া কানে লাগে, যেন অসংখ্য পতঙ্গের গুঞ্জনধ্বনি! তাহারা যেন মানুষের মনকে হাতছানি দিয়া ডাকে কোন্ দূরের পথে কোন্ অজানা রহস্য লোকে যেন তাহারা ঝাঁপ দেয়—অদৃশ্য হইয়া যায়! আবার সহসা যেন দিগ্বিদিক গুঞ্জনমুখরিত করিয়া তোলে! ঐ যে তাহাদের ডানার ঐক্যতান!

কি আশ্চর্য্য এই সুর; এ সুরের যেন প্রাণ আছে, সে যেন জীবন্ত। কিন্তু তাহাকে এমন বাধ্য করিয়া কে ঐ যন্ত্রের মধ্যে পুরিয়া রাখিয়াছে?

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল একই সময়ে দুইটি পর্দ্দা টেপায়! কেহ জানে না তখন সুরের কোন্ খেয়াল খেলিবে। সহসা যেন দুইটি সুরের মধ্যে ভীষণ কলহ চলিতেছে! পরস্পরের প্রতি দারুণ ঘৃণা মনে লইয়া তাহারা যেন চীৎকার করিতেছে! সে চীৎকার কখনও দুর্জ্জয় ক্রোধের মত কখন বা দুঃখের ভারে ভারাক্রান্ত, আশাহীনের বিলাপের মত শোনায়! ক্রিস্তফ-এর ইহা বিশেষ ভাল লাগে। তাহার মনে হয় যেন ভীষণ হিংস্র জীবদের শৃঙ্খলিত করিয়া রাখা হইয়াছে তাহারাই ঐ শৃঙ্খল কামড়াইয়া তাহার উপর মাথা ঠুকিয়া হতাশ ভাবে চীৎকার করিতেছে! আরব্য উপন্যাসের মন্ত্রপূত পাত্রে আবদ্ধ দৈত্যের মত ইহাদের মধ্যে কেহ যেন বাহির হইয়া আসিতে পারে! আবার কোন সুর মন ভুলাইবার চেষ্টা করে যেন পায়ে পড়িয়া ভাব করিতে চায়—কিন্তু বেশ বুঝা যায়, ইহারা সবাই যেন অক্ষম আক্রোশে উত্তপ্ত।

ক্রিস্তফ জানে না তাহারা কি চায়। কিন্তু তাহারা তাহাকে বিমোহিত

করিয়া রাখে, চঞ্চল করে। সময় সময় তাহারা তাহাকে লজ্জায় আরক্তিম করিয়া দিয়া যায়।

আবার কখনও এমন সুর সে আবিষ্কার করিয়া বসে যাহাদের পরস্পরের প্রতি প্রীতির অন্ত নাই! চুম্বন করবার সময় মানুষ যেমন দুই হাত দিয়া পরস্পরকে বুকে চাপিয়া রাখে ইহারাও যেন তেমনি গভীর আবেগের সহিত পরস্পরকে বাঁধে! অপূর্ব্ব সে মিলন মাধুরী, মধুর তাহাদের বিলাস! তাহাদের মুখ হাস্যোজ্জ্বল, কপালে কুটিল চিন্তার রেখা নাই—ক্রিস্তফকে তাহারা ভালবাসে, ক্রিস্তফ তাহাদের খুব ভালবাসে। এই সুরগুলির সহিত আলাপ করিয়া তাহার যেন তৃপ্তি হয় না, তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠে—ইহারা যেন তাহার অতি প্রিয় বন্ধু,—তাহার আপনার জন।

এইরূপে বালক জাঁ ক্রিস্তফ সুরের বন ভেদ করিয়া হাঁটে। তাহার আশে পাশে কত অসংখ্য শক্তি যেন খেলা করিতেছে—কেহ তাহাকে যেন আদর করিয়া ডাকে, কেহ যেন তাহাকে গ্রাস করিতে চায়!

একদিন সে এমনি বিভোর হইয়া সুরের মাধুর্য্য উপভোগ করিতেছে এমন সময় সহসা মেল্‌শিয়োরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে ভয়ে লাফাইয়া উঠিল! তাহার মনে হইল সে অন্যায় করিতেছে এবং মেল্‌সিয়োরের চড় বা ঘুসি আটকাইবার জন্য সে তাড়াতাড়ি তাহার হাত দুটি দিয়া মাথাটিকে আড়াল করিয়া রাখিল।

কিন্তু মেল্‌শিয়োর তাহাকে বকিল না, মারিল না, চীৎকার করিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার পর ধীরে ধীরে ক্রিস্তফ-এর মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—তোর ওটা ভাল লাগে না ক্রিস্তফ? আমার কাছে শিখ্‌বি কি করে বাজাতে হয়?—

ভাল লাগে!......কিছুক্ষণ বিস্ময়পূর্ণ চোখে মেল্‌শিয়োরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সে জড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—হাঁ বাবা—

পিতা ও পুত্র পিয়ানোর কাছে আসিয়া বসিল। তাহার পর অত্যন্ত মনযোগের সহিত ক্রিস্তফ সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করিল। প্রত্যেক সুরের নাম শুনিয়া তাহার বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। কোন সুরের নাম একটি বর্ণের ভিতর দিয়াই প্রকাশিত হয়, কোন সুরের নাম চীন ভাষার একটি সম্পূর্ণ বাক্যের মত দীর্ঘ এবং অদ্ভুত অর্থপূর্ণ! যেন পরীর দেশের রাজকন্যাদের নামের মত মধুর!

কিন্তু তাহার পিতা ঐ সমস্তগুলি অত্যন্ত হাল্কাভাবে বলিয়া যাইতেছিল,

ক্রিস্তফ-এর ভাল লাগিতেছিল না, এবং মেল্শিয়োরের আঙ্গুলের আঘাতে তাহারা যেন কতকটা উদাসীন এবং তাচ্ছিল্যভাবে গাহিয়া উঠিতেছিল।

তবু ক্রিস্তফ-এর আনন্দের সীমা নাই। কোন্ সুরের সহিত কোন সুরের কি সম্বন্ধ, কে মর্য্যাদায় বড় কে ছোট, ইত্যাদি ভাবিতে গিয়া সে দেখে ঐ সমস্ত স্বরগ্রাম যেন রাজার মত কখনও সৈন্যদের চালনা করে, আবার কখনও যেন একদল কাফ্রীর মত এক লাইনে মার্চ্চ করিয়া চলে। ঐ প্রত্যেকটি সৈন্যের বা প্রত্যেকটি কাফ্রীর যে কোনটি সুবিধা পাইলেই যেন রাজার মত বলশালী হইয়া উঠিতে পারে! পিয়ানোর প্রথম পর্দ্দা হইতে শেষ পর্দ্দার মধ্যে যেন এক বিরাট সৈন্যবাহিনীর উদ্ভব হয়!—

তাহার মনে হয় সে যেন একটি সুতা ধরিয়া টান দিতেছে এবং তাহাতেই ঐ সুরগুলি সৈন্যদলের মত মার্চ্চ করিয়া চলিয়াছে! কিন্তু পূর্ব্বে যে সুরের যে রূপ দেখিয়াছে তাহার তুলনায় ইহারা নিতান্ত তুচ্ছ! যেন সেরূপ বুঝি আর সে দেখিতে পাইবে না......তাহার সুরের মায়াকানন বুঝি চিরদিনের জন্য মিলাইয়া গিয়াছে!

যাহাহউক সে মন দিয়া সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করিল এবং ইহা তাহার কাছে বিরক্তিকর ছিল না। তাহার পিতার ধৈর্য্য দেখিয়া সে অবাক! মেল্শিয়োর সমান একাগ্রতার সহিত তাহাকে শিক্ষা দিত। একই গৎ বার বার করিয়া তাহাকে দিয়া বাজাইতে তাহার ক্লান্তি ছিল না। ক্রিস্তফ-এর ইহা আশ্চর্য্য লাগিত। সে বুঝিতে পারিত না কেন তাহার শিক্ষার সম্বন্ধে তাহার পিতার এত যত্ন। তবে কি বাবা আমায় ভালবাসে?—'

ক্রিস্তফ সমস্ত মন দিয়া শিক্ষা লইতে লাগিল। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু সে যদি জানিত তাহার পিতার এই অধ্যবসায়ের মূলে কি আছে; তাহা হইলে সে হয়ত পিতার এত বাধ্য হইত না।

—ক্রমশ

চড়কডাঙ্গার মোড়

শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ

(এক)

সেই চিরন্তন কোলাহল ! রোজকার সেই আসা যাওয়া, গাড়ী-ঘোড়া ও মটরের সেই উৎপাৎ ;—দোকানে দোকানে ক্রেতার ভিড় আজও ঠিক তেমনি ;—মোড়ে উপরের হোটেল হইতেও ঠিক তেমনি ভাবে "মেগাফোনে" (megaphone) রাস্তার অপর পারের হোটেলওয়ালার সঙ্গে কথা চলিতেছে। গলির ঐ শেতলা ঠাকুরের মন্দিরের শঙ্খ-ঘণ্টা ঠিক্ তেমনি ভাবেই বাজিল। ভিখারীদেরও তেমনি শ্রান্ত-কণ্ঠে "একটি আধলা দিয়ে যাও বাবা গো"—বলিয়া বৃথা চিৎকার !

তখন অপরাহ্ণ। অমল ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুরেশদা' তাহাকে যে-গলির কথা কহিয়া দিয়াছিল তাহার সন্ধান সে এখনও পর্যান্ত পাইল না। ভাবিতে ভাবিতে সে ধীরে ধীরেই পথ চলিতেছিল ! হঠাৎ তাহার মাথায় একটা বুদ্ধি জোগাইল। ভাবিল, হয়ত কোচম্যানেরা সে গলিটার খোঁজ বলিয়া দিতে পারিবে। সম্মুখেই একটা গাড়ীর আড্ডা। তথায় গিয়া প্রশ্ন করিয়া জানিল যে, ঐ মোড়ের পাশে যে গলিটা আরম্ভ হইয়াছে, সুরেশদার বস্তি-বাজারের গলি বোধ করি সেইটি-ই।

গলির খোঁজ ত' হইল, এইবার বাড়ী !

ধীরে ধীরে সে আসিয়া গলির মুখে দাঁড়াইল। দেয়ালে আঁটা লেখাটা অস্পষ্ট হইয়া গেলেও সে বুঝিল যে এ-ই সেই গলি।

গলিতে ঢুকিয়া গিয়া অমলের মনটা একটু খুঁত খুঁত করিয়া উঠিল। গলিটি অত্যন্ত সরু। দুই পাশে খোলার বস্তি। বোধ করি নীচ জাতিয়া বারবনিতারা এই নির্জ্জনে আসিয়া আড্ডা লইয়াছে। গলির সন্ধান পাইয়া অমলের যে আনন্দটুকু হইয়াছিল, বাড়ীর খোঁজ করিতে গিয়া তাহাও যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অমল ধীরে ধীরে পথ চলিতে লাগিল। খোলার বস্তি পার হইয়া দুই পাশে সারি সারি টিনের ঘর। দরজায় এবং বাড়ীর ভিতরে যে-রূপ কোলাহল চলিতেছিল রমণী-কণ্ঠ নিসৃত হইলেও শ্রুতি সুখকর মোটেই নয়।

কোন দিকে না চাহিয়াই সে পথ চলিতেছিল। অমল অবস্থাপন্ন গৃহস্থের সন্তান। চেহারাখানাও বেশ চলন-সই ছিল। তাহার চেহারা ও পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া আশে-পাশে ঘরের মেয়েরা একটু উঁকি মারিয়া যেরূপ ভাবে কটাক্ষ ইঙ্গিত করিতে লাগিল, তাহার অর্থ বুঝিতে অমলের বিলম্ব হইল না।

অমল চলিতে চলিতে সহসা থামিয়া পড়িল। দূর ছাই! সে যে বাড়ীব নম্বর ভুলিয়া গিয়াছে। এইবার সে মাথা তুলিয়া আশে পাশে ঘর গুলোর প্রতি চাহিয়া দেখিল যে, একটা বাড়ীতেও নম্বরের বালাই নাই। সে থমকাইয়া দাঁড়াইল। কিছু দূরেই দেখিতে পাইল যে, একটা জলের কলের কাছে পনর-কুড়ি জন স্ত্রীলোক কলসী মাজিতে মাজিতে হল্লা করিতেছে।

বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে। ইতি মধ্যেই অনেক বিলাসী সাজিয়া-গুজিয়া অতিথির প্রতীক্ষায় দুয়ার গোড়ায় দাঁড়াইয়াছিল। ইহাদেরই একজন অমলের এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, লাল টক্ টক্ অধর-কোণে একটু সলজ্জ হাসির রেখা চাপিয়া রাখিয়া বলিল, বাবু, এই ঘরে আসুন।

অমল শিহরিয়া উঠিল। সুরেশদার উপর একটু রাগও হইল। পরক্ষণেই সে হন্ হন্ করিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিল। কিছুদূরে আসিয়া গলিটি শেষ হইয়া গিয়াছে। অমল দাঁড়াইল। সামনেই একখানা পড়ো-বাড়ী দেখিতে পাইয়া তাহার মনে পড়িল যে, সুরেশদা তো এই জায়গাটার কথাই বলিয়া দিয়াছিল। কাছে একটা বস্তিও ছিল বটে। কিন্তু অমল সহসা ঢুকিতে সাহস করিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া একটু বিরক্ত হইয়াই ডাকিল, সুরেশদা'! বাড়ী আছ?

সুমুখে একটা বন্ধ ঘরের দরজা হঠাৎ খুলিয়া গেল। যে লোকটি উঁকি মারিয়া দেখিল, সে সুরেশদা। বোধকরি সম্প্রতি কোথাও বাহির হইয়া গিয়াছিল, পরণে জামা, পায়ে জুতা। বলিল, আরে, এসো, এসো, অমল যে।

অমল ঘরে ঢুকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, এ যে দেখ্ ছি স্বর্গে এসে ঠাঁই নিয়েচ! আরও কি বলিতে যাইতেছিল হঠাৎ থামিয়া গেল। দেখিল, সম্মুখে একটা ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া দুইজন স্ত্রীলোক কথা কহিতেছে। অমলের মনটা বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল! সে নিশ্চল হইয়া দাড়াইয়া রহিল।

সুরেশ তাহা বুঝিতে পারিয়া কহিল, ও কিছু নয়, তুই চলে আয়। বলিয়া একরকম টানিতে টানিতেই অমলকে তার ঘরে লইয়া গেল। তাহার মনটাও আজ বিশেষ ভাল ছিল না।

ঘরে একটা মাদুর বিছান ছিল। সুরেশ বলিল, বোস ভাই।

ক্ষুব্ধ ও শ্রান্ত অমল তাহার উপরই বসিয়া পড়িয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহারপর ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিতে পাইল যে, সুরেশের স্ত্রী, রুগ্নাবস্থায় একখানা ছিন্ন মলিন বিছানায় শুইয়া আছে। বোধকরি এখন একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অমল বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিল, বৌদির কি হ'য়েছে?

সুরেশ বিরক্ত ভাবেই উত্তর দিল; কিছুই না! দেখচো না, ভোগাচ্চে-- আজ দুটি বছর ধরে' আর বলো না ভাই সে সব কথা। ব'লয়াই রুগিনীর প্রতি একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভাল করিয়া সে বসিয়া রহিল।

অমল কোন কথা কহিল না। মুখ তুলিয়া চাহিলও না। আপন মনে কি যেন ভাবিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, বৌদির অসুখ কি খুব বেশি তাহ'লে?

একটা উপেক্ষাপূর্ণ মলিন হাসি হাসিয়া সুরেশ বলিল, আর বেশী!—মরেও না—বাঁচেও না! বলিয়াই সুরেশ চুপ করিল।

অমলও কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না। এমন ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকাও চলে না। সে একটা জরুরী কাজের ভাণ করিয়া বলিল, সুরেশদা', আজ আবার আমায় কালিঘাট যেতে হবে। আজ উঠি।

সুরেশ কোনও আপত্তি করিল না, পেছন পেছন দরজা পর্যান্ত আসিয়া বলিল, এখন ত চিনে গেলি, মাঝে মাঝে আসিস্।

আচ্ছা, বলিয়া অমল দ্রুত পদে বাহির হইয়া গেল।

(দুই)

অমলের মনটা স্বভাবতই কোমল। সুরেশের প্রতি তাহার ভালবাসা ছিল অসীম। সেই দিনকার ব্যবহারটাকে সে এই বলিয়া উড়াইয়া দিল যে, রোগে-শোকে সকলের মনই অমন এক আধটুকু "খিট্ খিটে" হইয়া যায়।

সুরেশদার সহিত সেই তার আবাল্য বন্ধুত্ব--সেই বুকে-বুকে ব্যথা বিনিময় —পাঠ্যাবস্থায় নদীতীরে ভ্রমণ কালে সুরেশদার কোলে শুইয়া, সেই ঝকঝকে জ্যোৎস্নায় অনন্ত নক্ষত্র খচিত নীল আকাশে আত্মভোলা চাহিয়া-থাকা—আজ

তাহার মনে হইতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে তাহার চোখের উপর তার রুগ্ণা বৌদির সেই রোগ-পাণ্ডুর মুখখানা ভাসিয়া উঠিল। সহসা সে একটু অস্থির হইয়া উঠিয়া পড়িল।

অমল যখন আসিয়া সুরেশের ঘরে উপস্থিত হইল তখন একটী মেয়ে সুরেশের স্ত্রীর বিছানায় বসিয়া তাহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিল। সুরেশও চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

অমল তাহার ঘরে ঢুকিতে যাইয়া একটী অপরিচিতা তরুণীকে দেখিয়া থামিয়া গেল। তাহার মুখখানা একটু রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

সুরেশ তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিল, এসো ভাই।

অমল সঙ্কোচের সহিত তাহার ঘরে ঢুকিল। একখানা ছোট্ট চৌকির উপর সুরেশ বসিয়াছিল। তাহাই অমলকে বসিতে দিয়া নিজে মেঝেয় বসিয়া পড়িল।

মেয়েটী ঘাড় হেট্ করিয়া নিঃশব্দে রোগিনীর পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

কতক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ কোন কথা কহিল না! সকলেই চুপ করিয়া রহিল।

এরূপ চুপ করিয়া বসিয়া থাকা মানুষের পক্ষে নিতান্ত সহজ নয়। তাই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সুরেশই প্রথমে কথা কহিল, বলিল, অমল, এত রোদে তোর আসতে কষ্ট হয় নি? না হয় একটু পরেই আসতিস্।

কথা কয়টা সামান্য। অমল শুনিল। এই সামান্য কথা কয়টিই অমলের মনে এক অভূতপূর্ব্ব আলোড়নের সৃষ্টি করিল। বহুদিন সে সুরেশদা'কে দেখে নাই। তারপর বহুদিনের বিরহের মিলন-দুয়ারে দাঁড়াইয়া সুরেশের যে মূর্ত্তি সে দেখিল তাহা তাহাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিতেছিল। তাই সহসা সুরেশদার কথা-কয়টা সত্য সত্যই তাহাকে অধীর করিয়া তুলিল। সে কোন রকমে আপনাকে সংযত রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ বাদে সুরেশ আবার কহিল, ছোট্টঘর—অন্ধকার, তোর কষ্ট হবে—চল্ বাহিরেই বসি।

অমল শান্ত ভাবেই উত্তর দিল, না, এই বেশ আছি।

সুরেশ অমলের প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল, হ্যাঁরে অমল! তোর চেয়ারা খানা অমন খারাপ হয়ে গেছে কেনরে?

অমল অতি কষ্টে আত্ম সম্বরণ করিয়া উত্তর দিল, আর তোমার চেহারাখানা? আরশী দিয়ে দেখেছ?

সুরেশ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আমাদের কথা ছেড়ে দে!

শুশ্রূষাকারিণী সেই অপরিচিতা মেয়েটী তখনও তেমনি ঘাড় হেঁট্‌ করিয়াই বসিয়াছিল। ইহাদের প্রতি ফিরিয়াও চাহিল না—ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য কিঞ্চিৎ মাত্রও আগ্রহ প্রকাশ করিল না। যেন সে ইহাদিগকে লক্ষ্যই করে নাই এমনি ভাবেই বসিয়া রহিল।

অমল এই মেয়েটীর নিরপেক্ষ নিস্তব্ধ মূর্ত্তিটী দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা কথাবার্ত্তা কহিল ইহার মধ্যে একটি বারও সে তাহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিল না। হঠাৎ সেই দিনকার ঘটনাটা মনে পড়াতে সে তাহার চক্ষু ফিরাইয়া লইল। নিজের এবম্বিধ দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া সে একটু অনুতপ্ত হইল। তাই থামিয়া যাওয়া কথাবার্ত্তাটা পুনরারম্ভের জন্যই কহিল, আচ্ছা, সুরেশদা! তুমি এমন হয়ে গেলে কেন?

অমল কি ভাবিয়া যে প্রশ্ন করিল তাহা সুরেশ আদৌ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। অগোচরে তাহার মনটা একটু কাঁপিয়া উঠিল। তাই সে সংযত কণ্ঠে সহজ ভাবেই সামান্য একটু খানি উত্তর দিল, সময়ে সব করে ভাই!

অমল কথার স্রোতটা অন্য দিকে ফিরাইবার জন্যই কহিল, আচ্ছা, আমাকে খবর দাওনি কেন?

হ্যাঁ! খবর দেব। ও মরাটা কি আমাকে কোথাও বেরুতে দিয়েছে? জ্বালিয়ে খেলে, আমায় জ্বালিয়ে খেলে! বলিয়াই সুরেশ তাহার ক্রুদ্ধ চক্ষু দুইটা বাইরের দিকে ফিরাইয়া লইল।

সুরেশের স্ত্রী বোধহয় জাগ্রত ছিল। সুরেশের এই কথা কয়টা শুনিতে পাইয়াই যেন তাহার নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটি উন্মিলন করিয়া স্বামীর দিকে মিনিট কয়েক করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া ঐ কথা কয়টারই যেন নীরবে প্রতিবাদ করিল।

সুরেশ ইহা লক্ষ্য করিল না। পূর্ব্বের ন্যায় বলিয়া যাইতে লাগিল, তবু ঐ ক্ষুদী এসে মাঝে মাঝে বসে—সেই যা একটু সময় পাই বেরুবার। ভাগ্যিস তোর সঙ্গে সেই দিন রাস্তায় দেখা হ'য়ে গেল হঠাৎ, নইলে তো তোকে খবরই দিতে পাত্তুম না।

প্রত্যুত্তরে অমল কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় সুরেশের স্ত্রী একটু কাঁসিয়া উঠিল। কাঁসিতে একটু রক্ত উঠিল। অমল চমকাইয়া উঠিয়া কহিল, একি—কাসি! রক্ত উঠ্‌ছে!

সুরেশ বলিল, তবে আর বল্‌ছি কি তোকে ?

মুহূর্ত্তের মাঝে কিসের আশঙ্কার একটা বিভীষিকা অমলের চোখের উপর ভাসিয়া উঠিয়া আবার মিলাইয়া গেল। অমলের মনটা একটু কাঁপিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল, চিকিৎসা—

অমলের কথার মাঝখানেই সুরেশ বাধা দিয়া কহিল, আর চিকিৎসা —খেতে পাচ্ছিনা !

অমল সব বুঝিতে পারিল। মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিয়া পকেট হইতে চারখানা দশটাকার নোট উঠাইয়া সুরেশের হাতে দিয়া কহিল, এই নাও, ভাল করে চিকিৎসার ব্যবস্থা কোরো ! টাকার জন্য ভেবো না।

মন্ত্রমুগ্ধের মত সুরেশ নোট ক'খানা হাতে করিয়া অমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

এইবার ফুলী মুখ তুলিয়া অমলের দিকে একবার চাহিল।

অমল কিছুপর ধীরে ধীরে আপন মনেই কহিতে লাগিল, বৌদির এমন অসুখ, অথচ আমি এতদিন জান্‌তে পাইনি। ভাবিতেই ক্ষোভে দুঃখে অমলের বুকখানা তোলপাড় করিয়া উঠিল।

আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া অমল উঠিয়া কহিল, আচ্ছা, সুরেশদা ; আজ তবে আসি। আমি আবার শনিবার আসব—সেদিন ছুটী আছে।

শনিবারের কথা শুনিয়াই সুরেশের মুখখানা হঠাৎ একটু অপ্রসন্ন হইয়া গেল। তাই মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে একটু অসংলগ্ন কথায়ই উত্তর দিল, শনিবার—শনিবার ! এঁ্যা, শনিবার—তা এসো—বেশত এসো।

অমল বাহির হইয়া যাইবার বেলায় পেছনে চাইতেই দেখিতে পাইল ফুলী তাহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে। কিন্তু সে দৃষ্টি অপরিচিতের প্রতি নিতান্ত সাধারণ দৃষ্টি নয়—অথচ তাহার অর্থ বুঝাও কঠিন।

তিন

শনিবার একটা-দেড়টার সময় অমল ট্রাম হইতে চড়ক-ডাঙ্গার মোড়ে নামিতে যাইবে, এমন সময় দেখিতে পাইল, সুরেশ তাহাকে ছাতি আড়াল দিয়া দ্রুত-বেগে চলিয়া যাইতেছে। সুরেশ বোধকরি পূর্ব্বাহ্নেই অমলকে ট্রাম হইতে অবতরণ করিবার সময় দেখিতে পাইয়াছিল। অমল একটু আশ্চর্য্য হইল ঐরূপ করার কোন যথাযথ কারণ সে খুঁজিয়া পাইল না। সুরেশের পেছন

পেছন যাইবার জন্য কিছু দূর অগ্রসর হইয়া থামিয়া দাঁড়াইল, ভাবিল, সুরেশদা' যেখানে যাইতেছে সেখানে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়াটা বোধহয় যুক্তি যুক্ত মনে করে নাই। হয়ত এখনই আবার ফিরিয়া আসিবে। বাড়ীতে ওদের কাছে জিজ্ঞাসা করিলেই সব জানিতে পারিবে এই ভাবিয়া সে ধীরে ধীরে তাহার বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইল।

ঘরে ঢুকিতেই সর্ব্বপ্রথমে তাহার নজরে পড়িল, সেই ফুলী। সেদিনও ঠিক তেমনি ভাবে রোগীর পাশে বসিয়া আছে। ঘরে ঢুকিতে সে সংকোচ করিল। একটি অপরিচিতা যুবতী মেয়ে ঘরে—সেখানে ঢোকাটা সে সমিচীন মনে করিল না। তাই ঘরের বাইরেই সুরেশদা'র প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

ফুলী অমলের এই ইতস্ততঃ ভাব লক্ষ্য করিল। তারপর ধীরে ধীরে সলজ্জ নম্রভাবে কহিল, ঘরে এসে বসুন।

অমল বাইরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিতেছিল, হঠাৎ ফুলীর এই সলজ্জ আহ্বানে সে চমকাইয়া উঠিল। তারপর আপনাকে একটু সংযত করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বৌদির বিছানার এক পাশে বসিয়া পড়িল।

ফুলী মুখ নত করিয়াই আপন মনে কাজ করিতে লাগিল। এই মেয়েটিকে দেখিয়া দেখিয়া অমলের বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া অমল ধীরে ধীরে তার বৌদিকে প্রশ্ন করিল, বৌদি! সুরেশদা' কোথায় গেল?

রোগিণী কথা কহিতে পারিত না, অমল না জানিয়াই প্রশ্ন করিয়াছিল। প্রশ্ন শুনিয়া তার বৌদি, ব্যথিত করুণ দৃষ্টিতে অমলের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল! মৃত্যু-পথ যাত্রিণীর ব্যথা-পরিম্লান সে কাতর দৃষ্টি যেন সহ্য করিতে পারা যায় না। সেদিকে সে আর চাহিতে পারিল না। দেখিল, বৌদির দুই চোখের কোণ বাহিয়া দর দর করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। অমলের চোখ দুইটাও ছল্ ছল্ করিয়া আসিল, অতি কষ্টে সে তাহা সম্বরণ করিয়া, ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল, তুমি কাঁদছ কেন বৌদি?

জবাব দিল ফুলী। কহিল, কথা কি আর সে কইতে পারে? বলিতে বলিতে কথার শেষদিকটা যেন তাহার মুখেই আটকাইয়া গেল।

যাইবেই। অমল তাহা জানিত। এবং তাহা জানিয়াই সে ধীরে ধীরে উঠিল। ফুলীর দিকে না তাকাইয়াই জিজ্ঞাসা করিল—সুরেশদা কোথায় গেল,—ফিরবে কখন?

ফুলী এ প্রশ্নের উত্তর যে কি দিবে, সহসা ভাবিয়া পাইল না। মনে মনে কথাটা একবার আওড়াইয়া লইয়াই বোধকরি বলিল, ঘোড়দৌড় দেখতে গেছে। শনিবার এমনি যায়।

কিছুপর অমল ফুলীকে লক্ষ্য করিয়াই কহিল, এক টুক্‌রো কাগজ---বলিয়া সে তাহার নিজের পকেটেই হাত পুড়িয়া দিল।

পকেট হইতে নোট বইখানা বাহির করিয়া একখানা কাগজ ছিঁড়িয়া লইল এবং পাশের দেয়ালে ভর করিয়া কলম দিয়া তাড়াতাড়ি লিখিল, সুরেশদা, তুমি রেসে যাও—এ তোমার ভারি অন্যায়। ইতি—অমল। লিখিয়াই কাগজ টুক্‌রটি ফুলীর হাতে দিয়া কহিল, এইখানা সুরেশদা'কে দিও। আমি কাল আবার আসব। বলিয়াই সে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

সুরেশ যখন আসিয়া কড়া নাড়িল তখন প্রায় ন'টা। ফুলী তখন পর্য্যন্তও তাহার ঘরে বসিয়াছিল। একটা লম্প লইয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

সুরেশ ভিতরে ঢুকিল।

সুরেশের যে চেহারা ফুলী দেখিল, তাহাতে সে তাহার সহিত কথা কহিতে সাহস পাইল না। তাহার ঘরে লম্পটা ফেলিয়া রাখিয়া সে ঘরের বাহির হইয়া যাইতেছিল। দরজা পর্য্যন্ত যাইয়াই তাহার পত্রখানার কথা মনে পড়াতে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া সে পত্রখানা সুরেশের পায়ের কাছে ছুড়িয়া দিয়া কহিল, এই নাও—তোমার সেই বন্ধুটি দিয়ে গেছে। কাল আবার তিনি আসবেন। বলিয়াই সে অবিলম্বে চলিয়া গেল।

সুরশে ধীরে ধীরে পত্রখানা কুড়াইয়া লইল। সেই একটা লাইন পড়িয়াই সে ক্ষেপিয়া উঠিল। উচ্চৈস্বরে কহিতে লাগিল, হা-রামজাদা! জোচ্চোর! এসেচেন শাসন কর্ত্তে। ভারীত চল্লিশটা টাকা দিয়ে গেছেন! একদিন একটা বাজী "উইন" (win) করতে পাল্লেই—চল্লিশ তো চল্লিশ—অমন সুদ শুদ্ধ চল্লিশটাকা ফিরিয়ে দিতে পারব। বলিয়াই সে গায়ের জামা খুলিয়া মেঝের ছুঁড়িয়া ফেলিল।

তারপর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সহসা সে ঘরের বাহিরে আসিয়া উচ্চ-কণ্ঠে ডাকিল, ফুলী!

ফুলী কোন সাড়া দিল না।

সুরেশ আবার ডাকিল। তথাপিও কোন উত্তর না পাইয়া দরজার কাছে

আসিতেই ফুলীর বাড়ীতে কিসের একটা কোলাহল ও দরজা বন্ধ হইবার শব্দ পাইল।

সুরেশ থমকাইয়া দাড়াইল এবং পরক্ষণেই একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, মেড়ুয়া—ছাতুখোর হারামজাদা! কিন্তু কথাটি যে কাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল কিছু বোঝা গেল না। বলিয়াই সে তার রান্না ঘরে ঢুকিল, স্ত্রীর অসুখের পর হইতে সে নিজেই রান্না করিয়া খাইত।

সকালের খাওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাই সে একখানা থালায় বাড়িয়া লইয়া খাইতে বসিল। এক মনে সে খাইতেছিল। ইতিমধ্যে ফুলী আসিয়া রান্নাঘরের দরজায় চুপ করিয়া দাঁড়াইল। সুরেশ দরজার দিকে পেছন দিয়া খাইতে বসিয়াছিল তাই তাহাকে সে দেখিতে পাইল না।

দিনের বেলার সেই ঠাণ্ডা ভাত তরকারী ক্ষুধার চোটে সুরেশ অম্লান বদনে ক্রমাগত খাইতেছে দেখিয়া ফুলীর বুকে কোথায় যেন একটুখানি ব্যথা বাজিল। ভাবিল, সেখান হইতে চলিয়া যায় কিন্তু না পারিল যাইতে, না পারিল কথা কহিতে। কিয়ৎক্ষণ পরে গলাটা একটুখানি পরিষ্কার করিয়া লইয়া অনুচ্চকণ্ঠে সে কহিল, কি বলছ?

সুরেশ মুখ ফিরাইয়া ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, ত্যাখ্ ফুলী! যদি কেউ কড়া নাড়ে—ঐ ফুটো দিয়ে আগে তাকে দেখ্‌বি। যদি সেই জোচ্চোরটাকে দেখিস্ তবে দরজা খুলিস্‌নি বলে দিচ্ছি! বলিয়াই পুনরায় সে মুখ ফিরাইয়া খাইতে লাগিল।

(চার)

সে রাত্রি প্রভাত হইল।

সুরেশের ঘুম ভাঙ্গিল। গত রাত্রের গ্লানি তাহার মন হইতে সব নিঃশেষে ধুইয়া গেছে। অমলের প্রতি তাহার ক্রোধ শান্ত হইয়া গিয়াছে—তাহার কারণ সে অমলকে মনে মনে ভয় করিত। অমল যে আজ আবার আসিবে তাহা সে জানিত। তাই সে তাহারই আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

প্রতিদিনের মত আজও ফুলী আসিয়া ঘরের কাজ করিতে লাগিল।

সুরেশ ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কথামত অমল যথা সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। ফুলী তখন সেই-খানেই ছিল।

অমল ঘরে ঢুকিতেই সুরেশ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিল, এসো, এসো। তোমার পত্র আমি পড়েছি! ও আমি যাই নি—আমি খেলি নি। আমি কি পাগল হয়েছি অমল! একটা লোকের কাছে কয়েকটা টাকা পেতুম, সে বলেছিল যেতে ওখানে তাই গিয়েছিলাম। পাগল! আমি যাইনি। কহিয়াই অমলের মুখের দিকে চাহিয়া সে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

সুরেশ নির্ব্বিবাদে আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে এই সম্পুর্ণ মিথ্যা কথাগুলো কহিয়া গেল। রাগে দুঃখে ফুলীর সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল।

সুরেশের কথার উত্তরে অমল অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন সুরেই কহিল, ও আমি আগেই জানতাম—তুমি ও কাজ কর্ত্তে পার না। তাই নিজে এসে সত্য ঘটনাটা জেনে গেলাম। শুনে অবশ্য আমার মনটা বড় খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল।

সুরেশ কহিল, না,—না, আমি যাইনি—আমি যাইনি। আয় বস্‌বি আয়,—দাঁড়িয়ে রইলি যে!

অমল বলিল, না, আমি আর বোসব না। কাজ হ'য়ে গেছে। আমি যাই—আমার কলেজ আছে। বলিয়াই অমল গলিতে বাহির হইয়া পড়িল।

অমল বাহির হইয়া যাইতেই ফুলী তাড়াতাড়ি করিয়া ঘরের বাহির হইয়া আসিয়া গলির মধ্যে অমলের কাছে উপস্থিত হইল।

অমল একটু আশ্চর্য্য হইল।

ফুলী কহিল, বাবু, দেখ্‌লেন, কি রকম মিথ্যা কথা বল্‌লে? ও ডাক্তার অবধি ডাকেনি। আপনি যে টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন তা' সব মাঠে দিয়ে এসেছে। ফুলীর চক্ষু দু'টা অশ্রু ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার মুখ চোখের ভাব দেখিয়া অমল এটুকু বুঝিতে পারিল যে, কত বড় দুঃসাহসে সে কথা কয়টা উচ্চারণ করিয়া হাঁপাইতে লাগিল!

কথা কয়টা শুনিয়া সুরেশের প্রতি তাহার মনটা বিতৃষ্ণা ও ঘৃণায় ভরিয়া উঠিল এবং শুধু তাহাই নয়,—কদর্য্য এই বস্তির মধ্যে দুঃসাহসিকা এই সুন্দরী যুবতী যে কেমন করিয়া, কি পথ ধরিয়া এবং কি দুঃখে এখানে বাস করিতেছে তাহারই ইতিহাস একটুখানি জানিবার জন্ম তাহার কৌতূহল জাগিল। কিন্তু ব্যাপারটা দেখিতে দেখিতে এমন ঘটিয়া গেল যে তাহার সে অহেতুকী কৌতূহল নিবৃত্তি হইতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। আকাশে অনেকক্ষণ ধরিয়াই মেঘ করিয়াছিল! শ্রাবণ মাস। সজল-ঘন-বাদল-আকাশ এবং ধরিত্রীর মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে যেন লুকোচুরি খেলা চলিতেছিল। এই বৃষ্টি আবার এই বন্ধ!

দেখিতে দেখিতে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি নামিল। অমলের হাতে ছাতা ছিল না এবং এই নিতান্ত সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সেখানে দাড়াইয়া থাকাও চলে না, অথচ তাহার এই সুরেশদাটির প্রতি নিতান্ত সংক্ষুব্ধ ও ব্যথিত অন্তঃকরণ লইয়া তাহার কাছে পুনরায় ফিরিয়া যাইবার প্রবৃত্তিও হইল না।

এমন সময় ফুলী গলির পাশের একটা দরজা হাত দিয়া ঠেলিয়া বলিল, এই যে, আসুন এই ঘরে।

এই জঘন্য পল্লীর মধ্যে সুন্দরী অপরিচিতা এই রমণীর এই অপ্রত্যাশীত আহ্বানে অমল যেন একবার আপাদ মস্তক শিহরিয়া উঠিল।

ফুলী আবার ডাকিল, আসুন!

কিন্তু তাহার এ কণ্ঠস্বর আহ্বান নয়,—আদেশ।

কি অজানিত আকর্ষণে অমল যে তৎক্ষণাৎ সে আদেশ পালন করিল কে জানে।

ফুলীর সঙ্গে অমল ভিতরে ঢুকিল। ঢুকিতেই দেখিতে পাইল, খোলা বারান্দার এক কোণে একটা হিন্দুস্থানী বসিয়া বসিয়া হুকায় তামাক টানিতেছে। তাহার সেই কালো কদর্য্য চেহারাখানা দেখিয়াই অমলের মনে একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইল।

ফুলী অমলকে লইয়া একটা ঘরে ঢুকিল। ঘরে ঢুকিবার বেলায় সেই বিকৃত দর্শন হিন্দুস্থানীটা বক্র-দৃষ্টিতে একবার অমলের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টিতে অমল সহসা শিহরিয়া উঠিল।

ঘর খানা বেশ সাজান গোছান ছিল। ধীরে ধীরে অমল আপন মনেই যাইয়া তক্তাপোষের উপর বসিয়া পড়িল। বাহিরে শ্রাবণের আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ক্ষণ পরেই ফুলী কি ভাবিয়াই যেন ঘরের বাহির হইয়া গেল। অমল চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

মিনিট কয়েক পরে ফুলী দুয়ারের কাছে আসিয়া অমলকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি পান খান? বলিয়াই সহসা কথাটাকে ফিরাইয়া লইয়া কহিল ও, । না। আপনি বসুন।

অমল বলিল, আমি পান খাই না।

ফুলী চলিয়া গেল।

ঘরে ছোট একটি জানালা ছিল। কি ভাবিয়া অমল হঠাৎ উঠিয়া সেই

জানালার কাছে যাইয়া দাঁড়াইল। দেখিল, বাহিরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। দিনের বেলাই অন্ধকারে দৃষ্টি পথে সব ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে। শীঘ্র বৃষ্টি থামিবার কোন লক্ষণ না দেখিয়া অমল সেই জানালার কাছেই দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ কিসের একটা গণ্ডগোল শুনিয়া অমল ফিরিয়া চাহিল। কিছু দেখিতে পাইল না। উদ্গ্রীব হইয়া চাহিয়া রহিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত এমনি ভাবে চাহিয়া থাকিতেই শুনিতে পাইল যে, সেই লোকটি বোধ করি ফুলীকেই বলিতেছে, ঘরে কে এসেছিল? কথা কয়টার শেষের টুকু একটু অস্পষ্ট শুনাইল; মনে হইল কে যেন বক্তার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে।

কথা কয়টা শুনিয়া অমল চমকাইয়া উঠিল। পরক্ষণেই একটু অস্ফুট আর্ত্তনাদের সঙ্গে প্রহারের শব্দ সে শুনিতে পাইল; আর মনে হইল যেন সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘরের দরজায় শিকলীও বন্ধ হইয়া গেল।

অমল আর একবার আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। দরজার কাছে যাইয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল সেই লোকটি সেই কোণটিতেই এবার পেছন ফিরিয়া বসিয়া তেমনি হুকা টানিতেছে।

বাহিরে সেই দুর্য্যোগ—সেই বৃষ্টি!

অমল কিছু ভাবিল না—তারই মধ্যে বাহির হইয়া পড়িল।

(পাঁচ)

সেইদিন ফুলীর বাড়ী হইতে আসিতে আসিতে অমল কেবলই ভাবিতেছিল সেই অদ্ভুত হিন্দুস্থানী ও ফুলীর কথা। ফুলিইবা কে, আর সেই হিন্দুস্থানীই বা ফুলীর কে হয়! ফুলী বাঙ্গালীর মেয়ে বলিয়াই তার মনে হইল। তবে ঐ হিন্দুস্থানীর সঙ্গে তার কি সম্পর্ক? অমল ভাবিল সত্য, কিন্তু কিছুই আবিষ্কার করিতে পারিল না।

উক্ত ঘটনার প্রায় পাঁচ সাতদিন পরে, অমল একদিন আসিয়া চড়কডাঙ্গার মোড়ে উপস্থিত হইল। সুরেশের বাড়ী যাইবার তাহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। অথচ কিসের আকর্ষণে তাহাকে যে কে টানিয়া আনিল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না।

সহসা সে ফুলীর বাড়ীতেও ঢুকিতে সাহস পাইল না। যদি আবার সেই হিন্দুস্থানীটার সঙ্গে দেখা হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সে একটা বিষম গোলযোগ

বাঁধিবে। ফিরিয়া যাইতেও তাহার ইচ্ছা ছিল না। কি করিবে ঠিক না পাইয়া সে গলির দিকেই ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

গলিতে ঢুকিতে যাইয়া সে একবার মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিতে পাইল, সেই হিন্দুস্থানী সেইদিকেই আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্ত তাহার সমস্ত শরীর একবার কাঁপিয়া উঠিল। সে নির্ব্বাক বিস্ময়ে সেই খানেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হিন্দুস্থানী তাহাকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। সম্ভবতঃ সে অমলকে দেখিতে পায় নাই।

অমল আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতেই শুনিতে পাইল যে, সেই হিন্দুস্থানী উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিয়া যাইতেছে, চাই সোনা মুংদাল্! চাই সোনা মুংদাল্!

অমল কিন্তু ঠিক বুঝিতে পারিল না এই সেই হিন্দুস্থানী কিনা।

অন্ত মনেই সে পথ চলিতে লাগিল। সুরেশের ঘরে যাইতে হইলে ফুলীর ঘরই আগে পড়ে।

ফুলীর ঘরের কাছে আসিতেই দেখিতে পাইল যে, বাহিরের সদর দরজা খোলাই রহিয়াছে এবং সুমুখের বারান্দার উপর বাঁশের খুঁটি ধরিয়া ফুলী বাহিরের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

অমলের সঙ্গে চোখা চোখি হইতেই ফুলী মুখ ফিরাইয়া লইল। অমলও অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া যাইতেছিল। ফুলী ফিরিয়া চাহিতেই তাহা দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিল, দাঁড়ান, ওদিকে যাবেন না।

অমল দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

ফুলী বলিল, ও-খানে দাঁড়িয়েই শুনবেন, না ভেতরে পেরিয়ে আসবেন?

অমল সবটা শুনিবার জন্য বাড়ীতে ঢুকিয়া ফুলীর সামনে উঠানে গিয়া দাঁড়াইল।

ফুলী কহিল, আপনার বৌদি......নাই...

অমল যেন বুঝিতে পারে নাই এমন ভাবেই প্রশ্ন করিল, এঁ্যা! কি!

ফুলী কহিল, হাঁ্যা, মারা গেছে। আপনি যেদিন এসেছিলেন সেই রাত্রে!

অমল তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিল, আর সুরেশদা? সুরেশদা' কোথায়?

ফুলী বলিল, তিনি ও বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন। কোথায় কিছু বলে যান নি।

অমল অবাক হইয়া, সুমুখে, ফুলীর অলক্তক-রঞ্জিত সুন্দর দু'খানি পায়ের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

উভয়ে নীরব—কাহারও মুখে কোন কথা নাই। বেদনা ভারাক্রান্ত বক্ষে সে দুইটি নর-নারী তেমনি নির্বাক হইয়া পাশাপাশি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার পর হঠাৎ সে মৌনতা ভঙ্গ করিয়া ফুলীই প্রথম কথা কহিল। নিজের কথা। বলিল, সে দিনের সেই.....আপনি কিছু মনে কোরবেন না।

অমল সজল চক্ষে উর্দ্ধে তাহার মুখের পানে অর্থহীন দৃষ্টিতে একবার তাকাইল। বলিল, কি? ও। সেই? তাহার পর একটু খানি থামিয়াই কহিল, লোকটা কে?

ফুলী বলিল, ডালওয়ালা।

অমল পথে আজ তাহাকেই দেখিয়াছিল। সে সম্বন্ধে তাহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। পুনরায় প্রশ্ন করিল, এখানে কেন?

প্রশ্ন শুনিয়া সহসা ফুলীর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সে আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতে যাইতে কহিল, সে কথা শুনে কাজ নেই! আপনি যান! বলিয়াই সে আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া ঘরে ঢুকিয়া, সশব্দে সেই আগন্তুকের মুখের সমুখেই দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

এ যেন সেই আদেশ শুনিয়া অমল একদিন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ইহারই এই ঘরে আসিয়া নিঃসঙ্কোচে প্রবেশ করিয়াছিল।

পশ্চাতে দরজা তাহার খোলাই ছিল অমল কিসের ভয়ে যেন ছুটিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিল, সুরেশের সেই পরিত্যক্ত গৃহের পানে অশ্রুার্দ্র করুণ দৃষ্টিতে একবার তাকাইল, এবং না থামিয়াই গলিটা সে হন্ হন্ করিয়া পার হইতে লাগিল। কিন্তু গলি পার হইতে না হইতেই, সেদিনকার মত আজও আবার ঝম্‌ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিল। চারিদিকে তাহার এই অজস্র জলধারার মধ্যে এক মাত্র সে নিজেকে ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইল না। সম্মুখে, পশ্চাতে পার্শ্বে বৃষ্টি ধারার এই পাতলা সূক্ষ্ম আবরণের মধ্যে পথ চলিতে চলিতে তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, তখনও যেন সেই রমনীর অবিচলিত কণ্ঠস্বর বৃষ্টির শব্দে তাহার কানে আসিয়া বাজিতেছে,—আপনি যান! কিন্তু তখন যাহা অলঙ্ঘ্য আদেশ বলিয়া মনে হইয়াছিল, এখন মনে হইল তাহা যেন আর কিছু—আদেশ নয়,—হুকুম নয়,—অনুরোধ; এবং সে অনুরোধের মধ্যে যেন কত নির্য্যাতিতা নারীর কত মূর্ত্ত বেদনার কত অপরূপ রহস্যের কাহিনী লুকানো রহিয়াছে!



উপন্যাস

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৭)

খুড়ীমা বল্লেন, মেঘেও শীত নয়, মাঘেও শীত নয়, যত্র বায়, তত্র শীত।

হেসে বল্লুম, এ বুঝি আপনার গুপ্ত-প্রেস পাঁজীর ভাষা।

না গো না, এ আমি ছেলে-বেলায় দিদিমার কাছে শিখেছিলুম।

খুড়ীমার সঙ্গে আমার বেশ সুন্দর সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে। তিনি আমাকে আর একটুও পর মনে করেন না।

বল্লুম, আজ ভারী শীত, আপনি একটা কিছু গায়ে দিন-না কেন?

প্রফুল্ল হাসিতে মুখখানি ভরে গেল;—না বাবা আমাদের জামা-জোড়া গায়ে দিতে নেই, এই আঁচলেই শীত ভেঙে যাবে এখন।

বাঃ এ আপনার বাড়া-বাড়ি, একটা মোটা গায়ের কাপড় গায়ে দিতে নেই—এমন কথা কোন শাস্ত্রে নেই।

এখুনি ত রান্না ঘরে যাবো—সেখেন থেকে সব শীত পালিয়ে যায়—ব'লে তিনি হাসতে লাগ্‌লেন।

আচ্ছা খুড়ীমা, আপনার রাঁধতে খুব ভাল লাগে, না?

খুড়ীমা সে কথাটা যেন কানেই তুললেন না—বল্লেন, বদন এখনও ফিরলো না—তাইতো রাতের গাড়ীতে এলে বড় কষ্ট হবে তার।

বদন কি কল্‌কাতা গেছে নাকি ?

তিনি আবার যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে ছোট একটি উত্তর দিলেন ;—হুঁ ।

খুড়ীমা !

কি কিরণ ?

বদনকে কেন ক'লকাতা পাঠিয়েছেন ?

কেন কি গো, তোমরা রয়েছ, সে একটু ঘুরে আসতে গেছে । আমি কেন পাঠাতে যাবো ?

চায়ের সঙ্গে পাঁপর ভাজা খেয়ে আমি তৃপ্তির ঢেকুর তুলে—বাইরে এসে দেখ্‌লুম—বেড়াতে যাবার সময় হয়েচে ।

বেলা বারটার পর ইলা একটা ছোট ডিঙ্গিতে করে বেড়াতে গেছে—সঙ্গে হরিলালবাবু, আর মিসেস দত্ত । বদন তাঁর আগেই চলে গিয়েছিল । আমাকে মিসেস দত্ত, অনেক টানা-টানি ক'রেছিলেন কিন্তু আমার কেন জানিনে যাবার ইচ্ছা হ'লো না ।

মনে ক'রলাম যে বদনকে নিয়ে আসি—তাই সটান্ ষ্টেশনে চলে গেলুম । সবটা পথ যেতে হলো না—পথে বদনের সঙ্গে দেখা ;—

কিহে বদন, ফাঁকি দিয়ে খুব ঘুরে এলে, ব্যাপার কি বল দেখি ?

বদনের যেন গলা শুকিয়ে গিয়েছিল,—ঘুরেই বটে—চরকির মত ঘুরচি, আজ সমস্ত দিনটা—উঃ যত বিদ্‌কুটে সব ফরমাস—বাবা এমন সব পেটুকও ত' দেখিনি —আজ প্রাণ বধ হবে বেচারি খুড়িমার আর কি—উনি বিধবা মানুষ !

কি হ'য়েচে হে ?—অত রাগ কেন ?

বদন রাগ ক'রে এগিয়ে বল্লে, হুঁ, উনি নাকি আবার জানেন না—

সত্যি বল্‌চি বদন, আমি কিছু জানিনে তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌চি ।

বদনের বিশ্বাস হ'লো,—সে একটু হেসে যেন আমাকে ক্ষমা করলে—বুঝতে পারলে যে চক্রান্তের মধ্যে আমি নেই ।

কি হয়েচে খুলেই বল না কেন ?

ওই তোমাদের ইলার, বিশ্ব-সংসার পেটে পোরবার সাধ হয়েচে—দেখ্‌বে এখন কোন জিনিষ আর বাদ নেই—আমি মনে করেছিলাম ফর্দ্দখানা তুমিই লিখেচ—কিন্তু ভাই হাতের লেখা দেখ্‌লে হিংসে হয় ।

তুমি সন্দেহ করেছিলে—ফর্দ্দ আমি লিখেচি ?—আমি বিন্দু বিসর্গও জানিনে কিন্তু ।

তাই তো তোমার উপর রাগ হচ্ছিল—দোষ নিওনা ভাই—আমার ঘাট হয়েচে।

বল্লুম, না জেনে রাগ করলে দোষ হয় না।

বদন একটু হেসে বল্লে, মেয়ে মানুষের এমন লেখা হয়, তা' আমি ভাবতেই পারি নি! কিন্তু হঠাৎ থেমে কি ভেবে বল্লে, না জেনে রাগ করাতেই সব চেয়ে বেশী দোষ হয়, তা আমি জানি।

বল্লুম, তুমি ভারি পণ্ডিত।

খানিকটা পথ দুজনে চুপ-চাপ চলে আসার পর বদন বল্লে, আজ দশমী কত রাত হবে রাঁধতে—কাল খুড়ীমার ভারি কষ্ট হবে দেখ্‌চি।

চল আজ গিয়ে বলিগে যে কাল এ সব রাঁধা হবে।

বাঃ বেশ বুদ্ধি, কাল উপোস ক'রে রাঁধবেন!—আর আমরা পেট ভ'রে খাবো?—আমি তাহলে বলচি কিছুতেই খাবো না।

না, না, খুড়ীমা কেন রাঁধবেন, ইলা আর তার মা রাঁধবেন।

গম্ভীর ভাবে ঘাড় নেড়ে বদন বল্লে,—সেকি খুড়ীমা হাত দেবেন?—সে কিছুতেই হবে না।

যদি বন-ভোজন করা যায়?

ঠিক বলেছ, কিরণ দাদা,—উঃ তোমার কি বুদ্ধি বাবা! বলে বদন যেন খুব একটা স্বস্তির ভাবে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে যেতে ফিরে কুলিকে বল্লে, এই জলদি আও! আমার কথা যেন সে নিমেষে ভুলেই গেল!

কিছু না বলে আমি আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে ফিরতে লাগ্‌লুম।

বদন যেন অল্প দিনের মধ্যে অনেকখানি বড় হয়ে গেছে! কলকাতায় পাঁচের একজন ছিল, মাথায় কোন চাপই ছিল না; কিন্তু এখানে তার স্বাতন্ত্র্য হয়েছে—যেন একটা কর্ত্তা-ব্যক্তি!

খুড়ীমার দুঃখে সে বড় বিষণ্ণ হয়েছিল—একটা উপায় বার হওয়াতে সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলে না—একেবারে ছুটে চল্লো!

বাড়ী ফিরে দেখি বদনের মুখ হাঁড়ি হয়ে গেছে! আমায় একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্লে, ঐ রাক্ষুসী-টা সব মাটি ক'রেছে। বল্লে কিনা—বাসি মটন সে কিছুতেই খাবে না। উনিও তাতে যোগ দিলেন।

উনি কে?

ঐ, ওর মা।

তার পর ?

তার পর আর কি ? খুড়ীমা মুখে গামছা বেঁধে রাঁধতে লেগে গেছেন ।

গামছা বেঁধে কেন ?

বাঃ বিধবা যে !

তাতে কি ?

শুঁকতে নেই—শুঁকলে অর্দ্ধেক খাওয়া হ'য়ে যায় যে—এও জান না ?

আমারো ভারি রাগ হলো—আমি নিজের ঘরে গিয়ে—চুপটি ক'রে বিছানায় শুয়ে রইলুম ।

কিছুক্ষণ পরে মিসেস দত্ত খুব হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে বল্লেন, একবার বাড়ীর ভিতর গিয়ে—তোমাদের খুড়ীমার কীর্ত্তি খানা দেখগে ।

বল্লুম, কি হয়েচে ?

মাংস রাঁধচেন—নাকে মুখে কাপড় জড়িয়ে--পাছে মুখের মধ্যে চ'লে যায় । আমি উঠে বসে বল্লাম, না গন্ধ যাবার ভয়ে, উনি বিধবা কিনা !

আমার স্বর বোধ করি অস্বাভাবিক কর্কশ হয়েছিল, বিরজা বল্লেন, তোমার কি শরীর খারাপ ?

না ।

তবে এই অসময়ে শুয়ে যে ?

ওমনি ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বল্লেন,—কি কুসংস্কারেই দেশটা ভরে আছে । আমার এ কথা কিছুতেই সহ্য হলো না—বল্লাম, এটা কুসংস্কার নয় এটা নিষ্ঠা ।

বিরজা কথা কইলেন না বটে কিন্তু চোখ মুখের এমন একটা ভাব করলেন, যাতে গভীর অবজ্ঞাই প্রকাশ হয় ।

আমি কিন্তু আমোল না দিয়ে, যা' বলা আবশ্যক তাই ব'লে ফেল্লাম ।

বল্লুম,—খুড়ীমা বিধবা ;—হিন্দু-সমাজে বৈধব্যের অনুষ্ঠানটি ভারি বিচিত্র—এটা একটা মস্ত আদর্শ-মূলক ব্যাপার—সমাজ এঁদের মধ্যে দিয়ে শুদ্ধির আদর্শটি চির-জীবন্ত ক'রে রাখার ব্যবস্থা ক'রেছে !

বিরজা বল্লেন, মেয়েদের উপরই এই ব্যবস্থা হলো কেন ? পুরুষরা নিজে এই ভার নিলেই ত' পারতেন ।

বল্লুম, ওটা একটা সম্পূর্ণ আলাদা কথা ; ওর উত্তর খুব সহজ ;— যে-যত দুর্ব্বল তাকে তত বেশী নিয়ম পালন করতে হয় ; শিশুর জন্য, রোগীর জন্য

কত নিয়মের ব্যবস্থা হয়েচে। সমাজ সংস্কারকরা হয় ত স্ত্রীলোকদের পুরুষদের চেয়ে দুর্ব্বল মনে ক'রে নেবার অনেক কারণ দেখেছিলেন।

তাঁদের সময় স্ত্রীজাতিকে সংসারের আবের মধ্যে, কঠিন আবর্ত্তের মধ্যে তেমন ক'রে প্রবেশ করতে হতো না,—তাই ভাব প্রবণতা তাঁদের বেশী ছিল; —আদর্শের অনুসরণ ভাবপ্রবণ নর-নারীরাই বেশী করে থাকে।

বিরজা বল্লেন,—আচ্ছা ধরে নিলাম যে তুমি যা বলচ তাই সত্যি; তার পর?

তাই পুরুষের বৈধব্যের ব্যবস্থা হয় নি।

বেশ, এও স্বীকার করলুম।

আমি বলছিলুম, খুড়ীমার নাকে কাপড় দেওয়াটা কুসংস্কার নয়—নিষ্ঠা। মানুষ কালক্রমে সবই ভুলে যেতে থাকে, নিষ্ঠা মানুষকে অনেক কথা মনে করিয়ে দিতে থাকে। বিধবা তাঁর দেহটিকে নিরন্তর শুদ্ধ রাখেন এই মনে ক'রে যে তাতে জীবন্ত মানুষের কোন অধিকার নেই—যে মানুষ স্বর্গে গেছেন—তিনি পৃথিবীর ক্লেদ-গ্লানির বহু উর্দ্ধে—বিধবা যে দেহ-মন দিয়ে তাঁকে আহ্বান করচেন, সেই দেহ-মন যদি পরম পবিত্র না হয় ত কেমন ক'রে তাঁর উপযুক্ত হবে?

হিন্দুর ঘরে বিধবা—ত্যাগ-ধর্ম্মের এক একটি পবিত্র দীপ-শিখা!

এমন সময় ইলা এসে বিরজার পাশে বস্‌লো।

কিসের কথা হচ্চে মা, তোমাদের?

বিরজা বল্লেন, ত্যাগ-ধর্ম্মের কথা।

সে যেন প্রস্তুত হয়েছিল, বল্লে, সবাই বলে, ত্যাগ কর, ত্যাগ কর, আমি ও' কোন দিনই বুঝে উঠ্‌তে পারিনে—কেন ত্যাগ ক'রবো—কার জন্যে ত্যাগ করবো। ভোগ না হতেই ত্যাগ?

বিরজা হাস্‌তে লাগলেন,—তোর যেমন এক কথা!

বল্লুম, কিন্তু ইলা, তুমি যদি আর একটু অগ্রসর হও ত' দেখ্‌বে যে তোমার নিজের ভোগের জন্যই ত্যাগের প্রয়োজন।

কেমন ক'রে?

নিরবচ্ছিন্ন ভোগ কি সম্ভব? নিশ্বাস না ফেল্লে কি প্রশ্বাস্ নেওয়া যায়!

ওটা ত ভোগের একটা প্রণালী।

কিন্তু ত্যাগত' এসে প'ড়চে? যে অনেক ভোগ ক'রেছে—সে আর তাতে

আনন্দ পায় না—সে তখন ত্যাগ ক'রে—দান ক'রে তৃপ্ত হয়। ভাল খাবারটি মা নিজে খেয়ে যত খুসী হন—তার চেয়ে ঢের বেশী আনন্দ হয় তোমাকে খাইয়ে। এ কেন হয়!

কি জানি, আমি ও বুঝে উঠ্‌তে পারিনে—তবে এই টুকু বুঝি—মা-রা বেশ একটু বোকা।

বিরজা আমার দিকে ফিরে বল্লেন, কিন্তু তুমি বাপু একটু ভুল ক'রেছ—ত্যাগ আর বর্জ্জন কি এক?

না, এক নয়ই; ত্যাগের মধ্যে কর্ত্তার ইচ্ছাটা প্রধান। কর্ত্তা ক্ষুব্ধ হয় না—হয় প্রসন্ন।

বিরজা বল্লেন, বেশ কথা, এখন আমি বল্‌তে চাই যে হিন্দু সমাজের বিধবারা কি এই ত্যাগের বোঝা প্রসন্ন মনে, স্বেচ্ছায় বহন ক'রে থাকে?

ইলা বল্লে, ও বাবা, তোমাদের যে রীতিমত মরাল-ক্লাসের লেক্‌চার সুরু হ'য়ে গেল দেখছি! বাবা—আমি এর মধ্যে নেই।

ইলা বার হয়ে গিয়ে হরিলাল বাবুর ঘরে ঢুকে বল্লে, কাকা, আপনি শীগ্‌গির যান, মা আর কিরণে—ভীষণ বাক্-যুদ্ধ সুরু হয়েচে—তাঁদের থামান দরকার।

তিনি মোটা কেতাব খানা থেকে চোখ তুলে চশমার ফাঁক দিয়ে ইলার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে বল্লেন, তুমি যে পালিয়ে এলে?

ইলা টেবিলের উপর হাত দুখানা রেখে—খুব এক চোট হেসে নিয়ে বল্লে' সে সব বড়-বড় কথার তর্ক, ত্যাগ ধর্ম্মের তর্ক—আপাততঃ আমার ওতে কিছুমাত্র দরকার নেই—তার চেয়ে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে কিঞ্চিৎ ভোগ করা যাক্‌গে—ব'লে চলে গেল।

হরিলাল প্রসন্ন দৃষ্টিতে তার গতির লঘুতা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন—বনের হরিণীর মত লঘু-চাঞ্চল্য! কিছুতেই যেন বাধা পড়বে না!

রান্না ঘরের দাওয়াতে বদন ব'সেছিল—সে তার চো'ক দুটো চেপে ধ'রে রইল—অর্থাৎ বল আমি কে?

বদন ঝাঁকি দিয়ে মাথা সরিয়ে নিয়ে বল্লে, ও আমার ভালো লাগে না বল্‌চি—আঃ কি কর যে!

খুড়ী মা, রান্না ঘর থেকে তাই দেখে মনে-মনে ভারি অপ্রসন্ন হয়ে বল্লেন, ইলা কিছু খাবে-কি?

খুড়ী মা, আপনি কি গোনকার?

হরিলাল এসে ইজি চেয়ারের উপর ব'সে বল্লেন, শুন্‌লাম তোমাদের ত্যাগ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে নাকি ভারী গুরু-গম্ভীর আলোচনা চ'লেচে—লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না—বক্তা কে?

হরিলাল বল্লেন,—বাকিটা আপনিই সমন্বয় ক'রে দিন্—

পারবত'?—ব্যাপার কি?

বিরজা বল্লেন, আমি প্রশ্ন করেছি, হিন্দু-বিধবারা কি স্বেচ্ছায়, প্রসন্ন-মনে ত্যাগের বোঝা বহন করে থাকে?

হরিলাল বল্লেন, স্বেচ্ছায় ত্যাগ ক'রলে, মানুষের পক্ষে প্রসন্ন হওয়া অসম্ভব নয়; কিন্তু আমি প্রশ্ন করচি—বিধবারা কি স্বেচ্ছায় বিধবা হন? স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁরা জানেন—যে এই তাঁদের পথ, হিন্দুদের এতেই কল্যাণ!—যেখানে বাধ্য বাধকতা আস্‌চে সেখেনে প্রসন্নতা খুঁজে বার করা শক্ত।

বিরজা বল্লেন—এতো জুলুম,—জবরদস্তি!

হরিলাল বল্লেন, ওটা কোন্ সমাজে নেই শুনি? ক'জন সৈনিক স্বেচ্ছায় প্রসন্ন চিত্তে যুদ্ধে প্রাণ দেয়? কিন্তু রাজপুত জাতের মধ্যে বীরত্বের অভাব ছিল না। হিন্দু-বিধবাদের মধ্যে তেমনি ত্যাগের যথেষ্ট নিদর্শন আছে—তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়—এই আমার বৌমার কথাই বলি।

আশা করি, মিসেস দত্ত রাগ করবেন না—কারণ এটা কতকটা ব্যক্তিগত হচ্চে।

আজকে তিনি, কোনদিন যা' করেন নি তাই করচেন,—স্বেচ্ছায় ক'রচেন—প্রসন্ন মনেই করচেন—ইলার ইচ্ছা-পূরণ করবার জন্যে—পেঁয়াজ দিয়ে মাংস রাঁধচেন, কলকাতার বাড়ীতে এমনটি হ'লে একটা হৈ হৈ কাণ্ড ঘটতো।

এ'কে কি বলবো? আজকে তিনি তাঁর বৈধব্য জীবনের বদ্ধ-মূল সংস্কারকে ছাড়িয়ে উঠেচেন! আজকে তিনি দেখিয়ে দিলেন যে যে নিয়মকে তিনি আজন্ম মান্‌বেন,—প্রয়োজন পড়লে,—ভালবাসার খাতিরে—তাকে কত শীঘ্র, না-করতেও পারেন!

হরিলালের-গলার গম্ভীর শব্দ ঘরের মধ্যে যেন অনেকক্ষণ গম্-গম্ করতে লাগ্‌লো!

বিরজা বল্লেন, আমার কিন্তু এই ধারণাই ছিল যে সমাজ বিধবাদের উপর একটা অন্যায় ক'রে আস্‌ছে। —ক্রমশ

ডাকঘর

শ্রাবণ মাসে একটি দুঃসংবাদ শুনেছ, এ মাসেও আর একটি দুঃসংবাদ দিচ্ছি। এতদিনে শুনেছ নিশ্চয় বাংলার আর একটি মহা-মানুষ ইহধাম ত্যাগ করেছেন। এই মানুষ ক'জনই আমাদের মানুষ ক'রে তুল্‌বার একটা বিপুল মমতা হৃদয়ে পোষণ করতেন। আমাদের দুঃখ, অজ্ঞানতা তাঁদের কষ্ট দিত, তাঁরা তাই জীবন ভ'রে আমাদেরই কল্যাণ-কল্পে বহুকষ্ট, পীড়ন ও বিফলতার বেদনা সহ্য ক'রেছেন।

আমাদের হৃদয় ও মনুষ্যত্বের নায়ক, আমাদের দেশের উন্নতি-সংগ্রামের নেতা ব'লে আমরা তাঁদের নমস্কার করি।

জীবিত অবস্থায় তাঁরা যে সম্ভাষণ পান্‌ নি, মৃত্যুর পরে তাঁদেরই দেশের ও বিদেশের সকলে তাঁদের নির্ম্মল অন্তরের অভিবাদন ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। মনে হয়, কর্ম্মরাজ্যের এই ধারা; মনুষ্যত্বের এই পরম পুরস্কার, এই ঈশ্বরের চরম আশীর্ব্বাদ।

গত ৬ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ২টার সময় সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ব্যারাকপুরের বিজন আবাসে এই কর্ম্মজীবনের সমাপ্তি করেছেন। খবরের কাগজে তাঁর বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে, তাঁর ছবিও বে'রয়েছে। আমাদের ছাপা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল ব'লে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে কল্লোলে বিশেষ কোনও আয়োজন করতে পারলাম না।

তা ছাড়া এই দুঃখের দিনেও বল্‌তে হচ্ছে, চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর তাঁর মৃত্যু নিয়ে এমন সব ব্যবসাদারী দেখেছি যে আর কারুর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ, কাগজের বিশেষ সংখ্যা বের করতে শঙ্কা ও সঙ্কোচ বোধ হয়।

তোমার মনে হ'তে পারে, এই সব লোকের সৌভাগ্য বা অর্থাগম দেখে আমাদের প্রাণের জ্বালা হয়েছে, হিংসা হয়েছে, কিন্তু তা' একটুও না। এক একটা কথা শুনেছি, এক একটা ব্যাপার দেখেছি আর মনে হয়েছে, আমাদের চাইতে আমরা যাদের ছোটলোক বলে, অশিক্ষিত বলি তারা প্রাণে বড়, সংযমে উচ্চ।

মনে হয়, দেশের সৌভাগ্য যে সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে আজও পর্য্যন্ত কোনও ব্যবসাদারীর চেষ্টা চল্‌ছে না।

এই অপ্রীতিকর কথাগুলি অত্যন্ত কষ্ট অনুভব ক'রেই লিখ্‌ছি, আশা করি তোমরা, এই ভাবেই দেশের সব মানুষ গ'ড়ে উঠ্‌ছে তা' মনে করবে না।

এই দেশেই, এই দেশের লোকই আজ পর্য্যন্ত জগৎকে অতিথিরূপে সেবা ক'রে কৃতার্থ হচ্ছে ; এ দেশেরই লোক পৃথিবীর আদর্শ, এদেরই মর্ম্মকথা শুন্‌বার জন্য অন্য দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই ব্যগ্র ও উৎসুক।

এবার তোমাদের ক'খানা বই ও পত্রিকার কথা জানাব। এর মধ্যে কতকগুলি এসেছে সমালোচনার জন্য। কিন্তু সমালোচনাটা ঠিক্ অন্য কথায় হয় ব'লে মনে হয় না। আমরা যে ভাবে লিখি তার নাম কি হয় জানিনা তবে মনে হয়, "সংক্ষিপ্ত সমালোচনার" চাইতে, এ প্রথাটা ভাল !

প্রথমেই বলি, কখানা বইয়ের কথা। সমাজতন্ত্রবাদ—ব'লে একখানা বই পেয়েছি। শ্রীগোপাললাল সান্যাল মিষ্টার চার্লস্ এইচ্, ওলিন কৃত মূল গ্রন্থের ভাবানুবাদ বাংলা ভাষায় করেছেন। আত্মশক্তি কার্য্যালয়, ৯৩।১এ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত, মূল্য দশ আনা। বইখানার দাম লেখা সব শেষের পৃষ্ঠায়—মলাটে। শেষের দিকের মলাটে একটি চক্রাকার চিত্রও আছে। সম্মুখের পৃষ্ঠায় সে চিত্রখানি কেন এলনা তা' বুঝা যাচ্ছেনা। দামটাই বা পেছনে লেখা কেন ?

বইখানি খুব কাজের বই। বর্ত্তমান সময়ে জগতের অধিকাংশ দেশই সমাজতন্ত্রী আদর্শে পরিচালিত, বাংলা ভাষায় এরূপ জন-মতবাদের একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়াতে ভালই হয়েছে। গ্রন্থকারের চেষ্টা সার্থক হবে আশা করি।

অপরিণীতা—একখানি নভেল। শ্রীবিজয়গোপাল বক্সী লিখেছেন। দাম ১।০ আনা। বইয়ের মলাটখানি কাগজের নয়, চামড়ার নয়, কাপড়ের নয়,—সেই "লাল সিল্কে" মোড়া প্রথামত সোনার জলে নাম লেখা। লেখকের ইচ্ছা ভাল, চেষ্টা মহৎ কিন্তু "অনুর্ব্বর মাথার এলোমেলো চিন্তাগুলো কষ্টে-সৃষ্টে জুড়ে গেঁথে" এই বইয়ের খস্‌ড়া লিখেছেন বলেই মনে হয়। তাঁর উদ্দেশ্য খুব মহৎ, পণপ্রথা নিয়েই বইখানার মূল অংশ ; নারীর কষ্ট, পুরুষদ্বারা নারীর পীড়ন প্রাণে প্রাণে অনুভব করেই হয়ত লেখক আখ্যায়িকা লিখেছেন, কিন্তু পুরুষ যে আবার যতীন, হরিশ চাটুয্যে প্রভৃতির মতও আছে তা' লেখক ভুলে যান্ নি আশাকরি। তা ছাড়া উপন্যাস লেখারও কয়েকটা ধরণ আছে, তার মধ্যে বক্তৃতা বা উপদেশ বেশী থাক্‌লে তাতে বক্তারই পরিশ্রম হয় মাত্র, আর সে বক্তৃতা যদি কেউ পড়ে তাহলে তারও হয় অন্ন-শ্রম।

এবার বল্‌ছি ব্যথিত জীবন—বলে বই খানার কথা। শ্রীরামসত্য

মুখোপাধ্যায় লিখেছেন। মূল্য দুই টাকা, বই খানি বেশ মোটা তিন শত একচল্লিশ পৃষ্ঠা। বই খানিকে গ্রন্থকার হয়ত উপন্যাস লিখছেন ভেবেই লিখেছেন। বইয়ের প্রথমে একটি ভূমিকা আছে তার ভিতর থেকে একটু একটু তুলে দিচ্ছি, তার কারণ আছে। লেখক নিজেই লিখ্ছেন— বঙ্গমাতার যে ভাষা তাঁহার মর্ম্মের, যাহা সনাতনী—যাহা সমুদ্র নির্ঘোষবৎ কল্লোলময়ী, আমি তাহাকেই বাছিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছি। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের ভাষা, যে খাতে দ্রুত ও অবিশ্রান্ত বহিয়া যাইতেছে, ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, আমার তরণী সে নদীতে পাল বাহিতে সাহস করিল না। আমি গঙ্গার মাহাত্ম্য শুনিয়াছি; তাহার তীরে তীরে অনেক তীর্থক্ষেত্রে অনেক তপোবন আছে। তরণী বাহিতে হয় ত ঐ গঙ্গা তরঙ্গে, মরি ত গঙ্গায় ডুবিয়া মরিব।" এই ত গেল তাঁর মনের কথা। তা ছাড়া "আর্ত্ত-কণ্ঠ-প্রহত কঠিন তীবক চিত্তের" "তথায় খনিত্র-খনিত পয়ঃপ্রণালীর" যেরূপ শোভা হয়" এ সব সত্ত্বেও ইনি 'চরিত্রাঙ্কনে ধর্ম্মের আদর্শ সংরক্ষণে প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন এবং লেখক মনে করেন, 'যদি আমার আর্ত্তকণ্ঠে সুপ্ত বীরদিগের কর্ণে প্রবেশ করে আমি জানিব সেইটাই আমার চরম সার্থকতা।' সুতরাং সুপ্ত বীরদিগের উপরই এখন এই বই খানার উপযোগীতা নির্ণয় করবার দায়িত্ব রইল।

এবার দেশের শত্রু—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী লিখিত। মূল্য কুড়ি আনা। হিসেব ক'রে দেখ ক' টাকা ক' আনা হয়। লেখকের নিবেদন,—এই ছোট রচনাটিকে সহৃদয় পাঠকগণ প্রবন্ধ ও বলিতে পারেন, উপন্যাসও বলিতে পারেন, ইহা দুই-ই—ইহা প্রবন্ধোপন্যাস। প্রবন্ধের পায়ের সহিত উপন্যাসের পাখা থাকিলেই যে পাখী হয় না—তাহার প্রমাণ উট্‌ পাখী। উট্‌পাখী উড়িতে পারে না—তাহার পাখা দুখানি তাহাকে দ্রুত ছুটিতে সাহায্য করে।··

দেশের যাঁরা প্রকৃত শত্রু ব'লে লেখক মনে করেন তাঁদেরই কয়েকটি চরিত্র অঙ্কন করেছেন।

আমাদের মনে হয় কতকগুলি বিষয়ে বল্‌বার মানুষের অধিকার ভেদ আছে। সে অধিকার মানুষ কেবলমাত্র বয়সের সঙ্গেই লাভ করে তা' নয়, তার জন্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও উদার চিন্তার প্রয়োজনও থাকে।

'হ্যখিতা'—উপন্যাস, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সাহা লিখিত, কলিকাতা, ৮৬ নং টালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীমতী প্রীতি-অঞ্জলী সাহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। এই পুস্তকের লভ্যাংশ অনাথ-ভাণ্ডারে প্রদত্ত হইবে বলে বইয়ের

প্রথমে ছাপা আছে। ছোট উপন্যাস খানিতে একটি নারীজীবনের করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ। বই খানির লেখা বেশ মিষ্টি, ভাষাও খুব শক্ত নয়।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে আবার আশ্বিন মাস এসে পড়ল। এবার পূজা পড়েছে আশ্বিনের প্রথম দিকেই। কল্লোলের আশ্বিন সংখ্যাও যথারীতি মাসের প্রথমেই বের হবে।

আর একটা কথা। আশ্বিন থেকে ত পূজার ছুটি, এই ছুটিতে অনেকে স্থায়ী-ঠিকানা ছেড়ে অন্যত্র চ'লে যান। কিন্তু এত অল্প সময়ের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন ক'রে তাঁদের কাগজ পাঠান আমাদের পক্ষে খুব সুবিধে হবে না। ঠিকানা বদলের জন্য কাগজ খোয়া যাবারও খুব বেশী সম্ভাবনা। তাই তাইতে, আমরা অনুরোধ করি, আমাদের গ্রাহকরা, যাঁরা ঠিকানা পরিবর্ত্তন ক'রে এই ছুটি উপলক্ষে অন্যত্র যাবেন তাঁরা যাবার আগে অনুগ্রহ ক'রে তাঁদের স্থানীয় পোষ্ট অফিসে তাঁদের নূতন ঠিকানায় তাঁদের নামে কাগজ চিঠিপত্র পাঠাবার উপদেশ দিয়ে যাবেন। তাহলেই সব রকমে সুবিধা হবে। আশা করি সকলে এই কথাটি মনে ক'রে স্বীয় পোষ্ট অফিসে এই মর্ম্মে একখানি চিঠি দিয়ে যাবেন। আমরা যথা-রীতি গ্রাহকদের কাগজ তাঁদের রেজেষ্ট্রীভুক্ত ঠিকানাতেই পাঠাব। ঠিকানা হঠাৎ বদল করবার দরুণ বা আমাদের পূর্ব্বে সংবাদ না দেবার দরুণ যদি কাগজ হারিয়ে যায় তাহ'লে পুনরায় সেই সংখ্যার কাগজ পাঠান আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

আশ্বিনের সংখ্যাটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করবার জন্য আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করছি। আশা করছি, আশ্বিনে খুব ভাল ভাল গল্প দিতে পারব, গল্প অনেক-গুলিই থাকবে এবং প্রত্যেকটাই নিজগুণে পাঠকের মনোমত হবে আমরা নিশ্চয় বলতে পারি। এই সংখ্যাটি সকলের মনোজ্ঞ করবার জন্য আমরা সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করছি।

ভাদ্রের সংখ্যায় যশস্বী লেখক শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 'পাষাণী' উপন্যাসখানি শেষ করেছেন। তাঁর হাতের সুন্দর লেখা বাংলার নরনারী মাত্রেরই প্রিয়। 'পাষাণী' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে কি না এখন থেকেই অনেকে খবর নিচ্ছেন। আশা করি শৈলজাবাবু কল্লোলের জন্য শীঘ্রই আর একখানি উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করবেন।

শৈলজাবাবু কল্লোলের বন্ধু ও সাহায্যকারী, আমরা তাঁকে এই উপলক্ষে আমাদের সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি।





তৃতীয় বর্ষ

ষষ্ঠ সংখ্যা

আশ্বিন, সন ১৩৩২ সাল

প্রতি সংখ্যা চারি আনা

মাশুলসহ বার্ষিক তিন টাকা আট আনা

সম্পাদক—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

সহ-সম্পাদক—শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ

কল্লোল পাবলিশিং হাউস

২৭ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শেফালি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওগো শেফালি,
সবুজ ছায়ার আঁধারে তুই
জ্বালিস দীপালি।
আমার তারা আকাশ থেকে
রূপের লিপি দিল এঁকে,
কালোর পরে থরে থরে
আখর রূপালি।
ওগো শেফালি॥

বুকের খসা গন্ধ আঁচল
রইল পাতা সে
আমার গোপন কানন-বীথির
বিবশ বাতাসে।
সারাটা দিন বাটে বাটে
নানা কাজে দিবস কাটে,
সন্ধ্যাবেলায় বাজে তোমার
করুণ ভূপালি,
ওগো শেফালি॥

শ্রাবণ সংক্রান্তি
১৩৩২

শরতের ফুল

দেউড়ীর দারোয়ান

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চাশ হাজার টাকার মালিক হরিচরণ আজ পথের ফকির। কৃষ্ণধন গাঙ্গুলীর মৃত্যুর বছর ঘুরতে না ঘুরতে যোগ্যপুত্র পিতৃভক্ত হরিচরণ তার বাপের সমস্ত স্মৃতিচিহ্নগুলিই, এমন কি সঙ্গে সঙ্গে নিজের নাম পর্য্যন্ত সাফ্ ক'রে ধুয়ে মুছে ফেলে একেবারে হারু গাড়োল হয়ে বসে আছে। সদর দেউড়ীর দেউকী সিং লোটা কম্বল গুটিয়ে আজ অনেক দিন হ'ল গভর্ণমেণ্ট সার্ভিস্ নিয়ে চৌরঙ্গীর মোড়ে দাঁড়িয়ে লাল পাগড়ী মাথায় বেঁধে দস্তুর মত ডিউটী ক'চ্ছে। করিম সেখ, আব্দুল মিঞা তেল কুচ্কুচে লাঠিগুলো ঘরের আড়ায় তুলে রেখে লাঙ্গল জোয়াল ঘাড়ে নিয়ে দস্তুর মত বার মাসে তের খন্দ কত্তে লেগে গেছে। পূজারী বামুন হাত পা বিহীন নুড়ী পাথরের পূজো ছেড়ে প্রমোশন পেয়েছেন। তিনি আজ কাল বোসেদের বাড়ীর হাত পা ওয়ালা শুঁড় গোটান গণেশের ধ্যানে নিমগ্ন। আর ঐ শুঁড়ের জন্য পূজুরী ঠাকুরের বরাদ্দও কিছু বেড়ে গেছে। হরিচরণের ঈদৃশ বৈরাগ্য ভাব দর্শনে অনেকগুলি চাম্চিকে ও আরশুলার আনন্দ আর ধরে না। কৃষ্ণধন গাঙ্গুলী বেঁচে থাক্তে তারা অনেকবার অনেক চেষ্টা ক'রে দেখেছে, ঐ তে-মহলা বাড়ীখানায় স্বাধীন ভাবে বিচরণ করা একচেটে ক'রে নিতে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হ'তে পারে নি। যেই একটু কোনও প্রকারে ফাঁক দিয়ে ঢুক্ত অম্নি গাঙ্গুলী মহাশয় নিজে আর বাড়ীসুদ্ধ সকলে মিলে ঠেঙ্গা লাঠী, ঢাল শড়্কী নিয়ে খুঁচিয়ে তাড়িয়েছে, এমন কি যুদ্ধে রাম টহল সিং বলবন্ত সিং, রামলক্‌লক্ সিং—এদের ছ'হাত লাঠীর কোপ সহ্য ক'ত্তে না পেরে অনেকে সমর ক্ষেত্রে দেহত্যাগও করেছে। আজ এই মহাসুযোগে গাঙ্গুলী মশায়ের অন্তর্ধানে ও সিং মশায়দের পৃষ্ঠ প্রদর্শনে এবং হরিচরণ বাবুর সন্ধি পত্রে সহি দিয়া এই অনেক দিনের আশা কার্য্যে পরিণত ক'রে, বিজয় নিশান উড়িয়ে অবাধে সারা বাড়ীখানা জুড়ে রাজত্ব কচ্ছে, কেউ আর বাধা দেয় না।

এ সব গেল কোথায়? এতবড় জমকাল বাড়ী, স্বনাম ধন্য গাঙ্গুলী মহাশয়ের সুকীর্ত্তি, পঞ্চাশখানা গ্রামের মালিক, দান ধ্যান নিরত কৃষ্ণধন বাবুর সে সব

গেল কোথায় ? লোকে লোকারণ্য, গান বাজনায় মুখরিত, রামা হো, সীতারাম সীতারাম, শালা টাকা ফেল্, কেলো তামাক নিয়ে আয়, কাহার্কা সিং ওকে খাড়া করে দাও, ঠাকুর পোলাও নিয়ে এস, বেই মশাইর টাক যে নাভীদেশ স্পর্শ কল্লে দেখ্‌ছি—গেল কোথায়, এ সব গেল কোথায় ! শুধু যে কিচ্‌মিচ্‌ আর মিচ্‌মিচ্‌। কি আশ্চর্য্য, হরিচরণ কি যাদু জানে, না ভেল্‌কী ক'রেছে ? আজও যে বছর ফেরে নি গাঙ্গুলী মশায় স্বর্গারোহণ করেছেন।

(১)

বাবুজী !

ওকে বাবা ! ও যে পুলিশ দেখ্‌ছি।

এধার আইয়ে বাবুজী !

কেন বাবা ! আমি তো এখান থেকেই তোমার কথা বেশ শুনতে পাচ্ছি, আমি তো তোমার ডিউটী করা লোক নই যে, আমাকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে সরে পড়বে।

কুচ কাম হায় জল্‌দী আইয়ে।

কেন বাবা ! একটু দেরি করে গেলে চ'ল্‌বে না, বড্ড বেসামাল নাকি ?

পাহারাওয়ালা আর ধৈর্য্য ধারণ করতে না পেরে একটু সুর চড়িয়ে দিয়েই বলল, ফিন্ বাত্‌ বোলেগা তো থানামে লে যায়েগা।

তবে বাবা চুপ কচ্ছি। আর যদি কথা বলি তো তোমার বাপন্ত দিব্বি।

কেত্তা দারু পিয়া ?

একটুও না বাবা। এই দেখতে পা'চ্ছ না কেমন শান্ত শিষ্ট সোনার কার্ত্তিকটী সেজে হীরের ময়ূরে চড়ে যাবার মত কেমন মৃদু মন্দগতিতে ঘাড় বাঁকিয়ে চলেছি, একটুও পড়্‌ছি নে বা টল্‌ছি নে। তুমি ডাক্‌বা মাত্রই তোমার কথাটা যেই ঝাঁ করে বন্দুকের গুলির মত কানে গিয়ে প্রবেশ করেছে আর অমনি চট্ ক'রে তোমার কাছে এসে হাজির। আর কি ক'ত্তে বল আমায় ? তবে হাঁ, মাতাল ধরতে চাও যদি, ধর ঐ যেদো শালাকে। রাস্তায় পঞ্চাশবার পড়্‌ছে আর উঠ্‌ছে, উঠ্‌ছে আর পড়্‌ছে বলিয়া হরিচরণ ওরফে হারু গাড়ল অদূরে তার সঙ্গীকে দেখিয়ে দিল !

আপ কা নজর তো ঠিক নেহি হায় বাবুজী !

ঠিক্ নেহি হায় ! আলবত্‌ হায়। আচ্ছা, বিশ্বাস না হয় দেখ। কি

দেখাই হ্যাঁ, তাই ত সামনের মাথায় ত' কিছু পাচ্ছি নে। হয়েছে, ঠিক হয়েছে, ঐ দেখ পাহারাওয়ালা সায়েব! ঐ—ঐ—ঐ হচ্ছে 'এল' জ্বল্‌ল, ঐ দেখ 'আই' জ্বল্‌ল, ঐ দেখ 'পি' জ্বল্‌ল, ঐ দেখ 'টি' জ্বল্‌ল, ঐ দেখ 'ও' জ্বল্‌ল, ঐ দেখ 'এন' জ্বল্‌ল, ঐ দেখ 'টি' জ্বল্‌ল, ঐ দেখ 'ই' জ্বল্‌ল, ঐ দেখ 'এ' জ্বল্‌ল! আবার কি প্রমাণ চাও? "লিপটন টি" পর্যন্ত পড়ে দিলাম। আবার কি করে নজর ঠিক রাখব বাবা পুলিশ! আচ্ছা, এইবার আর একটা প্রমাণ দিচ্ছি, ঐ একখানা ট্রাম আসছে না? ঐ দেখ ওর ওপরে কাঠের ওপর লম্বা লম্বা অক্ষরে লেখা রয়েছে "লিপ টন টি" আর তার দুই পাশে "জিনতানের" বড়ী আঁকা। কেমন এখন বিশ্বাস হল?—তা যাই বল বাবা, পকেটে কিছু নেই। বিশ্বাস না হয় এই দেখ পকেটের দরজা একদম খোলা—বলে হারু গাড়ল পকেটের এ-মুখ দিয়ে হাত পুরে দিয়ে ও-মুখ দিয়ে হাত বার করে পাহারাওয়ালাকে দেখিয়ে দিল।

পাহারাওয়ালা একটু ভেবে বল্লে, আপ্ আভি কাঁহা রয়তেঁ হেঁ?

হাম তো আভি তোমার সাম্‌নে রতা হ্যায়।

নেহি নেহি, ডেরা কাঁহা?

ডেরা তো নেই বাবা!

তব্ কাঁহা রয়তেঁ হোঁ?

এই তোমাদের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বিনি-পয়সায় পাহারা দেতা হ্যায়। কোম্পানী যদি এই সব দেশের সুসন্তান আশ্রয়হীন মাতাল গুলোকে রাস্তায় পাহারাওয়ালা করে দিত তা হ'লে আর এত টাকা এই সব সিংদের পেছনে খরচ কত্তে হ'ত না। বেশ বিনি-পয়সায় কাজ হাসিল অথচ আমাদেরও নিশ্চিন্ত হয়ে বুক ফুলিয়ে এক জায়গায় দাঁড়াবার স্থান হ'ত। তা ছাই কি এমন একটা পয়সাও ভগবান টেঁকে রেখেছেন যে, একটা ডেরায় গিয়ে এমন গোলাপী নেশাটার সম্মান বজায় রাখ্‌বে?

রাত্‌মে কাঁহা রয়তে হেঁ?

ময়দান মে রতা হ্যায়!

পাহারাওয়ালা মস্ত বড় একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে আপন মনে বার দুই সীতারাম, সীতারাম বলে হরিচরণের আপাদমস্তক একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করতে লাগল। শত ছিন্ন মলিন কাপড় পরনে, গায়ে একটা শ্মশান-কুড়ান কদর্য্য সার্ট আজানুলম্বিত, নগ্ন পা দুখানা ধুলি ধুসরিত, চক্ষু কোটরাগত, বর্ণ কালিয়ে,

চুলগুলা রুক্ষ, শুষ্ক ও শীর্ণ দেহখানা দেখে আর চোখের জল রাখতে পারল না। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে হরিচরণকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার সর্ব্বশরীর অশ্রুজলে সিক্ত করতে লাগল। হরিচরণ বড়ই সমস্যায় পড়ল। অত বড় বলবান পাহারাওয়ালার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার ক্ষমতা হরিচরণের মত বিশটা এলেও পারে না, কোনও চৌদ্দপুরুষে পারেও নি। সে ভাবতে লাগল, এ কি রকম পুলিশ বাবা! মাত্ লামী ক'ল্লে জানি, হয় কিছু গুঁতো সেলামী করে নিয়ে টেঁকে গুঁজে না দিতে পাল্লে রুলের গুঁতো মাত্তে মাত্তে থানায় ধ'রে নিয়ে যায়। কিন্তু এমন ক'রে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদ্‌তে' ত কোনও পুলিশকে কখনও দেখি নি। এ যে উল্টো হ'ল দেখছি। হরিচরণ বলল, আরে বাপু সেপাই জী! তুমি অমন বে-আইনি ক'চ্ছ কেন? এ আইনটা যে উল্‌টো হ'ল। কোথায় আসামী পেয়ে খুশী হবে, দু'পয়সা গলাবার চেষ্টা দেখ্‌বে, তা না তুমি একেবারে কেঁদেই ভাসালে দেখ্‌ছি। বলি দরজা-খোলা পকেট দেখে কি বড্ড দুঃখু হয়েছে নাকি যে শীকার ফস্‌কাল, তা না হয় যদি একান্তই না ছাড় তা হলে এই লাখ টাকার জামাটাই খুলে দিই। কেমন সায়েব? রাজি?

পাহারাওয়ালা পূর্ব্ববৎ হাউ হাউ করে কেঁদেই আকুল। হারুর কথার এক বর্ণও তার কানে পৌছাল না।

হারু দেখল, এ যে ভারি বিপদ। এর পর ব্যাপার দেখে লোকজন জুটে গেলে হয় ত' তাকে সত্যি সত্যিই থানায় যেতে হবে, তখন যে আরও বিপদ জুটবে। কাজেই সে প্রাণের দায়ে প্রাণপণ শক্তিতে পাহারাওয়ালার পেটে এমন এক ঘুঁষি মারল যে সেই ঘুঁষি খেয়ে বাধ্য হয়ে তার বাবুজীকে ছেড়ে দিয়ে চিৎপাত হতে হল। হারু ছাড়া পেয়ে কোনও দিকে না তাকিয়ে আপন মনে গজর গজর করে বকতে বকতে সরাসর সোজাপথ বেয়ে চলে গেল।

যেদো অল্প দূরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ বেশ মজা দেখ্‌ছিল আর ভাব্‌ছিল হেরো শালাকে ত' পুলিশে ধরেছে, ও শালা ত' মরেছে! আমি আর হেরো গাড়লের সঙ্গে মরি কেন? আস্তে আস্তে এই বেলা দিন থাকতে গা-ঢাকা দেই। তাই এতক্ষণ আড়ালে গা-ঢাকা দিয়েই ছিল। কিন্তু যেই সে দেখ্‌লে যে, হেরো ত পাহারাওয়ালার হাত ছাড়িয়েছে, ও সোনার চাঁদ গুটি গুটি অনেক দূর এগিয়ে এসেছে, তখন সে তাড়াতাড়ি বার হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে

হাঙ্গুর সাম্‌নে গিয়েই থম্‌কে দাঁড়িয়ে বল্লে—এই যে হেরো শালা, এসেছিস্! আমি আরও তোর জন্যে খুব রেগেমেগে ছুট্‌ছিলাম। যাক্ বাঁচা গেছে, শালাকে তখন বল্লাম, এত মদ খাস্ নে সামলাতে পার্‌বি নে, তুই শালা তা ত' শুন্‌বি নে।

শালাকে যে ঘুঁষি মেরেছি তাতেই বোধ হয় এতক্ষণ শালাকে অক্কা পেতে হয়েছে।

হয়েছে, আর বীর দর্প দেখাতে হবে না, এখনই হয়ত' কান ধরে এসে নিয়ে যাবে খ'ন, এখন চল্—শিগ্‌গীর, শীগ্‌গীর একটা গলির ভেতর ঢুকে পড়া যাক্।

যেমন কথা তেমনি কাজ! বহুক্ষণ বন্ধু বিচ্ছেদ হওয়ার প্রথম মিলনে আনন্দের উচ্ছ্বাসে বীর দর্পে দুই বন্ধুতে খুব মজা তামাসা জুড়ে দিয়েছিল; যেই হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাই ত, আবার যদি এসে পাকড়ায়, সর্ব্বনাশ! দুজনে আর টুঁ শব্দটি না করে একদমে যত জোরে পারল একটা গলির অনেকখানি এসে পড়ল।

তাই ত' রে হেরো! এযে মেধোর আড্ডা!

তাই ত'!

উভয়েই চলৎশক্তিহীন, উভয়েই উভয়ের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টি, উভয়েই বিস্ময় জগতে।

ফের্ হেরো!

কোন্ রাস্তা দিয়ে যাবি যেদো?

আয়, আমার পিছু ধ'রে আয়।

চল্।

(৩)

রেণুকা আজ প্রায় বছরাবধি চিঠির ওপর চিঠি-হাটি করে হয়রান, কোন সংবাদই নেই। খোকা বাবা বাবা ক'রে সারা বাড়ী ঘুরে বেড়ায় কিন্তু বাবা যে কে তা আজও ঠিক করতে পারে নি। সবাই বলে—নরু, তোর বাবা তোর জন্যে বৌ-পুতুল আন্‌তে, খাবার আন্‌তে কল্‌কাতায় গেছে। নরু মা'র কাছে ছুটে গিয়ে বাবার কত কথা জিজ্ঞাসা করে, ওমা মাগো! বাবা কখন আস্‌বে মা? আমার জন্যে বৌ-পুতুল আন্‌বে মা, খাবার আন্‌বে?

অভাগিনীর চোখের জলে বুক ভেসে যায় আর সেই স্বামীর স্বামী পরমেশ্বরকে

কাতর হয়ে কেঁদে কেটে মাথা খুঁড়ে বলে, ভগবান! খোকার বাবার সন্ধান দাও।

পরদিন দশটার ট্রেনে যাবার জোগাড় করে যতীন সে-দিন ন'টার ট্রেনে বাড়ী পৌছিয়েই ব'ল্লে—মেজ্-দি! গাঙ্গুলী মশায়ের কোনও চিঠি পত্র পেয়েছিস্?

রেণুকার দৃষ্টি যতীনের দিক থেকে আস্তে আস্তে মেজের ওপরই নুইয়ে পড়ল, উত্তর তার মাটীর মতনই ধীর স্থির নির্ব্বাক।

যতীনের আর কিছু বুঝ্‌তে বাকি রইল না। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে ওদিক পানেই চ'লে গেল!

* * *

বাবা! কাল আমি আবার বাসায় ফিরে যাচ্ছি। ঐ এক ছাড়া আর অন্য লোক জন ত' বাসায় কেউ নেই, মেজ-দি ত কেঁদে কেটেই দিন কাটাচ্ছে। তা কল্‌কাতার বাসায় মেজ-দিকে নিয়ে গেলে হয় না? তবু একটু নূতন জায়গা দেখে যদি একটু ঠাণ্ডা হয়।

তা বেশ ত' নিয়ে যা না। রেণুর মত আছে ত?

না, এখনও জিজ্ঞাসা করি নি, ভাব্‌ছিলাম আপনাকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে তার পর মেজ-দিকে ব'ল্‌ব।

বলি হ্যাঁরে! হরিচরণের কিছু সংবাদ পেলি?

কিছুই না। আর আমার সে রকম অবসর বা কৈ যে, একবার বিশেষ ক'রে খোঁজ নেব'।

এক কাজ কল্লে হয় না?

বলুন।

রেণুত' চিঠি-হাটি ক'রে হয়রান হয়েছে। ভুলেও খোঁজ নেওয়া ত' দূরের কথা, আজতক্ একখানি চিঠির জবাব পর্য্যন্ত দিলে না। শেষ চেষ্টাটা, একবার রেণুকে সেখানে পাঠিয়ে দিলে হয় না?

বেশ ত, তা দিন্ না। একবার শেষ চেষ্টাটা দেখা ভাল।

তা হ'লে আমি ভাব্‌ছি কালই সুধীর আর আয়নদ্দী পাইককে সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিই। বিশেষ অসুবিধা বোধ করে, আবার রাত্রের ভেতরই ত' ফিরতে পারবে।

হাঁ, তা' পারবে বৈকি।

তা হলে তুমি কাল্‌কের দিনটা থেকে পরশু যাত্রা কর, কেমন হবে না?

তা না হয় একদিন থেকেই যাব! যদি একান্তই ফিরে আসে, আমি সঙ্গে করেই কল্‌কাতায় নিয়ে যাব।

তা বৈকি।

(৪)

কৈ বাড়ীতে ত' কাউকে দেখলাম না রেণু-দি!

সে কিরে সুধীর!

মানুষের সাড়া পাওয়া ত' দূরের কথা, কোনও কালে যে এ বাড়ীতে মানুষ ছিল এমন রকমও নয়। ঘরময় কেবল আবর্জ্জনার রাশ আর চাম্‌চিকে আর্শুলায় ভরা। তুই ত' ভুল করিস্ নি রেণু-দি?

ভুল করব কি রকম, এতকাল কাটিয়ে গেলাম আর আজ এই এক বছরে সব গোলমাল হয়ে যেতে পারে? আচ্ছা চল্ ত, আমি একবার দেখে আসি, বলে রেণুকা অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে গাড়ী থেকে নেমে পড়ল।

ওঃ কতদিন, কতদিন এ স্বর্গের সৌন্দর্য্য উপভোগ করি নি। স্বামী! দেবতা! অভাগিনীকে পায়ে স্থান দাও। বড় আশা করে এসেছি, মুখ রক্ষে কর।

ভাই-বোনে ঘরে ঢুক্‌তেই আজ অনেক দিনের ভোগ-দখলি বাড়ীখানা বুঝি দখল শূন্য হয় ভেবে একদল চাম্‌চিকে কিচ্‌মিচ্ শব্দ করে ছুটোছুটি করতে লাগ্‌ল, আর্শুলার দল দেয়ালের চারিধারে মহা হুলুস্থুল বাধিয়ে দিয়ে আগন্তুকদের জানিয়ে দিলে—এ তোমার স্বামীর ঘর নয়, এ আমাদের।

ও বাবা এ যে ভূতের বাড়ী! দিনে ভীষণ অন্ধকার! এ যে দমবন্ধ হয়ে মলাম বলে সুধীর একছুটে ঘরের বাইরে এসে হাপ্ ছেড়ে বাঁচল।

রেণুকা কিন্তু সেই অন্ধকার আবর্জ্জনা ঠেলেই ঘরে ঢুকে পড়ল সে যদি আজ তার স্বামীর সন্ধান না পায় তাহলে যে এর চেয়ে গাঢ় অন্ধকার তার সাম্‌নে উপরে নীচে অন্তরে বাইরে!

সুধীর ডাকল, রেণু-দি! রেণু-দি! সে কি রেণু-দি ঘরে ঢুকল নাকি! রেণু-দি!

সুধীর ভিতরের ঘর থেকে রেণুকার কোনই উত্তর পেল না।

ফিরে আয় রেণু-দি, ওখানে সাপ আছে।

তা আমি জানি, কিন্তু এর পর যে যম আছে ভাই!

প্রায় পনর মিনিট কাল পরে রেণুকা বাইরে এসে বল্লে সুধীর, তুই একবার ঐ পাশের বাড়ীটায় জিজ্ঞাসা করে জেনে আস্‌তে পারিস্‌, ওরা তোর গাঙ্গুলি মশাইর কোনও খবর রাখে কিনা?

সুধীর পাশের বাড়ী থেকে সংবাদ আন্‌লে, তারা কোন খবরই রাখে না। আজ প্রায় নয় দশ মাস হ'ল কোথায় গিয়েছে, কাউকে কিছু বলে যায় নি। ভাই-বোনে আবার গাড়ীতে এসে উঠ্‌ল, গাড়ী বাড়ী ফিরে চ'ল্‌ল।

রেণুকার মনের মধ্যে যে তখন কেমনটা হচ্ছিল তা বালক সুধীর যত বুঝ্‌তে পারুক আর নাই পারুক, বুড়া পাইক আইনদ্দীর কিন্তু কিছুই বুঝ্‌তে বাকি ছিল না। বুড়া একবার কেবল উপরের দিকে নজর তুলে বল্লে, আল্লা!

তারপর গাড়ী চলেছে, বেশ চ'লেছে, অনেকদূর পথ পেরিয়ে এসেছে কিন্তু কারও মুখে একটি কথাও নেই। একমাত্র গাড়োয়ানের গরু-তাড়ান বাঁধি গদ ছাড়া। সুধীর যদিও মনের ভাব বুঝ্‌তে শেখে নি কিন্তু তার রেণু-দি'র চোখ মুখের ভাব দেখে কতকটা বিমর্ষ হয়েই বসেছিল। শুধু এই টুকু সে বুঝেছিল দিদি তার বরকে পায় নি। খোকারও এতক্ষণ কোন সাড়া-শব্দ ছিল না। সে বড় আশা করে এসেছিল, তার বাবাকে পাবে, রাঙ্গা বউ, খাবার পাবে বলে। এতক্ষণে বড় কাঁদ কাঁদ হয়ে অভিমান ভরে বল্লে'—কৈ মা, বাবা?

খোকার কথার জবাব তার অদৃষ্ট ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না!

(৫)

মা! জল খাব।

এই নাও বাবা!

যতীন তারপর দিনই তার মেজ-দিকে আর নতুন বউ সরমাকে নিয়ে কল্‌কাতার বাসায় এসে উঠেছে। বেশ একঘর কল্‌কাতার গৃহস্থ সেজে মুরুব্বিয়ানা ক'চ্ছে। যেখানে বড় বড় ডাক্তার সেইখানেই বড় বড় রোগ, কিন্তু বড় খাটে না কেবল ছোটর ঘরে দুঃখীর ঘরে। আবার ঐ বড় বড় রোগই এসে জোটে ছোট ছোট দুঃখীর, হত ভাগিনীর ভাঙ্গা কপালে। খোকা বুঝি বাঁচে না!

খোকার বাবা এ'ল না, খোকার বৌ-পুতুল এ'ল না, খোকার মা রোজ

বলে আজ আস্‌বে, কাল আস্‌বে। কিন্তু এ কাল আর খোকার বুঝি এল না। খোকার কা'ল আস্‌তে আসতে কাল এসে পড়্‌ল'।

মা! বা—বা—বৌ—পু—তু—ল—

ডাক্তার কেস্ ছেড়ে দিয়ে গেছে, ব'লে গেছে হোপ্‌লেস্।

আর ত' খোকা বাঁচ্‌বে না, ঐ বুঝি হয়ে গেল, না? খোকা যে কথা ব'ল্‌ছে। দেখি, একবার কান পেতে খোকার শেষ কথাটা শুনে নি। ওমা, একি! খোকার সেই কথা—মা! বা—বা, বৌ—পু-তু-ল—

ঐ যাঃ, সব শেষ। খোকার আমার হয়ে গেল। তোমরা সবাই ব'ল্‌তে পার, আমি খোকার জন্যে কাঁদ্‌ব কি হাস্‌ব? কি কর্‌ব? আচ্ছা, সবাই ত' কাঁদে কিন্তু ফিরে ত' পায় না। আমি একবার হেসে দেখি, ফিরে পাই কিনা। আর ফিরে পেয়েই বা কি হবে? খোকাকে ত' আমি তার বাবাকে দেখাতে পারব না; বৌ-পুতুল সে সব ত কিছু দিতে পার্‌ব না। নাই বা পারলাম, তবু হাস্‌ব। হাঁ হাসব বৈকি!

মেজ-দি! গাঙ্গুলি মশায় যদি এসময়—একি! মেজ-দি যে হাস্‌ছে! মায়ের প্রাণে ব্যথা লাগে নি! কৈ, চোখে ত জল দেখ্‌ছি না! বেশ দিব্বি হাস্‌ছে! আমার যে বুকখানা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে।

কিরে যতীন! দাঁড়িয়েই রইলি যে? শ্মশানে যাবিনে? আমি যে খোকার চিতা সাজাব ব'লে বসে আছি, মুখে আগুন দেব' বলে সাজ্‌ছি আর তুই এম্‌নি ক'রে বুঝি সময় নষ্ট কচ্ছিস? বাঃ!

(৬)

দেউকী সিং-এর আর ডিউটি করা হ'ল না। হারুর ঘুঁষির চোটেই হউক আর যার চোটেই হউক তার আর চাকরী ক'র্‌ত্তে ইচ্ছে হ'ল না। দেউকী সিং এখন ছোট্‌কী সিং সেজে পথে পথে কার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, অথচ তাকে ঠিক খুঁজেও পাচ্ছে না। পেলেও হয় ত বা ঠাউরে উঠ্‌তে পারছে না।

গঙ্গার ধারে ঐ সাধুর পাশে ও কে? সেই দিনকার সেই পাহারা-দেওয়ার সময় সেই ছেঁড়া জামা গায়ে, ছেড়া কাপড় পরনে যাকে দেখেছিলাম, সেই না?

সাধুজী! হাম্‌কো থোড়া গাঁজা পিলায়েগা?

এ কি বাবা বেওয়ারিশ বৈঠক যে, এলেই টান! দেখি বাবা তোমার মুখখানা, বলিয়া হারু গাঁজার কল্‌কের একটান মেরে কল্‌কেটা দেউকী সিং-এর সাম্‌নে ধর্‌তেই—আরে এ শালা দেখ্‌ছি সেই গুলি খাওয়া বাঘ, ঘুঁষিখোর পাহারাওয়ালা!

তাই না কিরে বলে যেমন চিৎবাজি খেতে খেতে প্রায় আট দশ হাত তফাতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ল। সাধু তড়াক্ করে এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, পা—হা—রা—ও—য়া—লা! সঙ্গে সঙ্গে সাধুর কৃত্রিম জটাটিও মাটিতে খসে পড়ল।

নেহি বাবা! হাম পাহারাওয়ালা নেহি হ্যায়, হাম ভিখ্‌ওয়ালা।

তা বাবা—ফকিরই হও আর আমীরই হও, এই নাও কল্‌কে, বেশ ক'রে কষে একটা দম মেরে ঐ সোজা রাস্তা দেখা যাচ্ছে, বেশ গঙ্গায় হাওয়াও ছেড়েছে, মশ্‌গুল করে সীতারামের নাম গান করতে করতে সরে পড়। নৈলে সেই ঘুঁষি মনে আছে ত, বলে হারু আর একবার ঘুঁষি বাগিয়ে দেউকী সিং-এর সাম্‌নে বেশ করে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিল।

দেউকী সিং পোড়া কল্‌কেতেই একটা টান মেরে কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে উপরে নিমতলার শ্মশান ঘাটের মধ্যে প্রবেশ করল। কিন্তু ঢুকেই কেবল নজর করতে লাগ্‌ল তার বাবুজী কি করে, কোথায় যায়।

সে যে প্রায় পনর ষোল বছর ধ'রে গাঙ্গুলি মশায়ের বাড়ী চাক্‌রী করেছে। চোব্বা চাপ্‌কান পরে কত দিন ঐ সদর দেউড়ীতে বন্দুক হাতে ক'রে পাহারা দিয়েছে, অনেক নিমক খেয়েছে আর এই এক বছর পেরুতে না পেরুতেই বাবু আমার এমন হয়ে যাবে, তা সে দেখ্‌তে পারবে না। না হয় তার আজীবনের সঞ্চিত অর্থ সবই তার বাবুজীর পেছনে যাবে, তবু বাবুজীকে ঠিক আবার বাবুজী ক'রে সে না হয় আবার তার দেউড়ীর দারোয়ান হবে।

(৭)

ওকি! খোকা চিতায় উঠেও যেন হাঁ করছে। ঐ হাঁ-এর ভিতর যেন বল্‌ছে, বাবা,—বৌ-পুতুল—কখন। বাহারে খোকা তবু তোর বাবাকে চাই? আচ্ছা একটুখানি দেরী কর্‌, আগে তোকে পুড়িয়ে ভস্ম ক'রে ফেলি। তারপর তোর বাবাও পাবি, তোর মাও পাবি, তোর বৌ-পুতুলও পাবি, সব পাবি—সব পাবি বলিয়া রেণুকা চিতায় সাজান তার খোকাকে সান্ত্বনা দিতে লাগ্‌ল।

হারু ও যেদো শ্মশানের ভিতর একটা গণ্ডগোল শুনে তাড়াতাড়ি ছুটে এ'ল মজা দেখতে কিন্তু মজাটা ঠিক জম্‌ল না। জুড়িয়ে গেল। . ব্যাপার—দুই বেটা মাতাল এক শব এনে এ বল্‌ছে আমি মুখাগ্নি ক'রব—ও বল্‌ছে আমি মুখাগ্নি করব। এই নিয়েই মারামারি। কিন্তু পাকতে না পাকতেই কাঁচিয়ে দিলে জন কতক গুণ্ডা এসে।

এঃ বেটারা মাতাল—যেদো দাঁত মুখ খিঁচিয়ে হারুর দিকে চেয়ে বল্লে।

হারুর তখন চোখ দুটা অন্য দিকে ঘুরে গিয়েছিল। সে দেখ্‌ছিল, একটা শিশু একটা চিতার উপর পড়ে আছে, তখনও আগুন দেওয়া হয় নি। কিন্তু বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, সে শিশুটা যেন হাস্‌ছে আর কাকে জিজ্ঞাসা করছে—মা! বাবা!

হারু মনে মনে ব'ল্‌লে, এ কি! এ শিশু ত' মরে নি বেঁচে আছে, নিশ্চয়ই বেঁচে আছে, নৈলে অমন কথা বলার ভাব কেন! হারু জ্ঞান হারা হয়ে এক-লাফে প্রায় চিতা ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিরে হেরো! অমন লাফ দিচ্ছিস্ কেন? বড় যে একটা কতা-টতা কানে তুল্‌ছিস্ নে! অমন হাঁ ক'রে দেখ্‌ছিস্ কি? বলে বন্ধু যেদো তার প্রাণের বন্ধু হেরোকে জানিয়ে দিলে, বেশী গাঁজা খেয়ে তার মাথাটা ঠিক্ বিগড়ে গেছে।

এ্যাঁ! ও মুখাগ্নি করে কে?

হারুর নেশা ছুটে গেল, সে আরও একটু সরে গিয়ে দেখল তার স্ত্রী রেণুকা!

রেণুকার হাতখানা কেঁপে উঠ্‌ল, হাতের জ্বলন্ত নুড়ো খপ্ করে চিতার পাশে পড়ে গেল। চম্‌কে উঠে, হলেই বা পর পুরুষ তবু সে অবাক হয়ে হরিচরণের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রৈল, অনেক দিন পরে এমন করে নাম ধরে ডাক্‌লে কে? খোকার বাবা না! এসে'ছ, বেশ বেশ, খোকার পুতুল এনে'ছ? খোকা! তোর বাবা এসেছে—উচ্চৈস্বরে কথাটা বলে রেণুকা একদম গঙ্গার ধারে ছুটে গিয়ে মাগো। বলে পতিতোদ্ধারিণীর বক্ষে আশ্রয় নিল।

হরিচরণ সেইরূপ মূঢ়ের ন্যায় সেইখানে ঠিক যেমন ছিল তেম্‌নিই র'ল, একটু নড়ল না, কথাও বার হল না। রেণুকা যে কখন গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে সে তার কোনই খবর রাখে না। যে পর্য্যন্ত না দেউকী সিং কাঁদতে কাঁদতে ভিজে কাপড়ে এসে বল্লে—বাবুজী! মায়ীকে নেহি মিলা।

হারুর চমক ভাঙ্গল, সাম্‌নে দেখল দেউকী সিং। এ কে! দেউকী দা না?

(শেষ)

যতীন নরুর শবদাহ শেষ করে কাঁদতে কাঁদতে যখন বাড়ী ফিরল তখন প্রায় রাত্ একটা।

সে রাত্রে আর যতীনের কান্নার বিরাম নাই, আর মুখে শুধু 'এর জন্যেই কি দিদি এত হেসে ছিলি'!

অপর ঘরে দেউকী সিং তার বাবুজীকে কোলে ক'রে আকাশ পাতাল ভাবছে, তার এই ভাবনার সাথি নেই, নিশীথ রেতে বন্ধ ঘরে তার উষ্ণ প্রাণভেদী দীর্ঘশ্বাস আর দীর্ঘশ্বাস!

ভোর হয় হয় হরিচরণ চোখ চেয়ে দেখল যে তার দেউকীদার কোলে শুয়ে আছে। হেরিকেনের আলোটা মিট্ মিট্ ক'রে জগৎটা দৃশ্যমান ক'রে রেখেছে। হতভম্বের ন্যায় কিছু সময় অপলক দৃষ্টিতে সিংএর দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ এক লাফে উঠে বসে উচ্চৈস্বরে বলে উঠ্ল পাহারওয়ালা! মনে আছে সেই ঘুঁসি ও বেদো! ওরে শালা বেদো, আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে দেউকী সিংকে বেশ করে দেখে নিয়ে দুইহাত দিয়ে দেউকী সিংএর গলা জড়িয়ে ধরে প্রাণভেদী আর্ত্তনাদে বলে উঠল—দেউকী দা! রেণুকা, খোকা, আমার কি হবে দেউকী দা?

যানে দেও বাবুজী! দুঃখ মাত্ কিও, কুচ্ পরোয়া নেহি। ভগবান কা যো মর্জ্জী ও বি ঠিক হো গা, দুঃখছে কুচ্ ফয়দা নেই হ্যায়। কোঠী মে চল্ ভাই। ফিন্ বাবু হোগা, হাম ফিন্ দেউরামে দারোয়ান রহেগা।

দেউকী দা! আমার যে কেউ নেই।

হাম হ্যায়।



শেষের দিক

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১)

দূরে কোথায় পাখী ডাকিতেছিল বউ কথা কও, বউ কথা কও। অবিল জ্যোৎস্নাভরা নিশি, পাতলা কুয়াশার মত মেঘ সমস্ত আকাশখানা ভরিয়া আছে, তারাগুলি তাহার আড়ালে কোথায় লুকাইয়াছে, চাঁদ সম্পূর্ণভাবে ঢাকা পড়িতে পারে নাই, দীপ্তিহীন আলোর আভাস সারা ধরার গায়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। স্ফুট জ্যোৎস্না এক সৌন্দর্য্য, আবিলতাময় জ্যোৎস্নার আর এক সৌন্দর্য্য।

অদূরে প্রবাহিতা গ্রাম্য নদী যমুনা, অতি শীর্ণায় ঝির ঝির করিয়া বহিয়া যাইতেছে মাত্র। কচুরী পানায় সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া কোনক্রমে যেন সাড়া দিতেছে— অতীতের সাক্ষ্যরূপে আমি এখনও বর্ত্তমান আছি, এখনও শুকাই নাই। এই নদীর ধারে একটা আমগাছের পাতার আড়ালে গা ঢাকিয়া একটা পাপিয়া চীৎকার করিতেছিল—চোখ গেল, চোখ গেল।

ফুলশয্যার রাত্রি, ফুলের গন্ধে ঘরখানি প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। বাড়ীর মেয়েরা মাঙ্গলিক আচরণগুলি সারিয়া অনেকক্ষণ আগে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলেও একেবারে যে চলিয়া যান নাই তাহা বাহিরে রুদ্ধ জানালার নীচে ফিস ফাস কথা, অন্যমনস্কতার জন্য পায়ের একটু জোর শব্দে বেশ জানিতে পারা যাইতেছে।

নব বধূ বিধান তখন বিছানার পাশে বসিয়া ঝিমাইতেছিল, রবীন্দ্র বিছানার উপর ঘুমের ভাণে পড়িয়াছিল। রাত ক্রমেই বাড়িয়া চলিল, মিনিট চলিতে চলিতে ঘণ্টায় গেল, কত ঘণ্টা কাটিয়া গেল তাহার ঠিক নাই।

বাহিরের ফিসফাস শব্দ বিলীন হইয়া আসিল, বড় বধূ একটু উচ্চকণ্ঠে বলিয়া গেলেন—"বাবাঃ, ঢের ঢের ছেলে দেখেছি এমন চালাক ছেলে কখনও দেখি নি। আমরা রয়েছি বলে বউটার সঙ্গে একটা কথা বললে না, ঘুমানোর ভাণে নিঃশব্দে পড়ে রইল। নাও বাপু, এইবার কথাবার্ত্তা যা বলবার বল, আমরা বিদায় নিচ্ছি।"

বিথান একটু নড়িয়া চড়িয়া ভাল হইয়া বসিল, রবীন পাশ ফিরিয়া শুইল।

ঢং ঢং করিয়া বারটা বাজিয়া গেল, নববধূ ঢুলিতে ঢুলিতে কাত হইয়া পড়িল। বাহিরে তখনও সেই পাখীটা ডাকিতেছিল বউ কথা কও, বউ কথা কও।

"বিথান—"

রবীন্দ্র উঠিয়া বসিয়াছিল, আলোটা বাড়াইয়া দিল, আলোর দীপ্তি বিথানের সুন্দর মুখখানার উপর আসিয়া পড়িল, সে মুখের পানে চাহিয়া রবীন মুগ্ধ হইয়া গেল, তাহার মনে হইল এমন সুন্দর মুখ সে আর কখনও দেখিতে পায় নাই। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে এই কথাটি মনে করিয়া তাহার হৃদয়টা পূর্ণ হইয়া গেল— এই অসীম রূপের যে অধিশ্বরী সে একমাত্র তাহার।

"বিথান—আমার বিথান,—"

নিদ্রালসনেত্রে বিথান চাহিয়া দেখিল পার্শ্বেই রবীন, সঙ্কুচিতা কিশোরী গায়ে মাথায় ভাল করিয়া কাপড়খানা টানিয়া দিয়া মুখখানা বিছানার মধ্যে গুঁজিয়া দিল।

আবেগ কম্পিত কণ্ঠে রবীন বলিল," লজ্জা কি বিথান, আর কেউ লুকিয়ে দেখছে না, তুমি মুখখানা আমায় একবার ভাল করে দেখতে দাও। লক্ষীটি, অমন জড়সড় হয়ে থেক না, দেখি, মুখখানা তোল একবার—"

বিথান কিছুতেই মুখ তুলিল না, মুখের কাপড় খুলিল না। রবীন তাহাকে তুলিবার জন্য এত চেষ্টা করিল, সে নড়িল না।

এত কি কঠোর পণ এই কিশোরীর যে সে মুখ তুলিবে না, জগতে সকলের কাছে সে মুখ দেখাইতে পারে, সকলের সহিত কথা কহিতে পারে, যত দোষ কি রবীনের তাই বিথান তাহার সহিত কথা বলা দূরে থাক তাহাকে মুখটাও দেখাইল না। অভিমান ধীরে ধীরে রবীনের হৃদয়খানা জুড়িয়া বসিতে লাগিল; সে মনে ভাবিল আর একবার মাত্র সে দেখিবে তাহার পর ইস্তফা দিবে।

ব্যথিত কণ্ঠে সে ডাকিল—"বিথান—"

"আঃ, বড় জ্বালালে তুমি, আমি তবে ও ঘরে যাই, ওঁদের কাছে শোব এখন। এ রকম করলে আমি এ ঘরে থাকতে পারব না।"

বিথান ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের কাপড় তখন সরিয়া গিয়াছিল, রবীন সে দিকে চাহিল বটে কিন্তু সে সৌন্দর্য্য আর দেখিতে পাইল না।

"থাক, তোমায় আর বিরক্ত করব না বিথান, তুমি আর ও ঘরে যেয়ো না

তাতে কেবল সবাই হাসবে। তুমি এই বিছানাতেই শুয়ে থাক, আমি বরং নীচে যাচ্ছি।"

সে বিছানা ছাড়িয়া একখানা সোফায় গিয়া বসিল, কিশোরী দিব্য নিশ্চিন্ত ভাবে বিছানায় শুইয়া পড়িল, আঁচলখানা দিয়া আগাগোড়া ঢাকিতে ঢাকিতে বলিল—"আর যেন আমায় জ্বালাতন করো না বলছি তা হলে সত্যি আমি গিয়ে সকলকে বলে দেব। রাত্রে কেউ ঘুমাতে পারবে না—সত্যি এ ভারি অন্যায়।"

অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে রবীন বলিল, "না, একবার যা জ্বালাতন করেছি বিথান, জীবনে আর কখনও যে তোমায় জ্বালাতন করব তা ভেব না। তুমি শুধু আজ রাতের জন্যে কেন—চিরকালের জন্যে নিশ্চিন্ত হতে পার।"

একটু পরেই নববধূ ঘুমাইয়া পড়িল।

বাহিরে তখন আকাশ জুড়িয়া কালমেঘ সাজিয়া আসিয়াছে, পাখীর গান থামিয়া গিয়াছে।

আলো কমাইয়া দিয়া রবীন সোফার উপরেই আড় হইয়া পড়িল, একটা মাত্র অস্ফুট শব্দ দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল—"ছিঃ।"

(২)

দিন বার তের থাকিয়া বিথান পিত্রালয়ে চলিয়া গেল।

স্বভাবটা ছিল তাহার বড় গর্ব্বিত ধরণের। বড়লোকের একটা মাত্র মেয়ে সে, দরিদ্রের গৃহে বিবাহ হওয়ায় সে নিজেকে বড় অপদস্থ ভাবিয়াছিল। তাহার পিতা কেবল ছেলেটাকে শিক্ষিত দেখিয়াই বিবাহ দিয়াছিলেন; তাঁহার ইচ্ছা ছিল বিবাহের পরে নিজের খরচে জামাতাকে বিলাতে পাঠাইয়া দিবেন, সেখানকার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সে ফিরিয়া আসিবে।

তিনি নিজে ছিলেন বড় জমীদার, সরকার হইতে উপাধী লাভও করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি যে বিলাতে যাইতে পারেন নাই এই ক্ষোভটা তাঁহার মনে নিরন্তর জাগিয়া থাকিত, পুত্র জন্মে নাই যে তাহাকে দিয়া এ ক্ষোভটা মিটাইয়া লইবেন, তাই তিনি জামাতাকে দিয়া আশা মিটাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

বিবাহের পর এক বৎসরের মধ্যে রবীনের বিলাত যাইবার কথা ছিল। শ্বশুর নিশ্চয়ই জানিতেন এক বৎসরের মধ্যে সে কোথাও নড়িতে চাহিবে না, কিন্তু যখন জামাতা বিবাহের পর পনেরটা দিন না যাইতেই বিলাত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল তখন তিনি একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া তিনি বলিলেন, "যাবে—সে তো বেশ ভাল কথাই বাবা, দু চার মাস পরে গেলেও তো চলত। বিয়ের পরে পনেরটা দিন গেল না, এখনই—এত তাড়াতাড়ি—"

অন্তরের কথা অন্তরেই চাপিয়া রাখিয়া রবীন বলিল, "আমার এখানকার এক্জামিন শেষ হয়ে গেছে, এখন যদি দুই মাস চুপ করে বসে থাকি, আলস্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় আর সহজে নড়তে চাইব না, সেই জন্যে আমি এখনই যেতে চাই।"

"তবে যাও বাবা, কিন্তু খুব সাবধানে থেকো। বিলেত জায়গাটা বড় প্রলোভনের, আমাদের দেশের ছেলেরা সেখানে নিজেদের সামলে রাখতে পারে না—সেই আমার বড় ভয়। তোমাদের এখন তরল মন, সত্যকে চিনতে না পেরে মিথ্যের চাকচিক্য দেখে ভুলে যাও, ঘরের পানে না তাকিয়ে বাইরের পানে ছোট। এই জন্যেই আমি বছরখানেক পরে তোমায় পাঠাতে চেয়েছিলাম, তাতে তোমারই ভাল হতো।"

সত্যই ভবানী বসু এই সব তরুণদের ততটা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। মাতৃহীনা কন্যার পাছে এতটুকু কষ্ট লাগে তাহাই তিনি সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতেন। এ দেশের ছেলেরা সেখানে গিয়া চরিত্র সংযত রাখিতে পারে না এ সব কথা তিনি শুনিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ভয় ছিল।

কন্যাকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "শুনছিস বিন বিন, রবীন এখনই বিলেত যেতে চাচ্ছে। আমি বলছিলুম বছর খানেক পরে যেতে, সে কথা সে শুনছে না, বলছে, বসে থাকলে অলসতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে এরপর সে আর নড়তে পারবে না"।

বিথান একটু ভাবিয়া বলিল "সে কথা সত্য বাবা, পড়তে পড়তে একমাস যদি সব ছেড়ে বসা যায়, আর পড়তে পারা যায় না, মন লাগে না।"

পিতা বিরক্ত ভাবে বলিলেন "তুই ও এ বলবি? ওদের দস্তুর তো জানিস নে তাই ফস করে এক কথা বলে বসলি। ওরা যে চলে যায়, ঘর বলে কোন বস্তুর কথা আর মনে থাকে না, সেখানে গিয়ে অসার আমোদে সব ভুলে যায়। এ বিয়ে হয়েছে মাত্র সে দিন, স্বামী স্ত্রীর যে কি সম্পর্ক সেটা এখনও অন্তর দিয়ে বোঝে নি। বছর খানেক থাকলে পরে—"

তাহার মনে যে কথাটা জাগিতেছিল তাহার একটু আভাস তাঁহার মুখে বাহির হইয়া পড়িল। বিথানের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল সে শান্তস্বরে বলিল,

আপনি মিথ্যে ভাবছেন বাবা, যে নিজেকে সংযত রাখতে পারে নি সে পারবে না, তার জন্যে আপনার মিথ্যে চেষ্টা করা। যার মনে শক্তি আছে তাকে সাবধান করতে হয় না, সে নিজেই সাবধানে থাকতে পারে।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভবানী বসু বলিলেন, "তাই ভাল মা, তোমাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

এ কয়দিন রবীন শ্বশুরালয়েই রহিল বটে স্ত্রীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিল না। দুইবার আহারের সময় সে ভিতরে আসিত শ্বশুরের সহিত, মাথা নত করিয়া কোন মতে আহার করিয়া যাইত, শয়নের জন্য সে বাহিরের দিকে একটা ঘর নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছিল, এ ঘরে বিথানের আসা সম্ভবপর ছিল না। শ্বশুর এ সব ব্যাপার কিছুই জানিতে পারেন নাই, তাঁহাকে কোন ক্রমে জানিতে দেওয়া রবীনের অভিপ্রেতও ছিল না। বিথানকে সে আর কোনও রূপে উত্যক্ত করিবে না বলিয়াই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। যখনই হৃদয়টা কোমল হইয়া আসিতে চাহিত তখনই সে মনের মধ্যে জাগাইয়া তুলিত এই সে দিনের অতীত ঝাপসা জ্যোৎস্নামাখা পাখীর গীতিমুখরিত একটা রাতের ছবি সেই রাতের উপেক্ষা, হৃদয় আবার কঠিন হইয়া উঠিত, সমস্ত মুখ কান লজ্জায় অপমানে লাল হইয়া উঠিত।

তাহার আদর বিথানের কাছে অত্যাচার বলিয়াই বোধ হইয়াছিল, তাহার বুকভরা প্রেম বিথান প্রথম মিলনের দিনে উপেক্ষা করিয়া দূরে ফেলিয়াছিল এ ব্যথা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। সে দেখিতেছিল বিথান নিজের যাহা তাহা বজায় রাখিতে চায়, তাহা হইতে এতটুকু কাহাকেও দিতে পারিবে না। ছিঃ, এই সে তাহার স্ত্রী?

তাহার বুকভরা প্রেম নিমেষে গভীর ঘৃণায় পরিণত হইয়া গিয়াছিল, যেদিকে বিথান থাকিত সে দিকে সে যাইত না।

স্বামীর এই ঘৃণাপূর্ণ ভাবটা বিথান বুঝিতে পারে নাই, বরং স্বামী তাহার দিকে না আসায় সে যেন বাঁচিয়া গিয়াছিল। পিতার বড় আদরের মেয়ে সে, কেহ যে তাহাকে ঘৃণা করিতে পারে এ কল্পনা সে কখনই করে নাই। দরিদ্র স্বামীকে সে একটু দয়ার চোখে দেখিত, বেচারাকে বিলাতে পাঠাইয়া যাহাতে সে একটা কোন ভাল বড় কাজ পাইতে পারে তাহার জন্য সত্যই তাহার একটু দৃষ্টি ছিল এবং এই দয়াটুকু করিয়া সে মনে মনে যথার্থ একটু গর্ব্বও অনুভব করিত।

বিথান মনে করিত স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যাহা কর্ত্তব্য তাহা সে করিয়া যাইতেছে। কিশোরী বুঝিতে পারে নাই তাহার ত্রুটী কোন্‌খানে হইয়াছিল।

বিদায়ের পূর্ব্বে যখন সে কর্ত্তব্য মনে করিয়াই স্বামীর সন্ধানে আসিয়া দাঁড়াইল, গম্ভীর মুখে উপদেশের সুরেই বলিল, "ঠিক মাসে তিনবার করে তোমার পত্র দেওয়াই চাই, এতে যেন ভুল না হয়। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখো, আর—আর বাবা নাকি শুনেছেন সেখানে গেলে খুব ভাল ছেলেও মন্দ হয়ে যায়, তাই বলছি যে—"

বাধা দিয়া ব্যঙ্গভরা সুরে রবীন বলিল, "ধন্যবাদ তোমায়, কেন না তুমিও আমায় অমূল্য উপদেশ দিতে এসেছ। আমিও একটা কথা বলি বিথান—ধর যদিই আমার পতন হয় সে জন্যে দায়ী কে হবে, তুমি না আমি ?

বিথান যেন অবাক হইয়া গেল,—"দায়ী কি বুঝতে পারলুম না।"

একটু শক্তসুরে রবীন বলিল, "অন্তর দিয়ে বুঝে তুমি আমায় উপদেশ দিতে এস নি, এসেছ চর্ব্বিত চর্ব্বন করতে অর্থাৎ তোমার বাপের কথাগুলো মুখস্থ করে আমায় কাছে বলতে। শোন বিথান, যে দিন তোমার নিজের স্বাভাবিক জ্ঞান জাগবে, যে দিন পরের কথা নিজের কথা বলে জানতে পারবে না, সত্যিকে যথার্থ সত্যি বলে বুঝতে পারবে সেই দিন জানবে, আমার পতনের জন্যে দায়ী তুমি, আমি নই। আমি যা কখনও ভাবি নি তুমি আমায় তাই ভাবিয়েছ, যা ঘৃণা করতুম তাতে প্রীতি জাগিয়েছ। আমার যদিই কিছু হয় কোন দিন—মনে রেখো সে একটা রাতে একটা ঘটনার জন্যেই হয়েছে। সে রাতে যদি আমার ডাকে সাড়া দিতে তবে হয় তো ঘটনাটা আজ অন্য রকম দাঁড়িয়ে যেত।"

সত্যই বিথান আজ অন্তর দিয়া তাহার ব্যথা অনুভব করিতে পারিল না, তাহার কথা বুঝিতে পারিল না। একজনের মর্ম্মভেদী ব্যথার কথা তাহার আত্মসম্মানে আঘাত করিয়াছিল তাই সে আহতা সর্পিনীর মত গর্জ্জিয়া চলিয়া গেল।

(৩)

কথা আছে সুযোগ একবার হারাইলে আর পাওয়া যায় না। জীবনে সুযোগ একবারই আসে, বার বার আসে না। বিথানের যে সুযোগ সে একবার পাইয়াছিল আর তাহা আসিল না।

দিনের পর দিন মাসের পর মাস—অবশেষে বৎসরের পর বৎসর ও কাটিয়া

চলিল, বিথানের নামে কোন পত্র বিলাত হইতে আসিল না। যে পত্র আসিত তাহা শ্বশুর ভবানী বসুর নামে, স্ত্রী যে আছে তাহা রবীন যেন ইচ্ছা করিয়াই ভুলিয়া গিয়াছিল।

অন্তরে আকুলতা জাগিয়া উঠিলেও বিথান তাহা কোনদিন কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে পারে নাই। সংসারে নারীর মধ্যে ছিলেন বৃদ্ধা মাসিমা, তিনি নিজের কাজ ছাড়া আর কিছু বুঝিতেন না। কাহার মনে কি ব্যথা তাহার খোঁজ তিনি রাখিতেন না। জ্বর হইলে তিনি বুঝিতে পারেন, মনের খবর তিনি পাইবেন কি করিয়া? জামাতা পত্র দিল কিনা সে খবরেও তাঁহার বিশেষ দরকার ছিল না, ছয়মাস নয়মাসে একদিন খবর পাইলেই হইল সে ভাল আছে। ইহার মূলে কতকটা ক্রোধও সঞ্চিত ছিল, কেননা জামাতাকে ম্লেচ্ছের দেশ বিলাতে পাঠাইতে তাঁহার একেবারেই মন ছিল না, প্রকাশ্যে ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেও তিনি ছাড়েন নাই। কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া তিনি জামাতার সম্বন্ধে কোন কথা বলা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছেন।

শান্তি ছিল না স্নেহময় পিতার। প্রত্যেক পত্রের ঠিকানার উপর সাগ্রহে তিনি চোখ বুলাইতেন, হায় রে সেখানে বিথানের নাম কই? এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসরও কাটিয়া গেল, বিথানের নামে পত্র আসিল কই?

উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে পিতা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ মা, তোর নামে পত্র আসে না তো? লজ্জা করিস নে মা, তুই ও তো পত্র দিসনে। খোঁজ খবরটা নেওয়া—"

বাধা দিয়া আরক্তিম মুখে বিথান বলিল, "তোমার তো পত্র আসে বাবা, ওইতেই তো সব খবর পাওয়া যায়।"

কাতর নেত্রে পিতা কন্যার লজ্জারক্ত মুখের পানে চাহিলেন। কন্যা অকপটে সব কথা তাঁহার কাছে প্রকাশ করিয়া গেলেও এই বিষয়টাকে একেবারেই গোপন করিয়া গিয়াছে ইহা তিনি বেশ বুঝিতেছিলেন। হৃদয়টা তাঁহার ব্যথায় ভরিয়া উঠিল, হায় রে, যদি তাহার জননী থাকিত। মায়ের কাছে তাহার কোন কথাই তো গোপন থাকিত না। মাসিমা আছেন বটে, কিন্তু তিনি যে সংসারের বাহিরে, সংসারে থাকিয়াও তিনি সংসারে নাই।

তথাপিও তিনি গোপনে বড় শ্যালিকাকে ডাকিয়া অনুনয়পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "দিদিমণি, একটা কাজ তোমায় নিশ্চয়ই করতে হবে। আমার কাছে বিনু কোন কথাই বলবে না, তোমার কাছে সব কথা বলতে পারে। তুমি একবার

খোঁজ নিয়ো ওদের মধ্যে কি ঝগড়া বিবাদ হয়েছিল তাই কেউ কাউকে পত্র দেয় না ?"

মাসিমা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, "সে কি কথা ? তিন বছর হয়ে গেল সে বিলেত গেছে, এরমধ্যে একখানিও সে পত্র দেয় নি তা আর আমি কি করে জানব ? আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করে দেখব।"

বিথানকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিতেই সে ফোঁস করিয়া উঠিল, "না দিক পত্র তাতে ভারি বয়ে গেল। তোমরা এ সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো কেন বলতো মাসিমা ?"

মাসিমা শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "তা বললে কি চলে মা, কেন সে পত্র দেয় না সেটা আমাদের জানা দরকার তো ?

বিথান মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল, উত্তর দিল না।

মাসিমা সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "বুঝেছি তোদের মধ্যে বিয়ের পরেই একটা মনান্তর হয়েছে তারই জন্যে সেও পত্র দেয় না, তুইও দিসনে। সে রাগ করে থাকলেও থাকতে পারে কারণ সে পুরুষ, রাগ তার সাজে, কিন্তু তুই যে মেয়ে তার স্ত্রী, তুই যে হিন্দুর মেয়ে, তোর রাগ অভিমান তো সাজবে না মা। ছি ছি, এতকাল এ কথা মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিস, বললে এতদিন সব মিটে যেত যে।"

অভিমান রুদ্ধকণ্ঠে বিথান বলিল, "আমি তো কিছুই করি নি মাসিমা, শুধু শুধু—"

বলিতে বলিতে তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া খানিকটা জল ঝরিয়া পড়িল।

অভিমানে দুঃখে রাগে তাহার অন্তর ফাটিয়া যাইতেছিল। মাসিমা তাহাকে এত বুঝাইলেন—পিতা তাহাকে পাশে বসাইয়া এত উপদেশ দিলেন সে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল, একটা কথা বলিল না, পত্র ও লিখিল না।

কেন, সে পুরুষ বলিয়া তাহার সবই মানাইয়া যায় আর বিথান মেয়ে বলিয়া এতটুকু রাগ অভিমান ও সাজিবে না ! সেই একটা রাতের কথা সে মনে করিয়া আছে, এই দীর্ঘকালেও সে রাতের কথা তাহার মন হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায় নাই। তবু আরও যদি সে ধনী হইত, যদি নিজের পয়সায় বিলাতে যাইয়া পড়ার সামর্থ্য থাকিত !

রাগে বিথানের হৃদয়খানা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, সে পিতাকে গিয়া বলিল,

"বাবা, বিলাতের খরচ বন্ধ করে দাও, অনর্থক তোমার এতটাকা জলে ফেলতে হবে না।"

পিতা একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিলেন, "সে কি মা, খরচ বন্ধ করব কেন ?"

বিধান দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, খরচ বন্ধ করতেই হবে। শুধু বিয়ে করে সে—"

তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, উচ্ছ্বসিত ভাবে হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিয়া সে ফিরিয়া গেল, পিতা অবাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। বেশ বুঝিতে পারিলেন এতদিন যে বেদনা তাঁহার নিনের বুকে জমাট বাঁধিয়াছিল নাড়া পাইয়া তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

তিনি কন্যাকে অনেক বুঝাইলেন, সে কিছুতেই বুঝিল না। তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সে রবীনকে জব্দ করিবেই। তাহার অর্থে সে বড়লোকের চালে থাকিবে আর তাহাকেই অবজ্ঞা করিবে এই কথাটা কাঁটার মত তাহার বুকে বাজিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল সারাবিশ্ব যেন অবজ্ঞাতা নারীর পানে চাহিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছে, তাহার দাসী ভৃত্যগুলা পর্য্যন্ত যেন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া যায়! না; এ সহ্য হয় না। যে তাহাকে অবজ্ঞা করে তাহাকেই সে যথা সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়া বড় করিয়া তুলিবে আর নিজে নিঃস্বের মত তাহার চরণে লুটাইবে ইহা হইবে না, হইতে পারে না।

স্নেহময় পিতাকে কন্যার আবদার রাখিতেই হইল, তাঁহাকে অগত্যা খরচ বন্ধ করিতে হইল। মনের মধ্যে ব্যথা বাজিতে লাগিল, মনে হইল তিনি অন্যায় করিয়াছেন, তথাপি—এ অন্যায়ের প্রতিবিধান করার শক্তি তাঁহার থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রতিবিধান করিতে পারিলেন না।

(৪)

খরচ না পাইলেও রবীনের অর্থকষ্ট হইল না। কয়েকটী ভারতীয় বন্ধু তাহার ভার লইয়াছিল এবং প্রাণপণে তাহাকে সাহায্য করিয়াছিল।

বিলাতের পড়া সাঙ্গ করিয়া রবীন দেশে ফিরিল।

তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা যতীন্দ্র কলিকাতায় কোন অফিসে হেডক্লার্ক ছিলেন, তাঁহারই বাসায় আসিয়া সে উঠিল। মাতৃসমা বড়বধূ পরমাদরে দেবরকে গ্রহণ করিলেন।

শীঘ্রই সে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে বরিত হইল, সকল চিন্তা ভুলিয়া সে গণিত লইয়া তন্ময় থাকিত, তাহার যে স্ত্রী আছে এ কথা আগেও যেমন সে কোন দিন ভাবে নাই এখনও তেমনি ভাবিল না।

সে দিন অফিস হইতে বাসায় ফিরিয়া অতীন্দ্র বলিলেন, "তোকে তোর শ্বশুর একবার দেখা করে আসার জন্যে বিশেষ করে বললেন, রবীন ভদ্রলোককে চটিয়ে কোন লাভ নেই, একবার দেখা করে আসিস্।"

বিলাত হইতে সে ফিরিলেই বড়বধূ সুরমা বিধানকে আনার কথা তুলিয়াছিলেন, রবীন তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল, সব কথা জানাইয়া বলিয়াছিল—"আমি প্রতিজ্ঞা করেছি বউদি, আর কখনও তাকে জ্বালাতন করব না। আমার প্রতিজ্ঞা অটুট থাকতে দাও, যদি তাকে নিয়ে এসো তা হলে আমি তোমাদের বাড়ী ছেড়ে পালাব।"

ব্যাপারটা যে গুরুতর গোছেরই হইয়া গিয়াছে তাহা সুরমা বুঝিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন—"তবে আর একটা বিয়ে কর ঠাকুর পো, ঢের মেয়ে আছে—ছোট বউয়ের চেয়েও ভাল—"

বাধা দিয়া রবীন বলিয়াছিল, "মাপ কর বউ দি, বিয়ে মানুষের একবারই হয়ে থাকে, দুবার হতে পারে না। দাদা যদি তোমায় ত্যাগ করেন তুমি কি আবার বিয়ে করতে পার? তবে তোমার বেলায় যদি সে নিয়ম বজায় থাকে আমার বেলাতেই বা চলবে না কেন?"

সুরমা চুপ করিয়া গিয়াছিলেন।

অতীন্দ্রের কথা শুনিয়া তিনিই বেশী উৎসাহিতা হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তোমায় যেতে হবে ঠাকুর পো সত্যি—ছোট বউই যেন দোষ করেছে, তার বাপ তো দোষ করেন নি। ভদ্রলোক তোমার খরচ তিনটী বছর চালিয়েছেন, আমরা তো একটা পয়সাও তোমায় দিতে পারি নি। তাঁর উপকারের কথা মনে করে তোমার গিয়ে একবার দেখা করা এতদিন উচিত ছিল।"

রবীন হাসিমুখে বলিল, "যদিও আমার খরচ দেননি, ভাবেন নি আমি কি করে ফিরব, আর সেখানে কি খাব, শেষ কালটায় কি ফল হবে—এ ঠিক গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া নয় কি বউ দি?"

সুরমা গম্ভীর মুখে বলিলেন, "হয় তো অবস্থায় তাঁর কুলায় নি তাই দিতে পারেন নি, তবু ও যে অতদিন টেনেছিলেন তার জন্যে—শ্বশুর বলে না হোক—ভদ্রলোকের দয়া ভেবেও তাঁর সঙ্গে দেশে ফিরেই দেখা করা তোমার কর্তব্য ছিল।

যাই হোক্ আজ তো তোমায় যেতেই হবে ভাই কেন না তিনি অনেক দুঃখ করেছেন।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া রবীন বলিল "একটু পরে যাব এখন বউদি। তা বলে তুমি যে আমার ভাত রাখবে না তা হবে না, আমি এখানে ফিরে তোমার হাতের ভাত ডাল খাব, বড়লোকের বাড়ীর পলাও কালিয়া খেতে পারব না। রাত নয়টার মধ্যেই ফিরব মনে রেখো।"

তাহার যে কথা সেই কাজ জানিয়া বউদি চুপ করিয়াই রহিলেন, রবীন অতীন্দ্রের বালক পুত্রকে লইয়া শ্বশুরের সহিত দেখা করিতে বাহির হইয়া গেল।

ভবানী বসু আনন্দের সহিত জামাতার অভ্যর্থনা করিলেন, ছয়টা হইতে আটটা পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া রবীন উঠিল।

মাসিমার কথা মত দাসী আসিয়া খবর দিল জামাই বাবুকে ভিতরে ডাকছেন।

ভবানী বসু বলিলেন, যাও বাবা, ভেতরে গিয়ে দেখা করে এসো ওরা তোমায় একবার দেখবার জন্ত ভারি ব্যস্ত হয়েছে।"

শান্ত কণ্ঠে রবীন বলিল, আমায় ও বিষয় মাপ করবেন, আমি বাড়ীর মধ্যে যেতে পারব না। আপনার কাছে আমি ঋণী তাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম আর কারও কাছে আমি ঋণী নই, এ কথা বলবেন।

জামাতার গর্ব্বপূর্ণ কথা ভবানী বসুর আত্মাভিমানে আঘাত করিল, তিনি নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন।

তাঁহাকে প্রণাম করিয়া রবীন বিদায় লইল।

দিনের পর দিন মাসের পর মাস যেমন আসিতে ছিল তেমনি যাইতেছিল। ভবানী বসুর সংসার এক ধারাতেই চলিতেছিল, ইহার মধ্যে নিঃশব্দে কবে যে একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে তাহা বাহিরের লোকে কেহই জানিতে পারে নাই। এই আঘাতটা তিন জনের বুকে বাজিয়াছিল, মাসিমা, বিপান ও ভবানী বসু, তিনজনেই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।

বিবাহের পূর্ব্বে যেমন ছিল এখন আর তেমনটী নাই, মাঝে কে আসিয়াছিল, এ সংসারে চিরকালের ধারা একেবারে উল্টাইয়া দিয়া গিয়াছে।

দিন যত যাইতেছিল বিপান ততই যেন মলিন হইয়া উঠিতেছিল। মনে বড় খোঁচা লাগিতেছিল সে বড় শোধ লইয়াছে, তার জিতের নিষ্পত্তি করিতে গিয়া সে যাহা কিছু লাভ করিয়াছিল নিমেষে সব হারাইয়া ফেলিয়াছে।

আজ একবার তাহার বহুদিনের ত্যক্ত শ্বশুরালয়ের সেই ঘর খানিতে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা করিতেছিল, একবার নয় বৎসর আগেকার সেই আবিলতা-মাখা রাতটী পাওয়ার বাসনা জাগিয়া উঠিয়াছিল। নয় বৎসর আগেকার সেই রাতটার স্মৃতি তাহার মনে ভাসিতেছিল, সেই ফুলশয্যার রাত ফুলের গন্ধে ঘর খানি ভরা, দূর হইতে ভাসিয়া আসা পাখীর গান আর তাহাকে জাগাইবার জন্য স্বামীর কি আকুল চেষ্টা।

"মা—বীন—

পূর্ব্ব স্মৃতিতে আত্মহারা ছিল সে, হঠাৎ পিতার আহ্বান শুনিতে পাইয়া চমকাইয়া উঠিল।

তাহার সম্মুখে একখানা পত্র ফেলিয়া দিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে পিতা বলিলেন, তোকে তোর শ্বশুর বাড়ী নিয়ে যাওয়ার জন্যে অতীন পত্র দিয়েছে। রবীনের ভারি ব্যারাম, বাঁচবার আর আশা নেই। পত্রখানা পড়ে দেখ তারপরে যা তোর মত হয় আমায় বলিস্।"

গোপনে চোখ মুছিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

রবীনের বড় অসুখ, বাঁচবার আশা নেই কথাটা যেন বজ্রাঘাতের মতই বিথানের বক্ষে বাজিল। সে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল, পত্রখানা তুলিয়া পড়িবার শক্তি যেন তাহার রহিল না।

সংবাদ লইয়া মাসিমা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া পড়িলেন, "ওরে বীন, তুই এখনও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছিস? আর কি এখন ভাববার সময়? আ সর্ব্বনাশী, রাগ করে সব হারাতে বসেছিস রে?"

বিথান পত্রখানা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বলিল, "আমি এখনি যাব মাসিমা, তুমি বাবাকে বলে দাও কাউকে আমার সঙ্গে দিতে।"

মসিমা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "এই তো মেয়ের মত কথা। আমি এখনই গিয়ে তোর বাপকে বলছি, সে তোকে নিয়ে এখনি চলে যাক। এই তো দুই ঘণ্টার পথ এখনি গিয়ে পৌঁছাবি।"

শুষ্কস্বরে বিথান বলিল, "না, বাবাকে যেতে হবে না। বসন্ত ভারি খারাপ ব্যারাম, বাবা ও ব্যারামকে বড় ভয় করেন, তাঁর যেতে হবে না। সরকার আমার সঙ্গে চলুক। যদি ভাল করতে পারি মাসিমা, আশীর্ব্বাদ কর।"

বলিতে বলিতে সে মাসিমার পায়ের উপর মাথাটা রাখিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া

কাঁদিয়া উঠিল। মাসিমা তাহার মাথাটা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিলেন, ভাল হবে বই কি মা কত লোকের বসন্ত হচ্ছে আবার ভাল হচ্ছে। পাড়াগাঁয়ে দেশী মতে চিকিৎসা হয় ভাল, তাতেই তারা সেখানে রয়েছে। আমি তোর বাবাকে গিয়ে বলছি সরকারকে তোর সঙ্গে দেওয়ার জন্যে।"

ভবানী বসু এই সংক্রামক ব্যারামটাকে বড় ভয় করিতেন, বাড়ীর কাছে কোন বাড়ীতে এ ব্যারাম হইয়াছে শুনিলে তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিতেন। বিথান যখন সরকারকে সঙ্গে লইতে চাহিল তখন তিনি হাসিলেন মাত্র।

গাড়ীতে উঠিবার সময় সরকারের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে দেখিয়া বিথান আশ্চর্য্য হইয়া গেল—"এ কি বাবা, তুমি যাচ্ছ যে?"

তেমনি মলিন হাসিয়া পিতা বলিলেন, "পাগলী, এ তো পরের ব্যারাম নয়। নিজের জীবনের মূল্য তো তোর চেয়ে বেশী নয় মা। তোকে সেখানে পাঠিয়ে নিজে এখানে থাকব কি করে একবার ভেবে দেখ দেখি।"

বৈকালে ট্রেন গিয়া ষ্টেশনে থামিতেই পিতা কন্যা নামিয়া পড়িলেন। পল্লীগ্রামে গরুরগাড়ী ছাড়া আর কোন গাড়ী নাই, বিথানকে সেই গাড়ীতে উঠিতে হইল।

বিবাহের পর দীর্ঘ নয় বৎসর পরে বিথানের পল্লীগ্রামে পদার্পণ। সে দিন যে দেশ দেখিয়া ঘৃণায় সে শিহরিয়া উঠিয়াছিল, জঙ্গল দেখিয়া কাঁপিয়াছিল, আজ সেই দেশ দেখিয়া তাহার ঘৃণা হইল না, ভয় হইল না।

দূরে আজও পাখী ডাকিতেছিল চোখ গেল, চোখ গেল, কোনদিক হইতে শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল বউ কথা কও, বউ কথা কও। বিথানের হৃদয়টা ব্যথায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, সে এবার কথা কহিবে, সে আর নীরবে থাকিবে না।

বাড়ীর বাহিরে খোকা মলিনমুখে দাঁড়াইয়াছিল, কাকিমাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিল না, আস্তে আস্তে সরিয়া গেল। বিথানের বুকটা একবার কাঁপিয়া উঠিল, তখনি সে ভাব সে সামলাইয়া লইল।

ভিতরের উঠানে বাঁশের টুকরা, খড় দড়ি ছড়ানো। বিথান কম্পিত পদে সে সব অতিক্রম করিয়া বারাণ্ডায় উঠিল, কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল—"দিদি—"

অতীন্দ্রের ছোট মেয়েটী ঘরের ভিতর হইতে উত্তর দিল—"কে, মা এই ঘরে।"

দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বিথান দেখিল সুরমা মেঝের উপর শুইয়া পড়িয়া

আছেন। বিধানের আহ্বান শুনিয়া একবার তিনি মুখ তুলিলেন, বুক কাটিয়া কান্না আসিল, সুরমা মুখ লুকাইলেন।

অভাগিনী সব বুঝিয়াও বুঝিতেছিল না,—শ্লথপদে অগ্রসর হইয়া সুরমার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল, রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল—"দিদি—"

"আর কি করতে এসেছ ভাই ছোট বউ, তিনঘণ্টা আগে যে সব শেষ হয়ে গেছে। রাখবার এত চেষ্টা করলুম, কিছুতেই রাখতে পারলুম না যে।"

হাহাকার করিয়া সুরমা কাঁদিয়া উঠিলেন—।

"মাগো—বাবা—

বিধান কাঁপিতে কাঁপিতে সুরমার বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল।

সেজের উপর টিপ টিপ করিয়া প্রদীপটা জ্বলিতেছে। আজও তেমনি কোথায় পাখী গাহিতেছে—বউ কথা কও, চোখ গেল। নয় বৎসর আগেকার সেই মধুময় রাতটী ফিরিয়াছে কিন্তু সে আজ কোথায় যে কথা কহাইবার জন্য কত অনুনয় বিনয় করিয়াছিল?

মাটীর উপর আছড়াইয়া পড়িয়া বিগান অভাগিনীর মত কাঁদিতে লাগিল—ওগো দয়িত আমার, প্রিয় আমার, একবার এসো গো এসো। আমি সাধ, মিটিয়ে একবার কথা বলব, আমার আশা পূর্ণ কর। ঈপ্সিত গো, আজ আমি ফিরেছি তুমি কোথায় গেলে?"

অপর ঘরে অতীন্দ্র চোখ মুছিয়া রুদ্ধকণ্ঠে স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "বউ মাকে এ ঘরে ধরে নিয়ে এসো, বড্ড কাঁদছে।"

সুরমা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কাঁদুক, কেঁদেই এখন ও শান্তি পাবে, আর কিছুতেই পাবে না। ঠাকুর পো চলে গেলেও তার আত্মা এখনও যায় নি, সে আত্মা এই চোখের জলে তৃপ্ত হবে।"

বাহিরের ঘরে দুই হাত কানের উপর চাপা দিয়া বৃদ্ধ ভবানী বসু চোখের জলে ভাসিয়া ভাবিতেছিলেন—"ভগবান।"



ব্যথার প্রদীপ

শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ

সমাজের সমস্ত বিধি বিধান মেনে বামুন পুরুত ডেকে, মন্ত্র পড়ে মনোহর দাশের সঙ্গে রঙ্গন-এর বিয়ে হয় নি। উভয় পক্ষেরই আত্মীয় কুটুম্বের বালাই ছিল না; এই শুভ কাজে প্রতিবেশীদের নিয়ে উৎসব ক'রে খাওয়ান দাওয়ানর কথাও মনোহরের মনে হয় নি। যৌবন যখন কামনার প্রদীপ বুকের ভিতর জ্বেলে দিয়েছিল, শরীর মন যখন মিলন তৃষ্ণায় পাগল এমন সময় দুজনের দেখা হল। দু'দিক হ'তে দু'খণ্ড মেঘ এসে ধীরে ধীরে যেমন পরস্পরের মধ্যে বিলীন হ'য়ে যায় তেমনি ক'রে এই দু'টি মানুষ পরস্পরের মধ্যে আপনাদের হারিয়ে ফেলেছিল; সাক্ষী ছিলেন ভগবান। এই জন্যে এটাকে বিবাহ বা উদ্বাহ বন্ধন বলা যায় না—মিলন নামই ঠিক।

এই মিলনের মধ্যে কোন নূতনত্ব বা এ মিলন কবিত্বময় ছিল কিনা জানিনা কিন্তু এতে বড় একটা চমৎকারিত্ব ছিল।

মনোহর দাশ গঙ্গার ওপর এক জেটির ক্রেন্‌মিস্ত্রীর কাজ করত। বড় বড় বজরা, গাধা বোট বা জাহাজ থেকে বস্তা বা বাক্স-বোঝাই মাল ক্রেনে তুলে নিয়ে জেটির অপর দিকে মাল গুদামে পৌঁছে দেওয়া এই ছিল তার কাজ। সকাল ছ'টায় সে কাজে বেরুত, ভাত খাবার ছুটির সময় ছিল তার বারোটা থেকে তিনটে, তারপর আবার তাকে সন্ধা ছ'টা পর্য্যন্ত ক্রেন্ চালাতে হ'ত। মাইনে পেত্তো গোটা চল্লিশ টাকা, রাতে ওভার টাইম খেটেও বিশ পঁচিশ টাকা সে উপায় করত। মদের বোতল আর কাজের নেশা ছিল তার একমাত্র সংসারের বন্ধন, কাজেই অবস্থা বেশ সচ্ছল হলেও এই টাকাগুলোর বেশীর ভাগ অংশ গিয়ে পড়ত গুরুচরণ সাহার শুঁড়িখানায় আর ভজহরি চাট্‌ওয়ালার দোকানে।—ভজহরির হাতের রান্না চাট্ অর্থাৎ কাঁক্‌ড়া বা মেটুলি চচ্চড়ি, কি দারুণ ঝাল দেওয়া কোন অজ্ঞাত মাংস, ডিমের ডাল্‌না বা চানাচুর না খেলে মনোহরের মতে মদ খেয়ে মজাই হয় না। প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলা কাজ থেকে ফিরবার পথে একটা

শিশিতে ক'রে আউন্স্ ছয় আট মদ আর কিছু চাট্ কিনে সে ঘরে ফির্ত। রাতে সে প্রায়ই রাঁধত না, দোকানের পরোটা ঐ চাট্ আর মদ খেয়েই তার রাতের খাওয়া সারা হ'ত। মদের দোকানে বসে, বন্ধু নিয়ে হল্লা ক'রে মদ খাওয়া ছিল তার রুচির বাইরে। সে নিজে মদ খায় কিন্তু মাতালদের সহ্য করতে পারে না বেশী। লোকজনের সঙ্গে মেলা মেশাও ছিল তার ধাতের বাইরে।

দিনের শেষে কাজ থেকে ফিরে শ্রান্ত শরীর মন একটু জুড়িয়ে নিয়ে পিদিম জ্বেলে তার মার হাতে লাগান তুলসী তলায় রেখে ভক্তিভরে মাটিতে মাথা রেখে প্রণাম করে তারপর পিল্সুজ্ টি ঘরের দাওয়ায় রেখে তার রাতের খাওয়া সেরে নিতে বসে। যখন বসে তখন বড় জোর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা কি আটটা হবে কিন্তু যখন ওঠে তখন প্রায় মাঝরাত! এতখানি সময় শুধু খেয়েই চলে না, অদৃশ্য কোন্ মানুষের কাছে আপনার জীবনের ব্যথা বেদনার সমস্ত ইতিহাসটুকু গভীর আবেগের সঙ্গে একটু একটু ক'রে বলে যেতে থাকে! চোখ দিয়ে তখন তার অবিশ্রান্ত ধারায় জল ঝরে পড়ে।

সেদিন দুপুর বেলা ছুটির পর দারুণ রোদের মধ্যে দিয়ে কোন মতে ঘরের দিকে চলেছে, চৌমাথার কাছে এসে হঠাৎ একটা নতুন জিনিস তার চোখে পড়্ল। যে পথটি বরাবর চিন্তামণির ঘাটের দিকে গিয়েছে সেই পথ দিয়ে এসে একটি মেয়ে তারই পিছন-পিছন, কখন আগে আগে কখন বা পাশে পাশে বস্তির দিকে চল্‌তে লাগ্‌ল!

স্বাস্থ্যপূর্ণ, আঁট-সাঁট শরীর, গায়ের রং কালো, রোদে। তাপে ও পরিশ্রমে তামাটে দেখাচ্ছে, গালে অতিরিক্ত লাল আভা; চোখ দুটি তার আরও কালো, তাতে যেন বিদ্যুৎ ভরা। পরনের কাপড়খানি যেন ভিজে ছিল রোদে শুকিয়ে আসছে, অত্যন্ত আঁট-সাঁট ভাবে পরা, মাথায় একটা ভিজা গামছা জড়ান আছে, মনে হয় সে এই মাত্র স্নান সেরে উঠে আসছে। চল্‌তে চল্‌তে তার কালো চোখের দু একটি চাউনি সে মনোহর কে উপহারও দিল। তারপর খানিক পথ এমনি দু'জনে বিনা বাক্যব্যয়ে পাশাপাশি এসে মেয়েটি ঢুকল জগৎ বিখ্যাত অন্ধকার স্যাঁৎ-সেঁতে আবর্জ্জনায় ভরা মাথা-ফাটার গলির মধ্যে। মনোহর কিছুক্ষণ পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার চলে যাওয়া দেখ্‌ল, কি যেন ভাবল তারপর বাজার থেকে বাজার ক'রে নিয়ে সে এল তার ঘরে।

একটু জিরিয়ে নিয়ে, উনান্ ধরিয়ে ভাত চাপিয়ে সে কৈ-পুকুরে স্নান কর্‌তে

গেল। ফিরে এসে সে প্রতিদিনের মত তরকারী কুটে নিয়ে রাঁধতে বস্‌ল। রান্না খাওয়া শেষ হ'লে, উঠানের কাঁঠাল গাছের ছায়ায় পাটি বিছিয়ে একখানি বহু পুরানো সহস্র দাগে ভরা জীর্ণ কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ খুলে সুর ক'রে পড়তে পড়তে ঠাণ্ডা বাতাসে তার চোখের পাতা তন্দ্রায় বুজে এল। তার এই সুখ-সুপ্তির মধ্যে ধীরে ধীরে সেই মেয়েটির কালো চোখের চাওয়া যেন অসীম কোন্ রহস্য-পূর্ণ লোকে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

তারপর আবার যথাসময়ে সে কাজে বেরিয়েছে, সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে মদের সরঞ্জাম নিয়ে বসেছে কিন্তু সব সময়ই সেই মেয়েটি যেন তার সাম্‌নে দিয়ে চলে ফিরে বেড়াচ্ছিল—মনোহরের মনে বড় বিস্ময় লাগ্‌ল।

পরের দিনও ঠিক ঐ সময় একই অবস্থায় আবার সে ঐ মেয়েটির দেখা পেল! এমনি ক'রে প্রতিদিনই ঠিক ঐ চৌমাথাটির কাছে এসে দু'জন দু'জনের দেখা পায়, এক সঙ্গে খানিকটা পথ হাঁটে তারপর আবার দু'জনে দু'দিকে চলে যায়। ক্রমে এই মেয়েটির দেখা পাওয়া মনোহরের কাছে এত স্বাভাবিক হ'য়ে এল যে, সময় সময় তার ভয় হ'ত—আজ যদি তারে না দেখি—কাজের মধ্যেও মেয়েটির কথা ভেবে সে আন্‌মনা হয়ে যায়।

সেদিন মনোহরের মনে হ'ল মেয়েটি চল্‌তে চল্‌তে একবার তার দিকে আড়চোখে চেয়ে একটু হাস্‌ল! সেও তাড়াতাড়ি হাসির ঋণ, হাসি দিয়ে শোধ কর্‌তে গিয়ে দেখ্‌ল—ফল হল উল্টো! মেয়েটি মুখ কাঁপিয়ে ছিট্‌কে পথের ওপাশে গিয়ে হন্-হন্ করে এগিয়ে চলে গেল! মনোহর অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আজ যেন ঐ মেয়েটিকে তার বড় ভাল লাগ্‌ল। এতদিন সে শুধু একটা বিস্ময়ের ওপরেই যেন ভাস্‌ছিল। তার মনের কৌতূহল বেড়ে গেল। সেদিন সে প্রতিজ্ঞা কর্‌ল—যেমন কোরেই হোক্ ওর সাতে ভাব কোর্ত্তেই হবে।

পরেরদিনও যথারীতি, যথা সময় এবং যথা স্থানে দু'জনের দেখা। কয়েক পা এক সঙ্গে চলেই মনোহর বিষম এক হোঁচট্ খেয়ে মুখদিয়ে একটা বিকৃত শব্দ ক'রে আহত পায়ের আঙুল হাতে চেপে মাটিতে বসে পড়্‌ল—বুড়ো আঙুলের নখের পাশ দিয়ে রক্ত ঝরে পড়্‌ছে!

মনোহরের উদ্দেশ্য ছিল অভিনয় করা কিন্তু সেটা যে এমন দারুণ সত্যে এসে দাঁড়াবে তা সে ভাবে নি।

মেয়েটি থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল। তারপর কাছে এসে চাপা গলায় অবাক

হয়ে বলে উঠল—ইঃ—ই যে দেকি একেবারে রক্তো গঙ্গা! র-র-একটুকর, আমি এস্‌তিচি।

অতি পরিচিতের মত স্নেহ সিক্ত সুরে কথাগুলি বল্‌তে বল্‌তে সে ছুটে পথের ধারের এক মুদীর দোকান থেকে খানিকটা রেড়ির তেল চেয়ে নিয়ে, পান দোখ্‌তা বাঁধা কাপড়ের খানিকটা ছিঁড়ে তেলে ভিজিয়ে মনোহরের পায়ের আঙুলটা অতি যত্নে বেঁধে দিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বল্‌ল, কেমন ইবার একটুক আরাম লাগচে না তুর্?

মনোহর মেয়েটির মুখের দিকে তার কৃতজ্ঞ দৃষ্টি রাখ্‌ল। মেয়েটি লজ্জা পেয়ে মুখ নীচু ক'রে বল্‌ল, এখন ত ঘরকে যেতে পার্‌বি না, একটুক্ ঐ পাকুড় গাচের ছাওয়ায় ব'স্।

অনুগত ভৃত্যের মত খোঁড়াতে খোঁড়াতে মনোহর গাছের ছায়ায় এসে বস্‌ল। মেয়েটিও সঙ্গে সঙ্গে এসে তার পাশে বস্‌ল, তারপর মৌনতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে মেয়েটি নিজেই মনোহরের আঘাত সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে যেতে লাগ্‌ল, ব্যথা কম্‌ছে কি না তাও জিগ্‌গেস কর্‌ল, তারই মধ্যে পুরুষদের প্রকৃতি নিয়ে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ কর্‌তেও ছাড়ল না। মিন্‌ষেগুলান্ সব উট্‌চোকো, রাস্তা দিয়ে যাবে কিন্তুক চোক দুটো যে কুতা থাকে তা যমরা জানে—ইত্যাদি।

মনোহর গভীর আনন্দে এই মেয়েটির অনর্গল ব'কে যাওয়া শুন্‌ছিল আর মাঝে মাঝে তার মুগ্ধ দৃষ্টি মেয়েটির মুখের ওপর রেখে তাকে রঙিয়ে তুলছিল। এক সময় সে হঠাৎ জিগ্‌গেস ক'রে বস্‌ল, আচ্ছা তুই উ মাতা-ফাটার গলিতে কার ঘর্‌কে থাকিস্?

উদাসীনভাবে মেয়েটি বল্‌ল, নক্ষী বাড়ীউলির একখান্ ঘর আমি নে আচি।

কেমন মনমরা হয়ে মনোহর বল্‌ল—নক্ষী বাড়ীউলি? উ যে—'

একটু ঝাঁজের সঙ্গে মেয়েটি বল্‌ল—উয়ার কতা আমারে কিচু কোস্ না—সব জানি—কিন্তুক কোন্ চুলায় আর যাই? পিত্থিমিতে আমার আর কে আচে?

ঘৃণা ভরা সুরে মনোহর বল্‌ল—যেতো শালার মাতাল—'

মুখখানাকে যথাসম্ভব বিকৃত ক'রে দারুণ বিরক্তি ও ঘৃণার সঙ্গে মেয়েটি কতকটা আপনার মনেই বল্‌ল—পিত্যহ রেতে দোর ঠেঙাঠেঙি···গলা কাটা কাটি খুনা-খারাপি···ভগোমান জানে কি কোরে আমার রাতটুকুন্ কাটে—নক্ষী

হারামজাদী কি কম শেয়ান্? বলে—অমোন গতোর নে' দোর বন্দো কো'রে কি থাক্‌তে হয়? খুলে দে না—শতেক খোয়ারী!

মনোহর বল্‌ল—আর কোথাও ভাল ঘর নে যতী তুই—

তার কথা শেষ না হতেই ঝঙ্কার দিয়ে মেয়েটি বল্‌ল—অমন নম্বা নম্বা কতা সব্বাই কইতে পারে—টেকা জোগাবে কুন্ যম?—

মনোহর কোন কথা কইতে আর সাহস পেল না। কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি নিজেই আবার আরম্ভ করল—অওরৎদারদের মাল নৌকা থেকে ঝাঁকা বোঝাই নে' দু'শো কদম এসে আর একজনার মাতায় চালান্ দি—দিনভোর খেটে এককুড়ি টেকা বড় জোর মাসে রোজকার হয়; তার পাঁচ্ টেকা যায় ঘর ভাড়া, নিজে রেঁদে খাই, ভালোটা মন্দোটার ওপর একটুকু নেশাও আছে, তাতেও পেরায় বারোটা টেকা যায়—হাতে আর কি রইল? পান দোখ্‌তা খাবার পয়সাও জুটে না। এই যে সে দিনকে হরিদাসীর ছেলেটা আমার চোকের সামনে সন্নিপাত হয়ে ধড়্‌ফড়িয়ে মোল, কিছু কি কোত্তে পানু? বাছার পেটে এক ফোঁটা ওষুদ পড়্‌ল নি ... হরিদাসীর হাতে এক কানা কড়ি ছ্যালো নি, আমার কাচ্‌কে চারটেকা ছ্যালো, সে ত সব শ্যাম ডাক্তারের প্যাকে গেল। কি আর উপায়? হাত জোড় কোরে ভগোমানের কাচ্‌কে নিবেদন জানানু—ভগোমান তুমি এরে বাঁচাও—তা ভগোমান কি গরীব নোকের কতা শুনে? তেনার ত যেত বড়নোক নে' কারবার—তারপর যে কাগোজখানায় ওষুদের নাম নিকে দে' ছ্যালো ডাক্তার, আমরা দু'জনায় সেটাকে ছেলেটার বুকে বোসতে নাগনু, আর তার চোক উল্টে গেল! টেকার গাদির ওপর বোসে আছে ঐ নচ্ছার মাগী নক্ষী, কিন্তুক্ একটা আদ্‌লা কি বার কোল্লে?—পায়ে ধরে কেঁদে হরিদাসী বললে—যেত দিন বাঁচ্‌ব তোর গোলামী কোর্‌ব মাসী, আমার ছেলেকে বাঁচা।—মাগী বল্‌ল কি—হেঁ কার ছেলে তার ঠিক নেই, তার তরে এত! ওটা ত মরবেই নাবের মদো আমার টেকাগুনো যাবে—' অতো গুলান্ মিন্‌সে ত আমাদের পাড়ায়, কেউ কি একবার উঁকি পাড়্‌লে?—রেতের বেলা এসে সোহাগ-পীরিত ক'রে ভোর রেতে ঘটিটে বাটিটে নে' পালাতে মুকপোড়ারা খুব দড়। কি আর করি, শেষবেলা আমিই ছেলেটাকে কেঁতায় জইড়ে কোলে তুলে নিনু আর হরিদাসী আমার সাতে সাতে কান্‌তে কান্‌তে চল্‌ল। ঘাটের 'মুড়ি-পোড়া ব'মুন' বলে, তিন টেকা সাড়ে বারো আনা নাগ্‌বে, পুড়াবার খরচ!—টেকা কুতায় পাবো! শেষটা আমার হাতের দুগাছা রূপার চুড়ি পোদ্দারের দুকানে রেকে বারোটি টেকা

পেনু।—পোড়ানি খরচ, পেরাচিত্তির করা, বামুন মুদ্দোফরাসকে দিতে পেরায় ছ'টেকা বেইরে গেল! বাকী টেকা আমি হরিদাসীর হাতে দিনু।—মাগো! হাউ হাউ করে বকৃতেই নেগেচি! আচ্ছা, তুর মা আচে? বুন, ভাই, বাপ, বৌ, ছেনা পোনা?—

মেয়েটির জীবনের কাহিনী শুনতে শুনতে মনোহর কেমন উনমনা হয়ে পড়েছিল, তার প্রশ্ন শুনেও তখুনি জবাব দিতে পারল না। কিছুক্ষণ পরে একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে শুক্‌ন হাসি হেসে সে বল্‌ল—হেঁ—মুলে মাগ নেই তার ছেনা-পোনা! বাপ মা ভাই বুন ছ্যাল, তা সে বছর মায়ের অনুগ্রহ হল আর আমাদের সংসার ধুয়ে নে গেল, বাকী রইনু আমি।

ব্যথিত সুরে জলভরা চোখ মনোহরের চোখের ওপর তুলে মেয়েটি বল্‌ল—তুরও কেউ নেই?—

উদাসীন ভাবে মনোহর উত্তর দিল—না। হঠাৎ সে মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে সময় অনুমান করে নিয়ে বল্‌ল—ইঃ! বেলা পেরায় আড়াই পহর! আজ আর ঘরকে যাওয়া হবে না—কাজে যাই।

মেয়েটি অনুতপ্ত হয়ে বল্‌ল—আমারই দোষ, বসে বসে গপ্প ক'রে বেলা গেল, তুর যে খাওয়া হ'ল নি?

মনোহর বল্‌ল—ঐ ভুজ্জাওলার দোকান থেকে কিছু খেয়ে নি গে।

সে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। মেয়েটিও উঠ্‌ল সঙ্গে সঙ্গে। মনোহর চোখ ভ'রে মেয়েটিকে শেষ দেখা দেখ্‌বার জন্যে তাকাতেই কুণ্ঠিত ভাবে সে বল্‌ল—তুর ঘর কুতা?

মনোহর বল্‌ল—ঐ মদন ঠাকুরের গালে। বাজার ছাইড়ে একটুক্‌ এগিয়ে গে বা হাতি যে গাল তারই ডান দিকে পেরথম ঘরখানায় আমি থাকি।—কিন্তুক্‌ তুর নামটি ত আমায় বল্‌লি না?

মুখ নীচু করে একটু হেসে মেয়েটি বল্‌ল—রঙ্গন।

মনোহর বল্‌ল—তুরও আজ যে বেলা হয়ে গেল—

রঙ্গন বল্‌ল—সে তুই ভাবিস্‌ না, ই পোড়া পেট কামাই যাবে নি। উয়ার তরেই ত এত খোয়ার—যাই।

মনোহর একটু ম্লান হেসে আবার তার জেটির দিকে চল্‌তে চল্‌তে একবার পিছন ফিরে তাকাল, রঙ্গনও ঠিক সেই সময় তার দিকে ফিরে দেখ্‌ছিল! হেসে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে আবার বস্তির দিকে চল্‌তে লাগল।

পথের ধারের এক খোঁট্টা ভুজাওয়ালার দোকান থেকে কিছু চাল্ কড়াই ভাজা, গোটাকতক পেঁয়াজের বড়া আর কাঁচা লঙ্কা নিয়ে খেতে খেতে সে চলেছে—বুক তার আজ কানায় কানায় ভরা।

২

সন্ধ্যার পর নিয়ম মত সে পকেটে মদের শিশি, আর হাতে চাটের ঠোঙা নিয়ে ঘরে ফির্ল। স্নান ইত্যাদি সেরে, ঠাকুর প্রণাম ক'রে, খাবারগুলি নিয়ে বসেছে এমন সময় উঠানে একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল!

আলোটা ছিল ঠিক মনোহরের চোখের সাম্‌নে তাই বাইরের অন্ধকারে তার ভাল নজর চলছিল না। একহাতে আলোটা আড়াল ক'রে সে বল্ল—কে গা?—

মেয়েটি এগিয়ে এসে দাওয়ার নীচে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—আমি রঞ্জন—তুর পায়ের ব্যথাটা কেমন আছে তাই জান্‌তে এনু

কথা বল্‌তে বল্‌তে একটা খাবারের ঠোঙা সে মনোহরের সাম্‌নে রাখ্‌ল।

মনোহর জিগ্‌গেস করল—উতে কি আছে?

রঞ্জন অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে বল্‌ল—একটুক্ মিষ্টি—তুর তরে আজ কিছু তরকারী রেঁধেছিনু, তারপর ভাবনু আমার হাতের রান্না কি তুই খাবি?—

মনোহর মন খুলে হেসে উঠ্‌ল, তারপর তার ডানপাশে অন্ধকারে যে শিশি আর ওষুধ খাবার মত ছোট একটা গেলাস ছিল সে দুটো সাম্‌নে এনে শিশি খুলে গেলাসে মদ ঢেলে খাবার জন্যে মুখের কাছে হাত উঠিয়েছে এমন সময় একটা অস্ফুট আর্তনাদ শুনে তার হাত নেমে এল। রঞ্জনের দিকে তাকাতেই সে বলে উঠ্‌ল—তুইও উ খাস্?

মনোহর কোন কথা না ব'লে মুখ নীচু ক'রে বসে রইল কিছুক্ষণ, তারপর মদের শিশি গেলাস রঞ্জনের পায়ের কাছে রেখে বল্‌ল—তুর্ দিব্যি উ আর খাব নি।

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। যেন বল্‌বার মত কোন কথাই তারা আর খুঁজে পাচ্ছিল না! দুজন এত কাছাকাছি এসে, পরস্পরের মন সম্পূর্ণরূপে জেনেও আর একটু এগিয়ে আসবার সাহস যেন কারো হচ্ছিল না। মৌনতা যখন অসহ্য হয়ে উঠেছে, এমন সময় রঞ্জন বল্‌ল—আজ ইবেলা তুই রাঁধিস্ নাই?

মনোহর হেসে বল্‌ল—হুঁ, একবেলা রাঁধ্‌তেই উনানে ফু পেড়ে পেড়ে চোক কানা হয়ে যায়, আবার দু'বেলা !

রঙ্গন মুখ নীচু ক'রে বল্‌ল—আমি তুর রেঁদে দুবো ?

মনোহর কোন কথা না বলে তিনটে চাবী সুদ্ধ একটা রিং রঙ্গনের হাতে দিয়ে বল্‌ল—এই বড় চাবীটা বাইরের দোরের, মাঝারিটা ভাঁড়ার ঘরের আর আর ছোটটা রান্না ঘরের।

তুর খাওয়া হয়েছে ?

রঙ্গন বল্‌ল—না, গে' খাব।

আমি দিলে খাবি না ?

রঙ্গন শুধু হাস্‌ল।

মনোহর স্নিগ্ধসুরে ডাক্‌ল—রঙ্গন।

রঙ্গন কোন উত্তর দিল না, তার চোখ বয়ে জল পড়ছে !

মনোহর এবার কতকটা কর্তৃত্বের সুরে বল্‌ল—তুকে আমি আর উখানে যেতে দু'বো নি।

রঙ্গনের চোখে রইল জল। কিন্তু মুখে আবার হাসি দেখা দিল।

মনোহর বল্‌ল—ঘর দোর সব তুর্‌ !

রঙ্গন হেসে বল্‌ল—ঘর দোর আমার আর তুই কার ?

মনোহর বল্‌ল—তুই বল্‌

রঙ্গন দ্বিধা লজ্জা ত্যাগ ক'রে মনোহরের চোকের দিকে তাকাল।

মনোহর দাঁড়িয়ে উঠে রঙ্গনের হাত ধ'রে বল্‌ল—আমার সাতে একবার আয়—'

রঙ্গনকে নিয়ে তুলসী তলায় এসে মনোহর বল্‌ল—ইটা আমার মা'র তুলসী বেদী ; আয় পেরণাম করি—

মনোহর নিজে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কর্‌ল, রঙ্গনও তার পাশে মাটিতে মাথা ঠেকাল। তারপর উঠে এসে দু'জনে খেতে বস্‌ল।

রঙ্গন বল্‌ল—কিন্তুক উখানে যে আমার পুরান কাসুন্দির হাঁড়িটে পড়ে রইল !

চীৎকার ক'রে হেসে মনোহর বল্‌ল—হা তুর্‌ মেয়েমানুষের মোলা রে—'

মুখ একটু ঘুরিয়ে রঙ্গন বল্‌ল—তা আর নয় ! আজ চার বচ্ছর উয়ার বয়েস হল—এক টুক্‌রা দে এক কুনকে চালের ভাত খাওয়া যায়।

মনোহর হেসে বল্‌ল—আচ্ছা তুঁর্ কাহন্দির হাঁড়ি আর সব জিনিস-পত্তর কাল আমি এনে দুবো—লক্ষী কিছু পাবে?

হুঁ, ইমাসের পনেরো দিনের ভাড়া আড়াই টেকা।

৩

বছর প্রায় ঘুরে আস্‌তে চলেছে, মনোহর তৃপ্ত। গুরুচরণ সাহার দোকানে প্রতিমাসে তার যে টাকা ঢাল্‌তে হত এখন তার চেয়ে কিছু বেশী মধ্যে মধ্যে গিয়ে পড়ছে 'লক্ষ্মী বাবুকা আস্‌লি, খাঁটি, সোনে-চান্দিকা দুকান-এ।' এবং সঙ্গে সঙ্গে দু'একখানা ক'রে ভারি ভারি রূপার গহনাও রঞ্জনের অঙ্গে এসে উঠ্‌ছে। যে মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকু তার কাছে মরুভূমি বলে কিছুদিন আগে মনে হ'ত, এখন সেখানেই সে শান্তি খুঁজে পেয়েছে তাই তার আনন্দের সীমা নেই। সে এখন পরিশ্রম করে বেশী, খায় প্রচুর, উপার্জ্জন করে অনেকগুলি টাকা, তার বিশ্রাম এবং নিদ্রার অবসরটুকু মনোরম শান্তিপূর্ণ, কোন দুশ্চিন্তা, দুঃস্বপ্ন সেখানে ঠাঁই পায় না।

কিন্তু রঞ্জনের মনে তৃপ্তি নেই, যৌবনের ক্ষুধা তৃষ্ণা, ক্রমেই তার অসহ্য হয়ে উঠ্‌ছে। অতৃপ্ত কামনা সর্ব্বদাই তাকে যেন কেমন আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। মনোহরের ইচ্ছা এবং সময় হলে তবে সে একটু সোহাগ একটু ভালবাসা একটু তৃপ্তি পাবে। সে নিজে গায়ে পড়ে কোন দিন সোহাগ জানাতে গেলে শ্রান্ত মনোহর হয় ত বলে, একটুকু বাতাস কর না রঞ্জন, আজ ভারি খাট্‌নি গেছে।

রঞ্জন মনকে সংযত করে নিয়ে মনোহরকে বাতাস করতে বসে। এই কথা ভেবে, মনে তার যত রাগ হয়, তার চেয়ে বেশী হয় লজ্জা। এই সুখের খাঁচা তার অসহ্য লাগে। চিরমুক্ত সে। বাইরের হাজার ঝড়-ঝঞ্ঝা মাথায় ক'রে চল্‌ত। সেই দারুণ দুঃখের মধ্যেও স্বাধীনতার একটা তীব্র নেশা তার মনকে ঘিরে রাখ্‌ত। এখানে সবই সংযত, নিয়মিত, পরিমিত, সীমাবদ্ধ!

গত কয় বৎসরের কর্ম্ম জীবনের কথা সে ভাবে, দুঃখ, দারিদ্র্য, অন্যায় অত্যাচার, অপমান—এ সবের ওপর নালিশ শোন্‌বার কেউ নেই সেখানে। যে পারে সে নিজে প্রতিশোধ নেয়, যার শক্তি নেই সে সহ্য করে। বছর সতেরো বয়স পর্য্যন্ত রঞ্জন কেবল সহ্যই করেছে, তারপর একদিন সে আপনার রক্ষার ভার আপনার হাতেই তুলে নিল, অত্যাচারী বিস্মিত হয়ে দূরে গিয়ে দাঁড়াল। সেই দিন থেকে সভয়ে মেশান কৌতুকের সুরে সকলে তার নাম উচ্চারণ করত।

সে তখন চাটনি কলে কাজ করে। কাজের মধ্যেই স্ত্রী-পুরুষের অজস্র নোংরা হাস্য পরিহাস চলতে থাকে। এই কলে যত ছেলে মেয়ে কাজ করত তার মধ্যে ভোলা চাঁড়ালের মত নোংরা প্রকৃতি কারো ছিল না। তার ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে একদিন একটি মেয়ে বলল—আমাদের কাচকে তুর্ যেত কুটানি, যা দেকি একবার রঙ্গনের কাচকে—'

ভোলা হেসে বলল—ই কথা? ভাল তুই মনে ক'রে দিলি—ছুঁড়িটে বেশ ডবকা লয়?

তখন টিফিনের সময়। সবাই কোথাও না কোথাও বসে কিছু খেয়ে নিচ্ছে। সবার থেকে কিছু দূরে একটু নিরিবিলি জায়গায় রঙ্গন আঁচলে কিছু মুড়ি কড়াই সিদ্ধ লঙ্কা সংযোগে চিবাচ্ছিল, সামনে এক ঘটি জল ও একটা শাল পাতায় ছোট ছোট দুটি শসা, নুন ম'রচ মাখা পড়ে আছে। হঠাৎ কোথা থেকে ভোলা এসে তার পাশে বসেই শসা দুট হাতে নিয়ে চিবাতে আরম্ভ করল! তারপর তার আঁচল থেকে মুড়ি থাবা ভর্ত্তি ক'রে নিয়ে খেতে লাগল। রঙ্গন আর খেল না, বাকী সমস্ত মুড়ি কড়াই সে ভোলার কাপড়ে ঢেলে দিয়ে জলের ঘটিটা নিয়ে উঠতে যাবে এমন সময় টের পেল, ভোলা বাঁ হাত দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরেছে!

বিশেষ কোন মেজাজ না দেখিয়ে রঙ্গন বলল—কি করিস্? ছাড়. কেউ দেকবে—'

তাচ্ছিল্যের স্বরে মুখ বাঁকিয়ে ভোলা বলল—আরে দেখনে দেও—কুন্ শালা ভোলার উপর কতা কহেগা?

সে আপনার মনে খেয়ে চলল।

রঙ্গন হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল, তাতে ভোলার হাত ছেড়ে গেল বটে কিন্তু সে কাপড়টাকে ধীরে অল্প অল্প টান দিতে লাগল।

রঙ্গন আর কোন কথা না বলে এমন প্রচণ্ড এক লাথি তার বুকে কসিয়ে দিল যে, লঙ্কা-মুড়ি-শসা-পূর্ণ মুখে কাস্তে কাস্তে ভোলা মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। তারপর জলের ঘটিটা উঠিয়ে নিয়ে সে নিঃশব্দে তার কাজের জায়গায় এসে বসল।

* * *

চটের কলে সে যখন ছিল তখন ভৈরব জলের ছেলে শ্রীদামকে তার কেমন

অদ্ভুত লাগ্‌ত, ভালও লাগ্‌ত। ছেলেটার বয়স প্রায় তারই সমান, হৃষ্ট-পুষ্ট জোয়ান শরীর কিন্তু কেমন যেন হাঁদা হাঁদা ভাব! কিছুই যেন সে বোঝে না! চটকলে বিড়ি, সিগারেট বা তামাক খাবার নিয়ম নেই, সবার মত 'দোখ্‌তার মিশি' ঠোঁটের কোলে রেখে আপনার মনে কাজ ক'রে যায়—কোন দিকে তার নজর নেই। তার বয়সী বা তার চেয়ে কত ছোট ছেলে মেয়েদের সঙ্গে কত 'রঙ্গ' কত 'ইয়ারকি' ক'রে, সে ওসব বোঝে না।

রঞ্জন কিছুদিন তাকে দেখ্‌ল তারপর একদিন নিরিবিলি একটা জায়গায় তাকে একা পেয়ে তার পাশে এসে দাড়াল, আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছিয়ে দিয়ে তারই মধ্যে গালটা একটু টিপে দিল।

শ্রীদাম রঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল—সেই বোকার হাসি, তাতে চেতনার আভাস নেই!

রঞ্জন একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ তাকে বুকে চেপে তার মুখের ওপর গভীর আবেগের সঙ্গে এক চুমা দিল!

শ্রীদাম বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; তার ঠোঁটে যেন কিসের ছোঁয়া সে অনুভব করছে যার স্বপ্ন-স্পর্শে সর্ব্বশরীরে তার সুখের ঢেউ খেলে যাচ্ছে! শরীর তার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল। চোখ মেলে দেখে কেউ নেই!

সেইদিন তার যৌবন-বনে ফুল ফুট্‌ল। ফুল তুলতে এল অনেক মেয়ে, এল না শুধু যে ফোটাল সে।

* * *

এই সেদিনের কথা, চিন্তামণির ঘাটে সে যখন মোট বইত, তখন তার মাথা থেকে ঝাঁকাটি নেবার জন্যে মুটেদের মধ্যে কি ঝগ্‌ড়া! শেষে সাব্যস্ত হল, পালা ক'রে সবাই ওর মাথা থেকে ঝাঁকা নেবে। এই দলের মধ্যে পরান ছিল সবচেয়ে রসিক। তাকে রঞ্জন কিছুতেই পেরে উঠত না! ঝাঁকাটি নেবার সময় কেমন অদ্ভুত উপায়ে যে সে রঞ্জনের গালে বা দাড়িতে ঠোঁটে চুমা দিত যে রঞ্জনও কিছু ধর্‌তে পারত না—যেন ঠেকে গেল। রাগ করবার উপায় নেই তার ওপর লোকটার হাসি, কথাবার্তা এমন সুন্দর যে তাকে ভালও লাগে। হাতের ছ'গাছা রূপার চুড়ি ত সে-ই দিয়েছিল—'

এমনি ক'রে রঞ্জন তার কাজের অবসরে সুখের খাঁচাটিতে ব'সে বাইরের স্বপ্ন দেখে! শেষে একদিন সে মনোহরকে বল্‌ল—ঘরকে বসে বসে বাত ধোরে লেগেচে, আমি কাজকে যাবো।

মনোহর হেসে বল্‌ল, তুই ত যাবি বাত সারাতে কিন্তুক লোকে বল্‌বে মনোহর খেতে দেয় নি—'

রঙ্গন বল্‌ল, উ পোড়া লোকের কতা কে শুনে ? আমরা কুলি মজুর জাত— ছ' বচ্ছর বয়েস ইস্তক ত মাটি থেকে খুঁটে খাচ্ছি ? আমাদের আবার বল্‌বে কি ?

সে আবার চিন্তামণির ঘাটে তার পুরাতন ঠাঁইটুকু দখল করবার জন্যে দাঁড়াল, পেতেও বিলম্ব হল না।

মাস তিন চার পর সে কাজ ছেড়ে আবার চুপ ক'রে ঘরে এসে বস্‌ল। শরীরটা কেমন ভাল থাকে না, কিসের একটা অশান্তি তার মনকে সব সময় ঘিরে থাকে, মাঝে মাঝে গভীর চিন্তায় ডুবে যায়। তার মনে অনবরত কে যেন প্রশ্ন করে—কার ছেলে ? পরান ? শ্রীদাম ? সাধু ? দাসু ? তিনকড়ি ? না মনোহর ? কার ?—

এই প্রশ্ন তার শরীরে যেন জ্বর এনে দেয় ! যখন অসহ্য লাগে ব'লে ওঠে— কার আবার, আমার—'

উত্তরে সে শুধু একটু বিদ্রূপ মেশান হাসি শুন্‌তে পায়। সে বিদ্রূপ, সে হাসি তার কানে যেন লেগেই রইল !

দিন যায়। মনোহর রঙ্গনের এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করল কিন্তু বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করল না, বরং যেন সে একটু বেশী খুশী হয়ে উঠ্‌ল। তারপর একদিন সন্ধ্যা বেলা সে এক ছড়া 'বিছা গোট্' এনে রঙ্গনের কোমরে পরিয়ে দিয়ে বল্‌ল— রঙ্গন, তুকে আগে যেত গয়না দে'ছিনু, তা সব ভালবেসেই দিচ্চি, আজ ইটা দিনু তুই মা হয়েচিস্ বলে।

রঙ্গনের মনের আগুন এবার দপ ক'রে জ্বলে উঠ্‌ল। ঝঙ্কার দিয়ে বল্‌ল— কে তুকে বল্‌লে ?

মনোহর হেসে বল্‌ল—আমি জানি।

কি আশ্চর্য্য ! যে কথাটাকে প্রাণপণে সে অস্বীকার করতে চায়, দেবতার কাছেও যে কথা সে স্বীকার করে নি—মানুষ ত দূরের কথা, সেই কথাটি কেমন ক'রে বাইরে প্রকাশ পেল ?

রঙ্গন কোন উত্তর না দিয়ে মাথা নীচু ক'রে বসে রইল।

মনোহর বল্‌লে—এখন থেকে তুকে একটু সাম্‌লে চল্‌তে হবে। তুকে আর রান্না বাড়া, হেঁসেলের কাজ কোত্তে দুবোনি, আগুনতাত্ তুর এখন সইবে নি !

নফ্‌রার মাকে চারটেকা মাইনে দে রাঁধ্‌তে কবুল করেছি, সে কাল থেকে আস্‌বে।

রঞ্জনের মনে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল, মনোহরের কথায় তার তেজ একেবারে কমে এল। অসহায় ভাবে মাথা নেড়ে সে জানাল, এতে তার আপত্তি করবার কিছু নেই।

কিন্তু সেইদিন থেকে মনোহরকে সে যেন সহ্য করতে পারত না! তার আদর সোহাগ তাকে যেন চাবুক মারত, তার চুম্বন, আলিঙ্গনে সে মরণ-যন্ত্রনা বোধ করত—অথচ এর কারণ সে বুঝ্‌তে পারে না; মনোহরকে তার ভয় ক'রে, সময় সময় তার কাছে সব কথা স্বীকার করবার জন্যে তার মন অস্থির হয়ে ওঠে কিন্তু পারে না। তবু দিন যায়, মাস যায় তারপর সময় হয়ে এল—

* * *

বেলা তখন প্রায় দেড়্‌টা হবে! পিঠের ওপর চুল এলিয়ে দিয়ে রঞ্জন দাওয়ায় বসে তার খোঁকার কাঁথার ওপর নানা রং-এর পাড়ের সুতার ফুল তুল্‌ছিল। ঘরের ভিতর খোঁকা তখন মনোহরের বুকে উপুড় হয়ে শুয়ে তার সর্ব্ব শরীর 'নালে' ভাসিয়ে বা-বাঃ মা-মাঃ প্রভৃতি নানা সম্বন্ধ বাচক শব্দ উচ্চারণ ক'রে মনোহরকে চমৎকৃত ক'রে দিচ্ছিল। মনোহরও তাকে বুকে চেপে বাবা আমার, মাণিক আমার আমার সোনা প্রভৃতি বলে শিশুকে বুঝাতে চেষ্টা কর্‌ছিল যে সে তাকে খুব ভালবাসে!

রোজই এই দৃশ্য রঞ্জন দেখে, রোজই মনোহরের স্নেহের কথা শোনে কিন্তু আজ তার অসহ্য লাগ্‌ল! কাঁথাটা এক পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে ঘরে এসে সে দাঁড়াল। তার সে চেহারা দেখে ভয় পেয়ে মনোহর খোঁকাকে বিছানায় শুইয়ে উঠে বসে জিগ্‌গেস কর্‌ল—কি হয়েচেরে রঞ্জন? অমন কচ্চিস কেন? আয়, আমার কাচ্‌কে একটুক্ বস।

রঞ্জন হাঁফাতে হাঁফাতে আগুনভরা চোখে তীব্র স্বরে বল্‌ল—কে তুকে বল্‌লে উ তুর্ ছেলে?

মনোহর কিছুক্ষণ অবাক হয়ে বসে রইল তারপর হঠাৎ চীৎকার ক'রে হেসে বল্‌ল—কে আবার বল্‌বে? ই কথা আবার কেউ বলে দেয় নাকি?

একথা কানে না তুলে তেমনি সুরে রঞ্জন বল্‌ল—উ তুর্ লয়—তুর্ লয়—তুর লয়—

কিছু বুঝ্‌তে না পেরে মনোহর বল্‌ল—তবে?

রঞ্জন কেঁদে উঠে বল্‌ল—আমি জানি না—

তার গলার স্বর বন্ধ হয়ে এল, তারপর সে মনোহরের পায়ের ওপর পড়ে মাথা ঠুকে ঠুকে বল্‌তে লাগ্‌ল—আমাকে মেরে ফেল্‌, কেটে কুটে থেঁত ক'রে ফেল্‌ আমি—'

মনোহরের মনের সংশয় কেটে গেল। সে রঞ্জনের মাথায় হাত বুলিয়ে বল্‌লে ই কতা? তুই জানিস্ না। কিন্তুক আমি বল্‌চি উ আমার। আর তুকে মেরে কেটে কি হবে রঞ্জন? ই কতা সত্যি যদি না-ও হয় তবু তুই যে আমাকে ভাঁড়ালি সে কতা কি কুন্‌দিন তুই ভুল্‌তে পারবি?—ই যে মায়ের বাড়া মার রঞ্জন—লে ধর্‌ ছেলেটা কান্‌তে লেগেচে, আমি কাজে যাই—

* * *

মনোহরের মনের কোন বিকার দেখা গেল না। সমস্ত জেনে এই দারুণ সংশয়ের মধ্যে সে দিব্য আরামে দিন কাটায়। খোঁকাকে তেমনি করেই আদর করে, রঞ্জনকে ভালবাসে।

কিন্তু রঞ্জনের মনের আগুন নিব্‌লেও শান্তি সে পেল না। যখন সে একা থাকে ছেলেটিকে কোলে নিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন কিছু আবিষ্কার সে কর্‌তে চায় কিন্তু পারে না! ও যেন তার ব্যথার প্রদীপ। চিরদিনের জন্যে কে যেন তার বুকে জেলে দিয়েছে—ও নিব্‌লেও বুঝি এ বেদনার শান্তি হবে না!



দীর্ঘসূত্রতার পরিণাম

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত সম্পাদক-মহাশয়

সমীপেষু—

বন্ধুবর,

পূজার সংখ্যার জন্য আপনাকে একটি নূতন গল্প লিখে দিতে হবে—এই ছিল আপনার অনুরোধ। সে-অনুরোধ আমি রক্ষা করব এমন প্রতিশ্রুতি আপনাকে দিয়েছিলুম। মনে মনে সংকল্প ছিল যেমন কোরেই হোক এবার গল্পটি ঠিক সময়েই আপনার দপ্তরে হাজির কোরে দেবো—কিছুতেই শুভলগ্ন বহে' যেতে দেব না। আমার সংকল্প শুনে অলক্ষ্যে বিধাতা-পুরুষ বোধ হয় হেসেছিলেন। নইলে এমন দুর্ঘটনা ঘটে!—অত কষ্টের লেখা গল্প এমন ভাবে অতলে তলিয়ে যায়!

এ কথা ঠিক বটে যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের গণ্ডীর মধ্যে আমি কখনো কোনো কাজ সমাপ্ত কোরে উঠতে পারি নি। এর সব-চেয়ে বড় উদাহরণ আমার বন্ধুরা এই দিয়ে থাকেন যে, আমি ইহজীবনে কোনো দিন ঠিক সময়ে ষ্টেশনে পৌঁছে রেল-গাড়ি ধরতে পারি নি—যদি না রেলগাড়ি স্বয়ং নিজের গাফিলিতে আমায় স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছেন। এ সামান্য অপবাদ আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু সত্যি বলছি এবার আমার দীর্ঘসূত্রতার সমস্ত অপবাদের মুখে কালি দিয়ে নিশ্চয়ই গল্পটি নির্দ্দিষ্ট দিনে আপনার কাছে পৌঁছে দিতুমই দিতুম। কিন্তু কি করব বলুন?—দৈব হলো অন্তরায়! মানুষ দেখছি সত্যই দৈবের বশ। কেন, আপনার কি মনে নেই, আপনার সেই নাত্নীর বিয়ের দিন কোথাও কিছু নেই ফাগুনের পরিষ্কার আকাশ হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি এসে কি নাকালটাই না আপনাদের কোরে গেল। আপনি তো দৈব মানেন না; তাই বোলে দৈব তো আপনাকে কিছু কম খাতির করলে না।

ভণিতা দেখে নিশ্চয়ই অনুমান করতে পেরেছেন যে, পূজার সংখ্যার প্রতিশ্রুত গল্পটি আমার লেখা হয়ে ওঠে নি এবং এ চিঠি তারই কৈফিয়ৎ। আপনি হয় তো মুখ গম্ভীর কোরে বলবেন, সে আমি আগে থাকতেই জানতুম—গল্প হবে না। তা হয় তো হতে পারে—আপনার হয় তো পরের ঘটনা আগে থাকতে জানবার ক্ষমতা আছে, সে নিয়ে তর্ক করতে চাই না, কিন্তু আমি এইটুকু বলতে চাই যে, আপনি যা জানতেন তার চেয়ে কিছু অতিরিক্ত আপনাকে জানাব বলেই এই চিঠি লিখতে বসেছি। এ শুধু আমার গল্প না দিতে পারার ক্ষমা-চাওয়া চিঠি নয়। এর মধ্যে কিছু নিগূঢ় রস আছে জানবেন।

পূর্ব্বে বলেছি গল্পটা আমার লেখা হয় নি। কিন্তু একেবারে লেখা হয়নি বলাটা ঠিক হলো না। কারণ লেখা সত্যই হয়েছিল, কিন্তু সে-লেখা কর্পূরের মতো উবে গেছে!—ঠিক কর্পূরের মতো নয় বটে কিন্তু অনেকটা ঐ রকমই। আপনি নিশ্চয় তর্ক তুলে বলবেন—কর্পূর উবে যায় স্বীকার করি কিন্তু লেখা কখনো উবে যেতে পারে না; কারণ কর্পূর এবং লেখা এক ধাতের জিনিষ নয়। আপনার এ যুক্তি অকাট্য স্বীকার করি, কিন্তু এটা জানবেন যে, ঘটনা নামক জীবটা সব-সময়ে যুক্তির শাসন মেনে চলে না—অন্তত বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যে একেবারেই চলে নি তার প্রমাণ আমার এই চিঠিতেই পাবেন। যে অভূতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য ঘটনা আমার এই গল্প-লেখার সূত্রে ঘটেছে তা শুনলে আপনার বিশ্বাস হবে যে, এ পৃথিবীতে সবই ঘটা সম্ভব—এমন কি যা ঘটবে বোলে কখনো মনে করি নি তাও ঘটতে পারে। বেশী বলব কি বিলাতী নামজাদা কোম্পানীর কারখানায় তৈরি খাঁটি ব্লু-ব্ল্যাক কালি যার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই নেই সেও সময়-বুঝে আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে ইতস্তত করে নি। তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণও এই চিঠিতে পাবেন।

মিথ্যা বলব না—গল্পটা আমি শেষ করতে পারি নি, তবে খুব শেষা শেষি এসে পৌঁছেছিলুম, যেখানটাকে সমালোচকেরা বলে থাকেন গল্পের প্রাণ। গল্পের সবই হয়েছিল, কেবল এ প্রাণটুকুরই অভাব ছিল। যাঁরা বুদ্ধিমান লেখক তাঁরা বোধ-হয়, এটার জন্য তত ব্যস্ত হন না; এবং সে ভালোই করেন; কারণ গল্পের এই প্রাণ হাৎড়াতে গিয়ে সেদিন আমার যে কি-রকম প্রাণান্ত হয়েছিল, আপনি যদি তা স্বচক্ষে দেখতেন, আপনার মায়া করত, সম্পাদক হয়েও আপনি বলতেন—থাক আর লিখে কাজ নেই; আমার গল্প চাই না। আপনি আশ্চর্য্য হচ্ছেন? তবে শুনুন আগাগোড়া ব্যাপারটা বলি।

সেদিন আপিস থেকে ফিরে, মাথার টনক নড়লো'—গল্পটা আজ লিখে ফেলতেই হবে। রোজই কাল লিখব-কোরে-কোরে এতদিন কেটেছে, কিন্তু আর তো কালের উপর বরাত দেবার উপায় নেই, কারণ কাল যে ফুরিয়ে এসেছে —এখন এই আজই তার সম্বল! রাত্রে আহারাদি শেষ কোরে গল্প লিখতে বসা গেল—সাম্‌নে তেলের প্রদীপ জ্বেলে! মাথার মধ্যে প্লট, হাতে কলম, দোয়াতে কালি—আর চাই কি! সবই তৈরি। কিন্তু মন চাইছিল না খাটতে। দেহটা তার মতে সায় দিয়ে বলে উঠলো—শুয়ে পড় ভাই, শুয়ে পড়। আমি মাত্র একটুখানি গা এলিয়েছি আর অমনি কল্পনার চক্ষে ফুটে উঠলো—সম্পাদকের কমনীয় মূর্ত্তি; কৈ মশাই গল্প কৈ? আমি ধড়মড় কোরে উঠে বসলুম। শেষের ও সেদিন ভয়ঙ্কর—কানে শুনেছি, চোখে দেখি নি; কিন্তু গল্প-দেবার শেষ-দিন তার চেয়ে আরো ভয়ঙ্কর—এ আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। কাজেই মনকে ধমক দিয়ে কাজে বসলুম; সে গল্পের তাঁতে মাকু ঠেলতে লেগে গেল। কিন্তু তার ভিতরে-ভিতরে কি-একটা ফাঁকির মতলব যেন ছিল। সে বোধ হয় ভাবছিল এই তাঁতের সূত্র ছিঁড়ে-খুঁড়ে এমন-একটা জট পাকিয়ে থাক যাতে আর গল্প-বোনা না চলে। নইলে মাঝ রাত্রে গল্পটা সত্যই এমন জট-পাকিয়ে গেল কেমন কোরে?

নতুন গল্প আপনি চেয়েছিলেন—নতুন গল্পই আমি লিখতে আরম্ভ করেছিলুম। সে গল্প পড়লে আপনি বুঝতে পারতেন, ঠিক এমনি গল্প জগতের কোনো সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত লেখা হয় নি। লিখতে-লিখতে আমারই মনে হচ্ছিল, এই গল্পের পাত্র পাত্রীরা যেন এতকাল কল্পনারাজ্যে অপেক্ষা কর্‌ছিল আমারই কলমের মুখ দিয়ে আত্মপ্রকাশ করবার জন্যে। জগতের বড় বড় সাহিত্যিকের ডাকে তারা কর্ণপাতও করে নি—শুধু আমারই মুখ-চেয়ে। কি বলব সম্পাদক মশাই, বড় দুঃখ রইলো, সে-গল্প আপনাকে শুনাতে পারলুম না। যে-গল্প নিঃসন্দেহ আমাকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে অমর করতে পারত, সেই গল্পই আমার মরণের ক্রোড়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে রইল।—বোধ হয় আমার মতো সব-লেখকেরই এই রকম হয়ে থাকে। কি বলেন?

লিখতে-লিখতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে কলম বাধলো—নিব ভেঙে নয়, অন্য কারণে। আমার গল্পের নায়ক-প্রবর তখন বনের ধারে গভীর রাত্রের অন্ধকারে ভীষণ জল-ঝড়ের মধ্যে নদী পার হবার আয়োজন করছে; নদীর ওপারে আছেন নায়িকা—যেন চখা-চখীর অবস্থা। নদী তখন ফুলে-ফুলে উঠছে, ঝড়ের

আঘাতে ঝঞ্ঝার গর্জ্জনে সমস্ত বন থেকে-থেকে ঝন্-ঝন্ কোরে উঠছে, আকাশ-চিরে বিদ্যুৎ বাজ নদীর বুকের উপর প্রচণ্ড শব্দে চপেটাঘাত কোরে চোলে যাচ্ছে। অসহায় নায়ক কোনো উপায় না পেয়ে এই দারুণ দুর্যোগে নদী পার হবার জন্যে আকুলি-ব্যাকুলি করছে—কিন্তু কোথাও একখানা নৌকা নেই!

এদিকে নায়িকা এপারে একা বসে আছেন নায়কের অপেক্ষায়। অন্ধকারে ঝড়ের গর্জ্জনে তাঁর বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে, ভাবছেন কতক্ষণে নায়ক এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু কোথায় নায়ক? তার আসার সময় যে অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এখন এই উৎকণ্ঠার মধ্যে এক-এক পল এক-এক যুগ বোলে মনে হচ্ছে। নায়িকার এমনি মনে হতে লাগলো যেন সে সৃষ্টির প্রথম যুগে এই অভিসারে যাত্রা কোরে বেরিয়েছিল, আর আজ এই প্রলয়ের দিন উপস্থিত, তবু তার নায়কের দেখা নেই। তবে আর এ ছার প্রাণ রেখে লাভ কি? সে উঠে দাঁড়ালো—নদী-জলে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবার জন্য।

নায়কটি ছিল আমারই মতো—অর্থাৎ দীর্ঘসূত্রতার সঙ্গে তার জীবনসূত্রকে আমি আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে দিয়েছিলুম। নইলে গল্পের প্লট তৈরি হয় কেমন কোরে? দীর্ঘসূত্রতা ত্যাগ কোরে যথাসময়ে সে যদি নায়িকার জন্যে যাত্রা কোরে বেরুত তাহলে তার এ বিপদ ঘটত না—এ ঝড়-ঝঞ্ঝা কিছুই আসত না; সে নির্ব্বিঘ্নে নদী পার হয়ে নায়িকার সঙ্গে মিলিত হতে পারত। কিন্তু তা তো হলো না। কাজেই আমার নায়ককে সেই নদীতীরে হাহাকার কোরে ছুটাছুটি কোরে বেড়াতে হলো। তার সেই হাহাকার ঝড়ের গর্জ্জনকে ছাপিয়ে উঠলো, তার চোখের জল অজস্র বারিধারাকে ডুবিয়ে দেবার উপক্রম করলে। কিন্তু তাতে কোনই উপায় হলো না। তবে সে কি করে? সে আকাশের ঝড়কে জিজ্ঞাসা করলে, নদীর তুফানকে জিজ্ঞাসা করলে, বনের বনস্পতিদের জিজ্ঞাসা করলে—কেউ কোনো উত্তর দিলে না; তারা নিজের রঙ্গেই নিজে মেতে রইল। নায়কের কেবলই মনে হতে লাগলো, হায় হায় এতক্ষণে বুঝি তার প্রণয়িনী ডুবে মরলো, নয়তো বাড়ী ফিরে গেল! কী সর্ব্বনাশ! তাহলে কি হবে? সে নায়ক হয়ে জন্মে কি করচে?—কোন্ কাজে সে লাগলে?

নায়ককে এমনিতর নাকানি-চোবানি খাইয়ে আমার খুব স্ফূর্ত্তি হচ্ছিল; দীর্ঘসূত্রতার কুফল এমন জলন্তভাবে অঙ্কিত করতে পেরে আমি খুব একটা গৌরব অনুভব করছিলুম, কিন্তু হায় তখন কি জানতুম আমার হাতে-গড়া নায়ক শেষে আমাকেই নাকানি-চোবানি খাইয়ে তার প্রতিশোধ নেবে!

আমার নায়ক তখন একেবারে হতাশ হয়ে মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়েছে—আর তার দৌড়াদৌড়ি ঝাঁপাঝাঁপি নেই। এমন সময় হঠাৎ তার সঙ্গের শিকারী কুকুরটা জলের স্রোতে কি-একটা দেখতে পেয়ে নদীর মধ্যে লাফিয়ে পড়লো। মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় নিয়মে অমনি আমার নায়কের মনে এই কথা উদিত হলো যে, সামান্য কুকুরে যা পারে মানুষ হয়ে আমি তা পারব না কেন? এই বোলে সে অসীম সাহসে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ নদীর অতল বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো—প্রাণত্যাগ করবার জন্যে নয়, সাঁৎরে নদী পার হয়ে বিপন্ন নায়িকাকে উদ্ধার করবার জন্য।

নায়িকা ততক্ষণে একগলা জলে এসে দাঁড়িয়েছে। সে চারিদিকে চেয়ে শেষ একবার দেখে নিচ্ছে যদি এখনো নায়কের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু হায়, কোথায় নায়ক? নায়িকা যদিও অন্ধকারে দেখতে পেল না, কিন্তু গল্পের কৌশলে নায়ক সত্যই তখন নায়িকার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। হায় সে যদি দেখতে পেতো, একটুখানি বিদ্যুতের আলো যদি তাকে সহায়তা করত! নায়িকা একবার ডুবলো, নদীর কালো জল তার সেই সুন্দর দেহখানি গ্রাস কোরে নিলে। সেই শোচনীয় দৃশ্য দেখে ক্ষণেকের তরে সমস্ত ঝড়টা একবার ঝপ্-করে থেমে গেল, নদীর ধারের বনগুলো একটা প্রচণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চোখ-মুদে দাঁড়িয়ে রইলো। আর নায়কের শিকারী কুকুরটা জলের উপরে একটা প্রকাণ্ড লাফ দিয়ে স্রোতে গায়ে থাবা মেরে তার মুখের গ্রাস থেকে কি-যেন-একটা কেড়ে নিলে। বিদ্যুতের আলোয় নায়ক দেখলে সে এক রমণীর দেহ। সে রমণী মৃত কি জীবিত বোঝা যায় না। কিন্তু তার মনে হলো এ তারই প্রণয়িণী! সে প্রাণ-পণে সেই দেহের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো কিন্তু স্রোতের বাধা তাকে সহজে কাছে পৌছতে দিলে না একটা ভীষণ ব্যবধান রচনা কোরে রাখলে—জীবন-মৃত্যুর ব্যবধান! আশায় নিরাশায় নায়কের বুকের ভিতরটা ঝড়ের মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন নৌকার মতো একবার উঠতে একবার ডুবতে লাগলো। এখন কে বাঁচে, কে মরে, তার ঠিক নেই।

গল্পের এই জায়গাটায় এসেই আমার খট্‌কা লেগেছিল। এই সঙ্গিন অবস্থায় করি কি? এই যে দুজন নায়ক-নায়িকা জীবন-মৃত্যুর কড়াকাড়ির মধ্যে এসে পড়েছে, এদের গতি কি হয়? এমনি নিরুপায় অবস্থায় বেশীক্ষণ তো জলে ভাসতে পারে না; এরা এখন করে কি? আমি মহা সমস্যায় পড়লুম। আমার মনে-মনে ইচ্ছা ছিল খুব-একটা হৃৎস্পন্দনকারী দৃশ্যের মধ্যে হঠাৎ দুজনের

মিলন ঘটিয়ে শঙ্খধ্বনির সঙ্গে গল্প শেষ করব। কিন্তু হঠাৎ কে যেন আমার ভিতর থেকে বোলে বসলো সে কি ঠিক হবে? তাহলে তোমার নায়কের দীর্ঘসূত্রতা পাপের শাস্তি হলো কৈ? আনন্দের পুরস্কার যদি তাকে দাও তাহলে পাপেরই যে জয় হলো! এতে তোমার গল্প হয় তো বাঁচতে পারে, কিন্তু নীতি যে একেবারে রসাতলে যায়! তার ফলে সমাজ সংসার দেশ সমস্তই ডুববে! ঠিক তো। এমনিতর একটা সারবান তত্ত্বকথা পূর্ণ প্রবন্ধ আজ সকালে একখানা এক পয়সা দামের সাপ্তাহিকে পড়েছিলুম বটে। কিন্তু হায় তখন কি জানতুম তারই ভূত এসে এই মাঝ-রাত্রে আমার ঘাড়ে চাপবে আর আমার এমন সাধের গল্পটি মাটি কোরে দিয়ে যাবে নানা রকমে আমায় নাকাল কোরে। আমার ভয় হলো চক্ষুলজ্জার খাতিরে আপনি আমার এই দুর্নীতিমূলক গল্প ছাপলেও সমালোচকরা আমায় ক্ষমা করবেন না। এখন উপায় কি? করি কি? মহা ফাঁপরে পড়লুম। এ অবস্থায় এখন নীতি বাঁচে কেমন করে? অনেক মাথা খুঁড়লুম, কিন্তু কোনো সৎ-যুক্তি মাথায় এলো না; স্মৃতির দপ্তর ওলোট-পালোট করতে লাগলুম যদি এমন কোনো প্রবন্ধ পড়ে থাকি যার মধ্যে ইঙ্গিত আছে, কেমন কোরে গল্পে নীতিকে বজায় রাখতে হয়; কিন্তু তেমন কোনো প্রবন্ধ মনে পড়লো না। একবার ভাবলুম দূর হোক গে ছাই ও নায়ক-নায়িকা দুজনকেই মায় কুকুরটা শুদ্ধ জলে ডুবিয়ে মারি। কিন্তু আহা, বেচারা প্রভু ভক্ত কুকুর, বেচারা নায়িকা—এদের দোষ কি? শুধু-শুধু তাদের প্রাণটা যায় কেন? প্রভুভক্তিরও কি এই পরিণাম? তবে কি নায়কটার দ্বারা নায়িকাকে উদ্ধার করিয়ে যখন সে তীরে উঠে নায়িকাকে আবেগ ভরে চুম্বন করতে যাবে ঠিক সেই সময় সর্পদংশনে তাকে হত্যা করাব? ব্যাপারটা খুব ঘোরালো মনে হলো বটে কিন্তু এতেও তো সেই নিরপরাধিনী নায়িকার প্রতিই অবিচার করা হয়। এত বড় নিষ্ঠুরতা কি মানুষে পারে? গল্প-লেখক হয়েছি বলেই কি আমি মানুষ নই! তবে করি কি? হয় জীবন, না হয় মৃত্যু, এ ছাড়া জীবের তো অন্য গতি নেই, অথচ এ দুটোর কোনোটাই আমার গল্পের কোনো গতি করতে পারছেনা। অবশ্য সকল অগতির গতি আছেন সেই বিশ্ববিধাতা, কিন্তু তিনি তো এই রাত্রে আমার জন্যে গল্প লিখতে আসবেন না। আমি একেবারে হতাশ হয়ে পড়লুম। হায় হায় দুদিন আগে যদি গল্পটা আরম্ভ করতুম, তাহ'লে এই নীতির ভূত হয় তো ঘাড়ে চাপতে সুযোগ পেত না, গল্পটা অবলীলাক্রমে শেষ হয়ে যেত। এবং যদি নিতান্তই বিপদে পড়তুম তাহ'লে গল্পটাকে আবার ঘুরিয়ে লেখবারও সময়

থাকত। কিন্তু এখন যে আর কোনো উপায়ই নেই। দীর্ঘসূত্রতার পরিণাম আমাকে ভোগ করতেই হবে। নিস্তার নেই। আমি নিরুপায় হয়ে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলুম। এদিকে গভীর রাত্রি ক্রমেই গড়িয়ে যেতে লাগলো—সেই নিদারুণ দিনের অভিমুখে, যে দিন আবার প্রতিশ্রুত গল্প দেবার শেষ-দিন, যার তোরণের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে সম্পাদকের গদা বা তাগাদা যাই বলুন।

আমি চুপ-কোরে বসে রইলুম।

মন বল্লে—"ভাবছ কি?"

আমি বল্লুম—"ভাবছি কাল্‌কের কথা—সম্পাদককে কাল বল্‌ব কি? গল্পের শেষ মাথায় এলো না, এ লজ্জার কথা তো বলা যায় না।"

সে বল্লে—"একটা কিছু বানাওনা, যা বল্লে সম্পাদক খুসি হবে।"

আমি বল্লুম—"মিথ্যা বলব?"

সে বল্লে—"মিথ্যা কেন বল্‌বে—গল্পচ্ছলে বোলো। মিথ্যা হলেও শোনাবে ভালো।"

আমি বল্লুম—"চুপ চুপ ও কথা মুখে এনোনা।"

সে চুপ-কোরে গেল।

আমি চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বুক-ঠুকে মনে-মনে বল্লুম—"না কিছুতেই না। কাজে যাই করি, লেখায় দুর্নীতির প্রশ্রয় কিছুতেই দেব না। এতে আমার অদৃষ্টে যাই থাক। জগতে যেখানেই দীর্ঘসূত্রতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে, আমাদের সমালোচকেরা ঘৃণিত লোচনে যে বল্‌বেন সে আমারই কুদৃষ্টান্তের ফল, সে আমি কিছুতেই ঘটতে দেবনা। এই গল্পকে আমি সুনীতিমূলক কোরে তুলবই এই রাত্রের-মধ্যেই—এই আমার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।"

সম্পাদক মশাই, আমার এ কঠোর প্রতিজ্ঞা শুনে আমাকে আপনার বাহবা দেওয়া উচিত—জগতে সুনীতি-প্রচারের জন্য নয়—গল্পটি যে আপনাকে শেষ কোরে দেব এই জন্যেই। আপনার গল্পের এইবার একটা সুরাহা হবে ভেবে আমি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলুম।

মাথার ভিতরটাকে কুলপির হাঁড়ির মতো খুব কসে নাড়া দিতে লাগলুম; অনেক নতুন গল্পের গোড়া ফণা তুলে ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে আমায় চমক লাগাতে লাগলো কিন্তু তাদের ল্যাজের দিকটা দেখে আমি হতাশ হতে লাগলুম, কারণ এর কোনোটাই নীতিদণ্ডের মাপসই নয়। বিচার করতে-করতে আমার মনে হলো—এ যে কোনো গল্পই দেখি নীতির আদালতে টেঁকেনা। মানুষ এতকাল

ধরে কি ভুলই কোরে এসেছে—নীতিকে বাঁচিয়ে রাখা যে মস্ত বড় সম্পদ এ কথাটা এতদিন কোনো সাহিত্যিকের মাথায় আসেনি। পৃথিবীই সমস্ত গল্পকে আবার সংশোধন-কোরে ঘুরিয়ে লিখতে হবে দেখছি নীতির জয়গান করবার জন্যে।

আমি যে এমন অপদার্থ তা জানতুম না। এককালে আমিও সম্পাদকের সহকারিতা করেছি—কত লেখা কেটেছি ছেঁটেছি কিন্তু এখন দেখছি সে সবই ভুয়ো; আমি নিজের লেখাই যখন সংশোধন করতে পারছিনা, পরকে সংশোধন করবার সাহস করেছিলুম কোন্ দুঃসাহসে? ভাবতে-ভাবতে আমার মাথা গরম হয়ে উঠলো—চোখ দুটো রক্তবর্ণ হলো। আমি পাগলের মতো ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি করতে লাগলুম—মাথা চাপ্‌ড়ে চুল ছিঁড়ে কলম কামড়ে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

মন বল্লে—"ওহে যাদুকর! আর কেন? এইবার ভেল্-কি-বাজি চালাও না।"

আমি তাকে ধমক দিয়ে বল্লুম—"চুপ্!"

হঠাৎ মনে হলো এমন অধৈর্য্য হচ্ছি কেন? প্রতিজ্ঞা করেছি আজ রাতা-রাতিই গল্পটাকে সুনীতিমূলক কোরে তুলবো—সে প্রতিজ্ঞা তো রাখতে হবে। সাহিত্য হচ্ছে সাধনার সামগ্রী এখন অধীর হলে কি চলে?

স্থির হয়ে কলম নিয়ে লিখতে বসলুম। হঠাৎ মাথাটা দেখি বসন্তের আকাশের মতো বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে; আশা হলো গল্পটা ভরা-ডুবি হবে না—উদ্ধারের একটা যেন পথ পাওয়া যাচ্ছে। ঘড়িতে দেখলুম রাত তখন তিনটে, আর ঘণ্টা দুই খাটলেই ভোর নাগাদে গল্প শেষ হবে নিশ্চয়। শেষটা খুব চমৎকারই হবে—যেমন চমকপ্রদ, তেমনি অভাবনীয়—তেমনি সম্পূর্ণ নূতন!

উৎসাহ-ভরে কলম দ্রুতগতিতে চলতে লাগলো। আমি লিখতে-লিখতে তন্ময় বাহ্য জ্ঞান-শূন্য হয়ে পড়লুম।...

আবার বাধা!—এবার আরও সঙিন, আরো সাংঘাতিক! এ বাধা দৈব-বাধা, এর উপরে মানুষের হাত নেই। অতএব চুপ!

বিশ্বাস করবেন কি? এবার যে ঘটনার বর্ণনা করব তা বিশ্বাস হবে কি? বিশ্বাস করতে বলতে ভয় হয় কারণ সে অসম্ভব ব্যাপার স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস হবার নয়। কিন্তু বিশ্বাস না কোরেই বা করছেন কি? অবস্থা-গতিকে অনেক অসম্ভব সম্ভব হয় এ সত্য নিশ্চয় আপনার জানা আছে। এবং এটাও জানেন

যে এই অবস্থা-তত্ত্ব অতি-জটিল-তত্ত্ব। এই অবস্থার ফেরে হয় নয় হয়, নয় হয় হয়! সত্য মিথ্যা হয়ে যায়, বন্ধু শত্রু হয়, সাধু শাস্তি ভোগ করে, অসাধু জয় ডঙ্কা বাজায়। এই অবস্থায় পড়ে তরল জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়! এ আপনি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতেন? কখনোই না। হেসে বলতেন—জল কখনো উড়তে পারে! কথায় বলে তেমন অবস্থায় পড়লে মানুষ কি না করে!

অতএব মনে রাখবেন আমরা সবাই এই অবস্থার দাস। নইলে আমায় এত বড় কৈফিয়ৎ লিখতে হয়।

কতক্ষণ ঘাড় গুঁজে এক-মনে লিখে চলেছিলুম ঠিক মনে নেই। হঠাৎ চমক ভাঙলো—কার একটা জোর নিশ্বাসের হাওয়া কপালে এসে লাগলো। মুখ তুলে চাইতেই দেখি সেই নিশ্বাসের আঘাতে প্রদীপের আলোটা একবার থরথর কোরে কেঁপেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হলো। অমনি চারিদিক থেকে ঘুৎঘুটে কালো-নিস্ অন্ধকার এসে বোঁ-বোঁ-কোরে আমাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়াতে লাগলো; মনে হলো যেন একটা অন্ধকারের ঘূর্ণি এসে আমায় ঘিরেছে; সেই ঘূর্ণির পাকে-পাকে আমি ঘুরতে লাগলুম—চড়ক-গাছ যেমন কোরে ঘোরে! চোখ দুটো ঘুরতে লাগলো চর্কির মতো, কানদুটো ইলেক্‌ট্রিক্ পাখার মতো আর মাথাটা লাট্টুর মতো! সেই ঘুরুনির চোটে অত অন্ধকারের মধ্যেও আমি সর্ষে ফুলের আলো দেখতে লাগলুম। বাপরে বাপ!—সে কি ঘুরুনি! আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত! সেই ঘূর্ণিতে মনে হলো আমার দেহের মেদ মাংস অস্থি সব যেন বাষ্প হয়ে গেছে—বুদ্ধি-শুদ্ধি যে কোথায় ছিটকে বেরিয়ে গেছে, তার সন্ধান পাওয়া দায়। আমি একেবারে হতভম্ব!

তারপর মনে পড়ে—খুব ঠাণ্ডা বরফ-জল দিয়ে ভিজানো একটুকরো স্পঞ্জ কে যেন বিদ্যুৎ-বেগে আমার উত্তপ্ত ললাটে বুলিয়ে দিয়ে গেল। সে এমন ঠাণ্ডা যে অত আমার সেই গলদ্‌ঘর্ম্ম অবস্থায় শীত কোরে এলো—আমি ঠক্-ঠক্ কোরে কাঁপতে লাগলুম। সেই ঠাণ্ডার স্পর্শে চম্‌কে উঠে চাইতেই দেখি আমার নাকের সাম্‌নে সাপের ফণার মতো একটা-কা লক্‌লক্ করছে! আমি ভয় পেয়ে মনের ভিতর থেকেই বোলে উঠলুম—"এ কিরে বাবা!"

উত্তর এলো—"জিহ্বা!"

—"কিসের জিভ?"

—"ভূতের!"

ভূতের !—আমি সোজা হয়ে উঠে বসলুম। বল্লুম—ভূত তো অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন ভূত কখনো দেখিনি।"

সে বল্লে—"ভূত অনেক রকমের আছে ;—এ-ভূত, ও-ভূত, সে-ভূত, গো-ভূত, শ্ব-ভূত, আরো কত ভূত ! তুমি কি সব দেখেছ ! আমি হচ্ছি শ্ব-ভূত।

আমি বল্লুম—"ও, তাহ'লে তুমি কুকুর-ভূত। কিন্তু তালব্য-শটাকে দন্ত্য-সর মতো উচ্চারণ করছ কেন ?—সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ-ভেদে যে অর্থ-ভেদ হয়ে যায়।"

বলতে-বলতেই দেখি আমার চোখের সামনে প্রকাণ্ড জিভ-ওয়ালা একটা কুকুর থাবা-গেড়ে আমার পানে ড্যাব্-ড্যাব্ কোরে চেয়ে বসে আছে। তার দেহটা একটা আঁকা-বাকা কালো লাইন দিয়ে আঁকা—যেন ছেলেদের হাতের ছবি !

আমি বল্লুম—"তোমার এমন ছিরি কেন ?"

সে তার সেই লম্বা জিভটা দিয়ে আমার কপালে একটা ঠোনা-মেরে বল্লে—"কি করব—আমার বিধাতা আমায় যেমন গড়েছেন !"

উঃ, সে জিভ কি ঠাণ্ডা ! আমি আবার কাঁপতে লাগলুম শীতে—দাঁতে দাঁত দিয়ে।

হঠাৎ কেমন আমার সন্দেহ হলো, এ কি সেই কুকুর না কি—! আমি বল্লুম—"তুমি কি আমার গল্পের নায়ক বীরসিংহের কুকুর ?"

সে কোন জবাব দিলে না ; ফিক্ কোরে একটু হাসলে মাত্র।

আমায় বল্লে—"তুমি এখনো বসে বসে কি করছ ?"

আমি বল্লুম—"গল্প লিখছি।"

সে বল্লে—"ও, গল্প লিখছ ? বেশ, বেশ—শোনাও তো। আমি গল্প শুনতে বড় ভালবাসি।"

আমি বল্লুম—"কুকুরে আবার গল্প শুনবে কি ?"

সে বল্লে—"আমি যে এক গল্প-লিখিয়ের কুকুর। তাঁর কাছে গল্প শুনে-শুনে আমার মৌতাত ধরে গেছে। গল্প না শুনলে আমার হাই ওঠে।" বলেই প্রকাণ্ড হাঁ-কোরে সে একটা হাই তুল্লে।

উঃ সেই হাঁয়ের ভিতরটা কী কালো কী গভীর !—যেন একটা অন্ধকার অতল গহ্বর কত দূর চলে গেছে ! আমি ভয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলুম !

আমি বল্লুম—"গল্পটা যে এখনো শেষ হয়নি।"

হায়েনার ডাকের মতো বিকট শব্দে একটা প্রচণ্ড হাসি হেসে সে বল্লে—"তার আর কি! গল্প আমি শেষ কোরে দেবো।"

অন্ধকারে তার সেই অট্টহাসা শুনে আমি কেমন্‌ জড়সড় হয়ে গেলুম।

সে বল্লে—"ভয় কি। পড়। গল্প শেষ না কোরে আমি নড়ছি না।"

দেশলাই নিয়ে আলো জ্বালতে যাচ্ছি সে ফস্‌-কোরে থাবা দিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরে বল্লে—"কর কি?"

আমি বল্লুম—"আলো জ্বালি নইলে পড়বো কি করে?

সে বল্লে—"সর্ব্বনাশ! আলো জ্বাললেই তো আমি গেছি। তুমি অন্ধকারেই পড়।" বোলে সে তার সেই ঠাণ্ডা কন্‌কনে জিবটা আমার চোখে বুলিয়ে দিলে। আমার চোখ দুটো পাথরের মতো অসাড় হয়ে গেল—আমি তাইতে দিব্যি পড়তে পারলুম।

আমি গল্প পড়তে লাগলুম; সে তার সেই কালো-লাইন-দিয়ে-আঁকা লম্বা-লম্বা কান-দুটো নেড়ে গল্প শুনতে লাগলো।

খানিকটা পড়েছি, সে বল্লে—"ভোর হয়ে আসছে, আলো ওঠার আগেই আমায় পালাতে হবে, তুমি একটু তাড়াতাড়ি পড়।"

আমি তাড়াতাড়ির ছন্দে পড়া সুরু করলুম। সে একটু শুনেই বল্লে—"আরো তাড়াতাড়ি।" আমি পড়ার গতি আরো দ্রুত কোরে তুল্লুম। সে বল্লে—"আরো জলদ ভাই, আরো জলদ!—দেখছনা, ভোর হয়ে আসছে।" আমি আরো জলদ-তালে চলতে লাগলুম। যতই জলদ তালে চলি, দেখি তার ফুর্ত্তি ততই বাড়ে—সে ততই হাঁকে আরো জলদ আরো জলদ! এমনি-কোরে মেল-ট্রেনের গতিতে চোলে আমি শেষে হাঁপিয়ে উঠলুম—আমার দম বন্ধ হবার যো! সে বল্লে "যাও, তুমি কোনো কম্মের নও!" বোলেই সে থাবা-মেরে আমার হাত থেকে গল্পের খাতাখানা কেড়ে নিয়ে টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে বসলো। আমি দেখি সে করছে কি একখানা কোরে পাতা উল্টাচ্ছে আর তার সেই লম্বা জিভ-খানা তার উপর বুলিয়ে নিচ্ছে আর মাঝে-মাঝে মহা তারিফ-কোরে বলছে—"বাঃ, বাঃ, বেশ!"

আমি বল্লুম—"ও কি করছ?"

সে বল্লে—"রস-গ্রহণ করছি। চেঁচে-পুঁছে না চাটলে যে রস পাই না!"

এই বোলে সে পাতার পর পাতা—মহা তৃপ্তির সঙ্গে চেটে যেতে লাগল। আমি অবাক হয়ে তার এই কাণ্ড দেখতে লাগলুম। তারপর হঠাৎ সে খাতা-

খানা আমার কোলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে সহসা অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি দেখি খোলা জানলা দিয়ে ভোরের আলো ঘরে এসে পড়েছে।

বেশ! ভূতটা তো আচ্ছা ফাঁকি দিয়ে পালালো! বল্লে, ভয় নেই, গল্পটা শেষ কোরে দিয়ে যাব—আর দিব্যি চুপি-সাড়ে সরে পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার লেখবার যে সময়টুকু ছিল তাও নষ্ট কোরে দিলে। কি করি?—হতাশ হয়ে অন্যমনস্কে খাতার পাতা ওল্টাতে লাগলুম। হঠাৎ একবার ভালো কোরে নজর পড়তেই দেখি একি আমার গল্প গেল কোথা! যেটুকু তাকে নিজের মুখে শুনিয়েছি তা ছাড়া বাকি সবটা সে চেটে েরে দিয়ে গেছে! এই বুঝি তার গল্প শেষ করা! হা অদৃষ্ট!

এই আমার এবারের পূজার গল্প লেখার ইতিহাস। হয় তো সম্পাদক মনে করবেন, এ আমার ফাঁকি। কিন্তু একথা ভুল্লে চলবেনা যে ফাঁকি মাল নিয়েই গল্পের কারবার। এই ফাঁকির ব্যবসায় এবারের কিস্তিতে আমি ঠকলুম কি সম্পাদক মশাই ঠকলেন, সে বিচার আর-পাঁচজনে করবেন। কিন্তু উপায় কি? লেখকের ঘরে এমনতর ভূতের উপদ্রব ঘটলে সে বেচারা করে কি? আমার কথায় বিশ্বাস না হয় আপনারা এসে স্বচক্ষে দেখে যাবেন আমার এই আধ-খাওয়া কলের মতো গল্পের খাতা খানা। আপনাদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যই আমি সেখানা সযত্নে তুলে রেখেছি। এলে নিঃসন্দেহ দেখতে পাবেন যে সত্যই তার শেষদিককার লেখা-পাতাগুলো ভূতে চেটে একেবারে সাদা কোরে দিয়ে গেছে;—এমন চমৎকার চেটেছে যে সন্দেহ হয় কোনো কালে এর গায়ে কালির আঁচড় পড়েছিল কি না!

আমার ইচ্ছে আছে আসছে বছরের গ্রাণ্ড একজিবিসনে আমার এই অমূল্য খাতাখানা ভালো কোরে বাঁধিয়ে পাঠিয়ে দেবো—মলাটে এর ইতিহাসটুকু লিখে, যা দেখে হাজার হাজার লোক শিক্ষা করতে পারবে—'দীর্ঘসূত্রতার পরিণাম কি ভীষণ অচিন্তানীয়।" ইতি—



স্বপ্ন-শেষ

শ্রীযুবনাশ্ব

সন্ধের মহড়ায় চোরের মতো ইদিক্ উদিক্ তাকাতে তাকাতে সন্তর্পণে আস্তানার গেন্দিয় পা দিতেই বাঞ্ছার কানে এল খেঁদী পিসীর কট্‌কটে বাজখাঁই গলার আওয়াজ ··· কি রে মড়া, হয়েচে কি? অত হাঁপাচ্চিস্ কেনে? কি ওটা তোর কাঁকে ···?

··· চুপ্, চুপ্ ··· চ' উদিগে ··· ঘরের ভেতর ··· বল্‌চি ···

··· আ মর্! কি এমন রাজ্যি জয় করে এলি যে ··· ওমা! উকি রে? কার ছ্যানা ···

··· মাইরি পিসী ··· দোহাই তোর! ঘরে চ' ··· মহাকাণ্ড হয়ে গেচে!

বাঞ্ছা তখনো প্রাণপণে হাঁপাচ্চে। তার কাঁখের পোঁট্‌লা থেকে একটা অদ্ভূত গোঙানীর শব্দ হতেই সে পটাপট্ দু তিনটে থাবড়া কসে অস্পষ্ট ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌ল ··· থাম্‌না শূয়র ··· একেবারে গলা টিপে ঠাণ্ডা করে দেব ···

তারপর সভয়ে বার দুই তিন পেছনে তাকিয়ে বল্‌ল, ··· চ' পিসী ···

ঘরে ঢুকে, ঝাঁপটা টেনে দিয়ে খেঁদী বলল, ··· নে' এখন, বার কর দিকি কি এনিচিস্ ···

বাঞ্ছা টিপ্ করে কোল থেকে বছর চার-পাঁচের একটী ফুটফুটে ছেলেকে ঘরের মেঝের নামিয়ে দিলে। ছাড়া পেয়ে ছেলেটা আর একবার কেঁদে উঠ্‌তেই সে তার গলা টিপে ধরে ঠাস্ করে গালে একটা চড় কসিয়ে দিয়ে বলল ··· চুপ, হারামজাদা, চুপ্! জাব ঐ একরত্তি; দাপট্ দ্যাক না!

বেধাবড়া ধমক আর মারের চোপতে ছেলেটার সুবুদ্ধি হয়েছিল, সে সত্রাসে চুপ করল।

খেঁদী ছেলেটার দিকে তাকিয়ে তাক্ক ভাবে বলল ··· করচিস্ কি! দলশুদ্ধ হাতে দড়ি দেয়াবি নাকি ···

বাঞ্ছা বলল,…দল ফল যাক্ চুলোর দোরে, নিজের হাত দুট্যেত বেঁচেচে! বাপ্…আর এটু হলেই…

খেঁদী তার দিকে বিরক্ত চোখে তাকিয়ে বলল,…নে, কপ্চাস্ পরে…কি হয়েছিল্ বল্…

…বলচি। রাজাবাজারের-মোড়ে ঐ যে বড়বাড়ীটা না—ঐ যে লালরংয়ের দেউড়ীওলা …..

…হ্যাঁ হ্যাঁ…পরামাণিকদের বাড়ী…

…ছোঁড়াটা হোতাকার। সন্ধের আগ্খানটাতে খেলতে খেলতে খানিকটা ইদিকে এসে দাঁড়িয়েছেল। আমি আসছিনু শ্যালদার দিক থেকে। হঠাৎ নজর পড়্ল ছোঁড়ার গলার দিকে, দেকি কি,…গ্যাসের আলোয় গোট্ গোট্ কি যেন ঝক্‌ঝকিয়ে উট্‌ল! ভাবনু, সাপ ব্যাং যাই হোক্ বাবা, ও আমি না হাতিয়ে ছাড়্চি নে! ছোঁড়া আপন মনে চলছিল, আমিও মৎলব ভাজ্‌তে ভাজ্‌তে ওৎ পেতে সাত্ ধরনু।

…নিকুচি করেচে তোর সাত্ধরার, মাল সাব্‌ড়ালি কি করে তাই বল্…

…শুড়্কে দিস্‌নি পিসী, বল্‌চি। শিক-কাবাবের দোকানের পাশের এঁদো গলিটার মুখে এসে যেই ছোঁড়া দাঁড়িয়েচে, আমিও অম্‌নি না তাক্ বুঝে, এক লাপে ওর ঘাড়ের ওপর! মুখ চেপে ধরে হিড়্ হিড়্ করে নে' এলুম গলির ভেতর! ছোঁড়ার তকনকার ভাবখানা যদি দেক্‌তিস্ পিসী! ঝটপট্… কেতেন চিতেন,…টোপ্‌গেলা বোয়ালছানার মতো দাপাচ্চে!…হারটা প্রায় কায়দা করে নে' এনেচি, য়্যামন সময় দেকি একব্যাটা লালপাগ্‌ড়ী গলির ঠিক মুখটাতে…চোক ত চড়ক্‌গাছ! জান্ থাকতে অমন রোজগারটা ভেস্তে যাবে… মাইরি আর কি! কিন্তু সাত পাঁচ ভাব্‌বারও ত আর সময় নেই…শালা এগুচ্চে! বোঁ করে ছোঁড়াটাকে পাজাকোলা করে তুলে নে' ওর জিবটা না টেনে ধরে দিনু ছুট্!…ছুট্ ত ছুট…একদম্ আস্তানার গের্দায় পা দিয়ে তবে হাঁপ্ ছেড়েচি!…বাপ্! কম ভুগিয়েচে শুয়োটা! আর শালার কি ওজন পিসী, এই তোর গা ছুঁয়ে বলচি, মাইরি, দেড়মণের কম হবে না!…কালঘাম ছুটিয়ে দিয়েচে!…

খেঁদী সব শুনে, খানিক চুপ করে থেকে বলল,…আচ্ছা, নিয়ে ত এলি, একন সামাল দিবি কি করে? কচি কাচা নয়, পুরষ্ট মাল!…হদ্দমুৎ বাদালি তুই!

বাঞ্ছা বলল,...হুজ্জুৎ আর কি। হারটা খুলে রাক্, তা'পর রাতারাতি ওকে পার করে দিয়ে আসি ফটকের কাছে,...বাস্, মিটে গেল সব...

খেঁদী বিরক্ত হয়ে বলল,...বলিহারী তোর বুদ্ধির? এতক্ষণ বাড়ীতে সোর গোল পড়ে গেছে না? ওদিক মাড়ালেই ত হাতে বেড়ী পড়বে। তা ছাড়া ছোঁড়াটাও ত আর চোক কান বুজে নেই, অনেক কতা ত ওই ফাঁস্ করবে!

...ফাঁস্ করবে না আমার এ করবে! রাস্তাঘাট চেনা কি ওর কর্ম্ম,...ঐ টুকু ত ছোঁড়া! তোর যত গুলিখুরী...

...তোর পিণ্ডি। আস্তানাটা ত দেকচে,...একটু বললেই পুলিশে টের পাবে। চক্কুর লীলে খেলা ত আর বেশী দিনের কতা নয়...

জবাব দেবার কিছু নেই। বাঞ্ছা চুপ্ করল।

খানিক ধন্দ ধরে থেকে খেঁদী বলল,...আমি বলি কি...

হঠাৎ একটা চুমকুড়ী কেটে বাঞ্ছা চেঁচিয়ে উঠ্ল,...ঠিক্, ঠিক্,...হয়েচে! শোন্...

দাঁত কিড়মিড় করে খেঁদী বল্ল,...আস্তে মড়া, আস্তে!

বাঞ্ছা সাম্লে নিয়ে গলা খাটো করে বল্ল,...আচ্ছা। তার পর খেঁদীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্ ফাস্ সুরু করল। সারা হলে, মুখ সরিয়ে এনে, হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বল্ল....কি বলিস্?

খেঁদী এক লহমার জন্যে একটু শিউরে উঠে, বিকৃত সুরে বল্ল,....বেশ বেশ!...আর তা ছাড়া পত্ ও ত দেকিনে কিছু!

ছেলেটা অনেকক্ষণ ভয়ে ভয়ে চুপ্ করে ছিল, এইবার খেঁদীর আঁচল ধরে ফুপিয়ে উঠ্ল....মা....মার কাছে যাব!

খেঁদী চম্‌কে উঠে চোক্ কটমটিয়ে তার মুখের দিকে তাকাল।.,..যাবে বৈ কি সোনাচাঁদ! এই নে' গেলুম বলে! এখন একটু থির হয়ে বোসো ত মাণিক! বলে, সে হারটা খুলে নিয়ে খেঁদীর হাতে দিয়ে বল্ল....নে, ধর...আদাআদি বাবা,—তার কমে পোষাবে না!

খেঁদী হারটা মুঠোজাত করে বল্ল,....ঢং রাক্! হামেশা যা হচ্চে তাই পাবি,...বারো আনা চার আনা...

বাঞ্ছা ঘোরতর আপত্তি করে বল্ল,...দোহাই তোর, মজুরী পোষাবে না! করতে কর্ম্মাতে ঝক্কি পোয়াতে বাঞ্ছারাম, আর পায়ে পা রেখে লাভের কড়ি গোণ্‌বার ব্যালা তুই? আর এটাতে খাট্‌নী ও জবরদস্ত!

খেঁদী আর না ঘাঁটিয়ে বলল......আচ্ছা, ছ' আনা নিস্! মড়া ছিনে-জোঁকেরো বাড়া. . . .

এমন সময়......পিসী ঘরে না কি গো, ... বলে ঝাঁপ ঠেলে বছর সাতাশ আটাশের একটী স্ত্রীলোক ঘরে ঢুক্‌ল। গায়ের বরণ তেল চুকচুকে, কপালটা ঢিবি, হাতুড়-পেটা নাকটার তলা দিয়েই হারমনিয়মের চাবির মতো একসার দাঁত বেরিয়ে পড়েচে।

চোয়ালটা কানের কাছে চৌকো হয়ে সাম্‌নের দিকে অনেকটা এগিয়ে এসেচে।

সে ঘরে ঢুকেই বল্‌ল, ... ওম্মা! কার ছেলে গো পিসী? দিব্যি···

খেঁদী জিব্ উল্টে বল্‌ল, ...আ মর্ ঢং দেকে আর বাঁচিনে! ছেলে যারই হোক্ তোর তা দিয়ে কি কাজ লা?

দাঁতী বল্‌ল,···আহা চটিস্ কেনে পিসী! তোর যে নয় তা জানি, তবে উড়ে ত আর আসে নি, তাই সুধোচ্চি।

সুরৎ যাই হোক্ দাঁতী গুণের মেয়ে। বয়েস গুণে ভিক্ষে ছাড়াও তার রোজগার ছিল মোটা, খেঁদীর তা অজানা ছিল না। সে একটু নরম সুরে বল্‌ল,......বাঞ্ছার রোজগেরে মাল।

দাঁতী সহজ সুরে বল্‌ল,...বটে! বলে ছেলেটীর পাশে গিয়ে বস্‌ল তার খামখাই ইচ্ছে হচ্চিল ছেলেটীর গায়ে মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দ্যায়, একটু কোলে নিয়ে........ধ্যেৎ!

ছেলেটী আবার এমন একটা নতুন জীব দেখে ভড়্‌কে গেছল, কিন্তু দাঁতী কাছে এসে বস্‌তে সে তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

দাঁতী একটু বিব্রত হয়ে অন্যদিকে তাকাল। তারপর বাঞ্ছার দিকে ফিরে বল্‌ল . . . . তোর আবার ছেলে পুষ্‌বার সক্ গেল কবে থেকে রে?

বাঞ্ছা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বল্‌ল . . . . ন্—নিকুচি করেচে তোর সকের। . . . . তা' হলে একুনি নে' যাব পিসী? আমার কিন্তু আর তর্ সইচে না!

খেঁদী বল্‌ল,...বোস্।

ছেলেটী এতক্ষণ দাঁতীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এইবার হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠ্‌ল। তার অব্যক্ত গোঙড়াণীর ভেতর থেকে একটা কথা শুধু বোঝা গেল . . . . মা।

দাঁতের দোলনতে দাঁতীর মুখে কোনো ভাবের ছাপ পড়্‌লেও সহজে ধরা যেত না। অসাবধানে তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল . . . . আহা! কিন্তু পরক্ষণেই সে সাম্‌লে নিয়ে বল্‌ল, . . . আ মর্!

খেঁদী তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে গলাটা যথাসাধ্য মোলায়েম করে বল্‌ল, ... যা না গো মাগী, ... সংয়ের মতো হেতা বোসে আছা উহু সুরু করলি কেনে? ঘর যা! ভরসন্দেয় কোতা দু পয়সা উপায়ের পত্ দেকবি, না . . . . .

দাঁতী ঝাঁজের সাথে বাধা দিয়ে বল্‌লি, আ মর! আমার রোজগারের দুঃখে তোর ত ঘুম হচ্ছে না! তোর যদি অসুবিধে হয় ত বল্, . . . যাচ্ছি। বলি আজকাল কি সন্দেয়·····

পিসী সত্যিই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌ল…কপাল! কিন্তু তাও বলি, ডামাক্ দ্যাকাস্ নি। বয়েস কালে তোর জন্যে রোজগার করেচি আমরা।

দাঁতী হেসে বল্‌ল, . . . পিসী, দুঃখু করিস্ নি। এখনো দু এক পোঁচ লাগিয়ে পরিপাটি করে চুলটুল বাঁধলে…চাই 'ক…

বাক্সা বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাশ্‌তে কাশ্‌তে বল্‌ল, ঘেন্নাঘাঁটি করিস নি বিন্দী! যা তুই, আমাদের একটু কাজ কম্মের কতাবার্ত্তা আচে।

বিন্দী-দাঁতীর শেষদিকের কথাবার্ত্তাগুলো পিসীর ভালোই ঠেক্‌ছিল, কিন্তু কাজকর্ম্মের কথা কানে আস্‌তেই সে গা-ঝাড়া দিয়ে বল্‌ল, যা। শোন্ . . . উল্টোডিঙ্গীর ছুঁড়িটা ওই কোণার পূব-দোরী ঘরে বন্ধ আচে . . . এই চাবি নে রতনা এলে দিস।

একটা গোপন কিছুর আঁচ্ পাবার পর থেকে বিন্দীর ওঠ্‌বার আর মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু জলে থেকে কুমীরের সাথে বাদ করা সম্বন্ধে ঐ যে কি একটা প্রবাদ আচে, সেইটের কথা মনে করে তাকে উঠ্‌তে হ'ল। সে বল্‌ল . . . উঠ্‌চি। ছেলেটাকে নে' গেলুম পিসী, দরকার হলে নে' যাস।

বাক্সা হাঁ হাঁ করে উঠ্‌ল, . . . রাখ্ রাখ্ নাবিয়ে দে! মাগী . . . বলা নেই কওয়া নেই . . .

খেঁদী একটু অবাক্ হয়ে বিন্দীর মুখের দিকে তাকাল! তারপর কি ভেবে বল্‌ল, . . . আচ্ছা নে' যা। কিন্তু ঢাক পিটে বেড়াস না যেন্! নিজের ঘর ছাড়া আর কোথাও বারও করিস্ নে!

বিন্দী বলল . . . আচ্ছা। তার পর ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে

ঝাঁপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ফিরে বলল ··· আচ্ছা পিসী, ছেলেটাকে যদি পুষি? দিয়ে দিবি আমায়?

বাঞ্ছা লাফ দিয়ে উঠ্‌তে যাচ্ছিল, খেঁদী তাকে থামিয়ে দিয়ে ঠোঁটে একটু হাসি টেনে বল্‌ল ··· তা কি হয় না মুকপুড়ী? হেতা ছেলে পুষ্‌বি কি? ও যার ছেলে তাদের ফিরে দে আস্‌তে হবে ··· তু' দিয়ে যাস্‌ খানিক বাদে ···

দাঁতা কিছু বুঝ্‌ল কিনা সেই জানে, ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

বাঞ্ছা কুঁদে উঠ্‌ল ··· তোর আক্কেলখানা কি বল্‌ ত? ওকে হাতছাড়া করলি যে বড়? একন কক্কন দিয়ে যাবে তারই পিত্যেশে বসে থাক্‌তে হবে!

খেঁদী তাড়া দিয়ে বল্‌ল ··· চুপ্‌ করে বোস্‌। ও মুকপুড়ীর সাম্‌নে তুই অমন কুঁদে কুঁদে উট্‌ছিলি কেনে বল্‌ ত? আমি যা করি সে সব দিক ভেবেই করি। কিন্তু তোর চালচুল দেকে ও ত টের পেয়ে গেছে যে ভিতরে কিছু গলদ আছে!

বাঞ্ছা একটু ঘাব্‌ড়ে গিয়ে বল্‌ল ··· হ্যাঁ, বিন্দী টের পেলে ত ভারী ···

··· ভারী নয়। কারুকে বিশ্বেস নেই ··· ও সব পিরীত ফিরীতের ঠাঁই হেতা নয়। ক'ত মিন্সে আসে ওর ঘরে ··· ফুকান হতে কতক্ষণ?

··· তবে তুই যে বড় ছ্যানাটাকে ছেড়ে দিলি?

··· সে আমি ঠিক্‌ই করেচি। না দিলে ওর সন্দ হত, একুনি গে ঢাক পিটে বেড়াত। নে' গেচে, একন ঠাণ্ডা থাক্‌বে খানিক। তুই এর ভেতর যোগাড় যন্তর সব ঠিক্‌ করে রাখ্‌ ··· মাঝ রাতের আগে কিছু হবে না ··· রাত পোয়াবার আগেই খালপার করে দিয়ে আস্‌তে পারবি।

··· যোগাড় ত কচু! ওই ত জীব ··· গলায় আঙ্গুল দিলেই ···

··· উঁহু। তাতে বিপদ আচে। আস্ত অত বড় লাসটা নে' যেতে গেলেই ধরা পড়বি। কেটে কুটে না নিলে ··· যন্তর পাতি কিছু নেই?

··· আমার সেই বড় বাঁক ছুরীখানা ···

... তাতেই হবে। বলে খেঁদী উঠ্‌ল।

দরজার কাছে এসে বল্‌ল ... বিড়ী আচে? দে একটা। একন যা, ... হ্যাঁ, গোটা দুয়েকের সময় ... যা।

অন্ধকারে প্যাচপেচে কাদার মধ্যে দিয়ে নিজের ঘরের দিকে যেতে

যেতে বাঞ্ছা শুনতে পেল, ওধারে বিন্দীর কুড়ের দোরে দাঁড়িয়ে দলেরই দুজন মরদ মত্ত-কণ্ঠে হল্লা জুড়ে দিয়েচে . . . বি . . . ন্দি . . . দ-দোরটা খোল্ মাইরি . . . ! র্ . . . রাত যে পুইয়ে গেল ব্ . . . আওয়া . . . !

বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে বিন্দী তাড়া দিয়ে উঠ্‌ল, . . . সরে পড় ভালো চাস্ ত ! . . . মর, মর ! নইলে ঝেঁটিয়ে রস ঝেড়ে দোব !

বিন্দীর ব্যবহারের রকমফের দেখে একটু অবাক্ হয়ে বাঞ্ছা গান ধর্‌ল, . . . গয়লা দিদি লো . . .



খেঁদীর ঘরে ছেলেটাকে দেখা অবধি বিন্দীর বুকের মধ্যে অত্যন্ত মরচে-পড়া কোন্ একটা তারে কেবলি কাঁপন উঠ্‌ছিল, তাতে তার নিজেরি থেকে থেকে অবাক্ লাগ্‌ছিল।

পেটের খিদে, সারা গায়ে খিদে খিদে,—এ সবের অনুভূতি তার অজানা ছিল না; সে খিদে তৃপ্তির পথও জানা ছিল। কিন্তু বুকের ঠিক্ মাঝখানটাতে কিসের এ খিদে, . . . এ একদম নূতন। ঘরে এসে ছেলেটাকে বুকে চেপে চুমোয় চুমোয় তার দু গাল ভরিয়ে দিয়েও তার তৃপ্তি হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল আরো—আরো . . . কিন্তু আশ্ মিট্‌ছিল না।

ছেঁড়া কাঁথা কম্বল, এঁদোগলির পচা পাঁক, অভাব ও অসুখের কাৎ-রানি, ক্ষুধা ও পশু-লালসার হাহাকার,—এরই ভেতর সে আজন্ম প্রতি-পালিত। তাই মনের ওলোট-পালট মাঝে মাঝে তাকে অবাক্ করে দিচ্ছিল, কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে সব ভাব্‌বার মতো মনের অবস্থাও তার ছিল না, শক্তিও না। খালি মনে হচ্ছিল, জলের তোড়ে নদীর পার ধ্বসে পড়ার মতো মনের মধ্যে কিসের যেন ভাঙন সুরু হয়েচে . . . একটু ভালোই ঠেকুচে তাতে . . .

বাইরে ভর সন্ধের খদ্দেরের দল হাঁকাহাঁকি করে ফিরে গেল। কেউ কেউ এক কথায়, কেউ গাল খেয়ে। ছেলেটাকে বুকে চেপে ধরে সে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

ছেলেটা প্রথমে বিন্দীর চেহারা দেখে তার কাছে আস্‌তে ভয় পেয়েছিল, কিন্তু তার পর থেকে, কি জানি কি ভেবে, ঠাণ্ডা হয়েছিল। এই-

বার বিন্দীর কোলের ভেতর থেকে মুখ বার করে বল্‌ল, . . . মা' কাছে যাব।

উঠে বসে, তাকে কোলে বসিয়ে বিন্দী বলল, . . . যেয়ো। ওরা খুব মেরেছিল, না? . . . কৈ দেখি?

শিশু মাথায় হাত দিয়ে বল্‌ল, . . . মেরেচে।

মাথায় চুমো খেয়ে হাত বুলোতে বুলোতে বিন্দী বলল . . . বাছা রে! . . . খিদে পেয়েছে মাণিক?

ছেলেটা ঘাড় কাৎ করে বল্‌ল, খাব। দুধ খাব না। জিলিপী খাব।

. . . জিলিপী? আচ্ছা' দিচ্চি এনে . . . কমলা লেবু খাবে?

আঙুল চুস্‌তে চুস্‌তে ছেলেটা বল্‌ল . . . হুঁ।

ঘরের কোণায় একটা কাগজের ঠোঙায় দুটো লেবু ছিল। এনে ছেলেটার দু-হাতে দুটো দিয়ে বিন্দী বলল, . . . খুলে দেব! দিই?

. . . হুঁ।

লেবুর খোসা ছাড়িয়ে দিতে দিতে বিন্দীর দুচোখ হঠাৎ জলে ভরে এল। একটু পরেই চোয়ালের উঁচু হাড়টা বেয়ে টস্‌ টস্‌ করে জলের ফোঁটা ছেলেটার হাতে এসে পড়ল।

ছেলেটা মাথা উঁচু করে দেখে, লেবু ভক্ষণে ক্ষান্ত হয়ে বল্‌ল, . . . ছিঃ . . কাঁদে না . . .

একটা অস্ফুট আওয়াজ করে, দু হাতে মুখ ঢেকে বিন্দী হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠ্‌ল।

ছেলেটি বিব্রত ভাবে তার দিকে তাকিয়ে কমলা লেবুতে মন দিল।

খানিক পরে চোখ মুছে বিন্দী উঠে বস্‌ল। তার মনে হ'ল একটু পরই ও খোকাকে পিসীর ওখানে দিয়ে আস্‌তে হবে। কি করবে ওরা ওকে নিয়ে! কিন্তু . . . পিসী যে বলেছিল যাদের ছেলে তাদের ফিরে দে' আস্‌বে . . . সত্যি? মনে ত হয় না . . . এত সহজে . . .!

আস্তানার দস্তুর বিন্দীর অজানা ছিল না। ছেলেটাকে হয় বেচে দেবে আর যদি রাখে, তবে হাত পা খোঁড়া করে দিয়ে তাকে রোজগেরে করে তুল্‌বে।

খানিক ভেবে চিন্তে সে বল্‌ল, . . . তোমার বাড়ী কোতা লক্ষীটি . . .

সে বল্‌ল...বাড়ী যাব।

...যাবেঁবৈ কি। কি রকম বাড়ী?......খুব বড়?

...এ—ত্তো বড়। লাল বাড়ী—

.....লাল রংয়ের বাড়ী? টেবাম্ গাড়ী যায় সাম্‌নে দিয়ে?

ট্রামের নাম শুনে খোকা উৎফুল্ল হয়ে উঠল।......টাম যায়, .রেল যায়··· আমি টামে চড়্‌ব... .

ট্রাম ও যায় রেলও যায় শুনে বিন্দীব একটু খটকা লাগ্‌ল। সে বল্‌ল, ...রেলে চড়্‌বে না? রেল গাড়ীতে?

খোকা বলল, . ধ্যেৎ তাতে বুঝি চড়া যায়। মাটী, কাদা, ময়লা থাকে...

বিন্দীব মনে রাস্তাটাব আঁচ আস্‌তে লাগল। সে জানত বাঞ্ছা বেশীর ভাগ সময়েই শেয়ালদার দিকে ফেরে। সে মনে মনে একটা মৎলব এঁচে বলল, ...খোকন মণি, ..তুমি বোসো একটু, আমি জিলিপী কিনে নে' আসি, কেমন? কেঁদোনা?

জিলিপীব নামে খোকা বল্‌ল...জিলিপী খাব। কান্‌ব না।

..আচ্ছা। বলে বিন্দী বেবিয়ে ঝাঁপ এঁটে দিয়ে আস্তানা থেকে বেরিয়ে পড়ল।

জিলিপী নিয়ে ফিরে আস্‌তে তার মনে হতে লাগ্‌ল, কি করা যায়। ওরা যাই করুক, খোকার অনিষ্টই করবে। নিজের কাছে রাখ্‌বার জন্যে তাব সমস্ত মন উতলা হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তাহলে ত খেঁদার হাত এড়ানো যাবে না। তবে......

খোকার কথায় যদ্দুর বোঝা গেল তাদের বাড়ী সারকুলার রোডে। কিন্তু কোন্ খানটায় ঠিক বোঝা গেল না। না যাক্‌...ছেলে হারিয়েচে, তারাও কিছু নিশ্চিন্ত হয়ে বসে নেই, এতক্ষণ সোর-গোল পড়ে গেচে। খোঁজ করলেই সন্ধান পাওয়া যাবে।

আস্তানায় ঢুকে মনে হল, এধার ওধার ঘুরে দেখে আসা ভালো, যদি কেউ দেখে।

রাত হয়ে গেচে। সমর্থ যারা, তারা রাতের রোজগারে বেরিয়েচে। খেঁদীর ঘরে সব চুপ চাপ,...মাগী বোধ হয় ঘুমুচ্ছে। এ ঘর সে ঘর থেকে মাঝে মাঝে দু একটা রুগ্নের গোঙানী, ও ছোট খাট ফিস্ ফাস্ শোনা যাচ্চে।

আস্তা প্রান্তের পূব দুয়ারী ঘরটা থেকে মত্‌নার মত্তজড়িত তর্জ্জন ও স্ত্রী কণ্ঠের অস্পষ্ট কোঁপানী ছাড়া আর বড় কিছু কানে আসচে না।

সন্ধের আগে কান্তর ঘরের খুন্-খুনে চাবাটা পটল তুলেছিল। লাসটা ঘরের সামনে পাঁকের মধ্যে টেনে ফেলে দেয়া হয়েছে, সময় বুঝে কাল যা হয় করা যাবে।

দেখে শুনে বিন্দী নিজের ঘরে ফিরছিল, হঠাৎ মানুষের গলার আওয়াজে আঁৎকে উঠ্‌ল।

... মাইরি, কে বাবা আঁদারে ঘুটঘুট করে বেড়াচ্চ ? কে—বিন্দী ?

... ওঃ! মড়া তুই!

নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে বাঞ্ছারাম আ-প্রাণ চেষ্টায় লম্বা সরু কল্কেটাতে দম কস্‌ছিল, বিন্দীকে দেখে বল্‌ল,...আয়, আয়,

বিন্দী বল্‌ল,...এখন না, কাজ আছে।

...রাত দুকুরে কি কাজ বাবা! আজ কদ্দিন মাইরি যাইনি তোর কাছে...

...সে কিরে ড্যাক্‌রা,...এই না পরশুই ভোররাত কাটিয়ে এলি ?

...সত্যি ভুল হয়ে গেচে মাইরি! তা আজকে...বলে বাঞ্ছা একটা ইঙ্গিত করল।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বিন্দী বলল,...ইয়ার্কি রাখ্‌, নইলে....

...কি বাবা! সম্মোভাব কদ্দিন থেকে ?

...যদ্দিন থেকেই হোক্‌, তোর তা দিয়ে কাজ। বলে বিন্দী ঘরের দিকে চলল।

বাঞ্ছা পেছন থেকে হাঁক দিল,...বিন্দী, ছোঁড়াটা কোতা রা ?

.. পিসীর ঘরে। ঘুমুচ্চে।

... ক'টার ঘন্টি শুনেচিস গীর্জ্জের ঘড়ীতে ?

... খানিক আগে বারোটা বাজ্‌ল!

... ওঃ তবে একনো বহুৎ টাইম্ আচে। বলে কল্কেটা উপুড় করে রেখে, বাঞ্ছারাম সেই খেনেই হাতে মাথা রেখে কাৎ হয়ে পড়্‌ল।

বিন্দী ঘরের কাছে এসে দেখ্‌লো, কে একটা মিন্‌সে মস্ত লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে। বিন্দী বল্‌ল, কে রে ?

ভাঙা বাংলায় লোকটা বলল, একটা পান খেতে দিবি না ? অনেক দিন আসতে পারি নি তোর কাছে...বিন্দী মুখ বাঁকিয়ে বল্‌ল, আজ বড্ড পেটে ব্যথা জমাদার সায়েব, আজ পারব না...জমাদার সোরগোলের ভয়ে সরে পড়্‌ল।

ঘণ্টা খানেক পর, খেঁদী আর বাঞ্ছা এসে বিন্দীর ঘরের সামনে দাঁড়াল।

খেঁদী কর্কশ চাপা গলায় ডাক্‌ল,...বিন্দী,...ওলো দাঁতী! মর্ মাগী,. ঘুমোলি নাকি?

... নিশ্চয় আয়েস করে ছোঁড়াটাকে নিয়ে গড়ানো হচ্চে! ঢং দেকে আর বাঁচিনে! যত অনাছিষ্টি...

বাঙ্গা ঝাঁপে ধাক্কা দিয়ে হুমকে উঠ্‌ল...ওঠ্ শালী!

ধাক্কার চোটে ঝাঁপটা খুলে গেল।

খেঁদী বলল,...য ত বাঙ্গা, নে' আয় মাগির চুলের মুটি ধরে।

আঁধার ঘরে ঢুকে, হাৎড়ে হাৎড়ে খানিক ঘুরে বাঙ্গা বলল,

... ঘর খালি 'পসী, কেউ নেই।

... অ্যাঁ, সে কিরে! বলে খেঁদীও গিয়ে ঘরে উঠ্‌ল।

স'ত্যি ঘর খালি। জিনিষ পত্তর যা ছিল ঠিক্ আচে। মানুষ কটি নেই।

বাঙ্গা রুদ্ধকণ্ঠে বল্‌ল,...গেল কোতা তা হলে! এই ত খানিক আগে দেকনু কোত্থেকে এসে ঘরে ঢুক্‌ল। ডাক্‌নু, বল্‌লে কাজ আচে। ছোঁড়াটার কথা সুধোতে বল্‌লে, তোর কাচে, ঘুমোচ্চে!

...কি বল্‌লে? আমার কাচে?

...হ্যাঁ।

...সেই যে নে' এল, তা'পর ত আমার ছায়াও মাড়ায় নি মাগী। যত নষ্টামি...নিশ্চয় ভেগেচে ওকে নে',

...ভাগ্‌বে কোতা? আর ক্যানেই বা ভাগ্‌বে? ছোঁড়াটার গায়ে ত আর কিছু ছেল না!

...তা না থাক্! মাগীর রকম সকম একটুও ভালো ঠেক্‌চে না আমার! কি ফ্যাসাদেই যে পড়নু...

...ফ্যাসাদ না কচু! কিন্তু...ছোঁড়াটা নেহাৎই যে বাচ্চা! পিরীত ফিরীতের...

...গাঁজার দমটা চড়েছে বুঝি? যা তা বকিস্ নি, এখন কি কর্‌বি, তাই ভাব্।

...করা আবার কি! এ তল্লাটে যদি খোঁজ মেলে, ত দেকে আসি!

...ভাব্...আমার কিন্তু বাপু রকম সকম সুবিধের ঠেক্‌চে না!

.. তখুনি বলেছিলুম তোকে, তা তুই ত আমার কতা শুন্‌বিনে! তখন না ছেড়ে দিলেই হোতো!

পরদিন তুপুরে বাঞ্ছা এসে খবর দিল, ...শুনেছিস্ পিসী কাণ্ডটা! দাতী মাগী ছোঁড়াটাকে নে' ফেরৎ দিতে গেছল তাদের বাড়ীতে,...তারা তাকে পুলিসে দিয়েচে...

থেঁদী কপালে চোখ তুলে বল্‌লে...উপায়! এইবারে ত দলশুদ্ধ ফাঁসাবে...

বাঞ্ছা একগাল হেসে বলল কচু! তু' ঘাব্‌ড়াসনি পিসী, মাগী বোকার হদ্দ আমি খবর নে' এনু, ও দলের কত্তা কিছুই ফাঁস করেনি। বলেচে ছোঁড়াটাকে পথে কান্‌তে দেকে ও কোলে নে' বাড়ী পৌঁচে দিতে গেছ্‌ল! তারা তা মান্‌বে কেন! ওদের বাড়ীর ঝি-টা বল্‌লে হার চুরীর জন্তে মাগীর জেল হবে! বলে আর একবার হুল্লোড় করে বাঞ্ছারাম হেসে উঠ্‌ল।



খাসিয়াদের শারদোৎসব

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(আরম্ভের পালা)

[ধান খেতে শরতের হাওয়া লাগে, বনের শিয়রে চাঁদ দেখা দেয়, ঘাটে মাঠে চাঁদনী বিছিয়ে পড়ে—পরব লাগে গাঁয়ে আর খাসিয়া পাহাড়ের কাছাকাছি। এ গাঁয়ের পুরুষ সে-গাঁয়ের মেয়েরা দলে দলে সাজে—ফুলের বাহার দেয় কালো চুলে, নতুন কাপড় পরে—পুরুষরা নেয় হাতে বাঁশি, মেয়েরা পরে শাঁখা কলী। বেলা থাকতে মাদোল ডাক দেয়—মস্ত তেঁতুল গাছের তলায় নাচের আসরে যুবক যুবতী তাদের। একটি মাদোল একটি বাঁশি, একটি দল মেয়ে একদল পুরুষ নাচ সুরু করে গেয়ে গেয়ে—কখন বলে বাঁশি, কখন কয় মাদোল, কখন বা গায় মেয়েরা, কখন পুরুষ দুই দলে মুখোমুখি হয়ে—]

(পুরুষ)

রঙে বাড়লে!
চিকন্ চিকন
নতুন ধানের
সঙ্গে বাড়লে!
রাতারাতি
চাঁদের কোনায়
ছন্দে বাড়িলে—
রূপে বাড়িলে!

(মাদোল)

দিনকে দিনে
দিনে দিনে

(বাঁশি)

ঘরের পাশে
পিপুল চারায়
ছাঁয়ে বাড়িলে!

(সকলে)

দেখ্‌তে শোভা
মনোলোভা
সরু ধানের
চিকণ চাউল
দিচ্ছে আভা
চাঁদ ঝলিছে
বাইরে ঘরে!

[মেয়েরা নেচে নেচে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে, পুরুষেরা গায়—]

(পুরুষ)

মরি মরি!
রাতের দেশা
রাতারাতি
গড়তেছিল
এই পুত্তলী!

(বাঁশি)

আসতে দিনা—
আকুল গায়ে
জড়িয়ে দিল
নীলাম্বরা

(মাদোল)

তাড়াতাড়ি!

(পুরুষ)

ঘুম ঘোরে না
ভুল করে বা
রং ধরালো
এমন নীল
রাতের নীলি!

(উভয়ে)

কাজল নীলি,
উজল নীলি!

[পুরুষেরা এগোয় তো মেয়েরা পিছোয়, মেয়েরা এগোয় তো পুরুষরা পিছোয়।]

(মেয়েরা)

না জানি নীল পাহাড়ে
কোন্ সে বনে
কেমন তরো
ফল ধরেছে
কোন্ বা গাছে!

(পুরুষ)

না জানি নদীর চরে
বালীর তলায়
কেমন দানা
কোনখানেতে
কিবা আছে!

(মাদোল ও বাঁশি)

ভালো মন্দ কালো সুন্দর
মিঠা তীতা ফল ধরেছে
জল চলেছে রকম্ রকম্।

[নদী-পারের মেয়ে ঝরণাতলার পুরুষ দুজনে দুজনের পরিচয় নিতে চলে]

(বাঁশি)

কও তো মিষ্টি কথা

(পুরুষ)

পাহাড়তলির এ কোন্ গাঁয়ের
মিষ্টি কথা কও

(মেয়েরা)

জানিয়ে দিয়ে যাও
কমনে তুমি রও
মহুয়া লতার কাজলা পাখি
মিষ্টি কথাকও!

(মাদোল)

কমনে তুমি রও

(পুরুষ)

কোথায় এমন পাও
মিষ্টি বুলি !
জানতে যদি পাই—
তোমার দেশের ঐ
মিষ্টি কথা
শিখতে চলে যাই।

(বাঁশি)

বলতো একটি কথা –

(মাদোল)

মনের মতন

(মেয়েরা)

বনের টীয়া—
কাজলা পাখি
চলতেছে উড়ে
মাঠে মাঠে
ধানের ঝারি
আনতেছে তুলে

(বাঁশি)

রাঙ্গা ঠোঁটে
চুরি করে।

(পুরুষ)

মানস করি
ডানা মেলে
অমনি করে
উড়ে পড়ি

তোমার পাশে
এই বাতাসে,
উড়িয়ে চলি,
ধানের ঝারি
নতুন নতুন !

[পুরুষ কাছে আস্‌তে চায় মেয়েরা ঘুরে ঘুরে চলে আর বলে—]

(মেয়েরা)

আমার ছাওয়া আমার আগে
তোমার ছাওয়া তোমার পাছে

(মাদোল)

এমনি করেই চলতে আছে
মিলতে মানা কাছে কাছে !

[পুরুষ মিনতি জানায় মেয়ে মিনতি মানায়—]

(পুরুষ)

ছাওয়া আমার
ধূলায় পড়ে
ছাওয়া তোমার
পায়ে ধরে

(মেয়েরা)

মিলতে মানা
কাছে কাছে
ছাওয়ায় ছাওয়ায়
পাশে পাশে।

(পুরুষ)

হাটের বাটে
ফিরে ছাওয়া
নদীর জলে
ডোবে ছাওয়া।

(বাঁশি)

যায় যায় ফিরে চায়

পায় পায় ফিরে যায় —

দূরে

[যেতে যেতে দুজনের কাছে দুজনে ফেরে গান গেয়ে দুঃখ জানায়—]

(মেয়েরা)

নতুন কলস

নয়ন জলে

ভরে নিলেম !

(পুরুষ)

ময়না কাঁটার

মালা বুকে

ঝুলিয়ে গেলেম !

(বাঁশি)

রাতের কোকিল

পালিয়ে চলে

রাত থাকিতে

সকলে

আমাদেরও চলতে হল

(মাদোল)

ধান কাটিতে

চাল ঝাড়িতে !

(পুরুষ)

মরি মরি

মনের খেদে

চাঁদ্নি রাতে

কেঁদে মরি !

(মেয়েরা)

মউনি লতার

ফাঁস পড়িল

মনের ব্যথা

কইতে হারি !

[মাদোল বাজিয়ে পুরুষ মেয়েদের ঘিরে ঘিরে নাচে আর বলে—]

(পুরুষ)

চলনা ?

পালিয়ে চলি

হাতে হাতে

সাথে সাথে

একলা বাটে

একলা চলি ?

[মেয়েরা বাঁশির সঙ্গে গায় আর বলে]

(মেয়েরা)

সরষে ক্ষেতের

পাতায় পাতায়

পায়ের চিহ্ন

রাখবে ধরে !

নদী পারের

ভিজে কাদায়

চলার চিহ্ন

রবেই পড়ে

লুকিয়ে যাবো

কেমন করে ?

(পুরুষ)

যদি যাও একলা রেখে

মরিব !

(মেয়েরা)

মরিব মুখ না দেখে।

[দুই দলে আবার মুখোমুখি হয়—মাদোল বাজে বাঁশি বাজে—এতে ওতে মিলন ঘটিয়ে]

(পুরুষ)

দেখি দেখি
এল নাকি
মোনাল পাখি।
মনের বনে
বাসা নিল কি?

(মেয়েরা)

বন লতার
মোনাল পাখি!

[ভোরের বাতাস জানায় সকাল এল বলে, বাঁশি সুর ধরে করুণ—]

(বাঁশি)

চোখের পাতা
কাঁপছে যেন
বাঁশ পাতাটি
ধীর সমীরে।
মাদার ফুলের
রং লেগেছে
হাসি মুখের
হাসির তীরে
নীল আকাশে
ঢেউ দিয়েছে
রাতারাতি!

খাসিয়াদের শারদোৎসব

(শেষের পালা)

[মেলা মেশা মিতায় মিতায়, চেনা অচেনায়, বেড়ানো সখীতে সখীতে, সখাতে সখীতে চারি রাতের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল, সুখের হাট ভাংলো। যে যার তার কাছে—বিদায় নিচ্ছে—মাদোল গুমরে কাঁদে, বাঁশি নিশ্বাস ফেলে, এ ওর মুখ চায় আর বলে—]

(সকলে)

যাই যাই আসি আসি
পরব হল শেষ

(মেয়েরা)

শুকনা নদীর
পারে চাল

(পুরুষ)

গিরি মাটির দেশ।

(মাদোল)

আপন আপন
ঘরে ঘরে
আপন গাঁয়ের
আপন জনা
পথ চাহিছে
দিন গণিছে—

(সকলে)

মনে আসে
সেই ভাবনা!

(বাঁশি)

বাড়ছে বেলা
তাই উতলা
মন বলে,—যা,
যা না চলে
পাহাড় তলে
নদী পারে
আপন আপন
মাটির ঘরে।

[একে ছেড়ে ও যেতে চায় না, পথ ভুল হয়ে যায়, নদী পারের মেয়ে সে পাহাড়ের পথে এগিয়ে যায়, ঝরণা তলায় পুরুষ নদীর পারে পারে চলে সকালের রোদে। হঠাৎ ভুল ভাঙ্গে চমকে বলে—]

(মেয়েরা)

ছাঁওয়া আমার
আগ্ বাড়িল
পাহাড় দেশে
দৌড়ে চলে
ছাওয়া আমার
সাঁতার দিল
একুল ওকুল
নদী জলে

[দূরের পথ, বেলা বাড়ে, মেয়েরা বলে পুরুষদের ডেকে যাবার বেলা—]

(মেয়েরা)

দু মুঠো মুড়কি
খেয়ে যাও
দু মুঠো মুঠি—
—খিলি খাও!

(পুরুষ)

লাগ্ছে বাসি
সব যে লাগ্ছে বাসি!
বল্ছে বাঁশি
যাও যাও!

[বাঁশি যত বলে যাও যাও—সাজা আর শেষ হয় না মেয়েদের—কথা আর ফুরোয় না পুরুষদের।]

(মেয়েরা)

চিকণ্ ধানের কড়ি
বিনিয়ে খোঁপায় পরি

(পুরুষ)

নতুন বাঁশের বাঁশি
বাজিয়ে নিয়ে চলি

(মাদোল)

টাট্‌কা নদীর মাছ
শিকে গেঁথে ধরি

(সারি দেয় সবাই পথের উপর, মাদোল বাজে—]

(মাদোল)

আগে চলেন
ধানের ঝাঁপি
পিছে চলেন
পানের ভারা
মাছের ভারা!

গোছা গোছা
চিকণ্ ধানের
নতুন ধানের
নদীর মাছের
যার পসরা !

(মেয়েরা)

বেছে বেছে চিকণ চাউল
লহর গাঁথি ঠাসা ঠাসা
জামার পাড়ে সিঁইয়ে পরি
ধানের ছড়ি
থাসা থাসা ।

(মাদোল)

মাছের ছবি
ভাসা ভাসা ।

(মেয়েরা)

পরি খোঁপায় ধরি সিঁতায়
ধানের ঝারি ।

(পুরুষ)

হাতে হাতে
ধানের ছড়ি ।

(মাদোল)

নতুন ধানের ঝুরি
টাট্‌কা মাছের নুড়ি ।

(যে যার সেজে গুজে নিতে আর বিদায় হতেই ব্যস্ত, মাদোলের কথায় কানই দেয়না, মাদোল ডেকেই চলে রেগে—)

(মাদোল)

বেতের ঝাঁপি ধানে ভরে' দিই
মাছের মুড়ো দুই হাতে নিই ।

(শরতের সোনার আলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে মাঠে ঘাটে ছড়িয়ে পড়ে মেয়ে পুরুষ আলোর মাঝে পাশাপাশি নাচে আর গায় এ ওর দিকে হাত নেড়ে—)

(পুরুষ)

সাজে সাজে
ভালো সাজে
আলো দে'য়া
সোনার সাজে

(মেয়েরা)

লাগে লাগে
মীঠা লাগে
মুখের কথা
যাবার আগে ।

(পুরুষ)

হাতে হাতে ধরা ধরি
একটু নেবো সাথে করি !

(মেয়েরা)

কানে কানে চুপি চুপি
যাব দুটো কথা বলি !

(বাঁশিতে সকালের সুরে বাজে—
পরব শেষ, পরব শেষ—)

(সকলে)

ফিরে যাই ফিরে যাই
ফিরে ফিরে দেখে যাই
মুখ ফেরাই হাত বাড়াই
ডেকে ডেকে
চলে যাই।

(বাঁশি)

বাঁশি কয় পরব শেষ
যেতে হয় আপন দেশ
কয় বাঁশি উদাসী
লাগে যে সব বাসি।
আসি আসি
যাই যাই।

(এই গীতটির মূল এবং ইংরাজী তর্জ্জমা নিম্নলিখিত পুস্তকে ছাপা হইয়াছে 'The Garos' by Major A Play Fair I. A. আমার এই অনুবাদ ইংরাজী হইতে কতটা ভিন্ন এবং মূল গানের সঙ্গে কতটা এক তা' উক্ত বই হইতে ধরা পড়িবে।)



ঘোড় বাজো

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

ঘাটের সঙ্গে গঙ্গাযাত্রীদের আশ্রয় নির্ম্মাণ করা বোধহয় তখনকার প্রথা ছিল। তাই তখনকার কোন ধার্ম্মিক জমিদার এই বাঁধান ঘাটটিও তার সঙ্গে গঙ্গাযাত্রীদের সুবিধার জন্য দুটি গৃহ নির্ম্মাণ করে পুণ্যসঞ্চয় করেছিলেন।

এখন সে জমিদার বংশের অবনতি ঘটেছে। সেই জমিদারেরই এক অভাব-গ্রস্ত প্রপৌত্র সেই ঘর দুটিই ভাড়া দিয়ে পুণ্যের চেয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেন। ভাড়া অবশ্য সামান্যই। কারণ সংস্কার অভাবে দুটি ঘরেরই জীর্ণদশা; গা-ময় ঘুঁটের প্রলেপ। একটিতে এক পক্ষীরাজের বংশাবতংস একাকী সগৌরবে বাস করেন, অপরটিতে থাকে তাঁর যান, আর তিনটি ছাগল, চারটি ছোট বড় ও মাঝারী কুকুর, একটি বিড়াল, একটি তিতির পাখি, একটি পুরুষ ও একটি নারী।

পুরুষটি একাধারে পক্ষীরাজের বংশধরের সেবক রক্ষক ও চালক—একদিন আধদিনের নয় গত পোনেরো বছরের—। মালিক বদল হয়েছে বটে ঘোড়ার কিন্তু সেবকের পদে এ পর্য্যন্ত আর কেউ প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ঘোড়াও মানুষ পাশাপাশি জীবনের পথে বার্দ্ধক্যে এসে পৌঁছেচে।

ঘোড়ার নাম কেউ রাখে নি কখনও বোধ হয়—সহিসের নাম ঘর্মণ্ড। সে নামকরণ সে বোধ হয় নিজেই করেছিল। আরা জেলার অখ্যাত কোন গাঁ থেকে একদিন শৈশবে বর্ষার বাঁধ ভাঙ্গা সোন্ নদীর বন্যায় তাকে বাপ মা, আত্মীয় স্বজন আশ্রয় সমস্ত আপদ বালাই থেকে একেবারে মুক্ত করে কৌতূহলহীন সংসারের মাঝে ভাসিয়ে এনে ফেলেছিল। তার পর বিশ বৎসর সেই বন্যার নেশা তার কাটে নি; সংসারের আনাচে কানাচে গলিতে ঘুঁজিতে সে কোন লক্ষ্যহীন স্রোতের খামখেয়ালিতে অসহায়ভাবে ভেসে ফিরেছে; অপ্রত্যাশিত ভাবে আছাড় খেয়েছে, অযাচিত ভাবে আশ্রয় পেয়েছে, আবার অকারণে বিতাড়িত হয়েছে।

ত্রিশ বছর বয়সে স্থায়ী আশ্রয় সে পেল, পেল ওই ঘোড়াটির অনুগ্রহে, ওই গঙ্গাযাত্রীদের সাবেক চটিতে।

ঘোড়াটির তখন প্রথম যৌবন। মাথা একটু সহজেই গরম হয়ে উঠে। একদিন কি হঠাৎ খেয়ালে চাট্ ছুড়ে সহিস বেচারীকে ঘাল করে গাড়ী উল্টে, ক্ষেপে দৌড় দিলে। জনাকীর্ণ রাস্তায় এক তুমুল কাণ্ড বাধল। ক্ষেপা ঘোড়াকে থামান যায় না; সোজা রাস্তায় বহুদূর দৌড়ে বাধা পেয়ে একটু থামে, আবার ফিরে বিপরীত দিকে দৌড় দেয়। রাস্তার লোক চলাচল একরকম বন্ধ হয়ে গেল। একটি বৃদ্ধার ঘোড়ার ধাক্কায় খোয়ার ওপর পড়ে গিয়ে মাথা ফাটল। দুচারজন অল্প স্বল্প আহত হ'ল। এই রকম দৌড়ের মাঝে হঠাৎ এক মোড়ের মাথায় গরুর গাড়িতে বাধা পেয়ে ঘোড়াটি ক্ষণেকের জন্যে থামল।

ঘমণ্ডির কিছুদিন থেকে কাজকর্ম্ম ছিল না। সারাদিন চার পয়সার চানা চিবিয়ে, খইনি টিপে ঘুরে বেড়াত। সে কাছেই কোথায় ছিল। দিনকতক এর পূর্ব্বে কোথায় কোচোয়ানী করায় এই জাতির অভিজ্ঞতাও তার ছিল। সে হঠাৎ সাহস করে সামনে এসে লাগামটা ধরে ফেল্লে।

সে লাগাম সে এ পর্য্যন্ত আর কাউকে ধরতে দেয়নি। খোঁজ করে যখন মালিককে ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে এলো তখন মালিক তাকেই অস্থায়ীভাবে সহিসের পদে বাহাল করতে চাইলেন। সে রাজী হ'ল। সাবেক সহিসের পাঁজরায় দুটো হাড় ভেঙ্গে গেছল—তাকে হাসপাতালে পাঠান হয়েছিল। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেও সে সহিসত্বের দাবী নিয়ে কোন দিন গোল করেনি, তবে ঘমণ্ডিকে এই দুঃসাহসের নোক্‌রী ছেড়ে দেবার জন্য বিস্তর সদুপদেশ দিয়েছিল। ঘমণ্ডি তা খেয়াল না করায় যাবার সময় চুপি চুপি ঘমণ্ডির কানে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ছাড়তে পেড়াপিড়ি করার আসল কারণটি সে বল্লে, তার পর চোখদুটো পাকিয়ে ঘাড় বাকিয়ে ঘমণ্ডি এই মোক্ষম সংবাদটির ওপর কি বলে শোনবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

ঘমণ্ডি তাচ্ছিল্য ভরে মুখ বেঁকিয়ে বল্লে, "ঝুট্‌বাত্!"

ঝুট্‌বাত্! সে নিজের চক্ষে দেখেছে—ঝুট্‌বাত্! ভূতপূর্ব্ব সহিস আরো বোঝাতে চেষ্টা করে—এ ঘরে কত লোক মরে গেছে তাদের ভূতগুলো যাবে কোথায়!

আর সে যে স্বচক্ষে রাত্তির বেলায় দেখেছে এই ঘোড়া প্রকাণ্ড একটা জীন্ হয়ে ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। আর তার পাঁজরাই বা ভাঙ্গল কেন! ঘোড়াভূত তার লুকিয়ে-দেখা টের পেয়েছিল বলেই না!

ঘমণ্ডি জানালে সে তাহলে ঘোড়া ভূত না দেখে এখান থেকে নড়বে না! তার ভূত দেখবার ভারি ইচ্ছা!

এই অন্যায় আবদারে আগেকার সহিস অত্যন্ত চটে গিয়ে পোঁটলাপুঁটলি তুলে নিয়ে চলে যেতে যেতে জানিয়ে গেল—এই বেয়াড়াপণার জন্যে ঘমণ্ডিকে পস্তাতে হবে। ভূতের সাথে ছেলেখেলা!

ঘমণ্ডিকে পস্তাতে হয় নি বোধ হয়। তার পর পোনেরো বছর কেটেছে।

······ঘোড়াটি সামনের বাঁ পা তুলে বাতাস আঁচড়াবার ভঙ্গি করে। ঘমণ্ডি বলে "এ বুঢ়ুয়া! তোহার ভুখ্ লাগল হো।"

বুঢ়ুয়া কান দুটি নেড়ে গলাটি বাড়িয়ে দেয়। তারা পরস্পরের নাড়ী নক্ষত্র জানে।

ঘোড়া ও মানুষ একত্র হল; এবার এল কুকুর। পোনেরো বছর আগে একদিন শীতের সমস্ত দীর্ঘ রাতটি ঘমণ্ডি জেগে কাটালে। সমস্ত রাত ধরে নিকটে কোথায় কটা সদ্যোজাত কুকুর-ছানা এমন বিকট কান্না কেঁদেছে যে ঘুমোয় কার সাধ্য। সকালবেলা খোঁজ করতে দেখা গেল পথের একটা বেওয়ারিশ 'লেড়ি কুত্তা' স্থানাভাবে এই দারুণ শীতে ঘাটের সিঁড়ির ওপরই প্রসব করে মারা পড়েছে। দুটো তুলোর পুঁটলির মত নরম আকারহীন মাংসের ডেলা, তখনও সেই শীর্ণ রোঁ-ওঠা কঙ্কালসার কুক্কুরীটির মৃতদেহের ওপর পড়ে মাই গুলো নিয়ে টানাটানি করছিল ও মাঝে মাঝে অসহায় ভাবে ক্ষীণ শব্দে কি প্রকাশ করছিল কে জানে। আর দুটি মাংসের ডেলা সমস্ত রাত উত্তাপের জন্যে কাৎরে তখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে একেবারে।

ঘমণ্ডি জীবিত বাচ্চা দুটোকে ঘরে এনে আশ্রয় দিলে। অনেক আদর যত্ন সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত একটিই বাঁচল, অপরটিকে কোন রকমে রাখা গেল না। ঘমণ্ডির সংসারে একটি প্রাণী বাড়ল।

······কুকুর বাচ্চাটি নড়বড়ে পায়ে ভর করে টল্‌তে টল্‌তে সমস্ত ঘর দোর তদারক করে বেড়ায়, থালাটাকে একবার শোঁকে, ঘোড়ার সাজ গুলো একটু চেটে দেখে, দুটি ঘরের মাঝখানের দরজায় দাঁড়িয়ে—তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ঘোড়াটিকে পর্য্যবেক্ষণ করে সংক্ষিপ্ত ভাষায় নিজের অনন্মুমোদন ব্যক্ত করে।

ঘোড়াটি একবার ঘাড় বাঁকিয়ে সন্দিগ্ধ ভাবে তার ওপর চোখ বুলিয়ে নেয়, তারপর এই নগণ্য সমালোচনা উপেক্ষা করে প্রশান্ত মনে পা ঠোকে, লেজ দুলিয়ে মাছি তাড়ায় ও নাসিকাধ্বনি করে।

এই নাকের শব্দে আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে, কুকুর বাচ্চা কট তর ভাষা প্রয়োগ করে।

একদিন এই থেকে একটু বিপদ ঘটল। নিছক গালাগালিতে কোন ফল না পেয়ে কুকুর বাচ্চা একটু মাত্রাতিরিক্ত ভাবে অগ্রসর হয়ে সেদিন ঘোড়ার ডান পায়ের ওপর আপনার দাঁতের শক্তি পরীক্ষা করে বসলে।

ঘমণ্ডি উনুন ধরাচ্ছিল, হঠাৎ আকাশ-ফাটা আর্ত্তনাদে চমকে উঠে ছুটে গিয়ে দেখে বীর কুকুর-কুমার চিৎ হয়ে পড়ে প্রাণপণে চীৎকার করছে এবং ঘোড়াটি বিস্মিত হয়ে ঘাড় নামিয়ে এই ক্ষুদ্র বেয়াদবটির সর্ব্বাঙ্গ শুঁকে দেখছে। নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনা সত্বেও কিছুক্ষণ কুকুর বাচ্চার ভয়ার্ত্ত চীৎকার থামল না এবং কয়েক দিন সে দরজার চৌকাট পর্য্যন্ত মাড়াল না।

তারপর বোঝাপড়া অবশ্য হয়েছিল। একদিন দেখা গেল সে বেশ নির্ভয়ে ঘোড়ার পায়ের ফাঁকে খেলে বেড়াচ্ছে।

বয়সের সঙ্গে সাহস বাড়ল। রাস্তায় অপরূপ বেশে কাবুলিওয়ালাকে যেতে দেখে একদিন সাজ পোষাকের অশোভনতা সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলে। ফিরে ল্যাজ নেড়ে ঘমণ্ডি অনুমোদন করল কিনা তাও একবার দেখে নিলে। একদিন ভাল্লুক সমেত এক বাজীকরকে অন্যান্য সহযোগীর সঙ্গে বহুদূর পর্য্যন্ত ধাওয়াও করে এল। সে এক স্মরণীয় দিন। কাপুরুষ ভাল্লুক পালিয়ে ত গেলই, একবার ফিরে তাকাতেও সাহস করলে না। ঘমণ্ডিকে সেই বীরত্ব কাহিনী কণ্ঠ ও ল্যাজের সাহায্যে সে অনেক করে বুঝিয়ে দিলে। ঘমণ্ডি বুঝল কিনা বলা যায় না। কিন্তু বুঝলেও এ বীরত্বের যথোচিত মর্য্যাদা সে যে দেয়নি এটা ঠিক—। প্রতিদিনের মতই সে উচ্ছিষ্ট ভাত কটা থালায় রেখে ডাকলে—"লে দুখিয়া।"

দুখিয়া প্রতিদিনের মত ত্রস্ত হয়ে ছুটে গেল না। গোটাকতক ইঁদুর ঘরে বড় উপদ্রব করত। এ পর্য্যন্ত বহুবার তাদের সম্মুখ-সমরে আহ্বান করেও দুখিয়া কিছু করে উঠতে পারে নি। অসভ্য ইঁদুর গুলো দেখা দিয়েই ঘরের কোণের গর্ত্তে গিয়ে ভীরুর মত আশ্রয় নেয়। আজ ঘমণ্ডির এই আবেগহীন অভ্যর্থনায় অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে সেই মুষিকদের সদর দ্বারে দাঁড়িয়ে তাদের গর্ত্ত আঁচড়ে সে হঠাৎ ভয়ানক হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি আস্ফালন সুরু করে দিলে। আজ সে একটা রক্তারক্তি করবেই।

অন্ধ ঘমণ্ডি! সে ভ্রূক্ষেপ না করে ঘোড়ার গা ডলতে গেল। অগত্যা আস্ফালন ত্যাগ করে খেতেই আসতে হ'ল।

তারপর কিছুদিন বাদে ঘমণ্ডির ঘরের সামনের রাস্তায় ডুখিয়ার পাণি-প্রার্থীদের সমাগম হতে সুরু হল। এবং সেই প্রণয়ীদের দ্বন্দ্ব কলহে আস্ফালনে রাস্তা সরগরম হয়ে উঠ্‌ল। ডুখিয়ার নাগাল পাওয়া এখন ভার! নারীর ছলা কলা কৌশল তার পুরোদস্তুর আয়ত্ত।

কয়েক মাস পরে ঘোড়ার ঘরের একটি নিরাপদ কোণে ঘাসের বস্তার ওপর আবার কটি তুলোর পুঁটলির মত বাচ্চা দেখা গেল।

ঘমণ্ডির ঘরে এখন সেই ডুখিয়ারই দৌহিত্র দৌহিত্রীরা ঘুরে বেড়ায়।

সকাল বেলা রাস্তার ধারের দরজায় একটা মোটা লোমের কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে ঘমণ্ডি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দাঁতন করছিল। ছেঁড়া চট্ গায়ে বেশ করে জড়িয়ে অনিচ্ছুক ছাগলীটাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে দুলারী এসে দাঁড়াল।

"ডুখিয়াকে ত দু'রোজ ন দেখলু হম্; কাঁহা গইল বা?"

রোজ রোজ এই গায়ে-পড়ে আলাপ করা ঘমণ্ডির পছন্দ হয় না। আজ সে দাঁতন করবার ছুতোয় মুখ বুজে রইল। দুলারী অনিমন্ত্রিত হয়েই ধুপ্ করে মাটিতে বসে পড়ল, তারপর ছাগলের দড়িটা পায়ের সঙ্গে বেঁধে জানালে,—এমন শীত সে কখন দেখেনি। বাবুদের রকে শুয়ে মাঝ রাতে মনে হয় হাড়ের ভেতর পর্য্যন্ত হিম হয়ে গেছে।

দাঁতন আর কতক্ষণ ধরে করা যায়! ঘমণ্ডি দাঁতনের ছিবড়েগুলো থুতুর সঙ্গে ফেলে বল্লে,—বুড়ো হলে অমন শীত একটু বেশী লাগে।

—বুড়ো আমি বুড়ো?—ঘরের ভেতর গরমে শুয়ে অমন সবাই বলতে পারে; হুঁ ওখানে শুক্ ত দেখি কে কত বড় জোয়ান।

ঘমণ্ডি সকৌতুকে এই আধাবয়সী স্থূলকায় মেয়েমানুষটির যুবতী থাকবার ইচ্ছা লক্ষ্য করে বল্লে,—আমিত বুড়োই হয়েছি তুইও ত তাহলে বুড়ী।

এবার যে কারণেই হোক্ কথাটা দুলারীর অপ্রিয় হ'লনা। হাস্যের বেগে স্থূল শিথিল উদরের ভাঁজগুলি পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে প্রায় লুটোপুটি খেয়ে দু তিনবার আবৃত্তি করলে,—"বুঢ্‌ঢা আউর বুঢ্‌ঢি।" তারপর আবার হাসি।

এই অহৈতুক উচ্ছ্বাসে হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠে পড়ে ঘমণ্ডি কঠিন স্বরে বল্লে, "রূপয়াঠো মিলি কি না?"

হাসি থামিয়ে উঠে শনচট্‌গুলো ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে অনিচ্ছুক ছাগলীটাকে একটা হেঁচকা দিয়ে দুলারী মুখ ভার করে বল্লে,—

—টাকা! টাকা! রোজ রোজ তাগাদা! টাকা যেন আমি দেবনা!

বলছি এই ছাগলের দুধের টাকা, বাবুদের বাড়ির মাইনের টাকা সব এক সঙ্গে পেলে দেব। এ মাস কাবার হোক্ আগে!" তারপর ছাগলীটাকে আর একটা হেঁচ্‌কা দিয়ে বল্লে, "উঠ্ বেটী!"

ঘমণ্ডি লোটা থেকে জল নিয়ে একটা কুলকুচো করে বল্লে, ও হুজুর এই দুমাস ধরে শুনছি; এবার যেন টাকা না নিয়ে এখানে আসা না হয়।

কিন্তু দুলারী তবু আসে, এবং টাকার কথাটা অবশ্য তার স্মরণ থাকে না। এসে দুখিয়ার বাচ্চাগুলোকে কোলে করে নাচিয়ে আদর করে। কোনদিন বা ঘমণ্ডির খাওয়া দাওয়া শেষ হলে যেচে বলে "তু রখ্ দে। বর্ত্তন হম্ মলি।" ঘমণ্ডি বেশী কথা কয় না—সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে একবার চায় তারপর বাসনকোসনগুলো ফেলেই রাখে। সন্ধ্যার সময় এসে ঘমণ্ডির হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে টান্ দিতে দিতে দুলারী বলে,—বক্‌রীটার আবার শীগ্‌গীর ছানা হবে, বাবুদের বাড়ির চাক্‌রীও বেশ সুখের, তার অভাব কিসের? এত বাচ্চা নেই যে খাওয়াতে হবে। গতর আছে রোজকার করে খাসা সুখে সে আছে।

ঘমণ্ডিকে সম্প্রতি তার এক দোস্ত দেশে ফিরে যাবার সময় একটি তিতির পাখী বেচে গেছে। ঘমণ্ডি খাঁচাটা নামিয়ে অন্য মনে শিষ্ দেয়। এ সব কথা যেন তাকে বলা হচ্চে না। আর এ সব অর্থহীন কথার জবাবই বা কি হতে পারে।

দুলারী হুঁকোটা ফিরিয়ে দিয়ে আপন মনেই বকে যায়—ঠাট্টা বটুকেরা তার ভাল লাগে না—হরদুঙ্গি সেদিনের ছোঁড়া, দারু পিয়ে মাতাল হয়ে সেদিন বলে কি না—দুলারী আমার পিয়ারী হবি? তেমনি তার মুখ ভেঙে দিয়েছে সেদিন। হরদুঙ্গি একটা চেংড়া গোলদার! ঘর করতে গেলে কি আর লোক নেই!

ঘমণ্ডি নীরবে তামাক খেতে খেতে ডিবিয়ার আলোয় দুলারীর অত্যধিক-পুষ্ট হাতের কব্জি থেকে কুনুই পর্য্যন্ত আঁকা উল্কিগুলো কিছুক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করে; তারপর নেহাৎ তাচ্ছিল্যভরে জিজ্ঞাসা করে,—ছাগলের দুধের 'ভাও' কত আজ কাল?

ছাগলের দুধের দাম!—দুলারীর চোখ একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে!—ছাগলের দুধ টাকা টাকা সের! ছাগলের দুধ অমন সস্তা জিনিষ নয়! আর তার ছাগলী এই বাচ্চা হলেই ত রোজ দুসের দুধ দেবে!

ঘমণ্ডি হুঁকোটা দেয়ালে ঠেসান দিয়ে রেখে বলে,—তাই নাকি? বেশ মুনাফা আছে ত!

দুলারী অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে আমিরী চালে বলে,—তব্‌কা !

ঘমণ্ডি খানিকক্ষণ মাথানীচু করে বসে থেকে শেষে কানাউঁচু একটা কাঁসি বার করে ঠোঙা থেকে আটা ঢালতে আরম্ভ করে।

দুলারী বলে—থাক্ থাক্ আজ না হয় 'রোটিটা' আমিই 'পাকিয়ে' দিয়ে যাচ্ছি।

দুলারী উঠে গিয়ে আটা মাখতে বসে। ঘমণ্ডি বলে—"তব্ তোহার ভি রোটি হিঁয়ে বনা লে।"

দুলারী বিনা আপত্তিতে আর খানিকটা আটা ঢেলে নিয়ে মাখতে মাখতে গল্প করে। কথায় কথায় বলে,—গলির ভেতর ডাগ্‌দর বাবুর বুড়ো কোচোয়ান নাকি ত্রিশ টাকা মাইনে পায়।

—ত্রিশ টাকা পায় না আরো কিছু ! এ অঞ্চলে ত্রিশ টাকা ঘমণ্ডি ছাড়া কেউ পায় না !

রুটি তৈরী শেষ হলে দুলারী বাবুদের বাড়ীর কাজ সেরে আসবার জন্যে উঠ্‌ল। গাড়ীটার এক পাশে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ একটুখানি জায়গায় দড়ির খাটিয়ার উপর কম্বল গায়ে দিয়ে ঘমণ্ডি শুয়ে ছিল। দুলারীকে উঠ্‌তে দেখে জিজ্ঞাসা করলে—"হো গইল্ ?"

"হাঁ। হম্ অব্ যাওত্ বানি।"

ঘমণ্ডি খানিক চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলে—ছাগলের দুধ সত্যি টাকা টাকা সেরত ?

অনিচ্ছুক ছাগলীটার গলার রসি ধরে টান্‌তে টান্‌তে দুলারী একদিন ঘমণ্ডির আস্তানায় এসে উঠ্‌ল। সে এগার বছর আগেকার কথা। শাঁখ বাজল না, উলুধ্বনি হ'লনা,—কোন উৎসবের আয়োজন দেখা গেল না।

ঘরে একটু স্থানাভাব হয় বটে, কিন্তু সে এমন কিছু নয়। দুখিয়ার বাচ্চাগুলি বড় হয়েছে। তারা আপনা থেকেই গাড়ীর ভেতর রাত্রিবাস করবার বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। এমন কিছু গোলমাল নেই। ছাগলীর বাচ্চা হ'লে ঘমণ্ডি একদিন দুসের দুধ না হওয়ার জন্যে গালাগাল করেছিল বটে, কিন্তু দুলারীও তার জবাব দিয়েছিল—ত্রিশ টাকা মাইনে কোথায় গেল ?

বছর যায় ! একটা কুকুর মরে আর একটা আবার বাচ্চা দেয়। প্রথম ছাগলীটা হঠাৎ একদিন কি খেয়ে এসে বমি করে চোখ উল্‌টে শেষ হয়ে গেল।

আরেকটা রাস্তার ঘোড়ার গাড়ীতে চাপা পড়ে পা ভেঙে খোঁড়া হয়ে এল। একটা বেড়াল কোথা থেকে এসে ভাগ বসিয়েছে। দুলারীর দেহের পরিধি দিনের পর দিন বাড়ে। ঘমণ্ডি কম্বল কাঁথা গুনচট্ মুড়ি দিয়ে জ্বরে পড়ে,—দুলারীর স্থূল দেহের গেঁতোমি নিয়ে গালাগালি করে সেরে ওঠে। বছর যায়।

সকালবেলা গলায় ঘুঙুর বাঁধা ছ মাসের চঞ্চল দুরন্ত ছাগলছানাটা সবার আগে উঠে বন্ধ দরজার কাছে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করতে সুরু করে, দরজায় মাথা দিয়ে ঠেলা দেয়। থালা ঘটিগুলো পায়ে লেগে শব্দ করে ওঠে। দুলারী সঙ্কীর্ণ জায়গাটুকুর মধ্যে অতি কষ্টে পাশ ফিরে ঘুমজড়িত বিরক্ত কণ্ঠে বলে "দেখ্‌ত ওকর বদমাসী!" তবু বদমাসী থামে না। ছাগলছানা এক লাফে গাড়ীর ভেতর উঠে, ঘুমন্ত কুকুরগুলোকে মাড়িয়ে এক হট্টগোল বাধিয়ে তোলে। ঘমণ্ডি চোখ রগড়ে উঠে বসে। তারপর উঠে দরজা খোলে। বেড়ালটা দুলারীর কোলের কাছ থেকে উঠে মাথা ঝাকিয়ে, পিঠ বেঁকিয়ে ল্যাজ তুলে পাগুলো টান্ করে আলস্য ভেঙে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। তিতিরটা খাঁচার ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ উচ্চ কণ্ঠে আপনার অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘোষণা করে। ঘমণ্ডি পা দিয়ে দুলারীকে একটা ঠেলা দিয়ে বলে "উঠ্‌ বুঢ্‌টি হাথি উঠ্‌।"

মানুষ ও পশু জাগে, মানুষ ও পশু আবার রাত্রে গায়ে গায়ে তাল পাকিয়ে নিদ্রা যায়। সমস্ত দিন রান্না-বাড়া খাওয়া দাওয়া আছে, কলতলায় জল নিয়ে ঝগ্‌ড়া আছে,—

"দিন ভর্ তু পানি ভরত্‌ রহি, আউর কৌন পানি ন লেব?"

অপর পক্ষ উত্তর দেয়—"হম্‌ত আগাড়ি আয়ল্।"

"আগাড়ি আয়ল্ ত কা রাজা ভয়ল! তু দিন ভর পানি লেই? ই তোহার নানাকে কল ন হও।"—

ঘুঁটে দেওয়া আছে, সন্ধ্যা বেলার জট্‌লা আছে।

মাতোয়ালা গোলদার হরদুঙ্গি আসে তার সারেঙ নিয়ে খড়ের গোলার রামজীবন আসে ঢোলক নিয়ে। দড়ির খাটিয়া পড়ে রাস্তায়। ঘমণ্ডি, রামজীবন হরদুঙ্গি বসে, এমন কি বড় বাবুদের দরওয়ান মহাদেও পর্য্যন্ত মাথায় পাগড়ি বেঁধে এসে মাঝে মাঝে সে খাটিয়ায় বসতে দ্বিধা করে না।

দুলারী নীচে মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে একটা কুকুরকে পায়ের ওপর শুইয়ে আঁটুল বাছে। মাঝে মাঝে একটা ছুটো মন্তব্য প্রকাশ করে।

'বড়া খচ্চর হও উ হমার বিলাড়, চারগো চুহা আজ মারল্, বাকী খায়লন্,
দাঁতোসে তনি কাট্ কাট্কে ফেক দেল—"

হরগুন্দি সারেঙ্ থামিয়ে তার রাঙা ঘোলাটে চোখ দুলারীর ওপর কিছুক্ষণ কৃত্রিম প্রশংসায় নিবদ্ধ করে বলে,—দিন দিন মোটা হয়ে দুলারী যেরকম খপ্সুরৎ হয়ে উঠ্ছে আরত তাকে চুরী না করে থাকা যায় না, শুধু "ঘমণ্ডি চিনথ্ আদমী, উত হল্লা করি" এই যা বাধা।

দুলারী মুখ ভার করে রাগের ভান করে। সবাই হাসে।

ভেতর থেকে মশা তাড়াবার জন্যে ঘোড়ার পা ঠোকার শব্দ শোনা যায়। ঘর থেকে দুরন্ত ছাগল ছানাটা নানা ভাবে লম্ফ ঝম্প করতে করতে বাইরে এসে কি ভেবে থম্কে দাঁড়ায় আবার মাথা বাঁকিয়ে গলার ঘুঙুর গুলো বাজিয়ে কোন অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে তাল ঠুকে লাফ দিয়ে ঘরে গিয়ে ঢোকে।—দিন যায়।

এগার বছর কেটেছে। দুলারীর মাথার চুলে বেশ পাক্ ধরেছে, মাংস আরো ঢিলে হয়েছে। চোখের কোণ আরো কুচ্কেছে।

কদিন ধরে সে কোন ভৌজাইনের বেমারের কথা নিয়ে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করছে। ঘমণ্ডি গাড়ী বার করে ঘোড়া জুত্ছিল। দুলারী আবার জানালে, তার ভৌজাইনের বেমার, তাকে দেশে যেতেই হবে।

ঘোড়া জুত্তে জুততে ঘমণ্ডি উত্তর দিলে,—কোন পুরুষে তার ভাইয়ের নাম পর্য্যন্ত শোনা যায় নি, আজ আবার ভাজ কোথা থেকে জন্মাল ?

ভাজ আবার কোথা থেকে জন্মাবে ? যেমন করে সবায় জন্মায় তেমনি করে! দুলারী ত আর ভুঁইফোড় নয়, তার মা বাপ্ ভাই বোন সবই আছে।

ঘোড়া জুতে পায়ে পট্টিটা জড়াতে জড়াতে ঘমণ্ডি বল্লে,—বটে! এতদিন ত ভৌজাইন খবর নেয়নি একটিবার! আর আজ খবরটাই বা এল কেমন করে ?

—তার দেশের লোক এসে তাকে খবর দিয়ে গেছে।

—বেশ বেশ! তা যাওয়া হবে কবে ?

—আজই।

—আজই ? বেশ। কিন্তু ঘমণ্ডি আসবার আগে যেন যাওয়া না হয়।

—তাই হবে। তাই হবে। দুলারী অমন চোর নয়।

—ঘমণ্ডি গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেল। কিন্তু দুপুর বেলায় তার সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করে আরেক জনের জিম্মায় গাড়ী রেখে ফিরে এল। দুলারী ঘরে

ছিল না। দরজা ভেজান। ভেতরে ঢুকে ঘমণ্ডি দেখলে পুঁটলি পোঁট্‌লা বাঁধা ছাঁদা শেষ হয়েছে।

ডুলারী গঙ্গার ঘাটে গেছল, ফিরে এসে ঘমণ্ডিকে দেখে একটু চমকে উঠে বল্লে—মোট বাঁধতে মেহনৎ লাগে না—সব খোলা হয়েছে যে?

ঘমণ্ডি চোখ রাঙিয়ে বল্লে,—খোলা হয়েছে যে? এ সব থালা ঘটি কার?

ডুলারী এবার ক্ষীণস্বরে বল্লে, "তোহার হও? লেতু, বাহার করলে!"

সমস্ত পোঁট্‌লা পুঁট্‌লি থেকে একে একে অনেক জিনিষই বার করে ফেলে ঘমণ্ডি বল্লে,—আরো কি চুরি করা হয়েছে?

—হ্যাঁ চুরি করা হয়েছে! "দেখ্‌না আউর কা হম্‌ চোরী করলু!"

ঘমণ্ডি খপ্‌ করে তার হাত্‌টা ধরে ফেলে কাপড়টায় এক টান দিলে। এবার ডুলারী সমস্ত সংযম ত্যাগ করে উচ্চস্বরে রোদনের সঙ্গে ঘমণ্ডির পিতৃ মাতৃকুলের উদ্ধার সাধন করে মুক্ত হস্তে ঘমণ্ডির ওপর কীল চড় ঘুঁসি আঁচড় কামড় বর্ষণ সুরু করে দিলে। তারপর এগার বছর ধরে ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধে জড়িত এই দুই পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে নির্লজ্জ রণতাণ্ডব সুরু হ'ল তার বর্ণনা যায় না।

দুপুর হলেও রাস্তায় ভীড় জমে গেছল। ঘমণ্ডি বহুক্ষণ ধ্বস্তাধস্তি করে ডুলারীর কোমর থেকে সাতটি দশ টাকার নোট ও খুচরা সাতটি টাকা বার করে নিয়ে অর্দ্ধউলঙ্গ অবস্থায় তাকে লাথিয়ে ঠেলে রাস্তায় বার করে দিলে। তারপর তার বাকী পোঁট্‌লা পুঁট্‌লি রাস্তায় এক এক করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বল্লে,—"বেইমান্‌ চোট্টা!" তার সমস্ত কাপড় জামার কিছু আর আস্ত ছিল না। সারা দেহে নখ ও দন্তের ক্ষত চিহ্ন।

ছিন্ন বিশৃঙ্খল চুলে, ছিন্ন অসম্বৃত বসনে ডুলারী বাইরে থেকে ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করে সমস্ত পাড়াকে তখন জানাচ্ছিল,—ডাকুতে তার টাকা কেড়ে নিচ্ছে, তার অনেক কষ্টে ছাগলের দুধ ঘুঁটে বেচে, মেহনৎ করে জমান টাকা!

হরচুঙ্গি ছুটে এসে জিজ্ঞাসা কল্লে,—কি ব্যাপার!

—কি আবার ব্যাপার! ভৌজাইনের বাড়ী যাবার নাম করে চুরী করে পালাবার মতলব! বেইমান্‌ চোট্টা...

"তু বেইমান, তু চোট্টা, তু ডাকু হও, দে দ হমার রূপয়া..."

ডুলারী রাস্তায় বসে রোদনের সঙ্গে গালাগালি করতে লাগল।—তার হকের

টাকা কেন ও ডাকু কেড়ে নেবে ? এগার বছর ধরে সে কি মাগ্‌না দুধ খুঁটে বেচেছে !

রামজীবন বল্লে,—"মিট্‌ মাট্‌ কর লে ভাই—!"

হরতুঙ্গি বল্লে, "হাঁ ভাই মিট্‌ মাট্‌ কর লে! এগার বরিষ তনো একসাথ রহ্‌লি।

ঘমণ্ডি তখন চৌকাটের ওপর বসে একটা কুকুর বাচ্চার গায়ে অন্যমনস্ক ভাবে হাত বুলোতে বুলোতে—দুলারীর গালাগালির প্রত্যুত্তর দিচ্ছিল, বল্লে,—এগার বছর ত কি হয়েছে! ও চোর আর এ চৌকাট মাড়াতে আসুক দেখি। বেইমান! ভোজির বাড়ী যাবার ছুতোয় চুরী করা! ভাগ্যিস্‌ সে সময় মত এসেছিল!

দুলারী উঠে বল্লে, "হম্‌ থানেমে যাওত বা'ন।"

ঘমণ্ডি বিদ্রূপ করে বল্লে, "যা তু থানেমে! হুঁয়ে তোহার ভৌজাইন হও।"



সাদা কালো

শ্রীজলধর সেন

চৈত্র মাস। বেলা প্রায় একটা! রৌদ্রের এমন তাপ যে সহজে কেউ ঘরের বাহির হয় না। যাদের নিতান্ত গরজ, আর যারা হুকুমের নওকর, তাদের ত শীত গ্রীষ্ম রৌদ্র বৃষ্টি নাই, তারাই নিতান্ত ক্লান্ত ভাবে পথ চল্‌ছে।

তার পর সে পথও পাড়াগাঁয়ের পথ নয় যে গাছপালা আছে, মাঠ ময়দান আছে। আমি বল্‌ছি কলিকাতার রাজপথের কথা। এখানে সেই চৈত্র মাসের দিন দুপুরে যেন আগুন ছুটছে।

সেই সময় একটী বৃদ্ধ, বয়স বোধ হয় সত্তরের কাছাকাছি, একটী বহুকালের জীর্ণ, শত-তালি বিশিষ্ট ছাতা মাথায় দিয়ে পথ হাঁটতে হাঁটতে ক্লাইভ ষ্ট্রীটে এসে একটা রৌদ্রতপ্ত দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়ালেন;—বেশ বুঝতে পারা গেল তিনি অনেক দূর থেকে এসেছেন, আর চল্‌তে পারছেন না; মুখ চোখের যে অবস্থা, শরীর যে রকম ঘামে ভিজে গিয়েছে, তাতে কেউ যদি তাঁর দিকে চেয়ে দেখ্‌ত, তা হ'লে মনে করত ভদ্রলোক এখনই ফুটপাথের উপর পড়ে যাবেন, আর তাঁর প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

কিন্তু তা হোলো না;—মিনিট খানেক দাঁড়িয়েই বৃদ্ধ ফুটপথের অপর পার্শ্বের একটা চারতলা বাড়ীর প্রধান দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এই প্রকাণ্ড বাড়ীটার এক অংশে জন সিনক্লেয়ার কোম্পানীর আফিস;—যেমন ভারি কারখানা, তেমনি প্রকাণ্ড আফিস—প্রায় দুইশ লোক এই আফিসে কাজ করে; বিলিতী সাহেবও চার পাঁচ জন আছেন, দিশী সাহেবও অনেক আছেন। বুড়া সিন্‌ক্লেয়ার সাহেব এখনও উপার্জ্জনের লোভ সংবরণ করতে পারেন নাই, তাই এই ভয়ানক গ্রীষ্মেও কলিকাতায় আছেন, রোজ দশটা পাঁচটা আফিস করেন। পঞ্চাশ বছর আগে কেমন ভাবে এই আফিসে কেরাণীগীরি করেছেন, আজ যে সিনিয়র পার্টনার—আজও তাই;—না শরীর ভাঙ্গলো; না টাকার পাহাড়ে মেজাজ বিগ্‌ড়ালো।

আমাদের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী ধীরে ধীরে এই প্রকাণ্ড আফিস বাড়ীর দ্বিতলে উঠ্‌লেন; তাঁর চলার রকম দেখে বেশ বুঝতে পারা গেল যে, এই প্রকাণ্ড গোলকধাঁধা তার অপরিচিত নয়; তিনি এ বাড়ীটা চেনেন, কোথায় কোন্ আফিস, তাও জানেন ব'লে মনে হোলো। তাঁর পরিধানে জীর্ণবস্ত্র হোলেও তা যে সাবান দিয়ে কেচে ফরসা করা হয়েছে, তা বেশ বোঝা গেল।

ভদ্রলোক দ্বিতলে উঠে আবার দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে খানিকক্ষণ হাঁপাতে লাগ্‌লেন, তার পর অতি কষ্টে আত্মস্থ হ'য়ে বারান্দা দিয়ে চলতে লাগ্‌লেন।

একটা খস্‌খস-দেওয়া দুয়ারের সম্মুখে একজন বৃদ্ধ আরদালী ব'সেছিল। বুড়া ভদ্রলোকটীকে দেখে সে উঠে দাঁড়ালো, দুইহাত জোড় করে নমস্কার করে বল্‌ল "বাবুজি এত রোদে যে; বহুত রোজ দেখা হোয় নাই। ভ'লো আছেন ত; বালবাচ্ছা আচ্ছা আছে?"

বৃদ্ধ বল্‌লেন "সব আচ্ছা হায় পাঁড়ে। তোমরা সব আচ্ছা?"

পাঁড়েজি হাত জোড় করে বল্‌ল "রঘুবীরজির কৃপাসে!"

বৃদ্ধ বল্‌লেন "পাঁড়েজি, বড় সাহেবকে খবর দেও, আমি একবার দেখা করতে চাই।"

পাঁড়েজি বল্‌ল "বাবুজি, আফিসের ভিতর গিয়ে একটু বিশ্রাম করলে আচ্ছা হোতো, তারপর সাহেবের সাত মোলাকাত হোতো, বড়া সাহেব পাঁচ বাজে তক আফিস ছোড়ে না।"

বৃদ্ধ বল্‌লেন "না, না, বিশ্রামের দরকার নেই; বড় জরুরী কাম আছে, তুমি খবর দেও।"

আরদালী ভিতরে চলে গেল; এক মিনিটের পরই ফিরে এসে বল্‌ল "চলুন বাবুজি, বড়া সাহেব আভি আপনাকে সেলাম দিয়েছেন।"

বৃদ্ধ যেই বড় সাহেবের কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করলেন, অমনি বুড়া সিনিয়র পার্টনার পিনক্লেয়ার সাহেব চেয়ার থেকে লাফিয়ে অগ্রসর হয়ে বুড়াকে ঠিক বাঙ্গালীর মত জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লেন "ওয়েল দত্ত, আর ইউ ষ্টিল লিভিং (Well Dutt, are you still living?) অর্থাৎ আরে দত্ত তুমি এখনও বেঁচে আছ?" কথা সব ইংরাজীতেই হয়েছিল।

দত্ত বল্‌লেন "না বেঁচে কি করব সাহেব, অদৃষ্টে যে অনেক কষ্ট আছে?"

সাহেব বল্‌লেন "কি রকম! আজ সাত বছর হোলো তুমি অবসর নিয়েছ, এর মধ্যে প্রথম দুই তিনবার দেখা করতে এসেছিলে, তারপর আর খবর নেই।

আমি মনে করেছিলাম দত্ত, তুমি যে শেষবার দেখা হ'লে বলেছিলে বেনারস চলে যাবে, তাই হয়ত গিয়েছ। তারই জন্য আমি খোঁজ নিইনি, তুমিও কি নির্দ্দয় দত্ত! ঠিক পঁয়তাল্লিস বছর আগেকার কথা সব ভুলে গেলে দত্ত ?"

শ্রীযুক্ত কানাইলাল দত্ত মশায় বল্‌লেন "ভুলে গেলে কি আজ এই দারুণ রোদের মধ্যে তোমার কাছে এসেছি সাহেব! বড়ই কষ্টে পড়েছি, তাই এসেছি।"

সাহেব এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বল্‌ছিলেন; এখন হুঁস হোলো বল্‌লেন "এস দত্ত, একটু বোসো, তোমাকে বড়ই ক্লান্ত দেখাচ্চে, একটু জিরিয়ে নেও, তারপর সব শুনছি।"

রামকানাই বাবু বল্‌লেন "এখন একটু ক্লান্তি বোধ হয়ই ত।" এই বলিয়া একখানি চেয়ারে ব'সে বল্‌লেন "সাহেব, আমার ত অজানা নেই তোমার কত কাজ। সেই কুড়ি বছর বয়সে তোমাতে আমাতে এক সঙ্গে এই আফিসে ঢুকি, সে আজ প্রায় চল্লিশ বছরের উপর। সেই পনর টাকার কেরাণী আমি, দুইশ টাকা পর্য্যন্ত মাইনে নিয়ে লেজারের কাজ করে গিয়েছি। আমি কি আর তোমার কাজের খবর রাখিনে, তোমার সময় নষ্ট করব না সাহেব, আমার দুঃখের কথা শোন।"

সাহেব বলিলেন "সে কি, তোমাকে বারো হাজার টাকা বোনাস্ দেওয়া হয়েছিল, তা কি নেই? আমি জানি, তুমি একটী পয়সাও চাকরীর সময় জমাতে পার নাই, এমন কি বাড়ীখানি যে একটু বড় করবে তাও পার নি। কি করে হবে এত কাজের মধ্যে কোন দিন একটী ফারদিংও তুমি অন্যায় করে নেও নি। তার পর বলত; এ বারো হাজার টাকা কি করলে?"

দত্ত বাবু বল্‌লেন "সেই দুঃখের কথাই ত বল্‌তে এসেছি। তুমি জান সাহেব, আমার একটী ছেলে আর একটী মেয়ে। মেয়েটী আজ পনর বছর বিধবা হোয়ে দুটী ছেলে নিয়ে আমারই আশ্রয়ে আছে। ছেলেটীরও বিয়ে দিয়েছিলাম, তাও তুমি জান সাহেব, ছেলেটার লেখাপড়া হোলোই না। তুমি ডেকে এনে চাকরী দিলে, তাও সে বছর খানেক পরে ছেড়ে দিল। তখনও আমি চাকরী করি কি না! বাবা আছে, ভয় কি, খেতে পরতে পাবই।"

সাহেব হেসে বল্‌লেন "এই ডিপেণ্ডেন্সের ভারই তোমাদের সর্ব্বনাশের মূল, দত্ত!'

দত্ত হেসে বল্লেন "তোমাদের নিয়ে-আসা অনেক জিনিষ ও আমাদের সর্ব্বনাশের মূল ?"

সাহেব বল্লেন "কি রকম ?"

দত্ত বল্লেন 'সেই দুঃখের কথাই ত বল্‌তে এসেছি। যখন বারো হাজার টাকা বোনাস্ নিয়ে চাকরী থেকে অবসর নিলাম, যখন ছেলেকে বল্লাম, বাবা এখন ত রোজগার না করলে চলে না। সে বল্ল, একটা কয়লার আড়ত করবে। বেশ, আমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে আড়ত করে দিলাম। তিন চার বছর বেশ কাজ চল্‌লো, যা আন্‌তে লাগল, তাতে খরচ পত্র ভাল ভাবেই নির্ব্বাহ হোতো। তার পরই ছেলেটার অধঃপতন হোলো। তোমাদের বিলাতী নেশায় তাকে ধরল। ঐ যে ময়দানের এক কোণে তোমরা এক জাল পেতে রেখেছ, আর দেশ শুদ্ধ লোকের—তোমাদের সাহেব বিবিদের সর্ব্বস্বান্ত করছ, আমার ছেলেও সেই জালে পড়ে গেল, সে তোমাদের রেস্ খেলায় যেতে গেল। যা পায় সব 'রেসে' ঢাল্‌তে লাগল। নাম মাত্র কয়লার কাজ করে! আমি কি অত জানি সাহেব। শেষে একদিন, এই মাস খানেক হোলো, সে পালিয়েছে, দেনার দায়ে পালিয়েছে; তার বাজার দেনা দশ হাজারের উপর। সকলেই বাড়ী চড়াও ক'রে, যার যা মুখে এল, তাই ব'লে অপমান করতে লাগল। আমার স্ত্রী আর বৌমা কেঁদে আকুল হোলেন। তখন কি করি, যে সাত আট হাজার টাকা ব্যাঙ্কে ছিল, সব এনে দিয়ে, একটা পয়সাও না রেখে, সব দিয়ে অপমানের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছি। তারপর আর কি ? ছেলেটার কোন খোঁজ পাচ্ছি নে সপরিবারে না খেয়ে মরতে বসেছি। সেই ছোট বাড়ীটুকু আছে, তাই মাথা দিয়ে আছি। কিন্তু খাবো কি ? তাই তোমার কাছে এসেছি। ভিক্ষা চাই না সাহেব, সে শিক্ষা তোমার কাছে পাই নি। আবার আমাকে লেজারে বসিয়ে দেও। দেখো, পেটের জ্বালায় এই সত্তর বছরের বৃদ্ধ আবার সেই পঞ্চাশ বছর আগের রামকানাই দত্ত হবে। নইলে যে, মারা যাব সাহেব। তাই এই রোদের মধ্যে সেই বাগবাজার থেকে এই ক্লাইব ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত হেঁটে এসেছি—ট্রামের পয়সা কোথায় পাব ?" বৃদ্ধ আর কথা বল্‌তে পারলেন না, চোখের জল তাঁর বাধা মান্‌লো না।

সাহেব তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে দত্ত বাবুর হাত দুখানি ধ'রে বল্লেন "দত্ত আমি যা বল্‌ব, তা পঁয়তাল্লিশ বছরের আগের জন সিন্‌ক্লেয়ারের কথা ব'লে মনে কোরো, এ কোম্পানির সিনিয়র পার্টনারের কথা নয়। তখন তুমি আর

আমি ভাই ভাই ছিলাম মনির ভৃত্য ছিলাম না। আজ তোমার ভাইরূপে এই তোমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি দত্ত! তুমি কি তোমার ভাইয়ের সাহায্যকে ভিক্ষা বলে মনে করে তাকে অপমান করবে? শোন দত্ত, যতদিন আমি বেঁচে আছি, ততদিন তোমার এই ছোট ভাই তোমাকে মাসে একশ টাকা সাহায্য করবে। আমি মরলেও আমার উইলে তার বিধান থাকবে। শোন দত্ত, ভ্রাতৃত্বের এ দাবী তুমি অস্বীকার করো না।" এই বলেই পকেট থেকে একটা চামড়ার কেস বার করে তার থেকে একশ টাকার একখানি নোট বা'র করে দত্তের হাতে দিয়ে বল্লেন "এই তোমার এই মাসের খরচ।"

বৃদ্ধ রামকানাই দত্ত অশ্রুপূর্ণ নয়নে সাহেবের হাত দুইখানি চেপে ধরলেন, কথা বলতে পারলেন না। সাহেব ও নীরব। এই নীরবতার মধ্যে যে ধ্বনি উঠতে লাগল, সহস্র কথাতেও তা বলা যায় না।



জৈতার আত্মত্যাগ

(ময়মনসিংহ-গাথা)

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার অধিকারী

একথা স্বীকার করিতেই হইবে, ময়মনসিংহ-গীতিকা, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটা নূতন যুগ আনিয়াছে। যে সাহিত্য বঙ্গপল্লীতে অশিক্ষিতের মুখে মুখে, বন-কুসুমের মত বাড়িতেছিল, তাহার আদর কেহ করে নাই।

'মহুয়া' গীতিকায় আমরা দেখিয়াছি—প্রেমিকের জন্য প্রেমিকের সর্ব্বস্ব ত্যাগ—"এই গীতিকায় জাতিবিচার কুলশীল, পদমর্য্যাদা সমস্তই প্রেমরত্নাকরের অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে।"

এই সংগৃহীত গাথায় প্রেমাস্পদের জন্য প্রেমিকের ত্যাগ নাই,—দীন অশিক্ষিত পল্লীবাসীও কি করিয়া দেশের প্রাণরক্ষার জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারে, আছে তাহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বৈশাখ মাস; ক্ষেতে ক্ষেতে সুপ্রচুর ধান, গৃহস্থের মনে কত আশা তুলিয়া দিতেছে। ধান বেচিয়া কে কি কিনিবে, তাহারই আলোচনা তাহারা করিতেছে।

পরথম বৈশাখ মাস ক্ষেতে সাইল ধান,
দেইখ্যা (১) হইল গিরস্তের পাগল পরাণ।
টাইল (২) ভইরা তুইলা ধান
দিয়াম কুইট্টা (৩) চিড়া
আইন্যা দিও নয়া কাপড়, আমার মাথার কিরা (৪)
গঞ্জের হাটে বেচা কিনা আছের কাকই (৫)
তাগা আইন্যা, গুড় আইন্যা, দিয়াম চিড়া খই।

---

(১) দেইখ্যা—দেখিয়া। (২) টাইল—গোলা। (৩) কুইট্টা—কুটিয়া, দিয়াম—দিব। (৪) কিরা—দিব্য। (৫) কাকই—চিরুণী।

কিন্তু তাহাদের আশা বুঝি ফলবতী হইল না। মেঘে মেঘে আকাশ একদিন ভরিয়া গেল। সকলেই বুঝিল—শিলাবৃষ্টিতে সব ধান নষ্ট হইবে।

এই মতে কত জন কত সল্লা করে
একদিন সাজল দেওয়া মাথার উপরে।
গুড় গুড় গুড় ডাকে মাডি(১) যেন লড়ে(২),
গিরেস্থ গিরস্থে কয় হিল(৩) নাকি পড়ে।

নিরুপায় গ্রামের লোক তখন জৈতার কাছে গেল। জৈতা ছিল 'হিরালী'। শিলাবৃষ্টি, ঝড় তুফান মন্ত্রের জোরে এরা নষ্ট করিতে পারে—লোকের এই বিশ্বাস।

জৈতা নামে গেরামেতে হিরালী(৪) আছিল
সকলে যাইয়া তার কাছে হাজির অইল।
তুমিও না জৈতা হও হিরালীর চূড়া
আইজের হিল খেদাইয়া বাচাও এই পাড়া।
বামুন কায়েত, দাস, মালী মুসলমান
হাত কচলাইয়া কয় জৈতা বিদ্যমান।
জবর(৫) হিরালী তুমি আছে গুণ জারী
আইজ বন্দ(৬) বাঁচাইয়া দেখাও বাহাদুরী।

সমবেত গ্রামিকের অনুরোধ জৈতা ঠেলিয়া ফেলিতে পারিল না! আকাশে 'কালা দেওয়া,'—ইহাকে তাড়ান তাহার কর্ম্ম নয়। তবু ত্রিশূল হাতে, গ্রামের উপকার সাধনে সে চলিল—মৃত্যু নিশ্চিন্ত জানিয়া।

জৈতা বলে কালা দেওয়া সাইজাছে গগনে
কিমতে ফিরাই ভাইব্যা নাহি পাই মনে।
স্ত্রিরি পুত্রু নাতি নাতকর তোমাদেরে থইয়া (৭),
যাইয়াম হাওড়ে আমি তিরশূল লইয়া।
এই হিল খেদাই যে সাধ্য মোর নাই,
না জানি দিয়াম কেবল গুরুর দোহাই।

---

(১) মাডি—মাটি। (২) লড়ে—নড়ে। (৩) হিল—শিল।

(৪) হিরালী—শিলাবৃষ্টি, ঝড় ইত্যাদি বন্ধকরবার ক্ষমতা সম্পন্ন গুণীলোক। হাতে ত্রিশূল লইয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে বৃষ্টির সময় ইহারা বাহিরে যায়—শিলারী (?)।

(৫) জবর—খুবভাল। (৬) বন্দ—মাঠ। (৭) থইয়া—রাখিয়া।

তিন কাল গেছে মোর বাকী চৈলা যায়
পন্নাম(১) জানাই আমি ওস্তাদের পায়।

স্ত্রী পুত্র ঘরে কাঁদিতে লাগিল। জৈতা মাঠে চলিল। গ্রামের প্রান্ত ভাগে এক পতিত ক্ষেত্র, ফসল তাতে হয় না। সেইখানে দাঁড়াইয়া ত্রিশূল পুতিয়া সে আয়-আয় ডাকিতে লাগিল। আকাশে গুড়ু গুড়ু দেওয়া ডাকিতে লাগিল, মেঘে চারিদিক অন্ধকার করিয়া ফেলিল।

স্তিরি পুত্র ঘরে থাইকা কাইন্দ্যা আকুল
মাঠেতে চলিল জৈতা হাতে তিরশূল।
মুখে লইয়া গুরুরনাম মন্ত্র পইড়া যায়,
আশমান চাইয়া ডাকে আয় আয় আয়।
এক যে ছিল পরাক্ষেত্, তাতে খাড়া হৈয়া
আয় আয় আয় ডাকে জৈতা ত্রিশূল পুতিয়া।
আশমানে কজইল্যা দেওয়া ডাকে ঘন ঘন
চাইর কোণ্ আন্ধাইর অইল না যায় পেখন।

একা মাঠে জৈতা চীৎকার করিতে লাগিল। হঠাৎ হুড় হুড় শব্দ হইল। সমস্ত শিলা আসিয়া জৈতার উপরে পড়িল। হাড় চূর্ণ হইয়া জৈতার দেহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, গ্রামের লোক, আত্মীয় স্বজন, জৈতার জন্য কাঁদিতে লাগিল। নিজের প্রাণ দিয়া সে দুর্ভিক্ষের হাত হইতে গ্রাম রক্ষা করিল। দূরে শিল পড়িলে, এখনও ঘরে ঘরে লোক জৈতার দোহাই দেয়।

গুড় গুড় গুড় গুড় কানে লাগে তালা
মন্ত্র কৈয়া একলা মাঠে জৈতা ভাঙ্গে গলা।
হুড় হুড় শব্দ অইল লোকে চমৎকার
জৈতার উপরে পড়্ল শিলের পাহাড়।
স্তিরি কান্দে পুত্র্ কান্দে মাথা থপাইয়া
গেরামের লোকে কান্দে জৈতার লাগিয়া।
পাথরে কইরাছে গুড়া কয়খানি হাড়
ক্ষেতে ক্ষেতে পুইত্যা অইল টুকরা টুকরা তার।
মেঘ করে দেওয়া ডাকে হিল পুড়ে দূরে
জৈতার দোহাই লোকে দেয় ঘরে ঘরে।

---

(১) পন্নাম—প্রণাম।

এই তো কৈতার কাহিনী। আপন হাড় দিয়া দধিচী মুনি দৈত্যের হস্ত হইতে দেবগণকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন, আর গ্রামের এই অশিক্ষিত কৈতা আপন অস্থি বিনিময়ে পল্লীর কৃষকের ক্ষুধার অন্ন রক্ষা করিয়াছিল, কাহার আত্মত্যাগ বেশী ?

অনাড়ম্বরময় পল্লী জীবনের সমস্ত সরলতা দিয়া এই ক্ষুদ্র গীতিকাখানি রচিত। ভাষার, বর্ণনার বাহুল্য কোথাও নাই। লেখকের নিজের মন্তব্যে ইহা ভারাক্রান্ত নহে।

বর্ষার আকাশের কি সুন্দর, সরল, সহজে-বলা বর্ণনা ইহাতে আছে।

একদিন সাজল দেওয়া মাথার উপরে
গুড় গুড় গুড় ডাকে মাডি যেন লড়ে
গেরস্থে গেরস্থে কয় হিল নাকি পড়ে।

মেঘ-কজ্জল বর্ষার দিনের সহজ সুন্দর, মনোমদ বর্ণনা কবি-গুরুর বর্ণনাকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

আশমানে কাজইল্যা দেওয়া ডাকে ঘন ঘন
চাইর কোণা আন্ধাইর অইল না যায় পেখন।

প্রভৃতি, কবিগুরুর 'গুরু গুরু দেওয়া ডাকে', এবং 'মেঘের পড়ে মেঘ জমেছে আঁধার ক'রে আসে' র সহিত তুলনীয়। দিগন্ত বিস্তৃত ময়মনসিংহের হাওড়ের মধ্যে যিনি মেঘ বাদলে পড়িয়াছেন, বর্ণনার যাথার্থ্য তিনিই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কবি যেন নিপুণ তুলিকা হস্তে ছবির পর ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন। বৈশাখ মাসে শালি ধানের উপর যখন বাতাস ঢেউ খেলিয়া যায়, কৃষকের চিত্ত তখন সত্যিই পাগল হইয়া পড়ে।

অশিক্ষিতের রচিত কবিতায় এত গুণের সমাবেশ আছে বলিয়াই, এই কবিতা ষ্টেলা ক্রামরিশের ন্যায় শিল্পসমালোচককে, সিল্‌ভা লেঁভি-র ন্যায় ফরাসী পণ্ডিতকে ও লর্ড রোনাল্ডশের ন্যায় ইংরেজ রাজনীতিককে বিস্মিত করিয়াছে।



ডাকঘর

আশ্বিন সংখ্যা কল্লোল বেরুল। ক'দিন পরেই পূজার ছুটি। কল্লোল আপিসও পূজার সময় বন্ধ থাক্‌বে। সে সময়ে যাঁরা চিঠি পত্র লিখ্‌বেন তাঁরা যদি যথাসময়ে উত্তর না পান তাহাতে যেন কিছু মনে না করেন। ছুটির পরই সকলের চিঠি পত্রের উত্তর দেওয়া হবে।

মাসের পর মাস কাগজ নিয়ে ব্যস্ত থাকার পর বৎসরে আপনা থেকেই ঐ ক'টা দিনের ছুটি আসে! স্কুল, কলেজ, আপিস আদালত আর আমাদের সম্বন্ধ যার সঙ্গে সব চাইতে বেশী সেই ছাপাখানাও বন্ধ থাকে। কাজেই আমাদেরও ছুটি।

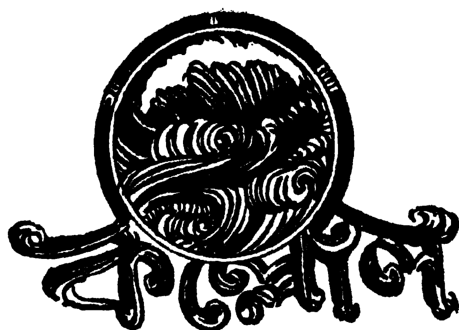
আশ্বিনের সংখ্যার কল্লোলে এবার আর কোনও ক্রমশ-প্রকাশ্য প্রবন্ধ বা গল্পাদি দেওয়া হয়নি। তার বদলে ছোট গল্প দেওয়া হয়েছে। কার্ত্তিকের সংখ্যায় আবার 'ক্রস্‌-ক্রস্‌রক্ত', 'শরৎচন্দ্র', 'স্মৃতির আলো' প্রভৃতি যথারীতি প্রকাশিত হবে।

ভাদ্র আশ্বিন এই দুই মাসে অনেক চিঠি পত্র এসে জমা হয়েছে, তার কতকগুলি উত্তর হয়ত ডাকঘরের মারফৎ দেওয়া হবে। অন্য কতগুলির উত্তর এখনও কিছু দেওয়ার নেই, সুসময়ে হয়ত আপনিই সে গুলির উত্তর তোমাদের নিজেদের মনে পাবে! কল্লোলকে খুব ভালবাস বলেই যে উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ নিয়ে ঐ সব চিঠি লিখেছ, তার উত্তর আজই যদি দিতে যাই, তাহ'লে আমার উত্তরও হয়ত ঠিক্ হবে না; কারণ আমিও কল্লোলকে তোমাদের মতই বোধ হয় ভালবাসি, বেশী যদি নাই-বা বাসি। এই কারণে আমার কথার মধ্যে বা চিন্তার মধ্যে অনেক অসম্ভব আশার কথা অনেক ভুল ধারণার কথা হয়ত বা এমন অনেক অপ্রিয় সত্য-কথাও থাক্‌তে পারে যা' আজই প্রকাশ করা সঙ্গত ও নয়, সুবিধারও নয়। যে ধৈর্য্য ও সংযম প্রত্যেক বড় কাজের গোড়ার জিনিস, সেই দুটি জিনিসেরই কথা তোমাদের আবার মনে করিয়ে দিতে চাই। নিজেকে খাঁটি রাখ;—নিজের কথা, ভাবনা, আর জীবন এক করে ফেল, দেখ্‌বে তুমি অনেকের দোষ ত্রুটি অতি সহজে ক্ষমা করতে পারছ, কারুর মার আর তোমার গায়ে লাগবে না!

আশ্বিনের এই উৎসবের দিনে আমাদের দূরস্থ ও নিকটস্থ সকলকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি জানাচ্ছি। আমাদের সকল দুঃখে সকল সুখে বিজয়-উৎসবের জয়ধ্বনি উঠুক।



গোকুলচন্দ্র নাগ



তৃতীয় বর্ষ

সপ্তম সংখ্যা

কার্ত্তিক, সন ১৩৩২ সাল

প্রতি সংখ্যা চারি আনা

মাশুলসহ বার্ষিক তিন টাকা আট আনা

সম্পাদক—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

সহ-সম্পাদক—শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ

কল্লোল পাবলিশিং হাউস

২৭ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ঝটিকা

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মুক্ত করে দিনু মোর রুদ্ধ দ্বার বন্ধ বাতায়ন,
এস দৃপ্ত প্রভঞ্জন,
উচ্ছৃঙ্খল দুর্ম্মদ বিদ্রোহী
দুরন্ত আনন্দখানি বহি,
চূর্ণ আজি কর গো আমারে ;
মৃত্যুর ফুৎকারে
নির্ব্বাপিত কর দীপ, ভগ্ন কর ভাণ্ডের ভাণ্ডার।
হে ঝটিকা, অতিথি আমার,
নটবর, হে ভোলা ভৈরব,
সুরু কর ধ্বংসের তাণ্ডব
মোর সুপ্ত জীর্ণ বক্ষতলে,
স্পন্দনে স্পন্দনে তারে
আন্দোলিয়া তোল তুমি ক্রন্দনের আনন্দ-কল্লোলে!
ক্রুদ্ধ অহঙ্কারে
বন্ধনেরে পদতলে করি' নিষ্পেষণ,
এস মোর ক্ষ্যাপা, বিবসন,
দৃঢ়হস্তে কাড়ি যত সঞ্চয়ের মিথ্যা আড়ম্বর
এস হে ঈশ্বর,
চূর্ণ করি' প্রাচীরের ক্ষুদ্র পরিসীমা
সুন্দর ভীষণ তব উলঙ্গ মহিমা
আমারে দেখাও ;
মোরে তুমি নিঃসম্বল নগ্ন করি' দাও

বন্ধহীন বিরহী বৈরাগী ;
প্রলয়ের প্রেমে অনুরাগী
এস হে অপরিমিত, অশান্ত, ব্যাকুল,
মোরে কর গৃহহীন পথের বাউল
হে চির-পথিক সহচর!
হে মোর অশেষ,
নিত্য অগ্রসর,
অনির্ণীত, এস নির্ণিমেষ,
নেত্র হতে মুছে নিয়া নিদ্রার কুজ্ঝাটি
এস হে ধূর্জ্জটি!

ওই যেথা সুরু হল প্রলয়ের আনন্দ-উৎসব,
তোমার তাথৈ-থৈ নৃত্যের তাণ্ডব
সেথা মোরে নিয়ে যাও
নিরুদ্দেশ করি' ;
হাত ধরি' ধরি'
নটরাজ, মোরে তুমি নাচিতে শেখাও
তোমারি বাত্যার তালে তালে,
মোর পায়ে বাঁধি দাও ঝঞ্ঝার মঞ্জীর।
এস হে অস্থির,
বিদ্রোহের জয়টীকা পরাইয়া মোর দীপ্ত ভালে
মোরে তুমি নিয়ে যাও,
হে উধাও,
যেথায় বজ্রের নিত্য বিজয়-উল্লাস,
বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ অট্টহাস,
যেথা পান্থ নিরাশ্রয় মেঘেদের যাত্রা-সমারোহ,
মিশাইব সেথা মোর প্রাণের বিদ্রোহ
প্রতপ্ত, প্রচুর!
এস দস্যু দুর্দ্দান্ত, নিষ্ঠুর,
মোরে তুমি ছিন্ন করে' নিয়ে যাও

তোমার কেতন-তলে ;
সেথা নিত্য রুদ্র কোলাহলে
তব সাথে দিব করতালি ।
এস কাল-বৈশাখী বৈকালী,
শিষ্য করে' নিয়ে যাও মোরে হে সন্ন্যাসী,
সর্ব্বনাশী
তোমার যাত্রায় ;
আমার পায়ের ছন্দ ধ্বনিয়া উঠুক তব
বন্ধহীন নৃত্যের লীলায় ।
চূর্ণ করি' অচলায়তন,
সজ্জার লজ্জার হ'তে মুক্তি দাও মোরে, বিবসন,
নিয়ে যাও জ্যোতিষ্কে জ্যোতিষ্কে গ্রহে সূর্য্যে,
নব নব ছন্দের মাধুর্য্যে !



ঋণশোধ

শ্রীসুকুমার ভাদুড়ী

নীরেশ যেদিন প্রথম আমাদের বোর্ডিং-এ এসে উঠ্‌লো সেই দিনেই তার চেহারাটা কেমন আমার মনে একটা কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিল। শীর্ণ কঙ্কাল-সার চেহারা, চোয়ালের হাড় দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়, লম্বা নাকটা ধারাল খাঁড়ার মত স্থির হয়ে আছে, আর সব চেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার দীপ্ত দুটি টানা টানা আয়ত চোখ। মনে হয় দেহের প্রতি অঙ্গের সমস্ত সজীব প্রাণ-শক্তিটাকেই যেন একসঙ্গে ঐ দুই চোখের ভিতর দিয়ে সজোরে আপনাকে ঠেলে প্রকাশ করতে চায়।

সিঁড়ির নীচে অন্ধকূপের মত সেই ছোট্ট ঘরটায় যে কোন সজীব মানুষ বাস করতে পারে আজ পর্য্যন্ত আমাদের কারো বোধ করি সেটা ধারণাতেই আসতো না। নীরেশ এসে সেই অন্ধকূপেই উঠ্‌লো—আর তার ভাড়া সাব্যস্ত হল এক টাকা চার আনা। ঘুঁটে কয়লা কেরোসিনের বদলে আজ যে শীর্ণ মানুষটি এসে ঐ ক্ষুদ্র ঘরটিতে নিজের নীড়টুকু বাঁধলে তার পানে মেসের সকলেই একবার করে বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টে চেয়ে নিল কিন্তু আর কোন কথাই কেউ বল্‌লে না—যে-যার নিজের কাজে চলে গেল। হয় ত তারা সকলেই ভাবলে ও-লোকটা তাদের সঙ্গে পরিচিত হবার অযোগ্য, কেন না ওর ঐ অন্ধকূপ কক্ষটাকে আপনার নীড় বলে মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের কাছে প্রকাশ পেল—আর্থিক অবস্থায় সে নিশ্চয়ই দোতলা ও তেতলার মেম্বরদের অনেক—অনেক নীচে।

কিন্তু আমার মনটা ওদের অতখানি অন্যায় বিচারকে অতটা নিঃশব্দে মেনে নিতে পারলে না। তাই একত্রে আমারই সঙ্গে তার আলাপটা অল্প একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌লো আর তাই দেখে মেসের অন্যান্য বাবুদেরও মুখে অল্প বিস্তর ব্যঙ্গের হাসি ধীরে ধীরে ফুটে উঠ্‌লো দেখ্‌তে পেলাম।

সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে নীরেশের সঙ্গে আমার প্রথম প্রথম আলাপ হ'ল। ঘরের বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে সে আপনার দেহেরই মত জীর্ণ চৌকির উপর শুয়ে

পড়েছিল ;—কাঠ আর তার হাড় বার-করা পিঠের মাঝখানে মাত্র একখানা লাল বিলাতি কম্বলের ব্যবধান—একখানা তোষক বা চাদর পর্য্যন্ত নেই।

বারকয়েক ঘরের সামনের বারান্দাটায় পায়চারি করে ভিতরের পানে চেয়ে চেয়ে দেখলাম ;—চৌকির উপর কি একটা কালো মত মাঝে মাঝে অন্ধকারে নড়তে দেখে মনে হল নীরেশ ঘরেই আছে। ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকতেই পায়ের শব্দে সে উঠে বসলো। নমস্কার জানাতেই অন্ধকারেই হাত তুলে প্রতি-নমস্কার জানিয়ে সে ক্ষীণ স্বরে বললে, বসুন, বাতিটা জ্বালি।

চৌকির এক পাশে বসলাম। এক কোণে একটা দেওয়ালগিরি পড়েছিল তার কাঁচের পিঠে কয়েকস্থানে কাগজের পটি। সেটাকে সন্তর্পণে জ্বেলে চৌকির এক কোণে সে বসে পড়লো।

একবার তার মুখের পানে চেয়ে আমি কোঁচার খুঁট নেড়ে বাতাস করতে করতে বল্লাম—উঃ কি গরম ; এই ঘর আপনি নিলেন কি করে মশাই ?

নীরেশ শুধু একটু ক্ষীণ হাসলে—কোন জবাব দিল না।

আকাশ ভরা কালো মেঘের বুক চিরে চিরে মাঝে মাঝে এক একটা ক্ষণিক বিদ্যুৎ-রেখা ঢেউ খেলে যায় দেখেছি, এ হাসিও যেন মনে হ'ল ঠিক তারই প্রতিচ্ছবি। সেই স্তূপীভূত মেঘের মধ্যে যে কতখানি আগুন কতখানি বাষ্প পুঞ্জীকৃত আছে 'তা' ঐ একটা বিজলী-রেখার মধ্যে থেকেই সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়।

ব্যথার যখন আরম্ভ হয় আর যখন তার শেষ হয়ে আসে তখনই মানুষ প্রাণ ভরে কাঁদতে পারে কিন্তু ঐ দুই অবস্থার সন্ধিস্থলে তার দলিত বুকে যখন ব্যথার বেদনা একান্ত নিবিড় হয়ে ঘনিয়ে ওঠে তখন তার কান্নার পরিবর্ত্তে বুঝি এমনি বিকৃত হাসিই ফুটে ওঠে বিমলিন তার দুই ওষ্ঠ প্রান্তে। অশ্রু তখন পরিণত হয় বাষ্পে—হৃদয় তখন তলিয়ে যায় ভাষাহীন বেদনার অনন্ত সাগর-তলে।

দেখেই বুঝলাম—নীরেশের সে হাসি স্বাভাবিক নয়।

এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে মনে হল, হয় ত এই ঘরের অবস্থার কথা তুলে তার অর্থহীনতার কথাটা তার মনে বেশী করে জাগিয়ে দেওয়া হল, হয় ত এতে তাকে জোর করে ব্যথা দিলাম আমি। তাই সহসা সে কথাকে চাপা দিয়ে প্রশ্ন করে বসলাম,—আপনি কি চাকরী করেন এখানে ?

—আজ্ঞে না, চেষ্টা করছি।

—তবে কি করেন ?

—কিছুই না ; শুধু বসেই আছি।

মনকে চাবুক মারতে ইচ্ছা হল। হায় রে দুর্ব্বল মানুষের মন! অর্থ আর সংসারের কথা ভিন্ন আর অন্য কোন বিষয়েই কি সে প্রশ্ন করতে জানে না? মানুষের জীবন, তার মান সম্ভ্রম মর্য্যাদা সবই কি ঐ আয় ব্যয়ের হিসেব নিকেশের গণ্ডীর মধ্যেই চিরুরুদ্ধ রয়ে যাবে?

ও আলোচনা একেবারে বন্ধ করে দিলাম। কয়েক মিনিট নীরবে অপেক্ষা করে রইলাম। মাঝে মাঝে অলক্ষ্যে তার মুখের পানে চেয়ে দেখলাম, একদৃষ্টে দরজার ভিতর দিয়ে সে ঐ সামনের অন্তহীন আকাশটির পানে চেয়ে আছে।

একপাশে একটা খাতা ও কলম পড়েছিল। মিট্‌মিটে আলোয় দেখলাম—খাতার বুকে কি সব লেখা। যেন ডায়েরীর মত। বড় কৌতূহল হ'ল দেখবার জন্য কিন্তু সবে মাত্র প্রথম দিনের আলাপ—মুখ ফুটে বলতে পারলাম না—কিন্তু চোখ আমার চেয়ে রৈল ঐ খোলা পাতারই ওপর।—

• • • মানুষ ফুলের গন্ধ মাখে তার বুক চিরে রেণু নিয়ে কিন্তু ভ্রমর মাখে তার নরম বুকে আপনাকে আবেগে লুটিয়ে দিয়ে। তার আসল কারণ এই, মানুষ ভালবাসে তার গন্ধকে তার পাঁপড়িকে কিন্তু ভ্রমর ভালবাসে তার রূপ সৌন্দর্য্য—তার সজীবতা—তার ভিতরকার সব কিছুকে।" • • •

হঠাৎ চুরি করে ডায়েরীর বুক থেকে এই কয়টি ছত্র পড়ে নিলাম। বুকখান আরও কৌতুহলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। মনে হল—কোথায় বুকের কোন নিভৃত কোণে এর সেই ব্যথার বেদনা দিনে দিনে এমনি করে ক্ষতের আকার বাড়িয়ে চলেছে যা'র অনন্ত কালিমা তার সারা দেহে মুখে বিজয়-কেতন উড়িয়ে দিয়ে বলতে চায় আমিই ব্যথার দীপ্ত প্রকাশ—আমারই স্পর্শে নীরেশ আজ স্বাস্থ্য ও শ্রীর একেবারে অস্তিমে এসেও এত সুন্দর!

আলাপের প্রথম পালা এই খানেই শেষ করে এলাম।

দিন চলে যায়। হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলাম নীরেশ আজ কাল মেসের অন্যান্য মেম্বরদের আলোচনার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। খাবার সময়, তাদের আড্ডায়, ছাদের মজলিসে, সব স্থানেই নীরেশের কথা ভিন্ন আর কোন কথাই যেন তাদের মুখে আসে না; এবং এই আলোচনায় নীরেশকে স্থির করেছেন কেউ বা এ্যানার্কিষ্ট; কেউ বা খুনী ফেরার—ইত্যাদি—ইত্যাদি।

অজ্ঞাত কুলশীল অপরিচিত মানুষের বিরুদ্ধে মানুষ দল বেঁধে এমনি সব কুৎসিত ধারণাকে মনে মনে গড়ে তুলতে ভারি আনন্দ পায় আবার যদি সেই অজ্ঞাত মানুষ নিরীহ হয় তবে ত তার আর কোন দিকেই মুক্তি নেই। তার

বিরুদ্ধে বাবুরা এত যে সব বিশ্রী ভিত্তিহীন ধারণার সৃষ্টি করতেন—তার প্রধান কারণ তার অবস্থা ছিল হীন আর সে যেচে কারো সঙ্গে আলাপ করতে যায় নি।

ছুটির দিন।

বোর্ডিং-এর অধিকাংশ লোকেই সেদিন দেশে গিয়েছিলেন। একটু নিরিবিলি পেয়ে নীরেশ সেদিন বিকেলটায় ছাদে উঠেছিল। ঘরের দরজাটা খোলাই পড়ে ছিল—উঁকি মেরে দেখলাম নীরেশ ভিতরে নেই।

বরাবর ছাদে উঠে গিয়ে দেখলাম—সে গালে হাত দিয়ে আলসের একপাশে চুপ করে সামনের এক ছোট্ট বাড়ীর পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামান্য একখানা দোতলা বাড়ী—দেখবার কিছুই সেখানে নেই। মধ্য অবস্থার এক তরুণ-দম্পতি একটি ছোট শিশুকে ঘিরে ঘিরে তার চারিপাশে আপনাদের আনন্দ-নিলয়টুকু গড়ে তুলছিল। মাত্র মাস দুতিন হল তারা ঐ বাসাটা ভাড়া নিয়েছে।

চুপি চুপি নীরেশের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। একজন সদ্য পরিচিতের পিছনে গিয়ে এমন অবস্থায় এমন নিঃশব্দে চুপি চুপি দাঁড়ানটা যে মোটেই ভদ্রতার চিহ্ন নয় তা' বেশ জানি; কিন্তু তবু কেমন মনে একটু সন্দেহ জাগল সেটাকে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না। সামনের দিকে চেয়ে দেখলাম—ছোট্ট ফুটফুটে ছেলেটি দোতলার বারান্দায় বসে আপন মনে খেলা করছে—আর তারই পানে নীরেশ একদৃষ্টে সতৃষ্ণ নেত্রে চেয়ে আছে

আমারও ভাল লাগল ঐ সংসারানভিজ্ঞ অল্পজ্ঞান শিশুটির সরল খেলা দেখতে। আপনার মনেই সে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, বল তুলে দেখে আবার ছুঁড়ে ফেলে দ্যায় আবার কুড়িয়ে আনে। পরিপক্ক মানব-মনের জটিল মনস্তত্ত্বের একটি ছায়াও তার মনে এখনও পড়ে নি—তাই হয় ত তার সে সরল মনস্তত্ত্ব সকলের ভাল লাগে না—পাগলামি বলে মনে হয়। বুদ্ধি মানেই যে মনের জটিলতা—তাই আমরা অতি সরল মানুষকে পাগল ভাবি।

একরূপ আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ নীরেশের দীর্ঘশ্বাস পড়ার শব্দে চমকে উঠলাম। সামনের বাড়ীর খোকার মা খোকাকে বুকে তুলে নিয়ে মুখে চুমো দিতে দিতে আপন মনে ভিতরে চলে গেলেন। নীরেশ মুখ ফিরিয়ে নিল।

পিছনে চাইতেই আমাকে দেখে প্রথমটা সে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই মুখে হাসি টেনে বললে,—কতক্ষণ এসেছেন, কিছু টের পাই নি ত' আমি!

আবার সেই হাসি—বুকের সেই ভাষা হাসির রেখায় রেখায় প্রতিফলিত।

মনে মনে ভাবলুম, বলি,—মানুষের একান্ত প্রিয় আনন্দে বাধা দেব—সে দানবীয় স্বভাব আমার নেই। কিন্তু সেটা আর মুখে উচ্চারণ করলাম না। বললাম, এইমাত্র আসছি—আপনি কি ভাবছিলেন, তাই ডাকি নি।

নীরেশ সেই খানে বসে পড়ল। বসে বললে, আজ একটু ছাদে এলাম হাওয়া খেতে—বেশ ঠাণ্ডা এই জায়গাটা।

পাশে বসে আমি উত্তর দিলাম, হুঁ—সারাদিন ঘরে বসে থাকা উচিতও নয়। একটু একটু ছাদে বেড়াবেন।

তার উত্তরে নীরেশ আবার একটু হাস্‌লে।

সকাল বেলা নীরেশ ডায়রী লিখছিল। স্নানের পূর্ব্বে একবার তার ঘরে ঢুকে পড়লাম। খাতার বুক থেকে মুখ তুলে সে কলম হাতে করে বললে—আসুন।

বসে পড়ে বললাম,—কি লিখ্‌ছেন?

হেসে উত্তর দিল, খেয়ালী মনের পাগলামী।

চক্ষু-লজ্জার বাঁধ ভেঙ্গে খাতাটা টেনে নিলাম, সেও কোন আপত্তি দেখাল না। লেখাটা পড়লাম। উপরে সে দিনের তারিখ—নীচে কয়েক ছত্র লেখা—

"পুরুষ ও নারীর আসল মিলন—দেহে দেহে, মনে মনে, আত্মায় আত্মায়, জীবনে জীবনে। এই দুই মহাশক্তির আসল মিলন সেই দিনই সার্থকতার চরম সীমায় এসে পৌঁছায় যে-দিন—তাদের উভয়ের ভিতরের বাঁধ একেবারে চুরমার হয়ে যায়—বিভিন্নতা বলে কিছুই থাকে না। বাহিরের আবরণ দূরে ফেলে ভিতরের দেবতাকে বাহিরে টেনে আনার প্রয়াস একটা প্রকাণ্ড মূর্খতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। দেবতার শক্তিকে পেতে হলে, উপাসনা করতে হয় তার মূর্ত্তিকে—তার বাহিরের আবরণকে। তাই দেবতার রূপকে মানুষ নিত্যকালের জন্য চির যুগ যুগ ধরে এত সুন্দর করে তুল্‌তে চায়।—

অসম্পূর্ণ লেখাটার উপর আর একবার চোখ বুলিয়ে খাতাটা সরিয়ে রাখলাম। নীরেশ মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল,—কি দেখ্‌লেন, পাগলামি নয়?

চুপ করে রইলাম; কি উত্তর দেব স্থির করে উঠ্‌তে পারলাম না।

মিনিট কয়েক পরে স্নানের জন্য উঠে গেলাম।

সন্ধ্যায় শুনলাম নীরেশের বিরুদ্ধে বোর্ডিং-এর সভ্যদের মধ্যে কি একটা কানাকানি চলছে। সামনের বাড়ীর তরুণীর পানে নীরেশ নাকি রোজ সন্ধ্যার সময় এক দৃষ্টে চেয়ে বসে থাকে। হয় ত এ অন্যায়, পর্দ্দা-নশীন মহিলাকে তার

অজ্ঞাতে দূর থেকে চুরি করে দেখে নেওয়া একটা মহাপাপ কিন্তু নীরেশকে যে ভাল করে চেনে সে কখনই একথা স্বীকার করে নিতে পারবে না এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। তার প্রথম দর্শনেই আমি বুঝেছিলাম—নীরেশ সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক উপরে—সে একজন অতিবড় সাধক তা' ধর্ম্মেরই হ'ক্ আর যারই হ'ক্। ও দীপ্ত চোখের অত্যুজ্জ্বল চাহনি সাধক ভিন্ন আর কারো চোখেই ত আমি পাই নি। এমনি জ্যোতিই আর দুটি চোখে আমি বহু পূর্ব্বে আর একবার দেখেছিলাম—চাইবাসার পাহাড়তলীর এক সাধুর শীর্ণ মুখে।

নীরেশের কানে বোধ করি এ সবই পৌঁছাত কিন্তু সে কোনও উত্তর দিত না।

নীরেশের সঙ্গে আমার বেশ আলাপ হয়ে গিয়েছিল এরি মধ্যে—এখন কেউ দেখলে মনে হবে যেন আমাদের কতদিনের আলাপ; আমরা যেন বহুদিনের পরিচিত দুই বাল্যবন্ধু। আর এই বন্ধুত্বের জন্য আমাকে বোর্ডিং-এর অন্যান্য লোকের কাছ থেকে অনেক ব্যঙ্গের হাসিও সহ্য করতে হয়েছিল।

একদিন নীরেশের কাছ থেকে তার জীবনের খানিকটা ইতিহাস শুনলাম।

মাসখানেকের আড়া-আড়িতে তার বাপ-মা দু'জনেই আজ বছর দুই হ'ল মারা গেছেন। তার মায়ের ছিল, যক্ষ্মা সেই থেকেই তাঁরা উভয়েই ঐ এক রোগেই মৃত্যুর মুখে গিয়ে পড়েন। নীরেশেরা ছিল দুটিমাত্র ভাই-বোন। বোনটির বিয়ে হয়ে গেছে এবং মাসখানেকের মধ্যেই বিধবাও হয়েছে—তবে শ্বশুরবাড়ীর অবস্থা নেহাৎ খারাপ নয় বলে এখনও সে সেইখানেই টি'কে আছে। নীরেশও এতদিন দেশেই ছিল, সেখানকার এক স্কুলে মাষ্টারী করত—কিন্তু আজ মাস দুএক হ'ল সে কাজে ইস্তফা দিয়েছে। তারপর পশ্চিমে কয়েক জায়গায় ঘুরে ঘুরে আজ এই বোর্ডিং-এ এসে উপস্থিত। কিন্তু কলকাতায় এত মেস বোর্ডিং থাকতে এখানকার ঐ ছোট্ট এতটুকু ঘরকেই কেন তার এত বেশী পছন্দ হ'ল তার কোন কারণই আমি নির্দ্দেশ করে উঠ্‌তে পারলাম না, আর সেও কিছু সে বিষয়ে প্রকাশ করল না। তবে অর্থাভাবের জন্য যে কখনই নয়—একথা আমি মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারি। কেন না বাসাভাড়ার জন্যে পাঁচটা টাকা আর বেশী দিতে সে পারে না—এমন হীন অবস্থা তার এখনও হয় নি।

আর স্বেচ্ছায় এমন করে সে তার মাষ্টারীই বা ছাড়ল কেন, দেশই বা ছাড়ল কেন—এরও কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আমি খুঁজে পেলাম না।

কিন্তু সেটাও বেশী দিন গোপন রইল না। একদিন অবসর বুঝে তার

মোটা খাতাখানা আগাগোড়া পড়ে নিলাম বেশ ভাল করে। সেই খাতা থেকেই তার আজীবনের সমস্ত ইতিহাসই পরিষ্কার আমার চোখের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

সেইদিন বুঝলাম একদিন যে তাকে আমি সাধক বলে স্থির করেছিলাম সেটা মিথ্যা নয়। একাগ্র সাধনাই আজ তাকে এমন করে আপন ভোলা উদাসীর পথে টেনে এনে ফেলেছে—দেশ বাড়ী আত্মীয় স্বজন সব কিছু থেকেই ছিন্ন করে। সে সাধনা ঈশ্বরের নয়, ধর্ম্মের নয়, মোক্ষের নয়, সে সাধনাতার প্রেমের—চির আকাঙ্খিত প্রিয়ার। সে সাধনা মুক্তির জন্য নয়, বন্ধনের জন্য। কিন্তু পূর্ণতা সে পায় নি আর ইচ্ছা করেই সে পেতে চায় নি।

ভালবাসা জিনিষটা যৌবনের একটা ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের পাকে সেও একদিন পড়েছিল। দেশেরই এক তরুণীকে সে ভালবাসল, প্রতিদানও সে কিছু কিছু পেয়েছিল, কিন্তু ইচ্ছা করেই দূরে দূরে সরিয়ে রেখেছে। সে জানতো আর একজনের কচি বুকে অনেকখানি নিবিড় ব্যথার সৃষ্টি এতে করেছে সে; তারও বুকে সে ব্যথার অনেকখানি আঘাত বাজতো—কিন্তু প্রাণপণে সে তাকে চেপে রাখতো। এই অমানুষিক সংযমের জন্য একদিন তাকে সত্য সত্যই একান্ত হৃদয়হীনতার পরিচয় দিতে হয়েছিল।

ত্যাগের মন্ত্রে আপনাকে দীক্ষিত করে একান্ত স্বার্থপরের মত সে শুদ্ধ আপনারই জীবনকে অতিমাত্রায় মহীয়ান করে তুলতে চায় নি। আপনার বুকের উপর প্রিয়ার সেই নরম বুকের স্পর্শকে সে চিরদিনই কামনা করে এসেছে—নরম দুটি অধরের অমিয় স্পর্শের জন্য চিরদিনই সে তৃষিত অন্তরে অনেক রাত্রে বিনিদ্র চক্ষে পায়চারি করে কাটিয়েছে—বিভ্রান্ত দিশাহারা সংজ্ঞাহীন পথিকের মত—কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই একটা একটানা চিন্তা তার মনের কোণে চিরজাগ্রত প্রহরীর মত কেবলই তাকে শাসিয়ে এসেছে, সে তার পিতা মাতার মৃত্যুর মূল কারণ। যক্ষ্মাগ্রস্ত স্বাস্থ্যহীন পিতামাতার সন্তান সে যে। আপনার উন্মত্ত কল্পনাকে চরিতার্থ করতে গিয়ে একটা বিষদগ্ধ ক্ষয়িষ্ণু বংশের সৃষ্টি করতে কিছুতেই চায় নি সে। আপনার তৃপ্তির জন্য আর একটা নিরপরাধিনীর প্রতি রক্ত বিন্দুর সাথে সাথে মৃত্যুর বীজ ব্যপ্ত করে দেওয়া,—সে যে দানবেই পারে, মানুষের বুক তাতে না কেঁপে পারে না।

কিন্তু আজ যে তার এই পরিপূর্ণ যৌবন, তার এই জীবন-ভরা আকুল প্রেম এমন করে ব্যর্থ হয়ে গেল, কার দোষে ভগবান?

মাঝে মাঝে দৌর্ব্বল্যের মুহূর্ত্তে সে তার জীবন-দেবতাকে কতদিন অভিশাপ দিতে গিয়েছে—কিন্তু অনেক কষ্টে সামলে নিয়েছে। মনে মনে ভেবেছে—এ দোষ তার ভাগ্যের; নইলে কি তার আবশ্যক ছিল এমন সর্ব্বনাশী মৃত্যুর বীজভরা ব্যর্থ জীবন নিয়ে জন্মাবার?

বিরহ বিধুরা প্রিয়া তার এমনি করে দিনের পর দিন নিরন্তর প্রত্যাখ্যানের বাণ খেয়ে খেয়ে ব্যথিত হয়েও সে তার হৃদয়ের দ্বার থেকে ফিরে যেতে চায় নি;—সুবাসিত যৌবনের রঞ্জিত ডালি সে চিরদিন একই ভাবে ধরে ছিল তার প্রিয়তমের তাপিত অধর তলে, একদিন তার নৈবেদ্য দেবতার ভোগে লাগবেই এই আশায়। কিন্তু মানুষের চোখে যখন তার যৌবনের উদ্বেল আকুলতা একেবারে প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন তার বাপ-মা তার মতের অপেক্ষা না করেই কোন্ এক অজানা পুরুষের হাতে তাকে সমর্পন করে দিলেন আর সেই থেকে সে হল পরস্ত্রী।

কিন্তু নীরেশের মনের কাছে সে পরস্ত্রী নয়, সে তার চিরকামনার প্রিয়া।

দুপুর রাতে নীল আকাশের তারার দল চেয়ে থাকে অনিমেষ নেত্রে ধরণীর নগ্ন বুকের পানে; নীরেশ তাদের পানে অতৃপ্ত চোখে চেয়ে চেয়ে ভাবে, ওরা সব যত এই বিগত বিরহীর চির পিপাসিত আত্মা ··· জীবনে এক ফোঁটা তৃপ্তির অভাবে এরা আজ এমন করে রাতের পর রাত নিদ্রাহীন নেত্রে কাটিয়ে চলেছে। মুক্তি এদের কোন দিনই নেই।

নীরেশের আত্মাও হয় ত একদিন ঐ দূর দিগন্তের তারার দলে গিয়ে মিশবে, এমনি করে এখানকার ধরণীর বুকে চেয়ে থাক্‌বে অমনি অতৃপ্ত কামনার বহ্নি দুই চোখে জ্বেলে নিয়ে। ··· কত বিনিদ্র নিশীথে হয় ত সে এমনি নিবিড় ব্যথার বেদনার ভাষাহীন অস্ফুট কণ্ঠে ককিয়ে উঠ্‌বে—ওগো মোর জীবন রাজ্যের প্রিয়তমা! ··· দরদী ঐ নক্ষত্রের কাছেই শুধু সে ভাষা ব্যক্ত করবে তার বুকের পাষাণ-ভারি ভাব, আর ত কোথাও নয়।

বোর্ডিং-এর সামনে ঐ যে ছোট্ট একটি দ্বিতল বাড়ী, ওর তরুণী বধূই নীরেশের প্রিয়া, স্বামীর চাকরীর জন্য আজকাল তারা এখানে বাসা নিয়েছে।

প্রিয়া কিন্তু জানে না নীরেশ তার এত কাছে মুখ বুজে আছে! সন্ধ্যার সময় রোজ রোজ নীরেশ একটী বার করে আড়াল থেকে তাকে দেখে নেয়, হয় ত অতৃপ্ত কামনার পীড়নে বুক তার হাহাকারে ভরে ওঠে, চোখ জ্বালা করে,

সর্ব্বশরীরে মাংসপেশী কেঁপে কেঁপে শিথিল হয়ে আসে তবু সে সজোরে তাকে চেপে রাখে, হৃদয়ের টুঁটি চেপে তাকে মারতে চায়।

এতদিনে বুঝলাম কেন আজ নীরেশের কলিকাতায় এত মেস বোর্ডিং থাকতেও এই ক্ষুদ্র অ তটুকু অন্ধ কূপটাকেই এত বেশী পছন্দ হয়ে উঠ্‌ল।

প্রেমের সাধনা নীরেশকে যে আজ ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথেই টেনে নিয়ে চলেছে নীরেশ তা' বুঝ্‌তো। তাই তার মুখে কথায় কথায় ঐ বিকৃত হাসি।

হ'লও তাই। নীরেশের ইহজন্মের সাধনা একদিন সত্য সত্যই তাকে মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে এল . . . .

একদিন সকালে উঠে নীরেশের ঘরে গিয়ে দেখি দরজা খোলা পড়ে আছে— রাঙা কম্বলের উপর নীরেশ অসাড় নিস্পন্দ পড়ে আছে।

ঘরে ঢুকেই চম্‌কে উঠ্‌লাম। চোখ তার স্থির অনিমেষে সাম্‌নের পানে চেয়ে আছে! বালিশের আশে পাশে কম্বলের উপর, গালে মুখে চারিদিকে ঘন ঘন রক্তের চাপ শুখিয়ে আছে।

পাশে এসে ডাক দিলাম, নীরেশ।

অর্থহীন দৃষ্টিতে সে একবার ফ্যাল ফ্যাল করে আমার পানে চাইল, তার পর অতি ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিল—এঁ্যা!

—একি ভাই?

—সব শেষ!

তার পর হাতের ইঙ্গিতে জলের কলসীটা দেখিয়ে জানালে জল দিতে।

জল গড়িয়ে দিলাম।

মুখে ঢালতে গিয়ে খানিকটা মুখে পড়ল—খানিকটা বাইরে গড়িয়ে পড়ে বালিশ কম্বল ভিজিয়ে দিল।

বোর্ডিংময় হৈ হৈ পড়ে গেল। এক মৃত্যু-পথ যাত্রী যক্ষ্মা রোগী কিনা এত দিন তার রোগ লুকিয়ে এখানে পড়েছিল! স্থির হয়ে গেল আজই তাকে হাসপাতালে চালান দিতে হবে।

কিন্তু হাসপাতালে তাকে আর চালান দিতে হল না। অপরাহ্নের দিকে তার অবস্থা প্রায় শেষ হয়ে এল।

আপিস কামাই করে সারাদিন তার পাশে বসে বসে কাটিয়ে দিলাম। দশটায় আপিশ যাবার সময় সবাই এক একবার সে ঘরে উঁকি মেরে চেয়ে চলে গেল।

অপরাহ্ণের দিকে বালিশের নীচে থেকে একটা খামের মোড়ক বার করে নীরেশ ধীরে ধীরে আমার হাতে দিল। খুলে দেখলুম দশ টাকার নোট এক তাড়া বাঁধা—প্রায় হাজার টাকা।

পাশের ছোট বাড়ীটার পানে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, ঐ বাড়ীর খোকার নামে পাঠিয়ে দিও।

খানিক চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, ও বাড়ী একবার খবর দেব? এখন ত কেউ বাসায় নেই, একবার শেষ দেখা—

আমার মুখের পানে সকরুণ নেত্রে সে একবার চাইল। মনে হল তার সর্ব্বশরীর যেন একবার মুহূর্ত্তের জন্য কেঁপে উঠ্‌লো।

ম্লান একটু হেসে শুধু বললে, না!

সন্ধ্যার পূর্ব্বে নীরেশ মারা গেল।

রাত্রে তাকে পুড়িয়ে যখন বাসায় ফিরলাম তখন রাত প্রায় একটা। কেউ কোথাও জেগে নেই। ধীরে ছাদের উপর চলে গেলাম।

সামনের বাড়ীর মেয়েটী তখন অশান্ত খোকাকে কোলে নিয়ে ছাদে বেড়িয়ে শান্ত করছে, কিন্তু কিছুতেই সে শান্ত হতে চায় না। কেবলই ক্ষণে ক্ষণে থেকে থেকে ককিয়ে উঠ্‌ছে; কিসের সে নিরুদ্ধ বেদনা সে-ই জানে।

তার বড় প্রিয় আরাধ্য দেবতা আজ কোথায় কোন্ অনন্ত লোকে অন্তর্হিত হয়ে গেল সে কি তার একটু জানে? তার আবাল্যের জীবন-দেবতা আজ অনন্ত কালের জন্য সমাহিত!

ধীরে ধীরে পকেট থেকে নীরেশের দেওয়া খামের মোড়কটা বার করলাম। খুলে দেখলাম নোটের তাড়ার সঙ্গে এক টুকরা কাগজ পিন দিয়ে আঁটা আর তার গায় লেখা, কাল খোকার জন্মদিনের উপহার।—নীঃ।

শুক্লষষ্ঠীর খণ্ড চাঁদ তখন বড় বাড়ীটার আড়ালে হেলে পড়েছে। অনেক কষ্টে খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে তরুণী ঘরে চলে গেল। সামনের ছোট বাড়ীও আবার তেমনি নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলাম, বুকের সমস্ত বেদনা নীরবে সহ্য করে নীরেশ আজ তার সারা বংশের প্রায়শ্চিত্ত করে গেল। আপনার জীবনকে মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত অনন্ত ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে টেনে এনে তার জীবন-দেবতা কি আজ এতে পরিপূর্ণ তৃপ্তি পেয়েছেন?

চাঁদ সে রাত্রির জন্য পরপারে ডুবে গেল।

বিদ্রোহী

শ্রীবিভাবতী দেবী

কে তুমি বিদ্রোহী মোর বক্ষমাঝে থেকে থেকে
করিছ গর্জ্জন,—
যেথা ক্ষুদ্র জীবনের বিচিত্র তরঙ্গগুলি
করিছে নর্ত্তন !
ভৈরব হুঙ্কারে হাঁকি' কাঁপায়ে তুলিছ সারা
বুকের পঞ্জর ;
বাসনার অঙ্ক পরি প্রমত্ত তাণ্ডবে রত
হে প্রলয়ঙ্কর,—
রণ আবাহন ধ্বনি গরজিয়া দিলে শূন্যে
জলদ নিনাদে
পুঞ্জীভূত কামনার সমাধান করি দিলে
নিমেষ নিপাতে !

স্বপনের সুপ্তি মাঝে মুরছিয়া পড়ে যবে
সকল পরাণ,
অমনি সুদূর হতে বিষাণে নিনাদ দিলে—
আকুল আহ্বান !
বসন্তের উতরোলে হৃদয়ের রন্ধ্র যবে
মর্ম্মরিত গানে,
ক্রন্দন কল্লোলে ভরা চির তীব্র আর্ত্তস্বর
বাজাইলে প্রাণে।
বরষার খরধারে নামে যবে বক্ষ মাঝে
কামনার বাণ
নিরাশার শঙ্খরবে দীর্ণ করি দিয়ে গেলে
সকল পরাণ !

ধ্বংসের পঞ্জর-তটে এবার দুর্জ্জয়রূপে
চকিতের লাগি
প্রকাশিলে মর্ম্মমাঝে বক্ষজোড়া বেদনার
অশ্রু-অর্ঘ্য মাগি'।
মোহন ভয়াল রূপ পরিপূর্ণ করি দিল
সকল পরাণ;
অম্বর ব্যাপিত জটা করি দিল নিখিলের
আলোক নির্ব্বাণ!

তড়িৎ ত্রিপুণ্ড্র ভালে পিণাকে টঙ্কার হানি,
কাঁপাইয়া দিক্,
সংহার ত্রিশূল ধৃত দেখিলাম অপরূপ!
আঁখি নির্নিমিখ্!
কণ্ঠে ধর উগ্রজ্বালা,—আমার সকল সুখ
চুম্বনে নিঃশেষি,'—
বজ্রনাদে বাজাইয়া ত্রিলোকের বক্ষজোড়া
ঘোর অট্টহাসি,—
বিষাণে নিঃশ্বসি' দিলে দিগ্বিদিকে প্রলয়ের
মত্ত প্রভঞ্জন!
উন্মত্ত আনন্দ তব শিহরিছে মর্ম্মমাঝে
সকল চেতন!

তাণ্ডবের তালে তালে বাজালে বেদনা মোর
নিকরুণ সুরে;
হে দুর্জ্জয়! একি লীলা করিতে এসেছ তুমি
এ জীবন জুড়ে!
বুঝিতে পারি না পারি, আজিকে ঘুচেছে মোর
সব ব্যথা ভয়,—
সকল চেতনা জুড়ি' আজ শুধু বেজে ওঠে
জয়, তব জয়!

শরৎচন্দ্র

(যৌবনে)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যে আমাদের এই বৃহৎ পরিবারটি নানাদিক হইতে এমনি বিধ্বস্ত হইয়াছিল যাহার ফলে পূর্ব্বের ধারা আর কিছুতেই বজায় রহিল না।

প্রকাণ্ড বাড়ীখানা প্রায় জন-শূন্য। ভিন্ন-ভাগ, মামলা-মকদ্দমায় নিমেষে যেন সব তচ্-নচ্ হইয়া গেল। বাহিরের বাড়ী হইতে পেয়াদার দল দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইল, থাকিবার মধ্যে রহিল কেবল বেচারা গৌরী-সিং; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে মৃত্যুর আহ্বানে সেও চলিয়া গেল!

তখন আমরাও পিতাঠাকুরের কর্ম্মস্থল মালদা জেলায় চলিয়া গেলাম। জ্যেঠা মহাশয়ের মৃত্যুর পর অভিভাবকহীন বাড়ীতে থাকা বোধকরি আর কিছুতেই সম্ভবপর হইল না।

মনে পড়ে, খুব সমারোহের সহিত আমাদের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজা হইত। গুরু আসিয়া স্বয়ং পূজায় বসিতেন। সাজ আসিত বাংলা দেশ হইতে। এক মাস ধরিয়া প্রতিমা গড়ার ধুম চলিয়াছে—কাঠাম পূজা, খড়-বাঁধা, একমেটে, মুখ গড়া, দোমাটির সময় কারিকরের কাজের উপর জ্যেঠা মহাশয়ের কঠোর সমালোচনা! তাহার পর খড়ি দেওয়া চিত্র করা, সাজ পরাণ, ঘামতেল মাখান ইত্যাদির ধুমে আমাদের যেন নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ থাকিত না।

সে-বার জ্যেঠামহাশয়ের মৃত্যুর পর জগদ্ধাত্রী আসিলেন ঘটে! সে এক নিরানন্দের ব্যাপার। কৌলিক পূজা—ফেলিতে নাই—তাই হইল। মনে পড়ে, সে-বারের পূজা বোধন হইতে বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত চোখের জলেই সম্পন্ন হইয়াছিল। সে সব কথা মনের উপর গভীর দাগ রাখিয়া গেছে;—এ জীবনে আর মুছিবার নহে!

এই পূজার পর আমরা চলিয়া গেলাম। সেখানে গিয়া সুখে দুঃখে দিন কাটিতে লাগিল। একদিন বাবা আসিয়া মাকে প্রফুল্ল-মুখে বলিতেছেন,

শুনিলাম :—অনেকদিন পরে আজ মতিলালের চিঠি পেয়েছি—সে ভাগলপুরে আস্‌তে চায়, . . . আমি তাকে আস্‌তে লিখে দিলুম। . . .

এই কথা শুনিয়া আমাদের আর আনন্দ ধরে না—শরৎ তাহা হইলে ভাগলপুরে আসিতেছে। আমরা সেদিন সত্য সত্যই নৃত্য করিয়াছিলাম। এখন সেই কথা মনে করিয়া হাসি পায়। কোথায় সে রহিল, কোথায় রহিলাম আমরা কিন্তু কি আনন্দ! এই শিশু-বুদ্ধি!

* * * *

চৈত্র মাসে আমরা আবার বাড়ী আসিলাম। শরৎ তখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া ফলের অপেক্ষায় আছে। মাথায় লম্বা চুল। তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হাসে; কিছু বলিতে চায় না।

বাহিরের বাড়ীতে জ্যেঠামহাশয়ের যে পূজার ঘরটি ছিল—শরৎ সেইখানে নিজের বাসা বাঁধিয়াছিল। ঘরখানি খুব ছোট, একটি দড়ির খাট ও টেবিল রাখিবার পর আর নড়িবার চড়িবার স্থানও ছিল না। পূবের দিকে জানালা, উত্তর-পশ্চিমে ঘরে ঢুকিবার দরজা। টেবিলের উপর কেতাবদান; সকলের উপর থাকে গোটা কয়েক কফির টিন সাজান ছিল।

টেবিলের উপর এক রাশি খাতা-পত্র! তাহাতে ছোট ছোট অক্ষরে শরতের হাতের লেখা। মনে আছে, খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরে সেদিন আমি তার ঘরে গিয়া বসিলাম। সে প্রসন্ন মনে তার লেখা-পড়ার কথা আরম্ভ করিয়া দিল।

সর্ব্ব প্রথমে কফির পাত্র-গুলি দেখাইয়া বলিল, যদি পাশ করি ত ওরই জোরে।

কেন?

দেশে থাক্‌তে কি কিছু করেছিলাম? এখেনে এসে দেখি সবাই দিচ্চে পরীক্ষা। তখন উঠে-পড়ে লেগে গেলাম। কফি খেয়ে সমস্ত রাত জেগে পড়তাম, তার প্রসাদীর সেবা করতাম।

প্রসাদী তার বড় মামার একমাত্র কন্যা। সেই বৎসর কালাজ্বরে তার মৃত্যু হয়।

পাশ হবে ত?

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, দেখি কি হয় এখন।

তাহার চোখ দুইটির মধ্যে কিন্তু—"তাতে বোধ করি কোন সন্দেহ নেই!"

এমনি একটি কথাই প্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু মুখে সে বিনয় করিয়া বলিল, বড় শক্ত, কি জানি কপালে কি আছে!

শরৎকে সেইদিন আমি প্রথম তামাক খাইতে দেখিলাম। তামাক সেবন যে মহাঅপরাধ, এমনি একটা সংস্কার বোধকরি শিশুকাল হইতে আমরা পোষণ করিবার শিক্ষা পাইয়াছিলাম! তাই আমার মনে বড় কঠিন ধাক্কা লাগিয়াছিল। কিন্তু কিছু বলিতে সাহস হয় নাই।

তাহার তামাক খাইবার কায়দা দেখিয়া আমার আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। গুড়-গুড়িটি খাটের তলায় ছিল এবং খাটের দড়ির ফাঁকের মধ্যে দিয়া নলটি বালিশের পাশে ইচ্ছামত উঠিতে-নামিতে পারিত। ভিতর হইতে দরজায় খিল আঁটিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে বিছানায় শুইয়া পড়িয়া সে নিমেষে ছোট ঘর-খানি ধূমাচ্ছন্ন করিয়া দিল। আমার সেদিকে চাহিয়া দেখিতে কেমন বাধ-বাধ ঠেকিল। বোধ করি, মনে হইয়াছিল যে, এই কু-অভ্যাসটি শরতের ভবিষ্যৎকে হয় তো এমনি করিয়াই সমাচ্ছন্ন করিয়া দিবে। আগের কথাগুলি লেখার পর শরতের একখানি ছায়াচিত্র আমার হাতে আসিয়াছিল। সে খানিতে অতি যত্ন সহকারে তাহার তামাক সেবনের চিত্র তোলা হইয়াছে। দেখিলেই বোঝা যায় যে, মানুষের চেয়ে গুড়গুড়ির আদর বেশী। নেশাটা চিরদিনই অবজ্ঞার বিষয় কিন্তু এক একজন মানুষের জীবনে তাহা কতখানি স্থান জুড়িয়া বসে এবং দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের সহিত জড়িত হইয়া যায়, ভাবিতে গেলে অবাক হইতে হয়; আবার হাসিও পায়।

সেদিন সে একমনে তামাক খাইতে লাগিল এবং আমি টেবিলের খাতাগুলি নাড়াচাড়া করিতে লাগিলাম। একখানা খাতার মলাটের উপর স্পষ্ট বড় অক্ষরে লেখা ছিল "কাক-বাসা"। উপন্যাস-লেখার এই বোধ করি আদিচেষ্টা।

এখানি পড়িবার সুযোগ ঘটে নাই। কিন্তু সে সময়ে এখানি লিখিতে তাহাকে বহু সময় ব্যয় করিতে দেখিয়াছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথা দিয়া কাটিয়া যাইত—সে মহানিবিষ্ট মনে লিখিয়াই চলিয়াছে।

বর্ষা চলিয়া যাইবার কয়েক দিন পূর্ব্বে সে তাহার লেখাগুলি আমাদের জিম্মায় রাখিয়া গিয়াছিল। লেখা পছন্দ হয় নাই বলিয়া সে এই বইখানি ফেলিয়া দিয়াছিল। * * *

শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনীতে ইন্দ্রনাথের একটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্র নহে! এই পুস্তকখানির বহু ঘটনাও সম্পূর্ণ কল্পনা প্রসূত নহে। ইহা অতিশয়

কৌশলের সহিত লিখিত ; বাস্তব এবং কল্পনা এমন অপূর্ব্ব সুন্দর ভাবে মিশ্রিত যে, তাহাকে কাহারো জীবন-কাহিনীও বলা যায় না—আবার সম্পূর্ণ উপন্যাস বলিয়া ধরিলেও ভুল করা হয়।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, শরতের জীবনে তখন ইন্দ্রনাথের প্রভাবের যুগ আরম্ভ হইয়াছিল। ইন্দ্রনাথ একটি কাল্পনিক নাম। ইন্দ্রনাথকে আমরা রাজেন্দ্র বলিয়া জানি। তাহার ডাক নাম ছিল "রাজু"।

রাজেন্দ্রনাথের কৈশোর-কাহিনী যেরূপ উজ্জ্বল ভাবে আঁকা হইয়াছে— তাহার পর আমার অক্ষমতা দিয়া তাহা ক্ষুণ্ণ করিতে চাহি না। শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, শরৎচন্দ্র রাজুকে বাস্তবের ক্ষণিক অনিত্যতা হইতে সাহিত্যের চির-নিত্যতার মধ্যে আনিয়া অমরত্ব দান করিতে যে-টুকু রস-যোজনার প্রয়োজন —তাহা পরিপূর্ণ ভাবে করিয়াছেন। সেখানে সত্য মলিন না হইয়া প্রোজ্জ্বল হইয়াছে। চিত্রের পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে যেমন দূরে সরিয়া যাইতে হয়—তাহাতে অনেক বাস্তব প্রচ্ছন্ন হয়—অনেক শূন্যতা কল্পনার স্নিগ্ধালোকে পূর্ণ হইয়া উঠে, ইন্দ্রনাথকে উদ্ঘাটিত করিতে শরৎচন্দ্র যথাযথ ভাবে ঐটুকু মাত্র করিয়াছেন। তাহাতে পরিচিত চরিত্র আরো সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে মাত্র ; কোথাও ক্ষুণ্ণও হয় নাই। এইখানেই লেখকের অসামান্য কৃতিত্ব। যাঁহাদের রাজুকে প্রত্যক্ষ ভাবে জানিবার সুবিধা ঘটিয়াছিল—একথা তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন।

রাজেন্দ্রনাথ আমাদের চেয়ে বয়সে পাঁচ-ছয় বৎসরের বড় ছিলেন ; তাঁহার সহিত ঘনিষ্ট ভাবে মিশা সম্ভব হয় নাই ; তবে দূরে থাকিয়া তাঁহার বীরত্বের কার্য্য-কলাপ দেখিয়া ভয়ে-বিস্ময়ে এবং আনন্দে বিমোহিত হইতাম মাত্র।

এক দিনের কথা বেশ মনে পড়িতেছে। গঙ্গাতীরে জমিদারদের শিবালয়ের পাকা রওয়াকের উপর—(যাহা এখনো 'পাকা' বলিয়া অভিহিত হয়)— সূর্য্যাস্তের পর, কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে বসিয়া "রাজু" বাঁশী বাজাইতেছিল, তেমন মধুর বাঁশী খুব অল্পই শুনা যায়। আমরা একদল বালক দূরে বসিয়া শুনিতে-ছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন হঠাৎ তালি দিয়া তাল দিতে আরম্ভ করিল। রাজু কয়েকবার তাহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া—অবশেষে বাঘের মত লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে এমন প্রহার করিল যে, বালকটি প্রায় হত-চৈতন্য হইয়া গেল। আমরা ছুটিয়া পলাইয়া গেলাম।

নিশ্চয়ই সেদিন লঘু পাপের গুরু দণ্ড হইয়াছিল। কিন্তু রাজুর কাছে অপরাধ করিয়া নিষ্কৃতি পাইবার কোন উপায় ছিল না— রাজ-পুত্রেরও নয়।

এইটুকু বলিয়া শেষ করিলে তাহার প্রতি কতকটা অবিচার করা হয়; তাই আরো দুই একটা ঘটনার কথা বলি।

একদিন গঙ্গার ঘাটে কয়েকজন মহিলা স্নান করিতেছিলেন। স্নানের পর তাঁহারা তখন পূজা-আহ্নিক সুরু করিয়াছেন—এমন সময় সেখানে কয়েকজন হিন্দুস্থানী আসিয়া স্নান করিতে নামিল। তাহারা এই পূজা-রতা মহিলাগণের সম্ভ্রম রক্ষা না করিয়া পরস্পর হাসা-হাসি ও জল ছিটা-ছিটি করিতে লাগিল। ঘাটে কয়েকজন বয়স্ক লোকও ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে ইহার প্রতিবিধানের কোন চেষ্টা দেখা গেল না। হঠাৎ কোথা হইতে রাজু আসিয়া বাঘের মত তাহাদের মধ্যে পড়িয়া—গলায় গামছার পাক দিয়া জলে ডুবাইয়া ধরিয়া—এমন নাকানাবুদ করিল যে, শেষ পর্য্যন্ত তাহারা করজোড়ে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিল এবং ঘাট মানিয়া ঘাট-ত্যাগ করিয়া গেল।

—ক্রমশ



আশাতীত

শ্রীসুশীলাসুন্দরী দেবী

আজ এতদিন পরে,
ওগো সুদূরের দেবতা আমার !
এত কাছে এলে সরে' !
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত দু'আঁখি
পল্লব দ্বার ফেলিয়াছে ঢাকি'
বাসনার বাতি কবে নিভে গেছে
দুর্ব্বিপাকের ঝড়ে
আশার অতীত ! ধরা দিলে আজ
আশাহীন অন্তরে।

আমি ত জানি না নাথ !
জীবনে আবার আসিবে আমার
এমন সুপ্রভাত !
তোমারি মাধুরী অরুণ লাগিয়া
শতদলে প্রাণ উঠিল জাগিয়া
তোমারি চরণ-পরশ মাগিয়া
চেয়েছিল দিনরাত,—
করুণ নয়নে তখন বারেক
ফিরে চাহিলে না নাথ !

ভাগ্যের পরিহাসে,
ভগ্ন মৃণাল সে কমল আজ
পঙ্কিল জলে ভাসে।

এতদিন পরে তব আগমন
একি জাগরণ ? একি গো স্বপন ?
কোথা বসাইব—কাঁপে তনু মন
উদ্বেল উচ্ছ্বাসে ।
বিপুল পুলকে ফেটে পড়ে হিয়া
নিশ্বাসে নিশ্বাসে ।

ওগো সুদূরের ধন !
ও চরণে কভু লাগে নি আমার
কল্পনা-পরশন ।
বিস্ময়ে আজ ভাষাহীন মুখ,
পরাণে সহে না দুঃসহ সুখ,
এত অবশেষে এত কাছে এসে
এত প্রেম বরিষণ !
চির-অরাজক রাজ্যে তোমার
করিলে পদার্পণ ।

স্রষ্টা

শ্রীযুবনাশ্ব

. . . দিগন্ত ছোঁওয়া মাঠ,—কোথাও ঘন লতা গুল্মে অন্ধকার,—কোথাও কচি ঘাসের সবুজ হাসিতে উজ্জ্বল! দূরে এ-ধারে ও-ধারে ধোঁয়ার মতো রহস্যে ঢাকা বিরাট পাহাড় . . .

সে চলেচে। তার পায়ে চলার পথ রাঙা হয়ে মাটীর বুকে ফুটে উঠ্‌চে।

গাছ, পাতা, ফল, ফুল, নদী, পাহাড়, তার আসাতে ভারী খুশী! তাকে জড়িয়ে ধরে, বুকে নিয়ে বলে, . . . তুমি এসেচ? আমরা সার্থক হলাম! ধন্য হলাম!

সে হেসে সবার সাথে কথা কয়, বসে সবার সাথে গল্প গুজব করে, . . . তারপর আবার উঠে চল্‌তে সুরু করে।

সারাদিন আগুন ঢেলে তার মাথার ওপর দিয়ে সূর্য্য ঢলে পড়ে অস্তাচলে,—যাবার সময় রাঙা হয়ে তাকে বলে যায়, . . . ভাই, চল্‌লাম! আবার দেখা হবে কাল . . .

সে ঘাড় কাৎ করে বলে, . . . এসো!

সন্ধ্যার গোধূলি তাকে ঘিরে নিবিড় হয়ে ওঠে। পাখীর ক্লান্ত কূজনে, তারার ঈষৎ আলোয় রাত্রি তাকে মায়ের মতো বুকে টেনে নিয়ে ঘুম পাড়ায়। সে শান্ত বিশ্বাসে মার কোলে ঢলে পড়ে।

আবার ভোর হয়, পাখী ডাকে। দিনের আলো তার চোখে চুমো খেয়ে বলে, . . . এত ঘুম!

আবার চলা সুরু হয়। নতুন করে মাটীর সাথে পরিচয়ের পালা চল্‌তে থাকে।

সবাই বলে, . . . এই যে! এসো। তোমার আসার আশায়ই ত আমরা উৎগ্রীব হয়ে আছি!

সে হাসে।

মরুভূমির তপ্ত হাহাকারের মধ্যে তার পায়ের ছোঁওয়ায় ফুল ফুটে ওঠে। তার পদ-চিহ্ন ধরে পাহাড়ের নির্ম্মম গায়ে মন্দাকিনী ধারা বয়।

সবাই বলে···প্রাণ দিয়েচ তুমি আমাদের! তুমি স্রষ্টা!

সে দূর আকাশের নীলিমার দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ায়। তার মাথা নত হয়ে আসে—যুক্তকর আপনিই ললাটে গিয়ে পৌঁছে।

আবার সন্ধ্যা হয়—রাতের নিকষে আবার ভোরের কণকরেখা ফুটে ওঠে।

বিশ্রাম ও পথ-চলা সমান তালে চল্‌তে থাকে!

* * * *

হঠাৎ একটা ঝাঁকুনী খেয়ে তার সব এলোমেলো হয়ে গেল। মনে হল, মায়ের তপ্ত নিবিড় আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে সে ঠাণ্ডা কোন্ এক জায়গায় এসে পড়েচে।

তার চোখে পড়ল, মস্ত বড় বড় মানুষের ব্যস্ত সমস্ত চেহারা, কানে এল তাদেরই দুর্ব্বোধ্য ভাষায় বিচিত্র কোলাহল। শুধু একটী পরিচিত শব্দ সে শুন্‌তে পেল . . . মা! মা!

তারই মাধুর্য্য ও আশ্বাসে তার দু'চোখ বুজে এল।

* * * *

পাড়া কাঁপিয়ে শাঁখের আওয়াজের সাথে সাথে ভারী গলার হাঁক শোনা গেল,—

বলি অ' খাক,—অ' কুসুম,—ওলো দেখে যা লো! টেঁপীর কেমন চাঁদপানা খোকা হয়েচে—



মনে মনে

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

মনের কথা হউক এবার মনে মনে চুপ করে',—
ভাষার নূপুর খুই খুলে';
ধ্বনির বীণায় হান্‌ব না রে, এবার ফুটুক রূপ ধরে'
তোমার আমার সকল কথা বুকের ব্যথার যূঁই ফুলে।

কাঁদিস্ নি আর কণ্ঠ-গাঙে তুলে মুখর কল্লোল
অমন করে' তুই ভুলে';
চোখের জলেই কর্‌ব এবার আমরা ব্যথার জল-দোল,
নীরব রোদন ঢেউ খেলে' যাক্ দৃষ্টিপাতের দুই কূলে!

মনের কথা হউক এবার মনে মনেই চুপ করে,'—
মুখোমুখি চোখ তুলে';
হাতের পরে হাতটি রাখিস্—দু'ঠোঁট চাপিস্ খুব জোরে,
আজ আরতি মৌনতমের মগ্ন মনালোক তুলে।



মুর্শীদ্যা গান

শ্রীজসীম উদ্দিন

মুর্শীদ্যা গান—কান্নার গান। চোখের জলের বাঁধন-হারা ধারায় সিক্ত এর সুর।—গেঁয়ো কৃষকের কাঁদন-ধোয়া কণ্ঠে এর স্থিতি।

কত যুগ যুগান্তরের কান্নাই না চলিয়া গিয়াছে; গ্রামের বুকের উপর দিয়া কত বেহুলার নয়ন গলান প্রেম 'গংকুড়ের' আকাশ ছোঁয়া তরঙ্গে ভেলা ভাসাইয়া মড়া পতিকে জিয়াইয়া আনিয়াছে, কত 'আমীর সাধুর' বিরহী সাবিন্দা দূর দেশে 'বেলয়ার' সন্ধানে কাঁদিয়া কাঁদিয়া গুমরিয়া মরিয়াছে, গ্রাম কেবল দেখিয়াছে আর অঝোরে কাঁদিয়াছে। তার সাপ্‌লা-ভরা ঝিলের ধারে কলসী ভরিয়া কত গ্রামের মেয়ে আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া দূর দেশে পতির উদ্দেশে চোখের জল ফেলিয়া গিয়াছে। গ্রাম তার সে কান্না ভুলে নাই। রাখালী, কেচ্ছা ও বারমাসীর গানে গ্রাম তা বুকে আঁকিয়া রাখিয়াছে।

এই সব গান কান্নায় হইলেও ইহাতে গ্রামের তৃপ্তি হইল না, বাহিরের এই কান্নার সাধনা যে দিন তার অন্তরের ঠাকুরকে জাগাইয়া তুলিল সেদিন বাউল-কবির একতারায় এক নূতন সুর বাজিয়া উঠিল—

"তুমি দাও দেখা সোনারচান আমারে—
তুমি কও কথা দয়ালচান আমারে।
তোরে না দেখিলে প্রাণ আমার—
বাঁচেনা রে॥"

বাহিরের যে কান্না শুধু বারমাসী ও রাখালী গানে বাজিয়া উঠিত সেই কান্নাই সেদিন দয়ালচানকে ডাকিয়া আনিল। আর এই দয়ালচান যে গ্রামকে দেখা দিয়া কথাও কহিয়াছিল তাহা যারা একবারও কোন মুর্শীদ্যা গানে যোগ দিয়াছেন তারাই সাক্ষ্য দিবেন।

কান্নার সাধনা করিয়া গ্রাম এই গান আবিষ্কার করিয়াছে তাই কান্না এর ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে বাজে। কবে যেন কোন্ গ্রামের মেয়ে তার বুক-ফাটা কান্নায়

নিশীথ রাতের বুকে বেদনার ঢেউ তুলিয়া দূর দেশে তার হারান ধনকে খুঁজিতে-ছিল। কে যেন এক নিভৃত নিকুঞ্জে বসিয়া সেই বেদনার সুরে 'সারিন্দার' সুর মিশাইয়া মুর্শীদ্যা গানের সৃষ্টি করিয়াছে।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাউল-কবি এ গান গাহিয়াছে আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া গ্রাম এ গান শুনিয়াছে। তাই কথা এই গানে নাই, আছে শুধু সুর আর কান্না। শুধু মাঝে মাঝে এক-একটি কথা আসিয়া হৃদয়কে তীরের মত বিদ্ধ করিয়া যায়।

কবে যে এ গান প্রচলিত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। তবে তিনশত বৎসর পূর্ব্বেও এ গান ছিল তাহা অনুমান করিলেও বোধ হয় নিতান্ত ভুল হইবে না। একশত ষোলবৎসর বয়সের এক বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছি, তার ছেলে বেলায় এ গান বাংলার পল্লীতে পল্লীতে বিশেষ জাঁকজমকের সাথেই গাওয়া হইত। কাজেই বোঝা যায় যে, এ সময়েরও অন্তত দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এ গান ছিল; মাণিকচান্দের গানের একস্থানে আমরা পাইয়াছি—

তুমি হবু বট বৃক্ষ আমি তোমার লতা
রাঙ্গা চরণ বেড়িয়ে লমু পালাইয়া যাবু কোথা।

আর একটি মুর্শীদ্যা গানে আছে—

তুমি হবা বট বিরিক্ষ আমি শিঙ্গা লতা
চরণে জড়ায়ে রব ছাড়িয়ে যাবা কোথা।"

এখানে দুইটি অনুমান করা যাইতে পারে। এক হয় ত গ্রাম্য গানের প্রভাব হইতে পূর্ব্ব কবিরা মুক্ত ছিলেন না কিম্বা কবিদের পুঁথিসকল সুর করিয়া গ্রামে গাওয়া হইত। তাহারই পদ গ্রামের গানের সাথে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বোক্ত ধারণাই বিশেষ সমীচিন বলিয়া মনে হয়। কারণ গ্রামের অনেক প্রভাব প্রাচীন কবিদের মধ্যে দেখা যায়। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী গ্রাম হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছিল।

মুর্শীদ্যা গানকে আরও প্রাচীন বলিয়া ধরা যায়। ইহা বোধ হয় আমাদের বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ নিদর্শন। আমাদের গ্রামের লোকেরা বহুদিন পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ছিল। পরে মুসলমান ও হিন্দু হইয়া ইহাদের অনেকে বাহিরের কাঠামটি বদলাইলেও অন্তরের বৌদ্ধ ভাবটি ছাড়িতে পারে নাই। আর যারা হিন্দু ছিল তারাও মুসলমান হইয়া হিন্দুভাব অনেকটা বজায় রাখিয়াছে। তাই বহু মুর্শাদ্যা-গানেই বৌদ্ধদের মায়াবাদের নিদর্শন পাওয়া যায়। জগৎটা যে কিছু না, ছাড়িয়া যাইতেই যে হইবে এইরূপ কথা অনেক মুর্শীদ্যাগানে আছে। লুই সিদ্ধাইর

গুরুবাদ যে মুর্শীদ্দ্যাগানে বিশেষ করিয়া আপন অস্তিত্ব রাখিয়া গিয়াছে তাহা বোধ হয় প্রমাণ করিতে হইবে না। কারণ মুর্শীদ শব্দের অর্থ গুরু। যে গানে গুরুর প্রসংসাদি আছে তাই মুর্শীদ্দ্যা গান। কেবল নিছক মানুষ ভজনের জন্য আর কোন গানই আমাদের দেশে নাই। বৌদ্ধরা যে নানারূপ অনুষ্ঠান করিয়া প্রেত আনয়ন করিতেন এ বোধ হয় তাহারই একটি নিদর্শন। কারণ এখনও অনেকে এ গান গাহিয়া গাছা আনে এবং তাহাদের উপর দেবতা আসিয়া নানারূপ কথা বলিয়া যায়। *

যাহা হউক আজকাল এ গান আর পূর্ব্বের মত শোনা যায় না। এক নুরুল্ল্যাপুর শানাল ফকীরের দরগায়ই এখন বিশেষ করিয়া এ গান গাওয়া হয়, এবং তিনি নিজেও বহু মুর্শাদ্দা গান রচনা করিয়াছেন। আর তাঁকে বাদ দিয়া এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে তাহা একেবারে অসম্পূর্ণ হইবে। দুঃখের বিষয় তাঁহার সম্বন্ধে প্রাচীন কোন লিখিত বিবরণই পাওয়া যায় না। কারণ তাঁর শিষ্যেরা অনেকেই লেখাপড়া জানিত না, তারা যা মনে করিয়া রাখিয়াছে তার সবই অসম্ভব কাহিনীতে পূর্ণ। বহুকষ্টে তারই দুই একটি আমরা যা সংগ্রহ করিয়াছি, এখানে তাহা বিবৃত করিব। ফরিদপুর জেলার গোলডাঙ্গির একটি বৃদ্ধের নিকট এবং শানালের দৌহিত্র গৈজদ্দি † ফকীরের নিকট আমরা প্রথমে এই কাহিনীগুলি শুনি, পরে শানালের অনেক ভক্তের মুখেই এগুলি শুনিয়াছি।

প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা জেলার অন্তর্গত নুরুল্ল্যাপুর গ্রামে শানালের জন্ম হয়। ইহার প্রকৃত শুদ্ধ নাম শাহ্ লাল। গ্রামের লোকেরা সংক্ষেপে শানাল বলিয়া থাকে। শানালের বাড়ী পদ্মানদীর তীরে। সেই সময়ে পদ্মানদীর ওপারে ঝাউমাহাটি গ্রামে প্রসিদ্ধ ফকীর দাণ্ড সিদ্ধাইর আবির্ভাব হয়। বাল্যকালে ইঁহার নিকট হইতেই শানালের ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। শানাল ছোট ডিঙ্গি বাহিয়া সন্ধ্যা বেলা ওপারে ঝাউমাহাটী গুরুর বাড়ী যাইতেন। সারা রাত্রি গুরুর কাছে ঈশ্বর আরাধনা করিয়া সকালবেলা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। যেদিন যাইতে না পারিতেন সেদিন পদ্মার তীরে বসিয়া সারীন্দা বাজাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া গাহিতেন—

---

* প্রবাসী, বঙ্গবাণী ও Dacca Review-এ স্বর্গীয় পাচকড়ি বাবু ও শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও মনীষী বিপীনচন্দ্রের বাঙ্গলার ইতিহাস বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধাবলী দ্রষ্টব্য।

† গৈজদ্দি ফকীর এখন মারা গিয়াছেন।

"ওপার আমার মুর্শীদের বাড়ী ;
এ পার বইসে কান্দি আমি রে।
বিধি যদি দিত রে পাখা,
উইড়্যা যায়্যা দিতাম দেখা ;
উইড়্যা পড়তাম দাগুসার পায় রে।"

এইরূপে বহুদিন কাটিয়া গেল। ওপারে গুরুর কাছে কি কি শিখিয়াছিলেন তাহা জানিবার জো নাই। তবে প্রথম জীবনে সারীন্দা বাজাইয়া কান্নার যে সাধনা তিনি করিয়াছিলেন সেই সাধনা তাঁকে বাংলার নিভৃত পল্লীক্রোড়ে আজ অমর করিয়া রাখিয়াছে।

ইতিমধ্যে একটি ঘটনা তাঁকে লোক-সমাজে প্রচার করিয়া দিল। পূর্বে চৈত্র মাসে বৃষ্টি না হইলে কৃষকেরা নানারূপ অনুষ্ঠান করিত। কেহ 'সিন্নী' করিত, কেহ 'নৈল্যা' গান করিত আবার কেহ কেহ খোদার নামে নামাজ পড়িত। পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানে এখন বৃষ্টি না নামিলে এই সব অনুষ্ঠান করা হয়। বলা বাহুল্য যে, এই সময় কৃষকের মেয়েরাও নানারূপ অনুষ্ঠান করিতে কুণ্ঠিত হইত না। কুমারী মেয়েরা 'বদনা বিয়ের' গান গাহিয়া 'আড়িয়া' মেঘ 'কালীয়া' মেঘকে ডাকিয়া সারাগ্রাম মুখরিত করিয়া তুলিত। সে-বার যখন কিছুতেই বৃষ্টি হইল না তখন নুরুল্যাপুর হইতে বার মাইল দূরবর্ত্তী কৃষকেরা শানালের গুরু দাগু সিদ্ধাইকে আহ্বান করিল। সারাদিন মন্ত্রতন্ত্র পড়িয়াও যখন মেঘ নামিল না, তখন অনেকে ফকীরকে নানারূপ ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কথিত আছে, ধ্যান বলে শানাল তাহা জানিতে পারিয়া ছয় ক্রোশ পথ অতি অল্প সময়ের মধ্যে অতিক্রম করিয়া সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর সীজদায় বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইতে লাগিলেন। তার কান্নার সঙ্গে সঙ্গে মেঘশূন্য আকাশ হইতে অবিরল বৃষ্টি ধারায় মাঠ ঘাট ভাসাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। তখন গুরুকে কাঁধে করিয়া লইয়া শানাল বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। এই ঘটনার পর হইতে তাঁহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

আর একবার রাজনগরের জমিদারের একটি ঘোড়া মারা যায়। শোনা যায়, শানাল সেই মড়া ঘোড়াকে বাঁচাইয়া দেন। ইহাতে উক্ত জমিদার শানালের বাড়ী পাকা করিয়া দিতে চাহিলে শানাল বলিয়াছিলেন, "আমার বাড়ী পাকা করিলে কি হইবে। উহা পঞ্চায় পাঁচবার ভাঙ্গিবে।" তাঁহার মৃত্যুর পর এ পর্যন্ত

তাঁহার বাড়ী পদ্মায় তিনবার ভাঙ্গিয়াছে, শিষ্যদের বিশ্বাস আরও দুইবার ভাঙ্গিবে !

বুদ্ধিমন্ত ঠাকুর নামে ব্রাহ্মণ শানালের শিষ্য হইয়া পড়েন। তাঁহার শিষ্য হইবার কাহিনী এইরূপ।

একদিন নদীতে আহ্নিক করিয়া কোন বটগাছের তলে বসিয়া জপযোগ করিবেন এমন সময় এক মুসলমান ফকীর আসিয়া সামনে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া অবজ্ঞা ভরে বলিলেন, "তফাৎ থাক্। ছুঁইস্ না।" ইহাতে ফকীর মৃদুভাবে উত্তর করিলেন "বাবা! কে মুসলমান, কে হিন্দু! সবই ত সে একজনেরই সৃষ্টি! তুমি যে নদীতে ফুল ভাসাইয়া দিলে, ফুল ত উজান বাহিয়া গেল না। দেখ আমি পূজা করি ফুল কোন্ দিকে যায়।" এই বলিয়া নদীর ধারে আসিয়া খোদার নাম করিয়া একটি ফুল জলে ভাসাইয়া দিলেন। ছোট ফুলটি উজান বাহিয়া চলিতে লাগিল। ফকীরের অসীম শক্তি দেখিয়া ঠাকুর তার পায়ে পড়িয়া গেলেন। বলা বাহুল্য,—এই ফকীর শানাল ব্যতীত আর কেহ নহে। তিনি বুদ্ধিমন্তকে সস্নেহে উঠাইয়া নানারূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন। পরিশেষে এই বুদ্ধিমন্ত শানালের একজন প্রধান শিষ্য হইয়া পড়েন। ইনি দুই শত বৎসর জীবিত ছিলেন।

এইরূপে শানালের নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বহু হিন্দু-মুসলমান তাঁর শিষ্য হইল। আমরা শানালের কোন বংশধরের নিকট শুনিয়াছি, তাঁহাদের প্রায় এক লক্ষেরও বেশী হিন্দু শিষ্য আছে। ইহাদের মধ্যে প্রায়ই নমঃশূদ্র। তাহারা শানালের বংশধরদের পায়ের ধুলা মাথায় লয়, দরগার 'সিন্নী' খায়, তাহাদের মন্ত্রপড়া জল পান করে, কিন্তু তাহাতে ইহাদের জাতি যায় না।

তাঁর শিষ্যদের বিশ্বাস, গুরুকে না ভজিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না! তাই তাহারা মুর্শীদ্যা গান করে। সে গানে গুরুর প্রশংসা ইত্যাদি থাকে তাই তাহাকে মুর্শীদ্যা গান বলে। কিন্তু বাস্তব পক্ষে মুর্শীদ্যা গানে ঈশ্বর সম্বন্ধেও বহু গান পাওয়া যায়। এবং অনেকে মুর্শিদ্যা অর্থে ভগবানকেই মনে করে।

তবে শানালের নাম লইয়াও তাঁর শিষ্যেরা অনেক গান গাহিয়া থাকে। গানের মাঝে মাঝে তাঁর বংশধরদের নামও লওয়া হয়।

শানালের ধর্ম্মমত জানিতে হইলে তাঁর শিষ্যদের ধর্ম্মমত জানিবার প্রয়োজন।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বিশেষ মতই ইহাদের নাই। আল্লা বরকত ফতেমা শ্মশানকালী ইত্যাদি যাবতীয় হিন্দু মুসলমানের দেব-দেবীরই ইহারা ভজনা করিয়া থাকে। হিন্দুকেও আমরা মান্দার ফতেমা ও আল্লাজীর চরণ বন্দনা করিতে দেখিয়াছি, আবার মুসলমানকেও কালীর নাম লইয়া চোখের জল ফেলিতে দেখিয়াছি। ফল কথা, যে গানে ভাব আসে সে গানই তারা গায়, তা সে গান কৃষ্ণেরই হউক আর আল্লাজীরই হউক।

এক কথায় বলিতে গেলে ইহারা ভাবের উপাসক। আর এই ভাবের উপাসকই ছিলেন শানাল। লোক-সভ্যতার অন্তরালে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারীন্দা বাজাইয়া গ্রাম্য বাউল-কবি আপন মনে মুর্শীদ্যা গান গাহিতেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেই কান্নার গান তাঁর শিষ্যেরা আজ গাহিয়া থাকেন এবং আজ কালকার মুর্শীদ্যা গায়কের অধিকাংশই শানালের ভক্ত। তবে গনী ফকীর, কুসুম-দিয়ার ফকীর ও লইমদ্দি ফকীরের শিষ্যেরাও অনেকে এই গান গাহিয়া থাকে।

ঢাকা ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার কৃষকদের মধ্যেই এই গান আজকাল বিশেষ ভাবে প্রচলিত; এই গান গাওয়ার প্রধান যন্ত্র সারীন্দা। লম্বা চুল-ওয়ালা ফকীরেরা সারীন্দা বাজাইয়া এই গান গাহিয়া থাকে।

প্রায় ১০৫ বৎসর জীবিত থাকিয়া শানাল দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার তিন পুত্র বেচুশা, খোদাজান ও আছিম শা ফকীর হন। ইঁহাদের মধ্যে বেচুশা ৮১ বৎসর, খোদাজান ৯৫ বৎসর ও আছিম শা ৭১ বৎসর জীবিত ছিলেন।

বেচুশার পুত্রদের মধ্যে বর্ত্তমানে গইজদ্দিসা-ই জীবিত আছেন, এবং শানালের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহার অনেক কথাই তাঁর নিকট হইতে শুনিয়াছি। ফেলুশা, আইজদ্দিশা ও আলতফ্সা খোদাজানের বংশধর। দুই বৎসর হইল ফেলুসা মরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অসম্ভব কাহিনী শুনা যায়। আছিমশার কোন পুত্র ছিল না। তাঁর চারি কন্যা এখন ফকীরী পাইয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, শানালের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরেরা তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে ভাগ করিয়া লইয়াছেন। এমন কি কবর হইতে তাঁহার অস্থি উঠাইয়া আনিয়া সিন্দুকে ভরিয়া পৃথক পৃথক স্থানে পুতিয়া দরগা করিয়াছেন। নদীতে বাড়ী ভাঙিলে উক্ত সিন্দুক উঠাইয়া লইয়া অন্যত্র পুতিয়া রাখা হয়। এবং প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় প্রত্যেক দরগায় উৎসব হয়।

সেই উৎসবে লক্ষ লক্ষ শিষ্য নানারূপ উপহার সামগ্রী লইয়া দরগায় হাজত

দেয় ও সারা রাত্রি জাগিয়া মুর্শীদ্যা গান করে। এই সময়ে প্রত্যেক শিষ্য আপন আপন গুরুদের মাথায় তেল দেয় ও প্রণাম করে। মাঘীপূর্ণিমার দিন শেষরাত্রে ধামাইল হয়। ধামাইল হিন্দুদের হোমের অনুকরণ ছাড়া আর কিছু নহে। প্রথমে একটি চৌকোণা স্থানকে ভাল করিয়া লেপিয়া রাখা হয়। ধামাইলের পূর্ব্ব পর্যান্ত শিষ্যেরা তার চারিদিকে বহু মোমবাতির আলো জ্বালাইয়া দেয়। ধামাইলের সময় প্রধান ফকীরেরা গলায় ফুলের মালা ও মাথায় গাঁদা ফুলের গুচ্ছ জড়াইয়া খাসদরগা হইতে সেই চৌকণা স্থানের দিকে অগ্রসর হয়। সম্মুখে ধামাইলের বাঁশ লইয়া শিষ্যেরা অসুরের মত পা ফেলিয়া চলিতে থাকে। শানাইয়ের সুরে সে সময় এক গম্ভীর আওয়াজ বাজিয়া ওঠে। ঢাকীদের বাদ্য সে গাম্ভীর্য্যকে আরও জমাট করিয়া তুলে। বলা বাহুল্য যে ফকীরেরা দরগা হইতে সামান্য কিছু কাঠ প্রত্যেকেই মাথায় করিয়া লইয়া যায়। পরে সেই ধামাইলের স্থানে আসিয়া মধ্যখানে আগুন জ্বালাইয়া দেয়। ধামাইলের বাঁশ লইয়া শিষ্যেরা চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জনতাকে দূরে রাখে। আতপ চাউলের আটার সহিত মাংস মিলাইয়া অনেকগুলি ছোট ছোট পোটলা কলার পাতায় বাঁধিয়া পূর্ব্বেই পোড়ান হয়। সেইগুলি এখানে আনিয়া ভোগ দেওয়া হয়। তারপর অনেক প্রকার মন্ত্র পড়ার পর প্রধান ফকীর সেই আগুনে পা দিয়া একটি নাড়া দিয়া দিলে শিষ্যেরা ধামাইলের বাঁশ লইয়া ঐ আগুনের উপর নাচিতে থাকে। এই সময়ে সেই কলার পাতায় বাঁধা সিন্নীর জন্য চারিদিক হইতে ভীষণ কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়; ইহাকে সকলে লুটের সিন্নী বলে।

ফকীরেরা পূর্ব্বেই ইহা বহু সংগ্রহ করিয়া রাখে। শিষ্যেরা চাহিয়া লয়। তাহাদের বিশ্বাস ইহা খাইলে রোগ ভোগ কিছুই থাকে না। এখানে এই ধামাইলের সাথে হিন্দুদের চৈত্র পূজার বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। চৈত্র পূজায় যেমন বেত হাতে সন্ন্যাসীরা নাচিয়া নাচিয়া সমস্ত মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়া তুলে, ধামাইলের মধ্যেও বাঁশ লইয়া সন্ন্যাসীরা সেইরূপ নাচিয়া থাকে। এই স্থানে ধামাইলের বাঁশ সম্বন্ধে দুটি কথা বলিতে চাই। জোড় বাঁশ না হইলে ধামাইলের বাঁশ হইবার যো নাই। সেইজন্য ছোট থাকিতেই দুটি বাঁশকে একত্রে বাঁধিয়া রাখা হয়। তারপর বড় হইলে কাটিয়া আনিয়া ধামাইলের বাঁশ তৈয়ার করা হয়। প্রত্যেক ফকীরেরই আট দশটি করিয়া বাঁশ থাকে, এবং এক একটির নাম মান্দারের বাঁশ, আলীর বাঁশ, গাজীর বাঁশ, আল্লার বাঁশ ইত্যাদি। ইহার ভিতর মান্দারের বাঁশই সবার চেয়ে বড় ও আল্লার বাঁশ সবার চেয়ে ছোট।

উৎসবের পনর ষোল দিন পূর্ব্ব হইতেই শিষ্যেরা এই বাঁশ লইয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া চাউল তরকারী পয়সা-কড়ি ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনে। বলা বাহুল্য যে, এই সময় তাহারা বাঁশগুলিকে কখনও মাটীতে ছোঁয়ায় না। যদি রাখিতে হয় তবে চাউলের ধামার উপর রাখিয়া কোন কিছুতে হেলান দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখে।

যাহাহোক, এইরূপে ধামাইল সারা হইলে শিষ্যেরা আরও দুই একদিন থাকিয়া যে-যার বাড়ী চলিয়া যায়। শানালের বাড়ী যে ধামাইল হয় তাহাতে সওয়া সের তেঁতুলের চেলা-কাঠের বেশী পোড়ান হয় না। কিন্তু আমরা কোন কোন স্থানে দেখিয়াছি বুকসমান আগুনের উপর ফকীরেরা বাঁশ লইয়া নাচে। দুই একখানা আগুন আমরা হাতে করিয়াও দেখিয়াছি, হাত পুড়ে নাই।

সানাল বহু দিন মরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁর ভক্তেরা এখনও তাঁকে ভুলিতে পারে নাই। সানালের শিষ্য হইয়া তাহাদের লাঞ্ছনার সীমা হয় নাই। মুসলমান মৌলবীরা তাহাদের এক-ঘরে করিয়াছে, তাহাদের জট কাটিয়া দিয়াছে। সারীন্দা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, তবু তারা সানালকে ছাড়ে নাই। বুকফাটা কান্নায় তাহারা গাহিয়াছে :—

"তোর বাজারে আইস্যা রে আমার
গ্যাল জাতি কূল রে।

এই জাতি দিয়া কূল দিয়া তারা সানালের অশ্রুজলের সাধনা করিয়াছে। কত রকমেই না সানালকে খোঁজ করিয়াছে। অন্তরের দরদের সারীন্দা বাজিয়া বাজিয়া তাহাদিগকে সমাজের বাহির করিয়া সেই চিরব্যথিতের সন্ধানে প্রবৃত্ত করাইয়াছে।

"চল যাই রে—আমার সানালের তালাসে রে
মন চল যাই রে।"

পথে 'হালুয়া' ভাইকে দেখিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া গাহিয়াছে।

"হাল বাও হালুয়া বাই রে হাতে সোনার নড়ি
এই পথ দ্যা নি দেখ্‌ছাও যাইতে
আমার সানালচ্যান বেপারী রে।"

হাতে সোনার ডুরী 'হালুয়া ভাই'কে দেখিয়া এই একই গান তারা গাহিয়াছে। তাহারা উত্তর দিয়াছে—

"দেইখ্যাছি দেইখ্যাছি আমরা সানালচান বেপারী—
ও তার হাতে আশা বোগলে কোরাণ
গলায় ফুলের মালা রে।"

কি যাদুই না সানাল জানিতেন! যার বলে কঠোর সমাজ-শাসন উপেক্ষা করিয়া লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলমান আজ সানালের নাম লইয়া আপনাদের ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছে। এ ভক্তি দেবতার নহে, ভগবানের নহে কিম্বা সম্মানিত কোন বিদ্বানের জন্যও নহে। সহর হইতে অনেক দূরে মূর্খ বাঙ্গাল এক বাউল-কবির জন্য। যাঁর সম্বলের মধ্যে ছিল এক চোখের জল আর কয়েকটি মুর্শীদ্যা গান। হয় ত সানালের জীবনের মহত্ব ছিল; হয় ত অনেক অশ্রুজলের ইতিহাসই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন নিজের জীবনটি দিয়া, সে সব না জানা আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য হইলেও তার ভিতর দিয়া আমরা এমনই একজন মহাপুরুষের দেখা পাই, যিনি আমাদেরই দেশের মূর্খ গেঁয়ো কৃষকের সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছেন। তাদের সহজ সুন্দর কবিত্বের কনকাসনে। তাঁর নিজের জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি ঘটনাগুলিকে যবনিকার অন্তরালে রাখিয়া বাংলার পল্লীজীবনের যে এক বিরহী হৃদয়ের ছবি তিনি আঁকিয়া গিয়াছেন তাঁর মুর্শীদ্যা গানের ভিতর দিয়া তাহা চিরদিন থাকিয়া যাইবে।

গ্রামে কোন সংক্রামক রোগ দেখা দিলেই গ্রামের লোকেরা সকলে মিলিয়া মুর্শীদ্যা গানের বৈঠক দেয়। প্রথমে একখানা ঘরকে 'আলাদা মাটী' দিয়া লেপা হয়, সে দিন কেহ মাছ মাংস খায় না। সন্ধ্যার পর সেই ঘরে ধূপ ধুনা জ্বালাইয়া সকলে কুণ্ডলী করিয়া বসিয়া গান আরম্ভ করে। শীতকাল ব্যতীত, আকাশ পরিস্কার থাকিলে বাহিরে উঠানেই গান হয়। গানের সময় নারিকেলের ছোবড়া পোড়াইয়া আগুন করিয়া সকলে তামাক খায়। ঘসীর (ঘুটে) আগুনে কেহ তামাক খায় না। যে প্রধান ফকীর, তাঁহার সামনে একখানা কুলা রাখা হয়। কুলাখানা ধান দূর্ব্বা ও সিঁদূর দিয়া রঞ্জিত করা হয়। তার কাছে ধূপের সরা থাকে, এবং পার্শ্বে সন্দেশ বাতাসা এবং সিন্নী রাখা হয়।

প্রথমে একটি বন্দনা গাওয়া হয়। এই গানে বহু দেব দেবী নাম করা হইয়া থাকে। সারীন্দা বাজাইয়া গ্রাম্য ফকীর গানের পর গান গাহিয়া যায়। গানের সাথে সাথে ধারার পর ধারায় তার বুক ভাসিয়া যায়। তারপর সর্ব্ব অঙ্গে পুলক দেখা দেয়। শরীর ঘর্ম্মাক্ত হয় ও কদলী পত্রের মত কাঁপিতে থাকে। আর সারিন্দা বাজাইতে পারে না। একটি পদই বার বার গাহিতে থাকে।

তারপর গাহিবারও আর শক্তি থাকে না, কেবল কাঁপিতে থাকে ও মুখ দিয়া ফেনা দেখা দেয়। বলা বাহুল্য যে, এই সময় অনেকেরই এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। কেহ হয় ত কাহারও গলা জড়াইয়া ধরিয়া অবিরল রোদন করিতে থাকে। এই সময় এক একজনের উপর গাছা আসিতে থাকে। গাছা আসা মানে কোন দেব-দেবীর একজনের উপর আবির্ভাব হইয়া নানারূপ কথা কহিতে থাকে। কাহারও উপর কালী আবির্ভূত হন, আবার কারও উপর মান্দার আবির্ভূত হন। গ্রাম্য লোকেরা তাহাদের কাছে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। গাছা তাহার যথাযথ উত্তর দেয়। কিছুক্ষণ পরে গাছা ছাড়িয়া গেলে লোকটি অজ্ঞান হইয়া পড়ে। অনেকের দাঁত লাগিয়া যায়। তেল জল দিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করা হয়।

এখানে আমরা যেরূপ বর্ণনা করিলাম সবখানেই যে গাছা এরূপভাবেই আসে তাহা নহে। অনেক স্থানে গানে একটু ভাব হইলেই 'চালানের' মন্ত্র পড়িয়া 'গাছা' আনা হয়। কোন কোন স্থানে কয়েকটি গান গাহিয়া তারপর 'জেকের' করিয়া গাছা আনা হয়। 'জেকের' হিন্দুদের নাম সংকীর্তনেরই অনুরূপ। তবে মুসলমানী জেকের দুই ভাগে বিভক্ত। বহিরঙ্গ জেকের—যা বাহিরে মুখে উচ্চারণ করিয়া গাওয়া হয়—আর অন্তরঙ্গ জেকের যা দেহের আঠার মোকামে গুরুর উপদেশ অনুসারে উচ্চারণ করিতে অভ্যাস করা হয়।

তবে মুর্শীদ্দ্যা গানে বহিরঙ্গ জেকেরই করা হয়। ইহার দুই একটির সুর এমনই যে, দশ পনর মিনিট গাহিলেই গা কাঁপিয়া উঠে।

এখানে একটির নমুনা দেওয়া গেল—

"পহেলা আল্লা দুয়ামে মওলা
তিয়ামে মহম্মদ
চৌঠাতে হজরত আলী—
পঞ্চমে বরকত মারে—
হরদমে আল্লার নাম।"

এই বিংশ শতাব্দীতে কেহ হয় ত এই 'গাছা' আসা বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু ইহা যে মিথ্যা, জাল তাহা ত মনে হয় না। কারণ ভগবানের নামে এমন করিয়া যাহারা কাঁদিতে পারে তারা যে মিথ্যা একটা অভিনয় করিবে তাহা ত মনে করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আর যে জিনিষটা এতদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে তাহার ভিতর যে সত্য আছে তাহা কে অস্বীকার করিবে?

মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা করিলে এইরূপ অবস্থা অনেকের দেখা যায়। গৌরাঙ্গদেবের জীবনেও আমরা এইরূপ ভাব দেখিয়াছি। একবার শ্রীবাসের বাড়ীতে ভাবের আবেশে বিষ্ণুখট্টায় উঠিয়া বসিয়া ভক্তদের নানারূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেবও এইরূপ ভাবে বিভোর হইয়া নানারূপ কথা বলিতেন। এমন কি হজরৎ মহম্মদও (দঃ) এইরূপ মহাভাবে সমাহিত হইয়া কোরাণের আয়াত সকল বলিয়া যাইতেন। শিষ্যেরা লিখিয়া লইতেন। এইরূপেই মহাগ্রন্থ কোরাণশরীফের সৃষ্টি হইল।

ইহা সেই ধর্ম্মজীবনের উন্নত অবস্থা কিম্বা প্রেত আনিবার পন্থা তাহা বলিতে পারি না। অমৃতবাজারের শিশির বাবুরা এইরূপে কীর্ত্তন করিয়া প্রেত আনয়ন করিতেন। প্রেততত্ত্ব বিষয়ে যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহারা এ বিষয়টি অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারেন।

বহু ফকীর সারীন্দা বাজাইয়া মুর্শীদ্যা গান গাহিয়া রোগীর চিকিৎসা করিয়া থাকে। ইহাতে নাকি অনেকের রোগও সারে। এক ফকীর ছাড়া বৈঠক ভিন্ন প্রায়ই লোকে মুর্শীদ্যা গান গাহে না। আর বৈঠকেও যে দিন ভাব হয় না সে দিন গান গাহিতে পারে না। মুর্শীদ্যা গানের এই একটা বিশেষত্ব যে, অন্তর কাঁদিয়া না উঠিলে এই গান কেহ গাহিতে পারে না। পূর্ব্বে আমরা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, অনেকে গাছা আসার নামে ভণ্ডামীও করে। তাহা অতি সহজেই ধরিতে পারা যায়। কারণ সত্যিকার গাছা দেখিলেই চেনা যায়।

চট্টগ্রাম ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় গ্রামেই মুর্শীদ্যা গানের ফকীর দেখা যায়। এ গানের কে রচয়িতা তাহা জানিবার উপায় নাই। কারণ প্রায় গ্রাম্য গানের শেষেই একটা ভণিতা থাকে কিন্তু কোন মুর্শীদ্যা গানেই ভণিতা পাওয়া যায় না। মেয়েরাও যে কেহ কেহ এ গান রচনা করিয়াছেন তাহার বহু প্রমাণ আমরা পাইয়াছি, কারণ মেয়েদের বিবাহের অনেক গানের সুর আমরা মুর্শীদ্যা গানে পাই এবং অনেক স্ত্রীলোক এই গান গাহিয়া থাকে।

"আমি জঙ্গলে জঙ্গলে ফিরি, আওল্যা কেশ নাহি বান্দি হে
আমি তোরো জন্যে হৈলাম পাগলিনী রে!"

প্রভৃতি পদ পড়িলে মনে হয় এই সব গান মেয়েদের রচিত।

এই গানের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা নিখুঁত পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় বিরচিত। পূর্ব্ববাঙ্গালার কথা এমন মিষ্টভাবে আর কোন গানেই সংযোজিত

হয় নাই। ইহার কোন পদ সাধু ভাষায় রূপান্তরিত করিলে আর ইহার লালিত্য থাকে না। যেমন,—

"তুমি আমারে বারায়্যা গ্যালারে কানাই
রাখাল ভাবে।"

এই গানটি গাহিবার সময় গায়ক (আমারে বারায়্যা) বলিয়া যে একটি টান দেয় তাহা অন্য কোন কথায়ই হইবার যো নাই। কিম্বা

"আমার দোরদীর টুন কইও খবর
আমার তালাস যান রে লয়।"

এখানে 'দোরদীর টুন' কথাটি যেমন মিষ্টি শোনা যায়, দোরদীর কাছে বলিলে তেমন শুনাইবে না।

অথবা, "আমি বায়্যা যায়্যা কোন্ ঘাটে
ভিড়াম নৌকাখান।"

প্রভৃতি পদগুলি কেমন মিষ্টি! এইখানে আমাদের একটি কথা মনে হয় যে, কলিকাতার ভাষা যেমন এক রকমের ভাব প্রকাশের সহজ পন্থা, সেইরূপ পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায়ও এক প্রকারের ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে, যাহা অন্য কোন ভাষায়ই হইবার যো নাই। পূর্ব্ববঙ্গের বাউল-কবির গান যাঁরা অনুসন্ধান করিয়াছেন তাঁরাই ইহার সাক্ষ্য দিবেন।

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, কেচ্ছা, রাখালী, বারমাসী ও মেয়েদের বিয়ের গান হইতে মুর্শীদ্যা গানের ক্রমপরিণতি হইয়াছে। যেমন 'মাধবের' গান ছিল।

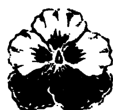
"হাল বাও হালুয়া বাই রে
হাতে সোনার নড়ি
মাধবেরে সারাইতে পারলে
দিব টাকা-কড়ি রে
প্রাণের মাধব গাছতল।"

অনেকগুলি মুর্শীদ্যা গানে পাওয়া যায়—

"হালবাও হালুয়া বাই রে হাতে সোনার নড়ি
এই পথ্ দ্যা নি যাইতে দেখ্ছাও আমার সানালচান বেপারী?"

এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ফলকথা মুর্শীদ্যা গান গ্রামের সকল গান ছানিয়া অমৃতের খনি। সুর ও কান্না এই গানের সব। এই সুর ও কান্না বাদ দিয়া শুধু কথা প্রকাশের সঙ্কোচ আমরা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। তবে এক আশা, এই সব কথা শুনিয়া যদি কেহ এই গানের সুর শিখিতে চান। কারণ আমাদের গ্রাম্য গানগুলি এখন ক্রমেই লোপ পাইতেছে। প্রাচীনকালে অনেক সুন্দর সুন্দর সুর ছিল, এখন তাহা প্রায়ই কেহ জানে না।

—ক্রমশ



দীর্ঘকাল দুরারোগ্য রোগভোগের পর, গত ৮ই আশ্বিন, ১৩৩২ সকালে বেলা দশটার সময় কল্লোলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র নাগ দার্জ্জিলিঙ্ সহরে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

প্রশ্ন

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

কিসের টানে ছুটছে প্রাণের গতির সরিৎ ?
কিসের ধারা গড়ছে সারা জীবন চরিত ?

এই যে চিত্র দুঃখ-সুখের বর্ণে দাগা,
অন্ধকারের নিঝুম পারে এই যে জাগা,
জ্ঞানের তরে এই যে কুড়াই কঠোর নুড়ি,
প্রেমের তরে এই যে ফুটাই কোমল কুঁড়ি,
এই যে পথে ভাঙ্গা রথের চাকা গড়ায়,
এই যে হুতাশ বহে বিজন বালির চড়ায়,—
কাহার রচা, এমন ওঁছা ছেঁড়া-খোঁড়া ?
একি অফুরন্ত গতির সঙ্গে জোড়া ?
হঠাৎ ফোটা চেতনাতে জেগে উঠে,
অচিন্ পথে ঠেলে বাধা চল্ছি ছুটে ;
একি আবার অজানাতেই ডুবতে সুধু ?
সরসতার পারে কিরে মরুর ধু-ধু ?

এই যে বিশ্ব ফুরায় নাক পড়েই আছে,
উহার মাঝে আকাঙ্ক্ষা আর আশার ছাঁচে
ঢেলে-গড়া জীবন বাড়ে মরণ পানে !
বুঝি না যে আমি আমার চলার মানে।
জড়ের গতির পরিণতি—আমরা চেতন,
কিসের নেশায় সহি অশেষ বিষের বেদন ?
পৃথ্বীখানার ভিত্তি সাঁচা—মোরাই ঝুটা ?
সবাই বাঁচে, প্রাণের মাঝেই ভস্ম মুঠা ?
এই যে অফুরন্ত বাসা পাতাই আছে—
বুড়িয়ে যাব, ফুরিয়ে যাব তাহার মাঝে ?

অমর তুমি, বিশ্বগাথার অশেষ কবি !
অজর তুমি, শ্যামল ধরার কোমল ছবি !
অচল তুমি, জড়ের গড়ন কঠোর শিলা !
অটল তুমি, নিত্য নূতন ব্যথার লীলা !
আমিই একা ক্ষণের তরে ছুটছি তড়িৎ,
শুকিয়ে যাবে এই যে ধারা—জীবন-সরিৎ ?

ঝাঙ্গা ফুল

শ্রীনীলিমা বসু

(বড় গল্প)

এক

নীচের ঘরে ধূসর আলোয় বসিয়া প্রভা, ক্লাশের অসমাপ্ত রুমালটা শেষ করিতে ব্যস্ত ছিল, কারণ পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে ; সেলাই সম্পূর্ণ করিবার জন্ম নীহারদি কড়া হুকুম দিয়াছেন।

মাঠে বেড়াইবার ঘণ্টা পড়িল, এখনও রেণু নীচে নামিয়া, আসিতেছে না দেখিয়া হাতের রোমালটা তাড়াতাড়ি বাক্সে বন্ধ করিয়া একরূপ ছুটিতে ছুটিতে সে উপরে উঠিয়া গেল।

রেণু তখনও প্রিয়-দির ঘরের টেবিলের উপর ফুলদানীতে গোলাপগুলি সাজাইতেছিল। মেট্রন ওরফে পিসীমার ঘণ্টাধ্বনি তাহার কাণে যেন একটুও গিয়া পৌঁছায় নাই ! প্রভা সোজাসুজি বেডরুম পার হইয়া প্রিয়দির ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

—কি গো রাণী, বেড়াবার ঘণ্টা পড়েছে কাণে যায়নি বুঝি ? বলিয়া মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া, একটানে ফুলগুলি রেণুর হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া প্রভা বলিল—চল্ শীগ্‌গীর, নইলে শকুন্তলাদিকে এক্ষুনি বলে দেব,—মেয়ের ঢং দেখে আর বাঁচিনা ! ও মা কোথায় যাব গো—

ফুল কাড়িয়া লওয়াতে রেণু মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুন্ন হইয়াছিল। সে বিরক্ত হইয়া বলিল,—রেখে দে তোর ঘণ্টা, ভাল লাগেনা। ফুলগুলি দে ভাই, সাজিয়ে রেখেই যাচ্ছি। ও কি, চল্‌লি যে ! দাঁড়া না ভাই একটু। তুই ও আমাকে এমনি করে বলবি ! তবে যা, বেশ, আজই এখুনি গিয়ে সত্যবতীদের দলে নাম লেখা।

ঠিক এমনি সময় নীচের ইয়ার্ড হইতে শকুন্তলা-দির কর্কশ-কণ্ঠের শানানো আওয়াজ তীরের মত উপরে উঠিয়া আসিল,—কে ওপরে আছ ? এক্ষুনি নেমে

এসো।. কল্পা তুমি এখনও ওখানে ঘুরছো? সব্বাইকে ডেকে নিয়ে এসো মাঠে। ওঠো, কে তোমরা বসে আছ, বই এখন রাখ, বই পড়ার সময় তো এখন নয়. এটা বেড়াবার ঘন্টা, মনে নেই? এক সঙ্গে পর পর এতগুলি কথা বলিয়া কর্ত্তব্য-পরায়ণা শিক্ষয়িত্রীটি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, মাঠের মাঝখানে রক্ষিত চেয়ারটায় তিনি তাঁহার স্থূল-দেহটাকে অতি কষ্টে এলাইয়া দিলেন।

শকুন্তলা-দির আহ্বানে প্রভা জোর করিয়া পুনরায় ফুলগুলি তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া, পার্শ্বে প্রিয়-দির বিছানার উপর ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল,—ঐ শুনলি তো? এখন চল্। তোর খাতা থেকে নাম কাটিয়ে সত্যবতীর খাতায় নাম লেখাব কিনা সে উপদেশ তো আমি তোর কাছে চাইনি!

দ্বিরুক্তি না করিয়া রেণু প্রভার সহিত বাহির হইয়া আসিল। ঘরের দরজাটাও আর বন্ধ করা হইল না।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে প্রভা বলিল,—আজ তোর আর আমার কপালে টাস্ক্ লেখা আছে দেখছি—

প্রভার কথাটা শেষ হইতে না দিয়া রেণু বলিল, আমার হাত ছেড়ে দে, লাগছে।

প্রভা হাত ছাড়িয়া দিল। সিঁড়ির শেষ ধাপে আসিয়া সে আর থাকিতে পারিল না, মিষ্টি করিয়া কহিল, রাগ করলি রেণু? আমার হাত ধরাটাও তোকে ব্যথা দিলে? তোকে ডেকে আনাটা যদি আমার অন্যায়ই হয়ে থাকে, তাহলে বেশ, আমি ক্ষমা চাচ্ছি। একটু থামিয়া লইয়া আবার বলিল,—কিন্তু এই ঘর গুছান, ও-ঘরের কাজ করা, এইটাই কি সব হলো? নিজের শরীরের দিকে তাকাবি না? দেখ্ তো একটু চেয়ে, কি চেহারা হয়েছে তোর।

রেণু এসব কথার কোন জবাব দিল না। বাস্তবিক প্রভা যাহা বলিতেছে তাহা একটুও মিথ্যা নয়। আগেকার সে চেহারা এখন আর তাহার নাই। গোলগাল মুখখানি কেমন যেন লম্বা হইয়া উঠিয়াছে, বাহুদুটি ক্রমশঃ কৃশ হইয়া চলিয়াছে, সে সহজ শ্রী যেন কোথায় মিলাইয়া যাইতে বসিয়াছে।

আজ মনের মত করিয়া তাহার পরম প্রিয় প্রিয়-দির ঘর সাজাইতে পারিল না বলিয়া রেণুর এসব কথা ভাল লাগিতেছিল না। প্রভার উপর মনে মনে সে একটু রাগও করিয়াছিল। আজ হয়তো প্রিয়-দি ঘরে ঢুকিয়া অগোছাল ঘর দেখিয়া কি ভাবিবেন, কি মনে করিবেন, এই সব কথাই রেণুর মনের মধ্যে আনাগোনা করিতেছিল। কিন্তু বন্ধুর কাতর কণ্ঠের আন্তরিকতাভরা কথা

কয়টি তাহার সমস্ত অভিমান দূর করিয়া দিল। একটু পরে সে হাসিয়া বলিল' তোর ভিতরে যদি এত কবিত্বই ছিল তাহলে সেদিন ক্লাশে "বন্ধুত্ব ও প্রেম" নিয়ে essay লিখিতে গিয়ে অমন হাঁ হয়ে বসে ছিলি কেন? এই বলিয়া রেণু প্রভার হাতখানা তাহার হাতের মধ্যে টানিয়া লইল। প্রভা জবাব দিল, সামনে তোর যা কলম চল্‌ছিল, আমি তো অবাক হয়ে বসে তাই দেখছিলুম। ও সব লেখা বাপু তোদেরই সাজে।

প্রভার কথায় রেণু হাসিতে লাগিল। বলিল, শুধু আমাদের নয়, যিনি লিখ্‌তে দিয়েছিলেন তাঁকেও সাজে।

কথা বলিতে বলিতে উভয়ে মাঠে আসিয়া পড়িল। বোর্ডিংএর সব মেয়েরাই ইতিপূর্ব্বে বাহির হইয়া আসিয়াছে। মাঠের এক কোণে সেভেন্‌থ্‌ ক্লাশের ছোট মেয়েরা ব্যাড্‌মিন্‌টন্‌ খেলা সুরু করিয়াছে। ফিফ্‌থ্‌ ক্লাশের রমা তাহার সঙ্গী রেণুকাকে ধরিবার জন্য প্রাণপণ বেগে ছুটিয়াছে। আরও একদল মেয়ে হাত ধরাধরি করিয়া, গুণ গুণ গান গাহিয়া সামনে দিয়া পার হইয়া গেল। ম্যাট্রিক ক্লাশের ভারী দলটিও রাজবাড়ীর পাট হস্তীর মত মন্থর গতিতে এদিক হইতে ওদিকে চলিয়াছে। দূরে শকুন্তলা-দি বসিয়া সকলের উপর কড়া নজর রাখিয়া পাহারা দিতেছেন। তাঁহার কেবলই ভয় পাছে কোন মেয়ে ফাঁকি দিয়া বসিয়া সময়টা কাটায়। যদি কোন মেয়ে বসিয়া গল্প করিতে চাহিত, তাহা হইলে শকুন্তলা দি দেখিলেই তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া তিক্ত-মধুর ভাষায় খুব বড় বক্তৃতা দিয়া বলিতেন,—তোমাদের বল্লে তো বুঝবে না? আজকাল সব বড় বড় ডাক্তারই বিকেল বেলাটা খোলা হাওয়ায় বেড়াতে বলেন, তা জানো? থার্ড ক্লাশের ডলীকেও একদিন এই কথা শুনিতে হইয়াছিল। কিন্তু সে এমনি মুখরা মেয়ে, যে ফট্‌ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল,—তবে আপনি কেন বেড়ান না শকুন্তলা-দি? ফলে তাহার বেহায়াপনার জন্য সে সন্ধ্যায় ষ্টাডি ক্লাশে তাহাকে পাঁচশ লাইন টাস্ক বেশী করিয়া লিখিয়া দিতে হইয়াছিল।

রেণু বলিল,—চল্‌ প্রভা, ঐ গাছের আড়ালে বেঞ্চিটায় বসি গে, আজ একটুও বেড়াতে ইচ্ছে কর্‌ছেনা আমার।

প্রভা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—শকুন্তলা-দি রাগ করবেন না তো?—উনি ওদিকে চেয়ে আছেন, দেখতে পাবেন না। চল্‌, তারপর টের পেলে ঘুরে বেড়ান যাবে

প্রভার ব্যবহারে রেণু যে আজ খুব ব্যথা পাইয়াছে, তাহা প্রভা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল, আর সেজন্য তাহার ব্যথাও বড় কম হয় নাই। এখনও সেই ব্যথা তাহাকে দোলা দিতেছিল। মুখে কিছু না বলিয়া সে রেণুর সঙ্গে সঙ্গে সেই বেঞ্চিতে গিয়া বসিয়া পড়িল। কতকগুলা পাম্ গাছের আড়ালে এমন জায়গায় বেঞ্চিটা ছিল, যে সেখানে কেহ বসিয়া আছে সহসা ইহা জানিবার কোন উপায় নাই।

—রাগ করেছিস্ রেণু? বন্ধুর হাতখানি কোলের উপর সস্নেহে টানিয়া লইয়া প্রভা জিজ্ঞাসা করিল।

প্রভার কথার ভঙ্গীতে রেণু হাসিয়া ফেলিল, বলিল—না, তোর ওপর রাগ করবো কেন? রাগ হচ্ছে ঐ "দি"র ওপর। উনি আমার কে বল্‌তো যে ওঁর জন্য সবাইয়ের কাছে ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ্য করেও সমস্ত কাজগুলো নিজের হাতে না করতে পারলে মনটা কিছুতে তৃপ্ত হয় না? সারাদিন মনটা কেন ঐ ঘরের ওপর পড়ে থাকে?

—তাতো থাকবেই, উনি যে তোর প্রিয়তমা।

লজ্জায় আনন্দে রেণুর মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল সে বলিল,—সত্যি ভাই, আমারই, আর কারুর নয়।

প্রভা বলিল,—কিন্তু আমি যদি ভাগের দাবী করি!

—দেব না।

—যদি তাঁর নিন্দে করে বেড়াই?

—তাও সহ্য করবো না।

—তবে আমায় কি করতে বলিস?

—তুইও আবার আমায় ঠাট্টা করতে আরম্ভ করলি প্রভা? এমন সময় শকুন্তলা-দি ডাকিলেন,—কে তোমরা গাছের আড়ালে? এখানে এস।

প্রভা মনে মনে যাহা ভাবিয়াছিল তাহাই হইল। শকুন্তলা-দির ডাকে সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, বলিল,—কেমন, বলিনি? ওঁর নজর এড়িয়ে চলা বড় সহজ কথা! এইবার চল্—দুজনে কিছু মিষ্টি কথা শুনিগে। রেণু বিরক্ত হইয়া বলিল,—বলিহারী চোখ!

দুইজনে ত্রস্তপদে শকুন্তলা-দির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

তিনি তাঁহার গোল গোল চোখ দুইটী বার কতক ঘুরাইয়া লইয়া

বলিলেন,—গাছের আড়াল না হলে তোমাদের বন্ধুত্ব হয় না, কেমন? বেড়াবে না, খেলা করবে না, কেবল এ-কোণে ও কোণে বসে কাটাবে! এমন লেজী হচ্ছ তোমরা দিন দিন!

রেণু ও প্রভা মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া শকুন্তলা-দির কথাগুলি শুনিয়া যাইতেছিল। খানিক পরে আবার তাঁহার নজর পড়িল উহাদের পায়ের দিকে, একটু রাগতভাবেই তিনি বলিলেন,—তোমরা ভেবেছ কি? এই সিজন্ চেঞ্জের সময়, গায়ে গরম কাপড় নেই, পায়ে জুতো নেই, অসুখ হবার বড় সাধ হয়েছে, না?—যাও শীগ্গীর জুতো পরে এসো।

দণ্ডদাত্রীর নিকট হইতে অতি সহজেই ছাড়া পাইয়া, দ্রুতপদে তাহারা ড্রেসিংরুমে আসিয়া প্রবেশ করিল।

উপর হইতে পিসীমা সাড়ে ছয়টার ঘণ্টা খুব জোরে বাজাইয়া দিলেন। মাঠের যত মেয়েরা তখন একে একে উপাসনার জন্য হলের একপার্শ্বে বাঁধা ষ্টেজের উপর আসিয়া হাজির হইয়াছে।

শকুন্তলা-দি কিছুক্ষণের জন্য অব্যাহতি পাইয়া এইবার উঠিয়া আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া লইলেন।

সমস্ত মেয়েরা বেশ চুপচাপ হইয়া ষ্টেজের উপর বসিলে পর, জ্যোতির্ময়ী ব্রহ্মসঙ্গীত খানা রেণুর দিকে দিয়া কহিল,—রেণু, আজ তোমার পালা, গান গাও।

—আমি আজ পারবো না।

—বাঃ, পারবে না কেন?

—আজ আমার সর্দ্দি হয়েছে, গলা ভেঙ্গে গেছে, আমি পারবো না।

চারিদিক হইতে সব মেয়েরা বলিয়া উঠিল,—বারে, আজ কাশি হয়েছে, কাল গলা ভেঙ্গে গেছে, ও সব শুনবো না। রুটিন্ মতন গান করতে হবে।

রেণু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, কোন কথারই জবাব পর্য্যন্ত দিল না। অবশেষে কণ্ঠ তাহার হইয়া গান ধরিল—

ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা,
প্রভু তোমার পানে, তোমার পানে,
যায় যেন মোর সকল গভীর আশা
প্রভু তোমার কানে, তোমার কানে,—

সে দিনের মত রেণু রেহাই পাইল।

দুই

প্রভা আজ দুই বছর হইল এই স্কুলে আছে। তাহার বাবা আসাম অঞ্চলে চাকরী করেন, সুতরাং মেয়ের পড়াশুনার সুবিধা না হওয়াতে তাহার মা নিজে পছন্দ করিয়া তাহাকে এই স্কুলের বোর্ডার করিয়া দিয়াছেন।

রেণু প্রভার পরে স্কুলে আসিয়াছে, সে ও দেড় বছর পূর্ণ হইতে চলিল। হেড্ মিস্ট্রেস্ কমলামিত্র প্রথম দিন পরীক্ষা করিয়া রেণুকে প্রভাদের ক্লাশেই ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

রেণুর বাবা গোয়ালিয়রে কি-কাজ করিতেন। মা-হারা এই মেয়েটিকে তিনি এতদিন কাছে কাছেই রাখিয়াছিলেন, এইবার মেয়ে বড় হইয়াছে, এরূপ ভাবে একা রাখা ঠিক নয় মনে করিয়া, তিনি সেবার নিজেই টিচারের সঙ্গে চিঠিতে বন্দোবস্ত করিয়া, গ্রীষ্মের ছুটির পর সাতদিনের ছুটিতে রেণুকে এখানে রাখিয়া গেলেন।

এতগুলি নূতন অপরিচিত মেয়ে ও টিচারের মাঝখানে যে দিন সে প্রথম স্কুলে আসিল, সেদিন তাহাকে কি বিড়ম্বনাটাই না ভোগ করিতে হইয়াছিল! প্রত্যেকের কাছে যেন সে নূতন হইয়া দেখা দিল, ক্রমাগত প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া সমস্ত মেয়েরা তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল; সেই সময় বন্ধুভাবে প্রভাই প্রথম আসিয়া বলিয়াছিল,—কি কচ্ছো ভাই তোমরা? এই নূতন মেয়েটি কে?—চল আমরা ওপরে যাই, বলিয়া রেণুর হাতখানি ধরিয়া উপরে উঠিয়া আসিল।

প্রভার সেদিনকার ব্যবহার রেণু আজও ভোলে নাই। কোথায় তাহার বিছানা পাতিতে হইবে, নীচের ড্রেসিং রুমে কোথায় তাহার বাক্সটি রাখিলে সুবিধা হইবে প্রভা সমস্তই তাহাকে নিজের মত করিয়া দেখাইয়া লইয়াছিল! তাহার পর কোন্ ঘণ্টায় খাওয়া, কোন্ ঘণ্টায় স্নান, কখন পড়া, কখন শোয়া, একের পর এক বোর্ডিং-এর নিয়মগুলি তাহাকে শিখাইয়া দিতেছিল। ঠিক সেই সময় দুই ডলী ঠাট্টা করিয়া যে কথাটা অনায়াসে তাহাদের মুখের কাছে হাত ঘুরাইয়া বলিয়াছিল, সে কথাও রেণু ভুলিয়া যায় নাই।

চিরকাল বাড়ী থাকিয়া ইচ্ছামত চলা ফেরা করিয়া, হঠাৎ এত টাইম-বাঁধা কাজ, চলা ফেরা, কথাবার্ত্তার মাঝখানে আসিয়া পড়াতে প্রথমটা রেণুর রাগে,

দুঃখে দুইচোখ ক্ষণে ক্ষণে জলে ভরিয়া উঠিতেছিল পাছে কেহ দেখিয়া ফেলে, এই আশঙ্কায় বস্ত্রাঞ্চলে বার বার সকলের অলক্ষ্যে চক্ষু দুইটি মুছিয়া লইত। কিন্তু প্রভার কাছে তাহা গোপন রহিত না। একদিন সস্নেহে কাছে টানিয়া লইয়া প্রভা বলিল,—কাঁদ্‌ছিস্ কেন ভাই? বাবার জন্য মন কেমন কর্‌ছে? চল্, আমরা একটু বেড়াই গিয়ে।

প্রভার এই সামান্য স্নেহের পরশ পাইয়া রেণু, এতগুলি মেয়ের মাঝখান হইতে তাকেই যেন আপনার করিয়া পাইল। সেই অবধি রেণু প্রভাকে, প্রভা রেণুকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিত না। ইহার জন্য সকলের কাছে তাহাদের কম বিদ্রূপ সহ্য করিতে হয় নাই।

প্রভা যেন এতদিন রেণুর জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। স্কুলে আসিয়া অবধি মনের মত সঙ্গী সে একজনকেও পায় নাই। সকলের সঙ্গে মিলিতে গিয়া, বার বার আঘাত খাইয়া ফিরিতে হইয়াছে। বিশেষ করিয়া তাহাদের এই ফোর্থ ক্লাশের দলটিকে সে বেশ ভাল করিয়াই চিনিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সব চেয়ে ভীষণ ছিল মায়া। মিথ্যা কথা ত তাহার অঙ্গের ভূষণ! চুরিতেও তাহার হাত বেশ পাকিয়াছিল। প্রভা স্কুলে আসিবার কিছুদিন পরেই এক কাণ্ড ঘটে।

প্রায়ই মেয়েদের কাপড়, জামা, জুতা হারায়। সেদিন ম্যাট্রিক ক্লাশের তড়িৎবালার বাক্সের ভিতর হইতে ঢাকাই কাপড়খানা চুরি যায়। সে লেডি-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ মিস্ সেনের কাছে জানাইলে তিনি অনুমতি দেন, সব মেয়েদের মেয়েদের বাক্স খোঁজা হোক্।

মিস্ সেন নিজে আসিয়া ড্রেসিং রুমে দাঁড়াইলেন, সকলে যার যার বাক্স খুলিয়া একে একে সমস্ত জিনিষ মাটিতে নামাইতে লাগিল। মিস্ সেনের আদেশেই মায়ার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছিল, এইবার যখন সত্যসত্যই তাহার বাক্স হইতে কাপড়খানা বাহির হইয়া পড়িল তখন, তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটি জলে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সব মেয়েরা মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভগী নিজে ঐ দলের মেয়ে হইলেও সুবিধা পাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল,—ছিঃ ছিঃ মায়া, কি লজ্জার কথা!

সেদিনকার ব্যাপারে প্রভার সমস্ত মন ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। বার বার তাহার এই কথাটাই মনে হইতেছিল, ছি-ছি, এই জন্যেই কি এরা স্কুলে আসিয়াছে?

রেণু প্রভার কাছে স্কুলের প্রায় সব কথাই শুনিয়াছিল। সুতরাং সে প্রথম হইতেই তাহাদের হইতে নিজেকে দূরে রাখিত।

* * *

রেণু স্কুলে আসিবার পর মাস তিনেক কাটিয়া গিয়াছে। একদিন রাত্রে সে তাহার মনের ভাবটা গোপন করিতে না পারিয়া বন্ধুর কাছে প্রকাশ করিয়া ফেলিল,—দেখ্ ভাই প্রভা, প্রিয়-দি'কে আমার ভারী ভাল লাগে। গলার স্বরটা আরও একটু কোমল করিয়া বলিল,—কেন বল্ তো ভাই!

প্রভা চুপ করিয়া রহিল, মনটাতে কিন্তু তাহার হাসি উছলিয়া পড়িতেছিল, নিঃশব্দে রেণুর হাতখানি নিজের কাছে টানিয়া লইল। একটু থামিয়া রেণু সসঙ্কোচে বলিল,—ভাললাগা নিয়ে স্কুলের মেয়েদের মধ্যে যে কাণ্ড দেখি, তাই বলতেই আমার লজ্জা করছিল। তুই হাসছিস কেন ভাই?

রেণুর হাতের আঙুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে প্রভা বলিল,—না, হাস্‌বো কেন? তবে তোর ভালবাসাকে তারিফ দিতে হয়। আমি কিন্তু ওঁকে একটু সমীহ করেই চলি, যে রুড় চেহারা!

—ওটা তোর ভুল ধারণা। এমন সুন্দর শ্রী আছে ওঁর চেহারায়, যার জন্য না ভালবেসে থাকা যায় না। আমি দেখি অনেক মেয়েরাই প্রিয়দি'র জন্য পাগল। এই বলিয়া আঙুল গুণিয়া সে কয়েকটি নামও বলিয়া দিল।

—যার যার অভিরুচি। হাসিতে হাসিতে প্রভা আবার বিদ্রূপ করিয়া বলিল,—এরই মধ্যে প্রেমে পড়লি রেণু! তাও আবার যে সে লোক নয়, একেবারে বি, এ, বি, টি!

অভিমানে ঠোঁট উল্টাইয়া রেণু কহিল,—এই জন্যেই তো বল্‌তে চাই নি। তোর কাছেও আমায় গোপন করে চল্‌তে হবে শেষটায়। রেণু পাশ ফিরিয়া শুইল।

প্রভা ডাকিতে যাইবে এমন সময় দেখিতে পাইল, পিসিমা 'বেড্‌রুমের' দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছেন, যাহারা এতক্ষণ বিছানায় শুইয়া কথা কহিতেছিল, বিশাল-বপু পিসিমাকে ঘরের ভিতর ঢুকিতে দেখিয়াই পঞ্চাশ ষাট জন মেয়ে একেবারে মড়ার মত খাটের উপর পড়িয়া রহিল। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে গুনগুন আওয়াজ শুনিয়া পিসিমা চক্ষু-আরক্ত করিয়া ধমকাইতে আসিয়াছিলেন তাহা যেন একেবারেই মিথ্যা।

ভগী কিন্তু ধরা পড়িয়া গেল। ক্লাশে বীণাপাণিকে হারাইয়া কি একটা প্রশ্নের উত্তর সে আজ দিতে পারিয়াছে, তাহাই সত্যবতীর কাছে জোর গলায়

বলিতেছিল। মেট্রনের আগমনে তাড়াতাড়ি হুমড়ি খাইয়া একটি মেয়ের খালি খাটের উপর সে পড়িয়া গেল। আঘাত বেশী পাইলেও নড়িল না। কে কেমন মেয়ে পিসিমার বেশ ভাল করিয়াই জানা ছিল, অন্ধকারে আন্দাজে নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া তিনি ডাকিলেন,—ডলী ওঠো। কোন সাড়া নাই।

তিনি একেই রাগিয়া ছিলেন সাড়া না পাওয়াতে চড়া গলায় ভাঙ্গা কাঁসির স্বরে পুনরায় ডাকিলেন,—উঠে এসো ডলী, শীগ্‌গীর উঠে এসো।

ডলী যেন গভীর নিদ্রায় মগ্ন, একবার উঁ, আঁ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

পিসিমা এইবার কাছে আসিয়া বলিলেন,—ওঠো বলছি ডলী! মনে নেই বেড্‌রুমে কথা বলবার নিয়ম নেই। এত করে বলছি, ভাল চাও তো ওঠো।

বেগতিক দেখিয়া ডলী আস্তে আস্তে উঠিয়া পড়িল, অন্যান্য মেয়েরা লেপের তলায় মুখ লুকাইয়া হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

এ-দালান হইতে ও-দালানে যাইতে মাঝখানে যে ব্রীজটা ছিল, সেখানেই পিসিমার আড্ডা, খান দুই বেঞ্চি পাতিয়া প্রায় সারাদিনই তিনি সেখানে ডাঙ্গার কুমীরের মত পড়িয়া থাকিতেন। রোদও লাগিত হাওয়াও পাইতেন। সেইখানে আসিয়া বলিলেন,—ঐ কোণে দাঁড়িয়ে থাক, যতক্ষণ না বলবো, ঘরে যেও না। চুপ্‌ করে দাঁড়িয়ে থাক। দুষ্টু মেয়ে, সারাদিন দুষ্টুমী করে বেড়াবে! বলিয়া তিনি রাত্রের ঠাণ্ডা সহ্য করিতে না পারিয়া, হেলিয়া দুলিয়া ব্রীজটা পার হইয়া তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। ডলী গায়ের কাপড়টা আগাগোড়া মুড়ি দিয়া বেঞ্চের উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। ঘরের মধ্যে তখন প্রভা ব্যতীত সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

তিন

রবিবার। সকালে সাণ্ডেস্কুল হইতে আসিয়া প্রভা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছিল, রাণী আসিয়া খবর দিল,—প্রভা তোমার ভিজিটর এসেছেন, যাও। প্রভা পুনরুক্তি না করিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া হলে গিয়া উপস্থিত হইল। কয়দিন হইতে তাহার বাড়ী যাইবার জন্য মন বড় উতলা হইয়া উঠিয়াছে, সেদিন পত্রে সংবাদ পাইয়াছে, মা কলিকাতা আসিয়াছেন। আজ সে বাড়ী যাইবে, এই আনন্দে তাহার মনটি উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

হলে ঢুকিয়াই দেখিল, একখানি বেঞ্চিতে তাহার মামা বসিয়া আছেন। তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই, মামা বলিলেন,—শীগ্‌গীর চল্‌ প্রভা, দেরী নয়। গাড়ী দাঁড়িয়ে।

—আচ্ছা, আমি মিস্ মিত্রকে জিজ্ঞাসা করে এক্ষুনি আস্‌ছি। বলিয়া প্রভা বাহির হইয়া গেল।

মিস্ মিত্রের কাছে অনুমতি লইয়া, রেণুর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া তাহাকে অনেক খোঁজাখুজির পর, প্রিয়-দি'র ঘরে দেখা পাইল। সময় অল্প তাই তাড়াতাড়ি রেণুর গলাটি সস্নেহে দুই হাতে জড়াইয়া বলিল,— আমি চল্লুম ভাই, মামা গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, কাল যদি না আসতে পারি পরশু আসবো।

রেণুর, বন্ধুর বাড়ী যাওয়ার সংবাদে মুখ ভারী করিয়া কহিল,—বাঃ রে আমায় একা ফেলে যাবি? আমি কি করে থাকবো?

—কেন, তোর প্রিয়-দি তো রইল, বলিয়া রেণুর গালে ছোট্ট একটি চুম্বন করিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল, ফিরিয়া তাকাইবারও যেন অবসর নাই!

প্রভা চলিয়া গেল। রেণু জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া, গাড়ীখানার চলিয়া যাওয়া দেখিতে লাগিল। প্রভা চলিয়া গেলে তাহার দুই চোখ আপনা হইতেই জলে ভরিয়া উঠিল,—মনে হইতে লাগিল, তাহার মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে মাঝে মাঝে সেও তো এমনি বাড়ীর আনন্দ উপভোগ করিতে পারিত, প্রভাকে ঠিক এমনি একা ফেলিয়া সেও বাড়ী যাইত! হঠাৎ নীচে প্রিয়-দি'র কণ্ঠস্বরে তাহার চিন্তার ধারা এলোমেলো হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি আলনার কাপড়গুলি গুছাইতে মন দিল।

একটু পরেই প্রিয় দি আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন, রেণুকে এমন সময় ঘরে দেখিতে পাইয়া তিনি মোলায়েম সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি কচ্ছো রেণু?

—কই কিছু না তো! প্রিয়-দি'র প্রশ্নে সে যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল, তাড়াতাড়ি হাতের কাছে একটা রুমাল ছিল, তুলিয়া লইয়া বলিল,—এটা কে সেলাই করেছে প্রিয়-দি?

—কে করবে বল! এটা আমার অনেক আগেকার শিল্পকার্য্য!

—কি সুন্দর! স্কুলে করেছিলেন বুঝি?

হ্যাঁ। বলিয়া তিনি তাঁহার জুতা মোজা একে একে খুলিয়া ফেলিয়া খাটের উপর হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িলেন। আজ তিনি মার্কেট হইতে ফিরিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

রেণু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, অবশেষে তাঁহার জুতা মোজা, যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিয়া বলিল,—আমি যাচ্ছি প্রিয়-দি।

—না, বোস। তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি। বলিয়া খাটের এক পার্শ্বে বসিবার ইঙ্গিত করিলেন।

রেণুও তখন সেখান হইতে সরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল না, অথচ এরূপ ভাবে বসিয়া গল্প করিতে দেখিলে, অন্য মেয়েরা কত কি বলিবে। এমনই তো ডলীর দল তাহাকে একটু আধটু বলিতে কসুর করে না। একদিকে বিষম লজ্জা, অপর দিকে আনন্দের দোলায় তাহার মনখানি দুলিতে লাগিল। ধীরে ধীরে খাটের পাশে মাটীতে সে বসিয়া পড়িল।

—আহা, ওখানে বসলে কেন রেণু? উঠে বোসো।

—না আমি এখানে বেশ বসেছি প্রিয়-দি, আপনি গল্প বলুন।

—তোমার বাবা কোথায় থাকেন রেণু?

—বাবা গোয়ালিয়রে কাজ করেন। সেখানেই থাকেন।

—মাও কি সেখানে থাকেন?

এই নিদারুণ প্রশ্নের সে কি জবাব দিবে। রেণু ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। আবার চোখ দুইটি ছলছল করিয়া উঠিল। সহসা প্রিয়-দি'র মুখের দিকে চাহিয়া ব্যথা-কাতর কণ্ঠে বলিয়া ফেলিল,—আমার মা নেই।

প্রিয়-দি চমকিয়া উঠিলেন,—মা নেই?—ভাই—বোন?

—ভাই, বোন কেউ নেই প্রিয়-দি। মা কবে মারা গেছেন তাও আমার মনে নেই।

অনর্থক এসব কথা জিজ্ঞাসা করিয়া রেণুকে আরও দুঃখ দিলেন মনে করিয়া তিনি নিজেও খুব দুঃখিত হইলেন। রেণুর গালে সস্নেহে মৃদু আঘাত করিয়া বলিলেন,—তোমার বন্ধু কোথায় রেণু?

বন্ধুর খোঁজ পড়াতে সে সলজ্জে বলিল,—আজ সে বাড়ী গেছে।

ল্যাণ্ডিং হইতে এমন সময় মেট্রনের গলা শোনা গেল,—ঘণ্টাটা বাজিয়ে দাও তো মাধুরী!

ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেই প্রিয়-দি জিজ্ঞাসা করিলেন,—এটা তোমাদের খাবার ঘণ্টা না?

—হ্যাঁ।

—তাহলে যাও। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

ঘর হইতে রেণু বাহির হইয়া আসিতেই ডলীর দল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ডলী চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—

কি গো রেণুবালা !

রূপে আলা।

কানে কালা ! এতক্ষণ কি অভিনয় করলে, একটু বল না !

এই মেয়েদের ব্যবহারে রাগে রেণুর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল, কোন দিকে না তাকাইয়া সরাসর খাবার ঘরে গিয়া একটি আসনে বসিয়া পড়িল। আজ পাশে প্রভা না থাকাতে, রেণুকে কতকগুলি মেয়ে কথার জালে ফেলিয়া বিব্রত করিয়া তুলিল।

একজন বলিল—কি গো রেণু, বন্ধু কোথায় গেল তোমাকে ফেলে ?

আর একজন বলিল—প্রভা কি নিঠুর !

আর একজন থিয়েটারী ঢঙে বলিয়া উঠিল,—একি আজ বিশ্বে নেহারি ! বন্ধু নাই ? ইহা কি সম্ভব কভু ?

সকলের কলরবে খাবার ঘরে হাট বসিয়াছে মনে হইতেছিল।

মিস্ মিত্র ডাইনিং রুমে আসিতেছিলেন, গোলমাল শুনিয়া একবার মেয়েদের ঘরে প্রবেশ করিতেই সব চুপ হইয়া গেল।

তাড়াতাড়ি থালার ভাতগুলি গো-গ্রাসে গিলিয়া রেণু উঠিয়া পড়িল।

—একি রেণু, আগে উঠবার তো নিয়ম নেই ? সত্যবতীর আজ নিয়ম, অনিয়মের এত প্রয়োজন দেখিয়া রেণুর রাগ কেবল বাড়িয়াই চলিল মুখ ভার করিয়া বলিল,—আমার শরীর ভাল নেই।

—এ যে দেখছি নূতন কায়দা, বন্ধু বিহনে শরীরও খারাপ হয় নাকি ?

কথাগুলি শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে মুখ ধুইয়া উপরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

চার

একটি একটি করিয়া সাত দিন পার হইয়া গেল তবু প্রভা স্কুলে ফিরিল না দেখিয়া রেণু মনে মনে চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কাল শনিবার চিঠি লেখার দিন ছিল, কিন্তু আশায় পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিয়া লেখা হয় নাই। আর এক সপ্তাহের মধ্যে চিঠি লিখিবার হুকুম নাই। কি করিয়া যে একটু খবর লইবে সে তাহাই ভাবিতে লাগিল। নিশ্চয়ই প্রভার অসুখ করিয়াছে, তাহা না হইলে এত দেরী হইবার কারণ কি ? নানা সম্ভব অসম্ভব চিন্তার ধারা তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। বোর্ডিং-এর মেয়েগুলি তাহাকে একলা পাইয়া প্রতিপদে অপদস্থ করিতে কসুর

করিতেছিল না। এমনি ধারা বিরক্তকর চিন্তার স্রোতে যখন তাহার মন-খানা ভাসিয়া চলিয়াছিল, তখন মাঠের মাঝখানে ডলী ও সত্যবতীর তীক্ষ্ণ গলার স্বর সজোরে আসিয়া রেণুর কানে প্রবেশ করিল।

—ওগো প্রভারাণী, বন্ধুর চেহারাখানা একবার দেখগে, বন্ধু যে তোমার হোদয়ে মরছিল! এই সাতটা দিন খাওয়া নেই, সে কি কাণ্ড!

.প্রভা তাহাদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া তাড়াতাড়ি মাঠ পার হইয়া ড্রেসিং-রুমে আসিয়া ঢুকিল। কাপড় ছাড়িয়া, স্লিপার পায়ে দিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিল। ট্রাম হইতে নামিয়া এতটুকুন্ পথ হাঁটিয়া আসিতেই তাহার বড় দুর্ব্বল বোধ হইতেছিল।

ডলী ও সত্যবতীর গলা শুনিয়া রেণু তাড়াতাড়ি উপরের ব্রীজে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু নামিয়া আসিতে পারে নাই অসভ্য মেয়েগুলির জ্বালায় প্রভার আগমন সংবাদে তাহার মনের বীণায় আনন্দ ঝঙ্কার দিতে লাগিল। বন্ধুর হাতে নিজের হাতখানি রাখিতে পারিলে সে যেন বাঁচে!

উপরে তখন কেহই ছিল না, প্রভা ব্রীজের উপর আসিতেই রেণু গলাটি দুইহাতে জড়াইয়া তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। অভিমানে সে কোন কথাই কহিতে পারিতেছিল না।

—ছাড় ভাই রেণু, এক্ষুণি ওরা সব দেখে ফেলবে তা হলে আর রক্ষে নেই।

—দেখুক—এখন আর আমার ভয় নেই, যা ওরা সব করেছে আমায়! লক্ষীছাড়া বাঁদরী ডলীটা আর ওই সত্যবতী রাণী রেণুকা। ইচ্ছে কচ্ছিল খুব ক'ষে দু'ঘা লাগাই।

প্রভা রেণুর পাগলামী দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল,—তুইও তো কথার ঘায়ে ওদের জ্বালাতে পারতিস্।

—গন্ধ কার ওদের পায়। বোর্ডিংশুদ্ধ খুঁজলেই ওদের জুড়ি মেলে, নইলে, অসভ্য জংলী যারা, তাদের ঘরেও এমন মেয়ে কক্ষণো দেখিনি!—

—চল্ ভাই, বিছানায় শুয়ে পড়িগে, বড্ড ক্লান্তি লাগচে।

এতক্ষণে রেণুর চেতনা হইল, ব্যস্ত হইয়া প্রভার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল,—ওকি, তোকে এমন মলিন দেখাচ্ছে কেন রে?

—অসুখ করেছিল—।

—কি অসুখ?—জ্বর?

—হ্যাঁ, ডেঙ্গুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেলুম না কোনমতে।

—তবে এ শরীর নিয়ে কেন এলি মরতে? আর দুদিন—

—তা হ'লে তুমি আর আস্ত রাখতে না আমায়; স্কুলের গেটে পা দিয়েই তো অভাব—অভিযোগের পালা আরম্ভ হয়েছে!

রেণু ব্যথিত হইয়া কহিল,—আমি বিছানাটা ঠিক করে দিই, তুই শুয়ে পড়। একটু থামিয়া লইয়া বলিল,—তোকে ছেড়ে থাকা আমার একদিনও পোষায় না বাপু! ইস্, কি বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে তোর।

প্রভা বিছানার উপর তাহার ক্লান্ত দেহটাকে এলাইয়া দিয়া বন্ধুর কথাগুলি শুনিয়া যাইতেছিল, এইবার জিজ্ঞাসা করিল—প্রিয়-দি কেমন আছেন, ভাল ত?

—হ্যাঁ। মৈত্রী-দি'র খুব জ্বর যাচ্ছে। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে। তাঁকে নিয়ে ক'দিন ধরে ওঁদের রাত্‌জাগা চল্‌ছে। প্রিয়-দি'র জন্য আমার ভারী ভাবনা হচ্ছে ভাই, এই হিড়িকে তিনি আবার না পড়েন।—গলার স্বর-টাকে যথা সম্ভব সংযত করিয়া আস্তে আস্তে কহিল,—কি বলবো প্রভা, মৈত্রী-দি'রও এটা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলতে হবে, প্রিয়-দি'র হাতে না হলে, কেউ তাকে এতটুকুন জলও খাওয়াতে পারেন না! একজনকে নিয়ে সকলে মিলে টানাটানি করলে, সে বেচারা বাঁচে কি করে? কথা সমাপ্ত করিয়া রেণু আপনিই হাসিয়া ফেলিল।

প্রভা এতক্ষণ হাসিতেছিল, এইবার বলিল,—বাঃ, এ তো আচ্ছা কথা, একি তোর একলার দখল নাকি রে? এ যে সেই—"পথের মাঝে মিলে গেল—" থাক্, আর বলতে চাই না। একটুখানি এদিক্-ওদিক্ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রভা পুনরায় বলিল,—আচ্ছা রেণু, ভালবাসা জিনিষটা সকলকার মধ্যেই আছে, আর সব মানুষই একজন না একজনকে ভালবাসে, নইলে আপনার জীবনটাকে একা কেউই টেনে নিয়ে চলতে পারে না; কিন্তু তোর মত এমন উন্মাদ হতে তো কাউকে দেখি নি!

রেণু কথাগুলি শুনিয়া গেল বটে, কিন্তু প্রশ্নটা একেবারেই উল্টা করিয়া বসিল,—তুই বললি প্রভা, সকলেই একজন না একজনকে ভালবাসে, নইলে একা চলতে পারে না,—তবে তুই বল্ কাকে তোর মনে ধরেছে? কাকে তুই মনে মনে মালা দিয়েছিস?

—তাতে তোর মাথাব্যথা কিসের ?

—না বল্লে আজ আমি ভারী কষ্ট পাব, বল্ লক্ষ্মীটি তোর পায়ে পড়ি, বলতেই হবে তোকে আজ !

—তোর মত তো আমি পাগলও হই নি, আর তাঁর জন্য প্রাণটা আমার বেরিয়েও যাচ্ছে না।

রেণু খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, কহিল—ওঃ বুঝেছি, বুঝেছি। থাক্ আর তোমায় বলতে হবে না প্রভারাণী! ডুবে ডুবে জল খাও, তুমি আমার চেয়েও পাকা ডাকাত! ঐ ফর্সা রূপেই তোমায় ভুলিয়াছে আর কেউ নয়।

প্রভা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল,—ছাই বুঝেছিস্। চেঁচাস নি রেণু, অসভ্য মেয়ে! লজ্জা নেই একেবারে, চেয়ে দেখ্, পর্দার আড়ালে প্রিয়-দি আর সুকৃতি-দি রয়েছেন।

—থাকুনগে ওঁদের মধ্যেও এমন ঘটনা দিনের মধ্যে কতবার ঘটচে! মিস্ মিত্রের ঘরের দরজায় একবার কান দিয়ে একবার মিনিট পাঁচেক দাঁড়া গিয়ে, কত কথাই শুনতে পাবি। ওঁরা যা বলেন তার তুলনায় আমরা তো কিছুই না—

ব্রীজ হইতে চটিজুতার ফট্ ফট্ আওয়াজ কানে আসিতেই তাহারা দুইজনে সন্ত্রস্তে উঠিয়া বসিল। মিস্ বোস ওরফে বিভা-দি তাঁহার এলোচুলের রাশ পিঠের উপর ছড়াইয়া দিয়া কাপড়ের চাবি বাঁধা আঁচলাটাকে আঙুলের মাথায় ঘুরাইতে ঘুরাইতে বেড্-রুম পার হইয়া প্রিয়-দি'র ঘরের পরদা উঠাইয়া কহিলেন, প্রিয়বালা ওঠো, তোমার প্রেয়সী অষুধ খাবেন, তোমার হাতে না হ'লে তার নাকি গলা দিয়েই ঢুক্‌বে না।

প্রিয়-দি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। সুকৃতি-দি তাঁহার অসম্ভব রকম বেঁটে ও মোটা দেহটাকে স্প্রিং-এর খাটের উপর দোলাইয়া দিয়াছেন, প্রাণপণ চেষ্টায় তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইতে লইতে বলিলেন,—তোর বরাতটা দেখলে আমারও বাস্তবিক হিংসা হয় প্রিয়—।

তিন জনেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সকলের মুখেই যে চাপা হাসি উথলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আর কেহ না টের পাইলেও রেণু অনায়াসে বুঝিতে পারিয়াছিল।

বিভা-দি'র কথায় রেণু হিংসা ও ক্রোধে জ্বলিয়া মরিতেছিল, তাঁহারা চলিয়া

যাইতেই সে একটু উদ্ধত ভাবে কহিল,—দেখ্‌লি তো প্রভা? মৈত্রী-দি'টা যদি স্কুল ছেড়ে চলে যায় ত আমি খুব খুশী হই। একেবারে কচি খুকির মত আবদার ধরেছেন;—এমন রাগ ধরে, কি—

প্রভা হাসিয়া বলিল,—পরের উপর রাগ হলে তার ঝাল মিটোবার এক উপায় আছে,—দুই হাতে নিজের চুল ছেঁড়া!—চল্‌ পেট জ্বলচে, খাবার ঘণ্টা পড়লো।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।





উপন্যাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হরিলাল বল্লেন, বাইরে থেকে পরের মত দেখ্‌লে অম্‌নি ধারণা হওয়াই তো খুব স্বাভাবিক। মিশনারিরা ঐ কথাই ব'লে থাকে। তা-ছাড়া, মানুষের গড়া নিয়ম-এর দোষ ক্রটিত' আছেই। আমাদের দেশ যাঁকে চিরদিন শ্রদ্ধা সম্মানের সঙ্গে মনে ক'রে রাখ্‌বে—যিনি আধুনিক বাংলার আদর্শ স্থল—বিদ্যাসাগর,—তিনিও ত' এই বিধানে হস্তক্ষেপ করবার প্রয়াস ক'রে ছিলেন! কিন্তু এ কথা কেউ বল্‌বে না যে, তিনি এই আদর্শের দোষ ধ'রে ছিলেন; তিনি মোটের উপর কয়েকটি ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তন প্রস্তাব করেছিলেন মাত্র। দেশ তার জন্য তখন মোটেই প্রস্তুত ছিল না—তাই তখন সেটা গ্রহণ করে নি।

এমন অগ্রাহ্য করার দৃষ্টান্ত ত' জগতের ইতিহাসে বিরল নয়। খৃষ্টের কথাই ত' বলা যেতে পারে।

হরিলাল ধীরে ধীরে উঠে ঘর থেকে বার হয়ে চলে গেলেন।

বল্লুম, ইনি শান্ত হয়ে এমন সুন্দর চিন্তা কর্‌তে জানেন যে, যে-কোন বিষয়ের মর্ম্মস্থলে পৌঁছুতে তাঁর দেরি হয় না! এইটে মানুষের কামনার বস্তু!

বিরজা বল্লেন, যাদের চামড়া হাতির মত মোটা আর কড়া, তারাই ভিতরে অত শান্ত হ'তে পারে, কিরণ; এ লোকটির অসাধারণ সহ্য শক্তি; এর বুদ্ধির ভারও আছে ধারও আছে; বেশী ভাগ কাজ ভার দিয়েই হয়ে যায়—ধারের পরিচয় বড় একটা পাওয়া যায় না। যদি কোন দিন পাও ত' অবাক হয়ে যাবে।

এই কথাগুলোর মধ্যে নিন্দা এবং স্তুতি দুই ছিল। তিনি বোধকরি হরিলাল বাবুর মুক্তকণ্ঠে সুখ্যাতি করতে ভয় পেতেন আবার সুখ্যাতি না করেও থাকতে পারতেন না। তাঁর অবস্থার কথা চিন্তা ক'রে আমি একচোট মনে মনে হেসে নিলুম।

তিনি উঠে যাওয়ার একটু পরেই বদন এলো। তার মুখের গাম্ভীর্য্য একটুও কমে নি। আমি পড়ছিলাম, সে এসে চেয়ারে শুদ্ধ হয়ে ব'সে রইল।

বইখানা বন্ধ ক'রে বল্লুম, বদন, আজ খুড়ী-মা'র অবস্থা দেখে—তুমি ভারি একটা অস্বস্তি বোধ করচ, না?

তুমি জান না আজ কি কাণ্ড হবে, এই রাতে।

কি,—কি,—বল ত?

আজ খুড়ী-মা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে ঐ নদীতে গিয়ে স্নান করবেন। কেউ তা বন্ধ করতে পারবে না।

এই শীতে, নিমোনিয়া হয়ে যাবে যে!

সে কথা কি তিনি বুঝবেন?

আমরা দুজনেই আকুল হ'য়ে ভাবতে ব'সলাম—কি করা যায়— কেমন ক'রে তাঁকে এই আসন্ন-বিপদ থেকে রক্ষা করা যায়!

বদন কিছুক্ষণ পরে বল্লে, কে ওঁদের পায়ে ধরে আসতে বলেছিল— বেহায়া ছুঁড়ি!

ছিঃ বদন, গাল দিও না; ওতে তোমার ক্ষতি হবে, ওঁদের কি?

কেন? তুমি বলে দেবে বুঝি?

না,—তা' দিতে যাবো কেন?

তবে ক্ষতি কি ক'রে হবে?

আমি মনে মনে হাসলুম— এ ছেলেটির সে বোধও নেই!

ভগবান অপ্রসন্ন হবেন।

বেহায়াকে বেহায়া বল্লে কেন তিনি অপ্রসন্ন হবেন?

ইলা এমন কি ক'রেছে যাতে তুমি এত বড় একটা শক্ত কথা প্রয়োগ ক'রতে পার? সে একটা আবদার ক'রে খুড়ী-মা'র কাছে কিছু খেতে চেয়েছে—এই বই ত' নয়—সেটা এতই কি দোষের ভাই?

বদন বল্লে, তাই বুঝি কেবল, আরো ওর দোষ নেই? অমন ক'রে অন্ধকারের মধ্যে আমার চোখ টিপে ধরার কি দরকার ছিল?

কোথায় অন্ধকারে ?

আমি রান্না ঘরের দাওয়ায় বসেছিলাম—কি ওর দরকার পড়েছিল, শুনি? খুড়ী-মা দেখ্‌তে পেলেন, তিনি আমাকে তখ্‌খুনি, আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে কত সাবধান ক'রে দিলেন। আমার লজ্জায় মাথা কাটা গেল। আমি কি ইচ্ছা ক'রে ওর সঙ্গে মিশি? ওই ত এসে এসে আমার ঘাড়ে পড়ে—খুড়ী মা বলেচেন, ওরা ভাল নয়, অমনি ক'রে পুরুষদের নষ্ট ক'রে দেয়।

মুচ্‌কে হেসে বল্লুম,—ওতেই তুমি নষ্ট হয়ে যাবে ?

বদন রাগ ক'রে বল্লে, তা' আমি কি জানি; খুড়ী-মা বল্লেন, ওতেই দোষ হয়।

বল্লুম, বদন, খুড়ী-মা বলেছেন, তা' বুঝলুম; কিন্তু তোমারও ত' বুদ্ধি আছে ? তোমার কি মনে হয়,—ঠিক ক'রে বলত ? তোমার নিজের কি কোন একটা মতামত নেই ?

বদন কিছুতেই তার মতামত দিলে না, রাগ করতে লাগ্‌লো।

বল্লুম, ও কথা থাক্‌গে—এখন এস, একটা উপায় বার করা যাক্ যাতে খুড়ী-মা'র নদীতে নাওয়াটা বন্ধ করা যায়।

সে আগ্রহ ক'রে বল্লে,—ওঃ তা যদি করতে পার কিরণ দাদা, ত' আমি তোমার সব কথা শুন্‌বো—ইলাকে আর কোন দিন গাল দেব না।

ইলাকে নয়, কোন মানুষকেই গাল দিতে পাবে না।

তারা দোষ করলেও নয় ?

না।

কেন ?

মনে কর, তুমি যদি কোন দোষ কর—

সে বাধা দিয়ে বল্লে, তা' কেন করতে যাব ?

মানুষ না জেনেও ত' অপরাধ করে !

বদন তাড়াতাড়ি বল্লে, ও-ও, বুঝেছি এখন। তারপর ?

হুঁ, তোমায় যদি আমি কটু কথা বলি, গাল দিতে থাকি—তাতে বেশী কাজ হয়, না তোমাকে মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে বল্লে, কাজ হয় ?

গাল দিলে মন বেঁকে যায়—তা আমি জানি ;—না কিরণ দাদা, তুমি ঠিক বলেছ—মিষ্টি কথাতেই আসল কাজ হয়।

তবে গাল দেওয়া ভাল নয়, এ স্বীকার কর ?

হাঁ, আজ থেকে আমি আর কাউকে রাগ ক'রে গাল দেব না।

আমি বদনকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আদর ক'রে বল্লাম—লক্ষী, ভাইটি আমার!

এখন বল,—কি উপায় করবে?

দুটো তালা জোগাড় কর। আমরা চুপ্‌চাপ—সদর আর খিড়কির দরজায় দুটো তালা দিয়ে দিলে—খুড়ী-মা বাড়ীর বার হতে পারবেন না।

বদন ভারি খুসী হয়ে গিয়ে বল্লে, ক্যাপিটাল—কিরণ দাদা—ধন্যি তোমার বুদ্ধি!

সে তালা খুঁজতে চলে গেল এবং নিমেষে দুটো তালা হাতে ক'রে এসে বল্লে, লাগিয়ে দিয়ে আসি?

না এখন নয়—শুতে যাবার সময়।

তবে তোমার টেবিলের উপর থাক?

থাক।

রাত্রের আহারের পর দোরে তালা দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে যে-যার ঘরে চলে এলাম।

আমার বারটার আগে শোয়া অভ্যাস নয়, তাই বাতিটা বাড়িয়ে দিয়ে—লেপের মধ্যে কুণ্ডলী হয়ে বসে পড়তে লাগ্‌লাম।

* * * *

গভীর রাত—মেজের উপর পায়ের খস্ খস্ শব্দ শুনে—পিছন ফিরে দেখি—সন্ত-স্নাতা খুড়ী-মা এসে চুপ্‌টি করে দাঁড়িয়েছেন।

খুড়ী-মা! এত রাতে স্নান করেছেন?

হাঁ বাবা,—আমরা বিধবা মানুষ!

তাঁকে দেখে শীতে আমার হাড়গুলো পর্য্যন্ত যেন কেঁপে উঠ্‌লো।

তিনি আস্তে আস্তে এসে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে—ল্যাম্পের চিম্‌নির উপকার গরম হাওয়াতে নিজের অসাড় হাত দুটোকে তাতাতে লাগ্‌লেন।

তোমার ঘরে এখনো আলো জ্বলচে, মনে ক'রলুম হয় ত পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছ—তাই দেখ্‌তে এলুম।

বল্লুম, কাল একাদশী আপনি কিছু খেয়েছেন?

না, এবার খাবো।

আর দেরী করবেন না, খুড়ী-মা, রাত যে অনেক হয়েছে।

তাতে আমাদের কিছুই হয় না, যমের অরুচি—বাবা!

তীব্র ব্যথায় ভরা কণ্ঠস্বর!

সময় পাইনে, তোমায় দু-একটা কথা বল্‌বো—বাবা, আমার একটা কথা রাখ্‌তে হবে।

চলুন, আপনার ঘরে গিয়ে খেতে খেতে বল্‌বেন। আপনার অনুরোধ, আমি কি অগ্রাহ্য করতে পারি?

তাই চল।

খুড়ী-মা খেতে খেতে বল্লেন, ঐ হরিণ-শিশুটিকে বাঘিনার হাত থেকে তোমাকে বাঁচাতে হবে, বাবা!

আমি অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলুম।

তিনি বল্লেন, এ কাজটি তোমাকে করতেই হবে, কিরণ।

কি কাজ খুড়ী-মা?

বদনকে বাঁচাতে হবে। ওর উপর ডাইনীর নজর পড়েছে।

আমার চোখ দেখে তিনি বেশ বুঝতে পারলেন যে, আমি তখনো বিষয়টি ঠিক মত ক'রে উপলব্ধি করতে পারি নি।

বল্লেন, তোমাদের পুরুষের মন, খোলা-মেলা, মেয়ে-মানুষের চাতুরি বুঝতে পার না—বাবা; কিন্তু আমরা অনেক আগেই ধরি!

তিনি যেন যে কথা বল্‌বেন, তার উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাচ্চেন না—এমনি ভাব ক'রে—কপাল কুঁচকে চোখ দুটো বুঁজে—একটুখানি ভেবে বল্লেন, ঐ ইলা মেয়েটিকে তোমরা যা মনে কর তা নয়—উটি আমাদের বদনটিকে নষ্ট ক'রে দেবে।

আমি নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম—মনে মনে ভাব্‌লুম—তাই ভালো—আমি মনে করেছি—কি একটা আবার হ'লো! প্রকাশ্যে বল্লুম,—না:—বদন ত' ছেলে-মানুষ—খুড়ী-মা।

তাই ত আমার ভয়; খুড়ী-মা'র চোখ দুটো তখনো যেন চিন্তায় নিবিড় হয়ে রয়েচে!

তুমি আজকের ঘটনা জানো না বোধ হয়—অন্ধকারে ওর ঘাড়ের উপর পড়ে কত সোহাগ,—চোক চেপে ধ'রে—

বদন আপনাকে ব'লেচে?

খুড়ী-মা বল্লেন, তা হ'লে ত সোজা হতো—সে স্কুলে। তাতেই-ত' আমার সন্দেহ।

আমি কি বল্‌বো? মাথা হেঁট ক'রে চুপ্‌ করে রইলাম।

খুড়ী-মা বল্লেন, পড়া-শুনো নিয়ে দিন-রাত ডুবে আছো বাবা, এ দুনিয়ার খবর তুমি এখনো জানো না। কিন্তু বদনটিকে নিয়ে আমার বড় ভয় করে। পাড়াগেঁয়ে ছেলে—লেখা-পড়া যে খুব হবে ব'লে মনে হয় না। কাঁচা বয়সে ঘুণ না ধরে!

তিনি হাত মুখ ধুয়ে এসে—আমার হাত দু'খানা ধরে বল্লেন—তোমার হাতে ধরে বল্‌চি—তোমাকে এ কাজটি করতেই হবে। এ ক'দিন ওর উপর একটু কড়া নজর রেখো। এর চেয়ে বেশী আর কি বল্‌বো, বল তোমাকে!

ভারি মন নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। একি ভীষণ সন্দেহ—মানুষ মানুষকে একটুও বিশ্বাস ক'রে না!

আলো নিবিয়ে দিয়ে ঘুমবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লাম; কিন্তু ঘুম আর কিছুতেই আসে না—মনের মধ্যে কেবলই এই প্রশ্ন উঠ্‌তে লাগ্‌লো—কেন এই সন্দেহ?—কেন এই সন্দেহ!

যেমন ক'রে মড়া কাটবার সময় আমরা নির্ম্মম হয়ে উঠি তেম্‌নি করে মানুষের চরিত্রকে ফালা ফালা ক'রে চিরে চিরে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম কোথায় তার গলদ—কোথা থেকে এই বিষ উৎসারিত হচ্চে।

দেখ্‌লাম শুচিবায়ের ক্ষারজলে নিত্য কাচা, ছিন্ন কাঁথার শুভ্র চেরির তলায় রক্ত-চক্ষু ভোগ-বাসনা, সাপের মত গোপনে, ফোঁস ফোঁস ক'রে—তার ল্যাজটা মাটিতে আচ্‌ড়াচ্চে আর তার মুখ থেকে বিষের নীল বাষ্প ধোঁয়ার মত বার হয়ে লোক-চক্ষুর দৃষ্টিকে নিষ্প্রভ ক'রে দিচ্চে!

আর শুয়ে থাকৃতে পারলুম না, আলো জেলে বই পড়তে স্নুরু ক'রে দিলাম।

(৮)

ছুটি ফুরিয়ে যায় আর কি?

সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল
সকলি ফুরায়ে যায় মা!

মনের ঠিক এই অবস্থাই হয় বটে! তখন মন যেন লুটিয়ে কেঁদে আকুল হ'য়ে বলে—কোলে তুলে নে মা!

(শনিবারে হাওড়া-শেয়ালদায় যাত্রীর ভিড়ের বীর-দর্প;—আর সোমবার সকালে? ঐ, কোলে তুলে নে মা কালি!)

ছুটীর শেষাশেষি সবাইকেই যেন ম্রিয়মান দেখাতে লাগলো। বেশ একটা হট্টগোল করে থাকা গিয়েছিল।

সকালে চায়ের বৈঠকে হরিলাল আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কবে যেতে হবে, কিরণ?

পরশু খুলচে; কাল সন্ধ্যার গাড়ীতে।

তাই ত, ব'লে তিনি ইজি চেয়ারের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে—যেন কি একটা মহাচিন্তায় একদম মগ্ন হয়ে গেলেন।

ইলা চঞ্চল চোখ দুটো এদিক-ওদিকে ফিরিয়ে বল্লে,—তা হ'লে, ভঙ্গ দিতে উনিই হলেন প্রথম।

বেশ থাকা গিয়েছিল কিন্তু, ব'লে মিসেস দত্ত—একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়লেন।

হরিলাল তাঁর দিকে ফিরে বল্লেন, আপনি আরো দিন কত থাকুন না কেন?

তিনি ইলাকে সম্বোধন ক'রে বল্লেন।

কি বলিস্?

আবদারের সুরে সে বল্লে, না, কেউ থাক্‌বে না, আমার একটুও ভাল লাগবে না।

হাসি টিপে বল্লুম, কেন খুড়ি-মা'রা ত' থাক্‌চেন।

রা কে-কে?

হরিলাল বল্লেন, বৌ-মা, বদন—

আপনি? দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি পরশু দশটার ট্রেনে যাবো।

মিসেস্ দত্ত বল্লেন, বাঃ তবে আমরা থেকে আর কি ক'রবো!

হরিলাল বল্লেন,—আমাদের কাজকর্ম্ম আছে, যেতে বাধা; ইলার ছুটি আছে; দিন কতক থেকে যান্, দুজনেরই উপকার হবে।

বাবার যে কষ্ট হবে?

কিসের? খাওয়া দাওয়ার?—আরে সে ব্যবস্থা আমি ক'রবো। দুবেলা দুমুঠো—আমাদের ওখেনে এসে খেয়ে যাবে এখন, বলে হরিলাল হাসতে লাগলেন।

তবে থেকে যা ইলা, কি বলিস্?

হরিলাল বল্লেন, ও আর কি বল্‌বে ছেলে-মানুষ—থাক্‌তে ইচ্ছে না হয়—এই ত পথ, চলে গেলেই পারবে।

মিসেস দত্ত বল্লেন, তবে তাই হোক।

ইলা অনেকটা অনিচ্ছায় যেন রাজী হলো।

তারপর যেন একটা গাঢ় নিস্তব্ধতা সেখানকার হাওয়াকে পর্য্যন্ত ভারি করে তুল্লে! যেন যার যা-কিছু বল্‌বার ছিল সব নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে!

খানিক পরে হরিলাল কথা কইলেন,—কিন্তু আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল—বলে তিনি যেন কি ভাব্‌তে লেগে গেলেন।

সবাই আগ্রহ ভরে তাঁর দিকে চেয়ে রইল।

হরিলাল গম্ভীরভাবে বল্লেন, মেঘের বিদ্যুৎও আছে বর্ষণও আছে—ফলে কবিও তৃপ্তি পায়—চাষীও ভরসা পায়। ইলার ওপর একদিনের পরিপূর্ণ ভার চাপিয়ে দিয়ে—আমরা থাকি তার পিছনে পিছনে—দেখি সে কি করে?

ইলা বল্লে, কিসের ভার কাকা?

বুঝতে পারনি? পিক্‌নিক গো পিক্‌নিকের ভার; তুমি যা ব্যবস্থা করবে—আমরা তাই গ্রহণ ক'রবো!

ইলা দু'চোখ বিস্ফারিত ক'রে অবাক হয়ে গেল—কিছুক্ষণের জন্য।

আহারের একদিকটা লোভনীয় বটে, কিন্তু তাকে গ'ড়ে তুল্‌তে কতখানি মেহনতের দরকার—তা' তার পক্ষে ভেবে উঠাও ছিল যেন কষ্টকর ব্যাপার।

হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিলে যেমন ডুবে যাওয়াই সহজ, ইলার পক্ষে তখন মনে হলো যে হেরে যাওয়াই বুঝি তখনকার জন্য জিতের পথ।

কিন্তু বিরজা তাকে বাঁচিয়ে দিলেন। তিনি একটু হেসে বল্লেন—ইলার ওপর ভার হলে যা ঘটবে তাত জানাই আছে। যদি আধ সিদ্ধ—কিম্বা সম্পূর্ণ পোড়া কিছু চাই ত'—ইলার উপর ভার দেওয়া চলে।

ইলা বল্লে, ভার দিলে—ভার—কাঁধে নেবার মালিক ত' আমি? দেখি—কে আমাকে রাজি করতে পারে!

হরিলাল বল্লেন—তাহ'লে প্ল্যানটা দেখছি আরম্ভেই কেঁসে গেল।

বিরজা বল্লেন, তা যাবে কেন ? আমি সে ভার নিচ্ছি।

ইলা মার পিঠ ঠুকে দিয়ে বল্লে, মা, সত্যি, তুমি কি লক্ষ্মী মেয়ে !

বিরজা এবার যেন একটু রাগই করলেন, বল্লেন, অ্ঃ কি করিস্ যে—তুই বড় জেঠা হয়েছিস্ ইলা।

তারপর মিসেস দত্ত এবং হরিলাল—নানা যুক্তি পরামর্শ ক'রে—সেদিনের সান্ধ্য ভোজটিকে সফল ক'রে তোল্‌বার চেষ্টা করতে লাগ্‌লেন।

বাইরের উত্তর দিকের বারাণ্ডায় হরিলাল এবং মিসেস দত্ত, কুকার্, ষ্টোভ ইত্যাদি নিয়ে খুব উৎসাহ এবং মনোযোগের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করলেন। শীতের বেলা প্রায় প'ড়ে এসেছে,—তখন পাঁচটা হবে।

ইলা রান্নার ব্যাপারে একবার ফিরেও চাইলে না। একটা ছোট ডালায় অনেকগুলো গাঁদা ফুল তুলে নিয়ে মনের আনন্দে গান করতে-করতে নদীর দিকে চলে গেল।

হরিলাল এক মনে পোলাওএর চালে জাফরাণ আর আদার রস মাখা-চ্ছিলেন, ইলার দিকে চেয়ে শান্ত হাসি হেসে বল্লেন, ও কোন কিছুরই ধার ধারে না !

বিরজা ফিরে তাকে আগা গোড়া দেখে নিয়ে খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বল্লেন,—কিন্তু জীবনে যদি একদিন ঐ ধার সুদে আসলে শোধ করতে হয় ত'—তার যে কি দুঃখ, কি ব্যথা—তখনি বুঝবে !

হরিলাল বল্লেন, হুঁ, তবে রক্ষা যে সকলের বোধশক্তি সমান নয়।

বিরজা ফিরে যেন একটু অধৈর্য্যের সঙ্গে, অনেকখানি কথাকে সংক্ষেপ ক'রে নিয়ে বল্লেন, বোধকরি স্মৃতি শক্তি ও সমান হয় না।

মনে হলো তাতে অনেকখানি অভিযোগ, অভিমান এবং শ্লেষ ও ছিল। হরিলাল কিন্তু অটল ! নির্ব্বাক !

মিসেস দত্তকে সতর্ক ক'রে দেবার জন্যেই যেন হরিলাল আমাকে বল্লেন, আচ্ছা তুমি কি বল কিরণ ?

আমি যেন একটু-একটু বুঝতে পারছিলুম যে এই আলোচনার মূল তাঁদের জীবনের দূর অতীতে নিহিত ছিল ; তাই তার মধ্যে কথা কইতে, আমার কেমন বাধ-বাধ ঠেক্‌লো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো যে কিছু একটা না বল্লে, হরিলাল বুঝতে পারবেন যে আমি একান্ত অবোধের মতই সেখানে ব'সে নেই। তাই একটা কিছু বল্‌বার জন্যেই আমাকে কথা কইতে হলো। বল্লুম, একজনের

বোধও থাকতে পারে স্মৃতিও থাকতে পারে—আর সেই সঙ্গে ব্যথাকে চেপে রাখবার অপরিসীম সহ্য শক্তি ও ত' থাকা আশ্চর্য্য নয়?

কিন্তু এই কথা বলেই হরিলালের চোখ দেখে বুঝতে বাকি রইল না যে আমি ধরা প'ড়ে গিয়েছি।

তিনি মিটি-মিটি হেসে বল্লেন, এক জনের এক সঙ্গে অতগুলো গুণ থাকে না হে;—এ অনুমান তোমার বিলকুল ভুল হ'লো।

বিরজা এগিয়ে এসে বল্লেন, ওর কিছুই ভুল হয়নি, আমি এমন লোকও দেখেছি—যার বোধ নেই স্মৃতি নেই—আর সহ্য করার শক্তি এক কড়া নেই—আবার ঠিক তার উল্টোটিও দেখেছি ব'লেই ত' মনে হয়।

হরিলাল আমার দিকে ফিরে বল্লেন, তা হলে স্বীকার করতে হবে যে মিসেস দত্তের অভিজ্ঞতা খুব বেশী।

বিরজা বল্লেন, তাতে একতিলও সন্দেহ নেই—কেউ স্বীকার করুক আর নাই করুক—তাতে বড় যায় আসে না।

আলো আনার অছিলা ক'রে সেখেন থেকে সরে গেলুম। বুঝতে পারলুম যে তাঁদের এই আলাপের মধ্যে আর তৃতীয় ব্যক্তির থাকা চলে না।

চাকর আলো দিয়ে এলো। আমি বাড়ীর মধ্যে খুড়িমাকে খুঁজে কোথাও না পেয়ে মনে করলাম যে গিয়ে খানিকটা নদীর তীরে চুপ্-চাপ্ ব'সে থাকি গে।

গায়ের কাপড় আনতে নিজের ঘরে গিয়ে হরিলাল এবং বিরজার কথা-বার্ত্তার কতক-কতক শুনে ভারি লজ্জা বোধ করলাম।

কথা তখন আমার প্রসঙ্গ নিয়েই চল্‌ছিল। বিরজা বল্‌ছিলেন, ইলার সঙ্গে কিরণের বিয়ে হলে কেমন হয়?

হরিলাল বল্লেন, ওরা ভারি হিঁদু; কিরণকে পাওয়া দুরাশা। কিরণকে যে পাবে—সে নিশ্চয়ই খুব সুখী হবে।

ঘরের মধ্যে থাকতে যেন আর আমার সাহসে কুলোল না,—আমি তাড়াতাড়ি নদীর দিকে ছুটলাম।

একটা ঝোপের পাশে চুপটি করে বসে রূপনারাণের ভাটার টান দেখতে লাগলুম। মনটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত হ'য়ে আসতে লাগলো। ইলার সঙ্গে আমার যে বিবাহ-সম্বন্ধ ঘটতে পারে—তা' কোনদিন আমার কল্পনাতেও আসে নি। তাই তার সঙ্গে গোড়া থেকেই সহজ ভাবে চলে এসেছি। আজকে যেন

সেই সব চলা ফেরাকে কাঙালের লুব্ধতা বলে মনে হওয়াতে ক্ষোভের অবধি রইল না! পুরুষের নারী জাতির উপর কোন আকর্ষণ নেই—এ মিথ্যা কথা মনে মনেও বলে নিয়ে বাহাদুরি করার প্রবৃত্তি—কি জানি কেন, আমার কোন দিনই নেই; কিন্তু তাই বলে অবাধে নারীর চরণতলে নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে হীন এবং সস্তা ক'রে ফেলার যে পুরুষের পক্ষে একটা তীব্র লজ্জার কথা—তাও ভুলে যাবার মত দুর্দ্দশা আমার কোনদিনই হয়নি।

গোধূলি-ম্লান শীতের দিন-শেষে পশ্চিম আকাশে সিন্দুরে মেঘের স্তবক থেকে একটা লাল দীপ্তি হঠাৎ সমস্ত পৃথিবীর উপর গোলাপি চেলির মত ছড়িয়ে প'ড়ে যেন মানুষকে আহ্বান করে বলে উঠ্‌লো,—অমন কোণে ব'সে মন ভারি ক'রে থাক্‌বার সময় এই নয়।

আমি মনকে প্রসন্ন ক'রে তোলাবার চেষ্টা করচি—ঠিক সেই সময়ে দেখ্‌লাম যে আমাদের রঙীন বোট্‌টির উপর বদন হাল ধরে বসে আছে—আর ইলা তার কাছে ব'সে একটা মালা গাঁথচে। তার ভাটার টানে ভেসে চলেচে। আমাকে দেখ্‌তে পাবার আশাও করেনি—তাই বোধ করি দেখতেও পেলে না।

তাদের শান্ত নিশ্চিন্ততার সঙ্গে এই রমণীয় সময়টিকে উপভোগ ক'রে নেবার ব্যাপারটি আমার বড় ভাল লাগ্‌লো। বদনের মুখ আমি পরিষ্কার দেখ্‌তে পেয়েছিলাম—তা' ক্লেদকলুষহীন পবিত্রোজ্জ্বল! ইলার সমস্ত ভঙ্গীর মধ্যে একাগ্র ভাব-তন্ময়তা ছাড়া আর কিছুইত খুঁজে পেলাম না!

কিন্তু আমার বুকটা একটু দুদ্দুড় করতে লাগ্‌লো!—মনে হলো কি কঠিন সমালোচনাই না হবে, ভাগ্যবশে এরা একজন নিন্দুকের চোখে পড়লে! জগতের কাব্যের সুধা ভাণ্ডটিকে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে, ভূমিসাৎ ক'রে দিয়ে, নিজের অন্তরের লালসার মদিরাকে মন্থিত করে যে কেবল হলাহলই ছেঁকে তুলেছে—হে ভগবান, তার কঠোর দৃষ্টির অগোচরেই ভেসে যেতে দাও এই দুটি নিরীহ প্রাণীকে—পরমানন্দে!

ভগবান্ কিন্তু আমার এই ঐকান্তিক প্রার্থনা শুনেন নি!

কেউটে সাপ যেমন ক'রে চকিতে গর্ত্ত থেকে বার হয়ে চক্র ধ'রে ভীষণ আস্ফালনে পথিককে বিহ্বল করে দেয়—সুরুতে আমিও তেমনি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলুম খুড়িমার ঈর্ষা-বিদ্বেষ মূর্ত্তি দেখে। আজও জানিনে কোথা থেকে কেমন করে তিনি সেখানে এসেছিলেন। তাঁর চোখ থেকে

আগুণ ঠিক্‌রে বার হচ্ছিল—রাগে সর্ব্বাঙ্গ থর থর ক'রে কাঁপছিল—বোধ করি মুখ দিয়ে ফেণাও বেরিয়েছিল।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলুম খুড়িমা আপনি! কিছুক্ষণ তিনি কিছুই বল্‌তে পারলেন না।

প্রথম প্রশ্ন করলেন,—কিরণ, তুমি কেন বোটে যাওনি?

এ কথার ঠিকমত কোন উত্তর আমার ছিল না, তাই চুপ ক'রে থাকতে হলো। কিন্তু তার ফল মোটেই ভাল হলো না; খুড়িমার চাপা সন্দেহ যেন নিমেষে প্রজ্বলিত হয়ে উঠ্‌লো।

তিনি সেখেনে লুটিয়ে প'ড়ে মাথা খুঁড়তে লাগ্‌লেন—বল্লেন, আমার চোখের সাম্‌নে এ অধর্ম্ম আমি কিছুতেই ঘটতে দেব না—তার আগে আমার আত্মহত্যা ক'রে মরাই ভাল।

তাঁর কপাল ফুটে রক্ত বেরিয়ে পড়ল—চোখের উপর পর্য্যন্ত একটা নীল কাল্‌সিরে পড়ে গেল।

ধরে তোলাতে বল্‌তে লাগ্‌লেন, আমায় ছেড়ে দাও—আমাকে এই পাপ সংসার থেকে চ'লে যেতে দাও—আমার শত্রু হয়ো না, কিরণ!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁর গলার শির দুটো ভীষণ ফুলে উঠ্‌লো—একটা অব্যক্ত যন্ত্রনায় খুড়িমা কাটা পাঁঠার মত ছট্‌ ফট্‌ করতে লাগ্‌লেন—মুখে গোঁয়াণি শব্দ!

খুড়িমা, খুড়িমা—বলে আমি তাঁকে ঝাঁকি দিতে—বল্লেন, বুকে বড় যন্ত্রনা—ফেটে গেল, দম আর ফেল্‌তে পার্‌চিনে—তারপর তাঁর সংজ্ঞা লোপ হয়ে গেল।

আর কেউ হলে হয়ত একটা হাউ মাউ ক'রে কি কাণ্ডই না বাধাত! আমি নাড়ি টিপে দেখ্‌লাম—দ্রুত চলা ভিন্ন আর কোন গোল নেই। তখন পরিষ্কার বুঝলাম যে এই মূর্চ্ছা মানসিক উদ্বেগের জন্যই।

নদী থেকে কোঁচাটার খানিকটা ভিজিয়ে জল এনে তাঁর মুখে মাথায় দিয়ে কিছুক্ষণ হাওয়া করতেই তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো।

ঘন ঘন শ্বাস বইতে লাগ্‌লো—তার পর তিনি ধীরে ধীরে কথা কইলেন;—

কিরণ, বাবা আমার—

কি খুড়িমা—

তিনি কাঁদতে লাগ্‌লেন; দুই গাল গ'ড়িয়ে চোখের জল অঝোরে ঝরতে লাগ্‌ল।

খুড়িমা, বাড়ী চলুন।

উঠে ব'সে বল্লেন, কি লজ্জার কথা, বুড়ো মাগী—ওমা এ লজ্জা কোথায় রাখব আমি!

বাড়ী ফিরে চলুন, খুড়িমা!

তা তো যেতেই হবে বাবা;—কিন্তু আমি কি বল্‌বো—লোকে জিজ্ঞাসা করলে!

কি আবার বল্‌বেন—কারুকে কিছুই বল্‌তে হবে না আপনার—আমি বল্‌বো—

কি তুমি বল্‌বে?

ঘাটের সিঁড়িতে পা হড়্‌কে প'ড়ে গিয়ে কেটে গেছে—চোট লেগেছে।

তিনি যেন অনেকটা স্বস্তি বোধ করলেন, আঃ বাবা, তুমি আমার মান বাঁচালে।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্লেন, আমার সব ভুল এক নিমেষে তিনি ভেঙ্গে দিয়ে গেলেন—এখুনি তিনি এসেছিলেন, কিরণ—বল্‌তে বল্‌তে তাঁর আহত মুখ-খানি প্রদীপ্ত হয়ে উঠ্‌লো।

বুঝেছ?—তোমার কাকা।

আমি স্তব্ধ হয়ে শুন্‌তে লাগ্‌লাম। আহা! দেবতা আমার! তিনি ব'লে গেলেন, কি তুমি মিছে অন্তের চিন্তায় নিজের মনকে কালো করে তুল্‌ছ?

সত্যি কথা কিরণ, আমি মনটাকে এই নিয়ে ভেবে-ভেবে কালোই করেছি।

খিড়কির দোর দিয়ে নিঃশব্দে আমরা দুজনে বাড়ীর ভিতর ঢুকে—সব আগে খুড়িমার কাপড় বদল করিয়ে তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ক্ষতর উপর জল পটি দিয়ে—তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম।

কিন্তু তারপরের কাজটা আমার বড় কঠিন বলে ঠেকল। হরিলালকে কি বলবো? সত্য না মিথ্যা?

মনের মধ্যে মহা ঝগড়া বেধে গেল। সত্য গোপন করে লাভ কি? লাভ অনেক। কেমন করে? সত্যের কৈঁকড়া অনেক,—তার কেন-র অন্ত নেই। আদি-অন্ত সব কথা না বলে নিষ্কৃতি কোথায়? আর মিথ্যা? এক কথায় সব চুকে যায়। পেছলে মানুষের পা হড়্‌কে গিয়েই থাকে—পড়ে গেলে ত' আঘাত লাগেই!

কি জানি কেন, হয়ত মনের দুর্ব্বলতার দরুণ আমি স্থির করলুম—যা থাকে কপালে যা ঠিক ঘটেচে—তাই বলব।

দৃঢ় সংকল্প করে বাইরে এসে দেখলুম—হরিলাল বাগানের পথের উপর ধীরে ধীরে পায়চারী করচেন। কাছে যেতেই বল্লেন, বেড়াচ্ছিলে বুঝি?

আমি হাঁ-না কিছুই না ব'লে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

কিছু বলবে?

আজ্ঞে, খুড়িমার বড় লেগেছে।

কোথায়?

কপালে।

কেমন ক'রে লাগল—এঁ্যা?

চুপ ক'রে রইলাম।

কথা কইচ না যে?

তবুও চুপ ক'রেই রইলাম।

হরিলাল একটা সানের বেঞ্চের উপরে ব'সে পড়ে বল্লেন,—ব'স দেখি। তার পর বল্লেন, বল কি হয়েচে, ঠিক ক'রে সব বল ত।

তাঁর আগ্রহের মধ্যে এমন একটা সংযত গাম্ভীর্য্য ছিল যাকে উপেক্ষা ক'রে কোন মিথ্যা কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করা আমার পক্ষে মোটেই আর সম্ভবপর রইল না। একটির পর একটি ক'রে—আনুপূর্ব্বিক সকল কথা বলে যেন আমার সমস্ত মনটা হাল্কা হয়ে গেল।

সব কথা শুনে নিয়ে তিনি বল্লেন, চল ত' একবার বৌমাকে দেখে আসি গে।

খুড়িমা গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। হরিলাল মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে তাঁকে নিরীক্ষণ করে বাইরে এসে চুপ করে বসে রইলেন।

আমার ঘরের আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে আমি একখানা বই টেনে—আকাশ পাতাল কত কি ভাবলাম! মনের উপর অত বড় ধাক্কার পর—মন কিছুতেই স্থির হ'তে চায় না।

বাইরে ইলার কণ্ঠ-ধ্বনির সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হাসি শুনতে পাওয়া গেল। হঠাৎ আমার মনের উপর কেমন যেন একটা চাপ অনুভব করতে লাগলাম। মনে হলো—এত কথা হরিলালকে না বল্লেও চলতো—কি জানি তিনি কি মনে করলেন আমাদের তিন জনকেই।

শুন্‌তে পেলাম ইলা বল্‌চে—একটা ভারি মজা হয়েচে—ডুলেদের ছেলেদের সঙ্গে বদনের লড়াই হয়েচে। বদন তাদের খুব ঠেঙ্গিয়েচে—

বদন কোথায়?

সে রাগ ক'রে নদীর ধারে বসে আছে বল্‌চে ছোট লোকদের এত স্পর্দ্ধা!

হরিলাল আমায় ডেকে বল্লেন, দেখত বদন আবার কি এক হাঙ্গামা বাধিয়ে তুল্‌চে দেখ্‌চি!

নদীর ধারে গিয়ে দেখি তখনো বদন রাগে ফুল্‌চে।

কি হয়েচে বদন?

বদন কথা কইলে না। আমি তার গায়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিয়ে বল্লাম, অত রাগ করতে হয় কি?

সে একখানা হাত ছুঁড়ে দিয়ে বল্লে, আঃ যাও, জ্বালাতন করলে ভাল হবে না বল্‌চি।

শুনেছ—খুড়িমার কি হয়েচে?

বদন তাড়াতাড়ি বল্লে, কি হয়েচে তাঁর?

গিয়ে দেখে এসো, আমি আর কি বলব?

বদন নিমেষে উঠে বাড়ীর দিকে দ্রুতপদে চলে গেল।

ফিরে দেখ্‌লাম—হরিলাল আর ইলাতে তর্ক বিতর্ক চলেচে।

ইলা বল্‌চে লোকেরইত অন্যায়—তাদের এমন কথা মনে করবার কি অধিকার আছে?

সবারই ত' সকল কথা মনে করার অধিকার আছে ইলা, নিজের বুদ্ধি, বিদ্যা, জ্ঞান আর সংস্কার মত—আমরা সকল জিনিষ বুঝে নেবার চেষ্টা করি। ডুলেরা—তাদের সংস্কার মত একটা কথা ভেবে নিয়েছে। তারা ত' আর এমার্সন নয় যে বল্‌বে যে স্ত্রী-পুরুষের চরিত্র এবং কাল্‌চারের উৎকর্ষ-সাধনের একটা প্রকৃষ্ট উপায়—পরস্পরের সঙ্গে সহজ-সুন্দর মেশা-মিশিতে। আমাদের দেশের ক'জন লোক এ কথা জানেন—আর যদিও বা জানেন, ত' মানতেই বা ক'জন প্রস্তুত?

কথাগুলো আমার বেশ লাগ্‌লো,—তাই একপাশে গিয়ে চুপ ক'রে বসে রইলুম।

কিছুক্ষণ পরে বদন এসে বল্লে,—কি হয়েছিল? ঘুমোচ্চেন না অজ্ঞান হয়ে আছেন?

ঘুমোচ্ছেন।

বদনও সেখানে ব'সলো।

হরিলাল তার দিকে ফিরে বল্লেন, মার খেয়েচিস ত?

লাগেনি।

ওদের গায়ে হাত তুল্‌তে আছে?

ভারি পাজি, কিছু না বলে-বলে ওদের শেখি বেড়ে গেছে।

তুমি বুঝি ওদের মধ্যে দর্পহারী মধুসূদন হ'য়ে অবতীর্ণ হয়েচ?

বদন মাথা নীচু ক'রে রইল।

হরিলাল বল্লেন, একটা কথা তোমাদের সব সময়েই মনে রাখতে হবে—দেশ কাল পাত্র বিচার ক'রে—চল্‌তে হবে।

ইলা বল্লে—তার মানে অচল হয়ে থাক্‌তে হবে।

হয়ত সময়ে সময়ে অচলও হ'তে হবে; চলাকে নিয়ন্ত্রিত করার মধ্যে,—থামাও এসে পড়ে।

সবাই চুপ ক'রে রইল।

হরিলাল খুব ধীর ভাবে বলে যেতে লাগ্‌লেন, এই ক'দিনের খেলা-মেলা চলা ফেরায়—ঘরে বিপ্লব জেগেছে; বাইরে বিপ্লব জেগেছে। বাইরের বিপ্লব ইলা,—তোমাকে অপমানে লাঞ্ছিত ক'রেছে—বদনকে আঘাত দিয়ে স্পর্শ ক'রেছে। আর ঘরের ব্যাপার কতখানি ঘ'নিয়েচে—তা' কাল সকালে বুঝতে পারবে—যখন বৌমার মুখের দিকে তোমাদের দৃষ্টি পড়বে। ......

চল্‌তে হবে বৈকি! সকল দিক বজায় রেখে যে চল্‌তে পারবে—তার চলাই সার্থক হয়........

এ যাত্রায় কিরণ বোধ করি, আমাদের সকলের চেয়ে সুন্দর চলেচে—কৈ সেও ত' দাঁড়িয়ে পড়েনি!

ইলা দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, যাই একবার খুড়িমাকে দেখে আ'স।

সে যেন একটু অধৈর্য্যের সঙ্গে চলে গেল।

* * * *

খুড়িমার ঘরে রাত দুটো অবধি আমার জাগবার পালা প'ড়েছিল। নির্জ্জনের সঙ্গী বই নিয়ে রাত কাটিয়ে দেব মনে করেছিলাম। কিন্তু রাত

বোধ করি বারোটা হবে—তখন ইলা এসে বল্লে, তোমাকে বিরক্ত, করতে এলুম।—তার অত্যন্ত থমথমে ভাব।

আমিও চাপা গলায় বল্লুম—বেশত, নিজে যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছ,—তাতো দেখাই যাচ্ছে।

সে বল্লে,—কয়েকটা কথা পরিষ্কার না ক'রে নিলে—আমার কিছুতেই স্বস্তি হচ্ছে না—আমি কয়েকটা জিনিষ জান্‌তে চাই, তুমি কি তা' আমাকে বল্‌বে ?

বল্লুম, যদি জানা থাকেত—বল্‌তে আমার কোন আপত্তি নেই—তবে এ ঘরে নয়, বাইরে এসো।

দুজনে বাইরে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালুম। দক্ষিণ দিক থেকে কেমন একটা বাতাস বইছিল, তাই শীতটা অনেক কম।

ইলা, রেলিং ধ'রে একটা চকচকে তারার দিকে চেয়ে বল্লে, আমি জান্‌তে চাই যে আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি—যার জন্ত তুমি আমার এত ক্ষতি করতে যাচ্চ ?

কথা শুনে আমি অবাক্ হয়ে গেলাম—বল্লুম, তোমার কোন ক্ষতি করবার দুরভিসন্ধি পর্য্যন্ত—আমার মনে আসেনি, ইলা !

ইলা অত্যন্ত কঠিনভাবে বল্লে, ও কথা আমি বিশ্বাস করিনে।

বল্লুম, তুমি যাকে বিশ্বাস কর না তার কোন কথার মূল্য ত' তোমার কাছে থাক্‌তে পারে না—তবে কেন মিছে আমায় প্রশ্ন করছ ?

মিছে নয়, ব'লে সে একটু ভেবে বল্লে, আমি সে বিচার পরে করব—তোমার কথার কোন মূল্য আছে কিনা—সে কথা পরে ঠিক করলেও চল্‌বে।

বেশ, বলে আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম।

বাঃ বল, চুপ ক'রে রইলে যে ?

কি বলব ?

ঐ যে জিজ্ঞাসা করলুম, আমি কি দোষ করেছি ?

তা তো আমি জানিনে—আরো পরিষ্কার ক'রে বল ইলা, আমি কোন কথা গোপন করব না।

ইলা বল্লে, আজ সন্ধ্যার পর থেকে এই আমার ধ্রুব বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে যে তুমি, মদন আর আমার বিরুদ্ধে এ বাড়ীর কোন কোন লোককে উত্তেজিত ক'রে তুলেছে। আমি এখন জান্‌তে চাই একথা সত্যি কি না ?

বল্লাম, ইলা, বোধকরি তোমার কাছ থেকে যেটুকু মর্য্যাদা আমার প্রাপ্য—তা তুমি আমায় দিচ্চ না, তবে মানুষের রাগ হয়, তারপর ঝগড়া হ'য়ে পড়ে। আমি বেশী কথা বল্‌তে চাইনে, শুধু এইটুকু বল্‌চি যে তোমার অনুমান সত্য নয়, তাই তোমার বিশ্বাস যতই কেন ধ্রুব হোক—সত্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

ইলা যেন একটু দমে গেল। সে খানিকক্ষণ চিন্তা ক'রে বল্লে, আমাকে আর বদনকে নিয়ে খুড়িমার সঙ্গে—তোমার কি কোন দিন কোন কথা হয়নি ?

লঘু হাস্য ক'রে বল্লুম, হয়েছে বইকি, কয়েকবারইত হয়েছে।

সে বল্লে, সে প্রসঙ্গের দরকার কি ছিল ? জান্‌তে পারি কি ?

আমি ধীর ভাবে বল্লুম, হয়তো কোন দরকারই ছিল না।

তবে হলো কেন ?

আমি বল্লুম, এই যে তোমার সঙ্গে এখন আমার কথা হচ্চে—এর জন্যে আমি কতটুকু দায়ী ইলা ?—তুমি যদি না আসতে, তুমি যদি এই প্রসঙ্গ না তুলতে—তা হলে এত উঠ্‌ত না ; কিন্তু তাই ব'লে এর যে কোন প্রয়োজন নেই—তাও তো আমি মনে করিনে।

ইলা অনেকক্ষণ ধরে কি ভাবলে—তারপর বল্লে, দেখো, একটা অনুরোধ আমি তোমাকে করতে চাই—তুমি রাখ্‌বে কি না জানিনে তবুও আমার দিকের কথাটা তোমাকে বলে রাখা ভাল।

বল্লুম, বল।

হুঁ, আমি এই নিবেদন করচি যে আমার সম্পর্কের কোন কথার মধ্যে তুমি আর কোন দিন থেক না। আমি যে সমাজের জল হাওয়াতে মানুষ, আমরা যে চলা-ফেরায় অভ্যস্ত, তুমি তার কোন খবর জান না, তুমি তাই বুঝে উঠ্‌তে পার না! যেখানে তোমার প্রবেশের কোন অধিকার নেই—সেখানে বিনা আহ্বানে অনধিকার প্রবেশ ক'রে তুমি অনধিকার চর্চ্চা নাই করলে ; তাতে তোমার কি লাভ হয় জানিনে, কিন্তু আমাদের অশেষ ক্ষতি হয়। সেই ধরণের একটা সমূহ ক্ষতি ক'রে বসেছ বলেই আমার মনে নিচ্চে।

এই কথাগুলি বলে সে দ্রুত পদে নিজের ঘরে চলে গেল। আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে শীতের পাণ্ডু আকাশের দিকে চেয়ে রইলুম। আকাশের প্রান্ত থেকে হঠাৎ একটা উল্কা ছুটে এসে কোথায় মিলিয়ে গেল! তার দাহের উত্তাপ বাতাস নিজের বুকের মধ্যে হয়ত একটা সোহাগের সঞ্চয় বলে লুকিয়ে

রাখ্‌লে—ভস্মবশেষগুলি সর্ব্বসহা ধরিত্রীর উপর ঝ'রে পড়ে একটা স্মৃতির মলিন দাগ রেখে গেল!

খুড়িমার ঘরে ফিরে এসে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলাম—বাইরের অবিশ্রান্ত ঝিঁঝির ডাক আর পাশের ঘরে দুজনের মধ্যে চাপা-ঝগড়ার শব্দ আমার কাণে আস্‌ছিল, কিন্তু কাণ দিয়ে তা শুন্‌বার ধৈর্য্যটুকুও যেন আর ছিল না!

—ক্রমশঃ





রমাঁ রলাঁ

[অনুবাদক—শ্রীকালিদাস নাগ ও গোকুলচন্দ্র নাগ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পরবর্ত্তী)

সেই দিন হইতে মেল্‌শিয়োর ক্রিস্‌তফ্‌কে এক প্রতিবেশীর গৃহে লইয়া আসিত; সেখানে প্রতি সপ্তাহে তিন দিন করিয়া সঙ্গীত চর্চ্চা করা হইত। এই যন্ত্র সঙ্গীতকারীদের মধ্যে মেল্‌শিয়োরের স্থান ছিল প্রধান বেহালা বাদকের, জাঁ মিশেল বাজাইতেন Violoncello। অপর দুই জনের মধ্যে একজন ছিল ব্যাঙ্কের কেরাণী, দ্বিতীয় জন Schillerstrasseএর বৃদ্ধ ঘড়িওয়ালা। সময় সময় গ্রামের ডাক্তারটিও তাহার বাঁশী লইয়া এই সঙ্গৎএ যোগ দিত। এই সদা যন্ত্রসাধন সাধারনত আরম্ভ হইত পাঁচটার সময়, শেষ হইত রাত্রি নয়টার পর। কোন একটি 'গৎ' বা সুর বাজান শেষ হইলে তাহারা নূতন কোন সুর বাজাইবার পূর্ব্বে প্রত্যেকে খুব খানিকটা করিয়া বিয়ার পান করিয়া লইত। প্রতিবেশী সকলে মধ্যে মধ্যে আসিয়া শুনিত, এবং যখন যাহার ইচ্ছা বিনা বাক্যব্যয়ে আবার চলিয়া যাইত। শুনিবার সময় কেহ থাকিত দেওয়ালে 'ঠেশ্' দিয়া, কেহ থাকিত জানালা বা কোন কিছুর উপর ভর দিয়া ঝুঁকিয়া এবং দেখা যাইত সকলেরই তালে তালে মাথা নড়িতেছে, কেহ তন্ময় হইয়া পা ঠুকিয়া তাল রাখিতেছে। চুরুট ও তামাকের ধোঁয়ায় ঘরটি প্রায় 'বেলুন' হইয়া উঠিয়া যাইবার দশা প্রাপ্ত হইয়াছে! যন্ত্রীদল স্বরলিপির পাতার পর পাতা বাজাইয়া চলিয়াছে, গৎ-এর পর গৎ, সুরের পর সুর—কিন্তু ইহাতে

কাহারও ক্লান্তি নাই। মুখে কাহারও কথা নাই, সকলের মনপ্রাণ যেন সুরের দোলায় দুলিতেছে। কপালে তাহাদের বলীরেখা গভীর মনযোগের আভাষ দিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রায় সকলেই আনন্দাতিশয্যে মুখ দিয়া একপ্রকার অদ্ভুত শব্দ করিয়া উঠে!

কিন্তু তাহারা যে সমস্ত সুর বাজাইত তাহার মাধুর্য্য এবং সৌন্দর্য্যকে যথার্থ ভাবে প্রকাশ করিবার মত শক্তি তাহাদের কাহারও ছিল না, এমন কি সে মাধুর্য্য তাহারা অনুভব করিতে পারিত কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে! তাহারা শুধু স্বরলিপি বাজাইত, তাল মান বজায় রাখিবার চেষ্টা করিত, তাহাও যে সব সময় ঠিক হইত না তাহা তাহারা জানিত না। তবু প্রাণপণে প্রতি স্বরের পরিবর্ত্তন, মীড় মূর্চ্ছনা ইত্যাদি সমস্তই শুধু যেন বজায় রাখিয়া যাইত, তাহাতে সঙ্গীতের প্রাণ সঞ্চার হইত না। তাহাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে শুধু সেই টুকুমাত্র অধিকার জন্মিয়াছিল যাহা লইয়া বা যাহা পাইয়া সাধারণ শ্রেণীর মানুষ যথেষ্ট পরিমাণে খুশী হইয়া উঠে, আনন্দ পায়, গর্ব্ব অনুভব করে। কিন্তু ইহার আরও অনেক উপরে যে যাওয়া যায় তাহা তাহারা ভাবিতেও পারে না, সে সঙ্গীতের বিমলতা তাহাদের নিকট হয়ত অদ্ভুত ঠেকিবে। তবু এই শ্রেণীর শিল্পীদের দ্বারা জগৎ ভরিয়া উঠিতেছে—মানুষ ইহাদিগের গুণে মুগ্ধ!

এই বাদক দলের আর একটি গুণ ছিল, তাহারা 'ভাল মন্দ' বিচার করিত না। তাহাদের মত—সঙ্গীত মাত্রেই ভাল। তাহা সে যে প্রকারেরই হোক, যাহা কিছু ব্যক্ত করুক। 'সারের' দিকে তাহাদের নজর ছিল না, তাহারা দেখিত কাহার কত 'ভার।' অর্থাৎ যাহা বাজাইতে তাহাদের বেশী সময় লাগে তাহার প্রতিই সকলের যেন একটা আন্তরিক ক্ষুধা ছিল। তাহারা Brahms এবং Beethovenএর মধ্যে কোন পার্থক্য রাখিত না কিম্বা হয়ত একই শিল্পীর দুইটি রচনা—একটি, মানুষের মন ভুলাইবার জন্য অর্থহীন কতকগুলি স্বর-বিন্যাস—ইহাই তাহাদের কাছে বেশী ভাল লাগে। কিন্তু অপরটির মধ্যে যে সঙ্গীত পরিপূর্ণ রূপ লইয়া বিরাজ করিতেছে শিল্পীর সহিত দৃষ্টি এবং মন বিনিময়ের জন্য, সেটিকে তাহারা সরাইয়া রাখে।

এই ঘরের এক কোণে একটি পিয়ানোর পিছনে ক্রিস্তফ্-এর বসিবার স্থান ছিল এবং ইহার উপর তাহার যেন কতকটা একাধিপত্য হইয়া গিয়া ছিল কারণ এখানে আসিতে বা ঢুকিতে হইলে 'হামাগুড়ি' দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই, তাহা সকলের পক্ষে বিশেষ সুবিধার ছিল না। এখানে অন্ধকার যেন

একটু বেশী এবং স্থানটি এত অপরিসর এবং সংকীর্ণ যে কোন মতে সেখানে সে বসিতে বা হাত পা গুটাইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইতে পারিত। তামাকের ধোঁয়ায় তাহার চোখ লাল হইয়া উঠিত, গলা জ্বালা করিত। নিশ্বাস লইতে নাকের মধ্যে ধূলা আসিয়া ঢুকিত কিন্তু এ সমস্তের প্রতি তাহার কোন খেয়াল ছিল না, তুর্কী ধরনে পা মুড়িয়া মাটিতে বসিয়া গম্ভীর ভাবে সে বাজনা শুনিত এবং অন্যমনস্কভাবে পিয়ানোর পিছনের কাপড়টিতে তাহার ধূলামাখা আঙুল দিয়া ক্রমাগত ফুটা করিয়া যাইত। যন্ত্রীদল যাহা বাজাইত যদিও তাহার সমস্তই তাহার ভাল লাগিত না তবু শুনিতে তাহার বিরক্তও আসিত না এবং এই বাদকদলের সম্বন্ধে সে কোন অভিমতও প্রকাশ করিত না, সে বুঝিত ও সমস্ত বুঝিবার পক্ষে সে নিতান্ত শিশু। কোন সুর শুনিতে শুনিতে সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে আবার কোন সুর শুনিয়া সে জাগিয়া উঠে—এ সমস্তই তাহার নিকট অত্যন্ত মনোরম লাগে। খুব ভাল কোন সুর শুনিলে সে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে। তাহার মুখে নানা প্রকার ভাব ফুটিয়া উঠিতে থাকে, তাহার নাক ফুলিতে থাকে, দাঁতে দাঁত চাপিয়া যায়, চোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে থাকে, কখনও আবার তাহার দৃষ্টি স্বপ্নাবিষ্টের মত ম্লান হইয়া আসে। কখনও আবার যুদ্ধের বাজনা শুনিয়া সে বীরের মত হাত পা ছুঁড়িতে থাকে, সৈনিকদের মত তালে তালে পা ফেলিয়া মার্চ করিবার জন্য তাহার মন অস্থির হইয়া উঠে, দস্যুর মত পৃথিবীর উপর পড়িয়া তাহাকে যেন গুঁড়াইয়া ফেলিতে চায়! পিয়ানোর কোণে অন্ধকারে তাহার দাপা-দাপি এত বাড়িয়া উঠে যে শ্রোতাগণ বিরক্ত হইয়া উঠে, কেহ হয়ত উঠিয়া আসিয়া সেই গর্তের মধ্যে মুখ বাড়াইয়া বলে—আরে ছোঁড়া, তুই পাগলা হয়ে গেলি নাকি? চুপ, ক'রে বস্ নইলে কান ছিঁড়ে দেবো—

ক্রিস্তফ্-এর সমস্ত উৎসাহ চলিয়া যায়, সকলের উপর তাহার রাগ হয়—কেন সকলে তাহাকে আনন্দ করিতে দিবে না? সে ত কাহারও কোন ক্ষতি করে নাই। সমস্ত বিষয়েই কি সকলে তাহাকে এই ভাবে উত্যক্ত করিবে?

বাজনার সময় এই ভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া সে শব্দ করিয়া ফেলে বলিয়া সকলেই তাহাকে তিরস্কার করে, বলে—নিশ্চয়ই তোর এ সব ভাল লাগে না।

ক্রমে ক্রিস্তফ্-এরও সেই ধারণা জন্মিল, সে সঙ্গীত ভাল বাসে না। কিন্তু ঐ যন্ত্রী দলের সকলের অপেক্ষা যে সঙ্গীতকে যথার্থ প্রাণ দিয়া অনুভব করিত

সে ক্রিস্তফ্, এ কথা যদি তাহাদিগকে বলা যাইত তাহা হইলে তাহারা আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিতে পারিত না।

ক্রিস্তফ্ ভাবে—ওরা যদি আমায় চুপ করিয়েই রাখ্‌তে চায়, তবে ও-সব যুদ্ধের বাজনা বাজায় কেন?

বাস্তবিক সেই সমস্ত সুরের মধ্যে অশ্বের হ্রেষা, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, সৈনিকদের আস্ফালন, বিজয়ীদলের আনন্দের কলরোল যেন তীব্র ভাবে বাজিয়া উঠিত। সকলের মত শুধু মাথা নাড়িয়া বা পা ঠুকিয়া ক্রিস্তফ্ তৃপ্তি পাইত না। তাহার প্রাণের আবেগ সে সমস্ত শরীর দিয়া যেন বাহির করিত কিন্তু উচ্ছ্বাসভরা শান্ত কোমল কোন সুর বা বিচিত্র স্বরবিন্যাসের কোন 'গৎ' শুনিলেই তাহার তন্দ্রা আসিত। বৃদ্ধ ঘড়িওয়ালা, গোল্ড্‌মার্ক-এর রচিত এই ধরনের একটি সুরের প্রশংসা করাতে তাহাই বাজান সুরু হইল। ইহাতে কোন তীব্র সুরের সমাবেশ নাই, সমস্তই বেশ যেন ছাঁটিয়া কাটিয়া মোলায়েম করা হইয়াছে। ক্রিস্তফ্-এর উত্তেজিত মন শান্ত হইয়া আসিল। তাহার তন্দ্রা আসিতে লাগিল। যন্ত্রীদল যে কি বাজাইতেছে তাহা বুঝিবার শক্তি তাহার নাই, সব সে শুনিতেছেও না, তবু গভীর তৃপ্তিতে তাহার মন ভরিয়া গেল। সুখের ভারে তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিল—সেই সঙ্গে তাহার স্বপ্ন দেখাও সুরু হইল।

তাহার এই সমস্ত স্বপ্ন বিশেষ কোন একটি বিষয় লইয়া ধারাবাহিক ভাবে যে তাহার মনে উদয় হইত তাহা নহে। তাহার 'মাথা মুণ্ডু' কিছু ধরিবার বা বুঝিবার উপায় ছিল না। কেক্ তৈয়ারী করিবার সময় হাতে যে সমস্ত ময়দা আঠার মত লাগিয়া গিয়াছিল তাহা ছুরি দিয়া লুইসা চাঁচিয়া ফেলিতেছে... একটা প্রকাণ্ড ইঁদুর সাঁতার দিয়া নদী পার হইয়া যাইতেছে... উইলো গাছের একটি শাখা, যেটিকে সে চাবুক করিতে চাহিয়াছিল তাহা সে হাতে পাইয়াছে —'কে জানে এমন সমস্ত অদ্ভুত স্বপ্ন এই বিশেষ সময়ে কেন তাহার মনে উদয় হয়! সময় সময় সে বিশেষ কোন ছবিও দেখে না, তবু তাহার মনে অসংখ্য বস্তু ও বিষয়ের সাড়া জাগে, তাহার যেন শেষ নাই! তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই যেন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলিবার নাই কারণ সকলেই যেন তাহা জানে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত নিরানন্দময় কিন্তু বাস্তব জীবনে যে সকল দুঃখ মানুষ পায় ইহাদের মধ্যে সে ধরণের বেদনা-জনক কিছুই নাই। তাহাদের কথা ভাবিতে বিশ্রী লাগে না অপমান-জনক নয় যেমন মেলশিয়োরের দুর্ব্যবহারের মধ্যে সে অনুভব করে, কিম্বা যখন মানুষের

নিকট অপমানিত হইয়া যে লজ্জা ও বেদনা সে অনুভব করে, ইহা তাহার মতও নয়—শুধু তাহারা মনকে কেমন যেন বিষণ্ণ করিয়া তুলে। কতকগুলি বিষয় মনের সমস্ত অবসাদ মুছাইয়া যেন পুনর্জ্জীবিত করিয়া তুলে, হাসির আলোকে হৃদয় ভরিয়া উঠে, আনন্দের প্রস্রবণ বহিয়া যায়!

স্বপ্নের ঘোরে ক্রিস্‌তফ্‌ বলিয়া উঠে—হয়েছে পেয়েছি—এমান ক'রে একটু একটু ক'রে আমি এগিয়ে যাব—

কিন্তু কি হইয়াছে, সে কি পাইয়াছে তাহাও সে জানে না, তবু ঐ সত্যকে স্পষ্ট সে যেন অনুভব করে। তাহার মনের মধ্যে সে এক সাগরের আকুল উচ্ছ্বাস যেন নিয়ত শুনিতে পায়! এ সাগর যেন তাহার খুব নিকটে মনে হয়, শুধু যেন দুর্ভেদ্য এক অন্ধকারের আবরণের মধ্যে তাহার দৃষ্টি হইতে আড়াল করিয়া রাখা হইয়াছে।

এই সাগর যে কি বা ইহার সহিত তাহার জীবনের যে কি সম্বন্ধ সে বিষয়ে তাহার কোন অভিজ্ঞতা নাই তবু তাহার মনে হয় একদিন ঐ অনন্তনীল পারাবার অনন্ত বিক্ষোভে দুলিয়া উঠিবে, তাহার পর বিপুল আবেগে ঐ আবরণ ঐ ব্যবধানের প্রাচীরের উপর পড়িয়া তাহার চিহ্নমাত্র আর রাখিবে না। তখন!...কি আনন্দ! কি বিরাট মুক্তি! তাহার সুখের সীমা থাকিবে না। আর কোন বাধা নাই, সাগর তাহার বুকের উপর! তাহার গভীর সুরের অতল তলে সে ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইবে, তাহার শ্রান্তি ক্লান্তি দুঃখ বেদনা, অপমান সব মুছিয়া যাইবে তাহার কোমল স্নেহ-স্পর্শে। ইহাও যদিও অত্যন্ত নিরানন্দময় তবু ইহাতে অপমান বা আঘাত নাই অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং যেন শান্তিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়।

সাধারনত এই সমস্ত 'খেলো' সঙ্গীতের মধ্য দিয়া ক্রিস্‌তফ্‌-এর মন সুরের নেশায় ভাবিয়া উঠিত। এই সমস্ত সঙ্গীতের রচয়িতাগণ অত্যন্ত সাধারণ মানুষ, সঙ্গীত সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান অতি অল্প, শুধু অর্থ উপার্জ্জনের আশাতেই যেন তাহারা ঐ সমস্ত লিখিয়াছে। সঙ্গীত সম্বন্ধে তাহাদের অজ্ঞতা ঢাকিবার জন্য তাহারা গতানুগতিক ভাবে বিশেষজ্ঞগণের প্রদর্শিত পথ ধরিয়া চলিয়াছে নয়ত কেহবা বিখ্যাত হইবার আশায় সে সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া আপনার খুশীমত সঙ্গীত রচনা করিয়াছে। কিন্তু সঙ্গীতের প্রত্যেকটি স্বরের মধ্যে এমন মোহিনী শক্তি আছে যে যদি একজন 'আনাড়ী' মানুষও তাহা লইয়া নাড়া চাড়া করে তবুও তাহাতেই সাধারণ মানুষের মনে সুরের ঝড় বহিতে থাকে। চিন্তা স্রোত

যখন মানুষকে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে দিক হইতে দিগন্তরে ভাসাইয়া লইয়া বেড়ায় তখন তাহার মধ্যে কোন অর্থহীন কথা মনে উদয় হইয়া তাহাকে বাধা দিতে পারে না কিন্তু এই সমস্ত পেশাদার খেলো রচয়িতাদের রচিত সঙ্গীতের শক্তি তাহা হইতেও যেন অধিক বলিয়া মনে হয়, এই রচনার মধ্যে রহস্যময় স্বপ্নের জাল পাতা আছে, সহজেই ইহাতে মানুষের মন ধরা পড়ে।

ক্রিস্তফ্ সেই পিয়ানোর পিছনে পড়িয়া আছে, তাহার কথা কাহারও মনে নাই। সহসা তাহার স্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গেল, সে জাগিয়া উঠিল, তাহার হাতে পায়ে 'ঝিঁঝিঁ' ধরিয়াছে। তাহার মনে হইল যে স্বপ্নরাজ্যে সে এতক্ষণ বিচরণ করিতেছিল বাস্তবিক তাহার সহিত তাহার জীবনের কোন সামঞ্জস্য নাই, সে ক্রিস্তফ্, তাহার হাত পা ধূলা কাদা-মাখা ঘুমের ঘোরে দেওয়ালের গায়ে নাক ঘসিতে ঘসিতে পা দুটি শক্ত করিয়া হাত দিয়া সে ধরিয়া রাখিয়াছে।

ক্রমশঃ।



হিসাবের বাহিরে

শ্রীভূপতি চৌধুরী

জীবনের যাত্রাপথে কত অসংখ্য পথিক ভিড় করে চলেছে ; কিন্তু তাদের কখন কে যে থমকে গিয়ে, পথ হারিয়ে মোড় ফিরে যায়, তারত কোনো হিসাব মেলে না। কিন্তু হিসাব পাওয়া গেল না বলে, তারা যে হারিয়ে গেল এত মিথ্যা নয়। জীবনের পথে এই থমকে পড়ে পথ-হারানো, এ এক বিচিত্র রহস্য, এ রহস্য নিয়তই চলেছে, তাই এমন রহস্য সেদিনও ঘটেছিল।

বিকাল না হতেই, সেদিন মেঘ ও বৃষ্টির চাপে সন্ধ্যার অন্ধকার কলকাতার আকাশে জমে উঠেছিল। আকাশের এ অবস্থা শুধু সেদিন বলে নয়, হপ্তা ভোরই এ রকম। ঝুপ ঝুপ্ করে অশ্রান্ত ধারায় জল ঝরছে। সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। জরুরি কাজের তাগাদায় কলকাতার যে সব বাড়ীর বনেদ খোঁড়া হয়ে ছিল, সে সব জলে ভরে উঠেছে। কদিনই কাজ বন্ধ। ফলে ঠিকে-মিস্ত্রী রূপনের এ ক'দিন শুধু কাজ নয় রোজগারও বন্ধ। বৃথা চেষ্টা করেও কোন লাভ নেই দেখে, সে ঘরে থাকাই স্থির করে তক্তপোষের ওপর কাঁথার বিছানাটা আঁকড়ে পড়েছিল। আঁকড়ে পড়ে থাকার মধ্যে যে একটা নিশ্চিন্ত ভাব বোঝায় সে রকম নিশ্চিন্ত ভাবে অবশ্য সে শুয়েছিল না, কারণ মাঝে মাঝে কিছু উপার্জ্জন করার ভাবনা ও তাকে ক্লিষ্ট করে তুলছিল বটে কিন্তু কোনো সোজা উপায় সে আপাততঃ খুঁজে না পাওয়াতেই, কাদা-প্যাচ-পেচে রাস্তা মাড়িয়ে আড্ডা দিতে যাওয়ার চেয়ে এইটাই তার কাছে ঢের বেশী লোভনীয় বলে মনে হয়েছিল। এ ছাড়া আরও একটা কারণ, খুব বেশী দিন তার বিয়ে হয় নি।

একটু আগে তার বৌ সুখী রান্নার ছল করে চলে যাওয়ার চেষ্টা করতেই, রূপন তার হাতখানা চেপে ধরে বাধা দিয়ে বললে—কোথা যাস্ এর মধ্যে ?

সুখী একটা ঢোক গিলে বল্লে—রান্নার উদ্যোগ কর্ত্তে হবে ত ? জলে ত ছিষ্টি ভিজে গেছে। উনুন ধরাতেইত বেলা কেটে যাবে। তারপর এই বাদলার রাতে রান্নার ঝঞ্ঝাট . . .

রূপন তার হাত ছেড়ে দিয়ে পাশ ফিরল।

সুখী ধীরে ধীরে ঘর হতে বার হয়ে গেল। সেই ঘরেরই কোলে ছোঁচাবেড়া দিয়ে ঘেরা মাটীর দাওয়ায় রান্না ভাঁড়ারের জিনিষ পত্র রাখবার শূন্য পাত্রগুলি বৃথা নাড়াচাড়া করতে করতে, কার কাছ থেকে চাল ধার পাওয়া যেতে পারে, সেইটাই হল তার ভাবনার বিষয়। এটুকু কিন্তু রূপনের চোখ এড়াল না, সে বুঝে নিল ব্যাপারটা। বিচিত্র ছলনাময়ী নারী, কত ছলই না তারা জানে! কিন্তু সবক্ষেত্রেই কি তারা সফল হয়?

রূপন তার ভাবনার ফেরে অস্থির হ'য়ে পাশ ফিরতেই, একটা কিসের গন্ধে সচকিত হ'য়ে ঘাড়টা তুলে, সে গন্ধটা যে কিসের তা নির্ণয় কর্‌বার চেষ্টা করলে। ভিজা-বাতাসে নাইট্রিক এসিডের গন্ধ ভারী হয়ে উঠেছিল। শিকারী বিড়াল যেমন লক্ষণ দেখে শিকারের আশায় উৎফুল্ল হয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ায়, রূপনও ঠিক সেইভাবে, তার বিছানার ওপর উঠে বসল। চোখ দুটো একটু বড় করে, ভাল ক'রে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস টেনে, মুহূর্ত্তের জন্য চোখ বুজে কি ভেবে সে বিছানা ছেড়ে নেমে দাঁড়াল। তারপর কাপড়টাকে কোমরে জড়িয়ে, সারা-দিনের বিশ্রাম-শিথিল অঙ্গটাকে একটা ঝাঁকি দিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক ক'রে, সেই গন্ধ অনুসরণ করে সে বার হয়ে পড়ল।

সেই পাড়াতেই নগেন সেকরা তার ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে, কাঠের কয়লার চুল্লীতে আগুন ধরিয়ে, নাইট্রিক এসিডে সোণার একটা গহনা গালিয়ে ফেলবার জন্যে বসে ছিল। পায়ের শব্দ উৎসুক নগেনের কাণে বাজতেই সে তাড়াতাড়ি উঠে বন্ধ জানলার ফুটোয় চোখ দিয়ে দেখে নিল লোকটা কে? রূপনের চলবার ভঙ্গী থেকেই সে বুঝে নিল যে রূপন এদিকেই আসছে। এত শীঘ্র যে গন্ধটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তাই ভেবে সে একটু অস্থির হয়ে উঠতে না উঠতেই রূপন এসে দরজায় ঘা দিলে। নগেন দরজা খুলে দিল।

ঘরে ঢুকেই কাঠের কয়লার অত্যন্ত স্বল্পালোকেও উনুনে চড়ান বাটীটা নজরে পড়া মাত্র রূপনের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ব্যাপারটা কিছু তাদের কাছে নতুন নয়, কাজেই লুকোচুরি কিছু ছিল না এর মধ্যে। নয় এই বিয়ে হওয়ার পর কদিনই রূপন এদিকে বড় ঘেঁসে নি। তার পূর্ব্বে ত এসব কাজে যাতায়াত তার হামেসাই ছিল। কিন্তু রূপনের-দিক থেকে ব্যাপারটা এরকম হলেও, নগেন তাকে দেখে বেশ একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু সে

ভাবটাকে তখনকার মতো দমন করে চোখের ইঙ্গিতে সে রূপনকে একটু ব্যঙ্গ করে, শুষ্ক স্বরে বললে, তুই ত আমাদের আর খোঁজও করিস্ না রে।

রূপন মুখটা একবার বিকৃত করে এসিডের বাটীটার দিকে লক্ষ্য করে বললে, ব্যবসা ত বেশ চলছে দেখছি। বলি পেলি কোথায়?

তোর সে খোঁজে দরকার কি? তুই ত ওসব ছেড়েই দিলি, না? নগেন তার কথাটায় জোর দেবার জন্যে হেসে উঠল।

রূপন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, হুঁ! কিন্তু তুই আমায় গোটা দুই টাকা দে ত।

নগেন তার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলে; তারপর তার মুখে পরিহাসের কোনো চিহ্ন নেই দেখে বললে, তাহ'লে ব্যবসা ফের ধরলি? মওকা কিছু পেয়েছিস্ না'কি?

রূপন একবার কপালটা কুঁচকে ঠোঁটের একটা প্রান্ত কামড়ে বললে, সে যা হয় হবে, তুই টাকা দে শীগ্‌গির।

এ ব্যবসা ছেড়ে দেবে এ কথা কখনও সে ভাবে নি কিন্তু কার্য্যগতিকে অনেকটা সেই রকমই হয়ে পড়েছিল বটে। অবশ্য এ ব্যবসায় মন যে বিশেষ ছিল তা নয়, কারণ ইচ্ছা থাকলে এ ব্যবসা যে না চালান যেত এমন নয়। মোটের উপর এ ব্যবসা বন্ধই হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এ কদিনের জল বৃষ্টিতে ব্যাপার একটু ভিন্ন রকম দাঁড়িয়ে গেল। ঘরে কিছু নেই সে জানত। রোজ-আনা রোজ-খাওয়া যাদের ব্যবস্থা, একদিন আনা বন্ধ হলে পরের দিন খাওয়া যে বন্ধ থাকে, এ ত নতুন নয়, কিন্তু একদিন রোজগার না থাকতেও বৌটা কেমন করে যে খাওয়াচ্ছে, তার কোনো উপায় সে খুঁজে পায় নি। তার বৌকে প্রশ্ন করে এইটুকু জানল যে, হাঁড়ির তলার গুড়োনাড়া মিলিয়ে দিন চলছে। এ কথা সে বিশ্বাস করে নি। অধিকন্তু তার বৌ যে তাকে লুকিয়ে ধার করে তাকে খাওয়াবে, এটা সে সহ্য করতে পারত না। তাই সে তার পুরাণো পথে যেতে চায় এবং তারই দাবিতে সে নগেনের কাছ থেকে টাকা চেয়ে বসল।

টাকা দুটো হাতে নিয়ে তার সামান্য একটু অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল কিন্তু এক-রকম জোর করেই সে সেভাবটা দূর করে সরাসরি বাড়ীর দিকে ফিরে চলল।

তখন ঠিক সন্ধ্যা না হলেও অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় বাতিওয়ালা জলের রাতে তাড়াতাড়ি তার কাজ সেরে চলে গিয়েছে। বস্তির মধ্যে বেমানান গ্যাসের

বাতিটা বেখাপ্পা ভাবে দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছিল। আর সেই আলোতে যে দৃশ্য রূপনের চোখে পড়ল, তাতে আর অগ্রসর হওয়ার প্রবৃত্তি তার রইল না।

তার বৌ সুখী, তারই এক প্রতিবেশী ঝমরুর সঙ্গে কি কথা বলছে; তাকে দেখে সে তাড়াতাড়ি তার ঘরের দাওয়ার দিকে ফিরে চলতে আরম্ভ করে দিলে। এই টুকুমাত্র তার চোখ দেখলেও মন তার দেখে নিল অনেক বেশী। একটা অতি বিশ্রী সন্দেহ তার মনটাকে তপ্ত করে তুললে। একবার মনে হল তখুনি ছুটে গিয়ে বৌটাকে এক লাথি কসিয়ে দেয় কিন্তু কি ভেবে সে ইচ্ছাটা দমন করে যেমন আসছিল, তেমনি ফিরে গেল।

রূপনের এই আসা ও যাওয়া লক্ষ্য করে সুখীর বুকটা একটা অজ্ঞাত ভয়ে যেন দু'লে উঠল। তার সমস্ত মনটা যেন নিমেষেই অস্থির হ'য়ে উঠল, আবার নিজেই নিজেকে জোর করে প্রবোধ দিয়ে, ধার-করা চাল ধুয়ে, সে রাঁধতে বসল; কিন্তু মন কি কাজের এ সান্ত্বনা মানে? একবার তার ভাবনা হ'ল, রূপন কি তার পূর্ব্বের পথে ফিরে গেল? এ ক'দিন তার রোজগার ছিল না। পাছে অভাবের কথায় রোজগারের উপায় করতে গিয়ে সে সেই পুরাণো ব্যবসা ধরে এই ভয়ে সে তার ঘরের অভাবের কথা তার কানেই তোলে নি। মিথ্যা কথা ক'য়ে, ফাঁকি দিয়ে ভুলিয়ে ধার করে সে দিন চালাবার ব্যবস্থা করে ছিল। আজ এমন সময় তাকে ধার করতে দেখে কি সে একটা কিছু উপায় করতে ফিরে গেল? এ চিন্তার সঙ্গে আর একটা কথা তার মনে পড়ল। ঝমরুর সঙ্গে কথা বলতে দেখে কি সে কিছু সন্দেহ করে ফিরে গেল? না, তা নয়, সে রকম হলে ত তখুনি সে এসে কৈফিয়ৎ চাইত। আর তা ছাড়া এই ঝমরুকে প্রত্যাখ্যান করেই ত সে রূপনকে বিয়ে করেছে। এমন সন্দেহ সে নিশ্চয় করে নি। সে নিজেকে শান্ত করে রান্নায় মন দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

রান্নার শেষ হয়ে গেল, কিন্তু চিন্তার শেষ হল না। কেরোসিনের ডিবিয়ায় বিশেষ তেল নেই দেখে রূপন ফিরে এলে তখন জ্বেলে নিলেই হবে ভেবে, সে ডিবিয়াটা নিবিয়ে দিয়ে, রূপনের প্রতীক্ষায় সেই দাওয়ায় বসে রইল। মন আবার চিন্তার জাল বোনা সুরু করে দিল।

কিন্তু রূপনের চিন্তার ধারাটা একটু ভিন্ন পথ ধরে চলেছিল। সুখীকে এই অবস্থায় দেখে প্রথমটা রাগে সে তপ্ত হয়ে উঠল, তারপর ভাবল, না, এই মেয়েমানুষ জাতটাকে বিশ্বাস করা চলে না। এদের চেয়ে নিমকহারাম জাত আর নেই। সে সটান গগন সা'র দোকানে গিয়ে উঠল। রূপন তার পুরাণো

খদ্দের, তবে ইদানীং তাকে বড় দেখা যেত না ; তাই এতদিন পরে তাকে দেখে উৎফুল্ল কণ্ঠে শুঁড়ি-সুলভ 'স'য়ের উচ্চারণ করে বল্লে, এসো, ভাই এসো !

রূপন তার হাতের মুঠোর টাকা দুটো গগন সা'র সামনে ফেলে দিয়ে, কোনো কথা না বলে শুধু হাতটা বাড়াল।

রূপনের শ্রান্ত, আলস্য-বিজড়িত, আনন্দ উৎফুল্ল মত্ত ভঙ্গীর সঙ্গেই তার পরিচয় ছিল, এ রকম উত্তেজিত অস্থির ভঙ্গীর সঙ্গে তার কখনো চাক্ষুষ সাক্ষা হয় নি, কাজেই সে টাকা দুটো পেয়ে একবার রূপনের মুখের দিকে চেয়ে চোখ মিট্ মিট্ করতে করতে তাক্ থেকে একটা বোতল পেড়ে রূপনের হাতের কাছে টেবিলের ওপর এগিয়ে দিয়ে বললে,—লে, এমন খাসা মাল এর আগে কখনও পাস্ নি।

রূপন তার কথার উত্তরে না-রাম না-গঙ্গা ভাবে বোতলটা নিয়ে দোকান ঘরের একটা কোণে-পাতা বেঞ্চির ওপর গিয়ে বসল।

এক নিঃশ্বাসে যতটা পান করা যায়, ততটা গলায় ঢেলে, সে সমস্ত ব্যাপারটা একবার ভাবতে চেষ্টা করলে। এমন সময় তার পুরাণো এক সেথো তার কাছে এসে হেঁকে উঠল, আরে রূপন যে ! একদম সব ভুলিস নি ?

রূপন বোতলটা এক হাতে ভাল করে ধ'রে মুখটা একটু বিকৃত ক'রে তার এই পুরোনো দিনের সঙ্গীর দিকে মুখ তুলে চাইতেই সে আবার বলে উঠল, আমরা ভেবে ছিলুম তুই সরে পড়্‌লি ! নেশা ধরেছিস্ যে ? বোয়ের নেশা ছুটে গেল না কি তোর ?

কথাটা শেষ করে নিজের রসিকতায় সে জোরে হেসে উঠল। কিন্তু তার কথায় রূপনের মনে আর একটা কথা জেগে উঠল। সে হচ্ছে তার বিয়ের কথা। সে একসঙ্গে মিস্ত্রীর ও অন্য একটা বিপদ ও লাভ মিশ্রিত একটা কাজ চালাত। মাস আষ্টেক আগের কথা—একটা বাড়ীর কাজে যখন সে খাটছিল তখন সেই সঙ্গে চুণ সুরকি বইবার কাজে যে কজন মজুরনী সেখানে জুটেছিল, তার মধ্যে এই সুখী মেয়েটাকে তার বেশ মনে ধরেছিল এবং তারি ফলস্বরূপ সে একদিন গিয়ে এই মেয়েটার হাত চেপে ধরল। এই মেয়েটার সাথে সাথে ঝমরু মিস্ত্রীও ঘুরত, এবং সে ঘুরতে আরম্ভ করেছিল রূপনের অনেক আগে থেকেই। ঝমরুকেও যে মেয়েটার মন্দ লেগেছিল তা নয়, কিন্তু তা সত্বেও রূপনের এই ঘনিষ্ঠ আহ্বানের আকর্ষণে সে ঝমরুকে উপেক্ষা করে রূপনকেই স্বীকার ক'রে নিলে।

তারপর থেকে রূপন তার ব্যবসার একটা দিক ছেড়ে শুধু আর একটা দিকই রেখেছিল। একটা কাজ করে তার এই নতুন জীবনের মাধুর্য্যটুকু উপভোগ করে, অপর কাজ কর্ব্বার সময় আর তার হয়ে উঠত না। আর সুখীও সে কাজের বিপদ জেনে, সে কাজ কর্ব্বার সময় যাতে না পায়, সে জন্যে রূপনকে সে ঘরে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করত। এই ভাবে দিন কেটে আসছিল কিন্তু এই ক'দিনের অশ্রান্ত বৃষ্টির ফলে রূপনের কাছে এই জীবনটা কেমন যেন বিশ্রী হয়ে উঠেছিল ; তার উপর সুখীর এই সংসার নিয়ে লুকোচুরি তার আরও বিশ্রী লাগল। এতদিন যে তৃপ্তি তার বুক ভ'রে ছিল, আজ তা যেন তিক্ত হয়ে উঠেছিল। তার মনের উচ্ছৃঙ্খল মানুষ অশান্ত হয়ে উঠেছিল। ঠিক এমন অবস্থায় যখন সে সুখী ও ঝমরুকে সন্ধ্যার অন্ধকারের আড়ালে দেখতে পেলে, তখন অতৃপ্তির প্রথম উত্তেজনায় তার পুরাণো অবস্থায় ফিরে যাওয়ার মধ্যে আশ্চর্য্যজনক কিছু ছিল না। কিন্তু তার ওপর যখন তার পুরাণো দিনের সেখো তার 'বৌয়ের নেশা ছুটল নাকি' বলে বিদ্রূপ করল তখন এই ঘৃণা এবং নেমকহারাম মেয়েজাতটার ওপর এর প্রতিফল নেবার জন্যে তার মন উত্তেজিত হয়ে উঠল। এই সুখী, যে কতদিন কত ছলায় তাকে ভুলিয়ে ঘরে রেখেছে, যার সোহাগে সে মত্ত হয়ে উঠেছিল, আজ সেই সুখীকে ঝমরুর সঙ্গে অমন অবস্থায় দেখে তার নিজেরই ওপর ঘৃণা হল। এই সুখীর নেশায় সে মেতেছিল, আজ তার সব শেষ করে দিতে হবে।

রূপন তার সেখোর কথার জবাব না দিয়ে বোতলটা হাতে করে উঠে পড়ল। তার সেখো একটু আশ্চর্য্য হয়ে একটা টিটকারীর হাসি ছড়িয়ে বললে, ব্যাপার কি সা-জী! বিয়ে করে ও ক্ষেপে গেল নাকি?

গগন সা' ঠোঁটটা একটু উল্টে বললে, বিয়ে করলে সবাই একটু আধটু ক্ষেপে যায়। এ আর নতুন কি?

এ কথা অবশ্য নতুন নয়, কারণ এ অবস্থায় প্রত্যেক মানুষের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থাটা একটু বেড়েই ওঠে বটে, বিশেষ করে তার সন্দেহে-দোলায়মান মনটাতে যদি ব্যঙ্গের ধাক্কা দেওয়া যায়।

রূপন রাজপথে দোকান হতে বার হয়ে এসে তাড়াতাড়ি চলবার বৃথা চেষ্টা করতে লাগল। তার খালি মনে হচ্ছিল, তখন চলে এসে সে কি ভুলই না করেছে। তখনই একটা হেস্তনেস্ত তার করা উচিত ছিল। মিছামিছি সে এতটা সময় তাদের স্ফূর্ত্তির জন্যে দিয়ে এসেছে। ছি, ছি, কি বোকা সে—

কথাটা মনে করে সে আরও জোরে চলবার চেষ্টা করলে। কাদায় পিছল পথে তার অসংযত পদ-বিক্ষেপের ফলে গোটাকয়েক আছাড় খেয়ে যখন সে তার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল তখন দেখে যে দরজা হা হা করছে আর ঘর অন্ধকার। নিশ্চয় সুখী তা হ'লে সরে পড়েছে।

একটা নিষ্ফল আক্রোশে ফুলে টলতে টলতে সেই অন্ধকারের মধ্যে ঘরে ঢুকেই তক্তপোষের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সে নিজে ঘুরে পড়ল, আর তার হাতের বোতলটা ছিটকে ঘরের মেঝেয় পড়ে গেল।

ঘরের মধ্যে এই পড়ার শব্দে সুখী চমকে উঠল। ভাবতে ভাবতে তার চোখে একটু তন্দ্রা এসেছিল। কিন্তু তন্দ্রাভরেই সে তাড়াতাড়ি দিয়াশলাই দিয়ে ডিবিয়াটা জেলে ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। বোতলের ছিপি ঠিক দেওয়া ছিল না, ছিপিটা খুলে গিয়ে বোতলের সমস্ত মদটুকু ঘরের মেঝেয় পড়ে ঘরের বাতাসকে গন্ধে ভারী করে তুলেছিল আর রূপন মাতালের মতো তক্তপোষের এক কোণে বসে আছে। এমন অবস্থায় রূপনকে দেখে ভয়ে সে একটু আড়ষ্ট হয়ে গেলেও তাকে সে অবস্থা থেকে তোলবার জন্যে সে অগ্রসর হল। আলোর আঘাত মাতালের চোখে লাগতেই রূপন চ'টে টলে উঠে দাঁড়াল, তারপর সুখী তার কাছে এসে দাঁড়াবামাত্র একটা অকথ্য গালি উচ্চারণ করে রূপন তাকে সজোরে এক ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিলে। নিজে ধাক্কা দিয়ে, নিজেই তার টাল না সামলাতে পেরে সে পড়ে গেল। আর সুখী—মাতালের ধাক্কা সামলাবার মতো শক্তি তার ছিল না। ধাক্কার চোটে তার হাতের ডিবিয়াটা ঘুরে তার গায়ের কাপড়ের ওপর পড়ে গেল। যেটুকু কেরোসিন ছিল, সেইটুকু তার কাপড়ে ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত দেহে আগুন ধরে পড়তেই সে চীৎকার করে সেই মদ্য-সিক্ত মেঝের ওপর মূৰ্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

মদের ঝোঁকে ভয়ে ও বিস্ময়ে রূপন এই বীভৎস অগ্নিলীলার দিকে চেয়ে রইল।



ঘাসফুল

শ্রীরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

এক

"রাতদিন কিসের এত পড়া? তুই বি, এ পাশ করবি, না এম, এ পাশ করবি শুনি? যা বই রেখে চুল বাঁধগে যা তোর শৈলমাসীর কাছে। আজ আবার তারা দেখ্‌তে আস্‌বে।"

লক্ষ্মীমণির এই কথা শুনিয়া লীলা বলিল, "আমি আর পারি না, রোজ রোজ দেখ্‌তে আস্‌বে আর দেখ্‌তে আস্‌বে।"

"ওঃ কি আমার ডানা-কাটা পরী জন্মেচে গো, লোকের একবার দেখেই পছন্দ হ'য়ে যাবে! যা বিরক্ত করিস্‌নি বল্‌ছি—তিনটে বাজ্‌ল।"

লীলা মায়ের কথা কখনই অগ্রাহ্য করে নাই কিন্তু দেখিতে আসিবে বলিয়া তাহাকে যে প্রায়ই সাজগোজ করিতে হয় এটা তার মোটেই ভাল লাগে না, বিশেষতঃ নরুদার সামনে তাহার এ রকম বেশে বাহির হইতে ভারী লজ্জা করে। নরুদা তাহাকে যে বইখানি পড়িতে দিয়াছিল সেটি তাহার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তাহার কোন মতেই উঠিতে ইচ্ছা হইতেছিল না, কিন্তু লক্ষ্মীমণির গম্ভীর মুখ দেখিয়া সে আর কোন কথা না বলিয়া বইখানি রাখিয়া ফিতা, মাথার কাঁটা প্রভৃতি লইয়া নামিয়া গেল।

লক্ষ্মীমণি জানালার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন, সামনে কতকগুলা আমগাছের ঘনছায়ায় দুটা কাঠবিড়ালী লাফালাফি করিতেছিল। লক্ষ্মীমণি সেইদিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, সত্যিই তো মেয়েটার আর কি দোষ। এইবার লইয়া তো দশবার হইল লীলাকে দেখিতে আসিয়াছে কিন্তু কাহারও পছন্দ হয় না, কেন তাঁহার মেয়েকে তো দেখিতে খারাপ নয়। সুন্দরী সে হইতে না পারে কিন্তু সে তো কুৎসিতও নয়। হইতে পারে তাহার টাকা নাই কিন্তু টাকাটাই কি সব? ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চোখের পাতায় জল ভরিয়া উঠিল।

হাত দুইটি উপর দিকে করিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, "মা গো, এবার যেন আর অপছন্দ না হয়!"

মেয়ে সকলেরই পছন্দ হইল, সেই মাসের শেষাশেষি গোলকপুরের নিতাই চাটুয্যের সঙ্গে লীলার বিবাহ ঠিক হইয়া গেল। নরু নিতাই-এর সব জানিত। লীলার মত মেয়ে এই নিতান্ত নির্ব্বোধ এবং বিপত্নীক পাষণ্ডের হাতে পড়িয়া কিরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিবে তাহা ভাবিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। একদিন দুপুরে লক্ষ্মীমণি যখন খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া রৌদ্রে বসিয়াছিলেন, নরু তাঁহাকে সব কথা বুঝাইয়া বলিল।

লক্ষ্মীমণি বলিলেন, "কি কর্‌ব বাবা, তোমার মামারা সব কথা দিয়েছেন, তা না হ'লে আমার কি ইচ্ছে যে মেয়েটা একটা বুড়োর হাতে পড়ুক—।" এই বলিয়া লক্ষ্মীমণি কিছুক্ষণ চুপ করিলেন, তাঁহার মনে পড়িয়া গেল তাঁহার স্বর্গত স্বামীর কথা। তিনি থাকিলে কি আর আজ এইরূপ হইত! একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি আবার বলিলেন, "ভাগ্য ভাল থাকে, ওতেই লীলার সুখ হবে। আমাদের আর কি সাধ্য আছে বল?"

দুই

বছর শেষ হইতে না হইতেই লীলা যখন মামার বাড়ী আসিল তখন তাহার পরণে সাদা থান আর আভরণশূন্য হাত দুখানি দেখিয়া লক্ষ্মীমণি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। এই নিষ্পাপ সরলা মেয়েটির সারা জীবন কেবল মরুভূমির মত চিরদিন ধূ ধূ করিতে থাকিবে ভাবিয়া তাঁহার মাতৃহৃদয় গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, তাই একাদশীর দিন সকালে উঠিয়া লীলাকে বলিলেন, "শাদা কাপড়খানা খুলে ফেলে এই লাল পেড়ে খানা আর এই চুড়ি দুগাছি পর।"

মায়ের এই আকস্মিক অদ্ভুত অনুরোধের কোন কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া সে লক্ষ্মীমণির দিকে অবাকদৃষ্টিতে চাহিয়াছিল কিন্তু কোন কথা না বলিয়া সে মায়ের কথামত কাজ করিল, সোনার চুড়ির ঠুংঠুং আওয়াজটুকু তাহার বড় মিষ্টি লাগিতেছিল, কেন, সে জানে না। লীলার এই রূপ দেখিয়া লক্ষ্মীমণি কোন রকমে কান্না চাপিয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

তিন

লালপেড়ে কাপড়খানা আর চুড়ি দুগাছি পরিয়া তাহার নিজেকে বেশ দেখাইতেছিল, তাই সে আয়নার সামনে গিয়া তাহার চুলগুলি একটু যত্নে বাঁধিয়া নীচে রান্নাঘরে গেল। তাহাকে দেখিয়াই তাহার বড় মামী সরলা বলিয়া উঠিল, "ও মা, একি ছিরি, তুই আবার ওসব পর্‌লি কেন? সোনার চুড়ি, লালপেড়ে কাপড়, ওগো মেজ বৌ, দেখে যাও আমাদের লীলারাণীর কাণ্ড! বলি হ্যাঁলো তোর এ গুলো পর্‌তে লজ্জা হোল না? এই সেদিন স্বামী মরেছে আর এরই মধ্যে সব ভুলে গেলি?"

মেজবৌ এতক্ষণে সেখানে আসিয়া জুটিয়াছিল। গালে একটা আঙুল দিয়া বলিল, "ওমা কোথায় যাব? সর্ সর্ রান্নাঘর থেকে। বেহায়াপনা কর্‌বার আর জায়গা পায় নি। তাই বলি, নরুর সঙ্গে এত ভাব কেন? রাতদিন হাসি তামাসা—ছেলেটাকে যেন গিল্‌তে ব'সেছে।"

লীলা একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। তার মায়ের অনুরোধে সে এই সব করিয়াছে তাহাতে যে কি অন্যায় হইয়াছে সে ভাবিয়া পাইল না। সে বলিল, "মা বলেছে তাই—" কথাটা শেষ করিবার পূর্ব্বেই সরলা মুখখানা যথাসম্ভব বিকৃত করিয়া বলিল, "তা না হ'লে আর কে বল্‌বে বল, তিনিই তো বসে বসে তোমার মাথা খাচ্ছেন। সর সর্ একাদশীর দিন আবার রান্নাঘরে কি কর্‌তে আসা? গয়না পরেছেন, তা' আবার দেখাতে এসেছেন—ছি, ছি!"

লীলা আর কোন কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে আপনার ঘরে চলিয়া গেল। রান্নাঘরের পাশের ঘরে লক্ষ্মীমণি একটা থালায় বড়ি দিতেছিলেন, চোখ হইতে দুই ফোঁটা জল হাওয়ায়-ঝরা শিউলির মত মাটিতে পড়িয়া গেল।

চার

রান্নাঘর হইতে আসিয়া লীলা মেঝেতে উপুড় হইয়া পড়িয়া খুব কাঁদিল। সকলের এই মিলিত ভৎর্সনার কারণ কি সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে কি করিয়াছে তাহার কি দোষ; সে যতই এই সব ভাবিতে লাগিল ততই তাহার ক্ষুব্ধ ব্যথিত মন ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাছেই নরুর দেওয়া একখানা বই পড়িয়াছিল, সেইটা মাথায় দিয়া সে ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল। চোখের জলের দাগ তাহার উপবাসক্লিষ্ট ঘুমন্ত মুখে বড় সুন্দর

দেখাইতেছিল। লক্ষ্মীমণি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া লীলার উপর তিরস্কার বর্ষণ করিয়া নিজের মনটাকে হাল্কা করিয়া লইবার আশায় উপরে আসিয়াছিলেন কিন্তু লীলার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, নিজেই ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। এই নিতান্ত নির্দোষ পাপপুণ্যের সম্পূর্ণ অতীত মেয়েটির সম্বন্ধে কোন পাপ চিন্তা করিতে তাঁহার মন কিছুতেই সায় দিল না, ভাবিলেন, 'দু'খানা গয়না পরলেই যদি আমার মেয়ের চ'রিত্র খারাপ হয়, তা' হোক গে।'

লীলার দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার চোখে পড়িল লীলার মাথার তলায় নরুর দেওয়া বইখানা, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে পড়িয়া গেল নরু ও লীলার প্রতি একটা কুৎসিত শ্লেষসূচক মেজ বউ-এর কথাগুলি। হঠাৎ লীলা চোখ মেলিতেই দেখিল, লক্ষ্মীমণি তাহার দিকে চাহিয়া আছে। লক্ষ্মীমণির চোখের দিকে চাহিয়া তাহার বড় ভয় পাইল। সে শুইয়া শুইয়াই বলিল, "কেন আমার দিকে অমন করে চেয়ে আছ? আমি কি করেছি?"

লক্ষ্মীমণি বলিলেন, "যা হতভাগী—নরুকে এক্ষুণি বইটা দিয়ে আয়। তোর জন্যে যে আমায় রাজ্যি শুদ্ধ লোকের মুখ ভেঙচানি খেতে হয়। আর খবরদার নরুর ঘরে যাবি। অত বড় মেয়ে হ'লি একটুও বুদ্ধি শুদ্ধি হ'ল না।"

কথাগুলি যখন লক্ষ্মীমণি বলিতেছিলেন তখন প্রত্যেক কথাটির নিরর্থকতা তাঁহার কানে বাজিতেছিল। লীলা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া তখনই নরুর ঘরে বইখানি দিয়া আসিল, আসিয়াই আবার মেঝেতে শুইয়া পড়িল, লক্ষ্মীমণির মুখ দিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে "মাগো" কথা দুটি বাহির হইয়া আসিল।

পাঁচ

আজ চার দিনের পর লীলার জ্ঞান হইয়াছে, এই কয়দিন সে জ্বরের ঘোরে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল, বিকালবেলা তাহার রোগ শীর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া লক্ষ্মীমণি বসিয়াছিলেন, লীলা যে কি একটা কথা বলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে তাহা তিনি তাহার ভাব ভঙ্গী দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি বলিলেন, "কি চাস মা?"

লীলা বলিল, "একবার নরুদাকে ডেকে দেবে মা?"

লক্ষ্মীমণি একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা দিচ্ছি," এই বলিয়া তিনি নরুকে ডাকিয়া আনিলেন। নরু আসিতেই লীলার রোগক্লিষ্ট মুখে কিসের যেন একটা প্রভা ফুটিয়া উঠিল, লীলা ধীরে ধীরে বলিল, "নরুদা, সেই রকম গল্প একটা বল না, বড় শুন্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে।"

লক্ষ্মীমণি বলিলেন, "কি গল্প রে নরু ?"

নরু বলিল "ওই সব যারা স্বদেশী ক'রে বেড়ায় তাদের গল্প, লীলার এই গল্প শুন্‌তে খুব ভাল লাগে।"

লক্ষ্মীমণি বলিলেন, "ও, তা' তোরা একটু গল্প কর, আমি নীচে থেকে আসি।"

লক্ষ্মীমণি নীচে যাইতেই সরলা বলিল, "লীলা আজ কেমন আছে গো ? রোজই মনে করি একবার দেখে আসব কিন্তু সময় আর হয় না।"

লক্ষ্মীমণি বলিলেন "আজ একটু ভাল আছে বৌদি, তাই নরুকে বসিয়ে একবার নীচে এলুম।"

কথাটা শুনিয়াই সরলা কি যেন একটা সত্যের সন্ধান পাইয়াছে বলিয়া মনে হইল, আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া সে লক্ষ্মীমণির ঘরের কাছে গেল এবং কান পাতিয়া লীলা ও নরুর মধ্যে কি কথা হইতেছে তাহাই শুনিতে চেষ্টা করিল। সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকার তখন ঘরের ভিতর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। লীলা গল্প শুনিতে শুনিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল নরু তাহা জানিত না, সে ঝুঁকিয়া লীলা ঘুমাইতেছে কি না দেখিতেছিল, সরলাও সেই সময় ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। নরু মুখ তুলিতেই সরলা নরুকে কোন কথা না বলিয়াই বলিল, "কেমন আছিস লো আজ ?"

নরু বলিল "আজ একটু ভাল আছে, মাসীমা।"

সরলা নীচে গিয়া লক্ষ্মীমণিকে গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "মেজ বৌ তো মিথ্যা কথা বলেনি ঠাকুরঝি। আজ আমি নিজের চোখে দেখলুম।"

লক্ষ্মীমণি কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন," কি বৌদি ?"

সরলা একটু হাতনাড়া দিয়া বলিল, "কি আবার, এই তোমার লীলারাণীর কেলেঙ্কারী।"

সরলার কথাটা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে অতিরঞ্জিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

ছয়

লীলা মারা যাইবার চার পাঁচদিন পরে নরু তাহার খোলা জানালার দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। একটা মহাক্লান্তির মলিন রেখা তার মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, জানালার সামনে ছোট মাঠের উপর সবুজ ঘাসের আস্তরণ বিছান রহিয়াছে। একটা ছোট্ট হলদে ঘাসফুল আকাশের দিকে চাহিয়া আছে, হঠাৎ নরুর তাহা চোখে পড়িল, সে লীলার কথাই ভাবিতেছিল। তাহার মনে হইল লীলা ঠিক ঐ ঘাস ফুলটার মতই ছিল, ঐ ঘাস ফুলটার মত নিতান্ত অযত্ন ও অবহেলার মধ্যে দিয়াই সে বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

"বাবা নরু, এই গুলো তোমার কাছে রেখে দাও, যাবার সময় বলে গিয়েছিল, মা নরুদার স্বদেশীর কাজে টাকা লাগে তুমি দিও, আমার তো বাবা আর কিছু নেই এই গুলোই রেখে দাও," এই বলিয়া একটা সোনার চিরুণী, দুগাছি চুড়ি রাখিয়া লক্ষ্মীমণি চলিয়া গেলেন।

আষাঢের মেঘছায়াচ্ছন্ন নদীর মত নরুর চোখ দুইটি ছল ছল করিয়া উঠিল।



কল্লোল 



গোকুলচন্দ্র নাগ

৮ম সংখ্যা
তৃতীয় বর্ষ



অগ্রহায়ণ
১৩৩২

প্রতি সংখ্যা চারি আনা

মাশুলসহ বার্ষিক তিন টাকা আট আনা

সম্পাদক—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

কল্লোল পাবলিশিং হাউস

২৭ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পুজোপহার! পুজোপহার!!

এবার পূজায়

"মোহনতোষ ব্রাদার্সের"



দোকান হইতে তাহাদের চিরপ্রসিদ্ধ

১॥০, ২॥০, ৩॥০ ও ৪॥০ টাকায় খোকন ব্রাণ্ড ফুটবল, ৫৲ এবং ৬॥০, ৮॥০ ও ১০॥০ টাকায় রঞ্জনসেট ব্যাডমিণ্টন ১।০, ১॥০ ও ২॥০ টাকায়, লুডু, হালমা, সাপ ও মই, জানোয়ারের দৌড়বাজি, ধাঁ ধাঁ পাসা প্রভৃতি গৃহখেলা ৪॥০, ৬॥০ ও ৮॥০ টাকায়, শিল্পশিক্ষার উপাদান মিকানো এবং ১৩॥০ ১৫॥০, ২২৲ ও ৩২৲ টাকায় নির্দ্দোষ আমোদের জন্য ক্যারম-বোর্ড ক্রয় করিলেই পূজার উপহার স্বাস্থ্যোন্নতির সহায়তা, সঙ্গে সঙ্গে মানসিক উৎকর্ষ সাধনের সহায়তা করা হইবে। ভিঃ পিঃ-তে মাল পাঠান হয়। পত্র লিখিলেই ক্যাটালগ পাইবেন।

মোহনতোষ ব্রাদার্স

১৫।১, কলেজ স্কোয়ার

(আলবার্ট বিল্ডিংস)

কলিকাতা

গোকুলচন্দ্র নাগ

[জন্ম—২৮শে জুন,—১৮৯৪ ; ভাদ্র ১৩৩২
মৃত্যু—২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৫ ; ৮ই আশ্বিন ১৩৩২]

প্রথম তাহার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় কলিকাতার শব্দময় রাজপথেরই এক পার্শ্বে।

এই তার সঙ্গে আমার পরিচয় সুরু। একজন আর একজনকে চিনিয়া লইবার জন্য আমাদের কাহারও কিছু উৎকণ্ঠা ছিল না ; কাজের ভিতর, কথায় ব্যবহারে যে যাহাকে যেমন করিয়া চিনিলাম তাহাতেই মানুষে মানুষে এই নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। দোষ ত্রুটি আশা আকাঙ্খা দুঃখ সুখে জড়িত দুইটি মানুষ কয় বৎসর ধরিয়া পরস্পরকে আত্মীয় ও বন্ধু বলিয়া জানিলাম।

১৯২১ ইংরাজী ৪ঠা জুন Four Arts Club-এর প্রতিষ্ঠা হয়। এই club-এর ideal ও কল্পনা মনে বহু বৎসর ধরিয়া রূপ ধরিয়া বিকসিত হইতেছিল। আদর্শ-সাধক দেশের বহু নরনারীর ম্লান মুখে নীরব বেদনার চিহ্ন দেখিয়া হৃদয় চাহিত চিত্তের অন্ধকার গুহা হইতে এই কল্পনাকে পথ কাটিয়া আনিয়া আলোকের পারে মূর্ত্তি দান করি। তখনকার সে বেদনা মুখের উপর বুঝি ছায়া ফেলিয়াছিল। গোকুল একদিন জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাব্‌ছ বল ত এমন করে? মনে হচ্ছে যেন আমিও তোমার সঙ্গে একই কথা ভাবছি, কিন্তু সে যে কি কথা তা আমি জানি না।

আমি বলিলাম, ভাবছি একটা পান্থশালার কথা—যেখানে মানুষ এসে শ্রান্ত জীবন-ভার নিয়ে বিশ্রাম করতে পারবে। জাতি, বয়স, sex ও position সেখানে কোনও বাধা হবে না। আপন আপন কাজকে মানুষ আনন্দময় করে তুলবে, মানুষ মানুষের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে মিশে আপন স্বচ্ছন্দ ইচ্ছায় আপনাকে সার্থক মনে করতে পারবে।

গোকুল আমার হাতের উপর তার হাতে জোরে তালি দিয়া মহা আনন্দে বলিয়া উঠিল, আমারও যে এটা জীবনের স্বপ্ন!—ঠিক রূপটা ধরে উঠতে পারছিলাম না এতদিন!

এর বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই গোকুল প্রবাসী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় গল্প লিখিত। কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল হইতে শেষ পরীক্ষা পাশ করিয়াছিল। কিছুকাল পরে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে Archæological Department-এ চাকরী উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের বহুদেশ ও অবজ্ঞাত স্থান ভ্রমণ করে। শরীর বিশেষ অসুস্থ হওয়ার দরুণ তাহাকে সেই চাকরী হইতে পরে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। তাহার পরই সে পুনরায় কলিকাতায় আসে। তৈল বর্ণে (oil colour) portraits আঁকিয়া উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করে। সুদূর পুনা ও বম্বে প্রভৃতি স্থান হইতেও তাহার কাছে তৈল চিত্রের অর্ডার আসিত। Portrait অপেক্ষা Landscape আঁকা সে বেশী ভালবাসিত, কিন্তু portrait না হইলে অর্থাগম হয় না বলিয়া তাহাকে portrait-ই আঁকিতে হইত। প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত অতুল বোস, যামিনী রায়, প্রভৃতি গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে গোকুলের সহাধ্যায়ী ছিলেন।

গোকুলরা তিন ভাই ও দুই ভগ্নী। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ কালিদাস নাগ এই সময়ে বিলাত যান। পিতৃ-মাতৃহীন এই ভায়ে ভায়ে জীবনের সুখ দুঃখের ভিতর এক অপূর্ব্ব বন্ধুত্বের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। গোকুল তাহার দাদা কালিদাস বাবুকে যেমন শ্রদ্ধা করিত তেমনি গভীর ভালবাসায় তাঁহাকে নীরবে পূজা করিত। বিলাত বাস কালে তাহার দাদার জন্য তাহাকে কতবার বিশেষ চিন্তাকুল দেখিয়াছি। গোকুলের বড় ভগ্নী বিধবা। গোকুল তাহার দিদি ও তাঁহার সন্তানদের সাধ্য মত সেবা করিত। গোকুলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান রামচন্দ্র মান্দ্রাজে চাকরী করে। গোকুল অবিবাহিত ছিল, কিন্তু তাহার পরিচিত, এমন কি অনেক নাম জানা লোকের জন্যও তাহার ভাবনার অবধি ছিল না। সমস্ত মানুষকে লইয়া যেন তাহার প্রকাণ্ড সংসার। গোকুলের ছোটবোন্ গোকুলের বড় আদরের ছিল। এই বয়সেও দেখিয়াছি দুই ভাই-বোনে ঠিক্ ছোটবেলার মত ছোট-খাট ঝগড়া করিয়াছে। তাহার বড় দিদি বলিতেন,—তোরা কি বড় হবি না!

দুই ভাই-বোনে তখন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হাসিত।

বয়স হইলেও ছোটছেলের মত মন রাখা চিত্তের সরসতারই পরিচায়ক।

গোকুল যে মনে শিশু ছিল তাহার আর এক প্রমাণ—ছোট ছেলেরা তাহাকে একদিনে আপন ভাবিয়া লইত। গোকুল এই শিশু-কুলের বন্ধু ছিল। তাহাদের আজগুবি গল্প বলা, তাহাদের নানা রকম আমোদজনক ছড়া প্রভৃতি শেখান, তাহাদের সঙ্গে কৌতুকপ্রদ নাম দিয়া সম্পর্ক পাতান, তাহাদের লইয়া খেলা করা গোকুলের সংগ্রামময় জীবনের শান্তির প্রসাদ ছিল। সেদিনও গোকুলের জমান চিঠির তাড়া খুলিতে তাহার অনেক শিশু-জননী 'তিরুয়া-মা'— 'তাব্দু-মা'র চিঠি দেখিলাম।

সে মানুষকে এত ভালবাসিতে পারিত যে, অনেক সময় তাহা দেখিয়া অনেকে গোকুলের এ সব ন্যাকামী বা বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু এত মমতার ঐশ্বর্য্য লইয়াও সে ভিখারীর মত একটি স্নেহ-কণাকে অমূল্য জিনিষ বলিয়া পরম আদরে ও কৃতজ্ঞতায় গ্রহণ করিত। তাহার ভালবাসার মধ্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইত না, নীরব গভীর মমতায় তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত, এই কারণে অনেকে মনে করিতেন, গোকুল দূরে দূরে সরিয়া থাকে।

মানুষের সঙ্গে আচরণে ও ব্যবহারে তাহার ভদ্রতা, শিখিবার মত জিনিষ। এই ভদ্রতা তাহার বাহিরের জিনিষ ছিল না, তাহা একান্ত স্বভাবজাত। কিন্তু কোনও রূপ অন্যায় ও নীচতাকে সে কিছুতেই লোক-দেখান ভদ্রতার আচ্ছাদন দিয়া সহ্য করিত না। মানুষের ত্রুটির জন্য সে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু কাহারও ব্যবহারে তাহা বারে বারে দেখিলে সে সত্যই বিরক্ত হইত। সেই বিরক্তির মধ্যে একটা দারুণ কষ্ট মিশান থাকিত। সেই জন্যই সে অন্যের অপরাধের জন্য নিজের মনে ভাবিয়া আকুল হইত।

Four Arts Club-এ থাকিতেই সে PhotoPlay Syndicate of India নামে বায়স্কোপের ছবি তুলিবার এক কোম্পানীতে সাদরে আহূত হয়। এই Sydicate-এর উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী, প্রফুল্ল ঘোষ প্রভৃতি তাহার ব্যবহারে ও শিল্পকুশলতায় মুগ্ধ ছিলেন। "Soul of a Slave" এই কোম্পানীর প্রথম ছবি। এই ছবি তুলিবার জন্য গোকুলকে বিপুল পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। সমস্ত studio setting ও Art-Direction গোকুলকেই চালনা ও design করিতে হয়। এই ছবিতে গোকুলেরও একটি ছোট ভূমিকা অভিনয় করিতে হয়। ভূমিকাটি তাহার স্বভাবের একেবারে বিরুদ্ধ

ভাবের। কিন্তু তাহার অভিনয়-কুশলতা এই ছোট ভূমিকাটিতেই স্পষ্ট ও সুন্দররূপে প্রকাশ পায়। এই ছবি তোলা লইয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অল্পাহারে ও অনেক সময় অনাহারে থাকিয়া তাহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ে। যতদূর মনে পড়ে সেই হইতেই তাহার শরীর আবার ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইহার জন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া চলে না। দোষ যদি দিতে হয় তাহা হইলে গোকুলের কর্ম্মনিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধকেই অপরাধী করিতে হয়। গোকুলের এই অনমুরঞ্জিত কর্ত্তব্যবোধ আজীবন তাহাকে পরিচালিত করিয়াছে। যে কাজের ভার লইত, তাহা সুসম্পন্ন করিবার জন্য সে সকল প্রকার অসুবিধা ও কষ্ট স্বচ্ছন্দমনে অবহেলা করিত। এমন কি, এই কারণে দীর্ঘকাল হয় ত তাহার বাঙালীর প্রধান খাদ্য—ভাত, খাওয়াই ঘটিয়া উঠিত না। শরীর যাহার শক্ত নয়, তাহার পক্ষে এরূপ অত্যাচার যে অত্যন্ত অপরাধ তাহাও সে জানিত, কিন্তু কাজের উৎসাহ ও আনন্দ তাহাকে পাগল করিয়া তুলিত।

গোকুলকে একসময়ে কলিকাতা New Market-এ এক ফুলের দোকান পরিচালনা করিতে হইয়াছিল। ফুল বেচা যাহার কাজ, ফুল বেচিয়া যাহাকে পয়সা উপার্জ্জন করিতে হইবে, তাহার পণ্যদ্রব্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। সে ফুল ছুঁইত অত্যন্ত সঙ্কোচে, ফুলকে ফুলের মত করিয়াই স্পর্শ করিত। দোকানের মালিরা শাকের আঁটির মত ফুলের গোছা লইয়া টানাটানি করিত, গোকুল তাহা দেখিয়া আচম্কা শিহরিয়া উঠিত। দোকান উজার করিয়া অনেক সময় ছোট ছোট ছেলে-মেয়েকে ফুল দিয়া ফেলিত। তাহাদের মুখের হাসি দেখিয়া গোকুল কত আরাম পাইত। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় পরিজনের ত কথাই নাই। গোকুলকে বলিলেই হইত কাহারও ফুল চাই। গোকুল প্রাণ ভরিয়া সকলকে ফুল দিয়া সুখ পাইত। অনেক সময় দেখিয়াছি কাহাকেও ফুল দিয়া, সে ব্যক্তি চলিয়া গেলে গোকুল নিজের ব্যাগ খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া বিক্রীর টাকা বলিয়া মালিদের দিয়াছে। দোকান তাহার আত্মীয়েরই ছিল, এই সব কারণে কোনও জবাবদিহি করিবার মত কোনও কারণ না থাকিলেও গোকুল নিজের ক্ষমতার অপচয় করিতে কুণ্ঠিত হইত। সস্তায় ফুল বিক্রী করিলে মালিরা অনেক সময় বলিয়াছে, বাবু আপনি দোকানে থাকিলে দোকান চলিবে না। গোকুল তাহাদের হাসিয়া উত্তর করিত, ফুল বেচে পয়সা নিস্ এই ঢের, ফুল কি মানুষ বেচ্‌তে পারে! এই ছোট কথাটিতেই তাহার হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যাইত।

নানা কারণে Four Arts Club উঠিয়া যায়। Club-এর একজন বিশেষ উদ্যোক্তা ও একনিষ্ঠ সভ্যের মৃত্যুই প্রথম কারণ। তারপর মানুষের শত্রুতা ত আছেই। এমন জিনিষ এই কয়জন যুবক এমন সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবে ইহাই যেন অনেকের অশান্তির কারণ ছিল। Four Arts Club থাকিতেই শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসু, শ্রীসুনীতি দেবী বি, এ, গোকুল ও আমি "ঝড়ের দোলা" বলিয়া একখানি গল্পের বই প্রকাশ করি। ক্লাব উঠিয়া যাওয়াতে আমাদের অনেকের মনেই বড় আঘাত লাগিল।

ক্লাবের সাহিত্য বিভাগ হইতে পত্রিকা বাহির করিব এই Scheme পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই কল্পনা লইয়া গোকুল ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা চলিতে লাগিল। কোথায় সম্বল, কোথায় লেখা তাহার কিছু খোঁজ ছিল না

Four Arts ক্লাবের অন্তরের সঙ্গীত ছিল—

"ছিল যে পরাণের অন্ধকারে,
এলো সে ভুবনের আলোর পারে।
স্বপন বাধা টুটি
বাহিরে এলো ছুটি
অবাক আঁখি দুটি
হেরিল তারে।"

ঠিক হইয়া গেল কাগজ বাহির হইবে। নাম ঠিক্ করিয়া ফেলিলাম— কল্লোল। গোকুলের ব্যাগে ছিল একটাকা আট আনা, আমার কাছে ছিল টাকা দুই—এই সম্বল লইয়া দোকান হইতে কাগজ কিনিয়া একটি ছোট প্রেসে কল্লোলের প্রথম হ্যাণ্ডবিল্ ছাপা হইল। ৩০শে চৈত্র সংক্রান্তি—চৈত্র মাসের সং দেখিতে পথে বিপুল জনতা হয়। সেই সুযোগে গোকুল ও আমরা কয়েকজন মিলিয়া হ্যাণ্ডবিল বিলি করিতে বাহির হইলাম। ইহার পূর্ব্বেই কল্লোলের কিছু কিছু কাপি প্রেসে ছাপিতে দেওয়া হয়।

বিধাতার সাহায্যে ১৩৩০-এর পহেলা বৈশাখ কল্লোল ছাপিয়া বাহির হইল। তাহার প্রথম কবিতার প্রথম লাইনকয়টি কল্লোলের সকলের মর্ম্মবাণী।

আমি কল্লোল, শুধু কলরোল, ঘুম-হারা দিশাহীন,
অজানা-জানার নয়নের বারি
নীল চোখে মোর ঢেউ তুলে তারি
পাষাণ শিলায় আছাড়িয়া পড়ি ফিরে আসি নিশি দিন।

গোকুলের সেই আনন্দের হাসিটি আজও চোখের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়ায় জীবনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া বহুকাল পরে সে যেন আসল পথের সন্ধান পাইল। তাহার উৎসাহ, তেজ, নবীন উদ্যম কল্লোলকে সঞ্জীবনী শক্তি দিল। 'পথিক' উপন্যাসখানির খসড়া তৈয়ারী ছিল। গোকুলের 'পথিক' উপন্যাসের প্রথম অংশ কল্লোল-এ প্রকাশিত হইল। তাহার পর কত অজানা আপন হইল, কত পর ভাই হইল। কত নিরাশা, বাধা বিপত্তি কল্লোলের গতির মুখে রুখিয়া দাঁড়াইল। কত অপমান্ অননুরাগ কল্লোলকে নিঃশেষ করিতে আসিল, বিধাতার ইচ্ছায় কল্লোল তাহার নূতন নূতন সঙ্গী লইয়া দুর্ব্বার যাত্রায় আজও অবধি চলিয়াছে। এই কল্লোল গোকুলের যেন হৃদ্‌পিণ্ড। এর স্পন্দনের তালে তালেই যেন গোকুলের হৃদয়ধ্বনি বাজিয়া উঠিত। মৃত্যুর তিন দিন আগেও মৃত্যু-পথযাত্রী পথিক আশ্বিন মাসের কল্লোলখানি প্রথম পাইয়া মহাসম্বলের মত বুকে চাপিয়া ধরিয়া বিপুল আনন্দে চোখ বুজিয়া রোগশয্যায় পড়িয়া ছিল। হঠাৎ এক সময় বলিয়া উঠিল, কল্লোলকে রেখো।

'পথিক' উপন্যাসখানি লিখিয়া গোকুলকে অনেকের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে কল্লোলের কাল্পনিক দলকেও অনেকে বিরক্তির চক্ষে দেখিলেন। কিন্তু সমগ্র মানব-সমাজে যে বিপদ কতকগুলি মানুষের জীবন-ধারাকে অবলম্বন করিয়া দেশকে গ্রাস করিতে উদ্যত তাহারই একখানি নিখুঁত ছবি 'পথিক'-এ গোকুল শব্দ-শিল্পে আঁকিয়াছিল। গোকুল যাহা নিজের অন্তরের সমস্ত বেদনা লইয়া জানিয়াছিল তাহাই লইয়া তাহার এ ছবি-খানি আঁকা। ইহাতে কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা বিশেষ কয়েকটি মানুষের প্রতি আক্রোশবশে কিছু লেখা নাই। অবশ্য ইহা সম্ভব, পথিকের চরিত্রগুলির সঙ্গে যাঁহার চরিত্র কোথাও মিলিয়া যাইবে তিনি হয় ত তাঁহারই চরিত্র অবলম্বন করিয়া লেখা বলিয়া তাহা মনে করিতে পারেন, কিন্তু 'পথিকের' রচয়িতা কাহাকেও সম্মুখে ধরিয়া হুবহু, তাঁহাকে লইয়াই 'পথিক' রচনা করেন নাই ইহা আমি জানি। 'পথিক' উপন্যাসখানি সম্বন্ধে আজও পর্য্যন্ত অনেক আলোচনাই মুখে শুনিয়াছি। অল্পদিন হয় ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এই পুস্তকখানি ও কল্লোল সম্বন্ধে স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া একখানি পত্র লিখিয়া পাঠান, তাহার কিয়দংশ এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

৭নং বিশ্বকোষ লেন, কলিকাতা
২৩ আগষ্ট ১৯২৫।

* * * * গোকুলের পথিক পড়া শেষ করেছি।. বইখানিতে সব চাইতে আমার দৃষ্টি পড়েছে একটা কথার উপর। লেখক বাঙ্গালার ভাবী সমাজটার যে পরিকল্পনা করেছেন তা' দেখে বুড়দের চোখের তারা হয়ত কপালে উঠ্‌তে পারে, হয়ত অনেকে সামাজিক শুভ চিন্তাটাকে বড় করে দেখে মনে করতে পারেন, এরূপ লেখায় প্রাচীন সমাজের ভিত্‌ ধ্বসে পড়বে। আট বছরের গৌরীর দল এ সকল পুস্তক না পড়ে তজ্জন্য অভিভাবকেরা হয়ত খাড়া পাহারার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু আমার মনে হয় আমরা যে দরজা, শার্শি ও জানালা একবারে বন্ধ করে রেখেছি, এ ত আর বেশী দিন পারব না—এতে করে যে কতকগুলি রোগা ছেলে নিয়ে আমরা শুধু প্রাচীন শ্লোক আওড়াইয়া তাদের আধমরা করে রেখে দিয়েছি। বাঙ্গালী জাতি একেবারে জগৎ থেকে চলে যাওয়া বরং ভাল কিন্তু এমন সংস্কারের যাঁতায় ফেলে তাদের অসার করে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন কি ?

এবার সবদিককার দরজা জানালা খুলে দিতে হবে, আলো ও হাওয়া আসুক। হয়ত চির নিরুদ্ধ গৃহে বাস করায় অভ্যস্ত দুই একটা রোগা ছেলে এই আলো ও হাওয়া বরদাস্ত করতে পারবে না। কিন্তু স্বভাবকে গলাটিপে মারবার চেষ্টায় নিজেরা যে মরে যাব। না হয় মড়ার মতন হয়ে কয়েকটা দিন বেঁচে থাক্‌ব। এরূপ বাঁচার চেয়ে মরা ভাল।

যে সকল বীর আমাদের ঘরের দোর জোর করে খুলে দেওয়ার জন্য লেখনী নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন, তন্মধ্যে কল্লোলের লেখকেরা সর্ব্বাপেক্ষা তরুণ ও শক্তিশালী। প্রাচীন সমাজের সহিত একটা সন্ধি স্থাপন করবার দৈন্য ইঁহাদের নাই। ইঁহারা নিজেদের প্রগাঢ় অনুভূতি, সত্যের প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি গুণে একান্ত নির্ভীক, ইঁহারা মামুলী পথটাকে একবারে পথ বলে স্বীকার করেন না, ইঁহারা যাহা সুন্দর যাহা স্বাভাবিক, যেখানে প্রকৃত মনুষ্যত্ব তাহা প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই আত্মায় স্বপ্রকাশিত সত্যটাকে ইঁহারা বেদ কোরাণের চাইতে বড় মনে করেছেন। এই সকল বলদর্পিত মর্ম্মবান লেখকদের পদভরে প্রাচীন জরাজীর্ণ সমাজের অস্থিপঞ্জর কেঁপে উঠ্‌বে। কিন্তু আমি এঁদের লেখা পড়ে যে কত সুখী হয়েছি, তা বল্‌তে পারি না। আমার মনে হয় ডোবা ছেড়ে পদ্মার স্রোতে এসে পড়েছি,—যেন কাগজ ও সোলার ফুল লতার কৃত্রিম বাগান ছেড়ে নন্দন কাননে এসেছি।

গোকুল বাবুর মানুষের মনের গতিবিধির উপর অসামান্য অন্তদৃষ্টি আছে; তাঁর ভাষায় বঙ্গভারতী যেন পুকুর ছেড়ে স্রোতঃস্বিণীতে এসে পড়েছেন, কেমন সহজ স্বচ্ছন্দ ও মনোহর এই স্রোত! আমি বইখানি পড়ে মুগ্ধ হয়েছি— যে ভাষা কখনও কূট সমাসের জালে পড়ে বের হয়ে আস্‌তে পারছিল না, কখনও বা নিতান্ত পাড়াগাঁয়ের ধূলি বালির মধ্যে অশ্রদ্ধেয় হয়ে পড়েছিল, অথবা ক্ষুদ্র ভাবটি প্রকাশ করতে যেয়ে অনেকটা ফেনান কথার মধ্যে যেয়ে নিজেকে ব্যর্থ করছিল, সেই ভাষারই কেমন সহজ প্রকাশ হয়েছে।

"পথিক" বইখানির আদ্যন্ত নূতন পথের কথা, নূতন অভিযানের বার্ত্তা। লেখকের লিপি কৌশল অসাধারণ; সহজ কথাগুলিকে সময় সময় তিনি এমনই সুন্দর করে বলে যান, যে, আমাদের চোখ চির পরিচিত জিনিষগুলি নূতন কৌতুহলের সঙ্গে দেখতে সুবিধা পায়। এই পুস্তকখানি যিনি আদ্যন্ত পাঠ করবেন তিনি নিশ্চয় বুঝবেন, একজন শক্তিশালী লেখক বাঙ্গালা সাহিত্যে এসেছেন। যদি কারু মতের সঙ্গে এই লেখকের মতের ঐক্যের অভাব হওয়ার দরুণ তিনি পুস্তকখানি অগ্রাহ্য করতে প্রয়াস পান,—তা মনকে শতবার চোখ ঠেরে ভাঁড়াবার চেষ্টা করলেও তিনি পারবেন না, মনে মনে লেখকের শক্তিকে স্বীকার করতেই হবে। * * কয়েকখানি পুস্তকে স্বাধীন মত প্রচারের চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তা এত উৎকট ও অশোভন হয়েছে যে সেই উদ্দেশ্য মূলক গল্পগুলি আর্ট হিসাবেও কতকটা বেখাপ্পা হয়েছে। কিন্তু এই লেখক নিজের মতগুলি পাঠকদের মাথায় চাপিয়ে দেওয়ার ব্যগ্রতা হতে গল্পটি লেখেন নাই। তিনি লিখেছেন ভারতীর প্রেরণায়। এ জন্য যা কিছু অশোভন, তা আমাদের অস্বাভাবিক বা উৎকট হয় নাই। প্রকৃতি তো কাছে শুধু ফুলের সাজি নিয়ে উপস্থিত হন না, কত জিনিষই তো আমরা চারিদিকে দেখতে পাই। সুতরাং এই গল্পের মধ্যে যদি কিছু নোংরা জিনিষ থাকে তার মধ্যে বেশ একটা স্বাভাবিকত্ব আছে, লেখকের মনের গলদ নিয়ে সেগুলি উপস্থিত হয় নি। মানব চরিত্র ইনি এমন চমৎকারভাবে পাঠ করেছেন যে প্রতিটি চিত্র পৃথক হয়েছে— তাহাদের বিভিন্নতা এত স্পষ্ট যে প্রত্যেকটিকে বেছে নেওয়া যায়। এই ভাবের গল্পগুলির সময় সময় একটা দোষ চোখে বাজে—সেটি হচ্ছে এই যে প্রত্যেকগুলি চরিত্র প্রায় একই ধরণের বিজ্ঞতা বা রসিকতার অভিনয় করে, সবগুলি এক ছাঁচে ঢালা হয়। তাদের নামগুলি ভিন্ন ভিন্ন এই যা তফাৎ। কিন্তু কথা বার্ত্তায় কোন প্রভেদ দেখা যায় না। যেমন আনাড়ি চিত্রকরের হাতে সবগুলি মুখ এক-

রকম হয়ে যায়। এই বইখানিতে তাহা হয় নাই। দীপ্তি, মায়া, তটিনী, শ্রীশ, জীবন মুকুল প্রভৃতি প্রত্যেক চরিত্রের বিশিষ্টতা আছে, যাতে করে পরিচিত ব্যক্তিদের কণ্ঠস্বর শুনলে যেমন তাদের চিনতে বিলম্ব হয় না, এদের কথাবার্ত্তায় তেমনই এক একটা সুরের বৈশিষ্ট্য আছে।

বইখানিতে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটি আছে তা বলতে হয়। পুস্তকের প্রথম ১৫০ পৃষ্ঠা অবধি লিপি কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় আছে; কিন্তু গল্প ভাগ তেমন জমে উঠেনি। এতটা পর্য্যন্ত সাধারণ পাঠকের ধৈর্য্য রক্ষা করা হয়ত কতকটা কঠিন হবে। তবে বইখানির পত্র সংখ্যা ৫৫০,র উপরে এই জন্য পাঠকের সিঁড়ি ভাঙ্গিবার কষ্টটা সইয়ে নিতে হবে। লেখার মনোহারিত্ব তাঁহার ধৈর্য্য রক্ষার সহায় হবে সন্দেহ নাই।

দীপ্তির যিনি শেষে স্বামী হয়ে দাঁড়ালেন, তাঁর প্রথম সমাগমটা এমন হয়েছিল যে স্বভাবতই তাঁকে একটা জুয়াচোর ও দুষ্ট লোক বলে পাঠকের মনে ধারণা হয়েছিল। কিন্তু তিনি বড় সহজে তাঁর রূপ বদলিয়ে ফেল্লেন। যদিও লেখক একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে দীপ্তির প্রতি অনুরাগ জনিত নূতন একটা ভাব তাঁকে বদলে ফেলেছিল। কিন্তু সেই ইঙ্গিতটা যথেষ্ট নহে। পাঠক তাঁর এতটা রূপান্তর দেখতে প্রস্তুত ছিলেন না, ইহা অত্যন্ত হঠাৎ হয়েছে, বহুরূপী হঠাৎ তার মুখোস খুলে ফেলে রাক্ষস মূর্ত্তি হতে যেমন নররূপ ধারণ করে এই পরিবর্ত্তনটা সেইরূপ আকস্মিক হয়েছে। আমরা ভেবেছিলুম সে ডাঃ মিত্রের একেবারে সর্ব্বনাশ করে দেবে।

ব্রাহ্মসমাজের যে চিত্র মাঝে ফুটে উঠেছে, তা' নিরীহ হিন্দুর চক্ষে বড়ই উৎকট ঠেক্‌বে; যেহেতু ঋতুভেদে জীব বিশেষের যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়—নর নারীর মধ্যে এইরূপ প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলাটা আমরা সাহেবদের মত অত সহজে নিতে পাচ্ছি না। কিন্তু এই ব্যাপারে লেখক স্বভাবকে অতিক্রম করে কারু গ্লানি করতে লেখনী ধারন করেন নাই—তা স্পষ্টই বোঝা যায় এজন্য তৎসম্বন্ধে আমাদের বলবার কিছুই নেই।

শুভার্থী

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

গত ১৯২৫ ইং ১লা জানুয়ারী হইতে গোকুলের জ্বর আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বেই প্রায় দুই বৎসর বা ততোধিক কাল ধরিয়া তাহার প্রায়ই অল্প জ্বর হইত।

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া কেহ বা ম্যালেরিয়া কেহ বা অক্তের দোষ বলিয়া মাঝে মাঝে চিকিৎসা করেন। তাহাতে গোকুল কখনও একটু ভাল থাকিত, কখনও আবার শয্যা লইত। সঙ্গে সঙ্গে পিঠে একটা অসহ্য বেদনা অনুভব করিত। এই অবস্থায়ও গোকুল রীতিমত ঠিক সময়ে কল্লোলের জন্য 'পথিক' উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলি লিখিয়া আসিয়াছে। বইখানি সম্পূর্ণ লেখা ছিল না, মাসে মাসে নূতন করিয়া সব লিখিতে হইত।

১লা জানুয়ারী যে জ্বর হইল তাহাতে তাহাকে একেবারে বিছানায় পড়িয়া থাকিতে হইল। কয়েক দিন পরেই রক্তবমি আরম্ভ হইল এবং পরীক্ষা দ্বারা যক্ষা রোগ বলিয়া স্থির হইল। এই সময়ের ঠিক পূর্ব্বেই গোকুল জ্বর লইয়া "জঁা ক্রিস্তফের" অনেকখানি অনুবাদ করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহাও তাহার দায়িত্ববোধের পরিচয়। এই দুরারোগ্য ব্যাধির সময় তাহাকে একান্ত প্রশান্ত ও সহনশীল দেখিয়াছি। এমন ভাল রোগী খুব কমই দেখিয়াছি। কল্লোলের সমস্ত বন্ধুগণ গোকুলের এই অসুখের সময় অক্লান্ত পরিচর্য্যায় তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছিল। নিজেদের জীবন তুচ্ছ করিয়া এই সব যুবক তাহাদের প্রিয় সহচরকে বাঁচাইয়া তুলিতে একটুও দ্বিধা করে নাই। গোকুল তাহাদের প্রতি ভক্তি বিনম্র চক্ষে চাহিয়া থাকিত। এই অসুখে পড়িয়াও তাহার কল্লোলের ভাবনা। গোকুলের দাদা কালিদাস বাবু, দুই ভগ্নী ও ভাগিনেয় প্রভৃতি গোকুলের সেবায় নিজেদের সমস্ত সামর্থ্য নিয়োগ করিয়াছিলেন। গোকুল থাকিত তখন তাহার বড় ভগ্নীর বাড়িতে—শিবপুরে। কিন্তু এই দূরে আসিয়াও গোকুলের সমস্ত বন্ধু আত্মীয় আত্মীয়া পরিচিতা মহিলারা প্রায়ই দেখিয়া যাইতেন। ঈশ্বরের করুণায় গোকুল এইবার যেন রক্ষা পাইল। ক্রমেই তাহার শরীর একটু ভাল হইতে লাগিল। ক্ষুধা বাড়িল, হজম করিবার শক্তি বাড়িল। ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ নবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ জ্যোতিপ্রকাশ সরকার, দার্জ্জিলিং-এর ডাক্তার শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার পাল মহাশয়গণের পরামর্শে গোকুলকে দার্জ্জিলিং পাঠান স্থির হইল!

শিশির বাবু ভ্রাতৃস্নেহে গোকুলকে দার্জ্জিলিং-এ রাখিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমেই তাহার শরীর সুস্থ হইতে লাগিল। তাহার ওজনও কিছু বাড়িল। যখন বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া চলিতে পারিল তখন ইক্‌মিক কুকারে ও ষ্টোভে নিজেই নিজের জন্য কিছু কিছু তরকারি প্রভৃতি রান্না করিয়া লইত। ইহাতে তাহার মনও ভাল থাকিত। দার্জ্জিলিং-এ বহু পরিবার

তাহার একান্ত আপন হইয়া গিয়াছিল। সেখানেও কতজন ভগ্নী, মা, ভাই হইয়া গেলেন। তাঁহারা মাঝে মাঝে নিজ হাতে রান্না করিয়া গোকুলের জন্ত মিষ্টি ও তরকারি পাঠাইতেন। গোকুল অত্যন্ত কৃতজ্ঞ অন্তরে এই সব দান গ্রহণ করিত। ঐ সময়ে যিনি যেটুকু ছোট চিঠিও তাহাকে লিখিয়া পাঠাইতেন, গোকুল অতি যত্নে তাহা তুলিয়া রাখিত। এই গুলিই যেন তাহার ধন রত্ন। অনেকে তাহাকে নিয়মিত ফুল পাঠাইতেন, ফুল দিয়া তাহার ঘর সাজাইয়া দিতেন, গোকুলের চিঠিতে তাহারও সংবাদ পাইতাম। মানুষের প্রতি এমন কৃতজ্ঞতাবোধ অতি অল্প লোকেরই দেখি।

এই কোমল হৃদয়ে যে নির্ভীক সত্যনিষ্ঠ মানুষ নিরন্তর জাগিয়া থাকিত তাহাও আশ্চর্য্য। নিজের আদর্শ ও নিজে যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছে তাহা নিজ জীবনে প্রকাশ করিতে ও প্রতিষ্ঠিত করিতে গোকুল একদিনের জন্তও কুণ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। সে জন্ত যাহা দুর্ভোগ সহিতে হইয়াছে, তাহা অকাতরে সহ্য করিয়াছে। কোনও দিন তাহা লইয়া আক্রোশ দেখায় নাই বা দুঃখ প্রকাশ করে নাই। চুপ করিয়া থাকাটা তাহার যেন স্বভাবেরই মূল। অনেক সময় তাহার আত্মীয় স্বজনরাও তাহাকে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না বা ভুল বুঝিতেন। তাহার জন্ত কাহারও কষ্ট হইবে, কাহাকেও অসুবিধায় পড়িতে হইবে তাহা জানিয়া কাহাকেও কষ্টে ফেলা তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব ছিল।

গোকুলের গলার স্বরে একটা আন্তরিকতা প্রকাশ পাইত। শুধু উহা কণ্ঠের ধ্বনি বলিয়া মনে হইত না। তাহার গান শুনিয়াও তাহাই মনে হইত। কণ্ঠস্বর খুব সুন্দর না হইলেও তাহার গানে এমন একটা গম্ভীর সুর ধ্বনিয়া উঠিত যে, তাহাতে শ্রোতার মনকে একান্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। গোকুল যখন বেহালা বাজাইত তখনও অত্যন্ত মনোযোগের সহিত বাজাইত। বাজাইতে বাজাইতে গায়কের মুখের দিকে মুগ্ধ চোখে চাহিয়া থাকিত।

কল্লোল প্রকাশিত হইবার কিছুকাল পরে বলিয়াছিল, আমি আর ছবি আঁকব না, এবার থেকে লিখ্‌ব। আমার মনে হচ্ছে, ভাষার ভিতর দিয়ে ছবি আঁকাই আমার ভাল হবে।

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর ডাঃ শিশির বাবু কালিদাস বাবুকে পত্রদ্বারা জানান যে, গোকুলের অসুখ বাড়িয়াছে, কাহারও দার্জ্জিলিং যাওয়া প্রয়োজন। সেই চিঠি পাইয়াই কালিদাস বাবু আমাকে ১৫ই তারিখে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দার্জ্জিলিং

পাঠাইয়া দেন। তখন দারুণ বর্ষা, রেল-পথ বন্ধ, পাহাড় ভাঙিয়া পথ ধসিয়া গিয়াছে। কার্শিয়াং পর্য্যন্ত যাইয়া দুইদিন সেখানে বাস করিতে হইল। তখনই মনে হইল, এত বাধা কেন আসে। যাইবার কোনও উপায় নাই, অথচ যাহার জন্ত আসিলাম তাহার কাছে যাইতে বিলম্ব হইতেছে! দুইদিন পরে কয়েকজন সঙ্গী লইয়া হাটিয়া দার্জ্জিলিং রওয়ানা হওয়া গেল। পথ অত্যন্ত দুর্গম ছিল, দার্জ্জিলিং পৌছিতে প্রায় বার ঘণ্টা লাগিল। আমি গিয়া পৌছিলাম ১৮ই তারিখে। গোকুলের সঙ্গে দেখা হইতে সে আমার হাতখানি তাহার কপালে রাখিয়া বলিল, দুর্দ্দিনে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, ভাবছিলাম আবার এই দুর্দ্দিনে যদি তোমার সঙ্গে দেখা না হয়।

কলিকাতার প্রত্যেক বন্ধু বান্ধবের কথা খুঁটিয়া খুঁটিয়া জানিয়া লইল।

সেই দিনই ডাক্তার সাহেবকে দেখান হয়। গোকুলের তখন আমাশয়ের মত হইয়াছিল, এবং গলায় একটা ঘা ছিল।

ডাক্তার সাহেবের ব্যবস্থা মতই ঔষধ পত্র ও পথ্য চলিতে লাগিল।

দুইটি নার্সও রাখিতে হইয়াছিল। নার্সদের সে মাতৃ সম্বোধনে আপন করিয়া লইল। পাহাড়ী নিরক্ষর সেবিকা দুইটি পুত্রস্নেহে তাহার সেবা করিতে লাগিলেন।

আমি গিয়াও যে চেহারা দেখিয়াছিলাম দুই একদিনের মধ্যেই সে চেহারা একেবারে বদলাইয়া গেল। গাল ভাঙিয়া পড়িল, দেহ অস্থিচর্ম্মসার। তবুও মুখ প্রফুল্ল, কথায় চাহনিতে সেই স্নিগ্ধতা জড়িত।

২২শে তারিখের রাত্রি অনেকক্ষণ অবধি জীবনের অনেক কাহিনী, অবিদিত অনেক সংবাদ বলিয়া যাইতে লাগিল। আমি প্রথমটা বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু সে নিজমুখে যখন বলিল, মৃত্যু-পথযাত্রীর কথাগুলি শেষ করতে দাও। আমার অনেক শান্তি হবে।—আমি তখন আর বাধা দেওয়া উচিত বোধ করিলাম না। কথা শেষ করিয়া আমার হাত লইয়া তাহার ললাটে স্পর্শ করাইল। তাহার পর নিজেই বলিল, Peace, Peace, আমার এখন খুব শান্তি। তুমি আস আমি বড্ড চাইছিলাম, বেশী ক'রে লিখ্‌তে পারি নি, কিন্তু বড় ইচ্ছে করছিল তুমি আস।

তারপর হইতেই সে রাত্রি সে খুব ভাল ঘুমায়।

সকালে জাগিয়া বলিল, বহুকাল পরে এমন ঘুম ঘুমালাম।

দুপুরে কয়েকবার জিজ্ঞাসা করিল, দাদা এলেন না?

আমি যখন বলিলাম, আজ সন্ধ্যেবেলা পৌঁছুবেন, তখন খুব আশ্বস্ত হইয়া চোখ বুজিল। সন্ধ্যা ছয়টায় কালিদাস বাবু পৌঁছিলেন। দুই ভাই, দুই সুখ দুঃখের সাথীতে সে কি এক দুঃসহ মুহূর্ত্তে দৃষ্টি বিনিময় হইল।

গোকুল একবার মাত্র কাঁপিয়া উঠিল। কালিদাস বাবু সংযত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

তাহার পর সেই রাত্রে (বুধবার) দাদাকে কাছে ডাকিয়া তাঁহার হাত লইয়া কপালে রাখিল এবং প্রায় আবেগরুদ্ধকণ্ঠে একবার মাত্র ডাকিল, দাদা!

তাহার পর হইতেই প্রায় আচ্ছন্ন অবস্থাতেই সমস্ত রাত্রি কাটিল। মুখের চেহারা দেখিয়া মনে হইতেছিল, দারুণ যন্ত্রণায় তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। কিন্তু তবুও সহনশীল এই মানুষটি একেবারে চুপ করিয়াই ছিল। মাঝে মাঝে প্রলাপের মত অতি ধীরে কিছু কিছু কথা বলিতেছিল।

সকালের দিকেও সামান্য জ্ঞান ছিল। নাম ধরিয়া ডাকিলে বুঝিতে পারিত। সকাল বেলা কয়েকজন আত্মীয় ও বন্ধুরা তাহাকে দেখিতে যান্। তাঁহাদেরই সম্মুখে, তাঁহাদেরই মাঝখানে গোকুল অতি ধীরে শেষ নিঃশ্বাসটি ফেলিয়া স্তিমিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টি যেন কোন্ দূর পথের দিকে চাহিয়া আছে।

উপস্থিত অনেকেই তখনও বুঝিতে পারেন নাই, সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

দার্জ্জিলিং-এর বন্ধুরাই পথিকের দেহ বহন করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গ দেখিয়া তাহার যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহা মনে করিয়া মনে হয় বুঝি ভালই হইয়াছে। ঐ তুষার ধবল পথ বাহিয়াই পথিক তাহার আবার যাত্রা সুরু করিল—সুন্দর ও সৌন্দর্য্যের উপাসক পথিক গৌরীশঙ্করের মোহনরঙ্গ দেখিতে দেখিতে অসীমের পথে চলিবে।

তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে যে সকল পত্র ও রচনা পাইয়াছি, তাহারই মধ্যে কয়েকটি এইস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি; সকলগুলি প্রকাশ করা সম্ভব নয় আশা করি ইহা সকলেই বুঝিবেন। অবশ্য এ সকলের অনেকগুলি লেখকদের বিনা অনুমতিতেই ছাপিতেছি। আশা করি তাঁহারা ইহাতে কোনও অপরাধ লইবেন না। গোকুলকে কে কি ভাবে জানিয়াছিলেন তাহারই আভাস দিবার জন্য আমি এইগুলি প্রকাশ করিলাম।

...আমি নিজে জীবনে এত আঘাত পেয়েছি যে, সবটা সহজভাবে নেওয়া যেন হয় অভ্যাস হয়ে গেছে। তবু, ত্রিশ বছরের বেশী যে সুখদুঃখের সাথী ছিল তাকে হারিয়ে

মত বড় একটা ফাঁকা বোধ করছি—আশা এই যে, আমাদের দিনও এগিয়ে আস্‌ছে—তার বেশী দিন বইতে হবে না।

কালিদাস

...গোকুল আমার আর দার্জ্জিলিং-এ নাই! আমাদের যে এইকণটি হিন্দুসমাজের একটি শুভক্ষণ। আগমনীর বাজনা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই যে তার বিসর্জ্জন হয়ে গেছে; শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে মানুষ কত আনন্দ করছে, ঠিক্ সেই সময় আমরা আমাদের স্নেহের মণি মাতৃপিতৃহীন ভাইটিকে চিরদিনের মত হারিয়েছি। ...মায়ের সন্তান মা নিজে এসে কোলে তুলে নিয়ে গেছেন—আরত ভাব্‌বার কিছুই নাই।...

দিদিমণি

...আমাদের ছেড়ে গোকুল ভাইটি চলে গেল একথা যে কিছুতেই ভাবতে পারছি না। ...এ কি ভগবানের বিচার? যাদের দ্বারা জগতের উপকার হবে তাদের দিকেই ভগবানের নজর! ভাল হয়েও ভাল হোল না, এমনি করে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল গোকুল! মনে করেছিলাম তোমাদের নিয়ে জীবনের দুঃখ কাটিয়ে যাব, ভগবানের সহ্য হল না।...

অতসী

দুঃখ সম্ভাষণমেতৎ,

হঠাৎ একদিন 'পথিকের' একটুখানি অংশ চোখে পড়াতেই—'কল্লোলের' গ্রাহিকা হবার আমার প্রবল ইচ্ছা হয় এবং সেই থেকেই গোকুলবাবুর লেখার আমি খুব বেশী পক্ষপাতী। আজ হঠাৎ তাঁরই মৃত্যুর খবর পেয়ে বড় অনুতপ্ত হলুম।

অনন্তের যাত্রীর দুদিনের ঠিকানায় রইল—'পথিকই' বাতি জেলে।...

আমি যত কাগজ নিয়ে থাকি তার মধ্যে 'কল্লোলই' আমার সবচেয়ে বেশী আদরের—এবং তাই তার এই ক্ষতিতে আজ আমার আন্তরিক দুঃখ ও সহানুভূতি জানাচ্ছি।

শ্রীঅদিতি দেবী

কিছুদিন পূর্ব্বে গোকুলবাবুর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। তিনি একজন দরদী সাহিত্যিক ছিলেন, বন্ধুত্বের সৌভাগ্য না হইলেও নানারূপেই তাঁহার প্রাণটির পরিচয় পাইয়াছিলাম।...

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

কল্লোলের সহকারী সম্পাদক বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সেবক শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ মহাশয়ের অতর্কিত মৃত্যুর সংবাদে আমরা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হলুম।

তাঁর সমস্ত বইগুলি পড়ার সৌভাগ্য আমার হয় নি তবু যে কয়টি পড়েছি এবং তাঁর সহকারীতায় আপনার যে পত্রিকাখানি মাসান্তে আমার পড়বার সৌভাগ্য হয়েছে তাতে করে তাঁর শক্তির পরিচয় পেয়ে আমরা কত যে আনন্দিতা হয়েছিলুম তা শুধু মাত্র আমরাই

জানি। বঙ্গভাষা যে তাঁর মত শক্তিশালী পূজারীর পূজা হারাল, সে বঙ্গভারতীর দুর্ভাগ্য। ...ঈশ্বরের নিকট তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।...

শ্রীবিমলা দেবী

জয়পুর

আজ 'কল্লোল' আপিসে আপনার চিঠি পড়েছি। বিজয়ার পর অনেকেই দেখা করতে এসেছিলেন, চোখের জল ফেলে ফিরে গেলেন। মনে হয়েছিল একবার যত বড় বিপদ কাটিয়ে উঠেছে, এবারকার এ বিপদও ধীরে ধীরে কেটে যাবে। বড় কষ্ট পেয়ে সে চলে গেল, সব কষ্টের শেষ...তাকে বড় শান্তি দিয়েছেন। আর সে নেই এই কথাই চারিদিক থেকে বুঝিয়ে দিচ্ছে, বড় অসহায় মনে হচ্ছে। এ অবস্থায় বেশ বুঝ্‌ছি কতখানি শক্তি সে ছিল।...

শ্রীসতীপ্রসাদ সেন

...মনে হয় যাকে হারালুম তার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও যেন অনেকটা হারিয়ে বসে আছি।...ভাবি, প্রাণ ভরে বাঁচ্‌তে চাই না বলেই কি মরণ এমন নিষ্ঠুর উপহাস ক'রে যায়? জীবনে যে ক'টি সামান্য দিন, যে ক'টি অপূর্ব্বক্ষণ ওঁর সংসর্গে পেয়েছিলুম তাকে প্রাণভরে উপভোগ করি নি কেন,......।

ওঁকে প্রথম দেখি আমি ফুলের দোকানে। ওঁর প্রাণটি ফুলের মতই কোমল পবিত্র ও সুগন্ধি ছিল। জীবনে উনি একটি নিদারুণ ও নিবিড় দুঃখ সন্তানস্নেহে লালন করতেন। কিন্তু সে দুঃখটি, কোনও দিন উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেখান্ নি।...আমি তাই আপনাদের দুজনকে প্রাণভরে বিশ্বাস করতাম। কতদিন...মনে করে ভেবেছি—এই দুটি আহত দুঃখী বন্ধুকে দুঃখ সুন্দর উদার ও মহান্ করে তুলেছে।

কোনও অস্বচ্ছতা, নির্বীর্য্যতা, সঙ্কীর্ণতা বা অনৌদার্য্য ওঁদের নেই।...আকাশকে ওরা চিনেছে।...কিন্তু আজ সমস্ত প্রাণ দিয়ে বল্‌তে চাইছি,তাকে এমন ক'রে এই অকাল সন্ধ্যায় যেতে দিতে চাই নি। মনে হচ্ছে এখনো ওঁকে ডেকে আন্‌তে পারি? কিন্তু কোথায় ওঁকে রাখব?...দুঃখ ওঁকে সুন্দর একটি সংযম, দৃঢ় একটি ধৈর্য্য ও নিবিড় একটি প্রশান্তি দান করেছিল। আনন্দের ঘনতাই ছিল এই দুঃখের প্রাণ।

...যেখানে মানুষ ভালবাস্‌ল সেখানে সে অহঙ্কার ক'রে বল্‌ল, মৃত্যুকে আমি বাঁচিয়ে রাখ্‌ব চোখের জলে।...'কল্লোল' সেই চোখের জলের কল্লোল।...উনি মনে মনে খাঁটি দরদী সাহিত্যানুরাগী ছিলেন, শিল্প ছিল ওঁর জীবনের হৃৎপিণ্ড, তাই উনি ছিলেন চিরসুন্দর। অসুখের সময়ও উনি আমাকে একটি "Black Prince" গোলাপ উপহার দিয়েছিলেন। উনি আমাকে চিঠিতে আশীর্ব্বাদ ক'রে পাঠিয়েছিলেন—'তোমার শূন্যতা মরুভূমির চেয়েও নিদারুণ হোক্!'......

শ্রীঅচিন্ত্য সেনগুপ্ত

...কাল তোমার চিঠিতে যে দুঃসংবাদ পেলুম তাতে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।... এ জীবনে অনেকের সংস্রবেই এসেছি, হয় ত ভবিষ্যতেও আস্‌ব কিন্তু মনের মধ্যে এত বড়

...কাজে রেখে কেউ যেতে পারে নি, পারবেও না।...তাঁর কাছ থেকে যে স্নেহ, যে প্রীতি নিঃশেষে পেয়েছি, তা অমূল্য, দুর্লভ।...তাঁর কাছ থেকে যা পেয়েছি, যতটুকু পেয়েছি, আমাদের জীবনে তার সুপ্রতিষ্ঠা করতে পারলেই সে আমাদের মধ্যে অমর হয়ে থাকবে।......

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

গোকুলচন্দ্র আর এ জগতে নাই—মনে হোল এ হ'তে পারে না—এ মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দিই। কিন্তু তাও যে অসম্ভব...।

...দুদিন আগে কে জানত যে সাহিত্য জগতে এই একজন প্রথম শ্রেণীর 'পথিক' এত শীঘ্র তাঁর পথচলা চিরকালের জন্য থামাবেন? দুদিন আগে কে ভাব্‌তে পেরেছিল যে, নির্মম অদৃষ্ট-দেবতা গোকুলচন্দ্রের ভক্ত, অনুরক্ত পাঠক পাঠিকাদের হৃদয়ে একটা 'ব্যথার প্রদীপ' জেলে রেখে তাঁকে হঠাৎ একদিন ছিনিয়ে নেবে।

শ্রীবিভূতিভূষণ রায়চৌধুরী

ঢাকা

...আজ এই প্রথম শুন্‌লাম যেজ মামাবাবু নেই। এ খবর সহ্য করবার মত ক্ষমতা আমার আছে......।

আমার একটা আনন্দ হচ্ছে যে, সাধারণ ভাবেই তাঁকে আমার বিজয়ার প্রণাম জানিয়ে ছিলাম—তখন তিনি কোন্ পথে......

জগৎবন্ধু

ঝর্‌বে না আঁখি জল

শ্রীজগৎবন্ধু মিত্র

যাও নাই আছ তুমি চেতনায়,
তাই কভু কাঁদিব না বেদনায়।
চলে গেছ বিচ্ছেদ-ছেদনে?
মিছে কথা! বেঁধে গেছ দৃঢ়তর বাঁধনে।
ধূলা ভরা যে সীমার বন্ধে
বাঁধিবারে চেয়েছিলে বিচ্ছেদ ও দ্বন্দ্বে;
আজ তারা অসীমের সুরে
ধ্বনি পা'ল চির প্রেমানন্দে।

'কল্লোলে' বড় ভালবাসতে—
যত কিছু বুজরুকি অনাচার
দিত বুঝি বুকে তব ব্যথা তার ;
তাই ব্যথী রেখে গেলে হুঙ্কার
'কল্লোল'-পাতে পাতে বেদনার।
ব্যথা ছিল তাই এত হাসতে।

শিখি নাই, ওগো গুরু, কাঁদতে,
শিখায়েছ ভাঙ্গাবুক বাঁধতে।
কত ব্যথা বইলে,
কত ঝড় সইলে,
হাসিমুখে জীবনের ব্যর্থতা সয়েছ ;
তাই মোর অশ্রুরে বেঁধেছ।

আজ শুনি পিছে রাখি বান্ধববর্গে
চলে গেলে কোন্ দূর স্বর্গে।
মিছে কথা নহ তুমি উদাসী,
নহ তুমি স্বর্গের প্রবাসী
এত ভাল বাসতে যে ধরায়
তার সব সুধা কিগো নিমিষে হারায় ?

যাও নাই, দরদী, স্বপনের পুরে ;
গেছ বুঝি সেই কোন্ দূরে,
যেথা প্রিয়া প্রেয়সীর লাগি
যুগ যুগ আছে চেয়ে পথে আঁখি রাখি।



যৌবন-পথিক

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

তুমি নব-বসন্তের সুরভিত দক্ষিণ বাতাস
ক্ষণতরে বিকম্পিত করি' গেলে বাণীর কানন,
অসীমের বক্ষ' পরে ফেলি' গেলে একটি নিঃশ্বাস,
কুসুমের সুষমায় স্নিগ্ধসুধা করি' নিবেদন।
চিরন্তন্ যৌবনের অন্তরঙ্গ আনন্দ প্রতিমা,
প্রথম ফাল্গুনে তুমি জাগাইলে সুখ-শিহরণ,
হাসির তরঙ্গ দিয়ে ধৌত করি' ব্যথার নীলিমা
উৎসবান্তে জীবনের শূন্যপাত্র করিলে বর্জ্জন।
মৃত্যুমাঝে বিরচিলে অন্তরের অপূর্ব্ব 'মাধুরী'
স্বপন-পুরীর মধু-মাধুর্য্য-সম্পদ করি চুরি।
হে চির-পথিক-বন্ধু, মৃত্যুহীন অমৃত-সন্ধানী,
রক্ত দিয়ে লিখে গেলে পরিপূর্ণ 'পথিকের' বাণী।

দুরন্ত প্রাণের তব চঞ্চলতা হ'ল অবসান,
অন্তর সঞ্চিত-সুধা অনাদিরে দিয়ে গেলে দান।



প্রেতপুরী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

শুয়ে আছি তোমার সকাশে—
ক্লান্তদেহ, নেত্রে তবু নিদ্রা নাহি আসে।
হেরিতেছি মদ্যসম আরক্তিম তব ওষ্ঠাধরে—
পিপাসার শুষ্ক মরু'পরে,
ক্ষণে-ক্ষণে খেলিতেছে একটুকু হাস্য-মরীচিকা।
—যেন কত শতাব্দীর অনির্ব্বাণ শিখা
পাষাণ-প্রেয়সী মুখে হয়নি বিলীন!
আজও ক্ষীণ রেখা তার হেরি' উদাসীন
তরুণ চারণ কবি—বাউল প্রেমিক!—
ধূলি-ঝড়ে দিগ্বিদিক
অন্ধ যবে, পুরাতন পুরীর চত্বরে
এমনি সে হাসি যেন নিবে আসে রূপসীর অধর-পাথরে!
যেন আর মনে নাই ধরণীর কোনো দুঃখ-সুখ,—
গীত আর লালসার মদালসে তবু তার হেসে ওঠে মুখ!

কত দিন-রজনীর—কত বরষের
প্রেমিকের চাটুবাণী, অন্তহীন ছলনার ফের
দিব্যজ্ঞান দানিল তোমায়?
আশা নাই, তবু তব পিপাসার অবধি কোথায়!
এমনি ভাবিতেছিনু, কহি নাই কিছু—
সহসা হেরিনু, কারা চলিয়াছে আগু আর পিছু,
—বিগতদিনের তব অগণিত হৃদয়-বল্লভ
করিবারে বাসনার বাসন্তী-উৎসব

তব দেহ-ভোগবতী তীরে !—
আমারি মতন তারা পতি ছিল অন্তরে বাহিরে ?
তারা বুঝি হেরিয়াছে অচতুরা বালিকার রতি-বিহ্বলতা—
শঙ্কাহীনা নবীনার নব নব পাতকের কীর্ত্তিকুশলতা !

হেরি' উরসের যুগ্ম যৌবন-মঞ্জরী
যে-অনল সর্ব্ব-অঙ্গে শিরায় সঞ্চরি'
মর্ম্মগ্রন্থি মোর
দাহ করি', গড়ে পুনঃ সোহাগের স্নেহ-হেম-ডোর—
সে অনল-পরশের আশে
মোর মত দেখি তারা ঘুরে' ঘুরে' আসে তব পাশে !
বিলোল কবরী আর নীবিবন্ধ মাঝে
পেলব বঙ্কিম ঠাঁই যেথা যত রাজে—
খুঁজিয়া লয়েছে তারা সর্ব্ব-অগ্রে ব্যগ্র জনে-জনে,
অতনুর তনু-তীর্থে—লাবণ্যের লীলা-নিকেতনে !
যত কিছু আদর সোহাগ—
শেষ করে' গেছে তারা ! মোর অনুরাগ,
চুম্বন, আশ্লেষ—সে যে তাহাদেরি পুরাতন রীতি,
বহু কৃত প্রণয়ের হীন অনুকৃতি !
—জানি, আমি জানি,
সেদিনও যে এসেছিল মোর মত প্রেম-অভিমানী—
লয়ে তারও চুলগুলি
এমনি করেছে খেলা চম্পক-অঙ্গুলি ;
আছিল কি আছিল না সে জন সুন্দর,
সে কথায় দিত না উত্তর—
বৃথা এ জিজ্ঞাসা !
এমনি ছলনা করি' কেড়েছিলে নিত্য নব-নাগরের
মিথ্যা ভালোবাসা !

আজি এ নিশায়—
মনে হয়, তারা সব রহিয়াছে ঘেরিয়া তোমায় !
তোমার প্রণয়ী, মোর সতীর্থ যে তারা !
যত কিছু পান করি রূপরসধারা—
তারা পান করিয়াছে আগে,
সর্ব্ব শেষভাগে
তাদেরি প্রসাদ যেন ভুঞ্জিতেছি, হায় !
নাহি হেন ফুল-ফল কামনার কল্প-লতিকায়,
যার' পরে পড়ে নাই আর কারো দশনের দাগ,
—আর কেহ হরে নাই যাহার পরাগ !
ওগো কাম-বধূ !
বল, বল, অনুচ্ছিষ্ট আছে আর এতটুকু মধু ?—
রেখেছ কি আমার লাগিয়া সযতনে
মনো-মঞ্জুষায় তব পিরীতির অরূপ-রতনে ?
আর কোনো অভিনব প্রেমের চাতুরী—
মন্দবিষ মোহের মাধুরী ?
অন্তরের অন্তঃপুরে সুনির্জ্জন পূজার আগার
আছে হেন—আর কেহ করে নাই আজও অধিকার ?
কারো স্মৃতি দাঁড়াবে না দু'বাহু পসারি'—
প্রবেশিব যবে সেথা পান্থ আমি প্রেমের পূজারী ?

আমারও মিটেছে সাধ,
চিত্তে মোর নামিয়াছে বহুজন-তৃপ্তি-অবসাদ !
তাই যবে চাই তোমাপানে,—
দেখি ওই অনাবৃত দেহের শ্মশানে
প্রতি ঠাঁই আছে কোনো কামনার সদ্য-বলিদান !
চুম্বনের চিতাভস্ম, অনঙ্গের অঙ্গার-নিশান !
বাঁধিবারে যাই বাহুপাশে—
অমনি নয়নে মোর কত মৌনী ছায়া-মূর্ত্তি ভাসে !

—দিকে দিকে প্রেতের প্রহরা !
ওগো নারী, অনিন্দিত কান্তি তব !—মরি মরি, রূপের পসরা !
তবু মনে হয়,
ও সুন্দর স্বর্গখানি প্রেতের আলয় !
কামনা-অঙ্কুশ-ঘাতে যেই পুনঃ হইনু বিকল,
অমনি বাহুতে কারা পরায় শিকল !
তীব্র সুখ-শিহরণে ফুকারিয়া উঠি যবে মৃদু আর্ত্তনাদে—
নীরব নিশীথে কারা হাহাস্বরে উচ্চকণ্ঠে কাঁদে !*



* মার্কিণ-কবি George Sylvester Viereck-এর অনুভাবে।

ঝরা-ফুল

শ্রীনীলিমা বসু

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

—পাঁচ—

শীতের রাত্রি। পরিষ্কার আকাশে পূর্ণিমার চাঁদটিকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। এত ঠাণ্ডাতেও রেণু তাহার পাশের জানলা বন্ধ করে নাই। ইহা তাহার জেদ বলিলেও চলে; সকলে যাহা করিবে তাহার উল্টাটি না করিতে পারিলে, রেণুর তাহা কিছুতেই ভাল লাগে না। জানালার পথে চাঁদের পানে সে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল, গায়ের লেপটাকে টানিয়া ভাল করিয়া গায়ে দিতে দিতে, আস্তে ডাকিল—এই প্রভা, ঘুমুলি নাকি?—কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ধীরে ধীরে লেপের তলা হইতে একখানি হাত বাহির করিয়া প্রভার গায়ে ঠেলা দিয়া পুনরায় ডাকিল—প্রভা ঘুমিয়েছিস্?

এইবার সাড়া না পাইয়া বুঝিতে পারিল প্রভা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আবার তাহার চঞ্চল চক্ষু দুইটাকে স্থির করিয়া চাঁদের দিকে চাহিয়া রহিল। ঘুম আজ তাহার চোখ হইতে কে যেন হরণ করিয়া লইয়াছে। একা একা অনেক কথা তাহার মনের মধ্যে আনাগোনা করিতে লাগিল। তাহার স্কুলে আসার কথা, প্রিয়দির কথা, প্রভার কথা সমস্তই তাহার মনে পড়িল। বাস্তবিক! প্রিয়-দিকে সে কি করিয়া এত ভালবাসিল? প্রভা তাহার বন্ধু, সহপাঠী, তাহার কাছে প্রাণের সব কথা বলিয়া সে তৃপ্তি পায়, কিন্তু প্রিয়-দিকে একদিন না দেখিলে, একবেলা তাঁহার সেবা করিতে না পারিলে এত দুঃখ হয় কেন? নিজের হাতে তাঁহার বিছানা পাতিয়া, ঘর ঝাঁট দিয়া, জলের কুঁজাটিতে জল ধরিয়া, টেবিলের উপর ফুলদানিতে নিত্য নতুন ফুল সাজাইতে কত আনন্দ! কত উৎসাহ! বাক্সের কাপড়গুলি যতবার প্রিয়দি এলোমেলো করিয়া ফেলেন, ততবার সে একটি একটি করিয়া তুলিয়া গুছাইয়া রাখে, ছেঁড়া কাপড় পরিপাটী করিয়া সেলাই করিয়া রাখে, এতটুকু ত্রুটী সে করে না। বড় ভালবাসে তার প্রিয়-দিকে।—একদিন সন্ধ্যাবেলা মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে প্রিয়-দি সম্বন্ধে প্রভার সঙ্গে কথা

হইতেছিল ; প্রভা বলিয়াছিল, 'সত্যি রেণু, এটা তোর অত্যন্ত বাড়াবাড়ি, এত মেয়ে রয়েচে তোর মত এমন পাগল হতে তো কাউকে দেখিনি। যেদি প্রিয়-দি এ স্কুল ছেড়ে চলে যাবেন, সেদিন তোর কি উপায় হবে তা আমি ভেবে পাই না!' এটাও সত্যি কথা, উনি যদি চলিয়া যান! আ না হোক্, কাল না হোক্, দু'মাস পর অথবা আরও ছমাস ; তা হলে—বক্ষ ভে করিয়া রেণুর একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। মনের মধ্যে তাহার কেবা কহিতে লাগিল—তা হলে—তা হলে ?—তাহা হইলে সে এক মুহূর্ত্তও এ প্রাচীর ঘেরা প্রকাণ্ড বাড়ীটার ধরা বাঁধা নিয়মের মধ্যে থাকিতে পারিবে না।

রাত অনেক হইয়া গেল, চোখে ঘুম নাই। এত বড় হলটায় পঞ্চাশ বা জন মেয়ে অকাতরে ঘুমাইতেছে।......ঐ কোণে কে যেন ঘুমের ঘোরে আবোল তাবোল কত কি কহিয়া যাইতেছে, আবার খানিক পরে একটি ছোট মে কাঁদিয়া উঠিল......। আকাশে চাঁদ অনেকটা সরিয়া গিয়াছে, তাহাকে আ দেখা যায় না, কেবল খানিকটা জ্যোৎস্না তাহার পায়ের দিক্‌কার লেপের উপ আসিয়া পড়িয়াছে। ওমা—ওকি! অনেক দূরে যেন কতকগুলো মানুষে কান্না শোনা যাইতেছে, কাহার যেন সর্ব্বনাশ হইল! এত রাত্রে—হাঁা, ঐ তে বল হরি হরি বোল! দেয়ালের গায়ে বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল আবার সেই মর্ম্মভেদী চীৎকার,—বল হরি, হরি বোল! রেণুর গা-টা শিহরিয় উঠিল, আগাগোড়া লেপটাকে মুড়ে দিয়া, চোখ দুইটাকে দুই হাতে চাপিয়া নিঃসাড়ে পড়িয়া রহিল। পাশে ঘুমন্ত প্রভাকে ডাকিতেও তাহার গলা দিয়া স্ব বাহির হইল না।

—ছয়—

১৫ই মার্চ্চ রবিবার, রেণুর প্রিয়-দির জন্মদিন। রেণু সকাল হইতে তাঁহার ঘর সাজাইতে ব্যস্ত ছিল। মনের মত করিয়া না সাজান পর্য্যন্ত সে কোন মতেই স্বস্তি পাইতেছিল না।

সকালে স্নানের পর, নূতন লাল চওড়া পেড়ে একখানি দিশী সাড়ী পরিয়া, ভিজা চুলগুলি পিঠের উপর এলাইয়া দিয়া প্রিয়-দি যখন নীচের মাঠে কয়েকজন টীচারের সহিত বেড়াইতেছিলেন, তখন রেণু বার বার উপরের ঘর হইতে অবাক হইয়া তাঁহাকে দেখিতেছিল ; এ যেন আজ নূতনরূপে তাহার কাছে দেখা দিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে ঠিক এমনি ধারা সুন্দর যেন সে প্রিয়-দিকে আর কখনও দেখে নাই। তাই একবার রেণু ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া প্রভার হাত ধরিয়া

একরূপ টানিয়া প্রিয়-দির বেড্-রুমের জানলার ধারে আনিয়া উপস্থিত করিল, বলিল,—দেখ্ প্রভা মাঠের দিকে চেয়ে, কী সুন্দর দেখাচ্ছে ভাই আমার প্রিয়-দিকে! বল্ তুই, সত্যি না?

প্রভা মৃদু হাসিয়া কহিল,—হাঁ, বেশ দেখাচ্ছে।

—ভাল করে বল্ প্রভা। ওঁকে দেখলে কে ভাল না বেসে থাকতে পারে আজ;—কেবল তুই ছাড়া! দেখছিস্ তো মধুলোভে মৌমাছির দল চব্বিশ ঘণ্টা ঘিরেই আছে।

প্রভা আর একবার নীচের মাঠের দিকে তাকাইয়া দেখিল। রেণুর অত্যধিক পাগলামী প্রভার সহ্য হইতেছিল না। একটু বিরক্ত ভাবেই কহিল,—আচ্ছা রেণু, পড়াশোনা তো অনেকদিনই প্রায় ছেড়ে দিয়েছিস্, খাওয়া নাওয়াও কি ছাড়বি নাকি? দশটা বেজে গেল স্নান করবি কখন?,

বন্ধুর ভর্ৎসনায় রেণু একটু লজ্জিত হইয়া, ঘরের কোণ হইতে ঝাঁটাটা বাহির করিয়া ঝাঁট দিতে দিতে বলিল,—এই যে যাচ্ছি প্রভা, রাগ করিস না। ভাই প্রিয়-দির জন্মদিন বলেই ঘরটা একটু পরিষ্কার করে রাখলুম, বিকেলে মালীর কাছ থেকে ফুল এনে পরে সাজান যাবে। এ বেলা এই থাক্—

সন্ধ্যাবেলা যে বাঁধান ষ্টেজটার উপর প্রত্যহ উপাসনা হইয়া থাকে, আজ তাহারই উপর একটি চেয়ারে রেণু সুন্দর করিয়া ফুল দিয়া সাজাইয়াছে। প্রিয়-দির বাক্স খুলিয়া সব চেয়ে দামী ফিরোজা রংএর কাপড়খানা অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া তাঁহাকে পরাইয়া নিজের হাতের সোনার বালা ও গলার সরু হার ছড়াটি তাঁহার হাতে ও গলায় পরাইয়া দিয়াছে। কোন বাধা, কোন আপত্তি আজ সে শোনে নাই। আজ যে তাহার প্রিয়-দির জন্মতিথি, আজ তাঁহাকে মনের মত করিয়া সাজান চাই। প্রিয়-দিকে সাজাইবার আনন্দে রেণু উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

উপাসনা ঘণ্টা পড়িল। সমস্ত মেয়েরা উপাসনার স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, কতকগুলি মেয়ের মাঝে তাড়াহুড়া করিতে গিয়া ডলী সিঁড়ির ধাপে এক আছাড় খাইয়া সামলাইয়া লইল। প্রিয়-দি এখনও আসিতেছেন না দেখিয়া রেণু বার বার দরজার দিকে তাকাইতেছিল, একটু পরেই মিস্ মিত্র, বিভা বোস, মৈত্রী দি, শকুন্তলা-দি পরিবেষ্টিত হইয়া প্রিয়-দি উপাসনা গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রথমটা তিনি সঙ্কুচিত ভাবে সকলের সঙ্গে একত্রে মেজের উপর বসিয়া পড়িলেন। এতগুলি মেয়ে টীচারের সম্মুখে রেণু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেও পারিল না।

লজ্জায়, অভিমানে তাহার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। ক্ষণপূর্ব্বে পড়িয়া যাওয়ার লজ্জায় ডলী এক কোণ ঘেঁসিয়া বসিয়াছিল, এইবার সে হাসিয়া জোর গলায় বলিল, চেয়ারে উঠে বসুন প্রিয়-দি, আপনার জন্যে রেণু এতক্ষণ ধরে সব সাজিয়েছে।

প্রিয়-দি উঠিলেন না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ডলীর কথায় সকলে বার-বার রেণুর মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দরোয়ানকে দিয়া রেণু কিছু মিষ্টি আনাইয়া রাখিয়াছিল। উপাসনান্তে মেয়েদের প্রণামের পর, প্রিয়-দি উপরে উঠিবার পূর্ব্বেই রেণু উঠিয়া গিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা একলা পাইলে পর প্রিয়-দিকে প্রণাম করিবে, সকলের সম্মুখে প্রণাম করিতে গেলে তাহাকে যে আজ নাকাল হইতে হইবে, তাহা সে ভাল করিয়াই জানিত।

উপরের সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া সে শুনিতে পাইল, মৈত্রীদি বলিতেছেন,—চল্ ভাই প্রিয়, আমার ঘরে চল্।

তাঁহারা উপরে আসিতেই রেণু অন্যদিকে সরিয়া গেল। একে একে সমস্ত টীচাররা যখন মৈত্রীদির ঘরে প্রবেশ করিলেন তখন রেণু ধীর পদে আসিয়া দরজার পরদা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া ভিতরের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল।

শকুন্তলা তাহার মোটা দেহ লইয়া বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে পারে না, স্প্রীংএর খাটের উপর দোল খাইয়া বসিয়া পড়িয়া তাহার সনাতন তীক্ষ্ণ স্বরটাকে মোলায়েম করিয়া সুকৃতিকে কহিল—আচ্ছা সুতি বলত, প্রিয়বালাকে দেখলে আজ হিংসে হয় না?

—তা আর বলচো কেন শকুন্তলা?—সে কথা আর বলতে?

সুকৃতির কথায় এক যোগে সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মৈত্রী তাহার বাক্স হইতে খানিকটা গন্ধ প্রিয়বালার গায়ে ঢালিয়া, মাথায় একটি ছোট্ট সোনার ব্রোচ্ উপহার স্বরূপ আঁটিয়া দিয়া কহিল,—বাঃ বাঃ কী সুন্দর দেখাচ্ছে ভাই, কী সুন্দর!—

বিভা বলিল,—সত্যি ভাই, এবার তোদের দুজনের মালাটা বদল হয়ে যাক্ না।—

মৈত্রী ঠোঁট উল্টাইয়া কহিল,—আচ্ছা বিভা, তোর এটা অন্যায় নয়,—

রেণু ঘরের ভিতরকার এই কথাগুলি, তন্ময় হইয়া গিলিতেছিল, এবং মনে মনে অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময় অদূরে ডলীকে দেখিতে পাইয়া

ছুটিয়া পলাইল, পিছন হইতে বারম্বার ডলীর ডাকেও সে ফিরিয়া তাকাইল না। অন্য পথে প্রিয়-দির ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

ফুলদানী হইতে একটি গোলাপ লইয়া তাহার পাপড়ি গুলি বিছানার উপর ছড়াইয়া দিল, মথার বালিসটিতে খানিকটা অগুরু ঢালিয়া দিল। টেবিলের উপরে রেকাবীতে মিষ্টিগুলি সাজাইয়া রেণু বেড্‌রুমে চঞ্চল চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এমন সময় প্রভা আসিয়া কহিল,—কই, চল্—দেখি ঘর কেমন সাজিয়েছিস্?

রেণুর মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, বন্ধুর হাতখানি নিজের হাতের মুঠায় চাপিয়া লইয়া বলিল,—তবু আমার ভাগ্যি—চল্, দেখ্‌বি চল্।

ঘর দেখা শেষ হইলে প্রভা বলিল, শোবার ঘণ্টা পড়লো, শুবিনে?

—একটু পরে শোব ভাই, প্রিয়-দিকে এখনও আমার প্রণাম করাই হয়নি।

প্রভা একাই আসিয়া শুইয়া পড়িল, বন্ধুর কথা তাহার বুকে আঘাত দিতেছিল। রেণু অনেকক্ষণ প্রিয়-দির আশায় বসিয়া রহিল। কিন্তু বন্ধুদের নিকট হইতে আজ প্রিয়-দির সহজে উঠিয়া আসা সম্ভব ছিল না। বেড্‌রুমে মেট্রনের হুম্‌কি কাণে আসিতেই, ব্যর্থ মনে ধীরে ধীরে আসিয়া সে বিছানায় শুইয়া পড়িয়া ডাকিল,—প্রভা, অ প্রভা? রাগ করেছিস্?

অভিমানে প্রভা কোন সাড়া দিল না, চুপ করিয়া ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়া রহিল। রেণু বিছানায় শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, ঘুম কিছুতেই আজ তাহার আসিতেছে না। দূরে মৈত্রী-দির ঘর হইতে তখনও মাঝে মাঝে হাসির কলরব শোনা যাইতেছিল।......

—সাত—

গতরাত্রির কথা প্রভা এখনও ভুলিতে পারে নাই। রেণুর ব্যবহার কাঁটার মত তাহার বুকে ব্যথা দিতেছিল। আজ রেণু যতবার কথা কহিয়াছে, প্রত্যুত্তরে কেবল মাত্র সেই কথাটিরই জবাব দেওয়া ভিন্ন, প্রভা আপনি ডাকিয়া কোন কথা কহে নাই। প্রভা যে এতটা দুঃখ পাইয়াছে রেণু তাহা জানিতে পারে নাই, জানিলে হয়তো বন্ধুর এ মৌনতা ভঙ্গ করিতে সে চেষ্টা করিত।

বিকালে স্কুল হইতে ফিরিয়া, ড্রেসিংরুমে প্রভা কাপড়-জামা ছাড়িতেছিল, ঠিক এমনি সময় রেণুকা আসিয়া জানাইল—প্রভা তোমার ভিজিটর।

—কার?—আমার? প্রভা বিস্ময়াহত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল। সোমবার আজ তো কাহারও আসিবার কথা নয়।

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমার, তোমার; মিস্ মিত্র আমায় বল্লেন।

তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া, টিচারস্ অফিসরুমে গিয়া প্রভা দেখিল তাহার বৃদ্ধ দাদামহাশয় বসিয়া আছেন। প্রভাকে দেখিয়াই তিনি হাসিয়া সংক্ষেপে বলিলেন—চল, তোমায় নিতে এসেছি।

প্রভা অবাক হইয়া কহিল—কেন? এই তো সেদিন বাড়ী থেকে এলুম। বছরের প্রথম এত কামাই হলে চলবে কি করে?—কারুর অসুখ হয়নি তো?

—না গো ছোটগিন্নী অসুখ নয়, এই দেখ মায়ের হুকুম। গিন্নীকে আজ নিয়ে যেতেই হবে। বলিয়া হাসিতে হাসিতে পকেট হইতে তাহার মায়ের একখানি চিঠি বাহির করিয়া কহিলেন—পড়ে দেখ, তারপর কাকে দেখাতে হবে দেখিয়ে ঠিক হয়ে নাও, আমি গাড়ী আনতে যাচ্ছি।

চিঠিখানা তাহার মা, লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিস্ সেনকে লিখিয়াছেন।

—মাননীয়াসু

আমার মেয়ে প্রভাকে দিন দশেকের জন্য আনাতে চাই বিশেষ দরকার, আপনি অনুমতি দিলে বাধিত হবো।

আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করবেন।

নিবেদিকা

শ্রীমৃণালিনী দেবী

চিঠি পড়িয়া প্রভা কিছুই বুঝিতে পারিল না। দাদামহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াও সঠিক জবাব না পাইয়া, তাহার মন অজানা আশঙ্কায় কাঁপিতে লাগিল।

মিস্ সেন চিঠিখানা পড়িয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—যাও। তিনি হয়তো মনে মনে গূঢ় কারণ জানিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং কোনই আপত্তি করিলেন না। কয়েকটি ম্যাট্রিকের মেয়ে সেখানে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

সেখানে অনুমতি পাইয়া প্রভা, দ্রুত রেণুর কাছে গেল। বাড়ী যাইবার সময় বন্ধুর উপর অভিমান করিয়া থাকা তাহার সম্ভব হইল না। সমস্ত ভুলিয়া গিয়া রেণুর কাছে উপস্থিত হইল। রেণু মেট্রনের কাছে তাড়া খাইয়া তখন তাহার কয়েকটা জামা ও কাপড়ে নম্বর দিয়া চিহ্ন করিয়া লইতেছিল। সহসা এমন সময়ে প্রভার যাওয়ার সংবাদে, রেণুর মন খারাপ হইয়া গেল, সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—কবে আবার আসবি প্রভা?

—কি জানি, মা তো দশদিনের জন্য মিস্ সেন কে লিখেছেন।

—তবে সব জিনিষ পত্তর নিয়ে যাচ্ছিস কেন?—আর বুঝি আসবি না?

—আহা, আসবো না কেন?—তুই একেবারে তাড়াতে চাস নাকি? বলিয়া প্রভা হাসিয়া ফেলিল। একটু পরে বলিল—দাদামশায় বল্লেন মা নাকি নিয়ে যেতে বলেছেন, আবার সঙ্গে নিয়ে আসবো।

রেণু নিজের হাতের কাজ ফেলিয়া,প্রভার সব জিনিষ গুছাইয়া দিতে লাগিল। তাহার দুই চোখ ক্ষণে ক্ষণে জলে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। সমবেত সকল মেয়েরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া প্রভাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল—কেন যাচ্ছ ভাই—কেন যাচ্ছ ভাই? আর আসবে না?

ডলী এতক্ষণ সেখানে উপস্থিত ছিল না, এইবার আলুথালু বেশে লাফাইতে লাফাইতে ঘরে ঢুকিয়া, অত্যন্ত ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল—প্রভা বাড়ী যাচ্ছ?

বিছানটা দড়ি দিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে গম্ভীর ভাবে প্রভা বলিল—হ্যাঁ।

—আর আসবে না বুঝি?

প্রভা তাহার কথার কোন জবাব না দিয়া কাজ করিতে লাগিল।

ডলী হাসিতে হাসিতে কহিল—রেণু যে এখনই কান্না জুড়ে দিলে, বন্ধু কি আর আসবে না নাকি?

ডলীর বিদ্রূপে প্রভার অত্যন্ত রাগ হইতেছিল—সে ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল—ডলী,এ তোমার ভারী অন্যায়, কেন তুমি সব সময় জ্বালাতন কর?

দুষ্ট ডলী লজ্জা পাইয়া, বলিতে বলিতে গেল—বাবা, এযে একজনকে মারলে আর একজন কামড়াতে আসে, একেই বলে বন্ধুত্ব।

রেণু সজল নয়নে প্রভার দিকে চহিয়া বলিল,—দেখ্‌লি তো প্রভা? এর পর ওরা যে আমায় কি করবে—

প্রভা চুপ করিয়া রহিল। রেণু কাতর কণ্ঠে কহিল চিঠি লিখিস ভাই—

এমন সময় দরজার বাহিরে বুড়া দরোয়ান হাঁক দিল,—প্রভা বাবা কা গাড়ী আয়া।—

—আট—

—সেদিনকার সেই আচম্‌কা-চলিয়া আসা বিকালটার আট দিন পরেই প্রভার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের কিছুদিন পরে প্রভা তাহার স্বামীর সহিত

পশ্চিমের একটা সহরের ছোট একটি বাংলোতে আসিয়া নূতন সংসার পাতিয়াছে। বাড়ীতে সোমনাথের বহুকালের হিন্দুস্থানী ঝি ছাড়া আর তৃতীয় মানুষ নাই।

তাই প্রভার বড় একা লাগে, বিশেষ করিয়া তুপুর বেলাটি! কিন্তু এমনি করিয়া তুই বৎসর ত কাটিল!

তুপুরের ঐ সময়টা প্রভা রোজ একখানা বই লইয়া বসে। বিগত দিনের কত কথা মনে আসে! যাহাদের ছাড়িয়া আসিয়াছে, তাহাদের কথা ভাবে আবার কবে তাহাদের সহিত দেখা হইবে? হয়ত, আর হইবে না। তাহার চোখ ছলছল করিতে থাকে।

সেই সঙ্গে রেণুর কথাও মনে হয়। সেদিনকার সেই বিকালটার পরে এই আড়াই বৎসরের মধ্যে আর তাহার সহিত দেখা হয় নাই। অথচ রোজই তাহার কথা মনে হয় আর জলে চোখ ভরিয়া আসে।

আজ তুপুরটিতেও সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল রেণুর কথা! রেণুর চিঠি প্রায় তিনমাস আসে না, সাত-আটখানা চিঠি লিখিয়াও কোন জবাব সে পায় নাই,—কি হইল তবে—? রেণু কোথায় আছে, কেমন আছে তাহাও জানিবার উপায় নাই। রেণুর চিন্তা তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল, সে ধীরে ধীরে উঠিয়া আলমারীর দেরাজটা খুলিয়া, তাহার সযত্নে রক্ষিত এই তুই বৎসরের জমান চিঠিগুলি এক এক করিয়া পড়িতে লাগিল।

ভাই প্রভা, শনিবার-জুন-১৯২১

অনেক দিন চুপ করিয়া ছিলাম, আর থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়েছে। তুই কোথায় আছিস ভাই? শ্বশুরবাড়ীর ঠিকানা না জানাতে মামাবাড়ীর ঠিকানায় চিঠি দিচ্ছি। প্রভা, তুই যে আমায় এমন করে ফাঁকি দিয়ে চলে যাবি, তা যদি আগে এতটুকুও জানতে পারতুম তাহ'লে, আমার প্রাণপণ শক্তিতে বাধা দিতে ছাড়তুম না। স্কুলের মেয়েগুলি দিন রাত, আমায় তোর কথা নিয়ে জ্বালাচ্ছে, ওরা তো জানে না ভাই যে, তোর সঙ্গে আমার সঙ্গে সম্পর্কটা কি? মন বড় খারাপ। বিয়ের সময় নিমন্ত্রণ পত্র এমন সময় এসেছিল যে, তখন আমার যাওয়ার কোন উপায় ছিল না। না হলে তোর সঙ্গে একবার শেষ দেখা করে আসতুম।

প্রিয়-দি যেন আজকাল কেমন হয়েছেন, শুনছি তাঁরও নাকি শীঘ্র বিয়ে

হবে। প্রভা! তুই যখন আমায় ছেড়ে গিয়েছিস তখন আমার আর কারও ওপর ভরসা নেই। আজ আর নয়—চিঠি দিস ভাই। তোর চিঠি না পেলে এখানে থাকাই অসম্ভব হবে। আমার আন্তরিক ভালবাসা নে। ইতি

তোর রেণু

স্কুল--শনিবার ১৯২১

ভাই প্রভারাণী!

তোর ছোট্ট চিঠিটা আমায় আনন্দের পরিবর্ত্তে ব্যথাই দিয়েছে। তুই যে আমায় এত শীগ্‌গীর ভুলে যাবি তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। যাক্, তুই নিশ্চয় আনন্দে আছিস, বৃথা চিঠি লিখে তোকে আর বিরক্ত করবো না। গত সপ্তাহে চিঠি দিইনি তার দুটো কারণ আছে,—প্রথম কারণ তোর ছোট চিঠি, দ্বিতীয়—প্রিয়-দির বিয়ে ২৫ শে ঠিক হয়েছে। ভাই, জানিনা প্রিয়-দি চলে গেলে আমি এখানে কি করে থাকবো? তার আগে যদি আমার মরণ হয় তো বেশ হয়। তোদের দুজনকে ছেড়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারবো না। বাবাকে লিখে দেব তাঁর কাছে আমায় নিয়ে যেতে। পড়া-শুনাতেও মন বসে না, কেবল দিন-রাত মনে হয়—'এঁরা কি স্বার্থপর, এঁরা কি স্বার্থপর! জগতে সকলেই নিজের নিজের স্বার্থ খোঁজে, আগে যদি এতটুকুও জানতাম—? প্রভা আর বেশী বাজে বকবো না, তোর সুখের কাঁটা হতে চাই না। আমায় ক্ষমা করিস। ইতি

রেণু

স্কুল—শনিবার ১৯২১

প্রভা ভাই আমার!

অনেক দিন পরে তোর মস্ত চিঠি পেয়ে বেশ ভাল লাগচে। এর আগে তোর চিঠি পাওয়ার আশা করা যে আমার অন্যায় হয়েছিল তা এখন বেশ বুঝতে পাচ্ছি। তোর শ্বশুর বাড়ীর কথা জেনে খুব খুসী হলাম। তুই যেমন লেখাপড়া ভালবাসিস, সেখানেও তোর সে সুবিধে আছে জেনে ভারী আনন্দ হলো। ভাই, প্রার্থনা করি তুই মনের আনন্দে যেন থাকতে পারিস। তোর চিঠিখানা কতবার পড়লুম। এখন আমার এই সঙ্গীহীন অবস্থায় তোর চিঠির কত মূল্য আমার কাছে! শনিবার ছাড়া আমাদের চিঠি লেখার উপায় নাই তা তো জানিস্। আমার ইচ্ছে করে প্রতিদিন বিকেলে বসে তোকে লিখি। প্রভা, প্রিয়-দির বিয়ে হয়ে গেছে আজ দশ দিন। বিয়ের দিন লাল সাড়ী পরে

যখন তিনি মাঠে বিকেলে বসেছিলেন তখন আমি ওপরের বেড্রুম থেকে দেখছিলাম কিন্তু কাছে এগিয়ে যেতে সাহস হয়নি, দূর থেকে মনে হচ্ছিল ঠিক যেন জলন্ত আগুন, কাছে গেলেই পুড়ে মরতে হবে।

এখনও তিনি স্কুলে আসেন বটে তবে রাত্রিতে বাড়ী যান। শুনলাম দিন কয়েকের মধ্যেই একেবারে এখানকার সম্পর্ক ছেড়ে দেবেন। আমি এ কয়দিনের মধ্যে তাঁর সঙ্গে একবারও দেখা করিনি, পালিয়ে বেড়াই সর্ব্বক্ষণ! মনে হয় সামনে গেলে চোখের জল কিছুতেই আর বাধা মানবেনা। তিনি একদিন আমার খোঁজ করেছিলেন। মনের মধ্যে তীব্র ব্যকুলতা থাকলেও বাইরে প্রকাশ করিনি, শুধু কথার জবাব দিয়েই চলে এসেছি। আমার আশা, কল্পনা, উৎসাহ সব কোথায় চলে গেছে। এ রকম করে কতদিন বাঁচবো? এক মুহূর্ত্তও আর এ বোর্ডিং-এ থাকতে ইচ্ছে কচ্ছে না। বাবা চিঠি দিয়েছেন, শীগ্গীরই এসে আমায় নিয়ে যাবেন। তোর সঙ্গে কি এ জীবনে আর আমার দেখা হবে না? আজ বিদায় দে ভাই। ইতি

তোর রেণুকণা

কলিকাতা—১৯২২
স্কুল

আমার আদরের বোন প্রভা!

ভাই, অনেক দিন পর আবার তোর একখানা চিঠি পেলাম, ভেবেছিলাম পুরাণো রেণুকে, পুরাণো বছরের মতই ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিস। কেন তুই ভাই আমার চিঠির উত্তর দিতে এত দেরী করিস বলত? বুঝিস নাকি তোর চিঠির জন্ম আমি কত ব্যগ্র হয়ে থাকি। এখন যে তোর চিঠিই আমার একমাত্র সঙ্গী, সে সঙ্গ থেকে তুই যদি আমায় বঞ্চিত করিস তবে আমি পাগল হয়ে যাবো যে ভাই। সপ্তাহে সপ্তাহে চিঠি পেতে ইচ্ছে করে তোর কাছ থেকে।

ভাই, আজ হলে-এ (Hall) বসে তোর কাছে চিঠি লিখছি আর কঙ্কা-দি পিয়ানো বাজাচ্ছে—আর আমার স্মৃতিপটে অনেক দিন আগেকার একটি দিনের কথা ভেসে উঠছে। সেদিন তুইও আমার পাশে বসে চিঠি লিখছিলি আর আমার প্রিয়-দি পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন! মনে পড়ে তোর, সে দিনটির কথা? পুরাণো দিনের কথা মনে হলে আমি কিছুতেই স্থির হ'তে পারি না, ইচ্ছে হয়

চীৎকার করে কেবল কাঁদি! প্রভা ভাই, প্রিয়-দি আর আসে না। অভিমানে ঠিকানাটাও জিজ্ঞাসা করিনি, এখন দুঃখ হয়। তিনি কি আমায় একখানাও চিঠি দেবেন না? একবারও কি আমার কথা তাঁর মনে হবে না? ভাই, প্রিয়-দির ঘরের দিকে আমি আর তাকাতে পারিনা, ঐ ঘরইতো আগে আমার কাছে স্বর্গ ছিল, কত যত্ন করেছি ঐ ঘর খানাকে, আর এখন লক্ষ্মী অভাবে সে ঘর একেবারে শ্রী-হীন হয়ে আছে।

আমি আসচে সপ্তাহে বাবার কাছে চলে যাচ্ছি, আমার কাকা নিয়ে যাবেন, সেখানকার ঠিকানা পরে দেব। কিছু মনে করিস না লক্ষীটি, তোকে সব জানাতে পারলে তবুও কত তৃপ্তি হয়। তুই ওখানে খুব বেড়াচ্ছিস,—বেশ ভাল কথা। প্রার্থনা করি তুই সুখী হ। ইতি

তোর রেণু

C/o A. C. Chattergee Esq
Craddock Town
নাগপুর—১৯২২
মঙ্গলবার

প্রভা,

আমি আটদিন হলো এখানে এসেছি। তোর চিঠি Ridirected হয়ে এখানে এসেছে। স্কুল থেকে এসেও শান্তি পাচ্ছিনা ভাই। কেন যে আমার এমন হলো বুঝি না। মনে হয় সমস্ত শান্তি, সমস্ত স্ফুর্ত্তি বুঝি সংসার থেকে উবে গেছে; বাড়ীতে কেবল বাবা, কাকা আর আমি, কাকাও দু'চার দিনের মধ্যে চলে যাবেন। কি যে করবো একা, জানি না। প্রিয়-দির খবরও আর পাই নি, বোধ হয় আর পাবও না। জীবনে যাঁকে আঁকড়ে ধরতে গিয়েছিলাম, হঠাৎ সে এমন ধাক্কা দিয়ে চলে গেল ভ্রূক্ষেপও কল্লে না—এখন আমি এই ভগ্ন দেহ মন নিয়ে কি করি বলত? আর বাঁচতে সাধ নেই। আজ বাবার সঙ্গে একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম। বাবা কেবলই বলেন—রেণু তোর মন ভাল নেই কেন, কেন অমন চুপ করে থাকিস? প্রত্যুত্তরে কি যে বলবো খুঁজে পাই না।

তোর চিঠিতে অনেক খবর পেয়ে খুসী হয়েছি, সত্যি তোর চিঠির জন্য আমি একেবারে উন্মুখ হয়ে থাকি। তোদের নূতন সংসারের কথা সব জানতে ইচ্ছে করে, কবে যে তোর মুখখানি দেখবো তাই ভাবি। ভালবাসা নে। ইতি

তোর রেণু

নাগপুর—শুক্রবার

সকাল ৭টা

প্রভা,

আজ ঘুম থেকে উঠেই তোর চিঠির জবাব দিতে বসেছি। তোর কালকের চিঠিটায় বেশ মজার খবর লিখেছিস দেখছি, তাই ভোরে উঠে সব কাজ ফেলে তোকে লিখতে বসলাম। আমাকে তুই উপদেশ দিয়েছিস বিয়ে করতে, ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোকে। একজনকে ভালবেসে আজ আমার এই দুর্দ্দশা হয়েছে, আর কাজ নেই ভাই। আর হবেও না সে সব কোনোদিন, পুরুষদের ওপর আমার কোনকালেই শ্রদ্ধা নেই, তারা যেন আরও অবিশ্বাসী। কাজকি ভাই বিয়ে করে? বেশ তো দিনগুলি চলে যাচ্ছে।

সোমনাথ বাবু কেমন আছেন? তাঁকে আমার চিঠি দেখাস্ না ভাই, হয় তো কি ভাববেন। আমাদের স্কুলের কথা কি সব তাঁর সঙ্গে গল্প করেছিস? সত্যি ভাই প্রভা, এসব কথা তাঁকে বলিস না, বড় লজ্জা পাব তা হলে।

তুই কেমন আছিস? আমার শরীর দিন দিন বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এখন দেখলে তুই কিছুতেই তোর রেণুকে চিনতে পারবি না। অনেক বড় চিঠি হয়ে গেল, আজ এই পর্য্যন্ত—ভালবাসা গ্রহণ করিস। ইতি

তোর রেণু

প্রভা দেরাজ হইতে আরও কতকগুলি চিঠি বাহির করিল। পুরানো চিঠিগুলি পড়িয়া তাহার মনে পুরাণো দিনের কত কথাই না নূতন হইয়া উঠিল।...… এমন সময় তাহার স্বামী সোমনাথ একখানা বড় সাদা খাম আনিয়া প্রভার হাতে দিয়া বলিল,—বোধহয় রেণুর চিঠি, পড়ে দেখত!

সাগ্রহে প্রভা চিঠিখানা লইয়া পড়িতে লাগিল—

নাগপুর—বৃহস্পতিবার

সন্ধ্যা

প্রভা ভাই!

তোর সাত আটখানা চিঠিই আমি পেয়েছি। অসুখে একেবারে শয্যাগত হয়ে পড়েছিলাম, ভেবেছিলাম আর বুঝি আমার উঠতে হবে না, কিন্তু ভগবানের কি ইচ্ছে জানিনা সেরে উঠলাম। তোর সব চিঠিগুলি বাবা যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন, সেদিন সবগুলি দিলেন। অসুখের পরে তোর চিঠিগুলি

খুব আনন্দ দিয়েছে। তাই মানুষ ইচ্ছে করলেই মরতে পারে না, যে যত বেশী মরতে চায়, ভগবান তাকে আরও বেশীদিন বাঁচিয়ে রাখে। তাঁর কি ইচ্ছে জানিনা ভাই। তুই হয়তো এতদিন কি ভাবছিলি, হয় তো অহংকার, নয়তো অন্য কিছু।

তোর শরীর কেমন আছে? শরীর এত দুর্ব্বল যে এতটুকু লিখতেই হাত কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে। আর একটু সেরে উঠলে বড় চিঠি দেব, রাগ করিস না ভাই। আমার ভালবাসা নে। ইতি

তোর রে

চিঠিখানা পড়া শেষ হইলে সোমনাথ ধীরে ধীরে সহানুভূতির কণ্ঠে বলিল,—বেচারী! প্রভা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল - সত্যি!... ...

(সমাপ্ত)



জংলা

শ্রীসুধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

(এক)

জংলার মনটা কিছুতেই ভাল লাগিতেছিল না। স্বরূপ আজ টীলার কোদালির তালে তালে তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া গান ধরিয়াছিল—"তু বড়া বেইমান্, তু' বড়া বেইমান্"। ভাবিয়া পাইল না কি বেইমানী সে তাহার সাথে করিয়াছে। যাহার মুখে একটু মলিন হাসি দেখিলে প্রাণটা হাহাকারে কাঁদিয়া উঠে, তাহার সঙ্গে গেল কিনা সে বেইমানী করিতে। 'দূর, তুই বেদরদী, বদমাস' বলিয়া মনটাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া জংলা উঠিয়া পড়িল।

দিনের আলো ম্লান হইয়া গিয়াছে। ঘোমটা দেওয়া লাজুক বধূর মত সন্ধ্যা অসংখ্য তারার মালা পরিয়া কোন্ অন্তহীন পশ্চিমে প্রিয়তমের গোপন অভিসারে চলিয়াছে। সাঁঝের প্রদীপ জ্বালাইয়া ছোট ভাই ছোক্‌ড়াকে খাওয়াইয়া নিজের ভাত বাড়িয়া জংলা মাত্র পালা লইয়া বসিয়াছে। ভাই আসিয়া বায়না ধরিল, তাহাকে লিয়ে রামলীলায় যেতে হবেক্! এই ছোট ভাইটী তাহার সারা অন্তরটা জুড়িয়া ছিল। তাহার কোন আবদারই ফেলিয়া দিবার সাধ্য ছিল না। তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সারিয়া ভায়ের সাথে রামলীলার হাজির হইল।

পালা সুরু হইল। হনুমানের লেজের বাহার দেখিয়া ছোকড়া তো হাসিয়াই অস্থির। দিদির দিক্ হইতে কিন্তু কোন সাড়াই পাওয়া যাইতেছিল না। জংলা ছটফট করিতেছিল; তাহার মন যেন কাহাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান্ হইয়া পড়িয়াছিল। চোখ দুইটা কেবলই আশেপাশে নাচিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আজ রামলীলার দিনও স্বরূপ আসিয়া তাহাকে সাথী করে নাই। হায়রে, সেদিন আজ কোথায়! অভিমানে তাহার বুকটা ভরিয়া উঠিল।

তখন সীতাহরণের দৃশ্য। সীতা কাঁদিয়া কাঁদিয়া গরুড়ের কাছে তাহার দুর্দশার কাহিনী বলিতেছে। রাবণ একটা লম্ফ দিয়া ধাইয়া আসিয়া তলোয়ারের ঘায়ে গরুড়ের একটা পাখা ছেদন করিয়া ফেলিল। চারিদিকের দর্শকগণ

রাবণের এই জবরদস্ত বীরত্বে একটা অস্ফুট কলরব করিয়া উঠিল। সীতা দ্বিগুণ কাঁদিয়া উঠিল, তাহার স্বর্ণাভরণ পথে পথে ছড়াইয়া দিতে লাগিল। জংলার চোখের পাতা ভারি হইয়া উঠিল—হ্যা রে বেটী দু' দুইটা মরদ তোকে ফেলে চলে গেল? তাই তো তুহার নছীবে এতো দুখ্ আছে। ঠিক সেই সময়ে স্বরূপ উজ্জলীর হাত ধরিয়া তাড়ির নেশায় মশ্‌গুল হইয়া—টলিয়া টলিয়া মণ্ডপে ঢুকিয়া অনর্গল বকিতে লাগিল। চারিদিকের লোকগুলি হা হা করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। জংলার ক্ষুব্ধ দৃষ্টি তাহার উপর গিয়া পড়িল—বাহারে বুর্বক্, আবার তাড়ি খাচ্ছিস্? সেই মেইয়াটাকে সাথে লিয়েছিস? বহুৎআচ্ছা, এবার মজা পাবি।

হিংসায় ও উল্লাসে তাহার চোখ দুইটা জলিয়া উঠিল। জোর করিয়া দৃষ্টি সরাইয়া আনিয়া সে গভীর মনোযোগ দিয়া দৃশ্যাবলী দেখিতে লাগিল। কিছুতেই মনটা শান্ত হইতেছিল না,—আবার উজ্জলীকে লিয়ে তাড়ি খাচ্ছিস্। ব্যস্, একবার দম্ আটকালেই নেশা ছুটে যাবেক্। উজ্জলীর কথা মনে হইতেই কে যেন তাহার বুকটাকে হাতুড়ী দিয়া পিটিয়া পিষিয়া ফেলিল।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল। জংলা উঠিয়া পড়িল—"চ'রে ভেইয়া, আবার ফজিরে পাত্তি তুলতে যেতে হবেক্ "বলিয়া হাত ধরিয়া ভাইকে টানিয়া তুলিল। তখন কুম্ভকর্ণ স্বয়ং দৌড়িয়া আসিয়া আসরে ধপ্ করিয়া শুইয়া পড়িয়া নাক ডাকাইতেছে—আবার মাঝে মাঝে মিট্ মিট্ করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিতেছে অথচ ঢাক ঢোল বাজাইয়া মারিয়া পিটিয়া ও তাহার ঘুমের অবসান হইতেছিল, না—এ হেন বিচিত্র উদ্ভট ব্যাপারটার কোন কূলকিনারাই সে করিতে পারিতেছিল না। এমন সময় বহিন্ তাহাকে ডাকিয়া লইল।

মণ্ডপের কোণে তাড়ির জঘন্য দুর্গন্ধ জমাট হইয়া গিয়াছিল। যাইতে যাইতে একবার সেইদিকে তাকাইয়া জংলার বুকটা একটা অজানা শঙ্কায় ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। স্বরূপ উপুর হইয়া মাটীতে সটান্ পড়িয়া আছে, মুখ দিয়া অবিশ্রাম বমি হইতেছে, তাড়ির বোতল কয়টা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, উজ্জলীও সরিয়া পড়িয়রাছে। নিমিষে সমস্ত অভিমান জল হইয়া গেল। ভাই বোনে ধরা ধরি করিয়া স্বরূপের সংজ্ঞাহীন দেহ তুলিয়া ঘরে লইয়া গেল।

(দুই)

জ্ঞান হওয়া অবধি স্বরূপ ও জংলা আসামের এই মোতিহারী চা বাগানে আছে। বাপ মায়ের কথা তাহাদের মনে পড়ে না। কেবল শিশু ভাইটীকে

বুকে করিয়া ঘর গোছাইয়া, ভিক্ষা করিয়া কত কষ্টে জংলা তাহাকে পালন করিয়াছে। এখন ভাই বোনে পাতি তুলিয়া যে হাজিরা পায়, তাহাতেই স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়। ছোটবেলা হইতেই স্বরূপের সাথে তাহার ভাব। ছোটখাট কত মারপিট, কান্নাকাটি, হাসি খেলার ভিতর দিয়া তাহাদের মধুর শৈশব কাটিয়াছে। তাহার পর কত হাসি গান, কত মান অভিমান তাহাদের কিশোর দিনগুলিকে একটা ঝঙ্কারে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। কোন্ অবসরে যৌবন মলয় প্রাণের আধ-ফোটা কুঁড়িগুলিকে চুপি চুপি ছুঁইয়া গেল। খেলা ধূলা ছাড়িয়া তাহারা চাহিয়া দেখিল, নূতন জীবন, নূতন জগৎ, উদ্দাম আকাঙ্খা, অপরিসীম আনন্দ—আশে পাশে রঙ্‌বেরঙে্‌র হেলা-ফেলা, আকাশ ভরা উৎসবের সমারোহ, আলোকের রোশনাই!

স্বরূপ ডাকিত "পাখী", জংলা ডাকিত "সর্দ্দার।"। কত নামেরই ছড়াছড়ি ছিল। লাইনের বুড়া কুলীরা ঠাট্টা করিয়া বলিত—"তোদের সাদি কবে হবেক্ রে? মোদের আলবৎ পেটভরে মদ খাওয়াতে হবে।" উভয়ের মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিত। একদিন স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"পাখী রে, হামারে সাদি করবিক্ নেই?" জংলা হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে আর কি! হাসি আর থামিতে চায় না। অনেক সাধ্য সাধনায় কহিল—"তোকে সাদি করব না তো যমকে করব নাকি রে? তুই সবুর কর না সর্দ্দার। ভেইয়াকে আগে একটা খপসুরত বহু আনিয়া দিয়ে তবে তো তোকে লিয়ে ঘর করব।" আর কোন দিন স্বরূপ কিছু বলে নাই, মাঝে মাঝে কেবল গান ধরে "জংলা পাখী পোষ না মানে, জংলা পোষা বিষম দায়।" হাজিরা পাইয়াই জংলার জন্ম মান্দ্রাজী সাড়ী, রবারের চুড়ি, গিল্টী করা পায়ের মল, এমন কিছু আনিয়া তাহার হর্ষোজ্জ্বল মুখখানিতে চুম্বন করিয়াই সে খুসী হইত।

উজ্জ্বলী বলিয়া একটা মান্দ্রাজী কুলী যুবতী তাহাকে চুরি করিয়া তাড়ির দোকানে লইয়া যাইত। উজ্জ্বলীর মরদানা নানকু কিছুদিন হইল মারা গিয়াছে। এখনও সে "সাঙ্গা" করে নাই। জংলার সাথে স্বরূপের ভাব দেখিয়া তাহার হাড় জ্বলিয়া যাইত। তাড়ি খাওয়াইয়া মাতাল বানাইয়া স্বরূপকে সে হাত করিতে চেষ্টা করিতেছিল। জংলা টের পাইয়া চোখে চোখে রাখিয়া মাথার "কীরা" দিয়া তাড়ির অভ্যাসটা প্রায় ছাড়াইয়া আনিয়াছিল। উজ্জ্বলী হিংসায় ক্ষেপিয়া উঠিল। একদিন স্বরূপকে ছাড়া পাইয়া তাড়ি খাওয়াইয়া বুঝাইল যে, জংলা সমবয়সীদের কাছে কহিয়া বেড়ায় যে তুই উহার গোলাম হইয়া আছিস,

সে তোকে উহার ভেড়া বানিয়েছে।' স্বরূপ নিঃসঙ্কোচে তাহা বিশ্বাস করিল। জংলার ঘর আর মাড়াইত না, কেবল তাড়ির দোকানে আকণ্ঠ তাড়ি পিয়া মাতাল হইয়া পড়িয়া থাকিত।

(তিন)

আঁকা বাঁকা সরু পথ দিয়া প্রদীপ হাতে জংলা উন্মনা হইয়া চলিয়াছে। কতগুলি বনের পাখী কলরব করিয়া মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। অতীতের কত সুখের স্মৃতি, দুঃখের ব্যথা, রাতের গীতি, কানে কানে আশার বাণী শুনাইতেছিল। তাহার পীড়িত আর্ত্ত-হৃদয় আজ তাহার দয়িতকে বুকের কাছে নিবিড়ভাবে জড়াইয়া পাইয়াছে। একটা দমকা হাওয়া আসিয়া মাটীর প্রদীপটাকে কাঁপাইয়া এলোমেলো হইয়া ছুটিয়া পালাইল। সচেতন হইয়া জংলা কাপড় দিয়া বাতাস বাঁচাইয়া সোনা-ঝিলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। একটা প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ পাতা মেলিয়া গভীর অন্ধকার রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া ঝিমাইতেছিল। তাড়াতাড়ি কাপড়ের খুঁটে বাঁধা সিঁদুর লইয়া গাছের পায়ে গভীর অনুরাগে ছড়াইয়া প্রদীপ রাখিয়া উপুড় হইয়া প্রণাম করিতে গিয়া জংলা কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল—"এ কালীমাইজি, মোর সর্দ্দারকে তুই ভোগাইস্ না, ওই আর তাড়ি খাইবেক্ না, কছম্ করেছে।"

একটা কোড়াল পাখী অকারণে চেঁচাইয়া উঠিল। সাড়া পাইয়া উঠিয়া উর্দ্ধশ্বাসে সে ঘরের পানে ছুটিয়া চলিল। না জানি ভাইটী অসুস্থ স্বরূপকে নিয়া কত অধীর হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে জমাট অন্ধকার। আকাশ গ্রাম খানির মত ঘুমাইতেছে। মাঝে মাঝে এক একটা গাঙচিল চি চি করিয়া ডাকিয়া আবার চুপ করিয়া থাকিতেছে। খানিক পরেই কলঘরের গ্যাসের মৃদু আলো দেখা দিল। শিরিষগাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে উহার শুভ্র আলো-ঝরা শেফালিকার মত ছড়াইয়া আছে। জংলা চলিতে চলিতে ডাক্তারের বাসার সাম্‌নে আসিয়া পড়িল, ভাবিল, একবার ডাক্তারকে নিয়া গেলে হয় না! ডাক্তার তখন সবে একটা মেয়েকে প্রসব করাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। জংলা ডাকিল—

"ডাগ্‌দার বাবু ঘরে আছ?"

"কোন্ হ্যায় রে?"

"আজ্ঞে, হামি জংলা, তিন নম্বর লাইনে ঘর। স্বরূপের জবর বোখার হইছে তুমি দেখবে চল্।"

ডাক্তারের মুখে ক্রুর হাসির রেখা দেখা দিল। বলিল, "তুম্ খাড়া রও, হামি কাপড়াগুলা ছেড়ে আস্‌ছি।" বাবু কাপড় ছাড়িয়া, চা খাইয়া ছড়ি হাতে বাহিরে আসিলেন। জংলা বাতি হাতে আগে আগে চলিল। ডাক্তার তাহার ঘরের নানা কথা খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিল। সে সংক্ষেপে সব কথাগুলির উত্তর দিতেছিল। এই ডাক্তারের কথা তাহার কোন দিন ভাল লাগে নাই। তাহাকে দেখিলেই ডাক্তার হাসিয়া আদর করিত, কত কি ছাই ভস্ম বলিত, সব কিছু সে বুঝিতে পারিত না। চলিতে চলিতে ডাক্তার হটাৎ বলিল—"হ্যারে জংলী স্বরূপ তোর মরদানা আছে রে?" জংলা কথা কহিল না। চুপ করিয়া হাটিতে লাগিল। তাহার বুকের মধ্যে একটা প্রচণ্ড তুফান তোলপাড় করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে সে আড়চোখে পশ্চাতে তাকাইতেছিল। যেন কোন ক্ষুধিত জানোয়ার তাহার পিছু লইয়াছে।

রোগী দেখিয়া ডাক্তার ঔষধ পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া গেলেন—একদাগ মাত্র ঔষধ পাঠান হইবে। খাওয়াইবা মাত্র আরামে ঘুম আসিবে এবং পরদিন প্রাতেই বেশ সুস্থ হইয়া উঠিবে।

(চার)

স্বরূপকে দাওয়াই খাওয়াইয়া ভাইকে ঘুম পাড়াইয়া জংলা প্রিয়তমের শিয়রে আসিয়া বসিল। আজ আর রাঁধাবাড়ি হয় নাই। ভাইবোন অনাহারে দিন কাটাইয়াছে। দুশ্চিন্তায় ও পরিশ্রমে শরীরটা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। চোখ দুইটা টানিয়াও খুলিতে পারিতেছিল না। মেটে বাতিটা আর একটু উস্‌কাইয়া দিয়া স্বরূপের পাশে শুইয়া পড়িল। বেহুসের মত স্বরূপ পড়িয়া আছে। দিনের বেলায় একবার সচেতন হইয়াছিল, কিছুই সে স্মরণ করিতে পারে নাই, খানিকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিয়া আবার মড়ার মত পড়িয়াছিল। অনেক রাত্রিতে জংলা ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল। স্বরূপ স্থির হইয়া শুইয়া ঘুমাইতেছে। বাহিরে মত্ত বাতাস অধীর হইয়া উঠিয়াছে। আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘশিশুগুলি নীড়-হারা পাখীর মত নিরুপায় ভাবে ঘুরিয়া মরিতেছে। জংলা অতীত দিনের সুখ দুঃখের কথা ভাবিতেছিল। এমনি এক বেদলা দিনে স্বরূপ জেদ্ করিয়া তাহার জন্য সোনামুখী পুতির মালা আনিতে পাঁচ ক্রোশ দূরে হাটে গিয়াছিল। রাত্রি হইয়া গেল। ঝড় বৃষ্টির বিরাম নাই, স্বরূপও ঘরে ফিরিল না। কত বার ঘর বাহির

হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া জংলা চোখ ফুলাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। দুপুর রাত্রে স্বরূপ আসিয়া তাহাকে জাগাইল। স্বরূপের বুকে মুখ লুকাইয়া কত অভিমানে সে কাঁদিয়াছিল, কত সোহাগ করিয়া সর্দ্দার তাহার গলায় তিন ছড়া সোনালী মালা পরাইয়া অশ্রু-সিক্ত মুখখানিতে চুম্বন করিয়াছিল। আর একদিন স্বরূপ একরাশ করবী ফুল আনিয়া তাহার আকাশভরা মেঘের মত কাল চুলে পরাইয়া দিয়াছিল। হাত ধরাধরি করিয়া তাহারা জগন্নাথের বাড়ী মেলা দেখিতে স্বরূপ তাহাকে কত খাবার কিনিয়া দিল, আবার রাধা-চক্রে উঠিয়া দুজনায় কত দোল্ খাইল। আরও এমন কতকি সুদূরের স্মৃতি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। হটাৎ একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া স্বরূপ জবা ফুলের মত লাল চক্ষু মেলিয়া চাহিল, যেন কি বলিতে চাহিল, কিন্তু স্বর ফুটিল না, তবু হাঁ করিয়া একটু জল খাইয়া জংলার হাত ধরিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইল। জংলা বড় শঙ্কাকুল হইয়া উঠিল। অসহ্য যাতনায় স্বরূপ ছটফট্ করিতে ছিল। ভোরের সময় কয়েকবার ভেদ বমি হইল; তাহার পর সকল যন্ত্রণার হাত এড়াইয়া পরপারে চলিয়া গেল। জংলা বুঝিতেও পারিল না, সর্দ্দার তাহাকে ফাঁক দিয়া পালাইল।

সারাটা দিন স্তব্ধ হইয়া জংলা দাওয়ায় বসিয়া রহিল—একবার ক্রন্দনাকুল ভাইটীকে ডাকিয়া কাছে লইল না। উদাস দৃষ্টিতে একটা বাঁশের খুঁটী ঠেস দিয়া পচা ডোবার পাশে পুরাতন নিম গাছটার পানে চাহিয়া রহিল। একটু নড়িল না, একবার উঠিল না। মুখ মৃতের মত রক্তহীন, চোখ শুকাইয়া গিয়াছে। বিকাল বেলায় সম-বয়সী কুলীর মেয়ে মঙ্গলী আসিয়া পাশে বসিল কিন্তু জংলার ভাব গতিক দেখিয়া কিছু বলিতে সাহস পাইল না, কাপড়ে বাঁধা দোক্তা ও চুণ বাহির করিয়া চিবাইতে লাগিল। স্বরূপ জংলার কতখানি লইয়া গিয়াছে, কত সাধ চুরমার করিয়া দিয়াছে, সে তাহা জানিত না। বলিল, "কি হয়েছিল রে? হঠাৎ জোয়ান আদমীটা ম'ল।" একটা শুষ্ক উষ্ণ নিঃশ্বাস ফেলিয়া জংলা শুধু একবার মাথা নাড়িল। মঙ্গলী ভালমন্দ কিছুই বুঝিল না, চুপ করিয়া রহিল। হায় রে অবোধ মেয়ে, সেই তপ্ত শ্বাসে কতকগুলি আগুনের ফুল্‌কী ধরিত্রীর বুকে ছড়াইয়া পড়িল, কি দুর্দ্দান্ত ভূমিকম্প তাহার দগ্ধ বুকের পাঁজর গুলিকে ভাঙ্গিয়া ঠেলিয়া বাহির হইবার পথ খুঁজিতেছিল, তুই কি করিয়া বুঝিবি?

ঘরে দীপ জ্বলিয়া উঠিল, দূরে সীতারামের মণ্ডপে সাঁঝের শাঁক বাজিয়া

উঠিল। জংলা আর সহ্য করিতে পারিল না, মঙ্গলীর বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া গলা জড়াইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাহারও মুখে কথা সরিল না, কেবল দুইটী সমবয়সী বেদনাতুর নারীহৃদয় বহুক্ষণ নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। ভাইটী ঘুমাইয়াছে। মঙ্গলী সকাল সকাল খাইয়া আসিয়া জংলার সহিত গলাগলি ধরিয়া শুইয়া ঘুমাইতেছে। জংলার চোখে ঘুম নাই, অনাহারে অনিদ্রায় শরীরে সামর্থ্য নাই, মাথার মধ্যে কতকগুলি এলোথেলো বিষাক্ত চিন্তা সরীসৃপের মত কিল্ বিল্ করিতেছে। কি ভাবিয়া মঙ্গলীর হাতখানি সাবধানে সরাইয়া নিঃশব্দে জংলা উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের কোণে পোঁতা একটা পুরাতন মরচে ধরা বর্শা পাড়িল। কি ভাবিয়া আবার ঘরে ফিরিয়া প্রদীপটা জ্বালাইয়া গলা হইতে রূপার হাস্‌লীটা খুলিয়া লইল এবং পরম স্নেহে ভাইটীর গলায় পরাইয়া দিয়া চুমা খাইয়া আবার তেমনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া পড়িল। মাথার উপরে কাল আকাশ। বাঁশঝাড়গুলি বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া দোলা খাইতেছে। জংলা বাবুদের কোয়ার্টারের দিকে চলিল। হাতে তাহার বর্শা, চোখে হিংসায় আগুন। কাছাকাছি আসিয়া চৌকিদারের হাঁক্ শুনিয়া সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর আবার ঘুরিয়া অন্যপথ ধরিল, আন্‌মনা হইয়া চলিতে চলিতে সেই সোনা ঝিলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল. বুকের মধ্যে নিদারুণ আত্মহত্যা প্রবৃত্তি বাসা বাঁধিয়াছিল, হাতের বর্শাটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আকুল হইয়া বসিয়া বহুক্ষণ কাঁদিতে লাগিল। জীবনের মমতা সে জয় করিয়াছিল কিন্তু ভাইয়ের মমতা তাহাকে টানিতে লাগিল। দিনের বেলায় ডাক্তারের লোক তিনবার আসিয়া তাহাকে প্রলোভন দেখাইয়া জ্বালাতন করিয়া গিয়াছে। অন্ধকারে তাহার চোখদুইটা ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, মাথাটা ভন্ ভন করিয়া ঘুরিতে লাগিল। জংলা উঠিয়া দাঁড়াইল। অশ্বত্থ গাছটীর একটা নীচু ডালে নিজের কাপড় খুলিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিয়া কিছুক্ষণ কি ভাবিল এবং পরক্ষণেই নিজের গলায় অপর প্রান্ত আঁটিয়া "জয় সীতারাম" বলিয়া ঝিলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

নীচে গিরি নির্ঝরিণী সোনাঝিলের উদ্দাম জলরাশি খিল্ খিল্ করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল।



উপন্যাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৯)

জন্মান্তরবাদ কেউ বিশ্বাস করে, কেউ বিশ্বাস করে না। আজও আমি ওর দার্শনিক তত্ত্বটি কি তা জানিনে; হয়ত এ জীবনে এটিকে জানবার অবসর ঠিক হয়ে উঠ্‌বে না!

তবুও দিনকতক যেন কর্ম্মফল,—জন্মান্তর-বাদে আমার বিশ্বাস দাঁড়িয়ে যেতে লাগ্‌লো! কিছুদিন এর বোঝা ব'য়ে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হ'য়ে ফিরে দাঁড়িয়ে মনকে বল্লাম, সত্যই কি তুই আমাকে চিনির বলদ ক'রে ফেল্‌বি রে?

মন বিদ্রূপ ক'রে বল্লে, খালি-পিঠ দেখ্‌লেই যে আমরা তাতে ভূতের বোঝা চাপাই!

বটে! জানো, আমাদের ছুরি আছে? এস ত' দেখি—তোমার কোন্‌-খান্‌টায় পচ্‌ ধরেছে!

আঘাত কঠিন হলে পচ্‌ ধরে,—'কন্ত! অপ্রত্যাশিত হ'লে আঘাত যে বড় কঠিন হয়!

এমনি করে মনকে কেটে-কেটে তার বিশ্লেষণ ক'রে দেখলাম যে জন্মান্তর-বাদ আর কর্ম্মফলের দোহাই দিয়ে মানুষ বিশ্ব রহস্যকে বুঝে ফেলেচি ব'লে মনে ক'রে নিতে চায়।

বুঝতে পারিনি বল্‌তে মানুষের যে বড় লজ্জা; মনও নাছোড়বন্দা, যা' সাম্‌নে আস্‌চে তাকে বুঝতেই হবে—না-বুঝতে পারার অন্ধকারে থাকার আতঙ্কে মন নিজেকে প্রতারণা ক'রে বলে—হাঁ বুঝেচি বইকি! কিন্তু আবার যখন

গরমিল হ'তে থাকে তখন—নূতনতর তত্ত্বের আমদানি ক'রে বলে এইবার অভ্রান্ত ভাবে বুঝেছি; কিন্তু তবুও যখন গোল হ'তে থাকে—তখন বলে—দেখ যা' কিছু ঘটচে—তাতো সব এই জীবনেরই নয়—আগের জন্মে যা'-সব ক'রে এসেচি—তারও ত ফল ভুগ্‌তে হবে! কারণ না'হলে কি কাষ্য হয়! যা ঘটচে—তার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে! এ জীবনে ত কোন অপরাধ করিনি, তবে এই ব্যথা কেন? নিশ্চয়ই পূর্ব্ব-জন্মে অপরাধ করেচি—তারই কর্ম্মফল।

কল্‌কাতায় ফিরে এসে কর্ম্মফল ব'লে যা ধরে নিয়েছিলাম—কঠোর বিচারের পর তাকে ত্যাগ ক'রে দিয়ে—মনকে বল্লুম, কেন যে এমনটি হলো তা জানিনে;—কারণ, আমার অনেকখানিই যে আমার দৃষ্টির অগোচরে—অদৃষ্ট!

দুই আর দুই-এ চার হয় অঙ্ক শাস্ত্র এই কথাই ব'লে খালাস—তার চেয়ে বেশী মাথা ঘামাবার তার দরকার হয় না; কিন্তু জীবনে সব সময়ে দুই আর দুই-এ চার যে হবেই হবে তা কে বল্‌তে পারে?

যে চার হবে ব'লে ব'সে আছে—চার না হলে, তার ব্যথা বড় গভীর; আর যে জানে যে চার হ'লে পরম ভাগ্য—না হওয়াই স্বাভাবিক, সে তিন নিয়েও খুসী হয়!

মানুষের বয়সের সঙ্গে এই অভিজ্ঞতাই বাড়তে থাকে। রাম পিতৃভক্ত ছিলেন, কিন্তু সে কথা নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র কিম্বা সাহজাহানের চলে কৈ?

তাই বোধকরি আমি অদৃষ্টের দোহাই পেড়ে স'রে দাঁড়াতে চেয়েছিলাম; কিন্তু—কম্বলি না ছোড়ে!

পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে কেন? এর কারণ আমাদের পণ্ডিত মশাই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে দুটো বিরোধী শক্তি পৃথিবীর উপর কাজ করচে ব'লে; সূর্য্যের দিকে ফিরে যাবার আকর্ষণ পৃথিবীর আছে এবং সূর্য্য থেকে দূরে পালিয়ে যাবার চেষ্টাও পৃথিবীর আছে; এই দুটো সমান-সমান হয়েচে বলে পৃথিবী ঘাণির বলদের মত কেবলই ঘুরচে—কেবলই ঘুরচে!—আর তাতেই শীত গ্রীষ্ম-বর্ষা, শরৎ-হেমন্ত-বসন্ত হচ্চে।

আমার মনে যেন তাই একটা সংস্কারের মতই দাঁড়িয়ে গেছে!—ঘুরতে দেখ্‌লে তখুনি দুটো শক্তির সম প্রভাব ধরে—ঋতু পরিবর্ত্তনের আশা আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকি!

সেদিন পথে হঠাৎ বলনের সঙ্গে দেখা, তার চুলগুলো উস্কোখুস্কো, চোখ দুটো কোল ব'সে গেছে—আস্তে-আস্তে চলচে।

আরে বদনবাবু যে—একি! এমন চেহারা?

বদন কোন কথা না ব'লে আমার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে যেতে লাগ্‌লো।

ব্যাপার কি? কোথায় টান্‌চ?

আমরা গিয়ে গোলদীঘির ছায়ায় ঘেরা একটি বেঞ্চের উপর ব'সলাম।

তখনো ব্যায়াম-পাগল লোকগুলো জলের চারিদিকে ঘুরতে সুরু করে নি; কবির দলের নিভৃত কোণটিও তর্ক-ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেনি। দীঘির দক্ষিণ পাড়ের প্রকাণ্ড শিরিষ গাছে—লঘু-কেশর ফুল ফুটে চারিদিক যেন আরক্তিম হ'য়ে র'য়েছে—আর তারি পাতার আড়ালে বসন্ত-বুড়ী পাখী যেন বারংবার লোককে বলে দিচ্চে—ওগো তোমরা এখন উদাসীন হয়ে থেকোনা, তাৎ ফুটচে—আর ক'দিন পরেইত বসন্ত বিদায় নেবে!

কিছুক্ষণ চুপ ক'রেই কাটল—তারপর বদন তার মৌণী ভেঙে মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো।

প্রথম কথা—নিশ্চয়ই তুমি আমাদের উপর খুব রাগ ক'রে আছ:

প্রমাণ?

ফিরে এসে একদিন ত' তুমি যাওনি?

তোমাদের বাড়ীতে?

বদন মাথা নেড়ে যেন একটু অধৈর্য্যের সঙ্গে বল্লে—না—না—

তবে?

আহা, উনি যেন কিছুই জানেন না!

কি জানি হে?

কেন, অসুখ করেছিল:

কার?

কার আবার।

বন্ধুম, বদন. তুমি দেখ্‌চি হেঁয়ালি ক'রে কথা কইতে শিখেচ—ব্যাপার কি সত্যি ক'রে বলত?

বদন অন্যদিকে ফিরে বল্লে, আর তুমি যে ক'চি খোকাটি, কিছুই বোঝ না।

কার অসুখ ক'রেছিল?

ইলার। বলতে যেন তার গলা কেঁপে গেল। ইষ্ট দেবতার নাম করতে নেই, জান্‌তুম; কিন্তু সেদিন শিখ্‌লুম যে প্রিয়জনের নাম করেও মানুষের গলা কাঁপে!

সেদিন নিঃসন্দেহে জানলুম যে বদন ইলার প্রতি আসক্ত। ইলাকে ভাল বেসেছে-বলতে পারতুম্ কিন্তু তা বল্লে সত্যি বলা হয় না। আসক্তি আর প্রেমের মধ্যে যেন আকাশ পাতাল তফাৎ দেখতে পাই। আসক্তি লালসা-প্রসূত, একটা অধীর সম্ভোগের তীব্র আকাঙ্খা নিয়ে জাগে, কিন্তু প্রেম তা নয়!—মহাপ্রভু বলেছেন প্রেম—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—তাতে সম্ভোগের লোলুপতা নেই—ত্যাগের গৌরবে প্রেম শান্ত, মহৎ এবং স্নিগ্ধ-সুন্দর। যার মনে তা' জাগে—নব জলধরের মত অসামান্য লাবণ্য এবং কান্তিতে পরিপূর্ণ মধুর হয়ে উঠে!

বদনের চেহারার মধ্যে অধৈর্য্য উগ্রতা এবং একটা দীনতমের ক্ষুধিত-রিক্ততা ছিল—তাই আসক্তি বলেছি।

বদনের অধৈর্য্য আর কোন জিনিষকে গোপন রাখতে দেবে না—সে পরিষ্কার স্বীকারই করলে যে ইলা তাকে ভালবেসেচে। এই উলঙ্গ নির্লজ্জতায় আমি যেন হাঁপিয়ে উঠতে লাগলুম।

শেষে বোধকরি বদনের মনে একটা দাক্ষিণ্যের ভাব এলো, সে বল্লে, দেখো ইলা অনেকবার ক'রে বলে দিয়েছে যে তোমাকে ডেকে নিয়ে যেতে—আমি সময় পাইনি—তাই এতদিন তোমাকে ডাকতে পারিনি; আজ একবার যাবে?

যাবার যে কোন দরকার আছে, বলে ত আমার মনে হয় না, বল্লুম।

বদন বল্লে, ঐ'ত তোমার রাগের কথা; একদিন ত' তুমি গেচ—কেবল দরকার পড়লেই কি যেতে হবে?

সে আমার আঙুল মট্‌কে আদর করতে করতে বল্লে, আজ একবার সন্ধ্যার পর যেয়ো ভাই—আমি তাকে ব'লে রাখব;—ঠিক্ ত?

জানিনে কেন, আমারও যাবার ইচ্ছা হয়েছিল, বল্লুম, দেখ বদন, ঠিক সন্ধ্যার সময় আজ আমি যেতে পারবো না, আমাকে সেই সময় হাওড়াতে এক বন্ধুর বাড়ীতে যেতে হবে, তাকে একটা খবর দিয়ে আসতেই হবে।

তারপরেই যেও।

সে হয়ত অনেক রাত হয়ে যাবে।

তাতে কি?—না, তোমাকে আজ ভাই যেতেই হবে।

বল্লুম, তবে এক কাজ করবো—খাওয়া দাওয়া সেরে—একবার ঘুরে আসবো।

তাই বেশ হবে ; তবে তুমি এখন যাওগে, ব'লে বদন আমার জোর ক'রে হাওড়ার দিকে রওনা ক'রে দিলে।

হাওড়া থেকে ফিরতে রাতই হলো। বন্ধুর মা কিছুতেই ছাড়লেন না—পেট ভ'রে রাত্রের মত লুচি সন্দেশ খাইয়ে দিলে। সমস্তদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর খেয়ে—শুয়ে পড়তে ইচ্ছা হলো। মনে করলাম বাসায় গিয়ে ঘুম দেওয়া যাবে,—ইলাকে দেখ্‌তে কালই যাওয়া যাবে। বাসায় গিয়ে দেখি, বদন বসে আছে।

বল্লুম, বদন আজ আর হয় না—ভারি ক্লান্তি বোধ করচি......

বদন তাড়াতাড়ি বল্লে,—তা হবে না, এই দেখ আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে, ধ'রে নিয়ে যেতে।... সে ঠিক ঐ কথাই আন্দাজ করেচে—তুমি এত দূর থেকে এসে আর যেতে চাইবে না।

নিরুপায় হ'য়ে যেতেই হলো!

ইলা তার ছোট বিছানাটির উপর উদ্‌গ্র প্রতীক্ষায় শুয়ে ছিল। পাশে একখানি ডেক চেয়ারের উপর নিজের হাতের কাজ করা সুজ্‌নি মোড়া!

মিসেস দত্ত আহ্বান ক'রে নিয়ে গিয়ে, কত অনুযোগ করলেন,—ইলার এত অসুখ গেল, তুমি একদিনও এলে না?

আমি যে কিছুই জান্‌তে পারিনি।

তা' কি, তোমার এ বাড়ীর ছায়াও মাড়াতে নেই?

আমি লজ্জায় চুপ ক'রে রইলাম।

চেয়ারটায় বসার পর তিনি ঘরের মধ্যে এসে বল্লেন, তুমি খানিকক্ষণ থাকো—আমি অনেকদিন কোথাও যেতে পারিনি—আজ একটু ঘুরে আসি। উনি থিয়েটার দেখ্‌তে গেছেন—অনেক রাতে আস্‌বেন ... কি বলিস্‌ ইলা?

বেশ ত', যাওনা।

বিরজা বদনকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন।

ইলা আস্তে-আস্তে আমার দিকে সরে এসে বল্লে, বল ত—আজ কতদিন পরে তুমি এলে? তার কণ্ঠস্বর চাপা অভিমান আর অশ্রুতে গদ-গদ।

ঘরের মধ্যে উজ্জ্বল আলো থাক্‌লে হয়ত দু-এক বিন্দু জল চোখের কোণে দেখ্‌তে পাওয়াও যেত।

এ কথার কি উত্তর দেব? জানালার মধ্যে দিয়ে চাঁদ দেখা যাচ্ছিল—আমি

সেই দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম। সেও কিছুক্ষণ কোন কথা কইলে না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌ল, আজ বিকেলে বোধ করি একটু জ্বর হয়েচে—হাত পা জ্বালা করচে, রগ টিপ টিপ করচে। দেখো'তো আমার হাতখানা—ব'লে আমার কোলের মধ্যে হাতখানা এগিয়ে দিলে।

হাতখানি তুলে নিলুম।

ইলা যেন নিজের মনে মনেই বল্লে, আঃ কি মিষ্টি—ঠাণ্ডা হাত দুখানি তোমার—ইচ্ছে করে বুকের মধ্যে নিয়ে বুকটা ঠাণ্ডা করে নি।

বল্লুম, জ্বর নেই, তবে নাড়ি চঞ্চলও বটে দুর্ব্বলও বটে!

তার দুখানা হাতের মধ্যে আমার হাত চেপে ধ'রে বল্লে—আর অসুখ থাক্‌বে না—তুমি যদি আস্‌তে তাহলে কি এত কষ্ট পাই!

আমার লজ্জা করতে লাগলো!

কিছুক্ষণ পরে ইলা বল্লে,—তুমি নিশ্চই আমাকে নির্লজ্জ ব'লে মনে করচো, কিন্তু কি জানি কেন—তোমাকে আমার একটুও লজ্জা করে না, তোমাকে আমার সেই প্রথম দিন থেকে আপনার জন বলে মনে হয়; তুমি বিশ্বাস করবে না—হরিলাল বাবুকে ছাড়া—আর কাউকে তোমার চেয়ে আমার নিকটতম ব'লে মনে হয় না।......

হরিলাল বাবু—কেমন একটা ভেতর থেকে যে কি গভীর স্নেহ করেন—তাতে আমার সমস্ত দেহ মন শান্ত হয়ে যায়, অবাক্ হয়ে যাই, কেন এমন তৃপ্তি আমি তাঁর কাছে পাই—তিনি ত' পর ছাড়া আপনার কেউ নন!......

উঃ তাঁর তুলনায় কি কর্কশ রূঢ় ব্যবহার বাবার! যাক্‌গে।

বল, আমার একটা ইচ্ছে হচ্চে—তুমি রাগ করবে না?

সব তাতে কি রাগই করি, ইলা?

তোমার হাত দুখানা আমাকে দাও।

তাকে দুখানা হাত দিলাম।

হাত দুখানাকে নিয়ে সে অনেক ইতস্ততঃ ক'রে তাতে দুটি মৃদু চুমু মুদ্রিত ক'রে দিয়ে—তার তপ্ত গালের উপর রেখে—বল্লে—আঃ কি আরাম!

হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লুম, পাগ্‌লামি সুরু হলো বুঝি?

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ইলা বল্লে, আহা! তাই যদি সত্য হ'তো!

তার স্বরের মধ্যে গভীর ব্যথার ব্যঞ্জনা ছিল।

খানিকটা চুপ-চাপই কাট্‌ল—তারপর ইলা বল্লে, একটু স'রে এসো—কানে কানে একটা কথা ব'লবো।

বল্লুম, বাড়ীতে তো কেউ নেই, কানে কানে বলবার দরকার ?

তা জানি নে ; কিন্তু সে কথার ধ্বনি বাতাসে বইতে পারে না, তা আমি জানি ;—সে বড় হাল্‌কা বড় পল্‌কা—তা থেকে শব্দ হ'লে নিমেষে সব চুরমার হ'য়ে কোথায় মিলিয়ে যায় !

কান এগিয়ে দিয়ে বল্লুম, বেশ বল—তোমার সেই আজ্‌গুবি কথা।

ইলা কৃত্রিম কান্নার সুরে বল্লে, উঁ—তুমি আমায় ব'কচ—তাহলে আমি বল্‌তে পারবো না।

আচ্ছা বকি নি।

কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে সে চুপি চুপি বল্লে, আজকে আমাকে আদর দাও।

এই কথা শুনে আমার মাথার মধ্যে ঝিম্‌ ঝিম্‌ করতে লাগ্‌লো। নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে, আপনাকে অনেক ধিক্কার দিলাম, মনে মনে বল্লাম,—কি নোংরা মন আমার—সে ত আদর চেয়েচ !

ইলার মাথার উপর হাত বুলিয়ে দিলাম—চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে দিয়ে কত আদর করলাম। সে চুপ ক'রে শুয়ে রইল।

হলো ত ?

না।

তবে ?

তুমি কিছু জান না ; বলে উঠে ব'সে বল্লে, এই দেখ আমি তোমায় দিচ্ছি—বলে আমার মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে—মা যেমন ক'রে ছোট ছেলেকে দোল দেয়—তেমনি করে দোলাতে দোলাতে—তার তপ্ত ওষ্ঠাধর দিয়ে আমার কপোল স্পর্শ করে একটি ছোট শব্দ করলে।

আমার শরীরের একদিক থেকে আর একদিক পর্যান্ত যেন ক্ষোভের তরঙ্গ ঝট্‌কা মেরে গেল ; মনে হলো—বুঝিবা সব পবিত্রতা নিমেষে ময়লা কালো হয়ে যায় !

মাথাটা টেনে নিয়ে বল্লাম, দুষ্টু, এই সব শিখচ ?

সে শুয়ে প'ড়ে বল্লে, ও আমাদের শিখতে হয় না ;—ভালবাসাই আমাদের জীবনের পাথেয়।

ইরার সেদিনের ঐ কথাগুলো—আমার মনের সামনে একটা নূতন জগতের দ্বার উদ্ঘাটন ক'রে দিয়েছিল। মনের নিগূঢ় গুহায় ভালবাসা তপস্যা করে; বিশ্বের যত কিছু কামনার ধনকে তুচ্ছ করে দিয়ে নিজেকে কামনার শ্রেষ্ঠ নিধি ক'রে তুলে একদিন প্রেম আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে চায়,—বলে, আমার যা কিছু সঞ্চয় তুমি নেও, নেও, নেও! প্রেমের এই আত্মোৎসর্গকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখলে মানুষের পাপ হয়। তাকে ছোট করে—আমরা নিজেই খাটো হয়ে যাই!

প্রতি প্রভাতে ফুলগুলি ত' এমনি ক'রে আত্মনিবেদন ক'রে বলে, গন্ধবহ, ভ্রমর,—আমার যা কিছু আছে—তোমরা নিঃশেষ ক'রে নেও। তাই দেখে আমরা ত কৃতার্থ হয়ে যাই! নিরুদ্ধ আনন্দে কবি সেই দান-সাগর যজ্ঞের হোতার আসনে ব'সে যে মন্ত্র রচনা করেন, তারই ঝঙ্কার ত ভারতীর বিশ্ব-বীণার তারে নিয়ত রণিত হচ্চে!

ইলা বল্লে, তুমি বড় শ্রান্ত আজ, আচ্ছা চুপটি ক'রে ঐ চেয়ারের উপর ব'সে একটা গান শুনলে ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে, দেখো তাই বলে ঘুমিয়ে প'ড় না।

আমি চোখ বুজে ইলার গান শুনতে লাগলুম। গানটি আমার মনে নেই কিন্তু গানের ভাব আর কথাগুলো আমার মনে এমন গভীর মুদ্রিত হয়ে গেছে যে, জীবনে ত' কোন দিন ভুলে যাওয়া সম্ভব হবে না! গানের সুরটা সকালের নয়—বিকেলের নয়—যেন সব কালকে আলিঙ্গন ক'রে লতার মত জড়িয়ে জড়িয়ে মহাকালের মাথার উপর পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্যে উধাও হয়ে যাচ্চে।

কোন্ নিভৃতে, কোন্ গোপনে ফুলটি ফুটেছে! সত্যি কথা! লোকচক্ষুর অন্তরালেই প্রেম পুষ্পিত হয়। বহু দিনের অজ্ঞাতবাসের সাধনা তার!

তারপর একদিন দক্ষিণ বায়ু সৌরভে চাঞ্চল্যে সেই নিভৃত নিকুঞ্জটি মাতিয়ে তোলে! তখন অকারণ স্ফূর্তিতে গভীর নিশার কুঞ্জ-ভবন বার বার ক'রে কেঁদে বলে, উৎসব-রাজ, তুমি এসো, তুমি এসো—আজকে তুমি আসবে না? তুমি কোথায় আছ?

বুঝতে পারলুম, ইলার চিত্ত-গহন আজ সেই উৎসব-রাজকে চাচ্চে! এক নিমেষে আমার মনের উপর কিসের যেন বান ডেকে গেল—যেন কোটি চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় সব অন্ধকার আলো হয়ে গেল—সকল অপূর্ণতা পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো!

সুখের আবেশে কেমন ক'রে ঘুম এসে পড়েছে জানি নে। ঘুম ভাঙলে দেখ্‌লাম—ইলার মুখের উপর জ্যোৎস্না এসে পড়েছে—আমার বাঁ হাতখানা বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে সে কিসের স্বপ্ন দেখ্‌ছিল জানি নে।

হাতখানা টেনে নিয়ে বার হয়ে দেখলুম মিসেস্ দত্ত—আর একখানা চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

তিনি আমাকে ডাকেন নি; কিন্তু কি মনে করেছেন—এমনি ক'রে আমাদের ঘুমোতে দেখে!

তখন রাত বারোটা হবে, মিসেস দত্তকে ডাক্‌বো কি না ইতস্তত করচি, এমন সময় বাইরের কড়া গুরু গর্জ্জনে বেজে উঠ্‌লো। হাবুদত্ত যেন ঝড়ের মত এসে পড়লেন।

আমাকে দেখে বল্লেন, তুমি? এত রাত্রে তুমি?

হঠাৎ আমার কোন উত্তর জোগাল না। তাই ত এত রাত পর্য্যন্ত—আমার থাকার কি প্রয়োজন?

বিরজা উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন, কিসের এত কৈফিয়ৎ—ওর ইচ্ছে ও এসেচে—তুমি বুঝি আজকে আবার মদ খেয়েচ?

চুপ ক'রে থাক্ বল্‌চি মাগী;—বলে ভীষণ চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন হাবু দত্ত।

চুপ ক'রে থাক্‌বো তোমার ভয়ে? মাৎলামি করতে ঢুকেচ ভদ্রলোকের বাড়ীতে?

হাবুদত্ত টল্‌তে টল্‌তে—উঠানের কোণ থেকে একটা নর্দ্দমা সাফ করবার ভাঙ্গা বাঁশ তুলে নিয়ে বল্লেন, তোকে হারামজাদি, যদি আজ মেরে খুন না করি ত' আমি এক বাপের বেটা নই।

গোলমাল শুনে ইলা ঘর থেকে বার হ'য়ে এসে হাবুদত্তের সামনে রুখে দাঁড়িয়ে বল্লে, তুমি যদি মা'র গায়ে হাত দেও ত' এখুনি আমি বাড়ী ছেড়ে দু' চোখ যে দিকে নিয়ে যায় চলে যাব।

মন্ত্র মুগ্ধ সাপের মত হাবুদত্ত নিজের বিবরে গিয়ে ঢুকে পড়লেন।

বাসায় ফিরে এসে চুপটি ক'রে ছাদের উপর বসে রইলাম। দক্ষিণে হাওয়ায় পুষ্পিত গাছের মাথাগুলো দুলে দুলে জ্যোৎস্নাকে শত আদর করেও তৃপ্ত হচ্চে না। কোকিল-কোকিলা রেশারেশি ক'রে পঞ্চম থেকে সপ্তমে উঠেও যেন কোথাও সুরের নিবৃত্তি খুঁজে পায় না।

নীচের দিকে, পথের উপর, কুকুরের ডাক, মাতালের গান আর পাহার-াওয়ালার ধমক। হঠাৎ আকাশ থেকে নেমে এসে মনের মধ্যে এই প্রশ্নই বারম্বার উঠ্তে থাকে,—কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা সনাতন ; রসানুভূতির বিমলানন্দ, না—স্থূল বাস্তবের নির্দ্দয় পদাঘাত ?

ক্রমশ



নিকষ কালো আকাশ তলে

শ্রীঅজিতকুমার দত্ত

নিকষ কালো আকাশ তলে শুকতারাটির আলোক ধারায়
একটুখানি পরশ পেয়ে চিত্ত আমার কোথায় হারায়!
বন্ধু তোমার আঁখির তারা
উঠল ফুটে স্বপ্ন পারা,
বিদায়-বেলার অশ্রুমাখা তোমার চোখের স্নিগ্ধ আলো,
আঁধার রাতে শুকতারাতে ফুটল ভালো, ফুটল ভালো।

নিদ্রাবিহীন শুক্লরাতের অশ্রুগাঁথা মালাখানি,
মরণ-পারের মিলনতরে অমর হয়ে রইল জানি।
আমার চিরদিনের আশা,
আমার সকল ভালোবাসা,
হৃদয়ে মোর উথলে-ওঠা বিপুল ব্যথা ব্যাকুলতর—
একটু তোমার পরশ দিয়ে ধন্য কর, ধন্য কর!

মরণ তোমায় মুক্তি দিল, জীবন আমায় রাখল বেঁধে,
মুক্ত হাওয়ার বঁধুর তরে খাঁচার পাখী বেড়ায় কেঁদে।
কবে আমার টুটবে বাঁধন,
পূর্ণ হবে মিলন-সাধন,
সেদিন আমার ওষ্ঠপরে তোমার ঠোঁটের পরশ দিয়ো,
পারিজাতের বিজন বনে—হে মোর প্রিয়, হে মোর প্রিয়!





রমঁ্যা রলাঁ

[অনুবাদক—শ্রীকালিদাস নাগ ও গোকুলচন্দ্র নাগ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যেদিন প্রথম মেলশিয়োর ক্রিসতফকে তন্ময় হইয়া পিয়ানো বাজাইতে আবিষ্কার করে সেদিন তাহার বিস্ময় এবং আনন্দের অন্ত ছিল না। ক্রিসতফ-এর বাজনা শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হইল—কি আশ্চর্য্য! একথা ত আমার একবারও মনে হয় নি!—আমাদের বংশের নাম ও রাখবে—'

মেলশিয়োর-এর ধারণা ছিল ক্রিসতফ তাহার মাতৃকুলের সকলের মত কৃষক-শ্রেণীর মানুষ হইবে কিন্তু সঙ্গীতের প্রতি তাহার অনুরাগ দেখিয়া মেলশিয়োর-এর সে ভ্রম দূর হইল। ভাবিল, ওকে শেখাতে এক পয়সা খরচ হবে না, তারপর ওকে নিয়ে সমস্ত জার্ম্মাণী বা বিদেশে ওর বাজনা শুনিয়ে ঘুরে বেড়ালে উপার্জ্জন মন্দ হবে না। তা ছাড়া ক্রাফট্ বংশের সুনাম ত ছড়িয়ে পড়বেই।

মেলশিয়োর তাহার প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে আপনার মহত্বকে দেখিবার চেষ্টা করে এবং একটু ভাবিলেই সে মহত্বটা আবিষ্কার করিয়া বসে।

নিজের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া সেরাত্রে আহারের পরই আবার মেলশিয়োর ক্রিসতফকে লইয়া পিয়ানো বাজাইতে বসিল। দিনের বেলা মেলশিয়োর যে বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছে, বার বার করিয়া তাহাই ক্রিসতফকে বাজাইতে হইল। ক্রমে শ্রান্তি ও তন্দ্রায় তাহার চোখের পাতা মুদিয়া আসিলে সেরাত্রির মত ক্রিসতফ ছুটি পাইল। কিন্তু পরের দিন সকাল, দুপুর সন্ধ্যা

তিনবার তাহাকে ঐ একই জিনিষ বাজাইতে হইল,তাহার পরের দিনেও ঐ ব্যবস্থা, প্রতিদিন তাহাকে ঐ একই সুর বাজাইতে হয়।

ক্রিস্তফ্-এর মন শ্রান্ত হইয়া আসিল। এই বাজনা তাহার শরীরে যেন বিষ ছড়াইয়া দিতে লাগিল, শেষে আর সে সহ্য করিতে পারিল না, তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

হাতের সমস্ত আঙুলগুলিকে যেন ঘোড়ার মত পিয়ানোর পর্দ্দাগুলির উপর দিয়া ছুটাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। চিরস্থির বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে সচল করিয়া তুলিতে হইবে, কনিষ্ঠ অঙ্গুলি চিরকালই ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া তাহার বড়টিকে জড়াইয়া থাকে, তাহার আড়ষ্টতা ঘুচাইয়া ফেলিতে হইবে—ক্রিস্তফ্-এর এ-সমস্ত অসহ্য বোধ হয়। ইহার মধ্যে কি সৌন্দর্য্য আছে? এই অঙুলের খেলা শিখিতে গিয়া ক্রিস্তফ্ তাহার সুরের কল্পলোকটি হারাইয়া ফেলে, স্বপ্নপুরীর চকিত উন্মুক্ত প্রবেশ-দ্বারটি খুঁজিয়া পায় না . . . ঐ পর্দ্দা এবং আঙুল সাধা তাহার কাছে অত্যন্ত নিরস, বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে লাগে—খাইবার সময় যেমন সর্ব্বদা একই প্রকারের আলোচনা চলে এবং একই প্রকারের রান্না প্রতিদিন খাইতে হয় ইহা যেন তাহা হইতেও শুষ্ক—একঘেয়ে! মেলশিয়োর যে সমস্ত উপদেশ দিত ক্রিস্তফ্ প্রথম প্রথম তাহা অন্যমনস্কভাবে শুনিত। তাহার এই অন্যমনস্কতা সম্বন্ধে তিরস্কার করিলে সে যেমন তেমন করিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। বকুনিকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিল না ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার মেজাজ অত্যন্ত বিশ্রী হইয়া উঠিল।

কিন্তু যেদিন সে শুনিল পাশের ঘরে মেলশিয়োর, তাহাকে লইয়া কি করিতে চায় তাহা বিশদ ভাবে কোন বন্ধুকে বুঝাইয়া বলিতেছে, সেদিন সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে অসহ্য হইয়া উঠিল—ওঃ শুধু এই জন্যে! আমাকে নিয়ে লোকের কাছে পোষ-মানা খেলোয়াড় জানোয়ারের মত দেখিয়ে নিয়ে বেড়াতে চায়—এই বয়সে কতটা সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার জ্ঞান জন্মেছে! তাই শেখাবার এত আগ্রহ? সমস্তদিনে আমার ছুটি নেই—একবার নদীর ধারেও যেতে পাব না . . . কেন সকলে মিলিয়া তাহাকে এমন বিপর্য্যস্ত করিতেছে? বুকের মধ্যে দুর্জ্জয় ক্রোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। স্বাধীনতাকে হারাইয়া তাহার আত্মসম্মানে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছিল। সে প্রতিজ্ঞা করিল, সে আর বাজাইবে না বা যত দূর সম্ভব বিশ্রী করিয়া ভুল করিয়া বাজাইয়া মেলশিয়োরকে নিরুৎসাহ করিয়া দিবে।

হয় ত' ইহা করা অত্যন্ত কঠিন হইবে, তবু যেমন করিয়াই হোক, সে তাহার স্বাধীনতাকে বজায় রাখিবেই।

যথারীতি সে'দিন মেল্‌শিয়োর তাহাকে শিখাইতে আসিলে ক্রিসতফ্‌ তাহার প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিতে আরম্ভ করিল—পর্দ্দার উপর বিষম জোরে হাত চালায়, ভুল করিয়া আঙুল ফেলে, তা দেখিয়া মেল্‌শিয়োর রাগে জ্বলিয়া উঠে চীৎকার করিয়া বকে, কিল চড়ের বৃষ্টি আরম্ভ হয়। কিন্তু বার বার দেখাইয়া দিয়াও কোন উপকার পায় না, মেল্‌শিয়োর-এর কাছে একটি বেশ 'ঘেঁটে' গোছের ভারী ছোট লাঠি ছিল, প্রত্যেকটি ভুল বাজানার সঙ্গে সেটি ক্রিস্‌তফ্‌-এর হাতের আঙুলে আসিয়া পড়িতেছিল এবং ঠিক একই সময়ে চীৎকার করিয়া ক্রিস্‌তফ্‌-এর কানে মেল্‌শিয়োর 'উপদেশ' ঢালিয়া দিতে ছিল। ইহাতে অবশ্য তাহার কানে তালা লাগা ছাড়া বিশেষ ফল লাভ হয় নাই। সেই দারুণ শব্দে ক্রিস্‌তফ্‌-এর মুখের চামড়া অদ্ভুতভাবে বাঁকিয়া কুঁচ্‌কাইয়া এমন সব আকার লইতে ছিল যাহা দেখিতে অত্যন্ত হাস্যোদ্দীপক। সে ঠোঁট কামড়াইয়া কান্না থামাইতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু স্বরগুলি যাহাতে ভুল বাজে সে বিষয়ে সে নির্ম্মম হইয়া হাত চালাইতে লাগিল। ভুলিয়াও একবার ঠিক করিয়া বাজাইল না! এবং ঘুসি বা চড় তাহার মাথার উপরে নামিতেছে মনে হইলেই সে মাথাটিকে লুকাইবার চেষ্টা করিত।

কিন্তু তাহার উপায়টি সে ঠিক বাছিয়া লইতে পারে নাই এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ইহা বেশ বুঝিতে পারিল। মেল্‌শিয়োর ক্রিসতফ্‌-এর 'বাবা,' সুতরাং একগুঁয়েমি যে তাহার মধ্যেও কিছু অধিক পরিমাণেই ছিল ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ক্রিস্‌তফ্‌-এর কানে চীৎকার করিয়া মেল্‌শিয়োর বলিল—যতক্ষণ না সব সুর ঠিক বাজাবি ততক্ষণ তোকে ছাড়্‌ছি না; এর জন্যে যদি দু'দিন, দু'রাত আমার এখানে কাটাতে হয়—সো ভি আচ্ছা।

ইহার পর ক্রিস্‌তফ্‌ বাজাইতে লাগিল কিন্তু সে যে ইচ্ছা করিয়া ভুল বাজাইতেছে তাহা আর গোপন করিবার চেষ্টা করিল না।

ক্রিস্‌তফ্‌-এর সমস্ত দুষ্টামি বুঝিতে আর বাকি রহিল না। মেল্‌শিয়োর দেখিল, ক্রিস্‌তফ্‌ ইচ্ছা করিয়া জোরে জোরে আঙুলগুলি পর্দ্দার এমন জায়গায় আঘাত করিতেছে যাহাতে দুইটি সুর এক সঙ্গে বাজিয়া উঠে—প্রহারের মাত্রাও সেই সঙ্গে 'চড়িয়া' উঠিল।

আঙুলের গাঁঠে গাঁঠে অনবরত আঘাত খাইয়া ক্রিস্‌তফ্‌-এর হাত অবশ

হইয়া গিয়াছিল। দুঃখে তাহার মন ভাঙিয়া পড়িতে ছিল, নিঃশব্দে সে চোখের জল ফেলিতে ছিল, তাহার কণ্ঠ ভেদ করিয়া যে কান্না বাহির হইয়া আসিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল তাহাকে অতি কষ্টে সে থামাইতে ছিল। তাহার মনে হইল, ইহাতেও কোন উপকার হইবে না, তাহাকে পূর্ণ বিদ্রোহী রূপে মেল্‌শিয়োর-এর সম্মুখে মরিয়া হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।—সে সহসা থামিয়া গেল, মাথার উপর যে ঝড়কে ডাকিয়া আনিতেছে তাহার কথা ভাবিয়া সে একবার কাঁপিয়া উঠিল, তাহার পর গম্ভীর এবং নির্ভীক কণ্ঠে বলিল—বাবা, আমি আর বাজাব না।

ক্রোধে মেল্‌শিয়োর-এর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। সে ক্রিস্‌তফ্‌-এর হাত দুইটি ধরিয়া বিপুল বলে তাহাকে ঝাঁকানি দিতে দিতে দাঁতে দাঁতে চাপিয়া বিকৃত কণ্ঠে গর্জ্জিয়া উঠিল—কি—কি বল্‌লি—?

ক্রিস্‌তফ্‌-এর মনে হইতেছিল, এইবার তাহার শরীর হইতে তাহার হাত দু'খানি খসিয়া পড়িবে! তাহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে মেল্‌শিয়োর-এর চড় বা ঘুসি হাত দিয়া আটকাইয়া বলিয়া উঠিতেছিল—আমি আর বাজাব না—আমাকে তুমি খালি খালি মারো, আমার ভাল লাগে না—আর—'

তাহার কথা আর শেষ হইল না, প্রচণ্ড একটি ঘুসি খাইয়া তাহার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিল।

মেল্‌শিয়োর চীৎকার করিয়া উঠিল—মার খেতে তোর ভাল লাগে না, না?—'

সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিস্‌তফ্‌-এর পৃষ্ঠে ঘুসি চড় বর্ষণ হইতে লাগিল। ক্রিস্‌তফ্‌ বাহ্য-জ্ঞান হারাইয়া বলিতে লাগিল—আমি বাজনা ভালবাসি না আমার ভাল লাগে না—

সে মাটিতে পড়িয়া গেল। মেল্‌শিয়োর তাহাকে জোর করিয়া উঠাইয়া চেয়ারে বসাইয়া তাহার হাতের আঙুল পিয়ানোর পর্দ্দায় ঠুকিয়া দিয়া বলিল—তোকে বাজাতেই হবে—

ক্রিস্‌তফ্‌ চীৎকার করিয়া বলিল—আমি বাজাব না—আমায় মেরে ফেললেও না—'

সে দিনের মত মেলশিয়োরকে হার মানিতে হইল। সে ঘাড় ধরিয়া ক্রিস্‌তফ্‌কে উঠাইয়া মারিতে মারিতে তাহাকে ঘরের বাহিরে লইয়া গিয়া

বলিল—তোর খাওয়া বন্ধ—যতদিন না নিভুর্ল ক'রে সমস্ত বাজাতে পার্‌বি ততদিন তোর আমার হাত থেকে নিস্তার নেই—মনে থাকে যেন শূয়ার—'

মেল্‌শিয়োর লাথি মারিয়া ক্রিস্‌তফ্‌কে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

ক্রিস্‌তফ্‌ দেখিল, সে অন্ধকার নোংরা সিঁড়ির উপর আসিয়া পড়িয়াছে। উপরের ছাদের ভাঙ্গা খড়খড়ি দিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া তাহার গায়ে লাগিল। চারিপাশের দেওয়াল বহিয়া বৃষ্টির জল চুঁয়াইয়া পড়িতেছিল। ক্রিস্‌তফ্‌ চিটচিটে সিঁড়ির ধাপের উপর বসিয়া আছে, রাগে ক্ষোভে তাহার সর্ব্ব শরীর ফুলিয়া উঠিতেছে, অর্দ্ধস্ফুট, জড়িত কণ্ঠে সে তাহার পিতাকে উদ্দেশে বলিতে লাগিল—জানোয়ার, নোংরা জানোয়ার—জানোয়ারের অধম—জানোয়ারটা মরে না? কবে মর্‌বে?

তাহার নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিল, ভীত ভাবে সে একবার সিঁড়ির অন্ধকার গহ্বরের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল। মাথার উপরে চাহিয়া দেখিল, সেই আলো আসিবার পথটুকু জুড়িয়া প্রকাণ্ড একটা মাকড়্‌সার জাল রহিয়াছে, এবং সেটা বাতাসে দুলিতেছে! সে আপনাকে আপনারই দুঃখ বেদনার মধ্যে যেন অসহায়ভাবে হারাইয়া যাইতে অনুভব করিতেছিল—কি ভীষণ একাকী সে!... সিঁড়ির নীচে অন্ধকার গহ্বরের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার মনে হইল—যদি এই ওপর থেকে রেলিং ডিঙিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ি গিয়ে ঐ নীচে, কি হয়?—নয় ত ঐ চোরা কুঠরীর জান্‌লা গলে'?... আমাকে এমনি ক'রে মর্‌তে দেখে ঐ জানোয়ারের পাষাণ মন ভেঙে যাবে—খুব কষ্ট পাবে—'

এই কথাটি মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বপ্ন দেখাও সুরু হইল—সে যেন সত্য জানালা টপ্‌কাইয়া নীচে লাফ দিল, তাহার পতনের শব্দও সে যেন শুনিতে পাইল! তাহার পরই উপরের ঘরের দরজা খুলিয়া গেল, কাহারা ব্যথিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—ওগো কি সর্ব্বনাশ হ'ল গো!... ক্রিস্‌তফ্‌, বাপ আমার, মাণিক আমার—ছুটিয়া সকলে সিড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিল, মেল্‌শিয়োর এবং লুইসা তাহার বুকের উপর পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। লুইসা তাহার ক্রন্দনের মধ্যে বলিয়া উঠিল—এ সব ত তোমার দোষেই হ'ল...তুমিই ত ওকে খুন কর্‌লে ... ওগো আমি কোথায় যাব গো—ক্রিস্‌তফ্‌, ও ক্রিস্‌তফ্‌, একটা কথা বল্‌ বাবা—'

মেল্শিয়োর মাটিতে মাথা ঠুকিয়া পাগলের মত হাত পা ছুড়িতে ছুড়িতে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—জানোয়ার, জানোয়ার, সত্যি আমি জানোয়ার—'

এই সমস্ত দৃশ্য তাহার মনে অনেকখানি শান্তি আনিয়া দিল। সকলের প্রতি তাহার মনে করুণার সঞ্চারও হইতেছিল কিন্তু সহসা এই প্রতিশোধটা বেশ উপভোগ করিতে তাহার মন আরম্ভ করিল, সে ভাবিল বেশ হয়েছে, এই শাস্তি ওদের পাওয়াই উচিত।

সহসা তাহার স্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গেল। সে দেখিল অন্ধকার সিঁড়ির উপর সে তেমনি একাকী বসিয়া আছে! নীচের দিকে একবার চাহিল, তাহার আত্মহত্যা করিবার সমস্ত প্রবৃত্তি চলিয়া গিয়াছে। ঐ কথা ভাবিয়া একবার কাঁপিয়া উঠিল এবং পাছে পড়িয়া যায় এই ভয়ে সিড়ির ধার হইতে সে সরিয়া আসিল। আপনাকে খাঁচায় বন্দী-পাখীর মত বলিয়া তাহার মনে হইতে ছিল। তাহার কিছুই করিবার শক্তি নাই, শুধু নিজেকে আঘাত করা বা মাথা কাটানো ছাড়া। সে কাঁদিতে লাগিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ময়লা হাত দিয়া চোখ রগড়াইতে লাগিল। ইহার ফলে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার মুখখানা অতি বদাকার হইয়া উঠিল। এই কান্নার মধ্যেই সে কিন্তু ঐ স্থানটুকুর সমস্ত জিনিষই দেখিয়া লইতে ছিল এবং ইহার মধ্যে বেশ একটু বৈচিত্র্যও সে অনুভব করিতেছিল। সে একবার তাহার কান্না থামাইয়া উপরের জানালার সেই মাকড়শাটিকে দেখিতে লাগিল, সেটি তখন নড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে সে আবার তাহার কান্নার সুর তুলিল, কিন্তু তাহাতে শুধু একটা শব্দ ছিল মাত্র, কান্না ছিল না। আপনার গলার নানা বিচিত্র সুর সে শুনে এবং যেন অভ্যাস মত কাঁদিয়া যায়। আরও কিছুক্ষণ এইভাবে কাটাইয়া চোরা-কুঠরীর জানলাটির দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। সে উঠিয়া আসিয়া জানলার ধারে বসিয়া সেই মাকড়শাটিকে দেখিতে লাগিল। উহাকে দেখিতে তাহার কৌতুহল হয় অথচ ঘৃণাও করে।

—ক্রমশ

শরৎচন্দ্র

(যৌবনে)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

রাজুর আরো একটা বীরত্বের কাহিনী বলি :—

ভাগলপুর সহর হইতে তিন চার মাইল পূর্ব্বে বারারি বলিয়া একটি স্থান আছে। সেখানে কয়েক ঘর জমিদারের বসতি হইতে বাজার স্কুল ইত্যাদি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই স্কুলের একজন শিক্ষক একদিন সাশ্রু-নয়নে রাজুর শরণ গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, মশাই শুনেছি আপনি নাকি দুষ্টের দমন করেন ? আমি একজন সাহেবের অত্যাচারে পীড়িত। আপনার দয়া চাই।

স্কুলের ছুটির পর শিক্ষকটি বারারি হইতে সহরে তাঁহার বাসায় ফিরিতেন। সেই সময়টিতে সাহেবেরা ক্লাবে খেলিতে আসেন। একটি সাহেব প্রায় নিত্যই টম্‌টম্ হাঁকাইয়া যাইতে যাইতে এই শিক্ষকটির পিঠে চাবুক মারিয়া যাইত। ইহা তাহার একটা খেলার মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল।

রাজু প্রতিবিধান করিতে স্বীকৃত হইল। পরদিন ঠিক সেই সময়ে একটা মোটা কাছি লইয়া পাঁচ সাত জন সহচরের সঙ্গে সেইখানে গিয়া হাজির রহিল। সাহেব সে দিনও নিয়মিত ভাবে শিক্ষকের পিঠে চাবুক হাঁকড়াইয়া চলিয়া যাইতেছিল কিন্তু কাছির ফাঁসের মধ্যে হঠাৎ ঘোড়ার পা আবদ্ধ হওয়াতে একটা হৈ রৈ কাণ্ড ঘটিল। ঘোড়া পড়িল—সাহেব এক লম্ফে ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করিবা মাত্র রাজু গিয়া তাহার নাকে ঘুসি মারিয়া বলিল, এই তোমার পুরস্কার। চাবুকের বাঁট ঘুরাইয়া সাহেব রাজুর মাথায় আঘাত করিবার উপক্রম করাতে নীলাম্বর বেমালুম পিছন হইতে তাহা টানিয়া লইল। সাহেব নাকের উপর আরো কয়েকটা ঘুসি খাইয়া বলিল,—বস্ করো—ঠিক হুয়া, বহুৎ হুয়া।

এই অমিত সাহস, যাহা সাবধানতার সুবিবেচনাকে তোয়াক্কা না করিয়া চলে, এবং যাহাকে অবিবেচনা বলা হয়—রাজুর ভিতর পরিপূর্ণ মাত্রায় জীবন্ত

ভাবেই ছিল। এমন মানুষকে লোকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। তাই বোধ করি ইন্দ্রনাথ চরিত্র সর্বজন প্রিয় হইয়াছে।

রাজুর ফুটবল খেলার সখ খুব ছিল; তাহার ভারি ইচ্ছা ছিল যে এমন দল হয় যাহারা এই খেলাটিকে চূড়ান্ত উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারে। কয়েকদিনের জন্য আমি এই দলে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। দলের খেলওয়াড়দের সহিত তাহার ব্যবহার যেমন মধুর তেমনি কঠোর ছিল। দলের সকলকে সে এই উপদেশ দিত যে সর্ব্বান্তঃকরণে না খেলিলে এই খেলা হয় না; এবং তাহার ত্রুটি হইলে দল হইতে বিতাড়িত হইতে একটুও দেরি হইত না।

রাজু যে কোন কাজ করিতে যাইত তাহা এমন চরম সুন্দর করিয়া করিত যে তাহাকে গুরুরূপে স্বীকার করিতেই হইবে। গুণ্ডামিতে সে সবার সেরা ছিল,—সাঁতারে, জিমনাষ্টিকে, ঘুড়ি উড়ানতে তাহার জোড়া ছিল না। কিন্তু লেখা পড়াতে তাই বলিয়া সে কাহারো চেয়ে কম নয়; হাতের লেখা মুক্তার মত, ড্রয়িং-এর হাত পাকা। ছুতোর মিস্ত্রির কাজেও তাহার অসামান্য দক্ষতা! বাঁশী হারমোনিয়ম ক্ল্যারনেট ভালই বাজাইত। কণ্ঠধ্বনি ছিল সুমধুর। অভিনয় করিবার অসাধারণ প্রতিভা ছিল। গভীর রাত্রে আমবাগান হইতে বাঁশী বাজিয়া উঠিত, সবাই জানিত রাজুর অগম্য স্থান নাই, সে সাপের ভয় করিত না—বোধ করি তাহার মৃত্যুভয়ও ছিল না।

কিন্তু যৌবনেই তাহার সন্ন্যাস সুরু হইয়া গেল। তাহার মনে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আসিল। বহির্জগত হইতে বিদায় লইয়া সে মনোজগতে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। গঙ্গার তীরে, শিশু-শ্মশানে একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছের গায়ে নিজে হাতে কাঠের ঘর বাঁধিয়া সে ধ্যান-নিমগ্ন হইল।

সেই ঘরে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না; প্রবেশের পথও ছিল বড় কঠিন; একখানি বাঁশ বাহিয়া উপরে উঠিতে হইত। শুনিয়াছি সেইখানে সে মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরের জ্যোতি দেখিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িত। যাহা দেখিত—একখানি খাতায় তাহা আঁকিয়া রাখিত।

লোকে নানা কথা বলিতে লাগিল। তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া ক্রমে সে মৌনী হইয়া পড়িল। অনশনে দিন কাটিত। বন্ধু-বান্ধব দূরে গেল। কেবল ভালবাসিত শিশুদের—কাছে পাইলে বুকে জড়াইয়া তৃপ্তির আনন্দে অবিরত কাঁদিত।

একদিন সকলে দেখিল, "পাখী উড়ে গেছে সাগরের পার।"
সকল অনুসন্ধান ব্যর্থ করিয়া সে আজ নিরুদ্দেশ !

* * * * *

শরতের জীবনে রাজেন্দ্রনাথের প্রভাবের কথা বলিতে গিয়া এত কথা বলিয়াছি। এই দুই জীবন হইতে দেখা যায় যে এক সময়ে উভয়েই—যাহাকে আমাদের শান্তি-প্রিয়তার চলিত ভাষায় উচ্ছৃঙ্খলতা কিম্বা স্বেচ্ছাচারিতা বলা হয়, তাহারই পথে অগ্রসর হইয়াছিল। কোন কিশোরের জীবনে এমনটি ঘটিতে দেখিলে আমরা সহসা একটা কিছু ঠিক করিয়া বসি, এবং কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলি—তাহার জীবন ব্যর্থ হইবেই হইবে। এ ক্ষেত্রেও তাহার কোন ক্রটি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

রাজেন্দ্রনাথের জীবন সম্বন্ধে জানি না—কি শেষ পরিণতি ঘটিল; কিন্তু শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এই প্রশ্নই বার বার করি, সত্যই কি জীবনটা ব্যর্থ হইয়া গেল ?

এ প্রশ্নের উত্তর দিবার আমার সাধ্য নাই; হয়ত বর্ত্তমানে কেহই ইহার সম্যক উত্তর দিতে পারিবে না। যাঁহারা নানা কারণে হয় ত বা কিছু কিছু দিতেছেন, জানি না তাঁহারা ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত! উত্তরকালে ইহার বিচার করিবার জন্য বহু প্রয়াস হয়ত বা করা হইবে। ব্যক্তিগত বিশেষ মতামতের কতটুকু মূল্য তাহা জানি, তবুও এই কথাই বলিতে ইচ্ছা হয় যে শরৎচন্দ্র জীবনের এই অংশে যে বিচিত্র পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাহা কোন জীবনেরই অবহেলার বস্তু নহে।

বঙ্গ সাহিত্যের রং-মহলের ঘরগুলিতে বিচরণ করিয়া বাহবা দিবার কালে এই কথা মনে না আসাই স্বাভাবিক। বিষপান করিয়া না মরিয়া নীলকণ্ঠ হইতে পারিলে পরে পূজার দালানও তৈয়ারি হয় এবং পূজারির সংখ্যা জুটিতে বেশী বিলম্ব হয় না। কিন্তু বিষপান করিয়া অমর হওয়া দুরূহ ব্যাপার নয় কি ?

* * *

পরীক্ষার ফল বাহির হইল যখন তখন শরৎ বোধকরি ভাগলপুরে ছিল না। মুণ্ডিত মস্তকে একদিন ফিরিয়া আসিল। বোঝা গেল দীর্ঘ কেশ বাবা তারকনাথের জটা-সম্পদের গৌরব বর্দ্ধন করিল। কিন্তু এ কথা সে কোনদিন স্বীকার করিল না, এবং আজো করিবে না। শরতের মাতৃদেবী—আমাদের মেজদিদি, ইহা অকপটে স্বীকার করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে তাহার বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে কেহ-কেহ আজো তাহাকে 'নেড়া' বলিয়া ডাকেন।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা সকল আমাদের জাতীয় অভ্যাসের অনুরূপই ছিল। পরীক্ষাগুলিকে সুকঠিন করিয়া তুলিয়া ছাত্র ফেল করাই যেন তখনকার দিনের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য! অন্তত তাহার প্রভাবের মধ্যে যে যুগ আমাদের জীবনে অতিবাহিত হইয়াছে—তাহাতে ঐ কথা মনে করিয়াই আমাদের চলিতে হইত। পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে মাস কয়েক বারো-চৌদ্দ ঘণ্টা করিয়া কঠোর পরিশ্রম না করিলে উদ্ধারের কোন উপায় ছিল না। সেই সময়ে আদা-জল খাইয়া ছাত্রগণ প্রতারককে প্রতারণা করিবার চেষ্টা করিত। শিক্ষা-দীক্ষার কথা ছাত্রগণ হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চতম কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত কাহারো মনে আসিত কিনা সন্দেহ; পাশের ছাপ পড়িলে তবেই তাহাকে ভাল বলিয়া বিবেচনা করা হইত। অতএব যেন-তেন প্রকারেণ কেবল পাশ করাই ছিল ছাত্র জীবনে একমাত্র কাজ। পাশ করিলে চাকুরি পাওয়া যায়। বাংলা দেশে এমনি করিয়া বহুবৎসর যুবকগণ পাশের আলেয়ার পিছনে ছুটিয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়াছিল। পরাধীন জাতির ইহাও বোধকরি একটি অভিশাপের অন্তর্গত—চরম দুর্ভাগ্যের নিদর্শন।

বাঁধা-গরু ছাড়া পাইলে যেমন চতুষ্পদ তুলিয়া নাচে—পরীক্ষার পর দেশময় এই চার-পায়ের নাচ সুরু হইয়া যাইত। এখনো যে হয় না এমন কথা বলি না। পরীক্ষার পর হইতে ফল বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত দিনগুলা কতকটা দ্বিধায় কাটার জন্য স্ফূর্ত্তিটা পূর্ণাঙ্গ হইতে পারিত না; কিন্তু ফল বাহির হইলে—একদল যেন ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া কি করিবে ভাবিয়া পাইত না, আর একদল ফেলের পদাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া জীবন্মৃত হইয়া থাকিত। বিচারের চেয়ে অবিচার হইত বেশী—তাই তাহার প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা বড় একটা কাহারো ছিল না। জীবিকার পথ উন্মুক্ত হইত বলিয়া তাহাকে ত্যাগ করাও ছিল শক্ত। আশুতোষের সংস্কারের পর এই দোষ সম্পূর্ণ দূর হয় নাই, হইবেও না, যতদিন শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য আমাদের সত্যকার চেষ্টা জাগ্রত না হইবে।

পাশ করার পর শরতের মন দুটি জিনিষে ঝুঁকিয়া ছিল। একটির কথা সকলে জানিত, কিন্তু অপরটির কাজ সম্পূর্ণ গোপনেই চলিত। রাজুর দলে মেশার প্রধান আকর্ষণ ছিল সঙ্গীতের নেশা। এই বয়সে তাহার গান-বাজনার প্রতি টানটা কিছু অসাধারণ বলিয়া মনে পড়ে। তাহার বাঁশী ছিল এবং তাহার দেখা-দেখি আমরাও বাঁশের সস্তা বাঁশী খরিদ করিয়া

'যমুনা পুলিনে বসে' ইত্যাদি বাজাইতে শিখিতে ছিলাম। শরৎ আড্ডায় মিশিয়া গান করিতে ও হারমোনিয়ম বাজাইতে বেশ শিখিয়াছিল।

শুনিয়াছি ভাগলপুর আসিবার পূর্ব্বে সে নাকি দিন কয়েকের জন্য যাত্রার দলে ভর্ত্তি হইয়াছিল। তাহার পক্ষে ইহা কিছু বিচিত্র নয়। গান বাজনার প্রতি টান তাহার সেই সময়ে খুবই প্রবল ছিল। তাহার ইপ্সিত বস্তু হইতে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিবার সাধ্য কাহারো ছিল না।

সে কিছু দিনের জন্য গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিল একথাও সত্য। পায়ে হাঁটিয়া পুরী যাওয়ার কথা বহুবার তাহার নিকট শুনিয়াছি। গ্রামে গ্রামে আতিথ্য স্বীকার করিয়া সে যখন বাড়ী ফিরিয়াছিল তখন তাহার চেহারা এত খারাপ হইয়াছিল যে প্রথমে কেহ নাকি চিনিতেও পারে নাই। এই সময়ে গণিতের অধ্যাপক স্বর্গীয় কে, পি, বোসের পরিবারের সহিত তাহার ঘনিষ্ট পরিচয় হয়।

এই ব্যাপারে—একটি কথাই মনে হয়। এইরূপ ঘর হইতে বাহির হইয়া সে কি কি কষ্টে, কোন কোন বিপদে পড়িয়াছিল তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নয় এবং তাহাতে বিশেষ লাভও নাই। ইহাতে এই কথাই প্রমাণ হয় যে এই বয়সে দুঃখকে বরণ করিয়া লইবার তাহার অকুতো সাহস ছিল। খাইতে পাইব না, কি শুইবার স্থান হইবে না;—এই সকল ক্ষুদ্র চিন্তা তাহার মনে স্থানও পায় নাই। গৃহের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সে আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই।

বাড়ীতে বাঁশীর চর্চ্চা করিবার সুবিধা হইত না। তাই সে সন্ধ্যার পর ঘোষেদের পোড়ো বাড়ীর দোতলার ছাদে বসিয়া প্রায়ই বাঁশী বাজাইত।

এ বাড়ী কিছুদিন পড়িয়া থাকার পর—মানুষ তাহাতে ভূত দেখিতে পাইত। এই ভূতের কাহিনী—এমন সব গম্ভীর প্রকৃতির লোকের মুখে শুনিতাম যে তাহা কিছুতেই অবিশ্বাস করা যায় না। শরৎকে জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়া বলিত—ভূত যে মানে তাকেই ভূতে দেখা দেয়—আমি ভূত টুত মানিনে।

একদিন দুপুর বেলা মুণাই মামা আমাদের যে অন্ধকার ঘরে বন্ধ করিত সেই ঘরের ভিতর হইতে মধুর বাদ্য ধ্বনি শুনিলাম। ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। বিস্ময়ের অবধি রহিল না। শরতের ঘরে গিয়া দেখি সে নাই, মনে হইল—এ তাহারি কাজ। তখন দোরে ধাক্কা দিতে সে দোর খুলিয়া ভিতরে ডাকিয়া বলিল, শিগগীর শিগগীর—ছোটমামা জানতে পারলে মুস্কিল হবে। ভিতরে গিয়া কৌচের উপর বসিয়া শুনিতে লাগিলাম—শরৎ ধীরে ধীরে

একখানি এস্রাজ বাজাইয়া গাহিতে লাগিল; মধুরা বাসিনী মধুর হাসিনী ইত্যাদি। নিমেষে যেন মন্ত্র-মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বুকের মধ্যে আনন্দের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

বাজনা শেষ হইলে বলিলাম—এটা কার শরৎ?

আমার।

কিনেছ?

না।

তবে

লীলা দিয়েছে।

লীলা শরতের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল।

একেবারে দিয়ে দিলে?

হুঁ, শিখতে দিয়েছে।

শরৎ সেইটিকে অন্ধকারের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া বলিল—কাউকে বলিসনে। তোকেও শেখাব।

—ক্রমশ



দুর্য্যোগ

শ্রীযুবনাশ্ব

দোতলা ডেকের রেলিং এর পাশে দাঁড়িয়ে পশ্চাদ্‌গামী জলধারার ভেতর নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম, কখন যে সারাদিনের ডাংপিটে দুরন্ত হাওয়া আসন্ন অন্ধকারের ভয়ে দম্‌ বন্ধ ক'রে একেবারে চুপ হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেচে, টেরও পাই নি।

সচল ও অচল রং বেরং-এর পোঁট্‌লা পুঁটলী সমেত একজন মাঝ-বয়সী যাত্রীর কথায় চমক্‌ ভাঙ্‌ল। লোকটি পানের রসে লাল টক্‌টকে মুখ-বিবর থেকে এক-হাঁ ধোঁয়া ছেড়ে বল্‌ল,—

. . . গোতিক বর সুবিদার না জোগন্নাথ, ঝোরি বিষ্টি আইব মনে লয়। . . . বুচি লো! চুণ দে দেহি এট্টু . . .

সতরঞ্চির ওপর হুঁকো ও গামছা বাঁধা জলতরঙ্গ টিনের তোরঙে ঠেস দিয়ে আজানু গোলাপী পাঞ্জাবী ও তদুপরি নীল ষ্ট্রাইপ্‌ দেওয়া টুইলের গলফ কোট গায়ে একটি বছর সাতাশ আটাশের মদনমোহন শুয়েছিল। বোধ করি তারই নাম জগন্নাথ। সে চট্‌ ক'রে কপালের লতায়িত কেশ গুচ্ছের ওপর হাত বুলিয়ে নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বল্‌লে,—

. . ডাইল! হালায় আপ্‌নের য্যত গাজাখুরী কথা! হুদাহুদী ঝ্যরি আইব ক্যান? আর আহেই যদি হালার ডর কিয়ের? আমরা ত আর হালায় জাইলা ডিঙিতে য্যাইতাছি না!

আকাশের দিকে চেয়ে মনে হ'ল, ঝড় আসা বিচিত্র নয়। সমস্ত আকাশের রং পাংশু-পিঙ্গল, ঈশান কি নৈঋত কি একটা কোণে হিংস্র শ্বাপদের মত একরাশ ঘোর কালো মেঘ শীকারের ওপর লাফিয়ে পড়্‌বার আগের মুহূর্ত্তের মতই ওঁৎ পেতে বসেচে। তীরে গাছের পাতা স্পন্দহীন, কেবল ষ্টীমারের আশ পাশ ঘুরে গাংচীলের ওড়ার আর বিরাম নেই। চারদিকে কেমন একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা থম্‌ থম্‌ করচে।

প্রকৃতির আসন্ন তাণ্ডবের আশঙ্কা যাত্রীদলের মধ্যে সংক্রামিত হ'য়ে গেচে। সবার মুখেই একটা সংহত উদ্বেগের আভাস। আমার মন্দ লাগ্‌ছিল না। দেখাই যাক্।......মাঝপদ্মায় ঝড়ের কথা শুনেচি ঢের, পড়েওচি; কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয়ের যোগাযোগ ঘ'টে ওঠে নি। 'চান্‌স্'টা এবার যদি হ'য়েই যায়, মন্দ কি!

একজন ইজের পরা মাল্লা যাচ্ছিল, সুধোলাম,—

......কিহে বাপু, ঝড় টড় হবে নাকি?

উত্তরে সে কালীমাখা হাত নেড়ে ও দাড়ীর আড়ালে একগাল হেসে, দুর্ব্বোধ্য চাট্‌গেঁয়ে ভাষায় যা' বল্‌লে,—তার অর্থ-বোধ দূরের কথা, মর্ম্ম গ্রহণ ক'রতেই আমার হ'য়ে এল। কিছুক্ষণ ভেবে চিন্তে মনে হ'ল, সে বল্‌চে,......তা' হ'লেও হ'তে পারে। এখন ত তুফানেরই সময়। তবে ডর নাই।

আমি বল্‌লাম,—ভয় ডরের কথা নয়, আদপেই ঝড় হবে কি না, তাই সুধোচ্চি।

খালাসী সাহেব চ'ল্‌তে সুরু ক'রেছিল, কথার জবাব দিল না।

কিন্তু জবাব পেতেও দেরী হ'ল না, যদিও পেলাম একটু নতুন রকমে। খানিক আগের স্থির অচঞ্চল প্রকৃতিকে ঝাঁকুনি দিয়ে একটা দম্‌কা হাওয়া ব'য়ে গেল, পাছু পাছু বড় বড় ফোঁটার চড় বড় শব্দে নহবৎ সুরু হ'ল।

যাত্রীদের চাঞ্চল্য কোলাহলে গিয়ে পৌছুলো। কানাত নামানো, সতরঞ্চি গুটোনো, বাক্স প্যাঁটরা সামাল ও তারি সাথে সাথে পূর্ব্ববঙ্গের সব কটা জেলার ভাষায় সমস্বরে চীৎকার......সে এক দৃশ্য!...হঠাৎ চোখে পড়লো একটি লোক আমার পাশ কাটিয়ে ফিমেল কম্পার্টমেণ্টের ধারে গিয়ে আপাদগ্রীবা সতরঞ্চি মুড়ি দিয়ে উবু হ'য়ে বস্‌ল। ব'সে সন্তর্পণে একবার কপালের কেয়ারীতে হাত বুলোতে নিতেই চিন্‌তে পা'রলাম, সে পূর্ব্বোক্ত শ্রীমান জগন্নাথ। হাবভাবে বুঝলাম, শ্রীমান ভীত হয়েচেন।

বাইরে তাকিয়ে দেখি কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব ওলটপালট হ'য়ে গেচে। আকাশ-কোণের শ্বাপদ জন্তুটা দেহ-বিস্তার ক'রে আকাশের অর্দ্ধেকের বেশী গ্রাস ক'রে ফেলেচে। অন্ধকারে কিছু চোখে পড়ে না, থেকে থেকে চারদিক্ মৃদু আলোক কম্পনে চম্‌কে চম্‌কে উঠ্‌চে। সে আলোয় ধূসর বৃষ্টি-ধারা ভেদ ক'রে দৃষ্টি চলে না, একটু গিয়েই প্রতিহত হ'য়ে ফিরে আসে। শীকার কায়দায় পেয়ে ক্ষুধার্ত্ত বাঘ যেমন উদ্বিগ্ন আনন্দে গোংরাতে থাকে, সমস্ত আকাশ জুড়ে তেমনি একটা শব্দ হ'চ্চে।

হঠাৎ তিমির ঘন রাত্রির সমস্ত আবরণ নিঃশেষে পুড়িয়ে দিয়ে একটা অতি তীব্র ঝাঁজালো বিদ্যুচ্ছটা ঝল্‌সে উঠ্‌ল, নিমেষ মধ্যে জল স্থল কাঁপানো বিকট বজ্র-নির্ঘোষে চরাচর স্তম্ভিত, মূক হয়ে গেল। মনে হ'ল যেন প্রকাণ্ড আকাশটা ভেঙে-চুরে নদীর বুকে এসে আছড়ে পড়্‌ল।

ভয় পীড়াদায়ক সম্ভাবনার আতঙ্কে, পরিণতির মধ্যে ভয় ভয়ানক নয়। তাই দৈত্যপুরীর সব কটা দানব যখন বাঁধন-হারা উন্মত্ত-উল্লাসে এক সাথে ঘাড়ে এসে প'ড়লো, তখন একটা উচ্ছৃঙ্খল বেপরোয়া সাহসে মনটা ভ'রে উঠ্‌ল।

ডেকের দিকে তাকিয়ে দেখি হাওয়ার তোড়ে ষ্টীমার কাত্‌ হ'য়ে গেচে। সমস্ত যাত্রী ঝড়ের আক্রোশ থেকে আত্ম-রক্ষার জন্যে নীচু দিকটায় গিয়ে জমায়েত হয়েচে। কোথায় কাপড়, কোথায় কি! সব উড়্‌চে। আবালবৃদ্ধবনিতার মিশ্র কলরব ছাপিয়ে দু' একজন মানব-হিতৈষীর গলা পাওয়া যা'চ্চে।

......যান্‌, যান্‌, আপন আপন জায়গায় যান্‌! গ্যাদ ক'রবেন না এক মুরায়, ...দ্যাহেন না হালার জা'জ কাইত অইয়া গেছে...

উপদেশ শোনা ও তদনুসারে কাজ করবার মত স্থান ও কাল সেটা নয়, তাই নিজ নিজ জায়গার ওপর কারো বিশেষ আকর্ষণ দেখা গেল না; যিনি পরামর্শ দিচ্ছিলেন, তাঁরও না।

বাহিরে অষ্টদিক্‌পালের মাতামাতি সমানে চল্‌চে। অবিরল বৃষ্টি, অবিশ্রান্ত বিদ্যুত, আকাশের অশ্রান্ত সরব আস্ফালন, সমস্ত ডুবিয়ে উন্মত্ত বায়ুর অধীর হুহুঙ্কার! তারই ভেতর দিয়ে আমাদের একমাত্র আশ্রয়-স্থল 'বাজার্ড' ষ্টীমার, বায়ু তাড়িত হ'য়ে কোন এক ঝড়ের পাখীর মতই সবেগে ছুটে চ'লেচে।

হঠাৎ মনে হ'ল কে যেন ডাক্‌চে। কাকে, কে জানে! ওকি,—আমাকেই...

...শুনুন একবার এদিকে...

চেয়ে দেখি মেয়ে কামরার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বছর কুড়ি বাইশের একটি সাদাসিধে হিন্দু ঘরের মেয়ে। আমি এগিয়ে যেতেই তিনি ব্যগ্রভাবে বল্‌লেন, ...অবি—অবিনাশ বাবুকে ডেকে দেবেন একটু? অবিনাশ বোস্‌। অনেক ক্ষণ হ'ল নীচে গেচেন, ফেরেন নি। তিনি আমার স্বামী।

তাঁর চোখের জল বোধ হয় বৃষ্টির জলে ধুয়ে গেচিল,—কিন্তু গলার আওয়াজে টের পেলাম তিনি কাঁদ্‌ছিলেন। আমি বল্‌লাম...আপনি ঘরে গিয়ে বসুন, আমি ডাক্‌চি তাঁকে।

তিনি সেইখানে দাঁড়িয়েই ব'ল্‌লেন,—

......আমি ঠিক আছি আপনি যান্।

ভিড় ঠেলে নীচে নাম্‌তে নাম্‌তে মনে হ'ল, যে বিপদে গেরস্ত ঘরের বৌ অসঙ্কোচে স্বামীর নাম উচ্চারণ করে ও একান্ত অজানা পরপুরুষের সাথে সপ্রতিভ কথা কয়, সে বিপদ আর যাই হ'ক্ সামান্য নয়!

ষ্টীমার অসম্ভব দুল্‌ছিল। শুনলাম এঞ্জিন বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'য়েচে, হাওয়ার মুখে যে দিকে যায় যা'ক্। সারেঙ্ হাল ধরে ব'সে আছে।

উন্মত্তা এলোকেশী প্রকৃতির বিরাম-হীন তাণ্ডব থেকে থেকে আচম্‌কা অট্টহাসিতে ভীষণতর হ'য়ে উঠ্‌চে।

ডেকের মথিত বিধ্বস্ত জন-সংঘের মধ্যে হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে পথ ক'রে নিয়ে অবিনাশ বাবুর খোঁজ সুরু করলাম। ষ্টীমার দুল্‌চে, পা ঠিক্ রাখা শক্ত, তার উপর ধাক্কা ধাক্কা,...একটা লোহার থামে ঠুকে গিয়ে খানিকটা জখম হ'ল কপালে।

বাধা ও বিফলতায় যে মরিয়া ভাবটার সৃষ্টি করে, সেটা উৎসাহ নয় উন্মাদনা। অসাফল্যের লজ্জাকে বরদাস্ত করবার লজ্জা, সে উন্মাদনার মুখে আমি কেন কেউই মানতে রাজী নয়। তার উপর দুটী সিক্ত চোখের সনির্ভর মিনতি... সব রকম দুঃসাধ্য কাজেই তার জোরে হাত দেওয়া যায়। গলা চড়িয়ে ডাক্ ছাড়লাম;—

...অবিনাশ বাবু, অবিনাশ বাবু...

যাত্রীদের আর্ত্ত কোলাহলে আমার গলা ডুবে গেল। অবিনাশ বাবুকে বার করা সম্ভব হবে বলে মনে হ'ল না। আর সে ভদ্র লোকেরও বলিহারি যাই, পথে স্ত্রী সাথে ক'রে বেরিয়ে, এই দুর্য্যোগে বেমালুম তাঁর কথা ভুলে ব'সে আছেন। একবার পেলে এক হাত নোব......

ডেক্, সেলুন, হস্পিটাল, কোথাও তিনি নেই। চেঁচিয়ে গলা ধ'রে গেচে, জামা কাপড় ভিজে একাকার, কপালে রক্তের দাগ.. ...তখনকার চেহারা সম্বন্ধে তখন কোন কথা মনে হয় নি এই রক্ষে। তবে অবস্থাটাও তখন খুব স্বাভাবিক ছিল না, এটা মান্‌তে হবে।

এইবার নীচের পালা। সিঁড়ি বেয়ে কিছু দূর যেতেই একটা প্রবল দম্‌কার ঝাপটে জাহাজ বাঁদিকে আরও কাত্ হ'য়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গেল, গেল......সব গেল, ধরণের একটা মিশ্রিত কোলাহল,......মিলিত কণ্ঠের অমন অসহায় করুণ আর্ত্তনাদ আর কখনও শুনিনি। মুহূর্ত্তের জন্য হিমশিহরণে আমার সংজ্ঞা অসাড় হ'য়ে এল, মনে হ'ল পড়ে যাব।

ধীরে সামলে নিয়ে দৃঢ় পদে নীচে নেমে এলাম। নীচের দৃশ্য আরও ভীষণ। যেদিকে যাত্রী দল ভীড় ক'রেছিল, সেদিকে বেশী জল ওঠায় সবাই মাঝামাঝি একটা জায়গায় জমে গেচে। আর খালাসী শ্রেণীর গুণ্ডা গোছের জন তিনচার লোক অকথ্য অশ্রাব্য, গালাগাল দিতে দিতে সেই কম্পমান, ভয়ার্ত্ত মনুষ্য পিণ্ডের ওপর নির্ব্বিচারে দোহাত্তা কীল চড় লাথি চালিয়ে যাচ্চে। তাদের বক্তব্য এই যে, ষ্টীমার কাত হ'য়ে গেচে, জল উঠ্‌চে—উল্টো দিকটায় যেতে হবে, নইলে বিপদ।

তাদের কথা যুক্তিহীন নয়, বিষ্টি ও হাওয়ার তোড় তুচ্ছ ক'রে উচু দিকে যাওয়া উচিত, তাও বুঝলাম। কিন্তু যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্য যে প্রণালী অবলম্বন করা হ'য়েচে, সেটা খুব স্বষ্ঠু ঠেকলনা। নেমে গিয়ে পেছন থেকে খালাসী কটার পিঠে তাদেরই প্রদর্শিত পথে মুষ্ঠি ও পদাঘাত সুরু করলাম। ভাগ্যি ভাল; ভীড় থেকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে জন দশ বারো এগিয়ে এসে আমার সাথে যোগ দিল।

মারা ও মারিটা যখন জমে উঠেচে, তখন আমি টুক্ করে বেরিয়ে এসে হাঁক ছাড়লাম—

অবিনাশ বাবু,-অ-অবিনাশ বাবু......!

এখানেও বোস মহাশয়ের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না।

এঞ্জিন পেরিয়ে সামনে এলাম। সেখানে তেমন ভীড় নেই। ডাক্ ঘরের কাঠের কুঠুরীর আনাচে কানাচে পার্শেলের মাল পত্রের পাহাড়, খবরের কাগজ থেকে চিটে গুড়ের জালা পর্য্যন্ত সবরকম জিনিষই বর্ত্তমান। একপাশে জন দশ বারো কুলি, পুরুষ ও মেয়ে জুই-ভ, জড়-সড় হ'য়ে ঝড়ের ঝাপট থেকে শরীর বাঁচানোর বৃথা চেষ্টা করচে। দু'একজনের ছেঁড়া নোংরা কাঁথা আছে, তারা তাই মুড়ি দিয়ে ব'সে আছে। বেশীর ভাগই নগ্নগাত্র, পরণে শুধু একটা নেংটি।

এইবার হতাশ হ'লাম। এখানে একটা ভদ্রলোকও নেই কাজেই অবিনাশ বাবুও যে নেই সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। তবু মনে হ'ল, থাক্‌তেও পারেন এধারে ওধারে গা আড়াল দিয়ে, দু'একটা ডাক দেওয়ায় দোষ নেই।

প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচালাম। আরো জোরে—আরও।

হঠাৎ মনে হ'ল, অনেক দূর থেকে যেন আওয়াজ হ'চ্চে,—......কে কে? এই যে আমি......এখানে......

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চারিদিকে তাকাতে লাগলাম। কিন্তু . . . কৈ ? কেউ ত চোখে পড়ে না! হাঁক ছাড়লাম, . . . কৈ মশায় ? কোথায় আপনি— অ-অবিনাশ বাবু . . .

একটু একাগ্র মনে লক্ষ্য ক'রতেই মনে হ'ল মালের গাদির গভীরতম প্রদেশ থেকে জবাব হ'ল,

. . . এই যে, বড় চ্যাঙারীটার তলায় . . . ডাইনে . . .

অবাক হ'য়ে পার্শ্বেলের পাহাড়ে উঠ্‌লাম। চ্যাঙারী,—একটা নয়, অনেক। দুর্গন্ধে বুঝলাম, সুট্‌কী মাছের। তারই একটার তলায় বেশ একটু গর্ত্ত মত হ'য়েচে, তারই মধ্যে ঘাড় দাবিয়ে উবু হ'য়ে ব'সে বিপন্না অপরিচিতার স্বামী শ্রীঅবিনাশ বোস, পাশের একটী অর্দ্ধনগ্ন যোয়ান কুলীমেয়ের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে, বোধকরি কাব্য-চর্চ্চা ক'রছিলেন। আমাকে দেখে আমার দিকে বিরক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বললেন, . . . কি চান মশায় ?

পত্নিকে দেখে পতি সম্বন্ধে যে গুটি কয়েক ধারণা খানিকক্ষণ থেকে পোষণ ক'রছিলাম, বোস-জাকে দেখে সেগুলো শশব্যস্তে পলায়ন ক'রল। চেহারার বর্ণনা না করাই ভাল, কারণ অত কুৎসিত্‌ মুখ সচরাচর চোখে পড়ে না। রংটা ফর্সা এবং সেই জন্যেই আরও খারাপ লাগচে। পুরু পুরু কালো ঠোঁটের আনাচে কানাচে খেঁকি কুকুরের মত শুঁয়ো শুঁয়ো চুল টিক্ টিক্ করচে। বয়স মনে হল পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে।

একটা ধাক্কা সাম্‌লে কঠিন গলায় বল্লাম,—বেরিয়ে আসুন।

লোকটা হুকুমের ধরণ শুনে ভয় পেল কিনা বুঝলাম না, দু'হাতে চ্যাঙারী ভর দিয়ে বেশ ক্ষিপ্রতার সাথে তিড়িং ক'রে একলাফে অনেকটা দূরে এসে পড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে, সতৃষ্ণ চোখে একবার পেছনে তাকিয়ে নিয়ে জিব চট্‌কে বল্লে,—

কি বলচেন ?

লোকটার হাবভাব দেখে বুঝলাম, স্ত্রীর বিরহটুকু সে ফাঁকা হা-হুতাশে না কাটিয়ে একটা সদ্ব্যবহারের পথ বার ক'রে নিয়েচে। বল্‌লাম—

আপনারই নাম অবিনাশ বোস ?

আজ্ঞে।

আপনার স্ত্রী রয়েচেন ওপরে ফিমেল ক্যাবিনে ?

লোকটা একটু ঘাবড়ে জবাব ক'রলে, . . . হ্যাঁ, হ্যাঁ। কেন কি হ'য়েচে বলুন ত ? কিছু . . . ?

ঘাব্‌ড়াবেন না। আপনার আক্কেলটা কি মশায় যে, এই দুর্য্যোগের সময় আপনি তাঁকে একা ফেলে দিব্যি এখানে রস-চর্চ্চা করচেন? আর ওদিকে তিনি . . .

আমাকে বাধা দিয়ে এইবার তিনি হুম্‌কে উঠ্‌লেন। একজন অপরিচিত ছোক্‌রা, প্রথমত স্ত্রীর হ'য়ে ওকালতী ক'রতে এসেচে, এবং দ্বিতীয়ত একটা সঙ্গোপন রসানুভূতিতে ব্যাঘাত জন্মিয়েচে—কাজেই চট্‌বার কথা ত বটেই! বললেন . . . আপনি . . . ইয়ে আমার স্ত্রী . . . ইয়ে তোমার অত মাথাব্যথা কেন হে ছোকরা! আর ইয়ে ভদ্দর লোকের বোয়ের সাথে পরিচয়ই বা কর কোন্ প্রকারে?

আমার হাসি পেল। চেপে, সমান চ'টে ব'ললাম . . . চোপ।

লোকটা মুহূর্ত্তে গুড়ি শুঁড়ি মেরে গেল।

বল্‌লাম, . . . দায় ঠেকেচে আমার আপনার স্ত্রীর সাথে গায়ে পড়ে আলাপ করতে! তিনি নিজে এসে আমায় প্রভুর খোঁজে পাঠিয়েচেন। আপনার অদর্শনে অধীর হয়ে . . . বুঝেচেন?

অবিনাশ বাবু নরম ভাবেই বল্‌লেন,—যেতে দিন মশায়, যেতে দিন। তাঁর . . . ইয়ে আমার স্ত্রীর কোনও বিপদ টিপদ হয় নি ত? ওকি, আপনার কপাল কেটে গেচে যে! ইয়ে বড্ড রক্ত পড়্‌চে!

কপালে হাত দিয়ে বল্‌লাম,—ও কিছু নয়। আপনি চলুন। তাঁকে কথা দিয়ে এসেচি, আপনাকে নিয়ে যাব।

চলুন, ব'লে একবার শেষ-মেষ সেই কুলী-মেয়েটার দিকে প্যাট্‌ প্যাট্‌ ক'রে চেয়ে তিনি আমার সাথ ধ'রলেন।

একটু যেতেই অবিনাশ বাবু বল্‌লেন,—

. . . তা' ইয়ে, আপনি ত আর লোক মন্দ নন্! কিন্তু দেখুন দেখি, ইয়ে, ওঁর ব্যাভারটা! হুট্ করে এসে একজন, ইয়ে, পর-পুরুষের সাথে কথা কওয়াটা কি ঠিক্ হ'য়েচে?

দেখ্‌লাম লোকটা অতিশয় ইতর, তখনো স্ত্রীর সাথে আমার কথা কওয়াটা হজম ক'রতে পারচে না। সর্ব্বাঙ্গ আমার রাগে রি রি ক'রতে লাগ্‌ল। ইচ্ছে হ'ল বলি, . . . আপনার স্ত্রী ত' বিপন্না হ'য়ে সাহায্য প্রার্থনা ক'রেছিলেন আমার কাছে, কিন্তু মশাই কি খুব ধর্ম্মভাবে ঐ কুলী-মেয়েটাকে গো-গ্রাসে গিলছিলেন?

কিছু বললাম না।

বাহিরে কি ভয়ানক অন্ধকার। ঝড় পূর্ণ বেগে চলচে। ভেতরের সমস্ত সতর্কতা, কোলাহলকে তুচ্ছ ক'রে রুষ্টা প্রকৃতির তর্জ্জন গর্জ্জনের আর অন্ত নেই। বিদ্যুৎ থেকে থেকে চম্‌কে উঠ্‌ছে, দুর্য্যোগের নিবিড় তিমির, সে ক্ষণ-প্রভায় আরো ঘন, আরো নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠ্‌চে। আকাশের গুরু গর্জ্জন হাওয়ার উচ্ছৃঙ্খল হাহাকারের সঙ্গে মিশে অভিশপ্তা রাত্রিকে দ'লে, ম'থে, ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেল্‌চে। ওপরের সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে অবিনাশ বাবু বল্‌তে লাগ্‌লেন, . . . তখনি জানি . . . ইয়ে, পেটে যখন বিদ্যে ঢুকেচে, তখন, ইয়ে স্বভাব চরিত্তির ঠিক্ নেই। ডব্‌কা বয়সটা দেখে লোভ সাম্‌লাতে পারলাম না, কিন্তু ইয়ে, এমন ভোগান্তি জান্‌লে কোন্ শালা . . .

আমি বাধা দিয়ে ব'ললাম, . . . কি ব'লচেন আপনি? কার কথা বল্‌চেন?

. . .'আর কার কথা মশাই, এই, গে' . . . আমার স্ত্রীর। দুটো শুঁড়ো রেখে আগের বৌটা যখন মরল, তখন ভাবলাম,—ধুশ্‌ শালা, ইয়ে, আর ও সব দিয়ে কাজ নেই। কিন্তু হরু-খুড়ো মেয়ে দেখিয়েই ত সব বিগ্‌ড়ে দিলে! হত দরিদ্র মশাই . . . হত দরিদ্র! বাপটার না আছে চাল, না আছে চুলো! কিন্তু আবার ইয়ে, এ দিক নেই ও দিক আছে! মেয়েকে বেহ্ম ইস্কুলে পড়ানো হ'য়েচে! তখন কি ছাই অত ভেবে দেখিচি। বয়স কুড়ি শুনেই আমার নোলায় জল এল! ইয়ে, এলাম ঘুরে সাত পাক! কিন্তু এখন . . .

রাগ আমার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কোন মতে দমন ক'রে ব'ললাম, . . . কি এখন? . কি ক'রেচেন তিনি?

লোকটার লালসা, নীচতা, এমন ইতর হ'য়ে প্রকাশ পাচ্ছিল যে, আমার মনে হ'চ্ছিল ওকে মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দিই।

ভেংচানো সুরে জবাব হ'ল, . . . না . . . করেন নি কিছু! তবে নবেলী ক'রে একজন বাইরের পুরুষের সাথে কথা কইলেন আজ, . . . কাল ইয়ে,— ক'রবেন কি কে জানে। আমায় না দেখ্‌তে পেয়ে . . . ইয়ে . . . অধীর! . . . ইয়ে, বিরহ . . .!

ব'লে লোকটা চুমকুড়ি দিয়ে হেসে উঠ্‌ল।

আমি আর সামলা'তে পা'রলাম না। তড়িৎবেগে একহাতে লোকটার ঘেঁটী চেপে ধ'রে আর এক হাত মুঠো ক'রে তার নাকের ওপর তুল্‌তেই সে বাধা

দিতে দিতে ও পাশে চেয়ে ব'লে উঠ্‌ল, . . . ইয়ে . . . ওকি . . . সন্থ . . তুমি . . . !

আমার হাত অসাড় হ'য়ে খ'সে এল।

চকিত বিদ্যুতালোকে দেখ্‌লাম,অবিনাশ বাবুর স্ত্রী পাথরের মত স্থির অপলক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে। ছ' ঠোঁট রক্তশূন্য—পাংশু।

আমি সেখান থেকে সরে এলাম।

ঝড়ের বেগ বোধ হয় কম্‌চে। বিষ্টি ধরেচে, থেকে থেকে হু হু করে হাওয়া বইচে। নৈশ প্রকৃতি দুরন্ত ছেলের মত দিনমানের হুটোপুটির পর শান্ত অবসাদে এলিয়ে পড়েচে। তার গা থেকে ডাংপিটেমর চিহ্ন মেলায় নি। কিন্তু ঠোঁটের কোণে কোনও উদ্বেগ নেই।



মুর্শীদ্যা গান

শ্রীজসিম উদ্দিন

মাঝির গান

পূর্ব্ব বাঙলা নদীর দেশ। ভাটির পানে নাও ভাসাইয়া পরাণ-দোরদীকে ডাকিয়া কত নায়ের মাঝির বুক ফাটিয়া গিয়াছে। তাদের সেই কান্নার মধ্যেই ভাটির মায়ায় ঘেরা উদাসী ভাটিয়াল সুর মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। পরে মুর্শীদ্যা গানে এই সুর স্থান পাইয়াছে, কিন্তু মাঝিরাও এ গান গাহিয়া থাকে। মুর্শীদ্যার বৈঠকে এই সব গানের বিশেষ আদর।

(১)

"ঘাটে লাগাও রে নাও
আমি চিনে লই বেপারীরে
নাও ঘাটে লাগাও রে।
কাল হেন মাঝি হারে বিটা নৌকা বায়্যারে যায়
(১) মরণকাষ্ঠ ধইর্যা রে কান্দে, ও সাধু তোমার বাপ মায় রে
নাও ঘাটে লাগাও রে।
আগা নৌকার ঝামুর হাঁরে ঝুমুর পাছা নৌকায় রে (২) ছয়া
তারি মদ্দি বইস্যারে আছে মনুয়ারে (৩) তনু হেলান দিয়া রে
নাও ঘাটে লাগাও রে।
নায়ের কাটা নৈলাম কাছি রে নইলাম আরও নৈলাম রে শুন
জনম ভইরে টাইনে রে মইলাম আমি না পাইলাম তার কূল রে
নাও ঘাটে লাগাও রে।

১। মরণকাষ্ঠ—বোধ হয় মাথা কাঠ ২। ছয়া—ছই ৩। মনুয়া—মন

এই না নৌকার, আগা বায়্যা ওঠে ঢেউ রে পাছা বায়া রে যায়
মরণ-কাঠ ধইরে রে মোনাই-ও মোনাই কান্দে হায় হায় রে
নাও ঘাটে লাগাও রে।"

গায়ক—রহিম মল্লিক
বয়স চল্লিশ বৎসর, গ্রাম গোবিন্দপুর, জেলা ফরিদপুর

(২)

"আমার হ'য়্যা জন্ম বৃথা গ্যাল ভাই
নাও আন রে
নাও আন রে বাই—না—ও আন রে।
ঘাটে বান্দা আছে রে নাও গুরা সমান পানি
আমি নিশ্চয় জাইন্যাছি এই নাও ছুইট্যাছে গহিনীরে (১)
বাই নাও আন রে।
(২) গুরুজীর বানাইন্যা নাও শ'গুণ কাণ্ডারী
বনের শৃগাল বলে আমি এই নৌকার বেপারী রে
বাই নাও আন রে।"

গায়ক—রেয়াজুদ্দি
বয়স ত্রিশ বৎসর, খাবাসপুর, ফরিদপুর

(৩)

"ধীরে ধীরে বাইও রে নৌকা
দয়াল চান রে ধরি রাঙা পায়।
আমি কি অপরাধ কইর‍্যাছি
শানাল চান রে তোমার রাঙা পায়।
লাভ করিবার আইস্যা রে ভবে আমি
খালি হস্তে যাই।
মহাজনের ভরা নাও আমি
ডুবাইয়া দেই।"

গায়ক—গণী মোল্লা

১। গহিনী—গভীর জলে, এখানে বিপদে। ২। গুরুজী যে সুন্দর নাও আমাকে দিয়াছিলেন আজ অনেক পাপে সেই নৌকাকে আমি কলুষিত করিয়াছি। তাই বনের যে তুচ্ছ শৃগাল সেও এই নৌকার বেপারী হইতে চায়।

(৪)

"ও সোনার মুরসীদ

জানলে তোর বাঙ্গা লৌকায় চ'ড়তাম না।

লৌকায় গোলই বাঙ্গা, তরী চেরা গাব গাহিনী (১) মানে না;'

সহজে খাটাও বাদাম চাঁচড়ে (২) যেন ঠেকে না॥

নয়্যা নাও গড়াইলে রে মোনা 'ধ্যাপার' ক'রল্যা না

ভাব্‌তে ভাব্‌তে হৈলাম সারা কূল কিনারা পাইলাম না॥

গায়ক—কোরমান ফকীর

(৫)

উঁঝুর ঝুঝুর বাজে নাও আমার

নিহাইল্যা বাতাসেরে মুরসীদ

রইলাম তোর আশে।

পশ্চিমে সাজিল ম্যাঘ রে স্বাওয়ায় দিল রে ডাক

আমার ছিঁড়িল হাইলির পানস (৩) নৌকায় খাইল পাক (৪) রে

মুরসীদ রইলাম তোর আশে।

আগা বায়া ওঠে ঢেউ রে পাছা বায়্যা রে যায়

আমার হিরাালাল মানিকিকর বারা, সোতে (৫) বাইয়্যা যায় রে

মুরসীদ রইলাম তোর আশে।

জসীম উদ্দীন

১। গাব গাহিনী—প্রতি বৎসর নৌকা পরিষ্কার করিয়া গাব দিয়া তবে ঘ্যাস দিতে হয়। ঘ্যাস্—কয়লার গুঁড়ো গাবের আঠা দিয়া নৌকার জোড়ায় জোয়ার দিতে হয়।

২। চাঁচড়—নদীতে যেখানে অল্প জলের তলেই বালুর চর থাকে সেখানকার স্রোতকে চাঁচড়ের ধার বলে।

৩। পান্‌স—হালের দড়ী। ৪। পাক—ঘূর্ণী। ৫। সোতে—স্রোতে।



গোকুল নাগ

[নজরুল ইস্‌লাম]

না ফুরাতে শরতের বিদায়-শেফালি,
না নিবিতে আশ্বিনের কমল-দীপালি,
তুমি শুনেছিলে বন্ধু পাতা-ঝরা গান
ফুলে ফুলে হেমন্তের বিদায়-আহ্বান।
অতন্দ্রা নয়নে তব লেগেছিল চুম
ঝর-ঝর কামিনীর, এল চোখে ঘুম
রাত্রিময়ী রহস্যের ; ছিন্নশতদল
হ'ল তব পথ-সাথী ; হিমানী-সজল
ছায়াপথ-বীথি দিয়া শেফালি দলিয়া
এল তব মায়া-বধূ ব্যথা-জাগানিয়া !
এল অশ্রু হেমন্তের, এল ফুল-খসা
শিশির-তিমির-রাত্রি ; শ্রান্ত দীর্ঘশ্বসা
ঝাউ-শাখে সিক্ত বায়ু রিক্ততার বাণী
কয়ে গেল, দু'লে দু'লে কাঁদিল বনানী !
তুমি দেখেছিলে বন্ধু ছায়া-কুহেলির
অশ্রু-ঘন মায়া-আঁখি,—বিরহ-অথির
বুকে তব ব্যথা-কীট পশিল সেদিন !
যে-কান্না এল না চোখে মর্ম্মে হ'ল লীন
বক্ষে তাহা নিল বাসা, হ'ল রক্তে রাঙা
আশাহীন ভালবাসা ভাষা অশ্রু-ভাঙা ! . . .

বন্ধু, তব জীবনের কুমারী আশ্বিন
পরিল বিধবা বেশ কবে কোন্ দিন,
কোন্ দিন সেঁউতির মালা হ'তে তার
ঝ'রে গেল বৃন্তগুলি রাঙা কামনার—

জানি নাই ; জানি নাই, তোমার জীবনে
আসিছে বিচ্ছেদ-রাত্রি, অজানা গহনে
এবে যাত্রা শুরু তব, হে পথ-উদাসী !
কোন্ বনান্তর হ'তে ঘর-ছাড়া বাঁশী
ডাক দিল, তুমি জান। মোরা শুধু জানি
তব পায়ে কেঁদেছিল সারা পথখানি !
সেধেছিল, এঁকেছিল ধূলি-তুলি দিয়া
তোমার পদাঙ্ক-স্মৃতি।

রহিয়া রহিয়া
কত কথা মনে পড়ে ! আজ তুমি নাই
মোরা তব পায়ে-চলা-পথে শুধু তাই
এসেছি খুঁজিতে সেই লুপ্ত পদ-রেখা,
এইখানে আছে তব ইতিহাস লেখা।

জানিনাক আজ তুমি কোন্ লোকে রহি'
শুনিছ আমার গান হে কবি বিরহী !
কোথা কোন্ জিজ্ঞাসার অসীম সাহারা,
প্রতীক্ষার চির-রাত্রি, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা,
পারায়ে চলেছ একা অসীম বিরহে ?
তব পথ-সাথী যারা—পিছু ডাকি কহে—
'ওগো বন্ধু শেফালির, শিশিরের প্রিয় !
তব যাত্রা-পথে আজ নিও বন্ধু নিও
আমাদের অশ্রু-আর্দ্র এ স্মরণখানি !'
শুনিতে পাও কি তুমি, এ-পারের বাণী ?
কানাকানি হয় কথা এ-পারে ও-পারে ?
এ কাহার শব্দ শুনি মনের বেতারে ?
কত দূরে আছ তুমি কোথা কোন্ বেশে ?
লোকান্তরে না সে এই হৃদয়েরি দেশে
পারায়ে নয়ন-সীমা বাঁধিয়াছ বাসা ?
হৃদয়ে বসিয়া শোন হৃদয়ের ভাষা ?—

হারায় নি এত সূর্য্য এত চন্দ্র তারা,
যেথা হোক আছ বন্ধু, হওনিক হারা!

সেই পথ, সেই পথ-চলা গাঢ় স্মৃতি,
সব আছে—নাই শুধু সেই নিতি নিতি
নব নব ভালোবাসা প্রতি দরশনে,
আরো প্রিয় ক'রে পাওয়া চিরপ্রিয়জনে,—
আদি নাই অন্ত নাই ক্লান্তি তৃপ্তি নাই—
যত পাই তত চাই—আরো আরো চাই,—
সেই নেশা সেই মধু নাড়ী-ছেঁড়া টান,
সেই কল্প লোকে নব নব অভিযান,—
সব নিয়ে গেছ বন্ধু! সে কল কল্লোল
সে হাসি-হিল্লোল নাই চিত্ত উতরোল!
আজ সেই প্রাণ-ঠাসা একমুঠো ঘরে
শূন্যের শূন্যতা রাজে, বুক নাহি ভরে!...
হে নবীন, অফুরন্ত তব প্রাণ-ধারা
হয় ত এ মরু-পথে হয়নিক হারা,
হয় ত আবার তুমি নব পরিচয়ে
দেবে ধরা; হবে ধন্য তব দান লয়ে
কথা-সরস্বতী। তাহা লয়ে ব্যথা নয়,
কত বাণী এল, গেল, কত হ'ল লয়,
আবার আসিবে কত। তবু মনে হয়
তোমারে আমরা চাই, রক্তমাংসময়!
আপনারে ক্ষয় করি' যে অক্ষয় বাণী
আনিলে আনন্দ-বীর, নিজে বীণাপাণি
পাতি' কর লবে তাহা; তবু যেন হায়
হৃদয়ের কোথা কোন্ ব্যথা থেকে যায়!
কোথা যেন শূন্যতার নিঃশব্দ ক্রন্দন
গুমরি গুমরি ফেরে, হু হু করে মন!...

বাণী তব—তব দান—সে ত সকলের,
ব্যথা সেথা নয় বন্ধু! যে ক্ষতি একের
সেখানে সান্ত্বনা কোথা? সেথা শান্তি নাই,
মোরা হারায়েছি, বন্ধু, সখা, প্রিয়, ভাই! . . .

কবির আনন্দ-লোকে নাই দুঃখ শোক,
সে-লোকে বিহারে যারা তারা সুখী হোক!
তুমি শিল্পী তুমি কবি দেখিয়াছে তারা,
তারা পান করে নাই তব প্রাণ-ধারা!
"পথিকে" দেখেছে তারা দেখে নি "গোকুল,"
ডুবেনিক—সুখী তারা—আজো তারা কূলে!
আজো মোরা প্রাণাচ্ছন্ন, আমরা জানি না
গোকুল সে শিল্পী গল্পী কবি ছিল কি না!
আত্মীয়ে স্মরিয়া কাঁদি, কাঁদি প্রিয় তরে,
গোকুলে পড়েছে মনে—তাই অশ্রুঝরে!



না ফুরাতে আশাভাষা না মিটিতে ক্ষুধা,
না ফুরাতে ধরণীর মৃৎ-পাত্র-সুধা,
না পূরিতে জীবনের সকল আস্বাদ—
মধ্যাহ্নে আসিল দূত! যত তৃষ্ণা সাধ
কাঁদিল আঁকড়ি' ধরা, যেতে নাহি চায়!
ছেড়ে যেতে যেন সব স্নায়ু ছিঁড়ে যায়,
ধরার নাড়ীতে পড়ে টান, তরুলতা
জল বায়ু মাটী সব কয় যেন কথা!
যেয়োনাক যেয়োনাক যেন সবে বলে—
তাই এত আকর্ষণ এই জলে স্থলে
অনুভব করেছিলে প্রকৃতি-দুলাল!
ছেড়ে যেতে ছিঁড়ে গেল বক্ষ, লালে লাল
হ'ল ছিন্ন প্রাণ! বন্ধু, সেই রক্ত-ব্যথা
রয়ে গেল আমাদের বুকে চেপে হেথা!

হে তরুণ, হে অরুণ, হে শিল্পী সুন্দর,
মধ্যাহ্নে আসিয়াছিলে সুমেরু-শিখর
কৈলাসের কাছাকাছি দারুণ তৃষ্ণায়,
পেলে দেখা সুন্দরের, স্বরগ-গঙ্গায়
হয় ত মিটেছে তৃষা, হয় ত আবার—
ক্ষুধাতুর !—স্রোতে ভেসে এসেছ এ-পার !
অথবা হয় ত আজ হে ব্যথা-সাধক,
অশ্রু-সরস্বতী কর্ণে তুমি কুরুবক !
হে পথিক-বন্ধু মোর, হে প্রিয় আমার,
যেথানে যে-লোকে থাক করিও স্বীকার
অশ্রু-রেবা-কূলে মোর এ স্মৃতি-তর্পণ,
আমারে অঞ্জলি করি করিনু অর্পণ !

*

সুন্দরের তপস্যায় ধ্যানে আত্মহারা
দারিদ্র্যের দর্প তেজ নিয়া এল যারা,
যারা চির-সর্বহারা করি' আত্মদান
যাহারা সৃজন করে করে না নির্ম্মাণ,
সেই বাণীপুত্রদের আড়ম্বরহীন
এ সহজ আয়োজন এ স্মরণ-দিন
স্বীকার করিও কবি, যেমন স্বীকার
করেছিলে তাহাদেরে জীবনে তোমার !
নহে এরা অভিনেতা দেশ-নেতা নহে,
এদের সৃজন-কুঞ্জ অভাবে বিরহে,
ইহাদের বিত্ত নাই, পুঁজি চিত্তদল
নাই বড় আয়োজন নাই কোলাহল ;
আছে অশ্রু আছে প্রীতি, আছে বক্ষ-ক্ষত,
তাই নিয়ে সুখী হও বন্ধু স্বর্গগত !
গড়ে যারা, যারা করে প্রাসাদ নির্ম্মাণ
শিরোপা তাদের তরে তাদের সম্মান।

দুদিনে ওদের গড়া, প'ড়ে ভেঙে যায়,
কিন্তু স্রষ্টা সব যারা গোপনে কোথায়
সৃজন করিছে জাতি সৃজিছে মানুষ—
রহিল অচেনা তারা। কথার ফানুষ
ফঁাপাইয়া যারা যত করে বাহাদুরী
তারা তত পাবে মালা যশের কস্তুরী!...
আজটাই সত্য নয়, ক'টা দিন তাহা?
ইতিহাস আছে, আছে ভবিষ্যৎ, যাহা
অনন্ত কালের তরে রচে সিংহাসন,
সেথানে বসাবে তোমা বিশ্বজনগণ।
আজ তাহা নয় বন্ধু, হবে সে তখন,—
পূজা নয়—আজ শুধু করিনু স্মরণ!

হুগলি
৩০ কার্ত্তিক, ১৩৩২



ডাকঘর

কার্ত্তিকমাসে ডাকঘরে কিছু জানান হয় নি, তার কারণ কল্লোলের পাঠক ও বাংলা দেশের প্রায় সকলেই অনুমান ক'রে নিতে পেরেছেন আশা করি। কার্ত্তিকের সংখ্যা যখন ছাপা চলেছে তখন আমি দার্জ্জিলিং শহরে আমাদের সুহৃদ ও প্রাণবান্ সাহিত্যসেবী গোকুলচন্দ্রের রোগশয্যা-পার্শ্বে। ছাপা যখন প্রায় শেষ, তখন গোকুলচন্দ্রেরও জীবন শেষ। সে অবস্থায় আমাদের পক্ষে কিছু লেখা সম্ভব হোল না। তাই কার্ত্তিকে কেবলমাত্র গোকুলের মৃত্যু-সংবাদটি ও তার অসুখের ঠিক প্রথম অবস্থার একখানি ফটো দিয়ে সমাচারটি দিয়েছিলাম। এবারে তাঁর জীবন সম্বন্ধে প্রবন্ধের আকারে কিছু দেওয়া হলো। বাইরের কথা-গুলিই লিখেছি; মানুষের অন্তরের ভিতর যে কত কথা থাকে তা' অনেক জানাও যায় না, আর যাও বা জানা যায়, তাও অনেক সময় প্রকাশ করা ঠিক মনে হয় না। মানুষের মৃত্যুর পর আমরা তার জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করি এবং তা দুই এক মাসের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ঐ মানুষটিই বেঁচে থাকতে তার প্রতিদিনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তের যে অনুক্ত কাহিনী তা' অপরিসীম, তা' প্রাণ দিয়ে অনুভব করা যায়, লেখায় ভাষায় তা' প্রকাশ করা একান্ত দুঃসাধ্য কার্য্য। এবারে গোকুলের যে ছবিখানি দেওয়া হোল, এখানি তার অসুখের মাস কয়েক আগে তোলা। আমাদেরই এক বন্ধু খেলাচ্ছলে হঠাৎ গোকুলকে বসিয়ে ছবিখানি তুলে নিয়েছিলেন,—কিন্তু সে ছবি আজ এ কাজে লাগল!

গোকুলের অসুখ যখন প্রথমবার খুব বাড়াবাড়ি, (জানুয়ারী মাসে) সেই সময়ে আর একজন সাহিত্যানুরাগী, কল্লোলের পরম সুহৃদ, কৃতী-ছাত্র, বিজয়-সেনগুপ্ত ইহধাম ত্যাগ করেন। এই ঘটনা সেই সময়ে এত আকস্মিক ঘটেছিল যে, আমাদের পক্ষে তা' ধারণার ভিতর এনে ঘটনাটা সত্য ব'লে বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা হয় নি। অনেক কারণে তার মৃত্যুর সঠিক কারণ সাধারণে প্রকাশ করা হয় নি। তার আত্মীয়দের এ বিষয়ে সাহায্য করা এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে তার মৃত্যুর কারণ সাধারণে প্রকাশ করা উচিত ছিল। তা' করা হয় নি ব'লে বিজয়ের সম্বন্ধে

অনেকে অনেক ধারণা নিজেদের মন-গড়া-ক'রে করে নিয়েছেন। এ জন্য কাকেও দোষ দেওয়া চলে না। তার মৃত্যুর পর তার আত্মীয়রা এমন একটা ধোঁয়াটে রকমের চাল দেখিয়েছিলেন, তাতে অনেকে মনে করল, বোধ হয় প্রেমে নিরাশ হয়ে এই যুবকটি প্রাণ হারাল; কেউ বা মনে করলেন, নানা বদ্‌খেয়ালিতে টাকা উড়িয়ে অনেক ধার-ধুর করে শেষ কালে ভয়ে এই ছেলেটি আত্মহত্যা করল। কিন্তু বিজয়ের আত্মীয়রা নীরব—তাঁরা কেউ এ সকল কথার প্রতিবাদও করলেন না বা তাঁরা যা' জানেন, আত্মহত্যা করার সে রকম কোনও কারণও মানুষের কাছে প্রকাশ করলেন না। তাই ইংরেজী প্রবাদের মত—Give a bad name to a dog—এই ভাবেই ঐ প্রতিভাবান্ জীবনের শেষ খ্যাতিটুকু র'য়ে গেল। তার মৃত্যুর পর আমরা তার সম্বন্ধে কোনও রকম আলোচনা করতে পারি নি। প্রথম কারণ, ঘটনাটি অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে আমাদের আঘাত করেছিল; দ্বিতীয় কারণ, গোকুলের তখন খুব অসুখ, সে যদি কল্লোলের পৃষ্ঠায় কোনও রকমে এই দুঃসংবাদ জানতে পারে, তা হ'লে সেই সময়ে তার জীবনের হানি হতে পারে এই ভয়ে। অনেক ক'রে কথাটি একেবারে চাপা দিয়ে রাখ্‌তে হয়েছিল। সে অবস্থায় আরও কষ্ট হয়েছিল, যখন দেখেছি খবরের কাগজওয়ালারা বিজ্ঞের মত বিজয়কে কেউ বা কাপুরুষ, কেউ বা দুর্ব্বল চিত্ত ব'লে আখ্যা দিয়ে তার মৃত্যু ঘোষণা করেছেন। প্রতিবাদ করবার উপায় ছিল না, প্রবৃত্তিও হচ্ছিল না। আজ গোকুলও নাই, বিজয়ও নাই, তাই এই দুই দরদী সাহিত্যিকের মৃত আত্মার সমক্ষে এই কথাগুলি উত্থাপন করছি। আজ গোকুল জান্‌লেও ভয় নেই, আর গোকুলের মৃত্যুর খবর বিজয় জান্‌লেও আমাদের দিক্ থেকে ভয় করবার মত কোনও কারণ নেই।

বিজয় ছিল মাত্র তেইশ কি চব্বিশ বছরের যুবক। সুন্দর চেহারা; কথা বার্ত্তায় সে মানুষকে মশগুল্ ক'রে রাখ্‌তে পারত। তবে সে বড় একটা সহজে ধরা দিত না। প্রথম আলাপে তাকে অত্যন্ত গম্ভীর ভারিক্কি লোক বলে ধারণা হোত। অনেক স্থানে সে চুপটি ক'রে ব'সে থাকত, কোনও কথায় যোগ দিত না।' তারপর লোকের সঙ্গে মিলে গেলে আশ্চর্য্য সহজ ও সরল ব্যবহারে মানুষকে আপনার ক'রে নিত। আজও কল্লোলের অনেকের পক্ষে কতকগুলি বাংলা কথা ও কতকগুলি কথা-বলার-ভঙ্গী উচ্চারণ করা বা অভিনয় করা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কারণ সেগুলির প্রণয়ন ও ব্যবহারকর্ত্তা ছিল বিজয়। পাতলা ছিপ্‌ছিপে চেহারা। চোখদুটি হাসিতে ভরা, মাঝে মাঝে

বেশ সময়-মাফিক্ দুই একটি কথা ছাড়ছে—আর উপস্থিত সবাকার সেই হাস্য-রোল। এই ত বাইরেকার তার একটি রূপ। লেখা-পড়ায়ও সে ম্যাট্রিকুলেশন থেকে এম, এ পর্য্যন্ত সব পরীক্ষাতেই উচ্চ স্থান অধিকার ক'রে পাশ করে এসেছে। বিজয় পিতৃহীন ছিল—শুনেছি, সেই কারণে তার মামারাই তাদের দুই ভায়ের প্রতিপালনের ও তাদের সম্পত্তি রক্ষার ভার নিয়েছিলেন। অনেক কথা না ব'লে শেষের দিকের কয়েকটা দিনের ছোট খাটো ঘটনাগুলি বলি। এ গুলির অনেক আমার নিজের জানা। যদি কেউ চ'টে যান্, তাহ'লেও আমাকে বল্‌তে হচ্ছে।

যতদূর মনে পড়ে ১৯২৪-এর বড় দিনের ছুটির সময় বোধ হয় সে তার এক বন্ধুর বাড়ীতে ঢাকায় বেড়াতে যায়। সেখান থেকে ফিরে এলে, তাকে এক নূতন মানুষ দেখি। খুব ফুর্ত্তি, হাসি গল্পে সে মুখর—যেন কল্‌কাতার বাইরে গিয়ে নূতন প্রাণ পেয়ে এসেছে। এর ঠিক্ পরেই, প্রায়ই সকাল বেলার দিকে আমার বাড়ীতে এসে চুপটি ক'রে ব'সে থাক্‌ত। আমি তখন কাজে ব্যস্ত থাক্‌তাম, তার সঙ্গে ভাল ক'রে কথাই হয় ত অনেক সময় বলা হোত না। এ কারণে নিজেকে অপরাধী মনে হোত। একদিন আমি নিজে থেকেই আমার ত্রুটি স্বীকার ক'রে তার কাছে মার্জ্জনা চাইলাম। সে হেসে উত্তর করল,—আমার আস্‌তে ভাল লাগে, তাই আসি, আপনি কাজ ক'রে যাবেন। আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য ব্যস্ত হবেন না। সে দিনের পর দিন আস্‌ত, চুপ করে ব'সে থেকে, হয় ত বা দুই একখানা বই-টই নেড়ে চেড়ে চুপ করেই চ'লে যেত।

আমি মনে অস্বস্তি বোধ করতে লাগ্‌লাম। তবু সে কি করে—এই প্রতীক্ষায় কিছুকাল কেটে গেল।

একদিন রাত্রে আমি যখন কল্লোল কার্য্যালয় থেকে বাড়ী ফিরছি, তখন সে আমার সঙ্গ নিল। অন্য দিন প্রায়ই আমার সঙ্গে দুই একজন বন্ধু থাকে, সে দিন আর কেউ ছিল না। খানিকটা এগিয়ে আমিই কথা পাড়লাম। বুঝ্‌তে পারছিলাম, সে কিছু বল্‌তে চায়। জিজ্ঞাসা ক'রলাম, আজ একলাটি এতক্ষণ ব'সে রইলে?

তার পরের কথাগুলি, প্রশ্নোত্তরের আকারে দিয়ে অনাবশ্যক দীর্ঘ না ক'রে তার জবানী কথাগুলিই বল্‌ছি।

সে বল্‌ল, আপনাকে একলা পাবার জন্য ক'দিন ধরেই চেষ্টা করছি, আজ তাই এত রাত অবধি ব'সে ছিলাম।—আমার ত বোধ হয় আর এম-এ দেওয়া

হয় না এবার।—একটা প্রাইভেট্-টিউশনি জোগাড় ক'রে দিতে পারেন?—হ্যাঁ আমাদের কিছু টাকা ছিল, তাই দিয়েই এতদিন আমার পড়ার ও থাকার খরচ চল্‌ছিল, কিন্তু দুই একদিন আগে আমার মামা বল্‌লেন, আমার নাকি আর একটি পয়সা নেই, পড়াশুনা চল্‌বে না। এম-এ-টা ভাল ক'রে পাশ করব ব'লে প্রস্তুত হচ্ছিলাম, কিন্তু পরীক্ষার 'ফী' দিই কোথা থেকে আর হোষ্টেলেই বা থাকি কেমন ক'রে?—না, মামা বিরূপ, কারণ আমি সাহিত্য ভালবাসি, সাহিত্য চর্চ্চা করি। কিন্তু আমি ত তাতে আমার লেখাপড়ার কোনও ক্ষতি করি নি।

ঠিক হোল, পরীক্ষার 'ফী' আমি যেখান থেকে পারি জোগাড় করব, আর অতি গোপনে 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় আমার বাড়ীর ঠিকানায় একটা প্রাইভেট্-টিউশনি পাবার জন্য আবেদন করা হবে। তাই হোল। বিজ্ঞাপন দেবার টাকার জোগাড়ও তার ছিল না। যাই হোক্, কয়েক দিন উত্তরের আশায় সে খুব উৎকণ্ঠিত হয়ে রইল। প্রায় সপ্তাহ উত্তীর্ণ হয়ে গেল, কোনও ডাক এল না। তার পরেই সে কয়েক দিন গা ঢাকা দিল। কাজে কর্ম্মের ভীড়ে আমি তার খোঁজ নিতে পারি নি। তবে তার সহাধ্যায়ী ও বন্ধুদের তার খবর নিতে অনুরোধ করাতে তারা বলেছে—তাকে হোষ্টেলে বা কলেজে কোথাও দেখা যায় না।

গোকুল আমাদের ছেড়ে যায় বৃহস্পতিবার, বিজয়ও বৃহস্পতিবার তার জীবন শেষ করে। বুধবার সন্ধ্যার সময়ও নাকি কল্লোল আপিসের দরজায় ঘুরে গেছে, আমি দেখি নি। এক বন্ধুর সঙ্গে বুধবার দুপুরেও একটা উপন্যাস লেখা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছে এবং তার পরের দিন এসে কাজ করবে তাকে কথা দিয়ে এসেছে। 'বাঁশরী' পত্রিকার আপিসেও তাঁদের গল্প দেবে এবং সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করবে ব'লে বলেছিল এ কথাও শুনেছি। রাত্রে আহারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হোষ্টেলে বন্ধুদের নিয়ে আমোদ করে। তাদের একটা গল্প বল্‌তে আরম্ভ করে—রাত যখন অনেক তখন গল্প শেষ না হতেই সে উঠে পড়ে। বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করে, শেষ কবে শুন্‌ব? তাতে নাকি ব'লে, কাল শুন্‌তে পাবে।

সে তখন তার মামার কাছে ভিন্ন বাড়ীতে থাকৃত। বাড়ীতে গিয়ে আলো জেলে পড়তে আরম্ভ করে। যখন দেখে চাকররা ঘুমুচ্ছে—তখন খান দুই চিঠি লিখে রেখে কার্ব্বলিক্ এসিড খেয়ে স্নানের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে মেঝের উপর শুয়ে পড়ে। সকালে উঠে বোধ হয় তার খোঁজ পড়ে। আশ্চর্য্য কথা এই যে, তার লেখা চিঠি দুখানি আর পাওয়া গেল না! ভাল করে কেউ

জান্‌তেও পারল না তাতে কি লেখা ছিল। দু'খানির ভিতর একখানি তার ঢাকার সেই বন্ধুটিকে লেখা। সেই বন্ধু মৃত্যুর খবর পেয়ে কয়েক দিন পরেই কলকাতা আসেন এবং সে চিঠিখানির খোঁজ করেন কিন্তু তা আর পাওয়া যায় নি। তার লেখা অপ্রকাশিত গল্প ও রচনা অনেক ছিল, তাও কিছু পাওয়া যায় নি।

এই সূত্রে আমরা সকল ঘটনা জেনে তাকে কাপুরুষ বা প্রেমে নিরাশ হয়ে আত্মহত্যা করেছিল বলে বল্‌তে চাই না। তা ছাড়াও আত্মহত্যা করবার অন্য কারণও হয় ত থাক্‌তে পারে, যা আমরা জানি না। একদিক দিয়ে দেখি—সাহিত্যের উপর তার অনুরাগই যেন তার কাল হোল। একে ভালবেসে বিজয়কে নানা যন্ত্রণা, পীড়ন, লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে তাও আমরা জানি।

গোকুল ও বিজয় এই দুইজন বাংলা সাহিত্যের সাধক ও সেবক, তুল্যভাবে না হোক্, এক রকমে না হোক্—জীবনের আদর্শের জন্য সংগ্রাম করতে করতেই প্রাণ হারাল।

বিজয় কেন হঠাৎ আত্মহত্যা করল এ কথা হয় ত ঠিক নির্দ্ধারণ করা হোল না। কিন্তু এ কথা ঠিক্ যে, সাহিত্যের দিকে ঝোঁক্ ছিল, সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল বলেই তাকে তার অভিভাবকদের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল। এই কারণে মৃত্যুর দুই একদিন পূর্ব্বেও নাকি তাকে তার বন্ধুবান্ধব ও চাকরদের সম্মুখে অপমান করা হয়েছিল। এই কথা দ্বারা আমরা তার অভিভাবকদের প্রতি কোনও দোষারোপ করছি বলে কেউ যেন মনে করবেন না। তার মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়েই এই কথাগুলি উল্লেখ করতে হোল। সে হয় ত মরে বেঁচে গেছে—কিন্তু তাকে একটা অখ্যাতি দিয়ে রাখা হয়েছে এই মনে করেই আমরা মানুষের মন থেকে ঐ ভাব দূর করে দিতে চেষ্টা করছি।

এবারে কাজী নজরুল ইস্‌লাম 'গোকুল নাগ' বলে যে কবিতা লিখেছেন, তার শেষের দিক্‌টা আজ কালকার বাংলা সাহিত্যের নিষ্ঠাবান্ সাহসী সেবকদের যেন সত্যিকারের ছবি।

এই দুইজনকে হয় ত আমরা চিনি, তাই তাদের অভাবে আমাদের কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু পৃথিবীর প্রান্ত হতে প্রান্তে এমনিতর কত নীরব অখ্যাতসাধক জীবন-কালে কোনও সম্ভাষণ না পেয়ে সাধারণ সৈনিকের মতই ধরণীর ধূলার গ্রন্থে জীবনের আখ্যায়িকা লিখে রেখে যান্। এঁরাই মানুষকে সৃষ্টি করছেন—

আবিষ্কার করছেন, তাধাকে রক্ত দিয়ে লালন করছেন, দেশকে একান্ত করছেন, জাতিকে কেন্দ্রীভূত করছেন—পৃথিবীকে পরিণতির অন্ধকার থেকে অনন্ত উন্নতির ব্যগ্রতায় জাগ্রত করছেন।

বাংলা ভাষা আজ কত রূপ ধরে কত পাত্রে পাত্রে পরিবেশিত হচ্ছে। জাতি ও তার ভাষা এক সঙ্গে গড়ে উঠ্‌ছে। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে সাহিত্যের সেবা আরম্ভ হয়েছে। সে সেবা নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা—নানা আকারে। সাময়িক পত্রিকা এই সকল সেবার অর্ঘ্য বহন ক'রে লোক-সমাজে বিতরিত হয়। তার মধ্যে কতকগুলি পুস্তকাকারে বা পত্রিকার আকারে আমাদের কাছেও 'সমালোচনার্থে' আসে। কিন্তু সমালোচনা করা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা একটু গোলমেলে। পূর্ব্বেও কল্লোলের মারফত এই কথাই বোঝাতে চেষ্টা করেছি।

সত্যিকারের কোনও একটি ক্ষুদ্র গল্পও সমালোচনা করতে গেলে বেশ বড় একটি প্রবন্ধ হ'য়ে দাঁড়ায়। কারণ 'ভাল হয়েছে', 'চলন সই' বা 'রাবিশ' এই কথা বলে রায় দিয়ে দেওয়া এক রকম সমালোচনা করা আমাদের দেশে প্রচলিত। আমাদের মনে হয় তাতে রচনা বা পুস্তকগুলি সম্বন্ধে সম্যক সুবিচার করা হয় না। সব চাইতে বড় কথা, সমালোচনা করবে কে? সমালোচককে কত বড় দরদী, কতখানি জ্ঞানী ও কতখানি সমদর্শী হতে হবে আমরা তা মনেই রাখি না। লেখা, সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত বা বিজ্ঞান সম্বন্ধে সব সমালোচনা পত্রিকার আপিসের সম্পাদক বা তাঁর কোনও সহকর্ম্মী হয় ত করছেন। পত্রিকা একখানা হাতে আছে বলে 'লিখে দিলাম কলাপাতে' এইভাবে 'হাতে মাথা কাটা' ব্যাপারটা পরের লেখার সমালোচনার ব্যাপারে না করাই ভাল বলে আমাদের মনে হয়। আর ভাল করে কোনও জিনিষকে সমালোচনা করতে হলে তাকে তার পূর্ব্বে যতখানি সময় ও ধৈর্য্যদ্বারা অধ্যয়ন করতে হয়, তা' আমরা সাধারণত পারি কি? সেইজন্য অন্তত কল্লোল-এ সমালোচনা করার স্পর্দ্ধা আমরা রাখি না। আর আমাদের সমালোচনার মূল্য কি? পত্রিকার আপিস আর গভর্ণমেণ্ট বিচারালয় প্রায় এক ধরণেরই। তাঁদেরও আইন্ নিজেদের তৈরী, দেশশাসন করছেন তাঁরা, বিচারালয় তাঁদের, যাঁরা বিচারক, তাঁরাও তাঁদেরই বেতনভোগী—এ ক্ষেত্রে আমরা সুবিচারেরই আশা করতে পারি। কিন্তু বিচারও হয় ত অনেক ক্ষেত্রে সুবিচারই হয়—আমরা, জনসাধারণ, তা' সত্বেও অনেক সময় তা' গ্রহণ করতে পারি না। মনে হয় যেন অবিচার হয়েছে। তাও যে হয় না, তাও নয়।

উকিল, মোক্তার, সাক্ষী সবুদের ভাল বন্দোবস্ত থাকলে বিচারককে পর্য্যন্ত ধাঁধিয়ে দেওয়া যায়। পত্রিকার আপিসের ব্যাপারও প্রায় তদ্রূপ। আইন্ বলতে আমাদের গোষ্ঠীগত ধারণা, বিচারালয় আমাদের নিজেদের কাগজ, বিচারক আমরা, আমাদের আত্মঅহঙ্কারও আত্মপ্রসিদ্ধির বেতনভোগী—কাজেই বিচার সুবিচারও হতে পারে, না-ও হতে পারে। সমালোচনায় একজনের লেখাকে 'বরবাদ'ও ক'রে দিতে পারি, চাই কি সমালোচনা ক'রে একটা লেখাকে প্রসিদ্ধও ক'রে দিতে পারি। তা-ছাড়া উকিল মোক্তার, সাক্ষী সাবুদ্ আমাদেরও ভড়্কে দেয়। উকিল হচ্ছে পরম অনর্থ লেখাটি, যদি কোনও নামকরা লেখকের হয়, সাক্ষী হচ্ছে অন্য কোনও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বা কাগজ যদি সেই লেখারই প্রশংসা করে থাকে, সাবুদ হচ্ছে, সেটা মস্তবড় বিপদ—লেখক বা প্রকাশকের সঙ্গে যদি পত্রিকার আপিসের বিশেষ পরিচয় থাকে। সেই পরিচয় নিষ্ঠুরভাবে অনুরোধের আকারে এসে ভাল সমালোচনা দাবী করে। মানুষমাত্রেই খোসামুদ বা প্রশংসা পেলেই মাথা খারাপ ক'রে বসে। লেখক বা প্রকাশক যদি তার উপর দুই এক কথা প্রশংসা ক'রে কিছু বলে তা হ'লে ত বিচারাসনে ব'সে সে ঋণও শোধ করতে হয়। বলতে গেলে সাতকাণ্ড রামায়ণ হয়ে পড়ে কিন্তু তা না ক'রে আমরা বিনীত ভাবে, লেখক, গ্রাহক, প্রকাশক সকলকে জানাচ্ছি, আমাদের দ্বারা অসম্পূর্ণ, দায়-সারা, পক্ষপাত সমালোচনা সম্ভব হবে না। তার কারণ, আমাদের দীর্ঘ অবসর নাই, আর আমরা সমালোচনা করবার মত ক্ষমতা রাখি ব'লেও মনে করি না।

তবু চেষ্টা করি, যাতে পত্রিকার আপিশে লেখা বা বই পাঠাবার উদ্দেশ্য সফল হয়।—লোকে জানতে পারে। যতদূর সম্ভব পাঠকের মন আকর্ষণ করবার মত জিনিষগুলি নির্দ্দেশ করে দিই, মোটামোটি ভাল যদি বলতে পারি তাহ'লে তাও বলি। নেহাৎ খারাপ বোধ হলে ক্ষেত্রবিশেষে তাও বলতে হয়।

এবারও কতকগুলি বই প্রভৃতি "সমালোচনার্থ" পেয়েছি। ঠিক্ 'Review' করবার মত সুবিধা নাই। পাঠকরা বইগুলি কিনে পড়ুন, এটা বোধ হয় প্রকাশকমাত্রেরই ইচ্ছা। কিনে পড়ে যাঁর যে রকম লাগ্‌ল তাও বইয়ের একরকম দর-যাচাই। তবে আমাদের যে দেশ—বলতে দুঃখ হয়, ভাল লেখা বই খুব কম লোকের পছন্দ হয়। বই কাটে বেশী—আমরা আর নাম করব না,— 'সুধীজন জান নিজ মনে।'

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় আজকালকার উঠ্‌তি লেখক। নামও খুব হয়েছে

কিন্তু তার চেয়ে আশ্চর্য্য যে, নাম ত হয়েছেই, তাঁর লেখাগুলিও সত্য সত্যই ভাল। লেখা ভাল না হলেও আমাদের দেশে নাম করা যায়, কিন্তু শৈলজানন্দ সে 'ক্লাশের' ছেলে নয়। খাঁটি বাংলার ছেলে, বাংলার আঁধারে কানাচে ঘুরে আমাদেরই ছবি আমাদেরই দেখিয়ে দিচ্ছে। কল্‌কাতায় চিরকাল বাস ক'রে সে পাঁড়াগাঁয়ের কথা লেখে না। তার দুখানি নূতন বই বেরিয়েছে। 'মাটির ঘর' উপন্যাস--দাম দুই টাকা; আর 'অতসী' ব'লে গল্পের বই—দাম এক টাকা বার আনা। প্রকাশক বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ছাপা বাঁধাইর কথা বল্‌তে পারি, ভাল হয়েছে। নূতন কথায় চির-পুরাতন বাংলার ব্যথার প্রকাশ এই দুইখানি বই।

বাংলার পাগ্‌লা ছেলে কাজী নজরুল ইস্‌লামের নূতন বই দুইখানি—'চিত্তনামা' —মূল্য একটাকা—প্রাপ্তি স্থান—ডি, এম, লাইব্রেরী, ৬১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা। দেশবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, কবিতার বই। সুন্দর বাঁধান; চল্লিশ পৃষ্ঠা।

আর একখানি—'ছায়ানট্'—দাম পাঁচ সিকা। প্রকাশক—বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস্, ১৯৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কবি বলছেন—'হে মোর রাণী! তোমরা কাছে হ'ার মানি আজ শেষে। আমার বিজয়-কেতন লুটায় তোমার চরণ-তলে এসে।'

ভাষার 'দো-ভাষী' শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক তাঁর নব-প্রকাশিত 'ত্রিবেণী' ও 'অমুক্ত-কাহিনী'তে দেশের ঐতিহাসিক কালকে ও মানুষকে আশ্রয় ক'রে গল্পের ছাঁদে যুগ যুগের অকথিত বাণীকেই প্রকাশ করেছেন। 'ত্রিবেণীর' দাম ন' আনা; অমুক্ত-কাহিনীর দাম একটাকা সাত আনা। প্রকাশক—কল্লোল পাবলিশিং হাউস্, ২৭ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আর একখানি বই শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী মহাশয়ের। উপন্যাস—নাম 'মৃণাল'। মৃণালের নাম ধ'রে ব্যথার-কাঁটা ভরা বাংলার তরুণ প্রাণের প্রণয়-কাহিনী। দাম—দেড়টাকা। একটা কথা কেবল বলি—এখানি বাজে উপন্যাস নয়।

এবারকার মত তাহ'লে আমাদের কথা শেষ করি। গোকুলের মৃত্যুতে যাঁহাদের কাছে থেকে সহানুভূতি ও চিঠি পত্রাদি পেয়েছি তাঁদের সকলকে আমাদের পক্ষ থেকে ও তার আত্মীয়দের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। গোকুল তার প্রাণের জিনিষ 'কল্লোলকে' ছেড়ে, এই ধরণীর ব্যথিত পীড়িত, অত্যাচারিত মানুষগুলিকে ছেড়ে, কোথাও যেতে পারে না, এই কথাই আমরা বিশ্বাস করি।

পুরোহিত

শ্রীকিরীট ঘোষ

চন্দ্রপুরের ভট্টচাজ-পণ্ডিতের ছেলে জ্যোতিশ যখন বি, এ, পাশ করে তার বাবার ব্যবসা অর্থাৎ পুরোহিতগিরি করতে লাগল তখন লোকের তাক্ লেগে গেল। কেননা এটা তাদের কল্পনাতীত। তার বাপ-দাদা এ কাজ করে এসেছে, তাই সে এ কাজ করতে মন দিল। শীঘ্রই সে বেশ প্রতিপত্তি করে নিলে। চারিদিকেই তার নাম ছড়িয়ে পড়ল।

সে পুরোহিতগিরি করত, আর রাত্রে ছোটলোকদিগকে ধর্ম্মকথা শুনাত। তাদের সৎপথে আনতে চেষ্টা করত। তারা তাকে বোধহয় প্রাণের চেয়ে ভালবাসত। ছোটলোকদের সঙ্গে এত মেলামিশার জন্য লোকে কিন্তু আর আজকাল তাকে বড় একটা সুনজরে দেখত না। বলত, ছোকরা বিদেশী ভাবাপন্ন।

গ্রামের উত্তর দিকটা ছিল একটু ফাঁকা। সেখানে একটা ঘরে অপরূপ সুন্দরী মলিনা বাস করত। যৌবন তার দু'কূল ছেয়ে উঠেছে। অনেকে তার নিটোল গঠন, সুন্দর চেহারা, আড় চোখের চাউনীতে পথভ্রষ্ট হত। সে চিরকাল এমন ছিল না। এই গাঁয়েরই সে গৃহস্থের বউ ছিল। তার বয়স যখন পনেরো তখন তার কপাল পুড়ল। তার বছর দু'য়ের পরে যখন তার সবে মাত্র যৌবন দেখা দিয়েছে তখন গাঁয়ের জমিদারের ছেলের প্রলোভনে সে কূলে কালি দিয়ে বেরিয়ে এল। সেই থেকে সে এই পথের পথিক।

(২)

সেদিন ছিল কি একটা পূজা। মলিনা একখানি রেকাবিতে ফল ও ফুল নিয়ে চলেছে মন্দিরে পুজো দিতে। পথে ও'পাড়ার চাটুয্যের সঙ্গে দেখা হল। মলিনাকে দেখে চাটুয্যে মুচ্‌কি হেসে বল্লেন—এ সব নিয়ে কোথা চললি মলিনা?

উত্তর এল, পূজা দিতে।

উত্তর শুনে চাটুয্যে হো হো করে হেসে বললেন—ক্ষেপ্‌লি নাকি মলিনা? তোর ছোঁয়া ফুল দিয়ে কি ঠাকুরের পূজা হয়?

মলিনা কুণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করল—কেন হয় না?

চাটুয্যে বল্‌লেন—ভুলে গেছিস কি, তুই কে?

মলিনা বল্‌ল—তাতে কি? তোমরা আমার হাতে খাও, আর ঠাকুর দেবতা কেন খাবেন না? তোমার ছোঁয়া দেবতা যখন নেন্‌, তখন আমার ছোঁয়া নেবেন না কেন?

এই ব'লে মলিনা ধীর মন্থর গতিতে মন্দিরের দিকে চল্‌ল। চাটুয্যে তাকে যেতে দেখে মনে মনে বিপদ গুণে পাড়ায় লোকদের খবর দিতে চল্‌ল।

(৩)

মলিনা যখন পৌছল, তখন জ্যোতিশ মন্দিরের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। মলিনা আস্তে আস্তে পূজোর থালাটি নাবিয়ে, পূজারীকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলে—আমার এ উপহার ঠাকুর কি নেবেন না?

জ্যোতিশ হেসে বল্‌লেন—নেবেন না কেন?

মলিনা সন্দিগ্ধচিত্তে কহিল—সত্যি?

পূজারী বল্‌লেন—হাঁ সত্যি।

মলিনা পুনরায় বল্‌ল—কিন্তু ওপাড়ার চাটুয্যে মশাই বল্‌লেন, পতিতার পূজা দেবতা নেন্‌ না।

পূজারী হেসে বললেন—কেন? তোদিগে যারা পতিতা করেছে তাদের পূজা যদি মা নিতে পারেন, তাহলে তোদের পূজা নেবেন না কেন?

মলিনা চমকে উঠল, ভাবল—তাই ত।

(৪)

গাঁয়ের লোক যখন এ কথা শুনল, তখন তারা ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তখনই ঠিক করল, জ্যোতিশকে মন্দিরের পূজারীর পদ থেকে সরাতে হবে। যেমন কথা, তেমনি কাজ। সেদিনই জ্যোতিশ ও-পদ হারাল আর সমাজে পতিত হল।

মলিনা যখন এ কথা শুনল, তখন কেঁদে জ্যোতিশ ঠাকুরের পায়ের তলায় পড়ে রুদ্ধকণ্ঠে বলল—ঠাকুর! এ পোড়ামুখীর জন্য এ কি করলে?

ঠাকুর স্মিতবদনে বল্‌ল—যা করা উচিত, তাই করেছি।

—তা হলে লোকে তা বুঝতে পারছে না কেন ?

—সেটা লোকের দুর্ভাগ্য।

* * * *

সেইদিন রাত্রে মলিনা গ্রাম ছেড়ে কোথায় চলে যাচ্ছিল। পথে জ্যোতিশের সঙ্গে দেখা হল। মলিনাকে দেখে জ্যোতিশ জিজ্ঞাসা করল—এত রাত্রে কোথা যাচ্ছ ?

মলিনা বল্‌লে—পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে ?

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় ?

মলিনা জবাব দিল—কি জানি কোথায়।

ঠাকুর বল্‌লে—চল তোমাকে কাশী রেখে আসি।

মলিনা কিছু বলল না, শুধু নীরবে ভক্তি-অশ্রু দ্বারা ঠাকুরের পা দু'টি সিক্ত করে দিল।

* * * *

ভোরে গ্রামের লোক যখন শুন্‌ল, জ্যোতিশ ও মলিনা গ্রাম ত্যাগ করে চলে গেছে, তখন সবাই জ্যোতিশকে ছিঃ, ছিঃ করতে লাগল। চাটুয্যে মশাই বল্‌লেন—আমি আগে থেকেই জানতাম, ও ছোকরা ভণ্ড। কথায় বলে অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ !

গ্রামের এপার হ'তে ওপার পর্য্যন্ত অমনি প্রতিধ্বনি উঠল—ভণ্ড !



কল্লোল



কান্তিক প্রেস, কলিকাতা

শিল্পী—শ্রীযামিনী রায়



তৃতীয় বর্ষ

নবম সংখ্যা

পৌষ, সন ১৩৩২ সাল

প্রতি সংখ্যা চারি আনা

মাশুলসহ বার্ষিক তিন টাকা আট আনা

সম্পাদক—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

কল্লোল পাবলিশিং হাউস

২৭ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৯ম সংখ্যা
তৃতীয় বর্ষ



পৌষ
১৩৩২

রলাঁ ও তরুণ বাংলা

শ্রীকালিদাস নাগ

এই সামান্য পত্রিকাটিকে ঘিরিয়া আজ যে সাহিত্য-মণ্ডলী গড়িয়া উঠিতেছে, ইহাদের প্রয়াসকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মত প্রচুর হাস্য-শক্তি হয় ত আমাদের অনেকেরই আছে ; হয় ত ইঁহারা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নগণ্য এবং এই নগণ্য অস্তিত্বের কথা ইঁহারাও অস্বীকার করিবেন না—কিন্তু এই প্রয়াসের অন্তরালে একটী শক্তি আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিতেছে।

এই নগণ্য সাহিত্যিকগণ আপনাদের আদর্শের দুঃসাহসিকতায় প্রণোদিত, তাঁহারা জানেন যে সাহিত্যের জাহ্নবী-ধারা প্রত্যেক তটভূমিকে অভিনন্দন করিয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। ভৌগোলিক সীমার মধ্যে মানবের চিন্তার ধারা সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। জগতের যেখানে যে মহাপুরুষ জাতি ও কালের সীমাবন্ধন অতিক্রম করিয়া সকলের হইয়া উঠিয়াছেন, যাঁহাদের চিন্তা বিশ্ব-দেহের শিরায় রক্তের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মানব প্রজ্ঞায় ও শ্রদ্ধায় তাঁহাদিগকে আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবে। সাহিত্যে এই যোগ-সাধনার ব্রতে প্রণোদিত হইয়া এই মণ্ডলীটি জগতের সমস্ত দেশের স্রষ্টাদের সহিত একটা পরিচয় ও আত্মীয়তার সম্বন্ধ সৃষ্টির জন্য নামেন। মহৎ অথবা বৃহতের সহিত সাযুজ্যের

যে সম্পর্ক তাহাতে যে খোসামোদের স্থান আছে সে কথা হয়ত আমাদের অনেকেরই মনে প্রথমেই জাগিতে পারে, কিন্তু এই সম্বন্ধের মধ্যে অন্য আর একটী বস্তনী আছে, সে পুণ্য-উৎসুকা ও সত্য-জ্ঞান-স্পৃহা। শেষের এই পথে নিষ্ঠার সহিত চলিয়া বহু সাহিত্যিকের সহিত ইঁহারা আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিয়াছেন। সমস্ত জগতের সম্মানের আসন হইতে এই সমস্ত মহাপুরুষগণ বন্ধুর মত নামিয়া আসিয়া ইঁহাদের সহিত মিশিয়াছেন। বিরাট ব্যক্তিত্বে স্বপ্রতিষ্ঠিত এই সমস্ত জীবনের সংস্পর্শ আমাদের সাহিত্যে ও সমাজে যে প্রয়োজন আছে তাহা প্রত্যেকেই বুঝি। তাঁহাদের মধ্যে যিনি ক্ষুদ্রদের সহিত একান্ত বন্ধু হইয়া মিশিয়াছেন এবং দূরে থাকিয়াও বন্ধুত্বের মধ্য দিয়া বাংলার তরুণ হৃদয়কে বুঝিতে চাহিয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন, আজ তাঁহার ষষ্ঠীতম জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমি মহাপ্রাণ রম্যাঁ রলাঁর কথা বলিতেছি।

এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা আপনিই আসিতেছে। সে আজ সংগ্রাম-মুক্ত। সহোদর বলিয়া যাহা তখন বলিতে পারি নাই, সহকর্ম্মী বলিয়া আজ কিছু বলিব। "পথিক" লেখা শেষ হইলে গোকুল সুখ্যাতিও পাইয়াছিল, সমালোচনাও শুনিয়াছিল। কিন্তু সে আপনি ছিল আপনার সব চেয়ে বড় সমালোচক। সে জানিত, যে-বিষয়ে সে লিখিয়াছে তাহার জন্য জীবনের আরও সমগ্র ও গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন কিন্তু তাহার জীবনের মূলে একটী বেদনা-সঙ্কুল আকুতি অনবরত প্রকাশের বেদনায় পূর্ণ থাকিত; সেই আকুতির প্রেরণাতে সে "পথিক" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। "পথিক" লেখার শেষে গোকুল আমার সহিত কথোপকথনে "জাঁ ক্রিসতফ" অনুবাদের কথা তোলে। একটী বৃহত্তর কাজে নিজকে দীক্ষিত করিবার জন্য সে এই অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়। তাহার মনে জাতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে কোন ভ্রান্ত ধারণা ছিল না। প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান প্রত্যেক ভাবাভাবী মানবের জন্য; অনুবাদ সাহিত্যের দ্বারা আপনাদের ভাষা ও সাহিত্যকে গৌরবান্বিতই করা হয়, এই আদর্শ সে অন্তর দিয়া গ্রহণ করিয়া নিষ্ঠার সহিত এই কার্য্যে নামে এবং নিদারুণ ব্যাধির মধ্যেও তাহার জীবনের একটী শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য ভাবিয়া "জাঁ ক্রিসতফে"র অনুবাদ সে করিয়া গিয়াছে। আমি এই অনুবাদে তাহার সহিত যোগদান করি। এবং এই জাঁ ক্রিসতফ অনুবাদের কথা রলাঁকে যখন জানান হয়, তিনি প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছিলেন,—

৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫

আপনাদের সকলের মিলিত আহ্বান-পত্র পাইলাম। তাহার সঙ্গে আপনাদের ১৫ই তারিখে প্রেরিত পত্রিকাও পাইয়াছি। আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শুনিয়া সুখী হইলাম যে, আমার প্রিয়বন্ধু কালিদাস নাগ আমার জাঁ ক্রিস্তফ্ কল্লোলের পাঠকের জন্য অনুবাদ করিতেছেন। আমার মানসপুত্র—ঘরছাড়া দুরন্ত ক্রিস্তফ্ য়ুরোপের অন্তরদেশ পরিক্রমণ করিয়া আবার চলিয়াছে ভারতবর্ষের পথে-বিপথে। তাহার প্রাণে দুইটী গভীর রহস্য আছে; সে দুটী যেন আপাত-বিরোধী। একটী বিদ্রোহ (Revolt) আর একটী সমন্বয় (Harmony)। প্রথমটী সে অতি অল্প বয়সেই আবিষ্কার করিয়াছিল, দ্বিতীয়টী আসে বহুবর্ষ পরে গ্রাট্সিয়ার নিকট হইতে। আমার প্রত্যেক বন্ধু যেন চিরন্তন প্রেয়সী গ্রাট্সিয়ার দেখা পায়,—হউক সে বাস্তবে, হউক সে মানস-স্বর্গে।

কিছুদিন পূর্ব্বে আপনাদের ইচ্ছা অনুসারে আমার একটী ফটো পাঠাই। এবং তাহাতে কয়েকটী লাইন লিখিয়াছিলাম ফরাসী ভাষায়; কারণ আমি ইংরাজী ভাষায় লিখি না। ইহাও নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে, আপনারাও কিছু ফ্রেঞ্চ অথবা লাটিন শাখার যে কোনও ভাষার চর্চ্চা রাখিবেন, কারণ এই সমস্ত ভাষা ইংরাজীর তুলনায় বাংলা ভাষার সহিত নিবিড়তর সম্বন্ধে আবদ্ধ; সে সম্বন্ধ তাহাদের ভাবের উদ্দীপনায় ও স্নিগ্ধ সুর-লালিত্যে।

এখন আমার পালা আপনাদের কাছে কিছু দাবী করিবার। আপনারা আমার জাঁ ক্রিস্তফ্ বাংলা ভাষায় অনূদিত করিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। আমার কয়েক জন য়ুরোপীয় বন্ধু ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সাহিত্যের সহিত যোগ সাধন করিতে চান। ভারতবর্ষের সমসাময়িক লেখকগণের নভেল, ছোটগল্প অথবা প্রবন্ধ পাইলে জুরিকের এমিল রনিগার (Roniger) অনূদিত করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশিত করিবেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর রচনাদি অনূদিত করিয়াছেন। এখন আপনাদের সমসাময়িক সাহিত্যের অনুবাদ প্রয়োজন; যেমন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনার সঙ্গে পরিচিত হইলে আমরা সুখী হইব। K. C. Sen ও Thompson কর্ত্তৃক অনূদিত তাঁহার শ্রীকান্ত (১ম ভাগ) বইখানি পড়িয়া তাঁহার অভিনব ব্যক্তিত্বে ও লিপি-কুশলতায় মুগ্ধ হইয়াছি। আপনাদের সাহিত্যে সমসাময়িক প্রসিদ্ধ লেখকগণের গল্প

লেখার অনুবাদ গ্রহণের কোনও বন্দোবস্ত করা যায় কি? ইহাতে আপনাদের মাতৃ-ভাষা গৌরবান্বিতই হইবে; এই সমস্ত বই বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িবে।

ভারতের নবীন লেখকদিগের নিকটে নিবেদন এই যে, আমার মাইকেল এঞ্জেলো, বেটোফেন্, টলষ্টয়, ও গান্ধীর জীবনী যে ভাবে লেখা, সেই ভাবে তাঁরা যেন ভারতের মহাপুরুষদের জীবনী লেখেন। ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা উদ্রেক করার ইহার অপেক্ষা ভাল কোনও পন্থা নাই। য়ুরোপ ব্যক্তিত্বে অতি-বিশ্বাসী। সে কোনও একটী ভাব বা আদর্শের অপেক্ষা ব্যক্তির বা ব্যক্তিত্ব দ্বারাই সর্ব্বদা অধিকতর অনুপ্রাণিত ও আকৃষ্ট হয়। তাহার সম্মুখে আনিতে হইবে—ভারতের মহাপুরুষ ঋষি অধিনায়কদের। প্রিয় দীনেশরঞ্জন দাশ ও কল্লোলের বন্ধুগণ, এই কথাগুলি আপনাদের কাছে নিবেদন করিলাম।

আপনাদের আন্তরিক অনুরক্ত বন্ধু
রমঁ্যা রলাঁ।

এই চিঠির সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করা ধৃষ্টতা মাত্র। রবীন্দ্রনাথের কথায় "তুচ্ছ যাহা তুচ্ছ তাহা নয়" রলাঁ আপনার জীবন ও সাহিত্যে তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন। তাই এই অপরিজ্ঞাত সাহিত্যিকগণের সহিত তিনি যে সম্বন্ধের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব। তরুণ ভারতের প্রতি রলাঁর এই নিবেদন হয় ত এখন অর্থশূন্য লাগিবে, কিন্তু যে-ভিত্তি আজ নীরবে বহুস্থলে গাঁথা হইতেছে, একদিন এই ব্যাপার তাহারই নির্ভরভূমি বলিয়া রলাঁর এই কল্যাণেচ্ছাটিকে আমরা সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করিব।

তাঁহার ভগ্নী মাদ্‌লেন্ (Madeleine) রলাঁর সাহায্যে তিনি নিয়মিত "কল্লোল" শুনিতেন। গোকুলের অসুখের কথা শুনিয়া সুদূর সুইশ্ দেশ হইতে সমবেদনায়, বন্ধু ও অগ্রজের মত যে কথাগুলি তিনি গোকুলকে লিখিয়াছিলেন, মৃত্যু-পথ-যাত্রীর অন্তরে তাহা অনেকখানি শান্তি আনিয়া দিয়াছিল। গোকুলের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইয়া যে পত্র লেখেন তাহা হইতে অংশ বিশেষ নীচে দিলাম,—

......যে দুঃখ আজ তোমায় ও তোমার বন্ধুবর্গকে অভিহত করিয়াছে আমাকেও তাহা সমানভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে। তোমাদের বেদনা সে আমারও। যে তরুণ সহযাত্রী পথিক ভাইটীকে মৃত্যু তোমাদের মধ্য হইতে কাড়িয়া লইয়া গেল

তোমাদের মধ্য দিয়া যে আমি তাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম।......ভবিষ্যতের জন্ত যাহাদিগকে প্রয়োজন তাহাদের একে একে মৃত্যুলোকে তিরোহিত হইতে দেখা, দেশের কি দুর্ভাগ্য। মনে হয় তোমাদের বঙ্গভূমি নিষ্করুণভাবে উদাসীন এবং অপব্যয়ে অপরিমিত! মুকুলেই সব ঝরিয়া যায়, ফলের পরিণতি ত দূরের কথা।

তবু বুক বাঁধিয়া চলিতে হইবে—যাহারা আজ পিছনে পড়িয়া আছে, তাহাদের আগে চলিতে হইবে! তাহারা আজ যে শুধু আপনাদেরই নিয়তিকে পূর্ণ করিবার জন্ত রহিল তাহা নয়—যাহারা চলিয়া গেল—যে প্রিয় বন্ধুগণ বিদায় লইয়া গিয়াছে তাহাদেরও চিন্তাকে ফলবতী করিতে হইবে—তাহাদের অসমাপ্ত কর্ম্ম শেষ করিয়া ফসল তুলিতে হইবে। আমাদের এ জগতের বার্ত্তা বহন করিয়া তাহারা অপর লোকে গমন করিয়াছে, জীবনের এই নিষ্ঠুর সংগ্রামে যাহারা আহত হইয়া মরিল কিংবা যাহারা আপনাদের আপনি আঘাত করিয়া মরিল—ইহাদের সকলের অন্তরের নিগূঢ় বাণী বহন করিয়া তাহারা গিয়াছে অপর লোকে......যত দেখা যায়, মন ততই গভীরভাবে অনুভব করে (আজ যেমন আমি অনুভব করি)। যাহারা আমাদের ভালবাসিয়াছিলেন এবং যাহাদের আমরা অনন্তকাল ধরিয়া ভালবাসিব আমরা প্রত্যেকেই সেই অলক্ষ্য পুণ্য মণ্ডলীর বাণী বহন করিয়া চলিয়াছি।......বিগত ষাট বৎসর ধরিয়া আমি এই বিশাল পৃথিবীর অপরিসীম বেদনা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি। আমার বিশ্বাস বেদনাই মানবতার চরম-ভাগ্য। আপনাকে অহরহঃ নব নব প্রেরণা ও কর্ম্মের মধ্যে জাগ্রত রাখিবে বলিয়া কালের উত্তরাধিকার সূত্রে মানব নব নব বেদনার ভোগাধিকার পাইয়াছে।

"বিশ্ব মানব-দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠানে তুমি প্রাণ ঢালিতে চাও? প্রথমে তবে এই বেদনার ভোগবতী নদীটি পার হও! অন্ত উপায়ে সে মন্দিরে প্রবেশ করা অসম্ভব। বেদনায় যখন চিত্ত বিদীর্ণ—তখনই বহিয়া চল মন্দিরের পথে। সেথায় ওপারে অশ্রু-নদীর অপর-কূলে অভিনন্দনের জন্ত অপেক্ষায় আছে অনাদি যুগের প্রিয়তমা আকাশ-দুহিতা আনন্দ।

বেদনা হইতে আনন্দের অনির্ব্বাণ দীপ্তি!

এমনি গাহিয়াছিল শীল্যার (Schilher) ও বেটোফেন্ (Beethoven)।*

---

* শীল্যারের "Hymn to Joy" (আনন্দের স্তুতি) বেটোফেন্ সঙ্গীতে রূপান্তরিত করেন। ইহা বেটোফেনের বিখ্যাত Ninth Symphony-র অন্তর্ভুক্ত।

প্রবাহমান অনন্ত কাল ধরিয়া স্বর্গের বেদনা-দূতী ঝড় ও তুফানের মধ্যে আমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া অপেক্ষা করিতেছে। তাহার মুক্তপক্ষপুটে আমাদের সে নিয়ত ঘিরিয়া রাখে—আমাদের অশ্রুজলের ভিতরেই তাহার অনুপম হাসিটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে . . .”

বাংলার আত্মার সহিত এই যে সুন্দর যোগ আমাদের জাতীয়জীবনে, ইহা একটা মহৎ প্রেরণা। এই যে যোগ-সাধনা রলাঁর সহিত সম্ভবপর হইয়াছে, তাহার অন্তরালে যিনি আছেন এবং এইজন্য যাঁহার কাছে আমরা সর্ব্বতোভাবে ঋণী তিনি রলাঁর ভগ্নী ও সহকর্ম্মিণী মাদ্‌লেন্ রলাঁ। মাদ্‌লেন্ রলাঁ সর্ব্বদাই স্বেচ্ছাবৃত অন্তরালে থাকিয়া আসিয়াছেন, তাই সকলের সম্মুখে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ব্যক্ত করা এখানে সম্ভবপর হইবে না। রলাঁর জীবনের সমস্ত দুঃখ-সংঘাত ও আনন্দের বিরাট আত্ম-উপলব্ধির মধ্যে মাদ্‌লেন রলাঁ তাঁহার বন্ধু ও সঙ্গিনী হইয়া বিপুল স্নেহের ছায়ায় মাতার মত রলাঁকে ঢাকিয়া রাখিয়া আসিতেছেন। তিনি ফরাসীভাষায় এইচ, জি, ওয়েল্‌স্, টমাস হার্ডি, ও রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গের অনুবাদিকা। শুধু জ্ঞান অর্জ্জনে নয়, হৃদয়ের সাধনায়ও তিনি রলাঁরই উপযুক্ত ভগ্নী। এই তাঁর পরিচয়। য়ুরোপের অন্তরস্থলবাসিনী এই ফরাসী রমণীর অন্তরে দেখিয়াছি আমাদের এই বাংলার প্রাণের সহিত পরিচয়ের জন্য কি গভীর আকাঙ্ক্ষা ও আকুতি। মাদ্‌লেন রলাঁকে যখন বাংলা ভাষা শিখাই তখন দেখিয়াছি এই পাশ্চাত্য রমণীর অন্তরে ভাষার মধ্য দিয়া কেমন করিয়া আর একটা জাতির সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করা যায় তাহারই ব্যাকুল ও গভীর চেষ্টা। পাশ্চাত্যজাতি নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি আমরা যে দণ্ড-নায়কের মনোবৃত্তির আরোপ করি সব সময়ে তাহা সুবিচার বলিয়া মনে হয় না। রলাঁই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর এদিক দিয়া তাঁর ভগ্নীও ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। Woman's International League-এর তিনি একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী এবং ভারতের নারী-জীবনকে এই বিশ্বজনীনতার সঙ্গে যোগ করিয়া দিবার প্রয়াসে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। তিনিই রলাঁকে কল্লোল ও অন্যান্য বাংলা পুস্তক ও পত্রিকা পড়াইয়া শুনান; এবং তরুণ বাংলার সহিত যোগ রাখিবার এই পন্থাকে তিনি আনন্দ ও নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। “পথিক” বাহির হইবার পর গোকুল নিজে অসুস্থ অবস্থাতেই দার্জ্জিলিং হইতে মাদ্‌লেন রলাঁকে একখানি “পথিক” পাঠাইতে পারিয়াছিল। তিনি আন্তরিক আনন্দ ও উৎসাহের সহিত তাহা

গ্রহণ করেন ও পড়েন। এবং অতি দূর হইতে বিদায়-উন্মুখ এই পথিকের নিকট—তাহার কর্ম্মের গৌরব স্বীকার করিয়া একটী সত্যকারের আনন্দনিঃস্যন্দী ও প্রেরণাপূর্ণ লিপি পাঠাইয়াছিলেন; সেই শ্রান্ত যোদ্ধার পক্ষে এবং আজও যাঁহারা সেই যুদ্ধ চালাইতেছেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা একটা আনন্দময় সান্ত্বনার কথা।

মাদ্‌লেন রলাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে যে এমন করিয়া লোক-চক্ষুর সম্মুখে আনিলাম সে শুধু আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য এবং সেই জন্য আমি তাঁহার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

খবরের কাগজের বাহিরে আজ নিভৃত-সৃজন-আগারে নীরবে জ্ঞান ও প্রেমের রঙে, যে মহা-জগতের মূর্ত্তিগড়া হইতেছে তাহার গোপন-ইতিহাস যেদিন প্রকট হইবে সেদিন আজিকার এই সমস্ত ঘটনা অন্যতর সার্থকতার মূর্ত্তি গ্রহণ করিবে। আজ ইহারা তুচ্ছ ও ভ্রান্ত বলিয়া অবজ্ঞার আসন পাইতেছে। এই আত্মীয়তার জগতে ভারতের বিশিষ্ট স্থান আছে। এবং সেই আত্মীয়তাকে স্বীকার করিয়া পাশ্চত্য জাতির বহু মণীষি ভারতের সহিত আবার প্রজ্ঞায় মিলিত হইতেছেন এবং তাঁহাদের মধ্য দিয়া আবার পূর্ব্ব ও পশ্চিমের চিন্তার মিলন ঘটিতেছে ও ঘটিবে। রলাঁ যদিও বিশ্বপ্রেমিক তথাপি ভারত এই নামটী তাঁহার কাছে যেন আরও একটু বিশেষ মধুর সংজ্ঞালাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের বৃহত্তর জীবনের দিকে তাঁহার মন ও আত্মা আনন্দে সাগ্রহে চাহিয়া আছে। এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা তাঁহার "গান্ধীর জীবনে" পরিস্ফুট এবং কল্লোলের বন্ধুদের নিকট তিনি যে একটী লিপিকা পাঠাইয়াছেন তাহাতেও ইহার বিশেষ প্রকাশ দেখা যায়।

"হে আমার ভারতবর্ষের বন্ধুরা,

য়ুরোপ ও এশিয়া একই নৌকার বিভিন্ন অংশ। য়ুরোপ পোতাগ্রদেশ; ভারত ভাবরাজ্যের অধিশ্বরী দূরবীক্ষণ গৃহ। সহস্র চক্ষু তার, সহস্র অখণ্ড দৃষ্টি। অনির্ব্বাণ আলোকে চির-প্রতিষ্ঠিত হও, হে আমার নয়নের জ্যোতি। তুমি যে আমার আত্মার জ্যোতি। আমার আত্মা যে তোমার দেহেতে লীন। আমরা এক অচ্ছেদ্য অভিন্ন সত্বা।"

রলাঁর এই স্বপ্ন-ভারত অনেকের কাছে অলীক কল্পনার খেলার মত শুনায় আমরা প্রত্যক্ষভাবে জানি এবং সকলের অপেক্ষা বেশী করিয়াই জানি যে, আজিকার এই বাস্তব-ভারত রলাঁর স্বপ্ন-ভারত নয় এবং সেই জানার অনেক সুবিধাও গ্রহণ করিয়া থাকি; কিন্তু এ কথা সত্য যে, যে-ভারতের মূর্ত্তি আজও

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্য দিয়া বিশ্ব-জগতের সম্মুখে আবির্ভূত হইতেছে সে-ই রলাঁর স্বপ্ন-ভারত এবং সে-ই শাশ্বত-ভারত। সময় ও ঘটনার ক্ষণিক আবরণে শাশ্বত ভারতের মূর্ত্তি হয় ত আবৃত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু যে শাশ্বত-ভারত ছায়ার মত রবীন্দ্র-সাহিত্য ছাইয়া রহিয়াছে, রলাঁর গভীরতম অন্তর-দৃষ্টি সময় ও ঘটনার যবনিকা ভেদ করিয়া সেই শাশ্বত-ভারতকে দেখিয়াছে।

এই আত্মীয়তার জগতে মহৎ ও ক্ষুদ্র মিলিতে পারে হৃদয়ের যোগ-বর্ত্তিতায় এবং তাহা যে মিলিয়াছে তাহারই সাক্ষ্য আজ অবজ্ঞাত অবস্থায় এই সামান্য পত্রিকা রাখিয়া গেল।

রলাঁর ষষ্ঠীতম জন্মতিথি উপলক্ষে তরুণ বাংলার কতকগুলি লেখক এবং তাহাদের যে বন্ধুগণ অমৃতলোকে চলিয়া গিয়াছেন অথচ যাঁহাদের মন ও আত্মা আমাদের সঙ্গে ঘুরিতেছে ও ফিরিতেছে তাহাদের সকলের সম্মিলিত প্রীতি ও শ্রদ্ধার নিবেদন করি যে, রলাঁ, তাঁহার ভগ্নী এবং তাঁহার বৃদ্ধ পিতা তাঁহারা যেন দীর্ঘায়ু হইয়া এই দুঃখ-নিরাশা-গহন যুগেতে মানবতার মহা আদর্শের মূর্ত্ত-বিগ্রহ হইয়া পান্থ-জনের সখার মত পথযাত্রীদের নব নব জীবনে নিয়ত অনুপ্রেরিত করিয়া চলেন।

রম্যাঁ রলাঁ

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বিলাসের স্তব নহে, রচিয়াছ বেদনার বেদ,
হে সৌম্য, সন্ন্যাসী, তুমি গাহিলে সাম্যের সামগান;
নর-নারায়ণে তুমি হেরিয়াছ অখণ্ড অভেদ,
কলহের হলাহল ফেলি' কর শান্তি-সোম-পান!
দুঃখের দহন-যজ্ঞে বোধিসত্ত্ব লভিলে নির্ব্বাণ,
তোমার চরণ স্পর্শে মুক্তি পায় সভ্যতা অসতী;
ভূমারে চিনেছ তুমি অমৃতের পুত্র মহীয়ান,
ব্যথার তুষার পুঞ্জে বহালে আনন্দ-সরস্বতী!
লহ এই ভারতের অকুণ্ঠ অম্লান-নম্র প্রেম ও প্রণতি।

সে কবে আমার মনে

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

যাযাবর হাঁস নীড় বেঁধেছিল বনহংসের প্রেমে
আকাশ-পথের কোন্ সীমান্তে থেমে
সে কবে আমার মনে ;
ডুবেছে বিস্মরণে,
আজি শুধু তার শূন্য নীড়টি ঘিরি
হতাশ আশার উদাস অলস মৌমাছি মরে ফিরি।

বেদিয়ার মেয়ে মরু ছেড়ে হল মোতি-মহলের বাঁদি
চঞ্চল চোখ্ 'বোর্খা'তে দিল বাঁধি
সে কবে আমার মনে ;
ডুবেছে বিস্মরণে।
আজি শুধু তার ত্যক্ত জীর্ণ ঘরে
পুরোণো স্মৃতির শ্রীহীন শুকানো পল্লব কাঁদি মরে।

শুক্‌নো চড়ায় সারাদিন করে শকুনিরা কলরব,
ভাদ্রের বানে ভেসে লাগে ঘাটে শেফালি-শিশুর শব,
আমার পরাণে আজি ;
উৎসব বেশে সাজি
হৃদয়ের পথে কঙ্কালগুলি চলে,
বাসর-রাতের দীপ নিবে গেছে বিধবা-নয়ন-জলে।



কপালের লিখন

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ডাক্তারী পাশ করে দেশে বসে বেশ কিছু করে খাচ্ছিলাম। নগদ বিশেষ কিছু হোক্ বা না হোক, রোগীর কাছ থেকে সময়ে অসময়ে কলাটা কচুটা আমার নির্ঘাত পাওনার মধ্যে গণ্য ছিল। আর একটা সুবিধা ছিল—আমিই ছিলাম আমার কেন্দ্রের অবিসম্বাদী রাজা। আমার উপর কথা বলবার আর কেউ ছিল না। কাজেই অনেক উঁচু মাথা নুয়ে পড়ত আমার অক্ষুণ্ণ প্রতাপের সাম্‌নে। ফলকথা বেশ সুখেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু ব্যঙ্গ-রসিক অদৃষ্ট দেবতার আমার এ সুখ সহ্য হ'ল না। একদিন কুক্ষণে দেশের পাত্তাড়ি গুটিয়ে কল্‌কাতায় গিয়ে 'প্রাক্‌টিশ্' করবার খেয়াল চেপে গেল। কালী, গঙ্গা মুখ তুলে চাইলে কলকাতায় গিয়ে বড় লোক হ'তে যে দু' দিনও দেরী লাগে না, এ সম্বন্ধে আমার অনেক গল্পই শোনা ছিল। এযাবৎ কোনটাই আমাকে তেমন কিছু বিচলিত করতে পারে নাই। কিন্তু কি করে দীনু ঘোষ পান্তাভাত খেয়ে পারাণীর পয়সার অভাবে সাঁতরে গাঙ্ পেরিয়ে মাত্র ছ'মাস পরে ফিরে এসে দোতালা বাড়ী ছেঁদে দিয়েছে—এই কাহিনীটাই আমার মুখের রুচি আর চোখের ঘুম কেড়ে নিল। শেষে আর অযথা কালবিলম্ব না করে এক হাসি-ভরা সুন্দর প্রভাতে প্রায় মাহেন্দ্রযোগ সম্বল করে বেরিয়ে পড়লাম রাজধানীর উদ্দেশে।

শহরে এসে প্রথম অসুবিধা হ'ল বাড়ী নিয়ে। দুই, চার দিন ধরে অনবরত ঘুরে অনেক 'পিসাবখানা' এবং বাতিথামের গা খুঁজেও কোন খালি বাড়ী পেলাম না। যা' দুই একটা পেলাম তারও আবার ভাড়া বেশী। শেষে পুণ্যের মাত্রাটা একটু বেশী হয়েছিল বলেই বোধ হয় এই নশ্বর দেহ নিয়ে 'স্বর্গধাম'এর একপাশে একটু জায়গা মিল্‌ল।

চাকুরীর দরখাস্ত লিখ্‌বার সময় 'সেকেণ্ড ডিভিশান'এ কি 'থার্ড ডিভিশান'এ পাশের কথাটা উল্লেখ না করে লোকে যেমন জোর দেয় 'ফার্ষ্ট

ভিভিশান'এর উপরে, 'স্বর্গধাম'এর মালিক গোবর্দ্ধন দাস মশায়ও তেমনি আলো বাতাসের কথা বাদ দিয়ে কেবলই বল্‌ছিলেন যে তাঁর ঘরের একটা প্রধান গুণ এই যে এখানে কারো কেরোসীন তেলের খরচ লাগে না। জানলা খুল্‌লেই সরকারী গ্যাসের আলো ঢুকে ঘর দু'খানাকে একেবারে 'দিন-অবতার' করে দেয়। ভাড়া যে তিনি একটু বেশী চান তার মানেও এই। মাসকাবারে ঐ একটি গ্যাসের আলোর জন্তেই তাঁর নগদ তিনটি করে টাকা ট্যাক্‌সো গুণ্‌তে হয়। তা' না হ'লে এই কলকাতার শহরে বাড়ী ভাড়া দিতে দিতেই ত তিনি বুড়ো হয়েছেন, তিনি কি আর বোঝেন না যে অমন দুইখানা নীচের ঘরের ভাড়া বিশ টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়? তবে আমার কথা স্বতন্ত্র। ডাক্তার মানুষ, তাঁর বাড়ী থাকবো, বিপদে সম্পদে তাঁকে একটু না দেখে ত আর পারবো না। এই জন্যে সমস্ত ছেড়ে দিয়ে মাত্র ট্যাক্‌সো বাবদ মাসিক পনর টাকা নিয়ে ১০নং উদয় কুণ্ডু লেন-স্থিত 'স্বর্গধাম'এর নীচের দুইখানা ঘর বৎসরাবধি-কালের জন্ম ভোগ দখল কর্‌বার অধিকার তিনি আমাকে দিলেন। এই মর্ম্মে একটা লেখা পড়াও হ'য়ে গেল।

* * *

চোরা বাজার থেকে গোটাদুই আলমারী এবং খানচারেক চেয়ার এনে ঘর সাজিয়ে ফেল্‌লাম। দয়াপরবশ হ'য়ে গোবর্দ্ধনবাবু তাঁর পৈতৃক আমলের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত একখানি তালিমারা টেবিল আগেই দিয়েছিলেন। ঢুকতেই হাতের ডাইনে নাম এবং নামের চেয়ে বড় করে খেতাব লেখা কাষ্ঠ-ফলক খানিও টাঙানো হ'ল। কিন্তু এই সব অনুষ্ঠান আয়োজন যাদের জন্ত কল্পনা-লোকের জীবের মত তাঁরা অশরীরীই রয়ে গেলেন।

প্রথম প্রথম গোবর্দ্ধনবাবু আমাকে যথেষ্ট আশা ভরসা দিয়েছিলেন এবং আমার মত তরুণ যুবকের পক্ষে শহরের হাওয়া মোটেই স্বাস্থ্যপ্রদ নয় বলে আমার মুরুব্বিস্থানীয়ও হয়েছিলেন। তাঁর একমাত্র মৃতবংশধরের সাথে আমার আকৃতি-গত সাদৃশ্য ছিল বলেই নাকি আমি তাঁর হৃদয়ের অনেকখানি জুড়ে বস্‌তে পেরেছিলাম। কিন্তু তাঁর স্নেহের দুলাল হ'য়ে থাক্‌বার সৌভাগ্য আমার বেশীদিন রইল না! একদিন আমার ঘরে ঢুকে অষুধের আলমারীর দিকে চাইতেই তাঁর ছোট চোখ দু'টি বড় হ'য়ে উঠ্‌ল। নাকের ডগাটি এক অদ্ভুত রকম ভাবে উঁচু করে তিনি বলে উঠ্‌লেন,—ওঃ, আপনি হোমিয়োপ্যাথিক ডাক্তার!

তারপর থেকে সদর দরজা ছেড়ে দিয়ে তিনি খিড়কি দরজা দিয়েই যাতায়াত করতে লাগলেন।

সন্ধ্যে হ'য়ে এসেছিল। কাজকর্ম্মের কোন বালাই ছিল না বলে আপাদমস্তক র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে চুপ করে বসে আকাশের গায়ে রঙ্ বেরঙের ফুল ফোটাচ্ছিলাম। শীতের সাঁঝে কর্ম্মহীনের পক্ষে এই একটা উপভোগের জিনিষ বটে! গোবর্দ্ধন-গৃহিণী-নিক্ষিপ্ত চিংড়িমাছের খোসা থেকে একটা তীব্র গন্ধ এসে ঘরটাকে ভরপুর করে দিলেও আমার চিন্তাস্রোতে বাধা দিবার কিছুই ছিল না। হঠাৎ একটা কালো ছায়া দরজার ওপর প'ড়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবন্ত অমাবস্যার মত একটি মূর্ত্তি ঘরের ভিতর ঢুকে এল।

ললিত স্বপ্ন টুটে গেল। আর কেউ হ'লে কি করত জানি না; তবে আমি ঠিক ছিলাম। শুধু ঠিক থাকা নয়, আমি যে একজন মস্ত বড় সাহসী পুরুষ তা' যাচাই করে নেবার এমন দ্বিতীয় সুযোগ আমার জীবনে আর ঘটে নাই।

মূর্ত্তিমান্‌টির দিকে তাকিয়ে প্রথমেই নজরে পড়ল তার লম্বা চুল আর দাড়ি। এই দুটি জিনিষ বাদ দিলে তার যে আর কি থাকে তা' বলতে পারি না। চুলগুলি আবার ক্ষ্যাপা বাউলদের মত মাথার ঠিক মাঝখানে খোঁপা করে বাঁধা। কিন্তু যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তিনি অত পরিশ্রম করেছিলেন তা' সমস্তই ব্যর্থ হ'ল—পাত্‌লা চুলের ঢাকনিটিকে সরিয়ে তাঁর তৈল-চিক্কণ সুবৃহৎ টাকটি বোধ করি ডাক্তারবাবুর ঘরের আসবাব পত্র দেখে নিচ্ছিল। তাঁর দন্তবিহীন মুখে দাড়িগুলি নেহাৎ খামখেয়ালী ভাবে উঠে যে শ্রী সম্পাদন করেছে তা' তাঁর স্ত্রীকে জিগ্যেস্ করলেই জানা যাবে।

ভিতরে এসেই আমি সাম্‌নে বসে থাকা সত্ত্বেও আমি আছি কিনা জিগ্যেস করে তিনি একখানা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। তারপর জুতোসুদ্ধ চরণ দু'খানি চেয়ারের 'পর তুলে ভদ্রতার খাতিরে র‍্যাপার বলা যায় এমন একখানা কাপড় দিয়ে ঢেকে একটু নড়ে চড়ে আবার খাতির-জমা হ'য়ে বসলেন—যেন এই ভাবে তাঁর দু'চার বছর কাটিয়ে দিতে হবে। লোকটাকে দেখে কি জন্যে জানিনা মনের মধ্যে একটা বিতৃষ্ণার ভাব জেগে উঠেছিল। কোন প্রকারে সেটা চাপা দিয়ে জিগ্যেস্ করলাম,—কি চাই আপনার?

একটু খুসীর হাসি হেসে তিনি যা বল্‌লেন তার মর্ম্ম এই যে তিনি বিশেষ কিছুই চান্ না। এতদিন আমি তাঁর বাড়ীর কাছে আছি কিন্তু একবারও তিনি দেখা করতে পারেন নাই, এ জন্যে তিনি বড়ই দুঃখিত। আর আসবেনই

বা কি ! তাঁর দুঃখের কথা বল্‌তে গেলে ছোট একখানা বই হ'য়ে যায়। দেশে তাঁদের জমিদারী ছিল, সে সমস্তই তিনি ভাইকে ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন। কিন্তু তাতেই কি তিনি নিস্তার পেলেন ! বেঁচে থাক্‌তে যে ভাই এক পয়সার একখানা পোষ্টকার্ড লিখে জিগ্যেস্ করত না, এখন তারই বিধবা তার ছিয়াত্তর কোটি বদুবংশ নিয়ে তাকে জ্বালিয়ে খাচ্ছে। তারপর মুখে বিশ্বের বৈরাগ্য মাখিয়ে বল্‌লেন যে সংসারে সুখের আশা করা বৃথা। যে কয়দিন বেঁচে থাকা যায় কেবল ভূতের ব্যাগার খাটা মাত্র।

দুঃখের কাহিনী শুন্‌তে শুন্‌তে বাস্তবিকই ঘুম এসে পড়েছিল, বন্ধুবর সেটা লক্ষ্য করে বললেন,—যাক্, আপনাকে অনেক বিরক্ত করলাম। তা হ'লে আজ আসি ? দেখুন, আমার নাম বনমালী সরকার। আমি 'দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ সার্কো থিয়েটার'এর ম্যানেজার, আপাততঃ ছুটিতেই আছি। এই সাত নম্বরেই থাকি। যদি কখনও কোন দরকার হয়, নিজের লোক ভেবে ডাক্‌লে বড় সুখী হ'ব। হ্যাঁ, রাজীব বাবুর সাথে আলাপ হ'ল ?

এ-হেন মূর্ত্তিমান্ যার ম্যানেজার সে সার্কাসের উন্নতি যে কতদূর মনে মনে তার একটা খস্‌ড়া তৈরী করে উত্তর দিলাম,—কোন্ রাজীববাবু ?

কোটর-প্রবিষ্ট অক্ষিযুগল ঘুরিয়ে ব্যস্ততার সঙ্গে ম্যানেজার বাবু বলে উঠ্‌লেন, রাজীববাবু ! রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ! সাম্‌নের এই বড় বাড়ী !

সাম্‌নের বড় বাড়ী এবং তার রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে কোন রকম অভিজ্ঞতা না থাকায় ম্যানেজার বাবুকে হতাশ করতে বাধ্য হলাম। তিনি কিন্তু থাম্‌লেন না, আহ্লাদে উৎফুল্ল হ'য়ে বলে যেতে লাগলেন যে, তাঁর এই চল্লিশ বৎসরব্যাপী জীবনের মধ্যে অনেক সদ্‌ব্রাহ্মণই তাঁর নয়ন পথে পতিত হয়েছেন কিন্তু রাজীববাবুর মত এমন সাত্ত্বিক এবং নিষ্ঠাবান্, আর একটিও তিনি কুত্রাপি দেখেন নাই। সারা জীবন শহরে বাস করেও রাজীববাবু হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত খুঁটিনাটি শাসন অনুশাসন ত মেনে চলেনই, তা' ছাড়া তিনি এতটা আচার-পরায়ণ, যে দোকানের খাবার দূরে থাক, একটা শালপাতার ঠোঙাও তাঁর বাড়ীর চতুঃসীমার ধারও ঘেঁস্‌তে পারে না। এই নিষ্ঠাবত্তার ভিত্তির উপরই যে অচল আসন প্রতিষ্ঠা করে মা কমলা রাজীববাবুর প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করেছেন, এ বিষয়েও তিনি নিঃসন্দেহ। অতঃপর, মোটার হাঁকিয়ে বেড়ান সত্ত্বেও যে আশে পাশের কোন্ কোন্ বাবুর মাথার চুলটি পর্য্যন্ত রাজীব মুখুয্যের কাছে বাঁধা তার একটা হিসাব দিয়ে পুনশ্চ আরম্ভ করলেন,—ওঁর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম,

কিন্তু বাড়ীর মেয়েরা ? এক মুখে ওঁদের কথা বলে শেষ করা যায় না। এই যে রাজীববাবুর বোন্ অন্নদা ছ'চল্লিশ বছর পর্যান্ত আইবুড়ো থেকে মারা গেল, একটা কথা কি কেউ কইতে পেরেছে তার সম্বন্ধে ? এখনও রাজীব-বাবুর সোমত্ত মেয়ে ঘরে রয়েছে। দেখ্‌বেন দেখি একবার তাঁর দিকে চেয়ে ! সতী সাবিত্তিরী বলি আমরা, বাস্তবিক সতী, সাবিত্তিরী বলে কি আর কেউ ছেল ! এঁরাই ত তাই !

রাজীববাবু মেয়ের বিয়ে দেন নি ?

বিয়ে দেওয়া কি আর সোজা কথা ! উনি যে স্বভাব কুলীন। ওঁদের সমান ঘর পাওয়াই যে দুষ্কর ! শেষ সংসার করবার সময় ভদ্দর লোক কি কষ্ট-টাই না পেল ! এ দেশটা ছেঁকে ফেলেও যখন ঘর মিল্‌ল না, তখন একদিন আমাকে ডেকে নিয়ে বল্‌লেন—বনমালী, তোমরা থাক্‌তে কি এই শেষ বয়েসে লক্ষীছাড়া হ'য়ে থাকবো ? কথাটা শুনে বড় দুঃখু হ'ল। সেই দিনই বেরিয়ে পড়লাম। কোথায় সেই বাঙাল দেশ মশায়, সেখেনে গিয়ে তবে কাজ ঠিক করি !

ম্যানেজার বাবুর ধৈর্য্যের বাঁধ অটুট থাক্‌লেও আমার ছিল না ! তাই একটু বাধা দিয়েই বল্‌লাম,—আজ তা' হ'লে—

ও হাঁ, হ্যাঁ, কথায় কথায় রাত একটু বেশীই হ'য়ে গেছে দেখছি !

তারপর একটি ছোট নমস্কার করে রাত ভোর হওয়া মাত্রই যেন রাজীববাবুর সাথে আলাপ করি এই সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন।

সার্কো-থিয়েটারের ম্যানেজারবাবু চলে যাবার পর গোবর্দ্ধনবাবু ছায়াবাজীর পুতুলের মত দরজার আড়াল থেকে মাথাটি বের করে জিগোস্ করলেন,—নিশি বাবু আছেন নাকি ?

এতদিন তিনি 'ডাক্তারবাবু' বলেই ডাক্‌তেন। কিন্তু তাঁর সেই অদ্ভুত আবিষ্কারের দিন থেকে নাম ধরে ডাকা সুরু করেছেন। বোধ করি হোমিয়ো-প্যাথ কে তিনি 'ডাক্তার' বলে ডাক্‌তেও রাজী ন'ন। উত্তর দিলাম,—না থেকে আর এত রাত্রে যাবো কোথায় ?

উত্তরটা শুনে তিনি যে বড় খুশী হলেন এমন বোঝা গেল না। গলার স্বর একটু চড়িয়েই বল্‌লেন,—বড বেহুঁশ লোক মশায় আপনি ! রোজ রোজ বলি দোর বন্ধ করে শুতে, কিন্তু কথাটা মোটে কানেই তোলেন না ! যে দিন চোর এসে ঝেঁটিয়ে সব নিয়ে যাবে, টের পাবেন সেই দিন।

আর বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করে তিনি সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

• • •

সেদিন সকাল বেলায় বেড়িয়ে ফিরবার পথে ম্যানেজার বাবুর সাথে দেখা হ'ল। আমাকে দেখেই তিনি সোৎসাহে বলে উঠ্‌লেন যে, আমার নাকি আর চিন্তা নাই—কপাল খুলেছে। ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করতে তিনি বল্‌লেন যে, রাজীববাবুর শেষ সংসারের অসুখ এবং আমাকেই যেতে হবে। সকাল থেকে তিন চারবার তিনি আমাকে ডাকতে গেছেন, বাড়ীতে না পেয়ে অবশেষে রাস্তায় খুঁজতে বেরিয়েছেন।

আমি প্রস্তত ছিলাম। তিনি সেটা লক্ষ্য করে বল্‌লেন যে, রাজীববাবুর বাড়ী একটু পরে গেলেও চল্‌বে। ততক্ষণ সময় নষ্ট না করে আজ কয়দিন তাঁর মেয়েটির অসুখ তা'কে একটু দেখে এলেও পারি। রোগী ঘাঁটতে ঘাঁটতেই ত ডাক্তারের হাত খোলে!

ম্যানেজার বাবুর বাড়ী হয়ে যখন রাজীববাবুর বাড়ী পৌছলাম তখন নয়টা বেজে গেছে! নগ্ন লোমবহুল শরীরের উপর শাদা পৈতের গোছাটা ঝুলিয়ে রাজীববাবু তাঁর বৈঠকখানা ঘরে মসীচর্চ্চিত ফরাসের উপর বসে কতকগুলি কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। আমাকে দেখে অভ্যর্থনা করে বসালেন সেই ফরাসের এক কোণে। ম্যানেজারবাবু সঙ্গেই ছিলেন, তাঁর দিকে চেয়ে একটু অপ্রসন্ন মুখে বল্‌লেন,—কি বনমালী, কিছু কর্‌তে পারলে?

বনমালীর মুখ শুকিয়ে গেল। রাজীববাবুর কথার সোজাসুজি কোন জবাব না দিয়ে চোখের ভাবেই বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি বিশেষ কিছুই করতে পারেন নাই।

রাজীববাবু তাতে বড় সন্তুষ্ট হলেন না। কণ্ঠস্বরে একটু দীপকের আমেজ মিশিয়ে বল্‌লেন যে, ম্যানেজারবাবুর ব্যবহারে তিনি মোটেই দোষ দেখেন না, কেন না তিনি উত্তমরূপেই জানেন যে, এটা কালের স্বধর্ম্ম কিন্তু তাই বলে ম্যানেজারবাবু যেন মনে না করেন যে, তিনি চুপ করে বসে থাকবেন! কুমীরেও মানুষ ধরে খাবার পূর্ব্বে তিনবার ধর্ম্মকে দেখিয়ে নেয়। তিনিও ঐ রকম একটা কিছু করে সোজা আদালতের পথ ধরবেন, তাইতে যা থাকে তাঁর টাকার বরাতে।

ছল্ ছল্ চোখে আমার দিকে চেয়ে একটু সহানুভূতি পাবার আশাতেই বোধ হয় ম্যানেজারবাবু কিছু বল্‌তে যাচ্ছিলেন। কিন্তু রাজীববাবু তাকে বাধা দিয়ে বল্‌লেন,—না, আর এক কথাও না। হুঁ, আজ হল গে আঠাশে, দেখ তোমাকে আমি ওমাসের পাঁচুই অবধি সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে টাকা যোগাড় করতে পার ত দেখা ক'রো, নয় শুধু শুধু আর মুখ দেখাতে এস না, যাও।

এমন ঝাড়াকাটা কথার পর আর অনুনয় বিনয়ে কোন ফল হবে না দেখে ম্যানেজারবাবু রাত্রিচর পক্ষীবিশেষের মত মুখখানা ভার করে উঠে গেলেন।

রাজীববাবু আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন তেতালায় একেবারে রোগীর ঘরে। রোগীণী ঘুমিয়ে ছিলেন, আমাদের পায়ের শব্দে জেগে আমাকে দেখেই আবার চোখ বন্ধ করলেন। বোধ হয় আমার উপস্থিতিটা বিশেষ পছন্দ করলেন না। রাজীববাবুর কাছে গিয়ে ললাট স্পর্শ করতেই তিনি ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠ্‌লেন,—তোমরা মনে করেছ কি! আমাকে না মেরে ফেলে কি আর ছাড়বে না? বাবাঃ! আজ অসুক কোরেচে তবু একটু চুপ করে থাকবার জো নেই!

দাপটটা শেষ সংসারের উপযুক্তই বটে!

গলার স্বর খাদে নামিয়ে রাজীববাবু বল্‌লেন,—ডাক্তারবাবু এসেছেন, একটু উঠে বোস।

আমার দিকে একবার বক্র দৃষ্টি করে তিনি আবার চোখ বুজলেন। আমি যে ডাক্তার এটা বোধ হয় তাঁর বিশ্বাস হলো না। শেষে অতিকষ্টে আস্তে আস্তে বল্‌লেন,—ও ডাক্তারের ওষুদ খেলে আমার রোগ ভাল হবে না!

একটু লজ্জিত হয়ে বিনয়ের সুরে রাজীববাবু বল্‌লেন,—ডাক্তারবাবু, কিছু মনে করবেন না। অসুখ হলে ওদের মাথা বিগড়ে যায়। কাকে যে কি বলে!

তারপর ওদের কাছে গিয়ে খুব আস্তে আস্তে বল্‌লেন,—নিশিবাবু নতুন হ'লেও পাশকরা ডাক্তার, বল্‌তে গেলে বাড়ীর পরেই থাকেন। তা' ছাড়া—

আর শুন্‌তে পেলাম না। গিন্নী বোধ হয় এই 'তা ছাড়া'-র লুক্কায়িত অর্থটুকু বুঝলেন। আর কোন ওজর আপত্তি করলেন না।

রোগীর ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত আছি, এমন সময়ে নয় দশ বছরের একটি ছেলে ঘরে ঢুকল। রাজীববাবু তাকে দেখিয়ে বললেন এটি তাঁরই

ছেলে। সে তাঁর কাছে গিয়ে বলল,—বাবা, দিদিমণি বললে, ডাক্তারবাবু যেন তাকে একবার দেখে যান।

জিজ্ঞাসুনেত্রে রাজীববাবুর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন,—ও হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু, আমার ঐ মেয়েটিকে একবার দেখে যেতে হবে। কি যে, হয়েছে ওর! দিন দিন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। কিছু খেতে পারে না। রাতে না কি ভাল ঘুমও হয় না।

ছেলেটির দিকে চেয়ে বললেন,—খোকা, তুমি একটু দাঁড়িয়ে একেবারে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে যাও। পালিয়ে যেয়ো না যেন?

ততক্ষণে কাজ সারা হয়েছিল। রাজীববাবুকে জিগ্যেস্ করলাম, আপনি যাবেন না?

উত্তরে প্রকারান্তরে তিনি যা' বললেন তার মানে এই যে, তিনি গেলে তাঁর শেষ সংসার বিশেষ সন্তুষ্ট হবেন না; যদি পারেন ত পরে দেখবেন।

আপাততঃ খোকার সাথেই চললাম। খোকার রঙটা ময়লা হলেও চেহারাটা মানানসই গোছের—একরকম কথা বলা চলে। নামতে নামতে জিগ্যেস করলাম,—খোকা তোমার নাম কি?

খোকা কি যেন খাচ্ছিল। একটু ভারি মুখেই উত্তর দিল,—গোবিন্।

বাঃ, বেশ নামটিত! তুমি কি পড়?

পিছন ফিরে দেখি খোকা নাই।

দোতালায় এসে পৌঁছিলাম। দিদিমণির ঘর কোথায়, কোন্ দিকে যেতে হবে কিছুই জানা নাই। অতএব একটু মুস্কিলেই পড়লাম। শেষে এ অবস্থা-সঙ্কট থেকে ত্রাণ করলেন স্বয়ং দিদিমণিই।

দিদিমণিকে দেখলাম। ছ'চল্লিশ না হলেও ছাব্বিশের কিছু কম হবেন না। হিন্দু ঘরের সোমত্ত মেয়ে, আমার সাথে কথা কন্ কি না, এ সম্বন্ধে একটু ভয় হ'য়েছিল। কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু এ ভয়টা গিয়ে দাঁড়াল বিস্ময়ে। কথা ত তিনি বললেনই এবং এমন ভাবে বললেন যে, ইতিপূর্ব্বে তাঁর বয়সী অন্য কোন রোগীর মুখ থেকে তা' শুনবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। আর একটা জিনিষ দিদিমণির লক্ষ্য করছিলাম—সেটা হচ্ছে তাঁর চোখের উপর অদ্ভুত আধিপত্য। প্রশ্নের উত্তর দিবার ফাঁকে ফাঁকে তিনি যে এক একটি কটাক্ষ হানছিলেন তার

বঙ্গানুবাদ করলে যা' দাঁড়ায়, আমি দৃষ্টিতত্ত্ববিশারদ না হলেও স্বভাব কুলীন রাজীব মুখুয্যের নিষ্কলঙ্ক কুলের পক্ষে যে সেটা বিশেষ গৌরবের নয় তা' নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

দিদিমণির রোগটি বিশেষ নতুন নয়। অনেক বয়স পর্য্যন্ত মেয়েদের বিয়ে না হলে যা' হয় তাই। হোমিয়োপ্যাথিশাস্ত্রে 'ম্যারেজ' বলে যদি কোন ওষুধ থাক্‌তো, তবে তার তিরিশ কি ছত্রিশ' দিলে দিদিমণির এ-রোগ যে সেরে যেতো, তা, বেশ জোর ক'রে বলা যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ তেমন কিছু না থাকায় আপাততঃ একটু জলের ভিতর ফোঁটাদুই নিছক 'ফাইটাম্' মেশাবার ব্যবস্থা করে বলে এলাম যে এতেই ভাল হয়ে যাবে।



রাজীববাবুর শেষ পক্ষকে রোগী ধরিয়ে দিয়ে ম্যানেজারবাবু বোধ হয় আমার মাথা কিনে নিয়েছিলেন। আজকাল সকালে বিকালে নিয়মিতরূপে তাঁর মেয়েকে আমার দেখতে যেতে হয় এবং মূল্য প্রাপ্তির কোনরূপ আশা না রেখে ওষুধ সরবরাহও করতে হয়। ব্যাপার শুধু এই পর্য্যন্ত গড়ালেও ক্ষতি ছিল না। সেদিন সকাল বেলায় আবার এসে তিনি ধন্না দিয়ে পড়লেন যে দু'টি টাকা তাকে ধার না দিলে তাঁর মেয়ের পথ্য একেবারেই চলে না বা ঐ রকম একটা কিছু। এই কয়দিনের ব্যবহারে তাকে চিনবার একটু সুযোগ পেয়েছিলাম। তাই বিনা ভূমিকাতেই বলে ফেললাম যে, রাজীববাবুর বাড়ীতে পেলে তাঁর মত সুযোগ্য ব্যক্তিকে টাকা ধার দিতে আমার বিন্দুমাত্রও আপত্তি নাই। তিনি বোধ হয় এ সম্বন্ধে একটু সন্দিহান ছিলেন। তাই তাঁর লোমশূন্য ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করে উঠ্‌লেন,—রাজীব মুখুয্যের বাড়ী থেকে টাকা এনে দেবেন আমাকে! তবেই হয়েছে আর কি!

ম্যানেজারবাবুর মুখ থেকে একথা শুনে মোটেই বিস্মিত হলাম না। তাই আপাততঃ প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে জিগ্যেস্ করলাম,—দেখুন ম্যানেজারবাবু, রাজীববাবুর মেয়েকে দেখে অবধি একটা কথা আমার মনের মধ্যে জট পাকিয়ে বেড়াচ্ছে। এত বড় গোঁড়া হিন্দু হয়েও রাজীববাবু কেমন করে যে আট বছরে মেয়ের বিয়ে দিয়ে গৌরীদানের ফল লাভটা উপেক্ষা করলেন, এই কথাটাই আমি বুঝে উঠ্‌তে পারি না।

পরম বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে তিনি আরম্ভ করলেন,—মশায়, ও কঞ্জুষের কথা আর বলবেন না। মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করতে কি আর কসুর করেছে। কিন্তু আজকাল আর শুধু চেষ্টা করলে হয় না। ট্যাঁক থেকে রেস্ত খসাতে হয়। এই আমরা পাঁচজনেই কি ওর মেয়ের বিয়ের কম চেষ্টা করেছি। কিন্তু ও নিমকহারাম কি আর তাই শোনে! দেখলেন ত সেদিনকার ব্যাপারটা। কটাই বা টাকা! যাক্, কোন সম্বন্ধ এলে আগে থাকতেই বলে বসে যে ও এক পয়সাও খরচ করতে পারবে না।

অতঃপর ম্যানেজারবাবু বলে যেতে লাগলেন যে, এই সুন্দর যুক্তি অবলম্বন করে নাকি রাজীববাবু চুপ করে বসে থাক্‌তে পারলেন না। প্রত্যেক দিন সকালবেলায় তিনি দেখ্‌তে পেতেন যে, তাঁর মেয়ে নাকি চার আঙুল করে মাথায় বেড়ে যাচ্ছে। অবশেষে তিনি অন্য উপায় ধরলেন। তিনি মানসনয়নে পরিষ্কার দেখ্‌তে পেলেন যে, এই সর্ব্বগ্রাসী পণপ্রথা তুলে দিতে না পার্‌লে সমাজ আর রক্ষা পায় না। তাই কোমরে কাপড় বেঁধে লেগে গেলেন পণপ্রথা নিবারণী সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত করতে। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর প্রশংসাকীর্ত্তনে খবরের কাগজের পংক্তি ভরে যেতে লাগল এবং দেশের লোকেও জান্‌তে পেল যে, দুর্দ্দশাগ্রস্ত মেয়ের বাপদের হ'য়ে দু' কথা বল্‌বার যদি কেউ থাকে ত এক তিনিই আছেন। তাঁকে সহানুভূতি দেখাবার লোকও জুটে গেল যথেষ্ট কিন্তু তার মাঝে কোন ছেলেওয়ালাকে পাওয়া গেল না। শেষকালে এক মলয়সেবিত বসন্ত সন্ধ্যায় হঠাৎ তিনি আবিষ্কার করে ফেল্‌লেন যে, সমাজের কাজ অনেক কিছুই করে ফেলেছেন বটে কিন্তু তাঁর মেয়ের বিয়ের কোন 'হিল্লেই করে উঠ্‌তে পারেন নি'। তাঁর এই অভিনব উপায়টাও ফেল মেরে গেল দেখে, আজকাল তিনি কৌলীন্যের দোহাই দিয়ে মেয়ের বিয়ের ভার স্থায়ী-ভাবে প্রজাপতির স্কন্ধে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন ইত্যাদি।

এতখানি বক্তৃতা দিয়েও ম্যানেজারবাবু তাঁর আগমনের শুভ উদ্দেশ্য ভুলে যান নাই। ঘড়ির দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌লেন,—ওঃ বেলা যে অনেক হ'য়ে গেছে! তা' হ'লে আমাকে কি বল্‌লেন?

আমি আমার সাবেক উত্তরটা পুনরুক্তি করায়, আমি যে তাকে বিশ্বাস করলাম না এই মন্তব্য প্রকাশ করে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

• • •

রাজীববাবুর সাথে কথা ছিল, তিনি ডাকতে পারেন না না পারেন, যতদিন তাঁর স্ত্রীর অসুখ থাকে আমি যেন রোজ একবার করে দেখি। সে দিন বিকেল বেলায় গিয়ে রাজীববাবুকে বাড়ী পেলাম না। চাকর দিয়ে খবর পাঠিয়ে তার সাথেই চললাম। রোগীর ঘর তেতালায়, দোতালায় দিদিমণির ঘরের পাশ দিয়েই সিঁড়ি। উঠতেই দিদিমণির ঘর থেকে যে অট্টহাসিটা বেরিয়ে এল, আর যা'হোক কোন প্রকারেই তাকে নারী-কণ্ঠের কাকলী বলা চলে না। একটু সন্দেহ হল। কিন্তু তার চেয়ে বেশী হল কৌতূহল। যত দূর জানি, এইরূপ বিকট হাস্য করবার মত পুরুষ শ্রেণীর জীব এ বাড়ীতে নাই। দিদিমণি যখন আমারও রোগী বটেন, তখন তাকে দেখবার অধিকার আমার আছে। আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম একেবারে দরজার সামনে। দেখলাম—একখানা খাটের উপর দিদিমণি অর্দ্ধশায়িত, পাশেই একটি মোটা বালিশ ঠেসান দিয়ে বসে আছেন একটি যুবক। মাথার চুলগুলি তাঁর লম্বা লম্বা, গোঁফ দাঁড়ি তাঁর কামানো, ঢুলু ঢুলু চোখে 'পেন'-এর চশমা আঁটা। দেখলেই বোধ হয় কবি-টবি হবেন। সামনেই একখানা খাতা খোলা রয়েছে, বোধকরি এইমাত্র তাঁর রচনা পড়ে শোনাচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই দিদিমণি শশব্যস্তে উঠে বসলেন, কবিবরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল এক নির্ব্বাক্ প্রশ্ন। দিদিমণি উত্তর করলেন,—উনিই ত ডাক্তার বাবু।

কবিবর হাসি হাসি মুখে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন,—ডক্টর সেন এসে ছিলেন, এঁর 'প্রেসক্রপশান্' দেখে আপনার এল, এম, এস্-এর আগে একটা 'ভি' লাগিয়ে নিতে বলেছেন।

অর্থাৎ কিনা আমি গোরুর ডাক্তার।

কবি-কিশোর উচ্চ হাস্য করে উঠলেন। তাঁর পচা রসিকতার নগ্ন অশিষ্টতায় সর্ব্বশরীর জ্বলে উঠল। উপযুক্ত উত্তর তার দিতে পারতাম কিন্তু পরের বাড়ী চড়াও হয়ে ঝগড়া করাটা বিশেষ সমীচীন হবে না বলে ক্ষান্ত দিলাম। রোগী দেখা আর ঘটে উঠল না।

পরে রাজীববাবুর বাড়ী থেকে ডেকে পাঠিয়েছিল কিন্তু যাই নাই।

সেদিন রাত্রে বসে বসে নিজের দুর্দ্দশার কথা ভাবছিলাম। দুই মাসের ভাড়া বাকী; গোবর্দ্ধনবাবু সেজন্যে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছেন এবং এও বলেছেন যে, তিনদিনের মধ্যে তাঁর টাকা না দিতে পারলে দোসরা জায়গা দেখতে হবে। সঞ্চিত পুণ্যটুকুর বোধ হয় ক্ষয় হয়ে এসেছিল, 'স্বর্গধাম'এ থাকা

যেন আর চলে না। প্রায় চারমাস শহরে এসেছি, অবস্থা ঠিক পূর্ব্বের মতই রয়ে গেছে। কালীগঙ্গা তবে কি কৃপা করলেন না! তবে কি ফিরে যাবো, না কোন আফিসে কেরাণী-গিরির চেষ্টা দেখবো? এই রকম কত কি ছাই পাশ ভাব্‌তে ভাব্‌তে ভারী মনেই শুয়ে পড়লাম।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে দেখি ঘরের মধ্যে মানুষ। গোবর্দ্ধন-বাবুর তিন টাকা দামের গ্যাসটি আজ সন্ধ্যে থেকেই 'লীক্' করে নিভেছিল। সুতরাং জান্‌লা খোলা থাক্‌লেও রাস্তার আলো পাবার কোন উপায় ছিল না। আমি জেগেছি এই সাড়া পেয়ে হুড়্‌ হুড়্‌ করে ত্নটো লোক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পরিষ্কার না বোঝা গেলেও একজনকে যেন গোবর্দ্ধনবাবু বলেই বোধ হল। তাড়াতাড়ি উঠে আলো জ্বাললাম। ঘরের সমস্ত জিনিষ ঠিক রয়েছে দেখে বড় আহ্লাদ হল—তবে শালারা আমার কিছুই নিতে পারে নাই। কিন্তু সময় নিরূপণ করবার জন্যে হাত বাড়াতেই দেখি সর্ব্বনাশ! নিত্য অভ্যাসমত চেয়ারের হাতলের উপর জামা রেখে শুতাম এবং এই জামাটির পকেটেই ডাক্তারী নল থেকে আরম্ভ করে ঘড়ি মণিব্যাগ ইত্যাদি আমার যথা সর্ব্বস্বই থাকতো। জামাটি নাই কিন্তু তৎস্থান দখল করে আছে আর একটি জামা। পকেটটি তার কোন কিছুর ভারে ঝুলে পড়েছে দেখে বড় ভরসা হ'ল—তবে বুঝি আমার 'ষ্টেথিস্কোপ'-টা রেখে গেছে। পকেটে হাত দিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনটি জিনিষ বেরিয়ে এল। প্রথম, একটি 'ক্লোরোফরম্'-এর শিশি, দ্বিতীয়, একতাড়া চাবি, তৃতীয় প্রায় আধ হাত লম্বা লোহার একটা শিক, বোধ হয় সিঁদকাঠিই হবে। যা' হোক, এ তস্করযুগল যে খুব রসিক এবং সূক্ষ্মদর্শী সে বিষয়ে কোন ভুল নাই। আমার ডাক্তারীর পসার বোধ হয় এরা লক্ষ্য করছিল, তাই এদিকে আমার কিছুই হবে না দেখে উপযুক্ত পথই বাৎলে দিয়ে গেল। কিন্তু এরা যে কোন্ শ্রেণীর, সাহেব কি উড়ে, প্রেমিক কি রাজনৈতিক এইটাই ঠাউরে উঠ্‌তে পারলাম না।

বসে বসে তাদের মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করলে বিশেষ কোন ফল হবে না দেখে রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌লাম—যদি কাছে কিনারায় তাদের শুভদর্শন মেলে। সামনেই রাজীববাবুর দরজা অর্থাৎ 'গেট'। পাশ দিয়ে যেতেই যেন সেটা খোলা বলে বোধ হল। কাছে গিয়ে দেখি বাস্তবিকই তাই। সটান ঢুকে পড়্‌লাম। ভয়ানক অন্ধকার। তুই চারটে ঠোকর খেয়ে অতি কষ্টে সিঁড়ি পর্য্যন্ত এসে পৌছলাম। এখান থেকে দোতালায় দিদিমণির ঘর বেশ স্পষ্ট

দেখা যায়। দরজা খোলা। বৈদ্যুতিক আলোর বন্দোবস্ত থাকলেও ভিতরে একটা মোমের বাতি মিন্‌মিন্ করে জ্বলছে। তারই এক টুকরো আলো ছিটকে এসে সিঁড়ির অন্ধকারটিকে জমাট করে তুলেছে। দুই চার ধাপ উঠলাম। আমার যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন সত্বেও একটা ছেঁড়া খবরের কাগজ কি ভাঙ্গা জুতোর বাক্সের সাথে পাটা ঠেকে যেয়ে একটা খস্‌খস্ শব্দ হল। তার পরই এক ছায়া মূর্ত্তির আবির্ভাব। শীতটা একটু বেশী লেগে ছিল বলেই বোধ হয় হাঁটু দু'টো ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো এবং গায়ের রক্তও বিশেষ সচল ছিল না। মনে করলাম আর কেন? এইবার বাঁচবার উপায় দেখি। কিন্তু মূর্ত্তিটির আগমনের উদ্দেশ্য জানবার বাসনাও কম ছিল না। তা ছাড়া ভরসা ছিল—মেয়ে মানুষ নেহাৎ জোর করে ধরে রাখতে পারবে না। অতএব নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মূর্ত্তিটি কাছে এসে চুপে চুপে বলল,—আচ্ছা লোক বাবা, ক'টার সময় আসবার কথা ছিল তোমার? দাঁড়াও এখেনে, আর ওপোরে গিয়ে গোরগোল কত্তে হবে না।

তিনি ফিরে গেলেন। চাপা গলায় কথা বললেও ইনিই যে দিদিমণি তা' বুঝতে আর বাকী রইল না।

বাক্যালোচনের অর্থভার লাঘব করে দিদিমণি ফিরে এলেন একটি ক্যাস্ বাক্স নিয়ে। নিতান্ত অনুগতটির মত হাতে পেতে নিলাম। পুনরায় আসছেন বলে তিনি ফিরে গেলেন।

মানুষের মনের মধ্যে সব সময়ই সুমতি আর কুমতির লড়াই চলছে। সুমতি চেষ্টা করছে মানুষকে সৎপথে নিয়ে যাবার জন্যে, কুমতি চেষ্টা করছে ঠিক তার উল্টো। দিদিমণি যখন বাক্স দিয়ে চলে গেলেন, তখন কুমতি বলল,—আর কেন? এইবার পথ দেখ।

বাধা দিয়ে সুমতি বলল,—উঁহু সবুরে মেওয়া ফলে।

ধমক দিয়ে কুমতি বলে উঠল,—নে, নে, তোর কথা মতই রঙের কল্‌কাতা দেখা হ'য়েছে। আর নয়!

সুমতি কোন জবাব খুজে পেলনা। কুমতিরই জয় হল।

যে ভাবে ঢুকেছিলাম সেই ভাবেই নিঃশব্দে বাক্সটি নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

সকাল বেলায় গোবর্দ্ধনবাবুকে ডেকে চুরীর আদ্যোপান্ত বললাম। প্রথমে তিনি একটু বাহাদুরীই নিলেন, এমন যে হবে তা' তিনি অনেক আগেই জানতেন। কিন্তু যখন বললাম পুলিশে খবর দেবো, তখন তাঁর মুখখানা

অস্বাভাবিক রকমেই ফ্যাকাসে হয়ে উঠ্‌ল। নিতান্ত ত্যাগী পুরুষের মত তিনি বল্‌লেন যে যা' গেছে তা যখন ফিরে পাবার সম্ভাবনা নাই, তখন আর মিছে পুলিশের হাঙ্গামায় গিয়ে লাভ কি! আমি যখন তাঁর আশ্রয়েই আছি, এ দণ্ডটা না হয় তাঁরই গেল। বাকী ঘর ভাড়াটা না হয় আমি নাই দিলাম।

এর আগে গোবর্দ্ধনবাবুকে এতটা স্বার্থত্যাগ করতে দেখি নাই।

• • • • •

সহরে 'প্রাক্‌টিশ' করে বড়লোক হবার সাধ মিটে গিয়েছিল। তাই আর একবার পোট্‌লা পুঁট্‌লী বেঁধে দিদিমণির বাক্সটি হাতে করে বেরিয়ে পড়লাম। পোষ্টাফিসের সাহায্যে সেটা পাঠাবার ব্যবস্থা করে ফিরলাম একেবারে গঙ্গাস্নান সেরে। তারপর গোবর্দ্ধনবাবুর ভাড়ার টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে সোজা ষ্টেশানে গিয়ে গাড়ী চড়ে বস্‌লাম।

আজকাল দেশেই আছি এবং যতকাল বাঁচি দেশেই থাক্‌বো। যাদের ছেড়ে গিয়েছিলাম তারা নিজের করে নিয়েছে, কাজেই নষ্টপসার উদ্ধার করতে বেগ পেতে হয় নাই। নামের পাছে এখন ভি, এল্‌, এম্‌, এস্‌,-ই লিখি, লোকে জানে বাবু আর একটা পাশ করে এসেছে।

যৌবন-চাঞ্চল্য

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

ছুটিয়া যুবতী চলে পথ;
আকাশ কালিমামাখা
কুয়াশায় দিক ঢাকা
চারিধারে কেবলি পর্ব্বত;
যুবতী একেলা চলে পথ।

এদিক ও দিক চায়
গুণগুণি গান গায়
কভু বা চমকি চায় ফিরে';
গতিতে ঝরে আনন্দ
উপলে নৃত্যের ছন্দ
আঁকাবাঁকা গিরি-পথ ঘিরে'।
সহজ স্বচ্ছন্দ মনোরথ—
ছুটিয়া যুবতী চলে পথ।

টসটসে রস-ভরপূর
আপেলের মত মুখ
আপেলের মত বুক
পরিপূর্ণ প্রবল প্রচুর;
যৌবনের রসে ভরপূর।
মেঘ ডাকে কড়কড়,
বুঝি বা আসিবে ঝড়,
তিলেক নাহিক ভয় তাতে,
উহারি বুকের বাস
পুরায় মনের আশ
উরস পরশ করি হাতে;
অজানা ব্যথায় সুমধুর
সেথা বুঝি করে গুরগুর।

যুবতী একেলা পথ চলে,
পাশের পলাশ বনে
কেন চায় ক্ষণে ক্ষণে
আবেশে চরণ যেন টলে
পায়ে পায়ে বাধিয়া উপলে।
আপনার মনে যায়,
আপনার মনে গায়
তবু কেন আন-পানে টান।

করিতে রসের সৃষ্টি
চাই কি দশের দৃষ্টি ?—
স্বরূপ জানেন ভগবান !
সহজে নাচিয়া যে বা চলে
একাকিনী বন বনতলে,
জানিনাক তারো কি ব্যথায়,
আঁখিজলে কাজল ভিজায়।

তারপর

শ্রীনলিনীভূষণ দাশ গুপ্ত

পল্লীর আবেশ মৌন স্নিগ্ধ শান্ত সাঁঝে,
নিরালা কুটির-কোণে স্তিমিত আলোকে,
একদল মন্ত্রমুগ্ধ শিশু-শ্রোতা মাঝে
খুন্‌খুনে ঠান্‌দি'দি চলে'ছেন ব'কে'।
নির্ব্বাক, নিঃস্পন্দ সব, শুদ্ধ কুতূহলী,—
যত শোনে, তত চায়। দিদি, পর-পর,
আবাল্য সঞ্চিত তার সুবৃহৎ "থ'লি"
নিঃশেষে দিলেন ঢালি'। তবু "তারপর" ?
"তারপর ?"—শিশুমুখে আকাঙ্ক্ষার ভাষা—
প্রকাশিছে ওরি' মাঝে বিশ্বের জিজ্ঞাসা।
অনাদি প্রকৃতি তার রহস্যের 'পুঁজি'
ধরে' আছে চিরদিন, কিন্তু খুঁজি' খুঁজি'
কোনোদিন কভু তার শেষ নাহি পায়—
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা শুধু নিত্য বেড়ে' যায়।



উপন্যাস

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১০)

কয়েক মাস পরে বাসায় ফিরে একখানি চিঠি পেলুম। হাতের লেখা অপরিচিত হলেও মেয়েমানুষের বলে কোন সন্দেহ রইল না; খুলে দেখি বিরজা দত্ত লিখ্‌চেন। একটু আশ্চর্য্য হলুম—ডেকে পাঠিয়ে বল্লে কি চল্‌তো না? চিঠি শেষ ক'রে বুঝলুম—তা' চ'লতো না-ই বটে।

লিখ্‌চেনঃ—

স্নেহের কিরণ,

এত কাছে থেকেও চিঠি লিখ্‌তে হচ্চে—দেখেই বুঝতে পারবে, আমার কি অবস্থা, আর চিঠিখানাও কত জরুরি।

সে রাত্রের পর আর তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি। তোমাদের ডেকে পাঠাতেও আমার ভয় করে; কারণ এ বাড়ীতে লোকের নিজের মান হাতে ক'রে আস্‌তে হয়। ভীষণ খাম্‌-খেয়ালি মানুষ, কাকে কি বলে বসেন, কখন কি ক'রে ফেলেন তার কিছুই ত ঠিক-ঠিকানা নেই। সে রাতে তোমার যে অপমান হয়েছিল তার জন্যে আমি কতকটা দায়ী, তোমায় সময়ে তুলে দিলে আর গোল হ'তো না; কিন্তু তোমরা এমনি ঘুমিয়ে পড়েছিলে যে তুলে দিতে মায়া হয়েছিল। শেষে আমিও ঘুমিয়ে পড়াতে গোল হয়ে গেল।

আশা করি তুমি কিছু মনে কর নি।

আজকে তোমাকে একটি গুরুতর বিষয় জানাচ্চি। তোমার বুদ্ধি বড় ধীর, তাই আশা করি, এই বিপদে তোমাকে সহায়রূপে পাব।

বিশ্রাম ভবনে, যে যাতে ইলা তোমাকে কতকগুলো অনুযোগ জানিয়েছিল— সে তার নিজের বুদ্ধিতে ও-সব করেনি। আমি তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠিয়েছিলাম। আমার তখন মনে হয়েছিল যে ইলাকে হরিলালবাবুর চোখে বিষ ক'রে দেবার অভিপ্রায় তোমার ছিল; কিন্তু পরে সম্পূর্ণ জেনেছি—আর বুঝ্‌তেও পেরেছি, যে সেটা আমার ভুলই।

জানি, ইলাকে তুমি খুবই স্নেহ কর এবং সেও তোমাকে খুবই শ্রদ্ধা করে।

বদনকে নিয়ে এখন দেখচি সত্যিকার মুস্কিল ক্রমেই ঘনিয়ে আস্‌চে। বদন আর ইলার বন্ধুত্ব এত ঘনিষ্ঠ হয়েচে—যা' একজন কুমারী মেয়ের পক্ষে বিপজ্জনক। এক মিনিটের ভুলে জীবনে এমন দাগ ব'সে যায়—যা' চির-জীবনের চোখের জলে ধুয়ে আর কিছুতেই পরিষ্কার করা যায় না।

শেষকালে ইলার ভাগ্যেও কি তাই ঘটবে? এই কথা মনে ক'রে,—রাতে আমার ঘুম হয় না-- মুখে খাবার রোচে না।

এদিকে এমন বিপদ—উনি বদনের কাছে কিছু-কিছু সুবিধে পান ব'লে হয়ত তার সম্বন্ধে চক্ষু বুজে আছেন; আর মেয়েটাকে এর ইঙ্গিত পর্য্যন্ত করবার উপায় নেই- সে একেবারে তেলে বেগুনে জলে ওঠে!

কি করি, বলত?

মনে করেছিলাম, হরিলালবাবুকে জানাই, কিন্তু ভেবে দেখ্‌লাম সেও মশা মারতে কামান্ দাগার মত হবে।

মাথা ঠাণ্ডা ক'রে একটা কিছু সমাধান তোমার করতেই হবে। যতদিন যাচ্চে আমি মনে মনে বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়চি।

আশা করি তোমার শরীর মন ভালই আছে। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ নিও। ইতি

তোমার শুভানুধ্যায়িনী

বিরজা।

চিঠির অন্ত পিঠে পুনশ্চ দিয়ে লিখেছেন;—

সে রাত্রে মদ খাওয়ার কথা যে ব'লেছিলাম, সেটা আমি রাগ ক'রেই বলেছিলাম; মদ উনি খান নি; তবে পেলে যে খান্ না তা নয়; অবস্থায় কুলোয় না ব'লে খান্ না। তবে রোজই সিদ্ধি খান, আর তার ব্যবস্থা আমাকেই ক'রে দিতে হয়।

এ কথাগুলো না লিখলেও চল্‌তো, তবুও লিখ্‌লাম তার কারণ, তোমাকে আমার অবস্থা বুঝিয়ে দিতে চাই। নেশা করাকে আমি চিরদিন মন দিয়ে অপছন্দ ক'রে এসেছি, এখন রীতিমত ভয়াই; অদৃষ্টের পরিহাস—আমাকেই এই কাজ করতে হয়! মেয়ে মানুষ কত অসহায়! তার একটা-না-একটা আড়াল চাই!

চিঠিখানা কয়েকবার প'ড়ে বুকের পকেটে রেখে দিয়ে সটান গিয়ে বিছানায় শুয়ে প'ড়ে ভাব্‌তে লেগে গেলাম :—

প্রথম জানা দরকার হচ্ছে ইলার বদনের প্রতি কি ভাব। বদনের কাছ থেকে তা পাওয়া যাবে না। ইলাকে জিজ্ঞাসা করলে—প্রথম নম্বর সে হয়'ত খাপ্পা হবে—না হলেও, কিছুই বল্‌বে না। তবে?

ইলা আর বদনের নিভৃতে কথা-বার্ত্তা শুন্‌তে পেলে হয়ত' বুঝতে পারি—তারই বা পথ কোথায়?

আমার ধীর শান্ত বুদ্ধি প্রায় অশান্ত অধীর হয়ে উঠ্‌লো; বুঝলুম, বেশীক্ষণ এই নিয়ে চিন্তা ক'রলে মাথাও গরম হয়ে উঠ্‌বে।

সকালে কিছুই মনে ছিল না। বেলা বারোটা আন্দাজ বাড়ী ফিরচি, দেখ্‌লুম হাবুদত্ত পানের দোকানে একটা প্রকাণ্ড লাঠি হাতে ব'সে বিড়ি খাচ্চেন। আমাকে দেখে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠে বল্লেন, তোমার সঙ্গে একটা সাংঘাতিক কথা আছে।

শুনে আমি প্রলয় গণনা করলাম।

জানা ছিল, কোন কথা তিনি চুপ্‌-চাপ্‌ ক'রে বল্‌তে পারতেন না; তাই বল্লুম, চলুন বাসায় গিয়ে কথা হবে।

একটু ইতস্ততঃ ক'রে বল্লেন, আচ্ছা চল, তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা হয় প্রতিবিধান করবো।

পথে চল্‌তে-চল্‌তে বল্লুম, এত বড় লাঠি নিয়ে কেন?

গম্ভীর উত্তর হলো, পরে জান্‌তে পারবে।

আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে হঠাৎ যেন তাঁর রাগটা বেড়ে উঠ্‌লো, মাটির উপর লাঠিটাকে সজোরে ঠুকে বল্লেন, ফাঁসি কাঠে ঝুল্‌তে হয় তাও স্বীকার—আমি বদ্‌নাকে খুন ক'রবোই, বলে দিচ্চি।

ঐ রকম একটা কিছু আমি আশঙ্কা ক'রছিলুম।

কি হয়েছে?

কি হয়েচে? কি হয়নি বল ত দেখি?

হাবুদত্তর ক্রোধ তখন ধাপে ধাপে চ'ড়ে উঠ্‌ছিল; তাই চুপ্‌ ক'রে থাকাই উচিত মনে করলুম।

এক কাপ্‌ চা খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে বল্লেন, দুপুর বেলা আমি যাই পড়াতে আর ঐ শালা আসে গান শিখ্‌তে—আমার মাথা-মুণ্ডু-পিণ্ডি করতে! ধাড়ীটা নাকে তেল দিয়ে ঘুম মারচে; আর ও হারামজাদা—ছুঁড়িটার গালে রং দিচ্চে।

বলত, কার রক্ত ঠাণ্ডা থাকে? বেটাকে আজ কি আস্ত রাখতুম -ভারি ভাগ্‌ বুঝে স'রে পড়েচে।

আচ্ছা পালাও চাঁদ, কিন্তু হাবুদত্ত তোমার মাথা গুঁড়ো না ক'রে আর জলস্পর্শ করচে না। মরদকা বাত—আর হাতি কা দাঁত।

বল্লুম, তাকে এই দুপুরে কোথায় পাবেন, সে দেশ ছেড়ে, আপনার ভয়ে, সরে পড়েছে।

একটু যেন নরম হ'য়ে হাবুদত্ত বল্লেন, আমারও তাই মনে হচ্ছে, কিরণ, বেটা যা ভয় পেয়েচে, এখন দু-চার দিন গা-ঢাকা দিয়েই থাক্‌বে, বোধ করি।

আমারও তাই মনে হয়।

হাবুদত্ত আমার চৌকির উপর ব'সে বল্লেন, তাতেই কি গো-বেটা পার পেয়ে যাবে, মনে করচে? হাবুদত্ত আছে ত' আছে গঙ্গাজলটি; কিন্তু গেঁজিয়ে তুল্‌লে . . .

বল্লুম, ওরা ছেলে-মানুষ, কিসে কি দোষ হয় অত জানেও না।

বটে! আমি ব'লে দিচ্চি ওই বদ্‌না বেটার সময়ে বে দিলে—শালা যে তিন-ছেলের বাপ হ'তো এত দিনে!

বুঝলাম, এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা। চুপ ক'রে রইলাম।

কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে হাবু বল্লেন, এখন কি করি বলত? ও ধেড়ে মাগীকে আমার একটুও বিশ্বাস নেই—বদ্‌না বেটাকে তাড়াবো, আর এক ভেড়ের ভেড়েকে জুটাবে।

বল্লুম, ছিঃ মার সম্বন্ধে ও কথা বল্‌বেন না,—পাপ হয়।

হুঁঃ, তুমি ছেলে-মানুষ, স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে কিছুই জান না। ও দিল্লিকা লাড্ডু, যো খায়া উওভি পস্তায়া যো নেহি খায়া উওভি পস্তায়া!

তাঁর কথা শুনে আমার হাসি এসে গেল; অতি কষ্টে চেপে বল্লুম, এখন

আপনার মাথাটা একটু গরম হ'য়ে আছে ; কিছু সময় যাক্—একটা কিছু মতলব এসেই যাবে।

ঠিক বলেছ, আমি অনেক সময় কিছু গোল-যোগে পড়লে সটান্ দক্ষিণেশ্বরে চলে গিয়ে দশ বার ঘণ্টা কাটিয়ে আসি, বুদ্ধি একদম সাফ্ হ'য়ে যায়।

বেশত' আজই চলে যান্ না।

গোটা দুই টাকা দিতে পার ?

পারবো।

আচ্ছা তবে এই লাঠিটা রইল এখানে। তুমি একবার ওদিকে গিয়ে ব'লে দিয়ে এসো যে—আজ রাতে আমি আস্‌বো না।

টাকা দুটি নিয়ে হাবুদত্ত—রওনা হবেন—এমন সময় বল্লুম, ঐ লুঙ্গীটা ছেড়ে একটা ধুতি আর চাদর নিয়ে যান।

ঠিক বলেছ, ব'লে বেশ পরিবর্ত্তন ক'রে হাবুদত্ততীর্থ ভ্রমণে চ'লে গেলেন। আমার ঘরের এক কোণে মাটির উপর—তাঁর লুঙ্গী এবং এণ্ড্রোক্লিস্-কুস্তি ঝুলে রইলো।

বেলা তিনটে-চারটার সময় হাবুদত্তের প্যারাডাইসে গিয়ে উপস্থিত হলাম। বিরজা সাদর অভ্যর্থনা করলেন। বদলের ব্যাপার নিয়ে তিনি যেন মনে-মনে খুসী হয়েচেন, দেখ্‌লুম ;—অন্ততঃ একটা নিষ্কৃতির ভাব।

বল্লেন, কিন্তু ইলা ভারি রাগ ক'রেচে ; সে নিজের ঘরে ব'সে পেন্টিং করচে—ওর যেদিন মন ভাল থাকে না—সেদিনই পেন্টিং করে।

অন্যদিন হলে তিনি ডেকে বল্‌তেন ; কিন্তু আজ যেন সেটুকু সাহসে কুলোল না, বল্লেন, যাওনা তুমি যাও না।

ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি ইলা একটা চায়ের পেয়ালা এঁকে তাতে গাঢ় নীল রং দিচ্ছে। বল্লুম, রংটি কি চায়ের রংএর কম্‌প্লিমেণ্টারি করেছ ?

ইলা মুখ ভার ক'রে বল্লে, এতেও কি মানুষের কোন স্বাধীনতা নেই ? এখেনেও কি সমালোচক তার বিনা পয়সার পরামর্শ দিতে কার্পণ্য করবে না ?

বল্লুম, যে তুমি যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করচ, সৌন্দর্য্য কোন ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি নয়—তাই তার সমালোচনার পথ সমালোচক মাত্রেরই কাছে উন্মুক্ত।

ইলা বল্লে, সমালোচক হ'তে কাঠ খড় লাগে না কিনা। অন্যের কাজের কুৎসা করার মত সহজ কাজ বোধকরি পৃথিবীতে আর দুটি নেই।

হেসে বল্লুম, সে কথা খুব সত্যি ইলা।

সে তুলিটা টেবিলের একদিকে ফেলে দিয়ে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বল্লে,— আঃ কিছু ভাল লাগে না ; কেবল যেন কাঁদতে ইচ্ছা করে আমার।

ইজি-চেয়ারের উপর এসে, বসে সে কাঁদ কাঁদ মুখ ক'রে রইল। তাকে দেখে বাস্তবিকই করুণার উদ্রেক হয়।

খানিক পরে ইলা বল্লে,—আজ বুঝি পথ ভুলে এদিকে এসেচ?

পেয়াদায় পথ ভুলিয়ে দেয় অনেক-সময় আমার। এ কথাটা তার ভাল লাগ্‌লো—কারণ সে কপালটা অতিমাত্রায় কুঁচ্‌কে রইল।

অন্য দিকে ফিরে, সে বল্লে, বাবা কিন্তু লোক তত খারাপ নন্। লোকের পরামর্শে এই সব করেন।

বুঝ্‌তে পারলুম যে ইলা দোষটা বিশেষ ক'রে আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছে। একবার মনে হ'ল যে আপত্তি ক'রি ; কিন্তু আর একদিনের অভিজ্ঞতায় জানা ছিল যে সে মানুষকে অবিশ্বাস ক'রতে দ্বিধা করে না। একজনকে মিথ্যাবাদী বল্‌লে যে তাকে কতখানি অপমান করা হয়—সে বোধ তার ছিল না।

বুকের মধ্যে ছুরি বেঁধার মত একটা ব্যথা বোধ করলাম ; কিন্তু মুখ খুল্‌তে সাহস হ'ল না।

ইলা কি ভাব্‌লে তা জানিনে, আমার মনে হ'ল যে সে যেন মনে করলে যে আমি চুপ ক'রে থেকে আমার নিজের অপরাধটা স্বীকার ক'রে নিলাম ; তাই একটু যেন উত্তেজিত হ'য়ে বল্লে, সত্যি কথা বল্‌বার সৎসাহসের অভাব দেখ্‌লে আমি সব চেয়ে ক্ষুব্ধ হ'য়ে পড়ি।

বল্লুম, সত্যকে মর্য্যাদা দান করাও বড় শক্ত ইলা।

সে বল্লে, সত্য কারুর মর্য্যাদার মুখাপেক্ষী নয়, তাকে কেউ অপমান করলে সে গ্রাহ্য করে না।

কথাটি আমার বড় ভাল লেগেছিল। বল্লুম, বেশ তবে তোমাকে সংক্ষেপে বলচি যে, তোমার বাবাকে আমি তোমার সম্পর্কে কোন পরামর্শ দিই নি।

সে একটা অবিশ্বাসের হাসি হেসে বল্লে, কিন্তু আমি জানি যে তিনি আজকে অনেকক্ষণ তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রেই কাটিয়েছেন। একথা বোধকরি তুমি এত শীঘ্র অস্বীকার ক'রবে না।

তার কথায় একটা তীব্র শ্লেষ ছিল।

হায় মূঢ় মেয়ে! তর্ক করতেও যে তোমার সঙ্গে মন চায় না; এই কথাই তখন আমার একমাত্র বক্তব্য ছিল; কিন্তু কিছুই বল্লুম না!

চুপ ক'রে রইলে যে বড় ?

তুমি যে একেবারে নিঃসন্দেহ, আর কিছুর ফাঁক যে একটুও নেই সেখেনে।

তোমার ঐ বিনিয়ে বিনিয়ে কথা শুন্‌লে আমার গায়ে যেন জ্বর আসে, ব'লে ইলা উঠে প'ড়ে তুলিটা ধুতে লাগ্‌লো।

ইলা বল্লে, বাবা এখন গেলেন কোথায় শুনি ?

দক্ষিণেশ্বরে।

মানুষের বুদ্ধিতে আর কুলোল না; তাই তোমরা বুঝি দেবতার আশ্রয় নিয়েচ ?

বোধ হয়।

হঠাৎ ইলা আমার দিকে ফিরে বল্লে—আমি বলে দিচ্ছি, দেবতা মানুষ সকলের চক্রান্ত শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হবেই হবে,—তার দু চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে বার হচ্ছিল।

যখন সব কথা ভাবি—ইলা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লো,—তখন ধিক্কারে আমার মন ভ'রে ওঠে!

কিন্তু সে ফের যখন আমার দিকে চাইলে, তখন তার চোখ দুটো অনেক নরম হ'য়ে গেছে, তাই সাহস ক'রে জিজ্ঞেস করলুম, কি কথা ইলা ?

একটু হাসিও যেন তার ঠোঁটের কোণে চম্‌কে চলে গেল, সে বল্লে, মানুষের ঐ ক্ষুদ্র প্রবৃত্তিটার কথা, যেখানে ঈর্ষার তাতে কল্পনা নিত্য বিস্তার লাভ করে,—ব'লে সে একটু ভেবে নিয়ে আবার বল্লে,—যেখানে তিল তাল হ'য়ে উঠে—যেখেনে অশ্ব-ডিম্ব—ব্রহ্মাণ্ডের আকার ধারন ক'রে!

আমি অবাক্ হ'য়ে গেলুম তার প্রকাশ করবার ভঙ্গী দেখে।

সে বল্লে, আচ্ছা, বরুনের মত আমার একটি ভাই যদি আজ থাকতো ?

ভালই ত হতো, ইলা।

আর সে যদি খেল্‌তে খেল্‌তে আমার গালে একটু রং মাখিয়েই দিত, ত' কি এমন একটা মহামারি কাণ্ড হতো—তুমি ঠিক ক'রে বল ত দেখি ? এই নিয়ে একটা হৈ রৈ কাণ্ড!—ছুটলেন, তিনি চাণক্য-পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ করতে—তারপর, বানপ্রস্থ না শেষ পর্য্যন্ত নিয়ে বসেন!

আমার যেন একটু লজ্জা-লজ্জা করতে লাগ্‌লো।

ইলা বল্লে আমি অবাক্ হ'য়ে যাই—ভেবেই পাইনে, যে মানুষের আর এক-

দিকে কল্পনা এত কম, কি ক'রে হয়! কেমন ক'রে আমার দিন কাটে বল ত'? কার সঙ্গে দুটো কথা কই? বদনকে ডাকি, আদর করি, সে ত কেবল আমার নিজের প্রয়োজন-বশেই! তুমি ত' ডুমুরের ফুল।—আর, বাপ মার সঙ্গে কোন্ ছেলে-মেয়ে দিন কাটাতে পারে?...

কি জানি, যেটা সব চেয়ে স্বাভাবিক, আর সহজ—সেটা মনে না এসে, এমন অসম্ভবটা মনে আসে কি ক'রে—তাই ভেবে, কুল কিনারা পাইনে!

ইলা, এ দিকটা কি সহজ সুন্দর ক'রেই না দেখিয়ে দিলে!

তারপর সে বল্লে, জানত বদনকে, সে একটা ইডিয়ট্—হঠাৎ ডেঁপো হ'য়ে গেলে ছেলেরা যেমন অভিনয় ক'রে কথা কয়, তেমনি ক'রে কথা কইতে শিখেচে। আর ও বয়সে ছেলেরা এমন একটু আধটু নাটুকে ধরণের হয়েও যায়, বোধ করি।

সব কথার শেষে ইলা বল্লে, আজও তোমাকে সেই সে দিনের কথাই বলচি, বদনকে নিয়ে একটা অনর্থ গণ্ডগোল যাতে না হয়—তাই আমি চাই। সেই দিক দিয়ে রেহাইএর দাবি, আমার একান্ত ন্যায়-সঙ্গত দাবি বলেই মনে করি।

বাসায় ফিরে আসতে আস্‌তে আমি এই কথাগুলোই মনের মধ্যে বারম্বার তোলাপাড়া ক'রতে লাগ্‌লাম। ইলা আমাকে বদন সংক্রান্ত ব্যাপারে সন্দেহ না ক'রে থাক্‌তেই পারে না। কেন?

কেন? তা' আজও ঠিক ক'রে বুঝে উঠ্‌তে পারি নি; সে ফুলের মত হাসে, সাপের মত ফোঁসে; মানবীর মত ভালবাস্‌তে জানে—আবার দানবীর মত সেই ভালবাসার অমর্য্যাদা ক'রে নিজের অভিশাপের দাবানলে নিজেকে পুড়িয়ে এমন মায়া কান্না কাঁদতে পারে—যাতে সংসার চকিত হ'য়ে উঠে!

অন্ধকার ঘরে চুপ্-চাপ ব'সে তপ্ত মনকে ঠাণ্ডা করতে লাগ্‌লুম। মনের আগা-গোড়া হাত্‌ড়ে দেখ্‌লুম—এক জায়গায় বড় ব্যথা!

জীবন-পথে চল্‌তে চল্‌তে পথিকের পায়ে কত কাঁটাই না ফোটে! তার মধ্যে দুটো একটা এমন ফোটে যে তার ব্যথা আর কোন দিনই যায় না। এ বুঝি তেম্‌নি?

পা টিপে-টিপে বদন কখন এসেছিল তা' বুঝতে পারিনি। বাতি জ্বালতে গিয়ে তাকে দেখে চম্‌কে উঠ্‌লুম।

কতক্ষণ এসেছ বদন?

এখুনি।

কোন সাড়া পাইনি যে ?

মনে ক'রেছিলাম, তুমি ঘুমিয়েছ তাই ডাকি নি।

বদনের আজ আর ফেণা-কাটা ভাব নয়, থিতোন।

তারপর ?

সে চুপ্‌টি ক'রে রইল,—এমনি অনেকক্ষণ কেটে যাবার পর—সে বল্লে, আলোটা নিবিয়ে দাও, চোখে লাগে।

আবার ঘর অন্ধকার ক'রে দিয়ে আমরা চুপ-চাপ ব'সে রইলাম।

বদন।

কি ?

কথা কও।

সে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লে।

বল্লুম, ইলার সঙ্গে দেখা ক'রে এলুম।

উত্তর, জানি।

তুমি গিয়েছিলে ?

নাঃ—।

তবে কেমন ক'রে জান্‌লে ?

তোমাকে—যেতেও দেখেচি, ফিরতেও দেখেচি।

বুঝলাম, বদন কাছাকাছিই লুকিয়ে ছিল।

এখন কি করবে ঠিক ক'রেছ ?

সেই কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেচি।

আমাকে ! কেন ?

জানিনে।...তুমি জাননা ?—একটা গভীর অভিমানের বেদনা-জড়িত কণ্ঠ-স্বর !

উত্তরে বল্লুম, জানি।

তবে বল।

কিছুই তোমার করতে হবে না ভাই ; দু চার দিন পরে কারুর কিছুই মনে থাক্‌বে না। ইলা তোমার উপর একটুও রাগ করে নি।

বদন যেন উত্তেজিত হ'য়ে বল্লে, ঠিক জান ? আমায় লুকচ্চো না ?

না হে, না।

সে যেন সবটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে—বাস্—আর আমি কিছু চাইনে।

সিঁড়ির উপর পায়ের শব্দ হ'য়ে উঠ্‌লো।

বদন ত্রস্ত হ'য়ে বল্লে, ঐ আস্‌চে।

কে?

হাবু দত্ত।

তিনি দক্ষিণেশ্বর গেছেন।

আঃ—ঐ তার পায়ের শব্দ—আমি খুব চিনি—ব'লে বদন—কোণের টুলটির উপর গা-ঢাকা দিয়ে বস্‌লো।

হাবু দত্ত দরজার কাছে এসে বল্লেন, কিরণ,—আর কে?

উত্তর দেবার আগেই—ঘরে ঢুকে দেশলাই জেলে—বদনের দিকে একটা কঠিন কটাক্ষ ক'রে—বল্লেন,—তুমি?

হাবু দত্তর হাত দুখানি ধ'রে ঘরের অপর দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে বল্লুম—দেখুন, মনটাকে শান্ত করুন।

হাবুবাবু, আমার দিকে ফিরে বল্লেন, গুরুদেবের অপমান করবো না—আমি তাঁর আদেশ পেয়েছি।

খুব ভাল কথা।

বাতি জেলে দিলুম।

কি আদেশ?

হাবু দত্ত বল্লেন, আমি বদনকে একটি মাত্র প্রশ্ন করতে চাই—তারপর সব স্থির করবো। কি বল?

করুন না প্রশ্ন,—বল্লুম আমি।

হাবু দত্ত বদনের দিকে ফিরে অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বল্লেন, বদন, তুমি কি ইলাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত আছ?

বোধ করি বদন এই প্রচণ্ড কথার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না; কিন্তু তার উত্তর শুনে আমরা দুজনেই অবাক হ'য়ে গেলাম।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে হাবুদত্ত বল্লেন, বেশ, তা হ'লে—তুমি অবাধে আমার বাড়ীতে যাওয়া আসা করতে পারো; তোমার স্বাধীনতায় আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না।

বদনের হাত ধরে হাবুদত্ত বার হ'য়ে গেলেন। আমার পেট হাসির ভুড়-ভুড়িতে ভরে উঠ্‌লো।

থিয়েটারের মঞ্চে যদি এই অভিনয় ঘট্‌তো তো দর্শক নিশ্চয় বল্‌তো—কৃত্রিম।

সত্য বহুরূপী!

—ক্রমশঃ

(প্রথম ভাগ সমাপ্ত।)



একটা ফিরিস্তি

শ্রীভূপতি চৌধুরী

স্রোতের আবর্ত্তে পড়ে যেমন সকল জঞ্জাল এক জায়গায় এসে জড় হয়, হয় ত তেমনি কোনো কারণে সহরের অনেকগুলি প্রাণী এসে জুটেছিল এইখানে।

সহরের বড় রাস্তার ওপর চার পাঁচতলা বাড়ীগুলোর মধ্যে, এই টিনের ছাদের দোতলা কাঠ-কোঠাটা আরসির কাঁচের দাগের মতো যতটা বেমানান মনে হ'ত, পাড়ার আর সব ভদ্র অধিবাসীদের তুলনায় এই বাড়ীটির বাসিন্দাগুলি তার চেয়ে বড় কম বিসদৃশ ছিল না।

এ বাড়ীর বাসাড়েগুলি মাত্র একটী জাতি ও একটী শ্রেণী-বিশেষের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। একতলার এক-টেরে কতকগুলি ঘরে থাকত কয়েকজন কলের মিস্ত্রী, তার পাশে একটা চত্বরে থাকত জন কয়েক ট্যাক্সি ড্রাইভার; আর শেষের চত্বরটীতে থাকত ক্ষান্তমাসী ও তার দল। এই কোঠাটীর দোতলায় থাকত কয়েক জন মুসলমান দরজি, একটী মান্দ্রাজী ডাক্তার, এক খৃষ্টান পরিবার ও কয়েকজন অফিসার-বাবু।

এই অপূর্ব্ব সম্মিলনের ফলে সে বাড়ীর মধ্যে দিনের অতি প্রত্যুষে যে শব্দ-কোলাহলের সূত্রপাত হ'ত, রাত বারোটার পূর্ব্বে কোনো দিন তার নিবৃত্তি হ'ত না। ভোর পাঁচটায় মিস্ত্রীর দল কলের কাজে যাবার জন্যে উঠে, যে শব্দ ঝঙ্কার তুলে দিত, সেই সুর সারাদিন যাতে না নেমে পড়ে, সে জন্য দরজির দল ও তাদের কল এবং ক্ষান্তমাসী ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা সতত সচেষ্ট থাকত। মধ্যে মধ্যে অফিস-ফেরত বাবুর দলও এ গোলে যোগ দিত তবে এই সুর সঙ্গতের শেষ তেহাই দেবার ভার ছিল উপরের ঐ খৃষ্টান পরিবারটীর উপর।

খৃষ্টান পরিবারের কর্ত্তাটী রাত বারোটার আগে ফিরতেন না এবং যখন ফিরতেন তখনকার তাঁর অবস্থাটাকে, আর যাই হোক, সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ বলা চলে না। এজন্যে ঘরে প্রবেশ ক'রে, ঝোঁকের মাথায় তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এমন

ভাবে আলাপ করতেন, যাতে সে বাড়ীর শান্তিভঙ্গের যথেষ্ট আশঙ্কা থাকত। তবে রক্ষার বিষয় সাক্ষ্য থাকত মাত্র একজন; সে হচ্ছে ক্ষান্তমাসী। অপর সকলে ততরাত্রে ঘুমিয়ে পড়ত এবং এমন ঘুমোতো যে কোনো সাড়াই আর তাদের পাওয়া যেত না।

এত রাত্রি পর্য্যন্ত জেগে থাকায় অথচ ভোর পাঁচটায় কলের মিস্ত্রীদের সঙ্গে বিছানা ছেড়ে ওঠায়, বাড়ীর সকল বাসিন্দার আসা-যাওয়ার ফিরিস্তির সঙ্গে ক্ষান্তমাসীর যতটা পরিচয় ছিল, এত আর কারো ছিল না, এবং এই জন্যেই অনেকটা, সে বাড়ীর সকলেই এই মানুষটীকে চিনত।

শান্ত শিষ্ট মানুষ ক্ষান্তমাসী, নিজের থেকে পরের তত্ত্বাবধানই ক'রে বেড়াত বেশী। নিজের ঘরদোর ঝাঁট, রান্নাপাট কোনো রকমে সেরে, বাকী সময়টুকু সে তার দলের খবরদারী ক'রে বেড়াত; শুধু তার দল নয় বাড়ীর সমস্ত বাসিন্দারই সে খোঁজ রাখত; এমন কি খৃষ্টান জেনেও ঐ খৃষ্টান পরিবারটীর খবরও সে, তাদের মহল না মাড়িয়ে ডিঙি মেরেও জেনে আসত। এমনি ক'রে দিন কেটে যেত, সন্ধ্যে হ'ত। তারপর ক্ষান্তমাসী তার জপের মালা নিয়ে বসত। রাতের সঙ্গে সঙ্গে যে যার ঘরে ফিরত।

এমনি করে সে বাড়ীর জীবনধারা চলছিল, কিন্তু হঠাৎ একটা অঘটন ঘটে গেল। প্রতিদিনের নিয়মিত কাজের তালিকা শেষ ক'রে ক্ষান্তমাসী রাতের অভিনয়ের শেষ অঙ্কের অভিনেতাটীর পদক্ষেপের আশায় জেগেছিল। রাত বারোটা বাজল। তখনও সেই মাতাল খৃষ্টানটার দেখা নেই। ক্ষান্তমাসী মনে মনে কেমন অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠল। আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল; ক্ষান্ত আর বিছানাতে শুয়ে থাকতে পারল না, তার ঘরের দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়াল: এমন সময় তার চোখে পড়ল তিনটী কালো মূর্ত্তি। অন্ধকারে তাদের চেহারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু তাদেরই মধ্যে একজনের পরিচিত ভাবভঙ্গী থেকে, তাকে সেই মাতাল খৃষ্টান বলে বুঝে নেওয়া যায়। অপর দু জন এমন ভাবে তার সঙ্গে চলছিল যে মনে হয় তারা তিনটীই অতি প্রিয় বন্ধু। ক্ষান্ত তার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সুরু হ'ল উপরের খৃষ্টান পরিবারের কোলাহলের অভিনয়। এত ভীষণ দাপাদাপি ও কোলাহল এর পূর্ব্বে কখনও তার কানে আসে নি। খানিকটা পরে দাপাদাপি যখন শেষ হয়ে গেল তখন নারীকণ্ঠের একটা অস্পষ্ট ক্রন্দন ও গোঙানির শব্দ তার কানে এসে বাজল। কল্পনায় একটা অত্যাচারের বীভৎস ভীষণতা অনুভব ক'রে, তার প্রাণ একটা

আশঙ্কায় দুলে উঠ্‌ল। তার নারী-হৃদয়ে একটু সাহস শুধু উঁকি দিয়ে গেল। কিন্তু অতগুলো মাতাল, সে একা, বাড়ীর আর সকলে যেন নেশার ঝোঁকে ঘুমুচ্ছে। সে যেমন বিছানায় শুয়েছিল, তেমনিই শুয়ে রইল, শুধু ভয়ে চোখের দু'টী পাতা এক করতে পার্‌লে না। খানিকটা পরে দুপ্‌দাপ্‌ ক'রে মাতালের দল সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। কিন্তু আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠায় সে রাত্রি আর তার ঘুম হ'ল না।

প্রতিদিনকার মতোই সে ভোরে ভোরে উঠে পড়্‌ল। কিন্তু সে দিন আর তার কাজে মন লাগ্‌ছিল না। একটা অসোয়াস্তির ছোঁয়াচে তার শরীর ও মন যেন বিষিয়ে উঠেছিল। কোনো রকমে অবাধ্য মনটাকে দিয়ে নিজের কাজগুলো করার সঙ্গে সঙ্গে সে লক্ষ্য করছিল খৃষ্টানটা কখন বা'র হ'য়ে যায়। তার বা'র হওয়ার সময় চলে গেল; আপিসের বাবুর দল কাজে বা'র হ'য়ে গেল, সরকারী উঠোনে বেলা এগারটার রোদ এসে পড়্‌ল। তখনও খৃষ্টানটার নামবার নাম নেই। নিজের কাজ সমস্ত শেষ হ'য়ে গেল; ক্ষান্তমাসী আর থাক্‌তে পার্‌লে না, সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে খৃষ্টান পরিবারটীর ঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল।

সে দিকটা একেবারে নিস্তব্ধ; কোন শব্দ তাদের ঘর হ'তে আসছিল না। বাড়ীর এই অংশটা অবশ্য রাত দুপুর ছাড়া অন্য সকল সময়েই চুপচাপ থাকে; কিন্তু এখনকার স্তব্ধতা যেন কেমন বিশ্রী বোধ হচ্ছিল। ক্ষান্ত একটু এগিয়ে গিয়ে দেখ্‌লে বারান্দায় কাগজ পত্তর ছড়ান, নোংরাকার হয়ে আছে। পা টিপে টিপে ঘরের কাছে গিয়ে দেখে দরজাটা হাঁ হাঁ কর্‌ছে। খৃষ্টানটা নেই; ঘরে জিনিস পত্তর কাল বা ছিল; কিন্তু যা ছিল তা'ও কিছু নেই, শুধু আছে দুটী জিনিস,—একটী বিছানা সমেত ভাঙা খাট ও তার উপরে শায়িত একটী মেয়ে। এই মেয়েটীই ঐ খৃষ্টানের স্ত্রী। মেয়েটীর বয়স আঠার কি উনিশ হবে। কিন্তু দেখ্‌লে মনে হ'ত পনেরর বেশী নয়। অভাব আর অত্যাচারের পেষণে মানুষ তার দেহের শ্রী সৌন্দর্য্য লাবণ্য ও পুষ্টি কতটা হারিয়ে ফেল্‌তে পারে এই মেয়েটী হচ্ছে তার একটী জীবন্ত নমুনা।

ঘরের মধ্যে বোতল-ভাঙা পড়ে আছে আর ছেঁড়া কাগজ উড়্‌ছে। সেই নোংরার মধ্যে খাটটীর উপর মেয়েটী অসাড় হ'য়ে আছে। ক্ষান্ত ভয়ে ভয়ে অতি সাবধানে, সেই ঘরে ঢুকে মেয়েটীর নাকের কাছে সন্তর্পণে হাত দিয়ে দেখ্‌লে—তখনও নিঃশ্বাস পড়্‌ছে। তারপর তার কপালে যতটা স্নেহভরে পারা যায় ততটা কোমলতার সঙ্গে তার ফাটা-হাতখানি মেয়েটীর কপালে রাখ্‌লে।

জ্বরের তাপে হাতটা ছ্যাঁক্ ক'রে উঠ্‌ল। মেয়েটীর একটা হাত তার শুয়ে থাকার দোষে কেমন যেন দুম্‌ড়ে ছিল। সেই হাতটী ঠিক ক'রে দিতে গিয়ে, সে হাতের শীর্ণতা দেখে কান্ত চম্‌কে উঠ্‌ল।

খৃষ্টান, একথা তার মনের কোণে উঁকি দিলেও, এ যে একজন অত্যাচারিতা পীড়িতা, অসহায়া নারী এই কথাটাই তখনকার মতো মাথা তুলে দাঁড়াল। তার প্রাণের দরদী সখী ব্যথায় সমবেদনায় কেঁদে উঠ্‌ল। আর ইতস্তত না ক'রে সেই উনিশ বছরের তরুণীকে একটী ছোট মেয়ের মতো কোলে ক'রে, কান্ত তাকে তার নিজের ঘরে নিজের বিছানার ওপর এনে শুইয়ে দিলে।

কান্তমাসীর দল ব্যাপার দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে প'ড়েছিল। সেই বিস্ময়েরই ঝোঁকে, গালে হাত দিয়ে কে যেন ব'লে ফেললে—যত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড মাগো! কোথাকার এক খিরিস্তেন ছুঁড়িকে এনে, মাসী ঘরে পুরলে—আচার বিচের আর রইল নে . . .

কথাগুলো কান্তমাসীর কাণে যেতেই একবার মেয়েটীর অবস্থার দিকে চেয়ে সে একটু চুপ ক'রে দাঁড়াল। তারপর আর নিজেকে স্থির না রাখতে পেরে, তার গলার শান্তস্বরকে উচ্চগ্রামে চড়িয়ে বল্‌লে—বলি আচারি লো আচারি আমার; তোদের আবার কুটীনি কিসের লা। যদি বলি তোর কুলের কথা—'

এই কুলের কথাটা অবশ্য কান্তমাসী ক্ষান্ত না দিয়ে ব'লে ফেললে বিশেষ সুশ্রাব্য হবে না; সুতরাং চুপ ক'রে যাওয়া শ্রেয় ভেবে সকলে একে একে স'রে পড়্‌ল।

কান্তমাসী ঘরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাকিনীর মতো এই পরচর্চ্চাকারীদের পলায়ন লক্ষ্য ক'রে রাগে ফুলছিল; এমন সময় সেই রুগ্না মেয়েটীর একটা অস্ফুট আর্ত্ত স্বর তার কাণে এল—মাগো! মুহূর্ত্ত-মধ্যে তার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে গেল। ক্ষিপ্তা ডাকিনী স্নেহশীলা রমণীর মতো মেয়েটির কাছে এসে দাঁড়াল। আবার কপালে জ্বরের তাপ লক্ষ্য ক'রে জলপটির ব্যবস্থা ক'রে, তার চিকিৎসার জন্যে সে ওপরের মাদ্রাজী ডাক্তারটীকে খবর দিতে গেল।

এইদিন হতে সমস্ত বাড়ীটার মধ্যে কেমন একটা পরিবর্ত্তন সুরু হ'য়ে গেল।

এতদিন পর্য্যন্ত কান্তমাসী যেমন অপরের খোঁজ নিয়ে এসেছিল, এইবার অপরে তেমনি কান্তমাসীর খোঁজ নেওয়া আরম্ভ করলে। অবশ্য খোঁজ নেওয়াটা দোষের নয়, কিন্তু খোঁজ নেওয়ার মধ্যে যে দোষ থাকতে পারে তা প্রথম প্রকাশ পেল, শ্যামঠাকুর ও তার পরিবারের ঝগ্‌ড়া থেকে। ব্যাপারটা হয়েছিল কি,

—মেয়েটীকে ক্ষান্ত তার ঘরে আশ্রয় দেবার পর হ'তে শ্যামঠাকুর তার অবসর-সময়টুকু এই খোঁজ নেওয়ার ছলে মাসীর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় কাটিয়ে দিত। এই ব্যাপারটীকে কটাক্ষ ক'রে শ্যামঘরণী দু'এক কথা বলায় শ্যামঠাকুর তার প্রতিবাদ করে এবং ঘরণী তখন রুখে দাঁড়ানয় ব্যাপার গুরুতর হ'য়ে পড়ে। অন্যসময় হলে ক্ষান্তমাসীর গলার ধমকে কাণ্ডটা এতদূর গড়াত না কিন্তু সে সেদিন নিস্ক্রিয় দর্শকের মতো সমস্ত ব্যাপারটা উপভোগ করায়, ঝগড়াটা হাতাহাতিতে পরিণত হ'য়ে বেশ জমে ওঠে; অবশেষে বাড়ীর আর সব বাসীন্দারা এসে সব থামিয়ে দেয়।

শ্যাম ও শ্যাম-ঘরণীর মধ্যে যে ব্যাপারটা এমনভাবে প্রকাশ্য হ'য়ে পড়েছিল, দলের অপর দম্পতির মধ্যে সে ব্যাপারটার আর পুনরাভিনয় না হ'লেও মনে মনে বেশ একটা অসন্তোষ জমে উঠেছিল।

নীচের তলায় যখন এ অবস্থা তখন দোতলার ঐ অফিসার বাবুরাও বড় নিশ্চিন্ত ছিল না। যাদের নিয়মিত কাজ ছিল—অফিস যাওয়া, তাস-পিটান ও জড়ের মতো ঘুমান, তারাও সকলে যেন মনুষ্যত্বের উত্তেজনায় মেতে উঠ্‌ল। যে মেয়েটীর ওপর সহস্র অত্যাচার হ'য়ে যাওয়ার সময়, মাতালের ভয়ে বা নিজেদের জড়ত্বের বন্ধনে, যারা কোনোদিন সহানুভূতি দেখাবার অবসর পেত না, আজ তারা সকলে সেই মেয়েটীর সম্বন্ধে জাগ্রত হ'য়ে উঠ্‌ল। মেয়েটীর নিঃসহায় অবস্থা, একা ক্ষান্ত কতটা করবে? এই উদ্দেশ্য নিয়ে তারা সকলেই সরকারী মাসীকে সাহায্য করবার জন্যে অগ্রসর হ'ল। এই কাজ ক'রে দেওয়ার সুযোগে ক্ষান্তমাসীর প্রিয়পাত্র হওয়ার চেষ্টায় পরস্পরের মধ্যে বেশ একটু রেষারেষিরও সূত্রপাত হ'ল।

এই সমস্ত ব্যাপারের ফলে বাড়ীর মধ্যে ক্ষান্তমাসীর প্রতিপত্তি বেশ বেড়ে উঠেছিল; কিন্তু এর কারণ যে কি তাও তার মতো অভিজ্ঞার কাছে অজ্ঞাত ছিল না। লোকগুলার ব্যবহার দেখে তার হাসি পেত আবার ভয়ও হ'ত একটু। মানুষ যখন প্রবৃত্তির তাড়নায় পশু হ'য়ে ওঠে তখন সে পশু-বলের কাছে তারা যে কত অসহায় তা'ত আর অজানা নয়। তাই এক এক সময় সে ভাবত এইবার যদি মেয়েটী কোথাও আশ্রয় পায়। তবেই তার মুখরক্ষা হয়। কিন্তু কোথায় যে এ আশ্রয় পাবে তা সে ভেবে ঠিক করতে পারত না। আর ভয় হত, একদিন যাকে সে আশ্রয় দিয়েছে, তাকে যদি তারই আশ্রয়ে নিপীড়িত হ'তে হয় তাহলে ত তার কলঙ্কের সীমা থাকবে না। অপরে হয়ত ভাববে এর মধ্যে তারও কিছু হাত ছিল।

সেই মেয়েটী যাকে নিয়ে এতবড় একটা নাট্যের অভিনয় সুরু হয়েছিল, সে কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটী বেশ একটু উপভোগ ক'রে যাচ্ছিল। তার জীবনের এক প্রহরের অশান্তি যখন বাড়ীর অন্য বাসীন্দাদের অষ্টপ্রহরের অশান্তি হ'য়ে দাঁড়াত, তখন সে বেশ আনন্দিতই হ'ত। এদের এই দ্বন্দ্ব কলহের বীভৎসতা দেখে সে হাস্‌ত, মনে করত—কি নির্ব্বোধ এরা, কি ঘৃণ্য জীব এ সব। তার মন সবচেয়ে কঠোর হয়ে উঠ্‌ত যখন সে দেখ্‌ত ওপরের অফিসার বাবুরা সরকারী উঠোন পার হ'য়ে ক্ষান্তমাসীর ঘরের সিঁড়ি দিয়ে, তার দিকে চেয়ে চেয়ে তারা ওপরে উঠে যেত। এদের এই ব্যবহার দেখে সে ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌ত, কখনও আবার ব্যঙ্গের কঠিন হাসিতে সে তাদের আঘাত করত। কিন্তু তারা কি তা বুঝ্‌ত; তারা যেন কৃতার্থ হয়ে যেত। সে ভাব্‌ত—এরা ক্ষ্যাপা না পশু, আশ্চর্য্য জীব এরা?

এই আশ্চর্য্যকর জীবের দলের বাইরে ছিল মাদ্রাজী ডাক্তার ও দরজীর দল। দরজীরা তাদের কল নিয়ে এতটা ব্যস্ত থাকত যে সমস্ত ব্যাপারটার গতি লক্ষ্য করার মত সময় তাদের ছিল না। তবে মেয়েটীকে তারা যে একেবারে উপেক্ষা ক'রে যেত, এ কথা ভাবলে পরে ভুল বোঝা হবে। তারা প্রত্যক্ষভাবে কিছু করত না এ পর্য্যন্ত। এইবার মাদ্রাজী ডাক্তার,—কাজ তার বিশেষ ছিল না, কাজেই সময় ছিল প্রচুর। সে লক্ষ্য করত—এতগুলো লোকের আকর্ষণ হ'য়ে আছে একটা মেয়ে, সে কারো দিকে ভ্রূক্ষেপই করে না। এত লোকের মনকে নিয়ে খেলা করতে পেরেছে এই তার গর্ব্ব। তার গর্ব্ব-চূর্ণ করবার জন্যে ক্ষান্তমাসীকে ডিঙিয়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারে এ সাহস কারো নেই। খালি দূর হতে দাঁড়িয়ে ভীড় করে, সকলে লোলুপ দৃষ্টিতে মেয়েটীর দিকে চেয়ে আছে।

তার নারীত্বের এ অপমানের প্রতিবিধান করবার প্রস্তাব নিয়ে, সরাসরি একেবারে মেয়েটীর কাছে গিয়ে তাকে সে তার আশ্রয়ে আহ্বান করলে।

তার কথা শুনে ক্ষান্তর চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই সে তার নিষ্প্রভ চোখের সন্দিগ্ধ আলোয়, ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইল। মেয়েটীর মুখে আবার একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল। ডাক্তার থতমত খেয়ে ধীরে ধীরে তার ঘরে চলে গেল।

প্রতিদিনকার মতো অফিস্-ফেরত বাবুর দল, হট্টগোল করতে করতে, তাদের দৃষ্টি দিয়ে মেয়েটীকে বিদ্ধ করে, তাদের ঘরে ফিরে এল। আজ মেয়েটী যেন নিজেকে বড় বিব্রত বোধ করলে। সে চুপ করে ভাবতে লাগল।

ক্ষান্তমাসী তখন মালায় বসেছে।

মালা শেষ করে উঠে ক্ষান্ত দেখে সে মেয়েটী নেই, আছে শুধু একটা চিঠি। চিঠিতে কি লেখা আছে তা সে জানত না; কিন্তু তার অর্থ যেন সম্পূর্ণ জানা হ'য়ে তার বুকটা কাঁপিয়ে তুলল। চিঠিটা হাতে করে সে তাড়াতাড়ি অফিসার বাবুদের ঘরে উপস্থিত হ'য়ে শুষ্কস্বরে বললে—দেখত বাবা, চিঠিতে কি নেকা আচে।

পাঁচ-সাতখানা হাত একসঙ্গে এগিয়ে এল।

একজন পড়লে—এ জীবনের মতো চললুম, মাসী।—

আর একজন কৃত্রিম নিরাশাদগ্ধ কণ্ঠে বললে—মাসী, বোনঝি ভাগ্‌লো কার সঙ্গে?

ঘর শুদ্ধ বাবু 'হাঁ' করে ক্ষান্তর দিকে চেয়ে রইল।

'যমরাজের সঙ্গে' বলে ক্ষান্ত তাদের দিকে একটা ঘৃণাতিক্ত কৃপাদৃষ্টি হেনে, তাদের ঘর হতে বার হয়েই দেখে ডাক্তারের ঘরটা হাঁ হাঁ করছে। আর তার মধ্যে থেকে ডাক্তার বার হয়ে এসে, যেন তার দিকে চেয়ে, নেমে চলে গেল।

ক্ষান্ত নির্ব্বাক বিস্ময়ে সে দিকে চেয়ে রইল। তার বুক থেকে একটা দীর্ঘ-শ্বাস ঝরে পড়ল। তারপর সে যেন সচেতন হয়ে, তাড়াতাড়ি নীচে নেমে, বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। তার জীবনেরও এমনি একটা দিনের কথা তখন মনে হ'ল। কিন্তু তাতে কি?—

যে গেল সে গেল।





রম্যাঁ রলাঁ

[অনুবাদক—শ্রীকালিদাস নাগ ও গোকুলচন্দ্র নাগ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জানালার নীচে রাইন নদী বাড়ীর দেওয়ালের গা দিয়া বহিয়া চলিয়াছে; উপরের এই জানালাটি নদীর উপর নদীর-মতই-গতিশীল আকাশের মধ্যে ঝুলিয়া আছে। সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার সময় ক্রিস্তফ্ সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে এই জানালার দিকে তাকাইয়াছে কিন্তু ইহাকে আজ যেমন করিয়া সে দেখিল এমন করিয়া কোন দিন দেখে নাই। দুঃখ মানুষের অনুভূতি বা শেষ শক্তিকে তীক্ষ্ণ করিয়া দেয়। চোখের জলে পূর্ব্ব-স্মৃতি ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবার পরও মানুষ অনুভব করে, যেন সমস্তই তাহার মনে গভীর দাগ কাটিয়া বসিয়া আছে, তাহা উঠিবার নয়।

ঐ চলন্ত নদীটি ক্রিস্তফ্-এর কাছে জীবন্ত বলিয়া মনে হইল। এই জীবটির বিষয় অবশ্য সে ঠিক বুঝাইয়া বলিতে পারিবে না তবু সে অনুভব করে যে-সমস্ত জীব সে দেখিয়াছে তাহাদের সকলের অপেক্ষা এই নদীর ক্ষমতা কত বেশী। নদীটিকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সে সার্শির কাঁচের উপর মুখ রাখিল। কাঁচের গায়ে তাহার মুখ নাক যেন চেপ্টা হইয়া লাগিয়া রহিল।

ক্রিস্তফ্ নদীর স্রোতের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবে—কোথায় যাচ্ছে ও? কিসের খোঁজে? ওর কি চাই? ও যেন কত স্বাধীন!—ওর পথ যেন সবই জানা আছে…কেউ কি ওকে থামাতে পারে না?—

দিন রাত্রি এই নদী আপনার ছন্দে নাচিয়া গাহিয়া বাড়ীটির কোল ঘেঁসিয়া বহিয়া চলিয়াছে তাহার বিরাম নাই—রৌদ্র বৃষ্টি, এই গৃহের দুঃখ আনন্দ সমস্ত উপেক্ষা করিয়া সে তাহার চলা বজায় রাখিয়াছে, যেন এ সমস্ত পরিবর্ত্তনে তাহার কিছুই যায় আসে না, দুঃখ যে কি তাহা যেন সে জানে না, বুঝে না! আপনার অসীম শক্তির আনন্দে মত্ত আবেগে সে তাই শুধু ছুটিয়া চলে!

ক্রিস্তফ্ ভাবে—আমি যদি ঐ নদী হ'তাম কি মজাই না হ'ত তাহলে! মাঠের ভিতর দিয়ে উইলো গাছের ডাল নাড়া দিয়ে, চক্‌চকে নুড়িগুলি ধুয়ে ধুয়ে, বালির পাড়ের কোল ঘেঁসে অবিশ্রান্ত ছুটে বেড়াতাম—কিছু ভাববার নেই, ঘরে বন্ধ করবার কেউ নেই, হাতে পায়ে 'খিল্' ধর্‌বে না—স্বাধীন—আমি মুক্ত!...

নদীর দিকে চাহিয়া এক মনে তাহার কলতান শুনিতে শুনিতে ক্রিস্তফ্-এর মনে হইল সে যেন ধীরে ধীরে ঐ নদীর স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে! সে চোখ বন্ধ করিতেই সহস্র প্রকারের রঙ আলো ও ছায়া যেন তাহার সম্মুখে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল! কল্পনার চোখে দেখা যাহা কিছু, তাহার কাছে যেন আকার ধারণ করিয়া দাঁড়ায়! সে ভাসিয়া চলিয়াছে, তাহার দুই পার্শ্বে বিস্তীর্ণ মাঠ, নানা প্রকারের গুল্ম-লতা. শস্য ক্ষেত্রের উপর দিয়া বাতাস বহিয়া যাইতেছে, সমস্ত আকাশ যেন শস্য এবং কাঁচা ঘাসের সুগন্ধে ভরিয়া গিয়াছে! চারিধারে ফুল! পপি, ভায়লেট্ কি সুন্দর! কি মধুর ঐ বাতাসের স্পর্শ ঐ কোমল তৃণ শয্যায় শুইয়া থাকিতে কি সুখ! ক্রিস্তফ-এর মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে তাহার বিস্ময়েরও সীমা থাকে না। এমনি আনন্দ ও বিস্ময় সে অনুভব করিত যখন কোন ভোজ-এর দিনে তাহার পিতা তাহার গ্লাসে অল্প একটু রাইন মদ ঢালিয়া দিয়া বলিত—খা।

ক্রিস্তফ নদীর স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে, কত গ্রাম সে পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে! বৃক্ষের শাখাগুলি জলের উপর যেন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের কচি কচি পাতাগুলি জলের মধ্যে যেন মানুষের হাতের আঙুলের মত খেলা করিতেছে, তরুবীথিকার অন্তরালে একখানি গ্রাম নদীর বুকে প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিয়াছে। সাইপ্রেস্ গাছ এবং সমাধি স্থানের ক্রশ্‌গুলি স্রোতধৌত সাদা দেওয়ালের উপর দিয়া দেখা যাইতেছে। পাহাড়, তাহার কোলে দ্রাক্ষাকুঞ্জ, ছোট একটি পাইন গাছের বন, একটি ভগ্ন প্রাসাদ...তাহার পরই আবার শস্য-ক্ষেত্র, মাঠ, ফুল পাখী সূর্য্যের আলো...

ভারী এবং সবুজ নদীর স্রোত বহিয়া চলিয়াছে যেন একটি অবিচ্ছিন্ন চিন্তার মত।—তরঙ্গের উচ্ছ্বাস নাই, কাচের মত মসৃণ। কিন্তু ক্রিস্তফ্-এর দৃষ্টি ইহার প্রতি নাই। সে চোখ বন্ধ করিয়া কেবল নদীর কলতান শুনিতেছে, এই বিরামহীন উচ্ছ্বাস শুনিতে শুনিতে সে জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়। সে তাহার কল্পনার সাহায্যে আপনাকে বহু উর্দ্ধে লইয়া যায়—এ কল্পনা, এ স্বপ্ন যে কোথায় যায় তাহা কোন মানুষ বলিতে পারে না।

দ্রুত তালে আগ্রহ এবং আবেগের সহিত নদী বহিয়া চলিয়াছে। তাহার ঐ তালে তালে বহিয়া যাওয়া হইতে যেন সঙ্গীতের সৃষ্টি হইতেছে। যেন কোমল দ্রাক্ষালতাটি বেড়া ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, যেন রূপার যন্ত্রের সুর বৃষ্টি! বেহালার অতি করুণ সুরের মত, বাঁশীর সুরের মত কোমল ও মোহন...সহসা নদীটি ক্রিস্তফ্-এর কল্পনা হইতে মুছিয়া গেল! নদীতীরের গ্রামগুলিও সেই সঙ্গে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! তাহার স্থানে গোধূলির ম্লান আলোক দেখা দিয়াছে, ক্রিস্তফ্ যেন তাহাতেই ভাসিয়া বেড়াইতেছে! তাহার শিশু-হৃদয় উচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। ও কাহারা তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল? কি সুন্দর সেই মুখগুলি! আর ঐ ছোট মেয়েটি, যাহার মাথা ভরা এক রাশ তামাটে রং-এর চুল—সে যেন ক্রিস্তফ্‌কে কাছে আসিবার জন্য নানা বিচিত্র ভঙ্গীতে ডাকিতেছে!......একটি বালক ম্লান চোখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে, তাহার চোখের তারা কি গাঢ় নীল।...কেহ তাহার দিকে চাহিয়া কেবল হাসিতেছে। কাহারও দৃষ্টি বিস্ময়পূর্ণ, কাহারও দৃষ্টি তাহাকে যেন বিদ্রূপ করিতেছে! কাহারও চাহনিতে তাহার মুখখানি লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিতেছে। কাহারও দৃষ্টি স্নেহ-স্নিগ্ধ, কাহারও বেদনায় ম্লান। কাহারও বা উদ্ধত—আর ঐ রমণীর মুখ কি সুন্দর! তাহার চুলের রং কালো তাহার পাতলা ঠোঁট দুটি পরস্পরের সহিত নিবিড়ভাবে বদ্ধ! তাহার চোখ দুটি এত বড় যে তাহার শরীরের সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন উহাতে ঢাকা পড়িয়াছে! সেই চোখদুটি এমন আগ্রহ ভরে ক্রিস্তফ্-এর দিকে চাহিয়াছিল যে সে ইহাতে বিশেষ বেদনা বোধ করিতেছিল। এ চাহনি তাহার ভাল লাগিতেছিল না! কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তাহার ভাল লাগিয়াছিল তাহাকে, যাহার চোখের রং সাগরের মত, যাহার হাসি আলোর মত স্নিগ্ধ, তাহার ঠোঁট দুটি ঈষৎ বিভক্ত তাহারই ফাঁক দিয়া কুন্দ-দন্তের দু'একটি দেখা যাইতেছে তাহার মুখের হাসি কি মধুর! ক্রিস্তফ্-এর মনে হইল সে উহাকে ভালবাসে! তাহার হৃদয় দুলিয়া উঠিল! আর একবার—

আর একবার শুধু আমার মুখের দিকে চেয়ে অমনি করে হাস—এখনি যেও না...কিন্তু হায়! অন্য সকলের সহিত সেও সহসা চলিয়া গেল...কিন্তু ক্রিস্তফ-এর মন অপূর্ব্ব শান্তিতে ভরিয়া রহিল। অনিষ্টকর এবং দুঃখের চিন্তা আর তাহার মনে নাই। সে যেন সূর্য্য কিরণে গানের স্রোতে ভাসিতেছে যেমন করিয়া গ্রীষ্মকালের স্নিগ্ধ বায়ু-হিল্লোলে গাছের কচি পাতাগুলি দোল খায়!...

কিন্তু এ সমস্তের অর্থ কি? কেন এই সমস্ত কল্পনা এই বালকের মনে জাগিয়া তাহার বুক খানিকে ব্যথা বেদনায় পরিপূর্ণ করিয়া রাখে? ঐ মুখগুলি ঐ সমস্ত দৃশ্যাবলী সে ত পূর্ব্বে কোন দিন দেখে নাই! তবু যেন সে সমস্তই তাহার পরিচিত মনে হয়! কোথা হইতে তাহারা আসে? বিধাতার সৃষ্টির কোন্ অন্ধতম প্রদেশে তাহাদের বাস।? ও সমস্ত কি পৃথিবীতে একদিন যাহা ছিল তাহারই ছবি, না একদিন যাহা হইবে তাহারই আভাস?

ধীরে অতি ধীরে সমস্ত কাল্পনিক ছবি ক্রিস্তফ-এর মন হইতে মিলাইয়া গিয়াছে, আবার তাহার মনে হইল সে যেন অসীম শূন্যতার মধ্য দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে, চারিপাশে তাহার কুয়াশার আবরণ! নীচে অতি ধীরে নদীটি মাঠের ধার দিয়া বহিয়া চলিয়াছে, তাহার স্রোত এত শান্ত এবং উচ্ছ্বাসহীন যে, মনে হয় যেন নদীটি স্থির হইয়া পড়িয়া আছে! দূরে বহু দূরে দিক-চক্রবাল-রেখার কাছে সাগরের উন্মত্ত তরঙ্গগুলি দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে! নদীটি তাহার সহিত গিয়া মিলিত হইল! সাগর উন্মত্ত আবেগে ছুটিয়া আসিয়া নদীকে বুকে তুলিয়া লইতে চায়... সাগর যেন নদীকে চায়, সে তাহার কামনার ধন... নদীর হাতে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি নাই!...

সঙ্গীত জাগিল! সে কি অপূর্ব্ব নৃত্যের সৃষ্টি! তালে তালে ছন্দে ছন্দে তাহার সে কি উন্মাদনা! বিশ্ব-জগৎ যেন সেই ছন্দে আত্মহারা হইয়া দুলিয়া উঠিতেছে! প্রাণ যেন মুক্ত বিহঙ্গের মত আকাশে আলো-বাতাসের স্পর্শ সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া আনন্দে মাতাল হইয়া চীৎকার করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে।... কি আনন্দ কি শান্তি! আর কিছু নাই শুধু অফুরন্ত সুখ!

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সিঁড়ির ঘরটি অন্ধকারে ভরিয়া উঠিয়াছে, নদীর বুকে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটাগুলি পড়িয়া বুদ্বুদের সৃষ্টি করিতেছে, নদীর স্রোত সেইগুলিকে লইয়া নাচিয়া নাচিয়া বহিয়া চলিয়াছে, কখন কখন একটি ছুটি

গাছের শাখা কিম্বা গাছের পচা ছাল ও ভাসিয়া যাইতে দেখা যায়, উপরের আলো আসিবার পথে যে মাকড়সাটি শীকারের আশায় বসিয়া ছিল সে তাহার অন্ধকার কোণে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে, বালক ক্রিস্তফ্ কিন্তু তখনও জানালার উপর ঝুঁকিয়া নদীর দিকে চাহিয়া আছে, তাহার মুখ ঈষৎ রক্ত-শূন্য এবং ধূলা-মলিন কিন্তু অপূর্ব্ব এক শান্তি যেন সেখানে বিরাজ করিতেছে, ধীরে ধীরে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্রমশঃ—



মুর্শীদ্যা গান

শ্রীজসীমউদ্দিন

(মুনার গান)

মনকে পাপের পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া ভগবানের মুখী দাঁড় করান এই সব গানের উদ্দেশ্য। ইহা ব্রহ্মসমাজের প্রার্থনার উদ্বোধনের মত। মনের সমস্ত জঞ্জাল, সমস্ত দুর্দ্দশার কথা এই সব গানে আমরা পাই। প্রত্যেক বৈঠকে প্রথমে বন্দনা-গান গাওয়ার পর এই মুনার গান গাওয়া হয়। যখন গানে ভাব জমিয়া উঠে তখন 'উদাসীন' বা 'চালানের' গান গাওয়া হয়।

(ক)

গুণের ভাই মোনাইরে
তুমি জঞ্জালে নারে দিও মন।
জঞ্জাল বেষম জঞ্জাল জঞ্জালে বড়রে জ্বালা
জঞ্জালে না দিয়া মন সোণার শরীল করলাম কালারে
জান মোনাইরে
ফিরাও এ পাগেলার মনরে, পাপের পথ রে হইতে
যেমন রাখালে ফিরাইছে ধেণু পরের শস্য খাইতে রে
জান মোনাইরে

গায়ক—রহিম মল্লিক, বয়স-৪০
গোবিন্দপুর, ফরিদপুর

(খ)

চল যাইরে—আমার দরদীর তালাসেরে
মন চল যাইরে।
ইস্ত্রী হৈল পায়ের বেড়ী পুত্র হৈল কাল
এড়াইতে না পারলাম রে দয়াল এই ভব জঞ্জালরে
মন চল যাইরে।

হাল বাও হালুয়া বাইরে হস্তে সোণার নড়ী
এই পথখ্যানি যাইতে দেখাছাও আমার সানাল চান সন্ন্যাসীরে
মন চল যাইরে।
দেইখ্যাছি দেইখ্যাছি আমরা সানাল চান সন্ন্যাসী
ও তার গলায় মালা, কান্ধে ঝোলা করে মোহন বাঁশীরে
চল চল যাইরে
জাল বাও জালুয়া বাইরে হস্তে সোণার ডুরী
এই পথখ্যানি যাইতে দেখছাও আমার সোণার চান বেপারীরে
মন চল যাইরে।
দেইখ্যাছি দেইখ্যাছি আমরা সানাল চান বেপারী
ও তার হাতে আশা, বেগলে কোরাণ মুখে মধুর হাসিরে
মন চল যাইরে।

ডুরী—খেপলা-জালের হাতে ধরিবার রসী। স্ত্রীপুত্র পরিজনের মায়ায় মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, এই সব ছাড়িয়া দরদীর তালাসে ফিরিরে যাইতে হইবে। পথে যাকে পায় তারই কাছে তার হৃদয়ের দেবতার কথা জিজ্ঞাসা করে। এখানে তাই 'গলায় মালা কান্ধে ঝোলা করে মোহন বাঁশী'র কথা শুনিয়া গৌরাঙ্গ দেবের কথাই মনে পড়ে। নদীয়া জেলায় গৌর-বিচ্ছেদের কোন গানে আমরা এইরূপ পদ পাইয়াছি?

(গ)

হা'রে দয়াল যাবারে ছাড়িয়া
আর হবে না মানব জনম ও ডাক আল্লা রছুল বইল্যা রে।
ও ভাই মোনাইরে।
ও ভাই মোনারে
(১) এই বড় বাড়ীর বড় ঘররে মোনা ভাই বড় করছাওরে আশা
এই রজনী প্রভাতের কালে পক্ষী ছাড়বে বাসারে—
ও ভাই মোনারে

---

(১) বড় বাড়ী বড় ঘরে বসিয়া বড় আশা করিলে কি হইবে? রজনী প্রভাতের কালে পাখী যেমন বাসা ছাড়িয়া নীল আকাশের কোলে উধাও হয়, তেমনি করিয়া মরণের আহ্বান আসিলে দেহ ছাড়িয়া মন পলাইয়া যাইবে

ও ভাই মোনারে

(১) বড় ঘর বাইন্দ্যাছাও অহেরে মনা ভাই, হা'রে, চেকন দিহা রে সলা
আমার আল্লাজীর বানাইন্যা ঘররে মনা ভাই, মাটীর বাঙ্গেলা রে।
ওভাই মোনারে।

ও ভাই মোনারে

(২) সমুদ্দুরে উঠে ঢেউ—ওরে মনা ভাই, হারে কূলে আইস্যা রে ঠেকে
আমার অন্তরে উইঠ্যাছে ঢেউ ওরে মনা ভাই কেবা তারে দেখে রে
ও ভাই মোনারে।

ও ভাই মোনারে

(৩) সাইল সন্বীর দুটী পাখীরে মনা ভাই গম্ভীর নীচেরে চলে
স্যাও গম্ভীর শুকায়্যা গেল রে মনা ভাই অমনি উড়াল ছাড়ে
ও ভাই মোনারে।

ও ভাই মোনাইরে

(৪) তালাপেতে নাইক্যা জলরে হাতে পাড় ক্যান রে ডুবে
বাসায় ও ত নাইক্যা ছাও ওরে মনা ভাই, ফইড় কেন ওড়েরে
রে ভাই মোনাইরে।

---

(১) মন যত বড় করিয়া—যত চেকন 'সলা' দিয়াই তার বড় ঘরখানি তৈরী করুক না কেন, আল্লাজীর বানাইন্যা এই যে মাটীর বাঙ্গেলা মানব-দেহ ইহা মাটীতে মিশিতে বড় দেরি হইবে না।

(৩) সাইল সন্বীর—পাখী দুটীর পরিচয় না জানিলেও এই পদটীর অর্থ বেশ বুঝা যায়। 'গম্ভীর' শুকায়ে গেলে সাইলসম্ভীর যেমন উড়িয়া যায়, রজনী প্রভাতের কালে পাখীও তেমনই বাসা ছাড়িয়া যাইবে। অর্থাৎ সময় হইলেই মন মানবদেহ ছাড়িয়া পালাইবে।

(৪) তালাপে—পুকুরে, ফইড়—পালক। জীবনের এই নশ্বরত্ব দেখিয়া কবির অন্তর আজ খুলিয়া গিয়াছে আজ তালাপে জল নাই তবু পাড় ডুবিয়া যায়। বাসায় বাচ্চা নাই তবু তারা আকাশে ওড়ে। এখানে রবীন্দ্রনাথের "অকারণে কেন ঝরে আঁখি জল" কবিতাটি মনে পড়ে।

সন্ধ্যারাগ

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত

বেশ বুঝ্‌তে পারছি শরৎ এসে পড়েছে। কিন্তু কি আস্তে আস্তেই যে এল! তার পদধ্বনি শুনতে পাই নি। আজ ভোরে হঠাৎ আকাশের নীল নিষ্কলঙ্ক নির্মেঘ প্রশান্তি দেখে মন ভারি মুগ্ধ হয়ে গেল। আকাশকে অত্যন্ত উজ্জ্বল ও উদার মনে হচ্ছে। এখনো চিমনির-ধোঁয়ার কলঙ্কের ছোঁয়াচ পড়ে নি। দূরে শেফালিগুচ্ছের মত একখণ্ড শাদা মেঘ প্রভাতের নির্ম্মল রৌদ্রে স্নান করছে, যেন শাদা পালক-ওয়ালা একটা বক তার দুটি পাখা বিস্তার ক'রে শুয়ে আছে। ঐ মেঘটা যেন মা'র রাশীকৃত সুকোমল পবিত্র ভালোবাসার মতো!

কিন্তু আমার জীবনে এই শরতের নির্মুক্ততা ও জ্যোতিষ্ময়তার স্থান নেই। সেখানে পুঞ্জ পুঞ্জ বেদনার মতো কালো নিবিড় মন্থর মেঘস্তূপ। মমতার দুটি স্তব্ধ বিশাল চোখে দূর-কালের মেঘাক্রান্ত আষাঢ় যেন মূর্চ্ছিত হয়ে আছে?

ভাবছি, জীবনে মোটে পঁচিশটি শরৎ এসেছিল, এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে। কত ক্ষণখণ্ড ধূলায় লাঞ্ছিত হয়ে মিশে গেছে, গলায় মালা করে' পরি নি। আজ তার জন্যে এত অনুতাপ হচ্ছে! এই পঁচিশ বছরের জীবনে শতদলের পাপড়ির মতো একটির পর একটি করে' কত দিন এসেছিল—কোনটি সূর্য্যোদয়ে পলাশের মতো রাঙা, গোধূলিতে বিরহ বেদনার মতো মধুর, কোনটি ঘনঘোর মেঘে প্রিয়ার ব্যথিত দৃষ্টির মতো শীতল, নক্ষত্রদীপ্ত রহস্যগভীর অন্ধকারে দুঃখের মতো প্রশান্ত, কোনটি বা পূর্ণিমার প্রচুর জ্যোৎস্নায় যূথিকার মতো প্রফুল্ল, কোনটি মধ্যাহ্নের দগ্ধ নির্ম্মম রৌদ্রে বৈরাগ্যসুন্দর সন্ন্যাসীর মতো উদাসীন! কত দিন হারিয়ে গেছে! দিগ্বধূর ছিন্ন কণ্ঠহার থেকে অপরূপ প্রভাত ও সন্ধ্যাগুলি আমার জীবনে খসে' খসে' পড়েছে, একটিও কুড়িয়ে রাখিনি, রাখিনি!

মনে পড়্‌ল, এক্‌জামিনের পড়া 'বার্ক' পড়্‌তে পড়্‌তে হঠাৎ আনমনা হয়ে পেছন চেয়ে দেখেছিলুম চাঁদের আলো একটি গরীব ঘরের ম্লান-বস্ত্রা মেয়ের মতো আমার ঘরের মেঝের লুটিয়ে পড়েছে। মনটা ভারি ভিজে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি বার্কটা ছুঁড়ে ফেলে বাতিটা নিবিয়ে দিয়েছিলুম। কে বলে সে গরীব ঘরের

মেয়ে ? জ্যোৎস্না পূর্ণ-যৌবনা ললিততনু সাকীর মতো শুভ্র ফেনোদ্বেল আনন্দের মদিরাপাত্র নিয়ে বিহ্বল আবেগে আমাকে বেষ্টন ক'রে ধরেছিল। সেই রাত্রে খোলা বারান্দায় অনেকক্ষণ নিঝুম হয়ে বেতের ভাঙা সোফাটায় শুয়েছিলুম। আর পড়া করিনি। নিজেকে এত সুন্দর এত মিষ্টি লাগ্‌ছিল! সমস্ত আকাশের সঙ্গে একটি বন্ধুত্ব বোধ করছিলুম যেন! ভাগ্যিস্ সে দিন 'বার্ক' ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলুম। নইলে সেই দ্বারান্তবর্ত্তিনী ম্লান-মুখী জ্যোৎস্নার আনন্দ প্রাচুর্য্যে স্নান করে' নিজেকে এত সার্থক ও সুন্দর বলে ভাবতে পারতুম না।

মনে পড়্‌ল পুরীর পুলিনে সমুদ্রের বিস্তীর্ণ প্রশান্ত জলরাশির ওপর একদিন সূর্য্যাস্ত দেখেছিলুম। ভাগ্যিস্ দেখেছিলুম! তাই ত সেই অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক মহত্ত্ব-ভরা উদার সূর্য্যাস্ত সময়ে নিজের মধ্যে একটি বিশালতা ও বন্ধনহীনতা অনুভব করতে পেরেছিলুম। ভাগ্যিস্ একদিন সারান্‌পুরের নিষ্পাদপ তৃণহীন শুষ্ক কঠিন গৈরিক ভূমিতে শ্রান্ত হয়ে শুয়ে নিজেকে একান্ত রিক্ত ও দরিদ্র বলে' ভেবেছিলুম, সেই সুমধুর ব্যথিত মুহূর্ত্তটিকে ব্যর্থ হতে দিইনি! মনে পড়্‌ল, এক বিয়ে বাড়ীর নিমন্ত্রণে গিয়ে একটি চঞ্চলা সদা হাস্যময়ী কিশোরীর সঙ্গে ভাব ক'রে রাত্রে তারার পানে চেয়ে চেয়ে তার নাম রেখেছিলুম সন্ধ্যাতারা; মনে পড়ছে, এক বছর বাদে কার বিয়ে হয়ে গেলে অকারণে চোখে জল ভ'রে এসেছিল, কত রাত পর্য্যন্ত ঘুমুতে পারিনি। সে রাতগুলি ব্যর্থতাবোধের কি অপার সুখেই যে কেটেছে!

ক'টি দিনই বা মনে করতে পারি; কত দিন বঞ্চিত উপেক্ষিত হ'য়ে অভিমান ক'রে চলে গেল। আকাশে নিদ্রাহারা কত তারা কত জ্যোৎস্না আমাকে ডেকেছিল, আমি দরজা ও বাতায়ন বন্ধ ক'রে লজিকের সিলজিজম্ মুখস্ত করেছি, পরে আপিসের হিসাবের অঙ্ক মিলিয়েছি। দ্বারের পাশ দিয়ে কত মুশাফের-ঝড় হেঁকে গেল, আমি নিশ্চিন্ত আলস্যে মগ্ন হয়ে দাবা খেলেছি বা পান চিবিয়েছি। কত রাত্রি শুভ্র-ব্রতা তপস্বিনীর মতো বৈরাগ্য ও বিরতির অর্ঘ্য বহন ক'রে আমার দুয়ারে নেমে এল, আমি বারোটা পর্য্যন্ত রাত জেগে জেগে গয়লানী আর মুদীর দোকানের হিসাব কস্‌লুম, আর বেশি খরচ হচ্ছে ব'লে মমতার সঙ্গে অযথা ঝগড়া করলুম। এই ত পঁচিশ বছরের কেরাণী জীবন।

তাই বুঝি অসময়ে যাবার লগ্ন এসে পৌঁছুল বলেই আজকের শরৎকে তৃষ্ণার্ত্ত চকোরের মতো আকণ্ঠ পান করতে চাই। নইলে আজো হয় ত হিসাব মিলাতুম! ঝগড়া করতুম! পৃথিবীকে আজ কী সুন্দর মনে হচ্ছে। সকাল হতেই রাস্তার

ও-পারে চায়ের দোকানে ভীড় লেগে গেছে। কত লোক যে জড় হচ্ছে। কত রকম আনন্দগুঞ্জন যে করছে তারা। সমস্ত সাধারণ তুচ্ছ ব্যাপারটি আমার কাছে এত বিচিত্র মনে হচ্ছে যে কি বল্‌ব! ভোর না হতেই রাস্তায় জল দিয়ে গেছে। কালো পিচে মোড়া ভিজা রাস্তার ওপর দিয়ে মোটরগুলি ছুটেছে—কি সুন্দর গর্ব্বিত ওর ছোটা! টেলিফোনের তারে বসে দুটি চড়ুই পাখী খানিক পরেই ফর্‌ফর্‌ করে' উড়ে চলে' গেল—কি মধুর ওদের পাখার শব্দ,—কি করুণ!

যান, এ কথা একান্ত সত্য হলেও—আজকের নির্ম্মল বিমুগ্ধ দিনটি প্রাণ দিয়েই উপভোগ ক'রে যাব। নোট্‌-বুকটায় লিখে রাখছি—আজ এগারোই ভাদ্র, মঙ্গলবার, আটটা বেজে তেরো মিনিট হয়েছে। সকাল থেকে বারান্দায় এই কাঠের ইজি-চেয়ারটায় শুয়ে শুয়ে শরতের জ্যোতির্ম্ময় নীল আকাশ দেখ্‌ছি। ভারি ভালো লাগছে। এক ফালি রৌদ্র আমার কোলের ওপর এসে পড়েছে। শরতের রৌদ্র-বিধৌত আকাশকে মনে হচ্ছে যেন কোন্‌ সদ্য-স্নাতা তন্বুগাত্রী কিশোরীর চঞ্চল হাসা যেন আমার কোন্‌ একটি কল্যাণী বোন খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হেসে উঠেছে; এই রৌদ্র যেন তারই হাসির টুক্‌রো। আবার মনে হচ্ছে এই প্রসারিত প্রশান্ত আকাশ যেন মৌন সহানুভূতিতে আচ্ছন্ন, যেন কোন্‌ মা আপন ব্যথিত পুত্রের পানে বিশাল বিষণ্ণ নয়নে চেয়ে আছে! আবার ভাবছি, আজকের আকাশ যেন নাম-না-জানা প্রিয়ার রহস্যভরা দুই নির্ণিমেষ নীল চোখ্‌! আমাকে ইসারায় ডাক্‌ছে। এই এগারোই ভাদ্রের আকাশখানিকে জগতের কোন্‌ কবি এমন আনন্দময় চোখে অভিবাদন করল জানি না, আমি ত আমার নোটবুকে লিখে রাখি!

ভাব্‌ছি এবং ভাব্‌তে ভারি কষ্ট হচ্ছে, যে পৃথিবীকে এত ভালবাসি, আমি চলে গেলে সে-পৃথিবীর এতটুকুও লাগ্‌বে না। কাল ঐ যে ও পাড়ার বাড়ি থেকে জোয়ান্‌ মরা-ছেলেটাকে ধরাধরি ক'রে শ্মশানে নিয়ে গেল, তাতে শুধু তার বুড়ো বাপ-মার ক্ষণিক চীৎকার ছাড়া আর ত কোথাও একটু দীর্ঘশ্বাস উঠ্‌ল না। সব আবার যে কে সে-ই। নিঝুম! উদাসীন! নির্ব্বিকার। আজো ত অপরূপ ক'রে সূর্য্যোদয় হ'ল। তৈমু কতদিন ভোর বেলা কুস্তি ক'রে গায়ে মাটি মেখে এই পথ দিয়ে বাঁশের আড়-বাঁশী বাজিয়ে গেছে, সে ত আজ এই সুন্দর সূর্য্যোদয়টি দেখ্‌তে পেল না। তাতে এত বড় পৃথিবীর কি যায় আসে? আমি যখন যাব, তার পরেও ত কত দিন কত রাত্রি আস্‌বে,

আমার জন্যে ত' একটি তৃণাঙ্কুরেও ঈষৎ রোমাঞ্চ উঠবে না। সে রাত্রে বিরহী কাঁদুক, কবি কবিতা লিখুক বীণা বাজাক, শিল্পী প্রতিমা গড়ুক, ব্যবসাদার হিসাব মিলাক, কেরাণী তার দুঃখিনী স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করুক, সেইখানে আমার স্থান কোথায়? কোথাও না। ভাবছি আজ পর্য্যন্ত এই নীল আকাশের তলে কোটি কোটি মানুষ হারিয়ে বিস্মৃত হয়ে একেবারে অপসৃত হয়ে গেল। তাদের এতটুকু চিহ্নও কোথায় পড়ে রইল না। যে দিকে চাই সেখানেই মৃত্যুকে অবজ্ঞা ক'রে প্রাণের মিছিল ছুটেছে! কঠিন শ্মশানের ভস্মরাশির পাশে দামাল তৃণশিশু-দলের দুরন্ত চঞ্চলতা। নোট-বইটায় আবার লিখছি—বাঁচতে চাই, বাঁচবার স্পৃহাটুকুই আমার মরবার পর অক্ষয় স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাক্!

মমতা চায়ের পেয়ালা ক'রে দুধ নিয়ে আস্ছে দেখছি। ও যেন শীতের বিশীর্ণ একটি কালো পাতা। ওকে আজ যে কেউই দেখবে, যেন বলে দিতে পারবে—ওর নাম মমতা, ময়লা একখানা কাপড় পরণে, এখানে সেখানে সেলাই করা, রান্নার কালি আর মশলা লেগে রয়েছে, তা দিয়ে আপনার পীড়িত উপেক্ষিত যৌবনকে আবৃত করেছে। রুক্ষ জটিল চুলগুলি মাতৃহারা শিশুর মতন অযত্ন-পালিত, দেখ্লেই একটু আদর ক'রে গুছিয়ে দিতে ইচ্ছা হয়। হাতে গলায় কানে একটিও সোণার আভরণ নেই, শুধু এয়োস্ত্রীর পরম গৌরবময় একটি মাত্র চিহ্ন বাঁ-হাতে আছে—একটি সরু লোহার চুড়ী! আর সব গয়না বিক্রী হ'য়ে গেছে। দুটি চোখে কি সজল স্নেহ-মাখা! অথচ এই মমতাকে কত দিন অকারণে তীব্র তিরস্কার করেছি। কত রাতে ওকে একা বিছানায় ফেলে অস্থির হ'য়ে ছাতে টহল মেরেছি। ও সমস্ত রাত ঘুমায়নি, বালিশে বুকটা চেপে ধ'রে খালি কেঁদেছে। কী করুণ তাপসীর মূর্ত্তি ওর আজ! আজ ওকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবাস্তে ইচ্ছা করছে। কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে গেল!

মমতা ধীরে ধীরে এগিয়ে আস্তে আস্তে আমার পানে চেয়ে একটু ফিকা হাসল। এই ত' তুমি ঘুম থেকে একলা বারান্দায় উঠে এসেছ। তুমি ত' রোজ ভালো হচ্ছ। শুধু শুধু খালি ভুল ভাব যত সব···

গরম দুধের পেয়ালাটা চেয়ারের হাতলের ওপর রেখে, মমতা হাঁটু গেড়ে পাশে বসল। বলল—আজ কত জ্বর পেলে?

তার দু'টি স্নেহার্দ্র উৎসুক চোখের পানে চেয়ে ধীরে বল্লুম—নর্ম্মেল।

নর্ম্মেল? সে উৎফুল্ল হয়ে দুটি চোখ সুখে ডাগর ক'রে মধুর কণ্ঠে 'সত্যি'...ব'লে আস্তে আস্তে আমার বুকের ওপর নিজের শ্রান্ত মাথাটি রেখে

ছলছল চোখে চেয়ে আনন্দে বল্লে—আর কি, এবার থেকে আর জ্বর হবে না, আর ভাবনা নেই, তোমাকে আমার কাছ থেকে কে ছিনিয়ে নেবে?

ওর চুলগুলিতে ধীরে আঙুল বুলোতে লাগলুম। ও যদি আমার জামার তলা দিয়ে বুকে হাত দেয় তাহ'লে ওর হাত পুড়ে যাবে। জ্বর একশো এক ডিগ্রিই ছিল। কিন্তু থার্ম্মোমিটারটার ওপর ভারি রাগ হয়ে গিয়েছিল আজ সকাল বেলা। রেগে এক ঝাঁকুনি দিতেই এক নিমেষে জ্বর নর্ম্মেলে নেমে গেল। মমতার রাত্রির মতো ব্যথিত নিস্তব্ধ ব্যাকুল দুটি চোখের পানে চেয়ে রূঢ় সত্য কথাটা মুখ দিয়ে বেরুল না। কাশ্‌তে কাশ্‌তে যে রক্তটা আজ উঠেছিল, সেই রুমালটাও সরিয়ে রাখ্‌লুম।

কিন্তু মমতাকে আজ ভারি মিষ্টি লাগ্‌ছিল। সমস্ত দুঃখের মধ্যে আজ যেন অপরিসীম একটি তৃপ্তি পাচ্ছি। ওকে বুকে জড়িয়ে আর কোন দিন যেন বুকটাকে এত ভরা মনে হয় নি। ভাব্‌তে ভারি কষ্ট হচ্ছে, এই মমতাকে একদিন কঠিন কটু-কণ্ঠে বলেছিলুম—ভালোবাসিনা। সে দুই হাতে খুকীর মতো মুখ ঢেকে কেঁদেছিল।

ওর আনত-মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বল্লুম—ভারি লোভ হচ্ছে মমতা!

ও শুষ্ক মলিন মুখখানি খুসীতে উদ্ভাসিত ক'রে আমার পানে চেয়ে আমার বুকের ওপর মুখখানি রেখে গালটি এলিয়ে দিয়ে বল্লে—দাও।

ঠোঁট দুটো এগিয়ে নিলুম। না, থাক্।

ও আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে বল্লে—কেন, গালে দিলে আমার কিছু হবে না, তুমি দাও।

দিলুম।

ওর শুক্‌নো রঙ হারা ঠোঁট দুটি, দুটি আঙুলে স্পর্শ করছি। দূরে নিমগাছের একটা কচি সদ্যোজাত শাখা তার অগুন্তি কিশলয় মেলে দিয়ে সূর্য্য কিরণে কাঁপ্‌ছিল। আমার জীর্ণ বুকের তলায় যে অক্ষয় প্রাণ আছে তা যেন ওই নিমের পাতার মতোই নূতন, কচি!

ডাক্‌লুম—মমতা!

মুখ না তুলেই বল্লে—কি?

—আমাকে তাহলে তুমি রেখে দেবে?

মাথা তুলে বল্লে—নিশ্চয়ই। কিন্তু দুধটা এক্ষুনি খেয়ে ফেল। জুড়িয়ে

গেল হয় ত ব'লে পেয়ালাটা মুখের সাম্‌নে তুলে ধ'রে ফের বল্লে—হাঁ কর, খাইয়ে দিই আস্তে আস্তে।

মাথাটা সরিয়ে নিয়ে বল্লুম—কোথায় দুধটা জোগাড় হল? পয়সা কোত্থেকে জোটালে?

—সে যেখান থেকেই হোক্ না, তুমি খাও।

—কিন্তু কাল রাত্রে তুমি কিচ্ছু খাও নি, পাশের বাড়ী থেকে বার্লি চেয়ে এনে খোকাকে খাইয়েছ, আমি সব জানি। এ দুধ তুমি নিয়ে যাও মমতা, খোকাকে দাও, তুমি খাও।

মা যেমন রোগা ছেলের পাগ্‌লামি শুনে হাসে, ও তেম্‌নি হাস্‌ল। বল্লে—খোকার জন্যে দুধ আছে। জুড়িয়ে গেল, খাও লক্ষ্মীটি!

বল্লুম—পয়সা কোথায় পেলে?

মুখ নীচু ক'রে রইল।

—খোকার ধুক্‌ধুকিতে শেষ কালে হাত দিলে? মা'র শেষ স্মৃতিচিহ্নটির সম্মান তা হ'লে আর রইল না মমতা? অন্য দিন হ'লে তাকে কটু স্বরে কত তিরস্কারই না করতে পারতুম। আজ কথাগুলি কান্নায় ভিজে গেল। ওকে বক্‌তে ভুলে গেছি।

মমতা বল্লে—বিক্রী ক'রিনি, বাঁধা দিয়ে কুড়িটা টাকা জোগাড় করেছি। আর ত কিছুর ভয় করি না এখন। কত ধুক্‌ধুকি আবার আস্‌বে। আমি কিন্তু তোমার প্রথম মাসের মাইনে পেলেই একটা গরদ কিনে প'রে তোমাকে প্রণাম করব। কিন্তু আর না, একেবারে জল হয়ে যাচ্ছে দুধটা, খেয়ে ফেল।

দুধটা ধীরে ধীরে খেয়ে ফেল্‌লুম।

বল্লুম—কুড়ি টাকা! কি কি খরচ করবে?

—তোমার নতুন অষুধটা, একটা তোমার জন্য র‍্যাপার, দুটো কাঁচের গ্লাস, আর খোকার গায়ে একটাও আস্ত জামা নেই—একটা জামা।

—আর? খাবার কিছু না?

—ও চয়ে যায়। খাওয়ার জন্যে কে ভাবে?

বল্লুম—তার থেকে, আজই টাকাটা দিয়ে তোমার জন্য একখানা গরদ কে'ন মমতা।

—কিচ্ছু দরকার নেই। আমার এই ময়লা ছেঁড়া কাপড়টাই গরদ, ব'লে নীচু হয়ে আমাকে প্রণাম ক'রে সহসা উৎফুল্ল হয়ে বল্লে—দেখ দেখ কেমন সুন্দর

নতুন ধরণের তেপায়া সাইকেল্। তুমি এম্‌নি থাক, কেমন? গায়ে রোদ লাগুক। আমি খোকাকে দুধ খাইয়ে আসি।

চলে গেল।

চোখে জল এসে পড়েছে। চলে যাব বলে নয়, মমতাকে আবিষ্কার করতে এত দেরী হয়ে গেল বলে। চোখের জলের আর এক নাম যে ভালোবাসা, তা আজ ঐ প্রসন্ন প্রসারিত আকাশ দেখে বুঝতে পারছি। মমতার এই অপরিচ্ছন্ন ছিন্ন বসনে অসংযত রুক্ষ কেশে শ্রীহীন রুগ্ন দেহে, আর এই পরিপূর্ণ সেবায় আমি একটি অপার মাধুর্য্য একটি অতল গভীরতা পাচ্ছি। ও এতদিন কোথায় ছিল? এই চোখের জলে ওর নব অভিষেক হচ্ছে।

গেল বছর অসুখটা বেড়ে গেলে পর ডাক্তাররা স্থান পরিবর্ত্তন করতে বল্‌লে। এর আগে ছ মাস বাড়ী বসে অষুধ গিলে গিলে জমানো পুঁজি যা কিছু ছিল চুকে বুকে গেল। ছত্রিশ টাকার চাক্‌রীটিও খোয়ালুম। ডাক্তাররা চলে গেলে মমতাকে বল্লুম— ওরা ভেবেছে তোমার কোল ছেড়ে ওয়ান্টেয়ারটাই আমার পক্ষে মৃত্যুর সব চেয়ে সুখকর স্থান হবে। ভুল। যতদিন আছি—

সেই দিন নিজেকে এত একলা অসহায় ও মমতাকে এত করুণাময়ী মনে হয়েছিল যে ও রকম কবিত্ব করতে পেরেছিলুম। চেয়ে দেখি, মমতা তার গা থেকে সমস্ত গয়না খুলে ফেলেছে। বল্লুম—না যেতেই বৈরাগিনী? ও বাঁ হাতের লোহার চুড়ীগাছি দেখিয়ে বলেছিল এই আমার অক্ষয় কবচ...

প্রায় সাত শ' টাকা হল। বিন্ধ্যাচল চলে গেলুম। ছ মাসে বেশ তাজা হয়ে এলুম, জ্বর নেমে গেল। ওজন বাড়্‌ল কিন্তু...

পোকারাও দেশ ভ্রমণে গিয়েছিল দল বেঁধে, আবার কল্‌কাতায় ফিরে এসেছে।

কতদিন মমতা নিজের জন্য ভাত রাঁধেনি। জোটেনি বলেই রাঁধেনি। জুটলেও ভেবেছে, এ দিয়ে আমার জন্য দুটো বেদানা হতে পারে, নিজের গ্রাসাচ্ছাদনটা ত তার তুলনায় অতি তুচ্ছ। না খেয়ে দেয়ে রাত জেগে আমার বুকে কোমল করপল্লবখানি বুলিয়ে দিয়েছে। নিজের যা দু'একখানি বিয়ের দামী সাড়ী ছিল, লুকিয়ে লুকিয়ে গরীব ঝি গয়লানী ভুজাওয়ালীদের কাছে বিক্রী করে পয়সা পেয়েছে। আমার বই খাতাগুলিও বোতলওয়ালার কাছে বিক্রী হয়ে গেল। আর কিছু রইল না। শেষকালে খোকার ধুকধুকিটি ও!

মমতা আবার কাছে এল। হাত পেতে বল্লে—থার্ম্মোমিটারটা দাও না।

বল্লুম—কেন?

—ও বাড়ীর পিসীমাকে দেখিয়ে আসি। দেখলে বেজায় খুশী হবেন।

দিলুম। ও একবার ঘাড় ফিরিয়ে হেসে চুলগুলি একটু দুলিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

আমার জ্বর কমেছে—ও যেন একটা অমূল্য সম্পদ। থার্ম্মোমিটারটা এমন সস্নেহে তুলে নিল যেন ও ওর খোকা।

কিন্তু আমারই বা কি যোগ্যতা ছিল? আপন অধিকারের গর্ব্বে তা'ত একদিনও চোখ চেয়েও দেখিনি। দেয়ালে ওর বছর চার আগেকার ফটোটি টাঙানো আছে। দেখা যাচ্ছে। কি নিটোল স্বাস্থ্য কি ললিত তনিমা! এই বুঝি তার ভস্মাবশেষ! আপন স্ত্রীকে একখানি বস্ত্র কিনে দিতে পারি না, শুধু তাকে খাটিয়ে নিজের সুবিধার চেষ্টা দেখি। এত বড় কাপুরুষ! ও আমার জন্য নিজেকে তিল তিল ক'রে দগ্ধ করছে। অথচ মুখে কি অনাবিল প্রসন্ন হাসি, কথায় কি অম্লান সহানুভূতি। নিজের ওপর এত বিরক্ত হয়ে উঠি। কিন্তু মরলেও ত মমতার মুক্তি নেই। আমি ওকে মুক্তি দিতে চাই।

দানবী নগরীর বিকট অট্ট-হাসি সুরু হয়েছে। শরীরটা খারাপ লাগ্‌ছিল। উঠে পড়্‌লুম। আস্তে আস্তে হেঁটে বিছানার দিকে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ কোথা থেকে এসে মমতা আমাকে দু'হাত দিয়ে ধ'রে ফেলে বল্লে—আজকে জ্বরটা ক'মে গেল বলেই হাঁটতে সুরু ক'রে দিও না। চুপ ক'রে শুয়ে থাক।

আমাকে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিল নোংরা শতছিন্ন বিছানায়। চ'লে গেল।

ও আজ ভারি ব্যস্ত। যেন ওর আজ একটা প্রকাণ্ড শুভ-দিন!

খোকা নাচ্‌তে নাচ্‌তে এসে হাজির। ওকে ওর মা একটা ফর্সা ফ্রক প'রিয়ে দিয়েছে আজ। এই সমস্ত বর্ষাটা ত অনাবৃতগাত্রেই কাটিয়েছে। ওর মুখখানি আজ আর অযত্নে অপরিষ্কার নয়, সদ্যস্ফুট শেফালি। চুলগুলি গোছানো। থপি থপি পা ফেলে কাছে এসে অস্ফুট কণ্ঠে ডাক্‌লে—আবা! তার সদ্যস্ফুট দাঁত কটি জুঁয়ের পাপড়ির মতো ঝিলিক দিল।

হাত বাড়িয়ে ডাকলুম—খোকনটা!

বুকে তুলে নিতে ইচ্ছা হচ্ছিল। কিন্তু নিলুম না। মুখখানি ভার ক'রে থপি থপি পা ফেলে চলে গেল।

মমতা চুলগুলিতে আঙুল চালাতে চালাতে বল্লে—আজ মাথাটা ধুইয়ে দিই, কেমন? জ্বর ত' আর নেই।

বারণ করলুম না। কি হবে মাথা ধুয়ে দিলে? শুধু শুধু ওর স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে কি লাভ? মমতা মাথা ধুইয়ে দিল। ঘরে চিরুণী নেই। আঙুল দিয়ে চুলগু'ল আঁচড়ে সহসা অধর দিয়ে চুল স্পর্শ করে বল্লে—কেমন তোমায় দেখাচ্ছে আজ।

ভালো লাগল না।

মমতা স্নান করে যে শাড়ীখানি আজ পর্‌ল, তা ফর্সা দেখ্‌ছি। কাপড় সকাল বেলা কেচে শুকিয়ে পরেছে। আজ ময়লা সে পরবে না। কালো চুলের আড়ালে সিঁথিটি সিন্দুরে উজ্জ্বল। পান খেয়ে শুক্‌নো ঠোঁট দুটি দোপাটির মতো রাঙা! একদৃষ্টে তার ঠোঁটদুটির পানে চেয়ে রইলুম। জানি ভাত সে আজো রাঁধে নি। ও বাড়ীর ঝিকে দিয়ে বাজার থেকে কি আনা'ল দেখলুম। তবু পান খেয়ে ঠোঁট দুটি লাল কর্‌ল। অথচ...

পাশে বস্‌ল। শরীর খারাপ লাগ্‌ছিল। জ্বর বাড়্‌ছিল। বল্লুম—ঘুমুব। তুমিও ত' অনেক রাত ভালো ঘুমাও নি। আজ একটু শোও গে'।

আর বিছানা ছিল না। নগ্ন মেঝের ওপর সে খোকাকে পাশে রেখে শু'ল। তপ্ত মধ্যাহ্নের পানে একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম। চোখের পাতা জ্বলছিল। যদি পাশে এসে শু'ত! না তা হলেও ভাল লাগ্‌ত না।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বারান্দায় কেরোসিনের ডিবেটা ধোঁয়াচ্ছে। চেয়ে রয়েছিলুম। এই কুশ্রী কঠিন একঘেয়েমির মধ্যে একটি বৈচিত্র্য যেন পাঁকের মধ্যে স্থলপদ্মের মতো ফুটেছে। কেরোসিনের আগুনের কোলে দুটি পতঙ্গ। আজকের দিনটা রুটিনে বাঁধা নয়। আমার তেতো মিক্‌শ্চারটা আর মমতা দিলে না, দুপুর বেলা দুধের পরিমাণ বেড়ে গেল। একদিন জ্বর কম্‌তেই মমতা প্রকাণ্ড ডাক্তার হ'য়ে পড়েছে! আজ সে সন্ধ্যায় চুল কেমন ক'রে জানি বাঁধল। তাতে আবার ফুল গোঁজা। দুয়ারে একটি মাটির বাতি জ্বালিয়ে সন্ধ্যা দিলে। ধূপ জ্বালালে। আজ সারা সন্ধ্যাটা সমস্ত ব্যস্ত কাজকর্ম্মের মধ্যে সে গুণ গুণ ক'রে গান গেয়েছে, খোকাকে নিয়ে ছড়া কেটেছে, খোকার চোখে কাজল এঁকেছে, নিজের চোখেও আঁক্‌তে চেয়েছিল, আমার পানে চেয়ে মুচ্‌কে একটু হেসে হাত নামিয়ে নিল। সর্ব্বাঙ্গ থেকে ওর খুসী উছ্‌লে পড়্‌ছে। ওর দেহখানি যেন নবমুঞ্জরিত মাধবী লতা। আজও সুন্দর করে নাচের ছাঁদে হাঁটছে, সন্ধ্যাতারার মতো স্নিগ্ধ চোখে চাইছে, কথার মধ্যে একটি সলজ্জ অস্ফুট-পক্ষ পাখীর মধুর কণ্ঠের মৃদুতা! কিন্তু বৃথা...

মমতা হাস্‌তে হাস্‌তে একখানা র‍্যাপার নিয়ে এল। খুসীতে সব কথাগুলি ভিজিয়ে বল্লে—এটা কিনলাম। বেশ সুন্দর, না?

কিন্তু আর বেশী না। বল্লুম—র‍্যাপারটা গায়ে জড়িয়ে দাও না, মমতা। ভারি শীত কর্‌ছে।

র‍্যাপারটা গায়ে জড়াতে জড়াতে মমতা বল্লে—শীত। কেন?

—জ্বরটা ফের বাড়ল মমতা।

উনুনে আগুন দেওয়া হয়েছিল। ধোঁয়া দেখে বুঝতে পারছিলুম। হয়ত তার জন্যে এবেলা ভাত রাঁধ্‌ত। রাঁধা তা হলে হ'ল না।

—বাড়্‌ল? র‍্যাপারটা জড়ানো হল না! অন্ধকার হলেও বুঝতে পার্‌লুম তার মুখ পাংশু হয়ে গেছে। তার গলার স্বর এত স্পষ্ট ছিল। জিগ্যেস কর্‌ল—কত?

জ্বর রাত্রেও একশো এক ডিগ্রিই ছিল। বল্লুম—তিন।

—তিন? যেন স্বচ্ছন্দবিহারিণী চলছন্দা হরিণীর বুকের যে স্থানটা সব চেয়ে কোমল সে স্থানটায় শাণিত ছুরী বসেছে—এম্‌নি আর্ত্তকণ্ঠ।...

রুক্ষ কণ্ঠে বল্লুম—বিকেলে আমার জন্যে যে পেঁপের মোহনভোগ তৈরী করবে বলেছিলে তা আমার আর রুচ্‌বে না। আমি এখন ঘুমাব।

গভীর রাত। বিনিদ্র চোখে সে গভীরতাকে কী নৈরাশ্যময় ও অতল মনে হয়! মমতা ছেঁড়া মশারিটা টাঙিয়ে দিতে আজও ভোলে নি, মশারির বাইরে চলে এলুম। ঠাণ্ডা লাগ্‌বে জানি, তবু বারান্দায় ইজি-চেয়ারটায় বস্‌তে ঝির্‌ ঝির্‌ হাওয়া, প্রেমের প্রথম অনুভবটির মতো একান্ত আদরে সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়ে দিল। এ যেন কোন্‌ দূর-দেশী প্রিয়ার গোপন শঙ্কিত প্রথম চুম্বনটি! চাঁদের আলো মেঘ্‌লা আকাশে থিতিয়ে রয়েছে। চরাচর-ব্যাপী অনন্ত নিঃশব্দতায় বিধবা রাত্রি যেন কাঁদ্‌ছে।

পা টিপে টিপে উঠে গিয়ে দেখি, মমতা কঠিন মেঝের ওপর তার নগ্ন শীর্ণ বুকটা চেপে ধ'রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌ছে। পাশে মেঝের ওপরই খসা তারার মতো খোকা শুয়ে ঘুমন্ত, চাঁপার আধেক-বোজা কুঁড়িটির মতো। এক ফালি জ্যোৎস্না মমতার গায়ের ওপর মা'র সুস্নিগ্ধ সান্ত্বনা-র মতো লুকিয়ে পড়েছে!

আবার কাঠের ইজি-চেয়ারটায় এসে বসেছি। একটা কাক প্রভাত হয়েছে ভুল ক'রে ভারি করুণ কণ্ঠে ডাকছে। একটা মোটর চ'লে গেল। দূর থেকে একটা চলন্ত ট্রেনের বাঁশী শুন্‌ছি। নোট-বইটায় লিখে রাখ্‌তে ইচ্ছে

করছে, মশারির তলায় মরতে চাই না। এই বিস্তীর্ণ আকাশের তলে না-পাওয়া প্রিয়ার মতো মরণকে বুকে তুলে নেব। কোন ক্ষোভ নেই। এই জীবনে হয়ত জুয়ো খেলে গেলুম। তাতেই বা কি? কোন মীমাংসাই ত তবু হবে না। যে চল্‌ল, তার পা থেকে এই নিষ্ঠুর জীবনযাত্রার নিয়ম-নিগড়-গুলি খুলে থাক্, তাই এতদিনের সঞ্চিত নিষ্ফল আত্মপ্রবঞ্চনার কৌশলগুলি একটি করুণ দীর্ঘশ্বাসে উড়িয়ে দিই। মশারি থেকে আজ একটিবার বেরিয়ে এসে এই নীল আকাশের সৌম্যতাকে নিশ্চল ভাবে গ্রহণ করি! আজকে একবার পরিপূর্ণ দ্বিধাশূন্যতায় ডাকি—কঙ্কা।

উঠে দাঁড়ালুম। ডিবিয়াটা জ্বেলে নোট-বুক্‌টায় এ কয়েকটি কথা না লিখে পারলুম না।

—মমতা যদি হয় আমার এই ব্যর্থ হতাশ জর্জ্জরিত ছত্রিশটাকার কেরাণীজীবন, কঙ্কা আমার এই ভূমাময় মহাকাশশায়ী উদার মৃত্যু। মমতার মন্দির যদি দেহের এই ভোগায়তনে, কঙ্কার তবে এই দূরের প্রান্তর সীমাহীনতায়! মমতা যদি এই প'ড়ো ঘর হয়, কঙ্কা তবে ঐ সুদূরবিস্তৃত কণ্টকিত অনির্দ্দিষ্ট বাহির! বাহির আমাকে ডাক্‌ছে। আমি চল্লুম।

কিম্বা এরকম ভাবে লিখে রাখলে ত' চলে।

—মমতাকে বহু কষ্ট দিয়েছি। আমার জন্যে খেটে খেটে ও জর্জ্জরিত হ'য়ে গেল। নিজের যৌবনকে লাঞ্ছিত করল। কত বেলা নিজে খেল না। আমার জন্য সমস্ত গয়না বেচ্‌ল। নিজেকে সর্ব্বপ্রকারে দীন বঞ্চিত ক'রে রাখ্‌ল। দিনের পর দিন মাসের পর মাস এই অকর্ম্মণ্য মৃত্যুপিপাসু হতভাগ্যকে নিয়ে দরিদ্র ভগ্ন জীবনের ভেলায় ভাস্‌ল, কোথাও কূল মিল্‌ল না। আমি আর পারি না। কুড়িটা টাকা ত' কালই ফুরিয়ে যাবে। তারপর? ... আমি ওকে আর পীড়িত করতে পারব না। আমি ওকে মুক্তি দিতে চাই। যতীন ত' তাকে ভালোবাসে। আমার অসুখের মধ্যে কতদিন ওকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছিল। ও নেয়নি। ওর রিক্ত আভরণশূন্য হাত দুখানি দেখে বন্ধুর বুকে নিদারুণ বেজেছিল। তাই ত' দুগাছি সোণার চুড়ী গড়িয়ে ও মমতাকে বলেছিল পরতে। মমতা পরেনি। নিতেও চায়নি। রান্না ঘরের বারান্দায় সেই করুণ দৃশ্যটি আমি ভিজা চোখে ব'সে ব'সে দেখ্‌ছিলুম এখান থেকে। মমতা নিতে না চাইলেও সেই চুড়ী দু'গাছি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে যতীনের মর্ম্মান্তিক বাজ্‌ছিল, বুঝছিলুম। তাই সে আমি কেমন আছি জান্‌বার

আছিলাম ওপরে এসে ডাক্তার ওপর মমতা যেখানে আমার দুধের বাটিটা রেখেছিল, তার পাশে চুড়ী দু'গাছি রেখে চ'লে গেল। শেষে সেই চুড়ী দু'গাছি বেচে মমতা ডাক্তারের ভিজিট দিয়েছে। যতীনের দেওয়া একখানি সবুজ দামী শাড়ী পরতে মমতা বাধ্য হয়েছিল; আমার সামনেই যতীনের সে কি কাতর অনুরোধ। মমতাকে বেশ দেখাচ্ছে এ কথা আমি ও যতীন দুজনে বল্‌তেই ত ও কেমন সুন্দর ক'রে হেসেছিল। তা ছাড়া আমার চোখের অলক্ষিতে যতীন ও মমতায় কি কি গোপন নিভৃত ও অস্পষ্ট স্নেহের বিনিময় হয়েছিল, তা না জানলেও অনুমান করতে ভালো লাগে। কোন ক্ষোভ নেই। যতীন ত, আমার চেয়ে কত কামনীয়! শক্তিমান তেজী ছেলে, চাওড়া বুক, দু'দশটা বুঝি অকাতরে বুক পেতে নিতে পারে; বড় লোকের ছেলে, সুন্দর চেহারা— মমতাকে ভালোবাসে! আমি মরে' গেলে মমতা ত' অনায়াসে—

মাথাটা বুঝি গুলিয়েছে। তাই বুঝি এ সব লিখ্‌ছি। না, সত্যি সত্যি মমতাকে মুক্তি দিতে চাই, আমি মরলে পর সে যদি যতীনকে নিয়ে সুখী হয়, তাতে কার কি ক্ষতি আছে? আমি ত' তাকে কষ্ট দিলুম। কত তিরস্কার করলুম। ভালবাসিনা—বল্লুম। যতীন যদি সুখী করতে পারে, তবে সে . . . , এ মিথ্যা আচারের কঙ্কাল নিয়ে প'ড়ে থাকলে, থাকবে, ওর ইচ্ছা, আমি ত' ওকে মুক্তি দিতে চেয়েছি। হয়ত এখনেও দেরী হয়ে গেল। কিন্তু মুক্তির অবাধ অগাধ বিস্তার ও প্রাণ ভ'রে ভোগ করুক এই আমার ইচ্ছা! যেমন আমি ভোগ ক'রে আজ কঙ্কাকে সম্বোধন করতে পারছি, কত কাল বাদে!

ঠাণ্ডা লাগ্‌ছিল। নতুন র‍্যাপারটা দিয়ে বুকটা খুব জোরে জড়াচ্ছিলুম। যেন কে তার দুটি ললিত বাহুলতা দিয়ে আমাকে বেষ্টন ক'রে ধরেছে!

অনেকক্ষণ পড়ে ছিলুম। কাশির চোটে ঘুম ভেঙে গেল। ফর্সা হচ্ছে। মমতার চাপা গোঙানি তখনো থামে'নি। ভারি বিশ্রী দেখাচ্ছিল ওকে। উঠে দাঁড়ালুম। মুহূর্ত্তে বুকটা পাষাণ হয়ে গেল। . . .

দেরাজে একটা টিনের কৌটা। তাতে সাতটা টাকা এখনো অবশিষ্ট আছে। . . .

হয়ত ভীষণ নিষ্ঠুরতা, কিন্তু জগৎজোড়া এই প্রচণ্ড প্রতিকারহীন নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তুলনাই চলে না এর।

বাইরে এসে পড়েছি। তাকে একবারটি শুধু দেখ্‌তে ইচ্ছা করছে মরবার আগে।

মিলনসুখতৃপ্তা ঐশ্বর্যময়ী নারী! একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল। ডাক্‌লুম। সার্কুলার রোড্।

গায়ে তখনো মমতার দেওয়া র‍্যাপারটা।

* * *

দার্জ্জিলিঙে জুবিলি স্যানিটেরিয়মএ ঠাঁই পেলুম। পৃথিবীর সবখান থেকে একেই আমি বেছে নিয়েছি। সন্ধ্যা। নার্সকে বল্লুম—বেড্‌টা চাকরকে ডেকে ঐ জানলাটার পাশে দাও। আমি ওদের কথাগুলি আরো একটু স্পষ্ট ক'রে শুনি!

আমার দুই চোখে সন্ধ্যার ম্লান কুয়াসা কাঁপছিল হয়ত। নার্স আমার কথা শুন্‌ল। নার্সকে দেখে কেবল মার কথা মনে পড়্‌ছে।

যতীন বলেছিল—তুমি এই সকালে বিছানা ছেড়ে? একদিন জ্বর কমতেই অত্যাচার সুরু করেছে?

আমার জ্বর কমেছে—এ খবরটা মমতা যতীনকেও জানিয়েছে, ওকে বল্লুম না যে সার্কুলার রোডের বাড়ীর দরজায় 'টু-লেট্‌' টাঙানো রয়েছে বলেই ওর কাছে এলুম। বলেছিলুম—মমতাকে তুমি বাঁচাও যতীন!

যতীন চম্‌কে উঠেছিল।

—কি হ'য়েছে মমতার?

—কাল রাত থেকে ভীষণ জ্বর, ভুল বক্‌ছে, তাই তোমাকে খোঁজ করতে আমি বেরিয়ে এসেছি। তুমি একবার যাও যতীন। ঘরে একটি পয়সাও নেই।

যতীন আমার ওপর চাদরটা ফেলে তাড়াতাড়ি বল্লে—চল।

—তুমি যাও, আমি ডাক্তারকে একেবারে 'কল' দিয়ে যাই।

—কিন্তু টাকা চাই যতীন।

—কত?

—প্রায় দুশ . . .

—চল, আমার পকেটেই আছে।

বল্লুম—তুমি একলা খালি পকেটে গেলেই চল্‌বে, টাকাটা আমার হাতে দাও।

যতীন আমার দিকে ফ্যাল্‌-ফেলিয়ে চেয়ে রইল।

বল্লুম—কাল রাতে মমতা আমাকে ভৎর্সনা করেছে। বলেছে—রুগ্ন মুমূর্ষু স্বামী নিয়ে সে তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছে। তার সুখ নেই স্বাচ্ছন্দ্য নেই। সে খেতে পায় না। ছেঁড়া কাপড় প'রে কেঁদে কেঁদে জীবন গোঙায়। আমার কি অধিকার আছে এম্নি ক'রে তার সৌন্দর্য্য স্বাস্থ্য কালো ক'রে দিতে? আমাকেও ঘৃণা করে। যাকে ভালোবাসে না তাকে সেবা করার মধ্যে তার সুখ নেই। তারপর আমি মরে গেলে নাকি ওকে ফের যাবজ্জীবন কৃত্রিম কঠিন বৈধব্যের শাস্তি বহন করতে হবে? কেন? যতীন, ও তোমাকে চায়। প্রলাপের সময় তোমার নাম করেছে খালি। তুমি একবার ওর কাছে যাও।

যতীন আমাকে হয়ত পাগল ভেবেছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, দু'শ' টাকা আমাকে দিল। এমন ভাবে দিল যেন ও ঐ দু'শ টাকা দিয়ে মমতাকে কিনে নিচ্ছে। হয়ত আমি চলে যাবার পর তখনই ও মোটরে ক'রে মমতার কাছে গিয়েছিল। হয়ত মমতাকে সান্ত্বনা দিয়েছে। আমি চলে যাবার পর পৃথিবীর কি হবে তা ভাবতে পারি না, আমি ত' যাই। আমি ত' তাকে একটিবার শেষবার দেখি! চুপ চাপ ছিল। হয়ত কঙ্কা এখন একটু ঘুমিয়ে পড়েছে। কখন আবার জাগবে না জানি!

সুনির্ম্মল যেদিন তার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে কঙ্কাকে দেখিয়ে বলেছিল—এ আমার ওয়াইফ্, তখন কঙ্কার কুণ্ঠিত লজ্জারুণ নম্র চোখের পাতার কাঁপনটি দেখে সমস্ত হৃদয় জ্বলে উঠেছিল—ওরে এ যে সেই! অথচ, এই সে যে কে তা আজ পর্য্যন্তও জানিনি। কঙ্কা সেদিন দুটি হাত জোড় ক'রে নমস্কার পর্য্যন্ত করতে পারে নি। কোন কথাও কয়নি। চোখে চায়ও নি একটিবার। অদূরে দাঁড়িয়ে রাঙা-শাড়ীর আঁচলটা ঘর্ম্মাক্ত দুটি আঙুল দিয়ে শুধু খুঁটছিল। তবু মনে হচ্ছিল গন্ধরাজের পাপড়ির মতো পেলব ঐ মেয়েটিকে যেন খুব চিনি! ওকে কোথায় যেন আমি দেখেছি। ঠিক মনে করতে পারছি না। কোন্ বিস্মৃত শৈশবে, আমাদের বুনো গাঁয়ের গা-ঘেঁষা না'-ভাসানো মরা গাঙের পারে হয়ত। হয়ত বা কোন মুখের ব্যস্ত রাজধানীর ভীড়ের মধ্যে, বা কোন আধেক-খোলা সলজ্জ বাতায়নের ফাঁকে! হয়ত বা এখেনে নয়। সে কোন শুকতারার দেশে! মধ্যরাত্রের অপরূপ স্তব্ধতায়! হয়ত বিষণ্ণ অপরাহ্নে ঘুমহারা রজনীগন্ধার অস্পষ্ট বেদনায়!

অবগুণ্ঠনের অবরোধ রচনা ক'রে মেয়েটি আজ কত দূর! তবু মনে হচ্ছিল যদি ওর ঐ শিথিল হাতখানি ধরি, ধ'রে চোখের পানে চেয়ে দুটি কথা কই,

মেয়েটি তা হলে একটুও রাগ করে না, সহজ পরিচয়ের সুরে উছল আনন্দে কত গল্প করে! মনে হচ্ছিল ও আর এক জন্মে আমার বোন ছিল, বা হয়ত আরেক জন্মে ও আমার বোন হবে, তখন আমাকে ছাড়া ওর জীবন কাটতে চাইবে না! যদি ওর ঘোমটাটি ফেলে দিই, ও তা হলে ক্ষণিক সরমে মুচকে একটু হাসে, ঘোমটাটি তুলে দেয় না; পিঠের ওপর দীর্ঘ চুলগুলি মেলা থাকে, তা দেখতে দেখতে চোখ জুড়িয়ে যায়! সুনির্ম্মল যেন একেবারে অচেনা। ও খালি ওর অয়েল-মিল্ রাইস্-মিল এঞ্জিন বয়লার-এর গল্প করছে। কিন্তু ওর সঙ্গে চাঁদনী রাতে শেলীর Alastor পড়বার কথা, ওকে আজ রবীন্দ্রনাথের 'তাজমহল' প'ড়িয়ে শোনালে ভারি মানাবে!

কিন্তু কন্যার সঙ্গে একটি দিনও কথা কইনি শুধু নিস্তব্ধ হৃদয় দিয়ে তাকে সম্ভাষণ করেছি। সেও স্তব্ধতায় উত্তর দিয়েছে। একটি দিনের ছবি আজো আমার মনে একটু থেকে গেল। উত্তরপাড়া থেকে নৌকা ক'রে আসছিলুম বেলুড় পেরিয়ে যখন যাচ্ছি পার থেকে কে মাঝিকে শুধাল তাদের আহিরীটোলায় নিয়ে যেতে পারবে কি না! তখন বেলুড় মঠে আরতির শঙ্খ থেমে গেছে। ভাগীরথী অন্তঃপুরলক্ষ্মীর মতো একটি পবিত্র শান্ত শুশ্রূষা বহন ক'রে চলেছে। আকাশের জ্যোৎস্না নদীর জলের মতোই ঘোলা!

মাঝি আমার অনুমতি চাইল। আমি মুখ বাড়িয়ে দেখলুম—সুনির্ম্মল আর সে! সর্ব্বাঙ্গে ওর সুষমা! সুন্দর সেজেছিল। এ জ্যোৎস্নাবিকীর্ণ সুষুপ্ত ভাগীরথীর মতো নয়, অমাবস্যারাত্রির নক্ষত্রদীপ্ত অন্ধকারে তরঙ্গিণীকে যেমন দেখায় তেমনি! সুনির্ম্মল ত আমাকে দেখে ভারি উৎফুল্ল হ'ল। লাফিয়ে উঠল নৌকাটাকে নাগরদোলা ক'রে। সে ধীরে ধীরে দুখানি পা ফেলে ফেলে এল। ইচ্ছে হ'ল একবার হাতটি ধ'রে তুলে আনি! নিজেই আসতে পারল। কোন কথা বললে না, সুনির্ম্মলের সঙ্গেও না। ভাবলুম, আমার কাছে ওরা কথার বাজে খরচ করতে চায় না। সমস্ত রাতই ত' প'ড়ে আছে ওদের।

সুনির্ম্মল মঠের গল্প সাঙ্গ ক'রে মাঝিদের সঙ্গে মাছধরার গল্প সুরু করল। জেলেরা এক পায়ে বৈঠা চালিয়ে দুই হাতে মাছ ধরছে। ডিঙিগুলি স্রোতের ফুলের মতো দুলছে। ওপারে চিম্‌নীগুলি কালো ধোঁয়া দিচ্ছে। চুপ ক'রে ব'সে থাকতে ভালো লাগছিল না। অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। কিন্তু বাজে গল্প করবার রাত ত' এ নয়!

বাঁশীটা মাঝখানে থামিয়েছিলুম। ভাটার টানের সঙ্গে সঙ্গে ভাটিয়ালের টান

ভারি মিল দিচ্ছিল। কঙ্কা নিঝুম হ'য়ে ব'সে ছিল ছাওনির বাইরে। সমস্তটি বুক পেতে যেন ও বাঁশী শুনছে। ওর ব'সে থাকবার ভঙ্গীটি ভারি করুণ লাগ্‌ছিল। ওর মুখখানিতে যেন কত দুঃখ! ঐ মুখখানিতে ব্যথার লাবণ্য না থাকলে মহিমা পেত না। কিন্তু কেন ওর ব্যথা? কে জানে? হয়ত ভুল দেখ্‌ছিলুম। তবুও, ওর যদি ব্যথা না থাকে বুকে, তা হলে মনটা যেন খুশী হয় না, খুঁত্‌খুঁত্‌ করে! যদি সত্যিই কোন ব্যথাই না এল ওর জীবনে, তবে ও একটি ব্যথা পা'ক, ওর চোখ্‌ দুটি গঙ্গার জলের মতো ছল্‌ছল্‌ ক'রে উঠুক, মন খালি এই কামনা করছিল। ওর জীবনে একটি পবিত্রতম দারিদ্র্য আসুক! ওর মুখখানা রক্ত-করবীর বিলাস ছেড়ে সন্ধ্যায় ফোটা অপরাজিতার মতো স্নিগ্ধ হোক! কি অন্যায় কামনা!

বাঁশীটা বারে বারে ফেলে দিতে ইচ্ছা করছিল। ইচ্ছা করছিল, দু'টি কথা কই। কথা কইলেই ও সুন্দর ক'রে জবাব দেবে নিশ্চয়। ওর সঙ্গে যে আমার কতকালের চেনা! কিন্তু মনে হচ্ছিল, কথা কইলেই যেন আজকের এই ঘুমন্ত ঘোলা নদীর ওপর নিঝুম জ্যোৎস্না রাতটা একেবারে মাটি হয়ে যাবে। আমার ইলিশমাছ ধরবার কৌশল জেনে কাজ নেই। বাঁশীতে ব'সে ব'সে একটা ভাঙা উর্দু গজল বাজাই!

ভাগ্যিস্‌ সেদিন বাড়ী ফিরে এসে অভিভাবক রাগী মামার অন্যায় বকুনির উত্তরে চটা চটা কথা কইনি। চুপ ক'রে বাঁশীটা কোলে নিয়ে বাইরে চেয়ার টেনে ব'সে নদী-স্রোতের অপার স্তব্ধতার কথা ভাব্‌ছিলুম,—আর···, কথা কইনি, কথা কইনি। এ যেন একটি অপার সান্ত্বনা।

তারপর ত' সেই অপরূপ রাত্রিটি বাক আর ম্যাথু আর্নল্ডের পাতার চাপে মারা প'ড়ে গেল। জনসন্‌ আর কোলাহল। তার মধ্যে সেই ঘুমহারা জ্যোৎস্না-জাগা নিশীথিনীর স্থান ছিল না। কিন্তু সে রাত্রিটি একবছর বাদে জন্ম পেয়েছিল আবার। তখন তা চোখের জলে ভরা!

একদিন বিকেল থেকে আমাদের বাড়ীতে সানাই বাজ্‌ছিল। উৎসবের বাদ্য হলেও তার মধ্যে পরিপূর্ণ দুঃখের রাগিণী চলেছে! গরদের কাপড়টা কুঁচিয়ে পরতে পরতে আমার সেই 'বয়স্ক ক্লাস' রাত্রিটির কথা মনে পড়্‌ল। আর মনে পড়্‌ল সেই যে একটি কোমলকায়া দূর মেয়ে ছাউনিতে হেলান্‌ দিয়ে ব'সে স্তব্ধ প্রার্থনাপূর্ণ হৃদয়খানি মেলে ধরেছিল আকাশের তলে—তার নমিত ব্যথিত দু'টি চোখে! সমস্ত ব্যাপারটা ভারি বিরস মনে হল। ভাবলুম, আমার পায়ে

যেমন পাম্প-শু, মাথায় শোলার টোপর, গায়ে গরদের চাদর, তেম্‌নিই হয়ত পাশে আমার স্ত্রী। ভাব্‌লুম, ওপাড়ার ক্ষান্তকে হ'লে ত' আমার চলে। শোভাবাজারের ললনাসুন্দরী বা চিংড়ীপোতার কৈবল্যদায়িনীর সঙ্গে মমতার তফাৎ কোন্ জায়গায়? ওদের যে কেউই ত' দু'বেলা ভাত রেঁধে দিত, অসুখ হ'লে ওষুধ খাওয়াত, ম'রে গেলে বিধবা হত। ওদের যে কেউই ত' বল্‌তে পার্‌ত—কোটি কোটি জন্ম ধ'রে আমরা মিলিত হয়ে আস্‌ছি। সর্ব্বনাশ! তাহ'লে ভাগীরথীর উর্ম্মি-গুঞ্জন-ক্লান্ত বিস্তৃত জলরাশির ওপর অপূর্ব্ব বিভাবরীর অসীম রহস্য ভ'রে যে কিশোরীটি গাঢ় চোখে চেয়েছিল—সে?

তাই মমতাকে আমি যে প্রথম চুম্বনটি দিয়েছিলুম তার মধ্যে যে একটি অতৃপ্ত কামনার প্রগাঢ় দুঃখ ছিল, তা'ও বোঝেনি। স্ত্রীকে নাকি চুম্বন দিতে হয়।

তাই একদিন মমতাকে যে কটুকণ্ঠে তিরস্কার করেছিলুম, তাতে যে ও কেঁদেছিল সে শুধু আমার নির্দ্দয়তায়—আমার দুঃখ স্মরণ ক'রে নয়। সে রাত্রে বারান্দায় মাদুরটা পেতে পূর্ণিমার প্রচুর জ্যোৎস্নায় উপুড় হ'য়ে শুয়ে শুয়ে নোট্-বুক্‌টায় লিখেছিলুম—আমার জীবনে এই দুঃখ অগাধ হয়ে রইল প্রভু যে ভালবেসে সমস্ত জীবন ভ'রে একটি অপার অনির্ব্বচনীয় দুঃখ বহন করতে পার্‌লুম না। আমি যেন বন্ধ্যা মৃত্তিকা। ভালোবেসে যে তোমার জন্য কাঁদতে না পার্‌ল তার মতো দুঃখী ত' আর নেই। তার যে অপার ব্যর্থতা। ভাত খেতে না পেয়ে কাঁদি, সংসারের শত অপমানে উৎপীড়নে কাঁদি, মমতার সঙ্গে কলহ ক'রে কাঁদি, কিন্তু এ কান্নায় বুক ভরে না প্রভু! আমি এই অপ্রচুর বিশীর্ণ দুঃখ নিয়ে কি করব? আমাকে তুমি পরিপূর্ণ করে কাঁদাও! আমাকে তুমি বৈরাগী কর।

সে রাত্রে বহুদিন পরে ফের কীট্‌সের Ode to a Nightingaleটা পড়ে'ছিলুম। প্রতিটি অক্ষর অপূর্ব্ব অশ্রুজলে ভিজা ছিল।

আজ আবার ব্রাউনিঙের Paracelcusএর কথা মনে পড়্‌ছে।

ওদের কথা শোনা যাচ্ছে। কঙ্কা আর সুনির্ম্মল।

ভারি মিষ্টি সুরে বল্‌ছে—যাও এখন একটু হাওয়ায়, সব সময় রোগীর ঘরে থাক্‌তে নেই। যাও, bore ক'রো না। কথার সুরে সুন্দর আদর।

সুনির্ম্মল কথা কইছে না। হয়ত ওর রুক্ষ চুলগুলি কপাল থেকে মাথায় আবার মাথা থেকে কপালে—এম্‌নি খেলা করছে।

কঙ্কা বল্‌ছে—তুমি কি ভাব? কিসের দুঃখ? আমাকে চাও? আমার

কঙ্কালটাকে ত' নয়? তবে আমাকে মরতে দিতে তোমার কি কষ্ট? না, না, তুমি এত সাম্‌নে মুখ এনো না। জাননা, আমার নিশ্বাসেও পোকা হাঁটে।

সুনির্ম্মল ভারি কাতর কণ্ঠে ডাক্‌ছে—কঙ্কা! ও হয়ত ওর দুটি ঠোঁট্ কঙ্কার ঠোঁট দু'খানির কাছে নিয়ে এল।

কঙ্কা হয়ত তার রক্তহীন পাণ্ডুর দক্ষিণ করতলখানি সুনির্ম্মলের মুখের ওপর রেখে আস্তে আস্তে মাথাটি সরিয়ে দিল। বল্‌ছে—তুমি ভারি দুষ্টু হয়েছ। তোমাকে নিয়ে আর পারি না। তোমাকে আমি মর্‌তে দেব না। তোমাকে বাঁচ্‌তে হবে।

—একলা?

—বাঃ, আমি মরে' গেলুম বলেই বুঝি আর রইলুম না তোমার পাশে? বাতাস যে আছে, বিশ্বাস কর ত'? কিন্তু তাকে দেখতে পাও? অথচ তাকে প্রতি নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করছ।

—কিন্তু…

—না, তুমি আমাকে আর বকিও না। তুমি বেড়াতে না গেলে রাগ ক'রব। কথা কইব না।

ভারি সুন্দর সুর! ওর মুখটি ক্ষণেকের জন্য মেঘলা হ'ল হয়ত।

সুনির্ম্মলও পাশ দিয়ে চ'লে গেল। ওর জুতোর শব্দ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শুন্‌তে পেলুম। ও এখান দিয়ে গেলে ওকে ডাক্‌তুম।

পরের সন্ধ্যায় কঙ্কা সুনির্ম্মলকে বল্‌ছিল—তোমাকে ছেড়ে যাব, এ বুঝি খালি তোমারই কষ্ট? আর আমার নয়? তোমার এই শক্ত বলিষ্ঠ বাহু দুটি, রাখ ত' দেখি আমাকে ধ'রে, বল ত',—'যেতে আমি দিব না তোমায়।' তবু 'যেতে দিতে হয়।' আমি যে চলেছি, তোমাকেই পেতে চলেছি। কিন্তু এখন তুমি যাও, বার্চ্চহিলে বা আর কোথাও বেড়িয়ে এসো লক্ষ্মীটি। রাত্রে না হয় আমার কাছেই থেকো! বোধহয় আজই শেষরাত্রি।

কঙ্কার চোখে নিশ্চয়ই জল এসে পড়েছে। সুনির্ম্মলেরও। এক হাতে নিজের আর এক হাতে প্রিয়ার চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছে।

আজ সুনির্ম্মল বারান্দাটার এ পাশ দিয়ে বেড়াতে যাচ্ছে! আমার দুয়ারের সাম্‌না দিয়ে যেতেই ওকে দুটি হাত তুলে নমস্কার কর্‌লুম, ও থমকে দাঁড়াল। ঘরে ঢুক্‌ল। সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে স্পষ্ট দেখলুম ও সুনির্ম্মল নয়, একটি সুকান্ত দীর্ঘায়ত দেহ তেজস্বী ছেলে, দুটি চোখে অকুণ্ঠিত সহানুভূতি।

ও একেবারে আমার পাশে এসে বসেছে। আমি যেন ওর অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমার শুক্‌নো একখানি হাত ওর মুঠির মধ্যে নিয়ে বল্লে—আমাকে ডাক্‌ছেন ?

আমি যেন ওর একটুও পর নই! ওর বুকে একটি প্রকাণ্ড দরদ বাসা বেঁধেছে যেন। দুঃখ ওকে আপন পর ভুলিয়েছে।

বুকটা দুরদুর্ করে কাঁপ্‌ছিল। বল্লুম্—কঙ্কা আজ কেমন আছে ?

আমার মুখে কঙ্কার নাম শুনে ও হয়ত একটু চম্‌কাল। বা চম্‌কাল না। খানিকক্ষণ চুপ করে' চেয়ে থেকে বল্লে—আজ রাতটা পোহালে, কাল আর ওকে রাখ্‌তে পারব না। রাখা যায় না। 'সে কোন বনের হরিণ ছিল আমার আমার মনে'—গানটা শুনেছেন ? তারে কে বাঁধ্‌বে ?

মনটা হয়ত সন্দেহে দুল্‌ছিল। তাই জিজ্ঞাসা করলুম্—আপনি ওর কে হন ? জিজ্ঞাসা করেই প্রশ্নের অসঙ্গতিটা নিজের কাছে ধরা প'ড়ে যাওয়াতে ভারি লজ্জিত বোধ করলুম। আমি ত' জানি। তবু এ কি দীনতা।

ও যদি বল্‌ত, স্বামী হই, তা হলে হয়ত একটুও রাগ করতুম না। কিন্তু ও চমৎকার একটি কথা বল্‌ল—কিছুই না।

বল্লুম—সুনির্ম্মল কোথায় ? আসেনি ?

—কেন আস্‌বে ?

—ওর স্ত্রী...

ছেলেটির কণ্ঠস্বরে বাষ্প এসে জমেছে। আমার রোগা হাতটা চেপে ধরে বল্লে—জুতো ছিঁড়ে গেলে বড় লোক সেটা নাখিয়ে ফেলে দেয়, তা বুঝি দেখেন নি ?

বুকটায় অসংখ্য কাঁটা বিঁধ্‌ছিল। বল্লুম---কিন্তু কঙ্কার মেয়ে ?

ছেলেটি বল্লে—একপাটি জুতো ছিঁড়লে অন্য পাটি জুতোও ছুঁড়ে ফেল্‌তে হয়। এই দস্তুর। শেফালি মারা গেছে।

আর্ত্তনাদ বেরুল।—সত্যি ?

ছেলেটি আমার হাতে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ওর চোখে জল। বল্লে—মাসের বাজার সওদার হিসাব মিলে গেলে যেমন হিসাবের খাতা লোকে ছিঁড়ে ফেলে তেম্‌নি অপ্রয়োজনীয় ব'লেই ও কঙ্কাকে ছিঁড়ে ফেলল। ফাটা মোটরের টায়ার দিয়ে ও কি করবে ? ও ওর জীবনের নতুন পাতা উল্টোল। রুগ্ন অসহায় কঙ্কাকে ফেলে ও চ'লে গেল। বম্বেতে কাপড়ের কারখানার বাণিজ্য-বারবনিতা ওকে ডাক্‌ল। কে জান্‌ত ? যখন জান্‌লুম, বড্ড দেরী হয়ে গেছে। ওকে

এখানে নিয়ে এসেছি আজ ছ' মাস। পারলুম না। খানিক থেমে ফের বল্লে— আপনার কথা বলুন। আপনাকেও ত ভারি অসহায় দুর্ব্বল দেখাচ্ছে। এই ব্যাপারটা শুধু আপনার সম্বল। একটা ষ্টোভ্ নেই, কোন ওষুধ নেই, নো ট্রিটমেন্ট্। কি, কি আমায় খুলে বলুন। নার্স কোত্থেকে পেলেন?—

বল্লুম—আমি আনন্দে মরতে এসেছি এখানে। সার্কুলার রোডের বাড়ীর নীচের ঘরে যে দ্বারোয়ান আছে, সে শুধু বল্লে—কন্যা দার্জ্জিলিঙে হাঁসপাতালে। ...নার্স? মরবার সময় কাছে একটী নারী চাই। যাকে ভারি চাইছি।

আমার হতাশাময় গভীর বেদনাপূর্ণ কাতর কণ্ঠস্বর শুনে ছেলেটি উঠে প'ড়ে বল্লে—এ কি অন্যায়? দাঁড়ান, আমি এর একটা এক্ষুনি বিহিত করছি। পরে আপনার গল্প শুনব' খন।

সিভিল সার্জ্জন্ ডাক্‌তে গেল হয়ত। কিন্তু বৃথা, বন্ধু!

রাত্রি সুরু হতেই ভীষণ বৃষ্টি সুরু হল। জমাট্ পিচের মতো অন্ধকার। একেই হয়ত কবিরা সূচীভেদ্য বলেছে। থাইসিস্ ওয়ার্ড্‌টা একেবারে মৃত্যুর মতো স্তব্ধ। মনে হয় এখানে সবই মরা। শূন্য ঘরে ভূতগুলি তাদের কালো কালো লম্বা লম্বা পা ফেলে নিঃশব্দে হাঁটছে।

পা দুটো কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ঠোকাঠুকি খাচ্ছিল। তবু বিছানা ছেড়ে বেরুলুম। যদি আজ্‌কের রাতটাই ওর না পোহায়! যদি ওর মুখে এমনি পিচের মতো কালো অন্ধকার বাসা নেয়।

দুয়ারটা ঠেল্‌লুম। খোলা ছিল। একটু শব্দ হ'ল। আবার চুপচাপ। হয়ত ওরা ঘুমুচ্ছে। পাশাপাশি?

শেড্ দেওয়া কমানো চাপা আলোতে ঘরখানিকে রহস্যময় মনে হচ্ছিল। প্রশস্ত বিছানার ওপর একমুঠো বাসি গত দিনের পূজায় দেওয়া গন্ধরাজের পাপ্‌ড়ির মতো কন্যা শুয়ে—যেন বহুদূরের অস্পষ্ট একটী গীতরেখা! যেন কীট্‌সের Madeline! আজো ওর পাণ্ডুর দুঃখিত করুণ মুখখানি দেখে সমস্ত প্রাণ ব'লে উঠছে—এ যে সেই! অথচ সে যে কে, তা বুঝ্‌লুম না। ও যেন বাসনাবিহীন ম্লান গোধূলিবেলা! ওর বিছানার দুই পাশে অজস্র ফুল— গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা ডালিয়া ব্ল্যাকপ্রিন্স, কনকচাঁপা,—সব ম্লানিয়ে এসেছে ওর দেহখানির মতো! ঘরে রোগীর জিনিস পত্র অগোছান হয়ে রয়েছে—শিশি, গ্লাস ফিডিং কাপ, প্যান, বাল্‌তি, বেদানার খোসা আঙুরের গুচ্ছ—অডিকোলনের বাটি—কত কি! শিয়রে একটা শোফায় ছেলেটী ব'সে ব'সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সারা মুখে করুণ একটি ক্লান্তি। এমন ভাবে ঘুমিয়ে পড়াটি কি মধুর। ওরা যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা কইছে। ছেলেটি এখুনি আবার জাগ্‌বে। ওর ঘরের নার্স টাও ঝিমুচ্ছে। বৃষ্টি থাম্‌ছে না।

ধীরে ধীরে ওর কাছে এগিয়ে এলুম ওর রুক্ষ জটিল চুলগুলি আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে। মশারি টাঙানো ছিল না! ওর পাশে একটু বসি! ওকে যদি ডাকি, কল্কা, ও চোখ চেয়ে আমাকে দেখে হয়ত বলে—তুমি এসেছ? যদি ওর কপালে আমার জ্বর-শুষ্ক হাতখানি রাখি, তা হলে ও হয়ত আমারে একবার আঃ বলে, হাতখানি বিশীর্ণ বুকের মধ্যে টেনে নেয়, আমার হাতখানি নিয়ে একটু আদর করে। যদি আমি ওর ঐ পাংশু শুক্‌নো কঠিন ঠোঁট দুটি চুম্বন করি, তবে ও আমাকে কিছুই বলে না, বিশাল চোখ দুটি একবার মেলে ফের আবেগে মুদ্রিত করে। ওর বুকটি তা হলে এমন ক্লান্তিতে দোলে না যেন। সেই প্রশান্তা ভাগীরথীর মতো তল্ তল্ থৈ থৈ করে! আমি আর ও দুজনেই নিরাময় হই। বৃষ্টি! বৃষ্টি! বৃষ্টি!

দুয়ারের কাছে এসে আমি নাকি অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলুম। একটা ক্ষণিক সোরগোল উঠেছিল। নার্স আমাকে বাহুতে ক'রে বিছানায় এনে শুইয়ে দিলে। নার্সকে মা বল্‌তে চাইলেও ওর স্নেহসিক্ত বাহুটিকে কল্কা ব'লে ডাক্‌তে ইচ্ছা করছিল।

শুয়ে শুয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনে খোকনটার জন্য সমস্ত প্রাণ কাঁদ্‌ছিল। ওর চুলভরা মাথাটা বোঁচা নাকটা, তুল্‌তুলে পা দুটোর জন্য প্রাণে প্রচণ্ড লালসা জমেছে। ওর সেই সবে-ফোটা যুথিকার কুঁড়ির মতো চারটি দাঁত! ওর উঁচু কপালটা।

বৃষ্টি আর কুয়াশা! কে বল্‌বে ভোর হয়েছে? ঘড়িতে এগারোটা বাজ্‌তে না বাজ্‌তেই কল্কা চ'লে গেল।

ভেবেছিলুম ছেলেটি বুঝি খুব অস্থির হ'য়ে পড়বে। ওকে দেখে অবাক হ'য়ে গেলুম। ও যেন কিছুই হারায়নি, বুক ভ'রে সমস্ত জীবন ভ'রে কি যেন ও পেল! ওর প্রাণের সঙ্গে শুধু কস্তূরীমৃগের তুলনা চলে।

বল্লুম—এবার আমার পালা।

ও ও-ঘর থেকে অনেকগুলি জিনিষ নিয়ে এসেছে চাকর দিয়ে। বল্লে-এসব আপনাকে কল্কা দিয়ে গেছে ব্যবহার করতে। ভারি বিশ্রী ঠাণ্ডা আজ, ওভার-কোট্‌টা গায়ে দিন্।

কল্কার ওভার-কোট্‌টা গায়ে দিয়ে দিল। তার ওপরে মমতার দেওয়া র‍্যাপারটা।

বল্লুম—ও দিয়েছে ?

—হ্যাঁ, আপনার কথা ওকে বলেছিলুম। যাবার আগে আমাকে বল্লে—তোমাকে যা দিলাম, দিলাম; এগুলি রোগা বন্ধুটিকে দিও। হয়ত তার সঙ্গে ঐ খেনে দেখা হতে পারে।

ওভার কোট্‌টা দু' হাত দিয়ে বুকের ওপর চেপে ধরে বল্লুম—কল্কা, দূর, আমার পরম, তোমার কাছেই আমি যাচ্ছি; যুগে যুগে মানুষ তোমারই অভিসারে ঘর-ছাড়া হয়েছে।

বল্লুম—এই ষ্টোভ্, গ্লাশ, প্যান যাগ্, টব কাপ কোট্—সমস্ত ?

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে বল্লে—সমস্ত।

কে যেন আমাকে খুঁজ্‌ছে! আমার নাম ক'রে ওদিকের ঘরে একটা নার্সকে জিজ্ঞেস করছে। চেহারার বর্ণনা দিচ্ছে। চোখে চশমা, মাথায় একরাশ কালো কোঁকড়ান চুল, গায়ে ছাইরঙের র‍্যাপার। যতীনের গলা না? নার্স এই ঘর দেখিয়ে দিল। বারান্দায় যতীনের জুতোর শব্দ, হাঁ, আমি চিন্‌তে পারছি। সঙ্গে আর কার লঘু পদধ্বনি?

মমতা আমাকে দেখে বুকের ওপর ছোট খুকীর মতো ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ফুলে' ফুলে' কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। ওর চুলগুলির ওপর হাত রাখ্‌লুম। ওকে কিন্তু আজ ওর নাম বদ্‌লে আর একটা নামে ডাক্‌তে ইচ্ছা করছে।



শরৎ-চন্দ্র

(যৌবনে)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গ্রীষ্মের অবকাশের পর আষাঢ়-মাসে কলেজ খুলিতে শরৎ তেজ-নারায়ণ কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইল। এই সময় আমাদের সহিত তাহার একটি নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। সে আমাদের পড়া-শুনা দেখিবার ভার গ্রহণ করিল।

সন্ধ্যার পর, দুই ভাই, আমাদের ঘরের মেজের উপর মাদুর পাতিয়া পড়িতে বসিতাম। শরৎ আসিয়া আমাদের মধ্যে বসিয়া দুইজনকে ঘণ্টা-খানেকের জন্য সাহায্য করিত। তাহার কাছে আমরা ইংরাজি এবং অঙ্কের পাঠ গ্রহণ করিতাম সেই সময়ে এক-একদিন মা ও আসিয়া বসিতেন এবং সেইদিন প্রায়ই নানারূপ অদ্ভুত গল্প হইত। মাতৃদেবীর যে-কোন বিষয়কে চিত্তাকর্ষক করিয়া বলিবার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার কপালে একটি কাটার দাগ ছিল। মনে আছে, সেইটিকে অবলম্বন করিয়া মা একদিন একটি ভূতের গল্প বলিয়াছিলেন—যাহা আজো দৃঢ়-ভাবে আমার মনে মুদ্রিত আছে।

সেদিন বাহিরে রীতিমত বর্ষা, আর ঘরের মধ্যে আমরা কাঁচা-লঙ্কা এবং নারিকেলের সহিত মুড়ি খাইতে খাইতে যেন চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতে লাগিলাম যে ক্রমেই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে—আর মা-আমাদের মাত্র আট বৎসরের বালিকা, ভয়-ভীর চিত্তে তাঁহার বড় দিদির আজ্ঞা-বহন করিয়া, প্রসন্নদিদিদের বাড়ীতে ঢুকিতেছেন। এই বাড়ীর ইতিহাস অতিশয় করুণ। প্রথম মৃত্যু হয় বাড়ীর সরকারের। রাত্রে কলেরা হইয়া সে বিছানায় মরিয়া রহিয়াছে; কেহ কোন সংবাদই জানে না। তাহার পর সরকারের প্রেতাত্মা একদিন কর্ত্তাকে খিড়কির পুকুরের পাঁকে চুবাইয়া মারিল। তাহার তিন-মাসের মধ্যে বাড়ীর একমাত্র বংশধরের সর্পাঘাতে মৃত্যু হইল। শেষে প্রসন্নদিদির কনিষ্ঠা ভগ্নী গর্ভাবস্থায় সন্ধ্যার সময় মূর্চ্ছিত হইয়া শেষরাত্রে মারা

পড়িলেন। বাকী রহিলেন প্রসন্নদিদি এবং তাঁহার মা। প্রসন্নদিদি থাকিতেন কালিঘাটে—তাঁহার মাকে দেখিতে প্রায় প্রতিশনিবারে রিষড়ায় আসিতেন। এই প্রসন্নদিদিই ছিলেন মার বড়দিদির বন্ধু। এক শনিবারে প্রসন্নদিদি আসিয়াছেন কিনা দেখিতে গিয়া—মা দেখেন, বাড়ী শূন্য, সকল দোরে তালা ঝুলিতেছে। এই অবস্থায়, তিনি ফিরিবার সময়—বোধকরি ভয় দূর করিবার মানসে, যেমন উচ্চ-স্বরে বলিয়াছেন—ওমা, এরা কেউ নেই যে—অমনি জানালার পাশ হইতে কঠোর অট্টহাসি! হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ! ঊর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া মা সদর দরজার চৌকাটে বাধা পাইয়া মূর্চ্ছিত হন। কপাল কাটিয়া সেই সময় রক্ত-গঙ্গা হয়। এই গল্প শুনিয়া আমরা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেলাম। গল্পের শেষ-দিকটা আরো মারাত্মক। বাড়ীর দোতালার ঘরগুলিতেই ভূতগুলির বাসা ছিল। একদিন দ্বিপ্রহরে, স্কুল বাড়ী হইতে সবাই দেখিল যে সেগুলি হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া গেল। পরে জানা গিয়াছিল যে ঠিক ঐ দিন, ঐ সময়ে একজন আত্মীয় ঐ ভূতগুলির উদ্দেশে গয়াতে গদাধরের পাদ-পদ্মে পিণ্ডদান করিয়াছিলেন। এই গল্প, মার কাছে শুনিয়া কোন ছেলের মনে, ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। এবং বহুদিন যাবৎ—আমাদের নিঃসন্দেহ ভূতে বিশ্বাস ছিল; এখনো যে একেবারে নাই, তাহাও মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি না। ভূত সম্বন্ধে সংস্কার দৃঢ়-বদ্ধ—তাহাকে যুক্তি-তর্কের দ্বারা তাড়ান—বোধকরি আর যায় না!

পড়ানর পর শরৎ খাইয়া নিজের পাঠে মন দিবার জন্য উপরের ঘরে চলিয়া যাইত। সেখানকার ব্যবস্থা দেখিলে পরিষ্কার বোঝা যাইত যে সে ঐ ব্যাপারে অমনোযোগী নয়। রাত্র ১টার পর সে ঘুমাইত। শরৎ কোন দিন সকালে উঠিতে ভালবাসে না। বেলায় আমাদের পাঠ শেষ করিয়া তাহার কাছে গেলে—দেখিতাম অনন্য মনে বাংলা লিখিতেছে। এই সময় বোধকরি সে "কাক বাসার" তৃতীয় খাতা লিখিতেছিল।

কিছুদিন পরে সে আবার বাহিরের ঘরে বাসা লইল। এই সময়ে তাহাকে ইংরাজি উপন্যাস এবং গ্যানোর ফিজিক্স্ খুব মনোযোগ দিয়া পড়িতে দেখিতাম। তাহাকে স্কট্ পড়িতে বড় দেখি নাই; কিন্তু ডিকেন্সের সুখ্যাতি সে শতমুখে করিত। এই সময়ে সে মিসেস্ হেনরি উডের পুস্তকও পড়িতে আরম্ভ করে।

কলেজ হইতে বাড়ী ফিরিয়া বৈকালে সে বড় একটা বাড়ী থাকিত না। এই সময়ে রাজুর সহিত সে ছোট ডিঙ্গি করিয়া কোথায় উধাও হইত। এক-এক দিন ফিরিতে রাত হইলে—আমরা সকালে তাহার কাছে পড়িতে যাইতাম। সে সময়ে

সে বিছানায় শুইয়া তামাক খাইতে খাইতে—অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে অধ্যাপনার কাজ করিত। মনে হইত অনেক রাত জাগিয়াছিল।

এই সময়ের একদিনের ঘটনা বেশ মনে পড়ে। তাহাদের বিজ্ঞানের পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষার নোটিশ্ মাত্র একদিনের। সন্ধ্যার সময় সে মোটা বইখানা লইয়া পড়িতে বসিয়া গেল। আমাদের বলিয়া দিল—সকালে আসিস্। সকালে আসিয়া দেখি যে শরৎ তখনো দোর-জানালা বন্ধ করিয়া, আলো জ্বালিয়া পড়িতেছে। আমরা আসাতে খুব বিস্মিত হইয়া বলিল, এর মধ্যে যে এলি?

সকাল হয়েছে যে।

দেখিলাম, সেই স্থূল পুস্তকখানা প্রায় শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। রাত্রি যে কাবার হইয়াছে সে হুঁস্ তাহার ছিল না। পরীক্ষার ফলে অধ্যাপক অতি বিস্মিত হইলেন। বই টোকার সন্দেহ করিয়া আবার প্রশ্ন দিয়া সমুখে বসাইয়া উত্তর লেখাইয়া—তাঁহার বিস্ময় আরো বাড়িয়া গেল। শরতের একাগ্রতা অসাধারণ—এবং তাহার ফলে, স্মৃতি শক্তিও প্রখর; আজও তাহার বহু পরিচয় আছে।

এই বৎসর সে নিভৃতে দুইটি জিনিষের সাধনা করিতেছিল। একটি পড়া-শুনার দিক দিয়া, অপরটি সাহিত্য-সাধনা। সাহিত্য-চর্চ্চা চলিত অতিশয় সংগোপনে। তাহার নিকটতম বন্ধু-বান্ধবও ইহার ঠিক খোঁজটি পাইত না। ইহার কারণ নির্ণয় করা তত কঠিন নয়। তখনকার দিনেও ইংরাজিতে পণ্ডিত হইয়া উঠাই ছিল ফ্যাশান এবং মাতৃভাষার অদৃষ্টে ছিল অপরিসীম অবহেলার লাঞ্ছনা। শরতের ভিতরের মানুষটি সুখ পাইত মাতৃভাষার আলোচনা করিয়া; কিন্তু তাহার পরিচয় সে কিছুতেই কাহাকেও দিতে চাহিত না:—

আমি আমার অপমান সহিতে পারি
প্রেমের সহে না ত অপমান।
অমরাবতী ত্যেজে হৃদয়ে এসেছে যে
তোমারো চেয়ে সে যে মহীয়ান্।

আমরাও বোধকরি, ইহা কেমন করিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলাম। আমাদের মধ্যেও একটা দল গড়িয়া উঠিতেছিল, যাহাদের ভিতরে ভিতরে বন্ধুত্বের ঐক্য-সূত্র ছিল—অপ্রকাশ্যে সাহিত্যালোচনা। এই দলের অগ্রণী আজ বাঁচিয়া নাই। বাঁচিয়া থাকিলে কি হইত জানি না, কিন্তু সেই অল্প বয়সে তাহার লেখা সাপ্তাহিক কাগজে বাহির হইতে দেখিয়া—আমরা অবাক হইয়া যাইতাম।

কিন্তু ক্লাসে ইহার জন্য আমাদের যথেষ্ট অখ্যাতি ছিল এবং মধ্যে মধ্যে লাঞ্ছনারও অবধি থাকিত না। বাহিরের বাধা যতই প্রবল হয়—অন্তরের গতি ততই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে থাকে। আমাদের প্রতিজ্ঞা ততই দৃঢ় হইতে লাগিল। পরস্পরকে চিঠি পত্র লেখা, আমরা পণ করিয়া বাংলায় চালাইতে লাগিলাম।

এই অন্তর-গূঢ় শক্তির স্ফুরণের পথ হইল বোধকরি হাতে লেখা মাসিক পত্রের মধ্য দিয়া। এই সংকল্প বোধহয় সর্ব্ব-প্রথমে গিরীন ভায়ার মস্তিষ্কে স্থান পাইল। তখন ভায়ার বয়স দশের বেশী নয়—যখন সচিত্র "শিশু" সম্পাদনের ভার সে স্বেচ্ছায় লইয়াছে।

এই কাগজ-খানিতে যে সকল কবিতা এবং উপন্যাস বাহির হইত তাহার কতক-কতক আজও আবৃত্তি করিয়া আমরা খুবই আনন্দ পাই। কবিতাগুলিতে সব চেয়ে বড় খাতির ছিল মিলের; যেমন, 'বাঁদরের' সহিত 'চাদরের' মিলই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, অতএব শিশুর কবি বাঁদরকে চাদর গায়ে দেওয়াইতে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না। বাঁদরের অপর একটি নাম রূপী---তখনি মিলের প্রয়োজনে সে টুপি পরিয়া বসিত। কবির কবিতা—এত'দিন পরে কেবলমাত্র স্মৃতি শক্তির অনুকম্পায় উদ্ধৃত করিতেছি—হয়ত' কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকিয়া গেল; আশা করি কবি ক্ষমা করিবেন; এবং গম্ভীর-মতি পাঠকগণেরও ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটিবে না। যথা:—

(১) বাঁদর,—বাঁদর!
ছিঁড়লি কেন চাদর?
বাঁদর---রূপী রূপী!
প'রেছিস্ কেন টুপি?
বাঁদর, বাঁদর---কেন, কেন'—
খেয়ে'ছস্ ফেণ?
ইত্যাদি

(২) রাম সিং ছটুকে
প'ড়লো ডোবায় পটুকে;
লোক রতনে
ক'রলে যতনে
রাম সিং গেল ম'রে! ইত্যাদি

এই প্রসঙ্গে একটি ইংরাজি রচনার কথা মনে পড়িল। আরো দশ-পনর বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীর ছেলে কেমন করিয়া ইংরাজিতে হাত পাকাইত ইহা তাহার একটি ভাল নিদর্শন :—

A lion killed a mouse,
Then went his house ;
Now cried his mother,
And therefore, cried his sister.

অল্পদিনের মধ্যে বাঙ্গালীর মনের ভাবান্তরের কথা ভাবিয়া দেখিলে খুসি হইয়া উঠিতে হয়।

শিশুর উপন্যাস এবং গল্প-গুলিতে কল্পনার জোয়ার-ভাটা খেলিত। রাজপুত্র অশ্বপৃষ্ঠে তীরের মত কিসের সন্ধানে ছুটিয়া ফিরিতেছেন—অবশেষে সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে, পাথরকে অশ্বত্থপাতা এবং সিংহকে মূষিক হইতে দেখিয়া একযোগে লেখক পাঠক এবং উপন্যাসের পাত্র মিত্র সবাই বিমোহিত হইয়া যাইত।

"শিশু" সম্পাদনের সব চেয়ে বড় তারিফ্ ছিল তাহার ঘড়ির কাঁটার মত নিয়মিত প্রকাশে। ভায়ার হাতখানি, যাহার নাম হইয়াছিল "শিশুপ্রেস" অবিরাম পরিশ্রম করিয়া কোনদিন ক্লান্ত হইয়া পড়িত না। যে তারিখে বাহির হইবার কথা বাহির হইবেই হইবে।

"শিশু"র জুবিলি সংখ্যার কথা মনে পড়ে। প্রচ্ছদপটে কুইন ভিক্টোরিয়ার ছবি—বহুবর্ণে চিত্রিত। অঙ্কনের কোন বাহাদুরি ছিল না; তবে অনুষ্ঠান এবং পারিপাট্যের কোন ত্রুটি নাই; ছবিখানির উপর পাতলা স্বচ্ছ কাগজ বসান, ছবির এক কোণে বিচিত্র ভঙ্গীতে চিত্রকরের নাম সহি—একেবারে যাহাকে বলে আপ-টু-ডেট্।

তখনকার দিনে এই সব কাজে উৎসাহ দিবার লোক ছিল না। গ্রাম্য স্কুলে সহরের চেয়ে ইংরাজির ধরণ ধারণের প্রচেষ্টা ছিল অতিরিক্ত; কাজেই স্কুলের শিক্ষক ছাত্র কেহই ইহাকে ভাল নজরে দেখিত না। বাড়ীতেও 'পড়ার ক্ষতি করা হয়'—এমন ভ্রূকুটি ছিল—তাই ভাবি, সে কিসের আকর্ষণে এই কাজ দুই ভায়ে করিতাম! কিছুদিনের জন্য অন্ততঃ আমিই ছিলাম 'শিশু'র একমাত্র পাঠক!

এই সময়ে দাদা, ছুটিতে বাড়ী আসিলেন রবীন্দ্রনাথের চৌকা সাইজের বিরাট কাব্য গ্রন্থখানি লইয়া। আমাদের আনন্দ আর ধরে না, কিন্তু প্রকাশ্যে পাঠ

করিবার সাহস ছিল না। লোকচক্ষুর অন্তরালে বসিয়া আমরা তাহা প্রায় কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলাম। কোন কোন দিন মাঠে বেড়াইতে গিয়া আমাদের প্রিয় কবিতাগুলি আবৃত্তি করিতাম:—শুনেছি শুনেছি কি নাম তাহার—শুনেছি শুনেছি তাহা! ইত্যাদি।

কাব্য-গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে আমাদের ভাবুকতা বাড়িয়া উঠিল। জ্যোৎস্না রাতে কবির সহিত আমরাও যেন 'নলিনীর' অকথিত বিরহ ব্যাথায় ব্যাকুল হইয়া উঠিতাম। প্রভাতের সৌন্দর্য্য আমাদের চক্ষে তাহার সকরুণ নবীনতায় ধরা পড়িয়া গেল। রাজবাড়ীর গোলাপ-বাগানে গিয়া—আমরাও প্রস্ফুটিত গোলাপের কাণে কাণে বলিতাম:—ও আমার গোলাপ-বালা, ও আমার গোলাপ-বালা:—

কবি হইতে হইলে বোধ ক'র প্রেমিক হওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্য-গ্রন্থ খানির ছিদ্রে আমাদের গৃহ-প্রবেশ করিয়া এই অহেতুক প্রেমের দীক্ষা আমাদের মনে দিয়াছিলেন। তখনো সাহিত্যের স্বাস্থ্য-রক্ষকের আমদানি হয় নাই; তাই যৌবনের উন্মেষে আমরা প্রেমিক হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, বাংলা লেখার কদরও তখন ছিল না—তাই আমাদের কবিতার কপ্‌চানি কাহারও কাণে পৌঁছিত না; কিন্তু সেকাল আর নাই, এখন প্রেমের পথে কড়া পাহারা বসিয়াছে!

এই সময় সাহিত্য-সেবায় শরতের কাছে আমরা বড় একটা বাচনিক উৎসাহ পাই নাই। আমরা জানিতাম, অতি সংগোপনে সে সাহিত্য সাধনা করিতেছে। আমরাও অতি গোপনে চর্চ্চা করিয়া যাইতেছিলাম। মনে হইত, হয়ত' একদিন সাগর-সঙ্গমে সকলের দেখা হইবে। সেই আনন্দময় দিনের কল্পনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিতাম।

কিন্তু আমাদের পরম বন্ধু ৺সতীশচন্দ্রের তীব্র আগ্রহে মধ্য-পথেই একদিন বাহিরে আসিতে হইয়াছিল। সতীশচন্দ্র পত্রে জানাইলেন যে তিনি 'আলো' বলিয়া হাতে লেখা মাসিক বাহির করিতে বদ্ধ-পরিকর। তাহাতে আমাদেরও লেখা থাকা চাই-চাই। এত বড় সুবর্ণ সুযোগকে বৃথা যাইতে দিই নাই, মনে হয়। কাগজ কলম লইয়া 'আলো'কে অধিকতর উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবার বাসনায়—অসহ্য আগ্রহভরে বসিয়া গেলাম। 'আলো'র প্রথম সংখ্যার পরই মৃত্যু বন্ধুবরের উপর তাহার নিদারুণ ঘন-ছায়া-পাত করিল। সেদিনের কথা মনে পড়ে, প্রাণের উপর বিরহ-ব্যথার তপ্ত ধারাটি!

এক বৎসর পরে কলিকাতায় বসিয়া বন্ধুর ইচ্ছাটিকে সঞ্জীবিত করিবার প্রয়াস আমাদের মধ্যে জাগিল। অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে 'আলো' নাম আর রাখা চলে না ; তাহার বদলে 'ছায়া' নাম দিয়া বন্ধুর স্মৃতি বহন করিব। বোধ করি আশ্বিনে আমরা 'ছায়া' বাহির করিলাম। এবার "শিশু প্রেসের" নূতন নাম করণ হইল—"ছায়া-প্রেস।" মা সরস্বতী গিরীন ভায়ার হাতে তাঁহার আশীর্ব্বাদের রাখি-বন্ধন করিলেন।

ক্রমশ



ডাকঘর

পৌষের কল্লোলে মহাপ্রাণ রলাঁ সম্বন্ধে ডাঃ কালিদাস নাগ মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ আছে। ইচ্ছা ছিল, এই সঙ্গে রলাঁর একখানি ছবি দিই, কিন্তু এর পূর্ব্বে কল্লোলেই রলাঁর একখানি ছবি প্রকাশিত হয়েছে এই ভেবে দেওয়া হ'ল না। রলাঁর আগের ছবিখানা বেরুবার পর তিনি কল্লোলের বন্ধুদের একখানি বেশ বড় ছবি পাঠিয়েছিলেন। তারই অপর দিকে বাংলাদেশের তরুণদের সম্ভাষণ ক'রে ফরাসী ভাষায় সুন্দর ক'টি কথা লিখে পাঠিয়েছিলেন। কালিদাস নাগ মহাশয়ের প্রবন্ধে সেই লেখাটির কতক বাংলায় তর্জ্জমা ক'রে দিয়েছেন; রলাঁর কাছ থেকে সুন্দর চিঠিখানি ও ছবির পিঠে এই লেখা সহ ফটোখানি পেয়ে অবধি মনের আনন্দকে ছাপিয়ে নিজেদের প্রতি চোখ পড়ল। সেই অবধি আমাদের জানা-শোনা তরুণ লেখক ও সাহিত্য অনুরাগী বন্ধুদের সঙ্গে যতই আলাপ হয়েছে যতই আলোচনা হয়েছে ততই মনে হয়েছে আমরা অধিকাংশই একটা মিথ্যা আত্ম-অহঙ্কারের বোঝা মাথায় ক'রে নিজেদের অনেক জিনিষ থেকে বঞ্চিত করছি।

রলাঁ বিদেশী, বহুদূরের লোক; পণ্ডিত, পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ও প্রেমিক মানব। তিনি যে ভাবে বাংলার তরুণদের ডাক দিলেন, আমরা নানা প্রকারে অনুপযুক্ত হয়েও সে ডাক উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও আনন্দের সঙ্গে শুনিনি। এ শোনা অন্তর দিয়ে। প্রথমত আমাদের মধ্যেও অনেকের কাছে তাঁর সঙ্গে এই সম্বন্ধটাকে অত্যন্ত সাধারণ জিনিষ বলে মনে হয়েছে। তার একটা কারণ বোধহয় তিনি দূরের লোক, এবং বিদেশে তাঁর জন্ম ব'লে। এখনকার বাংলা দেশে একটা দিকের মনোভাব, যে বিদেশ বা বিদেশী গর্ব্ব করতে পারে, আমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ হ'তে পারে এমন তাদের নিজস্ব কিছুই নাই। তাঁরা বলেন, এই সব ভিন্নদেশীয় মহাপুরুষেরা যা' চিন্তা করছেন, যে সব চিন্তার ধারা প্রকাশ করছেন, আমাদের দেশে তা' 'সব' বহুকাল আগে ভাবা হয়ে গেছে। সেই 'সব' জিনিষগুলি যে কি তা' অনেকেই জানি না। নিজের দেশ সম্বন্ধে, নিজের দেশের মহাত্মাদের সম্বন্ধে এ রকম একটা প্রীতি ও শ্রদ্ধা থাকা সর্ব্বতোভাবে

ভাল এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু যা' ছিল, তার খোঁজ আমরা জানি না। যেটুকু জানি বলি, তাও অনেকখানিটা পরের মুখে শুনে। নিজেদের কৃতিত্ব তার মধ্যে একটুও আছে কি না সন্দেহ। অধ্যয়ন, গবেষণা বা আলোচনা আমাদের অনেকের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি, এবং কোনও কালে হয়ত হবে না এও ঠিক্। সেই পূর্ব্বপুরুষদের শ্রেষ্ঠত্বকে ভাঙ্গিয়ে খাওয়া আমাদের স্বভাব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তাও কিছুই না জেনে শুনে। এ সব সত্বেও বাংলার তরুণরা অনেকেই নিজেদের যথেষ্ট জ্ঞানী মনে করি। সব চাইতে হাসির কথা, আমরা ক'টি গল্প লিখে মস্ত-বড় সাহিত্যিক হয়েছি ব'লে মনে করি। এ কথা হয় ত বাইরে অস্বীকার করতে পারি। কিন্তু সে বিনয়ের চাইতে বড় অপরাধ কিছু নাই। কারণ মিথ্যাকে আশ্রয় ক'রে সে বিনয়। এই বিনয়ের অন্তরালে আমাদের ধারণা থাকে আমরা সত্যই এক একজন 'কেষ্ট-কেটা' হয়েছি। এ রকম ভাব্তে আনন্দ আছে যথেষ্ট, জীবন জাগ্রত হবার সম্ভাবনাও থাক্তে পারে যথেষ্ট। কিন্তু ভাবাতেই যদি সব কিছুর সমাপ্তি হয় তাহলে নিজেকে এইভাবে খোসামুদী ক'রে আমাদের আমরা অকর্ম্মণ্য বই আর কিছুই করছি না। আমাদের আরও অহঙ্কার কর্ব্বার জিনিস হয়েছে, আমরা বিদেশীয় অনেক গ্রন্থকারের অনেক বই হয় ত পড়ে ফেলেছি। তার মধ্যেও অনেকগুলি ইংরাজীতে অনুবাদ। এই বইগুলি পড়েও আমাদের চিত্ত একটু গরম হয়ে উঠেছে। পড়াটা কোনও কারণেই দোষের নয় কিন্তু পড়ে গর্-হজম হওয়াটা দোষের। গর-হজম যেমন হওয়া অমনি সঙ্গে গরম হওটাও আপনি এসে স্বভাবে, ভাবে, ভাষায় বিষের মত ছড়িয়ে পড়ে। এই গরম হাওয়াটাই কর্ম্মক্ষেত্রের সকল অবস্থাতেই দোষনীয়। নিজেকে মারবার এমন আর আপাত-মধুর বিষ নাই। কতখানি বিনয়, কতখানি প্রাণের সরলতা, জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠদের প্রতি কতখানি শ্রদ্ধা অন্তরে থাকা প্রয়োজন সে খবর জানি কিন্তু মনে রাখি না। তার ফল হয়েছে এই যে দেশীয় বা বিদেশীয় বড় জিনিস বা মানুষকে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা করতে ভুলে যাচ্ছি। নিজে বড় হতে হ'লে যেটুকু নিরহঙ্কার হওয়া দরকার আমাদের অনেকের সেটুকু স্বভাবে নাই। সেইজন্যে আমরা শিখ্তেও পারি না কিছু। 'সব জানি' ভাবটা আমদের পক্ষে বিষম অনিষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিল না থাক্তে পারে, কিন্তু আমার নিজের মতের আমি যতখানি মূল্য দিই, অন্যের মতের প্রতি তার সিকিও দিতে আমরা নারাজ। 'হামবড়া' হওয়া ছাড়া ভাগ্যে এর চাইতে বেশী আর কিছু

জোটে না। 'হামবড়া' হওয়াতে বড় জ্বালা। নিজে জানছি আমি বড় অথচ কেউ মানে না আমি বড়্! এতে মনে বড় অভিমান আসে! অভিমান জাগায় পরের প্রতি ঈর্ষা, অশ্রদ্ধা। তার সঙ্গে সঙ্গে বিলাপ করি,—কেউ কিছু বোঝে না—অমুকে যা' লিখেছে তা' কিছুনা—অমুকে যা করেছে তা' বাজে ইত্যাদি প্রকারের ছোট কথা তখন মনে আসে, অনেক সময় বাইরে ব'লেও ফেলি। হ্যাঁ এটা ঠিক্, নিজের সম্বন্ধেও প্রত্যেক মানুষেরই একটা শ্রদ্ধা থাকা উচিত কিন্তু তারও একটা মাপ আছে, হিসেব আছে। ঠিক যতখানির আমি উপযুক্ত ঠিক ততখানির মতই আমাকে আমার জানা উচিত। অকারণে নিজেকে বাড়িয়ে তুল্‌লেই—হাত পা বা মুখ হয় ত বেড়ে যেতে পারে কিন্তু মনটি হয়ে যায় ক্রমশ অতি ছোট। মানুষের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যে আজীবন শিক্ষানবিশী করতে হয় এ রকম মন হ'লে তা' হবার আর কোনও সম্ভাবনা থাকে না।

নিজেরা—দল গড়ি, গণ্ডি পাকাই তাতে দোষ নাই, কিন্তু হীন অসারতা যেন তাকে আশ্রয় না করে। একটা পথ খোলা থাকা ভাল—যে পথ দিয়ে বাহির আমার অভ্যন্তরেকে সম্ভাষণ করতে পারে, আমিও অভ্যন্তরের বাহিরে বাহিরকে অভিবাদন করতে পারি। নিজেদের মধ্যে নিজেদের কেবল মিথ্যা চাটুবাদ দিয়ে ভুলিয়ে রাখার মত ছোট-হাওয়ার আর কোনও পথ নাই। আমরা যেমন মানুষ, আমাদের উপযুক্ত চাটুকারও জোটে অনেক। তাদের কাজ হচ্ছে—মিথ্যা'মথ্য সর্বক্ষণ অসার চাটুবাক্যে আমাদের তরুণ মনকে বিচলিত করা; সময়ে সময়ে বিজ্ঞের মত আমাদের পিঠে হাত বুলিয়ে, গলায় হাত জড়িয়ে তরুণকে অপ্যায়িত করা, তরুণদের উপর মুরুব্বিয়ানা করা। এই সব লোকের এতে প্রাপ্য কি তা' তারাই জানে। এ রকম করার একটা কারণ বোধহয় নিজের অক্ষমতাকে চোখঠেরে' সহজে প্রাপ্য লোকের উপর মোড়লগিরি। মাত্র ক' জন লোককে নিয়েও যদি এই ধরণের লোক দিন কাটায়, তাহলে তার মধ্যেও তার ভয়ের অবধি থাকে না। বুঝিবা হারাই একটিকে। তাই তার মধ্যেই একের অনুপস্থিতে অন্যটিকে সে ব্যক্তি খুব বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু প্রশংসা এমন জিনিস, অনেক বড়লোকই তাতে অভিভূত না হয়ে পারেন না তা' আমাদের মত ক্ষুদ্রদের ত কথাই নাই। বেশ বুঝতে পারছি এই লোকটি আমার বন্ধুকে নামিয়ে আমাকে বাড়াচ্ছে কিন্তু তবু ভাল লাগে। আমাকে যখন সে বলে, তোমার লেখা,

তোমার ভাষা—বাস্ ঐ পর্য্যন্ত বল্‌তেই আমার চোখ্‌ত উল্‌টে আসে, তার পর যা' বলে তা একেবারে—"কানের ভিতর দিয়া মরমে" মধুর মত "পশিয়া" যায়! মনে থাকেনা আমার কতটুকু প্রাপ্য কতখানি মিথ্যা প্রশংসা এ ব্যক্তি আমাকে করছে। অন্যায় করছে কি উচিত কাজ করছে সে কথাও আর লক্ষ্য থাকে না। কেবলই মনে হয়, আহা, এর মত সমজ্‌দার এ দুনিয়ায় নাই। এই আমার একান্ত আপন আর সব পর। যারা সত্যিকার ক'রে আমাকে দেখছে, যারা আমার প্রত্যেক পদক্ষেপ উন্মুখচিত্তে লক্ষ্য করছে, আমার প্রতি ক্ষুদ্র সার্থকতায় যাদের মন গর্ব্বে ও আনন্দে ভ'রে উঠ্‌ছে তাদের মনে হয় আমার পর। তারা হয়ত একবার কি দুবার ব'লে—বা! বেশ হয়েছে, এবার তোমার জয়! কিন্তু তাতে মন ভরে না। কেবলই মনে হয় আরও চাই, আরও শুন্‌তে চাই। যে আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সত্য মিথ্যায় জড়িয়ে তন্ময় ক'রে রাখে আমি তাকে চাই, তার কথা চাই। সে আমার মরমী, আমার দরদী। সে—যে মিথ্যা স্তোকবাক্যে আমার সর্ব্বনাশ করছে তা মনে হবারও কোনও অবসর ঘটে না। এই সব শক্তিহীন চাটুকাররাই আমাদের হামবড়া ক'রে তোলে।

তাই মনে হচ্ছিল, রলাঁর মত বিদেশী পণ্ডিতেরা, দার্শনিকেরা যে এসিয়া, ভারতবর্ষ বা বিশেষ ক'রে বাংলার দিকে চেয়ে বল্‌ছেন, তরুণ বাংলা, তোমাদের আমরা ভালবাসি। তোমরা আমাদের চিন্তার চক্ষু, তোমাদের কথা আমাদের শোনাও। তাঁদের ভালবাসা, তাঁদের দেওয়া এই সম্মান আমরা নিই কেমন ক'রে? অনুপযুক্ততা তাঁদের কাছে সর্ব্বদা মার্জ্জনাধীন অপরাধ কিন্তু তবু—? নিজেকে নিয়ে একলা থেকে কি কিছু শিখ্‌তে পারব। আমাদের মধ্যে এমন কারুর মনীষা বা প্রতিভা কি সমগ্র দেশকে, সমগ্রদেশের তরুণদের প্রকাশ করতে পারে?

দেশের কাজ শত রকমে শত ভাবে, সহস্ররকমের পদ্ধতিতে মানুষ করে। আমাদের দেশের কাজ হয় ত সাহিত্যক্ষেত্রে থেকে আমরা কিছুই করছি না। কিন্তু তবুও যে বাংলার তরুণ ব'লে যে আমাদের নাম—এই দেশ যে আমাদের পরিচয়। এই দেশ থেকে আমরা কি বলি সে কথারই যে দাম। আর সে দামেই আমার দাম। দেশের বাহিরের লোকের কাছে কোনও কথা বলি সে ক্ষমতা আমাদের নাই, কিন্তু নিজের কাছে, আপন দেশের মানুষের কাছে, কাছের পাশের লোকের কাছে আমরা কি বলি? কেমন ক'রে, কোন্ মুখে

আমরা তাদের শ্রদ্ধা, তাদের ভালবাসা আত্মসাৎ করি! জানি না কি এতখানি প্রাপ্য আমার নয়? তবু কোন্ অধিকারে মানুষের চিত্তের উপর আমাদের এই প্রবঞ্চনার প্রলোভন?

আমারই দেশের লোক আমাকে যতখানি ভাল বাস্‌ছে, আমার কাজের প্রশংসা করছে, আমার ভবিষ্যৎ পদক্ষেপটি উৎকণ্ঠার আশার প্রতীক্ষা করছে, তার উপযুক্তও কি হ'তে পারি না। মনে হয় পারি, কিন্তু একলা পারি না। যাদের জানি, যাদের জানি না তাদের সঙ্গ আমার প্রয়োজন। নিজের সাধনা বা প্রয়াসকে অন্যের জ্ঞান, অভিজ্ঞতার দ্বারা বিচার করা প্রয়োজন। প্রত্যেক মানুষের শিক্ষা থেকে শেখার জিনিস গ্রহণ করা আবশ্যক। কিন্তু সে সুযোগ পাই কেমন করে? মনে হয় বাংলার তরুণ সাহিত্যানুরাগী সকলের, মাঝে মাঝে মিলন হওয়া প্রয়োজন। এ মিলন শুধু মেশার খাতিরে নয়, অন্যের কাছে কিছু শুন্‌ব, জান্‌ব, শিখ্‌ব এই কামনা একান্তে পোষণ ক'রে শিক্ষার্থীর বিনয় নিয়ে আসা। এ রকম মিশলে আমার কার্য্যের বা অন্য কিছুর সমালোচনা হবেই অবশ্যম্ভাবী। সে জন্যও আমাকে প্রস্তুত থাক্‌তে হবে। আক্রমণ করবে কেউ আমাকে, সে ভয়ও থাক্‌তে পারে। কারণ সকল মানুষ সমান নয়। সকলের আলোচনা করার ধারা এক নয়। কিন্তু সে আক্রমণকে বীরের মতই প্রতিরোধ করতে হয়। আমি যে ধৈর্য্যের দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা অহেতুক আক্রমণকে ঠেকাতে পারি এ কথা আমার জানা থাকা চাই। এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনাই হ'তে পারে, কিন্তু এরকম একটা মিলনক্ষেত্র গ'ড়ে ওঠা অত্যন্ত প্রয়োজন হয়েছে। এই বৈঠকেই আমাদের লেখার সমালোচনা হ'তে পারে। আমার লেখা আমার কাছে যেমন লাগে অন্যের কাছেও তেমন লাগে কিনা তা এখানেই জানা যায়। আমার বিজ্ঞতার অন্তরালে কতখানি অজ্ঞতা থাক্‌তে পারে তা' যাচাই করার এই পথ। যাঁদের আমরা চিনি না, তাঁরাও এখানে আস্‌তে পারেন। এমন কি মফঃস্বলে যাঁরা একান্তে জুঁই ফুলের মতই ফুটে উঠে ঝরে পড়ছেন তাঁদের সঙ্গেও আমাদের পরিচয়ের সম্ভাবনা এইখান থেকেই হ'তে পারে। আমরা যে সবাই এক, নানা প্রকারের অবস্থার মধ্যে থেকেই এই সাহিত্য ক্ষেত্রে এক এবং আত্মীয় একথার মূল্য এইখানে। তাঁরা আমাদের, আমরা তাঁদের, লেখা আলোচনা ক'রে পরস্পরের উপকার করতে পারি। এই থেকে সার্ব্বজনীন্ মিলনক্ষেত্র সম্ভব হ'ল আমরা সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁরা অখ্যাত, অসুবিধায় আছেন,

তাঁদের সাহায্য করতে পারি। এমনও হ'তে পারে বাংলার তরুণ সাহিত্য অনুরাগীদের একটা বৃহৎকেন্দ্র হ'তে তাঁদের সমস্ত লেখাপত্রের পরিচালনা সম্ভব হ'তে পারে। পুস্তক প্রকাশকদের মধ্যে যাঁরা লেখকদের প্রতি অবিচার করেন তাঁদের সঙ্গে এই কেন্দ্র থেকে লড়তে পারি। এমনি ক'রে তরুণ বাংলা ব'লে যে সাহিত্যানুরাগীর অংশ, সে অংশটিকে সজীব ক'রে তুলতে পারি। দেশ বা বিদেশকে আমরা বলতে পারি, আমরা অতীতের ভাবধারাকে এইরূপে প্রবাহমান রেখেছি, এবং বর্ত্তমানের বিপর্যায় ও নূতন ধারাকে আমরা এই ভাবে রক্ষা ও সাধন করছি। এ রকম একটা প্রতিষ্ঠান কি সম্ভব নয়, প্রয়োজন নয়? আমি ত এইভাবে কিছুদিন থেকে ভাবছি, আমার এই চিন্তার মধ্যে ভুল-চুক থাকতে পারে, কিন্তু সে সব অতি সহজেই ঠিক হ'য়ে যেতে পারে। এ সম্বন্ধে বিশেষ পদ্ধতি যা' আমার মনে আছে, তা' প্রয়োজন মনে করলে একটি একটি ক'রে বলতে পারি। কিন্তু আগে জানতে হয়—এই রকম জিনিষের সার্থকতা আছে কিনা! আমি যে রকম মনোভাবের কথা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি, সে রকম মনের ভাব নিয়ে এই মিলনকে সম্ভব করতে পারলে আর কিছু না হোক, আমরা নিজেদের নিজেরা সরলভাবে বিচার করতে শিখব; এও একটা কম লাভের কথা নয়।

এবারে এইভাবে কথাগুলি বলেছি, কারুকে মনে ব্যথা দেবার জন্য নয়, কোনও ব্যক্তি বা দলবিশেষকে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করবার ইচ্ছা থেকে নয় এটা ঠিক। এ সত্য বলবার মত সাহস আছে। মোট কথা আমরা আমাদের নিজেরাই খর্ব্ব ও অপরিণত ক'রে রাখছি। তাতে আমরা মনে-বাইরে জরাজীর্ণ তেজহীন, সামর্থ্য ও উদ্দেশ্যহীন। যাঁরা নিজেদের আমার মত ক'রে মনে করেন তাঁদেরই কাছে আমার এই নিবেদন। যাঁরা এ সকল দুর্ব্বলতার অতীত বা উপরে তাঁদের কাছেও আমাদের এই নিবেদন। সংসারে আমরা ভাঙ্গতে পারি অনেক-কিছু কিন্তু গড়তে পারি কতটুকু। এই গড়ার মূলে আমি নিজেকে গড়ে তোলার কথাই বেশী ক'রে মনে করছি। যাঁরা সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি রক্ষা করছেন, এবং যাঁরা এই সৃষ্টির প্রসাদ লাভ করতে চান, সকলের কাছেই এবারের এই কথা কয়টি উত্থাপন করলাম। এ বিষয়ে আলোচনা কাগজে পত্রে লেখালেখি হউক সে রকম ভাবে কোনও আলোচনা আহ্বান করছি না। যাঁরা এ বিষয়ে চিন্তা করছেন বা করবেন—এমত ক'জনে কোথাও এক সঙ্গে ব'সে এ বিষয়ে আলোচনা করলে বেশী ফল হবে ব'লে আমার ধারণা। নিজের ধারণার কথা

বলায় অজ্ঞতা প্রকাশ পাবার ভয় আমার নাই ; আশা করি এজন্যও আমার সকল ত্রুটি সকলে মার্জ্জনা করবেন।

পোষাকের দাম

বিজয় সেন গুপ্ত

ঐতিহাসিকদের সময়ে সময়ে বড় ভুল হয়ে থাকে। তাঁরা আমাদের রাজা মোরাসের কাহিনী বলে গেছেন বটে, কিন্তু তাঁর রাজত্ব যে কোথায় ছিল সে-কথা বলেন নি। যাই হোক, তার সঙ্গে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা, যারা বিশ্বাস করতে চায়, করুক না কেন। ঠিক সে ব্যাপারটা কি, সেই কথাই আমি বলব।

একদিন বিকালে রাজা মোরাসের রাজকার্য্য শেষ হল ; রাজকার্য্য আর কিছুই নয়, কেবল মন্ত্রীর সুর-করে-পড়া শ'ত্তরখানা কাগজে নাম সই করা। মহারাজ চোখ বন্ধ করে এই সকল অপরিহার্য্য কাগজগুলি অনুগ্রহ করে শুনলেন শেষ পর্য্যন্ত। তার মধ্যে ছিল কতকগুলা নতুন লোককে কাজে বাহাল করার কথা, গোটাকয়েক মৃত্যুদণ্ডের আদেশ, এমনি আরো দু'একটা ছোটখাটো ব্যাপার। শুনতে-শুনতে তিনি মাঝে-মাঝে হাই তুলছিলেন। শেষে মন্ত্রী বললেন,—আমাদের কাজ শেষ হয়েছে—বলে রাজার নামাঙ্কিত মোহরটা পকেটে রাখলেন আর কাগজ-পত্র সব বগলে পুরে ফেললেন।

রাজা বললেন,—নারকিজ্, একটু অপেক্ষা কর ; একখানা শাদা কাগজে মৃত্যুদণ্ডের আজ্ঞা লিখে আমায় দাও, কারো নাম থাকবে না তাতে। তারপর মোহরটার ছাপ মেরে আমাকে দাও, আমি নাম সই করে দিচ্ছি।

মন্ত্রী অবাক হয়ে বললেন,—নাম থাকবে না কারো ?

—আমি জানতে চাই তোমার এতে কি আপত্তি থাকতে পারে ? বোধহয় তোমার মনে আছে যে, তুমি আমার মন্ত্রী এবং মোহর কোথায় দিতে হবে সেটা জানাও তোমার কাজ। তুমি দিন-দিন বড় ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছ, নারকিজ্!

—মহারাজ! মহারাজ, একি কথা! আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভূপতির দীনভৃত্য।

রাজা মোরাস্ অনুগ্রহভরে পিঠ চাপড়ে তাকে অভয় দিলেন; তারপর কাগজখানা নিয়ে তাঁর সোণার কোটের ভিতর-পকেটে রেখে দিলেন।

—শোনো বৃদ্ধ, আমি তোমাকে গোপনে বলচি, এ মৃত্যুদণ্ডের আদেশ নিয়ে কি করব।

মৃদুস্বরে নার্‌কিজ্ বল্লেন,—মহারাজের অসীম দয়া!

—আমি পরমা সুন্দরী নারীর অনুগ্রহ পেতে চাই,—সে-ই আমার কাছে এই সামান্য জিনিষটা চেয়েচে। বুঝতেই পার, আমি এই সামান্য জিনিষ তাকে না দিয়ে পারি নে।

—মহারাজের দয়ার শেষ নেই!

—নার্‌কিজ্, আমি বোকা নই। মুস্কিল এই যে, এই মেয়েটির নিজের কোনো ক্ষমতাই নেই,—তার স্বামী রয়েচে। আমার ক্ষমতা পেলেই সে স্বামীর কাছ থেকে আপনাকে মুক্ত করে নেবে। কিন্তু নার্‌কিজ্, বুঝলে, এর একটা কথাও যেন কারো কাছে বলে ফেলো না—

প্রশংসায় গদ্‌গদ্ হয়ে নার্‌কিজ্ বললে,—কিন্তু প্রাণবধের চেয়ে চুম্বন ঢের মধুর।

—ঠিক বলেচ! আমি এখন তার কাছে এই কাগজখানা নিয়ে যাচ্চি, কেননা, রাজ-অনুগ্রহ কখনো নিস্ফল হয় না। এই মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা রাজত্বের সোণার বইতে লিখে রাখ। কাল তোমাকে জমীর খাজনা হিসাব করা সম্বন্ধে যা বলেছিলাম লেখা হয়েচে তো?

—নিশ্চয়ই মহারাজ!

—পড়তো কি রকম শোনায়।

মন্ত্রী সোণার বইখানা খুলে শেষের দু' এক ছত্র পড়লেন,—যে মালী গাছকে প্রায়ই ছেঁটে রাখে, ভালো রাজাও ঠিক তারি মতো।

—খাসা হয়েচে,—বলে রাজা তাঁর 'ফেজ' মাথায় দিলেন; দিয়ে তিনি চললেন পুণ্যতোয়া নীলনদের ধারে তাঁর যে নিজের একটা বাগান আছে, সেই দিকে। সে বাগানে কারো প্রবেশের হুকুম ছিল না।

যে সমস্ত ভৃত্য আর পরিষদদের সঙ্গে তাঁর দেখা হল পথে, তারা সকলেই অ-ভূমি প্রণাম করে বললে,—প্রবল পরাক্রান্ত রাজা মোরাস্‌কে আমরা অভিবাদন জানাচ্চি। তাঁর উজ্জ্বল সোণার পোষাকে সকলের চোখে ধাঁধা লেগে গেল এবং তাঁর গর্ব্বিত পদক্ষেপে ধরণী কেঁপে উঠল। রাজার মনের কথাটা যেন বুঝতে পেরে

নাইটিঙ্গেল প্রেমের গান গাইতে সুরু করলে। শাদা লিলি ফুলগুলি মাথা নত করলে। গোলাপ তাঁর চলার পথে নিজের সুগন্ধে-ভরা পাপড়ি গুলি ছড়িয়ে দিলে; 'আজেলিয়া' গুলি কার যেন নাম চুপি চুপি বললে;—সে নাম রাজার নয়, সে নাম মনোমহিণী ফ্লোরিলার, নার্কিজের স্ত্রীর পূর্ব্বপক্ষের মেয়ে। প্রাসাদের সবাই অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, মহারাজ কোথায় চলেছেন; মন্ত্রী ছেলের কাণে-কাণে বললেন,—উনি কোনো হতভাগ্যের মাথা পকেটে করে নিয়ে যাচ্ছেন।

রোগাস্ ভয় পেয়ে নিজের মাথায় হাত দিয়ে দেখলে। দেখলে সেটা ঠিক আগের মতোই আছে, দুই কাঁধের মধ্যে গর্দ্দানের ওপর।

বাগানের দরজায় যে প্রহরী দাঁড়িয়ে ছিল, সে তখনি তাকে বললে,—তোমাকে এক থলি স্বর্ণ মুদ্রা দিচ্ছি। আমার সঙ্গে তোমার পোষাক বদল করে আমায় বাগানে ঢুকতে দাও।

প্রহরী রাজী হল না। বললে,—আমি পারব না, রাজা ফিরে এলে আমার আর মাথা থাকবে না

রোগাস্ বললে,—তুমি একটা গাধা। রাজা যতক্ষণ না ফেরেন, ততক্ষণ তো তোমায় মারতে পারবেন না; কিন্তু আমার কথা না শুনলে আমি এখুনি তোমায় মেরে ফেলব। কাজেই বুঝতে পারচ, তুমি সময়ও পাবে, অর্থও পাবে।

প্রহরী রাজী হল। রোগাসের অনেক দিন থেকে একটা সন্দেহ ছিল, তাই সে প্রহরীর বেশে রাজাকে অনুসরণ করলে। তারও সম্মুখে লিলিরা মাথা নত করলে। গোলাপগুলি সুগন্ধী পাপড়ী ছড়িয়ে দিলে; 'আজেলিয়া' চুপি চুপি বললে,—ফ্লোরিলা! কিন্তু রোগাস্ তাদের পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে গেল। বাগানের মধ্যেকার একটা গুপ্ত দরজা দিয়ে নীল-নদের তীরবর্ত্তী প্রমোদ-নিবাস গুলিতে পৌছানো যায়; এই দরজার চাবি থাকে রাজার কাছে। এই সব প্রমোদ-নিবাসের মধ্যে একখানি বাড়ী ছিল রোগাসের; এটা রাজা গেল গ্রীষ্মকালে তৈরী করে তাঁর এই বিশস্ত ভৃত্যকে উপহার দিয়েছিলেন। তেমনি ঠিক এক বছর আগে মন্ত্রী সোমার বইতে লিখে রেখেছিলেন যে, রাজার অনুগ্রহ নিস্ফলা হয় না।

রাজা বাগানের দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন। রোগাস্ রাজাকে অনুসরণ করে চলল।

নদীর তীরে গভীর নীরবতা, এমন কি কলধ্বনিও নীরব। ঘনায়মান সন্ধ্যার আলোকে নীলনদের স্রোতখানি বাঁকা তলোয়ারের মতো দেখাচ্ছিল।

রোগাসের বাড়ীতে পৌছে রাজা একটী রূপার বাঁশি বার করে তিনবার ফুঁ দিলেন। সেই শব্দে একটী তরুণী অলিন্দে দেখা দিল। তার সম্বন্ধে এইটুকু বললেই হবে যে, সে সময়কার শিল্পীরা মডেলের জন্যে তার চেয়ে সুগঠিত মুখ আর পায়নি।

নিম্নস্বরে রাজা ডাকলেন,—ফ্লোরিলা।

ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে রোগাস্ সব শুনতে লাগল। অনেক দিন থেকে সে ঠিক এই সন্দেহই করেছিল।

ফ্লোরিয়া উত্তর দিলে,—এই যে, মহারাজ।

—স্বর্গে প্রবেশের অনুমতি পাব কি?

—জিজ্ঞাসা কেন করচেন? রাজার কাজ হুকুম দেওয়া

—তোমার স্বামীকে আমি রাজসভায় কাজে ব্যস্ত রেখে এসেচি, সে হঠাৎ এসে পড়তে পারবে না। তার দিনও বোধ হয় ঘনিয়ে এসেচে। এই তার মৃত্যুদণ্ডের হুকুম নামা।

—মন্ত্রীর মোহর দেওয়া?

—নিশ্চয়ই।

রোগাস্ ভাবলে,—বাবার এ নীচ চাতুরী।

চুপি চুপি ফ্লোরিলা বললে,—আমার কাছে ওটা এক ঘণ্টা পরে নিয়ে আসবেন। একঘণ্টার মধ্যে আমি সমস্ত দাসাদের ঘুমোতে পাঠিয়ে দেব।

যে রাজা প্রেমে পড়েছেন, তাঁর কাছে একঘণ্টা অত্যন্ত দীর্ঘকাল। বিকালটাও অত্যন্ত গরম; মাটী থেকে তাপ উঠছিল। বাতাস নেই, নদীর জলও দর্পণের মতো মসৃণ। একটা গর্ব্বিত মৌমাছি গোলাপের ওপর এসে বসল।

জলের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ রাজার একটা খেয়াল জাগল। রাজার খেয়াল, সুতরাং—। রোগাস্ যে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল, তার কাছে বসে তিনি তাঁর হলুদ রঙের জুতা খুলে ফেললেন; বেগুণী রঙের গায়ের কাপড় এবং হীরার বোতাম বসানো সোনালি বর্ণের কুর্ত্তিও একে একে খুলে রেখে দিলেন। রূপার বাঁশিটী বার করলেন; তারপর এমনি করে একটীর পর একটী তাঁর বহুমূল্য রাজ-বেশ সব খুলে নরম ঘাসের ওপর রেখে দিয়ে প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি চারিদিকে চেয়ে দেখলেন। জন মানবের চিহ্ন নেই। পবিত্র নন্দনের এই নিষিদ্ধ অংশে কেই বা অনধিকার প্রবেশ করতে আসবে?

দর্পণের মতো জলই কেবল নির্লজ্জের মতো তাঁর দিকে চেয়ে আপন বুকে তাঁকে প্রতিবিম্বিত করলে। মোরাস্ জলে ঝাঁপ দিতেই জলরাশি তোষামোদ-ছলে তাঁর সারা উত্তপ্ত দেহখানিকে চুম্বন করলে। তাঁর ভারী ভালো লাগল। দ্রাক্ষলতা ঝড়িত গাছগুলি সেখানে একটা দেওয়ালের সৃষ্টি করেছিল; তারি আড়ালে তিনি চকচকে পাথরের নুড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে চললেন।

বহুক্ষণ ধীরে স্নান করার পর যখন প্রণয়িণীর সঙ্গে মিলনের সময় হয়ে এল, তিনি জল থেকে উঠে এসে পরিচ্ছদের সন্ধানে চলে গেলেন, প্রথম ঝোপের আড়ালে না পেয়ে মনে করলেন, বোধহয় ভুল হয়েচে; তাই তিনি চ'ললেন পরের ঝোপটার কাছে। কিন্তু রাজবেশের কোথাও চিহ্ন নেই। তিনি তখন প্রত্যেক ঝোপে সন্ধান সুরু করলেন, শেষে নদীতীরে প্রত্যেক অংশ খুঁজে দেখলেন; কিন্তু কোনো ফল হল না।

কোথায় আমার পরিচ্ছদ? কে চুরি করচে? মানুষে কখনোই নয়। শুনচ পৃথিবী, তুমি যদি গিলে ফেলে থাক, আমি আমার রাজ্যের যত গাছ, যত ঘাস সব উপড়ে ফেলব তা হলে।

মাটীতে পড়ে তিনি কান্না জুড়ে দিলেন। শেষে লাফিয়ে উঠে চাঁদকে উদ্দেশ্য করে বললেন,—এই বুড়ো নিশালোক, আরো জোরে জ্বল্‌না! নইলে তোর মন্দির গুঁড়ো করে দেব।

কিন্তু চাঁদ শুনলে না; সে যেন ভয়-পাওয়া মেয়ের মতো মেঘের আড়ালে আপনাকে গোপন করলে। বৃথা হল। ধূলা এবং গাছথেকে ঝরা জল তাঁকে একেবারে বিশ্রী করে দিল। নিরুপায় হয়ে তিনি ভাবলেন প্রাসাদে ফিরে নতুন পোষাক পরে ফের আসবেন। প্রহরীরা তাঁকে এই অবস্থার দেখে ফেলবে;—এ লজ্জা তাঁকে সইতেই হবে; অবশ্য তার উপায়ও তাঁর জানা আছে। তিনি তাদের সব কেটে উড়িয়ে দেবেন, কাজেই এ নিয়ে পরিহাস করার অবসরই পাবে না তারা।

তাড়াতাড়ি তিনি চললেন সেই গুপ্ত-দরজার দিকে। দরজা বন্ধ। তাঁর মনে পড়ল তিনি চাবি সঙ্গে নিয়ে যাননি। নদীর ধার দিয়ে এস দক্ষিণ দুয়ার পার হয়ে বহু রাস্তার মধ্যে দিয়ে প্রসাদে ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। প্রজারা তাঁকে এই অবস্থায় দেখলে কতই না হাসির গান রচনা করবে! সৌভাগ্য-ক্রমে কেউ কিন্তু তাঁকে দেখল না, পথে লোক মোটেই ছিল না। কেবল মন্দিরের দ্বারে একজন ভিখারী ঘুমিয়ে ছিল। রাজা তার ঘুম ভাঙিয়ে বললেন,—তোমার গায়ের কাপড়টা আমাকে দাও।

ভিখারী ভয় পেয়ে তাঁকে বেত দিয়ে আঘাত করে বললে, বেরিয়ে যা; না গেলে মেরে গুড়ো করে ফেলব।

রাজা বুঝলেন ভিখারীর জোর তাঁর চেয়ে বেশী; তাই তিনি দ্রুতপদে চলে গেলেন। একদল ক্ষুধিত কুকুর চীৎকার করতে করতে তাঁর পিছু নিলে। প্রহরী দ্বারে ঘুমাচ্ছিল, এমন সময় কে তার পিঠে আঘাত করলে; সে বলে উঠল্—এই কে তুই? কি চাস?

—আমাকে ঢুকতে দাও, তোমার গায়ের কাপড়খানা দাও।

প্রহরী ভাবলে এ বুঝি বিদ্রুপ। সে প্রথমে একটু অপ্রস্তুত হয়ে শেষে হেসে বললে,—এই তোর চাই? ভিক্ষুকশালা এখান থেকে অনেক দূর মনে করে দুঃখু হচ্চে।

রাজা রেগে বললেন,—আমার হুকুম তুমি মানতে বাধ্য!

রাজার অবিন্যস্ত চুল আর রক্ত-মাখা-পা-ওয়ালা কিম্ভূত চেহারার দিকে সে বর্শাখানা লক্ষ্য করে বললে,—বেরিয়ে যা।

না।

—আমি রাজা।

—না, আহাম্মক! যা বেরিয়ে যা! আমার ভারী ঘুম না পেলে তোকে রাজার নাম নিয়ে খেলা করবার জন্যে আচ্ছা করে ঘা কতক দিয়ে দিতাম।

রাজা মোবাস্ তখন বোঝাতে লাগলেন। তাঁর মনে পড়ল যে, ছোটলোকদের এইরকম ব্যবহার করতে হয়।

—শোন বাপু, আজ রাতে আমি নদীতে স্নান করতে নেমেছিলাম, আমার কাপড় কে চুরি করে নিয়ে গেছে আমি হলপ করে বলচি, আমিই রাজা মোরাস্।

প্রহরী জবাব দিল, উজবুক।

বিষণ্ণ হয়ে দেওয়ালের ধার দিয়ে-দিয়ে গুঁড়ি মেরে রাজা ফিরে চললেন তাঁর প্রিয়তমার ভবনের উদ্দেশে। তিনি ভাবলেন, সেখানে গিয়ে দরজায় আঘাত করে কাপড় চাইবেন। মনে মনে তিনি আরো প্রতিজ্ঞা করলেন, একবার কাপড় পেলে হয়, সমস্ত সহরকে একেবারে পুড়িয়ে ছাই করে দেবেন।

পোষাক? আচ্ছা রাজার কি আর কিছুই নেই? কেবল কি তার পরিচ্ছদেরই দাম? নিজে সে কিছুই নয়?...

তারপর তিনি সেই ভিখারীকে দেখতে পেলেন। অকর্ম্মা বুড়া উঠে বসে অপেক্ষা করছিল কখন মদের দোকান খুলবে বলে।

রাজা বললেন,—তোমার গায়ের কাপড়টা আমায় দাও।

তাচ্ছিল্যসূচক ভঙ্গীতে ভিখারী জবাব দিলে,—তোমার নিজেকে কি এই অবস্থায় খুব ভালো দেখাচ্চে মনে করেচ? কাপড়-চোপড়গুলো সব কোথায় বাঁধা দিলে বাপু? বাস্তবিক, মদওয়ালাদের জ্বালায় আর বাঁচবার জো নেই! আমি রাজা হলে সবাইকে ফাঁসি কাঠে চড়তে হ'ত!

—আমিও ঠিক তাই করব যদি তুমি তোমার গায়ের গায়ের কাপড়খানি দাও।

—আমার কাছে জোচ্চুরি করতে এসেচিস। বদমায়েস কোথাকার।

—আমি রাজা।

ভিখারী অবাক হয়ে চাইলে।

—তুমি কি স্বর্ণমুদ্রায় আমার নাম আঁকা দেখনি?

—আমি! আমি জন্মে সোণার টাকা চোখেই দেখিনি,—বলে সে গায়ের কাপড়খানা রাজাকে দিয়ে দিলে।

এখন আর তাঁর প্রাসাদে যাবার কোনো বাধা রইল না। যদিও তখন খুব সকাল, তবু সদর দরজায় অনেক লোক জমা হয়েচে। তারা সবাই চুপিচুপি কথা বলছিল। রাজা তাঁর অনুগত ভৃত্যদের দেখতে পেলেন। তারা কিন্তু তাঁকে যেন চিনলেই না; পাছে তাঁর নোংরা গাত্রাবরণ তাদের চমৎকার পোষাকের সঙ্গে লেগে যায়, এই ভয়ে তারা সরে গেল। রাজা দরজায় মুষ্ট্যাঘাত করলেন।

—খোল, আমি রাজার নামে হুকুম করচি।

দ্বারের প্রহরী হেসে বললে,—তোমরা কি আমায় চিনতে পারচ না? আমার প্রিয় প্রজাবৃন্দ, একবার আমার দিকে চেয়ে দেখ দেখি! আমিই তোমাদের রাজা।

উত্তরে কেবল একটা হাসির রব উঠল।

—কাবুল, তুমি চুপ করে রইলে যে! আমি তো মাত্র গেল-হপ্তায় তোমাকে প্রচুর অর্থ দিয়েচি! আর তুমি—নাইলাস্ তোমাকে আমি দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার করেচি; তুমিও ও কি আমায় চিনবে না?

কাবুল বা নাইলাস্ কেউই রাজাকে চিনতে পারলে না।

চটে গিয়ে তিনি বললেন,—অকৃতজ্ঞ! সে কোথায়—ফ্লোরিলা? সে নিশ্চয়ই আমাকে চিনবে।

এই সময়ে রাজার নকীব ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। তার উন্নত বর্শার ওপর গাঁথা ছিল একটি ছিন্ন মাথা,—সে মাথা ফ্লোরিলার।

আর সে তাঁকে চিনবে কি করে? সে যে চিরদিনের জন্যে নীরব হয়ে গেছে! তার দীর্ঘ স্বর্ণাভ চুল তার সুন্দর মুখখানির চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাতে দীর্ঘ বর্ষারও খানিকটা ঢেকে দিয়েছিল। সমবেত লোকেরা আনন্দে কোলাহল করে উঠল। রাজা দুঃখিত হয়ে জানতে চাইলেন কে এ কাজ করেছে। উত্তর কেউ দিলে না বটে, কিন্তু তিনি নিজেই দেখতে পেলেন তখনি। নকীব একটী রাজ-ঘোষণা পাঠ করে সেটাকে পেরেক দিয়ে দরজায় এঁটে দিলে যাতে সবাই দেখতে পায় যে, তাতে মন্ত্রীর মোহর দেওয়া আছে। রাজা মোবাস্ নিজের কপাল টিপে ধরে মনে-মনে বললেন,—বোধহয় আমি রাজা মোবাস্ নই।

জনতা বেড়ে উঠল। যত 'নাইট' আর সম্ভ্রান্ত মহিলারা বেরিয়ে এলেন সেই সুগঠিত মাথাটী দেখতে, যা আর কখনো ঈর্ষা বা প্রেম জাগাতে পারবে না। সেই ভিখারিও এল। রাজার সঙ্গে কেবল সে-ই কথা কইলে, আর কেউ না

বললে,—চলে এস এখান থেকে! নইলে সবাই তোমাকে মেরে তাড়িয়ে দেবে, আর আমি তোমাকে যে-কাপড়খানা দিয়েচি তা-ও কেড়ে নেবে।

ভিখারী তাঁকে হাত ধরে নিয়ে চলল, তাঁর নিজের ইচ্ছাশক্তি সব যেন হারিয়ে গেছে।

কিছু দূর গিয়ে নাবৃকিজের দেখা পেয়ে আবার তাঁর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মন্ত্রী তখন বগলে একগাদা কাগজ নিয়ে রাজার কাছে চলেছিলেন। রাজা ছুটে গিয়ে তার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন,—নাবৃকিজ্ তোমার দেখা পেয়ে বেঁচে গেলাম!

মন্ত্রী দারুণ বিপত্তিতে পড়ে জোর করে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বললেন,—কোথাকার নির্লজ্জ তুমি হে?

— আমাকে চিনতে পারচ না? আমি রাজা।

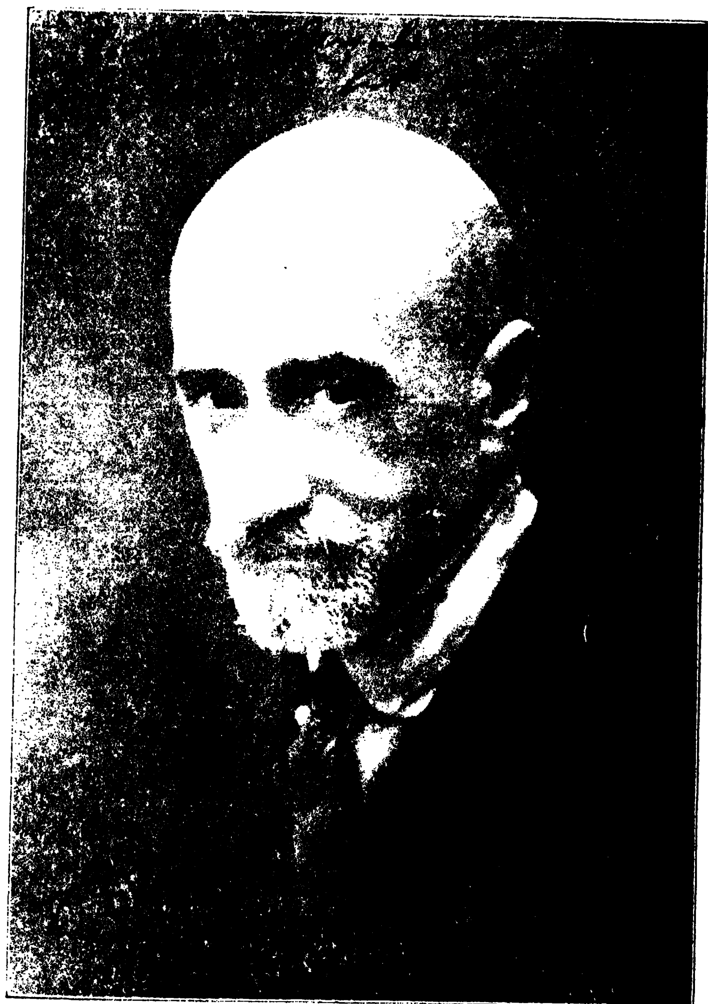
হেসে উঠে মন্ত্রী বললেন,—অসম্ভব! তোমাকে দেখতে অনেকটা তাঁরি মতো বটে, তবে তোমার গলাটা অত্যন্ত ভাঙা,—বলে নিজের জন্মদিন উপলক্ষে রাজার-দেওয়া সোণা-মোড়া ছড়িটী দিয়ে তাঁর পিঠে একটী মৃদু আঘাত করে চলে গেলেন।

প্রাসাদে প্রবেশ করলেন মন্ত্রী; খুব প্রফুল্লমনে। ভৃত্যেরা তাঁর আগে আগে চলল দ্বার খুলে দেবে বলে, শেষে তিনি এসে পৌঁছালেন যেখানে রাজা —বোগাস্—অপেক্ষা করছিলেন।

বোগাস্ তাঁকে সব ব্যাপার খুলে বললে' কেমন করে সে ফ্লোরিলা আর রাজার গুপ্ত-কথা শুনেছিল, কেমন করে রাজপরিচ্ছদ পরেছিল আর নামহীন মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানায় ফ্লোরিলার নাম লিখে দিয়েছিল।

এর পরে কি হল সে-কথা ঐতিহাসিকেরা লিখে গেছেন, তবে আর আমি তা' পুনরাবৃত্ত করতে যাচ্চিনা। তবে সেটা আমি নিজে বিশ্বাস করি না। *

* হাঙ্গেরীয় লেখক Koloman Mikszath হইতে।



জেসিন্তো বেনাভান্তে



তৃতীয় বর্ষ

দশম সংখ্যা

মাঘ, সন ১৩৩২ সাল

প্রতি সংখ্যা চারি আনা

মাশুলসহ বার্ষিক তিন টাকা আট আনা

সম্পাদক—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

কল্লোল পাবলিশিং হাউস

২৭ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১০ম সংখ্যা
তৃতীয় বর্ষ



মাঘ
১৩৩২

দেবী হয়ে ছিনু বটে

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

দেবী হয়ে ছিনু বটে একেবারে চিত্রপটে
তুলি দিয়ে আঁকা—
নয়ন নিমেষ হীন, হাসি ওষ্ঠ-পুটে লীন,
অমাশেষ নিশীথের নিদ্রাময়ী রাকা!

নিশ্বাস পড়িত কিনা আর কেহ আমি বিনা,
পারে নি জানিতে,
শুদ্ধবাণী, বীণা তার, মূক কিম্বা মৌনতার
অভিনয়, পারো নাই কভু বুঝে নিতে!

মাণিকের দীপ মনে, জ্বলে কিনা কোনো কোণে
ভাবো নাই কভু,
সে মূরতি শান্ত ধীর, স্নিগ্ধ শ্যামা যামিনীর
প্রতিমা মহিমাময়ী, হায় কিন্তু তবু

সে তো লাগে নাই ভালো, তুমি চেয়েছিলে আলো
হাসি আর গান,
রূপে অপরূপ করি, দেহ আর চিত্ত ভরি
সঞ্জীবনী মন্ত্র ভরা উতলা পরাণ
দেবী পেয়েছিল ফুল, অসীমের এক চুল
আলো দিয়ে আঁকা,
দেবী পেয়েছিল গান মরালের অভিযান
মানসের অভিমুখে মেলে দিয়ে পাখা !
আরতির পঞ্চদীপ পূজার কমল নীপ,
বিহগ বৈতালি,
সুরভি পসরা-বহা কোকিলের মন্ত্র-কহা
মলয়জ স্পর্শ ভরা সমীর মিতালি !
হায়, গেল মধুমাস ফুরাল হেমন্ত রাস
ফুল আর পাখী,
গেল আলো গেল হাসি, পড়ে নির্ম্মাল্যের রাশি
মন্দিরে বিজন ব্যথা, আজ শুধু বাকী !
গেছে ঋক্ নাই সাম, নয়নের অভিরাম
আরতির আলো,
বেদী আজ ধূলি লীন, দেবী যে মাধুরী হীন
রাত দিন, দুইতার সম ভাবে কালো !
নারী হয়ে বেঁচে থাকা, নারী বলে বুকে রাখা,
চলা পাশে নিয়ে,
সমানের অধিকার, তাহার অধিক আর
ভার শুধু, মিছে কথা গড়িয়ে বানিয়ে !
কাঠ খড় প্রতিমার, গড়ে তোলা সুষমার
শেষ বিসর্জ্জন,
জলাঞ্জলি সেথা সব, দুদিনেই নিরুৎসব
প্রাণ বাঁচে, মিটে গেলে সব আয়োজন।

এক টুকরো

গল্প

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পথে সেদিন চোখের সামনে এক ট্যাক্সিওয়ালা তীরের মত গাড়ী ছুটাইয়া আসিয়া এক গরিব কুলিকে চাপা দিয়া মারে,—চোখে এই ব্যাপার দেখিয়াছিলাম। তারি ফলে পুলিশ-কোর্টে সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলাম।

মামলা আসিল বেঞ্চ-কোর্টে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও বেঞ্চ-ঘরে আসিয়া বসিলাম। এজলাসে এক হাকিম বসিয়া 'পেটি-কেশ' করিতেছিলেন। এজলাস-ঘরে যেন গাজনের ভিড় লাগিয়াছিল। একদিকে লাল-পাগড়ীর দল কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে—অপর দিকে একটা খাঁচার মধ্যে পঞ্চাশজন হতভাগাকে পুরিয়া দেওয়া হইয়াছে; এক-একটা নাম ডাকা হইতেছে, আর জরিমানার কোপ পড়িতেছে। ছেলেবেলায় হাতে মাথা-কাটার গল্প শুনিয়াছিলাম। এ যেন তাই! ঘরে গোলমালের অন্ত নাই। হাকিম রক্ত নেত্রে এক-একবার চাহিয়া দেখিতেছেন, অমনি লাল-পাগড়ীর দল 'চোপ্-চোপ্' রব তুলিতেছে।

বে-লাইন দু' টাকা, মাতোয়ালা পাঁচটাকা, ফেরিওলা একটাকা—এমনি হারে জরিমানা চলিয়াছে। হতভম্বের মত দেখিতেছিলাম। বিচারের নামে এ যেন একটা প্রকাণ্ড পরিহাস চলিয়াছে!

হঠাৎ নাম ডাকা হইল চামেলি, আর সন্তোষকুমার দত্ত। খাঁচার মধ্যে পুলিশ তখনি এক অবগুণ্ঠনবতী নারীকে ও এক চোয়াড়ে-গোছ ছোকরাকে ঠেলিয়া পুরিয়া দিল। ছোকরাটার নাম সন্তোষ হইলে কি হয়, তার মাথার চুলকাটার ফ্যাশান আর পোষাকের দিকে তাকাইলে দারুণ অসন্তোষে প্রাণটা মার্-মার্ করিয়া ওঠে!

তাদের বিরুদ্ধে নালিশ—মাতোয়ালা হয়ে দুজনে পথে ঝগড়া-মারামারি করেছে! ছোকরা বলিল, না হুজুর,—আমি ওর ঘরে বসতে গিয়েছিলুম। ও ছুটে পালিয়েছিল, তাই ডাকতে বেরিয়েছিলুম—

হাকিম অবগুণ্ঠনবতীর পানে চাহিয়া কহিলেন, মুখ তোল্ মাগী!

বেচারী! কোনমতে মুখের ঘোমটা সে একটু সরাইল। দেখিলাম, সুন্দর মুখখানি, চোখের জলে সে মুখে কালির দাগ পড়িয়াছে!

হাকিম কহিলেন—দোষ করেছিস্?

চামেলি নীরবে মুখ নত করিল। হাকিম কহিলেন,—বল্ না— এঁঃ!

অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে রাজ্যের লজ্জা স্বরে মাখিয়া নারী কহিল, লোকটা পয়সা দেয় নাই, গোঁয়ার, বাড়ীওয়ালীকে হাত করিয়া ঘরে বসিতে আসে। সে বসিতে দিবে না বলিয়া মারিতে উদ্যত হয়—তাই মারের ভয়ে সে পথে আসিয়াছিল, ঝগড়া করে নাই!

হাকিম শুনিলাম ভারী কড়া মানুষ! বজ্রগর্জ্জনে হুকুম দিলেন, পনেরো টাকা করে ত্রিশ টাকা জরিমানা! না দিলে পনেরো দিন কয়েদ।

ছোকরা নিষ্পরওয়া ভাবে মাথাটা একবার নাড়িয়া পকেট হইতে পনেরোটা টাকা বাহির করিয়া দিল। পুলিশ বলিল, ওধারে। টাকা দিয়া সে চলিয়া গেল। নারী কিন্তু নড়িতে চায় না, অত্যন্ত কাতরভাবে মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন দোকানের সামনে ফুটপাথে কে দুখানা বেঞ্চ পাতিয়া বসিয়াছিল তাকে লইয়া হাকিমের বকাবকি চলিয়াছে। সে বলিতেছে, এক খানার বেশী বেঞ্চ সেখানে তার নাই, তা দুখানা পাতিবে কি করিয়া! পুলিশ বলিতেছে, হাঁ হুজুর, দু'খানা বেঞ্চ! হাকিম রাগিয়া তার জরিমানা করিলেন, দু'টাকা দুখানা বেঞ্চের জন্য।

এমন সময় পাহারওয়ালা নারীকে ধমক দিয়া কহিল, হঠ্ যা। হাকিম সে শব্দে ফিরিয়া চাহিয়া কহিলেন,—কি?

পুলিশ বলিল,—জরিমানার টাকা দিচ্ছে না। বলে, টাকা নেই।

হাকিম কহিলেন,—লে'যাও। টাকা নেই, জেলে যাবে।

এজলাসের নীচে ক'খানা চেয়ার আলো করিয়া চাঁদনির সাহেব-পোষাক-পরা নানা মূর্ত্তির কয়েকজন বাবু বসিয়াছিলেন; তাঁদের একজন বলিলেন,—বাবা, হাকিম তো নয়, কশাই!

আর একজন কহিলেন,—ভারী puritan!

পুলিশ নারীকে টানিয়া লইয়া গেল।

যেন বায়োস্কোপে ছবি দেখিতেছিলাম! দৃশ্যের পর দৃশ্য সরিতেছে!...

থাকিতে পারিলাম না। মুহূর্ত্তের জন্ম ভুলিয়া গেলাম, সে নিজের শরীরকে পণ্য করিয়া দেহখানা ভাড়ায় খাটাইতেছে,—মনুষ্যত্বের সে এত বড় অপমান করিতেছে, নারীত্বকে পিষিয়া মারিতেছে! শুধু মনে হইল, আহা, নারী অবলা! অপরাধ তার কি? না, একটা গুণ্ডা বখাটে ছোকরার ইঙ্গিত-মত আপনাকে ধরিয়া দিতে পারে নাই, পলাইতেছিল! ইহাতেই মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া গেল! এর জন্য রাজ্যে এমনি হাহাকার পড়িয়া যাইবে যে—

পাশেই বসিয়া ছিলেন এক ভদ্রলোক—তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মেয়েমানুষটিকে সত্যই জেলে নিয়ে যাবে?

তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, হুঁ।

আহা!

মনটা ঝড়ের দোলায় দুলিয়া উঠিল। চুপ করিয়াই রহিলাম। তিনটার পর আমার মামলা চুকিলে কোর্টের ইন্‌স্পেক্টারকে প্রশ্ন করিলাম, যে-মেয়েমানুষটির পনেরো টাকা জরিমানা হইয়াছে, সে টাকা দিয়াছে?

জবাব মিলিল, না।

আমার পকেটে কুড়িটা টাকা ছিল। শীত পড়িয়াছে ছেলে-মেয়েদের জন্ম গরম ফ্রক, আরো কি কি কিনিতে হইবে গৃহিণী তার মস্ত ফর্দ্দ দিয়াছিলেন। সাক্ষ্যের ওজুহাতে আফিসের ছুটী ও যখন মিলিয়াছে, কোর্টের ফেরত জিনিষগুলা কিনিয়া লইয়া যাইব কথা ছিল। টাকা কয়টা বুকের মধ্যে যেন প্রচণ্ড আর্ত্তনাদ জুড়িয়া দিল, কেবলি কহিতে লাগিল, নারী, বেচারী, আহা!

ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে বলিলাম, ওর জরিমানার টাকা আমি দেবো, মশায়।

ইন্‌স্পেক্টার বাবু চোখে এমন দৃষ্টি ভরিয়া আমার পানে চাহিলেন!... মানুষের চোখে এমন ব্যঙ্গও ফোটে! তিনি ডাকিলেন, ওহে সাগর—

একটি ছোকরা সামনে আসিল। হাতে তার থলি। ইন্‌স্পেক্টরবাবু কহিলেন, সেই চামেলির জরিমানার টাকা ইনি দিচ্ছেন—

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি চোখ আমার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। তার মধ্যে কোন মতে টাকা পনেরোটা সেই সাগরের হাতে দিয়া চলিয়া আসিতেছিলাম—কি মনে হইল, এজলাস-কামরার সামনের বারান্দায় দাঁড়াইলাম। তবু কৌতুহল-ভরা সেই সব কৌতুক দৃষ্টি-বর্ষণের বিরাম নাই! পুলিশ সে নারীকে লইয়া আসিল। ভিড়ের মধ্য হইতে একজন কহিল, এই বাবু তোমার জরিমানা দিচ্ছেন গো...

নারী মুখ তুলিয়া চাহিল। সে চোখের দৃষ্টিতে কি যে ছিল!...

ভাবিলাম, একটা কথা বলি, উপদেশের ছলে, যে, নারীর নারীত্ব হেলার বস্তু নয়,—এমনি ধরণে ! কিন্তু কণ্ঠ কে যেন চাপিয়া ধরিল। নীরবে এক পা অগ্রসর হইলাম।

হঠাৎ একটা স্বর কানে গেল। ফিরিয়া দেখি, সেই নারী ! সে বলিল,—এ দয়া কখনো ভুলবো না ! ১ নম্বর পদ্মঘাটায় থাকি, ও পথে কখনো যদি যান্, পায়ের ধুলো দেবেন, অনেক কথা বলবার আছে।

পা ছাড়াইয়া সরিয়া আসিলাম। পিছনে তখন হাস্য-পরিহাসের রকেট্ ফাটিয়াছে...!

অফিসে একবার দর্শন দিয়া বাড়ী ফিরিলাম। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। অন্দরের রোয়াকে আর্শির সামনে বসিয়া গৃহিণী বেণীবন্ধন করিতেছিলেন, একটা কালো ফিতা কপালে ফের দিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, গৃহিণী তার একটা দিক দাঁতে চাপিয়া আছেন !

আমি ফিরিতে আমার পানে তাঁর নজর পড়িল। কহিলেন, ছেলেদের জামা-টামা কৈ ?

—আনা হয় নি।

—আজো ভুল ?

একটা নিশ্বাস পড়িল ! কহিলাম,—আজ ভুল নয়, মীনু...

—তবে ?

কাছারির ব্যাপার খুলিয়া বলিলাম। গৃহিণী রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন,—কোথা কার একটা বদমায়েস মাগী দোষ করে জেলে যাচ্ছে, তার জন্তে দয়ার সিন্ধু উথলে উঠলো একবারে। রাজা হরিশ্চন্দ্র।

আমি বলিলাম,—তার সেই চোখের জল যদি দেখতে।

স্ত্রী গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—চাই না দেখতে ! কি অভাগ্যি করেছি যে তাকে দেখতে যাবো ! যেমন পথে আছে, তেমনি হবে তো।

আমি কহিলাম,—কিন্তু সে কি তার দোষ। পুরুষ-মানুষগুলোর দুশ্চরিত্রের জন্তেই তো তার এই দশা।

—তা কেন ! ওদের দোষেই তো পুরুষ বদ হচ্ছে।

এ দিক দিয়া সুবিধা হইবে না, বুঝিয়া বলিলাম,—তবু সে নারী ! তোমারই মত অবলা নারী, মীনু...

গৃহিণী রাগে ফোঁস করিয়া উঠিলেন,—কি !...পরক্ষণেই অশ্রুতে ফাটি

পড়িয়া কহিলেন,—এত বড় কথা, আমার সঙ্গে একটা এর তুলনা! তা হবেই তো...দাসী-বাঁদীর মত পড়ে আছি বলে...ছি, ছি,...আমার গলায় দড়ি!

সর্ব্বনাশ! নানাভাবে বুঝাইলাম। কিন্তু গৃহিণীর রাগ শান্ত হইবার নয়! আমি বলিলাম,—বেচারী বড় কষ্টে আছে গো...যাবার সময় আমার কাছে কত দুঃখ করে গেল।

গৃহিণী ঝঙ্কার দিলেন,—তা যাও না, কে মানা করেছে! তাকে বুকে করে এনে সিংহাসনে বসিয়ে রাখো, দুঃখ ঘোচাও তার!

নিরুপায় হতাশভাবে বসিয়া পড়িলাম। ছেলেরা পার্কের মাঠে বেড়াইতে গিয়াছিল। গৃহিণী ক্রন্দনের স্বরে বলিলেন,—পুরুষমানুষ এমনিই! একটা সুন্দর মুখ দেখে অমনি!... নিজের চলে কি করে, তার ঠিক নেই। ছেলেমেয়েগুলো পরতে পাচ্ছে না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

নাঃ, অসহ্য! একটা দুর্ভাগিনীর পানে একটু দরদের দৃষ্টিতে চাহিয়াছি, অমনি ওখানে বাহিরে কোর্টে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, আর ঘরে এই কলরব কলহ! তখন এ সমস্যায় চিরদিন যা করি, তাই করিলাম। অর্থাৎ সটান্ উঠিয়া হেদুয়ার ওদিক দিয়া যেদিকে দুই চোখ যায়, চলিলাম। কতক্ষণ কোন্ পথে ঘুরিলাম, জানি না। ঘুরিতে ঘুরিতে শ্রান্তি বোধ করিয়া একটা গলির মোড়ে এক বাড়ীর রোয়াকে আসিয়া বসিলাম। হঠাৎ নজর পড়িল, পথের নামের ফলকে।—পদ্মঘাটা লেন।

বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। পদ্মঘাটা! এই গলিই না! মোড়ের বাড়ীখানার দিকে দৃষ্টি পড়িতে দেখি, এই যে সেই ১নং বাড়ী! সামনেই বারান্দা।

নিজের অলক্ষিতে পা দুইটা কখন্ যে আমাকে টানিয়া সেই বারান্দার নীচে লইয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছে, হুঁশ ছিল না। উপর-পানে চাহিয়া দেখি, বারান্দায় দাঁড়াইয়া রঙিন কাপড়-পরা পাঁচ সাত জন নারী...তাদের সঙ্গে...সেই চামেলি মুখে সিগারেট, হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে!—তা হইলে তার সে অশ্রু, সে ম্লান মুখ! বুকে একটা মুগুরের ঘা পড়িল।

পিছন হইতে কে ডাকিল, সুরো...! ফিরিয়া দেখি, যতীশ। এ পথের সে একজন খ্যাতনামা পথিক। যতীশ আমায় জড়াইয়া ধরিল, মহানন্দে বলিয়া উঠিল,—বাহবা। তাহলে এ পথের পথিক হয়েছ দেখচি যে...এ্যাঁ!—আম্‌তা আম্‌তা

করিয়া কি যে তাকে বলিলাম, কিছুই খেয়াল নাই। তবে সেখানে মুহূর্ত্ত দাঁড়াইলাম না। একেবারে নিজের গৃহে ফিরিলাম। গৃহিণী তখন রাগ ভুলিয়া রান্নাঘরে। আমি আসিয়া নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিলাম। ছেলেদের সদ্য প্রোমোশোন হইয়া গিয়াছে—নূতন বই খুলিয়া ঘরে তারা প্রচণ্ড কলরব তুলিয়া দিয়াছে!

আশ্রয়

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১)

রামহরি মণ্ডলের একটী মাত্র মেয়ে চন্দ্রা যখন বিধবা হইয়া পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিল তখন গ্রামের সকলেই একটু আহা-উহু করিল। বৃদ্ধ রামহরিকে অনেকে প্রবোধ দিল,—"তা আর কি করবে মোড়লের-পো, ভগবান যা লিখেছেন ওর ভাগ্যে তা ঘটবেই, ও তো আর অন্যথা করা যাবে না।"

রামহরিকেও অগত্যা তাহাই বুঝিতে হইল। না বুঝিলেই বা চলে কই, ভগবানের কাজের অন্যথা তো হইবে না। যে দণ্ড যাহার উপর অর্পিত হইতেছে তাহা হইবেই, রদ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

চোখের জল মুছিয়া রামহরি কন্যাকে পদতল হইতে টানিয়া তুলিল, নিজের জীর্ণ বসনাঞ্চলে তাহার মুখখানা মুছাইয়া দিতে দিতে সান্ত্বনার স্বরে বলিল, "কাঁদিস নে মা, যা হয়ে গেছে তা আর তো বদলাবে না। আমার আর সংসারে কেউ নেই, বুড়ো বাপের ভার নিয়ে এখানে থাক।"

চন্দ্রা নিজের শোক [illegible]ইয়া বৃদ্ধ পিতার সেবায় আত্মনিয়োগ করিল।

রামহরি মণ্ডলের বিঘা কত জমি জমা ছিল, তাহাতে যে ধান উৎপন্ন হইত তাই দিয়া একরকমে সংসার চলিয়া যাইত। এই মেয়েটীকে সাত মাসের রাখিয়া তাহার

মা মারা গিয়াছিল, পাড়ার অনেকে তখন রামহরিকে আবার বিবাহ করিবার উপদেশ দিয়াছিল, না হইলে তাহার সংসার চলিবে কি করিয়া? একা সে ক্ষেত খামারের কাজ করিবে, না সংসারের কাজ কর্ম্ম করিবে, সাতমাসের মেয়ে মানুষ করিবে?

তাহারা প্রতিবাসী হিসাবে সৎউপদেশই দিয়াছিল কিন্তু মূর্খ রামহরি তাহাদের কোন উপদেশই কানে লইল না। দূর সম্পর্কীয়া এক বৃদ্ধা দিদিকে আনিয়া সংসারে রাখিল। সে বৃদ্ধা সব দিন রাঁধিয়া দিতে পারিত না, কেবল মেয়েটীকেই রাখিত। ইহাও রামহরির কাছে ভাল ছিল, সে রাত্রে ফিরিয়া রাঁধিত, তাহাই দিনে রাত্রে দুজনের হইয়া যাইত। ইহার পর কেহ যখন বিবাহ সম্বন্ধে কথা কহিতে আসিত তখন সে হাসিমুখে উত্তর দিত, আর দরকার কি ভাই? মেয়েটাকে মানুষ করার জন্যে ভাবনা ছিল, তা ভগবান একটা দিক দেখিয়ে দেছেন। এখন বিয়ে করে কেবল গলগ্রহ বই তো নয়। চন্দ্রা আমার বেঁচে থাক, ওর বিয়ে দিয়ে জামাই নাতি-নাতনী নিয়ে সুখে দিন কাটিয়ে দেব।"

চন্দ্রা যখন সাত আট বৎসরের তখন বৃদ্ধা দিদি ইহলোক ত্যাগ করিল। চন্দ্রাকে লইয়া তখন রামহরিকে বেশী কষ্ট পাইতে হয় নাই, কেন না গরীবের মেয়ে চন্দ্রা তখন বয়সাপেক্ষা বেশী কর্ম্মঠ হইয়া উঠিয়াছে। সে তখন হইতে জোর করিয়া ভাত রাঁধা, জল তোলা বাসন মাজা প্রভৃতির ভার লইয়াছিল। খেলার সময় তাহার খুব অল্পই ছিল, খেলার সঙ্গীও তাহার দুই একটী ছাড়া বেশী ছিল না। বাড়ীর কাছেই হরিচাড়ালের বাড়ী, মাছ ধরিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া হরি জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সংসারে তাহার একটীমাত্র পুত্র প্রেমলাল, সাধারণে তাহাকে পেমা বলিয়া ডাকিত, আর পেমার বিমাতা। বিমাতা ছেলেটীর উপর মোটেই সদ্ব্যবহার করিত না, সামান্য একটু ত্রুটি ঘটিলেই সে তাহার আহার বন্ধ করিয়া দিত, এই অবস্থায় রামহরির শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া পেমার আর উপায় ছিল না। মাসের মধ্যে কুড়িদিন সে রামহরির বাড়ী খাইত, দশটা দিন বাড়ীতে খাইত। চন্দ্রার একান্ত খেলার সঙ্গী ছিল এই চাঁড়ালের ছেলেটী, এতটুকু বেলা হইতে সে পেমাকে দেখিয়া আসিতেছে।

বিমাতা যে সপত্নীর পুত্র কন্যার উপর কতখানি সদয় হয় এবং কি ভাবে ব্যবহার করে তাহা রামহরি পেমা, তাহার মা ও বাপের ব্যবহার দেখিয়া জানিতে পারিয়াছিল। এতবড় গ্রামখানার মধ্যে এক ঘর এই অন্ত্যজ চাঁড়াল বাস

করিত, গ্রামের লোকে ইহাদের যতদূর সম্ভব এড়াইয়া গিয়া নিজেদের শুচিতা রক্ষা করিত, ইহাদের কোন খোঁজই কেহ রাখিত না। অদৃষ্টক্রমে ছেলেটা রামহরির কাছে আসিয়া পড়ায় রামহরি ইহাদের যাবতীয় কথা জানিতে পারিয়াছিল, পুনর্ব্বার বিবাহের নামে সে জ্বলিয়া উঠিত। সে আপনার চোখে দেখিত—গ্রামের লোকের কথায় ভুলিয়া সে আবার বিবাহ করিয়াছে, নববধূ তাহার কন্যাকে বিধিমতে লাঞ্ছনা করিতেছে।

যখন চন্দ্রার বিবাহ হইয়াছিল তখন সে দ্বাদশ বর্ষিয়া বালিকা মাত্র। অনেক দেখিয়া শুনিয়া রামহরি অন্য গ্রামস্থ ভরত মণ্ডলের পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া ফেলিল। ভরতের অবস্থা খুব ভাল ছিল, ছেলেটাও বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছিল, তাহাদের কৈবর্ত্ত সমাজে এমন ছেলে আর একটা ছিল না বলিলেও চলে। মেয়েটা নাকি সুন্দরী ছিল তাই ভরত আরও বড়ঘরে ছেলের বিবাহ দিবার কথা ভুলিয়া এইখানেই সম্বন্ধ ঠিক করিয়া বসিল।

বিবাহের সময় রামহরি এ পর্য্যন্ত যাহা সঞ্চয় করিয়াছিল সবই কন্যা জামাতাকে দান করিয়া ফেলিল। সে যে উল্টা নিয়ম চালাইল ইহার জন্য আত্মীয় স্বজন সকলেই তাহার কার্য্যের নিন্দা করিল।

বিবাহের পরেই চন্দ্রাকে পিত্রালয় ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, চোখের জল ফেলিয়া রামহরি বেহাইয়ের হাত দুখানা ধরিয়া আর একটা বৎসর কন্যাকে নিজের কাছে রাখিবার প্রার্থনা করিয়াছিল কিন্তু ভরত কোন মতেই রাজি হয় নাই। সে বেহাইকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল বিবাহের পরে কন্যাকে পিত্রালয়ে রাখা একেবারে অন্যায়, দৃষ্টান্ত স্বরূপ সে আপনার সাত, দশ ও বার বৎসরের তিনটী মেয়ের উদাহরণ দিয়াছিল যে এই মেয়ে তিনটী বিবাহের পরে আর পিত্রালয়ে আসিতে পায় নাই।

সে আজ তিন বৎসরের কথা। এই তিন বৎসরের মধ্যে চন্দ্রা আর পিতার কাছে আসিতে পায় নাই। পিতার চোখের জল ঝরিয়া পড়িতে পড়িতে শুকাইয়া উঠিত—না, তাহাদের অকল্যাণ হইবে যে। কন্যা স্বামী-আলয়ে রহিয়াছে, যে কোন নারীর ইহা সৌভাগ্যের কথা যে।

তিন [illegible] পরে চন্দ্রা বিধবা অবস্থায় পিতার কাছে জীবন কালের জন্য চ[illegible]সিল। সে নাকি অকল্যাণী অপয়া, শ্বশুর শাশুড়ী তাই পুত্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছেন।

পিতা কন্যাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল, একবার করিয়া কাঁদিয়া বলিল,

বাপ যার কাছে কল্যাণ অকল্যাণ নেই মা, তুই যাই হ' না কেন, আমার এ দরজা তোর কাছে চিরমুক্ত।

(২)

তিন বৎসর পূর্ব্বে যে চন্দ্রা ছিল এ যেন সে চন্দ্রা নয়, তাহারই ছায়া মাত্র। সে চঞ্চলতা তাহার ছিল না, দৌড়াদৌড়ি, হাসি, বেশীকথা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রা নিঃশব্দে সংসারের কাজ করে, কেহ বুঝিতে পারে না সে আছে কি না।

শুধু রামহরির বক্ষেই এ আঘাতটা প্রবলরূপে বাজে নাই, আর একজনের বক্ষে বড় কঠোররূপে বাজিয়াছিল, সে পেমা চাঁড়াল, হরে চাঁড়ালের পুত্র।

এখন সে অষ্টাদশ বর্ষীয় কিশোর, সংসারের অনেক সে লাভ করিলেও এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই। স্বামী মরিলে মানুষ যে একেবারে এমন করিয়া বদলাইয়া যায় তাহা সে জানে না, তাই যতই সে চন্দ্রার কথা ভাবিতে লাগিল, যতই চন্দ্রাকে দেখিতে লাগিল ততই আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে লাগিল।

চন্দ্রা এখন তাহাকে এমন ভাবে এড়াইয়া যায় কেন তাহা সে ভাবিয়া পায় না। সে দিন অভুক্ত সে—পথের ধারে চুপচাপ বসিয়াছিল, সাহস করিয়া আগেকার মত রামহরির বাড়ীতে যাইয়া জোর করিয়া ভাত চাহিয়া খাইতে পারে নাই। রামহরি মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় তাহাকে দেখিতে পাইয়া নিজের বাড়ীতে যখন ডাকিয়া লইয়া গেল তখন আনন্দে তাহার হৃদয়খানা ভরিয়া উঠিয়াছিল—এইবার চন্দ্রাকে সে সম্মুখে দেখিতে পাইবে। আজ মাস তিনেক হইল চন্দ্রা এখানে আসিয়াছে ইহার মধ্যে একদিন মাত্র সে ঘাটের পথে তাহাকে দেখিয়াছিল। আগেকার মতই—কি চন্দ্রা, ভাল আছ তো—বলিয়া চন্দ্রার সম্মুখীন হইতেই চন্দ্রার মুখখানা হঠাৎ পাংশু হইয়া উঠিয়াছিল, সে একটাও উত্তর দেয় নাই, মুখের উপর ঘোমটাটা আর খানিক নামাইয়া দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গিয়াছিল। চন্দ্রার মুখখানা সে ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই, সেই ক্ষোভটা মনের মধ্যে জাগিয়া ছিল। এ দিন তাই সে ভাবিয়াছিল ভাত দিতে চন্দ্রাকে নিশ্চয়ই বাহিরে আসিতে হইবে, সে সেই সময় চন্দ্রাকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইতে পারিবে।

কিন্তু চন্দ্রা বাহির হইল না। দাওয়ায় ভাত দিয়া আগেই সে সরিয়া গিয়াছিল, পেমার ব্যগ্র ব্যাকুল চোখ দুইটী চারিদিকে ঘুরিল কিন্তু কোথায় সে?

মুহূর্ত্তে তাহার ভাত তরকারী যেন তিক্ত বিস্বাদ হইয়া গেল, অন্তরটা বড়

ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। বটে, সে আজ এতই পর হইয়াছে, সম্মুখে বাহির হইলেও দোষ হয়? তিন বৎসর আগে তো তাহাকে ছাড়া চন্দ্রার খেলা হইত না, চন্দ্রার ছোট বড় সকল কাজেই পেমাকে দরকার পড়িত।

ঝাঁ করিয়া একটা নূতন কথা তাহার মনে জাগিয়া উঠিল সে চাঁড়াল বলিয়া গ্রামের অন্য সকলের মতই কি চন্দ্রা তাহাকে ঘৃণা করে? এই যে সেদিন দাসেদের বাড়ীর মেয়েটা—নাকি পেমার ছোঁয়া জল তাহার গায়ে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল তাই তাহাকে কত না গাল দিল। চন্দ্রাও বোধহয় এখন তাহাকে ঘৃণা করিতেছে, জাতের কথা বড় হইয়া তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে।

মুখখানা তাহার বিকৃত হইয়া উঠিল, বড় বড় চোখ দুটি মুহূর্ত্তের জন্য জলিয়া উঠিয়া নিমেষে ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। সে আর খাইতে পারিল না, কণ্ঠনালি কে যেন চাপিয়া ধরিল, সে পাত কুড়াইয়া কুকুরটাকে ডাকিয়া সবগুলা খাইতে দিল।

চন্দ্রা দরজার পাশে দাঁড়াইয়া দেখিল, সে একটাও ভাত খাইল না সব ফেলে কুকুরটাকে ধরিয়া দিল; দেখিল হঠাৎ পেমার বড় বড় চোখ দুইটা তীব্র ভাবে জলিয়া উঠিয়া তাহার পরেই ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। বিধবা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস কোন মতে রোধ করিয়া রাখিতে পারিল না, সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল।

হায় রে কে জানিতে পারিবে আজ পেমার সম্মুখে সে কেন যাইতে পারিতেছে না? অস্পৃশ্য চাঁড়াল বলিয়া সে কোন দিন পেমাকে ভাবিতে পারে নাই, চিরদিন তাহাকে নিজের ভায়ের মত দেখিয়াছে। সেদিন ঘাট হইতে ফিরিবার পথে পেমা যখন তাহাকে ডাকিয়া কথা বলিয়াছিল তখন সে সঙ্কোচ লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া কথা কহিবে ভাবিয়া ছিল, সেই সময়েই তাহার সঙ্গিনী মেয়ে দুইটার পানে চোখ পড়িতেই সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। মেয়ে দুইটা এমনভাবে হাসিয়াছিল যাহাতে লজ্জা পাইবারই কথা। সেই মুহূর্ত্তে তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছিল, সে বিধবা, এখন যে কোন পুরুষের সহিত কথাবার্ত্তা বলা দোষাবহ।

ইহার পরে দুই এক জনের দুই একটা ফিসফাস্ কথাও তাহার কানে আসিয়া তাহাকে আরও সঙ্কুচিত করিয়া তুলিয়াছে। যদিও সে জানে পেমা-দা তাহাকে নিজের বোনের মতই ভালবাসে, তাহার সরল মনে পাপ থাকিতে পারে না তথাপিও সে সাহস করিয়া আর পেমার সম্মুখে বাহির হইতে পারিল না; যে জানে যদি আবার কেহ কোন কথা বলে।

সে বুঝিতে পারিতেছিল, কাজটা বড় খারাপ হইতেছে, পেমা-দা'র সরল মনে সে বড় আঘাত দিয়াছে, পেমা-দা বড় ব্যথা পাইয়াছে কিন্তু এ ব্যথা জুড়াইবে সে কি করিয়া? লোক-নিন্দাকে সে কি করিয়া ঠেকাইবে?

বিবাহের পূর্ব্বে—যখন সে বালিকা ছিল তখন সে পেমার সহিত মিশিত, খেলা করিত তখনই অনেক লোকে ঠাট্টা করিয়াছিল, অনেকে বলিয়াছিল—রামহরি মেয়ের জন্যে পাত্র খুঁজছে কেন, পাত্র তো কাছেই রয়েছে।

এই দিন হইতে পেমা সাবধান হইয়া গেল, সে বেশ বুঝিল চন্দ্রা আর সে চন্দ্রা নাই, সেও এখন তাহার চিরকালের সাথী পেমা-দাকে ঘৃণা করে, কারণ পেমা চাঁড়াল, অস্পৃশ্য।

এতদিন গ্রামসুদ্ধ সকলের ঘৃণা কুড়াইয়াও যে কষ্ট সে অনুভব করে নাই, তাহাকে ঘৃণা করে জানিয়া সেই কষ্ট সে পাইল। আজ মনে হইল সে অস্পৃশ্য। আর্ত্তকণ্ঠে একবার সে শুধু আকাশের পানে তাকাইল, তাহার বুকের নীরব ভাষা মূর্ত্ত হইয়াই ভগবানের চরণে লুটাইয়া পড়িল।

সত্যই—এ ব্যবধান কেন? চণ্ডাল যাহার হস্তে সৃজিত, ব্রাহ্মণও সেই হস্তে সৃজিত, যেখান হইতে উভয়ে আসিয়াছে সেইখানেই উভয়ে যাইবে, একই বিচারপতি উভয়ের বিচার করিবেন, তিনি তো জাতি ধর্ম্ম বিচার করিয়া দণ্ড দিবেন না, কার্য্যের ফলাফল দেখিয়া বিচার করিবেন। দুদিনের অধিবাসী—সংসারে আসিয়া কেন এই ভেদাভেদ নিজেদের মধ্যে গড়িয়া লইয়াছে? ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া চণ্ডালের অধম কার্য্য করিয়া কেহ সম্মানীত হইতেছে, চণ্ডালের বংশে জন্ম লইয়া ব্রাহ্মণাপেক্ষা মহৎ কাজ করিয়াও কেন যে-চণ্ডাল সেই চণ্ডাল থাকিয়া যাইতেছে। মানুষ দেখিয়া যায় শুধু জাতি, বাহ্যিক ধর্ম্মের ভাণ, প্রকৃত যাহা কেহ তাহা চিনিতে পারে না।

পেমা শুধু ভাবিতে লাগিল কেন এ রকম হয়? তাহার যদি কোনও উচ্চ বংশে জন্ম হইত সে এই বৈষম্য দূর করিতে পারিত, তাহার কথা লোকে কান দিয়া শুনিতও, কিন্তু হায় রে, সে যে নীচ চাঁড়ালের ছেলে, সে কথা বলিতে গেলে লোকে যে আগেই দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে কারণ সে অস্পৃশ্য।

(৩)

পেমা সেদিন নিজেদের দাওয়ায় বসিয়া চুপচাপ এই কথাই ভাবিতেছিল। বিমাতা পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছিল, ঝুপ ঝাপ করিয়া বর্ষার বারিধারা আকাশ

চিরিয়া • ধরার বুকে ঝরিয়া পড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র উঠানে একহাঁটু জল দাঁড়াইয়া গেল।

সেই জলের পানে চাহিতে চাহিতে কবেকার পুরাণ স্মৃতি পেমার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। আগে এমনি জল খানায় ডোবায় জমিয়া থাকিত, চন্দ্রার অনুরোধে সে কতদিন খেলা ঘরের নৌকা এমনি জলে ভাসাইয়া দিয়াছে। আজও তেমনি জল জমিয়াছে, আজ তাহার ইচ্ছা করিতেছে তেমনি করিয়া জলে নৌকা ভাসাইয়া দেয়, কিন্তু চন্দ্রাকে তো সে আজ পাইবে না।

বৃষ্টি যখন ছাড়িয়া গেল তখন সমস্ত অঞ্চলটা মাথায় জড়াইয়া বিমাতা বাড়ী ফিরিল। আসিয়াই অকারণে পেমাকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল—আ পোড়ারমুখো ছোক্‌রা, তোর মনে মনে এতও ছিল হতচ্ছাড়া ছোঁড়া। আজ আসুক আগে বাড়ী ফিরে, তোকে আচ্ছা করে জব্দ করে তবে ছাড়ব। তোর জন্যে আমায় এত কথা শুনতে হয় রে নরে হতভাগা? সতীনের বেটা, জ্বালাতেই রয়েছিস, দূর হয়ে যা না কেন—তুইও বাঁচিস আমিও বাঁচি।"

অকারণে বিমাতাকে এরূপ সপ্তমে চড়িয়া উঠিতে দেখিয়া পেমা প্রথমটায় অবাক হইয়া গেল। সে জানিত বিমাতার রাগের সময় কোনও কথা বলিলে সে আরও চটিয়া চেঁচাইয়া গালাগালি দিয়া পাড়া জমকাইয়া তুলে; তাই যখন শ্যামা বকিয়া বকিয়া চুপ করিল তখন শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে মা, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি নে কি করেছি।"

"কি করেছিস," শ্যামা মুখ খিঁচাইয়া বলিল, "কি করেছিস তা জিজ্ঞাসা করছিস কোন মুখে রে পোড়ারমুখো? লোকে কত কথা বলছে তার কিছু জানিস? তুই মণ্ডলদের বাড়ী হামেসা যাওয়া আসা করিস কেন? গাঁয়ের লোক আজ তাদের ঠেলা করে রাখলে, আর তাদের বাড়ী কেউ যাবে না, কেউ তাদের কিছু খাবে না। আ মর হতচ্ছাড়া, তোর মনের মধ্যে এতও ছিল, তোর জন্যেই তো ভালমানুষ রামহরি মণ্ডল আজ জাতে ঠেলা রইল। আজ মাঠ থেকে কর্তা আগে বাড়ী আসুক না, জুতিয়ে তোর হাড় গুঁড়ো করে দেবে এখন।"

পেমা শুধু ফেল ফেল করিয়া তাকাইয়া রহিল। সে মাত্র দুই দিন রামহরি মণ্ডলের বাড়ীতে গিয়াছিল, আর তো যায় নাই। তাহার এই দুই দিন যাওয়ার অপরাধে বৃদ্ধ রামহরি মণ্ডল আজ জাতে ঠেলা হইয়া রহিল। কিন্তু কেন, সে তো [illegible] যায় নাই, একদিন দাওয়ায় খাইতে বসিয়াছিল, আগেও [illegible]

প্রায়ই খাইত তখন কত লোকই তো তাহাকে খাইতে দেখিয়াছে তবে তখন কেন রামহরি মণ্ডলের জাতি গেল না, এখনই বা গেল কেন?

এ 'কেন'র উত্তর সে খুঁজিয়া পাইল না।

মণ্ডলের বাড়ীতে একবার গিয়া সব খবরটা জানিয়া লইবার জন্ত তাহার মন ছুটিতে লাগিল, কিন্তু সে যায় কি করিয়া? লজ্জায় সঙ্কোচে সে যেন মুসড়িয়া পড়িতেছিল, আবার সে যাইবে কোন্ মুখে, তাহার জন্তেই যে তাহারা জাতিচ্যুত হইয়াছে? সে যে অস্পৃশ্য চাঁড়াল, তাহাকে দাওয়ার উপর ভাত দেওয়ার অপরাধে নিরপরাধ বৃদ্ধ আজ জাতিচ্যুত। সকল কাণ্ডের মূল হইয়া সে কেমন করিয়া আবার সেখানে গিয়া দাঁড়াইবে?

সে স্থির করিল, সন্ধ্যার পরে সে চুপি চুপি রামহরি মণ্ডলের বাড়ী যাইবে, ব্যাপারখানা কি তাহা শুনিয়া আসিবে।

সে দিন তাহার পিতার বাড়ী ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল, বাড়ী ফিরিবামাত্র শ্যামা তাহাকে শুনাইয়া দিল, তাহার ছেলে হইতেই বৃদ্ধ রামহরি মণ্ডলের জাতিটা নষ্ট হইয়া গেল।

হরে চাঁড়াল পুত্রকে তাড়াইয়া যাইতেই সে তিন লম্ফে উধাও হইয়া গেল।

আকাশ জুড়িয়া তখন কালো মেঘ সাজিয়া আসিয়াছে, বাতাসটা থামিবামাত্র বৃষ্টি নামিল।

ঝর্ ঝর্, ঝর্ ঝর্ অবিশ্রান্তধারে জল ঝরিতে লাগিল, চোখ ধাঁধিয়া বিদ্যুৎ ছুটিতেছিল, কড় কড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছিল। নিরাশ্রয় কিশোর পথের ধারে একটা গাছতলায় দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিল। আজ সে যাইবে কোথায়? অন্য দিন পিতা তাড়াইয়া দিলে সে সটান রামহরি মণ্ডলের দাওয়ায় গিয়া উঠিত, আজ সে এক পাও নড়িতে পারিল না। বিদ্যুতের আলোয় নিকটবর্ত্তী রামহরি মণ্ডলের ঘর দাওয়া ঝল্সিয়া উঠিতেছিল, সে বদ্ধনেত্রে সেই দিকে চাহিয়া ছিল।

কড় কড় কড় কড়!

আকাশের গা চিরিয়া আগুনের শিখা ছুটিয়া ধরার দিকে নামিল, ডাকিতে ডাকিতে গোজা অগ্রসর হইল।

"বাবা গো—"

আর্ত্তভাবে চেঁচাইয়া উঠিয়া দুই কানে দুই হাত চাপা দিয়া পেমা ছুটিয়া রামহরির দাওয়ার উঠিতে আছাড় খাইয়া পড়িল। বজ্র তখন দাওয়ার নিকটবর্ত্তী

একটা নারিকেল গাছের উপর গিয়া পড়িয়াছে, গাছটা সেই বৃষ্টির মধ্যেও জলিতেছে।

তাহার আর্ত্তস্বর শুনিয়াই রামহরি দরজা খুলিয়া আলো হাতে দাওয়ায় আসিয়া তাহাকে অর্দ্ধমূর্চ্ছিতপ্রায় পড়িয়া থাকিতে দেখিল। তাড়াতাড়ি চন্দ্রা পিতার আদেশে জল লইয়া আসিল, পিতা ও কন্যা পেমার শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

পেমার ভয়টা কাটিয়া গেলে সে উঠিয়া বসিল। রামহরি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল, "বাজ পড়া দেখে বুঝি ভয় পেয়েছিস পেমা? এই দুর্য্যোগে ঘরের বার হয়েছিস কেন, ছিলি কোথায়?"

পেমা বলিল, "বাবা তাড়িয়ে দিয়েছে। ওই গাছতলাটায় দাঁড়িয়ে ছিলুম, তারপর—"

চন্দ্রা ভর্ৎসনার স্বরে বলিল, "আর বাজ এসে যদি ওই গাছটার ওপরই পড়ত তা হলে কি হত?"

পেমা শান্তভাবে বলিল, "তা হ'লে তো ভালই হতো চন্দ্রাদিদি, একেবারেই মরে যেতুম, একটু একটু করে তো মরতে হ'ত না।"

আজ সে এই প্রথম চন্দ্রাকে দিদি বলিয়া ডাকিল, চন্দ্রা এ ডাকে সত্যই হৃদয়ে পুলক অনুভব করিল, হৃদয়খানা তাহার করুণায় ভরিয়া উঠিল।

রামহরি বলিল, "তোর বাবা আজ তোকে তাড়ালে কেন পেমা?"

পেমা কথাটা গোপনে রাখিতে পারিল না, বলিল "আমার জন্যে নাকি তোমরা জাতে ঠেলা হ'য়ে রইলে, তাই মা বাবাকে বলবামাত্র বাবা একটা বাঁশ নিয়ে মারতে এল, কাজেই আমি পালালুম। বাবা বলেছে আমায় আর বাড়ীতে ঢুকতে দেবে না, দেখি—তা যদি হয় কাল সকালে ভিন গাঁয়ে চলে যাব, দুটো ভাত যেমন করেই হোক গেলে জুটবেই। আমি কি করেছি কাকা, তোমার দাওয়ায় বসে শুধু ভাত খেয়েছি এক দিন, এতেই এখন লোকে তোমায় জাতে ঠেলে রাখলে? আগে তো কতদিন তোমার দাওয়ায় ভাত খেয়েছি তা বুঝি লোকের চোখে পড়ে নি।"

হায় রে, দাওয়ায় ভাত খাওয়ানোর অপরাধে রামহরি জাতিচ্যুত হয় নাই এ কথা কেমন করিয়া এই সরল কিশোরটিকে সে বলে? জাতি ভাই কিশোরের সহিত জমি জমা লইয়া যে বিবাদ বাধিয়াছিল সেই বিবাদের কালে কিশোর জাতির মধ্যে একটা আন্দোলন তুলিয়াছিল—রামহরির কন্যা চন্দ্রা ভ্রষ্টা, চণ্ডা

পুত্র পেমা রামহরির জাতি নষ্ট করিয়াছে, সেই জন্য আজ বৃদ্ধ রামহরি সমাজ-চ্যুত, আজ তাহার সংসারে কন্যাটী ছাড়া আর কেহ নাই।

চন্দ্রা মুখ ফিরাইয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিল। রামহরি খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তাই বটে, সেই জন্যেই আমার জাত গেছে, তোর বাপ তোকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কাল তোর বাপ যদি তোকে জায়গা না দেয়, তুই ভিন গাঁয়ে ভাতের জন্যে যাবি কেন রে পেমা, আমার বাড়ীতে থাকতে পারবি নে? জাতে আমায় ঠেলা তো করেছেই, আর তো কিছু করতে পারবে না। বুড়ো হয়েছি, কবে আছি কবে নেই তার ঠিক কি; তার পরে আমার অবর্ত্তমানে তোর এই বোনের ভার নিয়ে তুই থাকতে পারবি নে?"

পেমা বিস্ময়ে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া বৃদ্ধের পানে চাহিয়া রহিল, অস্ফুটকণ্ঠে বলিতে গেল—"আমি যে চাঁড়াল,—"

"তাতে কি এসে গেল রে পেমা? চাঁড়াল আলাদা জায়গা হ'তে আসে নি, আলাদা জায়গায় যাবেও না, আমিও যেখান হ'তে এসেছি তুইও সেখান হ'তে এসেছিস, নিজেকে চাঁড়াল বলে এত হীন ভাবছিস কেন? আমার বড় ভাবনা—আমি মরে গেলে চন্দ্রার ভার কে নেবে, কে তাকে দেখবে। তোকে যদি পাই পেমা—আমি যে বড় নিশ্চিন্ত হ'য়ে চোখ বুজতে পারি। আমি জানি, চন্দ্রা যদি পবিত্র থাকে তবে সে তোরই কাছে থাকবে, জগতে আর কেউ তোর মত তাকে রক্ষা করে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। ভয় কি, তোকেও তোর বাপ মা তাড়িয়ে দিয়েছে, আমাকেও সমাজ তাড়িয়ে দিয়েছে, এখন তোকে উপলক্ষ্য ক'রে আমরা বেঁচে থাকি, আমাদের উপলক্ষ্য করে তুই বেঁচে থাক্। তোর নিজের বোন চন্দ্রা, তাই মনে করে ওর ভার নে। মনে কর্ তুই চাঁড়াল নোস, তুইও কৈবর্ত্ত হয়ে গেছিস।"

হাঁপাইয়া উঠিয়া চন্দ্রা ডাকিল—"বাবা—"

তাহার মাথায় হাতখানা বুলাইতে বুলাইতে রামহরি বলিল, "ভাবছিস কেন, চন্দ্রা আর ভয় কি, কারণ আমি যে সমাজ-ছাড়া, আর তো কেউ আমায় চোখ রাঙাতে পারবে না, আর তো কেউ শাসন করতে পারবে না। ভগবান তোর আশ্রয় জুটিয়ে দিচ্ছেন, শিশুর মত মন যার তাকে অবিশ্বাস করিস নে, এ আশ্রয় হারাস নে।"

(৪)

গ্রামে তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেল, রামহরি চণ্ডালকে নিজের গৃহে সাদরে স্থান দিয়াছে, সমাজচ্যুতের স্পর্দ্ধায় সকলেই চটিয়া উঠিল।

প্রধান মণ্ডল রাসবিহারী রামহরিকে ডাকিয়া পাঠাইল, রামহরি প্রথমটায় নড়িল না ; তাহার পর কি ভাবিয়া গেল।

তাহাকে সম্মুখে দেখিয়াই প্রধান মণ্ডলের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, রাগ সামলাইয়া সে ভারি গলায় বলিল, "শুনলুম তুমি নাকি চাঁড়ালটাকে তোমার বাড়ীতে রেখেছ, তুমি জানো এ তোমার ভারি অন্যায় কাজ হয়েছে ?"

শান্তকণ্ঠে রামহরি বলিল, "যে সমাজ-চ্যুত হয়েছে সে জানে তার কাছে চাঁড়াল বামুন ভেদাভেদ নেই। তোমরা কেউই তো আমার হুঁকায় তামাক খাবে না মণ্ডল, তবে অতটা মাথা ঘামানোর দরকার কি? তোমরা সেদিন স্পষ্টই বলেছ আমার যদি কোন বিপদ আপদ হয় তোমরা দেখবে না, মরলে কেউ কাঁধ দেবে না। এ সব কথা শুনে বাধ্য হ'য়ে আমায় চাঁড়ালকে ঘরে আনতে হয়েছে। মরলে পরে মেয়েটা না হয় মুখে আগুনই দিতে পারবে, পারে তো নিয়ে যেতে পারবে না।"

প্রধান মণ্ডল ভয়ানক চটিয়া গেল, রাগের মুখে খুন শাসাইল, রামহরি তাহাতে কান দিল না, চলিয়া আসিল।

দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। পেমার পিতা পেমাকে আর নিজের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিল না। গ্রামের লোকে তাহাকে শাসাইয়া ছিল যদি সে পেমাকে গ্রহণ করে তাহা হইলে এখানকার বাজারে তাহাকে মাছ বিক্রয় করিতে দিবে না। অবাধ্য ছেলেটার জন্য পেমার পিতা নিজের জীবিকার পথ বন্ধ করিতে পারিল না।

শিশুর মত সরল হৃদয় পেমা মহা আনন্দে রামহরির বাড়ী রহিয়া গেল। চন্দ্রাকে সে ভালবাসে—যথার্থ অন্তর ঢালিয়া ভালবাসে, কিন্তু সে ভালবাসার বৈশিষ্ট্য আছে। সে চন্দ্রাকে পাওয়ার কল্পনা কোন দিনই করে নাই, শিশু যেমন চাঁদ দেখিতে ভালবাসে, চাঁদ দেখিয়া চাঁদের আলো দেখিয়া যেমন তাহার তৃপ্তি তেমনি চন্দ্রাকে দেখিয়া চন্দ্রার কথা শুনিয়া পেমা বড় তৃপ্তি পায়।

চন্দ্রার মুখের হাসি একেবারেই মিলাইয়া গিয়াছিল, পেমার এই গম্ভীর মুখ দেখিতে মোটেই ভাল লাগিত না। সে মনে ভাবিত—স্বামী কি এবং স্বামী মরিয়া গেলে হাসিই বা যায় কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর সে কোন দিনই পায়

নাই। চন্দ্রাকে জিজ্ঞাসা করায় সে শুধু মলিন হাসিয়াছিল মাত্র, কোন উত্তর দেয় নাই।

জাতির স্বতন্ত্রতা পেমা প্রাণপণে বাঁচাইয়া চলিত। ইহাদের ঘরের চৌকাঠ সে কখনও পার হয় নাই। বাহিরের কাজ সে মহা আনন্দে সব করিয়া ফেলিত, ঘরের কাজ চন্দ্রা নিজে সব করিত। একদিন চন্দ্রার জ্বর হইয়াছিল, সেই জ্বর লইয়াও তাহাকে জল তোলা ঘরের কাজ সবই করিতে হইয়াছিল। ব্যাকুল ভাবে পেমা তাহার কাজ দেখিতেছিল, সে চাঁড়াল বলিয়া ঘরের কাজে তাহার অধিকার ছিল না। মুখ ফুটিয়া সে দিন সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আচ্ছা চন্দ্রাদিদি, কি করলে কৈবর্ত্ত হ'তে পারা যায়?"

চন্দ্রা তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হাসিয়াছিল, তখনই গম্ভীর হইয়া বলিয়াছিল, "দূর বোকা, যে যে জাত তা ছাড়া অন্য জাত বুঝি হ'তে পারে? আমি কৈবর্ত্ত, বামুন হ'তে পারি বুঝি? কৈবর্ত্তের ঘরে না জন্মালে কৈবর্ত্ত হ'তে পারা যায় না। তুমি যদি কৈবর্ত্ত হ'তে চাও পেমা-দা, তা হলে তোমায় মরে কৈবর্ত্তের ঘরে জন্মাতে হবে?"

যদি সদ্য সদ্যই মরিয়া কৈবর্ত্তের ঘরে আবার ঠিক এত বড়টী হইয়া জন্মগ্রহণ করা যাইত তাহা হইলেও বা পেমা মরিয়া দেখিত। রামহরির মুখে সে যে সব পুরাণ কথা শুনিত তাহাতে জানিয়াছিল, মরিলেও কত কাল ধরিয়া কোথায় থাকিতে হয় তাহার পর আবার জন্ম লইতে হয়। বাবা, যদি একশত বর্ষ তাহাকে মরার পরে শুধু ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, তাহার পর জন্মিয়া তাহার লাভ কি? তখন তো সে আসিয়া চন্দ্রাকে আর দেখিতে পাইবে না। না বাপু, কাজ নাই মরিয়া কৈবর্ত্তের ঘরে জন্ম লইয়া, সে হইতে চাঁড়াল হইয়া তফাতেই থাক, চন্দ্রাকে তো দেখিতে পাইবে।

সে দিন রামহরি অসুস্থ অবস্থায় মাঠ হইতে বাড়ী ফিরিল, সে জ্বর ছাড়িল না, প্রত্যহ তাহার উপরে জ্বর আসিতে লাগিল, ইহার সহিত সর্দ্দি কাশী, বুকে ব্যথা, চন্দ্রা ব্যাকুল হইয়া পেমাকে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইল।

ডাক্তার আসিল না। গ্রামের সর্দ্দার ডাক্তারবাবুর বাড়ী গিয়া তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া উৎসাহ দিয়া হাত করিয়া লইয়াছিল। জীঘাংসায় হৃদয় তাহার পুড়িয়া যাইতেছিল, অবাধ্য রামহরিকে কোন ক্রমে জব্দ করা চাই-ই।

চন্দ্রা মাথায় হাত দিয়া বসিল। দরিদ্র কৃষকের ঘরে নগদ অর্থ থাকে না,

বেশী টাকা দিতে পারিলে এখনই পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে ডাক্তার আনানো যায়। বাঁচানোর দিকে তখন তাহার দৃষ্টি, তাই সে কাকা কিশোরের বাড়ী ছুটিল—এক বিঘা জমী বন্ধক রাখিয়া সে যদি দশটা টাকাও দেয়।

কিশোর মাথা নাড়িয়া বলিল, "এক বিঘা জমি আর কতটুকু, ও রেখে কেউ দশটা টাকা দেয়? ওর সঙ্গে আর যে কয়বিঘা জমি আছে সবসুদ্ধ যদি বন্ধক রাখো, তা হ'লে কুড়িটা টাকা এখনি দিতে পারি।"

চন্দ্রা তাহাতেই রাজি হইল, এখন তাহার টাকার বড় দরকার, কুড়িটা টাকা—ইহাতে পিতার চিকিৎসা বেশ হইবে।

একখানা কাগজে হাতের টিপ দিয়া সে টাকা লইল।

বড় ডাক্তারও আসিল, ঔষধও আসিল, কিন্তু পিতা রক্ষা পাইল না। চন্দ্রাকে পেমার রক্ষণাবেক্ষণে রাখিয়া রামহরি ইহলোক ত্যাগ করিল।

কুড়ি টাকার মধ্যে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা দিয়া চন্দ্রা এ দিককার কাজ এক রকম মিটাইয়া লইল, জমি কয়বিঘা বন্ধক ছিল, পেমার ইহাতে শান্তি ছিল না। সে চন্দ্রার সহিত পরামর্শ করিয়া থালা ঘড়া কয়েকটী বিক্রয় করিয়া কুড়ি টাকা সংগ্রহ করিয়া চন্দ্রাকে আনিয়া দিল।

টাকা দিতে যাইবা মাত্র কাকা রাগিয়া আগুন। কয়েকটী সর্দ্দার গোছের লোককে ডাকাইয়া সেই কাগজখানি দেখাইয়া সে বলিল, "আপনারা দেখুন—দাদা মারা যাওয়ার দু দিন আগে চন্দ্রা আমায় কুড়ি টাকা দিয়ে এই আট বিঘে জমী বিক্রি করেছে। এখন চাঁড়ালটার কথা শুনে সেই কুড়ি টাকা ফিরিয়ে এনে দিচ্ছে—বলছে জমী দিতে হবে।"

চন্দ্রার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, নির্ব্বাকে সে খানিক কাকার পানে তাকাইয়া কম্পিত পদে বাড়ী ফিরিল।

সে যত সহজে সহ্য করিয়া গেল পেমা তত সহজে সহ্য করিল না। সে চেঁচাইয়া গ্রাম মাথায় করিল এবং যেরূপেই পারুক কিশোরকে শাস্তি দিবে প্রতিজ্ঞা করিল। চন্দ্রা কিছুতেই তাহাকে শান্ত করিতে পারিল না।

দুই দিন পরে হঠাৎ একদিন কেমন করিয়া চন্দ্রার ধান বোঝাই গোলাটা যে আগুন ধরিয়া গেল তাহা বুঝা গেল না। অনেক চীৎকারে গ্রামের লোক কেহ এই পতিতার সাহায্যার্থে আসিল না, লুকাইয়া সকলেই মজা দেখিতে লাগিল।

আগুন নিভাতে একটী পুরুষ ও একটী নারী প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি

গোলার আগুন উড়িয়া যে ঘরের চালে লাগিয়াছিল সে দিকে তখন কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই।

ধু ধু ধু, আগুন জ্বলিতে লাগিল, সে আগুন নিভান গেল না। দূরে দাঁড়াইয়া জলহীন শুষ্কনেত্রে চন্দ্রা দেখিতে লাগিল বিনাদোষে তাহার যথাসর্ব্বস্ব কেমন করিয়া আগুনে পুড়িয়া যায়। আর্ত্তকণ্ঠ ভেদ করিয়া একটা কথা বাহির হইতে চাহিতেছিল, প্রাণপণে সে কণ্ঠ বন্ধ করিয়া রাখিল।

সমস্ত রাত্রি জ্বলিয়া জ্বলিয়া ভোরের দিকে আগুন নিভিয়া আসিল। ভোরের আলো যখন ধরার গায় আসিয়া পড়িল তখন বাড়ী ও গোলা ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।

"পেমা-দা, এখন আমার আশ্রয় কোথায়, আমি কোথায় যাব গো?"

এই বলিয়াই সে হাহাকার করিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল।

পেমা শূন্য নয়নে দগ্ধ ঘরখানার পানে চাহিয়াছিল। চন্দ্রার কথায় মুখ ফিরাইল, তাহার হাতখানা ধরিয়া টানিয়া তুলিতে তুলিতে শান্তস্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কাঁদছিস্ কেন চন্দ্রা, আমি তোর বড়দাদা, আমি এখনও বেঁচে রয়েছি যে তুই বলছিস তোর সব গেছে, সব তো যায় নি বোন। চল দিদি, আমরা দুই ভাই বোনে কলে যাব, তুই ঘরে থাকবি আমি কলে কাজ করে টাকা আনব। তোর বাবা শুধু তোরই বাবা ছিল না রে, সে আমারও বাবা ছিল। আমায় চিনেছিল বলে তোকে আমার হাতে দিয়ে গেছে। চন্দ্রা দিদি, আজ ভাল করে আমার পানে চেয়ে দেখ আমি তোর দাদা। মনে কর আজ আমি চাঁড়াল নই।"

চন্দ্রা তাহার হাতখানা নিজের মাথার উপর রাখিয়া কাঁদিয়া বলিল, "না তুমি আজ চাঁড়াল নও, তুমি আজ আমার সত্যিকারেরই ভাই, তুমি আজ কৈবর্ত্ত হয়ে গেছ। আজ তুমি আমার দাদা—দাদা—"

"দিদি—"

পেমার চোখ দিয়া জ্ঞানে এই প্রথম দ ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।



আর একটা পথ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

রাত্রি একটা হবে। থিয়েটার দেখে ফিরছি। অভিনয়ের ব্যাপারটা তখনও মনের মধ্যে তোলপাড়া করছিল। পত্নীর চরিত্র সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে একটা সন্দেহজনক আলোচনা চ'লছে, গুপ্তচরের মুখে এই সংবাদ শুনে পুরাণ প্রসিদ্ধ এক আদর্শ নরপতি তাঁর সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে সারাজীবন বিবেকের তাড়নায় কী প্রচণ্ড অনুতাপানলেই দগ্ধ হয়েছিলেন,—বার বার সেই কথাই মনে হচ্ছিল আর ভাবছিলেম যে, প্রেম—না কর্ত্তব্য কোনটা মানব-জীবনের সত্যকার শ্রেষ্ঠ সম্পদ? যদি কর্ত্তব্যটাইকেই বড় ক'রে ধরা যায়, যেমন এই যশলুব্ধ রাজা ধরেছিল—তাহ'লে বিবেকের অনুসরণ করাটাই কি মানুষের সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য নয়? কিন্তু পুরাকালের সবচেয়ে বড় দেশের এই সবচেয়ে বড় আদর্শ নৃপতি তো সে কর্ত্তব্য পালন করে নি, অথচ কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়েই ত সে এক নিরপরাধিনী নারীর উপর সকলের চেয়ে নির্ম্মম অত্যাচারটা করতে সক্ষম হয়েছিল?

সমস্যাটা ক্রমেই যত জটিল হয়ে আসতে লাগল, সেটা সমাধানের উৎসাহ যেন আমার ততই কমে আসতে লাগল, শেষে স্থির করে ফেললুম যে, নারীর প্রতি পুরুষের চিরন্তন অবজ্ঞাই এই শোচনীয় কাহিনীর মূলভিত্তি। সেই পৌরাণিক ত্রেতা যুগেও সামান্য সন্দেহে নারী পুরুষ কর্ত্তৃক অন্যায় ভাবে পরিত্যক্ত হ'ত, নির্য্যাতীত হ'ত, অপমানিত হ'ত, নইলে পূর্ব্ব কথিত রাজারই মহাবীর বলে খ্যাত কনিষ্ঠ ভাইটি কখনই তাঁর ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার দোহাই দিয়ে অরসিকের মতো এক প্রেমার্থিনী রমণীর নাসিকাচ্ছেদন ক'রে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাতে সাহস করতেন না।

সেই ত্রেতাযুগ থেকেই এদেশে নারীর প্রতি পুরুষের অন্যায় অবিচার অত্যাচার অবাধে চলে আসছে বলেই বোধ হয় আজ পৃথিবীর এই চতুর্থ বা শেষ যুগে সেটা একেবারে চরম অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে—এমনই একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যখন বর্ত্তমানকে অতীতেরই জের বলে টেনে নিয়ে আমাদের সামাজিক

জীবনের বেহিসাবটাকে কোনও রকমে মেলাবার চেষ্টা ক'রছিলেন, ঠিক সেই সময়ে নারী কণ্ঠের একটা সকরুণ আর্ত্ত চীৎকারে চম্‌কে উঠে আমার মনের চিন্তাসূত্র হঠাৎ ছিন্ন হ'য়ে গেল।

শীঘ্রই বাড়ী এসে পৌঁছতে পারবো ব'লে যে সরু গলিটার ভিতর দিয়ে আমি হন্ হন্ ক'রে চলে আসছিলুম, সেটা যে এত নির্জ্জন—এত নিস্তব্ধ—এটা এতক্ষণ মোটেই আমার মনে হয় নি। সহসা আর্ত্ত নারী-কণ্ঠের এই কাতরতা শুনে পথের মধ্যে থম্‌কে দাঁড়াতেই সেটা যেন খুব স্পষ্ট করেই উপলব্ধি করতে পারলুম। গা'টা কেমন যেন আপনিই ছম্ ছম্ করে উঠ্‌ল।

অল্পক্ষণমাত্র সেই শব্দ লক্ষ্য করে সেখানে দাঁড়াতেই বুঝতে পারলুম যে, বাঁ-হাতি একখানা একতলা বাড়ীর ভিতর থেকেই এই আওয়াজ এসেছে। পরক্ষণেই একটা পুরুষোচিত কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল এবং একটা মারপিট ঝটাপটির আওয়াজও কানে এল, সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই নারী-কণ্ঠস্বর মর্ম্মভেদ্ কাতর রোল। ব্যাপারটা এইবার আমার কাছে বেশ সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল,—এই বাড়ীতে নিশ্চয়ই কোনও অসহায় স্ত্রীলোকের উপর নির্য্যাতন হচ্ছে।

কেমন একটা দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল, সেই নির্য্যাতিতা নারীকে রক্ষা করবার। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে সেই বাড়ীর দরজাটায় দু'একবার নিজের সমস্ত শরীরের ভর দিয়ে ঠেলে দেখলুম—দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। ভাবলুম তাই ত, এখন কি করি? দরজায় জোরে জোরে ঘা মেরে দরজা খুলে দেবার জন্য উচ্চকণ্ঠে হাঁক দেবো নাকি? সেটা কি উচিত হয়? এদের কারুর সঙ্গেই আমার জানা নেই—আমি একজন পথের অপরিচিত পথিকমাত্র। আমার পক্ষে এরূপ করা একটু অসমসাহসিকের পরিচয় দেওয়া হবে না কি?

এক নিমেষমাত্র ওই রকম সাত পাঁচ ভাবছি,—এমন সময় সেই বাড়ীরই সদর দরজার হুড়কোটা সহসা একটা শব্দ হয়ে খুলে গেল এবং একটি কুড়ি একুশ বছরের রোরুদ্যমানা সুন্দরী তরুণী একটা যেন কিসের ধাক্কা খেয়ে ভিতর থেকে একেবারে বাইরে ঠিক্‌রে এসে পড়ল! নীচের রকের ধারে সিমেণ্টের সিঁড়ির উপর বা সেই খোওয়া-বারকরা গলির রাস্তায় ছিট্‌কে পড়লে এই সুন্দরী তরুণীকে নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ হাঁসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হ'তো কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দরজার সম্মুখে তখন আমি দাঁড়িয়ে ছিলেম বলে তিনি সেই ধাক্কায় ধমকে ছিট্‌কে এসে পড়লেন একেবারে আমারই ঘাড়ের উপর!

এই অতর্কিত অবস্থায় নিশ্চিত পতনটাকে কোনও রকমে টাল খেয়ে সামলে

আতুরকে আগ্‌লে নিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই একটা বিকট হাস্যে নিশীথ রাত্রের নিদ্রিত সর্ব্বাঙ্গ যেন আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌ল। প্রকৃতিস্থ হ'য়ে দেখি একজন পানোন্মত্ত প্রৌঢ় ব্যক্তি আমার গলাটা টিপে ধরে অতি অশ্রাব্য কুৎসিত ভাষায় অভিযোগ করছেন যে, আমি নাকি প্রতিদিন গোপনে এসে তাঁর এই তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ প্রেম করি, তিনি অনেকদিন থেকেই আমাকে ধরবার ফিকিরে ছিলেন কিন্তু ছুঁড়ীটা (তাঁর স্ত্রী) নাকি বড় ধড়িবাজ, তাই এতকাল সুবিধে ক'রে উঠ্‌তে পারেন নি, আজ নাকি তিনি আমাকে একেবারে হাতে-নাতে ধরে ফেলেছেন।

বৃথাই আমি তাঁকে বারম্বার বোঝাবার চেষ্টা করলুম যে, ব্যাপারটা তিনি যা মনে করেছেন তা নয়, আমি পথিকমাত্র। এত রাত্রে আর্ত্ত স্ত্রী-কণ্ঠস্বরে বিচলিত হ'য়ে কৌতূহল পরবশই গৃহদ্বারে উপস্থিত হ'য়েছিলেম, আমি তাঁর স্ত্রীকে চিনি না, তিনি যে লোক ব'লে আমাকে মনে করেন, আমি সে লোক নই। এ সম্বন্ধে তাঁর স্ত্রীকে প্রশ্ন করলেই তিনি জানতে পারবেন।

তখনও পর্য্যন্ত সজল তার দুই চক্ষে অগ্নি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভদ্র-মহিলাটি আমাকে বললেন, "ছি ছি! ঐ সন্দিগ্ধ মন মাতালটার সঙ্গে আপনিও অনায়াসে একজন স্ত্রীলোকের অপমান ক'রছেন? আপনাকে দেখে আমার অন্য রকম ধারণা হয়েছিল।"

সেই দৃষ্টি ও সেই বাক্যের মধ্যে যে মর্ম্মান্তিক ভৎর্সনা নিহিত ছিল তারই লজ্জা আমাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে। অপরাধীর মত বললেম, "মাপ করবেন, আমি আপনার চরিত্র সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করি নি, আমরা যে পরস্পরের অপরিচিত আমি শুদ্ধ মাত্র এইটেই প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম, আমাকে বিশ্বাস করুন।"

মহিলাটির সঙ্গে কথা বলবার সেই অসতর্ক মুহূর্ত্তের মধ্যে তার মস্ত হাতীর একটা প্রচণ্ড ঘুসি আমার নাকের উপর এসে পড়ল' সঙ্গে সঙ্গে তিনি গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌লেন, "তবে রে! এই যে বিশ্বাস করছি।"

আমার মাথাটা ঘুরে গেল, আমি সেই দোরের সামনে সিঁড়ির ধাপের উপর টলে পড়ে গেলুম। আমার নাক দিয়ে ঝর্‌ ঝর্‌ করে রক্ত পড়তে লাগল।

মহিলাটি তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে আমাকে তুলে বসিয়ে নিজের আঁচল দিয়ে আমার আহত নাকটা সযত্নে চেপে ধরে পাশেই বসে পড়লেন।

গোলমাল শুনে পাড়ার লোকেরা অনেকেই উঠে পড়েছিল, আশে পাশের

বাড়ী থেকে দু'দশজন ছোকরা ও আধাবয়সী লোক বেরিয়ে এসে তখন সেখানে জমা হয়েও গেছল।

স্ত্রীলোকটির স্বামী সকলের কাছে কাতরভাবে সহায়তা ভিক্ষা করে বুঝিয়ে দিলেন যে, আমিই নিত্য তাঁর অবর্ত্তমানে গোপনে এসে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ প্রেমে লিপ্ত হই, তাঁরা সকলে যেন আমার সমুচিত দণ্ড মুণ্ডের ব্যবস্থা করেন।

পাড়ার লোকেরা এক পায় ত' আর চায়, এই কথা শুনেই তারা আমার উপর ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলেন এবং তাঁদের পাড়ায় এসে এরূপ বেয়াদপী করবার স্পর্দ্ধা রাখি বলে আমাকে তার সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য সকলে একযোগে আমাকে মারতে উদ্যত হলেন। আমি দেখলুম, সকলের উদ্যত মুষ্টির সম্মুখে সেই নারী পক্ষপুটে শাবককে রক্ষা করবার মতো নিজের দুই হাত মেলে দিয়ে আমাকে তাঁর দেহের আড়ালে আবৃত করে দাঁড়ালেন!

নাকের রক্ত পড়াটা তখন বন্ধ হয়ে গেছল। আশৈশব ব্যায়াম চর্চ্চা করে আমার দেহে অসুরের ন্যায় শক্তি ছিল। নারীর অঞ্চল-ছায়ে আত্মরক্ষা করতে লজ্জা বোধ হ'ল। তীরের মত বেগে উঠে দাঁড়িয়ে আমি তাদের সামনে এগিয়ে গেলুম। সহসা আমার এই মূর্ত্তি দেখে তারা একটু ভড়কে গিয়ে প্রথমটা কয়েক পা পেছিয়ে গেছল, সেই ফাঁকে আমি আমার সম্বন্ধে তাঁদের ভুলটা সংশোধন করে দেবার জন্য যে কথাগুলো বল্লুম, তাঁরা কেউই তা বিশ্বাস করলেন না। উত্তরে শুধু "মার্ মার্ মার্ শালাকে" ব'লতে বলতে তাঁরা সদলে আমাকে আক্রমণ করলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই দু'চার জন আমার আত্মরক্ষার কৌশলে জখম হ'য়ে পড়তেই তাঁরা যখন পৃষ্ঠ ভঙ্গ দেবার উদ্যোগ করছেন ঠিক সেই সময় ঘাঁটির পাহারাওয়ালা সাহেব দু'একজন সঙ্গী নিয়ে হাজির হ'লেন।

ফলে আমার সঙ্গে সেই ভদ্রমহিলাটিও গ্রেপ্তার হ'য়ে থানায় প্রেরিতা হলেন। আমাদের ধরিয়ে দিয়েও পাড়ার লোকগুলির উৎসাহ একটুও কমে নি। থানার দোর পর্য্যন্ত তাঁরা অনেকেই আমাদের পিছু পিছু এসেছিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে সেই থানার পঞ্জাবী ইন্‌স্পেক্টারটি ছিল আমারই এক অন্তরঙ্গ বন্ধু! বন্ধু আমাকে নিয়ে সেদিন অনেক ঠাট্টা তামাসা করলেন বটে কিন্তু দুজনকেই খুব যত্নে রাখলেন; সুতরাং হাজত বাস আর আমাদের করতেই হ'ল না! পরস্ত্রী অপহরণের যে অভিযোগ মহিলার স্বামীটি আমার বিরুদ্ধে এনেছিলেন তা পুলিশের রিপোর্টের উপর ও সেই মহিলার জবানবন্দীর জোরে—একেবারেই

কেঁসে গেল! এবং জেরার মুখে প্রমাণ হয়ে গেল যে, মহিলার স্বামীটি একটি দুর্দান্ত মাতাল, লম্পট এবং স্ত্রীর প্রতি অযথা সন্দেহে অত্যাচার করায় তাঁর পূর্ব্ব দুই স্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন!

আদালত-ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার পর সেই স্ত্রীলোকটি যখন গললগ্ন অঞ্চলে ও সজল নেত্রে ভূমিষ্ঠ হয়ে আমাকে প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিয়ে বললেন, "আমাকে ক্ষমা করবেন। এই অভাগিনীকে সাহায্য করতে এসেই আপনি এই কষ্ট পেয়েছেন, এর দায়িত্ব সমস্তই আমার। আমারই জন্য নিরপরাধ আপনাকে বহু শাস্তি ও বহু লজ্জা পেতে হয়েছে।"

আমি তাঁকে সসম্ভ্রমে হাত ধরে তুলে জিজ্ঞাসা করলুম, "সে যা হবার হয়ে গেছে, আপনার আর এতে অপরাধ কি? তা আপনি এখন কি করবেন? আপনার স্বামী ত আপনাকে ত্যাগ করেছেন শুনলুম!

"সেইটেই এই দুর্ঘটনায় আমার সবচেয়ে বড় লাভ!" এই বলে একটু ম্লান হেসে তিনি আবার বলতে লাগলেন, "আমি আজ স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা নই, এক উচ্ছৃঙ্খল মদ্যপায়ী লম্পট নিষ্ঠুরের প্রতিদিনের নিদারুণ অত্যাচারের হাত থেকে আমি আজ মুক্তি পেয়েছি, যদিও চিরকলঙ্কের বিনিময়ে আমায় সে মুক্তি কিনতে হ'ল—তা হোক্, তথাপি জানবেন, এই মুক্তির জন্য আমি চিরদিন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাক্‌বো!"

"আপনি নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু ভেবেছেন কি?"

আবার সেই ম্লান হাসি হেসে তিনি বললেন, "ভাববার কি বিশেষ কিছু আছে বলে আপনি মনে করেন? আমাদের এই অভিশপ্ত হিন্দুনারীর জীবনের এরূপ অবস্থায় দুটি মাত্র পথ খোলা আছে, এক আত্মহত্যা, দ্বিতীয় বেশ্যাবৃত্তি! অতএব আমি কোন্ পথ অবলম্বন ক'রবো সে কথা কি আপনাকে আর বলতে হবে?"

আমার বুকটা চম্‌কে উঠ্‌লো! দু'টি হাত ধরে মিনতি করে তাকে টেনে নিয়ে এলুম পুলিশ ইন্‌স্পেক্টারবাবুর গাড়ী করে তাঁদেরই বাড়ীতে।

বাবুটি ছিলেন একজন আর্য্য-সমাজী, তিনি সেই মহিলাটিকে সেদিনের সেই আমারই রক্তে রঞ্জিত তাঁর পরিহিত বস্ত্রের অঞ্চল প্রান্তটি দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "দেবী, ওই রক্তধারায় রঞ্জিত হয়ে নূতন করে যে সিন্দুর আপনি সেদিন আপনার

সীমন্তে ধারণ করেছেন, বেদমন্ত্রে তাকে পবিত্র অক্ষয় ক'রে নিতে আপনার আপত্তি আছে কি ?"

তিনি নিমেষের জন্য আমার দিকে চেয়ে লজ্জানুরাগে রক্তিম হয়ে মাথাটি নত করলেন।

ওরা ভয় পায়

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

ওরা ভয় পায় !
ওরা চোখ বুজে থাকে,
বলে মিথ্যা, সত্য, কিছু নাই—
শুধু ফাঁকি, আর শুধু মায়া ;
এই আসা যাওয়া,
আগে পাছে শুধু তার,
অর্থহীন নিরুত্তর অন্ধকার শুধু !

আমার ভুবনে কিন্তু ফুল ফোটে ফল ফলে রোজ
ঋতুগুলি আসে যায় গন্ধে গানে প্রাণে ভরপুর !
আগে পাছে আছে কি না কিছু
খুঁজিবার
নাহি অবসর।
আছে যাহা,
তাহারই পাছে,
আমার দিবসরাত্রি
ছোটে অনুক্ষণ !

আমার দিনের আলো
হেসে কাছে আসে,
ভালোবেসে
কথা কয় ;
আমার রাত্রির সুপ্তি, কপোল পরশ করে ধীরে,
বলে,
নাহি ভয় !

শরৎচন্দ্র

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(যৌবনে)

এই বৎসরটাও উদ্যোগ-ব্যাপারে অতিবাহিত হইয়া গেল। কিন্তু পরের বৈশাখ হইতে 'ছায়া' নিয়মিত ভাবে বাহির হইতে লাগিল। আমাদের দলটিও তখন জমাট বাঁধিয়া উঠিল ; সকলে ভাগলপুরে একত্রিত হইলাম।

কিন্তু আমাদের কলিকাতা থাকিবার সময়ে শরৎ ভাগলপুরে সাহিত্যের একটি ক্ষুদ্র পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছিল। আমাদের আসিয়া যোগ দেওয়াতে তাহা অনেকটা পুষ্ট কলেবর হইল। সে আজ চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের কথা।

একদিনের কথা বেশ মনে পড়ে। একটি ক্ষুদ্রকায় যুবক তাহার অযাচিত প্রেমের ডালি বহন করিয়া আমাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার অসাধারণ স্মৃতি-শক্তি—রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থ তাহার জিহ্বাগ্রে, শরতের শেফালির মত কবিতা ঝর ঝর করিয়া অজস্র ঝরিতেছে !

সে আসিয়া বলিল, তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলুম। আমরাও যেন

বলিলাম, বেশ ত, তোমার জন্তেই ত আমাদের হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত রেখেছি। এই আমাদের মিলনের সহজ ইতিহাস! কেউ কাউকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম না। শরতের সঙ্গে যোগই ছিল আমাদের সে-দিনের ঐক্যের সেতু; আর ছিল সেই বয়সের ধর্ম্ম—প্রেম-নিবেদন করিবার জন্য চিত্তের অসীম ব্যাকুলতা।

বাইরের বাড়ীর সনাতন দড়ির খাটের উপর বসিয়া সকল-বিস্মৃত হইয়া আমরা কাব্য-আলোচনা করিতে লাগিলাম। সে-দিনের কথা মনে পড়িলে আজো মনের মধ্যে এমনিতর একটা ঝঙ্কার বাজিতে থাকে—

"যেদিন সে প্রথম দেখিনু
সে তখন প্রথম যৌবন।
প্রথম জীবন পথে বাহিরিয়া এ জগতে
কেমনে বাঁধিয়া গেল নয়নে নয়ন।"

এই বন্ধুটি সম্প্রতি বহরমপুরে থাকেন; সাহিত্যে তাঁহার খ্যাতি আছে। ইনিই শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট। সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা শ্রীমতী নিরুপমা ইঁহার ভগ্নী। বিভূতির আদরের ডাক-নাম—শ্রীমান্ পুঁটুভট্ট। নিরুপমা ছিলেন, "বুড়ী"—তাঁহার তখন পোষাকি নাম ছিল অনুপমা, এখন তাহাই আবার সাহিত্যে রূপান্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে—"নিরুপমা।" বয়সে পুঁটুর ছোট বলিয়া বুড়ীকে চিরদিন কনিষ্ঠার মতই স্নেহ করিয়াছি। এখানে সেই পরিচয় কিছু কিছু প্রকাশ পাইলে হয় ত অপরাধ হইবে না।

সাহিত্য এবং শরৎকে অবলম্বন করিয়া আমাদের বন্ধুত্ব অল্প দিনের মধ্যেই প্রগাঢ় হইল। পুঁটু তখন শেলী, কীট্‌স, বায়রণ, টেনিসন সব পড়িয়াছে,—বেদ-ব্রহ্ম, গীতা-উপনিষদ্ কিছুই বাকি নাই, হারবর্ট স্পেন্‌সার, মিল, হেগেল মার্টিনোর কথাও তাহার কাছে প্রথম শিখি। যেদিন বলিল যে, সে নাস্তিক—সেদিন ভয়ে আমার জিভ হইতে পেটের নাড়ি পর্য্যন্ত যেন শুকাইয়া উঠিল! যেন চোখের সম্মুখে দেখিলাম যে, নরকের অগ্নিতে স্বয়ং যমরাজ নির্দ্দয় গদাঘাতে তাহাকে বিধ্বস্ত করিতেছেন! তাহার সহিত তর্কে পাড়িয়া উঠিবার কোন উপায় ছিল না। সে জল করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, ঈশ্বর বলিয়া কোন বস্তু থাকিতেই পারে না, পরন্তু ঈশ্বর বলিয়া যদি কিছু স্বীকারই করিতে হয় ত সে প্রোটোপ্লাজম! তাহার পর সেই তত্ত্ব লইয়া এক কঠোর প্রবন্ধ লিখিল—তাহা দেখিয়া আমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া রহিল—মুখে কথা ফুটিল না।

কিন্তু মূঢ়তার এত পরিচয় পাইয়াও পুঁটু আমাদের ত্যাগ করিল না। আমরাও তাহাকে কিছুতেই গুরুর পদে সমাসীন হইবার মত আমল দিলাম না। তাহার অপরিসীম স্নেহ-প্রবণ হৃদয় দিয়া সে কেমন নিত্যই আমাদের আপনার করিয়া লইতে লাগিল।

এই সময়কার শরতের কথা বলি। তাহার ভাগ্যে পরীক্ষা দেওয়া ঘটে নাই। প্রধান কারণ, পরীক্ষার ফি জুটে নাই। অপর কারণ, মেজদিদির মৃত্যু বোধ করি।

মেজদিদির মৃত্যু হইলে মতিদাদা ছেলেদের লইয়া অন্যত্র বাসা করিলেন। মনে হয়, নানা কারণে তিনি আমাদের বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে বাধ্যই হইয়াছিলেন। খঞ্জরপুরের নূতন বাসায় গিয়া শরৎ চাকরিতে ভর্তি হইয়াছিল।

এই বাসার সন্নিকটে তখন পুঁটুরা থাকিত। গঙ্গাতীরে প্রকাণ্ড একটা পাকা বাড়ী। পুঁটুর সহিত পরিচয়ের আগে একদিন সেখানে গিয়াছিলাম। নিকটের মসজিদের ছাদের উপর সে-দিন সান্ধ্যবৈঠক বসিয়াছিল। গান বাজনা, নাটকের অভিনয় এবং তাহার মধ্যে চা এবং জলখাবারের আদ্য-শ্রাদ্ধ চলিয়াছে। খাইবার লোকেরও অভাব নাই এবং ততোধিক চেষ্টা খাওয়াইবার। সেদিনও পুঁটুকে দেখিয়াছিলাম, সে তাহার ডবল বয়সের বন্ধুদের সঙ্গে বসিয়া তাহার এঁচোড়ে-পাকা অপরিণত মতামতগুলি সজোরে প্রচার করিয়া সেখানকার বায়ুমণ্ডল সংক্ষুব্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

সেখান হইতে ফিরিয়া শরতের ঘরে গিয়া বসিলাম। টেবিলের উপর একখানি বই! মিসেস্ হেনরি উডের সব বই বোধ করি ছিল। তখন সে ‘অভিমান’ বইখানি লেখা শেষ করিয়াছে। শুনিলাম, লেখা খুব চমৎকার হইয়াছে। কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাহা পড়িয়া নাকি শত মুখে সুখ্যাতি করিয়াছেন।

এই পুস্তকখানি এখনো অপ্রকাশিত। কিন্তু কোথায় আছে তাহা কেহ জানে না। বন্ধু-বান্ধবের হাতে হাতে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন তাহার আর কোন খোঁজ খবর পাওয়া গেল না। শুনিয়াছি ‘অভিমানে’ ইষ্টলীনের ছায়া আছে।

অর্থাভাবে পরীক্ষা দিতে না পারার আঘাত শরতের মনকে কতখানি জখম করিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা করিতে পারা শক্ত; আজো তাহা নিঃশেষে মিটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ঐ দিকে বাধা পাইয়া সে সংসারের স্রোতে গা-ভাসাইয়া

দিল। দিন রাত আড্ডা—এবং আপিসে গিয়া কোনক্রমে নমো নমঃ করিয়া ফুল ফেলিয়া দিয়া—দিনগত পাপক্ষয় করাই হইল তাহার কাজ। কিন্তু ইহাতে ভিতরের মানুষটি তৃপ্তি পায় নাই। এই অতৃপ্ত ক্ষুধার্ত্ত যুবকের মনের খোরাক আড্ডার অশ্রান্ত হৈ হৈ যোগাইতে পারে নাই। তাই গোপনে ভারতীর সেবা সে করিত এবং সেই গোপন-সাধনের দুই অন্তরঙ্গ সেবায়েৎ জুটিল—পুঁটু এবং বুড়ী!

শরতের কবিতা লেখার ধৈর্য্য ছিল না; কিন্তু কবিতার আদর সে করিতে জানে। পুঁটু ছিল দার্শনিক। কবিতা লিখলে ব্যাখ্যার জন্য মল্লিনাথের প্রয়োজন হইত। কিন্তু বুড়ীর লেখনী হইতে তখনি স্বচ্ছ-ধারায় কবিতা উচ্ছ্বসিত হইত। তাহার অন্তর্গূঢ় নিবিড় বেদনার স্নিগ্ধ স্পর্শ পাঠকের মনে অপূর্ব্ব ভাব-রসের সমাবেশ করিয়া দিত। আমাদের মনে হইত চর্চ্চা করিলে বুড়ী বড় কবি হইতে পারিবে। কিন্তু কিছুদিন পরে সে কবিতার চর্চ্চা ছাড়িয়া দিল। এখনো আশা হচ্ছে যে বাংলা সাহিত্যের ঐ দিকেও সে কিছু দিয়া যাইবে।

এই নিভৃত সাধনায় যোগ দিলাম গিরীন ভায়া এবং আমি। শরৎকে কবে যে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলাম জানি না। তবে সে অধিকার চিরদিনই আমাদের মধ্যে অব্যাহত রহিয়া গেল।

* * * *

এই সময়ে আমাদের 'সাহিত্য-সভার' জন্ম হয়। সভ্যগণের নামের তালিকাটি বৃহৎ নয়—তাই দেওয়া যাইতে পারে।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট
শ্রীমতী অনুপমা দেবী
শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
এবং আমি

এই ছয় জনের মধ্যে একজনের আসন ছিল নেপথ্যে।

সভা বসিত উন্মুক্ত মাঠে—দিনান্তের স্নিগ্ধ-আলোকে। শনি-রবিবারের অবসর দিনগুলিই সভা বসিবার সময় ধার্য্য হইত।

সভায় কি কাজ হইত?—সাহিত্য আলোচনা বলিলে খুবই মামুলি-মোটা কথা বলা হয়।

একদিন রবীন্দ্রনাথ ভাগলপুর-সাহিত্য-সম্মিলনে আসিয়া কেন যে 'সৃজন এবং নির্ম্মাণের' সাহিত্যে বিভিন্নতা বুঝাইয়াছিলেন জানি না, কিন্তু সেদিন তাঁহার কথাগুলি বড় মনে লাগিয়াছিল। মনে হয়, ভাগলপুরই ঐ আলোচনার বিশেষ ভাবে উপযুক্ত স্থান। সাহিত্য নির্ম্মাণ করা আমাদের এই ক্ষুদ্র সভাটির কাজ কিম্বা উদ্দেশ্য ছিল না। অন্তত যিনি ইহার সভাপতিরূপে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—তাঁহার প্রতিভা, যতদূর জানি, নির্ম্মাণের উপযোগী নহে। এই সভাটিতে সাহিত্য সৃজনের চেষ্টাই চলিয়াছিল—সাহিত্য যে কি তাহা সত্য করিয়া উপলব্ধি এবং হৃদয়ঙ্গম করাই ছিল আমাদের কাজ। এই সভার কোন সভ্য সাহিত্যের ব্যাকরণ কি অভিধান লিখিবার দুরাকাঙ্ক্ষা রাখিত না। ইহাতে ইতিহাস কিম্বা প্রত্নতত্ত্বের দুরূহ গবেষণার কোন উদ্যম একদিনের জন্যও দেখা যায় নাই।

কবিতা কিম্বা গল্প লেখাই ছিল আমাদের কাজ। সভাপতি কবিতার বিষয় ঠিক করিয়া দিলে সাতদিনের মধ্যে আমাদের তাহা লিখিয়া তৈরী করিতে হইত এবং সভায় নিজে নিজের লেখা পড়িয়া সভাগণকে শুনাইতে হইত। বুড়ীর লেখাটি শরৎ পড়িত। সভাপতির আর এক কঠিন কাজ ছিল, লেখার বিচার করিয়া নম্বর দেওয়া। প্রায় সকল কবিতায় বুড়ী হইত ফার্ষ্ট—আর আমাদের মুখ হাঁড়ি হইয়া যাইত। লেখার সম্বন্ধে লেখকের একটা অপরিহার্য্য মমতা জন্মায়—তাহা যে কত বড় অন্ধতা আনিতে পারে—সে শিক্ষাও আমাদের এই সময়ে হইয়াছিল।

এই দলের মধ্যে এখানে একজনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতে চাই। সাহিত্যে তাহার রস-বোধের অবধি ছিল না। কিন্তু লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহাকে টানিয়া আনিতে কোন দিনই পারা গেল না। যোগেশ আমাদের 'ছায়া' কাগজের গুরু-গম্ভীর সম্পাদক ছিল! পুঁটু তাহার নামে একটি কবিতা বানাইয়াছিল—তাহার মাত্র একটি চরণ মনে পড়ে "ক্রীটিক্ যোগেশ ক্রুদ্ধ!" যোগেশকে লেখা দিয়া সন্তুষ্ট করা অতিশয় কঠিন ছিল। 'ছায়া'তে সমালোচনা ভিন্ন সে আর কিছু লিখিয়াছে বলিয়া ত' মনে পড়ে না।

কিন্তু যোগেশ কোনদিনই 'অটোক্র্যাটিক্' সম্পাদক নয়। তাহার নিদর্শন পরের একটি সুন্দর ব্যবস্থা হইতে পাওয়া যাইবে।

'ছায়া'র দলের মত প্রায় একটি দল কলিকাতার ভবানীপুরে গড়িয়া উঠিতেছিল। তাহার মুখ-পত্র ছিল "তরণী"। সেই দলেরও অনেকেই সাহিত্য জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি—অনেকে মিলিয়া "ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতির" প্রতিষ্ঠা করেন। ভাগলপুর 'সাহিত্য-সভা'র মত বোধ হয় তাহা এখনো পঞ্চত্বলাভ করে নাই। মধ্যে মধ্যে সাম্বৎসরিক উৎসবের সংবাদ দৈনিক পত্রের স্তম্ভে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই দুই কাগজ পরস্পরকে পাল্লা দিয়া চলিত। 'তরণী'র শেষ পৃষ্ঠায় থাকিত 'ছায়া'র সমালোচনা এবং ছায়ার পৃষ্ঠে থাকিত 'তরণী'র প্রতি নিক্ষেপ করিবার জন্য অগ্নিবাণের তূণ!

একবার 'তরণী'র কোন কবি নিজেকে সমুদ্রতটের বালুকণা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া পরে সমুদ্রের তরঙ্গ-লীলার বিশদ বর্ণনা করেন। আর যাইবে কোথায়! 'ছায়া'র সমালোচকের পক্ষে তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল, বালুকণার পক্ষে ঐরূপ দেখা সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব প্রমাণ করিতে 'ছায়া'র দুই পৃষ্ঠা ব্যয়িত হইয়াছিল এবং পরিশেষে আমাদের বিজ্ঞ সমালোচক বলেন যে, তিনি কবিকে চিনিয়াছেন, তিনি শ্রীঅমুকচন্দ্র—; কি দুঃখে তিনি বালুকণা হইবেন? ষাট্ বালাই ইত্যাদি।

সাহিত্য-সমাজপতির আদর্শে সে যুগের সমালোচনাই হইত ঐ ঢং-এর। মনে পড়ে, কোন বিখ্যাত মাসিকে রবীন্দ্রনাথের কৈফিয়ৎ তলব করা হইয়াছিল—'সোনার তরীর' "গগনে গরজে মেঘ" লইয়া। সমালোচকের উত্তেজনা এত উচ্চে উঠিয়াছিল যে, তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি 'সোনার-তরী' নির্ম্মান করিবে না—অতএব কবি সম্পূর্ণ অবস্তু-তান্ত্রিক! রবীন্দ্র-নাথের তখন বয়স অধিক হইয়াছিল—তিনি পথে আসিলেন না; কিন্তু নবীন কবির দল বোধকরি একদম হুঁসিয়ার হইয়া গেছেন; কারণ বাংলা-সাহিত্যের অদৃষ্টে উহার আর জোড়া পাওয়া গেল না!

ঘরে বসিয়া খুব ক'টা চড়াকথা শুনাইয়া দিয়া তাল ঠুকিতে পারিলেই লোকে উচ্চ-কণ্ঠে বাহবা দিত। কোন সাপ্তাহিক কাগজে চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের 'শকুন্তলা তত্ত্বের' সমালোচনা পাঠ করিয়া আমরা বীর রসের আস্বাদন পাই। সমালোচকের প্রস্তাবটি অবশ্য একটু কঠিন ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন যে, শকুন্তলা-তত্ত্ব ছাপিতে যে টাইপগুলি লাগিয়াছে—তাহা গালাইয়া একটি গদা তৈরী করিয়া তাহা লেখকের মাথায় মারিলে—তবে তিনি একটু শান্ত হইতে পারেন। এই সকল ভীম-প্রবৃত্তির সমালোচক এখন ক্রমেই দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। উত্তর-কালে—এই সকল সমালোচনা হইতে বাঙ্গালী জাতির যুদ্ধ-প্রিয়তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাইবে নিশ্চয়।

এইরূপ সমালোচনার ফল যে ভাল হয় না—তাহা অল্প দিনের মধ্যেই আমরা বুঝিয়াছিলাম। তরুণীর দল একদম ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া প্রমাণ করিতে বসিল যে, বালুকণাই এই পৃথিবীর যা-কিছু সকল সম্পদের আদিভূত কারণ।

এই ঘটনার পর যোগেশ সমালোচনার বোর্ড (Board) সৃষ্টি করিল। প্রতি সভ্যকে তরণী পড়িয়া তাহার লিখিত সমালোচনা সম্পাদকের নিকট 'পেশ' করিতে হইত। সম্পাদক তাহা হইতে মতামত বাছিয়া সমালোচনার মালা গাঁথিয়া দিতেন। মনে পড়ে, ইহাতে কোন পক্ষেই অবিচার হইত না।

'ছায়া'র অনেক লেখা পরে 'যমুনা" মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। শরতের গোটা দুই তিন গল্প ও প্রবন্ধ ছিল। 'ছায়া' অতি যত্ন সহকারে বাঁধাইয়া রাখাও হইয়াছিল। প্রয়োজনের দিনে 'যমুনা'র সম্পাদক মহাশয়—সেখানি চাহিয়া লন। প্রয়োজন ফুরাইলে আমাদের নিদারুণ কথাই শুনিতে হইয়াছিল। প্রেসে দিবার কালে 'পাতা ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া' ছায়াকে ক্ষুণ্ণ করিতে করিতে তাহার অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছে। সান্ত্বনা বাক্যটি ততোধিক মর্ম্ম-গ্রাহী! "প্রয়োজন কি সেই হাতের লেখা খাতাখানায়? সবই ত ছাপায় উঠিয়াছে।"

প্রয়োজন কি সত্যই নাই?

১৩০২

পল্লী-ব্যথা

শ্রীগোপাললাল দে

শস্যবরষ শেষ হতে যায় ফুরায়েছে সম্বল,
আষাঢ়-আকাশে বিন্দু ঝরে নি সময়ে হয় নি জল;
রোয়া হয়েছিল কষ্টে কতক শুকায়েছে কিছু তার,
যা আছে তাহাও হয় নি তেমন ফসল হবে না আর;
ঘরের মানুষ গরু বাছুরের আহার জোগাতে আছে,
পুরাতন ধান খড় যাহা ছিল বিক্রয় হয়ে গেছে;

হাজার রকম খরচ রয়েছে পোষ্য অনেকগুলি,
একেবারে সব জের মিটাইতে কাঁধে নিতে হবে ঝুলি ;
ফসল দেখিয়া চোখে জল আসে দাঁড়ায়ে ক্ষেতের ধারে,
খরচ করিয়া কাটিলে মাড়িলে মাস কত যেতে পারে,
পাওয়া যাবে যাহা কোন মতে নাহি হবে বছরের ভাত,
কি হবে ভাবিয়া পল্লী-কৃষক মাথায় দিয়েছে হাত।
বাকী কয় মাস কিনে খাইবার অর্থ জুটিবে কোথা,
কেমনে বাঁচিবে কচি কাঁচাগুলি কে বুঝিবে হায় ব্যথা !
যদি বা জুটিত ঋণ, তাহা হলে ধান্য চলিত কেনা,
মাটি বাটি ঘর বাঁধা নাহি দিলে কেবা দিবে হায় দেনা ;
এরও পরে হায় সারা বছরের কাপড় কিনিতে হবে,
খাজনা না দিলে রাজার নায়েব শান্ত কি আর রবে ?
হয় ত আবার কারো কারো ঘরে মেয়েটি হয়েছে বড়,
পাড়ার লোকের নিন্দার ভয়ে হয়ে আছে জড়সড়।
কারো বা এবার না ছাইলে চাল ঘরেতে পড়িবে জল,
ব্যয় আছে এত তবু অনেকেরই কিছু নাহি সম্বল।

শুধু তাই নয় আশ্বিন হ'তে জ্বালা গেছে ছেয়ে,
দুএকটি দিন ভাল থেকে থেকে ভুগিতেছে ছেলে মেয়ে ;
সবাকার ঘরে দুতিনটি করে ছট ফট করে জ্বরে,
কতই বা জোটে ঔষধ পথ্য কে কাহার সেবা করে ;
পা হাত সবার সরু হয়ে গেছে চোখ মুখ আধমরা,
পেটটি কেবল বাড়িয়া হয়েছে লিভার প্লীহাতে ভরা ;
জ্বরে ভুগে ভুগে বুকের পাঁজর আঙুলেতে যায় গোণা,
ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিমোনিয়াতেও মরিছে দুএক জনা।
টোপ পানা আর বাঁশ পাতা পড়ে পচে আছে ডোবাগুলি,
রোদ পায়নিক পোকা পচা জল সাধ্য কি মুখে তুলি,
সেই বিষ জলই করে ব্যবহার কি করিবে আর হায়,
বহুজোর তার একটুকু ভাল জল তুলে এনে খায়।

ঝোপ ঝাড় আর বৃথা জঙ্গলে গ্রামখানি আছে ভরে,
সন্ধ্যা না হতে মশকবাহিনী আসে ঝিন্ ঝিন্ করে।
ঘরের বাহিরে লোক চলে নাক' সাঁজেই দিয়েছে দ্বার,
দুয়ারের পাশে বনের শেয়াল ডেকে যায় বারে বার।
কি জানি কি যেন ভাবীআতঙ্কে সবার মলিন মুখ,
নাহি বিশ্বাস নাহি আনন্দ নাহিক শান্তি সুখ;
কাজে আর যেন নাহি উৎসাহ ভরসা নাহিক বুকে,
কি জানি কিসের অজানা সে ভয় লেগে আছে চোখে মুখে;
এদের অভয় কেবা দিতে পারে কেই বা এদের আছে,
অন্ন বস্ত্র স্বাস্থ্য-কাঙাল যাবে বা কাহার কাছে!





(উপন্যাস)

দ্বিতীয় ভাগ

অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তর ব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয় বৃন্ত শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত গগনে,
চারিদিকে চির যামিনী।
অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি,
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মুরতি
তুমি অচপল দামিনী

ধীর গভীর গভীর মৌন-মহিমা,
স্বচ্ছ-অতল স্নিগ্ধ নয়ন নীলিমা,
স্থির হাসিখানি উষালোক সম অসীমা,
অয়ি প্রশান্ত হাসিনী।

অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তর বাসিনী।

—রবীন্দ্রনাথ

১

রথ-যাত্রার সময় পুরীতে চিরকালই ভীষণ ভিড় হ'তো। নূতন রেল খোলাতে এই তীর্থক্ষেত্রে এমন জনসমাগম হতে লাগ্‌লো যে, সরকার বাহাদুর ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন। এই সময়ে একটার জায়গায় সাতটা দারোগা লাগিয়ে শান্তিরক্ষা করা দায় হ'য়ে উঠ্‌লো। আমি এই মরশুমে কলেজের নাগপাশ মোচনের পরই স্পেশাল কলেরা ডিউটিতে শ্রীক্ষেত্রে এসে কাজ সুরু করে দিলাম। লোকের শেষ ছিল না, রোগের অন্ত ছিল না—আর সমস্তদিনে কাজ থেকে একতিল অবসর পাবার উপায় ছিল না।

তখন দেশে ডাক্তারের অভাব, তাই পরীক্ষা দিয়ে ফল বার হবার আগেই আমার এই চাকুরি জুটলো। মাসখানেক বাড়ীতে থাকতে পেয়েছিলুম মাত্র।

মা বাবা দুজনেই পঠদ্দশায় বিবাহের বড় বিরুদ্ধে ছিলেন। কাজেই এতদিন পর্য্যন্ত আমার ঐদিকের কোন ভোগান্তি ছিল না। সহপাঠীদের প্রেম-ব্যাকুলতা, তারপর "পুত্র-কন্যার প্রবল বন্যার" বিড়ম্বনার কথা শুনতে শুনতে যেন ঐ জিনিষটার উপর আমার একটা বিতৃষ্ণাই জন্মে গিয়েছিল। মনে হ'তো সুস্থ শরীরকে কেন মিছামিছি ব্যস্ত ক'রে তোলা!

একটি ছোট দোতালা বাড়ীতে বাসা বেঁধে ছিলুম। এই বাসার ব্যবস্থা—ঠিক ক'রে বল্লে, অব্যবস্থার, ভার ছিল অতি-বৃদ্ধ রামার উপর। জীবনে অনেক উত্থান, পতন, অনেক দুঃখ-সুখের লীলা শেষ ক'রে রামা যখন সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়, তখন আমি তার আশ্রয় গ্রহণ করলাম। সে মনে করলে, আমাকে ভর ক'রে দাঁড়াবে; কিন্তু কার্য্যত ঠিক তার উল্টোই বোধ করি দাঁড়িয়েছিল। সংসারের সকল বিষয়ে আমার পঙ্গুতা দেখে রামাকেই হয় ত বেশী ক'রে সক্ষম হ'তে হয়েছিল।

রামা নিজের দিক থেকে জীবনের প্রায় সকল বিষয়েই আশা শূন্য হয়েছিল, সে যেন আর নিজেকে নিয়ে পেরে উঠ্‌ছিল না; কিন্তু অপরের বিষয়ে সে একটুও অবসন্ন হয় নি—তাই তার জীর্ণ মনের উপর আমার প্রয়োজনগুলি স্থান পেয়ে যখন বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো—তখন তাতে নবীনতার কোন অভাবই হলো না। এ ঠিক্—জীর্ণ তাল গাছের গায়ে—পরিপূর্ণ শক্তিতে অশ্বথের চারা যেমন ক'রে বেড়ে উঠ্‌তে থাকে তেম্নি। তাল গাছ তখন আর নিজের দরকারে বাঁচে না; অশ্বথ গাছকে বাঁচিয়ে রাখাই তখন তার কাজ হ'য়ে পড়ে।

ভ্রূর চুলগুলি তার পেকে সাদা হ'য়ে চোখের উপর ঝুলে প'ড়ে ছিল। দৃষ্টিও বোধ করি ক্ষীণ হয়েছিল। সকালে এসে ভ্রূর চুলগুলি দুহাতে সরিয়ে দিয়ে আমার মুখ নিরীক্ষণ ক'রে রামা বল্‌তো, বাবু আমার হাতে প'ড়ে তোমার বড় অযত্ন হচ্ছে, তুমি যে রোগা হয়ে যাও।

তার কথা শুনে হাসি আসতো। বল্‌তুম, তাই ত রামচন্দ্র, এ যে ভাবনার কথা হয়ে প'ড়লো দেখ্‌ছি—একটা কিছু উপায় না করলেই নয়।

রামা রাগ ক'রতো—ঐ কথা ব'লে রোজই তুমি আমাকে ফাঁকি দাও বাবু। আমি আজ একটা কিছু ব্যবস্থা করবোই ক'রবো।

তোমায় ফাঁকি দিয়ে আমার লাভ কি, রামা?

রামা বিড়-বিড় ক'রে কি বল্‌তে বল্‌তে নিজের কাজে চ'লে যেত।

রক্তের টান, মানুষের সঙ্গে মানুষকে যুক্ত ক'রে; কিন্তু তাতে মনুষ্যত্বের স্ফূর্তির অবসর বড় অল্প; সেটা এত উদ্দাম যে, তার ফেণায় চিত্ত ঢাকা প'ড়ে যায়। তার স্বস্তির দিকটা প্রচ্ছন্ন, অস্বস্তির ক্ষোভে মন ঘুলিয়ে উঠে। শাস্ত্রকাররা তাই একে আসক্তি, মায়া ব'লে আবর্জনার মত ঝেঁটিয়ে সাফ্ করে দিতে বলেন।

রক্তের সম্বন্ধ না থেকেও যে যোগ সেটাকে সকল যুগে সকল দেশেই একটু উঁচু জায়গা দেওয়া হয়েচে। এতে মানুষের কল্পনা আছে, ধ্যান আছে, অভিনিবেশের সাধনা আছে; ওর অস্বস্তি মনকে ঘোলা ক'রে তোলে না, ওর ব্যথায় অন্তর চিড় খেয়ে সুধা-ক্ষরণই করে।

রামা তাই রাগ ক'রেও যেন সুখ পেত। তার উপর কোন দাবী কোন দিনই করি নি, তাই তার অক্ষম হাত দুটি দিয়ে সে আমার সকল অভাবই পূর্ণ ক'রে রাখত। যেটা পেরে উঠ্‌ত না তার জন্যে সর্বাগ্রে সে নিজের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে তারই দু'একটা স্ফুলিঙ্গ নিতান্ত অনিচ্ছা স্বত্বে যেন আমার উপর নিক্ষেপ করে নিজেকে জব্দ করবার উপায় খুঁজতো; কিন্তু সে দিকে দিয়েও তার ব্যর্থতাই এসে পৌছত। আমি জানতুম, সে যা-কিছু করে সেই আমার যথেষ্ট।

* * *

রণের ক'দিন আমাদের নিশ্বাস ফেলবার অবসর ছিল না। আমার অধীনে আরো চার জন লোক ছিল: রাজ-পথের ধারেই কলেরা-ক্যাম্প। প্রায় দু'শো হাত লম্বা পর্ণ-কুটীর, পাঁচ ছ' হাত লম্বা এক-একখানি ঘর; রোগী শোবার

জন্য একটি ক'রে বাঁশের মাচা। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সব ঘর ভ'রে গেল—তখন গাছতলা ভিন্ন আর আশ্রয় দেবার স্থান রইল না। তা ছাড়া—রোগীদের আত্মীয়-স্বজনের স্থান যে কোথায় হয় তার কোন ঠিক-ঠিকানাই ছিল না।

কিন্তু সব চেয়ে কঠিন সমস্যা দাঁড়িয়েছিল, সেবা করার লোকের অভাবে। রোগের ঔষধের ব্যবস্থা করা এক, আর রোগীকে ওষুধ খাওয়ান আর এক। তাদের তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্চে—ওগো একটু জল দাও, ওগো প্রাণ যে যায়—কিন্তু কে শুনবে তাদের কথা!

দূরে জন কতক চলে যাচ্চে পথের উপর দিয়ে—তাদের একজনকেও এদিকে টেনে আনা যায় না। তারা রথে জগন্নাথ দেখে জীবন সার্থক করবে—আর জন্মাতে হবে না!

একদিন সকালে ম্যাজিষ্ট্রেট এলেন আমাদের কাজ পরিদর্শন করতে। তাঁকে আমি দুঃখের কথা বল্লুম। তিনি একটু হেসে বল্লেন, কিন্তু ডাক্তার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম ত্যাগ ক'রে কে আসবে এই নোংরা কাজ করতে? ও আশা তোমরা ছেড়ে দাও, যা পার, যতটুকু তোমাদের সাধ্যে হয়—তাই ক'রে যাও।

সায়েব, সত্যই কি তুমি চেষ্টা করলে আমাদের সাহায্য করবার জন্যে এক জনও দিতে পার না?

কি চেষ্টা তুমি করতে বল আমাকে?

আমি বলি তুমি পথে পথে ঢেঁড়া দিয়ে দাও—লোকে জানুক যে এমনি একটা মুস্কিল এখেনে হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—এতবড় জন-সমাগমে একজনও এসে দাঁড়াবে না?

বিনা পয়সায়? তুমি অল্প বয়সের বালক—এখনো দুনিয়াকে চিনতে তোমার বাকি আছে, ডাক্তার।

ধিক্কারে আমার প্রাণ পূর্ণ হয়ে উঠ্‌লো, চোখ ফেটে জল বার হয় আর কি, কষ্টে সম্বরণ করে নিলুম।

চ'লে যাবার সময় সায়েব বল্লেন, দেখি, তোমাকে সাহায্য দেবার কত দূর কি করা যায়।

দু-একদিন পরে, কলেরা ক্যাম্পের কাজ দেখ্‌বার জন্য দর্শক আসতে লাগ্‌লেন। বুঝ্‌লুম—সাহেব একেবারে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে নেই।

* * * *

সে-দিন আর আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না, যে-দিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে লবনশুল্কের ইন্সপেক্টরের মেম মিসেস্ জিঠানি এসে উপস্থিত হলেন।

মিসেস্ জিঠানিকে তাঁর গাউন, আর ফুল-ফল শোভিত প্রকাণ্ড হ্যাটের অন্তরাল থেকে চিনে নিতে এক সেকেণ্ডও দেরি লাগে নি।

আমি স্তম্ভিত হয়েই রয়ে গেলুম। তাঁর সঙ্গে যে পূর্ব্বে কোন দিনের পরিচয় ছিল, তা' প্রকাশ করতে আমার যেন সাহসে কুলাল না; এবং তিনি বোধ করি সাহেবের সঙ্গে ছিলেন বলে আমার সঙ্গে পরিচয় স্বীকার ক'রে নিজেকে অযথা খেলো করলেন না।

দু'জনে যখন গাড়ী করে ক্লাবের দিকে চলে গেলেন—তখন আমি আর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারলুম না—একটা চেয়ারের উপর শুয়ে প'ড়ে বোধ করি কিছুক্ষণ হতচেতন হয়েই রইলুম—তারপর আমার দু'চোখ দিয়ে কান্নার জোয়ার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌লো।

বাসায় ফিরে গিয়ে রামাকে বল্লুম, আমার ক্ষিদে নেই। উঠ্-বোস ক'রেই সে রাত ত কেটে গেল।

যে মনীষী বলেছেন যে, পৃথিবীতে অসম্ভব ব'লে কিছুই নেই—ও কথাটাকে অভিধান থেকে তুলে দাও, গভীর অভিজ্ঞতার কথা মনে ক'রে অবাক হয়ে বলতে লাগ্‌লুম, তাই ত এ কি হলো?

মেঘ-কেটে তীব্র জ্যোৎস্না যেন বিদ্রূপ ক'রে আর এক জ্যোৎস্না রাতের কথা মনে করিয়ে দিয়ে গেল। মনের সমালোচক মহাশয় সহজ নির্দ্দয়তার সঙ্গে—ব্যঙ্গের কর্কশ কণ্ঠে বল্লেন, উৎসব-রাজ কোথায় বিরাজে?

সেই রাত্রে এই পৃথিবীকে একটা মাটীর খেলা-ঘরের চাইতেও অবস্তু বলে মনে হলো। মানুষের কথা মনে করে সমস্ত গা ঘুলিয়ে বমি ক'রে ফেলবার ইচ্ছা করতে লাগ্‌লো।

মনে হলো মানুষকে কেবল শাস্তি দেবার জন্যে প্রকৃতি তার স্মৃতি-শক্তি দিয়েছেন। এই জগতের নিয়ন্তা বলে কোথাও কেউ নেই; আছে কেবল ভোগ লোলুপ বদ-মেজাজি প্রকৃতি আর স্বেচ্ছাচারিতা আর খেয়াল, অনাদি অনন্ত মহাশূন্য জুড়ে চির অমর!

আকাশ নিমেষে পরিষ্কার হ'য়ে গিয়ে চক্‌চকে চাঁদ দেখা গেল, নক্ষত্র চারিদিকে ঝল-মল করতে লাগ্‌লো; আবার নিমেষ ফেল্‌তে কালো মেঘে

চারিদিক ভরাট হয়ে গিয়ে যেন মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে মেঘেরা রণ-দুন্দুভি বাজাতে লাগ্‌লো।

আমার মনটা যে কি হয়ে গেল তা' আমি বর্ণনা করতে পারি নে। আকণ্ঠ বিক্তায় ভ'রে গিয়ে বিকারে রোগীর মাথাটার মত যেন উত্তপ্ত কটাহের মধ্যে অতীতের স্মৃতির যা-কিছু আবর্জ্জনা জঞ্জাল সব টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটিয়ে তুল্লে।

জোড় হাত ক'রে বল্লুম, ভগবান ভুলিয়ে দেও আমার সকল পূর্ব্ব স্মৃতি; আজ থেকে আমার মনকে ঐ আকাশের মত মহাশূন্যে পরিণত ক'রে দাও— তাতে যেন আর কোন দাগ না পড়ে!

শেষ রাত্রে অবাক হ'য়ে ভাবতে ব'সলাম, আমার তাতে কি? কেন এই অশান্তি? এ কি ঈর্ষা! দেহের অণু পরমাণু রক্তের প্রতিবিন্দুটি পর্য্যন্ত যেন ঘৃণায় চীৎকার ক'রে বলে উঠ্‌লো, না, না, তা কিছুতেই হ'তে পারে না।

তবে এই বিষের জ্বালা কিসের?

শেষ পর্য্যন্ত আমার নিজের কাছে নিজেরই কেমন লজ্জা লজ্জা করতে লাগ্‌লো।

তখন অরুণোদয় হচ্ছিল—ভাঙ্গা মেঘের উপর সিন্দুরে আলো—ভাঙ্গা হৃদয়ের উপর শোণিতবিন্দুর মতই বোধ করি ভীষণ দেখাচ্ছিল!—আমি ভয়ে চোখ বুজে আমার সমস্ত শক্তিকে আহরণ ক'রে গভীর সংকল্প গ্রহণ করলুম; বল্লাম, দেবতারা আমার সহায় হও, ঋষিগণ আমার সহায় হও, পিতৃলোক আমার সহায় হও, আমাকে এই আকাঙ্ক্ষা-নদীর তীরে আমার কামনার শবকে ভস্মীভূত ক'রে ফেল্‌তে তোমরা সবাই অমিত বল, অমোঘ আশীর্ব্বাদ এবং অসামান্য সহিষ্ণুতা দান কর।

প্রিয়তমের সৎকার করার পর মন যেমন একটা কঠিন বৈরাগ্যের কঠোর আবরণের মধ্যে মাথা গুঁড়ে খুঁড়ে রক্তা-রক্তি করে বসে, সমস্ত দিন আমার মনের সর্ব্বাঙ্গ থেকে যেন অজস্র শোণিত তেমনি ক'রেই নিঃসৃত হতে লাগ্‌লো। কত ধিক্কার দিলুম, কিন্তু সে বেহায়া!

এমনি ক'রে নিজের ফাঁসে গলা দিয়ে, নিজের তৈরী অস্ত্রে আত্মহত্যা ক'রে আমি যেন অশরীরী ভূতের মত আমার কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ ক'রে ফিরতে লাগ্‌লুম!

দিনের শেষে অবসন্নতার সঙ্গে এলো একটা অনিবার্য্য পিপাসা! মনে হ'ল শূন্যের অসহ্য আতপে মরুভূমি আজ বুঝি সমুদ্র শোষণ করতে চায়।

তাই কর্ত্তব্য ছেড়ে জন্ম জন্মান্তরের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আজ এই প্রথম ছুটলাম সমুদ্র দেখ্‌তে। এতদিন অবসর ছিল না; তাগিদও ছিল না। আজকের তাগিদকে ঠেকিয়ে রাখবার সাধ্য আর নেই!

দূর থেকেই জলের গর্জ্জন কানে এসে পৌঁছল—যেন অম্বর-অবনী কাঁপিয়ে বিরাট রথের চক্র-নির্ঘোষ! শব্দ-তরঙ্গ বায়ু-মণ্ডলকে সংক্ষুব্ধ ক'রে মানুষের অন্তর পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে তুলুচে! গম্ভীর আজ ধ্বনির ভিতর দিয়ে যেন আত্ম-প্রকাশ করচেন!

ক্রমে লবণাম্বুর গন্ধ পেলুম—নিশ্বাস প্রশ্বাসে যেন সহজ স্বস্তি অনুভব করলাম। চোখের সামনে নীলিমার অনন্ত বিস্তার, জলের কল্লোল; ঢেউ-এর তা-তা থৈই নৃত্যের সঙ্গে—কার হৃদয় না ময়ূরের মত নেচে উঠে!

আকাশ অনন্ত বিস্তৃত; কিন্তু শূন্য সমুদ্রের পূর্ণতা মানুষের মনকে পরিপূর্ণ ক'রে দেয়; মনে হয় কোথাও যেন খালি নেই, আর কিছুই চাই না; সবই সেখানে আছে।

অবাক্ হয়ে ব'সে জীবনে যা কখনো দেখ্‌বার সৌভাগ্য হয় নি, তাই দেখে মনকে ভরিয়ে নিতে লাগ্‌লুম। ঢেউগুলো বাহু বাড়িয়ে যেন মানুষকে ডাক দিচ্ছে,—আয় আয়! তোর এক তিলও খালি থাকবে না, এ আমার ফাঁকির কারবার নয়!

হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড ঢেউ এসে আমার কোমর পর্যান্ত ডুবিয়ে দিয়ে গেল। এই রসিকতার জন্য একটুও প্রস্তুত ছিলাম না। জল চ'লে গেলে, জুতোর দিকে চেয়ে দেখলুম—তাতে এক রাশ বালি—ভাবচি কি করি! পিছন থেকে একজন এমন ক'রে হাসচে শুনতে পেলুম, যার দিকে চাইতেও আমার লজ্জা হ'তে লাগ্‌লো।

একটু দূরে স'রে এসে ভিজে কাপড়েই বালির উপর ব'সে মনে করচি—বাড়ী ফিরতে হবে—আর থাকা চলে না; এমন সময় একটি ছোট খাটো শ্যামবর্ণের মেয়ে এসে বল্লে, আপনি বুঝি এই প্রথম সমুদ্র দেখ্‌তে এসেছেন?

লজ্জায় আমার দু'কান গরম হয়ে উঠ্‌লো; একটু রাগও যেন হলো, গলার স্বরে বুঝতে পারলুম যে, হাসির উচ্ছ্বাস ঐ কণ্ঠ থেকেই ইতিপূর্ব্বে নিঃসৃত হচ্ছিল।

অপ্রতিভ হয়ে বল্লুম, আমার জানা ছিল না।

মেয়েটি বল্লে, তা আগেই আমি অনুমান করেছিলাম; আপনাকে সাবধান করে দেবার ইচ্ছা হচ্ছিল। কিন্তু আপনার গাম্ভীর্য্য দেখে সাহস পাই নি।

কথার উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম।

মেয়েটি আবার কথা কইলে, আর ভিজে কাপড়ে থাকবেন না—কত দূরে বাড়ী? যান।

সেই উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে ভারি জুতো জোড়াটা নিয়ে দু-পা যেতেই মেয়েটি আবার বল্লে, দেখুন, জুতো জোড়া খুলে ফেলুন, বড্ড ভারি হয়ে যায় নি?

তা হয়েচে।

এক কাজ করবেন? এই কাছেই আমাদের বাড়ী, ঐ দেখা যাচ্চে; চলুন না আমাদের বাড়ীতে—কাপড় বদলে নেবেন, আগুন-তাতে আধ ঘণ্টার মধ্যে আপনার জুতো শুকিয়ে খট্‌খটে ক'রে দেব।

নাঃ, বাসাতেই যাই।

মেয়েটি পরিষ্কার গলায় বল্লে, আপনি বুঝি অপরিচিত মানুষদের বাড়ী যেতে ভালবাসেন না।

এ আবার কি? আমি অবাক হয়ে গেলাম—এই মেয়েটির অনাড়ম্বর সরলতায়; আশ্চর্য্য এই যে তাতে প্রগল্‌ভতার লেশ পর্য্যন্ত ছিল না।

হঠাৎ আমার মনটা কেমন হাল্‌কা হয়ে, এক নিমেষের মধ্যে আড়ষ্ট ভাব কেটে গেল। বোধ করি সহজ সরলের কাছে মানুষের এমনি ক'রেই শিশু সারল্য জেগে উঠে। বল্লুম, হাসি;—এবং এত কথার পরেও যদি অপরিচিত বলি তাহলে মিথ্যা কথাই বলা হয়।

আমার মুখ দিয়ে, 'তুমি' বার হ'চ্ছিল কিন্তু এবারের মত সাম্‌লে নিলুম।

এই মেয়েটিকে বোধ করি কেউ কখন আপনি ব'লে কথা কয় নি; তার নম্রতা দুর্ব্বার চেয়েও নীচু; এক কথায় তা' পরিস্ফুট হয়।

মেয়েটি বল্লে, তবে আর দেরি করবেন না, আমার সঙ্গে আসুন।

আমি ধীরে ধীরে তাদের বাড়ীর দিকে চল্‌তে চল্‌তে নিমেষের মধ্যে লক্ষ-চিন্তায় মনকে চঞ্চল ক'রে তুল্‌লাম। কে ডাক্‌লে তা জানি নে, কোথায় চলেছি তা জানি নে! তাই বলে যেতে যে খুব মন্দ লাগ্‌ছিল তাও না। মনে আশঙ্কার এক বিন্দুও ছিল না; তার অজানার সমস্তটা যেন আমার কেমন ক'রে নিমেষে জানা হ'য়ে গিয়েছিল; আমি যেন মনে মনে জেনেই ব'সেছিলুম যে, এই সবটার মধ্যে ভয়ের কিছুই ছিল না—যা কিছু সে কেবলই একটা অনাবিল আনন্দের!

ভাল-মন্দকে এমনি ক'রে যুক্তি-বিচারের বেড়া ডিঙিয়ে ধ'রে নেবার কোন

ক্ষমতা মনের আছে কি না জানি নে ; মাঝে মাঝে, আছে—এই কথাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় !

বাইরের ঘরে গিয়ে আমি দাঁড়ালুম ; সেখেনে বসবার বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না ; মেয়েটি হরিণের মত ক্ষিপ্রপদে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গিয়ে এক পলের মধ্যে নেমে এসে বল্লে, উপরে চলুন।

উপরে কেন ? এই খেনে থাকি।

ওমা ! এখেনে বস্‌বার দাঁড়াবার জায়গা নেই—না, না এখেনে নয়, উপরে আসুন ; স্বরের মধ্যে এমন একটা কাকুতি মিনতি ছিল যে ভীষ্মও বোধ করি তা লঙ্ঘন করতে পারতেন না।

উপরে উঠে বারান্দায় একখানি ছোট মাদুরের উপর বসলাম।

অদূরে রান্না ঘরে একটি ছোট উনুনের উপর ভাতের হাঁড়ী চড়ান ছিল ; সেটিকে নামিয়ে রেখে—তার পাশে আমার জুতোজোড়া শুকোতে দেওয়া হলো।

রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মেয়েটি মৃদু হেসে বল্লে, এখুনি আস্‌চি।

মিনিট দুই পরে একখানি ধোপ-দস্ত ধুতি নিয়ে এসে বল্লে, এইবার ওই ভিজে কাপড়টা ছেড়ে ফেলুন। জামাটাও ত ভিজে গেছে ; ওটা দিন, আমি নিংড়ে শুকিয়ে দি।

কৈ, জামা ত ভেজে নি !

মেয়েটি আমার জামা ধরে বল্লে, ওমা ! আপনি ত খুব, এ বুঝি ভেজা নয় !

নিমেষে তীরের মত ঘরে ঢুকে—একটা গায়ে দেবার চাদর এনে বল্লে, নিন্, ও সব ছেড়ে ফেলুন। আমি একটু চা ক'রে দি আপনাকে।

না, না, থাক্, চা আমি খাই নে।

মেয়েটি এক গাল হেসে বল্লে, আপনার সব বিদ্যে আমি টের পেয়েছি, পুরুষ মানুষে চা খায় না—সেকি একটা কথা ; হাঁ আপনি যদি ডাক্তার হ'তেন ত বিশ্বাস করতুম !

কেন ডাক্তারেরা বুঝি চা খায় না ?

জানি নে খায় কি না খায় ; কিন্তু অন্য লোককে চা খেতে ভারি মানা করেন তাঁরা। এই দেখুন না, আমার মাসী-মা'র কত দিনের চায়ের অভ্যাস ত ?—ডাক্তারেরা মানা ক'রে দিয়েছেন—মাসী-মা'র ভারি কষ্ট হয় !

কেন ? কি হয়েছে তাঁর ?

ভারি অসুখ, তাই ত আমি তাঁকে নিয়ে এখেনে এসে রয়েছি।

একলা তুমি? একান্ত বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলুম।

নাঃ, আর আমার তের চৌদ্দ বছরের ভাই কুশল; সে এখন চাকরটাকে নিয়ে হাটে গেছে।

কি অসুখ হয়েছে মাসী-মা'র?

মেয়েটি আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বল্লে, ডাক্তার বল্‌তে মানা ক'রেছেন—থাইসিস্।

স্তব্ধ হয়ে রইলুম।

চা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলুম, মাসী-মা'র আর কে আছেন?

তিনি বিধবা। ছেলে মেয়ে নেই।

তোমরা কত দিন এখেনে এসেচ?

তিন মাসের বেশী হবে।

তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে ত?

তা ঠিক জানি নে, বোধ হয় একটু জোর পেয়েছেন। এখন সকালে একটু উঠ্‌তে হাঁট্‌তে পার্‌চেন।

কার চিকিৎসা হচ্চে?

কল্‌কেতায় গোপাল ডাক্তারের চিকিৎসা হচ্ছিল—তিনিই এখেনে আস্‌তে বলেচেন।

এখানে কোন ডাক্তার দেখেন না?

দরকার হয় নি। হলে যিনি নামজাদা বড় ডাক্তার তাঁকেই ডাক্‌বো।

মেয়েটির অদ্ভুত সাহস দেখে অবাক্ হ'য়ে গেলাম; যেন কোন অবস্থাকেই সে একটুও ভয় করে না। বাঙালীর ঘরে এমন একটা বড় দেখা যায় না।

সে বল্লে, এই সন্ধ্যের সময়টা তিনি ভারি অবসন্ন বোধ করেন, তাই আপনার সঙ্গে আজ আর আলাপ হলো না। একদিন সকালে ক'রে এলে আলাপ করিয়ে দেব।

আমি হাসলুম—আমাকে কি ক'রে এই এত বড় জায়গার মধ্যে খুঁজে বার ক'রবে?

কেন? নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে আর একদিন দেখা হবে। সে দিন সব জেনে নেব।

আজকে বুঝি কিছু জান্‌তে নেই?

আজ জান্‌তে চাইলে আপনি রাগ করবেন যে। জোর ক'রে এসে ও সব কথা জিজ্ঞেস করতে নেই। যে দিন নিজে আস্‌বেন।

হেসে বল্লুম সে দিনকার আসাই বুঝি গ্রাহ্য হবে?

তা কেন? আমি ত আর বলচি নে যে, আজকের আসা, নট্‌-গ্র্যান্‌টেড।

এই ইংরেজি কথার বুক্‌নিটি দিয়ে—তার মুখখানি আরক্তিম হয়ে গেল। আমি যেন লজ্জার কারণটা ঠিক বুঝতে পারলুম।

এক প্রকৃতির লোক থাকে যারা হঠাৎ নিজের প্রকৃত পরিচয় দিতে চায় না,—অভ্যাসের বশে, সেটা প্রকাশ হয়ে গেলে, তারা এমনি লজ্জা পায়। সে ইংরেজি জানে একথা হয় ত' বিশেষ ক'রে লুকাবার প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু পাছে একটা কায়দা কি বাহাদুরি দেখান হয়ে গিয়ে থাকে—এই চিন্তায় সে হয় ত অনেকখানি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

বল্লুম তা' আর একদিন এসে তাহলে আজকের আসাটা যে রাতিল নয় সেইটাই প্রমাণ করে যেতে হবে।

মেয়েটি একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে বল্লে, সে ত' আপনার সৌজন্যের এবং বিশেষ করে অনুগ্রহের উপর নির্ভর করবে।

বল্লুম সৌজন্যের দিক দিয়ে—আমার একটা কর্তব্যের কথাই মনে আস্‌চে, সেটা যদি না করা হয় তা হলে একটা বড় রকম ত্রুটি থেকে যাবে বোধ করি।

আমার মুখের উপর দৃষ্টি ফেলে, কৌতূহলী ভাবে সে বল্লে, কি সেটা?

তোমার নামটি?

ওঃ, এই? আমার নাম নীলিমা; মাসী-মা আমাকে নীলমণি বলেন। ছেলেবেলায় আমাকে নীলমণি বল্লে রাগ হতো; কিন্তু এখন আর রাগ করি নে। এখন যে বড় হয়েচি।

মনে মনে একটু হেসে নিলাম।

উঠে দাঁড়িয়ে বল্লুম, তবে আজকে বাড়ী যাই; কাল বিকেলে আবার আস্‌বো।

নীলিমা বল্লে, বিকেলে কিন্তু মাসী-মা'র সঙ্গে দেখা হওয়া শক্ত। সকালে বুঝি আপনার বড্ড কাজ?

বল্লুম, একেবারে সকালের দিকটা হয় না। দশটা এগারটার সময় সমুদ্র স্নান করতে আস্‌বো ভাবচি কাল, কিন্তু সে যে ভারি অসময়।

নাঃ একটুও অসময় হবে না। সে সময় এলে মাসী-মা খুব খুশী হবেন।

আচ্ছা চেষ্টা দেখ্‌বো, যদি একান্ত বাধা না হয় ত তোমার মাসী-মা'র সঙ্গে আলাপ ক'রে যাবো।

বেরিয়ে এসে আবার সমুদ্রের দিকে গেলুম। চাঁদের আলোয় জল কালো দেখাচ্ছে—আর পাড়ের বালি সাদা হয়ে উঠেছে!

একটা বেঞ্চের উপর ব'সে পড়ে জলের সঙ্গে আলোর খেলা দেখ্‌তে লাগলুম। নির্জ্জন বেলার উপর সফেন তরঙ্গের মৃদঙ্গ ধ্বনি যেন আর এক দিনের সায়াহ্নের কথা মনে এনে দিতে লাগ্‌লো। সে দিন জনাকীর্ণ বাদ্য-মুখর আলোকোদ্ভাসিত উদ্যানের মধ্যে মানুষের হাতে-গড়া উৎসবের আনন্দ-হিন্দোলের মধ্যে মন মাতাল হয়ে উঠেছিল। আজো মনের মধ্যে তেমনি যেন একটা সুখের অনুভূতির মৃদু স্পর্শ বিরাটের তাণ্ডবের মধ্যে জ্যোৎস্নার লীলাঞ্চলের উতলা সঞ্চালনে, আপনার ক্ষুদ্রত্বের জন্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয়ে পুলকোল্লাসে বিলসিত হয়ে উঠ্‌লো!

সে দিনের বাইরের অনুষ্ঠানগুলি সবই ছিল সীমার বেড়ার মধ্যে খর্ব্ব হয়ে, কেবল মনের ভিতরের প্রমোদ প্রাঙ্গণটি ছিল দিগন্ত বিস্তৃত! আজ বিস্ময় বোধ করলুম বহিঃপ্রকৃতির সীমাহীন প্রসারের ভিতর গুটিপোকার ক্ষুদ্র আবরণের মত সুখ-দুঃখ জড়িত মানুষের ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি ক'রে!

বহুদিনের রোগ শয্যা থেকে উঠে আরোগ্য স্নানের পর পা যেমন ক'রে টল্‌তে থাকে, পথে যেতে যেতে আমার পাও যেন তেমনি করে টলে যেতে লাগ্‌লো। ব্যাধির বাধা ক্লেদমুক্ত নিরাময় দেহে অরুচির অবসান হয়ে যেমন একটা ক্ষুধা জাগতে থাকে—আমার মনের গোপন পুরে হঠাৎ যেন তেমনি-তর একটা কিছুর অনুভূতি বোধ করে আমি বিস্ময় বিহ্বল হয়ে পড়লুম!

এ আবার কি উৎপাত!

* * *

জীবনে এই প্রথম সমুদ্র স্নান। এর ভিতর যে এতখানি হাঙ্গাম নিহিত, তা' জানতুম না!

জলে নেমে প'ড়ে হঠাৎ বুঝলুম যে, গঙ্গা, কি, নদী-স্নানের মত ব্যাপারটা সহজ নয়। কোমর জলে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতে, একটা ঢেউ এসে বেয়াড়া ধাক্কা দিয়ে বলে গেল খবরদার! সেবার পড়্‌তে পড়্‌তে রয়ে গেলুম।

কিন্তু এত সহজে রণে ভঙ্গ দিতেও লজ্জা করলো। পাশে একটি লোক স্নান করছিলেন, তাঁকে দে'খলুম যে, উঁচু ঢেউ-এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঁচু হয়ে

উঠ্‌ছেন—আর ঢেউটা চ'লে গেল বেশ সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। তাঁর দেখা-দেখি কায়দাটা অচিরে অভ্যাস করে নিয়ে মনে মনে একটু স্বস্তি বোধ করলুম।

সে লোকটি আমার চেয়ে একটু এগিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন—আমি ভয়েই বোধ করি অতখানি অগ্রসর হইনি।

একবার ঢেউ-এর সঙ্গে উঠে পরিষ্কার অনুভব করলাম যে, আমি একটা সমূহ-বিপদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছি। হঠাৎ ঢেউটা চূর্ণ হয়ে গেল—আর সেই সঙ্গে আমার সমস্ত শরীরকে যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে গেল। দুখানা হাত যেন দেহ থেকে সজোরে কে ছিঁড়ে নিয়ে গেল। ব্যাপারটা শেষ হলে দেখলাম তটের উপর প'ড়ে আছি—আর বাঁ হাতের গোড়াটা সম্পূর্ণ স্থানচ্যুত হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে, অপর হাত দিয়ে সেটাকে তুলে ধরতেই—সশব্দে সেটা স্বস্থানে ফিরে এলো, কিন্তু যন্ত্রণার আর অবধি রইল না।

তীরে এসে উঠে মনে করলাম যে, তখুনি হাসপাতালে গিয়ে একটা ভালো ক'রে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়ে নি; কিন্তু তার আগেই নীলিমা আর তার ভাই কুশল এসে আমাকে গ্রেপ্তার ক'রে ব'সল।

বল্লুম, হাতে ভারি লেগেছে, হাসপাতালে যাবো।

নীলিমা বল্লে, চলুন ত' আমাদের বাড়ী—আমি সব ঠিক ক'রে ওষুধ দেব, একটুও ব্যথা থাক্‌বে না।

ভাই-বোনে আমার হাতের রীতিমত ব্যবস্থা ক'রে বল্লে, এর চেয়ে আর বেশী কি হতো আপনার হাসপাতালে?

নীলিমা বল্লে, আপনাকে এক ডোজ আর্নিকা দিলেই ব্যথা আর থাকবে না।

তবে দিতে দেরি করচ কেন?

এই যে, বলে সে ঘরের মধ্যে চ'লে গিয়ে একটা ছোট গ্লাসে ক'রে ওষুধ এনে দিলে—দেখুন পনর মিনিটের মধ্যে কি আশ্চর্য্য ফল হয়।

তাহলে ত' বুঝতে হবে তোমরা ম্যাজিক জান।

মাসী-মা এলেন। ঠাণ্ডা দুটি চোখ যেন আমার গায়ের উপর দিয়ে বুলিয়ে একটু হেসে বল্লেন, পিত্তি প'ড়ে যাবে, একটু মিছরির পানা দে না, নীলমণি, ততক্ষণ।

তাঁকে প্রণাম করবার ইচ্ছা হলো; কিন্তু লজ্জায় তা ঘটে উঠ্‌ল না।

আজ সকাল থেকে—মাসী-মা বল্লেন, নীলমণির উৎসাহের আর সীমা-পরি-

সীমা নেই। একঘর রেঁধে-বেড়ে ব'সে আছে, কখন তুমি আসবে। তা বাবা, আমার যেমন কপাল, দিন যায় ত' ক্ষণ যায় না। কোথাও কিছু নেই, সুস্থ মানুষ—নেয়ে এসে খাবে—তা না হাতখানার কি দশা হলো। দুটো খেয়ে নিয়ে, একবার হাসপাতালে গিয়ে দেখিয়েই এসো। পুরুষ মানুষের হাত—এ ত আমাদের নয় যে ঠুঁটো হ'য়ে থাকলেও ক্ষতি নেই!

নীলিমা সেখেনে ছিল, সে যেন একটু অস্বস্তি বোধ ক'রে কথা চাপা দেবার জন্যে বল্লে, মাসী-মা, তুমি জান না আর্নিকা কি ভাল ওষুধ। সেবার বকুলের বাবা ঘোড়া থেকে প'ড়ে গিয়ে ওই আর্নিকাতেই বেঁচে গেলেন।

মাসী-মা যেন একটু অন্যমনস্ক ভাবে বল্লেন, তা হবে হয় ত।

কুশল দ্রুতপদে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে রান্না ঘরের মধ্যে চলে গিয়ে ডাকলে—দিদি দিদি—ও দিদি!

একটা কাঁচের গ্লাসে মিছরির জল নিয়ে এসে নীলিমা বল্লে—নেবু দিয়ে দি?

মাসী-মা অবাক হয়ে গিয়ে বল্লেন, নীলু, নেবু পেলি কোত্থেকে লা?

ওই কুশো—কি জানি কোত্থেকে,—নিয়ে এলো মাসী-মা।

কুশল, কেউ প্রশ্ন করবার আগেই বল্লে, নুন-গোলার সায়েবের বাড়ী থেকে।

মাসী-মা বল্লেন, সে আবার কোথায় রে?

নীলিমা হেসে বল্লে, ওর যেমন কথা—এই ইলাদি'দর বাড়ী থেকে, মাসী-মা।

আমার বুকের মধ্যে কি যেন একটা ধাক্কা দিয়ে চলে গেল। ইচ্ছা মুখ থেকে কি জানি কেন, হঠাৎ জোর ক'রে, বেরিয়ে প'ড়ল—থাকগে শুধু মিছরির জলই দেও।

নীলিমা স্নিগ্ধ হেসে বল্লে, একেবারে মিষ্টি কি ভাল লাগে, একটু টক্ হলে আপনার লাগবে ভাল।

—ক্রমশ



অধিকারী

শ্রীবিমলা দেবী

রাজ-উদ্যানে রাজ-মহিষীর বহু যত্ন রোপিত লতার বুকে ফুল ফুটে উঠল; তার স্নিগ্ধ সৌরভে আকাশকে ভারাক্রান্ত করে রাজ-প্রাসাদের চারিদিক ঘিরে বাতাস বইতে সুরু করলে। ফুলের বন্দনা গানে প্রভাত সারা আকাশ রাঙিয়ে দিলে। শিউলী-তলায় লাজভরে শিউলী ফুলেরা ঝরে গেল। রাজ-উদ্যানের প্রধান মালী এসে বল্লে—"আমার ফুল।" রাজ-বাড়ীর চিত্রকর এসে হেসে বল্লে—"ওগো মালী, তোমার ঘরে ও-ফুল শোভা পায় না, ও-ফুল আমার।" কবি এসে বল্লে—"ওগো শিল্পি, আমার আজন্মের সাধন, ও-ফুল আমার।" খেলা ফেলে উন্মনা শিশু ছুটে এসে দুই হাত বাড়িয়ে বলে উঠল—"ও-ফুল আমাকে দাও, ও-ফুল আমার।" তরুণ তার নির্দ্দিষ্ট পথ ভুলে এসে বল্লে—"ওগো, ও যে আমার।" সকলে সমস্বরে বলে উঠল—"ও যে আমার।"

যথা সময়ে রাজ-মহিষীর অন্তঃপুরে সে সংবাদ গেল। রাজ-উদ্যানের ফুলে কার অধিকার এই নিয়ে বাকবিতণ্ডা। কি ভীষণ মূঢ়তা। ক্রুদ্ধা রাজ-মহিষী প্রহরীকে ডেকে বল্লেন—"প্রহরী, আমার উদ্যানের ফুলে কারা অধিকার করতে এসেছে? তাদের বলে দাও, ও-ফুল রাজ-মহিষীর। এত বড় দুঃসাহসী মূঢ় কে আছে যে, রাজ-উদ্যানের ফুলে অধিকার করবার স্পর্দ্ধা রাখে!" প্রহরী চলে গেল; ক্রুদ্ধা রাণী গর্জ্জে উঠলেন— এত বড় ধৃষ্টতার উচিত শাস্তি চাই!"

সন্ধ্যার অন্ধকার তরুশাখে বনের বুকে ঘনিয়ে এল। প্রহরী এসে বল্লে—"ও-ফুল রাজ-মহিষীর।" সকলে সমস্বরে বলে উঠল—"ও ফুল—আমার।"

সম্মুখে রাজা বসে। বিচার-গৃহ লোকে লোকে পূর্ণ হয়ে উঠেছে, সম্মুখে দাঁড়িয়ে বন্দীরা শঙ্কিত হৃদয়ে শাস্তির প্রতীক্ষা করছে। রাজ-মহিষীর ফুলে অধিকার করবার স্পর্দ্ধা! ঝরকার আড়ালে ক্রুদ্ধা মহিষী রাজার কঠিন শাস্তির প্রতীক্ষা করছেন। এত বড় ধৃষ্টতার উচিত শাস্তি যে চাই-ই! রাজা প্রশ্ন করলেন—"রাজ-মহিষীর ফুল নেবার সাহস কর কোন্ অধিকারে?" সকলে

সমস্বরে বলে উঠল—"মহারাজ, ও-ফুল আমায় মুগ্ধ করেছে, ও-ফুল আমার।" সকলের বাকবিতণ্ডার মাঝে সমাপ্তি তার শ্বেতবস্ত্রে সব দেহ আচ্ছাদিত করে এক হস্তে শান্তি আর হস্তে পূর্ণতা নিয়ে সভার মাঝে নেমে এসে বল্লেন—"ও ফুল কারুর নয় ও, ফুল আমার।" ফুল তার বুক-ভরা মধু সৌন্দর্য্য নিয়ে সমাপ্তির চরণ তলে লুটিয়ে পড়ে বলে উঠল—"ওগো, শূন্য, ওগো পূর্ণ, আমি তোমারই। অধিকারীর দল স্তব্ধ হ'য়ে চেয়ে রইল, ফুল ঝরে গেল।

জাসিন্তো বেনাভান্তে

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

(১)

পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সম্বন্ধ আজ নানা দিক দিয়ে ক্রমশ গাঢ় হয়ে আসছে। যে সরল দাসত্বের বন্ধনী দিয়ে পশ্চিম চেয়েছিল যে, সে পূর্ব্বকে তার রাজভবনের দাস করে রাখবে—ক্রমশ সে বন্ধন ছিন্ন হয়ে চলেছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সংঘর্ষ আজ সুস্পষ্ট; হয় ত অনিবার্য্য।

পশ্চিমের জাতিরা আজ তাদের সাম্রাজ্যের-ক্ষুধায় চায় সসাগরা পৃথিবীর মালিক হতে; সে চায় তার সভ্যতা ও ধর্ম্ম অন্য জাতির যদি তাদের কামান আর বারুদ দিয়ে ঠেকাবার শক্তি না থাকে তবে নিশ্চয়ই গ্রহণ করতে হবে। পশ্চিম যেন সমস্ত জগৎকে সভ্য করবার আদেশ পেয়েছে আকাশ থেকে।

পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলন ও সহযোগিতার কথায় যাঁদের আত্মাহুতি জন্মগ্রহণ করে য়ুরোপের স্বার্থান্ধ জাতির অহংকারী-মনে আঘাত করছে—তাঁরা অধিকাংশই সেই পশ্চিমের লোক। যুদ্ধোন্মত্ত য়ুরোপে আজ জাতীয়তার অন্ধ প্রেমের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্য-ক্ষুধার রাক্ষুসী-বৃত্তির বিরুদ্ধে, সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণের দিকে চেয়ে যে সমস্ত মহাপুরুষ আপনাদের অসাধারণ ব্যক্তিত্বে স্ব-প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমগ্র

য়ুরোপের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের বীরত্বের ও শৌর্য্যের কথা আজ পূর্ব্বকে মুগ্ধ করেছে। পশ্চিমের সভ্যতা আজ এই সমস্ত ব্যক্তির জীবনে ও সাধনায় ব্যক্ত; পশ্চিমের সভ্যতা আজ পশ্চিমের জাতির মধ্যে নাই। য়ুরোপের আত্মা আজ এই সমস্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় করে আছে।

তাই এই সমস্ত ব্যক্তি আজ পূর্ব্বের দিকে শিক্ষার জন্য, মিলনের জন্য চাইতে পেরেছেন; তাঁদের শান্ত-উদার অন্তর নয়নে পূর্ব্বের মহীয়সী সভ্যতার জ্যোতি প্রতিভাত হয়েছে।

জাসিন্তো বেনাভান্তে সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে প্রথমেই পূর্ব্ব ও পশ্চিমের এই সম্বন্ধের কথা মনে পড়ল, কারণ পূর্ব্বের কারুকলাময়ী সভ্যতার তপোবনে পশ্চিমের মদ-ঐরাবতের মত্ত-অভিযানের বিরুদ্ধে যাঁরা আজ দাঁড়িয়েছেন, বেনাভান্তে তাঁদের মধ্যে একজন। The Fire of Dragon নাটকে আমরা Siliandia র মধ্যে য়ুরোপের এই মিথ্যা-সভ্যতার অভিযানের স্পষ্ট মূর্ত্তি দেখতে পাই। যে সমস্ত কলা-কৌশলে পশ্চিম স্তিমিত-পূর্ব্বকে আপনার বশ্যতায় এনেছিল, বেনাভান্তে এই নাটকে তার স্বরূপ ফুটিয়েছেন। বেনাভান্তের এই নাটকের কথায় মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের বাণীর সঙ্গে বোধ হয় বেনাভান্তের সাক্ষাৎযোগ আছে।

ভারতবর্ষে Nirvan রাজ্যের রাজা Dani Sar. এই রাজ্যে আসে মিলনের ও সহযোগিতার প্রস্তাব নিয়ে Siliandia. Siliandia পশ্চিমের বর্ত্তমান সভ্যতার প্রতীক। সঙ্গে তার Mr. Morris, Mr. Cotton, Mr. Clergyman, সৈন্য সামন্ত ইত্যাদি। Dani Sar ভাল মানুষ; সে দেখল, Nirvan রাজ্যের এ ত লাভ—একটা মিলনের সুবিধা। সে Siliandia-কে সাদরে গ্রহণ করল। Dani Sar-এর বাণী কিন্তু প্রতিবাদ করে বলেছিল,

"তুমি বুঝছ না রাজা, এদের চোখের নীল সরলতার কিংবা সত্যবাদিতার চিহ্ন নয়!"

Dani Sar হাসে।

ক্রমশ ক্রমশ কখন রাজ-অন্তঃপুরের সোনার পঞ্চ-প্রদীপের জায়গায় বিজলীর অদ্ভুত আলো জ্বলে উঠল; সঙ্গীত যেখানে ছিল হাওয়ার মত অবাধ আর মুক্ত, সে কখন এল গ্রামোফনে আটকা পড়ে; ক্রমশ ক্রমশ নানারকমের অদ্ভুত যন্ত্র ছেয়ে ফেলল Nirvan রাজ্য। প্রজারা সন্দেহ করে। Dani Sar-কে তারা এসে বলে, আমরা প্রমাণ পেয়েছি, ওরা আমাদের ঘৃণা করে। Dani Sar বলে,

ঘৃণা ?—ঘৃণা করতে যাবে কেন তারা ? তাদের বর্ণ শ্বেত বলে, তাদের চোখের মণি নীল বলে, তাদের চুল সোনালী বলে ? তাদের দেশ অনুর্ব্বর, তারা যদি আমাদের দেশের শস্যে বাঁচে তাদের ত' আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই !

কিন্তু এ ধারে, Mr. Morris, Mr. Cotton, আর Mr. Clergyman বলাবলি করে,—

Mr. Cotton - এবারে ডিপ্লোমেসী হ'বে বেঁচে গেলাম দেখছি--

Mr. Morris—অবশ্য ; ঠিক সময়ে ভারী সৈন্যের দল পাঠাতে পারা গিয়েছিল বলে।

Mr. Cotton—এই তো শক্তি। একদিন এইটেই হবে আমাদের একমাত্র যুক্তি।

Mr. Clergyman,—তোমরা কিন্তু ঈশ্বরের সহায়ের কথা ভুলে যাচ্ছ। ঈশ্বরের অনুকম্পা আমাদের দিকে। আমরা আগুনের মত পুড়িয়ে চলি না, আমরা আলোর মত অন্ধকার দূর করে চলি। মনে রেখো, আত্মার জন্যই জয়। আমরা এই সমস্ত লোকদের খৃষ্টধর্ম্মান্তরিত করব। তবে ত এরা ঈশ্বরের অনুকম্পার যোগ্য হবে।

এই ধর্ম্ম আর সৈন্যের আবরণের অন্তরালে Nirvan রাজ্যের লোকেরা দেখে, তারা এই বিদেশীদের অস্ত্রের কলে দিবা চলা-ফেরা করে চলেছে।

Dani Sar-এর মনে অশান্তি দেখা দিল। Dani Sar দেখে যে, তার ভাই তার বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে কখন। অবশেষে একদিন মৃগয়ার সময় Dani Sar দেখে, সে বন্দী। তার ভাইকে এরা সিংহাসনের প্রলোভন দেখিয়ে যুদ্ধে উত্তেজিত করে। সেই যুদ্ধে সে নিহত। Dain Sar-এর সম্মুখে সন্ধি পত্র। তার রাজ্য তার নিজের হাতে বিদেশীকে তুলে দিতে হবে।

"I am the prisoner the slave...and I am pressed and urged and even forced to sign a treaty which hands over to them forever my kingdom. It is not generosity that prompts them, *it is Europe that threatens calling them curel traitors,* and thus they need the shadow of a king to give up by his own hands what they have not the courage to take as their own . . . But it is not robbery, it is not pillage, it is

tribute which Nirvan pays as the ally and friend of Saliandia . . . What Siliandia did to nirvan and to me matters nothing so long as the worthy diplomacy of Europe has found specious pleas to cover bad actions . . . Protectorate, War-Indemnity . . . civilization . . . progress."

বেনাভান্তের এই নাটক সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে কোনও ইংরেজ সমালোচক লিখেছিলেন, "It is difficult to understand Benavente's idea in writing the play."

(২)

১৮৬৬ সালে ১২ই আগষ্ট ম্যাড্রিদ শহরে জাসিন্তো বেনাভান্তে জন্মগ্রহণ করেন। সেই বৎসরের প্রারম্ভেই Pyrenee পর্ব্বতের ওপারে রম্যাঁ রলাঁ জন্মগ্রহণ করেন। জাসিন্তোর পিতা ছিলেন একজন শিশু-রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। জাসিন্তোর পিতা শিশুদের যে ডাক্তার ছিলেন, সে তাঁর ব্যবসার জন্য নয়, শিশুদের প্রতি একান্ত মমতার বশে তিনি সেই বিদ্যায় পারদর্শী হন। শিশুদের প্রতি এই মমতা ও সহৃদয়তা বেনাভান্তে তাঁর পিতার নিকট থেকে গ্রহণ করেন এবং তিনি যে পরে স্পেনে Children's Theatre-এর প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন, সে তাঁর পিতারই অনুপ্রেরণায়। বেনাভান্তে স্কুলে সাধারণত যাহাদের "অকালপক্ক" বলা হয় সেই শ্রেণীর ছেলে ছিলেন। স্কুল ও কলেজের পড়া শেষ করে উনিশ বৎসর বয়সে ম্যাড্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়নের জন্য যান। এই সময় একটা বিষম দুর্ঘটনা বেনাভান্তেকে উকিল হওয়া থেকে বাঁচিয়ে তাঁকে পথে বসিয়েছিল।—সে তাঁর পিতার মৃত্যু। এই রকম অনেক দুর্ঘটনা অনেক প্রসিদ্ধ লোককে অপ্রসিদ্ধির হাত থেকে বাঁচিয়েছে। পিতার মৃত্যুর পর নিরুপায় হয়ে তাঁকে আইন পড়া পরিত্যাগ করতে হয়। আইন ত্যাগ করে বেনাভান্তে সাহিত্যের পথে নামেন। এই সময় তিনি নিয়ত যেখানে থিয়েটার হত সেখানেই যেতেন এবং যখন যে কাজ পেয়েছেন তাতেই জীবিকা অর্জ্জন করেছেন।

এই সময় বেনাভান্তে রীতিমত শেক্‌স্‌পীয়ার পড়তে থাকেন। তখন প্যারিসের এক গৃহের নিভৃত অন্তরালে যুবক রঁলাও এমনি শেক্‌স্‌পীয়ারের মধ্যে

মগ্ন হয়ে চলেছিলেন; এ-ধারে স্পেনের রাজধানীর মধ্যে বেনাভান্তে শেক্‌স্‌পীয়ারের অমৃত উৎস থেকে শক্তি ও রস আহরণ করছিলেন।

এই সময়কার অভিজ্ঞতা বেনাভান্তের নাট্য-জীবনের যথেষ্ট কাজে লাগে। এই সময় বেনাভান্তে বহু দেশ পর্য্যটন করেন। এবং একবার কোনও সার্কাসের দলের কাজ নিয়ে তিনি রুষিয়ায় যান। এই সময় তাঁর নাট্য-জীবনের একটা বিশেষ দিক তাঁর মনে লাগে—সে সার্কাসের ক্লাউন। এই সব ক্লাউনদের ছবি বেনাভান্তের নাটকের অনেক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ জুড়ে আছে। এদের জীবন ও হাবভাব বেনাভান্তের মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। এই সার্কাসের ক্লাউনের জীবনকে আশ্রয় করে রুষিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার লিওনিড আন্দ্রিভ ব্যাহত জীবনের যে অমরনাট্য রচনা করেছেন তা আমরা সবাই জানি। বেনাভান্তে এদের মধ্যে দেখেছিলেন ও দেখিয়েছেন, তাঁর নিজের কথাতেই—all the epic of human laughter ..."

প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের বিশেষ একটী রূপ আছে। বাংলার সাহিত্য গীতি-বহুল। বাংলার বাউলগান, বৈষ্ণব কবিতা, দোঁহা,—বাংলার বিশেষত্ব; কারণ বাঙালী ছিল রূপতান্ত্রিক, তীব্র অনুরাগময়; বাংলা ছিল সবুজ। স্পেনের সাহিত্য-বিষয়ে বলতে গেলে তেমনি সাহিত্যে যে বিশেষ রূপটী চোখে পড়ে—সে নাটকের। য়ুরোপে বহু যুগ পূর্ব্ব থেকেই স্পেনে ও ইংলণ্ডে নাট্য-কলার রীতিমত উন্নতি হয়েছিল। তার কারণ, স্পেনীয়দের মনে রক্তমাংসের মানুষের প্রতি একটা দারুণ আগ্রহ ও ভালবাসা তার জাতীয় জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে আছে। এবং এই রক্তমাংসের মানুষের গতি-বিধির সঙ্গে নাট্য-কলার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। মানুষের মনের গতিই ত নাটকের ছন্দ। বর্ত্তমান স্পেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি Miguel De Unamuno. উনামুনোর "The Man of Flesh and Bone" নামক অপূর্ব্ব প্রবন্ধে যে রক্তমাংসের মানুষের জয়-গীতি গেয়েছেন, সেই মানুষের প্রতি আসক্তিই Lope De Vega হতে আরম্ভ করে Benevante পর্য্যন্ত বহু নাট্যকারের জন্ম দিয়াছে। Lope De Vega স্পেনের নাট্য-জগতের আদিস্রষ্টা এবং তিনি ছিলেন শেক্‌স্‌পীয়ারের সমসাময়িক। তিনি একা যত নাটক লিখেছেন বোধ হয় যে কোনও দেশে একটী শতাব্দীতে তত অভিনয়যোগ্য নাটক রচিত হয় না। তিনি সর্ব্বসমেত দুহাজার দু'শ খানা নাটক রচনা করেন।

জাসিন্তো বেনাভান্তের ঠিক পূর্ব্বেই স্পেনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন

Jose Echegaray. বেনাভান্তের সঙ্গে স্পেন-নাট্যে নূতন যুগের আরম্ভ হয়। Echegaray-র নাটকের নায়কেরা সব অস্বাভাবিক রকমের একটা উচ্ছ্বাসের তরঙ্গে নিয়ত উঠছে আর নামছে।

বেনাভান্তে স্পেনের নাটকের নব-জন্মদাতা। বেনাভান্তের বহু আগে যদিও Cervantes মানুষের বহ্বাড়ম্বর আর বড়কথার মিথ্যা সমারোহের বিরুদ্ধে স্পেনে তাঁর কলম চালিয়েছিলেন, তবুও স্পেনের সাহিত্যে ও জীবনে মৃত মধ্যযুগের কঙ্কাল-স্বরূপ সাহিত্যে বহ্বাড়ম্বরের বীরপুরুষটী অন্তর্হিত হন নি। বড় বড় বক্তৃতা, বড় বড় কথায়, নেপথ্যে ভয়াবহ মর্ম্মন্তুদ বক্তৃতা, সময়ে ও অসময়ে, এবং এই সমস্ত বক্তৃতার খাতিরে নাটকের যে প্রাণ সেই মানুষটীকে বিকৃত ও বিক্ষত করা, আজ মোগল-পাঠান আর রাজপুতের ত্রিবেণী-সঙ্গমপূত বাংলা নাট্যমঞ্চে যেমন অশোভন ভাবে শোভা পাচ্ছে, স্পেনের সে-দিনের নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে ঠিক সেই রকমই চলেছিল। স্পেনের এই সময়কার নাটক ও রঙ্গমঞ্চের সমালোচনায় Walter Starkie ম্যাতারলিঙ্কের যে সকরুণ উক্তিটী তুলেছিলেন, আমাদের বাংলা নাটক আর রঙ্গমঞ্চের দিকে চেয়ে সে দুঃখময় প্রশ্ন আপনি জাগে—

"Must we indeed, roar like the Atrides before the Eternal God will reveal himself in our life? And is he never by our side at times when the air is calm and the lamp burns on unflickering?"

"চিরকাল কি আমরা শুধু চীৎকার করে ডেকে মরব। কবে তিনি জীবনে ধরা দেবেন? এই শান্ত অপলক প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোয় তিনি কি আবির্ভূত হবেন না?"

বাংলার সাহিত্যের জীবনে সে অন্তর লক্ষ্মী জীবন হয়ে আজও ধরা দেয় নি—সাহিত্যের শান্ত অপলক প্রদীপের আলোর মমতা আজও বুঝি জ্বালা হল না!

১৮৯৮ সালের আন্দোলন স্পেনের ইতিহাসে একটা বড় ঘটনা। সাহিত্যে ও সমাজে এই '৯৮ সালের আন্দোলনের প্রধান অধিনায়ক ছিলেন বেনাভান্তে।

১৮৯৮ সালে Cuban War-এ স্পেন পরাজিত হয়; এবং এই যুদ্ধের ফলে স্পেনের সমস্ত ঔপনিবেশিক অধিকার নষ্ট হয়। এ ক্ষতি কিন্তু স্পেনের ইতিহাসে স্পেনের সৌভাগ্যের সূচনা করে। এই পরাজয় স্পেনকে আপনার দিকে ফিরিয়ে

যেতে শেখায়। এবং তার ফলে তখন মিথ্যা বহ্বাড়ম্বরের খেলার জায়গায় স্পেনের অভ্যন্তরে চারিদিকে একটা জীবনের সাড়া পড়ে যায়। ১৮৯৮ সালের আগে স্পেনের রেল, কল, কারখানা অধিকাংশই ছিল বিদেশীর অর্থে পরিচালিত। এই আন্দোলনের পরে স্পেন সজাগ হয়ে আপনাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের দিকে ফিরে চাইল। স্পেনে এর আগে pyrenees পর্ব্বতের পার হতে কোনও আন্দোলন বা পরিবর্ত্তনের স্রোত আস্‌তে পারত না, এই ঘটনার পর থেকে সহসা যেন pyrenees পাহাড়ের মত বড় একটা অন্তরাল অতি সামান্য হয়ে দাঁড়াল এবং স্পেনে সমস্তকিছু "Europeanize"—"য়ুরোপীয় করা"-র একটা বিষম স্পৃহা চারিদিক থেকে জেগে উঠে। তখন pyrenees-এর পারে মায়াবী মহানগরী প্যারিসের দিকে স্পেনের যুবকরা চেয়ে আছে। কিন্তু এই হঠাৎ-য়ুরোপীয় হবার আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল স্পেনের কবি ও দার্শনিক Migeul De Unamuno. Unamuno-র লেখায়* স্পেনের অন্তরকে আমরা দেখতে পাই—যে স্পেন তাজা মাটীর গন্ধে ভরা—যে স্পেন উদ্দাম আনন্দে নব নব ব্যথার সঙ্গে নব নব সৃষ্টির প্রসাদ উপভোগ করে—যে স্পেন বিপদ আর বজ্রপাতে উল্লসিত হয়। Unamuno বলেন, 'So far from being Europeanized, I should not be ashamed of being African, yes, as African as Tertullian" "য়ুরোপীয় হওয়ার চেয়ে আমি আবার আনন্দে টারটুলিয়ানের মত আফ্রিকান্ হব।" উনামুনো, আদিম স্পেনিয়ার্ডের যে বিপুল প্রাণশক্তি, তারি সাহায্যে চেয়েছিলেন জড়তা আর শৃঙ্খলের বন্ধন ভেঙ্গে সেই জীবনকে জাগাতে—"that sleeps and dreams in the depths of the sub-consciousness"—যে জীবন জাতির অদৃশ্য-লোকে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে শুধু নিশীথ স্বপ্ন দেখে। যাই হোক, বেনাভান্তের মধ্যে এই দুই ধারাই আমরা দেখতে পাই। বেনাভান্তের মধ্যে আমরা স্পেনের স্বরূপ পাই. আর তার উর্দ্ধে স্বচ্ছ তোয়া ধারার কল-স্রোত কানে আসে, যে ধারা ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়, সে মানব-মনের চির-মন্দাকিনী। "Saturday Night"-এর আরম্ভে আমরা যে নব-বসুন্ধরার স্তবগান শুনি—সে আমাদের বাংলার উদার উদাসীন চন্দ্রালোকে আমাদের রক্তে তন্দ্রাচ্ছন্ন সুন্দরের স্বপ্নকে জাগিয়ে দেয়! যে মহোৎসবের রাত্রি আজ আমাদের জীবন হতে অজ্ঞাতবাসে গেছে তারি শোকে ও বিরহে মন মুহ্যমান্ হয়ে ওঠে। চোখের সামনে মনে হয়, যেন দেখি যে, এক

---

* 1. The Tragic Sense of Life. 2. Essays and Soliloques".

উদাস প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আজিকার বাংলার মৃত্যু-মলিন বাসনায়-কৃশ বার্দ্ধক্যে ভরা-যৌবন অগণিত শুষ্ক তরু-পল্লবের সঙ্গে ঊর্দ্ধবাহু হয়ে বলছে, "নির্ম্মম নীলের অধীশ্বর, একটী মহোৎসবের রাত্রি জীবনে দাও।"

"আজ মহোৎসবের রাত্রি। ধরণী, অপার পারাবার আর ঐ নীল আকাশ আজ এক মূর্চ্ছাতুর মিলনে বাঁধা হল। আকাশ, আলো, ঐ পর্ব্বত-শিখর, এই বন-বীথিকা আজ সদ্য-জাত ধরণীর স্নিগ্ধ শিশুর হাসির আলোকে উদ্ভাসিত হল। হে ধরণী সদ্যজাত, তুমি মৃত্যুর ও ব্যথার অপরিজ্ঞেয়। হে মায়াময় নবতটভূমি, তোমার তীরে আসে ঐ দেবতা আর মহাপুরুষেরা, আসে ঐ অপ্সরা আলোক-দুহিতা, সঙ্গে তার বন-মৃগশিশু, তোমার অপরূপ সে প্রেমের ও জ্ঞানের ধ্যানবস্তু। থিয়োক্রেতিসের গাথা আর ভার্জ্জিলের গোপ-গীতি তোমারি সুরে অনুরণিত, আজ আমাদের ধরণীর যে শিশু তোমার অপার রূপে আপনার বেদনাকে মগ্ন করে ধন্য হতে চেয়েছিল, সে স্বর্গ-সুন্দর শৈলী,—সত্য-সুন্দর ও শিবের উপাসক—যে পাবক মন্ত্রে Assisi-এর ভক্ত-কবি গাঢ় অনুরাগে সমস্ত বিশ্বকে অভিনন্দন করেছিলেন, অনন্তের ধ্যানে সে কবির ছিল সেই মন্ত্র। হে সূর্য্য, হে, আত্মার সহোদর, হে বিহগ, হে আরণ্যিক পশু, তুমিও আমার আত্মার সহোদর। এ বিশ্ব আমার আত্মার সহোদর!"

বেনাভান্তের নাটকের একটী প্রধান বিশেষত্ব এই যে, মূলচরিত্র অধিকাংশই নারী। ১৮৯৮ সালের আন্দোলনে নারীর সামাজিক অবস্থা ও নারীর শক্তিকে রীতিমত গৌরবান্বিত করা হয়। বেনাভান্তের নাটকে আমরা দেখতে পাই, বেদনার ও নির্য্যাতনের হলাহল আনন্দে পান করে নারী-শক্তি মহীয়সী হয়েছে। সেই বেদনার গভীরতায় তারা আত্মার এত বড় একটা নিবিড় শান্তি পেয়েছে—যার মহিমায় বেনাভান্তের নাটকে পুরুষদের অবিচার ও অত্যাচার ভয়ানক ঘৃণ্য ভাবে আপনি ফুটে উঠে। বেনাভান্তের নায়িকারা বলে—

"এই বিশ্ব-ভরা বেদনার সমুদ্রে আমার এ বেদনাটুকু কতইবা? এই হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করে দিলাম—আসুক বেদনার দুকূল ভাঙ্গা জোয়ারা! আমার বেদনার বিন্দুটী নীরবে অসীম সিন্ধুতে লুপ্ত হয়ে যাক্।"

এই বেদনার অসীম সিন্ধুতে নীরবে বেনাভান্তের নায়িকারা আপনাদের আনন্দে বিলীন করে দিয়েছে। Isabel যখন জানতে পারল যে, স্বামী এমিলীয়ার প্রেমে বদ্ধ তখন সে স্বেচ্ছায় পাগল সেজে পাগলা গারদের জীবনকে বরণ করে নিল। Raimunda-র শেষ উক্তি, "Blessed be the blood

that sanes, the blood of our Lord Jesus !"—আমাদের পুরাণের বহু মহীয়সী নারীর মুখে, অশোভন হয় না।

Doll, Isabel, Dounina, Raimunda প্রমুখের দিকে চেয়ে আর একটী দেশের কথা মনে পড়ে, যেখানে একদিন তারা নারীর মধ্যে ঈশ্বরী-শক্তিকে দেখেছিল, কিন্তু আজ সেখানে নারী আপনার মূক-বেদনার কারাগারে আপনি মহীয়সী।

বেনাভান্তে নারীর রূপ ও মহিমায় অনুরঞ্জিত দেখেছিলেন সমস্ত আর্ট ও সাধনা।

"এই বই তোমাকে দিলাম, হে নারী; কারণ তোমার নামে উৎসর্গ করা এই আমার লেখায় নিশ্চয়ই তোমার রূপের ও মহিমার ছায়া এসে পড়বে; হে নারী, তুমি যদি সুন্দর হও, চাই না তোমার মহিমা। তুমি যদি মহিমান্বিত হও, কি প্রয়োজন তোমার সৌন্দর্য্যের ? আর যদি তুমি এক সঙ্গে হও মহিমান্বিত আর সুন্দর, তবে হে মর্ত্ত্যবাসী আকাশ-দুহিতা, হে স্বর্গজ্যোতি, নত-জানু হয়ে তোমার পূজা করা ব্যতীত আর কি সম্ভব! তুমি ছাড়া কোনও সঙ্গীত, কোনও কাব্যকলা নাই; কারণ সঙ্গীতই হোক আর কোন কাব্যকলাই হোক, সে তোমার প্রেমেরই নামান্তর মাত্র আর প্রেমহীন কাব্য-কলা—সে ত এমন এক ধর্ম্ম যার কোন অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর নেই।"

(৩)

বেনাভান্তের নাটকের যে ধারা আমরা তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে এবং বর্ত্তমান স্পেনের রঙ্গালয়ের ইতিহাসে দেখতে পাই, তার সঙ্গে জীবনের একটা একান্ত সম্বন্ধ আছে। শেক্‌স্‌পীয়ার, ইব্‌সেনও চেয়েছিলেন অনন্ত কালের গর্ভ থেকে খানিকটা অংশ ছিনিয়ে নিয়ে এসে জগতে চিরকালের মত তাদের স্থায়ী ক'রে দিয়ে যেতে। এই সমস্ত স্রষ্টাগণ এই সমস্ত নব-নির্ম্মিত মানব ও মানবীর দেহে ও মনে এমন একটা অনির্ব্বচনীয় প্রাণের মোহ দিয়ে দিতে পেরেছিলেন যার জন্যে তারা স্থায়ী হয়েও অনন্ত কালের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। বেনাভান্তের নাটকে আমরা কোনই type পাই না। বেনাভান্তে জীবনের নিত্য প্রবাহমান গতি থেকে কোনও ব্যক্তি বা জীবনকে ছিন্ন করে তাকে অমর করতে যান নি—বেনাভান্তের নাটকে ঠিক আমরা উল্টা জিনিষটি পাই—জীবনের নিঃশব্দ গতিটী। বস্তুগত জীবনের অন্তরালে একটী

নিঃশব্দ নদী প্রতি মুহূর্ত্তে নব নব রঙ্গে অদৃশ্য আলোকের ইঙ্গিতে মানব-জীবনের তটভূমিকে কখনও অভিনন্দন করে, কখনও বা শুষ্কবালুচরের অতিসম্পদ দিয়ে সরে যাচ্ছে—তাহার গতির খেয়ালে জগতে রূপের সৃষ্টি ও স্থিতি হচ্ছে। এই ধারার উৎপত্তিস্থান রহস্যময় ও মানব-দৃষ্টির অন্তরালে। সে ধারার গতিবিধিও মানবের ইচ্ছা ও অনিচ্ছার বাইরে। মানব অজ্ঞাতে যেমন নিয়ত বায়ুর সংস্পর্শে আসে, তেমনি মানব অনবরত সেই ধারায় অজ্ঞাতে অবগাহন করে চলেছে। বেনাভান্তের সমস্ত নাটকের মধ্য দিয়ে আমরা এই নিঃশব্দ নদীটির জলভরা পদ-ধ্বনি শুনতে পাই।

বেনাভান্তের নাটকের সেই জন্য বলা হয় দুটী রঙ্গমঞ্চ—একটী outer stage, বাইরের দৃশ্য-পটের রঙ্গমঞ্চ—যেখানে মানুষ অভিনয় করে চলেছে আর একটী inner stage, যার বস্তুগত সত্ত্বা রঙ্গমঞ্চে কোথাও নাই। যাহা অভিনেতাদের কথায় ও ভাবে ফুটে উঠতে থাকে। মানুষের সমস্ত ব্যক্ত-কর্ম্মের অন্তরালে আর একটী গোপন লোক আছে—বেনাভান্তের নাটকে আমরা অনবরত সেই চেতনার মগ্ন-লোকের দিকে ফিরে চাই, যেখানে আমাদের চিন্তা ও কর্ম্মের বীজগুলি তৈরী হয়ে চলেছে। তাই বেনাভান্তের নাটকে সেই আব হাওয়ার সৃষ্টির জন্য আমরা অনেক সময় বেনাভান্তের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ (The Bonds of Interst-এ যেমন) নাটকের ব্যক্তি ও স্থান কালের কোনও সঠিক সত্ত্বা পাই না—কিন্তু তাদের কথাবার্ত্তায় বাস্তবতার সে অভাবটুকু পূরণ হয়ে ওঠে। বেনাভান্তের নাটকে কবিতার গতি ভয়ানক সংযত কিন্তু যেখানে সেই সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে যায় সেখানে বেনাভান্তে এক অপূর্ব্ব কবির অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে ফুটে উঠেন—সেখানে ভাষার অন্তরে মহাকাব্যের সুর বেজে উঠে। নাট্য-কারের মস্তিষ্কের ইঙ্গিতে চলা-ফেরা করে চলেছে : শেক্‌স্‌পীয়ারের বিরাটকায় দুরন্ত শিশুদের মত তারা যেন আপনার হৃদয়ের তেজে আপনিই এগিয়ে চলতে পারে না। The Bonds of Interest-এর শেষ উক্তিতে Silvia জীবনের যে মুক্তির কথা বলে, বেনাভান্তের সাহিত্য সম্বন্ধেও তাই খাটে।

"আমাদের এই চলা-ফেরায় (The Bonds of Interest-এ) জীবনের রঙ্গমঞ্চে যেমন পুতুল নাচের পুতুলের মতন সব মানুষ আপনারা দেখেছেন, তারা সব যে যার সুতোর টানে চলেছে—কেউ কামনায়, কেউ বা স্বার্থের, কেউ বা মোহের আর শত দুর্দ্দশার টানে, কারুর বা পায়ে সুতোয় টান পড়ে, সে চলে নিষ্ঠুর ভবঘুরের পথে ; কারুর বা হাতে সুতোর টান পড়ে, মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত

তাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বাঁচতে হয়, ঝগড়া করে, চালাকি করে, ভয়াবহ সব পাপ করে। কিন্তু এদেরই মাঝখানে আবার কখন অলক্ষিতে আকাশের আলোক-তন্তু থেকে আলোর স্বর্ণসূত্র এসে পড়ে; সূর্য্য আর চন্দ্রের আলোয়-বোনা প্রেমের সেই স্বর্ণসূত্রে এই সব পুতুলের মতন মানুষ সহসা দেবতার মত হয়ে ওঠে; আননে তাদের সহসা উষার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য ভেসে ওঠে; অন্তরে তখন তাদের আকাশ-যাত্রী বিহঙ্গমের পক্ষ-যোজনা হয়; তারা যেন বলে, এ সবই মিথ্যা নয়—আমাদের এই জীবনেই আছে স্বর্গের জ্যোতি—একটা অনাদি সত্য—যা এই নাটকের অভিনয়ের শেষে শেষ হয়ে যায় না।"

বেনাভান্তের নাট্য-সাহিত্যের সমালোচনায় বেনাভান্তের এই উক্তিই যথেষ্ট। বেনাভান্তের নায়কগণকে অনেক সময় মনে হয় কলের পুতুলের মত, যেন তারা নাট্যকারের মস্তিষ্কের ইঙ্গিতে চলা-ফেরা করে চলেছে; কিন্তু সহসা তাদের মুখোস পড়ে যায়, দেখি তারা সজীব মানুষ—রক্ত উন্মাদতালে তাদের শিরায় নৃত্য করে চলেছে।

এই কবিটীর সঙ্গে আর একজনকেও দেখতে পাই—সে দার্শনিক বেনাভান্তে। কিন্তু সে দার্শনিক কবিরই আত্মীয়। বেনাভান্তের নাটকে এই সমস্ত খোদাই-করা কাব্য-খণ্ডগুলি এক অপূর্ব্ব জিনিষ!

কিন্তু বেনাভান্তের নাটকের দেহে যে রস প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সে শ্লেষের। সে এক সকরুণ হাস্য-রস—যা সমসাময়িক য়ুরোপীয় সাহিত্যে আমরা আনাতোল ফ্রাঁসের মধ্যে দেখতে পাই। এই হাসি ও বিদ্রূপ আঘাত বটে কিন্তু এ আঘাতের অন্তরালে অসীম মমতা আর সমবেদনা লুকিয়ে আছে। আনাতোল ফ্রাঁস যখন বলেন, Irony and Pityare both good counsel; the first with her smiles makes life agreeable; the other sanctifies it with her tears......The Irony I invoke is no cruel Diety. She mocks neither love nor beauty . . . it is she who teaches us to laugh at rogues and fools, whom but for her we might be so weak as to despise and hate".

"বিদ্রূপ আর সহবেদনা দুজনেই মানুষের প্রিয় বন্ধু। একজন তার হাসি দিয়ে জীবনকে ভোগ্য করে তুলেছে আর একজন অশ্রুজলে ধুইয়ে জীবনকে পবিত্র করেছে। যে বিদ্রূপের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে আমি আবাহন করছি সে কোনও নিষ্ঠুর দেবতা নয়। সে সৌন্দর্য্য কিংবা প্রেমকে বিদ্রূপ করে না . . .

সে শান্ত, করুণায় ভরা তার প্রাণ। . . . সেই আমাদের শয়তান আর বদমায়েসকে দেখে হাসতে শেখায় . . . হয় ত তার অভাবে আমরা এত দুর্ব্বল হয়ে যেতাম যে, আমরা হয় ত তাদের ঘৃণা আর অবজ্ঞা করতাম।"

বেনাভান্তের নাটকে আমরা এই সকরুণ বিদ্রূপের পরিচয় নিয়ত পাই। তাঁর নাটকের মধ্যে একটী প্রস্তর নয়না নারী লুকিয়ে আছে—সে কাঁদতে পারে না—তাই সে হাসে।

বেনাভান্তে Leonardo-র মুখে এই হাসির পরিচয় দিয়েছেন,—

"যে জীবন মরে গেল তার উপর কবর তুলতে হাসির মত কেউ না! আমরা কাঁদি—যা এখনও জীবন্ত আছে—জীবন্ত থেকে যা আজও যন্ত্রণা বেদনা পাচ্ছে অথবা যা হয় ত এখনও আমাদের স্মৃতিতে বেঁচে আছে কিন্তু আমরা হাসি সে প্রেম, বিশ্বাস, আকাঙ্খা, স্মৃতি, যাই হোক যখন মরে যায়। . . . সমস্তই নষ্ট হয়ে মরে যায়; হাসি সে চিরন্তন। জীবন সে কি এই হাসির নব নব চিরন্তন বিকাশ মাত্র নয়, জীবন কি প্রেমের মৃত্যুজয়ী উল্লসিত হাসি নয়?"

বেনাভান্তের সাহিত্য এই হাসির প্রতীক্। নিপীড়িত সত্যের নষ্ট গৌরবের উপর যে মিথ্যা মহা সমারোহে ওঠে, পুরুষের অন্ধ প্রভুত্ব যখন সৃষ্টির সৌন্দর্য্যের তালে পা ফেলতে ভুলে গিয়ে নারীকে পোষাকের আর সাজ-সরঞ্জামের সামিল করে তুলে, মৃত-সমাজের প্রেতাত্মা যখন দেবতার ভোগ অধিকার করে বসে, যখন মানুষ আপনার দানের কার্পণ্যে চায় স্বর্গের অধিকার কিনতে—বেনাভান্তের এই হাসির শ্মশানে তখন শ্মশানেশ্বরীর মৃদু চন্দ্রলেখা-হাসি উদ্ভাসিত হয়; শ্মশানে তখন শব-দাহের আয়োজন চলে। যে মরে গেছে, মৃত্যুই তার শেষ গৌরব। সমাধিই তার যোগ্য সম্মান। তার প্রেতাত্মাকে দেবতার আসনে বসিয়ে নিত্য প্রাণ-ভগবানের ভোগ দেওয়া বীর্য্যহীনতার পরিচয়। বেনাভান্তের সাহিত্যের অন্তর-লক্ষ্মী এই প্রস্তর নয়না হাস্যময়ী নিষ্ঠুর করুণ দেবতা Pyrenees পর্ব্বত পার হয়ে সাগর-সিন্ধু এড়িয়ে সিন্ধু-কাবেরী-গঙ্গার বালু-সৈকতে যে দিন পরিভ্রমণে আসবেন, সেই সুন্দর দিনকে স্মরণ করে বেনাভান্তের সম্বন্ধে এই সামান্য পরিচয় ও আলাপ শেষ করলাম।

মা

শ্রীহিমাংশুপ্রভা সিকদার

পৃথিবীর বুকে চোখ মেলিয়া অনিল যাহার ক্রোড়ে আশ্রয় পাইল সে তার গর্ভধারিনী নয়। কোন আত্মীয়াও নয়, সে বাটীর পুরাতন দাসী, বালবিধবা তারা। পরিচারিকার কর্ত্তব্যভার বিশ্বস্তভাবে পালন করিয়া দাসী তারা যৌবনের শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অসময়ে পরপারের ডাক আসিয়া পড়াতে অনিলের জননী একমাত্র পুত্রের লালন-পালনের ভার তারা অপেক্ষা অন্য কোন বিশ্বস্ত হস্তে সমর্পণ করিবার অবসর ইহলোকে খুঁজিয়া পাইলেন না।

সুখ দুঃখ আনন্দ নিরানন্দের ভিতর দিয়া শিশু অনিল দাসীর ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তারা মৃত্যু-পথযাত্রী ব্যথা-কাতরা প্রভুপত্নীর শেষ আদেশ অক্ষয় মন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া ছিল। সে নিবিড় স্নেহ দিয়া এই মাতৃহারা শিশুটিকে ঘিরিয়া রাখিল এবং অনিল, যখন কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া তাহাকেই মা বলিয়া ডাকিল তখন সন্তানহীনা তারার হৃদয়ে মাতৃ-স্নেহ অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায় উৎসারিত হইত! সে মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া যাইত, অনিল ও তাহার মধ্যে শুধু প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ।

অনিলের পিতা অমূল্যনাথ স্বভাবতই গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তরুণ বয়সে পত্নী হারাইয়া তিনি আরও গম্ভীর হইয়া পড়িলেন। সংসারের সমুদয় ভারই দাসী ভৃত্যের উপর অর্পিত হইল। তিনি শুধু নির্জ্জন কক্ষেই আপনাকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। সংসারের কোন কোলাহলই সেখানে প্রবেশ করিতে পারিল না।

শিশু অনিল পিতার এই অটল গাম্ভীর্য্যের প্রাচীর ভেদ করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় পিতার কক্ষের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইত। যখন কোন সাড়াই আসিল না, সে হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। শেষে এমনি দাঁড়াইল, পুত্র পিতার মন হইতে যে অনেকখানি দূরে সরিয়া গেছে তাহা অমূল্যনাথ টেরও পাইলেন না।

বন্ধু-বান্ধবগণ অমূল্যনাথের এই আচরণ দেখিয়া বেশ ভয় পাইয়া গেলেন। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, কোন্ দিন বা অমূল্যনাথ লোটা-কম্বল লইয়া বাহির হইয়া যায়। কেহ কেহ বলিলেন, পত্নীর শোক তাহার বুকে খুব বড় করিয়া বাজিয়াছে। সকলের মন ত সমান নয়। মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া বহু আলোচনা করিয়াও যখন কোন তথ্যই তাঁহারা আবিষ্কার করিতে পারিলেন না, তখন একেবারে হাল ছাড়িয়া না দিয়া ভবিষ্যতে কি আছে দেখিবার আশায় বসিয়া রহিলেন।

অমূল্যনাথের ধ্যান ঐকান্তিক ঈশ্বর ভক্তির দিকেই বাড়িয়া চলিল। সাধু সহবাসও ঘটিতে লাগিল। এইরূপ ভাবে চলিতে চলিতে একদিন নূতন জ্ঞান মনে উদয় হইল যে, কোন ধর্ম্ম কার্য্যে সহধর্ম্মিনী না থাকিলে মুক্তির পথে নাকি অনেকটা অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়।

অভিমানী পুত্র পিতার সান্নিধ্য হইতে দূরে চলিয়াই গিয়াছিল। আর ফিরিল না। তারা ছিল তার খেলার সাথী, গল্প বলিবার একমাত্র সঙ্গী। যখন সন্ধ্যার আঁচলখানা পৃথিবীর বুকে খসিয়া পড়িত, অনিল তারার ক্রোড়ে শুইয়া গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িত।

বধূবেশে অর্পনা আসিয়া অমূল্যনাথের লক্ষ্মীহারা গৃহ শ্রী-মণ্ডিত করিয়া তুলিলেন। বন্ধু-বান্ধবগণের দুরূহ সমস্যা এত সহজে নিষ্পত্তি হইয়া গেল। তাঁহারা ভারী আরাম পাইলেন।

অনিলকুমার এখন ছয় বৎসরের শিশু। অনর্গল কথা কহিয়া সে সকলকে অস্থির করিয়া তুলে। নববধূর আগমনী দাসী ভৃত্যের মুখে শুনিতে পাইয়া সে নববধূটিকে এক অদ্ভুত জীবের অন্তর্ভূত করিয়াছিল। যখন চাক্ষুষ দেখা হইল তখন বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। নববধূর বহুমূল্য শাড়ী ও অলঙ্কার দেখিয়া সে ভারী আমোদ পাইল কিন্তু যখন মাতৃ সম্বোধন করিতে পিতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইল, তাহার পুঞ্জীভূত অভিমান উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে তারার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কহিল, "ও ত বৌ, ওকে আমি মা বলে ডাক্‌বো না, তুমিই আমার মা।" তারা শিশুর এই ভাব দেখিয়া মৌনী হইয়া রহিল। সে এই শিশুকে কি বলিবে, কি করিয়া বুঝাইবে যে, এই শিশুর উপর তাহার কোন দাবীই নাই। সে ত শুধু লালন-পালনের ভার পাইয়াছে। দাসীর পক্ষে ইহাই কি যথেষ্ট নয়? এই শিশুর প্রতি তাহার হৃদয়ে বাৎসল্যের বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইয়া এখন যে শাখা প্রশাখায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সে

খবরও সে রাখিত। সে ত সম্পূর্ণ অসহায়া। সংসারের বাত্যায় এই বৃক্ষ ত একদিন ভূমিসাৎ হইতে পারে, তখন সে কি করিবে? কোন্ আশ্রয় অবলম্বন করিয়া জীবনের পথে চলিবে! নববধূর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক আশঙ্কা অনেক ভীতিই তাহার মনে জাগিয়া উঠিল।

অপর্ণা বয়স্থা। ধনী পিতার সন্তান। কর্ত্রীহীন সংসারে আসিয়া তিনি আপনার কর্ত্তব্যভার বুঝিয়া লইলেন। কি জানি কেন সতীন-পুত্রের মমতাময়ী— এই দাসীটির প্রতি তাহার তেমন ভাল ভাব জন্মিল না। সুস্থ সবল দৈহিক সৌন্দর্য্যশালী শিশুটি অপর্ণার মনে স্নেহের সঞ্চার করিয়া দিল। খেলনা লজেন্স প্রভৃতি দিয়া শিশুর মন বশ করিবার চেষ্টা যখন একেবারেই ব্যর্থ হইয়া গেল, তখন সব রাগ গিয়া পড়িল তারার উপর। কি করিয়া দাসীর কুহক হইতে অনিলকে রক্ষা করা যায়, ইহাই তাঁহার একমাত্র আলোচ্য ও চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। দাসী ভৃত্যের প্রভাব হইতে অনিলকে রক্ষা করিতে না পারিলে তাহার ইহকাল পরকাল দুই-ই নষ্ট হইবে, ইহা অপর্ণা স্বামীকে বার বার বুঝাইতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির হইল, বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর হস্তে বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া তাঁহারা এক বৎসরের জন্য পুরী বাস করিবেন।

যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। অনিল নূতন দেশে যাইবে, সমুদ্র দেখিবে এই সব ভাবিয়া ভারী— আমোদ পাইল। বালকের মন অনেক রঙ্গীন স্বপ্নের জাল রচনা করিতে লাগিল। তারার সান্নিধ্য যে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে এ সংবাদ সে ছাড়া বাড়ীর আর কোন প্রাণীরই অগোচর ছিল না।

বুদ্ধিমতী তারা সবই বুঝিতে পারিল। কিসের জন্য এই আয়োজন তাহা তাহার বুঝিতে একটুও বিলম্ব হইল না। সে ত ইহার প্রতীক্ষা বহুদিন হইতেই করিয়া আসিতেছে। কল্পনা যখন বাস্তবে দাঁড়াইল, তখন তাঁহার হৃদয় ভেদ করিয়া শুধু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। একটা জ্বালা সে বক্ষ-পিঞ্জরে অনুভব করিল।

অনিল চলিয়া গিয়াছে। বিদায়ের করুণ ক্রন্দনধ্বনি এখনও তাহার কানে বাজিতেছে। শিশুর ম্লান অশ্রুসিক্ত মুখখানি এখনও তাহার হৃদয়-পটে মুদ্রিত হইয়া আছে। অনিলের একটা ছেঁড়া জামা—দু'একটা ভাঙ্গা খেলনা তারা নিজের ঘরে সযত্নে রাখিয়াছিল। নির্জ্জীব পদার্থগুলিকে চুম্বন করিয়া সে কথঞ্চিৎ আরাম পাইত। ঐ স্মৃতিগুলিকে সাক্ষী করিয়া সে তার দুর্ব্বিষহ দিনগুলি কাটাইতে লাগিল। কোন এক শুভ অবসরে একটি শিশু তাহার জীবনের পথে

আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে ত দূরে চলিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার পায়ের চিহ্ন এখনও মুছিয়া যায় নাই!

অনিলের সংবাদ পাইবার জন্য তারা আকুল হইয়া থাকিত। কর্ম্মচারীর নিকট অমূল্যনাথ প্রায়ই চিঠিপত্র লিখিতেন। সংবাদ পাইবার জন্য তারা তাহার নিকট ছুটিয়া যাইত। কোন দিন শুভ সংবাদ শুনিত। কোন দিন চিঠির মধ্যে বৈষয়িক কথা ছাড়া অন্য কোন সংবাদ নাই জানিয়া ব্যথিত মনে ফিরিয়া আসিত। শূন্য পুরীতে অনিলের স্মৃতির মাঝে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে ক্লান্ত হইয়া আপন বিছানায় লুটাইয়া পড়িত। সে শিশুকে সে আপনার সব স্নেহ নিঃশেষ করিয়া মানুষ করিয়াছে তাহার সংবাদ পাইবার অধিকার হইতেও সে আজ বঞ্চিত। কি করিয়া বিধাতার এই নিষ্ঠুর অভিশাপ সে বহন করিবে? সে কি করিয়া বাঁচিবে? এই দুঃখ যে তিল তিল করিয়া তাহার হৃদয় চূর্ণ করিয়া দিতেছে।

অনেক সময়ে মানুষের প্রাণের নিবেদন দেবতার চরণে পৌঁছিলেও কোন সাড়া পাওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে কিন্তু উল্টা দাঁড়াইল। তারার মনের ব্যথার ভার সহ্য করিতে শরীর সমর্থ হইল না। সে একেবারে শয্যাশায়ী হইল, একটু একটু করিয়া মৃত্যুর দিকে সে অগ্রসর হইতে লাগিল। বিকারের ঘোরে তারা বিছানায় হাত দিয়া কি যেন অনবরত খুঁজিত। যাত্রার দিনের শেষ পাথেয় বুঝি যে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

নূতন স্থানে আসিয়া নূতন দৃশ্য দেখিয়া অনিল কয়েকদিন আমোদে কাটাইল কিন্তু এ ভাব ক্ষণস্থায়ী হইল। ঘুমের ঘোরে সে মা মা বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত। বালকের সব প্রফুল্লতা সব সজীবতা চলিয়া গেল। ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা বুঝি সকলের মনে এক একবার উঁকি দিয়া গেল! একদিন প্রবল জোরে জ্বর আসিয়া বালককে অজ্ঞান করিয়া ফেলিল। ডাক্তাররা বলিলেন, টাইফয়েড, বাঁচিবার আশা কম।

তখন গোধূলি বেলা। সূর্য্যাস্তে সোনার রশ্মি লীলায়িত সমুদ্রের উপর পড়িয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সমুদ্র তীরবর্ত্তী একটি বাড়ী স্তব্ধ, কোলাহল রহিত।

অমূল্যনাথ ও অপর্ণা অনিলের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন। মৃত্যুর কাল ছায়া ধীরে ধীরে বালকের মুখে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

ভৃত্য একখানা টেলিগ্রাম দিয়া গেল, অমূল্য নাথ পড়িয়া দেখিলেন তারার

মৃত্যু হইয়াছে। অনিল মা মা বলিয়া একবার ডাকিয়া চিরদিনের জন্য চক্ষু নিমীলিত করিলেন।

দূরে মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। অমূল্যনাথ ও অপর্ণা জ্বালাময়ী চোখে অনন্ত ক্ষুব্ধ সাগরের উর্ম্মিমালার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মুর্শীদ্যা গান

জসীম উদ্দীন

মুনার গান

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(১)

পাগল মন আমার রে—
তোর মুখেতে আল্লার নাম ক্যান শুনি না।
নিমিই ঝিমিই দুই গাছ পন্থ তরুতলা দিয়া
যমরাজা পাই আছে ক্যান বুঝি মনরার(১) লাগিয়া।
সাইল সুয়া দুডী (২) পাখী গহীন নদী চরে
গাঙ গহীন(৩) শুকায়া গেলে শুক্তি উড়াল (৪) ছাড়ে।

১। মনুয়ার—মনের ২। দুডী—দুইটী, ৩। গহীন—গভীর। এই গানে, সংসারের সবই যে মিথ্যা, যমরাজার ফাঁদ যে প্রতিমুহূর্ত্ত আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে এই কথা বলা হইয়াছে। কত আদর করিয়া চিরল বরণ আঁখি ধবল বরণ কবুতর এই প্রাণটাকে মানুষ পালন করে, কিন্তু হায় নদীর জল শুকাইয়া গেলে সাইল সুয়া পাখী যেমন সাদা বালুচরের সহস্র মায়া ভুলিয়া শূন্যে উড়িয়া যায়, তেমনি সময় হইলেই সংসারের সমস্ত কেনা-বেচা সাঙ্গ করিয়া তখন যে মিছা ফাঁকি দিয়া মন পাখী পালাইয়া যাইবে। ৪। উড়াল—উড়া সুরু করে।

ধবল বরণ কবুতর চিরল বরণ আখি
তুই আমারে ছাইড়া যাবি দিয়ে মিছা কাকি।

গায়ক—আইনদ্দী, বয়স ৪৫।

সাইল-সুয়া—অন্য গানে এদের নাম সাইল সখীর বলা হইয়াছে। আমরা এদের কোন পরিচয় জানি না।

(২)

ও আনল (১) ধীক ধীক ধাক ধীক (২) জ্বলে রে
আমার মনের আনল নেবে না।
আজ আনল কি দিলে জুড়াবে রে,
আজ আনল কে দিল জ্বালায়া রে
আমার মনের আনল নিবে না।
মনের আনল তনে (৩) জানে আর জানিবেন কে
আর জানিবেন সাহেব আল্লা পয়দা করছেন যে রে
আমার মনের আনল নেবে না।
বনের হরিণে বলে আমি কারবা ধার ধারি
হাপনার রক্তে মাংসে জগৎ করলাম বৈরী রে
আমার মনের আনল নেবে না।
পানী কাউড় উইঠ্যা বলে আমরা নিতুই নিতুই নাই
মনের গৈরবে আমরা কাল হয়া যাই রে,
আমার মনের আনল নেবে না।

গায়ক—আইনদ্দী

(৩)

আমার আল্লা রছুলের নাম
আমার পীর (৪) আর মুরশীদের (৫) নাম
জানিয়া লও রে মন।

১। আনল—অগ্নি। ২। ধীক ধীক—রহিয়া রহিয়া। ৩। তনে—দেহে, তনু শব্দ সপ্তমীতে তনে। ৪। পীর—গুরু। ৫। মুরশীদের—গুরুর।

হক (১) জানিও হক লইও, হক করিও চিনা
হকের নামে ভইররে ভারা, (২) ও তার লাভে হবে দুনা। (৩)
পাহাড়ের উপর পর্ব্বতরে পর্ব্বতের উপর চূড়া
এ দুনে (৪) উড়ায়ে নিবে যেমন সিমুইলের তুলা
পাহাড়ের উপর পর্ব্বতরে পর্ব্বতে হীরার ধার
সেই ধারেতে কাটারে যাবে যত বদী (৫) গুলা গার।

গায়ক—আইনদ্দী

(৪)

মন যদি বৃন্দাবনে বাস করিতে চাও,
আল্লাজীর কাণ্ডারী নৌকা ধীরে ধীরে বাও।
মাতা পিতার দুখান চরণ মাথায় তুলে লও।
রতি মনে (৬) নিহার (৭) কইরারে, ও তার দুইখান চরণ মাথায় লও।
সীজদা (৮) কাল উঠায়া দিয়া রে
নৌকা ইমান (৯) রাইখ্যা বায়া যাও।

গায়ক—আইনদ্দী, বয়স ৬৫
চরমাধবদিয়া, ফরিদপুর।

(৫)

মন তুমি গুরুর পাকে রইল্যারে মিছা মায়ায় বন্দী হয়া।
এলাহি দরিয়ার মাঝে নানান রঙের কল
পাথর ভাসিয়া যায়, সোলা হয় তল।

১। হক—হক, সত্য। ২। ভারা—বোঝাই। ৩। দুনা—দ্বিগুণ। ৪। দুনে—দুনিয়া। ৫। বদী—বদ।

৬। রতি মনে—প্রেমের সহিত। মনে প্রেম লইয়া। ৭। নিহার—ধ্যান ৮। সীজদা—নামাজের সময় যে মাথা মাটিতে ছোয়াইতে হয় ইহাকে সীজদা বলে। সীজদা—মানে প্রণাম। ৯। ইমান—বিশ্বাস। বৃন্দাবনে বাস করিতে হইলে আল্লাজীর কাণ্ডারী নৌকায় উঠিতে হইবে। সীজদার পাল উঠাইয়া দিয়া ইমান রাখিয়া তরি বাহিতে হইবে। আজ কাল হিন্দু-মুসলমানে এত দাঙ্গা হাঙ্গামার দিনে এই গানটী বড় আশ্চর্য্য বলিয়া ঠেকিবে।

ইলবিল শুকায়্যা যায়, মৎস্য নিল চিলে
ছাড়িয়া যায় সোনার ভাইধন কামিনার কোলে।
শুকনা কাষ্ঠের পরে পড়িয়া ডাকি কাকা
ওই যে ভাজন বেটা মরিয়া গেলে মার শরীলে দাগা।

গায়ক—জনৈক ফকীর, বয়স ত্রিশ

(৬)

তত্ত্ব জানিয়া লওরে মন
ডাইনে আল্লা বামে রছুল রইছেন একঠাঁই
রছুলউল্লা (১) কাইন্দা বলে আমি আল্লা দেখি নাই।
দুবুলার (২) শীর্ষেরে ভাই নিশুলের (৩) পানী
ডাইন চক্ষেনি কইতে পারে মুনা বাম চক্ষের কাহিনী।
কোথায় শুনে আইলরে ফকীর মাংস নাই তার হাড়ে,
হাড়ের উপর নাইক্যারে মাংস রক্ত ভাইস্যা পড়ে(৪)।

গায়ক—১। আইনদ্দী, চরমাধবদিয়া
২। রহীন মল্লাক, গোবিন্দপুর

বাম চক্ষে ডান চক্ষের কাহিনী জানে না, এই দেহের একদিকে রসুল, আর এক দিকে খোদা, এত কাছে তারা, তবুও রসুল খোদাকে না পাইয়া কাঁদিয়া ফেরেন এই বিষয়ে গভীর চিন্তা করিবার জন্য মনকে উদ্বুদ্ধ করা হইতেছে।



১। রসুল—প্রেরিত। ২। দুবুলা—দূর্ব্বা ঘাস। ৩। নিশুলের—শিশিরের।
৪। এই দুই লাইনের অর্থ বহু পরিশ্রমেও জানা যায় নাই।

উৎসর্গ

শ্রীপ্রীতি সেন

ছোট্ট একটী দ্বীপ। চারিদিকে ধূ ধূ করছে সাগরের জলরাশি। দ্বীপের কূলে কূলে ঊর্ম্মিমালার ব্যর্থ গর্জ্জন সাগরের ক্ষোভ জানিয়ে দিচ্ছে,—অসীম অনন্ত আমি। যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর রাজত্ব। সর্ব্বত্রই আমার অপ্রতিহত ক্ষমতা! . . . তার মাঝখানে, এ কে বিদ্রোহী আমার ক্ষমতাকে অবজ্ঞা করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে? দাও, দাও তাকে চূর্ণ করে দাও—ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে আঘাতের পর আঘাত করে, তাকে খণ্ড বিখণ্ড ক'রে দাও! . . . আমার অবজ্ঞাকারী বিদ্রোহী। আমার সামনে থেকে সরিয়ে দাও . . . বিশ্ব থেকে এ অসীম সাহসিকের নাম বিলুপ্ত করে দাও।

. . . যুগের পর যুগ কেটে গিয়েছে। যুগের পর যুগ ধরে সাগরের অপ্রতিহত ক্ষমতা দ্বীপের কূলে এসে প্রতিহত হ'য়ে ফিরে গিয়েছে। প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষায় দ্বিগুণ বেগে, দ্বিগুণ উৎসাহে আবার এসেছে—আঘাত পেয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ক্ষোভে অপমানে গর্জ্জন করতে করতে ফিরে গিয়েছে। . . . সাগরের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে, সাগরের দর্পকে উপহাস করে, পর্ব্বত-মালায় পরিবেষ্টিত দ্বীপ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইল—সাগরের সব আস্ফালনই ব্যর্থ হ'ল। . . . তার অপমানের তার ক্ষমতার অবজ্ঞার শাস্তি দেওয়া তা'র হ'ল না। সব আঘাতই সহ্য ক'রে দ্বীপ দাঁড়িয়ে রইল—অটল অটুট।

* * * *

দ্বীপের মাঝখানে ছোট একটী মন্দির। মন্দিরের চারি পাশে দশ বার ঘর লোকের বাস। . . . দ্বীপেরই মত এরা অসীম সহিষ্ণু। সব ঝঞ্ঝা বাত্যা সহ্য করে সাগরের গর্জ্জনকে উপেক্ষা করে এরা নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছে—দ্বীপের মাঝখানে, তাদের দেবতার মন্দিরের তলে। . . .

মন্দিরটী বহু পুরাতন। তবু তার জরাজীর্ণ দেহখানি প্রকৃতির সব উপদ্রব সহ্য ক'রে—এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। . . . দ্বীপবাসীরা বেশ গর্ব্বের

সঙ্গেই বলে থাকে যে, পৃথিবীর শেষ পর্য্যন্ত তাদের দেবতার আবাসস্থল ঐ ছোট্ট মন্দিরটী প্রকৃতিকে উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকবে। দেবতা আর প্রকৃতির যুদ্ধে প্রকৃতির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

* * *

দেবতার মানস-সন্তান এই দ্বীপবাসীরা, এদের প্রাচীনতম শাস্ত্রে লেখা আছে, দ্বীপবাসী দেবতা 'সিদ্ধি' নিজের পূজার জন্য এই দ্বীপবাসীদের সৃষ্টি করেন। সেই থেকেই—সে বহু বহু যুগের আগের কথা—এই দ্বীপবাসীরা দেবতার পূজা করেই জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে, দেবতার কৃপায় সব ঝঞ্ঝাবাত্যাই এরা হাসি মুখে উপেক্ষা করে আসছে।

. . . বড় জাগ্রত এই দেবতা। দ্বীপবাসীদের মধ্যে প্রবাদ, নিশুতি রাতে, বেদীর তলে বসে, বুক থেকে তিন ফোঁটা রক্ত উৎসর্গ করে, এক মনে, এক প্রাণে দেবতাকে ডাকতে পারলে, দেবতা তুষ্ট হ'য়ে পুজারীর আকাঙ্খা পূর্ণ করে দেন। . . . কার্য্যে সিদ্ধি দান করেন বলেই দেবতার নাম 'সিদ্ধি'। দ্বীপবাসীরা এ প্রবাদ অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করে। . . .

২

দ্বীপের কূলে পাথরের মূর্ত্তির মত নিথর হ'য়ে পূর্ব্বদিকে মুখ করে এক যুবক দাঁড়িয়েছিল দিগন্ত বিস্তৃত সাগরের দিকে চেয়ে। . . . চোখে তা'র অসীম তৃষ্ণা, মুখে আকুল আকাঙ্ক্ষা। . . . দূরে—বহু দূরে—সাগরের পরপারে তা'র জন্মভূমি, যার প্রতি ধূলিকণা সে প্রাণভরে ভালবাসে, পূজা করে! স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির কথাই সে ভাবছিল। নিষ্ঠুর ভাগ্যের তাড়নায় সে আজ জন্মভূমির কোল হতে বিচ্ছিন্ন—ফিরে যাবার কোন আশাই বুঝি তার নাই। হতাশভাবে যুবক চারিধারে চাইলে···জল—শুধু জল। ফিরে যাবার একমাত্র পথ রুদ্ধ ক'রে রেখেছে সাগর, অসীম অনন্ত জলরাশি।

. . . ফুলের মত সুন্দর এক কিশোরী এসে যুবকের পাশে দাঁড়াল। অতৃপ্ত নয়নে যুবকের নিঃস্পন্দ দেহের দিকে কতক্ষণ চেয়ে থেকে সে মৃদুস্বরে ডাকলে, সুন্দর!

স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে যুবক কিশোরীর দিকে চাইলে, ডাকছ কিশোরী?

স্বরে বীণার ঝঙ্কার দিয়ে কিশোরী বললে, সাগরের দিকে চেয়ে কি ভাবছিলে সুন্দর?

কিশোরীর কপোল থেকে বিদ্রোহী এক গুচ্ছ চুল সরিয়ে কোমল স্বরে সুন্দর বললে, কিছুই ত ভাবি নি কিশোরী!

তবে?

মুগ্ধ হয়ে প্রভাতের সৌন্দর্য্য দেখছিলাম, কিশোরী!

আর কিছুই না?

এক নিমেষের জন্য সুন্দর দিগন্ত বিস্তৃত সাগরের দিকে চাইলে! না, ফিরে যাবার আর কোন আশাই তার নাই!

মনের ভাব গোপন করে স্মিতমুখে সে কিশোরীর দিকে চাইলে! আর— আর তোমার কথা ভাবছিলাম কিশোরী!"

সূর্য্যের প্রথম আলো কিশোরীর মুখে পড়ে তার কপোল পর্য্যন্ত রাঙা করে দিলে।

* * *

নিশীথ রাত, প্রহরের পর প্রহর ধরে' বেদীর সামনে বসে কিশোরী এক মনে দেবতার আরাধনা করছে; কোন দিকে তার লক্ষ্য নাই! তবু, তবু বুঝি কোন ফল হল না। কিশোরীর সব পূজা, আকুল আহ্বান বুঝি ব্যর্থ হল!

বুক ভাঙ্গা এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিশোরী মুখ তুলে চাইলে। দেবতার মুখে যেন রহস্যভরা মৃদু হাসি ফুটে উঠল। নীচু হ'য়ে কিশোরী বেদীর তল থেকে ছোট্ট কি একটী জিনিষ তুলে নিলে। . . . তারপর . . .

তপ্ত রক্তের মাঝ থেকে কে যেন জিজ্ঞাসা করলে, কি চাই তোমার কিশোরী?

মন্দিরের গাঢ় অন্ধকারের মধ্য থেকে অস্ফুট স্বরে উত্তর এল, সুন্দরের সুখ!

* * *

ভোরের প্রথম আলোর সঙ্গে কিশোরী মন্দিরের দরজায় এসে দাঁড়াল, মুখে তার তখনও সাফল্যের মৃদু হাসি লেগে রয়েছে, চোখের স্বপ্নের ঘোর তখনও কাটে নি।

একটু বিস্মিত হয়ে সে দূরে বহুদূরে সাগরের দিকে চাইলে। ঢেউয়ের

সাথে তালে তালে নৃত্য করতে করতে ছোট্ট একটী নৌকা ভেসে চলেছে— আরোহী—কোন্ অজানা পথের অজ্ঞাত কে এক যাত্রী !

ভোরের আলোয় ক্রমশঃ সবই স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠল ! নৌকার আরোহীকে কিশোরী চিনতে পারলে—সুন্দর !

ভোরের বাতাস নিমেষের জন্যে কিশোরীর বুকের আঁচলকে আলিঙ্গন করে শত চুম্বনে তাকে আচ্ছন্ন ক'রে দিলে। আদরে সোহাগে সব ভুলে নিজেকে সঁপে দিয়ে সে দেখলে—নিঠুর বাতাস আর সেখানে নাই ! . . . অভিমানী সে, মাটীতে লুটিয়ে পড়ল !

. . . কিশোরীর উন্মুক্ত বক্ষের ওপর রক্তের দাগ ফুটে উঠল। . . . মৃদুস্বরে কে যেন কিশোরীর কানে কানে বল্লে, শোক কিসের কিশোরী ? যা চেয়েছিলে তাই ত পেয়েছ ! জন্মভূমির কোল ছাড়া সুন্দরের সুখ কোথা ?

কোমল স্বরে বাতাস জিজ্ঞাসা করলে, আশা পূর্ণ হয়েছে কিশোরী ?

মুখ তুলে কিশোরী সাগরের দিকে চাইলে। মুখে তা'র তৃপ্তির হাসি,— চোখে স্বর্গের জ্যোতিঃ ! *



* ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে।



রম্যাঁ রলাঁ

[শ্রীকালিদাস নাগ ও শ্রীশান্তাদেবী কর্তৃক অনূদিত]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ক্রিসতফকে হার মানিতে হইল। অভিভাবকদের বিরুদ্ধে একরোখা বীরত্বের সঙ্গে সে লড়িয়াছে, তবু শেষে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রহার জয়ী হইল। প্রতিদিন সকালে তিন ঘণ্টা ধরিয়া তাহাকে সেই বিষম যন্ত্রণাদায়ক পিয়ানো যন্ত্রটার কাছে বসান হইত। অত্যধিক মনোযোগ ও শ্রান্তিতে সে উদ্‌ভ্রান্ত, তাহার নাক ও গাল বাহিয়া টপ টপ করিয়া অশ্রু ঝরিতেছে, তবু সে তাহার ছোট লাল হাত দুখানি সাদা কালো চাবির উপর দিয়া চালাইয়া যাইতেছে—সারাক্ষণই প্রায় তাহার হাত যেন ঠাণ্ডা ও আড়ষ্ট—কখন ঐ ভয়ঙ্কর ছড়িটা ছপাৎ করিয়া পড়ে! একটা বেসুর বাজাইলেই ছড়ি নামে এবং সে আঘাতের অপেক্ষা ও অসহ্য বক্তৃতাবলী মাষ্টার মহাশয়ের মুখ হইতে ছুটে। ক্রিসতফ ভাবে, সে সর্ব্বান্তঃকরণে সঙ্গীতটাকে ঘৃণা করে; তবু সে যে কেন উহাতে লাগিয়া আছে তাহা বুঝে না। শুধু মেলশিয়রের ভয়ে ইহা হওয়া সম্ভব নহে। তাহার পিতামহের কোন কোন কথা তাহার মনের উপর খানিকটা ছাপ দিয়াছে। নাতিটিকে কাঁদিতে দেখিয়া বৃদ্ধ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিতেন, এ যন্ত্রণাটুকু সহ্য করার দাম আছে, ইহার বিনিময়েই ত মানব-জীবনের সর্ব্বোচ্চ আশ্বাস ও গৌরবের কারণ এই সুন্দর মহান শিল্প—সঙ্গীতকে লাভ করা যায়। এই সরল

কথাগুলি ক্রিস্তফের হৃদয় স্পর্শ করিত, ইহা তাহার শিশুসুলভ যাতনায় উপেক্ষা ও গর্ব্বের সহিত তাল রাখিয়া চলিত, সে-জন্য ক্রিস্তফ তাহার দাদা মহাশয়ের কাছে কৃতজ্ঞ ছিল। কিন্তু সে বাঁধা পড়িয়াছিল যুক্তি তর্কের বলে নয়; দু'একটা সুরের স্মৃতি তাহার হৃদয়কে কিনিয়া লইয়াছিল; সে যেন ঐ সঙ্গীতেরই ক্রীতদাস। অথচ তাহারই বিরুদ্ধে যে বৃথা বিদ্রোহ করিয়া আসিতেছে।

তাহাদের শহরে, জার্ম্মানীর অন্য শহরের মত, একটি থিয়েটার ছিল; সেখানে গীতিনাট্য, কৌতুকনাট্য, নাটিকা, মামুলী নাটক, মিশ্র নাট্য প্রভৃতি সকল রকমের সকল রুচির অভিনয় চলিত। সন্ধ্যা ছয়টা হইতে নয়টা পর্য্যন্ত সপ্তাহে তিনবার করিয়া অভিনয় হইত। বৃদ্ধ জাঁ মিশেল একটিও বাদ দিত না এবং সবগুলিতেই সমান উৎসাহ দেখাইত। একবার বৃদ্ধ তাহার নাতিটিকে লইয়া গেল, যাইবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই মস্ত ভূমিকা করিয়া ক্রিস্তফকে ব্যাপারটা বুঝাইল; সে বিশেষ কিছু বুঝিল না, তবু আন্দাজ করিল, সেখানে ভয়ঙ্কর একটা কিছু দেখিবে। দেখার উৎসাহে সে উন্মত্ত অথচ বেশ ভয়ও আছে, যদিও ভয়টা স্বীকার করিতে পারে না! সে শুনিয়াছিল অভিনয়ের মধ্যে ঝড় হইবে; শুনিয়া বজ্রাঘাতের ভয়ে সে অধীর হইয়া উঠিল। সে জানিত যে, একটা যুদ্ধ আছে, তাহাতে সে যে মারা পড়িবে না তাহারই বা স্থিরতা কি? অভিনয়ের পূর্ব্বরাত্রে বিছানায় শুইয়া ক্রিসতফ্ যন্ত্রণায় ছটফট করিল এবং অভিনয়ের দিন প্রায় ইচ্ছা করিয়া বসিল যে, তাহার দাদামহাশয় কোন ক্রমে তাহাকে লইয়া যাইতে যেন না আসে! কিন্তু যখন সময় হইয়া আসিল অথচ দাদা-মহাশয় আসে না, ক্রিস্তফ ছট্‌ফট করিতে লাগিল এবং প্রতি মুহূর্ত্তে জানলা দিয়া দেখিতে সুরু করিল: শেষে বৃদ্ধ আসিলেন এবং দুজনে রওনা হইতেই তাহার হৃদ্‌পিণ্ডটা লাফাইতে লাগিল, তাহার জিব শুকাইয়া প্রায় কথা বন্ধ হইল।

যে রহস্যনিকেতনটির কথা সে এতটা শুনিয়াছে তাহার কাছে দুজনে আসিল। ফটকের কাছে জাঁ মিশেল জনকতক বন্ধুর সঙ্গে জুটিল কিন্তু ক্রিস্তফ প্রাণপণে তাহার হাতটা ধরিয়া রহিল পাছে সে হারাইয়া যায়; সে বুঝিতেই পারে না কেমন করিয়া লোকগুলা এমন সময়ে গল্প মস্করা করে!

জাঁ মিশেল তাহার অভ্যাস মত অরকেষ্ট্রার পিছনে প্রথম সারে বসিল। এবং রেলিঙের উপর ঝুঁকিয়া নীচু গলায় একজন বাজনদারের সঙ্গে লম্বা গল্প জুড়িয়া দিল। এখানে যেন তাহার রাজত্ব! এখানে সকলে তাহার কথা শুনে,

কারণ ওস্তাদ বলিয়া তাহার একটা প্রতিপত্তি আছে, সেটার সদ্ব্যবহার মিশেল ত করিতই বরং প্রায় বাড়াবাড়ি করিয়া বসিত। ক্রিস্‌তফ কিছুই শুনিতে পায় না! নাটক দেখিবার প্রতীক্ষায় সে অধীর; থিয়েটারের ঘরটা কি চমৎকার, কি বিষম ভিড়! ভিড় দেখিয়া তাহার ভয় হয়; সে মাথা ফিরায় না; কারণ তাহার মনে হয় সকলে যেন তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। তাহার ছোট টুপিটা পায়ের কোলের মধ্যে চাপিয়া চোখ বড় বড় করিয়া সে রহস্য-যবনিকার দিকে চাহিয়া থাকে।

অবশেষে ধপ্ ধপ্ করিয়া তিনবার আওয়াজ শুনা গেল; মিশেল একবার নাক ঝাড়িয়া গীতিনাট্যের স্বরলিপিখানা পকেট হইতে টানিয়া একমনে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন, যেন ষ্টেজের উপরের অভিনয়ের দিকে দৃক্‌পাতও নাই। যন্ত্র সঙ্গত আরম্ভ হইল; প্রথম স্বর-গ্রামের আলাপেই ক্রিস্‌তফ্ যেন স্বস্তি বোধ করিল; এই স্বর-জগতের সঙ্গে সে যেন আত্মীয়তা বোধ করিতেছে—তখন হইতে অভিনয়টা যতই খাপছাড়া বোধ হউক না কেন, মোটের উপর সে বেশ সহজে উপভোগ করিয়া যাইতে লাগিল।

পট উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, পিচবোর্ড কাগজের গাছপালা এবং মানুষগুলোও তার চেয়ে বেশী জ্যান্ত নয়। ক্রিস্‌তফ্ অবাক হইল না, শুধু প্রশংসায় উৎফুল্ল হইয়া সব দেখিতে লাগিল। নাটকের আখ্যানবস্তুটি কোন্ এক প্রাচ্যদেশের, কিন্তু কোন দেশ তাহার ঠিকানা করা শক্ত। নিতান্ত কাঁচা কবির লেখা, তাহার মধ্যে প্রাণবস্তু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; ক্রিস্‌তফ্ প্রায় কিছুই বোঝে না, অদ্ভুত রকম ভুল করিয়া বসে; একটা চরিত্রের সঙ্গে আর একটাকে ভুল করে এবং দাদামহাশয়ের জামা টানিয়া এমন সব আজগুবি প্রশ্ন করে, যে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, সে কিছুই বুঝে নাই। তবু তার বিরক্তি নাই। সে প্রচণ্ড উৎসাহে শুনিতেছে। গীতিনাট্যটার মাথা মুণ্ড নাই তবু, তাহাকে অবলম্বন করিয়া ক্রিস্‌তফ্ নব একটা কল্পনাট্য মনে মনে রচনা করিতে লাগিল। যাহা দেখিতেছে তাহার সঙ্গে কিন্তু কোন মিলই রহিল না। প্রতি মুহূর্তে দু'একটা ঘটনা তাহার মনগড়া আখ্যানটিকে উলট্‌পালট্ করিয়া দিল। কিন্তু তাহাতে না দমিয়া ক্রিস্‌তফ্ নতুন করিয়া গল্পটিকে মেরামত করিয়া যাইতেছিল। নানা প্রকার শব্দ করিয়া সে বুঝাইতেছিল যে, অভিনেতৃ-দলের মধ্যে সে বিশেষ ভাবে কোন কোন মানুষকে পছন্দ করিতেছে, এবং যাহাদের উপর তাহার সহানুভূতি পড়িয়াছে তাহাদের অদৃষ্টে কি ঘটে জানিবার জন্য সে রুদ্ধশ্বাসে

অপেক্ষা করিতেছে। একটি সুন্দরী নামিয়াছে তাহার বয়স অনিশ্চিত রকমের, দীর্ঘ উজ্জ্বল কেশদাম, একটু অস্বাভাবিক রকম আয়ত চক্ষু এবং নগ্ন পদ। ইহার সম্বন্ধে ক্রিস্‌তফ্‌ যেন একটু বেশী ভাবিতেছে! যত উৎকট অসম্ভব ঘটনার বিন্যাসে কিন্তু সে একটুও বিচলিত হইতেছে না। অভিনেতাদিগের কদর্য্য হাস্যোদ্দীপক চেহারা, বিকট মোটা শরীর, এবং দুই সার দিয়া যে অদ্ভুত গানের জুড়িগুলি দাঁড়াইয়াছে, শিশুর উৎসুক দৃষ্টিতে এ সব কিছুই সে দেখিতে পায় না। যত নিরর্থক অঙ্গভঙ্গি, অতিরিক্ত চেঁচাইয়া গাওয়ার ফলে স্ফীত মুখ, বিরাট পরচুল, 'টেনর' গায়িকার অসম্ভব উঁচু জুতা, এবং রঙ্গমঞ্চে তাহার বিশেষ প্রিয়তমাটির মুখে বিচিত্র রঙের ছোপ ও সাজসজ্জা ক্রিস্‌তফের চোখে পড়ে না। তাহার এখন প্রেমিকের অবস্থা, প্রিয়তমার যথার্থ স্বরূপটি দেখা সম্ভব নয়; প্রেম তাহাকে অন্ধ করিয়াছে। শিশুসুলভ অদ্ভুত মায়াদৃষ্টি সব অপ্রীতিকর অনুভূতিকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে এবং রূপান্তরিত করিতেছে।

বিশেষভাবে মায়াজাল সৃষ্টি করিতেছিল সঙ্গীত ও সঙ্গত। ইহাতে দৃশ্যগুলিকে যেন এক মায়া কুহেলিকার আবহাওয়ায় আচ্ছন্ন করিয়া সমস্ত জিনিষকে সুন্দর কাম্য ও মহান করিয়া তুলিতেছিল। অসম্ভব প্রেমের পিপাসা হৃদয়ে জাগাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের কত ছায়ামূর্ত্তিকে নামাইয়া আপন গড়া শূন্যতাকে পূর্ণ করিতেছে। ক্রিস্‌তফ্‌ ভাবে অধীর! কোন কোন কথা ইসারা, বা গীতিবাক্য কেমন যেন তাহাকে অস্বস্তিতে ফেলে! সে তখন মুখ তুলিতে পারে না। ভাল মন্দ সে কিছুই বুঝে না, শুধু, কখনও লজ্জায় লাল হয়, কখন তাহার মুখ ফেকাসে হইয়া উঠে। কখনও কপালটা ঘামিয়া উঠে, তাহার ভয় করে পাছে তাহার এই বিব্রত অবস্থা কেউ দেখিয়া ফেলে। নাট্যের বিষম অবস্থাটি যখন আসিল—চতুর্থ অঙ্কের সঙ্গে সমস্ত প্রেমিকের উপর যেন তাহা সর্ব্বদাই আসিয়া পড়ে,—এবং সেই 'টেনর' গায়িকা ও প্রবীন নায়িকা তাহাদের চেঁচাইবার শক্তি কতটা বুঝাইয়া দেয়—সে সময় ক্রিস্‌তফের যেন দম বন্ধ হইয়া আসিল। তাহার গলা এমন ব্যথা করিতে লাগিল যেন খুব ঠাণ্ডা লাগিয়াছে, হাত দিয়া সে নিজের ঘাড়টা টিপিয়া ধরিল; সে যেন ঢোঁক গিলিতে পারিতেছিল না, তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে, হাত পা যেন জমিয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে দাদামহাশয়ের অবস্থাটাও প্রায় সেই রকম দাঁড়াইয়াছিল, মিশেল সরল শিশুর মতই নাটকটি উপভোগ করিতেছিলেন এবং ভাবাবেগে বিব্রত অবস্থা চাপা দিবার জন্য যেন অন্যমনস্ক ভাবে কাশিতেছিলেন। কিন্তু ক্রিস্‌তফ্‌ সব

বুঝিতেছিল এবং তাহাতে খুশী হইতেছিল। বিষম গরম পড়িয়াছে, ক্রিস্তফ প্রায় ঘুমে ঢুলিয়া পড়ে; সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল কিন্তু তবুও তাহার ভাবনা "আরো অনেকটা আছে ত? এখুনি শেষ হতে পারে না!" হঠাৎ পালা শেষ হইয়া গেল, কেন হইল সে বুঝিল না। যবনিকা পতনের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকবর্গ উঠিয়া পড়িল, মায়াজাল ছিন্ন হইয়া গেল।

—ক্রমশ



মানসী

শ্রীহুমায়ুন কবির

জীবনের সিন্ধু মথি বেদনার অমৃত-গরল
প্রেম কহি তারে মোরা সখি!
নিকুঞ্জের কণ্টক কেতকী!
অভিমান, অশ্রুজল,
ক্ষণে ক্ষণে অকারণে বেদনার অশ্রুনীরে ভাসি,
অকারণে হাসি
আপনারে ঢালি দিয়া পূর্ণপ্রাণে তোরে ভালবাসি!
সুধারাশি
ছেয়েছে গগন
অমৃতধারায় মম সিক্ত প্রাণমন!

সারাদিন ধরি'
তোরি তরে
প্রহর গণিয়া আছি উদাস অন্তরে,
বসি' হিয়া ভরি
আনন্দ—আশায়।
দিন আসে দিন চলে যায়,
শূন্য পড়ে থাকে মোর হিয়া;
কাঁদিয়া কাঁদিয়া
সকল ভুবন ভরি তোরি খোঁজে বেড়াই ফিরিয়া!

কখন নয়নে ধাঁধা লাগে
ছুটে যাই আগে
উৎসুক পরাণে,

তোর হাসিখানি যেন দেখিলাম কাহার বয়ানে !
নিভে যায় হাসি
আমার অন্তর ভরি ঘনাইয়া আসে অশ্রুরাশি,
ফিরে আসি কাতরে কাঁদিয়া
ব্যথাদীর্ণ হিয়া !

পথে যেতে যেতে
বারে বারে উঠিয়াছি মেতে
ভুলিয়া গিয়াছি তোর বাণী,
তখন দেখেছি তোরে, ভাবিয়াছি তোরে নাহি জানি !
আপনারে বুঝিতে না পাই
আপনার অন্তরের বনমাঝে পথ যে হারাই,
তাই তোরে খুঁজি নানা বেশে
অন্তরের নব নব দেশে !
সুখদুঃখ দুটি তারে বাজে মম জীবনের বীণা,
ভাবি তুই মোর প্রাণলীনা !
বারে বারে ভুলে যাই কথা
সকল অন্তর ভরি বিষদাহে জ্বলে তীব্র ব্যথা !

সুখহাসি নিভে যায় সখি,
চকিতে চমকি
তোর পানে যাই ত্বরা ছুটে
রূঢ় আলোকের ঘায়ে নয়নের স্বপ্নমোহ টুটে !
বেদনা বাজিতে থাকে অন্তর ভরিয়া
মরমে মরিয়া
মূর্চ্ছিত হৃদয়খানি গোপনে বহিয়া পথ চলি,
নিভৃত অন্তর কাঁদে বেদনায় গলি' !

———

ডাকঘর

এবারে কল্লোলে যাঁর ছবিখানা দেওয়া হোল তাঁর সম্বন্ধে আলোচনাও এ সংখ্যায় আছে। জেসিন্তো বেনাভান্তে কল্লোলের বন্ধুদের যে ইংরেজী চিঠিখানি লিখেছেন তা এখানে তুলে দিচ্ছি। তাঁর হাতের লেখা চিঠিখানির অনুলিপি ব্লক ক'রে দেবার সুবিধা হোল না। এর পরেও যাঁদের চিঠি কল্লোলে প্রকাশিত হবে তাঁদের সকলের লেখাও যে ব্লক ক'রে দিতে পারব তা আশা করি না।

(চিঠি)

Dear Sir,

Thank you with all my heart for your letter. I send you the photo you ask for. Some of my works are published in America—English Translation, but I have none of the volumes.

My best salutations to your friends and believe yours—

Madrid }
Spain }

JACINTO BENAVENTE

(অনুবাদ)

মহাশয়,

আপনার পত্রের জন্য আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আপনি যে ফটো চাহিয়াছিলেন, তাহা পাঠাইলাম। আমার লেখা কিছু কিছু আমেরিকায় ইংরেজিতে অনুবাদ হইয়াছে, কিন্তু তাহার একখানি গ্রন্থও আমার কাছে নাই। আপনার বন্ধুরা আমার বিশেষ নমস্কার জানিবেন এবং বিশ্বাস করিবেন আপনাদের—

ম্যাড্রিদ্ }
স্পেন্ }

জেসিন্তো বেনাভান্তে

ইনিও বিদেশী। এঁদের যশ, খ্যাতি, কাজ বা অবসরের অভাব থাকলেও তাঁরা প্রায় সকলেই সুদূর বাংলার কোন্ প্রান্ত থেকে ক'টি মানুষের প্রীতির আহ্বানের সাড়া দিয়েছেন। এগুলিও বড়লোকের লক্ষণ। আত্ম অহঙ্কার বা concieted ভাব হয় ত এই বিদেশীদের মধ্যেও অনেকের আছে কিন্তু যেখানে সাহিত্যের নামে ডাক পড়েছে সেখানে মানুষ-হিসাবে একেবারে সদর পথে এসে এঁরা দাঁড়িয়েছেন। এ বিষয়ে এ কথাগুলি বলবার এই কারণ যে, আমরা এঁদের কাছে ঘেঁষে যেতে পারি এমন কিছু সম্বল বা কৃতিত্ব আমাদের নাই অথচ এঁরা আমাদের সম্বন্ধে কিছু না জেনে-শুনেই শুধু বাংলার তরুণ সাহিত্য অনুরাগী বলেই আমাদের পত্রের উত্তর দিয়ে বাংলার সম্মান রক্ষা করেছেন। নিজের সাহিত্যকে ঠিকুজি-কুষ্ঠির মত টিনের চোঙায় তুলে না রেখে, নিজের পদগৌরবে নিজেকে জড়িয়ে না রেখে এঁরা বাংলার অজ্ঞাত-কুলশীল প্রাণের বেতার খবরের জবাব দিলেন। যে সাহিত্য মানুষ সৃষ্টি করে, সর্ব্ব-মানবকে এক করে, দেশ জাতিকে উল্লঙ্ঘন করে মানুষের মন ও ধর্ম্মকে চালনা করে তার ডাক সাহিত্যের যাঁরা শিল্পী তাঁরা কেউ এড়াতে পারেন না। হয় ত কোনও কোনও দেশের সাহিত্যিক তা' করেন। কিন্তু এই অবহেলা দ্বারাই প্রমাণ হয়ে যায় যে, তাঁরা সত্যিকারের সাহিত্যিক নন্। তাঁরা যশলিপ্সু, কাঙাল; প্রাণ তাঁদের নাই। প্রাণ থাকলে প্রাণের সাড়া না দিয়ে কারুর উপায় নাই। প্রাণ থাকলে সাহিত্যের ক্ষুদ্রতম সেবাও যে-মানুষ করে তাঁরা তাদের যথাযথ সম্মান করতে পারতেন। তাঁরা যে তা' পারেন না তার কারণই হচ্ছে তাঁরা যশের জন্য সাহিত্যের সেবা করেন, শুধু সৃষ্টির উল্লাসে তাঁদের কোনও সৃষ্টি জীবন পায় নি। এই উল্লাসের ভিতর বাধা-বন্ধ নাই, শুধুই মায়ার সৃষ্টি, মায়ার খেলা, প্রাণের খেলা। তাই আপামর মানবের প্রাণের কান্না একজনের রচনার ভিতর ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে, মানব-মনের অবিশ্রান্ত আনন্দের ধারা কারুর রচনায় চিরন্তন্ প্রবাহের মত মানব-মনের তটভূমি সঞ্জীবিত ক'রে যায়। তাই সত্যিকারের সাহিত্যিক যাঁরা, স্রষ্টা যাঁরা, তাঁরা যতই বড় হ'তে থাকেন ততই যেন ছোট্টটি হয়ে যান্। মানুষের সঙ্গে তাঁদের নিগূঢ় সম্বন্ধ ছোট-বড় তাঁদের কাছে পরম আদরের। এই প্রাণের যোগেই প্রাণ হতে প্রাণের টান্ পড়ে, সেই টানে মানুষ মানুষের চিরদিনের আপন হয়। বিধি-নিষেধের বাহিরে, লোক-চক্ষুর অন্তরালে মানুষের এই মহান্ পরিবার-গঠনকার্য্য সংগঠিত হচ্ছে। যে ধর্ম্ম মানুষকে শুধু বড়ই করবে, ব্যপ্ত করবে, অমর করবে

সেই ধর্ম্মই এই বৃহৎ মানব-পরিবারকে আশ্রয় ক'রে নানাপ্রকারের বিপর্য্যয়ের ও পরিবর্ত্তনের ভিতর চির-নবীনতা লাভ করছে।

মানুষকে বাঁচাবার, মানুষকে মারবার কল কারখানা, ঔষধ পদ্ধতি এই বিজ্ঞানের যুগে অনেক আবিষ্কার হচ্ছে, কিন্তু যে অনুভূতি ও সহানুভূতি মানুষের প্রাণের কামনা ও সাধনাকে চিরপ্রবাহে নিরন্তর উৎফুল্ল করছে সে প্রবাহের ধারাকে রক্ষা করা বিজ্ঞানের বুদ্ধির বাইরে। যদি একটা মানুষের নীরব চাহনির মধ্যে কোনও ভাষা থাকে তাহলে সেই ভাষা জাতি বর্ণ দেশ কাল নির্ব্বিশেষে যুগ যুগ হতে অশব্দ হয়েই প্রকাশিত হয়ে আসছে। হৃদয়ের ভাষাও তাই নীরব ভাষাকে আশ্রয় ক'রে গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। এই সাহিত্যের সৃষ্টি মানুষের প্রাণের সম্পদ, এ সম্পদের ক্ষয় নাই।



গেল কয়েকটা বছরের মধ্যে শুধু বাংলা দেশই কতকগুলি 'মানুস'কে হারাল! এবার যেন বাংলার উপরে দানের পালা পড়েছে। বাংলার যত কিছু ভাল, যত ক'টি ভাল সবই এই দানের বলি হোল। কে দিবি তোর শ্রেষ্ঠ দান— দেবতার এই ডাকের সাড়া দিল বুঝি বাংলা দেশ। মনে হয় এবার তার বদলে বিধাতার কিছু ফিরিয়ে দেবার পালা পড়ল। বাংলাকে তাঁর অমর করতেই হবে। এত কেড়ে নিয়ে এত অসহায় ক'রে বাংলাকে তিনি অমর-বরের যোগ্য ক'রে তুলছেন। যাঁরা আহুতি হলেন, তাঁদের আদর্শ, অভিপ্রায়, অসমাপ্ত কাজ আমাদের জন্য রইল।

যিনি মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ ছিলেন সে মহারাজা আজ কয়েকদিন হোল দেহ ত্যাগ করেছেন। আকস্মিক দুর্ঘটনা তার কারণ। তিনি মহারাজা হয়ে মহারাজার মতই কেবলমাত্র যান-বাহন, প্রাসাদ, আড়ম্বর ও সম্পদ আহরণ করেই মহারাজার সম্মান নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন। তাহলেও খবরের কাগজে, চিঠিতে পত্রে তাঁর জন্য অল্প বিস্তর শোক প্রকাশ ও আলোচনা হোত নিশ্চয়। কিন্তু যে গুণগুলি জগদিন্দ্রনাথের নিজস্ব ছিল সেগুলির তিনি সাধনা করেছিলেন। মনুষ্যত্বের তাড়া এত নির্ম্মোঘ। মানুষ হবার আকিঞ্চন তাঁকে মনের পথে ভিখারীর মতই ঘুরিয়েছে। ব্যক্তির সুখ সুবিধার উপরেও ব্যাপ্তির জন্য তিনি আপনাকে নিয়োজিত করেছিলেন। মন তাঁর শিল্পীর কামনায় ভরা ছিল। সে সাধনে নিজেকে প্রয়োগ ক'রে অনেক বিষয়ে কৃতিত্ব

লাভ করেছিলেন। বড় বড় গুণের কথা লেখবার আগে একটা কথা খুব মনে পড়েছে,—তাঁর হাসি আর হাসাবার ক্ষমতার কথা। এমন 'আমুরে' লোক খুব কম দেখা যায়। আজকাল বাংলাদেশে মুখে হাসি আছে এমন লোক বড় দেখা যায় না। তা কিসের জন্য সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা হয় ত অনেকটা নির্দ্দেশ করতে পরেন কিন্তু মানুষের মুখে হাসি থাকবে না এর মত বড় অভিশাপ বোধ হয় আর কিছু নাই। জগদিন্দ্রনাথ যেমন হাসতেন, তেমনি হাসাতেও পারতেন। গল্প ?—আরম্ভ হোল ত শেষ নাই! তাঁর কাছে বসে সত্যি সত্যি খাওয়া-দাওয়া ভুলে যেতে হোত। বয়স ত তাঁর কম ছিল না, কিন্তু বয়স মনে ক'রে ক'রে গম্ভীর হয়ে থাকা—এ তাঁর স্বভাবে ছিল না। ছোট বড় বিচার নাই, তাঁর কাছে গেলে সব সমান! মহারাজাদের আম্লা বা কর্ম্মচারীদের কাছে এগুতেই মন চায় না, তা আবার স্বয়ং মহারাজা। কিন্তু এ মহারাজার সে বালাই ছিল না। তবে কিছু একটু পেটে বিদ্যে না থাকলে এঁর কাছে বড় পাত্তা পাওয়া যেত না। নিজে গুণী লোক ছিলেন, গুণের আদরও ছিল তাঁর কাছে। কম বেশীতে কিছু এসে যেত না। গান জান, বাজনা জান, খেলাধূলা জান, লেখাপড়ার চর্চ্চা কর—যথেষ্ট—মহারাজার দ্বার খোলা, মন খোলা। ক্রিকেট খেলা বাংলাদেশে এতখানি উঁচুতে তুলতে তিনি কম টাকাটা খরচ করেছেন! কোথায় কে ভাল খেলোয়াড়—ভারতবর্ষেই হোক্ আর বিদেশেই হোক—আন তাকে যত টাকা লাগে। বাঙালীরা তাদের খেলা দেখুক, তাদের সঙ্গে খেলে খেলা শিখুক এই ছিল তাঁর মনের কামনা। বাজনা-বিদ্, কলা-বিদ্, সঙ্গীত-বিদ সাহিত্যিক, কবি—মহারাজা তাঁদের তাঁবেদার। নিজে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, নিজে সুলেখক, নিজে ভাল কবি, নিজে ভাল বাজিয়ে গাইয়ে, কিন্তু কোথায় ভালটুকু তারই খোঁজে তাঁর মন-ধ্যান্। অর্থের খরচ ত, কথাই নাই। টাকা খরচ ক'রে, কেবলমাত্র মাইনে-করা সম্পাদক রেখে মাসিক-পত্র চালান আর নিজে তার সম্পাদক ব'লে নাম দেওয়া এ প্রথা হয় ত এদেশে চলিত আছে কিন্তু জগদিন্দ্রনাথ সত্যই সম্পাদকী করতেন। তাঁর সে ক্ষমতাও ছিল। 'মানসী-মর্ম্মবাণী' তাঁর হাতে এসে সাহিত্যক্ষেত্রে যে স্থান অধিকার করেছে শুধু মাইনে করা সম্পাদক রেখে তা' সম্ভব ছিল না। তাঁর সঙ্গে বাংলার প্রধান প্রধান লেখক অনেকেই একযোগে কাজ করেছেন, কিন্তু তাঁর নিজের কাগজের সম্পাদনে নিজের যথেষ্ট নজর ছিল।

দেশে পণ্ডিত বিদ্বান অনেকে আছেন, কিন্তু তাঁরা কেমন যেন মাথাবোঝাই



জগদিন্দ্রনাথ রায়

জাহাজের মত হয়ে যান। তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ই বেশী আসে। বিদ্বান ব'লে যদি মনে মনে শ্রদ্ধায় পাঁচবার মাথা নত হ'য়ে আসে কিন্তু তাঁদের ঐ গুরু-গম্ভীর ভাব দেখে মাথা আর উঠ্‌তেই চায় না। জগদিন্দ্রনাথও সুপণ্ডিত ছিলেন, Culture ব'লে যে জিনিষটার নাম তা তাঁর প্রতি আঙ্গুলটির ডগায় যেন লেখা। Culture জিনিষটা ঠিক্ জ্ঞানলাভের মাত্রার সঙ্গে বেড়ে চলে না। ওটা মানুষের মনের নিজস্ব—ঐখানেই মানুষের মনের বাহার ধরা পড়ে। জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা ক'রে, আলোচনা ক'রে ব'সে, হেসে কোথাও সৌজন্য শিষ্টতা বা কমনীয়তার অভাব মনে হবার মত কিছু ছিল না। কাজেই তাঁর সঙ্গে ও সাহচর্য্য মানুষের কাম্য ছিল। ভয়ের হেতু ছিল না।

রাজনীতি-ক্ষেত্রেও জগদিন্দ্রনাথ ঘনিষ্টভাবে যোগ দিয়েছেন। কংগ্রেস ও কনফারেন্স প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট যোগ ছিল। বাংলার অন্যতম প্রধান জমিদার হলেও তিনি কখনও নিজেকে জনগণ থেকে স্বতন্ত্র মনে করেন নি; আভিজাত্যের অনুশীলনে তাঁর গণতন্ত্রবাদী মন আরও সুন্দর হয়ে উঠেছিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তারপরও ১৮৯৭ ও ১৯১২ খৃষ্টাব্দেও তিনি দুইবার ঐ সভার সদস্য হন।

পূর্ব্বে প্রাদেশিক সম্মিলনীর কার্য্য প্রধানত ইংরেজীতেই সম্পন্ন হোত। যে অধিবেশন জগদিন্দ্রনাথের আহ্বানে নাটোরে হয় তার বিশেষত্ব এই ছিল যে, অধিবেশনের সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বক্তৃতা রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অনূদিত হ'য়ে সভায় পাঠ করা হয়। জগদিন্দ্রনাথও তাঁহার অভিভাষণ বাংলায় পাঠ করেন।

জগদিন্দ্রনাথ সাহিত্যরসিক, সামাজিক, কবি, পরহিতকারী ছিলেন বলেই তাঁর এত বড় সম্মান। তাঁর পরিবারস্থ সকলকে সান্ত্বনা দেবার আমাদের অধিকার আছে বলে আমরা মনে করি না, কিন্তু যে ভাবে চিন্তা করলে শোক, মৃত্যু ও সমস্ত বিচ্ছেদকে আত্মায় ধারণ করা যায়, জগদিন্দ্রনাথের বিচ্ছেদেও তাঁর পরিবার আশা করি এই শোক হতে শক্তি ও নবজীবনের প্রেরণাই লাভ করবেন।

এবারেও সমালোচনার জন্য কতকগুলি পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা আমাদের কাছে এসেছে। তার মধ্যে কতগুলির সংবাদ জানাচ্ছি।

অত্যাচারী শাসক (রুষিয়ার)

আর্য্য পাবলিশিং কোম্পানী, পি ৫৭, রসা রোড্ সাউথ, কলিকাতা হতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ আনা মাত্র। ঋষি টলষ্টয় লিখিত Rule by Murder-অবলম্বনে রচিত।

ভারতে হিন্দু-মুসলমান

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত লিখিত। মূল্য আট আনা। বিষয় সূচী—ভারতে হিন্দু, হিন্দুর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, হিন্দু ও মুসলমান, ভারতে মুসলমান, হিন্দুত্বের প্রকৃতি, মোসলেম প্রতিভা, নেশনের ঐক্যসূত্র। প্রকাশক শ্রীসুরেশচন্দ্র বর্ম্মণ, আর্য্য পাবলিশিং কোং, পি ৫৭ রসা রোড্ সাউথ, কলিকাতা।

আত্মদান—শ্রীযুক্তা নুরন্নেছা খাতুন 'সত্য ঘটনা মূলক গার্হস্থ্য কথন।' মূল্য একটাকা। প্রকাশক মোসলেম পাবলিশিং হাউস, ৩নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। এই গ্রন্থকর্ত্রীর অপর দুইখানি বই 'স্বপ্ন দৃষ্টা' ও 'জানকী বাঈ'।

মেসোপটেমিয়া ভ্রমণ

মোহাম্মদ আব্দুস্ সত্তার প্রণীত কারবালা, বাগদাদ্ প্রভৃতি তীর্থস্থানের কাহিনী। একমাত্র প্রাপ্তিস্থান—মোসলেম পাব্লিশিং হাউস্, ৩নং কলেজ-স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আগামী ১লা মাঘ হইতে, কল্লোল এবং কল্লোল পাবলিশিং হাউস্ সম্পর্কীয় যাবতীয় চিঠিপত্র, রচনা ও মূল্যাদি ১০।২ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

গোকুলচন্দ্র নাগ স্মরণে

শ্রীজিতেন বকসী

হে অচিন হে তরুণ বন্ধু মোর, সুন্দর পথিক,
বিদায়ের কাল কিগো এই হলো ঠিক?
বরণের তরে যবে, ধরার অঙ্গন-তলে
শেফালির দীপশিখা জ্বলে,
রক্ত কমল যবে, ধূপ গন্ধে দিল রন্ধ্র ভরি'
বিবশিয়া দশ দিশি; তব পথোপরি'
শুভ্র-কাশ আঁকি দিল মুগ্ধ-চিত্তে শ্বেত-আলিম্পন—

হে প্রেমিক এই কিগো যাবার লগন?
ভাল বেসেছিলে এই ধরা
গানে-গন্ধে পরিপূর্ণা মুগ্ধা, কলস্বরা;
সাজায়ে গেলে গো তারে, ভরি দিবা-রাতি
অশ্রুমালা গাঁথি';
চর্চ্চিত করিলে তার ভাল,
যৌবনের দিয়ে স্বপ্ন-জাল;
কণ্ঠে দিলে তার
দুঃখ-হত ব্যর্থ জীবনের বেদনার রক্ত-পুষ্প হার।

আজি এই পাত-ঝরা বায়
অশ্রুর মায়া এসে চক্ষু মোর ম্লান বাষ্পে ছায়,
অকারণে অবুঝ ব্যথাতে;
আজ মনে পড়ে, তব চরণের পাতে

পথখানি কেঁদেছিল, কেঁপেছিল উদাসী সমীর
সে-দিনের মায়া লাগে, হৃদয়ে অথির ;
স্মরি তোমা, নয়নেতে ভরে তপ্ত বারি
ওগো চির-সৌন্দর্য্য পূজারী !

চঞ্চল পান্থ ওগো, দুদিনের ঘরখানি-বাঁধা
সুখ-দুঃখ সর্ব্ব হাসা-কাঁদা,
শেষ করিলে কি ? হায়—
সুন্দরে জীবন ভরি যারা পূজে, যারা ওগো চায়
তাহাদেরই পড়ে ডাক্, আসে গো আহ্বান
পথ-চলিবার ; কণ্ঠে লয়ে বেলা-শেষ গান
তারা ধরে পথ, অস্তাচল-মুখে
অতৃপ্ত জীবন লয়ে, অশ্রু-রুদ্ধ বুকে।

যাও তুমি, দরদী গো কবি, শিল্পী, হে রসিক-মন,
নিত্য-কালের সিংহাসন
রবে তব তরে ; আজ যারা
চিনিল না তোমা ; যে অম্লান ধারা
বহাইলে বঙ্গ-বাণী বুকে
যারা তৃপ্তি সুখে
করিল না পান—বুঝিল না রসাস্বাদ তার
না বুঝুক, না চিনুক তারা ! পারিজাত-হার
শুভ্র তব স্মৃতি ঘেরি রহিবে জড়ায়ে চিরদিন—
ওগো মুক্ত-আত্মা চির প্রসন্ন নবীন ॥

যাও বন্ধু, হে নির্ভীক-প্রাণ,

সে রঙের আলিম্পন রচি গেলে, দিয়ে তব অন্তরের গান

ওগো প্রিয়, রসিকের চিত্ত-তলে,

তাহা মুছিবে না, নিত্য নয়নের জলে

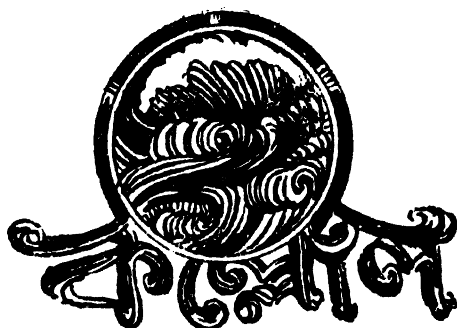
অম্লান রহিবে। যাও তুমি যাও

শিশির কাঁদন-সিক্ত ওগো বন্ধু, ওগো পুবো-বাও!





দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর



তৃতীয় বর্ষ

একাদশ সংখ্যা

ফাল্গুন, সন ১৩৩২ সাল

প্রতি সংখ্যা চারি আনা

মাশুলসহ বার্ষিক তিন টাকা আট আনা

সম্পাদক—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

কল্লোল পাবলিশিং হাউস

১০।২ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

ষষ্ঠ বর্ষ

১৩৩২

ফাল্গুন



বার্ষিক

৩।০ আনা

প্রতি

সংখ্যা

/০ আনা

আবার "বিজলী" আপনাদের শুভকামনা ও সহানুভূতি লইয়া ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহে বাহির হইল। যাঁহারা পুরাতন গ্রাহক ও যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সকলের নিকটই 'বিজলীর' সনির্ব্বন্ধ নিবেদন, নানা অনিবার্য্য কারণে এতদিন পত্রিকা প্রকাশ করিতে না পারিয়া গ্রাহক অনুগ্রাহকবর্গের বিরাগভাজন হইলেও, এই অনিবার্য্য ক্রটি মার্জ্জনা করিয়া তাঁহারা যেন কেহই বিজলীর প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে কার্পণ্য না করেন।

গ্রাহক ও বিজ্ঞাপন সম্বন্ধীয় চিঠি পত্র ও টাকা কড়ি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

রচনা প্রভৃতি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

এখন হইতে প্রতি সপ্তাহে বিজলী নিয়মিত পাইবেন এবং বিজলীর বিচিত্রতা আপনাদিগকে মুগ্ধ করিবে একথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি।

সম্পাদক—শ্রীঅরুণচন্দ্র সিংহ ; শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

কার্য্যালয় :—৯৩।১এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

১১শ সংখ্যা
তৃতীয় বর্ষ



ফাল্গুন
১৩৩২

এস

শ্রীবিভাবতী দেবী

এস তুমি সুন্দর মোর
 নবরূপে এস নবসাজে,
জীবনের বাঞ্ছিত এস
 নিভৃত এ চিত্তের মাঝে।
 মধুমাসে ধরণীর বুকে
 থর থর ব্যাকুলতা সম,
 এস তুমি কম্পিত পদে
 উন্মুখ অন্তরে মম।
নিদাঘের দহনের মাঝে
 দয়াহীন তপনের মত,
এস তুমি, অনিমেষ আঁখি
 করি মোর মুখ পানে নত ;

জলদের মন্থর বুকে
হেসে ওঠো তড়িতের রূপে,—
শ্যামলের অন্তরে এস
সোহাগের মত চুপে চুপে !

জ্যোৎস্নার তরীখানি বেয়ে
এস তুমি চকিতের লাগি,
বিহ্বল নয়নের মাঝে
নিশীথের অনুরাগ মাগি' !
স্বপনের পারাবার পারে
অরুণের মত এস তুমি,
আঁধারের চিরমূক বাণী
ধীরে ধীরে ফুটাইয়ো চুমি' !

নিখিলের তন্ত্রীর পরে
বেজে উঠি' সঙ্গীত সম,
স্পন্দিত অন্তর খানি
ঝঙ্কারে ভরি তোলো মম !
সাগরের উদ্দাম বুকে
ঝড়ের মত ওঠো জাগি,
ঈশানের দূত রূপে এস
জীবনেরে চরণে দলি !

সৃজনের প্রভাতের মত
চেতনার অম্বর বেয়ে,
মহাকাল মন্দির তলে
জীবনের জয়গান গেয়ে,—
এস তুমি আলোকের রথে
সুরে বাঁধা বীণাখানি করে
মরমের তমো রাশি যত
চরণের তলে যাক্ ঝরে।

রাত্রির অভিযান

শ্রীনির্ম্মল কুমার রায়

বন্ধু বলিয়া গিয়াছিল যে ট্রাম ডিপোর কাছে সে আমার জন্য অপেক্ষা করিবে—আর যদি কোন বিশেষ কারণে সে না-ই আসিতে পারে (আমি জানিতাম সে নিশ্চয়ই আসিবে না) তবে সোজা বাঁ দিকে যে বড় রাস্তাটা ট্রাম ডিপোর নিকট হইতে বাহির হইয়াছে তাহা দিয়া গেলে একটা ডোবা দেখিতে পাওয়া যাইবে সেখানে দুইটি রাস্তা মিশিয়াছে—তাহাদের মধ্যে যেটি ডোবাটির ধার দিয়া গিয়াছে সে পথ দিয়া চলিলে তাহাদের বাগান বাড়ী পাওয়া যাইবে। বেশী দূর নয়, ডিপো হইতে বড় জোর মিনিট দশেকের পথ। আমাদের আরও কয়েকজন সে বাগান বাড়ীতে যাইবে বলিয়াছিল এবং সকলে ঠিক ৯-টার সময় ট্রাম ডিপোর কাছে যাইয়া একত্র হইবে ঠিক ছিল।

সন্ধ্যার পরেই যেন শীতটা একটু বেশী করিয়া সেদিন পড়িল। ক্রমান্বয়ে ৪ বৎসর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তাড়া খাইয়া সময়ের মূল্য সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান হইয়াছিল বিশেষতঃ অচেনা জায়গা, লোকজন না পাইলে বড় অসুবিধা হইবে তাই ঠিক করিলাম যে ঠিক ৯-টা না হউক অন্ততঃ কয়েক মিনিট এদিক সেদিকের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিব এবং যাহারা খুব দেরীতে আসিবে তাহাদের উপর খুব এক হাত লইব। ৮-টা বাজিতে না বাজিতেই গরম কোটটি গায় দিয়া ট্রামে চাপিলাম।

কিছুদূর গিয়া কর্পোরেশনের গ্যাসের বাতি শেষ হইল—কেবল বহুদূরে দূরে দু-একটা কেরোসিনের বাতি মুনসীপালের জয়ধ্বজা উড়াইতেছিল। আরোহী সংখ্যা ৬'টি একটি করিয়া কমিয়া আসিতেছিল এবং অবশেষে পোলের কাছে গাড়ী থামিতেই ১ম ও ২য় শ্রেণীর সবগুলি লোক নামিয়া গেল। এ পথে আমি আর কোন দিন যাই নাই। রাস্তার অবস্থাও শোচনীয়; নিতান্তই যেন কোন মতে রাত্রি দিন কত পথিকের পদতাড়ণ ও এই লৌহাসুরের প্রচণ্ড পীড়ণ সহ্য করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছে। কোন কালে বোধ হয় একবার 'খোয়া' দেওয়া হইয়াছিল তাহারাই এই দুঃসময়ে রাস্তাটি যে 'মেটাল্‌ড্‌ রোড্‌' তাহা প্রমাণ করিতেছে। গাড়ীটা ছুটিয়া চলিয়াছে বেশ জোরেই—আমার কেমন একা একা লাগিতেছিল। ভাবিয়াছিলাম ট্রামেই

দু চার জন বন্ধুর দেখা পাইব—আবার ভাবিলাম হয়ত কেউ কেউ আমার আগেই গিয়াছে—আর সকলে আমার পরে যাইবে।

দুদিকে খোলার ঘর—শীতটাও বেশ। আলোয়ানখানা না আনিয়া বড়ই ভুল করিয়াছি। এর আগে ট্রাম মাঝে মাঝে থামিতেছিল—এখন অবিশ্রান্ত ছুটিয়া চলিয়াছে। আমার মনে একটা কেমনতর ভয়ের সৃষ্টি হইল—হয় ত বা ভয় নয়। এ যেন যন্ত্রপুরীর বিরাট লৌহাসুর—আমি এক ক্ষুদ্র মানবশিশু। এ চলিয়াছে আমাকে নিয়া উঃ—কি ভীষণ শব্দ! আমি চুপ করিয়া বসিয়া আছি—কোথায় যাইতেছি! সম্মুখে অন্ধকার—নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার, এর মধ্যে পথ ঘাট বাড়ী কিছু চেনা যায় না, শুধু মাঝে মাঝে এক একটা ঘোলাটে বাতি আসিয়া চলিয়া যায়। তাই তো, এ অন্ধকার রাত্রিতে আমি কোথায় ছুটিয় চলিয়াছি—কোন নরকে কোন জাহান্নামে? এ কি থামিবে না!

একটু ঘুম পাইয়াছিল, হঠাৎ একটা ধাক্কা খাইয়া জাগিয়া উঠিলাম—ট্রাম ডিপোতে পৌঁছিয়াছে।

নামিলাম, আশে পাশে বন্ধুটির খোঁজ করিলাম—তাহাকে পাওয়া গেল না। দেখিতে লাগিলাম অন্যান্য বন্ধুরা কেহও আসিয়া পৌঁছিয়াছে কিনা—কেহ আসে নাই। ভাবিলাম শীঘ্র আসিয়া পৌঁছিবে—এদিকে সেদিকে পায়চারি করিতে লাগিলাম। ক্রমে তিন খানা ট্রাম আসিল—কিন্তু তাহার মধ্যে আরোহী ছিল না। রাত্রি সাড়ে নয়টা বাজিয়া গেল, শুনিলাম সেই শেষ ট্রাম। মনটা বড়ই দমিয়া গেল। এখন কি করি—ফিরিয়া যাইবার উপায় নাই—অথচ এই অন্ধকার শীতের রাত্রিতে একলা অচেনা জায়গায় কি করিয়া খুঁজিয়া বাহির করি। ৫।৬ মাইল হাঁটিয়া বাড়ী ফিরা অসম্ভব। জায়গাটা কদর্য্যতায় পরিপূর্ণ। অবশেষে ঠিক করিলাম, বন্ধুর কথামত বাঁ দিকের রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিলাম।

কিছুদূর গিয়াই রাস্তাটা গলির মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাশের ড্রেনটা অসংখ্য আবর্জ্জনায় বন্ধ হইয়া দুর্গন্ধের সৃষ্টি করিয়াছে। কোথায় বা এক রাশ ছাই রাস্তার অর্দ্ধেক জুড়িয়া রহিয়াছে। কাছেই একটা কালো ভাঙ্গা হাঁড়ী—কতকগুলি ছেঁড়া ন্যাকরা। আমি চলিতে লাগিলাম ১০ মিনিট ১৫ মিনিট করিয়া ২০ মিনিট চলিয়া গেল। সে গলি আঁকিয়া বাঁকিয়া ঘুরিয়া কেবল চলিয়াছে, এর শেষ নাই। অন্ধকার রাত্রিতে একলা এরূপ রাস্তায় চলা যেমনই বিরক্তিজনক তেমনই ভয়প্রদ।

অবশেষে বন্ধুর সেই ডোবার কাছে পৌঁছিলাম, গলিটা একটা ছোট মাঠের মধ্যে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে, মাঠটার বুকে একটা কি মড়া গাছ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, গাছে পাতা একটা নাই—শুক্‌না কাঠ, গাছের বাকল কোথায়ও খসিয়া পড়িয়াছে, শূন্য শুষ্ক ডাল গুলি উৰ্দ্ধপানে ক্ষুধার্ত্ত প্রেতিনীর সহস্র শীর্ণ বাহুর মত ছড়াইয়া রহিয়াছে, কি চায় এরা এই অসীম কৃষ্ণ যবনিকার কাছে। অন্ন—জল—পানীয়? কিছুনাই—কিছু নাই ওর কাছে। ও শূন্য—ফাঁকি, একেবারে ফাঁকি, নিশিদিন পৃথিবী মায়ের জীবন রস শোষণ করিয়া লয়। একটা কি পাখী—প্রকাণ্ড আকার—সোঁ সোঁ শব্দে উড়িয়া আসিয়া ঝুপ্ করিয়া সে গাছটির উপর বসিল।

পাশেই ডোবা. ডোবার কোণে একখানা চায়ের দোকান—তার সম্মুখে একটা কেরোসিনের বাতি। বাতিটা আলোর চেয়ে ধূমই বেশী উদ্গারণ করিতেছিল। সে স্তিমিতালোকে ডোবার বীভৎসতা আরও প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। জল প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে, আর যা ও আছে অশেষ কচুর পানাতে ভরা, কত পোকা উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে, ভাঙাপারের এখানে সেখানে আলোর রেখা পড়িয়া যেন বলিতেছে এ শূন্য—ভরা নয়, রাত্রি দিন সে তড়াগের বুক হইতে দূষিত বাষ্প উঠিয়া বাতাসকে বিষাক্ত করে।

সমস্ত দেখিয়া আমার মনটা বিরক্ত এবং ভয়ে ভরিয়া উঠিল, মাঠের মধ্যে আসিয়া শীতে বেশ কষ্ট পাইতেছিলাম। ভাবিলাম ঐ চা'র দোকানের মালিককে একটু জিজ্ঞাসা করিয়া লই। ১০ মিনিটের জায়গায় ২৪ মিনিটে এখানে পৌঁছিয়াছি। আর বাকিটা কতক্ষণে পৌঁছিব কে জানে।

চা'র দোকানে উঠিলাম, দোকানের আসবাব পত্রের মধ্যে একখানা টেবিল, কোন যুগে তৈরি হইয়াছিল তার ইতিবৃত্ত নাই। উপরের কাঠখানা এখানে সেখানে পোকায় খাইয়াছে।—সেজন্যই বোধ করি মেটে রং তাহাতে লাগান হইয়া থাকিবে। সে রং-এর দুর্গন্ধে ঘরখানা ভরিয়াছিল। একখানা টুল কাছেই ছিল। তাহার গায়ের রং গবেষণার বিষয়, আর কাছেই একটা জিনিষ ছিল যাহা কোনদিন চেয়ার নামক গৌরবজনক আখ্যায় অভিহিত হইত। এখন আর তাহাকে সে নাম দেওয়া চলেনা। দুটা হাতলের একটাও নাই, পিছনের কাষ্ঠখণ্ডেরও অভাব। টেবিলের উপর একটা টিনের চতুষ্কোণ ডিবা। উপরে জিনিষটা আলো দেবার জন্য ছিল, তাহার দোষ দেওয়া চলেনা, চিম্‌নি বেচারির গায়ের এখানে সেখানে এত কাগজ যে দেখিলে সন্দেহ হয় জিনিষটা কাচের না

কাগজের? সেই দুর্ভেদ্য কাগজাবরণ ভেদ করিয়া যে অল্প পরিমাণ আলো বাহিরে আসিতেছিল তাহাতে ঘরের সমস্ত জিনিষ অতি বীভৎস বলিয়া বোধ হইল। একটা কেরাসিনের টিন নির্মিত চুল্লীর উপর স্থাপিত টিনের কেত্‌লি হইতে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠিতেছিল। দোকানদার চুল্লীর পাশে একখানি অতি নোংরা চাদর গায় দিয়া জড় সড়্ হইয়া বসিয়াছিল।

আমি দোকানে বসিয়া টেবিলের উপর হাত রাখিতেই লোকটা চেঁচাইয়া উঠিল—"ওখানে নয়—ওখানে নয়—" হাতটা তুলিতেই দেখি এক চাপ্‌টা রং হাতের মধ্যে—জামার গায়ে লাগিয়াছে। রুমাল দিয়া হাত মুছিলাম কিন্তু দুর্গন্ধ গেলনা।

দোকানী জিজ্ঞাসা করিল, কি চাই বাবু আপনার? সেখানে কিছু চাহিবার প্রবৃত্তি আমার ছিল না কিন্তু যখন একবার আসিয়া সেখানে বসিয়াছি—তাই বলিলাম—এক কাপ্‌ চা।

"আচ্ছা" বলিয়া চিনির ডিবা খুলিয়া দেখিতে পাইল উহাতে গোটা কয়েক আরশোলা ভিন্ন আর কিছু নাই। আমাকে অতিশয় বিনীত ভাবে কহিল, দেখুন আজ ঐ বাবুদের ওখানে থিয়েটার—অনেক লোক এসেছে কিনা, তারা এখানে সব চা খেয়ে গেল—তাতেই চিনিটা যে ফুরিয়ে গেছে তা আমার খেয়ালই ছিলনা—তা' এক্ষুনি নিয়ে আসছি একটু বসুন।

তাহার সমস্ত চোখেমুখে যে কাতরতা প্রকাশ পাইল যে পাছে এই একটি মাত্র গ্রাহক ছুটিয়া যায়, তাহাই যথেষ্ট। বিশেষতঃ কাছে কোথাও থিয়েটার হইতেছে এই সংবাদ পাইয়া আমার মনটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বন্ধুর বাগানবাড়ীতে থিয়েটার দেখিবারই নিমন্ত্রণ ছিল।

দোকানী চলিয়া গেল। আমি একলা সে দোকানে বসিয়া রহিলাম। ধীরে ধীরে একখণ্ড কুয়াসা আসিয়া ডোবাটার উপর দাঁড়াইল। সে কালো অন্ধকারের বুকে অস্ফুট সাদার আবরণ যেমনই অশোভন তেমনি অনর্থক, সে যেন অন্ধকারের গাঢ়তা বুঝাইয়া দেয়। মুমূর্ষুর মুখের ক্ষীণ এবং ক্ষণিক একটু উজ্জ্বলতার মত।

একটু একটু বাতাস বহিতে লাগিল, ভয়ানক শীত, কুয়াসাগুলি এলো মেলো হইয়া ছড়াইয়া পড়িল। টুপ্‌-টাপ্‌ করিয়া শব্দ হইল, একি এ অসময়ে বৃষ্টি! তাইতো মনটা ভয়ভয় করিতে লাগিল, দোকানীটাকে যাইতে

দিয়া ভাল করি নাই। হঠাৎ দূরে চাহিয়া, দেখিলাম, একটা মানুষের মত—এক মুহূর্ত্তে শরীরটা শিহরিয়া উঠিল। মনে মনে খুব সাহস করিলাম, ভয় পাইলে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা। ক্রমেই মূর্ত্তিটি দোকানের দিকে আসিতে লাগিল। খুব উঁচু। হ্যাঁ—এতক্ষণে বাঁচিলাম, এখন বেশ দেখা যাইতেছে মানুষই বটে।

লোকটা আসিয়া দোকানে উঠিল, দোকানের অস্ফুটালোকে তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। এর চেয়ে ভূত হইলে ভাল ছিল—সে মিথ্যা—কিন্তু এ কি ভীষণ বীভৎস বিকট মানুষ—জলজ্যান্ত মানুষ আমার সম্মুখে!

লোকটার বাঁ দিকের গাল ও কাণটা একেবারেই ছিল না। তাতেই দাঁতগুলি একেবারে শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল। আশে পাশের চামড়া সঙ্কুচনে শুকাইয়া গিয়াছিল; সে বিশ্রী কালো অসংবিন্যস্ত চর্ম্মের মধ্যে অপরিষ্কার দাঁতগুলি ঝক্ ঝক্ করিতেছে, এ যেন অন্ধকারের বুকে তার সর্ব্বগ্রাসী দংষ্ট্রারাজী, বিশ্বের যাবতীয় শুভ ঐ তীক্ষ্ণ শক্ত দন্তের পেষণে চূর্ণ করিবে; চোয়াল দুইটা অসম্ভব রকমের বড়, দৃঢ়তার পরিচায়ক। লোকটাকে দেখিলে মনে হয় অনেক ঝড় ঝাপটা এর উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কপালের দুই দিকে ক'টি রেখা পড়িয়াছে ডান গালটাও উঁচু নীচু সঙ্কুচিত।

লোকটার পোষাক আরও অদ্ভুত। গায়ে একটা সামরিক বিভাগের কোট কতদিনের পুরাণো ঠিক নাই। হাফ পেণ্টের নীচে বিবর্ণ পট্টি এবং পায়ে তালি দেওয়া মিলিটারি বুট। মিলিটারি বুটে কতদিনে তালি দিতে হয় তা অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন। সমস্ত দেহ ভরিয়া লোকটার একটা সংগ্রামের চিহ্ন। কি যেন একটা হইয়া গিয়াছে, এ তাহারই অবশিষ্ট।

লোকটা একটু হাসিল। তাহার সে হাসির বীভৎসতা অবর্ণনীয়। ঘনান্ধকার বনে নিশীথে একাকী পথিক যদি হঠাৎ অন্ধকারের বুকে দুই শ্রেণী দাঁত দেখিতে পায়—নিবিড় গাঢ় অন্ধ তমসা—তার বুকে নিরাবলম্ব দুই শ্রেণী তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা আর সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট অট্টহাসি, তার যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিহরিয়া উঠে আমারও তাই হইল। লোকটা টুলের উপর বসিয়া বলিল, আমি মানুষ, ভয় নেই। মুখের ভিতর হইতে বাতাস বাহির হইয়া যাওয়াতে কথাগুলি অনেকটা বিকৃত। সেই ধূমধূলিআচ্ছন্ন অস্পষ্ট অন্ধকারালোকে টোপলের সম্ভালপ্ত রং-এর দুর্গন্ধে অভিভূত হইয়া আমার কাণে কথাটা কেমন একরূপ তৃপ্তি ঢালিয়া দিল। "আমি মানুষ"! সেও মানুষ। তবে এই জন মানবহীন নিঃসঙ্গ প্রদেশে আমি একটি সাথী পাইয়াছি—আমি একলা নই।

ইচ্ছা হইল একটু আলাপ করি। কিন্তু মুখের দিকে চাহিতেই মন ঘৃণায় ভরিয়া উঠিল। ঐ চোয়াল গাল—ঐ মুখগহ্বর—ও আবার মানুষ। কিন্তু মানুষের চোখ অনেকটা অভ্যাসের দাস। যে লোকটাকে প্রথম খুব কুৎসিত বিশ্রী বলিয়া লাগে কিছুদিন দেখিতে দেখিতে আর তাহার রূপহীনতা বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা আপনার ও জায়গাটা—"আর বলতে হবে না। কিছু ভেবো না তুমি—আমি অসন্তুষ্ট হইনি ও একরকম অভ্যেস হয়ে গেছে, যে দেখে সেই জিজ্ঞেস করে কিন্তু সবাইকে বলতে পারি না। কিন্তু আজ বেশ সময়—না? বাইরে এই অন্ধকার টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে, কেউ কাছে নেই শুধু তুমি আর আমি—বেশ বেশ হবে—আমি বলব। তুমি শুনবে হা-হা-হা। আবার সেই হাসি—আমার অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল:

"বেশী দিনের কথা নয়, এই ১৯১৫ সন। দশ বৎসর বড় কমও নয় কিন্তু, মনে হয় এই সেদিন। ৩৫ বৎসর বয়সে বয়েস ভাঁড়িয়ে সৈন্যদলে যোগ দেই। শরীরে বেশ শক্তি ছিল, ইচ্ছা হ'ল দুনিয়াটাকে একবার এ ভাবে দেখি। জীবনটা কি কতকগুলি কাজ চিন্তা অথবা কতকগুলি অভিজ্ঞতার সমষ্টি—এ নিয়ে মাথা ঘামানো মিছে। কোথা হতে জীবন—কোথায় যাবে—কেন—এসব আলোচনা করা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়। কেবল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চলা, এর মধ্যে একটু সুখ আছে। তাই—দেশের সম্মান রক্ষা করবার জন্য নয়—কারণ সেদিকে চিন্তা করবার অবসর আমার হয় নি—শুধু জীবনটাকে আর একভাবে দেখবার জন্য তাকে আরো সজীব ভাবে পাবার জন্য যুদ্ধে যোগ দিলাম। বাস্তবিক কি একঘেয়ে এই জীবন—বিস্বাদ—বিচিত্রতাবিহীন। কেন—কেন এই কর্ত্তব্যের দাসত্ব—দায়িত্বের শৃঙ্খল? যুক্তির গুরুভার—শুধু চলা যায় না? কিছু ভাবনা নেই? চিন্তা নেই? কারণ কিছু লাভ নেই ওতে—যা হোক।

"প্রথমটা বেশ উৎসাহে কেটে গেল। কষ্টও বড় কম ছিল না, তিন বেলা 'প্যারেড'—তবু লাগত বেশ। এ আমি দেখেছি নতুন জিনিষের মধ্যেই একটা আনন্দ—হোকনা তা ক্ষণস্থায়ী—মিথ্যা, এখানে কোন্ জিনিষটা না ক্ষণস্থায়ী কোন্‌টা না মিথ্যা?"

আমি লোকটার অদ্ভুত মতামত শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। বাহিরে বৃষ্টির সাথে বাতসটাও একটু বাড়িয়া উঠিতেছিল, এমন কি মাঝে সোঁ সোঁ শব্দও

শোনা যাইতেছিল। লোকটা আমার দিকে চাহিয়া আবার একটু হাসিয়া বলিতে লাগিল—

"ওতে ভাববার কিছু নেই। ভাব্‌ছ আমি যা বল্‌ছি তা সব মিথ্যা—হবে হয় ত—আমি অস্বীকার করি না। যা হোক,একমাস ট্রেনিং—এর পর যখন ফিল্‌ডে যাবার জন্য তাঁবু তোলা হ'ল তখন সুবাদারের তাঁবু হতে এক ডজন মদের খালি বোতল বাহির হ'ল দেখে সকলে আশ্চর্য্য হ'লেও আমি হই নি। কেন তা' বল্‌ছি।

সৈন্যদের মধ্যে কয়েকজনের রাত্রিতে পাহারা দিতে হয়,কারণ সৈন্যদের বন্দুক রসদ প্রভৃতি এক জায়গায় থাকে। তাঁবুর চারিদিকে কয়েক শত গজের মধ্যে কেউ আসলে তাকে চার্জ্জ কর্‌তে হয় এবং সন্তোষজনক উত্তর না পেলে গুলি চালাবার নিয়ম।" গুলি চালাবার নাম শুনিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। সেই অপরিচিত সৈনিক আমার এ ভাব লক্ষ্য করিয়া আবার একবার হাসিয়া উঠিল এবং বলিতে লাগিল—

"ভয় পাবার কি আছে। সৈন্য-বিভাগ মানুষ মারবারই জন্য—এ তার হাতে খড়ি--এতে ভয় পেলে চল্‌বে না। যুদ্ধের জন্য মানুষ মারা বীরত্ব—জাতি-প্রেম স্বদেশভক্তি! আমি আমার দেশকে ভালবাসি অতএব চাই অন্যদেশ আমার দেশের কাছে মাথা নুইয়ে থাক্—আর একজনও তাই ইচ্ছে করে—আচ্ছা বেশ—এসো পরীক্ষা করে দেখি কে কার দেশকে বেশী ভালবাসে। কামান বন্দুক গোলাগুলির মধ্য দিয়ে একদেশ অতিরিক্ত রক্তপাতে দুর্ব্বল হয়ে পড়ে—সব শেষ হয়, এক পক্ষ জয়লাভ করে—ঘোষণা করে আমরা ন্যায়ের পক্ষে লড়েছি, ভগবান চিরকাল সত্যকে, ন্যায়কে রক্ষা করেন—সন্ধি হয়—অপর পক্ষ স্বীকৃত হয় টাকা দিতে, জন দিতে, যন্ত্র দিতে। তারপর কয়েক বৎসর চলে যায়। গোপনে গোপনে ভালবাসার বিষ ফেনিয়ে ওঠে, বিপক্ষ বলে এবার এসো দেখি! ন্যায়ের পক্ষ বলেন, এই যে পবিত্র সন্ধি। শক্তিমান বলে, এক টুক্‌রা কাগজ! প্রবল অগ্নিবর্ষণে প্রতিপক্ষ পুড়ে ছাই হয়ে যায়, এবারও ভগবান তেমনি ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করেন। এতো জানা কথা, আর এ ন্যায়ের অভিযান চিরকাল বাঁচিয়ে রাখবার জন্য রয়েছি আমরা, আমাদের মরণকে ভয় করলে চল্‌বে কেন?

"রাত্রি ছিল প্রায় ২টা, আমার সে রাত্রিতে 'ডিউটি'—'গ্রেট্‌কোট' গায় দিয়ে রাইফেল নিয়ে ঘুরছিলাম। ঘুম একটু একটু পাচ্ছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ।

কোথায়ও আলো নেই শুধু মাঠের বুকে তারার অস্ফুটালোক। লোকজন —কাহারো দেখা নেই। এক এক কোণে গিয়ে আর একজন সিপাহীকে দেখ্ছিলাম—তাঁবুর চারদিকে চারজন ডিউটি।

এমন সময় দূর হতে একখানা মোটর আস্‌ছিল আমাদের দিকে। একটু বিস্মিত হ'লাম এমন সময় মোটরে কে? যখন অনেকটা কাছে এল, দেখ্‌লাম আমাদের সুবাদার ও একটা মেয়ে। তার কাপড়চোপর ও চোখ-মুখের ভাবভঙ্গী তার পরিচয় জানাচ্ছিল। আরো যখন কাছে এল ভাব্‌লাম 'চার্জ্জ' করি। যদি আমার কর্ত্তব্য পালন না করি তবে এজন্য হয় ত আমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। এই সময়ে এই জাতির মেয়ের সঙ্গে সুবাদারকে দেখে আশ্চর্য্য ও বড় কম হই নি। সুবাদারের চরিত্র ভাল বলে খ্যাতি ছিল।

"কে আসে—দাঁড়াও"।

চালক বেটা আমার কথাই শুন্‌তে পেল না—"কে আস—দাঁড়াও" বলে রাইফেল তুললাম। হঠাৎ যেন সুবাদারের ঘুম ভাঙ্‌ল, বেজায় জোরে চীৎকার করে বলে উঠ্‌লেন—থামো শূয়ার। চালক বেচারী আমার উদ্যত রাইফেল দেখে ও সুবাদারের চীৎকার শুনে হঠাৎ মোটরখানা থামাল। একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে সুবাদার ও সাথের স্ত্রী লোকটা থমকে উঠল, সুবাদার তৎক্ষণাৎ মোটর হতে নেবে বল্‌লেন, 'সুবাদার!—যাও"

আমি রাইফেল কাঁধে রাখলাম তারপর সুবাদার রমণীটিকে নিয়ে তাঁর আফিস তাঁবুতে ঢুক্‌লেন। আমি তাঁর চলন দেখে বুঝ্‌তে পারছিলাম সুবাদার প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। প্রায় আধঘণ্টা পরে তাঁবু হতে বের হয়ে স্ত্রীলোকটাকে মোটরে তুলে দিয়ে বল্‌লেন "জোরসে হাকাও"। তারপর ধীরে ধীরে নিজের তাঁবুর দিকে চলে গেলেন।

তারপর দিন সন্ধ্যার সময় সুবাদারের তাঁবুতে আমার ডাক পড়ল। সেখানে গিয়ে দেখি বেশ এক মদের আড্ডা। আমাকে খুব প্রশংসা করে এক গ্লাস এগিয়ে দিলেন—আর যাতে শীগ্‌গীরই আমার উন্নতি হয় সেকথা সাহেবের কাছে বল্‌বেন বল্‌লেন। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল—আমি এর আগে কখনও মদ খাই নি। স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়েছি—কিন্তু আমার গত ৩২ বৎসর জীবনের মধ্যে চরিত্রের এমন একটা কিছু দৃঢ়তা গড়ে ওঠে নাই যাতে সে গ্লাসটা উপেক্ষা কর্‌তে পারি। তুমি ভাবছ লোকটা বলে কি? কিন্তু ভেবে দেখো—চরিত্রের যে একটা বিশিষ্ট বল তা কারো নেই। কেউ নিজে

নিজে অশেষ দুষ্কর্ম ক'রে' শুড্ বয়' বলে চলে গেল—কেউ স্ত্রীর অন্তরালে আত্মরক্ষা করে নিজকে চরিত্রবান বলে চালিয়ে দিল আর কেউবা আচার নিয়মের বর্ম্ম আবরণ পরে নিজকে সাধু বলে প্রকাশ করল কিন্তু সময় বিশেষে বিশেষ পথ দিয়ে যখন প্রলোভন এসে উপস্থিত হয় তখন তারা ভেসে যায়। আমি মদ খেলুম।

একরকম মাতাল হয়েই সেদিন তাঁবুতে ফিরে এলুম। মদের নেশা সেদিন আমার বেশ লাগল। যা হোক তারপর ক্রমে ক্রমে মদ জিনিষটা বেশ অভ্যাস হয়ে গেল। সুবাদারের সঙ্গে অনেক অস্থানে কুস্থানে ঘুরে আমি অন্য মানুষ হয়ে গেলুম। প্রতি রাত্রিতে সুবাদার আমাদের একদল নিয়ে বেরিয়ে যেতেন, আমরা দুপুর রাত্রিতে মাতাল হয়ে ফিরে আসতাম। তাঁবু কুৎসিত কথায় গরম হয়ে উঠত—কেউবা বমি করে ফেলত। বমির দুর্গন্ধে অভিভূত হয়ে আমরা কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকতাম। আজ এই যে হাতে কোটের উপর একটা দাগ দেখতে পাচ্ছ এ তারই অনুগ্রহে। তুমি ভাবছ এ অন্যায়। তোমার বয়েস অল্প, জীবনকে অল্প দিক থেকে দেখেছ। যদি তার বহুরূপ দেখতে তবে বুঝতে প্রত্যেক বড় পদের পেছনে এরূপ একটা রহস্য লুকিয়ে আছে—প্রত্যেক প্রভুত্বকে শত অন্যায় সৃষ্টি করেছে। আমি বলছি না যে ঠিক এরূপ অন্যায় কিন্তু অনেকটা। এক একটা সার্থকতার ইতিহাস খোঁজ, মূলে হয়ত একটা গুপ্ত হত্যা—মানুষই হোক, বিশ্বাসই হোক, অথবা আরো কিছু বীভৎস। হত্যা কিছু নয়—তাতে বীভৎসতা কই? তার চেয়ে অনেক খারাপ কাজ আছে যা অতি গোপনে অতি সুদক্ষ ভাবে সম্পন্ন হয়ে মানুষকে জগতের পথে ঠেলে দিচ্ছে।

তারপর একেবারে রণাঙ্গনে। যুদ্ধক্ষেত্রের সে আনন্দ সে স্ফূর্ত্তি আমি বলতে পারব না। 'ব্যাণ্ডের' তালে তালে পা ফেলতে ফেলতে বন জঙ্গল নদ নদী পেরিয়ে ছুটে চলা—যুদ্ধক্ষেত্রে সে অগণন গোলাগুলির মধ্যে অবিচলিত ভাবে অগ্রসর হওয়া সে এক বিরাট ব্যাপার। ডাইনে যে সে হয়ত পড়ে গেল বাঁয়ের জনও গেল—কিন্তু আমি চলেছি। একটা গোলা এসে সাঁ করে কয়েক জনাকে নিয়ে গেল তারপর ফেটে ভেঙ্গে চুড়মার হয়ে চারদিকে ছারখার করে দিয়ে গেল। তুমি বুঝবেনা সে সুখ সে আনন্দ। উঃ কি বিরাট কি প্রচণ্ড!"

বলিতে বলিতে লোকটার মুখ চোখ এক পৈশাচিক আনন্দে ভরিয়া উঠিল, সমস্ত মুখ চোখ আকুঞ্চনে পূর্ণ হইল। বাহিরে বাতাস বেশ জোরে বহিতেছিল

বৃষ্টিও কম নয়। বাইরের বাতিটা নেভে নেভে—আমার অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল।

"চারিদিকে আগুন—গর্জ্জন—ধোঁয়া এক বিষম ব্যাপার! হাতা হাতি যুদ্ধ বড় হয় না কিন্তু সে সুযোগও আমি পেয়েছি। সম্মুখে শত্রু। মাথার উপরে ক্ষীণালোকের মধ্যে হঠাৎ শত্রুর বেয়োনেট্ বসিয়ে দাও—একেবারে আমূল বসিয়ে দাও—ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠবে। সে রক্ত অন্ধকারে কেমন নীল দেখায়। হা—হা—হা—কী ভীষণ আনন্দ—কী স্ফূর্ত্তি—রক্ত—আগুন—মৃত্যু। বাঃ—সে রক্ত ধারায় ইচ্ছে করলে—মানুষের সে রক্ত ধারায় তুমি স্নান করে নিতে পার।

তারপর একদিনের কথা বলব আমার সে বেশ মনে আছে। রাত্রি প্রায় ৩ টার সময় বিউগ্‌ল্‌-এর শব্দে সকলে চম্‌কে উঠ্‌লাম, বাইরে এলাম—হুকুম হ'ল কামান চালাতে হ'বে সম্মুখে আর আমরা পদাতিক দুভাগ হয়ে দুইদিকে অগ্রসর হ'তে থাকব। মাথার উপরে আকাশে কিছু কিছু তারা এদিকে সেদিকে অসংবদ্ধ ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, কি জানি কোন তিথির—আধখানারও কম চাঁদ উঠেছে। চারিদিকে কামানের গর্জ্জন। আশে পাশের গ্রাম হ'তে অধিবাসীরা অনেক আগেই চলে গিয়েছিল। চারিদিকের গাছপালা ও মাটিতে গোলা গুলির চিহ্ন সুস্পষ্ট। নিঃসঙ্গ একাকা প্রকৃতি যেন ভয়ে শিউরে উঠেছে। প্রায় ৪ মাইল মার্চ্চ করবার পর আমরা গুলি চালাবার আদেশ পেলাম। প্রতিপক্ষ হ'তেও গুলি বর্ষণ হচ্ছিল। কয়েক ঘণ্টা পর শত্রুরা বিধ্বস্ত হয়ে চলে গেল—আমরা সগর্ব্বে মার্চ্চ কর্‌তে কর্‌তে চল্‌লাম। সে কী উল্লাস—আমাদের পায়ের তাড়নায় মা বসুন্ধরাও বুঝি কেঁপে উঠ্‌ছিল। খানিক দূর গিয়েই দেখ্‌তে পেলাম শত্রুরা তাড়াতাড়িতে অনেক জিনিষ পত্রও ফেলে গিয়েছে। এখানে সেখানে দু'চারটা মড়াও পড়ে ছিল। কারো বা মাথা নেই কারো বা বুকের পাঁজর একেবারে উড়ে গেছে। মাঝে মাঝে মশাল জ্বেলে দেবার হুকুম হ'ল।

সেই অস্পষ্ট মশাল আলোকে আমরা যুদ্ধ ক্ষেত্রের বীভৎসতা বেশ ভাল করে দেখ্‌তে পেলাম। আমি ঘুরতে লাগলাম। একটা লোকের কোমর হ'তে নীচ পর্য্যন্ত উড়ে গিয়েছিল। দেখ্‌লাম লোকটার হাতে একটা হীরের আংটি। আমি হাত খানা ধরে যেই আংটিটা খুল্‌তে যাব সে অমনি চোখ মেলে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বল্‌ল—'জল", অ্যাঁ—লোকটা এখনও মরে নি!"

তারপর কি হইবে ভাবিয়া আমি শঙ্কিত হইলাম। বাইরের বাতিটা একেবারে নিবিয়া গেল। মাঠ-ডোবা সব একাকার—নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার মাঝে মাঝে সাদা কুয়াসার বিশ্রী প্রলেপ, ঘরের বাতিটাও ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল। আমার মনে ভয় হইল আজ এ অন্ধকার রাত্রিতে—আমি অপরিচিত—কাহার সহিত আলাপ করিতেছি, মানুষ না ভূত। বৃষ্টির জলের ঝাপ্‌টা ঘরে আসিতেছিল।

"কি করি। আংটিটা দেখে আমার ভারী লোভ হচ্ছিল—অমন সুন্দর হীরের আংটি। লোকটা তো আর বেশীক্ষণ বাচবে না—আমি না নেই আর একজন নেবে, বেয়োনেটের দিকে একবার চাইলাম—চন্দ্রের ও মশালের অস্পষ্ট ফ্যাকাসে আলোতে তার মুখে মরণের পাণ্ডুরতা লেপে দিয়েছিল। বেয়োনেটটা জোর করে ধরে বসিয়ে দিলাম একেবারে তার চোখের ভিতর—একটু শব্দ, একটু চীৎকার—একটু চেষ্টা, তারপর সব চুপ।"

আমি ভয়ে অভিভূত হইয়াছিলাম। দম লইয়া বলিলাম, আঁা তুমি জ্যান্ত মানুষটাকে মেরে ফেললে—একটা সামান্য আংটির লোভে? একটা মানুষ জীবন্ত আস্ত মানুষ—যার একটি আঙুল দিতে পারে না কেউ!

"চুপ রও।" লোকটা বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে হাঁকিল। সে ক্ষুদ্র দোকান ঘর বাহিরের ঘনান্ধকার আমার অন্তরাত্মা এক সঙ্গে কাঁপিয়া উঠিল! ক্রোধে তাহার কপাল সঙ্কুচিত, নাসিকা বিস্ফারিত হইল।

"জোচ্চোর—একটা মানুষ মেরেছি—অমনি তুমি চেঁচিয়ে উঠ্‌লে। কই এর আগে যখন বল্‌ছিলাম এ হাতে হাজার মানুষ মেরেছি—তখন তো তুমি টু-শব্দটিও করোনি! না—সে যুদ্ধ। পৃথিবী ভ'রে পলে পলে এই যে অসংখ্য হত্যাকাণ্ড চলছে এর খোঁজ রাখ—কে মানুষ মারেনি—কেউ আঘাতে মেরেছে, কেউ ভাতে মেরেছে, কেউ মনে মেরেছে।

ওকে মেরেছি ওর উপকার করেছি। জান তুমি, যুদ্ধ অসমর্থের আদর করে না। সৈন্যদলে ভর্ত্তি হওয়ার আগেতে তোমাকে কত প্রলোভন দেখান হবে, তুমি লেখাপড়া শিখেছ—তুমি হয়ত বোঝ। কিন্তু আমি বুঝিনি, আমার সহস্র অশিক্ষিত ভাই বোঝেনি। যারা কলে কারখানায় খনিতে মাথার ঘাম পায় ফেলে শুধু ভগবানের দিকে চেয়েও ভাত জুটাতে পার্‌লে না—তারা শুনেছে—দেশের জন্য প্রাণ দিলে—তারা ভাত পাবে—কাপড় পাবে মাইনে পাবে। তার পর একবার ঢুক্‌লে তাদের উপর অসম্ভব অত্যাচার

চলেছে। তাদের দেহের উপর অত্যাচারের কথা বলছি না—মনে, যাতে তারা পশু হয় তার চেষ্টা চলেছে—মানুষকে নির্ব্বিচারে হুকুম মানতে শেখান হয়েছে—নরহত্যাকে ধর্ম্মের মুখোস পরিয়ে দেখান হয়েছে। আরো কত কি! তারপর যুদ্ধে আহত হ'লে যদি তোমার দ্বারা আবার আশা থাকে—তবে অনেক যত্ন তুমি পাবে। কোনরূপে তোমার অশক্ত দুর্ব্বল দেহকে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড় করান চাই—শত্রুপক্ষের একটি গুলি খরচ করাবার জন্য। কিন্তু তোমাদ্বারা কোন আশা আর না থাকলে—তোমাকে ফেলে দেবে—শেয়াল কুকুর মরলে যেমন ভাগাড়ে ফেলে দেয়—অথবা সেই হাসপাতালে নিয়ে যাবে। উঃ—কি বিকট সে সামরিক হাসপাতাল—একটা যন্ত্র—একটা বৃহৎ চুল্লী মানুষের শক্তি সামর্থ্য সব খেয়ে চুষে তাকে হজম করে ফেলে—অথবা অস্থিচর্ম্ম-সার করে পথে নাবিয়ে দেয়।

—যা'ক এখানেই প্রায় শেষ। তারপর আর একটা যুদ্ধে একটা বুলেট্ লেগে আমার নাকটা উড়ে যায়—আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। তারপর যখন জ্ঞান হল—তখন আমি হাসপাতালে—আমার হাতের সে আংটিটা দেখিনি।

তারপর—আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল—আমাদের সৈন্যদল ভেঙ্গে দিল—কারণ যুদ্ধের অভিনয় শেষ হয়েছিল। এখন আমি কি করে খাই? শুধু ভাত খেলে হ'লো। আমার মদের পয়সা দেয় কে—আমার ভোগের পয়সা জোটায় কে? আমি এমন কিছু জানি না যাতে দুপয়সা রোজগার করতে পারি। আমার এ চেহারা দেখে কেউ আমাকে চাকরি দেয় না। যুদ্ধ চলে গেছে—তার ক্ষিদে মিটেছে—কিন্তু আমি পড়ে আছি—আমার যে ক্ষিদে আমার সৈনিক জীবন জাগিয়ে দিয়েছে—তার খাবার কই?—আছে তোমার কাছে কিছু?"

এতক্ষণে ব্যাপারটা অনেকটা স্পষ্ট বলিয়া বোধ হইল। আমার পকেটে ৫৲ টাকার নোট আর কিছু ভাঙ্‌চি পয়সা—ভাবিলাম লোকটাকে পয়সা দিলে এখনই মদ খাইবে—তাই বলিলাম—দ্যাখ মদ খেতে তোমাকে আমি পয়সা দিতে পারবনা—যদি প্রতিজ্ঞা কর—মদ খাবে না—খারাপ কাজ করবে না তবে দেব—

তুমি কি পাদ্রি—সে অনেক শোনা আছে—দেবে কি না বল—আজ এ শীতের রাত্রিটা আমি কিছুতেই অমনি যেতে দেবনা।

লোকটার পুষ্ট হাত পা—উন্নত দেহ দেখিয়া আমার ভয় হইল—কি জানি হয়ত গুণ্ডা—আমি একটা সিকি তাহাকে দিলাম।

"আমি কি ভিক্ষুক", বলিয়া সে সিকিটা বাইরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। ঠিক এমন সময়ে ঘরের বাতিটা কমিতে কমিতে নীল হইয়া জ্বলিয়া পট্ করিয়া নিবিয়া গেল। বাইরে একটা ঝপ্ করিয়া শব্দ হইল—বোধ হয়, বৃষ্টিতে ভিজা কোন নিশাচর পক্ষীর ডানার শব্দ। এক ঝলক জলো হাওয়াও অন্ধকার ঘরে ঢুকিল। হঠাৎ লোকটা আমার উপরে লাফাইয়া পড়িল। আমি মাটিতে পড়িয়া তাহার দৃঢ় মজবুত হাতের স্পর্শ অনুভব করিলাম। তাহার নিশ্বাস আমার গালে লাগিল। সেই বিকৃত গালটা আমার গায়ে লাগিল। আমি ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিলাম। লোকটা ধীরে ধীরে আমার পকেটে হাত দিয়া মানি-ব্যাগটা লইয়া বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে ও ভিতরে তখন একই নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার।

"কোনো এক স্বপ্নে ঢাকা মায়াময় দেশে,
বিভাবরী জাগে প্রিয়া মোর তরে,
মোরে ভালবেসে।"

শ্রীঅজিতকুমার দত্ত

ওগো ভরা নদী,
অন্তর মথিয়া তব কি বেদনা বাজে নিরবধি!
কোন্ ব্যথা বক্ষে চাপি পরিপূর্ণ যৌবনের ভারে
কূলে কূলে কল্লোলিয়া নিশিদিন খুঁজে ফের কারে?
কোন্ অজানার দেশে তোমা লাগি জাগিছে জলধি?

হে পূর্ণাঙ্গী নদী !
বৈশাখের বায়ু যবে উড়াইয়া ধূসর অঞ্চল
তোমার তরঙ্গ রঙ্গ করেছিল উদ্দাম চঞ্চল,
সেদিন তোমার সেই বুকভরা দুরন্ত উচ্ছ্বাসে
বুঝিতে পারনি তুমি ; সেই দিন আকাশে বাতাসে
হেরিয়াছ আনন্দের অনন্ত নির্ঝর ; কিন্তু হায়
অনুভব করনি যে উদ্বেলিত যৌবন শোভায়
তোমার অন্তর দেহ উঠিতেছে পরিপূর্ণ হয়ে —
বৈশাখ এসেছে তব যৌবনের বার্তাখানি লয়ে

আজিকে বর্ষার শেষে যৌবনের সমস্ত সম্পদ
লভিয়াছ তুমি, তাই কৈশোরের দুরন্ত দুর্মদ
আনন্দের তীব্র-জ্বালা অকস্মাৎ গেছে আজ থেমে
যৌবনের চিরসঙ্গী অনুজ্জ্বল স্নিগ্ধ শান্ত প্রেমে।
অনুক্ষণ তাই আজ কূলে কূলে সুধাও সদাই
—কোথা প্রিয় ? প্রিয় কোথা পাই !

হে বন্ধু ! চাহিয়া দেখ আজি মোর অন্তরের পানে,
সে ও হায় তব প্রায় বিপুল সম্পদ বহি প্রাণে
হারায়েছে চঞ্চলতা তার ; আজি হৃদয়ে আমার
যে ব্যথা উচ্ছ্বসি উঠে বক্ষে তারে বহি অনিবার
চলেছি প্রিয়ার খোঁজে। যৌবনের অভিশাপ মোরে
বিধাতা দিয়াছে বর ; আমার দরিদ্র চিত্ত ভরে
ফুটিয়া উঠেছে আজি বসন্তের কুসুম সম্ভার,
হিয়া মোর গেছে ভুলে কৈশোরের উচ্ছ্বাস তাহার ;
যৌবনের সাথে শুধু বক্ষে জাগে তীব্র ব্যাকুলতা
প্রিয়া তরে ; নাহি জানি কে সে প্রিয়া ! পাব তারে কোথা !
শুধু জানি:কোনো এক স্বপ্নে ঢাকা মায়াময় দেশে
বিভাবরী জাগে প্রিয়া মোর তরে,—মোরে ভালবেসে ;
শুধু জানি উচ্ছ্বসিত যৌবন-মাধুর্য্য-পূর্ণ হিয়া
রাখিয়াছে সাজাইয়া মোর তরে ভালোবাসা দিয়া।

আজি তাই বাহি মোর যৌবনের স্বর্ণ-তরী খানি
যাত্রা করিয়াছি মোর প্রিয়তমা লাগি ; নাহি জানি
কোন্ দূর দুরান্তরে পাব তারে ; নাহি জানি কবে,
অন্তর উঠিবে ভরি মিলনের বিপুল বৈভবে।
জানি আমি. পাব তারে কোনো এক অজ্ঞাত সন্ধ্যায়
অন্ধকার নদীতটে সুনিবিড় বেণুবন ছায়।

সন্ধ্যাতারা সম তার বিরহ-করুণ আঁখি দুটি
উঠিবে আমার স্তব্ধ অন্ধকার চিত্তাকাশে ফুটি;—
স্বপ্ন সম আঁখি মেলি ভাষাহীন মৌন ইসারায়
বাহুপাশ বন্ধে তার আমন্ত্রিয়া আনিবে আমায়।
যৌবন গৌরব ভরা নদীতট ছায়ায় সে দিন,
মিলন চুম্বন মাঝে দুটি প্রাণ হয়ে যাবে লীন।

শিল্পের স্বরূপ

শ্রীইন্দুশোভা দেবী

ফুটতে চাওয়া কুঁড়ির ওই সলজ্জ হাসিটুকুই সুন্দর ; না ফোটা ফুলের ওই উচ্ছ্বসিত আনন্দটুকুই সুন্দর! যাঁরা কুঁড়ির কাছে ফুলের আশা করেন, তাঁরা বলবেন—কুঁড়িই সুন্দর; যাঁরা ফুলের মাঝে ফলের ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন তাঁরা বলবেন—ফুলই সুন্দর। কবি বলবেন, দুই-ই সুন্দর। তিনি ভবিষ্যতের লাভালাভ বিবেচনা করে মূল্য নিরূপণ করতে জানেন না। বর্ত্তমানের আনন্দটাকে তিনি বিনি-পয়সার খুসীর মালা দিয়ে বরণ করে নেন।

যা সত্যিকারের আপন নয় তাকেই আমরা শক্ত করে লোহার সিন্দুকে পুরে রাখি; তার জন্য আমাদের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই ; তাই সঞ্চয় যত বেড়ে ওঠে. দুশ্চিন্তাও ততই ভারী হয়ে ওঠে। এই-ই বন্ধন। কবি অকৃপণ হয়ে তার ঐশ্বর্য্য বিলিয়ে দেন, এযে তাঁর সৃষ্টি, তাঁর আপন, সত্যি-কারের আপন,

তাই এর জন্য তাঁর কোন দুশ্চিন্তা নেই ; সঞ্চয়ের বাঁধন তাঁর নেই। তাই তাঁরই ঐশ্বর্য্য নিয়ে তাঁর এমনি করে ছিনিমিনি খেলা। ভাঙ্গা-গড়া, আবার গড়া, এই তাঁর ভোগ—এই তাঁর লীলা।

বিজ্ঞান খোঁজে বহুর মধ্যে এককে, প্রাণের প্রাচুর্য্যের মধ্যে বিধির একত্বকে। শিল্প চায় অরূপকে অপরূপ রূপের মাঝে প্রকাশ করতে—জড়ত্বের একত্বকে প্রাণের বৈচিত্র্যে মহীয়ান্ করে তুলতে। বিজ্ঞানের কাম্য—জ্ঞান ; শিল্পের কাম্য—আনন্দ। বিজ্ঞান তাই ভাগ করে রেখা টানে, বিশ্লেষণ করে বহুর মাঝের এককে টেনে বের করে—তারই ছাপ মেরে বৈচিত্র্যকে একাকার করে দেয়। শিল্প প্রাণকে এই জড়ত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি দেয়—নানা নানা রূপে ও নানা নানা ছন্দে। শিল্পী সত্যকে দেখে—পরিপূর্ণ অখণ্ড-রূপে। প্রাণের অনুভূতি দিয়ে কবিতাকে প্রতিষ্ঠা করেন—ন্যায়শাস্ত্রের কার্য্য-কারণের অনুবন্ধনে নয়। শিল্প গতিশীল—স্ফূর্ত্তিই তার প্রাণ। বিজ্ঞান অব্যয়—সমতাই তার লক্ষ্য।

শিল্প বিশেষের মাঝে বিশ্বের ইঙ্গিত। শিল্প রূপ আবার রূপক-ও। যে রূপ রূপককে অস্বীকার করে—তা কেবল মাত্রই বিশেষ। তা প্রাণহীন জড় মাত্র, স্থান কালের বন্ধনে পঙ্গু স্থবির। মেলার দিনে এক পয়সার ভেঁপুর জন্যে "ভোলার" যে কান্না, তা শিল্পের উপাদান কারণ এযে বিশ্বের শিশু-হৃদয়ের চিরন্তন সত্য। ঐ যে সন্তান-জননী তুলসী-তলায় সন্ধ্যাদীপ জ্বেলে পুত্রের কল্যাণ কামনায় গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণতি জানাচ্ছে—ও যে বিশ্বজনীন স্নেহান্ধা মাতার কল্যাণী রূপ।

শিল্পীর সৃষ্টির মাঝে জীবনের সপ্তস্বরার ঝঙ্কার বাজে। সে সৃষ্টিকে আবেষ্টন করে গ্রহ তারার অনন্ত নর্ত্তন চলেছে। ষড় ঋতুর অফুরন্ত রসধারায় এই সৃষ্টির নিত্য অভিষেক হচ্ছে। কবির সৃষ্টি—তাই প্রকৃতির মাধুর্য্যে সম্পদ্‌বান্ প্রাণের স্পন্দনে জীবন্ত। জীবনের হাসি-কান্না, আলো-ছায়া, আশা-আকাঙ্খা, দ্বন্দ্ব দ্বেষ, দুঃখ-দৈন্য, স্নেহ-মমতা এই তো শিল্পের উপাদান। শিল্পীর চোখে কিছুই নগণ্য নয়, কিছুই হেয় নয়।

প্রাণের যত গোপন কান্না, যত অপূর্ণ আকাঙ্খা, যত রিক্ত সুষমা—জীবনের সমস্ত দৈন্য, সমস্ত বিফলতা—তাও কবির অনুভূতির মাঝে অমর হয়ে বেঁচে থাকে। শিল্পীর সৃষ্টি—প্রাণের পরিপূর্ণতাতেই ঐশ্বর্য্যশালী নয় ; রিক্ততার নিঃশেষতাতেও মহীয়ান্।

শিল্প মানব প্রাণের পরিপূর্ণ প্রকাশ—মানবাত্মার পরমতম আনন্দ—চরমতম সান্ত্বনা—যুগ যুগ বিশ্বমানবের আশা আনন্দ অশ্রুজল দিয়ে বিশ্বেশ্বরের যে মন্দির গড়ে উঠেছে—তার উদার প্রাঙ্গন তলে সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা।

সে মন্দির-দ্বারের মঙ্গল-আরতি অনাদি অতীত থেকে ভেসে এসে, অনন্ত ভবিষ্যতে মিশে গেছে। আর সে মন্দিরের সুউচ্চ চূড়া—প্রাণের জয়গান করে অসীমের পানে ইঙ্গিত কচ্ছে।

বাসর-রাত্রি

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আজি এ মাধবী রাত্রে যে প্রফুল্ল ফুল-শয্যা করেছি রচনা,
অন্তরালে সঞ্চিত রয়েছে কত ক্ষুধার্ত্তের বঞ্চিত কামনা—
শীতার্ত্ত বিবস্ত্র কত পীড়িতের করুণ তিয়াষ,
মুমূর্ষু মূর্চ্ছিত কত হতাশের শেষ অভিলাষ!
গৃহহীন পথিকের তন্দ্রাহীন নিষ্ঠুর রোদন
সিক্ত করে' দেয় মোর ব্যাকুল-বকুল গন্ধ বাসক-শয়ন;
সদ্যোজাত যত শিশু মরেছিল হিম মৃত্তিকায়,
আমার গলার মালা জ্বলে' গেল তাহাদের বুকের জ্বালায়
পর্ণপুট-স্ফুটন-ব্যথায়!

যে অমূল্য বস্ত্রখানি করিয়াছি পরিধান আজ,
তার মাঝে হেরি আমি বহুশত বিবসনা রমণীর লাজ,
কুরূপ কঙ্কালসার পুরুষের কুশ্রী কাতরতা,
লালসা-লাঞ্ছিত কত বিধবার বিষন্ন ব্যর্থতা;
কত গর্ভ-ধারিণীর বীভৎস কাকুতি,
কুঙ্কুম কুসুম-কম কুমারীর কদর্য্য বিচ্যুতি;
কত শত সতীত্বের নির্ম্মম নির্লজ্জ বলিদান,
কত মা'র কামের নিশান!

যত দুঃখী ভিখারিণী চোর ফেলি সেজেছে পতিতা,
সর্ব্বঅঙ্গে জ্বালিয়াছে নব নব পিপাসুর চুম্বনের চিতা ;
নিজেরে উলঙ্গ করি যত নারী গ্রীবাতটে বেঁধেছিল ফাঁসি,
তাহাদের প্রেত-অট্টহাসি
এ-বস্ত্রের প্রতি সূত্রে উঠিছে উচ্ছ্বাসি' !
বীভৎস পাপের আর পিপাসার গন্ধ—এ বসন,
প্রতি সূত্রে শোনা যায় কত দূর দরান্তের অশান্ত ক্রন্দন।

আমার মুখের কাছে তুলিয়াছি পরিপূর্ণ যে অন্নের গ্রাস,
তার মাঝে শুনি যেন কত শত ক্ষুধার্ত্তের দীন দীর্ঘশ্বাস।
শীর্ণ দুটি হাত মেলি তারা সবে উৎসুক উৎসাহে
মোর কাছে এক মুষ্টি ভাত ভিক্ষা চাহে ;
যত শিশু জননীর শুষ্ক জীর্ণ নিঃশেষিত স্তনে
বিন্দু দুগ্ধ পেল না'ক তৃষ্ণাতীক্ষ্ণ দংশনে দংশনে ;
দুর্ভিক্ষে জননী যত পুত্রের মুখের গ্রাস নির্ব্বিবাদে কাড়ি,
তাতেও না পেয়ে তৃপ্তি নিজের গর্ভের পুত্রে সদন্তে বিদারি'
ক্ষুন্নিবৃত্তি করে আপনার,
ভেসে আসে সেই সব শেফালি-শোভন শুভ্র শিশুর চীৎকার

জঠরজ্বালায় অন্ধ যত নারী করিয়াছে শরীর বিক্রয়,
ক্ষুধার অসহ্য মূল্যে করিয়াছে সতীত্বের সুধা-বিনিময়,
সাজিয়াছে ঘৃণ্য বারাঙ্গনা,
বুকে জ্ব'লি সন্তানের সন্তপ্ত কামনা ;

বন্ধ্যা গিরি-মৃত্তিকায় আপনার স্বেদবিন্দু করিয়া সেচন,
নির্ভীক কৃষাণ যত সুশ্যামল প্রাচুর্য্যেরে করি উদ্ঘাটন
উপবাসী রহে আপনারা,
সবুজের চারিধারে প্রসারিয়া প্রজ্বলিত ক্ষুধার সাহারা ;
তাহাদের বিদীর্ণ বিলাপ
হানে অভিশাপ !
অন্ন আর রোচে না'ক, প'ড়ে থাকে একান্ত বিস্বাদ,
যেন শুধু মনে হয় করিয়াছি ঘোর অপরাধ।

আমার শকট চলে রাজপথে মহোল্লাসে মাতি,
মনে হয় যেন কারা চক্রতলে বুক দেছে পাতি—
কোটি কোটি পদাহত ধূলায় বিলীন ;
তাদের সকল অশ্রু শুষ্ক স্তব্ধ উদাসীন প্রস্তর কঠিন !
কলুষিত নগরীর ভূষা-কৃত্রিমতা
লুকাইয়া রাখিয়াছে অগণন জীবনের ভীষণ ব্যর্থতা ;
এর যান, পথ, সেতু, অট্টালিকা, খনির খনন,
লুকায়েছে সংখ্যাহীন মানবের প্রাণ-বিসর্জ্জন ;
প্রাচীরের প্রতিটি প্রস্তর
যেন কার বুকের পঞ্জর !

ওগো প্রিয়া, উদাসিয়া, তোমারে যে করেছি চুম্বন,
প্রচুর প্রবল সুখে তব ওই দেহলতাখানি
ক্ষুধাক্লিষ্ট তপ্ত বুকে টানি'
করি যে নিবিড় নিপীড়ন,
জান তুমি, কত মূল্য তার ?
কোটি ব্যর্থ প্রেমিকের মূক হাহাকার !
যাহারা না পেয়ে প্রেম ব্যাভিচারী সেজেছে পিশাচ,
মণির বিহনে যারা কুড়াইল কামনার কাচ ;
নিদ্রাহীন রাত্রি জাগি' নেত্রে যারা নিরাশ্বাস ভরি'
শুভ্র এক জ্যোৎস্না রাতে চলে গেল আত্মহত্যা করি,
পঙ্কিল কদর্য্য রোগে পঙ্গু হল যারা,
অপ্রচুর প্রাণ নিয়ে যারা তৃপ্তিহারা ;
তাদের বুকের রক্ত—যারা ব্যর্থকাম,
ওগো প্রিয়া, আমাদের মিলনের দাম।

তাই শুধু মনে হয় সব মিথ্যা, যেন মোর কাছে নাই তুমি,
আমি একা, ব্যর্থ, পঙ্গু, সঙ্গীহীন, হতাশ্বাস, নিঃস্ব মরুভূমি ;
শুধু খেদ, হাহাকার, তাপ, অশ্রুজল,
মোদের বাসর রাত্রি মলিন, বিফল !

চোর

শ্রীদীনেশচন্দ্র লোধ

(এক)

আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের অযাচিত উপদেশে এবং কর্ত্তব্যানুরোধে আবদুল ঋণ করিয়া ছোট ভাই-এর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে। সেই ঋণের দায়ে তাহার স্থাবর অস্থাবর প্রায় সমস্ত সম্পত্তিই গিয়াছে, এখনও বাকী আছে মাত্র বাঁশ বেতের একটা ছোট ভাঙ্গা ঘর। তবুও মহাজনের সম্পূর্ণ দাবী শোধ হয় নাই।

ছোট ভাই অতিরিক্ত কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া স্থানান্তরে সস্ত্রীক ঘর বাঁধিয়াছে। আবদুল দৈনিক যে পাঁচ ছয় আনা মজুরী করিয়া পায়, তাহাতেই তাহার দিন কাটে। সে দিন সকাল বেলা কাজে বাহির হইবার আগে আবদুল খাইতে বসিল। তাহার স্ত্রী একটা মাটীর বাসনে কিছু বাসিভাত, গোটা দুই কাঁচা লঙ্কা ও এক ঘটী জল আনিয়া তাহার সম্মুখে দিল। আধসের খানেক জল ভাতে ঢালিয়া একটা লঙ্কা ভাঙ্গিতেই তের বৎসরের ছেলে মজিদ আসিয়া জানাইল, মহাজনের লোকজন আজ আবার আসিতেছে। তাহাদের শুভাগমন আজ নূতন না বলিয়া আবদুল কোন প্রকার ব্যগ্রতা দেখাইল না। কিন্তু তাহার মুখে ভাতের গ্রাস উঠিতেছিল না, যেন কি ভাবিতে ভাবিতে বাসনের গায়ে দুইটা ভাত আঙ্গুলে টিপিতে লাগিল। তাহার স্ত্রী মজিদকে ডাকিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিয়া দিল, মজিদ বাহির হইয়া গেল। আবদুল সকলই শুনিতে পাইল, উৎকণ্ঠায় তাহার দারিদ্র্যক্লিষ্ট মলিন মুখটা যেন আরও মলিন হইয়া উঠিল।

মজিদ তাহার 'লালু'কে লইয়া রসুলদের ঘরের পাশ দিয়া চুপি চুপি যাইতেছিল। মহাজনের একটা কর্ম্মচারী তাহাকে 'খপ' করিয়া ধরিয়া ফেলিল এবং সঙ্গীদের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল,"হতভাগার দুষ্ট বুদ্ধি দেখ, এতটুকু ছেলে এখন থেকেই এসব শিখ্‌ছে। আর একটু দেরী হলেই পাঁঠাটা নিয়ে পালাচ্ছিল আর কি।" তার পর মজিদের গলা ধাক্কা দিয়া বলিল "যা আবদুলকে ডেকে আন।" ডাকিতে হইল না, আবদুল ভাত ফেলিয়া বাহিরে আসিল। মহাজনের

দুইটা চাকর ঘরে ঢুকিয়া একটা ভাঙ্গা কোদাল, তিনটা মাটীর বাসন ও একটা ছেঁড়া চট্ বাহির করিল। অনেক খুঁজিয়াও নিলাম করিবার মত আর কিছু পাইল না। সরকারী পিয়ন বলিল, "এ সব নিয়ে কাজ নেই, পাঠাটা নিয়ে চলুন।"

মজিদ কিছুতেই তাহার 'লালু'কে নিতে দিবে না। লালুর গলার দড়ি ধরিতে গিয়া সে দুই তিন বার ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া আসিল। পিতার কাছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মিনতি জানাইল কিন্তু আব্দুল কি করিবে, তাহার যে ইহাতে হাত নাই মজিদ তাহা বুঝিল না। মায়ের কাছে গেল, কোন ফল হইল না। শেষে পিয়নের ও চাকরদের পায় পড়িয়া কত কাঁদিল। কিন্তু কই, কেহই ত তাহার মিনতি শুনিল না। টানিতে টানিতে লালুকে লইয়া চলিয়া গেল। মজিদ মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। বহুদূর হইতে লালুর ডাক শোনা গেল। আব্দুল কাহাকেও কিছু না বলিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। তাহার স্ত্রী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহিরের জিনিষগুলি ঘরে তুলিয়া লইল। মজিদ আইন আদালত ক্রোক কিছুই বুঝিল না, কেবল কাঁদিতে লাগিল।

(দুই)

পাড়ার অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মজিদও দত্ত-বাড়ীতে পূজা দেখিতে আসিয়াছে। রং-বেরংএর নূতন জামা-কাপড় পরিয়া পূজা-বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা খেলিয়া বেড়াইতেছে। পাশে দাঁড়াইয়া নগ্ন দেহে দরিদ্রের ছেলেরা তাহা দেখিতেছে। কাজ কর্ম্মে বাড়ীর সকলেই ব্যস্ত। একজন প্রৌঢ় আসিয়া মজিদের দলের সকলকে একটু জোর গলায় শুনাইয়া গেল, হিন্দুর পূজা-বাড়ীতে অন্যজাতের লোক মণ্ডপের এত কাছে দাঁড়াইতে পারে না। হিন্দু হইলেও নমঃশূদ্র, মালী, বাগ্দীদের ছেলে-মেয়েদেরও সরিয়া বহু দূরে গিয়া দাঁড়াইতে হইল। একটা ঝি আসিয়া গোবর ছিটা দিয়া জায়গাটা শুদ্ধ করিয়া দিল। মজিদ দল ছাড়িয়া বলির পাঠা যেখানে বাধা ছিল সেখানে গেল। আরও অনেকগুলি পাঠার সঙ্গে তাহার লালুকেও দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। তিন দিন আগেও ত সে জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া মহাজনের বাড়ীতে লালুকে ঘাস দিয়া আসিয়াছে। তাহার মনে সন্দেহ জাগিয়া উঠিল, হয় ত লালুকেও দেবীর কাছে বলি দিবার জন্য আনা হইয়াছে। লালুকে জড়াইয়া ধরিয়া মজিদ কত কথা জিজ্ঞাসা করিল, লালু মাথা নাড়িয়া, গলা তুলিয়া তাহার উত্তর দিল, যেন সে সকলই বুঝিতে পারিয়াছে। ছুটিয়া গিয়া সে একটা গাছের কাঁচা ডাল ভাঙ্গিয়া লালুকে আনিয়া

দিল, অন্য পাঁঠাগুলি ভাগের জন্য গলা বাড়াইতেই লালু সেগুলিকে বেশ ভাল করিয়া শিক্ষা দিল। তামাসা দেখিয়া মজিদের সমস্ত বুকটা যেন অব্যক্ত আনন্দে ভরিয়া উঠিল। দুইটা চাকর আসিয়া বাছিয়া বাছিয়া তিনটা পাঁঠা লইয়া গেল ও বলিয়া গেল, বড় পাঁঠা কয়টা নবমীর দিন নিবে। মজিদ কিছুই বুঝিতে পারিল না, কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস পাইল না। ঠিক করিল, অন্য কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবে, তাহার লালুকেও দেবীর কাছে বলি দেওয়া হইবে কিনা। সাড়া পড়িয়া গেল, বলির সময় হইয়াছে। লোকজনে মণ্ডপের সম্মুখের প্রাঙ্গনটা ভরিয়া গেল। ঢাক ঢোল বাজিতে লাগিল। স্নান করাইয়া পাঁঠার গলায় মালা পরাইয়া পুরোহিত তাহার কানের কাছে কি মন্ত্র পড়িয়া দিলেন, কেহ কেহ বলে, দেবী প্রসন্ন হইয়া বলি গ্রহণ করিলে নাকি পাঁঠারও মুক্তি হয়। পাঁঠাগুলি শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে মুক্তির অপেক্ষায় যূপ কাষ্ঠের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। একটা পাঁঠা গিলিত চর্ব্বনও আরম্ভ করিল। সে কি আর জানে যে, দেবীর তুষ্টির জন্য ও তাহার মুক্তির জন্য এই চর্ব্বিত ঘাস আর হজম হইবারও সময় পাইবে না।

বলি শেষ হইল,বাদ্যধ্বনি দ্বিগুণ চড়িয়া উঠিল,সকলেই উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল। মজিদ দূরে দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিল, তাহার মনটা যেন কেমন হইয়া গেল। জ্বরেরও সময় হইয়া আসিল। আজ কতদিন তাহার জ্বর। আকালের যে অবস্থা, তাহাতে মজিদের চিকিৎসার ব্যয় তাহার পক্ষে অসম্ভব। সকালে বিকালে তুলসী পাতা ও শেফালী ফুলের পাতার রস একটু নুন দিয়া মজিদকে খাওয়ায় আর নমাজের সময় খোদার কাছে তাহার প্রার্থনা জানায়। মজিদ সকাল বেলা বেশ ভাল থাকে, বিকালেই তাহার জ্বর হয়। কাঁপিতে কাঁপিতে মজিদ একাই বাড়ী ফিরিল।

(তিন)

অষ্টমী রাত্রিতে দত্ত-বাড়ীতে 'দি এমেচার যাত্রা পার্টীর' হরিশ্চন্দ্র অভিনয় হইতেছে। রাত্রি তখন একটা কি দেড়টা। বলিষ্ঠ এক যুবক গোঁফ কামাইয়া পাউডার মাখিয়া শৈব্যা সাজিয়াছে। মৃত রোহিতাশ্বকে কোলে লইয়া শৈব্যা বসিয়া আছে, হরিশ্চন্দ্র চণ্ডাল বেশে লাঠি হাতে দাঁড়াইয়া আছে। দলের 'ছোকরা'গুলি 'জুরি' গান আরম্ভ করিয়াছে। হরিশ্চন্দ্রও তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছে। গান থামিতেই হরিশ্চন্দ্র পার্ট আরম্ভ করিল। ইত্যবসরে শৈব্যা

মাথা নোয়াইয়া তামাকে একটা জোর টান দিয়া লইল। কৃত্রিম কান্না জুড়িয়া শৈব্যা পার্ট আরম্ভ করিল,তামাকের ধোঁয়া তখনও নাক দিয়া বাহির হইতেছিল। শ্রোতাদের অনেকেরই 'চক্ষের জলে বক্ষ' ভাসিয়া গেল। হঠাৎ সভার এক কোণ হইতে হুড় হুড় করিয়া কতগুলি লোক উঠিয়া গেল। 'চোর চোর' শুনিয়া অনেকেই উঠিয়া গেল। জমান আসরটা ঠাণ্ডা হইয়া গেল। যাত্রা কিছুক্ষণের জন্য থামিয়া গেল, সাজ সজ্জা পরিয়াই দলের অনেক লোক উঠিয়া গেল। কতক্ষণ কেবল প্রহারের শব্দই শোনা গেল। শেষে একটা রোদন-ধ্বনি ও অস্পষ্ট শব্দ শোনা যাইতেছিল। বাড়ীর বড়বাবু ঘটনাস্থলে গিয়া গোলমাল থামাইয়া দিলেন। প্রহারের চোটে চোর প্রায় সংজ্ঞা হারাইয়াছে। বড়বাবু হাত ধরিয়া তুলিতেই অনেকেই চিনিতে পারিল যে, এ মুসলমান পাড়ার আব্দুলের ছেলে। তাহার গায় তখনও বেশ জ্বর আছে, শরীরের দুই একটা জায়গায় একটু রক্তের দাগও আছে। আব্দুলকে ডাকিয়া আনা হইল। আব্দুল বলিল, মজিদ যে পাঠা চুরি করিতে আসিয়াছে সে তাহা জানে না; তবে জ্বরে পড়িয়াও অনেক দিন 'লালুকে' কিনিয়া লইতে আব্দুলকে বলিয়াছে। বড়বাবু ব্যাপার বুঝিলেন। আব্দুল মৃতপ্রায় ছেলেকে কাঁধে করিয়া অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিল, বড়বাবুও কি ভাবিতে ভাবিতে উপরে চলিয়া গেলেন। যাত্রা আবার আরম্ভ হইল।

পরদিন আবার বলির সময় হইল। বড়বাবু অন্দর হইতে আসিয়া পুরোহিতকে ডাকিয়া বলিলেন, আজ থেকে আমার বাড়ীতে পূজায় আর কোন দিন বলি হইবে না। উপস্থিত সকলেই একে অপরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। পুরোহিত বলিলেন, "পূর্ব্বপুরুষের বাধা নিয়ম কি এক দিনে তুলে দেওয়া চলে?" বড়বাবু একটু রাগিয়া বলিলেন, "চলে না চলে আমি দেখ্‌ব, আমার বাড়ীতে পূজা,বলি হওয়া না-হওয়া আমার ইচ্ছা।" পুরোহিত প্রমাদ গণিলেন। কত তর্ক যুক্তি শাস্ত্র বেদ দেখাইলেন, বড়বাবুর তবুও এক কথা। বলি বন্ধ করার ফলে কত সোনার সংসার ছাই হইয়াছে, কত বংশ নির্ব্বংশ হইয়াছে তাহার ফর্দ্দ শুনিয়াও বড়বাবু দমিলেন না। তখন পুরোহিত বলিলেন, "এবারের পাঁঠা উৎসর্গ হয়েছে, এবার হউক, আর দুদিন হয়েছে একদিন বাদ দেওয়া ভাল হবে না। বন্ধ করতে হয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণের পরামর্শ নিয়ে আস্‌ছে বছর থেকে বলি বন্ধ করবেন। বড়বাবুর কথাই শেষকালে বজায় রহিল। বলিতে যাহাদের আনন্দ তাহারা বলিল, "দত্ত-বাড়ীর পূজার আমোদটা একবারে নষ্ট হলো। আর নিয়মভঙ্গে যাহাদের ভয় তাহারা দত্ত-পরিবারের আশু বিপদের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া বাড়ী ফিরিল।

(চার)

মজিদ মরণ-পথে দাঁড়াইয়াও যখন তাহার মায়ের মুখে শুনিল, লালুকে বলি দেওয়া হয় নাই, তখন তাহার কত আনন্দ। তাহার মাকে বলিল, শীঘ্রই যেন টাকা জমাইয়া লালুকে কিনিয়া আনে। এই কয়েক দিন যাবত লালুর কত অযত্ন হইতেছে তাহা ভাবিয়া মজিদ বড় বিমর্ষ হইয়া পড়িল। মা তাহাকে জানাইল, সে দেড়টাকা জমাইয়াছে আর বাকী দুইটাকা হইলেই লালুকে আনিবে।

আব্দুলের সাময়িক শুভাকাঙ্খীরা যখন শুনিল মজিদের অবস্থা শোচনীয়— তখন সকলে আসিয়াই আব্দুলকে বড়বাবুর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিতে উপদেশ দিল। না হয় না জানিয়া অন্যায়ই করিয়াছে, তাহার জন্য এতটুকু ছেলেকে এই ভাবে হাতে ধরে মারা কি দত্তদের ভাল হইয়াছে? আব্দুল তদুত্তরে চক্ষু মুছিয়া বলিয়াছে, "ঘরে ভাত নেই, মোকদ্দমা করব কি করে, আর তাতেই বা কি হবে, যা হবার হয়েছে, তোমরা দশ জনে আশীর্ব্বাদ কর, মজিদ এবার সেরে উঠুক।"

"মজিদের জীবনের আশা খুব কম," "দত্তরা এবার বলিবন্ধ করার ফল হাতে হাতে পাবে" ইত্যাদি নানাপ্রকার কথা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। কথাটা বড়বাবুর কানে আসিল। তিনি একবার নিজে যাইয়া মজিদকে দেখিয়া আসিবেন স্থির করিলেন।

সন্ধ্যার একটু আগে বড়বাবু একজন ডাক্তার লইয়া আব্দুলের বাড়ীর দিকে চলিলেন। সঙ্গে একটা চাকর, লালুকেও লইয়া চলিয়াছে।

'ছোটলোকের' পাড়ায় বড়বাবুকে যাইতে দেখিয়া স্ত্রী-পুরুষ সকলেই অবাক হইল। কেহ কেহ বলিল, "আইনের ভয় সকলেরই আছে, আব্দুল ভাল লোক বলে এতদিন চুপ করে আছে, এত অত্যাচার খোদা সইবে না।

হঠাৎ মর্ম্ম-ভেদী একটা ক্রন্দনের রোল শুনিয়া চলিতে চলিতে বড়বাবু থমকিয়া দাঁড়াইলেন, কান পাতিয়া একটু শুনিয়াই দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন।

তাঁহারা যখন আব্দুলের বাড়ীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে। মজিদের পবিত্র দেহ তখন বাহিরে আনা হইয়াছে। তাহার অতি আদরের লালুও আসিল, চিকিৎসার জন্য ডাক্তারও আসিলেন — কিন্তু বড় অসময়ে।

অন্ধ কবি

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

অন্ধ মোরে করেছে আলোক।
যে-সূর্য্য দিয়েছে তোমা দিবস তোমার,
স্বপ্নাধিক সুগভীর রাত্রি মোর দিয়েছে আমায়।

তবু আমি পথের পথিক,
তুমি র'বে বসে' যেথা জন্ম তোমা দিয়েছে জীবন
যতক্ষণ মৃত্যু নাহি আসে তোমা নবজন্ম দিতে।

তবু আমি খুঁজি' লব পথ,
সঙ্গে মোর যষ্টি আর বীণা
তুমি যবে ব'সে ব'সে মন্ত্রজপ করিবে তোমার।

তবু আমি বাহি'রব অন্ধকারে
তুমি যবে আলোকেরো ত্রাসে সঙ্কুচিত।
আর আমি গাহিব সঙ্গীত।

হারাতে পারি নে আমি পথ।
সবিতাও রহে নাকো বসে'
আমাদের যাত্রাপথ বিধাতা করেন নিরীক্ষণ,
তাই মোরা রহি নিরাপদ।

যদিও চরণ মম ক্ষণে-ক্ষণে দাঁড়াবে থমকি'
বায়ুভরে পক্ষ মেলি' গান মোর চলিবে বহিয়া।

সুগভীর সুমহান-পানে
চাহিতে চাহিতে অন্ধ হ'য়ে গেছি আমি।
গভীর মহান-পানে ক্ষণিকের দৃষ্টিপাত তরে
কেবা তার চক্ষুটি দিবে নাকো দান?

দুটি ক্ষুদ্র কম্পমান দীপ কেবা ফুৎকারেতে দিবে না নিবায়ে
হেরিবারে লেশমাত্র আভাস ঊষার?

তুমি বলো, "আহা, ও যে দেখিতে পারে না তারাবাজি
দেখিতে পারে না ক্ষেত্র, দেখিতে পারে না শেফালিকা।"
আমি বলি, "আহা, ওরা যেতে নাহি পারে তারালোকে
শুনিতে পারে না ওরা শেফালির বাণী।
ওদের নাহিকো, আহা, কর্ণ মধ্যে অন্য কোনো কান।
আহা—আহা—উহাদের নাহি ওষ্ঠাধর
প্রতি অঙ্গুলির বৃন্ত 'পর।" *

শরৎচন্দ্র

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(যৌবনে)

আমাদের 'সাহিত্য সভার' এই যুগটির কথা বাংলা-সাহিত্যের কাছে হয় ত ক্রমেই আদরের হইয়া উঠিবে। কারণ, এই যুগে শরৎচন্দ্র যে কয়খানি বই লিখিয়াছিলেন—তাহা বাংলা পাঠকের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে বলিয়াই ত' মনে হয়।

'কাক বাসা'র অস্তিত্ব আর নাই বোধ করি। 'অভিমান' হয় ত কাহারো কাছে এখনো আছে। 'পাষাণ' আমার কাছে ছিল বটে; কিন্তু কবে তাহা সরিয়া পড়িল—কিছু ঠিক করিতে পারিলাম না।

তাহার পর লেখা হয় 'বাগান' তিন খণ্ড। প্রথম খণ্ডে ছিল, কয়েকটি গল্প, 'বোঝা' 'কাশীনাথ' 'অনুপমার প্রেম'। দ্বিতীয় খণ্ডে ছিল, 'কোরেল' 'বড়দিদি' ও 'চন্দ্রনাথ'। এবং তৃতীয় খণ্ডটি 'দেবদাস'। 'শুভদা' বলিয়া আর একখানি—অসমাপ্ত বই ও এই সময়ে লেখা হয়। এ গুলি, ইংরেজি ১৮৯৪ হইতে ১৯০১ সালের মধ্যে লেখা।

* আরব-কবি Kahlil Gileranএর ইংরেজী কবিতা "The Blind Poet"-এর অনুবাদ।

সর্ব্ব প্রথমে যে কথা বলিয়াছি এখন আবার সেই কথা কয়টির পুনরায় উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি। শরৎচন্দ্রের গ্রন্থের সমালোচনা লেখা—আমার উদ্দেশ্য নয়। বোধ করি তাহা আমার সাধ্যের বাহিরের বস্তু।

শরতের জীবনের বৈচিত্র্যময় ধারার যেটুকু অংশ আমার গোচর, সেইটুকু লইয়াই আমি নাড়া চাড়া করিতেছি। ব্যক্তিগত মতামতের মূল্য যৎসামান্য—হয় ত, ভ্রান্ত। তাহা লইয়াও পাঠকের বিশেষ মাথা ব্যথা না হওয়া উচিত।

কোন এক সাহিত্য-সভায় শরৎচন্দ্র নাকি বলিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার নামের ফের-বদল করিয়া তাঁহার উপন্যাস লেখার হাতে খড়ি হয়। আবার এক জায়গায় বলিয়াছেন যে, বঙ্কিমের চরিত্রগঠন লইয়া তাঁহার মনে তর্ক উঠে; তিনি বারবার প্রশ্ন করিতে থাকেন—এই কি সত্য? ইহাই কি মানব-জীবনে বাস্তবিক ঘটে?

এই প্রশ্ন এবং বিস্ময়—(গতানুগতিকের সহজ পথ হইতে সরিয়া দাঁড়ান; অন্যের তৃপ্তিকে—অন্তরে অতৃপ্ত থাকিয়াও—অপ্রবুদ্ধ ভাবে স্বীকার করিবার সুপ্রচলিত পদ্ধতির বিরুদ্ধাচরণ; এবং অভ্যাস, ভয় এবং চক্ষুলজ্জায় নিজের ব্যক্তিত্বকে হারাইয়া ফেলায় তীব্র বেদনা) শরৎচন্দ্রের যৌবনের দিনগুলাকে সতত সংক্ষুব্ধ করিয়া রাখিত! তুফানে স্রোতের বিরুদ্ধ-মুখে হাল ধরিয়া বসিতে মাঝির অকুত সাহস ও অসামান্য শক্তির প্রয়োজন হয়। শরৎচন্দ্র এই শক্তি এবং সাহস এই সময়েই আহরণ করিতেছিলেন বলিয়া মনে হয়।

বাংলার কথা-সাহিত্যের নবযুগ প্রবর্ত্তন বোধ করি রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'ই সূচনা করে। এই বইখানি 'কাঁচার'-দলকে খুসি করিয়াছিল। কিন্তু প্রবীনের দল তারস্বরে ছি-ছি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রণদুন্দুভির নিনাদ অন্তরীক্ষ-মণ্ডলকে এমন প্রকম্পিত করিয়াছিল যে, একদিন ভয় হইয়াছিল যে, 'চোখের বালি'র তাদের কেল্লা বুঝি বা ভূমিসাৎ হয়! কিন্তু চোখের-বালির ভিত্তি সুদৃঢ়;—এখন বুঝিয়াছি যে, সাহিত্য হইতে তাহাকে অপসৃত করা ঢাক ঢোলের কর্ম্ম নয়।

শরতের 'বড়দিদি' অনেক পরে প্রকাশিত হইলেও 'চোখের বালি'র সমসাময়িক। ইহা 'চোখের-বালি'র দোসর রূপে গণ্য হইতে পারে। 'দেবদাস'ও 'বড়দিদি'র এক বৎসরের মধ্যে লেখা। অতএব কথা-সাহিত্যের নবযুগের প্রবর্ত্তকের মধ্যে শরৎচন্দ্র অন্যতর এমন কথা বলিলে হয় ত একটা সমূহ ভুল করা হইবে না।

এই নবযুগের বিষয় আরো একটু বিশদ-ভাবে আলোচনা করিলে হয় ত যে কথা বলিতে চাহিতেছি তাহা স্পষ্ট হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকে নবযুগের যে কিছুমাত্র আভাস-ইঙ্গিত নাই এ কথা বলিলে তাঁহার উপর অবিচার করা হয়। বঙ্কিমের কুন্দনন্দিনী, শৈবলিনী এবং ভ্রমর প্রভৃতি চরিত্র ইহার সাক্ষ্য। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ইহাদের প্রতি পাঠকের সহানুভূতি ধাবিত হইবার পথ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করেন নাই। তিনি আবাহমান কালের সামাজিক নীতির প্রতি সন্দেহ করিবার ক্ষণিক অবসর মাত্র দিয়াই— তাহার সমাধানও করিয়াছেন অচিরে! পাঠকের স্বাধীন চিন্তার উপর বিষয়টিকে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই।

সামাজিক আচার-ব্যবহারের নবযুগ বোধ করি রাজা রামমোহন রায় প্রবর্ত্তন করেন। তাহার পর আসিলেন ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার বিধবা-বিবাহের সমস্যা লইয়া। চিন্তা এবং আচারের নব-ধারায়—যতদূর মনে হয়—বঙ্কিম তেমন করিয়া যোগ দিলেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন তখন সাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট! বিধবা-বিবাহের পথে, এই অসীম বলশালী প্রদীপ্ত-প্রতিভা সাহিত্যিক বিরোধী হইয়া দাঁড়াইতেই—বিদ্যাসাগরের সমস্ত চেষ্টা যেন ব্যর্থ হইয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকে বিধবা-বিবাহ হিন্দুসমাজে অচল—এমন কথারই ভূয়ো ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

দেশের সাহিত্য যাহা অগ্রাহ্য করিবে—দেশবাসীর কাছে তাহা অচল। জন-হিত-সাধনায় এই কারণেই বোধ হয়, বিদ্যাসাগরের তীব্র চেষ্টা তাঁহার আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ ফল প্রসব করে নাই।

বিধবা-বিবাহের কথা দৃষ্টান্ত-স্বরূপই বলা হইল।

সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাগুলি সকল দেশেই রাজশক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। একদিন আমাদের দেশেও হয় ত রাজারই হাতে এই শক্তি ন্যস্ত ছিল; কিন্তু অবস্থা বৈগুণ্যে এখন আমাদের রাজা বিদেশবাসী এবং সম-ধর্ম্মী নহেন; তাই এ-দেশে প্রচলিত ধর্ম্মবাদগুলির বিষয়ে কিম্বা সমাজ-সংস্কারে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না।

এ-দিকে সমাজকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে তাহার বিধিমত সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু কে তাহা করিবে? বর্ত্তমানে সেই কাজ কতক পরিমাণে সাহিত্যই করিতেছে।

রুশ দেশেও একদিন টলষ্টয় নিজের লেখনার দ্বারা এই কাজ করিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছিলেন।

সাহিত্যের ভিতর দিয়া আদর্শ গড়িয়া উঠিতে থাকে। মানুষের জীবন সচল—তাই তাহার আদর্শও সচল—বৰ্দ্ধমান। অচল হইলে যে কি হয়, তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ 'অচলায়তনে' দিয়াছেন।

বোধ করি সাহিত্যে নূতন আদর্শের প্রবর্ত্তন—জাতির সজীবতার পরিচায়ক। ভাল কি মন্দ হইয়াছে—বর্ত্তমান তাহা বিচার করিতে পারে না; তাই সেই আলোচনা অনাবশ্যক। বিরোধ এবং মতভেদের সীমা নাই—তাই মুখ চাপিয়া যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ!

এইরূপ তর্ক উঠিলে আমাদের একজন আত্মীয় বড় মজার কথা বলিতেন। তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহার যুক্তি অকাট্য। তিনি বলিতেন, যা-কিছু হইতেছে সমস্তই মঙ্গলময়ের কল্যাণ বিধানে! এই মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল আসিবে কোন্ দিক দিয়া? জন্মও ভাল, মৃত্যুও ভাল—সুখও ভাল, দুঃখও ভাল, সত্যও ভাল, মিথ্যাও ভাল। আমাদের তাহা বিচারের প্রয়োজনই বা কি?

ইতিপূর্ব্বে পুরাতন রীতি-নীতিকে অভ্রান্ত জ্ঞানে—তাহারই ছাঁচে সাহিত্য নিজের সৃষ্টি করিত। তাহাতে অঙ্কিত চরিত্রগুলি একেবারে দেব, না হয় দানব চরিত্র হইয়া যাইত। মানবের সঙ্গে তাহার বড় একটা সম্পর্ক থাকিত না। নবযুগে কিন্তু মানুষ মানুষ-চরিত্র আঁকিবে বলিয়া কোমর বাঁধিল—এইখানেই বিরোধের সৃষ্টি।

কবি কহিলেন :—

"থাক স্বর্গ হাস্য মুখে, কর সুধা পান
দেবগণ! স্বর্গ তোমাদেরি সুখ-স্থান—
মোরা পরবাসী। মর্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি—তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজল-ধারা। * * *
* * স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্ত্ত্যে থাক সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা—অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গ খণ্ডগুলি!" * *

নবযুগের কবি সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত প্রেম লইয়া মানুষের জীবন নিত্য

যে খেলা খেলিতেছে তাহারই সন্ধানে তৎপর হইলেন। নীতি-শাস্ত্রের সুগোল খাপে ইঁহাদের চতুষ্কোণ অস্ত্র-শস্ত্র আর কিছুতেই প্রবেশের পথ পায় না!

এ দিকে স্বর্গের ইতিহাসের পুঁথি-পত্র বই-এর দোকানের 'তাকে' মুক্তির কামনায় কীটের সহকারিতা ভিক্ষা করিয়া পড়িয়া রহিল। মর্ত্ত্যধামে দেবতার অভাব হওয়াতে বইগুলির আর খরিদ্দার মিলিল না!

নবযুগের প্ররোচনায় সাহিত্য-ক্ষেত্রে "চরিত্রহীনের" নৃত্য সুরু হইয়া গেল! দেশের চরিত্রহীন যত ছুটিল নিজেদের জীবনের সত্য কাহিনী পাঠ করিবার আশায়। অল্পদিনের মধ্যে চরিত্রহীনের প্রথম সংস্করণ কাটিয়া গেল। প্রকাশক পোকায় কাটার দায় হইতে এবারের মত রক্ষা পাইলেন।

নবযুগের কবি নীতি শাস্ত্রের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে উপদেশের কঠিন কণ্টক-মালা গাঁথিয়া পাঠক-অভ্যাগতকে বরণ করিলেন না; তিনি তাহাকে প্রশ্ন করিলেন :—

"মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম?

এবং তাঁহার নিবেদনের মন্ত্রটিও হইল অপূর্ব্ব!

"দুঃখ সুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়াছি তোমায়
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষা সম।"

* * *

যা-কিছু আমার আছে আপনার শ্রেষ্ঠধন
দিতেছি চরণে আসি—
অকৃত কার্য্য, অকথিত বাণী, অগীত গান,
বিফল বাসনারাশি।"

ভাল-মানুষের দেশে এই সকল কি দুঃসাহসিকতা নয়? তবে রক্ষা এই যে, এই পৃথিবীটা নিছক ভাল-মানুষের দেশ নয়!

রবীন্দ্রনাথ নাকি বলিয়াছেন—শরৎচন্দ্রের কারবার ফাঁকির কারবার নয়।

এই কথা কয়টির মধ্যে শরতের জীবনের বহু সত্য নিহিত আছে। তাহার অভিজ্ঞতার মূলধনের কথা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। মূলধনের

পরিমাণ করাও সুকঠিন। হয় ত একদিন কোন যোগ্যতর ব্যক্তি তাহার তেরিজ কষিয়া বলিয়া দিতে পারিবেন।

মহাজন যে পথে গিয়াছেন শরৎ সে পথে যায় নাই। সত্যই, সে নিষ্ঠুর পীড়নে হৃদয় নিঙাড়িয়া জীবনের পাত্রটি পূর্ণ করিয়াছে—তাই আজ তাহার হাতে অকথিত বাণীর বীণাটি!

যৌবনের উদ্দাম আবেগে একদিন সে "বনে বনে কস্তুরি-মৃগ সম" ছুটিয়াছিল। সে দিন লোকে বোঝে নাই যে, জীবনের পাঠ এমনি করিয়াই গ্রহণ করিতে হয়! মানুষ দেখিয়া শেখে আর ঠেকিয়া শেখে। অবশ্য দেখিয়া শেখার সুখ অনেক;—কিন্তু তার ফাঁকিও অনেক। ঠেকিয়া শেখার গাঁথুনি একেবারে পাকা, রেক্কার!

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, অমন ত' বহু ব্যক্তিই ঠেকিয়া শিখিয়াছে, কিন্তু সবাই কিছু রেক্কার দৌলৎখানা গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। সে কথাও সত্য।

শরতের ভিতর সত্যের আকাঙ্ক্ষা যেমন তীব্র দেখিয়াছি, এমন অল্পই গোচর হয়। সত্যের অন্বেষণে নিজেকে রিক্ত করিতে তাহার দ্বিধা ছিল না; সত্যের অনুসন্ধানে নিজেকে অকপটে মুক্ত করিতে তাহার এক বিন্দু বাধা হয় নাই। এইখানে বস্তুত তাহার একতিলও ফাঁকি নাই।

ইহার ফলে তাহার প্রতীতি এমন দৃঢ় হইল যে, সেই সত্যের প্রকাশে তাহার কিছুমাত্র ভয় কুণ্ঠা রহিল না। সেখানেও সে লোকের মুখ চাহে নাই—সত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই কথা কহিয়াছে। নিন্দা স্তুতির কোন ধার সে ধারে নাই!

*　　　*　　　*　　　*

ভাগলপুরের বাঙালী-সমাজের কিছু আলোচনা এখানে প্রয়োজন বিবেচনা করি। ইতিপূর্ব্বে ইহার কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি।

শরতের বাল্য এবং যৌবনের অনেক দিন এই সমাজের উত্থান পতন এবং সুখ-দুঃখের সহিত কাটিয়াছে। তাহাকে গড়িয়া তোলার অনেকখানি ভার একদিন এই সমাজের হাতেই হয় ত ছিল।

মুসলমান আমলে যে সব বাঙালী বিহারে আসেন—কার্য্যগতিকে তাঁহাদের একত্রে বস-বাস করিবার সুযোগ হয় নাই, অনুমান করি। বিচ্ছিন্ন ভাবে বাস করার জন্য জাতির স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রাখা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। তাই

আজ এমন অনেক বাঙালীকে এ-দিকে দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা কথাবার্তায় আচার-ব্যবহারে এ-দেশীর মত প্রায় এক হইয়া গিয়াছেন।

প্রায় তিন চার শত বৎসর পূর্ব্বে রাঢ় দেশের উত্তরাংশ হইতে উদ্যোগী তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন একদল কায়স্থ ভাগলপুর জেলায় আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইঁহারাও জাতীয়তা রক্ষার বিষয় তেমন জাগ্রত ছিলেন না, মনে হয়। কমলার সেবা করিয়া আজ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সমৃদ্ধ হইয়াছেন।

ইংরাজ আমলে চব্বিশ পরগণা, হুগলি, নদীয়া প্রভৃতি স্থান হইতে কিছু বাঙালীর সম গম এখানে হইয়াছিল। তাঁহারা শহরের মধ্যে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। শহরের যে অংশে তাঁহারা বসতি করিয়াছিলেন আজও তাহা "বাঙালীটোলা' নামে অভিহিত। জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টায় ইঁহারা স্কুল, হরিসভা ইত্যাদি করিয়া বাঙালীর বাঙালীত্ব বহুল পরিমাণে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।

দ্বিতীয় দলের জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টার মধ্যে বারোয়ারি পূজার অনুষ্ঠানটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রায় প্রতিবৎসরই বসন্ত সমাগমে এই পূজার ব্যবস্থা হইত। প্রতিমা এবং সং গড়িবার জন্য নদীয়া হইতে কুম্ভকার আসিয়া মাসাধিক কাল থাকিয়া বাংলার বহু শিল্প-কলার পরিচয় দিয়া যাইত। এই সম্পর্কে শশী পালের নাম করা যাইতে পারে। শশী পালের পুতুল-নাচ এ-দেশের পক্ষে একটা অচিন্তনীয় বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল। মনে পড়ে, দর্মা-ঘেরা ঘরের মধ্যে হাত-পা নাড়িয়া কোমর দুলাইয়া শশীপালের পুতুল-বাইগুলি যখন নাচিতে থাকিত তখন বাহিরে একটা হৈ-রৈ কাণ্ড ঘটিত—ভিড় হইত রথ-দোলের মত। অশোক বনে সীতা হনুমানকে আম দিতেছেন—পদাঘাতে মহিরাবণের জন্ম ইত্যাদি দেখিয়া আমাদের দিনগুলি মহানন্দে কাটিত।

যে সময় বারোয়ারি পূজা সমারোহের সহিত হইত তখন বাঙালীর সংখ্যা এখানে কম ছিল; কিন্তু তখন তাঁহাদের প্রতিপত্তি ছিল বেশী এবং পরস্পরের মধ্যে একতাসূত্র ছিল। কিন্তু চিরদিন সমান যায় না, ক্রমে বাঙালীর প্রতিপত্তি কমিল এবং পরস্পরের মধ্যে জ্ঞাতিত্ব বিরোধজনিত যথেষ্ট অনৈক্য দেখা দিল।

সে-কালের ভাগলপুরের বাঙালী সম্প্রদায়, বোধ করি, বিহারের অন্যান্য শহরের তুলনায় একটু বেশী রক্ষণশীল ছিলেন। তাঁহারা হিন্দু-শাস্ত্রসঙ্গত আচার-বিচার বিধি-ব্যবস্থা একটু কঠোর ভাবে মানিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেন।

যেখানে তাহার ব্যভিচার ঘটিত, সেখানে একেবারে খড়্গ-হস্ত হইয়া উঠিতেন।

ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে—স্বাধীন চিন্তা এবং তাহার আনুসঙ্গিক আচার-ব্যবহার ক্রমেই আসিয়া পড়িতে লাগিল। পরে যে দলাদলি বিরোধ বিসম্বাদ ঘটে—বোধ করি ইহাই তাহার অন্যতম কারণ

ইংরাজি ১৮৮৪—৮৫ সালে যে দলাদলি হয় তাহার ফল অতি বিষময় হইয়াছিল। সেই আত্মবিরোধের কুফলেই ইদানিংকার বাঙালী সমাজ হয় ত' এতটা হীনবল হইয়া পড়িয়াছে।

স্বনাম-ধন্য রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একজন অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। দরিদ্রের সন্তান হইয়াও তিনি নিজের তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি এবং অটল-অধ্যবসায়ের বলে অল্প দিনের মধ্যে সঙ্গতি সম্পন্ন হইয়া উঠেন। মাত্র পনর-কুড়ি বৎসর ওকালতি করিয়া তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং সরকারি "রাজা" উপাধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। দেশের প্রায় সকল সদনুষ্ঠানের সহিত এক সময়ে তাঁহার ঘনিষ্ট যোগ ছিল। কিন্তু তিনি কোন দিনই 'গোঁড়া'-হিন্দু ছিলেন না। তাহার উপর মধ্যে মধ্যে রাজার উন্মাদ-রোগ হইত। লোকের অনুমান, যে, এই রোগের আক্রমণে একবার তিনি বিলাত চলিয়া যান। ফিরিয়া আসিলে ভাগলপুরের সমাজ তাঁহাকে 'একঘরে' করিল।

সমাজে পুনঃ প্রবেশের জন্য তিনি জীবন-ব্যাপী যুদ্ধ করিয়া নিষ্ফল হন। এই অন্তর্বিপ্লবে ভাগলপুরের বাঙালী-সমাজ যে কিরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছে তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। দলাদলির ফলে পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা-বিদ্বেষের তীব্র বিষ-বীজ উপ্ত হইয়াছিল। তাহা ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া এককালে সমাজকে সমূহ জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল!

রক্ষণশীল-দলের দলপতি ছিলেন আমাদের বাড়ীর কর্ত্তা। আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিনী-সভা—হরিসভার সকল অধিবেশনগুলিই বোধ হয় আমাদের বাড়ীতেই বসিত। দলাদলির সময়ও কমিটি বসিত আমাদের বাড়ীতেই। এবং বহু বৎসর ধরিয়া বারোয়ারি পূজার কর্ত্তৃত্বের ভার আমাদের জ্যেঠা মহাশয় স্বর্গীয় কেদার নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতেই ন্যস্ত ছিল। কেদারনাথ শরতের দাদা মহাশয়।

কেদারনাথ অতিশয় ধীর গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। হিন্দু-ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি এবং বিশ্বাস ছিল। বিদেশে গমন করিলে হিন্দুর যথার্থ ধর্ম্মহানি ঘটে এ-কথা তিনি অকপটে বিশ্বাস করিতেন। শাস্ত্রের অনুশাসন যে

মানিল না তাহাকে ক্ষমা করিয়া সমাজে স্থান দেওয়া যাইতে পারে—এমন কথা একদিনের জন্যও বোধ করি তাঁহার মনে আসে নাই।

কিন্তু রাজাকে সহায়তা করিবার লোকও সমাজে ছিল। শিশু-বয়সে যাঁহাদের বাড়ীতে থাকিয়া তিনি মানুষ হইয়াছিলেন—স্বভাবতই তাঁহারা তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইঁহারা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। দুই পাশাপাশি বাড়ীর মতদ্বৈধ লইয়া সমাজ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত। প্রবৃত্তি এবং প্রয়োজন অনুসারে কেহ বা এ দিকে আসিত, কেহ বা ও দলে যাইত।

এই প্রতিবেশীদের অবস্থা সেই সময়ে খুব ভাল ছিল। আমাদের কিন্তু ও বাড়ীতে যাইতে কঠিন মানা। এ নিষেধ মানিয়া চলা সময়ে সময়ে আমাদের সম্পূর্ণ অসম্ভব হইত।

ও-বাড়ীতে শাসন বলিতে কিছুই ছিল না! কর্ত্তারা অত কঠোর ছিলেন না। লুকাইয়া তাহাদের বাড়ী যাইলে আমাদের অবহেলা না করিয়া তাঁহারা আদর করিতেন। ও-বাড়ীর কর্ত্তারা ছিলেন বেশ দিল-দরিয়া মেজাজের; ছেলেদের ঘুড়ি-উড়াইবার সখ মিটাইয়া দিতেন বাজার হইতে এক-রাশ ঘুড়ি লাটাই কিনিয়া আনিয়া দিয়া। ও বাড়ীর ছেলেদের তামাক চুরুট খাইতে ইচ্ছা হইলে—লাউ কুমড়ার ডাঁটা লইয়া শিক্ষা-নবিশী করিতে হইত না এবং ধরা পড়িলে—একটা হাসির রোলে অপরাধ উড়িয়া যাইত।

সেখানে 'কাঠ পুতলির' নাচ নিত্যই চলিয়াছে। সাপুড়ে আসিয়া সাপ খেলাইয়া প্রচুর পুরস্কার লাভ করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইত। সন্ধ্যার পর সখের যাত্রা দলের ঢোলের চাঁটিতে আমাদের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিত। শাসনের লৌহপিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া আমরা সেই আনন্দ-বাজারের প্রতি যে কি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতাম,—তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না!

এই সখের যাত্রার দলের অধিনায়ক যৌবনে সূর্য্য-সিদ্ধ হইবার মানসে প্রদীপ্ত সূর্য্যের উপর নিজের দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া রাখিয়া কঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলেন; ফলে দুই চক্ষুই তাঁহার নষ্ট হইয়া যায়। তাই তাঁহার অবসর ছিল অখণ্ড। তিনি আদর করিয়া এই দলের নাম দিয়াছিলেন "নব হুল্লোড়।" হুল্লোড় শব্দের প্রকৃতিগত অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া বহু-বার তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি—"হুং, হোতা লোড়য়াস্থ ইতি হুল্লোড়।" ইহার অর্থ এখনো আমি জানি না।

এই নব হুল্লোড়ে দিবা রাত্র চলিত উৎসবের মাতামাতি। কেহ বেহালা

শিখিতেছে—তাঁহার ক্যাঁচ কোঁচের অবিশ্রান্ত ধ্বনি ! কেহ বা ডুগ্‌গি তাবলার বেদম চাঁটি দিয়া মুখে 'কৎতে তাধিন্ তাধিন্ তা'—সাধিতেছে। আবার কেউবা নেশা করিয়া আগাগোড়া মুড়ি দিয়া এক পাশে লম্বা হইয়া পড়িয়া আছে। আবার অন্যদিকে লম্বা নল-গুড়্‌গুড়ি লইয়া তাম্রকূট-সেবন-শিক্ষার্থী মুখ হইতে অবিরাম ধূমোৎগীরণ করিয়া কাসিতেছে—অধিনায়ক সেই সঙ্গে শ্লোক আওড়াইয়া বলিতেছেন :—

"তাম্রকূটং মহাদ্রব্যং স্বেচ্ছয়া পিয়তে যদি।
টানে টানে মহাফলং মত্ত্যো দিব্য মহৎ সুখম্ ॥

এখানে বালক যুবক বৃদ্ধ—কাহারো প্রবেশ নিষেধ নাই ! ও-বাড়ির পড়ুয়া প্রমোশন না পাইলে বকুনি খাইত না,—আদর করিয়া ডাকিয়া আনিয়া—গলায় মালা দিয়া বনমালী সাজাইয়া দেওয়া হইত। আমরা বোধ করি মনে মনে ঈর্ষায় জ্বলিতাম। একি অবিচার তোমার বিধাতা ! একটা বাড়ী আগে ফেলিয়া যাইতে কি হইয়াছিল তোমার ?

—ক্রমশ

শীতের দুপুরে

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়

স্তব্ধ দশদিশি আজি নিঃসাড়,
কুণ্ঠিত শীত-বায়ু ফিরে দ্বারে দ্বার,
কোন্ নব বারতার আনে উপহার—
প্রা—ণের মাঝে যায় রে—খে ;
মূর্চ্ছিত তরু-লতা বন-পথে হায়,
পত্রের আবরণ ঝরে পড়ে যায়,
করুণ বিদায় বাঁশী কোন্ অছিলায়
শে—ষের সুরে যায় ডে—কে !

মরণের বাণী জাগে শ্বাসে শ্বাসে আজ,
শিহরণে ঝরে যায় কুসুমের সাজ,
স্তব্ধ দুপুরে ত্বরা নাই—নাই কাজ
কাঁ—দন জমে ওঠে প্রা—ণে ;
রুদ্ধ আজিকে ঘরে ঘরে সব দ্বার,—
ক্ষুব্ধ পবন ঘুরে মরে চারি ধার,—
বাতায়ন-পথে মনে হয় বারে বার—
আ—মার প্রিয় কর হা—নে !
দিশেহারা হাওয়া সুধু ঘুরে ফিরে বয়,
গোপনে গোপনে কানে কোন্ কথা কয়,
শিহরণ জেগে ওঠে সারা প্রাণময়
শী—তের মৃদুছোঁয়া লে—গে ;
তেমনি কি প্রবাসের প্রিয়তম জন
নিরাশায় চুপি চুপি খুলি বাতায়ন
অকারণ অবসরে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে
হা—ওয়ার পরশনে জে—গে ?
অলস দুপুরে জমে ওঠে অবসাদ—
টুটে যায় মুহু আজ ধৈর্য্যের বাঁধ,
হাওয়াসনে মিশে ভেসে যাইবার সাধ
দূ—রের প্রিয়তম বা—সে ;
অকারণ পুলকের ছোঁয়া লাগে গায়—
কার মৃদু পরশের নিশ্বাস্ বুলায় ;
প্রিয়-হীন স্তব্ধ দুপুর কেটে যায়—
জা—গি' বাতায়ন-পা—শে !

———

উৎসব রাতে

শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়



[ইটালিয়ান লেখক Masuccio of Salerno-এর 'Friends in Love'-এর ছায়া অবলম্বনে এই গল্পটি লিখিত।]

বিমলের জমিদার-বন্ধু সরিতের বাড়ী আজ কি একটা উৎসব! চারিদিকে আলোর বন্যা ছুটছে, দাসদাসী সব বিনা কাজে হাঁক ডাক্ করে বেড়াচ্ছে, আর সকলকে ছাপিয়ে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে সিংহদরজার ওপর থেকে ভেসে-আসা নহবতের করুণ রাগিণী। সমস্ত বাড়াটা আজ সরগরম, সকলেই আনন্দে মশ্‌গুল্! কিন্তু এত আনন্দের দিনেও বন্ধুর-বাড়ী নিমন্ত্রিত বিমলের মনটা বড় চঞ্চল, সানাই-এর করুণ রাগিণীরই মত উদাস! সন্ধ্যার দু'মিনিট আগে পর্য্যন্তও সে বন্ধুর সঙ্গে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছে, সমস্ত বাড়ীখানা তার আনন্দ কলরবে মুখরিত হয়েছিল, কিন্তু এখন তার মন থেকে সে আনন্দের উজ্জ্বল-আলো কোথায় মিলিয়ে গেল, সন্ধ্যার অন্ধকারের মত তার মনটা বড় ভার, বড় গুমোটকরা!

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাড়ীখানা নিমন্ত্রিত নর-নারীতে ভরে গেছে। নারী-কণ্ঠের কাকলীপূর্ণ ড্রয়িং রুম থেকে বেরিয়ে এসে বিমল যেন হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচ্‌লো। তাড়াতাড়ি তেতালার ছাতে পালিয়ে গিয়ে একলাটি পায়চারি করে বেড়াতে লাগ্‌লো আর তার মনটা সানায়ের কান্না-ভেজা সুরের হাওয়ায় কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছিল।

ঐ যে চপলা, আনন্দের একখানি সজীব মূর্ত্তি ড্রয়িংরুমে সরিতের পাশে বসে অর্গানের সুরে নিজের অন্তরের সকল গোপনবাণী তার দেবতার কাছে ব্যক্ত করে দিলে, "ওগো প্রিয়তম, দয়িত আমার, এস জ্ঞানে এস ধ্যানে"—আর সরিৎ একদৃষ্টে সেই চপলার রূপ-কমলের মধু পান করে মাতাল হয়ে উঠ্‌লো, গানের সুরে সুরে তার বুকখানা ভরে উঠ্‌লো জয়ের

গর্ব্বে, আর বিমল, যে তার নিত্য যাতায়াতের পথে নিমেষ-দেখা চপলাকে তার জীবনের সকল ঐশ্বর্য্য, সকল সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে নিঃস্ব, কাঙাল হয়েছে সে তা'র মানসপ্রিয়ার উচ্ছ্বসিত গানে মুস্‌ড়ে পড়লো নিজের পরাজয়ের লজ্জায়, দুঃখে আর অভিমানে! তাই সে চপলার সামনে থেকে পালিয়ে এসে একলাটি ছাতে বেড়িয়ে বেড়াতে লাগ্‌লো। হায়! এই রিক্তের বেদন্ ঐ সুখী মেয়েটি কি বুঝ্‌বে, যদি বুঝতো তা'হ'লে⋯ ⋯

অনেকক্ষণ পায়চারি করে তার পা-দুটো ভার হ'য়ে উঠ্‌লো, আস্তে আস্তে ছাতের আলসেটির ওপর গিয়ে বস্‌লো। নীচের ড্রয়িংরুম থেকে ভেসে আসছিল চপলার গান, "ওগো সুন্দর, মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি"—

বিমল চুপ করে বসে ভাবতে লাগলো, সেই অতীতের কত সুখ-দুঃখ বিজড়িত স্মৃতি, তার নিত্য চলাচলের পথে চপলার প্রতীক্ষা, নির্দ্দিষ্ট সময়ের চেয়ে একটু দেরী হয়ে গেলে তার চোখ দুটির অভিমান ভরা নীরব ভৎর্সনা⋯সে আর ভাব্‌তে পারলে না। একটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে—তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো ওমরখৈয়ামের দুটি লাইন,—"অতীত যা তার দুখের স্মৃতি ভবিষ্যতের ভাবনা ঘোর, দিল্‌পিয়ারা সাকি আমার, পেয়ালা ভরে ঘুচাও মোর"—

' আর সঙ্গে সঙ্গে চম্‌কে উঠলো পিছনে সরিতের গলা শুনে—"বন্ধু, তোমার হঠাৎ এমনি পরিবর্ত্তনের কারণ ত কিছু বুঝতে পাচ্ছি না! বল, বল কেন এমন হ'ল...বলবে না?

বিমল নীরব, শুধু তা'র বড় বড় চোখদুটি জলে ভরে উঠ্‌লো।

—অ্যা, কাঁদ্‌ছ বন্ধু? তোমার দুঃখের কথা আমার কছে গোপন রাখ্‌ছ বন্ধু, আমাকে কি তার একটুও অংশ নিতে দেবে না বিমল? তুমি যদিও তোমার মনের কথা, তোমার ব্যথা, বেদনা আমার কাছে গোপন রাখ বন্ধু আমি...আমি কিন্তু আমার অন্তরের কোন কথাই তোমার কাছে লুকিয়ে রাখি না, তাই এখনও তোমায় একটা বড় গোপন কথা বল্‌বো বলে এলুম কিন্তু তুমি যে কাঁদছ⋯

সে বিমলের হাতদুটি নিজের হাতদুটি দিয়ে চেপে ধর্‌লে। বিমল কান্না-ভেজা-স্বরে আস্তে আস্তে বললে,—"বলো...বলো সরিৎ, কি বল্‌তে এসেছ!"

সরিৎ বিমলের চোখদুটি নিজের কোঁচার খুটে মুছিয়ে দিয়ে বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে,—"চপলাকে ত দেখে এলে তুমি, উঃ কি সুন্দর সে...তার চেয়েও সুন্দর

তার ঐ মিষ্টি গলাটি…… বাস্তবিকই— আমি তার গানের সুরে জমে গিয়েছিলুম। আর সেই সুযোগে তুমি পালিয়ে এসেছ দুষ্টু! ঐ চপলা, ঐ তন্বী-সুন্দরী আর দুমাস পরে আমার একান্ত আমার হয়ে যাবে বন্ধু, তাই তোমায় বল্‌তে এলুম বিমল, তুমি আমার সঙ্গে না থাক্‌লে আমি যে সে জয়ের আনন্দ একলা উপভোগ করতে পারবো না বন্ধু!

সরিতের এই অভিন্ন-হৃদয় বন্ধুত্ব বিমলকে আজ আরো ব্যথিয়ে তুল্‌লে। সে আর তার অন্তরের গোপন ব্যথা বন্ধুর কাছে লুকিয়ে রাখ্‌তে পারলে না। একে একে সমস্ত কথাই সরিতকে বলে ফেল্লে।

বিমলকে আপনার বুকের কাছে টেনে এনে সরিৎ হাসিমুখে বল্‌তে লাগ্‌লো,—"আমার সুখদুঃখের অংশীদার পেয়ে আজ আমার যে রকম আনন্দ হচ্ছে, সত্যি এ রকম আনন্দ আমি আর কখনো জীবনে পাই নি বন্ধু! আমি চপলাকে সত্যিই ভালবাসি বিমল, কিন্তু তাকে আমার জীবনের সঙ্গে বাঁধতে চাই না, পার্‌বোও না! ওঠ চল, তুমিই তার যথার্থ যোগ্য বন্ধু...আমায় মাপ কোরো বিমল, আমি জান্‌তুম্ না যে, তুমি চপলাকে অনেকদিন আগে থেকে এত ভালবাস। হাঃ হাঃ সবই ঠিক্, কেবল একটা পুরুত রেখে নেওয়া—ভগবান তোমাদের সুখী করুন্। চল, উঠে পড়ো।"

বিমল সরিতের কাছে ক্ষমা চাইতে লাগ্‌লো যে, সে চপলাকে ভালবাসে ও চিরদিনই বাস্‌বে কিন্তু তার মত হতভাগা চপলাকে তার দুঃখের সঙ্গে শুধু দুঃখ দিতে চায় না…সে সুখী হবে যদি সরিৎ চপলাকে তার গৃহ-লক্ষী করে লয়।

বিমলের কথা শুনে সরিৎ তাকে হাত ধরে হিড়্‌হিড়্ করে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে চল্লো নীচেয়—"পাজী, তোকে ক্ষমা কর্‌বো…যা আমি বল্‌ছি তা নিশ্চয়ই হবে, এই তোর দুষ্টুমির শাস্তি…"

বিমলকে নীচে এনে তার নিজের ঘরে বসিয়ে সরিৎ চপলাকে সেই ঘরে ডেকে নিয়ে এলো তারপর তাকে বিমলের পাশে একটা চেয়ারে জোর করে বসিয়ে বল্লে,—'চপলা, আমাকে যদি তুমি যথার্থ ভালবাস, আমি যা বল্‌বো, আশা করি তাতে তুমি একটুও দুঃখিত হবে না। আর আমার কথা মত যদি তুমি কাজ করো, তাই হবে তোমার আমার প্রতি যথার্থ ভালবাসার প্রমাণ! তুমি বোধ হয় জানো না, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু বিমল তোমাকে কি রকম

পাগলের মত ভালবাসে। আমার চেয়ে সেই-ই তোমাকে পাবার বেশী যোগ্য। আমরা দুজনেই এখন তোমার—এখন তুমি যাকে ইচ্ছে তোমার বেছে নাও।"

সরিতের কথা শুনে চপলা চম্‌কে উঠ্‌লো, বড় বেশী আশ্চর্য্য হয়ে গেল সরিতের এ রকম মহত্বে। সে মনে মনে ঠিক্ কর্‌লে, সরিতের এই মহত্বের পুরস্কার দিতে হ'বে বিমলকে তার চিরজীবনের সঙ্গী করে···তাতে তার নিজের বুকে যত ব্যথা বাজে বাজুক্...দুঃখ নেই। মনের বেদনা মুখের হাসিতে চেপে সরিতের মুখের দিকে চেয়ে চপলা বল্লে,—"আমি জানতুম, তোমার আমার মিলনের মাঝ্‌খানে উঁচু পাঁচিল দাঁড়িয়ে রয়েছে কিন্তু তুমি আমায় ভালবাস্‌তে, আমায় চাইতে তাই আমিও তোমাকে ভালবেসেছিলুম, তোমাকে আমার অন্তরের অন্তরে চেয়েছিলুম। জানি না তোমাকে কি বলে প্রশংসা কর্‌বো··· তুমি এত বড় ধনীর সন্তান হয়ে, এত সৌভাগ্যশালী হ'য়ে, এত সুন্দর সুপুরুষ হয়ে স্বেচ্ছায় আপনার সকল সুখ বলি দিচ্ছ তোমার বন্ধুর জন্যে! তোমার যদি তাই ইচ্ছা হয় আমি তোমার অনুরোধ···না···না তোমার আজ্ঞা স্বেচ্ছায় পালন কর্‌তে রাজি আছি, যদি তোমার বন্ধু আমাকে ক্ষমা করেন্, আমার অতীত দুর্ব্বলতা ভুলে গিয়ে আমাকে মার্জ্জনা করেন্...এই নাও আমার হাত বন্ধু···"

চপলা তার ডান হাতটি সরিতের দিকে বাড়িয়ে দিলে, সরিত সেখানি বিমলের ডান হাতটির ওপর রেখে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নীলিমা

শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত

হে মৌন গগন,—ওগো সুদূরের নীল,
হে বিচিত্র অনন্ত নিখিল,
অপার ঐশ্বর্য্য বেশে দেখা তুমি দাও বারে বারে
নিঃসহায় নগরীর কারাগার-প্রাচীরের পারে!
—উদ্বেলিছে হেথা গাঢ় ধুম্রের কুণ্ডলী

উগ্র চুল্লীবহ্নি হেথা অনিবার উঠিতেছে জ্বলি,
আরক্ত কঙ্করগুলি মরুভূর তপ্তশ্বাস মাখা,
—মরীচিকা ঢাকা!
অগণন যাত্রিকের প্রাণ
খুঁজে মরে অনিবার,—পায় নাক' পথের সন্ধান;
চরণে জড়ায়ে গেছে শাসনের কঠিন শৃঙ্খল,
হে নীলিমা নিষ্পলক, লক্ষ বিধি-বিধানের এই কারাতল
তোমার ও মায়াদণ্ডে ভেঙেছ মায়াবী!
জনতার কোলাহলে একা বসে ভাবি
কোন্ দূর স্বপ্নপুর-রহস্যের ইন্দ্রজাল মাখি'
বাস্তবের রক্ততটে আসিলে একাকী!
স্ফটিক আলোক তব বিথারিয়া নীলাম্বরখানা
হে সুদূর বিরাট অজানা!
চোখে মোর মুছে যায় ব্যাধবিদ্ধা ধরণীর রুধির লিপিকা,
জ্বলে ওঠে অস্তহারা আকাশের গৌরী দীপশিখা!
বসুধার অশ্রু-পাংশু আতপ্ত সৈকত,
ছিন্নবাস নগ্নশির ভিক্ষুদল, নিষ্করুণ এই রাজপথ,
লক্ষ কোটি মুমূর্ষুর এই কারাগার,
এই ধূলি,—ধূম্রগর্ভ বিস্তৃত আঁধার
ডুবে যায় নীলিমায়,—স্বপ্নায়ত মুগ্ধ আঁখিপাতে,
—প্রস্ফুটিত মেঘকুঞ্জে, সুনির্জন নক্ষত্রের রাতে;
ভেঙে যায় কীটপ্রায় ধরণীর বিশীর্ণ নির্মোক,
তোমার চকিত স্পর্শে হে অতন্দ্র দূর কল্পলোক!

ক্ষণিকা*

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

বেদনার ইতিহাস মানবের অন্যতম স্থলে আঘাত করে, সেই আঘাত এতই করুণ এতই সুন্দর যে, তাহা সোজাভাবে ব্যক্ত করা যায় না, রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' এই বেদনার ইতিহাস।

কবির জীবন চিরদিনই অনেকটা অজ্ঞাতভাবে কাব্যের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কবির জীবন এবং কাব্যের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন চিরদিনই আছে। কাজেই কাব্যখানি আলোচনা করিবার পূর্ব্বেই আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, রবিবাবুর জীবন ও কাব্য এমন বৈচিত্র্যময় ও ভাবময় যে, আমরা তাঁহার লেখার সকল সময় সমর্থ করিবার সহৃদয়তা লাভ করিতে পারি না। বিশেষতঃ তিনি যে অসীম নিপুণতার সহিত পাশ্চাত্য ভাবপ্রবাহ এবং তাহা প্রকাশ করিবার অভিনব রীতিকে এ দেশে আমদানী করিয়াছেন, তাহা আমরা প্রাচ্য হইয়া বিশেষ ভাবে তদগত হইতে সমর্থ হই না। রবীন্দ্রনাথ মানব জীবনকে যে প্রকৃতির সকল দিক দিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন ইহার পরিচয় আমরা তাঁহার কাব্যেই পাই। আজ আধুনিক কালের রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের ভাবকে বাংলায় নিমন্ত্রিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারার পরিচয় দিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইলে সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যের খবর রাখিতে হয়, সেই পাণ্ডিত্যের যে একান্ত অভাব, তাহা বলাই বাহুল্য এবং সেই কারণে 'ক্ষণিকা'র আলোচনা করিবার ধৃষ্টতাও করি না; তবে কাব্যখানি আমাদের চিত্তে যে বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহারই ইতিহাস দিব। অসাধারণ শিক্ষা, নিপুণতা, ও উদ্যমের সহিত কবিত্ব প্রতিভার সংমিশ্রণে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি হইয়াছে, পাশ্চাত্যভাবকে তিনি বিশেষ ভাবে আয়ত্ত করিয়া বঙ্গীয় সরস্বতীর বীণা লইয়াই তিনি গান করিয়াছেন, তাই রবীন্দ্রনাথের

---

* এই কাব্যের বিবিধ আলোচনা হইয়া গিয়াছে, তবু আরও অধিক আলোচনা বাঞ্ছনীয়। —সম্পাদক।

গান বাঙ্গালীর কাছে বেসুর লাগে নাই। বিশেষত 'ক্ষণিকা'র মধ্যে বেশীভাবে আত্মকথাই প্রকাশ পাইয়াছে।

'ক্ষণিকা' তাঁহার গীতিকাব্য। হৃদয়াবেগকে সুরের তারে বাঁধিয়া ব্যক্ত করাই তাঁহার জীবনের চিরকাজ। 'ক্ষণিকা'তে "সৌন্দর্য্যের সন্ন্যাসী-কবি যখন ভোগক্ষুব্ধ যৌবনকে ছাড়াইয়া ভারশূন্য প্রাণে বাংলার গ্রাম্য প্রকৃতির বুকের মধ্যে একটা স্থির শান্তির ঘর বাঁধিতেছেন, একটি আকুল শান্তি. বিপুল বিরতির মধ্যে সমস্ত সৌন্দর্য্যকে সহজ করিয়া, সরল করিয়া, ব্যাপ্ত করিয়া, বিরল করিয়া দেখিতেছেন তখন শেষের দিকে ক্রমেই একটি নিবিড়তর স্পর্শে একটি অতলের অতলে নিমগ্ন হইবার উপক্রম চলিতেছে।" তাঁহার এই জগতের ভাবকে আহরণ করিবার মত শক্তি বেদনার ইতিহাসেও বেশ সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট রহিয়াছে। বেদনার ভিতর যে আনন্দ তাহাই কাব্যের রস। কবিত্বের প্রধান উপাদান জীবন-পথে আনন্দ-সিদ্ধি এবং বেদনা হইতে যে আনন্দলাভ তাহা কবিত্বের প্রধানতম উপাদান।

কাব্যখানির 'ক্ষণিকা' নাম দেওয়ার একটু সার্থকতা আছে। আমাদের এই ক্ষণিক জীবনের মধ্যে একটি ক্ষণিকতম অংশ রহিয়াছে যাহা আমরা কদাচিৎ উপভোগ করিতে পারি। সেই অংশই কবিত্বের আস্বাদ গ্রহণের অবসর বা কবিত্বের আনন্দলাভ করিবার অবসর; ক্ষণিকতম অংশের অবসরে তাহার এই ক্ষণিক কাব্যের স্বাদ ও বিস্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য উৎসর্গ পত্রে বলিয়াছেন:—

আশা করি নিদেন পক্ষে
ছ'টা মাস কি এক বছরই;
হবে তোমার বিজনবাসে
সিগারেটের সহচরী।
কতকটা তা'র ধোঁয়ার সঙ্গে
স্বপ্নলোকে উড়ে যাবে,
কতকটা কি অগ্নিকণায়
ক্ষণে ক্ষণে দীপ্তি পাবে?

আমি যে ক্ষণিক অবসরের কথা বলিয়াছি—তাহা 'ক্ষণিকা'র ছ'টা মাস কি এক বছরের মধ্যেই। আর এই যে ধূম, ইহা স্বপ্নলোকে উড়িয়া যাইবার। যাহা উড়িয়া যাইবে তাহারও একটা গন্ধ লাগিবেই আর 'ক্ষণিকা'র ক্ষুদ্রাংশ কি

অনাস্বাদের মধ্যেও একটুখানি স্বাদের আভাস দিতে পারিবে না? এই গেল 'ক্ষণিকা' সম্বন্ধে তাঁহার নিজের বক্তব্য। যিনি কবি তিনি বিভিন্ন সমালোচনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া খাঁটি কাব্য প্রকাশ করিতে পারেন না; বিচিত্র ভাব কবিত্বকে সহজভাবে, সরলভাবে, স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করিতে চায়। তবে ভাব মাঝে মাঝে এমন গভীরতা লাভ করে যে, তাহাদের প্রকাশ ভাষার সাক্ষাৎ-শক্তির অসাধ্য হইয়া উঠে, তখন কবি ইঙ্গিত বা সঙ্কেতের পথ অবলম্বন করেন। সমালোচক সমালোচনার তুলাদণ্ডে পাঠ্যাপাঠ্য বিচার করেন; কবিত্ব বিকাশের পথে নীরবে চলিয়া যায়, সমালোচকের কর্কশ বা মধুর ধ্বনি তাঁহাকে নিয়ন্ত্রিত ও কদাপি বিচলিত করিতে পারিলেও নিরস্ত করিতে পারে না। 'ক্ষণিকা' 'নৈবেদ্য' 'কল্পনা' 'কাহিনী'—এই কাব্যগুলি প্রায় এক সময়ের লেখা। 'কথা' 'কল্পনা' প্রভৃতিতে শুধু দেশকে বুঝিবার জানিবার ভালবাসিবার সূচনা আছে; এবং এই সূচনা প্রাচীন ইতিহাসের মধ্য দিয়া প্রাচীন কাব্য-পুরানের মধ্য দিয়া। তাঁহার প্রকৃত কবিত্বের ও পবিত্রতম ভাবের আবেশ 'নৈবেদ্য'-এ। 'ক্ষণিকা' তাঁহার বেদনার ইতিহাস, হতাশ্বাসের ইতিহাস। রবিবাবুর ক্ষণিকাতেই প্রথম ও প্রধানত বাংলা কথিত ভাষার প্রয়োগের এক মুখ্য কারণ আছে। এই কাব্যের প্রথমার্দ্ধ তাঁহার বেদনার প্রতি তীব্র বিদ্রূপ। এই বিদ্রূপ, তাঁহার একটা প্রাণের কথা। এই বেদনা তাঁহার অকাজ বোধের বেদনা। তাঁহার অকুণ্ঠচিত্তে সাহিত্য-সেবা তিনি অপর্য্যাপ্ত মনে করিয়াছেন। এই বেদনা বা প্রাণের কথা 'মনের কথা জানানে' ভাষাতেই সরল ভাবে, অবাধগতিতে প্রকাশ করিবার এমন সুবর্ণ সুযোগ তিনি ছাড়েন নাই। তাই কথিত ভাষার অবতারণা। বিশেষত হসন্ত-ওয়ালা শব্দ, যে শব্দ আমরা নিত্য ব্যবহার করি, প্রাণের কথায় বিচিত্র ছন্দের ঝঙ্কার বেশ করিয়া বাজাইয়া তুলে; তাই প্রাণের মধ্যেও সহজে আঘাত করিতে পারে। যথা—

দীঘির জলে ঝলক্ ঝলে
মাণিক্ হীরা,
শর্ষে ক্ষেতে উঠ্‌ছে মেতে
মৌমাছিরা।

কাব্যখানি পাঠ করিলেই ছন্দের বিচিত্র ঝঙ্কার অপেক্ষা তরলতা ও মাধুর্য্য প্রতি পৃষ্ঠায় দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দের দীপ্তি এবং ভঙ্গী চিরদিন

রক্ষা করিয়াছেন। তিনি স্বাধীনভাবে নিজে গড়িয়া চলিয়াছেন। কবিত্ব ক্ষেত্রে বা সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি যে নূতনত্ব আনয়ন করিয়াছেন, তাহা এই বিচিত্র ছন্দের ভিতর দিয়া ক্ষণিকাতে প্রকাশ করিয়া তিনি ক্ষণিক জীবনোৎসবে তৃপ্ত রহিয়াছেন। এই উৎসবে বেদনা প্রকাশ, বেদনার প্রতি বিদ্রূপ এবং সেই বিদ্রূপে আত্মতৃপ্তি, তাই তিনি বেদনা প্রকাশ করিবার সঙ্গেও এক আদর্শের সঙ্গীত করিয়া তৃপ্তি ভোগ করিবার অবসর করিয়া লইয়াছেন। যথা—

পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়,
ছুটে আর টুটে পলকে,
তাহাদেরি গান গা'রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে।

বাস্তব সৌন্দর্য্য হইতে কল্পিত সৌন্দর্য্যেরই যেমন অধিক গৌরব, তেমনি কবির কল্পিত আদর্শ বাস্তবতাকে অতিক্রম করিয়াছে। সেই মহান্ আদর্শের কর্ম্ম-সঙ্গীত-প্রকাশে তাঁহার আনন্দ, হয় তো সেই আদর্শের তুলনায় তাঁহার স্বল্প (?) কর্ম্ম-প্রেরণাকে তিনি ধিক্কার দিয়া বেদনার উপর আনন্দ লাভ করিতেছেন। ক্ষণিক জীবনে আনন্দ লাভের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কোন এক অজ্ঞাত মহানের গীতি গাহিয়া, নিজের ধারাকে বৃহৎ মনে না করিয়া বেদনা অনুভব করিয়াছেন এবং সেই বেদনার মধ্যে তৃপ্তি বা আনন্দ লাভ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়াছেন; তাঁহার বেদনার সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছন্দে ছন্দে অলক্ষিত ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

ইহা কবির সুপরিণত বয়সের কাব্য, তাই যৌবন-জীবনের উন্মত্ততা ও ব্যগ্রতার উপর বিস্মৃতি-যবনিকা ফেলিবার কামনা করিয়াছেন। তিনি প্রেরণার নির্দ্দিষ্ট গতিকে প্রকৃতির ক্রোড়ে স্থাপন করিবার মানস করিয়াছেন,। যেমন—

প্রতি নিমেষের কাহিনী
আজি বসে বসে গাঁথিস্ নে আর
বাঁধিস্ নে স্মৃতি-বাহিনী!
যা আসে আসুক, যা হ'বার হো'ক্,
যাহা চলে যায় মুছে যাক্ শোক,
গেয়ে ধেয়ে যাক্ দ্যুলোক ভূলোক
প্রতি পলকের রাগিণী।

কবি নিজকে অতীত অকাজ-কাহিনী (?) প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, আর অতীত-স্মৃতির উপর সুদৃঢ় আবরণও দেখিবার প্রয়াস করিয়াছেন। তিনি আবার বেদনাকে বলিয়াছেন 'মুছে যাক্ শোক'। তিনি 'ক্ষণিক আলোকে, আঁখির পলকে' জীবনের 'শেষ হিসাব' করিতে চাহিয়াছেন, সাংসারিক ব্যগ্রতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে চাহিয়াছেন, আবার সেই সঙ্গে বেদনার মধ্যে আনন্দ লাভও কাম্য। একই কবিতার শেষাংশে তিনি ক্ষণিকের মধ্যে সম্পূর্ণই তৃপ্ত, বেদনার কঠোর আঘাতের মধ্যেও—

"ধরণীর 'পরে শিথিল বাঁধন,
ঝলমল প্রাণ করিস্ যাপন।"

এই প্রাণ যাপনের মধ্যে যে আনন্দের অবতারণা তাহাও যেন ধার করা। বেদনার ছবি গুপ্ত রাখিয়া প্রকৃষ্ট ভাবে আনন্দ প্রকাশ করিতে যাইয়া কবির বেদনাহত হৃদয় ধরা দিয়াছে। যেমন—

"মর্ম্মর তানে
ভরে ওঠ্ গানে
শুধু অকারণ পুলকে।"

এই আকাশের মধ্যে কবির হৃদয়ের বেদনা ধরা পরিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনগতি যদি এমন বৈচিত্র্যময় না হইত, তবে তাঁহার ক্ষণিকা আলোচনা করিতে এতটুক্ কুণ্ঠা বোধ করিতাম না। তাঁহার বিচিত্র ভাব নানা কাব্যের মধ্যে দিয়া বিচিত্র ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ক্ষণিকার জীবন আরও বিচিত্র, তাই উহা পাঠ করিবার কষ্ট সহ্য ও ধৈর্য্য রক্ষা করা সহজ হইয়া উঠে না। কিন্তু 'ক্ষণিকা'র ভিতর যে তাঁহার সারা জীবনের ভাবগতির নির্দ্দেশ আছে আমরা তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, তিনি যে সংসার কুহেলিকার মধ্য দিয়া জীবন চালাইয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই গীতিকাব্যের মধ্যে পাওয়া যায়। যাঁহারা 'গীতাঞ্জলি' নৈবেদ্য,'সোনার তরী',প্রভৃতি কাব্যে রবীন্দ্রনাথকে যে ভাবে বুঝিয়াছেন, আবার তাঁহারা 'ক্ষণিকা' পাঠ করিলে রবীন্দ্রনাথের ভাবের অভিনবত্ব ও ধারার পরিবর্ত্তন বেশভাবে লক্ষ্য করিতে পারিবেন। যদিও ছন্দের একটী মাধুর্য্য তাঁহার সকল কার্য্যে সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, তথাপি ইহাতে যেন একটী পরিবর্ত্তনের ছায়া পড়িয়াছে। তাঁহার কাব্য পথের এমন বিচিত্র পরিবর্ত্তন কেন? তাঁহার সুগম্ভীর ভাবধারার মধ্যে হঠাৎ আত্মদৈন্য

প্রকাশের অভিলাষ কেন? যিনি 'পালের রসি' কসিয়া ধরিয়া 'আনন্দের গান' গাহিয়া 'সোনার তরী' ভাসাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার মর্ম্মের মধ্যে হঠাৎ বেদনা-স্মৃতি কেন? —একটানা পথে চলিবার জীবন তাঁহার নয়, তাই ভাবের এতটুকু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখানে তিনি সাধারণ পথ ছাড়িয়া মাতালের পথে আসিয়াছেন। বিশ্বের যাবতীয় আনন্দ ও সৌন্দর্য্য উপভোগের অবসানে, অবসান-গীতির ছন্দে বেদনা অনুভব করিয়া, নিজের তানকে উপেক্ষা করিয়া বলিয়াছেন,—

ভাগ্য যবে কৃপণ হ'য়ে আসে,
বিশ্ব যবে নিঃস্ব তিলে তিলে,
মিষ্ট মুখে ভুবন-ভরা হাসি
গুহশেষে গুজন দরে মিলে,
বন্ধু জনে বন্ধ করে প্রাণ,
দীর্ঘ দিন সঙ্গীহীন একা।

* * * *

প্রকৃতির নিয়মই এই। ব্যাক্তিগত জীবনের মধ্যে এই ভাগ্য-কার্পণ্যের ফলাফল আমরা অনেক সময়েই অনুভব করিতে পারি, আবার এই সঙ্গীহীন দীর্ঘদিনের অবসানের মধ্যে অদৃষ্টের ফেরে যদি মিলনাকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয় তবে,

বন্ধু ফিরে বন্দী করি বুকে,
সন্ধি করে অন্ধ অরিদল,
অরুণ ঠোঁটে তরুণ ফোটে হাসি
কাজল চোখে করুণ আঁখিজল।

ইহা তাঁহার জীবনের শেষাংশে, পরের ভোগ তৃপ্তিকে নিজের কল্পনা করিয়া, একটুখানি আনন্দের সূচনা। এইরূপ করিয়া নিজের ব্যাক্তিগত জীবনকে স্বতন্ত্র রাখিয়া, কবিত্বময় জীবনখানি বিশ্ব-সৌন্দর্য্য দর্শনে ব্যাপৃত রাখিবার চেষ্টা তাঁহার এই প্রথম নহে। এই 'ক্ষণিকার' মধ্যেই, স্বল্প গীতির উচ্ছ্বাসের মধ্যেই, আবার তিনি নিজকে দিয়াই পৃথিবীর নানা মহল্লায় নানাভাবে প্রবেশ করিয়া বিচিত্র খবর দিয়াছেন। তাঁহার গত জীবনের স্মৃতি-চিহ্নকে অবলম্বন করিয়া, গীতির মনোরম ছন্দে তাহাদের পরিণাম-ইতিহাসও দিয়াছেন।

প্রথমে তাঁহার একটানা সাধারণ ভোগ-সুখময় জীবন হইতে বিদায়ের বাণী। তিনি তাঁহার এই চিন্তাপূর্ণ জীবন ত্যাগ করিয়া মাতালের আনন্দের রাজ্যে, স্বচ্ছন্দতার রাজ্যে, তৃপ্তির রাজ্যে যাত্রা করিবার জন্য ব্যস্ত। এই যাত্রা, তাঁহার

জীবন গতির বৈচিত্র্য নহে, ইহা তাঁহার কবিত্বের স্বাভাবিক গতি। তিনি এই 'কুটিল দ্বিধাময়' সংসারের অকারণ বাধাগুলিকে মাতালের নেশার ঝোঁকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীনভাবে চলিবার জন্য উন্মত্ত। রবীন্দ্রনাথের কাব্য জীবন ও এই স্বাধীনতারে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। 'মাতাল' কবিতাটী এতই সুন্দর হইয়াছে যে, ইহার প্রায় সারা অংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, আপনারা—সহৃদয়তার অনুগ্রহে তাহার বিশেষত্ব বুঝিয়া নিন্।

ওরে মাতাল, দুয়ার ভেঙে দিয়ে
পথেই যদি করিস্ মাতামাতি,
থলি ঝুলি উজাড় ক'রে' ফেলে'
যা আছে তোর ফুরাস্ রাতারাতি,
অশ্লেষাতে যাত্রা ক'রে' সুরু
পাঁজি পুঁথি করিস্ পরিহাস
অকারণে অকাজ লয়ে ঘাড়ে
অসময়ে অপথ দিয়ে যাস্। ইত্যাদি

শাস্ত্র-পুঁথির অকারণ বাধা-বিপত্তিকে ছাড়াইয়া, সংসারের স্বার্থপরতাপূর্ণ জ্ঞানরাশিকে অতিক্রম করিয়া, সেই 'থলি ঝুলি উজাড় ক'রে ফেলে' রাতারাতি ফুরাণের দেশেই অভিসার। তাঁহার এই কি অদ্ভুত আলাপ, অদ্ভুত কামনা! কর্ম্মপরায়ণ জীবনখানিকে এমন করিয়া 'সৃষ্টিছাড়া হাওয়া' লাগাইয়া বিস্মৃতির বক্ষে নিক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্য কি? এই সংশয়ের নিষ্পত্তি:—

সংসারেতে সংসারী ত ঢের,
কাজের হাটে অনেক আছে কেজো,
* * * *
থাকুন তাঁরা ভবের কাজে লেগে,—
লাগুক্ মোরে সৃষ্টিছাড়া হাওয়া।

তাঁহার এই অদ্ভুত রকমের কথাবার্ত্তা শুনিয়া হয় তো মনে হইতে পারে, সংসারের অশ্রান্ত কর্ম্মকোলাহল হইতে নিজকে নিতান্ত বিচ্ছিন্ন রাখিয়া কৌতুক করিবারই প্রয়াস এই খানে আছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়। দেশের কাজের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াও মাতাল প্রাণের স্বচ্ছন্দতা ও সুখ তাঁহার আধুনিক কাম্য বস্তু; এই মাতালের পাতালবাসী হইতে হইলে নিজকে তাহার উপযোগী করিয়া তুলিতে হয়, আধুনিক জীবনের অনেক বাঁধাবাঁধি নিয়মকে অতিক্রম

করিয়া যাইতে হয়,—সাংসারিক বুদ্ধি বিবেচনাকে ছাড়াইয়া উদার হইতে হয়।

প্রকৃতির একাধিপত্যে শাস্ত্র-পুঁথির ততটা হাত নাই, যেইখানে প্রকৃতির দানের সহিত জীবনখানি এমন ভাবে গঠিত হয় যে, আজ কালকার বাঁধাবাঁধি নিয়ম-শাস্ত্রের মূল্য একেবারেই নাই, সেই সময়ে যাহা ভোগ করিবার বা ত্যাগ করিবার, তাহার প্রবৃত্তি প্রকৃতি আপন হইতেই জাগাইয়া তুলে। আবার শাস্ত্র-পুঁথির সারাংশ প্রকৃতির হাতের লেখা, রবীন্দ্রনাথের জীবনের ঐক্য সেই খানেই। তিনি যে যৌবনেতেই বানপ্রস্থের অবতারণা করিয়াছেন তবে কি তাহা একেবারে অমূলক? তিনি এই যৌবনে কবিত্বের দাবী করিয়াছেন, শুধু নিজকে নয়, সমস্ত বিশ্ব-মানবকে প্রকৃতির হাতে তুলিয়া দিতে চাহিয়াছেন, আধুনিক গার্হস্থ্য জীবনের একটুখানি অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিয়া তিনি বলিয়াছেন :—

ঘরের মধ্যের বকাবকি,
নানান মুখে নানান কথা,
হাজার লোকে নজর পাড়ে,
একটুকু নাই বিরলতা,
* * *
হতভাগ্য নবীন যুবা
কাজেই থাকে বনের খোঁজে,
ঘরের মধ্যে মুক্তি যে নেই
এ কথা সে বিশেষ বোঝে।

আমরা এমন বলিতে চাই না যে, তিনি মনুর বিধিকে অবিধি আখ্যা দিতেছেন, কিন্তু আধুনিক যুগে মানব-সমাজ মনুর বিধির একটুখানি সামান্যতম উপলক্ষ্য রাখিয়া শাস্ত্রের অনাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার কৌতুক ও বেদনানুভব। তাঁহার এই যে বেদনা, ইহার দুইটী কারণ আমরা দেখিতে পাই, প্রথমতঃ তিনি ইহা স্পষ্টই বুঝিয়াছেন যে, আধুনিক শিক্ষা ও জীবন-পদ্ধতি মনুর বিধি হইতে অর্থাৎ পৌরাণিক কঠোর সত্য হইতে আমাদিগকে বহু দূরে রাখিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আধুনিক বৃদ্ধগণের সংসারে আসক্তি, তাই তিনি বলিয়াছেন :—

মনুর শাস্ত্র শুধ্‌রে দিয়ে
নতুন বিধি করব জারি—

বুড়ো থাকুন ঘরের কোণে,
পয়সা কড়ি করুন জমা --
দেখুন বসে বিষয় পত্র
চালান মামলা মোকদ্দমা ;—
ফাল্গুন মাসে লগ্ন দেখে
যুবারা যাক্ বনের পথে,
রাত্রি জেগে সাধা সাধন,
থাকুক রত কঠিন ব্রতে।

জীবনের যে অংশ বানপ্রস্থের জন্য নিরূপিত হইয়াছে, বৃদ্ধেরা তাহা নানা বাজে কাজের সমালোচনায় অতিবাহিত করেন :

আবার সত্য প্রকাশের উপরও তাঁহার কৌতুক! আজ তাঁহার এমন ধারা কেন? বেদনা স্বীকারের মধ্যে কৌতুকের আবরণ দিয়া লজ্জার প্রকাশ। সকল অকাজের বেদনা নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া নিয়া, পরকে নিষ্কৃতিদান তাঁহার হয় তো উদ্দেশ্য। এই কৌতুক প্রত্যাহার করিবার ছলে আবার বলিতেছেন—

চিত্ত দুয়ার মুক্ত রেখে
সাধু বুদ্ধি বহির্গতা—
আজকে আমি কোন মতেই
বল্‌ব নাক' সত্য কথা।

ইহাই ব্যথিত জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা। এই যে ভূরি ভূরি অকাজের উদাহরণ সারা জীবনে লক্ষিত হইতেছে তাহা অসত্যের গণ্ডীর মধ্যে ফেলিয়া তৃপ্তি লাভ করিবার একটি ব্যর্থ প্রয়াস। আবার সেই ছন্দেই একখানি অতি খাঁটি কথার প্রকাশ দেখিতে পাই। কৌতুকের মধ্যে খাঁটি কথার ধ্রুব সত্যের প্রকাশ বড়ই সুন্দর এবং মর্ম্মস্পর্শী। হিন্দুধর্ম্মের প্রাণের কথাই আমরা এখানে দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথের সারা কাব্যের মধ্যেও কিসের একটা অনুভূতি পলকে পলকে তাঁহার হৃদয় ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাঁহার কাব্যকে অমৃতময় করিয়া তুলিয়াছে। এই অনুভূতি তাঁহার 'ধর্ম্মের', ধর্ম্মের শাসনেই 'পতিতা' ও পবিত্র। এই ধর্ম্মের ভিতরেই তাঁহার মহান্ আদর্শের আবির্ভাব; তিনি এই আদর্শেরই অনুগত, সর্ব্ব ভ্রান্তি-ক্লান্তির মধ্যেও সেই মহানের স্মৃতি জাগ্রত—

হে প্রেয়সী স্বর্গদূতী
আমার যত কাব্য পুঁথি
তোমার পায়ে পড়ে স্তুতি
তোমারি নাম বেড়ায় রটি,—
থাক হৃদয় পদ্মটিতে—
এক্ দেবতা আমার চিতে!—
চাই না তোমায় খবর দিতে
আরো আছেন ত্রিংশ কোটি—

ইহাই একেশ্বরবাদ। কোটি কোটি দেবতার ভয়ে এবং রোষের আশঙ্কায় আমরা সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত ও সশঙ্কিত রহি, আজ হয় তো হঠাৎ জাগরণের আলোকে মনসা শীতলার রোষের আশঙ্কায় ভ্রূক্ষেপ না করিতে পারি কিন্তু আমাদের মজ্জাগত দুর্ব্বলতা সহজে ও স্বল্প সময়ে অপনীত হইবে বলিয়া মনে হয় না। তা' যাক্, আজ নবযুগের পথে, ধর্ম্ম-যুগের পথে আমরা নিখুঁত জিনিষ খুঁজিয়া লইব না কেন? আজ প্রাচীন যুগের কোটি কোটি দেবতার কাহিনী ভুলিয়া যাইব। সেই বিবিধ শক্তিগুলিকে পরমাত্মার বিচিত্র লীলার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিব, তাই কবি বলিয়াছেন,—

ত্রিভুবনে সবার বাড়া,
একলা তুমি সুধার ধারা
উষার ভালে একটি তারা,
এ জীবনে একটি আলো!

আজ 'সময় বুঝিবার দিন' আসিয়াছে; আজ 'তুচ্ছ কথা' ভুলিয়া যাইব। 'কোটি কোটি তারার' সন্ধান লইবার অবসর আজ নাই।

তার পর সত্যের পথ ছাড়িয়া একটুখানি কৌতুকের পথে অগ্রসর হইবার প্রয়াস। এখানে আধুনিক কবিত্ব শক্তির বিকাশ স্থলের কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা পাইতে পারি। যদিও কবি এই খানে নিজেও ততটা কবিত্বের শ্রেষ্ঠতম সোপানের কথা আলোচনা করেন নাই, তথাপি সাধারণের রুচির বেশ একটা আভাষ পাওয়া যায়। বড় বড় তথাকথিত টীকিধারী পণ্ডিতদের নস্য কৌটার মধ্যে যে আধুনিক কবিত্ব-পদ্ধতি ততটা স্থান লাভ করিয়া উঠিতে পারে না, তাহা তাঁহার 'তথাপি' কবিতার প্রথমাংশেই দেখিতে পাই। 'বিষ্ণেরত্ন' পাড়ার' নামেই অমনি—

গান তা শুনি গুঞ্জরিয়া
গুঞ্জরিয়া কহে—
নহে, নহে নহে !

এই 'নহে'র কৈফিয়তও আবার দিয়াছেন। এই খানে শুধু কৌতুক প্রকাশ নহে, নিখুঁত সত্যেরও প্রকাশ। আজকাল গান সাহিত্যের অভিনব ক্ষেত্রে নামিয়া অভিনব বৈচিত্র্য সমাবেশে, কাহাদের হৃদয়-সামগ্রী হইতে পরিয়াছে, তাহার পরিচয় দানই বোধ হয় 'তথাপি' কবিতার উদ্দেশ্য। কবি গানকে লইয়া সাহিত্য-প্রিয় নবীন ছাত্র মহলে এবং কাব্য রসিকা কুল বধূর অন্তঃপুরে গিয়াছেন। কিন্তু গান সেইখানে পূর্ণস্বস্তির আশ্বাস করিতে পারে নাই। তবে গানের ঈপ্সিত স্থান কোথায় ? তবে কোথায় তাহার শুভ ও সফল যাত্রা ?

যেথায় সুখে তরুণ যুগল
পাগল হয়ে বেড়ায়,
আড়াল বুঝে আঁধার খুঁজে
সবার আঁখি এড়ায়,
পাখী তাদের শোনায় গীত,
নদী শোনায় গাথা,—
কত রকম ছন্দ শোনায়,
পুষ্প লতা পাতা,—

এই খানে এই কৌতুকের অবসান। তারপর মানব-চরিত্রের অসামঞ্জস্যের ব্যাপার। এ অসামঞ্জস্যের মধ্যে, সত্যের মাঝে ডুবিয়া রহিয়া, সকলের স্বভাব-বৈচিত্র্যের অনেকাংশ ছাটিয়া বিশ্বপ্রেমের বিকাশের ছায়াও আমরা কিঞ্চিৎ দেখিতে পাই। সেই আলোচনার প্রসঙ্গে আরেকটি মজার কথাও আছে। কথাখানির আবরণটি কৌতুকের, গর্ভে গভীর সত্য ; আবার ইহার মধ্যেই কবির জীবনের বেদনার ইতিহাস—

নিজের ছায়া মস্ত করে,
অস্তাচলে বসে বসে
আঁধার করে তোল যদি
জীবনখানা নিজের দোষে.

বিধির সঙ্গে বিবাদ করে
নিজের পায়েই কুড়োল মারো !

নিজকে সরল করিয়া, উদার করিয়া, বিশ্বের অনন্ত ছন্দের সহিত যোগ করিয়া দিতে পারিলে "সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি"। মানব-প্রকৃতির হাতে গড়া হইলেও তাহাদের ব্যক্তিগত চরিত্রের সামঞ্জস্য সম্ভবপর নয়, তবুও নিজের ভিতর আত্মার আলোখানি জ্বালিয়া দিলে জগতের তফাৎ ম্লান হইয়া যাইবে, মনের এইখানেই বিশ্ব-প্রেমের প্রকাশ। এই কৌতুকাচ্ছন্ন সত্যের মাঝেই আবার পরমাত্মার প্রতি আকুল আহ্বান, গভীর অনুরাগ পাইবার আকুল আকাঙ্ক্ষা। এইখানেই আমরা কৌতুকের মধ্য দিয়া 'গীতাঞ্জলি' 'নৈবেদ্যের' ভাবই যেন পাই—

তুমি যদি আমায় ভাল না বাসো
রাগ করি যে এমন আমার সাধ্য নাই ;

* * * *

স্তুতির চেয়ে আসনটিতেই আমার অভিরুচি।

'কবির বয়সে' রবীন্দ্রনাথের ভাবনা নিজের জন্য নহে, সারা বিশ্বের মুক্তির জন্য। আবালবৃদ্ধবনিতার শত-সহস্র ভাবনারাশি কবির অন্তরে ফুটিয়া রহিয়াছে ; শত সহস্রের মনোবেদনা কবির বীণার সুরে জড়িত আছে। তাই এই 'সুন্দর ভুবনে' তিনি মরিতে চাহেন না, কিন্তু 'পরকাল' যদি একান্ত 'না ছোড় বান্দা' হয়, তবে বিশ্বের প্রতি তাঁহার বাণী কি ?

চল্‌ছে যেমন চলুক্ তেমন
হঠাৎ যেন গান না থামায়।

তারপর তিনি এই বিশ্ব-সংসারে নিজের ছায়াকে ছোট করিয়া ধরিয়া, নিজের কর্ম-প্রেরণাকে ব্যর্থ প্রয়াসের অবসানে ক্লান্তির দৈন্য হেতু অগণ্য ভাবিয়া ত্রুটি স্বীকার-রূপ আনন্দ পাইয়াছেন। তিনি আনন্দময়ের আনন্দ রাজ্যে আসিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন, তাই—

আজ যে বসে গান শোনাব
কথাই নাহি জোটে,
কণ্ঠ নাহি ফোটে !

* * * *

ইহা যেন অনেকটা ক্লান্তিরই ছায়া এবং ইহাতেই কর্ম-প্রেরণার শৈথিল্যের অবতারণা ; কিন্তু তাঁহার বাস্তব জীবনে শৈথিল্যের নিতান্তই অভাব। তাঁহার

'ভীরুতা' কবিতাখানি কবি-হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয়। আবার তিনি নীরবও নহেন; নিজের থলি ঝুলি লইয়া জগতের কাছে ব্যথার ভাগী হইবার জন্ম উপস্থিত, এই ভীরুতা কি তাঁহার প্রকৃত ভীরুতা? না, ইহার ভিতর কবির অন্তর্জীবনের বাণী রহিয়াছে? তিনি পরের ব্যথার বোঝা নিজের বুকের উপর টানিয়া নিয়া পরকে নিষ্কৃতি দিবার আয়োজনে আছেন। এইখানেই কবি-জীবনের সার্থকতা। এই কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

গভ স্বরে গভীর কথা—
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই;
মনে মনে হাস্‌বি কিনা
বুঝ্‌ব কেমন করে?

এই কবিতাখানির বিশিষ্টতা আমি আর আলোচনা করিব না। পাঠক ইহার বিশিষ্টতা ও মাধুর্য্য অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'ক্ষণিকা'র এইখানে নূতন করিয়া আরম্ভ। নূতন নূতন ভাবের সমাবেশে 'ক্ষণিকা' অমৃতময় হইয়া উঠিয়াছে, এই আনন্দের বা অমৃতের ধারা শুধু সাহিত্যের হিসাবে কেন, ব্যক্তিগত জীবনেও বড় কম নহে।



উপন্যাস

দ্বিতীয় খণ্ড

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

আমি যে ডাক্তার, ধরা পড়ে গেল আমার পকেট থেকে বুক পরীক্ষা করার যন্ত্রের নলটা উঁকি মেরে থাকায়।

নীলিমার মুখখানা যেন আশায় প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। উঃ ভগবানের কি দয়া!

মাসী মা বল্লেন, নীলমণি, আজ কোন্ তিথি বল্ ত? আজ যেন আমার জ্বরটা একটু বেশী হবে। এখন থেকেই চোখ জ্বালা করচে।

নীলিমা পাজি দেখে বল্লে, তাই ত মাসী-মা, তোমার আন্দাজ ঠিক বটে—বেলা বারটার পরই পূর্ণিমা পড়েছে।

হাসপাতাল থেকে ফিরে আস্‌তে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। নীলিমাকে কথা দিয়ে গিয়েছিলুম যে, এসে দেখে যাবো, মাসী-মা কেমন থাকেন।

জ্বর তখনো কমে নি। জ্বরের অবস্থায় মাসী-মা কেবল ঘুমোতে থাকেন।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবার সময় নীলিমা জিজ্ঞাসা করলে, তাহলে এখন কোথায় যাবেন?

যাবো আর কোথায়? খানিকটা সমুদ্রের তীরে ব'সে—তারপর বাসায় ফিরবো।

আচ্ছা আপনি যান— আমি কাজ সেরে পারি ত যাবো। বলে, সে তাড়াতাড়ি ফিরে গেল।

কি জানি কেন, সমুদ্রের তীরে একলা ব'সে থাক্‌তে ভালো লাগ্‌লো না সে দিন। কেবলই ফিরে ফিরে দেখ্‌চি—এখনো ত এলো না! একটু যেন অধৈর্য্য—আবার তার সঙ্গে কুণ্ঠা; মনে মনে নিজের উপর রাগ করলুম। আবার হাসিও এলো।

ঢেউ ওঠার এক শব্দ— পড়ার আর এক শব্দ--ঢেউ ভেঙ্গে যাওয়ার শব্দ অন্য—মাটিতে শেষকালে ছ'ড়িয়ে পড়ার শব্দ ভারি করুণ! একই জল—কত বিভিন্ন প্রকারের ধ্বনিতে আকাশ পূর্ণ ক'রে তুল্‌চে!

ঢেউগুলো যেন মানুষের মনের অভিলাষ; সাম্‌নে পেছনে, উঁচুতে নীচুতে —তারা দুল্‌চে—দুল্‌চে;—তাদের ব্যথার ধ্বনিতে মনের তারগুলো নানা সুরে বেজে-বেজে উঠ্‌চে। শেষকালে আর না পেরে উঠে মাটিতে ছড়িয়ে প'ড়ে ফেণার-ফুলের অর্ঘ্য রচনা ক'রে বল্‌চে—আর যে পারি নে ওগো—আমাকে আশ্রয় দাও।

ফেণার ফাঁকে জলের মধ্যে চাঁদ এসে উঁকি মার্‌তে লাগ্‌লো।

নীলজলের মধ্যে চাঁদকে চাঁদ বলে মনে হয় না, খানিকটা গলা-রূপো অবিশ্রাম তল-উপর করচে! ফেণাগুলো যেন সেই রজত প্রস্রবণের বুদ্বুদ্! অবাক্ হয়ে তাই দেখ্‌চি—এমন কতক্ষণ দেখেছি জানি নে,--হঠাৎ পিছন থেকে কে আমার দু'চোখ চেপে ধরলে।

চোখ-চাপার কায়দা, যতক্ষণ না নাম বল্‌তে পারা যায় ততক্ষণ রেহাই নেই। আমি চুপ ক'রে সরু আঙুলগুলির উষ্ণ-স্পর্শ অনুভব ক'রে টিপি-টিপি হাস্‌তে লাগ্‌লুম। রেহাই চাই নে।

সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে নীলিমা বল্লে, তুমি ভারি দুষ্টু।

কেন?

নাম বল্লে না কেন?

কার নাম বল্‌বো?

যে ধ'রেছিল।

যদি ভুল হতো?

ও বাবা! তুমি এত সাবধানী?—ভুল হতো ত' হতো;--কি তাতে এসে যায়?

সে পায়ের কাছে ব'সে প'ড়ে বল্লে,—মনে মনে খুব রাগ ক'রছো বোধ হয়?

রাগ কেন ক'রবো—কি এমন হয়েছে?

বাবা—হয় নি আবার! আমার মত একটা অপদার্থ লোক—তোমাকে এমন তিক্ত বিরক্ত ক'রে তুলেচে—কি গম্ভীর মানুষ তুমি!

গম্ভীর? গম্ভীর কোথায়?

তা জানি নে;—যদি অপরাধ ক'রে থাকি, মার্জ্জনা ক'রো।—আমি আর তোমার সঙ্গে সভ্যতার আদপ-কায়দা রেখে চল্‌তে পারবো না। 'আপনি মশাই'কে ঐ সমুদ্রের জলের মধ্যে বিসর্জ্জন দিলাম!

নীলিমা খুব হাস্‌তে লাগ্‌লো—তার চোখ দুটোয়, মুখের প্রতি রেখার রেখায় সরল-আনন্দ যেন নিমেষে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো।

কি? কথা কইচ না যে?

শুন্‌চি।

অন্য লোকের কি শোনার ইচ্ছা হয় না?

সংক্ষেপে বল্লুম, হয় ত।

তবে?

ইচ্ছা হলেই কি পূর্ণ হয়? অনেক তপস্যা করলে তবে ইচ্ছার দেবতা প্রসন্ন হন।

তপস্যা কি ক'রে করতে হয়?

তা কি আমি জানি?

পিছন থেকে কে একজন বলে উঠ্‌লো, নালি, আমি জানি, তোকে শিখিয়ে দেব।

নীলিমা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বল্লে, কে ইলা-দি, এসো এসো—একজন নতুন লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দি।

আমার বুকটা কেমন দুদ্‌দুড় করতে লাগ্‌লো।

ইলা এগিয়ে এসে আমার সাম্‌নে দাঁড়াল। একটি ছোট্ট হাসি—সেই জ্যোৎস্না-লোকে তার মুখটি বিকচ ক'রে দিয়ে গেল।

তুমি? চিন্‌তে পারো কি?

ইলা সে দিন গাউন ছেড়ে সাড়ি প'রেছিল।

বল্লুম, আজকেই ঠিক চিন্‌তে পেরেছি ইলা, সেইদিন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারি নি।

আশ্বস্ত হলে ?

আমি নির্ব্বাক বিস্ময়ে ইলার দিকে চেয়ে রইলুম। নীলিমা একটু অপ্রতিভ হয়ে দূরে সরে গেল। পরিচয় করিয়ে দেবার যখন প্রয়োজন নেই—তখন আর কোন প্রয়োজনই নেই বুঝি!

জানি নে ইলার কি হয়েছিল। আমার সমস্ত মনটা যেন দুমড়ে দুমড়ে একটা ব্যথার মৃদু স্পন্দনে মোচড় খেতে লাগ্‌লো!

অনেক দিনের পরে দেখা। অনেক আবরণ ভেদ ক'রে—উন্মুক্ত আকাশের তলায়—সমুদ্রের উতলা বাতাসে- মনটা বার হয়ে এসে অকস্মাৎ কাঁপতে লাগ্‌লো। চাঁদের আলো যেমন ক'রে জলের উপর কাঁপে!—ঢেউ গুলোর দুষ্টুমির আর অবধি নেই!

ইলা এগিয়ে গিয়ে একটা বেঞ্চের উপর ব'সে ডাক্‌লে, নীলি, এ-দিকে আয়। নীলিমা গিয়ে তার বাঁ দিকে বসলো। আমি চুপটি করে দূরে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলুম।

তোর মাসী কেমন রে ?

আজ্ঞে জ্বর হয়েচে।

বাঃ! তোর আক্কেল ত' খুব!—তাঁকে একলা ফেলে পালিয়েচিস ?

কুশল আছে।

সে ত ছেলেমানুষ।

নীলিমা আর কোন কথার উত্তর দিলে না।

কি জানি-কেন, বাড়ী ফেরার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে জেগে উঠলো; বোধ করি তাই ধীরে ধীরে সরে আস্‌ছিলুম—হঠাৎ পিঠের উপর একটা প্রচণ্ড ধাকাতে বুঝতে পারলুম যে, এক অসুরের পাল্লায় পড়েছি।

বজ্রকণ্ঠে সায়েব বল্লে, তোমার এখানে দাঁড়িয়ে থাকা একান্ত সন্দেহ-জনক এবং আমি ঘোরতর আপত্তি করি।

ফিরে বল্লাম, জান্‌তে পারি কি—কিসের আপত্তি ?

কালার কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়াকে ঘৃণা করি।

বল্লুম, মনে করি যে, আমি আমার অধিকারের মধ্যেই আছি—তার এক চুলও ব্যতিক্রম হয় নি। তোমার ধাকা দেওয়াটা সম্পূর্ণ অভদ্র ব্যবহার বলেই মনে করি।

তোমার মনে করা আর আমার কুকুরটার মনে করাকে, আমি এক মনে করি।

তেমন মনে করে নেওয়াও সকলের পক্ষেই সহজ—

সায়েব সুরার উত্তেজনায় অতিরিক্ত গরম ছিল। হঠাৎ ঘুঁসি বাগিয়ে অগ্রসর হয়ে এলো।

বল্লুম, সাবধান, প্রথমবার ক্ষমা করেছি কিন্তু মনে করি, সে ক্ষমা পাবার উপযুক্ত পাত্র তুমি নও।

একটা ঘুঁসি এসে আমার বুকের উপর পড়ল। তারপর?—সে না বলাই ভাল।

সমুদ্রের বালির উপর সম্মুত্ত মূর্ত্তি সশব্দে পড়ে গিয়ে বল্লে, বাস্—খুব হয়েচে, আর না।

ইলার হাসির লহর তীক্ষ্ণ-তীব্র বিদ্যুতের মতই সমুদ্র গর্জ্জনের নিবিড় শব্দ পুঞ্জকে যেন নিমেষে খণ্ড-খণ্ড, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে গেল! সে হাত-তালি দিয়ে বল্লে, ব্রাভো, কিুটো, ক্যাপিট্যাল্—

সাহেব ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে বল্লে, এ বাবুর ধারের কারবার নয়—হাতে-হাতে নগদ বিদায়—আমার দিকে ফিরে বল্লে, থ্যাঙ্কিউ বাবু—গুড্-নাইট—

ইলা চেঁচিয়ে বল্লে, নো গুড নাইট নাউ—কিরণ, যেও না।

ইলা বাংলাতেই কথা বল্‌তে লাগ্‌লো, নিকু, এই কিরণ আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

সাহেব আমার কর মর্দ্দন করে বল্লে, হামি হত্যন্ত খুশী হই—হাপ্‌নি হণ্টর‍্যাঙ্গো বন্ধু শুনিয়া।

ইলার দিকে ফিরে বল্লে, ওয়েল হিলা, হাণ্টর‍্যাঙ্গো মানে জানতে পারে? হাণ্টো মানে—শেষ; র‍্যাঙ্গো মানে খুশী—তার মানে শেষ-খুশী—ইয়েস, আই নো ইট্—ইট্ মিন্স,—পুরাতন বন্ধু।

সাহেবের অর্থ বিশ্লেষণ শুনে নীলিমা হেসে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো।

তার দিকে ফিরে সায়েব বল্লে, তোমাকে খুশী করে—আমি খুশী হই।

ইলা আমার দিকে ফিরে বল্লে, আর নিরীহ লোককে ঘুঁসি মার। বৃহস্পতিটি!

তিঠান নবীন যুবাটি নয়। রংটা দেশের হিসাবে যথেষ্টই ফর্সা; কিন্তু একজন সাহেবের তুলনায় বেশ মাঠোহ বলা যেতে পারে। নাকটা খাড়া—চোখ দুটো নীলাভ পাট্‌কিলে।

সে গিয়ে বিনা বাক্য-ব্যয়ে নীলিমার পাশে ব'সলো। ইলা আমাকে তার পাশে ব'সতে ইঙ্গিত করলে—বল্লুম, থাক্‌গে, মানুষকে অযথা ক্ষিপ্ত করায় কোনও লাভ নেই।

কি ব'লচো কিরণ? ও ত' নীলির পাশে বসতে পারে—আর তোমার বসাতে আপত্তি হবে?

হেসে বল্লুম, তাই ত মনে করি ইলা—এখনি যে ঘটনাটা ঘটল—তা থেকে এমনটি মনে কি করা যায় না?

নেশার ঝোঁকে অমন করেচে। আমার সাম্‌নে ও কেঁচোটি। তা ছাড়া যদি কিছু বেয়াদপি করে ত তুমি তাকে আবার শিক্ষা দিও, আমার তাতে সম্পূর্ণ সায় আছে।

বসে বল্লাম, রাত ত হচ্চে।

গম্ভীর ভাবে ইলা—হুঁ বলে' বল্লে, তা হলে বাড়ী যাও। তোমার পথ চেয়ে কেউ সেখেনে বসে নেই, তাও জানি।

কে-কার পথ চেয়ে থাকে ইলা, এ দুনিয়ায়?

তোমরা তার খবর রাখ কি? সুখের পায়রা—ধরা দিতে দেরি হয় না—আবার পালিয়ে যেতেও—

আমাদের দুজনের মনোযোগ জিঠানির কথা বার্ত্তায় ধাবিত হলো—সে ভাঙ্গা বংলায় নীলিমাকে স্ত্রী-পুরুষের চরিত্রগত পার্থক্যটা বুঝিয়ে দেবার চেষ্ট করছিল।

জিঠানি বলছিল,—পুরুষের মনটা সমুদ্রের জলের মত—সে মাটির পায়ের কাছে নিত্য আছাড় খেয়ে বলচে—ওগো তুমি প্রসন্ন হও, ওগো তুমি প্রসন্ন হও; কিন্তু মাটি কঠিন, মাটি শুনেও শোনে না, বুঝেও বোঝে না।

নীলিমা বল্লে, জল কি জানে না যে, মাটি কঠিন?

জানে, জানে,—খুব ভাল ক'রেই জানে।

তবে সে এ ব্যর্থ চেষ্টা করে কেন?

সত্যি বলচি, মিস্ রায়, ওইটেই আমি বুঝে উঠ্‌তে পারি নে।

নীলিমা বল্লে, মাটি কি এত কঠিন যে একটুও গলে না?

একটু আধটু বোধ করি গলে; কিন্তু জলের তাতে মন উঠে না।

আচ্ছা সাহেব, তোমাকে একটা প্রশ্ন করি, কিছু মনে ক'রো না। সমুদ্রের জলে যদি সব মাটি গলে যেত—তা'হলে কি জল খুশী হ'তো?

সায়েব অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগলো।

ইলা বল্লে, নীলি, তুই আর ওর মাথা গরম ক'রে দিস্ নি। ও সমস্ত রাত মদ খাবে আর পায়চারি করবে। তারপর শেষ রাতে ওর সেরা সিদ্ধান্তে এসে চীৎকার ক'রবে - হিলা - আই নো,—মিস্ রায় মাষ্ট বি এ জুয়েল।

নীলিমা বল্লে, সায়েব, আর ইলা-দি কি?

তাড়াতাড়ি উত্তর, গোলাপের গন্ধ পরিমল, মেঘের বিদ্যুৎ-প্রভা, হিরণ্ময় সুধাপাত্রে রক্ত ঝলমল, সদ্য-সুখ মত্ত মনলোভা!

বাপরে মূকং করোতি বাচালম্! . . . নিক্‌টো, এটা কি স্কুলে মুখস্থ করেছিলে?

না, না, আমি বোবা;—এ মদ কথা কইচে।

নীলিমা বল্লে, সায়েব, আচ্ছা বল ত তুমি আমার কে হও?

ভগ্নীপতি।

তোমার মনটা ত সমুদ্রের জল?

একেবারে।

তা হ'লে ঐ চাঁদের ছবিটা কি?

জানি, জানি,—বোলটে পারি না . . .

ইলা বল্লে, নিকো, বাড়ী যাও।

তুমি কখন যাবে?

আজ আমি নীলিদের বাড়ী থাক্‌বো।

বিশ্বাস হয় না।

তবে?

আবার সুর করে সায়েব বল্লে,জানি জানি . . . বোলটে পারি না।

জেনে না বলতে পারার মধ্যে দাম্পত্য জীবনের কতখানি অসুখ আর অশান্তি লুকিয়ে থাকে—তাই ভেবে ক্ষুব্ধ হ'য়ে পড়লুম্। ইলা এ কি করেছে? আর দুনিয়ার মধ্যে কি লোক জোটে নি!

জিঠানি যেন ক্রমেই অসুস্থ হ'য়ে পড়লো। বেশ বুঝতে পারা গেল যে, সোজা হ'য়ে বসে থাকা আর সম্ভবপর হচ্ছে না।

ইলা বল্লে, নিক্, ব্যাপার কি?

সেই বিশ্রী ব্যপাটা। . . . ভয় কর্‌চি রাত্রে তোমাকে জ্বালাতন কর্‌তে হবে—বুঝিবা ডাক্তারই ডাক্‌তে হয়।

ইলা আমার দিকে ফিরে বল্লে, কিরণ, তোমাকে একটু যে কষ্ট করতে হবে।

কি করবো?

একটা মরফিয়া ইঞ্জেকশন দিতে হবে,—তোমাকে আমাদের ওখানে যেতে হবে। ব্যবস্থা সব পাবে।

বেশ, চল তা'হলে।

ইলা জিঠানির হাত ধরে বল্লে, চল বাড়ী যাই।

সে ভাল ছেলের মত তার সঙ্গে চলতে লাগলো।

নীলিমা আমার কাছে এসে বল্লে, কাল আবার দেখা হবে?

কালকের কথা কালই জানে।

সে আমার হাত ধ'রে বল্লে, না। তুমি ঠিক করে বলে যাও যে, কালও আস্‌বে।

চেষ্টা করবো।

মাসী-মাকে দেখতে আস্‌বে না?

আস্‌বো বৈ কি।

কখন?

সকালে একটা খবর দিও; যদি প্রয়োজন হয় ত'—তখনি আস্‌বো, নইলে বিকেলে নিশ্চয়।

নীলিমা তাদের বাড়ীর মধ্যে চ'লে গেল। খান কয়েক বাড়ীর পরই ইলার বাড়ী।

একটা ইঞ্জেকশন দিতেই জিঠানি ঘুমিয়ে পড়লো।

ইলা বল্লে, কিরণ, কিছু খাবে?

এখনো ত' ভাল ক'রে খাবার ইচ্ছা হয় নি।

তবে একটা লাইমজুস সোডা দি?

দাও।

সোডার পাত্র নিঃশেষ করবার আগেই ইলা আমার কাছে এসে ব'সে বল্লে, কেমন লাগ্‌চে আমাকে?

বেশ।

কি চাপা-মানুষ তুমি! একটা কথা যদি তোমার মুখ দিয়ে বার করা যায়?

হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লুম, কথা মুখ দিয়ে বের ত' হয় ইলা; কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, তোমার মনের মত তা হয় না।

তুমি ভারি দুষ্টু হ'য়ে গেছ আজকাল, আমি কি তাই বলচি যে, তোমাকে আমার মন-রেখে কইতে হবে?

তবে কি চাইচ?

রাগ করে বল্লে, আমার মাথা আর মুণ্ডু।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটল।

নীরবতার দুঃসহতা কাটিয়ে দেবার জন্যই বোধ করি বল্লুম, বেশ বাড়ীটি তোমার।

সে বল্লে, হুঁ, তারপর? বেশ সুখে আছি, না?

সে কথা আমি ব'লব না। তুমিই ত বল্‌বে।

তোমার কি অনুমান হয়?

অসুখী হবার ত' কোন কারণ নেই ইলা। তুমি নিশ্চয়ই স্বেচ্ছায় এই সাহেবকে গ্রহণ করেছ। আমি যতদূর জানি, তোমাকে বাধ্য ক'রে কেউ কোন কাজ ত' করাতে পারে না। তোমার ঘর-দোর সাজ পোষাক দেখে ত' মনে হয় না যে, কোন অভাব তোমার আছে। তুমি সুখী, এ অনুমান যদি ক'রে থাকি ত' কি অন্যায় করেছি বল ত?

ইলা রাগ না ক'রে বল্লে, ডাক্তারির চেয়ে ওকালতি করলে তোমার চল্‌তি বেশী হতো কিরণ।

বল্লুম, এখন আর তার কোন উপায় দেখি নে, ইলা।

ইলা হাস্‌তে লাগ্‌লো—কি বাধ্য লোকটি আমার!

হঠাৎ সে কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়ে বল্লে, দেখ কিরণ—বড় অভাবের মধ্যে মানুষ-হওয়ার জন্যেই বোধ হয় টাকার ওপর কেমন লোভ আমার রয়েই গেল। ছেলে বেলা থেকে এই কথাই মনে ক'রে এসেচি যে, যার টাকা আছে—সে সুখকে তার দোরে বেঁধে রাখতে পারে; কিন্তু এখন বুঝচি, ভাল খাওয়ায় সত্যিকারের সুখ নেই- টাকা মানুষকে সুখ দিতে পারে না। ভোগে কেউ কখনো বড় হ'তে পারে না। মনের মানুষ নইলে কোন সুখ নেই।

বল্লুম, প্রতি মানুষই আলেয়ার আলো, ইলা। দূরে থেকে যা' মনে করি, কাছে এসে তার একটুও পাওয়া যায় না।

ও কথা আমি তোমার মান্‌তে চাই নে, কিরণ। আমায় ক্ষমা ক'রো—আজ বাধা নেই—তাই বল্‌চি, যদি তোমাকে—

বারান্দা থেকে নীলিমা জিজ্ঞাসা করলে, ইলা-দি, তোমার সাহেব কেমন?

ঘুমিয়েছে।

ডাক্তার বাবু কি চলে গেছেন?

না। কেন?

কিছু না—আমি খবর নিতে এলুম। যাচ্ছি।

ইলা তাকে ডাক্‌লে না।

বল্লুম, ইলা, যে কথা ব'লে কোন ফল নেই—তা না বলাই ত' ভাল।

ফল নেই কেমন ক'রে জান্‌লে তুমি?

আমি চুপ ক'রে রইলুম।

তুমি জান? নিভৃতে তোমার নাম ক'রে আমার সমস্ত প্রাণ তৃপ্তিতে ভ'রে যায়?

চুপ ক'রে তার দিকে চেয়ে ব'সে রইলুম।

সে বল্লে, মানুষের মনের এক জায়গা আছে—যেখেনে বোধ করি ভগবানের কথাও চলে না। সেখেনে নীতির উপদেশ কালা—ব্যর্থ হয়ে যায়।

ইলার গলা ভারি হয়ে গেল। বোধ করি, দু' এক ফোঁটা জলও চোখ থেকে পড়লো।

সে সাম্‌লে নিয়ে বল্লে, অনেক দুঃখে মনে করলাম রামায়ণ-মহাভারত পড়লে বুঝি কিছু সান্ত্বনা পাবো—পোড়া কপাল আমার, সেখেনেও ঐ সেই কথা!

মনে করলাম সাবিত্রীর উপাখ্যান পড়লে যদি মনের জোর পাই। কি ক'রেছিল সাবিত্রী? সে ত' মৃত্যুকে বরণ ক'রে নিতে পিছ-পা হয় নি। বাপের কথা না শুনে, স্বয়ং ব্রহ্মর্ষি নারদের কথা না মেনে—সত্যবানকে নিলে!

বল্লুম, মন কি সত্যই ফেরান যায় না?

উপদেশ?

না, জিজ্ঞেস্ করচি শুধু।

তোমরা মহাপুরুষ, তোমরা পার; কিন্তু আমি তা পারি নি—পারবোও না।

ঘড়িতে দশটা বাজলো। আমি দাঁড়িয়ে উঠে বল্লাম, রাত হলো এখন।

ইলা বল্লে, তোমাকে ত' কেউ শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে নি।

হাস্‌তে হাস্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম; সিঁড়িতে নামবার সময় পিছন ফিরে চেয়ে দেখলাম—প্রদীপ্ত আলোতে ইলার সবাষ্প চোখ দুটো ঝক্ ঝক্ ক'রে জ্বলচে।

আমাকে এগিয়ে দিতে সে এক পাও অগ্রসর হ'লো না। যেন দেখ্‌তে পেলুম, তার মনটা বজ্র কঠিন হয়ে একেবারে অচল হ'য়ে গেছে।

মুক্ত আকাশের তলায় এসে দাঁড়িয়ে বল্লুম, ভগবান শুনেচি তুমি ত সব পার, তুমি মরুভূমিতে তুষার শীতল নির্ঝরের ধারা বওয়াতে পার, সমুদ্র গর্ভে আগুন জ্বলে, সেও ত তোমার ইচ্ছায়! আমার অজ্ঞান-কৃত অপরাধ মার্জ্জনা কর, প্রভু! ইলার মনকে নবীন-অনুরাগে পূর্ণ ক'রে তার স্বামীর দিকে ফিরিয়ে দাও।

মাথার উপর দিয়ে সমুদ্রের বাতাস হা হা ক'রে হেসে চলে গেল। মনে হলো, উদ্দাম বাতাস আমার এই প্রার্থনা, যেন ইপ্সিত স্থানে পৌছতে দেবে না।

নির্জ্জন পথে একলা চলেছি। একদিকে ক্ষুব্ধ সমুদ্র—ডেঙ্গার উপর এসে আছড়ে প'ড়ে তার মনের কামনা-বাসনাগুলোকে পৃথিবীর পায়ের উপর, ফেণা ক'রে, বাষ্প ক'রে দিয়ে ব্যথার অঞ্জলি নিবেদন করচে! মাথার উপর শান্ত চাঁদ—সমুদ্রের অশান্তি দেখে, অবাক নিস্পন্দ নেত্রে চেয়ে বল্চে—একি—একি!

চম্‌কে উঠে ফিরে দেখি—নীলিমা চুপটি ক'রে দূরে দাঁড়িয়ে হাস্‌চে।

ফিরচ?

রাত অনেক হয়েচে—আর বাইরে থেক না নীলিমা।

সায়েবের খবর কি?

আফিমের নেশায় ঘুমোচ্চে।

আর ইলা দি?

ঘুমোয় নি এখনো।

তবে চলে এলে যে?

সেখেনে রাত্তির কাটাবার কথা ব'লছিল না।

কি খেলে?

বিশেষ-কিছু নয়।

একটু-কিছু খাও না। ক্ষিদে পায় নি?

থাক্, বাড়ী গিয়ে খাব।

নীলিমা ছুটে এসে আমার হাত ধরে ফেল্লে—আমি তাড়াতাড়ি স'রে গিয়ে বল্লুম, কে দেখ্‌তে পাবে আবার।

অত্যন্ত অবজ্ঞা ভরে বল্লে, দেখুক্ গে . . . না, তোমাকে খেতেই হবে—আমি যে তোমার জন্য খাবার তৈরি করেছি।

কেন মিছামিছি কষ্ট করতে গেলে?

সে আর কোন কথা না ব'লে বাড়ীর দিকে চ'লে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে গেল।

আমি বিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

— ক্রমশঃ

দ্বিজেন্দ্র-প্রয়াণ

শ্রীগোপাললাল দে

খুলেছিলে তোমরা কবে দেশী মেলার দ্বার,
গেয়েছিলে আদি বোধন-গান ;
সে আজ সবাই ভুলেই গেছে, বহু কালের পরে
প্রতিধ্বনি কোথায় অবসান।
তার পরে আজ গত হল কত বরষ মাস,
ঝঞ্চা বয়ে গেল দেশের বুকে ;
স্বদেশসেবী দেশবাসীরা বীরতনুজের মত,
অকাতরে সইল হাসি মুখে।
কেউ বা গেল কয়েদখানার বদ্ধ কারাগারে,
কেউ বা চালান গেল দ্বীপান্তরে ;
অকাতরে প্রাণ দিলে কেউ বীর শহীদের মত,
হাসি মুখে সবাই মায়ের তরে।
ছাড়লে কেহ রাজার বিত্ত রত্ন আভরণ,
সন্ন্যাসী-সাজ অঙ্গে নিল টানি ;
জয়ধ্বনি জগৎ জুড়ে উঠলো বারে বার
ধ্বনির আবার উঠলো প্রতিধ্বনি।
আমরা মানুষ, সামনেটারেই বড় ক'রে দেখি,
দেখি নাক' কি আছে তার মূলে ;
তাই ত মোরা এ দেশ-প্রীতির আদি গুরুর দলে
একেবারে গে'ছি সবাই ভুলে।
ভাবায় তুমি যা দিয়েছ প্রথম একেবারে,
মহাজনের পদ-রেখার মত ;
সে সব রেখাই লক্ষ্য করে' এল বাণীর ঘরে,
স্ব-বৈতালিক কবি শত শত।

দর্শনেতে যা দিয়েছ বাংলা দেশের নহে,
জগৎ-মাঝে পাবে সে সব স্থান ;
স্বদেশ-প্রেমী দার্শনিকের অগ্রগামী কবি
দরদিয়া গাইলে প্রাণের গান।
কিন্তু তাত! চিত্ত মোদের মুগ্ধ যাহা হেরি,
সে যে তোমার আত্মা গরীয়ান ;
উর্দ্ধ-রেতা মহা-ঋষির শুদ্ধজ্ঞানের মত
বরেণ্য সে চিত্ত বরীয়াণ।
শান্ত তপোবনের তরু স্নিগ্ধ ছায়া-তলে,
যোগীর মত সাধন-শিলাসনে ;
দূরের পানে বিছিয়ে দিয়ে শান্তি-করুণ দিঠি
থাকতে বসি যখন আপন মনে ;
ব্যাকুল বায়ু, আকাশ আলো, ধ্বনি প্রতিধ্বনি,
তোমার কাছে আসত চরাচর ;
দিগন্তরের মনের কথা বনের ব্যথা নিয়ে,
তোমার কাছে আসত সরাসর।
কাঠ-বিড়ালী নাচ্‌তো সুখে তোমার পায়ের কাছে,
পাখীগুলি কইত প্রাণের কথা ;
পিপড়ে মাছি মৌমাছিরাও আস্‌ত প্রেমের ডাকে
এমন প্রেমের ডাক শিখিলে কোথা!
আকাশ আলো জড়িয়ে সবায় ধরত নিবড় সুখে,
পশু পাখী আস্‌ত তোমার আগে ;
এমি নিবড় প্রেমের ডোরে বিশ্ব বেঁধেছিলে,
এই কথাটা বড়ই ভাল লাগে!
তাই ত আজ কাঁদছে যাদের বাস্‌তে তুমি ভালো,
কাঁদে আজি পশু পাখীর দল ;
আঁচল-কোণে বাঁধা মাণিক হারিয়ে ফেলে যেন,
দেশমাতা আজ ফেল্‌ছে চোখের জল।



শ্রীরম্যাঁ রলাঁ

(শ্রীকালিদাস নাগ ও শ্রীমতী শান্তা দেবী অনূদিত)

অভিনয়ের পর ঠাকুরদাদা ও নাতি ছুটি এক-বয়সী শিশুর মত রাতে বাড়ী ফিরিতেছিল। কি সুন্দর রাত্রি! কি স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না! দুজনে নীরবে হাঁটিতেছে এবং অভিনয়ের স্মৃতিগুলি মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতেছে। শেষে বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল :

কি রে ক্রিসতফ্, ভাল লাগল?

ক্রিসতফ্ জবাব দিতে পারিল না, ভাবের আধিক্যে সে এখনও যেন জড়সড়; পাছে মধুর মোহ টুটিয়া যায়, সেই ভয়ে সে কথা কহিতে পারিল না; বহু কষ্টে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া নীচু গলায় সে শুধু বলিল, হাঁ দাদামশাই।

বৃদ্ধ একটু হাসিয়া কিছু পরে বলিয়া যাইতে লাগিল :

দেখেছিস্, ক্রিসতফ্, সঙ্গীত জিনিষটা কি অপূর্ব্ব! ঐ সব কত অদ্ভুত মানুষ, কত বিচিত্র দৃশ্য সৃষ্টি করা—এর চেয়ে বড় শক্তি আর কি আছে? এ যে পৃথিবীতে ভগবান হওয়া!

বালকের মনে এই কথাটি বাজিল। কি, একজন মানুষ ঐ সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছে! সে ত এ কথা স্বপ্নেও ভাবে নাই! তাহার মনে হইয়াছে যেন সমস্তই নিজে নিজে ফুটিয়া উঠিয়াছে, যেন সব প্রকৃতিরই লীলা। কিন্তু সংগীত এ যে একজন মানুষের—একজন সুরস্রষ্টার সৃষ্টি। সে ত একদিন ঐ রকম ওস্তাদ হইতে পারে! আঃ যদি এক দিন—শুধু এক দিনের জন্য সে হইয়া পড়ে! তারপর . . . তারপর যাহা ইচ্ছা হোক্—এমন কি মরিতেও সে রাজী! সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল :

কে ঐ সব রচনা করেছে দাদামশাই ?

বৃদ্ধ রচয়িতার নাম বলিল ; হাস্লেয়ার একজন তরুণ জার্ম্মাণ শিল্পী, বার্লিনে বাস করেন, এক সময়ে তাঁর সঙ্গে বৃদ্ধের আলাপ ছিল। ক্রিস্তফ্ সব খবরগুলি যেন গিলিতেছিল ; হঠাৎ বলিয়া উঠিল :

আচ্ছা তুমিও পার দাদামশায় ?

বৃদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল : কি ?

ঐ রকম রচনা তুমিও করতে পার ?

নিশ্চয়—বৃদ্ধ জবাব দিল, কিন্তু কণ্ঠে একটু বিরক্তি !

চুপ করিয়া খানিকটা হাটিতেই বৃদ্ধ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। তাহার জীবনের একটি গভীরতম বেদনা ঐখানেই ! নাট্য-সঙ্গীত শিখিবার ইচ্ছা তার আজীবনের, কিন্তু প্রেরণার অভাব সে সাধে বাদ সাধিয়াছে। তাহার বাক্সে দু'একটা অঙ্ক লেখাও আছে কিন্তু তাহার মূল্য সম্বন্ধে বৃদ্ধের কোন আত্ম প্রতারণার অবকাশ ছিল না, সেজন্য বাহিরের বিচার-বৈঠকে সে নিজের রচনা-গুলিকে কখনও আনিতে পারিত না।

বাড়ী ফেরা পর্য্যন্ত আর দুজনে কোন কথা হইল না। দু'জনের একজনও ঘুমাইতে পারিল না। বৃদ্ধের মন যেন কিসে উতলা হইয়াছে ; শান্তির জন্য সে বাইবেলের আশ্রয় লইল। ওদিকে ক্রিস্তফ্ বিছানায় পড়িয়া সন্ধ্যার উৎসবের যত ঘটনা তন্ন তন্ন করিয়া মনে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। সব তাহার মনে আছে—সেই খালি-পা মেয়েটি আবার তাহার চোখের সম্মুখে যেন ভাসিয়া উঠিল। ঘুমে প্রায় ঢুলিয়া পড়িতেছে, তাহার কানে সঙ্গীতের একটা তান এমন স্পষ্ট করিয়া বাজিতে লাগিল যেন সমস্ত যন্ত্রীর দল তাহার কাছেই বাজাইতেছে ! তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন নৃত্য করিতেছে ; একটা বালিশে ভর দিয়া সে বসিল, সুরের নেশায় যেন তার মাথা ঘুরিতেছে ! সে ভাবিতেছে : এক দিন আমিও রচনা করিব ! কোন দিন পারিব কি !

তখন হইতে ক্রিস্তফের এক ইচ্ছা—কবে আবার থিয়েটারে যাইবে। বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে সে সঙ্গীত-সাধন আরম্ভ করিল, কারণ তাহার পুরস্কার ছিল অভিনয় দেখিতে পাওয়া। ইহা ছাড়া আর অন্য চিন্তা নাই, সপ্তাহের অর্দ্ধেক সে বিগত অভিনয়ের কথা ভাবে এবং অর্দ্ধেক আগামী নাট্যটির সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা করিয়া কাটায় ! অভিনয়ের দিনটা পাছে সে অসুস্থ হইয়া পড়ে

এই ভয়ে সে অস্থির—এবং সেই ভয়ের দরুণ সে তিন চার রকম রোগের লক্ষণ নিজের মধ্যে আবিষ্কার করিয়া বসে! সে ঐ দিনটা প্রায় খায় না, কি একটা অশান্তির তাড়নে তার আত্মা যেন ছট্‌ফট্‌ করে! পঞ্চাশ বার সে ঘড়ি দেখে আর ভাবে সন্ধ্যা যেন আর আসেই না! শেষে আর আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া এক ঘণ্টা আগে টিকিট ঘরের সামনে হাজির হয়, পাছে জায়গা না পায়; অথচ খালি নাট্য-মন্দিরে প্রথম ঢুকিয়া সে আবার অস্থির হইয়া পড়ে। দাদামশায়ের কাছে সে শুনিয়াছে যে, দর্শকেদের সংখ্যা যথেষ্ট না হওয়ায় দু'একবার নাকি অভিনয় বন্ধ রাখিয়া টাকা ফেরত দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ক্রিস্‌তফ্‌ গুণিতে থাকে—তেইশ চব্বিশ, পাঁচশ . . . নাঃ, এত কমে চলিবে না—কিছুতেই কি দশটা বাড়ান যায় না! যখন কোন গণ্যমান্য লোককে উচ্চ আসন অধিকার করিতে দেখে, ক্রিস্‌তফের হৃদয় কতকটা আশ্বস্ত হয়, সে বলিতে থাকে, এ লোককে কখনও ভাগিয়ে দিতে সাহস করবে না। এরা নিশ্চয় এর জন্য অভিনয় করবে। তবু তার বিশ্বাস হয় না। যতক্ষণ না বাজনদাররা নিজ নিজ স্থানে বসে, তার মন নিশ্চিন্ত হয় না। এমন কি তার পরও ক্রিস্‌তফ্‌ ভয় করিতে থাকে যে, আর একদিনের মত বুঝি বা পট-উন্মোচন সঙ্গে সঙ্গে কেউ বলিয়া বসে, আজ প্রোগ্রামটা উল্টাইয়া দিতে হইল। তাহার নিকটস্থ বন্ত্রার স্বর-লিপির উপর তিক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া সে পড়িয়া লয়, পরিচিত প্রোগ্রাম ঠিক আছে কি না। দেখিয়া দুই তিন মিনিট পরে আবার দেখে সেটা ঠিক, না ভুল করিয়া বসিয়াছে। কনসার্ট পরিচালক ত এখনও আসে নাই! নিশ্চয় তাহার অসুখ করিয়াছে। ঐ পর্দ্দাটার পিছনে কিসের যেন গোলমাল—কত লোকের ছুটোছুটি—চাপাগলায় কথা—কোন দুর্ঘটনা হইল নাকি? আবার নিস্তব্ধ। ঐ পরিচালক তাহার স্থানে আসিল—সমস্তই ত প্রস্তুত, তবু কেন ছাই আরম্ভ হয় না! হল কি? ক্রিস্‌তফ্‌ অধৈর্য্যে যেন আত্মহারা হইয়া পড়ে। হঠাৎ ঘণ্টা বাজে, তাহার বুক দুর দুর করিয়া উঠে। যন্ত্র-সঙ্গতে উন্মোচনি (overture) রাগিণীর আলাপ হইতে থাকে এবং কএক ঘণ্টার মত ক্রিস্‌তফ্‌ আনন্দ-সাগরে যেন সাঁতার কাটিতে থাকে—একমাত্র ভয় এখুনি সব শেষ হইয়া যাইবে।

* * *

কিছু দিন পরে ক্রিস্‌তফের সঙ্গীত-জগতে একটি বড় ঘটনা তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল: প্রথম যে গীত-নাট্যটি শুনিয়া সে পাগল হইয়াছিল, তাহার

রচয়িতা স্বয়ং হাস্‌লেয়ার তাহাদের শহরে আসিতেছেন এবং নিজের রচনাবলী শুনাইতে নিজেই সঙ্গতের পরিচালনা করিবেন! সমস্ত শহর যেন ক্ষেপিয়া উঠিল। প্রায় পক্ষাধিক কাল ধরিয়া হাস্‌লেয়ার হইল একমাত্র আলোচনার বস্তু, কারণ জার্ম্মাণীর সর্ব্বত্র এই তরুণ সঙ্গীতজ্ঞটিকে লইয়া বিষম তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। তিনি যখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন ক্রিস্তফের অবস্থা অন্যরকম। মেলশিয়োরের বন্ধুরা ও বৃদ্ধ মিশেল অনবরত খবরাখবর করিতে লাগিল এবং ঐ ওস্তাদটির অভ্যাস খেয়াল ইত্যাদির সম্বন্ধে নানা আজগুবি ধারণা জমাইয়া তুলিল। ক্রিস্তফ্ মহা আগ্রহে সেই সব গল্প শুনিত। সেই মহাপুরুষ যিনি তাহার সঙ্গে এক শহরে রহিয়াছেন—এক আকাশে নিঃশ্বাস লইতেছেন, এক পথে হাঁটিতেছেন, ইহা ভাবিতেও আনন্দে সে যেন বিভোর এবং ভাবে সে যেন তাঁহাকে দেখিতেই বাঁচিয়া আছে!

হাস্‌লেয়ার গ্রাণ্ড ডিউকের প্রাসাদে তাঁর অতিথি হইয়া আছেন। তিনি খুব কমই বাহির হন; শুধু মহড়া দিবার জন্য নাট্য-মন্দিরে যান কিন্তু ক্রিস্তফ্ সেখানে ঢুকিতে পায় না। ওস্তাদটি এমনই কুঁড়ে যে, ডিউকের গাড়ী ছাড়া এক পা নড়েন না। সুতরাং গাড়ীর ভিতরে থাকিতে একবার দেখা ছাড়া আর তাঁহার দর্শন লাভ বড় একটা ঘটে না। সে তাঁহার পশমের জামাটি ঝুলিতে দেখে এবং ডাইনে বাঁয়ে ধাক্কা দিয়া পিছন হইতে সামনে আসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় প্রতীক্ষা করে—ভিড়ের ভিতর হইতে ওস্তাদকে একবার দেখিবার জন্য! প্রাসাদের যে ঘরটিকে তাঁহার বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে তাহার জানালার নীচে ক্রিস্তফ্ উন্মুখ হইয়া একবেলা কাটাইয়া দিল; তাহাতেই কি সুখী! হাস্‌লেয়ার দেরিতে ওঠেন, সুতরাং প্রায় সারা সকাল জানালাটি বন্ধ থাকে; ক্রিস্তফ্ পায় বন্ধ খড়খড়িটা ছাড়া কিছুই দেখিতে পায় না। ইহা হইতে সবজান্তা মহলে রটিয়া গেল যে, হাস্‌লেয়ার দিনের আলো সহ্য করিতে পারেন না—দিনকে রাত করিয়া চিরকাল কাটাইয়া থাকেন!

শেষে ক্রিস্তফ্ তাহার আদর্শ বীরকে কাছে পাইল, সে কনসার্টের দিন; সারা শহর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, ডিউক ও তাঁহার সভাসদগণ মুকুটচিহ্নিত রাজকীয় বক্সে বসিয়াছেন—দুটি স্বর্গদূতের মূর্ত্তি তাহার নীচে। সমস্ত নাট্য-মন্দির মহাসমারোহে যেন ঝলমল করিতেছে, ওক্ শাখা ও লরেল ফুলে রঙ্গমঞ্চটি সুসজ্জিত। ধর্ত্তব্যের মতন যতগুলি যন্ত্রী সে শহরে ছিল প্রত্যেকে আজ আসরে

নামিয়াছে, এ যেন তাদের মানের দায়! মেলশিয়োর তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে এবং জ্যাঁ মিশেল কণ্ঠ-সঙ্গতের পরিচালনা করিতেছে।

হাস্‌লেয়ার প্রবেশ করিতেই উচ্চ অভিবাদন-ধ্বনিতে বাড়ীটা যেন পড়িয়া যায়; মহিলারা ভাল করিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসন ছাড়িয়া উঠিলেন। ক্রিস্‌তফ্ যেন চোখ দিয়া শিল্পীকে গ্রাস করিতেছে। হাস্‌লেয়ারের মুখখানি তরুণ ও সহানুভূতিপূর্ণ কিন্তু এই বয়সেই যেন একটু ফোলা ফোলা এবং শ্রান্তিতে আচ্ছন্ন। মাথার সাম্‌নেটা টাকে ভরা, উপরটায় পাতলা চুল এবং পিছনে সুন্দর কুঞ্চিত কেশ। তাহার নীল চোখের মধ্যে কেমন যেন একটা অনিশ্চয়তা জড়াইয়া আছে। তাঁহার গোঁফ ছোট ও সুদর্শন, তাহার মুখ ভাবব্যঞ্জক এবং সর্ব্বদাই যেন অস্থির, হাজার রকম অস্পষ্ট ভঙ্গীতে তরঙ্গিত। দীর্ঘকায় এবং কেমন যেন অভব্য রকমে ছট্‌ফট্ করেন, কোন মানসিক সঙ্কোচের দরুণ নয়, শ্রান্তি ও বিরক্তির বশেই এ রকম ব্যবহার করেন। কেমন একটা অস্থির খামখেয়ালির সঙ্গে তাঁহার সেই অদ্ভুত শরীরটাকে দোলাইয়া তিনি সঙ্গতের পরিচালনা করিতেছেন এবং তাঁহার সঙ্গীতের সঙ্গে ছন্দ রাখিয়া যেন কখনও আদর কখনও উৎকট আবেগের বশে নানা অঙ্গ-ভঙ্গী করিতেছেন। তাঁর সঙ্গীতেও এই চাঞ্চল্যের অবিকল ছায়া পড়িয়াছে। যন্ত্র-সঙ্গতের স্বাভাবিক অসারতা ভেদ করিয়া তাঁহার সঙ্গীত ক্ষণে ক্ষণে প্রাণের ধাক্কায় উৎসারিত হইতেছে। ক্রিস্‌তফ্ যেন হাঁপাইতেছে। লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ভয় থাকিলেও সে তাহার আসনে স্থির থাকিতে পারিতেছে না; সে হাঁকপাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া উঠে, সঙ্গতটি এমন অতর্কিত ভাবে এমন জোরে তাহাকে ধাক্কা দেয় যে, সে মাথা, হাত, পা নাড়িয়া তাহার কাছের মানুষদের বিব্রত করিয়া তোলে; এবং তাহারা যথাসম্ভব আত্মরক্ষা করিয়া চলে। শ্রোতার দল উত্তেজনায় অধীর—সঙ্গীতে যত না হোক, সাফল্যের মোহে মুগ্ধ। শেষ হইতেই প্রশংসার ধ্বনি এবং চীৎকারের ঝড় বহিয়া গেল এবং যন্ত্র-সঙ্গতের তূর্য্যনাদ তাহার সঙ্গে মিলিয়া যেন এক বিজয়ী বীরের অভ্যর্থনা জার্ম্মাণ রীতি অনুসারে করা হইল। ক্রিস্‌তফ্ গর্ব্বে কাঁপিতেছিল। যেন ঐ জয়ধ্বনি ও সম্মান তাহারই উপলক্ষ্যে হইতেছে। হাস্‌লেয়ারের মুখ শিশুসুলভ আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল দেখিয়া ক্রিস্‌তফ্ মহাখুশী। মহিলারা ফুল ছুঁড়িতেছে, পুরুষরা টুপি নাড়িতেছে—দর্শকবৃন্দ মঞ্চের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সকলেই যেন শিল্পীর করমর্দন করিতে চায়। ক্রিস্‌তফ্ দেখিল, একজন ভক্ত তাঁহার হাতখানি

চুম্বন করিল, আর একজন তাঁহার রুমালটি চুরি করিল, তিনি ডেস্কের উপর ভুলিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। ক্রিস্তফ্ও মঞ্চের উপর যাইতে চেষ্টা করিল, কেন, সে জানে না। অথচ যদি হাস্লেয়ার সে সময় তার পাশে আসিয়া দাঁড়ান, সে নিশ্চয় ভয়ে ও আবেগে অধীর হইয়া ছুটিয়া পলায়। তবু সেই পা ও পোষাকের ব্যূহ ভেদ করিবার জন্য ক্রিস্তফ্ তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া ধাক্কা দিতেছে। কিন্তু হাস্লেয়ার ও তাহার মধ্যেকার সেই ব্যবধান সে চূর্ণ করিতে পারিল না, সে যে নিতান্তই ছোট। সৌভাগ্যক্রমে কনসার্টের পর দাদা মশাই ক্রিস্তফ্কে দলে টানিয়া লইয়া গেলেন; এ দলটি হাস্লেয়ারের ঘরের কাছে জড় হইয়া তাঁহাকে সঙ্গীতের অর্ঘ্য নিবেদন করিবে: রাত্রি হইয়াছে, মশাল জ্বালিয়া যন্ত্রসঙ্গতের যত ওস্তাদ সেখানে উপস্থিত হইয়াছে। সকলেরই মুখে এক কথা: কি অপূর্ব্ব রচনাই না আজ হাস্লেয়ার শুনাইয়াছেন! প্রাসাদের বাহির সীমানায় আসিয়া শিল্পীর জানালার নীচে সকলে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সকলেই জানে, এমন কি হাস্লেয়ারও বেশ জানেন, কি ঘটিবে, তবু কেমন যেন একটা চাপা চাপা ভাব সকলের মুখে! রাত্রির স্নিগ্ধ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া সহসা শিল্পীর দু' একটি স্বরচিত সঙ্গত বাজিয়া উঠিল। তিনি ডিউকের সঙ্গে জানালার সামনে আসিলেন; ভক্তের দল জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং তাঁহারা দুজনেও প্রত্যভিবাদন করিলেন। ডিউকের একজন অনুচর ওস্তাদদের নিমন্ত্রণ করিয়া প্রাসাদের ভিতর লইয়া গেল। বড় বড় কামরা, তার ভিত্তি গাত্রে কত নগ্নকায় বর্ম্মধারী বীরের চিত্র—রক্ত মুখ হইয়া তাহারা যেন আস্ফালন করিতেছে—এই সব দেখিতে দেখিতে তাহারা ভিতরে চলিল। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন; আরও কত জিনিষ চোখে পড়িতেছে; মর্ম্মরের নর-নারীমূর্ত্তি লৌহ সজ্জায় ভূষিত। ওস্তাদরা যে গালিচার উপর দিয়া হাটিতেছেন সেগুলি এমন পুরু যে, পায়ের শব্দ শোনা যায় না; শেষে তাহারা যে ঘরটিতে আসিল, সেটির আলো যেন রাতকে দিন করিয়াছে; টেবিলের উপর প্রচুর খাদ্য পানীয়াদি সাজান আছে।

ডিউক স্বয়ং সেখানে উপস্থিত, কিন্তু ক্রিস্তফ্ তাঁহাকে দেখে নাই; তাঁহার চোখে ভাসিতেছে শুধু গুণী হাস্লেয়ার। তিনি তাহাদের দিকে আসিয়া সকলকে ধন্যবাদ দিলেন। তাঁর কথাগুলি বেশ বাছা বাছা; কথার মাঝে যেন থতমত খাইয়া থামিয়া বেশ একটি রহস্য-উক্তি প্রয়োগ করিয়া সামলাইয়া লইতেছিলেন এবং সকলে হাসিতেছিল। ভোজ আরম্ভ হইল। হাস্লেয়ার চার পাঁচ জন ওস্তাদকে একটু বিশেষ মনোযোগ দিলেন—তার মধ্যে ক্রিস্তফের

দাদা মশাইকে সকলের চেয়ে বেশী তারিফ করিলেন। তাঁহার রচনা যারা সর্ব্বপ্রথম বাজাইয়াছে—জঁা মিশেল তাহাদের মধ্যে অন্যতম ; সে কথা তাঁর মনে আছে এবং হাস্‌লেয়ার তাঁর এক বন্ধুর কাছে মিশেলের যথেষ্ট প্রশংসা শুনিয়াছেন জানাইলেন—সেই বন্ধুটি মিশেলের ছাত্র। মিশেল তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইলেন এবং প্রত্যুত্তরে এমন উৎকট স্তবগান করিলেন যে,হাস্‌লেয়ারের একান্ত ভক্ত ক্রিস্‌তফ্‌ও লজ্জায় অস্থির হইয়া উঠিল। হাস্‌লেয়ারের কাছে কিন্তু এসব বেশ মনোজ্ঞ ও স্বাভাবিক ঠেকিতেছিল। শেষে বৃদ্ধ নিজের বাক্য-জালে জড়াইয়া পড়িয়া উদ্ধার পাইবার আশায় ক্রিস্‌তফের হাত ধরিয়া হাস্‌-লেয়ারের কাছে উপস্থিত করিল। হাস্‌লেয়ার অন্যমনস্কভাবে তার মাথা চাপড়াইলেন কিন্তু যেমনই শুনিলেন যে, ছেলেটি তার সঙ্গীত শুনিয়া পাগল এবং তাঁহার দর্শনের প্রতীক্ষায় রাতের পর রাত ঘুমায় নাই, হাস্‌লেয়ার তার হাত ধরিয়া অনেক প্রশ্ন জুড়িলেন। ক্রিস্‌তফ্‌ ত নির্ব্বাক, আনন্দে লজ্জায় লাল হইয়া সে তাঁর দিকে তাকাইতেও পারিতেছিল না, তিনি তার দাড়ি ধরিয়া মুখখানি তুলিলেন, তখন ক্রিস্‌তফ্‌ তাঁকে দেখিতে সাহস পাইল। হাস্‌লেয়ারের চোখে সদয় হাস্য. ক্রিস্‌তফ্‌ও হাসিয়া ফেলিল। সেই মহাপুরুষের বুকের মধ্যে যাইয়া তার এমনই সুখ বোধ হইল যে, ঝর ঝর করিয়া চোখের জল পড়িতে লাগিল। সেই সরল স্নেহ হাস্‌লেয়ারের হৃদয় স্পর্শ করিল—তিনিও স্নেহে পূর্ণ হইয়া উঠিলেন। বালককে চুম্বন করিয়া তিনি গভীর স্নেহে কথা আরম্ভ করিলেন ; সেই সঙ্গে মধ্যে মধ্যে মজার কথা বলিয়া তাহাকে হাসাইতে লাগিলেন। চোখের জলের মধ্য দিয়া ক্রিস্‌তফের হাসি ফুটিয়া উঠিল। এই ভাবে শীঘ্র সে বেশ সহজ বোধ করিল এবং হাস্‌লেয়ারের কথায় জবাব দিতে আরম্ভ করিল। তাহার ছোট বড় মত উচ্চাভিলাষ সব তাঁর কানে কানে বলিয়া যাইতে লাগিল, যেন দু জনে বহু কালের বন্ধু! সে বলিয়া বসিল যে, সে হাস্‌লেয়ারের মত একজন ওস্তাদ হইয়া সুন্দর সুন্দর রচনা করিয়া স্বনামধন্য হইবে! যে একটু আগে লজ্জায় অস্থির হইতেছিল, সে-ই এখন বেশ বিশ্রম্ভালাপে মগ্ন! সে কি বলিতেছে জানে না—শুধু আনন্দে সে বিভোর! তাহার বক্তৃতা শুনিয়া হাস্‌লেয়ার সহাস্য মুখে বলিলেন :

বড় হয়ে তুমি যখন একজন ভাল ওস্তাদ হবে, তখন আমার সঙ্গে বার্লিনে দেখা কোরো, আমি তোমায় মানুষ করে তুল্‌ব।

ক্রিস্‌তফ্‌ ত আহ্লাদে আটখানা—কি জবাব দিবে! হাস্‌লেয়ার ঠাট্টা

করিয়া বলিলেন : কি এটা তোমার পছন্দ হয় না নাকি? ক্রিস্‌তফ্‌ পাঁচ সাত বার শুধু জোরে মাথা নাড়িল ; বুঝাইতে চায়, খুব পছন্দ!

তাহলে রফা করা গেল?

ক্রিস্‌তফ্‌ মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল।

বেশ, তবে আমায় আদর করে দাও।

ক্রিস্‌তফ্‌ তার সমস্ত শক্তি দিয়া হাস্‌লেয়ারের গলা জড়াইয়া আদর করিল।

আরে ছাড় ছাড়—ছ্যাঃ: তোমার নাকটা মোছ নি! আমার কাপড় ভিজিয়ে দিলে!

তিনি হাসিয়া নিজের হাতে ক্রিস্‌তফের নাক মুছাইয়া দিলেন। সুখে বালক ত অধীর! তাহার হাত ধরিয়া হাস্‌লেয়ার খাবারের টেবিলের কাছে লইয়া গেলেন এবং ক্রিস্‌তফের পকেট কেক্ ইত্যাদি বোঝাই করিয়া বিদায় দিবার সময় বলিলেন : কেমন প্রতিজ্ঞাটা মনে আছে ত? তবে বিদায়!

ক্রিস্‌তফ্‌ সুখ-সমুদ্রে যেন সাঁতার দিতেছে। সারা পৃথিবী তার কাছে লোপ পাইয়াছে। এই সন্ধ্যার পূর্ব্বে কি ঘটিয়াছে কিছুই তাহার মনে নাই। হাস্‌লেয়ারের প্রত্যেক কথা প্রতি অঙ্গ ভঙ্গিটি সে মনের মধ্যে আঁকিয়া লইয়াছে। তার একটি কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়িতেছে, হাতে একটা আয়না লইয়া হাস্‌লেয়ার বলিতেছিলেন আর তাঁর মুখ কেমন যেন কঠিন হইয়া উঠিতেছিল :

আজিকার এই আনন্দের মধ্যে যেন আমরা আমাদের শত্রুদের কথা না ভুলি। শত্রুদের কখনই ভোলা উচিত নয়। আমরা যে ছত্রভঙ্গ হই নাই তাহার জন্য ঐ শত্রুরা দায়ী নয় ; এবং তাহারা যে ছত্রভঙ্গ হইবে না তাহার জন্যও তাহারা আমাদের ধন্যবাদ দিবে না সুতরাং আমি শেষ 'টোষ্টে' এই বলি যে, এমন মানুষ আছে যাহাদের স্বাস্থ্যপান আমরা করিব না!

সকলে প্রশংসা করিল, হাসিল—হাস্‌লেয়ারও হাসিলেন ; তাঁর খোসখেয়ালী মেজাজ যেন ফিরিয়াছে। কিন্তু ক্রিস্‌তফ্‌ কেমন দামিয়াই গেল। তার উপাস্য বীরের কোন কাজই সে সমালোচনা করিতে পারে না কিন্তু তিনি যে এমন নিষ্ঠুর কদর্য্য বিষয় ভাবিতেও পারেন তাহাতে সে আঘাত পাইল। এমন সন্ধ্যায় শুধু উজ্জ্বল স্বপ্ন ও মধুর চিন্তাই আসা উচিত ছিল কিন্তু কি যে তার মনে আঘাত দিল সে তলাইয়া বুঝিল না ; এবং আনন্দের হিল্লোলে তার সেই অপ্রীতিকর ভাবটা যেন মিলাইয়া গেল। ফিরিবার পথে বৃদ্ধের কথা যেন আর থামে না। হাস্‌লেয়ারের প্রশংসায় সে উন্মত্ত, সে বার বার বলিল, তার

মত মনীষী এক শতাব্দীর মধ্যে জন্মায় নাই। ক্রিস্তফ্ কিছুই বলিল না, তার হৃদয় প্রেমের নেশায় ভরপুর। সে এই মহাপুরুষকে চুম্বন করিয়াছে। তিনি তাঁকে কোলে করিয়াছেন; তিনি কি সুন্দর—কি মহৎ! বিছানায় পড়িয়া বালিসে চুমো দিয়া সে বলিল, আমি তাঁর জন্য জীবন দিব—মরিব . . .।

* * * * *

সেই ছোট শহরটির চিত্তাকাশে হাস্‌লেয়ার যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত একবার ছুটিয়া গেলেন তাহার স্থায়ীপ্রভাব ক্রিস্তফের উপর পড়িল। সে তার সমস্ত তরুণ বয়স ধরিয়া হাস্‌লেয়ারকে আদর্শ করিয়া তাঁর পদানুসরণে ব্যাগ্র হইল। ছয় বছরের মানুষটি সঙ্কল্প করিয়া বসিল, সেও সঙ্গীত রচনা করিবে। কিছুদিন হইতে সে না জানিয়া রচনা করিতেছিল; রচনা সম্বন্ধে তার মন সজাগ হইবার পূর্ব্বে আপনার মনেই সে রচনা করিয়াছে।

সঙ্গীত যেন তার জন্মগত; সবই তার কাছে সঙ্গীত; যাহা কিছু নড়ে চলে, স্পন্দিত হয়, কম্পিত হয়, সূর্য্যকরোজ্জ্বল উষ্ণ দিন, বায়ুগর্জ্জন গুনিত রাত্রি, আলোকের কম্প্রশিখা, নক্ষত্রের স্পন্দন, ঝড়ঝঞ্ঝা, বিহঙ্গকাকলী, ঝিল্লীধ্বনি, তরুমর্ম্মর, প্রিয় ও অপ্রিয় কণ্ঠস্বর, ঘরে আগুনের পাশে পরিচিত শব্দ-সঙ্গতি, একটা দরজার ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ—সমস্তই সঙ্গীত; শুধু চাই শুনিবার কান। সৃষ্টির এই বিচিত্র সুর-সঙ্গতি ক্রিস্তফের হৃদয়ে প্রতিধ্বনি জাগাইত। যাহা কিছু সে দেখে, যাহা কিছু সে অনুভব করে, সমস্ত তার অজ্ঞাতসারে কখন সঙ্গীতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। তার প্রাণ যেন একটি গুঞ্জন মুখর মধুচক্র কিন্তু কেহই তার খবর রাখে না—সে নিজে ত নয়ই!

অনেক ছেলের মত ক্রিস্তফ্ অনবরত ঘণ্টার পর ঘণ্টা গুন্ গুন্ করিয়া সুর ভাঁজিত। সে রাস্তায় হাঁটে, এক পায়ে লাফায়, দাদামহাশয়ের পাশে মেঝের পড়িয়া থাকে, হাতের উপর মাথা রাখিয়া একখান ছবির বই দেখিয়া যায়। কখনও আবার রান্নাঘরের অন্ধকার কোণে চৌকিতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, সন্ধ্যার আলো আঁধারে এলোমেলো জাগ্রতস্বপ্ন দেখিতে থাকে—কিন্তু যাহাই করুক, দেখা যায়, সে তার ঠোঁট চাপিয়া গাল ফুলাইয়া, ছোট মুখ-ভূর্খাটির ভিতর দিয়া কেমন একটা একটানা স্বর-লহরী ছুটাইতেছে। ক্রিস্তফের মা বড় একটা মন দেন না কিন্তু হঠাৎ মধ্যে মধ্যে আপত্তি করেন।

এই আধাস্বপ্ন আধাজাগরণের অবস্থাটা যখন তার মনে বিরক্তি আনে, সে তখন নড়িয়া চড়িয়া শব্দ না করিয়া থাকিতে পারে না। তখন সে গলা ছাড়িয়া

গান ধরে। সকল অবস্থার সুর সে তৈরি করিয়াছে; ভোরে মুখ ধুইবার গামলায় ছোট হাঁসের মত যখন ছুপ্ ছুপ্ শব্দ করে, সেটার নকলে সে এক সুর রচনা করিয়াছে। ঐ যে লক্ষ্মীছাড়া পিয়ানো যন্ত্রটা, তার সামনের চৌকিতে বসিবার সময় এবং সেই চৌকি হইতে লাফাইয়া পালাইবার সময় সে দুরকম সুর করে। বলা বাহুল্য শেষের সুরটা আগের সুর হইতে চটকদার। মা যখন টেবিলের উপর সুপ্ পরিবেশন করেন তখন সে তাঁর সামনে অদ্ভুত সুরে মুখ-তূর্য্য বাজাইতে বাজাইতে চলে। আবার ঘর হইতে শোবার ঘরে আসিবার সময় পরম গম্ভীরভাবে সে জয়যাত্রার সুর বাজাইতে থাকে। কখনও আবার দুটি ছোট ভাইকে লইয়া সে ছোটখাট মিছিল-এর সৃষ্টি করে; প্রত্যেকেই গম্ভীর ভাবে পায় দিয়া হাঁটে আর নিজ নিজ সুর ভাঁজে। সব চেয়ে ভাল সুরটি অবশ্য ক্রিস্তফ্ নিজেই আলাপ করে। প্রত্যেক সুরটি কোন বিশেষ ঘটনার সঙ্গে জুড়িয়া দেয়, অথচ তাদের মধ্যে গোলমাল বাধে না। অপরে হয় ত ভুল করিয়া বসিত কিন্তু ক্রিস্তফ্ সুরগুলির মধ্যে যে স্পষ্ট ব্যবধানের ছায়ারেখা দেখিতে পায়, তাহার দরুণ সে কখনও ভুল করিতে পারে না।

একদিন তার দাদামহাশয়ের বাড়ীতে ক্রিস্তফ্ মাথা উঁচু করিয়া বুক ফুলাইয়া তালে তালে পা ঠুকিয়া ঘরের চারদিকে হাটিতে সুরু করিল—তাহার মাথা ঘুরে নাই এই আশ্চর্য্য। সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার নিজের রচিত একটা সুর ভাঁজিতেছিল। বৃদ্ধ দাড়ি কামাইতে কামাইতে, সেই সাবান মাখা মুখে ক্রিস্তফের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল :

ওরে বাচ্চা! কি গান কর্‌ছিস্?

ক্রিস্তফ্ বলিল, সে জানে না! বৃদ্ধ বলিল, আবার গা ত। ক্রিস্তফ্ চেষ্টা করিল কিন্তু সুরটা সব মনে পড়িল না। দাদামশায়ের নজর পড়িয়াছে দেখিয়া সে গর্ব্ব অনুভব করিল; একটা গীতি-নাট্যের সুর নিজের মত করিয়া গাহিয়া বৃদ্ধের কাছে তার গলার প্রশংসা আদায় করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু জাঁ মিশেল সেটা শুনিতে উৎসুক নয়; সে যেন কিছুই লক্ষ্য করে নাই এই ভাবে চুপ করিল। কিন্তু ক্রিস্তফ্ যখন একা ঘরে সুর ভাঁজিতেছিল বৃদ্ধ দরজাটা খানিক খুলিয়া রাখিল।

কিছু দিন পরে ক্রিস্তফ্ একদিন কতকগুলো চেয়ার সাজাইয়া একটি কৌতুক-নাট্য আরম্ভ করিল, তার সঙ্গীত সে অন্য গীতি-নাট্যের <u>ভাঙ্গা</u> চোরা

সুর জুড়িয়া রচনা করিয়াছে। নৃত্যোপযোগী সঙ্গীত-ছন্দে সে হাটিতে ও অভিবাদন করিতে সুরু করিল। টেবিলের উপরে বেটোফেনের যে ছবিখানি ঝুলিতেছিল তাহার দিকে চাহিয়া সে বক্তৃতা জুড়িয়া দিল। পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া যেই সে এক পাক ঘুরিয়াছে,সে দেখিল তার দাদামশাই দরজার ভিতর দিয়া সব দেখিতেছে। সে ভাবিল, বৃদ্ধ কি হাসিতেছে। লজ্জায় সে একেবারে থামিয়া গেল। ছুটিয়া জানালার কাছে গিয়া সার্সির উপর মুখ চাপিয়া ভাণ করিল, যেন মহা আগ্রহের সঙ্গে সে কিছু একটা দেখিতেছে। বৃদ্ধ তাহাকে কিছুই বলিল না; শুধু কাছে আসিয়া চুম্বন করিল। ক্রিস্তফ্ বুঝিল, সে সন্তুষ্ট হইয়াছে। তার সন্তোষের চিহ্নগুলি অবলম্বন করিয়া তার গর্ব্ব বিপুল হইয়া উঠিল। তাকে যে তারিফ করা হইয়াছে সেটা বুঝিবার মত বুদ্ধি তার যথেষ্ট ছিল। কিন্তু দাদামহাশয়ের কোন্ জিনিষটা সব চেয়ে ভাল লাগিল তাহা সে ঠিক বুঝিল না; তার নাট্য-প্রতিভা, না সঙ্গীত? তার গান, না নাচ—কোন্‌টা? নাচের সম্বন্ধে সে নিজেকে একটু বেশী রকম তারিফ করিত, তাই ভাবিল নাচটাই সব চেয়ে সেরা!

এই সমস্তই যখন সে ভুলিয়া গিয়াছে তখন সপ্তাহ খানেক পরে একদিন দাদামশাই বেশ একটু গোপন রহস্যের সঙ্গে যেন বলিল—একটা জিনিষ দেখাইবার আছে। বাক্স খুলিয়া একটি স্বরলিপি বাহির করিল এবং পিয়ানোর উপর রাখিয়া ক্রিস্তফ্‌কে বাজাইতে বলিল। বেশ ঔৎসুক্যের সঙ্গে সে সুরু করিল এবং মোটামুটি পড়িয়া বাজাইতে পারিল। স্বরলিপিটি বিশেষ যত্ন করিয়া বৃদ্ধ বড় বড় অক্ষরে নিজে লিখিয়াছে; লিপির মাথায় কত রকমের টানটোনের নক্সা-কাটা। বৃদ্ধ ক্রিস্তফের পাশে বসিয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে জিজ্ঞাসা করিল, সে সঙ্গীতটি চিনিতে পারে কি না। ক্রিস্তফ্ বাজাইতেই এত ব্যস্ত ছিল যে, কি বাজাইতেছে সেটা লক্ষ্য করে নাই; সুতরাং বলিল, সে জানে না।

জানিস না? আচ্ছা শোন্ ত?

হাঁ সে যেন জানে, কিন্তু কোথায় শুনিয়াছে মনে নাই। বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল, মনে কর্ দেখি?

ক্রিস্তফ্ মাথা নাড়িয়া বলিল, জানি না!

তাহার মনে পরিচয়ের আলোক অল্পে অল্পে আসিতেছিল। ঐ সুরটা

যেন মনে হইতেছে . . . কিন্তু হইতে পারে না . . . ভাবিতেও তার ভরসা হয় না . . . সে চিনিয়াও চিনিবে না।

লজ্জায় সে লাল হইয়া বলিল, জানি না দাদামশাই।

আরে বোকা! ও যে তোর নিজেরই রচনা—জানিস না?

ক্রিস্তফ বেশ চিনিয়াছিল, কিন্তু তবু ঐ কথাগুলিতে তার বুক যেন কাঁপিয়া গেল।

বৃদ্ধ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বইখানি দেখাইলেন। দেখ্—এই সুরটা তুই মঙ্গলবার মেঝের পড়ে পড়ে গাইছিলি। আর এটা গত সপ্তাহে তোকে আবার গাইতে বলি, তোর মনে পড়ল না—এটা সে দিন চেয়ারের কাছেই নাচ্‌তে নাচ্‌তে গেয়েছিস্—মনে পড়ে?

স্বরলিপির উপর চমৎকার সুন্দর অক্ষরে লেখা

শৈশবের সুখ, জাঁ ক্রিস্তফ্ ক্রাফ্‌ট-এর প্রথম রচনা

ক্রিস্তফ্ ত হতভম্ব! ঐ বড় বইয়ের উপর কি সুন্দর নাম—সবটা তার রচনা! . . . সে শুধু অস্পষ্ট স্বরে বলিল, দাদামশাই!

বৃদ্ধ তাহাকে বুকে টানিয়া লইল। ক্রিস্তফ্ নতজানু হইয়া বসিয়া তার মাথাটি দাদামশাইয়ের বুকের মধ্যে রাখিল—সুখে তার সর্ব্বশরীর অধীর। বৃদ্ধের আনন্দ বোধ হয় আরও বেশী – প্রায় আবেগে ভাঙ্গিয়া পড়ে—বহুকষ্টে কণ্ঠ সম্বরণ করিয়া বলিল, অবশ্য আমি তোর সুরের সঙ্গে স্বর-সঙ্গতি ও যন্ত্র-সঙ্গতগুলো জুড়ে দিয়েছি, আর—(একটু কাসিয়া) ঐ নীচের জায়গায় একটা ত্রিপদী রাগিণীও বসিয়েছি—ওটা করা নিয়ম—আর-জানিস্—জিনিষটা মোটের উপর মন্দ হয় নি।

বৃদ্ধ বাজাইতে সুরু করিল। দাদামশাইয়ের সঙ্গে একজোটে সৃষ্টি করিয়াছে ভাবিতে সে গর্ব্বে ভরিয়া উঠিল।

কিন্তু দাদামশাই, তোমার নামটা ত এখানে লিখ্‌তে হবে।

না, দরকার নেই। তুই ছাড়া আর কেউ না জানলেই ভাল। শুধু—বৃদ্ধের গলা কাঁপিয়া গেল—শুধু পরে যখন আমি মরে যাব, তুই এটা মনে রেখে বুড়ো দাদামশাইকে স্মরণ করিস্, কেমন? আমায় ভুলবি না ত?

বৃদ্ধ অবশ্য প্রকাশ করিল না যে, তাহার নিজের একটা সুর তার নাতির রচনার মধ্যে বসাইয়া দিবার লোভ সে সম্বরণ করিতে পারে নাই; নাতির

জিনিষটি তার মৃত্যুর পর অমর হইয়া থাকিবে এটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তার এই সরল খামখেয়ালীর অবতারণা। কিন্তু সেই কাল্পনিক গৌরবে ভাগ বসাইবার আগ্রহের মধ্যে একটি সকরুণ বিনয়ের ভাব ছিল; তার নিজের চিন্তার একটি তুচ্ছ ভগ্নাংশও যদি অনাগত কালে চলিয়া যায়—সেই নামহীন অমরত্বেই সে সুখী। ক্রিস্তফের হৃদয়কে ইহা স্পর্শ করিল, সে দাদামশাইকে বার বার চুম্বন করিতে লাগিল এবং বৃদ্ধও গভীর স্নেহভরে তার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া বলিল:

আমায় মনে রাখ্‌বি ত বাবা? পরে যখন তুই খুব বড় একজন ওস্তাদ হবি, মস্ত শিল্পী হবি, তোর গৌরবে তোর বংশ ও পরিবার, তোর দেশ ও তোর শিল্প গৌরবান্বিত হবে—তখন মনে রাখ্‌বি ত যে, তোর এই বুড়ো দাদামশাই প্রথম বুঝেছিল, প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল?

নিজের কথা শুনিয়া নিজেই বৃদ্ধ কাঁদিয়া অস্থির। অথচ এই রকমের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া ফেলিতেও তার বিশেষ অনিচ্ছা, হঠাৎ কাসি আসিয়া ধাক্কা সামলাইয়া দিল এবং গম্ভীর মুখে ক্রিস্তফ্‌কে বিদায় দিল—সে তার অমূল্য রচনাটি বুকে চাপিয়া ছুট্ দিল।

—ক্রমশ

ডাকঘর

ফাল্গুন মাস পড়ল। কল্লোলের তৃতীয় বর্ষ প্রায় শেষ হ'তে চল্‌ল। এই বছরটিতে কল্লোল হারিয়েছে অনেক, পেয়েছেও অনেক। যা হারিয়েছে তার তুলনা হয় না, তা' ফিরিয়ে পাবার আর কোনও উপায় নাই। কেবল যে মৃত্যুই কল্লোলের সব কিছু কেড়ে নিয়েছে, তা নয়, মৃত্যু ছাড়া আমাদের প্রত্যেক্যের ভিতর এমন সব অনেক প্রবৃত্তি আছে যে, সেগুলির কাছে অনেক ক্ষেত্রেই হার মান্‌তে হয়। সে হারের ফাঁসি মানুষ সাধ ক'রে গলায় পরে। তখন কোনও বাইরের শক্তি সে পরাজয়ের কাছ থেকে আমাদের মুক্ত করে নিতে পারে না। তার একটা কারণ, তার মধ্যে আপাতমধুর

এমন সব ব্যবস্থার আশা থাকে যে, সে লোভ এড়ান বড় দায়। গোকুলের মৃত্যু, বিজয়ের মৃত্যু, এ সবের অভাব পূর্ণ হবার কোনও সম্ভাবনা নাই। তাদের অভাবে যে ক্ষতি তা' কল্লোলকে সয়ে নিতে হয়েছে, সেই নিদারুণ দুঃখের দিনেও কল্লোলকে তার আপন ক্ষুদ্রশক্তি কেন্দ্রীভূত করে' তার লক্ষ্যের দিকে নব পরিচিত সহস্রের সঙ্গে অগ্রসর হতে হয়েছে। বর্ষশেষের পূর্ণ মাসে তাই একে একে সব ক্ষতি, সব হারানর কথা মনে পড়ছে।

কল্লোলকে যারা ভালবেসেছে, যারা কল্লোলের সার্থকতাকে স্বীকার করে, যে কারণেই হউক আজ দূরে চলে গিয়েছে, তাদের সকলকেই আজ মন বারে বারে সন্ধান ক'রে ফিরছে, তাদের সমস্ত দান মনের কৃতজ্ঞতায় চর্চ্চিত হয়ে আছে। যিনি যে রকমে কল্লোলকে স্বীকার করেছেন, কল্লোল তাঁকে নতমস্তকে আপন বলে স্বীকার করছে। কিন্তু এই সব-হারাবার দুঃখের মধ্যেও কল্লোল কত নূতন পরিচিতের আত্মীয়তা ও সান্নিধ্য লাভ করেছে। তাঁদের কাছেও কল্লোলের একান্ত প্রাণের কৃতজ্ঞতা সঙ্কোচে প্রতীক্ষা করছে। তাঁরা কল্লোলের এই অনিবার্য্য গতিকে আপনাদের শক্তি দিয়ে রক্ষা করছেন।

আজকাল যে সকল সাময়িক পত্রিকা আছে, কল্লোল তার একটিকেও অগ্রাহ্য করে না, আর প্রত্যেককে সমুচিত সম্মানের সহিত গ্রহণ করতে যতটুকু উদারতার প্রয়োজন, কল্লোলের সেটুকু আছে। কল্লোল নূতন কিছু দেবে বলে, নবযুগের কোনও সাধনাকে পরিস্ফুট ক'রে তুলবে, এমন কোনও দুরাশা সে রাখে না। তার প্রথম হতেই সে সকলকে সাদরে গ্রহণ করেছে, বাংলার সকল লেখক লেখিকার অন্তরের ধ্বনিকে সে পরম সমাদরে তার বক্ষে ধারণ করে চলেছে। সে বড়র কাছেও কল্লোল, ছোটর কাছেও কল্লোল। তার ভিতর দিয়ে আজ যে সকল লেখক লেখিকা বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে যশলাভ করেছেন তাঁদের কাছে কল্লোলের কোনও দাবী দাওয়া নাই, যাঁরা আজও কল্লোলের ভেতর দিয়ে আপনার মনের চিন্তাকে উৎকর্ষতার দিকে অগ্রসর করতে চেষ্টা করছেন, তাঁদের খ্যাতি বা উন্নতির জন্যও কল্লোল কোনও দায়িত্ব গ্রহণ করে নি। এ একটা প্রবাহের বিচিত্র গতি, সে কল্লোল নাম নিয়ে চলুক, আর যে নামেই চলুক, সে চিরন্তন, কোনও কালে তার শেষ নাই, অন্ত নাই।

এই গতির বেগে মানুষের প্রাণের গতি ছুটে চলেছে। এরই নাম কল্লোল,

এরই নাম আনন্দধারা, এরই নাম আর্ত্তনাদ, এরই নাম বিদ্রোহ, এরই নাম শান্তির কামনা, প্রেমের সন্ধান-যাত্রা।

যদি কেউ ভুল ক'রে ভেবে থাকেন, কল্লোলের কোনও বিশেষ 'মিশন' আছে, তাহলে তাঁকে বল্‌তে হয়, কল্লোলকে তিনি ভাল ক'রে লক্ষ্য করেন নি। কল্লোলের উপর কালো মেঘের ছায়া পড়েছে, প্রভাত সূর্য্যের রশ্মিপাত হয়েছে, সন্ধ্যার অলক্তরাগের প্রতিচ্ছবিও তার বক্ষে নেচে চলেছে, তারই সঙ্গে কত পূজার ফুল, কত মৃতদেহ, কত অমূল তরু, কত ঝঞ্ঝাদীর্ণ বিটপীর শাখা —এ সকলই তার বুকের উপর ঠাঁই পেয়েছে। তার দুর্ব্বার এই যাত্রায় যা' টিক্‌তে পেরেছে, তাই আছে। আজ যা' আছে, কাল তা থাক্‌বে না হয় ত। যা চিরন্তন তারই স্থান হয় ত চিরদিনের মত কল্লোলের বক্ষ-জোড়া প্রবাহের মধ্যে মিলিয়ে থাক্‌বে।

এই কল্লোল পত্রিকার সম্পাদন ভার আমার উপরে ন্যস্ত। আমার অক্ষমতা একে যতখানি ক্ষুণ্ণ করেছে তার জন্য আমি দায়ী। যা' পারি নি তা' নিশ্চয়ই আমার ক্ষমতার বাইরে; আর এই তিন বৎসর সমস্ত ব্যাঘাতকে অতিক্রম করে যে শক্তি-বলে কল্লোলের পরিচর্য্যা করতে পেরেছি, তার জন্যও আজ প্রসন্নমনে সকলের কাছে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কল্লোলের কার্য্যালয় নানা কারণে স্থানান্তরিত করতে হয়েছে। তার মধ্যে একটি কারণ, আমার নিজের সময় ও সামর্থ্যকে সম্যকভাবে প্রয়োগ করবার ইচ্ছায়। কল্লোলের এই কাজের সঙ্গে সুপরিচিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বিজলী'র সম্পাদন কার্য্যও আমি নিয়েছি। বিজলী ও কল্লোল দুইটি ভিন্ন পত্রিকা। একটির সঙ্গে অন্যটির কোনও সম্বন্ধ নাই। বিজলী পরিচালনা করে' কল্লোলের পরিচর্য্যা করা আমার পক্ষে আরও সুবিধা হবে, এও বিজলীর সম্পাদন ভার গ্রহণ করার একটি কারণ দুটি কার্য্যালয় কাছাকাছি হ'লে কাজের পক্ষে অনেক সুবিধা হয়।

কল্লোল পাবলিশিং হাউসও ১০।২ পটুয়াটোলা লেনেই স্থানান্তরিত হয়েছে।

বিজলীর ষষ্ঠ বর্ষ আরম্ভ হোল, ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহে বিজলীর নূতন বৎসরের প্রথম সংখ্যা বের হবে স্থির হয়েছে। লেখক ও লেখিকাদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন কেউ কল্লোলের লেখার সঙ্গে বিজলীর অথবা বিজলীর লেখার সঙ্গে কল্লোলের জন্য রচনা না পাঠান। তাতে আমাকে বড়

অসুবিধায় পড়তে হবে। দুটি পত্রিকার জন্য ভিন্ন ভাবেই লেখা-পত্র পাঠাবেন এই অনুরোধ। দুটির কার্য্যালয়ও ভিন্ন স্থানে।

এবার একটি অত্যন্ত দুঃখের কথা জানাচ্ছি। কল্লোলের ও বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে পরিচিত তরুণ লেখক শ্রীযুক্ত সুকুমার ভাদুড়ী বিশেষ পীড়িত। ইনি কল্লোলের বিশেষ হিতকামী ও নিঃস্বার্থ ভাবে ইনি কল্লোলের জন্য অনেক খেটেছেন। তাঁর এই রোগের সংবাদে আমরা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছি। আশা করি, কল্লোলের শুভার্থীদের শুভকামনার ফলে সুকুমার শীঘ্রই নিরাময় হয়ে উঠ্‌বেন। সুকুমার এখন বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দুমকায় আছেন।

খুব সম্ভব কল্লোল চতুর্থ বৎসরে ভিন্ন ও বৃহদাকারে বের হবে। এর লেখা প্রভৃতিও যাতে আরও মনোজ্ঞ হয় তার জন্য এখন থেকেই বিশেষ চেষ্টা করা হচ্ছে। গ্রাহকবর্গ যাতে তাঁদের এত প্রিয় কল্লোলের আরও নূতন গ্রাহক সংগৃহীত হয়, আশা করি তার জন্য চেষ্টা করবেন।

চৈত্রের সংখ্যায় জাঁ ক্রিস্তফ একটু বেশী করে দেবার কথা হচ্ছে। তাহলে মূল ফরাসীর একটি খণ্ড চৈত্রে শেষ হয়। নূতন বৎসরে অন্য খণ্ড আরম্ভ হতে পারে। গোকুল যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন, তাঁর অবর্ত্তমানে তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ ও গোকুলের পূজনীয়া ভাতৃজায়া, বাংলার বিখ্যাত লেখিকা শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী একযোগে এই অনুবাদ কার্য্যের ভার নিজ হতেই গ্রহণ করেছেন। এ জন্য কল্লোলের পক্ষ থেকে আমরা তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কল্লোলের প্রতি সকলের এই অযাচিত প্রীতি ও সহানুভূতিই কল্লোলের একমাত্র সম্বল।

কল্লোল এই তিন বৎসরে বাংলার বহু নর-নারীর চিত্তাকর্ষণ করেছে। তাঁদের চিঠি-পত্র পড়লে, মনে হয় তাঁরা কল্লোলকে মায়ার বাঁধনে বেঁধে ফেলেছেন। গোকুলের মৃত্যুর পর শতাধিক পত্রে গোকুলের জন্য গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি এবং তার সঙ্গে কল্লোলের প্রতিও একটা গভীর সহানুভূতি কল্লোলের শুভাধ্যায়ীদের কাছ থেকে পেয়েছি। গোকুলের শেষ ইচ্ছা—কল্লোলকে রেখো, এই ধ্বনিটি নিরন্তর প্রাণের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। এই সকলের ইচ্ছাকে পালন করার ভার আমার উপরে। কিন্তু সকলের সাহায্য ব্যতিরেকে এত বড় গুরু ভার বহন করা আমার পক্ষে একান্তই অসম্ভব হবে। তাই যাঁরা কল্লোলকে এত ভালবাসেন তার সুখে দুঃখে যাঁদের মন ব্যাকুল হয়, তাঁদের সাহায্য নূতন বৎসরের জন্য বিশেষ ভাবে ভিক্ষা করছি। তাঁরা প্রত্যেকে কল্লোলের জন্য গ্রাহক সংগ্রহের

চেষ্টা করবেন, ভাল ভাল রচনা যাতে কল্লোলের জন্য পাওয়া যায় তারও চেষ্টা করবেন। এই রকম ক'রে প্রত্যেকের সামান্য চেষ্টার সমষ্টির ফল কল্লোলের নূতন জীবন ধারায় প্রভূত শক্তি দান করবে।

এই সাহায্য প্রার্থনার ভিতর নিরাশার কোনও খেদ নাই। শুধু কল্লোলের প্রতিষ্ঠাকে আরও সুদৃঢ় এবং তাকে আরও উপযুক্ত ক'রে তুল্‌বার জন্য আমার এই নিবেদন।

অবসাদ ও আশঙ্কা মানুষকে যে একেবারে বিচলিত করতে পারে না তা নয়, তবে কল্লোল সে সকল অগ্নি-পরীক্ষা হ'তে এই তিন বৎসরে বহুবার উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে। প্রতিদিনের অসংখ্য নিরাশার বাণী, অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা, কল্লোলকে আঘাত করেছে, কিন্তু সে আঘাত সে নিজেরই মধ্যে ব্যপ্ত ক'রে দিয়ে আবার তার চলার ছন্দে ছুটে চলেছে। এতে যদি কেউ মনে করেন, কল্লোল তার স্বত্বা সম্বন্ধে গর্ব্বিত, তাহলে সবিনয়ে নিবেদন করছি, সে সত্যই তার এই জীবনটুকুকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে এবং তারই জন্য তার এই অন্তরের প্রসাদটুকু নিতান্ত অহঙ্কারের মতই দেখায়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বিগত শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা করিবার সময় আমরা অনেকে সেই সময়কার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার কথা ভুলিয়া যাই এবং অধিকাংশ স্থলে আমরা বর্ত্তমানের তুলাদণ্ডে সেই যুগের অনেককে বিচার করিয়া গ্রহণ করিবার সময় একটা ভুল করি; সে ভুলটী এই যে, আমরা সেই সময়কার কথা ও মাপ দিয়া তাঁহাদের ওজন করি না; আমরা তাঁহাদের ওজন করি আজকালকার দাঁড়ি-পাল্লায়। যে কয়জন দারুণ দুঃসাহসী পুরুষ লোকাপবাদ ও তাচ্ছিল্যের মধ্য দিয়া সামান্য বাঁশ আর তক্তা সাজাইয়া বাংলার নাট্য-মঞ্চের প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন—আজ রঙ্গমঞ্চের স্বাভাবিক ক্রমোন্নতির ফলে তাঁহাদের সেই আদিম প্রচেষ্টাগুলি অতি সামান্য লাগিতে পারে কিন্তু কলা-লক্ষ্মীই জানেন, তাঁহাদের অন্তরের নিষ্ঠা ও গভীরতা কত গাঢ় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন প্রথম প্রতিভার অসম দুঃসাহসিকতায় সাহিত্যে নব নব মানব সৃষ্টি করিয়া বাংলা-সাহিত্যকে নব জন্মদান করিলেন,

আজ হয়ত সে পথে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের নর-নারী সব ভিড় করিয়া চলিয়াছে কিন্তু বঙ্কিমকে বুঝিতে হইলে বাংলার তখনকার পারিপার্শ্বিক সাহিত্য-জগতের কথা ভাবিতে হইবে। বাংলা সাহিত্যের আকাশে তখনও "আন্তির কুয়া কুয়া কইছে", বাংলার সমাজে তখনও সদ্য-বিধবাকে ধুতুরার ফল খাওয়াইয়া পাগল করিয়া বাঁশের খোঁচায় চিতায় পুড়াইয়া সতী করা হইতেছে, বাংলার গ্রামে গ্রামে তখন অন্যূন বিংশ-পত্নী-সৌভাগ্যবান্ কুলিন ব্রাহ্মণ একরাত্রে অষ্টম বর্ষীয়া হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায়-বৃদ্ধা অনূঢ়া বালিকার আইবুড়ো নাম ঘুচাইয়া পরলোকের সুব্যবস্থার নামে বিবাহ করিতেছে— ; এই অসম্ভব বীভৎস জগতের মাঝখানে কোথা হইতে জোয়ারে আসিল—অপরূপ মানব-মানবীর দল ; আয়েষা, কুন্দ, শৈবলিনী, কপালকুণ্ডলা, নগেন্দ্রনাথ, প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, মহেন্দ্র ইত্যাদি। বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে আমরা চাহিয়া থাকি কিন্তু দৃষ্টি আরো একটু ঘুরাইয়া ফেলিলে দেখিতে পাইব, কি ভয়ানক প্রাণহীন অন্ধকারের সমুদ্র ! সেই অন্ধকার সমুদ্রের দিকে চাহিয়া মনে হয়, এই মহাদ্যুতি সূর্য্য কেমন করিয়া ঐ সমুদ্র মথিয়া উঠিল !

এই সমস্ত কথা বলিতেছিলাম, কেননা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্ন-প্রয়াণকে বুঝিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা রচিত হইয়াছিল পঞ্চাশ বৎসর আগে—রবীন্দ্র-সাহিত্যের পূর্ব্বে। বাংলা-ভাষা তখনও কিশোর-কবির মনে নীরবে নব-সৃষ্টির আশায় বসিয়াছিল, বাংলার কথায় ও সুরে তখনও সহজ-দেবতা ধরা দেন নাই। পঞ্চাশ বৎসরের সাধনার বলে দিগ্বিজয়ী কবি আজ বাংলা ভাষা ও ভাবের অঙ্গে যে অপূর্ব্ব নিপুণতা ও লীলার সঞ্চার আনিয়াছেন তখনকার দিনে ভাষার ও ভাবের সে সহজ মিলন ও তাহাদের অপূর্ব্ব লীলাময় গতি দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্ন-প্রয়াণে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, যেন তরুণ রবীন্দ্রনাথ স্বপ্ন-প্রয়াণের অঙ্গের আড়ালে লুকাইয়া আছেন। বাংলা ভাষা আজ যে নমনীয়তার অধিকারী হইয়াছে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে স্বপ্ন-প্রয়াণে তাহার সুস্পষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

ভাষার ক্রমোন্নতির ফলে দেখা যায় যে, ভাষার অর্থের পরিসর ক্রমশ বাড়িয়া যায়। অল্প কথায় এমন ভাব প্রকাশ করা যায়, যাহার ভাব বহুদূর বিস্তৃত ; অনেক সময় শব্দ এমনি হইয়া ওঠে যে, সে তাহার অভিধানগত অর্থকে ছাড়াইয়া এক বৃহত্তর সূক্ষ্ম সত্তা গ্রহণ করে। শব্দ তখন মনোময় হইয়া ওঠে। তাহার অর্থ তখন অভিধানকে ছাড়াইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে

এই মনোময় জগতে আনিয়াছেন। এই মনোময় জগতে শব্দ শুধু একটা ইঙ্গিত হইয়া ওঠে; সীমাবদ্ধ অক্ষরের ভাষা হৃদয়ের যে সব অসীম কামনা ও বেদনা তাহারই প্রতীক্ হয় এবং অর্থে যাহা বলিয়া বুঝাইতে পারে না ইঙ্গিতে তাহা বুঝায়। রবীন্দ্রনাথের এই ইঙ্গিতময়ী অপূর্ব্ব ভাষা দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্ন-প্রয়াণের মধ্যে পাই। দ্বিজেন্দ্রনাথই প্রথম এই ভাষা প্রয়োগ করেন। সেই সময়কার অন্যান্য কবিদের সহিত রবীন্দ্রনাথের যে স্পষ্ট প্রভেদ চোখে লাগে তাহা মনে হয় ভাষার এই ক্রমোন্নতির জন্য। হেমচন্দ্র অথবা নবীনচন্দ্রের ভাষা এই দূরপ্রসারী ইঙ্গিতময় সত্বা লাভ করে নাই।

সুদূর নগর গ্রামে বাজে দ্বিপ্রহর

অথবা—

মহাকবি আদিকবি—
ছন্দে উঠে শশি রবি
ছন্দে পুন অস্তাচলে যায়—

একেবারে রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ভঙ্গী! মনে হয় রবীন্দ্রনাথের—

"ছন্দে উঠিছে তারকা
ছন্দে কনক রবির—"

এই ভাষার সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষার সংযোগ আছে। স্বপ্ন-প্রয়াণের ভাষা অপূর্ব্ব। এই রকম সহজ লীলাময় ভাষায় বাংলা সাহিত্যে আর কোন কাব্য লেখা নাই। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় বহু নব শব্দ দিয়াছেন ও বহু শব্দে নব নব ভঙ্গী দিয়াছেন— দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ব্বেই সে কাজে হাত দেন।

অই মম তপ
অই মম জপ
অই চাঁদে উনমাদ বাসনা-জলধি।

অথবা—

আমরা যখন যাব বন-সামিয়ানা তল দিয়া..."

ডাকিলে সাড়া দিবার নাহি-লোক!
নিশ্বাসিয়া ওঠে ঝাউ কত যেন হইয়াছে শোক!
শাখা-বাহু উচ্ছসিয়া খেদায় আলোক্—

(রবীন্দ্রনাথ—"অরণ্য উদ্যত-বাহু করে হাহাকার")

অথবা—

গীত মাত্র পিয়া
রহে যেন জিয়া!
শুনিতে শুনিতে আঁখি উঠিল বাদলি'।

অন্যত্র—

এই বেলা পড় সরি; পরে বলে করো না আড়াল
ঝাট দিয়া ফেলি তারা-কুসুমের এসব জঞ্জাল,
আসিছেন প্রভু মোর ত্রিলোক বাঞ্ছিত-দরশন

অথবা—কবির বিষয়ে বলিতে গিয়া সেখানে বলিয়াছেন—

চিরকাল তুমি অরণ্যের পাখী, থাকিবেও তথা
চিরকাল! বলিতেছি আমি সেই অরণ্যের কথা,
যে অরণ্য বাতাসের সনে মুখামুখি কথা কয়
ডরে না ঝড়ে ঝাপটে, দিগন্ত-প্রাচীরে বদ্ধ নয়, . . . * *

এবং—

সন্ধ্যা না হইতে যবে—পূর্ণিমার প্রেম পিপাসায়
পূর্ব্ব দিকে শশী
উঠি' আছে বসি
ফুল কুড়াতেছি মোরা বকুল তলায়।

এই সমস্ত উদাহরণে দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষার অপূর্ব্ব ভঙ্গী ও সহজ সৌন্দর্য্য স্পষ্ট বোঝা যায়। লালসার রূপবর্ণনায় ও অন্যান্য স্থলে প্রায়ই কবি ভারতচন্দ্রের কথা মনে পড়ে। ভাষার স্বচ্ছন্দ গতির দিকে চাহিয়া মনে হয়, স্বপ্ন-প্রয়াণের কবি যেন ভারতচন্দ্রের স্মৃতিকে বহন করিয়া আনিয়াছেন।

এখন স্বপ্ন-প্রয়াণের স্বপ্নের কথা বলা প্রয়োজন।

"জীবন স্মৃতি"তে রবীন্দ্রনাথ এই কাব্য-সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "বড়দাদা তখন দক্ষিণের বারান্দায় বিছানা পাতিয়া সামনে ছোট ডেস্ক লইয়া স্বপ্ন প্রয়াণ লিখিতেছেন। বড়দাদা লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন আর ঘন ঘন হাস্যে বারান্দা ভরিয়া উঠিতেছে। * * * বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে তেমনি স্বপ্ন-প্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়ীময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই। বড়দাদার কবি-কল্পনায় এত প্রচুর প্রাণ-শক্তি ছিল যে, তাঁহার যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে তিনি ফলাইতেন বেশী। তাই অনেক লিখিয়া ফেলিয়া দিতেন। সেই গুলি কুড়াইয়া রাখিলে বঙ্গসাহিত্যের একটী সাজি ভরিয়া তোলা যাইত। * * স্বপ্ন-প্রয়াণ যেন একটা রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ। তাহার কত রকমের কক্ষ, গবাক্ষ, চিত্র, মূর্ত্তি, কারু-নৈপুণ্য। * *"

স্বপ্ন-প্রয়াণের যে কবি একদিন অমর্ত্ত্য লোকে কল্পনার প্রেমে বিমোহিত হইয়া মন্দাকিনীর সলিল-সিকতার সহিত আপনার বেদনার অশ্রু মিশাইয়াছিলেন সে কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বয়ং।

জগতে দুই শ্রেণীর কবি ও কাব্য দেখা যায়। একজনের কাব্যই জীবন, অপর জনের জীবনই কাব্য। দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনখানি একখানি কাব্য। আদিম কবির সারল্য ভরা, একান্ত জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত একখানি মধুর কাব্য। স্বপ্ন-প্রয়াণের নায়ক কবি-কল্পনার প্রেমে বিমোহিত হইয়া তাহার হাতে

ধরা দিবার জন্য জীবনখানি প্রদীপ-শিখার মত সারা রাত্রি ব্যাপিয়া একান্ত নির্ভরে জ্বালিয়া রাখিয়া ছিল, ঠিক সেই রকম দ্বিজেন্দ্রনাথ সমস্ত জীবন মঙ্গলময় জ্ঞানের আরাধনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন—যে জ্ঞান তাঁহাকে এমন সুন্দর ও মহান্ এক অনুভূতি দিয়াছিল, যাহার সাহায্যে সত্যই তিনি জীবন দিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন—"সর্ব্বা দিশা মম মিত্রং ভবন্তু"—সমস্ত দিক আমার মিত্র হউক! "মিত্রস্যচক্ষুষা সমীক্ষামহে,"—মিত্রের চক্ষু লইয়া আমরা দেখি।

শান্তি-নিকেতনের আমলকী-কুঞ্জের নিত্য-অভ্যাগত পরদেশী বিহঙ্গমরা আকাশ-যাত্রার অবসরে আর অভ্যর্থনার জন্য সেই পরম স্নেহময় গৃহস্বামীটিকে দেখিতে পাইবে না। নিত্য অভ্যস্ত চড়ুই-এর দল অন্ধ অভ্যাসের বশে বারে বারে আসিয়া ফিরিয়া যাইবে। তপোবন পরিত্যাগ করিয়া তাপস চলিয়া গিয়াছেন; তাপসের স্নেহ-মন্ত্র সঞ্জীবিত সমস্ত নির্ব্বাক অরণ্য ব্যথিত হইবে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন বিশ্রাম করিতেন তখন গণিতের কোনও গূঢ় তত্ত্ব লইয়া চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। সেই সময় তিনি বলিতেন, "এই সবে একটু বিশ্রাম করিতেছি।"

"অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও স্বেচ্ছায় তিনি দরিদ্র ছিলেন। পিতৃদত্ত মাসহারার সবটাই জ্যেষ্ঠপুত্র দীপেন্দ্রনাথের হাতে যাইত, নিজে কিছুই রাখিতেন না। তাঁর নিয়মিত আহার বস্ত্রের কখনো অপ্রতুল হইত না কিন্তু একটী কাম্যবস্তুর অভাব মধ্যে মধ্যে অনুভব করিতেন—সেটী লেখার জন্য ও বাক্স তৈরীর জন্য কাগজ। একদিন শুনি, জোড়াসাঁকোতে তাঁর চাকরকে কাকুতি মিনতির স্বরে বলিতেছেন—দীপুকে গিয়ে বলিস্, আজ যদি আমায় একটা দোয়ানি দেয় আমি একখানা খাতা আনাই।"*

স্বপ্ন-প্রয়াণ লিখিয়া কবি যখন যাহাকে পাইতেন তাহাকেই শোনাইতেন। শ্রোতার জ্ঞানবুদ্ধির তারতম্যের কথা একেবারেই মনে থাকিত না।

"তিনি আমাদের (সরলা দেবী) শ্রোতা করে তাঁর স্বপ্ন-প্রয়াণ শোনাতেন, ভালো বুঝতে পারতাম না। তাতেই মজা লাগত। মুখ চেপে হাসি টিপে রাখতাম, বাইরে এসেই হেসেই সারা। একদিন আমাদের সঙ্গে তারা দাসীও শ্রোতৃবৃন্দের একজন ছিল। শুনতে শুনতে সে গড় হয়ে প্রণাম করলে। বড়মামা (দ্বিজেন্দ্রনাথ) উচ্চহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, "ও কি? প্রণাম করছিস কাকে?" সে বল্লে, "ঠাকুর দেবতার নাম শুনলে পেন্নাম কত্তে হয় না।"

স্বপ্ন-প্রয়াণের যাঁহারা ঠাকুর-দেবতা তাঁহাদের নাম কবি, কল্পনা, মায়া, লালসা, কামনা আনন্দ ইত্যাদি। অবশ্য ইঁহারাই জীবনের দেবতা। ইঁহাদের পাষাণ-দেউলে অহরহ মানব দলে দলে আহুতি দিয়া চলিয়াছে।

স্বপ্ন-প্রয়াণের রূপকের বাহ্য-অংশকে বলা যাইতে পারে কবির সহিত কল্পনা দেবীর পরিণয়। স্বপ্ন-প্রয়াণে দ্বিজেন্দ্রনাথ একটী কবির সৃষ্টি করিয়াছেন, যে কবি বিশ্বের অন্তর লোকের অধিষ্ঠাতা আনন্দময় পুরুষ।

---

* শ্রীমতী সরলা দেবী

স্বপ্তিতে ডুবিয়া গেল জাগরণ
সাগর-সীমায় যথা অস্ত যায় জলন্ত তপন

তখন স্বপ্ন আসিয়া কবির শিয়রে পদ্ম-কর বুলাইল। স্বপ্নের পদ্ম-পরশে কবি "অচেতন হইয়া চেতন লাভ করিল—ঘুমন্তে জাগিল।"

স্বপ্নের কৃপায়
অন্ধে আঁখি পায়

সেই স্বপ্ন-দৃষ্টির সাহায্যে কবি ছায়াপথ দিয়া স্বপ্ন-দেবীর সঙ্গে চলিয়াছেন। কোন্ কূলহীন পারাবারে কামচারী রথ চলিয়াছে কবি জানে না। সারথীও নির্বাক। ইহা কবির বাস্তব-রাজ্য হইতে মনোরাজ্যে প্রয়াণ। সেখানে,

দীপে স্বর্ণরেণু
চরে কামধেনু
কল্পতরু ছায়া তলে রত্নে হাসে ধরা।

সেইখানে রহিয়াছে বিগত আনন্দের পৃথিবী। সেইখানে আদি-জননী মায়ার স্বর্গ-ভবনে কল্পনার সহিত কবির দেখা। তারপর কবি রসাতল ও স্বর্গ সমস্ত ঘুরিয়া দেখেন, লালসা, কুৎসা ঘৃণা, পাপ কি কি রকমে আপনার প্রতাপ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত রূপকের বর্ণনায় মানবী-ভাব এত সুন্দর ফুটিয়াছে যে, এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার পরিচয় দিতে গেলে রসহীন নীতি-কথার মত শোনাইবে। কবির কল্পনা-দেবীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থা, বিষাদপুরের দৃশ্য, লালসার রূপ ও কীর্ত্তি—এমন সরল ও সহজ, যে কখনই মনে হয় না যে, কোনও নীতির রূপক পড়িতেছি। এই সমস্ত ঘটনার উপর কাব্যের একটা সুন্দর আবরণ আছে যাহা পাঠ করিলেই প্রতীয়মান হয়। স্বপ্ন-প্রয়াণের শেষে নায়ক-কবি বিষাদে অধীর হইয়া বলিতেছেন,

কবি কহে, কাহারে দুষিবে কেবা, সব পৃথিবীর
অই দশা নিরখিয়া মন মোর হয়েছে অধীর—
কিছুতে না হয় তৃপ্ত! কি আছে এ-ছার ভব-ধামে
আছে বটে প্রেম-রত্ন! কিন্তু কোথা! প্রেম শুধু নামে!
চাবি-বন্ধ হৃদয় সকলি প্রায়, দৃঢ় মুষ্টি কর!
পদ প্রসারিতে মানা চারিদিকে গণ্ডি-আঁকা ঘর।

কবির সমস্ত ভ্রমণের মধ্যে যে সমস্ত অন্যায় ও অত্যাচারের ছবি দেখিয়াছেন তাহার স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত হইয়া কবির চিত্ত জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কোথাও—

এর অভিমান উঠে সকল হইতে উচ্চে চড়ি'
সাধ যায় চরাচর পদতলে যাক্ গড়াগড়ি
ও দাঁড়ায় কর-যোড়ে অত্যাচার ভারে অবনত

এই লালসা আর হীন বাসনার জগৎ হইতে কবির বিষাদ-কণ্ঠে চায় সেই স্থান, যেখানে—

"* * * হৃদয় সবার—
এক ছাঁচে ঢালা, কেহ নহে পর, এক বাসস্থান
সকল জগ-জনের, ক্ষুধা তৃষ্ণা সবার সমান।

আজ স্বপ্ন-প্রয়াণের স্বপ্ন-লোক ছাড়িয়া বিংশ শতাব্দীর জাগর বাস্তব-লোকে হিংসা আর লালসার সংগ্রামের শ্রান্ত অবসানে সেই প্রশ্ন উঠিয়াছে—

কোথায় সেই স্থান? মানব কি আবার মিলিবে না আপনার আদি-গৌরবে? কাহার অন্তরে সেই মন্ত্র আছে যার তেজে মানবের মহাযজ্ঞশালার দুয়ার আবার খুলিবে? জেনোয়ার মন্ত্রণা-সভায়? ভার্সেই কন্‌ফ্যারেন্সে? লুকার্ণোর চুক্তিতে?

এ প্রশ্ন আজ পৃথিবীর উপরে চন্দ্র সূর্য্যের মত দুলিতেছে। এ প্রশ্ন দুলুক্ কিন্তু স্বপ্ন-প্রয়াণের ঋষি-কবি তাঁর স্বপ্ন-কাব্যে কবিকেই ভার দিয়াছেন এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য। নায়ক-কবিকে সুসঙ্গ বলিতেছে—হে কবি, তোমার কণ্ঠে বিলাপের ধ্বনি কেন? তুমি অরণ্যের পাখী, তোমার মুখে বিলাপের ধ্বনি কি সাজে? তুমি চিরকাল অরণ্যের পাখী—যে অরণ্য বাতাসের সঙ্গে মুখামুখি কথা কয়, যে অরণ্য ঝড়-ঝাপটে ভয় করে না—দিগন্ত প্রাচীরে বদ্ধ নয়—তুমি সেই অরণ্যের পাখী? তোমার কণ্ঠে বিলাপ ধ্বনি? তোমার বাণীতে আছে অসাধ্য সাধন মন্ত্র! তুমি আঁধার নিশীথে প্রভাত সূর্য্যকে ডাকিয়া আন—দুরন্ত শীতে তোমার কুঞ্জ-ভবনে তুমি শিশিরকে বাষ্প করিয়া উড়াইয়া দক্ষিণ বাতাসের পথ করিয়া দাও—অসাধ্য সাধন-মন্ত্র তো তোমার কণ্ঠে!

এই অসাধ্য সাধন মন্ত্র আজ ভারতের দিগ্বিজয়ী কবির তন্ত্রীতে বাজিতেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথের বীণায় অগ্নি-মূর্ত্তি লইয়া উঠিতেছে—সে অগ্নির তেজে দিগন্তের অন্ধকার সমুদ্রের এ-পারে আর ও-পারের মাঝখানে মাঝে মাঝে এক আলোর স্বপ্ন-সেতু সৃষ্টির সাড়া পাওয়া যাইতেছে, আবার কখন তরল অন্ধকারের তাম-স্রোত আসিয়া পড়িতেছে। শুধু উর্দ্ধে সেই প্রশ্নটী একটী তারার মত জ্বলিতেছে—মানবের মহাযজ্ঞশালার দুয়ার খুলিবে কবে?

কল্লোল



সুকুমার রায়চৌধুরী

জন্ম—১৩ই কার্ত্তিক, ১২৯৪ মৃত্যু—২৪শে ভাদ্র, ১৩৩০

U. Ray & Sons, Calcutta



তৃতীয় বর্ষ

দ্বাদশ সংখ্যা

চৈত্র, সন ১৩৩২ সাল

প্রতি সংখ্যা চারি আনা

মাশুলসহ বার্ষিক তিন টাকা আট আনা

সম্পাদক—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

কল্লোল পাবলিশিং হাউস

১০।২ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

ষষ্ঠ বর্ষ
১৩৩২
চৈত্র

বার্ষিক
৩৷০ আনা
প্রতি
সংখ্যা
/০ আনা



আবার "বিজলী" আপনাদের শুভকামনা ও সহানুভূতি লইয়া বাহির হইল। যাঁহারা পুরাতন গ্রাহক ও যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সকলের নিকটই 'বিজলী'র সনির্ব্বন্ধ নিবেদন, নানা অনিবার্য্য কারণে এতদিন পত্রিকা প্রকাশ করিতে না পারিয়া গ্রাহক অনুগ্রাহকবর্গের বিরাগভাজন হইলেও, এই অনিবার্য্য ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া তাঁহারা যেন কেহই বিজলীর প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে কার্পণ্য না করেন।

গ্রাহক ও বিজ্ঞাপন সম্বন্ধীয় চিঠি পত্র ও টাকা কড়ি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

রচনা প্রভৃতি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

এখন হইতে প্রতি সপ্তাহে বিজলী নিয়মিত পাইবেন এবং বিজলীর বিচিত্রতা আপনাদিগকে মুগ্ধ করিবে একথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি।

সম্পাদক—শ্রীঅরুণচন্দ্র সিংহ, শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

কার্য্যালয়:—৯৩৷১এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১২শ সংখ্যা
তৃতীয় বর্ষ



চৈত্র
১৩৩২

মরুভূমি

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

হে মরণ-মূর্চ্ছাহতা, পিপাসিনী, হে ভৈরবী মরু,
বাজাও বাজাও তব পিপাসার প্রচণ্ড ডমরু,
যন্ত্রণার কর্কশ ঝঙ্কার ;
হে কঙ্কালী, নৃত্য কর দাবদগ্ধ রৌদ্রের আহ্লাদে,
চিত্তেরে বিচ্ছুরি' তোল বালুকা-বিক্ষিপ্ত আর্ত্তনাদে,
হান হান ধূলির ফুৎকার !

তৃষ্ণার অনলকুণ্ডে স্নান করি' হে রুদ্রা তাপসী,
পবিত্র পাবক-স্তোত্র দিগ্বিদিকে তুলিছ উচ্ছ্বসি'
উদ্দাম জ্বালার জয়োল্লাসে ;
নবসূর্য্যে জন্ম দিলে আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপ্ত অগ্নিতে,
তৃষার নির্ঘোষ ঘোষ' নিষ্ঠুর সে সূর্য্যের স্তুতিতে,
নিদারুণ তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে !

জলজ্জটা, বিবসনা, খুলেছ কৃত্রিম আবরণ,
বৈরাগিনী, দিয়াছ যে দুর্ব্বল লজ্জারে বিসর্জ্জন,
কি সুন্দর জ্বলন্ত নগ্নতা!
বন্ধন বিচূর্ণ করি' দেখায়েছ গুপ্ত ভয়ঙ্করে,
বাহিরে এনেছ, প্রিয়া, লুক্কায়িত লোলুপ অন্তরে,
বিস্তীর্ণ বিপুল ব্যাকুলতা!
হে নির্লজ্জা, জরাহীনা, আপনারে করি উন্মোচন,
দেখাইলে তৃষাদগ্ধ ভীষণ সে অনন্ত যৌবন,
নবোদ্ভিন্ন পুষ্প কামনার;
বক্ষ ভরি' কার তরে সঞ্চিয়াছ বিস্তীর্ণ বিরহ,
বিদগ্ধ ললাটে নাহি বর্ষার সজল অনুগ্রহ,
নাহি নাহি অশ্রুর আষাঢ়!
কোনো শষ্প তৃণাঙ্কুরে স্তন্য নাহি দিলে, হে পাষাণী,
হে বন্ধ্যা, তোমার বক্ষে দুর্ভিক্ষের হাহাকারখানি
কাঁদে রুক্ষ রিক্ততায়;
অতন্দ্র আকাঙ্ক্ষা জ্বালি' ধ্যান কর কা'রে সন্ন্যাসিনী,
রৌদ্রের অক্ষরে লেখা দুঃখের অলক্ষ্য লিপিখানি,
পাঠ কর তীব্র ব্যগ্রতায়!
মায়াবিনী, হে ছলনাময়ী মরু-ভূমি-মালবিকা,
বুকে কাঁপে দিশাহারা পথভোলা তৃষা-মরীচিকা—
আপনারে দেখাও স্বপন;
হে প্রিয়া, পিপাসাক্লিষ্টা, কা'রে তুমি করিছ সন্ধান,
হেথা এস দুঃখ নিয়ে, এই বুকে অগ্নি-অনির্ব্বাণ
পাতিয়াছি বাসক-শয়ন!
হেথা এস এই বুকে তোমার বিরহখানি নিয়া,
নিগূঢ় সৌন্দর্য্যখানি নগ্নতায় দাও প্রজ্বালিয়া
অশ্রুহীন অশ্রান্ত উৎসাহে;
বন্ধহীন বেদনার দীর্ঘশ্বাসে হান সর্ব্বনাশ,
বহ্নি-প্রিয়া, ধন্য কর,—আনন্দ-বিদীর্ণ অট্টহাস—
প্রত্যাশার প্রখর প্রদাহে!

বিজলী

শ্রীবিমলা দেবী

(১)

'কানা ছেলের নাম 'পদ্মলোচন' এ বিড়ম্বনা আর কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছিল কিনা জানি না, তবে বিজলীর ভাগ্যে ঘটিল বটে। দেবতা অপদেবতা সাধু সন্ন্যাসীর পায়ে অনেক তৈল খরচ করিয়া যে-দিন বিজলী জন্মগ্রহণ করিল, সে-দিন বিজলীর মাতা শুভ্রা আদর করিয়া কন্যার নাম রাখিয়াছিলেন বিজলী।

বিজলী যে বিজলীর বিপরীত তাহা বলা বাহুল্য। বিজলী ত দূরে থাকুক, তাহার বর্ণ এতই কালো হইল যাহাকে—'অমাবস্যা' বলিলে কাহারও আপত্তি করিবার সম্ভাবনা ছিল না; মেয়েটার মুখে একটা সহজ শ্রী ছিল বটে কিন্তু সেও সাধারণ পাঁচজন অপেক্ষা কিছু বেশী নয়। কিন্তু বিধাতা এইটুকুতেই ক্ষান্ত রহিলেন না। বিজলীর জন্মের তিনমাস পরে শুভ্রা সহসা তিনদিনের জ্বরে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তখন শ্রীহীনা 'মা-খাকী' মেয়েটার উপর আত্মীয় স্বজন আর প্রতিবেশীরা পর্য্যন্ত হাড়ে চটিয়া গেলেন। মাকে টপ্ করিয়া একেবারে গিলিয়া ফেলিয়া এ হতভাগা শ্রীহীনা মেয়েটার বাঁচিবার যে কি প্রয়োজন ছিল, অনেক গবেষণা করিয়াও কেহ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলেন না।

ঠাকুর-মা কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, 'আমার কপাল, আর কি বলব বল! না হ'লে এমন অলুক্ষণে মেয়েই বা জন্মাবে কেন? আর তাও যদি একটা ছেলে হ'ত ছাই! একে ত মেয়ে, তায় ঐ রূপের ডালি!'

মাতা যত আদর করিয়াই 'বিজলী' নাম রাখিয়া থাকুন, বিজলীর ভাগ্যে আবর্জ্জনার মত একবার এখান হইতে ওখানে, আবার ওখান হইতে এখানে ফেলাই ঘটিল।

ফেলাও যায় না অথচ রাখাও যায় না এমন একটা বোঝা লইয়া সকলেরই বিরক্তিতে মনটা ভরিয়া উঠিল।

সুদীর্ঘ একমাস ধরিয়া মৃতা বধূকে উদ্দেশ করিয়া এই শ্রীহীনা হতভাগা মেয়েটার আগমনী ঘোষণা করিয়া, প্রত্যহ একচোট সকাল বিকাল চীৎকার করিয়া সহসা একদিন বসন্ত-ঠাকুরাণী আবিষ্কার করিলেন, গৃহে আর একটী বধূর প্রয়োজন হইয়াছে। আবিষ্কার এবং আবিষ্কারটাকে কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব হইল না। একদিন বিজলীর পিতা রামতনু বাবু বসন্ত-ঠাকুরাণীর 'মনমিছরির' দৌহিত্রীকে বিবাহ করিয়া লক্ষ্মীশূন্য গৃহে লক্ষ্মীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

'মনমিছরির' দৌহিত্রীর পিতামাতা কন্যার 'কুটিলা' নামকরণ না করিয়া কেন যে 'সুশীলা' নামকরণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারাই জানেন; তবে নামটার সহিত তাহার ব্যবহারের যে কিছুমাত্র ঐক্য ছিল না তাহা বলা বাহুল্য।

নববধূ আসিবার পর বাড়ীর পুরাতন দাসী হরিমতী—যে মাতৃহারা হইবার পর বিজলীর লালন পালনের ভার লইয়াছিল—যখন বিজলীকে লইয়া আসিয়া কহিল, 'বৌ-মা, এ মেয়েটা তোমারি, আহা মেয়েটা জন্মাতে না জন্মাতেই মা'টা গেল মরে, তা মা তুমি ভালমানুষের ঝি, তুমিই একে মানুষ কর।' তখন বধূ বিজলীকে স্পর্শ করা ত দূরে থাক বর্ত্তিকাকারে নাকটা যথাসম্ভব কুঞ্চিত করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল; ব্যাপার বুঝিয়া কেহ আর এ প্রসঙ্গ নববধূর নিকট উত্থাপন করিতে সাহস করিল না। এমনি করিয়া ঘরে বাইরে বিশ্বের লাঞ্ছনা ও অনাদর কুড়াইয়া এই অপ্রয়োজনীয় মেয়েটী বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

(২)

যাহার প্রয়োজন নাই, এমন কি যে না থাকিলে ক্ষতি অপেক্ষা লাভই বেশী তাহাকেও থাকিতে হয়; এবং এই জোর করিয়া টিঁকিয়া থাকার মত বিড়ম্বনা পৃথিবীতে বোধ হয় অল্পই আছে।

এ বাড়ীতে বিজলীর কণামাত্রও প্রয়োজন ছিল না, তবু তাহাকে থাকিতেই হইত; কারণ এ আবর্জ্জনা ফেলিবার স্থান বিশ্বে কোথাও ছিল না। যেখানে ফেলা সহজ সেই মাতুলালয়েও এমন কেহ ছিল না যাহার কাছে এ অনাবশ্যক বোঝাটা দূর করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। দূর সম্পর্কে এক মাসী আছে বটে, কিন্তু সে-ই বা লইবে কেন আর লইলেই বা প্রতিবেশীদের বাক্যজ্বালায় দেওয়াই বা যায় কি করিয়া? অনন্যোপায় হইয়া

এ বাড়ীর সকলের মনের পুঞ্জীভূত রাগ এই সহিষ্ণু অল্পভাষিণী বালিকাটীর ঘাড়ে ক্ষিপ্রবেগে বর্ষিতে আরম্ভ করিল। শিশু বয়স হইতে লাঞ্ছনা সহিয়া সহিয়া বিজলী ক্রমেই আপনার মধ্যে আপনি এমনি গভীর ভাবে গোপন হইতে শিখিয়াছিল, যেখানে সহসা কেহ প্রবেশ করিতে সাহস করিত না। শিশু বয়স হইতেই সে প্রাণপনে আপনাকে গোপন করিয়া চলিতে চেষ্টা করিত। নিজেদের 'প্রাইভেট কমিটী'তে যখন সঙ্গিনীদল অসঙ্কোচে আপনাদের মনের সাধ ইচ্ছা ব্যক্ত করিত, তখনও এই অল্পভাষিণী মেয়েটী চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। জনহীন ঘরে হয় ত কোন দিন বসিয়া বিজলী একখানা বই পড়িতে চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় যদি একটী দুই বৎসরের শিশুও সেই কক্ষে প্রবেশ করিত, অমনি সে ত্রস্তে সেখানা চাপা দিয়া দিত; ভয় পাছে কেহ তাহার এ হাস্যকর বিদ্যাভ্যাসের প্রয়াসটুকু দেখিয়া লয়। এমনি করিয়া নিরন্তর নিজেকে গোপন করিতে করিতে বিজলী এমনি অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল যে, সামান্য কোন সাধ বা ইচ্ছাও সে ব্যক্ত করিতে সাহস করিত না। শিশু বয়সে মাতৃহারা হওয়ায় নিজেকে গোপন করিবার চেষ্টা তাহার ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল।

সে দিনটা ছিল মেঘ ভারাক্রান্ত আষাঢ় মাস; এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; তখনও নীলাকাশকে মসিলিপ্ত করিয়া মেঘের দল আকাশ জুড়িয়া পড়িয়া ছিল। একেই ত বর্ষার আগমনীতে কলিকাতা সহরের মুখ ভার হইয়া উঠিয়াছে; আবর্জ্জনার পচা গন্ধে ও জল কাদায় কলিকাতার গলিগুলির দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে, তাহার উপর বিকাল হইবা মাত্র রন্ধনগৃহের গাঢ় ধূমে ও 'কলের' ধোঁয়ায় কলিকাতার আষাঢ় গগন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। বর্ষার আগমনীতে সহরের যে পরিমাণে মুখ ভার হইয়াছে, তাহাতে তাহার না আসাই ছিল ভাল; কিন্তু অযাচিতকেও থাকিতে হয়; ভগবানের রাজ্যে এইটেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বিড়ম্বনা।

বৈকালিক কাজ কর্ম্ম সারিয়া, স্নান সমাপনান্তে বিজলী অনেক দিন পরে ছাতে আসিয়া দাঁড়াইল। আজকাল তাহার ছাতে ওঠা বারণ; অত বড় মেয়ে ছাতেই বা উঠিবে কেন? বিমাতার কঠিন শাসনে সে ছাতে ওঠা ছাড়িয়াই দিয়াছিল।

সকাল বিকাল রন্ধনগৃহের ধোঁয়ায় যখন সমস্ত বাড়ীটা ভরিয়া যাইত এবং সুশীলা যখন ধোঁয়ার হাত এড়াইবার চেষ্টায় ছাতে গিয়া উঠিতেন তখনও

সে যে-কোন কাজ লইয়া নীচেই বসিয়া থাকিত; বর্ষাকালের ভিজা কয়লার আগুন কিছুতেই ধরিতে চাহিত না, এবং কয়লার এই অবাধ্যতায় সমস্ত বাড়ীখানি ধোঁয়ার তীব্রতায় ভরিয়া উঠিত! কখনও যদি বিজলী ধোঁয়ার হাত এড়াইবার চেষ্টায় জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইত, বসন্ত ঠাকুরাণী অথবা সুশীলা 'হাঁ হাঁ' শব্দে ছুটিয়া আসিতেন। অত বড় অবিবাহিতা মেয়ের জানলার কাছে দাঁড়াইবারই বা প্রয়োজন কি?

আজ কিন্তু সে অনেক দিন পরে বিমাতার কঠিন নিষেধ ও বসন্ত ঠাকুরানীর অন্তর টিপুনি সমস্ত ভুলিয়া ছাতে আসিয়া দাঁড়াইল; এবং অনেক দিন পরে হাওয়ায় হাঁপ ফেলিতে পারিয়া তাহার মনটা এমনি আচ্ছন্ন হইয়া গেল যে, ভিজা ছাতেরই এক কোণে সে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

আকাশের পশ্চিম প্রান্ত ছিন্ন করিয়া সারাদিনের পর সূর্য্যদেব প্রকাশ পাইয়া কলিকাতার অট্টালিকা সমূহের পিছনে সূর্য্যদর্শনাকাঙ্ক্ষীদের দর্শনাকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখিয়াই লুকাইতে আরম্ভ করিয়া ছিলেন। বিজলী তন্ময় হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার বালিকা-হৃদয় সূর্য্যের প্রকাশ ও ঢলিয়া পড়ার সৌন্দর্য্যে কবিতার ভাষায় পুরিয়া ওঠে নাই সত্য, কিন্তু মন তাহার অসীম আনন্দে কেবলি বলিতেছিল, 'কি সুন্দর'! কিন্তু কোন সুন্দর বস্তুকে উপভোগ করিবার অধিকার বোধ করি এই ভাগ্যহীনা মেয়েটির অদৃষ্টে তাহার বিধাতা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন; বিজলী যখন তন্ময় হইয়া সমস্ত ভুলিয়া একাগ্র দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতেছিল, ঠিক সেই সময় সুশীলা ছাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তদবস্থায় বিজলীকে দেখিয়া একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন—হতভাগা মেয়েটাকে সারা বাড়ী খুঁজে এলাম, বলি গেল কোন্ চুলোয়; আর উনি এখানে—রস করে বসে রয়েছেন। ওমা আমি কোথায় যাব গো! কত করে বারণ করি—বলি, তুই বড় হয়েছিস্, এমন করে যখন তখন হট হট করে ওপরে গিয়ে বসা ভাল দেখায় না—বাস্ কেন। তা' কথা কি কারুর কানে ঢোকে। ভাবে ও কোথাকার কে মাগী চেঁচাচ্ছে, চেঁচাক গে যাক্। আচ্ছা রোস্ না—রোজ রোজ তোর বাড় আমি ভাঙছি; আসুক না আজ বাড়ী; কেমন মজাটা দেখাই। হতভাগা মেয়ে। কথা শেষ করিয়া সুশীলা সিলিটারী মেজাজে পা ফেলিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। বিজলী অপরাধীর মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিল।

নীচে তখন রীতিমত যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। সন্ত অফিস প্রত্যাগত রামতনু

বাবুর সম্মুখে কুন্তির ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া সুশীলা আজিকার সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিলেন—কত করে বল্লাম, বেশ ত ছেলে যদি না-ই পাওয়া যায়, তা' বলে ত আর মেয়ে থুবড় করে রাখা যায় না। আমার সেজ বো'র ভাই রয়েছে গোকুল, তার সঙ্গে দাও! দ্বিতীয় পক্ষটা মরে ত মোটেই বিয়ে করতে চায় না, তা আমরা জোর করে বল্লে কিছু 'না' বল্‌তে পারত না। তা হ'ল না, বড় না রূপের মেয়ে, তাই তার জন্যে রাজপুত্তুর জামাই করবে। তোমার যা' ইচ্ছে কর গে যাও, কিন্তু এই আজ আমি বলে রাখ্‌ছি, ও মেয়ে যদি তোমার কুলে না কালী দেয় ত তখন বোল। এইটুকু বয়সে এত বাড়! ওমা আমি যাব কোথায় গো।'

রামতনু বাবু একেই ত কেরানী-কুলের মর্য্যাদা রক্ষার্থে যত প্রকার বদ মেজাজী রাগ আছে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহার উপর মেয়েমানুষের এত বড় বাড় শুনিয়া তাহার হাড় পর্যান্ত জ্বলিয়া গেল, এই আষাঢ়েই যদি বিয়ে দিয়ে ওকে দূর না করি ত—মস্ত কি একটা শপথ করিয়া তিনি সেই বেশেই তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেলেন।

(৩)

সেই দিনের সেই ঘটনার পর হইতে বিজলী আজকাল একটু বেশী রকম নিগ্রহ হইয়া পড়িয়াছে। আজ কাল জনহীন একা ঘরে বসিয়া থাকাও বিজলীর পক্ষে নিষেধ হইয়া গিয়াছে। কেন একলা ঘরে কি এখন রাজকার্য্যের চিন্তা আছে যাহার জন্য গৃহস্থ ঘরের অত বড় মেয়ে দিবা রাত্রি যখন তখন ঘরের কোণে গালে হাত দিয়া বসিয়া থাকিবে?

প্রথম প্রথম বিজলী পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনের এ সতর্কতার কারণ অনুমান করিতে পারিত না কিন্তু কয় দিনেই সে বুঝিয়া লইল, ব্যাপার কি! এবং তাহার পর হইতেই সকলের উপরে একটা অমানুষিক বিতৃষ্ণা ও নিগূঢ় ঘৃণায় তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ পুরিয়া উঠিল।

দিবা রাত্রি সন্দেহ ও লাঞ্ছনায় এই বালিকা মেয়েটী দুই দিনেই আশ্চর্য্য পরিপক্কতা লাভ করিল। দুই দিনেই তাহার এমন আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল, যাহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন; সুশীলা গালে হাত দিয়া কহিলেন, 'ওমা ঐটুকু মেয়ের পাকামী দেখেছ!' কিন্তু এই বালিকা মেয়েটীর পক্কতার জন্য যে তিনিই দায়ী, এ কথা তাঁহার মুখের উপর বুঝাইয়া দেয়, এমন স্ত্রী-পুরুষ সে

অঞ্চলে কেহই ছিল না। তাহার বালিকা-অন্তঃকরণ যে তাঁহাদেরই অশিষ্ট ইঙ্গিত, অমানুষিক লাঞ্ছনায় এমন পক্কতা লাভ করিয়াছে সে কথা সকলেই ভুলিয়া গেলেন, এবং দিন দিন তাহার লাঞ্ছনার মাত্রা বাড়িয়াই চলিল। এ মেয়েটীর দিবা রাত্রি অমানুষিক লাঞ্ছনায় কেহই একবার 'আহা' বলে না, সে যে মাতৃহারা শ্রীহীনা মেয়ে! হয় ত অভাগিনী বালিকার এ কঠোর লাঞ্ছনায়—অলক্ষ্যে অন্তর্যামীর চোখে দু' ফোঁটা অশ্রু দেখা দিয়াছিল, কিন্তু এই নিষ্ঠুর বিশ্বে তাহার জন্য একটু 'আহা' বলিবার উদারতাও কাহার ছিল না। 'মেয়েমানুষ' হইয়া যখন জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তখন লাঞ্ছনা ত অনিবার্য্য, তবে আর দুঃখ করিয়া লাভ কি?

সবে মাত্র বিজলী একরাশ পান লইয়া সাজিতে বসিয়াছে, এমন সময় 'মিলিটারী' চালে পা ফেলিয়া আপনার কোলের শিশুটীকে ক্রোড়ে লইয়া সুশীলা আসিয়া সেইখানে দাঁড়াইলেন এবং তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন, 'সকাল থেকে ঐ কটা পান সাজা আর তোমার শেষ হ'ল না? ছেলেটা যে সেই থেকে কেঁদে কেঁদে পায়ে পায়ে ঘুরছে তা তাকে একটু নিয়েও কি উপকার করতে পার না? ছেলে নিয়ে কি পান সাজা হয় না নাকি?' সুশীলার প্রশ্নের বিজলী কোন উত্তর দিল না; খোকাকে যখন তখন 'সোহাগ' করিয়া কোলে লওয়া যে সুশীলারই নিষেধ, সে কথা বিজলী বলিল না, কারণ সে অধিকার তাহার ছিল না! সে নীরবে চুন খয়ের পূর্ণ ডান হাতখানা অঞ্চলে মুছিয়া লইয়া খোকার দিকে হাত বাড়াইয়া কহিল, এস খোকামণি! 'খোকামণি' বিজলীর আহ্বানে প্রবল ভাবে মাথা নাড়িয়া 'দাব না দা' বলিয়া মাতার বুকে মুখ লুকাইল। সুশীলা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, বসে বসে 'এস খোকামণি' বলে সোহাগ করলে ত ও ছেলেমানুষ আগে যাবে। একটু গতর নাড়িয়ে ভুলিয়ে নিতে পার না? বিজলী উঠিয়া দাঁড়াইয়া খোকার হাতের কাছে তাহার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত সুপারী কুচাইবার জাতিটা তুলিয়া ধরিয়া কহিল— 'এটা নেবে?' খোকা লইবার জন্য হাত বাড়াইতেই বিজলী হাতটা সরাইয়া লইয়া কহিল, 'তবে কোলে এস।' এ প্রলোভন বড় প্রলোভন, কয়েক বার ইতস্তত করিয়া খোকা বিজলীর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বিজলী অন্যমনস্ক ভাবে পান সাজিতেছিল, এবং খোকা সানন্দে হাতের কাছে অনেকগুলি লোভনীয় বস্তু পাইয়া একবার এটা, একবার সেটাকে রসনায় ঠেকাইয়া দেখিতেছিল কোন্‌টা বেশী সুখাদ্য। পানগুলি প্রায় মোড়া শেষ হইয়াছে এমন সময় খোকার আর্ত্তচীৎকারে বিজলী চমকিয়া চাহিয়া

দেখিল একটা ছেঁড়া পান হাতে লইয়া খোকা মহাচীৎকার জুড়িয়া দিয়াছে; পানের অবশিষ্ট অংশ তাহার গলায় আট্‌কাইয়া গিয়াছে। বিজলী আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার গলায় আঙ্গুল প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল বিজলীর বৈমাত্রের বোন নন্দরাণী তখন মায়ের শিক্ষামত পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া জানালা দিয়া উঁকি দিতেছিল। খোকার গলায় পান আট্‌কাইয়া যাওয়ায় এবং দিদিকে একটু তিরস্কৃত করিবার লোভে সে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'ওমা শিগি্‌গি্‌র এসো গো, খোকা মরে গেল।' বিজলী ভিতর হইতে ভয় পাইয়া শঙ্কিত সুরে কহিল—নন্দ, চুপ কর, কিছু হয় নি ভাই, ভাল হয়ে গেছে। নন্দ খোকার জীবন সম্বন্ধে নিশ্চিন্তই ছিল, উদ্বেগের কোন কারণই তাহার ঘটে নাই। তাহার কাছেই এই চঞ্চল শিশুটা পান আটকাইয়া খুব জোর খানিকটা বমি করিয়া রহিয়া গিয়াছে; সুতরাং সে বিষয়ে সে পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল; কিন্তু তাই বলিয়া চুপ করাও ত যায় না, তাহা হইলে দিদি যে ফাঁকে তালে তিরস্কার হইতে বাঁচিয়া যাইবে। সুতরাং সে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী জোরে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'ও ঠাকু-মা, মা, এস না শিগ্‌গির; ওগো মাগো খোকা মরে গেল।'

দেখিতে দেখিতে চাকর ঝি যে যেখানে ছিল ছুটিয়া আসিল। সুশীলা ছুটিয়া আসিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—'ওমা কি হ'ল ছেলের।'

ছেলে তখন পূর্ণ নিশ্চিন্তে চোখের জলের সহিত মুখের হাসি মিলাইয়া বিজলীর কোল হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছিল; সহসা এ অভাবনীয় কাণ্ডে খোকা ও বিজলী উভয়েই হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। সুশীলা ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মত ঝাঁপাইয়া পড়িয়া খোকাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। ইতিপূর্ব্বে নন্দ ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিয়াছিল, শুনিয়া সকলেই একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল, কেহই কিছু বলিল না কেবল স্পষ্টবাদিনী দাসী পাঁচুর মা নন্দর দিকে চাহিয়া কহিল, 'মাগো, ও কি গো দিদিমণি; একেবারে ভয় লাগিয়ে দিয়েছিলে; আমি বলি কি হোল? ওমা ইরি মধ্যে 'মরে গেল মরে গেল কি গা!'

সুশীলা জোর করিয়া হাস্যরত বালকের পিঠে মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাকে এক চোট কাঁদাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, পাঁচুর মা'র কথায় তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন, 'এটা কি বড় কম হ'ল পাঁচুর মা! বলি এই ত কচি প্রাণ তা বেরুতে কতক্ষণ! ও বুড় মাগী মেয়েটার যায়া

যদি কোন উপকার আছে। ভাগ্যিস্ নন্দ ডাকলে, না হ'লে কি আর ফিরে পেতুম! সেই যে বলে 'ডাইনির হাতে পো সমপ্পন' আমার হয়েছে তাই।'

—কি জানি মা, তোমরা সব সুখী পেরাণ, তোমাদের সব একটুতেই আতকে ওঠা।' বলিয়া অপ্রসন্ন মুখে পাঁচুর মা প্রস্থান করিল। সুশীলা বকিতে বকিতে চলিয়া গেলেন,—ওমা কি হবে, আর একটু হলেই বাছার আমার শেষ হয়েছিল আর কি! এই নাকে কানে খৎ দিয়ে তোমার খুরে দণ্ডবৎ, আর যদি কখন ছেলে দিই! ওমা ইচ্ছে করে বাছার পেরাণটা বার করছিল গো—

বিজলী অপরাধীর মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

(৪)

—'হ্যাঁ গা তোমার ইচ্ছেটা কি শুনি!" রামতনু বাবু ছুটির দিন একবাটী সরিষার তেল লইয়া সবে বাঁ হাতে জবজবে তেল লইয়া ডান হাতে ঘষিতে সুরু করিয়াছেন, এমন সময় সুশীলা আসিয়া উক্ত প্রশ্ন করিয়া যুদ্ধার্থী সৈনিকের মত সুকৌশলে ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইলেন। রামতনু বাবু ডান হাতের দুই আঙ্গুলে তেল লইয়া উত্তমরূপে নাসিকার ছিদ্র পথে তেলটুকু প্রবেশ করাইয়া কিছু শঙ্কিত কিছু বিপন্ন হইয়া কহিলেন, 'কিসের আবার কি ইচ্ছে?'—'এই জিজ্ঞেস করছি থুবড় চোদ্দ বছরের ধাড়ী মেয়ে যে ঘরে পুষে রেখেছ, তার বিয়ে দেবার ইচ্ছে আছে কিনা? তুমি ত পণ করে বসে রয়েছ রাজপুত্তুর এসে মেয়ে না চাইলে মেয়ে দেবে না, তা শুনিইনা কেন কোন দেশের কোন্ রাজপুত্তুর এসে তোমার ও রূপের কাঁদি মেয়েকে বিয়ে করবে?'

—তা ছেলে না পেলে কি করব? এত আর বাজারের শিম, বেগুন, নয় যে পয়সা দিলেই মিলবে।'

—শিম বেগুন নয় সে ত আমিও জানি, কিন্তু ইরি মধ্যে ক' জায়গায় বিয়ের চেষ্টাটা করা হ'য়েছে শুনি? এত হাজার হাজার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে আর তোমারই বা হবে না কেন শুনি?—

আরে তারা টাকা দিচ্ছে; আমার কি বাপের তালুক আছে যে দশ হাজার টাকা দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেব?" বলিয়া অপ্রসন্ন মুখে রামতনু বাবু তৈল মর্দ্দন ছাড়িয়া খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা গোঁফে হাত বুলাইতে মন দিলেন।

সুশীলা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, 'তবে আর কি! বয়ে গেলাম। ও মেয়ের বিয়ে দিয়ে আর কি হবে 'বিবি' করে ছেড়ে দাও।

বাবুর সম্মুখে কুস্তির ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া সুশীলা আজিকার সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিলেন—কত করে বল্লাম, বেশ ত ছেলে যদি না-ই পাওয়া যায়, তা' বলে ত আর মেয়ে থুবড় করে রাখা যায় না। আমার সেজ বো'র ভাই রয়েছে গোকুল, তার সঙ্গে দাও! দ্বিতীয় পক্ষটা মরে ত মোটেই বিয়ে করতে চায় না, তা আমরা জোর করে বয়ে কিছু 'না' বল্‌তে পারত না। তা হ'ল না, বড় না রূপের মেয়ে, তাই তার জন্যে রাজপুত্তুর জামাই করবে। তোমার যা' ইচ্ছে কর গে যাও, কিন্তু এই আজ আমি বলে রাখ্‌ছি, ও মেয়ে যদি তোমার কুলে না কালী দেয় ত তখন বোল। এইটুকু বয়সে এত বাড়! ওমা আমি যাব কোথায় গো।'

রামতনু বাবু একেই ত কেরানী-কুলের মর্য্যাদা রক্ষার্থে যত প্রকার বদ মেজাজী রাগ আছে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহার উপর মেয়েমানুষের এত বড় বাড় শুনিয়া তাহার হাড় পর্য্যন্ত জ্বলিয়া গেল, এই আষাঢ়েই যদি বিয়ে দিয়ে ওকে দূর না করি ত—মস্ত কি একটা শপথ করিয়া তিনি সেই বেশেই তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেলেন।

(৩)

সেই দিনের সেই ঘটনার পর হইতে বিজলী আজকাল একটু বেশী রকম বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। আজ কাল জনহীন একা ঘরে বসিয়া থাকাও বিজলীর পক্ষে নিষেধ হইয়া গিয়াছে। কেন একলা ঘরে কি এখন রাজকার্য্যের চিন্তা আছে যাহার জন্য গৃহস্থ ঘরের অত বড় মেয়ে দিবা রাত্রি যখন তখন ঘরের কোণে গালে হাত দিয়া বসিয়া থাকিবে?

প্রথম প্রথম বিজলী পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনের এ সতর্কতার কারণ অনুমান করিতে পারিত না কিন্তু কয় দিনেই সে বুঝিয়া লইল, ব্যাপার কি! এবং তাহার পর হইতেই সকলের উপরে একটা অমানুষিক বিতৃষ্ণা ও নিগূঢ় ঘৃণায় তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ পূরিয়া উঠিল।

দিবা রাত্রি সন্দেহ ও লাঞ্ছনায় এই বালিকা মেয়েটী দুই দিনেই আশ্চর্য্য পরিপক্কতা লাভ করিল। দুই দিনেই তাহার এমন আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল, যাহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন; সুশীলা গালে হাত দিয়া কহিলেন, 'ওমা ঐটুকু মেয়ের পাকামী দেখেছ!' কিন্তু এই বালিকা মেয়েটীর পক্কতার জন্য যে তিনিই দায়ী, এ কথা তাঁহার মুখের উপর বুঝাইয়া দেয়, এমন স্ত্রী-পুরুষ সে

অঞ্চলে কেহই ছিল না। তাহার বালিকা-অন্তঃকরণ যে তাঁহাদেরই অশিষ্ট ইঙ্গিত, অমানুষিক লাঞ্ছনার এমন পকতা লাভ করিয়াছে সে কথা সকলেই ভুলিয়া গেলেন, এবং দিন দিন তাহার লাঞ্ছনার মাত্রা বাড়িয়াই চলিল। এ মেয়েটার দিবা রাত্রি অমানুষিক লাঞ্ছনায় কেহই একবার 'আহা' বলে না, সে যে মাতৃহারা শ্রীহীনা মেয়ে! হয় ত অভাগিনী বালিকার এ কঠোর লাঞ্ছনায়—অলক্ষ্যে অন্তর্যামীর চোখে দু' ফোঁটা অশ্রু দেখা দিয়াছিল, কিন্তু এই নিষ্ঠুর বিশ্বে তাহার জন্য একটু 'আহা' বলিবার উদারতাও কাহার ছিল না। 'মেয়েমানুষ' হইয়া যখন জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তখন লাঞ্ছনা ত অনিবার্য্য, তবে আর দুঃখ করিয়া লাভ কি?

সবে মাত্র বিজলী একরাশ পান লইয়া সাজিতে বসিয়াছে, এমন সময় 'মিলিটারী' চালে পা ফেলিয়া আপনার কোলের শিশুটীকে ক্রোড়ে লইয়া সুশীলা আসিয়া সেইখানে দাঁড়াইলেন এবং তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন, 'সকাল থেকে ঐ কটা পান সাজা আর তোমার শেষ হ'ল না? ছেলেটা যে সেই থেকে কেঁদে কেঁদে পায়ে পায়ে ঘুরছে তা তাকে একটু নিয়েও কি উপকার করতে পার না? ছেলে নিয়ে কি পান সাজা হয় না নাকি?' সুশীলার প্রশ্নের বিজলী কোন উত্তর দিল না; খোকাকে যখন তখন 'সোহাগ' করিয়া কোলে লওয়া যে সুশীলারই নিষেধ, সে কথা বিজলী বলিল না, কারণ সে অধিকার তাহার ছিল না! সে নীরবে চুন খয়ের পূর্ণ ডান হাতখানা অঞ্চলে মুছিয়া লইয়া খোকার দিকে হাত বাড়াইয়া কহিল, এস খোকামণি! 'খোকামণি' বিজলীর আহ্বানে প্রবল ভাবে মাথা নাড়িয়া 'দাব না দা' বলিয়া মাতার বুকে মুখ লুকাইল। সুশীলা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, বসে বসে 'এস খোকামণি' বলে সোহাগ করলে ত ও ছেলেমানুষ আগে যাবে। একটু গতর নাড়িয়ে ভুলিয়ে নিতে পার না? বিজলী উঠিয়া দাঁড়াইয়া খোকার হাতের কাছে তাহার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত সুপারী কুচাইবার জাতিটা তুলিয়া ধরিয়া কহিল— 'এটা নেবে?' খোকা লইবার জন্ম হাত বাড়াইতেই বিজলী হাতটা সরাইয়া লইয়া কহিল, 'তবে কোলে এস।' এ প্রলোভন বড় প্রলোভন, কয়েক বার ইতস্তত করিয়া খোকা বিজলীর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বিজলী অন্যমনস্ক ভাবে পান সাজিতেছিল, এবং খোকা সানন্দে হাতের কাছে অনেকগুলি লোভনীয় বস্তু পাইয়া একবার এটা, একবার সেটাকে রসনায় ঠেকাইয়া দেখিতেছিল কোন্‌টা বেশী সুখাদ্য। পানগুলি প্রায় সাজা শেষ হইয়াছে এমন সময় খোকার আর্ত্তচীৎকারে বিজলী চমকিয়া চাহিয়া

দেখিল একটা ছেঁড়া পান হাতে লইয়া খোকা মহাচীৎকার জুড়িয়া দিয়াছে; পানের অবশিষ্ট অংশ তাহার গলায় আটকাইয়া গিয়াছে। বিজলী আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার গলায় আঙুল প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল বিজলীর বৈমাত্রেয় বোন নন্দরাণী তখন মায়ের শিক্ষামত পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া জানালা দিয়া উঁকি দিতেছিল। খোকার গলায় পান আটকাইয়া যাওয়ায় এবং দিদিকে একটু তিরস্কৃত করিবার লোভে সে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'ওমা শিগ্‌গির এসো গো, খোকা মরে গেল।' বিজলী ভিতর হইতে ভয় পাইয়া শঙ্কিত সুরে কহিল—নন্দ, চুপ কর, কিছু হয় নি ভাই, ভাল হয়ে গেছে। নন্দ খোকার জীবন সম্বন্ধে নিশ্চিন্তই ছিল, উদ্বেগের কোন কারণই তাহার ঘটে নাই। তাহার কাছেই এই চঞ্চল শিশুটা পান আটকাইয়া খুব জোর খানিকটা বমি করিয়া রহিয়া গিয়াছে; সুতরাং সে বিষয়ে সে পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল; কিন্তু তাই বলিয়া চুপ করাও ত যায় না, তাহা হইলে দিদি যে ফাঁকে তালে তিরস্কার হইতে বাঁচিয়া যাইবে। সুতরাং সে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী জোরে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'ও ঠাকু‍মা, মা, এস না শিগ্‌গির; ওগো মাগো খোকা মরে গেল।'

দেখিতে দেখিতে চাকর ঝি যে যেখানে ছিল ছুটিয়া আসিল। সুশীলা ছুটিয়া আসিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—'ওমা কি হ'ল ছেলের।'

ছেলে তখন পূর্ণ নিশ্চিন্তে চোখের জলের সহিত মুখের হাসি মিলাইয়া বিজলীর কোল হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছিল; সহসা এ অভাবনীয় কাণ্ডে খোকা ও বিজলী উভয়েই হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। সুশীলা ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মত ঝাঁপাইয়া পড়িয়া খোকাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। ইতিপূর্ব্বে নন্দ ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিয়াছিল, শুনিয়া সকলেই একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল, কেহই কিছু বলিল না কেবল স্পষ্টবাদিনী দাসী পাঁচুর মা নন্দর দিকে চাহিয়া কহিল, 'মাগো, ও কি গো দিদিমণি; একেবারে ভয় লাগিয়ে দিয়েছিলে; আমি বলি কি হোল? ওমা ইরি মধ্যে 'মরে গেল মরে গেল কি গা।'

সুশীলা জোর করিয়া হাস্যরত বালকের পিঠে মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাকে এক চোট কাঁদাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, পাঁচুর মা'র কথায় তেলে বেগুনে জলিয়া উঠিলেন, 'এটা কি বড় কম হ'ল পাঁচুর মা! বলি এই ত কচি প্রাণ তা বেরুতে কতক্ষণ! ও বুড় মাগী মেয়েটার যায়া

যদি কোন উপকার আছে। ভাগ্‌গিস্‌ নন্দ ডাকলে, না হ'লে কি আর ফিরে পেতুম! সেই যে বলে 'ডাইনির হাতে পো সমপ্পন' আমার হয়েছে তাই।'

—কি জানি মা, তোমরা সব সুখী পেরাণ, তোমাদের সব একটুতেই আতকে ওঠা।' বলিয়া অপ্রসন্ন মুখে পাঁচুর মা প্রস্থান করিল। সুশীলা বকিতে বকিতে চলিয়া গেলেন,—ওমা কি হবে, আর একটু হলেই বাছার আমার শেষ হয়েছিল আর কি! এই নাকে কানে খৎ দিয়ে তোমার খুরে দণ্ডবৎ, আর যদি কখন ছেলে দিই! ওমা ইচ্ছে করে বাছার পেরাণটা বার করছিল গো—

বিজলী অপরাধীর মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

(৪)

—'হ্যাঁ গা তোমার ইচ্ছেটা কি শুনি!" রামতনু বাবু ছুটির দিন একবাটী সরিষার তেল লইয়া সবে বাঁ হাতে জবজবে তেল লইয়া ডান হাতে ঘষিতে সুরু করিয়াছেন, এমন সময় সুশীলা আসিয়া উক্ত প্রশ্ন করিয়া যুদ্ধার্থী সৈনিকের মত সুকৌশলে ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইলেন। রামতনু বাবু ডান হাতের দুই আঙ্গুলে তেল লইয়া উত্তমরূপে নাসিকার ছিদ্র পথে তেলটুকু প্রবেশ করাইয়া কিছু শঙ্কিত কিছু বিপন্ন হইয়া কহিলেন, 'কিসের আবার কি ইচ্ছে?'—'এই জিজ্ঞেস করছি থুবড় চোদ্দ বছরের ধাড়ী মেয়ে যে ঘরে পুষে রেখেছ, তার বিয়ে দেবার ইচ্ছে আছে কিনা? তুমি ত পণ করে বসে রয়েছ রাজপুত্তুর এসে মেয়ে না চাইলে মেয়ে দেবে না, তা শুনিইনা কেন কোন দেশের কোন্‌ রাজপুত্তুর এসে তোমার ও রূপের কাঁদি মেয়েকে বিয়ে করবে?'

—তা ছেলে না পেলে কি করব? এত আর বাজারের শিম, বেগুন, নয় যে পয়সা দিলেই মিল্‌বে।'

—শিম বেগুন নয় সে ত আমিও জানি, কিন্তু ইরি মধ্যে ক' জায়গায় বিয়ের চেষ্টাটা করা হ'য়েছে শুনি? এত হাজার হাজার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে আর তোমারই বা হবে না কেন শুনি?—

আরে তারা টাকা দিচ্ছে; আমার কি বাপের তালুক আছে যে দশ হাজার টাকা দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেব?" বলিয়া অপ্রসন্ন মুখে রামতনু বাবু তৈল মর্দ্দন ছাড়িয়া খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা গোঁফে হাত বুলাইতে মন দিলেন।

সুশীলা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, 'তবে আর কি! বর্ত্তে গেলাম। ও মেয়ের বিয়ে দিয়ে আর কি হবে 'বিবি' করে ছেড়ে দাও।

—'বিয়ে দেব না কে বল্লে? তা ত আর দু' এক টাকার কাজ নয়, দুটী হাজার নগদ ছাড়া যে কোন শালা রাজি হয় না।'

গৃহিনী প্রায় লাফাইয়া উঠিলেন—"এঁ্যা দু' দু' হাজার দিয়ে তুমি ঐ একটার বিয়ে দেবে! তার পর আমার নন্দ আমার দুগ্‌গা এদের হ'বে কি?"

—'সে দেখা যাবে।'

—দেখা যাবে আবার কি! দু হাজার ছেড়ে দুশো টাকাও আমি দেব না। কেন ঐ ত রয়েছে গোকুল, বো'র ভাই, কি এমন খারাপ শুনি! ওকেই বা মেয়ে দেবে না কেন! কি তোমার মেয়ে ডানা-কাটা পরী!

রামতনু বাবু তেল মাখা অসমাপ্ত রাখিয়াই তৈলসিক্ত দুর্গন্ধপূর্ণ মলিন গামছা খানা কাঁধে ফেলিয়া স্নানের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন; সুতরাং কথাটা থামিয়া গেল; কথাটা থামিল বটে কিন্তু চাপা পড়িল না। গৃহিনীর দিবা রাত্রি তাড়নায় রামতনু বাবু বাধ্য হইয়া গোকুলকেই জামাতা করিতে স্বীকৃত হইলেন। ইচ্ছা ছিল মেয়েটার ভাল দেখিয়া বিবাহ দিবেন কিন্তু অদৃষ্ট! অদৃষ্ট ছাড়া ত পথ নাই, যাহার সঙ্গে যাহার ভবিতব্য তাহা কি খণ্ডান যায়। অসম্ভব! আর একটা শ্রীহীনা মেয়ের জন্য দিবারাত্রি অশান্তির প্রয়োজন কি?

বিবাহ স্থির হইয়া গেল। তিনশো টাকা-নগদ লইয়া তৃতীয় বার গোকুল বরবেশে বিজলীর পিতৃপিতামহদের নরক যাত্রা হইতে স্বর্গের দ্বারে তুলিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। সুশীলা পাড়া প্রতিবেশী সকলকেই ডাকিয়া কহিলেন, 'ও কি বিয়ে করতে চায়, বলে 'ও কালো মেয়ে বিয়ে কোরব না! কত করে বলে কয়ে তবে না রাজি করলাম, তা আপনার লোক বলেই ত তবু রাজি করা গেল, না হ'লে ও রূপের কাঁদি মেয়ে কি কেউ বিয়ে করতে এগোয়!

কথাটা সকলেই মানিয়া লইল। বঙ্গদেশে কন্যার ত অভাব নাই, গোকুলেরও সুন্দরী কন্যার সহিত বিবাহ হইতে পারা আশ্চর্য্য কি? বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল; এবং বিজলীও বঙ্গললনার চির-প্রথামত ঘোমটা টানিয়া বধূ সাজিয়া শ্বশুরালয় চলিয়া গেল।

সুশীলা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কত কষ্টে না ঐ পথের কাঁটা দূর হইয়াছে।

(৫)

এক একটা লোক আছে, যাহারা মরিয়াও মরে না; বিজলী ছিল সেই দলে। এত করিয়া যদি বা গৃহিনী এ গলার কাঁটাটা দূর করিয়াছিলেন, এবার কিন্তু সে ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়ভাবে গৃহিনীর কণ্ঠে বিঁধিল।

এক বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতে বৃদ্ধ গোকুলচন্দ্র নাবালক ও সাবালক প্রথম ও দ্বিতীয় সংসারের গোটা আষ্টেক দুর্ভিক্ষ পীড়িতবৎ রুগ্ন কঙ্কালসার পুত্র কন্যা ফেলিয়া ও বালিকা পত্নীকে বিধবার দলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া বোধ করি বা বহু পুণ্য সঞ্চয়ের খাতিরে বিষ্ণুলোকেই প্রস্থান করিলেন।

বিজলীর বৃদ্ধা শাশুড়ী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, 'ওমা গো কি অলুক্ষুণে বৌ ঘরে এনেছিলাম গো, এক বছর পেরুল না, ছেলেটাকে গিলে বসে রইল। ওরে ও অলুক্ষুণে বৌ আজই দূর করে দে।'

অলক্ষণা বধূকে দূর করিয়া দিবার অনিচ্ছা কাহারও ছিল না। একটা অনাবশ্যক বোঝাকে ঘাড়ে করিয়া প্রতিপালন করিয়া লাভ নাই। যাঁহারা এই অলক্ষণা মেয়েটাকে তাঁহাদের ঘাড়ে চাপাইয়াছিলেন তাঁহাদের ঘাড়েই আবার এ বোঝা ফেলিয়া আসিতে কাহারও আপত্তি হইবার কথা নয়।

এক বৎসর পরে বিজলী পুনরায় পিতার স্কন্ধেই ফিরিয়া আসিল। সুশীলা কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া পাড়া শুদ্ধ উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়া বিজলীকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। দিন কাটিতে লাগিল।

দুপুর বেলায় সুশীলা নিজের ঘরে মাদুর পাতিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, এবং নিকটে বসিয়া বিজলী সুশীলার শিশুপুত্রটীকে, নানা প্রকার সুর করিয়া ছড়া কাটিয়া ঘুম পাড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিল; চঞ্চল শিশুর এ কার্য্যটা তত মনঃপুত হইতেছিল না, সে এক এক বার চক্ষু খুলিয়া বিজলীর অঞ্চলবদ্ধ চাবির গোছা লইবার চেষ্টা করিতেছিল, এবং পরক্ষণেই বিজলীর তাড়নায় চক্ষু মুদ্রিত করিতেছিল।

এমন সময় নীচের উঠান হইতে ডাক আসিল—'মাসি-মা'। বিজলীর চিনিতে বিলম্ব হইল না, আগন্তুক সুশীলার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পুত্র অমরেশ।

বিজলী প্রথমটা উত্তর দিল না। উত্তর না পাইয়া অমরেশ দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া আসিল; এবং কক্ষে প্রবেশ করিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

বিজলী সরিয়া মাথার কাপড়টা ললাট পর্য্যন্ত টানিয়া দিয়া মুখ তুলিয়া কি একটা উত্তর দিতে গিয়া সহসা আরক্ত মুখে মুখ নত করিয়া লইল। একটা অবর্ণনীয় অস্বস্তি ও লজ্জায় তাহার সমস্ত মুখখানা অস্তাচল-গামী তপনের মত রাঙাইয়া উঠিল।

'তোমার মত কুৎসিত আর নাই; তোমার দিকে চাহিয়াও দেখা যায় না;

শিশু বয়স হইতে ক্রমান্বয়ে এই একই মন্তব্য শুনিয়া শুনিয়া বিজলী এমনি অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল যে, আজ কিছু দিন হইতে এই সুন্দর যুবকটীর মুগ্ধ দৃষ্টি তাহাকে শুধু যে লজ্জিত করিয়া তুলিয়াছে তাহাই নয় বিস্মিতও কম করে নাই।

অমরেশের আগমনের দ্রুতপদশব্দই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক সুশীলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। চক্ষু মেলিয়াই উভয়কে তদবস্থায় দেখিয়া রাগে তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু ধনী ভগ্নীর এক মাত্র সন্তান অমরেশকে কিছু বলিবার সাহস তাঁহার ছিল না; ভগ্নীর কাছে 'কাপড়টা' 'জামাটা' তিনি প্রায় লাভ করিতেন, বিশেষ দাঁড়াইয়া থাকায়—ভিতরে যাহাই থাকুক—বাহিরে কোন দোষ বলা যায় না; সুতরাং তিনি জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার বিজলীর দিকে চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া শুষ্ক হাসি মুখের উপর টানিয়া কহিলেন—'এই যে অমু তুই। আয় ঘরে আয় কতক্ষণ এসেছিস্?' অমরেশ তখন অনেকটা নিজের অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছিল; মাসিমার আজ্ঞায় কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, 'এই আসছি মাসি-মা।' কথাটা যে সুশীলার কিছু মাত্র বিশ্বাস হয় নাই, তাহা তাঁহার মুখ দেখিলেই দর্শক মাত্রেরই বুঝিতে বিলম্ব হইত না।

—'তবু ভাল অমু আজকাল তবু তোর গরীব মাসিকে মনে পড়ে। আগে ত মাসী বলে মনেও পড়ত না, আজকাল তবু সময় অসময় ছুটে এসে খবরটাও নিয়ে যাস্।'

কথাটার মধ্যে একটা জ্বালা ও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল, যাহা বিজলী অথবা অমরেশের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। অমরেশ আরক্ত মুখে চুপ করিয়া রহিল, উত্তর দিল না। বিজলীর সমস্ত মুখখানা ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল; সে ঠিক জানিত, সুশীলার এ ইঙ্গিতের পরিণাম কোথায়।

রামতনু বাবু সুশীলা ও আত্মীয় স্বজনগণের প্রাণপণ একমাত্র এই চেষ্টা ছিল, যাহাতে এই আজন্ম স্নেহ বঞ্চিতা মেয়েটীর মনে স্নেহ পাইবার ও দিবার একটা স্বাভাবিক ইচ্ছা না জাগিতেও পারে। মানুষের মনে প্রকৃতিদত্ত যে একটা ভালবাসিবার ও ভালবাসা পাইবার স্বাভাবিক বাসনা আছে, সেটা স্বাভাবিক হইলেও এরূপস্থলে মারাত্মকও বটে, সুতরাং তাঁহাদের প্রাণপণ চেষ্টা ছিল, এই মেয়েটীর চারিদিক হইতে একটা অস্বাভাবিকতার প্রাচীর গাঁথিয়া ইহাকে সৃষ্টির বাহির করিয়া দিবার। অকৃত্রিম স্নেহ দিয়া হয় ত তাঁহারা এই অভিশপ্ত

মেয়েটাকে তাঁহাদের মনের মত গড়িয়া তুলিতে পারিতেন কিন্তু স্নেহ দিলে নাকি মেয়েদের বিগড়াইয়া যাইবার সম্ভাবনা বেশী; সুতরাং দিবারাত্রি লাঞ্ছনা ও আঘাত দিয়া বিজলীকে তাঁহারা বশে আনিবার চেষ্টা করিতেন,—এবং বলা বাহুল্য ইহাতে এই আজন্ম স্নেহবঞ্চিতা সহিষ্ণু মেয়েটাকে তাঁহারা কিছু মাত্র বশে আনিতে পারিতেন না। এবং দিবারাত্রি এই অশিষ্ট ইঙ্গিতে ও ধৃষ্টতাপূর্ণ ব্যর্থ চেষ্টা বিজলার চিরসহিষ্ণু মনকেও অন্তরে অন্তরে বিদ্রোহী করিয়া তুলিতেছিল। অল্পক্ষণ ব'সয়া থাকিয়া অমরেশ উঠিয়া গেল। বারংবার সুশীলার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে সে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িতে'ছল।

অমরেশ উঠিয়া যাইতেই সুশীলা কিছু মাত্র ভূমিকা না করিয়াই তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'অমন ঢলাঢলি করতে হয়, বাজারে গিয়ে কোর, গেরস্ত ঘরে ওসব পোষাবে না।'

বিজলী একবার মুহূর্তের জন্ত মুখ তুলিয়া আরক্ত মুখে সুশীলার দিকে চাহিল; উত্তর দিল না; কিন্তু অন্তরে অন্তরে সে সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। সুশীলার কাছে সে অনেকবার অনেক প্রকার আঘাত পাইয়াছে কিন্তু আজিকার মত এমন স্পষ্ট নির্লজ্জ উক্তি কেহ কখন শোনে নাই।

সহ্যেরও যে একটা সীমা আছে, সে কথা বোধ হয় এ বাড়ীর বাসিন্দারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কারণ আজ পর্য্যন্ত সহস্র আঘাত বিদ্রূপেও এই নিরুপায় মেয়েটার মুখ দিয়া একটা কথাও বা'হর হয় নাই। কুৎসিত এবং নিরুপায় হইলেও বিজলী যে রক্ত মাংসের সৃষ্ট সাধারণ মানুষ—পাষাণে গড়া নয়— সে কথা ইঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

বিজলীর নিকট হইতে সুশীলার কথার কোন প্রকার উত্তর আসিবার সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং মুহূর্ত্ত কাল চুপ করিয়া সুশীলা কহিলেন, 'তোমার হয় ত অমনি করে ঢলাঢলি করে দিন কাটবে, তাই বলে গেরস্থ ঘরের বৌ-ঝি-দের ত আর অমন করে চলবে না। আমার ঘরে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে রয়েছে, ওসব শিখলে তাদের ত সর্ব্বনাশ হবে।'

এবার বিজলী কি একটা উত্তর দিতে গিয়া সহসা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া উদ্যত বাক্য সংযত করিয়া লইল; এবং মুহূর্ত্তে দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

(৬)

বহু দিন বিরহের বেদনা সহিয়া মিলন হইলে, বিরহী প্রণয়ীর মুখে যেমন

—'বিয়ে দেব না কে বল্লে? তা ত আর দু' এক টাকার কাজ নয়, দুটী হাজার নগদ ছাড়া যে কোন শালা রাজি হয় না।'

গৃহিনী প্রায় লাফাইয়া উঠিলেন—"অঁ্যা। দু' দু' হাজার দিয়ে তুমি ঐ একটার বিয়ে দেবে! তার পর আমার নন্দ আমার দুগ্‌গা এদের হ'বে কি?"

—'সে দেখা যাবে।'

—দেখা যাবে আবার কি! দু হাজার ছেড়ে দুশো টাকাও আমি দেব না। কেন ঐ ত রয়েছে গোকুল, বো'র ভাই, কি এমন খারাপ শুনি! ওকেই বা মেয়ে দেবে না কেন! কি তোমার মেয়ে ডানা-কাটা পরী!

রামতনু বাবু তেল মাখা অসমাপ্ত রাখিয়াই তৈলসিক্ত দুর্গন্ধপূর্ণ মলিন গামছা খানা কাঁধে ফেলিয়া স্নানের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন; সুতরাং কথাটা থামিয়া গেল; কথাটা থামিল বটে কিন্তু চাপা পড়িল না। গৃহিনীর দিবা রাত্রি তাড়নায় রামতনু বাবু বাধ্য হইয়া গোকুলকেই জামাতা করিতে স্বীকৃত হইলেন। ইচ্ছা ছিল মেয়েটার ভাল দেখিয়া বিবাহ দিবেন কিন্তু অদৃষ্ট! অদৃষ্ট ছাড়া ত পথ নাই, যাহার সঙ্গে যাহার ভবিতব্য তাহা কি খণ্ডান যায়। অসম্ভব! আর একটা শ্রীহীনা মেয়ের জন্য দিবারাত্রি অশান্তির প্রয়োজন কি?

বিবাহ স্থির হইয়া গেল। তিনশো টাকা-নগদ লইয়া তৃতীয় বার গোকুল বরবেশে বিজলীর পিতৃপিতামহদের নরক যাত্রা হইতে স্বর্গের দ্বারে তুলিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। সুশীলা পাড়া প্রতিবেশী সকলকেই ডাকিয়া কহিলেন, 'ও কি বিয়ে করতে চায়, বলে 'ও কালো মেয়ে বিয়ে কোরব না! কত করে বলে কয়ে তবে না রাজি করলাম, তা আপনার লোক বলেই ত তবু রাজি করা গেল, না হ'লে ও রূপের কাঁদি মেয়ে কি কেউ বিয়ে করতে এগোয়!

কথাটা সকলেই মানিয়া লইল। বঙ্গদেশে কন্যার ত অভাব নাই, গোকুলেরও সুন্দরী কন্যার সহিত বিবাহ হইতে পারা আশ্চর্য্য কি? বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল; এবং বিজলীও বঙ্গললনার চির-প্রথামত ঘোমটা টানিয়া বধূ সাজিয়া শ্বশুরালয় চলিয়া গেল।

সুশীলা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কত কষ্টে না ঐ পথের কাঁটা দূর হইয়াছে।

(৫)

এক একটা লোক আছে, যাহারা মরিয়াও মরে না; বিজলী ছিল সেই দলে। এত করিয়া যদি বা গৃহিনী এ গলার কাঁটাটা দূর করিয়াছিলেন, এবার কিন্তু সে ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়ভাবে গৃহিনীর কণ্ঠে বিঁধিল।

এক বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতে বৃদ্ধ গোকুলচন্দ্র নাবালক ও সাবালক প্রথম ও দ্বিতীয় সংসারের গোটা আষ্টেক দুর্ভিক্ষ পীড়িতবৎ রুগ্ন কঙ্কালসার পুত্র কন্যা ফেলিয়া ও বালিকা পত্নীকে বিধবার দলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া বোধ করি বা বহু পুণ্য সঞ্চয়ের খাতিরে বিষ্ণুলোকেই প্রস্থান করিলেন।

বিজলীর বৃদ্ধা শাশুড়ী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "ওমা গো কি অলুক্ষুণে বৌ ঘরে এনেছিলাম গো, এক বছর পেরুল না, ছেলেটাকে গিলে বসে রইল। ওরে ও অলুক্ষুণে বৌ আজই দূর করে দে।'

অলক্ষণা বধূকে দূর করিয়া দিবার অনিচ্ছা কাহারও ছিল না।। একটা অনাবশ্যক বোঝাকে ঘাড়ে করিয়া প্রতিপালন করিয়া লাভ নাই। যাঁহারা এই অলক্ষণা মেয়েটাকে তাঁহাদের ঘাড়ে চাপাইয়াছিলেন তাঁহাদের ঘাড়েই আবার এ বোঝা ফেলিয়া আসিতে কাহারও আপত্তি হইবার কথা নয়।

এক বৎসর পরে বিজলী পুনরায় পিতার স্কন্ধেই ফিরিয়া আসিল। সুশীলা কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া পাড়া শুদ্ধ উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়া বিজলীকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। দিন কাটিতে লাগিল।

দুপুর বেলায় সুশীলা নিজের ঘরে মাদুর পাতিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, এবং নিকটে বসিয়া বিজলী সুশীলার শিশুপুত্রটীকে, নানা প্রকার সুর করিয়া ছড়া কাটিয়া ঘুম পাড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টায় চাপরাইতেছিল; চঞ্চল শিশুর এ কার্য্যটা তত মনঃপুত হইতেছিল না, সে এক এক বার চক্ষু খুলিয়া বিজলীর অঞ্চলবদ্ধ চাবির গোছা লইবার চেষ্টা করিতেছিল, এবং পরক্ষণেই বিজলীর তাড়নায় চক্ষু মুদ্রিত করিতেছিল।

এমন সময় নীচের উঠান হইতে ডাক আসিল—'মাসি-মা'। বিজলীর চিনিতে বিলম্ব হইল না, আগন্তুক সুশীলার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পুত্র অমরেশ।

বিজলী প্রথমটা উত্তর দিল না। উত্তর না পাইয়া অমরেশ দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া আসিল; এবং কক্ষে প্রবেশ করিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

বিজলী সরিয়া মাথার কাপড়টা ললাট পর্য্যন্ত টানিয়া দিয়া মুখ তুলিয়া কি একটা উত্তর দিতে গিয়া সহসা আরক্ত মুখে মুখ নত করিয়া লইল। একটা অবর্ণনীয় অস্বস্তি ও লজ্জায় তাহার সমস্ত মুখখানা অস্তাচল-গামী তপনের মত রাঙাইয়া উঠিল।

'তোমার মত কুৎসিত আর নাই; তোমার দিকে চাহিয়াও দেখা যায় না;

শিশু বয়স হইতে ক্রমান্বয়ে এই একই মন্তব্য শুনিয়া শুনিয়া বিজলী এমনি অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল যে, আজ কিছু দিন হইতে এই সুন্দর যুবকটীর মুগ্ধ দৃষ্টি তাহাকে শুধু যে লজ্জিত করিয়া তুলিয়াছে তাহাই নয় বিস্মিতও কম করে নাই।

অমরেশের আগমনের দ্রুতপদশব্দই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক সুশীলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। চক্ষু মেলিয়াই উভয়কে তদবস্থায় দেখিয়া রাগে তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু ধনী ভগ্নীর এক মাত্র সন্তান অমরেশকে কিছু বলিবার সাহস তাঁহার ছিল না; ভগ্নীর কাছে 'কাপড়টা' 'জামাটা' তিনি প্রায় লাভ করিতেন, বিশেষ দাঁড়াইয়া থাকায়—ভিতরে যাহাই থাকুক—বাহিরে কোন দোষ বলা যায় না; সুতরাং তিনি জলন্ত দৃষ্টিতে একবার বিজলীর দিকে চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া শুষ্ক হাসি মুখের উপর টানিয়া কহিলেন—'এই যে অমু তুই। আয় ঘরে আয় কতক্ষণ এসেছিস্?' অমরেশ তখন অনেকটা নিজের অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছিল; মাসিমার আজ্ঞায় কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, 'এই আসছি মাসি-মা।' কথাটা যে সুশীলার কিছু মাত্র বিশ্বাস হয় নাই, তাহা তাঁহার মুখ দেখিলেই দর্শক মাত্রেরই বুঝিতে বিলম্ব হইত না।

—'তবু ভাল অমু আজকাল তবু তোর গরীব মাসিকে মনে পড়ে। আগে ত মাসী বলে মনেও পড়ত না, আজকাল তবু সময় অসময় ছুটে এসে খবরটাও নিয়ে যাস্।'

কথাটার মধ্যে একটা জ্বালা ও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল, যাহা বিজলী অথবা অমরেশের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। অমরেশ আরক্ত মুখে চুপ করিয়া রহিল, উত্তর দিল না। বিজলীর সমস্ত মুখখানা ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল; সে ঠিক জানিত, সুশীলার এ ইঙ্গিতের পরিণাম কোথায়।

রামতনু বাবু সুশীলা ও আত্মীয় স্বজনগণের প্রাণপণ একমাত্র এই চেষ্টা ছিল, যাহাতে এই আজন্ম স্নেহ বঞ্চিতা মেয়েটীর মনে স্নেহ পাইবার ও দিবার একটা স্বাভাবিক ইচ্ছা না জাগিতেও পারে। মানুষের মনে প্রকৃতিদত্ত যে একটা ভালবাসিবার ও ভালবাসা পাইবার স্বাভাবিক বাসনা আছে, সেটা স্বাভাবিক হইলেও এরূপস্থলে মারাত্মকও বটে, সুতরাং তাঁহাদের প্রাণপণ চেষ্টা ছিল, এই মেয়েটার চারিদিক হইতে একটা অস্বাভাবিকতার প্রাচীর গাঁথিয়া ইহাকে সৃষ্টির বাহির করিয়া দিবার। অকৃত্রিম স্নেহ দিয়া হয় ত তাঁহারা এই অভিশপ্ত

মেয়েটিকে তাঁহাদের মনের মত গড়িয়া তুলিতে পারিতেন কিন্তু স্নেহ দিলে নাকি মেয়েদের বিগড়াইয়া যাইবার সম্ভাবনা বেশী; সুতরাং দিবারাত্রি লাঞ্ছনা ও আঘাত দিয়া বিজলীকে তাঁহারা বশে আনিবার চেষ্টা করিতেন,—এবং বলা বাহুল্য ইহাতে এই আজন্ম স্নেহবঞ্চিতা সহিষ্ণু মেয়েটীকে তাঁহারা কিছু মাত্র বশে আনিতে পারিতেন না। এবং দিবারাত্রি এই অশিষ্ট ইঙ্গিতে ও ধৃষ্টতাপূর্ণ ব্যর্থ চেষ্টা বিজলীর চিরসহিষ্ণু মনকেও অন্তরে অন্তরে বিদ্রোহী করিয়া তুলিতেছিল। অল্পক্ষণ ব'সয়া থাকিয়া অমরেশ উঠিয়া গেল। বারংবার সুশীলার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে সে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িতেছিল।

অমরেশ উঠিয়া যাইতেই সুশীলা কিছু মাত্র ভূমিকা না করিয়াই তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'অমন ঢলাঢলি করতে হয়, বাজারে গিয়ে কোর, গেরস্ত ঘরে ওসব পোষাবে না।'

বিজলী একবার মুহূর্ত্তের জন্য মুখ তুলিয়া আরক্ত মুখে সুশীলার দিকে চাহিল; উত্তর দিল না; কিন্তু অন্তরে অন্তরে সে সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। সুশীলার কাছে সে অনেকবার অনেক প্রকার আঘাত পাইয়াছে কিন্তু আজিকার মত এমন স্পষ্ট নির্লজ্জ উক্তি কেহ কখন শোনে নাই।

সহ্যেরও যে একটা সীমা আছে, সে কথা বোধ হয় এ বাড়ীর বাসিন্দারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কারণ আজ পর্য্যন্ত সহস্র আঘাত বিদ্রূপেও এই নিরুপায় মেয়েটীর মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হয় নাই। কুৎসিত এবং নিরুপায় হইলেও বিজলী যে রক্ত মাংসের সৃষ্ট সাধারণ মানুষ—পাষাণে গড়া নয়—সে কথা ইঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

বিজলীর নিকট হইতে সুশীলার কথার কোন প্রকার উত্তর আসিবার সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং মুহূর্ত্ত কাল চুপ করিয়া সুশীলা কহিলেন, 'তোমার হয় ত অমনি করে ঢলাঢলি করে দিন কাটবে, তাই বলে গেরস্থ ঘরের বৌ-ঝি-দের ত আর অমন করে চলবে না। আমার ঘরে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে রয়েছে, ওসব শিখলে তাদের ত সর্ব্বনাশ হবে।'

এবার বিজলী কি একটা উত্তর দিতে গিয়া সহসা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া উদ্যত বাক্য সংযত করিয়া লইল; এবং মুহূর্ত্তে দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

(৬)

বহু দিন বিরহের বেদনা সহিয়া মিলন হইলে, বিরহী প্রণয়ীর মুখে যেমন

বিরহের অশ্রু ও মিলনের আনন্দ মধুর ভাবে ফুটিয়া উঠে, তেমনি সেদিন বর্ষণক্লান্ত সারা বিশ্বের উপর সূর্য্যের আলোক ও বর্ষার-মেঘ মিলিয়া একটা নিবিড় মাধুর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। বহু দিন পরে সূর্য্যের তরুণ কিরণ বিশ্বের বুকে লুটাইয়া পড়িয়াছে; তরুণ সূর্য্যের কিরণ চুম্বনে সজল গাছের পাতাগুলি ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিতেছিল।

কি একটা উপলক্ষে সুশীলা সেদিন সদলবলে কালীঘাটে গিয়াছিলেন, বিজলী গৃহেই রহিয়া গিয়াছে। অত বড় বিধবা মেয়েকে বাটীর বাহির করা কাহারও মত ছিল না; কি জানি কোথা হইতে যদি এই অভিশপ্তা মেয়েটীর মনে স্নেহের বাসনা জাগিয়া ওঠে। কাজ কি বাপু!

দৈব বিড়ম্বনা! এত করিয়াও সুশীলা কিন্তু এই আজন্ম স্নেহ বঞ্চিতা মেয়েটীর মন হইতে স্নেহ পাইবার স্বাভাবিক বাসনা দূর করিতে পারেন নাই; এত দিন পরে অমরেশের স্নেহমুগ্ধ দৃষ্টি বিজলীর চতুর্দ্দিকের সুদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করিয়া তাহাকে ক্রমেই বিচলিত করিয়া তুলিতেছিল। বিজলী অন্যমনস্ক ভাবে জনহীন বাড়ীময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

সহসা বাহির হইতে কাহার আহ্বান আসিল; বিজলীর বুঝিতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইল না আহ্বানকারী কে? তাহার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা সজোরে স্পন্দিত হইয়া উঠিল; তাহার সমস্ত শরীরের রক্ত চলাচল যেন মুহূর্ত্তে বন্ধ হইয়া গেল। তড়িৎস্পৃষ্টের মত তাহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্য সে ভাবিল, উত্তর দিবে না; উত্তর না পাইয়া রুদ্ধ দ্বারে আঘাত দিয়া আহ্বানকারী ফিরিয়া যাইবে! আজ একাকিনী বিজলী গৃহে থাকিবে সে কথা কি আগন্তুক জানে না! জানে নিশ্চয়, তবে! একটা অবর্ণনীয় আশা ও আশঙ্কার হিল্লোল বিজলীর বুকের মাঝে দুলিয়া উঠিল। একবার ভাবিল ফিরাইয়া দেওয়াই ভাল; কিন্তু তখনি মনে হইল, হয় ত কোন কথা জানাইবার জন্যই আসিয়াছেন। সহসা তাহার মনে পড়িল কল্যকার কথা; অমরেশ তাহার সহিত নির্জ্জন সাক্ষাৎ চায়। কিন্তু কেন? একবার ভাবিল সাক্ষাৎ করিবে না; কিন্তু আগন্তুকের পুনরাহ্বানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। হউক, যাহা হইবার হউক—তথাপি সে এমন করিয়া ইহাকে ফিরাইতে পারিবে না। দ্রুতপদে নীচে নামিয়া বিজলী দ্বার খুলিয়া দিল।

দ্বারের বাহিরে দরজা ধরিয়া অমরেশ দাঁড়াইয়াছিল; বিজলী দ্বার,

খুলিতেই সে ভিতরে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিয়া সহসা বিজলীর মুখের দিকে চাহিয়া চমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বিজলীর মুখের শঙ্কিত চঞ্চল ভাব তাহার চক্ষে পড়িতেই এরূপ নির্জ্জন সাক্ষাতের গুরুত্ব তাহার চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। এ সাক্ষাতে হয় ত তার কোন ক্ষতি নাই, কারণ সে পুরুষ কিন্তু এই নিরুপায় মেয়েটীর ক্ষতির কথা মনে হইতেই অমরেশের পা দুটী নিশ্চল হইয়া আসিল। অল্পক্ষণ উভয়েই স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; অল্পক্ষণ পরেই মৃদু কণ্ঠে বিজলী কহিল, 'মা বাড়ী নেই, আপনি কি আস্‌বেন ভিতরে ?"

অমরেশ চমকিয়া মুখ তুলিল; তাহার পর সহসা স্খলিত কণ্ঠে কহিল, 'আমি ? না—এখন এমন সময় উচিত নয় যে; আমি যাই বিজলী, আর কোন সময় তোমার সঙ্গে দেখা করব, এখন নয়। কিন্তু—' সহসা অগ্রসর হইয়া আসিয়া অমরেশ আপনার শীতল হাতের মধ্যে বিজলীর হাত দুটা টানিয়া লইল; এবং মুহূর্ত্ত পরেই একটা উদ্দাম আকুল আকাঙ্ক্ষা চাপিয়া লইয়া সহসা বিজলীর হাত দুইটা ছাড়িয়া দিয়া স্খলিত পদে ছুটিয়া চলিয়া গেল। পর মুহূর্ত্তেই সুশীলার গাড়ী আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে থামিল।

(৭)

বাড়ীর মধ্যে একটা চাপা ঝড় বহিয়া যাইতেছিল। সুশীলা ও রামতনু বাবু শত চেষ্টায়ও অমরেশের আগমনের কারণ বিজলীর নিকট হইতে জানিতে পারিলেন না। কথাটা লইয়া যে সুশীলা চীৎকার করিবেন তাহারও উপায় ছিল না, কারণ এ কলঙ্কের পঙ্ক শুধু বিজলীর নয়, বাড়ী শুদ্ধ সকলেরই মুখে তাহা লাগিবে। সুতরাং ইহা লইয়া বাহিরে নাড়া চাড়া করাও যায় না।

অমরেশ চলিয়া যাইবার পর হইতে বিজলী এমনি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল যে, বাহিরের কোন মন্তব্য কোন প্রশ্নই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছিল না। অমরেশের সেই শীতলকরস্পর্শ টুকুই শুধু বারংবার বিজলীর স্তব্ধ বুকের মাঝে শিহরণ জাগাইয়া তুলিতেছিল।

রাত্রি হইয়া গেল; সকলেরই মন আজ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। যে যাহার কক্ষে গিয়া শুইয়া পড়িল। আজ ত হইল না কিন্তু কাল নিশ্চয়ই ইহার বিহিত চাই, আর কিছু না হয় বিজলীকে তীর্থক্ষেত্রেই পাঠাইতে হইবে। না হইলে যে সর্ব্বনাশ!

রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে; রজনীর স্নিগ্ধ নিস্তব্ধতাকে ব্যথ করিয়া তখনও

কলিকাতার রাস্তার উপর- গাড়ী ঘোড়া চলাচলের তীব্র শব্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল।

বিজলী অনেকক্ষণ একাকী অন্ধকার কক্ষে বসিয়া রহিল; আজ যথার্থই তাহার সমস্ত মন আত্মীয় স্বজনদের উপর বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকক্ষণ একাকী বসিয়া থাকিয়া বিজলী ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

পরদিন প্রভাত হইতেই সুশীলা বিজলীর কক্ষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অনেক চিন্তার পর বিজলীকে তীর্থক্ষেত্রে পাঠানই স্থির হইয়াছে; খবরটা বিজলীকে দেওয়া চাই যে। বিজলীর কক্ষের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল না; ঠেলা দিতেই খুলিয়া গেল।

কক্ষে প্রবেশ করিয়াই সুশীলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। কেহ কোথাও নাই; শূন্য শয্যার উপর একখানা চিঠি বাতাসের আন্দোলনে এখান ওখান ঘুড়িয়া বেড়াইতেছিল।

(৮)

দেখিতে দেখিতে কথাটা বাতাসের বেগে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল; এতদিনের পর কালো মেয়ে বিজলী বিশ্বের সকল লাঞ্ছনার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া গঙ্গাগর্ভে আশ্রয় লইয়াছে। যে শুনিল সেই 'আহা' করিল; মাতৃহারা অভাগিনী মেয়ে! কেবল চিরসহিষ্ণু কালো মেয়ের মৃত্যু সংবাদ সুশীলা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। মরিয়াও অভাগিনী বালিকা কলঙ্কের হাত হইতে অব্যাহতি পাইল না; মুখ বাঁকাইয়া সুশীলা কহিলেন, 'ও গো সে মরে নি গো মরে নি, ও সব নতুন নতুন ঢং; আগেই ত বলেছিলাম ও মেয়ে তোমার খুব মুখ উজ্জ্বল করবে। কেমন হ'ল ত?' বিজলী যে মরে নাই, সে যে মিথ্যা লিখিয়া অমরেশের কাছেই গিয়াছে,—তাহাতে সুশীলার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। অমরেশ তাহাকে নিশ্চয় লইয়া যায় নাই; অমন একটা কুৎসিত মেয়েকে বিবাহ করিবে অমরেশ! কেন, বঙ্গদেশে কি কন্যার অভাব হইয়াছে না কি? গৃহিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রামতনু বাবুর কথাটা মনে লাগিতেছিল, অথচ নিজের কন্যার এমন শোচনীয় দুর্মতি ও দুর্গতি পিতা হইয়া তিনি কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবেন। পাড়ার বৃদ্ধ জয়হরি আসিয়া সান্ত্বনার সুরে রামতনুকে কহিলেন, 'কি করবে বল ভায়া? ও সব কপাল, কপাল, অদেষ্ট ছাড়া ত আর পথ নেই। সে গেছে ভালই হয়েছে, বিধবা মেয়ে,

বেঁচে থেকে ত কোন লাভ নেই ; তোমার যা কষ্ট, তা কি করবে বল ?'

রামতনু বাবু ক্যাল ক্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। কষ্ট ? ওঃ তা বটে, কিন্তু সত্যই কি বিজলী মরিয়াছে ! একটা সন্দেহের আগুন তাঁহার বুকের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি দুই হস্তে মুখ ঢাকিলেন।

আখেরী

শ্রীনির্ম্মলকুমার ঘোষ

বছর-পুঁথির শেষ পাতাটা এগিয়ে এলো—এগিয়ে এলো !
থাকতে সময় এই অসময়ে মনের কপাট খুলেই ফ্যালো।
ফসল কাটার গান শুনেছি মাঠের পরে ফসল ক্ষেতে,
নদীপারের কাশবনে কে ডাক দিল শ্বেত-আসন পেতে ?
নিবিয়ে দে তোর ঘরের প্রদীপ, পূবের অরুণ-উদয় হেরি—
বৈতালিকের গান শোনা যায়, নূতন দিনের নেইকো দেরী।
নেইকো দেরি—নেইকো দেরি রুদ্ধ দুয়ার খুলতে হ'বে—
নূতন যুগের উদ্বোধনের পূজাহোমে আলোই তবে ;—
কেনই বা নিশ্চিন্ত আছ—অলসভরে নয়ন মেলো !
বাড়ছে কালো,—রাতের প্রদীপ নিবিয়ে ফ্যালো, নিবিয়ে ফ্যালো।
আবির্ভাব-উৎকণ্ঠা নিয়ে ঋতুরাজের বার্ত্তা এলো—
তারি নিমন্ত্রণের লাগি'—পাকা ফসল কেটেই ফ্যালো !
ফসল কেটে মাঠ খালি কর্ নূতন প্রকাশ দেখ্‌বি সবে ;—
পাকা ফসল জমিয়ে রাখো, আখেরে নবান্ন হ'বে।
কে আছো গো লুকিয়ে কোথায়, বেড়িয়ে এসো মহোৎসবে;
বছর-পুঁথির শেষ পাতাটা নূতন রাগে রাঙ্‌তে হ'বে।
মুক্ত প্রাণের উৎসবে আজ রুদ্ধ প্রাণের বাঁধন খোলো—
নূতন যুগ ঐ জন্ম লভে—প্রাচীন যুগে একটু ভোলো।

জীর্ণ প্রাণের অঙ্গনে আজ জীর্ণ ঝড়ার মাতন লাগে,—
পুরাণো বীজ দীর্ণ করি' নূতন চারা মুক্তি মাগে।
বেরিয়ে এসো নবীন ওগো দীন আবরণ ছিন্ন করি'
নূতন পরশ-আমেজ পেনু—প্রকাশের আর নেইকো দেরী।
কুয়াসাটা যাচ্ছে কেটে, ভোরের অরুণ পাচ্ছে উদয়,
পথহারাদের পথের পরে জাগ্‌ছে যেন কোন্ বরাভয়!
কোন্‌খানে কে গোপন আছ—বেরিয়ে এসো মহোৎসবে;
কার প্রাণে কোন্ বার্ত্তা আছে—শুন্‌তে হ'বে শুন্‌তে হ'বে।
বকেয়া-বাকী হিসেব নিকাশ চুকিয়ে দেবার নেইকো দেরী—
বিশ্ব প্রাণের উৎসবে আজ মিল্‌বে এসো তাড়াতাড়ি!

সুকুমার ভাদুড়ী

কল্লোল তখন সবেমাত্র প্রকাশিত হ'তে সুরু হয়েছে।

একদিন গ্রীষ্মের দুপুর বেলা কল্লোল কার্য্যালয়ের ছোট্ট ঘরখানিতে বসে আমরা কাজ করছি। গোকুল একখানা আরাম চেয়ারে বসে কল্লোলের জন্য প্রেরিত রচনাগুলি একমনে পড়ছে। তপ্ত দুপুরের এই নির্জ্জনতার মাঝখানে, কচি নূতন পাতার মত একটি ছেলে ঘরের ভিতর যেন উড়ে এসে পড়্‌ল।

ছিপ্ ছিপে ফর্সা চেহারা, চোখ দুটি বড়, এই বয়সেই কপালের ওপর ৩ চারিটি রেখা বেশ গভীর ভাবে পড়েছে। পাত্‌লা ঠোঁট দুখানি কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বিভিন্ন হোল। মৃদু হেসে বল্‌ল, আমি আপনাদের দেখ্‌তে এসেছি।

সে নিজে তার পরিচয় দিল।

তার আগেই সুকুমারের দু'একটি গল্প কল্লোলে বেরিয়েছিল। সে সব লেখা সে ডাকে পাঠিয়েছিল।

অল্পে অল্পে সেদিন তার সঙ্গে আমাদের আলাপ হোল। যাবার পূর্ব্বে সে অত্যন্ত সঙ্কোচভরে বলল, আমি কল্লোলের জন্য কাজ করতে চাই।

আমি আর গোকুল মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম। সে চাওয়া একজন আরেকজনকে দেখ্‌বার জন্ত নয়। সে চাহনির মধ্যে একই সময়ে দুজনের মনের কৃতজ্ঞতা বাতায়ন পথের আলোর শিখার মত দেখা দিল। সে কৃতজ্ঞতা, যিনি আমাদের প্রতি মুহূর্তের শক্তি ও সহায় তাঁরই উদ্দেশে নীরবে উত্থিত হোল।

মনে আনন্দ ছল্ ছল্ ক'রে উঠ্‌ল।—একটা মানুষ আবার আপন হোল। কল্লোলের সাগর সমান প্রবাহে আর এক বিন্দু।

সেই থেকে সুকুমার প্রায় প্রত্যহই আস্‌ত। আত্মীয়তা বেড়ে গেল। শুধু সাহিত্যের সহচর নয়, তার জীবনের ছোট খাট সমস্ত বিষয়েই সে আমাদের বন্ধুরূপে জেনে নিল। তার বাবা মা কে, কোথায় তাদের বাড়ী, এ সকল জানতে আমরা চাই নি। মোটের উপর আমরা তার সঙ্গে থেকে এই কয় বছরে যতটুকু তার ও পরিবার সম্বন্ধে জান্‌তে পেরেছি তাই আজ বল্‌ছি।

শুনেছি সুকুমারকে খুব কষ্ট ক'রে তার নিজের পড়া চালান ও পরিবার প্রতিপালন করতে হোত। সেজন্ত সে কল্‌কাতায় থেকে 'প্রাইভেট্‌ টিউশনি' করত। এদিকে দুপুরে ও বিকেলে কলেজে যেত। স্বাস্থ্য তার মোটের উপরে খারাপ ছিল না। দেখ্‌তে রোগা ছিল বটে কিন্তু নিত্য জ্বর, সর্দ্দি, কাশি, পেটের অসুখ—এ রকম ধরণের কথা কিছু শুনি নি। তবে খাটুনি তার খুব বেশী ছিল। তার চাইতে বোধ হয় সাংসারিক দুর্ভাবনা তার অনেক বেশী ছিল।

যতদূর জানি, তার বাড়ীতে তার বিধবা মা, দুটি অবিবাহিতা বোন ছিলেন। একটি বোন্ তখন বাংলার সমাজ হিসাবে 'অরক্ষণীয়া' হয়েছিলেন। তাঁকে পাত্রস্থ করার ভাবনাই তার তখন সব চাইতে বড়। বাংলাদেশে ঘুরে ঘুরে বছর পাঁচেকের মধ্যে সে একটি সুবিধামত বর জোগাড় ক'রে উঠ্‌তে পারে নি। তার প্রধান কারণ বোধ হয়, চাহিদার মত বর-পণ দেবার অক্ষমতা।

আমাদের সঙ্গে আলাপ হবার পর সুকুমার ও বিজয় দুজনে মিলে আমাদের খুব আমোদে রাখ্‌ত। বিজয়ের গম্ভীর আকৃতির অভ্যন্তরে যেমন একটি সুরসিক মানুষ ছিল, তেমনি সুকুমারের সংসারের রোদে-পোড়া হাড়-ক'খানির ভিতরেও একটি আনন্দের খনি ছিল। সে অন্ধকার গুহা

থেকে হীরের মত জল্‌জলে ছোট খাট অনেক মজার কথা সে আমাদের শোনাত। কৃষ্ণনগর তার দেশ, সেখানকার উচ্চারণকে একটু রকমারি ক'রে সে নানা রকম গল্প শোনাত। তার একটা কথা আজও মনের মধ্যে ভেসে উঠ্‌লে এ দুঃখের দিনেও হাসি পায়। কথাটা ছিল, এক বড়লোকের ছেলে শীতকালে তার বাবার কাছে আব্দার ধর্‌ল, সাধারণ মশারীর পরিবর্ত্তে তাকে একটা, -"লেপ্পোর মশারী" ক'রে দিতে হবে।

বিজয় ও সুকুমারের মধ্যে খুব প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। এরা দুজনেই লোককে খুব হাসাত। বোধ হয় দুজনের দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়েই এরা দুজনে দুজনের এত আপন হয়েছিল। এরা দুজনে ঘরে ঢুক্‌লেই আমরা কাজের চাপ্‌ থেকে মাথা তুলে প্রতীক্ষা করতাম, এরা আজ কি নূতন হাসির কথা বলে। এত কষ্টের মধ্যেও এরা এত হাস্‌তে পারত, এটা খুব অস্বাভাবিক মনে হলেও খুব শক্ত কথা।

বিজয় হয় ত একদিন এসে বল্‌ল—এ—ই—য়ে, সুকুমারটা একটা "ফল্‌স্‌" (false)! কথার মাথা নেই মুণ্ডু নেই, কিন্তু বিজয় এই "ইয়ে" কথাটি এমন বিকৃত ও তোত্‌লার মত ক'রে উচ্চারণ করত যে, তার ঐ কথাটির প্রথম চোটেই সবাই খুব হেসে উঠ্‌ত। বিজয় আর সুকুমার ছিল, আমাদের দরিদ্র সংসারটির মাঝখানে আনন্দের কপোতাক্ষী। ওদের ছোটছেলের মত ভাবগুলি আমাদের সংগ্রামের বদ্ধ হাওয়ার মাঝখানে যেন বাইরের নির্ম্মল বায়ুর নিশ্বাস বহন ক'রে আন্‌ত। আমরা মুখ তুলে সে নিশ্বাস নিয়ে বেঁচে উঠ্‌তাম। তাই এদের দুজন ও গোকুলের সদানন্দ স্বভাবের অভাব, আমাদের বড় অসহায় ক'রে রেখেছে।

সুকুমার এম, এস, সি ও ওকালতী পড়ত। শেষকালে খরচের দায়ে এম্‌, এস্‌, সি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

সুকুমার শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে ইদানীং গৃহ শিক্ষকের কাজ করত। নামে চাকরী, কিন্তু থাক্‌ত একেবারে ঘরের ছেলের মত। প্রমথবাবু ও তাঁর স্ত্রী সুকুমারকে পুত্রস্নেহে রেখেছিলেন।

এই কাজ ক'রে যে মাইনে পেত, তাতে সব খরচ কুলিয়ে উঠ্‌ত না। মাঝে মাঝে তাই লেখার ব্যবসা চালাত। যথা, পূজার সময় কোনও সাময়িকী কাগজের শারদীয়া সংখ্যায় গল্প দেওয়া, কোনও মাসিকে ধরাধরি ক'রে গল্পের পরিবর্ত্তে কিছু পাওনা-গণ্ডা জোগাড় করা,

এমনি ক'রে তাকে চালাতে হোত। গল্প লেখায় সুকুমারের একটু আধটু নাম ছিল বটে, কিন্তু যে সব কাগজের কর্তৃপক্ষ লেখককে টাকা দিতে পারেন, তাঁরা সুকুমারের মত লেখককে নেহাৎ না চেপে ধরলে টাকা দেবেন কেন? ভাল লেখকদের পারিশ্রমিক (?) দিতেই তাঁরা কাঁউ মাঁউ করেন।

যাহোক, এ রকম উঞ্ছবৃত্তি করে ত সুকুমার বেশ চালাচ্ছিল। ভাবনা ছিল বোনের বিয়ে। শেষকালে হঠাৎ তার মৃত্যুর মাস কয়েক পূর্ব্বেই তার বোনের জন্য একটি বর জুটে গেল। বরটিও ভাল, টাকা পয়সাও বিশেষ কিছু নেন্ নি।

সুকুমার এই বোনটির বিয়ে দিতে পেরে কত আনন্দ করেছে। তার এই কর্ত্তব্যটি পালন করতে পেরে সে নিজেকে ধন্য মনে করত।

গত পূজার সময় সে বাংলার বাইরে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে যায়। ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত দীলিপকুমার রায় প্রভৃতির সঙ্গে সুকুমারের আত্মীয়তা ছিল। তাঁহাদেরই কারুর সঙ্গে বা তাঁহাদেরই কারুর কাছে বিদেশে গিয়ে সে থাক্‌ত। নিজের খরচায় দেশ বেড়া'ন তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

গেল পূজাতে আমি গোকুলকে নিয়ে দার্জ্জিলিং-এ যখন ব্যস্ত তখন সুকুমারের একটা চিঠি পাই, তাতে সে লিখেছিল শরীর সারাবার জন্য সে মোজাফ্‌ফরপুর গিয়েছে। সেখানে খুব গান-বাজনার সঙ্গত চলেছে, বেশ আমোদে আছে।

সাম্‌নে গোকুল প্রতিদিন মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছে আর এদিকে, সুকুমারের এই চিঠি। পড়ে মনে হলো, আহা বাঁচুক! সম্মুখের ঐ অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চেয়েই একথা মনে হলো। গোকুলের রোগ-যাতনাক্লিষ্ট মুখে যে একটা শেষরশ্মিপাতের উজ্জ্বলতা দেখ্‌তে পেতাম, পাহাড়ের গায়ে ছিন্ন মেঘের অন্তরালে সূর্য্যাস্তের শেষ আভাতেও তাই দেখেছি। বুঝি সূর্য্যও তার প্রতিদিনের হাসি-মেঘে জড়িত পৃথিবীকে ছেড়ে যেতে চায় না! তাই মনে, হয়েছিল, বাঁচুক, যাদের বাঁচার একটুও উপায় আছে তারা বাঁচুক! গোকুল তখন বল্‌ছিল, জানালার পর্দ্দাটা সরিয়ে দাও একটু, আকাশটা দেখি, এখুনি ত আবার অন্ধকার হয়ে আস্‌বে।

মনটা ছ্যাঁক্ করে উঠ্‌ল। তার সাধারণ কথাটা এমন করেই তখন মনকে আকুল করে তুল্‌ছিল। সত্য, পাহাড়ের দেশে অন্ধকারটা ঝুপ্‌ করেই নেমে আসে।

সে চিঠি পাওয়ার পর সুকুমারের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় নি। যে বার দেখা হোল, তখন তাহাকে দেখে বড় ভাল ঠেক্‌ল না।

তারপরেই মাস দুই পরে শুনি সে জ্বরে পড়ে আছে। সে জ্বর ছেড়ে যেতে তার চেহারা একেবারে সাদা গন্ধকের শলুই কাঠির মত হয়ে গেল। বুঝি জ্বালাতে পারলে জ্বলে। কিন্তু নিজের কোনও সামর্থ্য নাই।

পরামর্শ করে ডাক্তার জিতেন বাবুকে দিয়ে পরীক্ষা করান হোল। অন্য ডাক্তারও দুই একজন দেখ্‌লেন। শেষ কালে জানা গেল—ডায়েবেটিস্ (বহুমূত্র রোগ)।

এত অল্প বয়সে এ রোগ হওয়া খুব ভয়ের কারণ। কোথাও ভাল বায়গায় যাওয়া তৎক্ষণাৎ প্রয়োজন! কিন্তু তার মত অবস্থার যুবকের প্রয়োজনের মত আয়োজন কিছুই থাকে না। বুঝি প্রয়োজন যার যত দারুণ, আয়োজন তার ততই কম থাকে!

নেহাৎ কৃষ্ণনগরে বাড়ীতে যাওয়াই স্থির হোল। ঔষুধ পত্র প্রেসক্রিপসন্ সঙ্গে গেল। মাস খানেক কোনও চিঠি পেলাম না। ভয়ে ভয়ে চিঠি লিখ্‌তাম না। যদি ভাল হয়ে উঠ্‌ছে হয়,—হয় ত বা একটু আমোদে আহ্লাদে আছে, এ সময়ে রোগের খবর জিজ্ঞেস করে তাকে আবার রোগের কথা মনে করিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। আর যদি রোগ বেড়েই থাকে? তাহলেও কি করে তাকে চিঠি লিখে ব্যস্ত করি। জান্‌তাম তার বাড়ীতে সে ছাড়া পুরুষ কেউ থাকে না, সে-ই ত চিঠি পাবে।

শেষ কালে তারই একজন বন্ধু তাকে দেখ্‌তে গেলেন। খবরটা আজ পাব কাল পাব ভাবছি, এমন দিনে সুকুমারের হাতের লেখা চিঠি পেলাম। লেখা—খুব বেশী বাড়াবাড়ি হয়েছিল, একেবারে শয্যাগত, চিঠি লেখার বা ওঠ্‌-বার ক্ষমতা ছিল না।

তাকে যে অবস্থায় দেশে পাঠান হয়েছিল, সে চেহারা আর—তার উপর বাড়াবাড়ির সংবাদ—মন আপনা থেকেই বলে উঠ্‌ল, তবে কি এক, দুই—তিন্?

বিজয়; গোকুল—আর মনে করতে ইচ্ছা হোল না।

তার পরের চিঠিতে লিখল, দুম্‌কায় তার এক কাকা আছেন, তাঁরই ওখানে গিয়ে মাস খানেক থাকা স্থির হয়েছে, কারণ কাকা মাত্র আর একমাসই ওখানে

থাকবেন, তারপর তাঁকে অন্যত্র বদলী হতে হবে। তিনি সেখানকার এসিষ্টাণ্ট সেট্‌লমেণ্ট অফিসার।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে তাকে আনতে গেলাম। তার চেহারা দেখে মুখে স্বাভাবিক ভাব রাখাও মুস্কিল। দুখানি সরু লাঠির ওপর দুটি বড় চোখ, আর কিছু নাই। মাতালের মত দুলতে দুলতে আমার হাত ধরল। কত আশার কথা! নিজেই বলতে লাগল, আমার আর এখন বিশেষ কিছু অসুখ নেই, অনেকটা সেরে উঠেছি। কেবল যা' দুর্ব্বলতা ইত্যাদি। কলকাতার বন্ধুদের কথা, কল্লোলের নূতন বৎসরের কথা, বিজলীর কাজ কি করে চালাব তার কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

শরীরের তার তখন এমন অবস্থা যে, নিজের পায়ে পা লেগেই সে ষ্টেশনের প্লাটফর্মে একবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। সে অবস্থা দেখে মনটা আরও দমে গেল। তবু তাকে যতটা সাহস দেওয়া সম্ভব, তাই দিয়ে দুম্‌কায় রওয়ানা করে দেওয়া হোল। তার একলা ঐ দুর্গম পথ যাওয়া একেবারেই সম্ভব ছিল না। আমাদেরই বন্ধু নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ তাকে সঙ্গে করে দুমকায় রেখে এল। যাবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত প্রমথ বাবু ও তাঁর পত্নী—শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী এবং শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করেছিলেন।

এই অর্থ সাহায্য অপ্রত্যাশিত, কিন্তু দুঃসময়ে মস্ত বড় উপকার হোল। নৃপেন তাকে দুমকায় রেখে কল্‌কাতায় ফিরে এল। দুমকায় তার কাকা ও খুড়ী-মা তাকে প্রাণপণ সেবা যত্ন করেছেন। দুম্‌কার মত যায়গায় তার মত রোগীর ঔষধ পথ্য জোগাড় করা বড় সহজ কথা নয়। বিশেষ কোনও জিনিষই সেখানে পাওয়া যায় না, তবু তাঁদের দুজনের অক্লান্ত সেবায় সুকুমার একটু ভালই বোধ করছিল। কত আশা;—ভাল হয়ে আবার সাহিত্যের সেবা করবে, কত কি!

৫ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে আমি তাকে একখানা চিঠি লিখি এবং ৬ই সকাল বেলা কাল্লনের ডাকঘর লিখ্‌তে তার অসুখের কথা লিখি, সে সময় সে বোধ হয় খেয়ার পাড়ি দিয়েছে!

তার দুদিন পরে কল্লোলের ডাকঘরের শেষ প্রুফটা দেখে সবেমাত্র শেষ করেছি, এমন সময় তার শেষ সংবাদ নিয়ে তার কাকার কাছ থেকে চিঠি এল। সংগ্রাম-ক্লান্ত রণবীর সমস্ত ক্ষত চিহ্নের ভূষণ পরে মৃত্যুর আমন্ত্রণ রাখ্‌তে চলে গিয়েছে।

মৃত্যুর দুদিন পূর্ব্বে তার নিউমোনিয়া হয়। খুব সম্ভব পথেই কোনও রকমে ঠাণ্ডা লাগে। তার শরীরে এমন কিছু পদার্থ ছিল না যে, ডাক্তারেরা কোনও রকম ঔষধ দিয়ে তাকে একদিনের জন্যও রক্ষা করেন।

বারে বারে এই মৃত্যুর সংবাদ দিতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু একটার পর একটা ঘটনা এমন পর পর ঘটছে যে, তাকে অস্বীকার করবার কোনও উপায় নাই। বাংলা দেশে তারই মত কত অখ্যাত যুবক যুদ্ধে ক্লান্ত হ'য়ে অকালে শেষ শয্যা গ্রহণ করছে!

সুকুমারের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শ্রীযুক্ত প্রমথ বাবু আমাকে যে চিঠিখানি লিখেছেন, তা এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম।

বাংলাদেশের এই ক্ষয়ের আহুতিতে আর কত বলি চাই!

২০ মে ফেয়ার,
বালিগঞ্জ
১২-২-২৬

কল্যানীয়েষু,

আজ ঘুম থেকে উঠে তোমার পোষ্টকার্ডে সুকুমারের অকাল-মৃত্যুর খবর পেয়ে মন বড় খারাপ হয়ে গেল। কিছুদিন থেকে তার শরীরের অবস্থা যে রকম দেখেছিলুম তাতেই তার জীবনের বিষয়ে হতাশ হয়েছিলুম।

আমার সাধ্যমত তার রোগের প্রতিকার করবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তার ফল কিছু হ'ল না। নৃপেন যে তার সঙ্গে দুমকা গিয়েছিল' তাতে সে প্রকৃত বন্ধুর মতই কাজ করেছে। নৃপেনের এই ব্যবহারে আমি তার উপরে যারপর নাই সন্তুষ্ট হয়েছি!

এই সংবাদ পেয়ে একটা কথা আমার ভিতর বড় বেশি ক'রে জাগছে।

সুকুমারের এ বয়সে পৃথিবী থেকে চ'লে যেতে হ'ল শুধু তার অবস্থার দোষে। এ দেশে কত ভদ্র সন্তান যে এ রকম অবস্থায় কায়ঃ-ক্লেশে বেঁচে আছে, মনে করলে ভয় হয়। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

পড়ে থাকা

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

ফেলে রেখে গেছ কত পুঁথি পত্র, খেলনা কত না,
স্মৃতির দেউটিগুলি বিস্মৃতির আঁধার দেউলে,
ঝাড়িমুছি, চেয়ে দেখি, হাতে করে রেখে দিই তুলে'
আমার যে জোর-করে ভুলে থাকা বিচ্ছেদ যাতনা,
সেদিন দ্বিগুণ হ'য়ে ওঠে;
সেদিন আকাশে মোর একেবারে আলো নাহি ফোটে;
ফুল ভুলে যায় হাসি, গীত সুধা পাখীর গানের
কোথা যায়? কানে পশে, পথ খুঁজে পায় না মনের।
চোখে পড়ে খাতার কোণায় লিখে রাখা বার বার,
ছোট বড়, আঁকা বাঁকা, লাল কালো, হাতের আখরে,
সারি সারি লতায় পাতায় ঘেরা, কত যত্ন করে'
তোমার মনের ডাক, অনুরাগ "মাগো, মা আমার"—
জল যে শুকায়ে আসে চোখে,
কোথা আমি, কোথা তুমি, কত দূরে আছ কোন্ লোকে?
কেন নিয়ে চলে গেলে অকস্মাৎ এত ভালবাসা?
ভেঙে দিয়ে গড়ে তোলা আমাদের ছোট খাটো বাসা!
তোমার যা কিছু ছিল সুন্দর সাজান চারি ধারে,
হাতে বোনা কচি গাছ দিনে দিনে যুবা হ'ল সব,
কারো আজ ফুল দোল, কাল কারো রাসের উৎসব,
কারো ফসলের বেলা, আনত অপুর ফলভারে,
তব অন্ধকার মাঝে একা,
বৃথায় আমার কাটে দিন, কত দীপ্ত অশ্রু রেখা
লেখে মৌন ইতিহাস, কত আলো মিলায় মলিন;
মোর ভরিল না কোল, বসুন্ধরা বিফলে বিলীন।

চিঠি

শ্রীহরিপদ গুহ

বেলা পড়ে এসেছে। স্বামী সিদ্ধিনাথ ঈজি চেয়ারে শুয়ে কি একখানা বই দেখ্ছিলেন। স্ত্রী শুকতারা মেঝের বসে একমনে কার্পেটে ফুল তুল্ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে উঠে গিয়ে তাঁর ঘুমন্ত ছেলে দুটীকে বাতাস করে আস্ছিলেন। দাসী এসে টেবিলের ওপর একখানা চিঠি রেখে গেল। সিদ্ধিনাথ পত্রখানা তাঁর নামে দেখে, খামটা ছিঁড়ে ফেলে পাঠ কর্‌তে লাগ্‌লেন ;—

ঠাকুর-পো—

আজ কতদিন পরে তোমার এই চিঠির মধ্য দিয়ে সম্ভাষণ কর্‌ছি! উঃ! কতদিন! মনে করেছিলুম, এ গৃহত্যাগিনীর সংবাদ আর কাকেও জানাব না; যেমন সকলের অসাক্ষাতে বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছি, তেমনই গোপনে একদিন ধরার পান্থশালা থেকে চির-বিদায় গ্রহণ কর্‌ব! কিন্তু পার্‌লুম না ভাই! কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখতে পারলুম না। আলোক সেদিন এ কালামুখীকে 'মা' বলে ডেকে, আমার মর্ম্মের মাঝে যে গভীর রেখা টেনে দিলে, তা কোন মতেই মুছে ফেল্‌তে পার্‌লুম না! তার কাছে শুন্‌লুম,—তোমরা এখানে বেড়াতে এসেছ; তাই ঠিকানা জেনে আজ এই পত্র লিখ্‌তে বসেছি।

তুমি ত জান্‌তে, স্বামী আমার উপার্জ্জনে অক্ষম বলে বাড়ীসুদ্ধ লোকের অপ্রিয়ভাজন ছিলেন। প্রতিদিন কত লাঞ্ছনাই না তাঁকে সহ্য কর্‌তে হতো! —অথচ, তিনটে পাশ করেও কেন যে তিনি তার প্রতিকারের চেষ্টায় মন দিতেন না, তা এতদিনেও আমি ভেবে ঠিক্ কর্‌তে পারি নি!

তারপর, যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় যে দিন তিনি একখানা চিঠি লিখে রেখে আমার বাক্স থেকে ক'খানা গহনা নিয়ে জন্মের মত বাড়ী ছেড়ে চলে যান, সে দিনের কথাও তোমার মনে আছে বোধ হয়? তিনি ত গেলেন না, আমায় বাঘিনীর গর্ত্তে ফেলে রেখে গেলেন! বাঘিনী?—হাঁ, নয় ত কি? 'ননদিনী রায়বাঘিনী' কথায় যা শুনেছিলুম তা মিথ্যা নয়। আমার ননদই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ! মেয়েছেলে যদি বাপ মায়ের অত্যন্ত আদুরে হন এবং অল্পবয়সে বিধবা হয়ে যদি তাঁদের সংসারেই চির-দিনের জন্য প্রবেশ করেন, তাহলে তাঁর ভাজের যে কি দুর্দ্দশা হয়,

তুমিই তার একজন অলন্ত সাক্ষী! শাশুড়ী ঠাকুরুণও মেয়ের চেয়ে বিশেষ কম ছিলেন না;—থেকে থেকে কুটুকুট কামড় দিতে তিনিও বড় কসুর কর্তেন না। আর আমার স্বামী, যিনি নিজের স্ত্রীকে শত্রুপুরীতে ফেলে পালান, সে যে কি অবস্থায় আছে, মর্‌ল কি বাঁচ্‌ল কোন খবরই নেন না, বুঝ্‌তে পারি না, তিনি কেমন পুরুষ? ভেবে পাই না, এমন লোকে বিবাহ করেন কেন, যাঁদের নিজের স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণ কর্‌বার ক্ষমতা নেই?

যা হোক্, তিনি চলে যাবার পর থেকে আমার ওপর যে কি উৎপীড়ন আরম্ভ হলো, তা তোমায় ত সব ভেঙে বল্‌তুম না—পাছে তুমি মনে কষ্ট পাও। 'অলক্ষণা', 'সর্ব্বনাশী' 'রাক্ষুসী' শুনতে শুনতে ত কানে তালা ধরে গেল! এমনই আরও কত কি! রক্ত মাংসের শরীরে আর কত সয় ঠাকুর-পো? এতে, পাষাণও যে ফেটে যায়, মরামানুষও যে জেগে উঠে!

তারপর, একদিন ভোররাত্রে দেড়-বছরের মেয়েটীকে কোলে নিয়ে একবস্ত্রে শ্বশুরবাড়ী ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম; পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাতৃ-হীনা অভাগীর কোথাও আশ্রয় নেই জেনেও। মনটা তবু একবার কেমন করে উঠ্‌ল; জেলখানায় কয়েদীর কারাগার ছাড়্‌বার সময় যেমন হয়! যদি তুমি উপার্জ্জনক্ষম হতে, মামা-মামীর গলগ্রহ হয়ে ছোটভাইটীকে নিয়ে তাঁদের সংসারে পড়ে না থাক্‌তে, যদি তোমার নিজের থাক্‌বার সামান্ত একটু স্থানও থাক্‌ত, তা হলে নিশ্চয়ই সেখানে গিয়ে উঠ্‌তুম। কারণ, তুমি নিঃসম্পর্কীয় প্রতিবেশী হলেও আমার বড়দিদির মতই শ্রদ্ধা-ভক্তি কর্‌তে এবং ভালবাস্‌তে! —ক'জন জ্যেঠা-ভগ্নী তার মায়ের পেটের ভায়ের কাছে এমন ব্যবহার পায়! এত ধাক্কা খেয়ে এ বিশ্বাসটা এখনও ত হারিয়ে ফেল্‌তে পারি নি!

'যাক্, বাড়ী ছেড়ে ত বেরুলুম। নিঃসহায়, নিরবলম্ব অভাগিনী নারী একলা পথে! রাস্তা চল্‌তে চল্‌তে ভগবানকে কেবল ডাক্‌তে লাগ্‌লুম,—'আমার এ চলার শীগ্‌গিরই শেষ করে দাও ঠাকুর!' সামান্ত যা-কিছু হাতে ছিল, তা দিয়ে ত চার পাঁচদিন কোন রকমে চল্‌ল;—রাতটা গাছতলায় পড়ে কাটিয়ে দিতে লাগ্‌লুম। তারপর ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে একদিন এক ঠাকুর-বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলুম। কিন্তু, আহার্য্যের কথা ত কিছুতেই বল্‌তে পার্‌লুম না! ভিক্ষা চাইতে যে গলার কাছে রক্ত ছুটে আস্‌তে লাগ্‌ল! যা হোক, চাইতেই যখন হবে, বাচিঞাই যখন নিয়তি, তখন মুখ বুজে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে চল্‌বে কেন? অতি কষ্টে ত পূজারীকে নিজের অবস্থার কথা বল্লুম।

সেখানে আরও দু-তিনজন ছিল। সকলে মিলে কদর্য্যভাষায় আমায় ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে লাগ্‌ল। হৃদয়হীন পশু সব! সেখান থেকে আস্তে আস্তে সরে এলুম। ভাবতে লাগ্‌লুম, এই স্ত্রী জাতিটা এত দুর্ব্বল, এতটা অসহায় কেন? এর জন্য কে বেশী দায়ী? প্রকৃতি, না তারা নিজে?

যা হোক্, একবার চাওয়ায় লজ্জাটা একটু কমেছিল, সাহসও সামান্য বেড়ে গিয়েছিল। তাই এবার এক গৃহস্থের বাড়ীর ভেতর ঢুকে, তাঁরা স্বজাতি জেনে গিন্নীর নিকট রাঁধুনী-বৃত্তির প্রার্থনা জানালুম। শুনে, তিনি আমার দিকে এমনই কট্‌মট্‌ করে চাইলেন যে, ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে উঠ্‌ল! তারপর, যে নীচ অকথ্য-ভাষায় আমার ওপর গালাগালি বর্ষণ করতে লাগলেন, তাতে সন্দেহ হলো,—তিনি কি ভদ্র কন্যা, ভদ্র গৃহস্থের স্ত্রী! সেখানে অবমানিত হয়ে আবার ত পথে এসে পড়লুম। মাথার ওপর তখন রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছিল; ক্ষিদেয় শরীর অবসন্ন হয়ে আসছিল! মেয়েটা মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল; তার আর অপরাধ কি? কদিন ত তাকে ভালরকম দুধই যোগাতে পারি নি; আমার শরীরের যে অবস্থা! তবু ত সে অনেক সহ্য করেছে; মায়ের মেয়ে কিনা! তাকে ভোলাতে লাগ্‌লুম,—'ওরে অভাগীর সন্তান! ওরে আমার বুকছেঁড়া ধন! ওরে আমার সাতরাজার ধন মাণিক! তোর মা যে আজ নিতান্তই অসহায় রে, নিতান্তই অসহায়!'

লোকের ব্যবহারে ঘৃণা ধরে গিয়েছিল; কিন্তু, পোড়া পেট ত মানে না! আমি মরি তাতে ক্ষতি নেই; কিন্তু মেয়েটাও যে সেই সঙ্গে সঙ্গেই যাবে! পা আর চল্‌ছিল না; তবুও মনে জোর করে আর একজনদের বাড়ী গিয়ে উঠ্‌লুম একটা চশমা চোখে ছোক্‌রার সঙ্গে বাইরের ঘরেই দেখা হলো। তাকে আমার অবস্থার কথা কোনরকমে জানাতেই, সে একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠ্‌ল; দরওয়ান ডেকে আমায় তাড়িয়ে দিতে চাইলে। আমি কত কাকুতি মিনতিই না করলুম, কিন্তু, সেই কঠোর-হৃদয় নৃশংসের কিছুতেই দয়া হলো না! দরওয়ান আস্‌তে দেরী হচ্ছে দেখে, সে রাগে আমায় কুকুর লেলিয়ে দিতে গেল; আমি ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এলুম।

বেলা পড়ে এল। নদীর ধারে এসে আঁজ্‌লা আঁজ্‌লা করে জল খেয়ে ক্লান্ত শরীরে একটা গাছতলায় বসে পড়লুম। কত পুরুষ, কত মেয়ে নদীতে জল নিতে এল; কিন্তু কেউ একটা কথাও আমায় জিজ্ঞাসা করলে না, মুখের সামান্য 'আহা'ও বল্‌লে না। এই সংসার! আর এই অন্তঃসারশূন্য সংসারের

লোক! ক্রমে সূর্য্যের আলো নিভে গেল; সন্ধ্যা হলো। আমিও ধীরে-ধীরে সেখানে শুয়ে পড়লুম। মেয়েটা তখন আমার কোলে একেবারে নেতিয়ে পড়েছিল। ওরে বাছা, বাছারে আমার! তারপর, কখন যে ঘুমিয়ে পড়লুম, কিছুই জানতে পারি নি। সকালে কার ডাকে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখি,—একটি শান্তমূর্ত্তি প্রৌঢ়া। তিনি নদীতে স্নান করতে এসেছিলেন; আমায় এ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ডাকাডাকি করছেন। আমি উঠে বসতে, তিনি মিষ্টি কথায় আমার দুর্দ্দশার করুণ কাহিনী শুনতে চাইলেন; সমস্ত শুনে কাপড় দিয়ে নিজের চোখ মুছতে লাগলেন। মনে হলো,—সাক্ষাৎ দয়াদেবী বুঝি এ অভাগিনীর দুঃখে দুঃখিত হয়ে, কৃপা করে মর্ত্ত্যে নেমে এসেছেন! তিনি আমায় তাঁর বাড়ী নিয়ে যেতে খুব আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। আমিও আশ্রয় পেলুম ভেবে জীবন-মরণ পণ করে তাঁর সঙ্গে ধীরে-ধীরে পথ চলতে লাগলুম।

সেখানেও কিন্তু তিন মাসের বেশী টিকতে পারলুম না। পোড়া রূপই যে আমার সর্ব্বনাশের কারণ হলো! গৃহিনীর গুণধর পুত্রের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে আবার একদিন রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হলো।

তারপর, একরূপ অনাহারে গৃহিনী দত্ত সামান্য পয়সায় কদিন মুড়ী-মুড়কী খেয়ে পথে-পথে ঘুরতে লাগলুম। কিন্তু, এমনি-করে আর কতদিন চলবে? মেয়েটা ত বার-বার অবস্থা হয়ে দাঁড়াল। হায়! তখন যদি সে যেত, তা হলে কপালে ত আর তাকে এ কলঙ্কের ছাপ পরতে হতো না! মা হয়ে মেয়ের মৃত্যুকামনা যে কতবড় জ্বালায় করছি, তা বুঝছ ত ঠাকুর-পো?

"তারপর......অধঃপতনের অতল তলে তলিয়ে গেলুম! কেন?...কেন? ...মেয়েটার ক্ষুধার তাড়নায়, জগতের লোকের নির্ম্মম নিষ্ঠুর অত্যাচারে! পথে বসে আছি দেখে, একদিন একজন কাছে এসে বললে,—'আমি যদি তার প্রতি অনুগ্রহ করি, তাকে একটু ভালবাসি, তা হলে সে আমার সকল অভাব দূর করে দেবে, আমায় রাজরাণীর মত আদর-যত্নে রাখবে।' কানের ভেতরটায় কে যেন গরম সীসে ঢেলে পুড়িয়ে দিলে!—আমি চক্ষে অন্ধকার দেখতে লাগলুম! হায়! এ কথা শোনবার পূর্ব্বে আমার আশুন্ধ ধরার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেল না কেন! মনে করলুম,—দুর্ব্বল নারীকে একা পথে পেয়ে যে পাপিষ্ঠ এমন অপমান করতে সাহসী হয়, জিহ্বা দিয়ে অতবড় কলুষিত বাক্য উচ্চারণ করে, উঠে তার ওই মুখে সজোরে এক লাথি বসিয়ে দি! আমি

কোন কথা কইলুম না দেখে সে একটু হেসে ফিরে গিয়ে নিজের গাড়ীতে উঠে বস্‌ল। এমন সময় মেয়েটা ক্ষিদের জ্বালায় ভয়ানক চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল; কিছুতেই থামতে চাইলে না। কেন সে অমন শত্রুতা কর্‌লে! আর যে পারি না! 'এখনও সময় আছে, এখনও এর প্রতীকার কর, এখনও আমায় বাঁচাও ঠাকুর!' ... কোথায় ভগবান! ... কে শুন্‌বে! তখন, ... ঈশ্বরকে ডেকে বললুম, 'যদি তোমার পুণ্যরাজ্য থেকে আমায় নির্ব্বাসিত কর্‌লে, তবে আর কেন? আজ থেকে ভাল করেই তোমার বিপক্ষে দাঁড়ালুম!'

"তারপর সে বাবুটীর সঙ্গে তিনবৎসর একত্রে কাটালুম। সে কুবেরের ঐশ্বর্য্য অকাতরে আমার পায়ে লুটিয়ে দিতে লাগল; সত্য সত্যই কোন অভাবই রাখ্‌লে না। তবুও তাকে বরাবরই ঘৃণা করে এসেছি। যে নরাধম আপনার স্ত্রীর প্রেম, পুত্রের ভালবাসা বিস্মৃত হয়ে তাদের ন্যায্য স্বত্ব থেকে বঞ্চিত করে' একটা কুলটাকে নিয়ে পড়ে থাকে, কিছুমাত্র ধর্ম্মজ্ঞান থাকতে অতবড় হীন অপদার্থকে ঘৃণা কর্‌ব না ত কি? তবে কৃতজ্ঞতার ঋণ যে একেবারেই নেই, এটাই বা অস্বীকার করি কেমন করে? কুলটা, ... কুলটা?—পুরুষের অসীম দয়ায় আজ তা নয় ত আর কি? কিন্তু, কতবড় জ্বালায় এ পথে নেমেছিলুম, আর কি যন্ত্রণায় পুড়ে মর্‌ছি, তা মানুষ কোথায় যে বুঝবে? ভগবানই যখন ভাব্‌তে ভুলে গেছেন!

"যা হোক্, আমি তাকে অনেকবার সাবধান করেছিলুম, স্ত্রী পুত্রের দিকে একটু মনোযোগ দিতে বলেছিলুম, কিন্তু কেই বা কথা শোনে? বরং বারবার বলায় সে একদিন রেগে শুধু আমায় মার্‌তে বাকী রেখেছিল। কাজ কি আমার অত দয়ায়,—আমি যে সমাজের আবর্জ্জনা, পতিতা!

"তারপর বাবু হঠাৎ একদিন মদের নেশায় ছাদ থেকে পাখী হয়ে উড়্‌তে গিয়ে এমন দেশে উড়ে গেলেন, যেখান থেকে ফিরে আসার সংবাদ আজও পর্য্যন্ত কেউ দিতে পারে নি। যাক্, আমিও বাঁচ্‌লুম।

"তারপর, তারপর আর অতি অল্পই আছে। পাপের বাসা ছেড়ে, মেয়েটীর হাত ধরে আবার একদিন বাইরে এসে দাঁড়ালুম। সাতবৎসর কত তীর্থে তীর্থেই না ঘুরলুম, কিন্তু কই, শান্তি ত পেলুম না! আজ এক বৎসর হলো, এই পুরীতে এসে বাস কর্‌ছি,—আর প্রত্যহই সেই চরম দিনের অপেক্ষায় সময় গুণছি! আমি ম'লে মেয়েটার অবস্থা যে কি হবে, এই ভাবনায় আমায় পাগল করে তুলেছে! আহা! সে যে আমার নির্ম্মল কুসুম! দেশে এমন দয়াবান,

মহাপ্রাণ যুবক কি কেউ নেই যে, এ হতভাগিনীর মেয়েকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করে? যদিও আমার পক্ষে এ নিতান্ত দুরাশা, তবু আশাতেই যে মানুষ বেঁচে থাকে ভাই! তার একটা ব্যবস্থা হলে যে, আমি নিশ্চিন্ত হই! তারপর পাপের উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ দিয়ে এমন একটা আশ্রম নির্ম্মাণ করাই যাতে আমার ন্যায় উৎপীড়িত, আশ্রয়শূন্য, উপায়হীন অভাগিনীরা আর ক্ষুধার তাড়নায় পাপ পথে না গিয়ে, সেখানে একটু মাথা গোঁজ্‌বার স্থান পায় এবং দু-মুঠো শাক-ভাত খেয়ে কোনরকমে নিজেদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌তে পারে!

"আমার কথা যা বল্‌বার সবই বল্‌লুম। হাঁ, একটা কথা লিখ্‌তে ভুলে গেছি; আমার মেয়ের অদৃষ্ট-আকাশ তমসাচ্ছন্ন দেখে, তার ঠাকুর-মা'র দেওয়া উজ্জ্বলা নাম বদ্‌লে তমসা রেখেছি! কেমন, ঠিক করি নি? এখন তুমি একবার আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বে? আশ্রম-সম্বন্ধে তোমার পরামর্শ ভিক্ষা চাই। আমি যাই হই, তুমি যে এখানে আস্‌তে কখনই দ্বিধা বোধ কর্‌বে না, এ বিশ্বাস এখনও ক্ষুণ্ণ হতে দিই নি! ভগ্নীকে ত আস্‌তে অনুরোধ কর্‌তে পারি না; তবে তিনি যদি দয়া করে এ পাপিষ্ঠার গৃহে পদার্পণ করেন, তা হলে নিজেকে কৃতার্থজ্ঞান কর্‌ব। আলোককে আনা চাই-ই। ইতি

তোমার হতভাগিনী
বৌ-দিদি"

সিদ্ধিনাথ স্ত্রীর দিকে পত্রখানা ছুঁড়ে দিয়ে আপন-মনে ভাবতে লাগ্‌লেন,—যখন তিনি কৈশোরে পিতা-মাতাকে হারিয়ে একদিন স্নেহের হাটে দেউলিয়া হয়ে পড়েছিলেন, তখন এই নারী তার হৃদয়ের অকৃত্রিম ভালবাসা দিয়েই তাঁকে উদ্ধার কর্‌তে সক্ষম হয়েছিল! তাঁর অন্তরের ক্ষুধা ভালরূপেই মিটিয়ে দিয়েছিল! আর একদিন, যে সময় তিনি কঠিন পীড়ায় পড়ে স্বজন কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হয়ে, শুধু শয্যায় শুয়ে মরণ-সমুদ্রের কলতান শুন্‌ছিলেন, তখন এই দয়াময়ীই প্রাণ তুচ্ছ করে দিবারাত্রির সেবায় শমনের মুখ থেকে তাঁকে ছিনিয়ে এনেছিল! তার দেওয়া জীবন ভিক্ষা পেয়েছিলেন বলেই ত আজ তিনি অক্লান্ত-পরিশ্রমের ফলে অগাধ সম্পত্তির অধিকারী! আর কয়দিন পূর্ব্বেও স্নান করতে গিয়ে, আলোক নিজেকে সাম্‌লাতে না পেরে যখন সমুদ্রের অতল-জলে তলিয়ে যাচ্ছিল, তখন ওই নারীর ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই না তিনি তাঁর প্রিয়তম ভাইটীকে ফিরে পাবার সৌভাগ্যলাভ করেছিলেন! আজ

অকস্মাৎ তাঁর চিন্তা-সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। শুকতারা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—'কি ঠিক কর্‌লে?'

তিনি বল্‌লেন—'এখনো ত ঠিক্ কিছু করি নি।'

'আমার কিন্তু স্থির হয়ে গেছে।' এই বলে তিনি নিজের দেবরকে ডাক্‌লেন—'ছোটঠাকুর-পো!'

আলোক উপস্থিত হলে তিনি তাকে পত্রখানা আগাগোড়া পড়ে শোনালেন; তারপর জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—'ইনি কে, বুঝতে পেরেছ?'

আলোক মাথা নেড়ে জানালে—'চিনেছি।'

'এখন আমার একটা অনুরোধ রাখবে?'

'ও কি বৌ-ঠান্! অনুরোধ! অনুমতি বলুন! কোন্‌দিন আপনার কথা অমান্য করেছি?'

সুকতারা আনন্দ-গদগদস্বরে বল্‌লেন—'হ্যাঁ আমার ভায়ের উপযুক্ত কথা বটে! কিন্তু মনে যদি কোন দ্বিধা-সঙ্কোচ আসে?'

'আপনার আশীর্ব্বাদে তাদের হাত থেকে উদ্ধার পাব।'

'তোমার মঙ্গল হোক্! তমসাকে তোমায় গ্রহণ কর্‌তে হবে।'

সিদ্ধিনাথ হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—'সে কি!'

'হ্যাঁ! মানুষের অবিচারে ভগবানের অভিশাপে যে জর্জ্জরিত, তার প্রাণে শান্তি দিতে চেষ্টা করা আবার এই মানুষেরই ধর্ম্ম! পুণ্যবতীকে সকলেই শ্রদ্ধা ভক্তি করে থাকে, এতে বিশেষ কোন মহত্ত্ব নেই। কিন্তু পাপিনীকে,—বিশেষত, যে পাপ ঠিক্ তার ইচ্ছাকৃত নয়,—কতজন সহানুভূতি দেখিয়ে কোলে টেনে নিতে পারে?'

সিদ্ধিনাথ হর্ষভরে বল্‌লেন—'তোমার মত স্ত্রী লাভ করে আমি ধন্য! মনে মনে আমিও এতক্ষণ ওই কথাই ভাবছিলুম; কিন্তু পাছে তুমি বিরক্ত হও বলে সহসা কোন মত দিতে সাহস কর্‌ছিলুম না। যাক্ এখন আমার ভাবনা দূর হয়ে গেল!'

শুকতারা ঈষৎ হেসে বল্‌লেন—"হ্যাঁ গা, আমি কি এতই নীচ? আমার ওপর কি তোমার বিশ্বাস নেই? নাও, এখন চল, আমরা দিদির ওখানে যাই; আর দেরী করো না।'

মুগ্ধ আলোকনাথ ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তার ভ্রাতৃজায়ার পদধূলি গ্রহণ

করলে। শুকতারাও তাঁর দেবরের মাথায় হাত রেখে নীরবে আশীর্ব্বাদ করলেন।

বসন্তের গোলাপ

শ্রীউমা দেবী

গোলাপ উঠিল ফুটে রূপ গন্ধ নিয়ে
বহিল প্রথম যেই দক্ষিণ বাতাস
বসন্তের দূত যেন বার্ত্তা গেল দিয়ে
দেরী নেই, দেরী নেই; এল মধুমাস।

গোলাপি অঞ্চলখানি, মুখে দিয়ে টানি
দাঁড়ায়ে রহিল সেথা যেন নববধূ,
কি শোভা মাখানো তার কচি মুখখানি!
কি অপূর্ব্ব মিঠে তার বুক ভরা মধু!

দশদিক হ'ল তার সুবাসে আকুল,
মধুলোভে উড়ে উড়ে এল কত অলি,
ফিরাইয়া দিল সব গরবিনী ফুল
হতাশ ভ্রমর দল ফিরে গেল চলি।

বসন্ত আসিল যবে ঝরি তার পায়
কহিল গোলাপ-বালা, প্রেম মুগ্ধ হিয়া,
"এতক্ষণ ছিনু আমি তব প্রতীক্ষায়
রূপে গন্ধে পূর্ণ হয়ে তোমার লাগিয়া!"

রূপ রস গন্ধ ভরা তনু মন তার
বসন্তে দিল সে নিজ শ্রেষ্ঠ উপহার।

আবোল তাবোল

শ্রীযুবনাশ্ব

মানে না বুঝে ভালোবাসার একটা বয়েস আছে। ছেলেবেলাটা সেই বয়েস।

শিশু যা দেখে তাই ভালোবাসে। মানে, অর্থ, তত্ত্ব, কিছু জান্‌বার ইচ্ছেই তার হয় না, খাম্‌খা ভালোবেসেই সে খুশী।

জ্ঞানের আয়তন বাড়বার সাথে সাথে তার খুশীর আয়তন কমে আসে। ক্রমে সে দেখে, সব তার পেছনেই হুঁকো মুখ করে মস্ত মস্ত মানে বসে পরম বিজ্ঞভাবে ঝিমুচ্ছে,—উঁকি দিতে গেলেই বলে, বোসো, বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দিই!

শিশু-মনের এই খাম্‌খা আনন্দের জগৎ আবিষ্কার করবার পর থেকে চেষ্টা চল্‌চে, কি করে আবার সেখানে ফেরা যায়। বয়েসের চাকা ঘুরিয়ে দিতে পার্‌লে কথা ছিল না, কিন্তু সে সম্ভব নয়। অর্জ্জিত জ্ঞানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে চট পট্ যদি লেপা পোঁছা শিশু-চিত্তে ঢোক্‌বার কোনো রাস্তা থাকৃত, মানুষ সেটা বার করে ফেল্‌তে কসুর করৃত না। তবে, যা খেয়ে হাল্ ছাড়বার পাত্র মানুষ নয়, তাই সে হাল ছাড়ে নি।

শিশু হবার অসাধ্য সাধন ছেড়ে, কি করে শিশু-জগতের অর্থহীন আব্-হাওয়াটাকে প্রবীণ চিত্তে সংক্রামিত করে নেওয়া যায়, মানুষ তারই চেষ্টা দেখচে। ইংরেজী নন্‌সেন্স এবং বাংলা আবোল তাবোল সাহিত্য এই প্রয়াসেরই অভিব্যক্তি।

মানুষের মনে একটা চিরন্তন শিশু বাস করে, জ্ঞানের চাপেও তার মরণ নেই। মহা মহা পণ্ডিত লোককে দেখেছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছোটদের সাথে খোশমেজাজে অনর্গল যা তা' বকে যেতে। পাণ্ডিত্যের অন্তরায় অতিক্রম করে অন্তত ঐ সময়টুকুর জন্যে দুটো চিত্ত এক হয়ে গেছে।

আবোল তাবোল সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্চে, পাণ্ডিত্যের চাপে আধমরা মানুষের মনের শিশুটাকে পুনর্জ্জীবিত করে' অর্থহীন হাসির জগতে তাকে শিশু-মনের সাথে এক করে দেওয়া।

এইখানে একটা কথা বলে নেওয়া ভালো। ননসেন্স কথার বাংলা মানে হ'ল 'অর্থহীন'। কিন্তু অধিকতর ভাবব্যঞ্জক হবে বলে অনুরূপ বাংলা সাহিত্যকে আবোল তাবোল সাহিত্য আখ্যা দিলাম।

অদ্ভুত যা কিছু, তাই মানুষকে আকর্ষণ করে। শিশুকে করে অর্থহীন হাসির উৎসে ঘা দিয়ে, প্রবীণকে করে অনুসন্ধিৎসার আকাঙ্ক্ষায় সুড়সুড়ি দিয়ে। যেই সুরু হল

রাম গরুড়ের ছানা,
হাস্‌তে তাদের মানা—

অমনি ছেলেদের হাসির বাঁধ ভাঙ্‌ল। যতক্ষণ চল্‌ল, হাসিও চল্‌ল। শেষ হয়ে গেলেও হাসি থামল না। কিন্তু পণ্ডিত ঐ দুয়ের চরণেই আটকা পড়ে গেলেন। মানে কি, কেমন দেখতে? থাকে কোথায়, কোন্ যুগের জীব, এখনও আছে কিনা,—ফলে মানে সমঝাতে সমঝাতে হাসিটুকু বাসি হয়ে গেল।

আবোল তাবোল সাহিত্য হাসির সাহিত্য। রঙ্গ-ব্যঙ্গ সাহিত্যও তাই। কিন্তু দুয়ের ভেতর তফাৎ এই যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন হল গিয়ে মানে, তা সে মানে প্রচ্ছন্নই থাক্ আর বিকৃতই হোক্। কিন্তু মানে না থাকাই আলোচ্য সাহিত্যের মেরুদণ্ড। অর্থহীনতার বহিরাবরণ তাকে বজায় রাখতেই হবে।

বহিরাবরণ কেন বল্‌চি, বোধ হয় একটু খুলে বলা দরকার। মানুষের অত্যন্ত ঘরোয়া ভুল-চুককে আশ্রয় করে অনেক সময় আবোল তাবোল সাহিত্যের রসসৃষ্টি হয়, কাজেই বিদ্রূপের কশাঘাতটুকু প্রচ্ছন্ন থাক্‌লেও অনেক সময়েই তার জ্বালাটুকু প্রচ্ছন্ন থাকে না।

ট্যাঁশ গরু গরু নয়, আসলেতে পাখী সে—

শুনে ছেলেরা যতই হাসুক, দো-আঁসলা দলের কারো মুখে হাসির ছায়া-পাতও হবে না সুনিশ্চিত। কিন্তু,

খায় না সে দানা পানি ঘাস পাতা বিচালি
খায় না সে ছোলা ছাতু ময়দা কি পিঠালি;
রুচি নাই আমিষেতে, রুচি নাই পায়সে
সাবানের সুপ আর মোমবাতি খায় সে।

—শোনা মাত্র দাঁত ফাঁক হল।

গান চল্‌চে,—

একদিন খেয়েছিল ন্যাকড়ার ফালি সে—
তিন মাস আধমরা শুয়েছিল বালিসে।—

—এর পর আর হাসি বাগ মানে না।

আজগুবিকে রং ফলিয়ে মস্ত করে দেখাতে পারাতেই লেখকের কৃতিত্ব। এর আব্‌হাওয়া তৈরী হয় অদ্ভুত শব্দযোজনা, কল্পনার খামখেয়াল ও সৃষ্টিছাড়া অবস্থার পরিকল্পনা দিয়ে; চিত্র যত বেয়াড়া হবে, তত উপভোগ্য হবে। বয়সের জীর্ণ খোলসের ভেতর থেকে খেয়াল-খোলা চিরতরুণ ভোলা শিশুমনকে সঞ্জীবিত করে তুলে অসম্ভবের ছন্দে নাচিয়ে তাকে ভুলের ভবে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিতে পারাতেই এর সার্থকতা। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে যদি কারুকে জিজ্ঞেস্ করা যায়,

কেউ কি জান সদাই কেন বোম্বাগড়ের রাজা,
ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত্ব ভাজা?

তাহলে বোম্বাগড় কোথায়, সেখানকার রাজা কে, এমন মতিচ্ছন্ন স্বভাব তার হ'ল কেন, এ-সব নিয়ে কোন প্রশ্নই উঠবে না; বিজ্ঞতার আবরণ মুহূর্তে দূর হবে, শুধু দুলে উঠবে অশান্ত হাসির সমুদ্র। গান চল্‌তে থাক্‌বে—

রাণীর মাথায় অষ্টপ্রহর কেন বালিস বাঁধা,
পাঁউরুটীতে পেরেক ঠোকে কেন রাণীর দাদা?
কেন সেথায় সর্দি হলে ডিগবাজী খায় লোকে?
জ্যোছ্‌না রাতে কেন সবাই আলতা মাখায় চোখে?
সিংহাসনে ঝোলায় কেন ভাঙ্গা বোতল শিশি?
কুমড়ো দিয়ে ক্রিকেট খেলে কেন রাজার পিসী?
ওস্তাদেরা লেপ মুড়ি দেয় কেন মাথায় ঘাড়ে?
টাকের 'পরে পণ্ডিতেরা ডাকের টিকিট মারে?

হাসি ক্রমে অট্টহাস্য, নাচন ক্রমে তাণ্ডবে গিয়ে পৌঁছবে। বয়সের ব্যবধান যাদুমন্ত্রে লোপ পাবে, ছেলে বুড়ো একসাথে চোখে বাণ ডাকিয়ে হেসে গড়াগড়ি দেবে।

আমাদের হুকোমুখো হ্যাংলার দেশে আবোল তাবোল সাহিত্য বহুল পরিমাণে প্রচলিত হয় নি, এ দুর্ভাগ্যের কথা হতে পারে, কিন্তু সত্যি কথা। দ্বিজুবাবু চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর সে সব গানের চলও হয়েছিল। 'আষাঢ়ে'

বইখানাকেই প্রায় আবোল তাবোল সাহিত্য বলা চলে। কিন্তু তাঁর পদাঙ্ক তাঁর মৃত্যুর পরও বহুদিন অনুসৃত হয় নি। স্বর্গীয় সুকুমার রায় কলম ধরে আবোল তাবোল সাহিত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। দেশশুদ্ধ ছেলে বুড়োর প্রাণ খুলে হাসবার খোরাক তিনি একা যত জুগিয়ে গেছেন, অন্য কোন দেশের সাহিত্যে তার তুলনা মেলে না। আমাদের অকাল বৃদ্ধ দেশ—চিন্তাগ্রস্ত, নষ্টস্বাস্থ্য মানুষ দিয়ে ভরা। হাসবার দরকার আমাদের যত বেশী, এমন বোধ হয় আর কারো নয়। কম দুঃখে কবি লেখেন্ নি—

রামগরুড়ের বাসা
ধমক্ দিয়ে ঠাসা,
হাসির হাওয়া বন্ধ সেথায়, নিষেধ সেথায় হাসা।

—শতকরা আশীজন বাঙালীর বাড়ী খোঁজ নিলে এর সত্যতা বোঝা যাবে। কবির 'একুশে আইনে'র মতোই সেখানকার অবস্থা—

কারুর যদি দাঁতটী নড়ে;
চার্‌টী টাকা মাশুল ধরে,
কারুর যদি গোঁফ গজায়,
একশ আনা ট্যাক্‌শ চায়,
খুঁচিয়ে পিঠে গুঁজিয়ে ঘাড়,
সেলাম ঠোকায় একুশবার।

কবির কল্পনা আজগুবি, ভাষা বে-পরোয়া। কিন্তু ব্যথাটুকু একেবারে মরমীর। এই সত্যিকারের ব্যথাটুকু থেকে যে সাহিত্য গড়ে উঠেচে, সে তাই অসাধ্য সাধনে সমর্থ হয়েচে; হাসির হাওয়া দিয়ে কান্নার জঞ্জাল সে উড়িয়ে নিতে বেরিয়েছিল, তার অভিযান নিষ্ফল হয় নি।

ইংরেজ সমালোচক আবোল তাবোল কবিতাকে বলেছেন—Rhymed apotheosis of the preposterous. অর্থাৎ কিনা আজ্‌গুবির প্রাণের গান। তিনি আরো বল্‌চেন,—অর্থহীন অসম্ভব কথা আর উল্টা মানের শব্দ হবে এ গানের বাহন। অর্থহীন কথাগুলো সব হবে ধ্বন্যাত্মক, যাতে ব্যবহৃত জায়গায় ভাবব্যঞ্জক হয়। গানগুলো ব্যঙ্গানুকরণের ধরণে লেখা হলে দোষ নেই, কিন্তু বিদ্রূপাত্মক কিম্বা উপদেশ পূর্ণ হবে না।

গানগুলো বিদ্রূপাত্মক হবে কিনা সে নিয়ে নতুন করে তর্ক তুলে লাভ নেই।

আগেই বলেছি, বিদ্রূপাত্মক আবোল তাবোলও হতে পারে। শুধু বাংলায় নয়, ইংরেজিতেও তার যথেষ্ট নজীর আছে। G. K. Chestertion এর,

They haven't got no noses
The fallen sons of Eve ;
Even the smell of roses
Is not what they supposes
But more than mind disposes
And more than men believe.
The brilliant lure of water
The brave smell of a stone,
The smell of dew and thunder,
The old bones buried under,
Are things in which they blunder
And err ; if left alone. ইত্যাদি

এ-সব কবিতা আবোলে তাবোল,সে বিষয়েও সন্দেহ নেই, আর বিদ্রূপাত্মক-সেও দেখা যাচ্ছে।

ইংরেজ সমালোচকের প্রসঙ্গটা আন্‌বার একটু আবশ্যক আছে। তিনি প্রধানত শব্দসম্পদের দিক্ থেকেই ননসেন্স কবিতার সাফল্য মেপেছেন। কথার খেলোয়ারী মারপ্যাঁচ অত্যাবশ্যক, কিন্তু লেখকের দিক্ থেকে গভীর অন্তদৃষ্টিও যে আবশ্যক সে কথা ভুললে চলবে না। যা' তা' লিখলেই আবোল তাবোল হয় না, তার প্রমাণ ভুরি ভুরি দেওয়া যেতে পারে। আবোল তাবোল সাহিত্যকারের দরদ চাই, রসানুভূতি চাই, শিল্পসৌকর্য্য চাই—এর একটীকে বাদ দিতে গেলেই রচনা পঙ্গু হবে। অবশ্য ইংরেজীতে অনেক কথার কারসাজী ভরা লেখাও আবোল তাবোলের পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে চলে যাচ্ছে ; কিন্তু বাঙালীর ছেলে ননসেন্সের মধ্যেও মানে খোঁজে—শুধু কথায় ভোল্‌বার ছেলে সে নয়। হয় ত পায়ও—কে জানে ?

একজন প্রধান আবোল তাবোল সাহিত্যকারের সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে এ শ্রেণীর সাহিত্য সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক দুটোচারটে কথা বলে নিলাম, আমার নিজের সাফাই এইটুকু।

কবি সুকুমার রায়

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

আমাদের বাঙলা দেশের শুচিস্নিগ্ধ আবহাওয়াটিই কবি-চিত্ত গড়ে তোলবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সেই জন্যে, আমাদের বাইরের স্বচ্ছলতা থাক্ বা না থাক্, আমাদের সহস্র প্রকার দীনতা যত দারুণ ও যত কুশ্রী-ই হোক্, আমাদের মধ্যে সত্যিকারের কবির অভাব কোনোদিনই বড় একটা হয় নি। ফরাসীদের মত বাঙালীরাও প্রত্যেকেই এক একটি miniature-poet, কিন্তু প্রকৃত রসানুভূতি যাঁদের মধ্যে গভীর ও সুন্দর এবং প্রকাশের ভঙ্গী মধুর ও মনোরম, তাঁরাই কবি বলে জন-সমাজে প্রশংসিত ও আদৃত হ'য়ে থাকেন। প্রথমেই ব'লে রাখা ভালো, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের মধ্যে স্বর্গীয় সুকুমার রায় অন্যতম।

আমাদের দেশে প্রতিভার আদর নেই। কথাটা শুনতে যতই অপ্রিয় ও রূঢ় হোক্, এ কথা মানতেই হবে যে, প্রতিভার আদর করতে আমরা জানি নে। পশ্চিমের লোকের মধ্যে গোপন প্রতিভার নব-নব আবিষ্কার করার একটি প্রচেষ্টা দেখা যায়—এ কথার প্রমাণ স্বরূপ এ কথা বললেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে যে, আমেরিকার লোকেরা তরুণ নিগ্রো-কবি Countee Cullen-এর প্রতিভার যথাযোগ্য সমাদর করতে দ্বিধা করে নি;—আর আমাদের দেশের লোক যে কত সহজে কত বড় প্রতিভার অবহেলা ও অবমাননা করতে পারে, তা সুকুমার রায়ের সম্বন্ধে দেশের লোকের মনোভাব আলোচনা করলেই বুঝতে পারা যাবে।

প্রায় আড়াই বছর পূর্ব্বে যখন তাঁর মৃত্যু হয়, তখন বাঙলা দেশের কোনো কাগজেই তাঁর সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হয় নি। যা হয়েছে, তাও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ। তিনি কত বড় যোগ্য পিতার সন্তান ছিলেন, ছাত্র-জীবনে তাঁর কৃতিত্ব কিরূপ উজ্জল ছিল, হাফটোন্ ছবির ব্লক্ প্রবর্ত্তনে তাঁর দান কত বড়—এই সব কথাই খুব জোর দিয়ে বলা হয়েছিল—সাহিত্যিক হিসাবে তাঁকে তেমন বড় স্থান দেওয়া হয়েছে বলে তো আমার মনে হয় না। তারপর এই আড়াই বছরের মধ্যে—অন্ততঃ আমি যতদূর জানি—তাঁর সাহিত্য-

জীবনের তেমন বিস্তৃত আলোচনা কেউ করেন নি। জীবিত থাকতে তিনি বাঙলাদেশের হাজার হাজার ছেলে মেয়ের জীবন সরল হাসির সুধায় অভিষিক্ত করে' দিয়েছিলেন—তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এ কথা কি আমাদের মন থেকে মুছে গেছে?

'মৃত্যুকে কে মনে রাখে? মৃত্যু সে তো মুছে যায়'—এই কথাই কি সত্য? কিন্তু তাই বা বলি কি করে? তাঁর দেহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্তরের অফুরন্ত আনন্দের নন্দন বনটিও তো পুড়ে ছাই হয়ে যায় নি—তাঁর হাসির ঝর্ণাধারাটি তো তিনিই দেশের লোকের প্রাণে বইয়ে দিয়ে গেছেন—তার চলার স্রোত কি আর কখনো থামবে?

"সন্দেশে"র পৃষ্ঠায় তাঁর কত ধরণের কত লেখা ও ছবি যে পড়ে আছে, তার কে ইয়ত্তা করবে। তা থেকে বেছে বেছে দু'খানি বই তৈরী করা হয়েছে, যাদের নাম আজ পর্য্যন্তও যদি বাঙলার কোনো শিক্ষিত গৃহে পরিচিত হ'য়ে না থাকে, তবে আমাদের নেহাৎই দুর্ভাগ্য বলতে হবে। 'আবোল তাবোল" ও "হ-য-ব-র-ল" পড়ে' হাসতে হাসতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে নি, এমন কেউ যদি কোথাও থাকেন, তবে তিনি যেন এই মুহূর্ত্তেই এই বই দু'টি সংগ্রহ করে জীবনের কয়েকটা মুহূর্ত্ত উচ্ছৃঙ্খল হাসির বন্যায় ডুবিয়ে সরস করে' নেন্।

এই বই দুখানি ভালো করে পড়লেই বোঝা যায়, সুকুমার রায় কবি ও রস-লেখক হিসাবে—ইংরিজিতে যাকে humorist বলে—কত বড় ছিলেন। যাঁর হৃদয় পুষ্পের হাসির মত শুচি ও সুন্দর নয়, তাঁর পক্ষে এ সব কবিতা ও গল্প রচনা করা অসম্ভব বলেই মনে হয়। তাঁর হাসির বিশেষত্বই হচ্ছে এই যে, অত্যন্ত সহজ ও সরল—তার পেছনে কোনো নিরস প্রচেষ্টা নেই;—conscious effort-এর অভাবই হচ্ছে তাঁর হাস্যরসের প্রধান গুণ। তিনি তাঁর অন্তরের নিজস্ব মাধুর্য্য দিয়ে এই সমস্ত হাসির টুক্‌রো তিল তিল করে গড়ে গেছেন; তাই মনে হয়, তিনি হাসাবার জন্যে এ সব লিখে যান নি, খুবই সাধারণ কথা খুবই সাধারণ ভাবে বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কি করে জানি সে সমস্ত তরল খুসিতে রসিয়ে উঠল। এ ছাড়া তাঁর আরো অনেক লেখা আছে, যা এদের চাইতে কোনো অংশেই হীন নয়, কিন্তু সে সবের কথা আলোচনা করা এ প্রবন্ধে সম্ভব হবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাঁর "খাই খাই" "দাঁড়ি" ইত্যাদি কবিতা ও "অবাক্ জলপান" 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' ইত্যাদি নাটিকা উল্লেখ করা যেতে পারে।

'আবোল-তাবোল্'-এর নামটিই তার অনেকখানি পরিচয় বলে দেয়। কিন্তু এ অপূর্ব্ব কবিতাগুলিকে কেবল nonsense rhyme বল্‌লে অনেকখানি কম করে বলা হয়। ইংরিজি ভাষায় nonsense rhyme বলে যে ধরণের ছড়া পরিচিত হয়ে আস্‌চে—তার মূল্য কেবল এইটুকু যে, সেগুলি গানের সুরে আবৃত্তি করে' মা'রা ছোটো ছেলেমেয়েদের সহজে ঘুম পাড়াতে পারেন, কিংবা ছেলেমেয়েরা নিজেরা সেগুলির ছন্দের মিষ্টত্ব থেকে খানিকটা আনন্দ পেতে পারে। এইটুকু ছাড়া তাদের বাস্তবিক কোনো মূল্য নেই—এবং তাদের মানে সত্যি সত্যি কিছু থাকে না—থাক্‌লেও, তা অতি সাধারণ ও বিশেষত্ব বর্জ্জিত। যথা—"Jack and Jill, went up the hill" ইত্যাদি। "আবোল তাবোল" মোটেই সে ধরণের কিছু নয়। যদিই বা nonsense হয়, তবু এ অতি উঁচু দরের nonsense. কাব্যের কষ্টি-পাথরে বিচার কর্‌লেও এ-সব কবিতার মূল্য কিছু কমে তো যায়ই না, বরং অনেক-খানি বেড়ে যায়। বইখানি মুখ্যত ছেলেমেয়েদের জন্যে লেখা, কিন্তু অনেক বুড়ো বয়সের লোকও এর আনন্দ-রসটি উপভোগ কর্‌তে পারেন। সাধারণ বাঙালীর জীবন অত্যন্ত নীরস ও একঘেয়ে, বৈচিত্র্যের অভাব তার প্রধান অভিশাপ। আমরা, আগামী রবিবার কি-ভাবে কাটবে, তা এ রবিবারে অনায়াসে বলে' দিতে পারি,—দিনের পর দিন আমাদের জীবন যাত্রার প্রণালীর কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে না। মাক্সিম গর্কির এক গল্পে একজন লোক এই ধরণের একটা কথা বলেছিল:—Why do we work? To live. Why we live? To work. What is the sense in that?" এ কথা অধিকাংশ বাঙালীর জীবন সম্বন্ধে অক্ষরে-অক্ষরে খাটে। এই নির্জ্জীব, নিরা-নন্দের মাঝখানে "আবোল তাবোলের" আজগুবি কাণ্ডকারখানা, অদ্ভুত কথাবার্ত্তা বড়ই উপাদেয় ও প্রীতিকর। কবি তাঁর কল্পনা ও আনন্দের সুষমা দিয়ে এমন একটি অসম্ভব স্বপ্নপুরী তৈরী করেছেন, যেখানে আকাশের গায়ে টক্ টক্ গন্ধ পাওয়া যায়, শুয়োরের মাথায় টুপি না দেখে মানুষ অবাক্ হ'য়ে যায়, যেখানে ছায়া-ধরার ব্যবসা দিব্যি চলে, গানের গুঁতোয় দালান চৌচির হ'য়ে ফেটে পড়ে, রামধনুর রঙ পাকা নয় বলে খুঁত-ধরা বুড়ো মুখ ভার করে—আরো কত রকম উদ্ভট ব্যাপার ঘটে, যা কর্ম্ম-দেবতার উপাসক আমরা ভাবতেও পারি নে। আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের শুষ্ক ক্লেশদগ্ধ মরু-প্রান্তরের উপর এই সব সহজ ও নিতান্ত সরল কথা স্নিগ্ধ দক্ষিণা হাওয়ার মতই ঝির্‌ঝিরিয়ে বয়ে'

যায়—তার স্পর্শের উন্মাদনা সত্যই অনির্ব্বচনীয়! মানুষের মনের একটি দিক আছে যা গতানুগতিক নিয়ে তৃপ্ত নয়, যা এই দৃশ্যমান জগতের সমস্ত শোভা ও সৌন্দর্য্য চয়ন করে'ও তুষ্ট হয় না—যেখানে এক চির-শিশু দুর্দ্দম কৌতূহলের বশে নিরন্তর চির-রহস্য অন্ধকারে উঁকি মারতে চায়—এই ইন্দ্রিয়গোচর জগতের বাইরের খবর জান্‌বার জন্যে যার ঔৎসুক্যের সীমা নেই। সেই জন্যেই আদিম কাল থেকে মানুষ, পরী দৈত্য, দানব ভূত-প্রেত প্রভৃতি কাল্পনিক জীব সৃষ্টি করে আস্‌চে,—এরা মিথ্যা হ'তে পারে, কিন্তু এক হিসেবে সংসারে এদের মত সত্য আর কিছুই নেই। মানুষ ইত্যাদি সমস্ত জীবজন্তু অতি বাস্তব সত্য—কিন্তু এরা কেউ স্থায়ী নয়; একদিন যারা বাস্তবতার গর্ব্বে নিজেদের খুব বড় মনে করে' আত্মপ্রসাদ লাভ করে, পরের দিন তাদেরই শেষ চিহ্ন ধূলোয়ে মিশে' হারিয়ে যায়। কিন্তু মানুষ তার কল্পনার সুধা দিয়ে যাদের গড়চে, অনাদি কাল থেকে অসীম পর্য্যন্ত তাদের সেই একই রূপ, একই প্রকাশ। তাদের বার্দ্ধক্য নেই, জরা নেই, পরিবর্ত্তন নেই—জগতে বাস্তবিক চিরন্তন কিছু থাকে তো তারাই। মানুষ কখনোই পরী ইত্যাদিতে সত্যি-সত্যি বিশ্বাস করে না, কিন্তু তবু এ-সব চাই, কেননা, এই ভাবে সে তার দুনির্বার কৌতূহল তবু খানিকটা নিবৃত্ত কর্‌তে পারে। সত্য হোক্, বা মিথ্যা হোক্ এ জগতের বাইরের একটা বিন্দুর আভাস সে পায় তো! রহস্যের যবনিকা উত্তোলন কর্‌তে সে যখন পার্‌চে না, তখন এ-সব দিয়ে নিজের মনকে ভুলিয়ে না রাখলে সে তৃপ্ত হ'তে পারে না।

সেই অতীন্দ্রিয় জগতের আভাস আমরা 'আবোল-তাবোলে' পাই বলে'ই এর স্থান এত উপরে। অথচ, লক্ষ্য কর্‌বার বিষয় হচ্চে এই যে, কবিতাগুলিতে (দু-একটি ছাড়া) ভূত-পেত্নী ইত্যাদির উল্লেখ বড় একটা নেই—সেই জন্যে বইটিকে ঠিক রূপকথার শ্রেণীতেও ফেলা যায় না। অধিকাংশ কবিতারই পাত্র আমাদের মতই একজন রক্ত মাংসের মানুষ; (দু-একটা পশু-পাখীরও আছে)। আমরা প্রতিদিনকার কাজকর্ম্মের ভিতর দিয়ে যে-সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি সেগুলিকেই খুব বাড়িয়ে অদ্ভুত করে' বলা হয়েচে। কিন্তু সেরূপ আচরণ সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব বলে'ই সেগুলি রূপকথার মতই অদ্ভুত ও সুন্দর মনে হয়। এই খানেই "আবোল্-তাবোলের" বিশেষত্ব। এ-সম্বন্ধে চার্লি চ্যাপলিন্-এর film-গুলো উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর film-গুলো সম্বন্ধে একজন বলেচেন যে, সে-গুলি "human experiences exagge-

rated" ছাড়া আর কিছুই নয়। বাস্তব-জগতে বেহালার ছড়িটা বারবার কারো গোঁফের উপর এসে সুড় সুড় করে' না লাগতে পারে; কিন্তু একটা মাছি বারবার এসে ঠিক নাকের তলায় বসে 'ভোঁ ভোঁ' করে' তাকে আধ-পাগল করে দিয়ে যেতে পারে। এই রকম কত ছোট খাট দুর্ঘটনা আমাদের ত হামেশাই ঘটুচে।। সেইগুলির উপরই একটু বেশী করে রঙ ফলিয়ে চার্লি তাঁর ফিল্‌ম্‌গুলো তৈরী করেন বলে'ই তাঁকে আমাদের এত ভালো লাগে—এত আপন ও অন্তরঙ্গ মনে হয়; সেই জন্যই সর্ব্বদা দুর্ব্বল ও অক্ষম হ'য়েও তিনি আমাদের সবাকার সহানুভূতি আকর্ষণ করেন। সুকুমার রায়ের কবিতাও অনেকটা এই জন্যেই আমাদের মন এত সহজে ও এমন প্রবল ভাবে সাড়া দিয়ে ওঠে।

সুকুমার রায়ের কবিতাগুলোকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এক নম্বর—ঐ প্রথমে যাকে বলেছি, "human experiences exaggerated—এই ধরণের কবিতা। এ-শ্রেণীর কবিতার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য "কাঠবুড়ো" "গোঁফচুরি" "কাতুকুতু বুড়ো" "গানের গুঁতো" "চোর ধরা" "সাবধান" "বুঝিয়ে বলা" "ডাংপিটে" "ফস্‌কে গেল" "ঠিকানা" "কাঁদুনে"। আরো অনেক আছে—কিন্তু সবগুলির নাম দেওয়া সম্ভব নয়। এ-সব কবিতা বিশেষ আনন্দ দেওয়ার কারণ এই যে, এ-সব ঘটনা আমাদের প্রায় প্রত্যেকের জীবনেই একটু বিনম্র আকারে ঘটে' থাকে—মনে হয়, কবি আমাদের প্রত্যেকের সমস্ত গোপন ইতিহাস জেনে নিয়ে একটু বাড়িয়ে টাড়িয়ে বলেচেন। গানের দাপে দালান ফাটুক্ বা না ফাটুক্—কোনো-কোনো সুগায়কের অযাচিত অনুগ্রহে বিব্রত হয় তো অনেকেই হয়েচেন, এবং মনে মনে বলেচেন', "আর না দাদা, গানটা থামাও লক্ষ্মীটি"। তাই ভীষ্মলোচন শর্ম্মার প্রবল সঙ্গীতানুরাগের বর্ণনা পড়ে' পাঠক প্রাণ খুলে' হাসেন বটে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ভীষ্মলোচনের "শীকার"দের প্রতি প্রত্যেকের বেশ একটু সহানুভূতিও জন্মে। "সাবধান" ও "বুঝিয়ে বলা"কে satire-ও বলা যেতে পারে। যে সব দারুণ লোক-হিতৈষীরা যাকে-তাকে হাতের কাছে পেয়ে অযাচিতভাবে অতি সারবান্ উপদেশ প্রদান করেন, কিংবা সংসারের শতশত বিপদের বিরুদ্ধে সতর্ক করে' দিতে যান, তাঁদের সর্ব্বজনীন উদারতার প্রতি যে একটু শ্লেষের কটাক্ষও না আছে, এমন মনে হয় না! এঁরা জগতের সর্ব্বত্রই সমভাবে বিরাজমান, এঁদের সদা-জাগ্রত করুণ কল্যান-আঁখির তীব্র দৃষ্টি থেকে নিস্তার পেয়েছেন, এমন লোক খুবই কম

আছে বলে' আমার বিশ্বাস। সুতরাং, শ্যামদাস ও প্যালারাম বিশ্বাসের জন্য পাঠকদের স্বতই অনেকটা দুঃখ ও সহানুভূতি হয়। এ দু'টী হতভাগ্য জীবের অপ্রকাশিত বেদনা প্রত্যেকেই নিজের অন্তরের সমবেদনা দিয়ে বুঝে' নিতে পারেন। "ফস্‌কে গেল"তে দুর্ঘটনার পরিমাণ যতটা বেশি করে' দেখানো হয়েচে, ততটা বাস্তব জীবনে অবশ্য ঘটে না, কিন্তু যারা কাজ করার আগে খুব বেশী বড়াই করে, কাজের বেলায় যে তারা কিছুই করে' উঠ্‌তে পারে না, এ তো বহুদিনকার পুরোণো কথা। "চোরধরা"র সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। "কাঁদুনে" কবিতাটি অতুলনীয় বল্‌লেও চলে। ছেলেপিলেদের অসাময়িক ও অহেতুক কান্নায় উত্যক্ত না হয়েছেন, এমন লোক কে আছে, জানি নে। সেই বিরক্তি কী সুন্দর রূপেই না প্রকাশ করা হয়েচে :—

নন্দঘোষের পাশের বাড়ি বুথ্ সাহেবের বাচ্চাটার
কান্নাখানা শুন্‌লে বলি, কান্না বটে সাচ্চা তার।
কাঁদ্‌বে না সে যখন-তখন, রাখবে কেবল রাগ পুষে,
কাঁদ্‌বে যখন খেয়াল হবে খুন-কাঁদুনে রাক্ষুসে!

*   *   *   *

ঝুম্ ঝুমি দাও, পুতুল নাচাও, মিষ্ট খাওয়াও একশোবার,
বাতাস কর, চাপ্‌ড়ে ধর, ফুটবে নাকো হাস্য তার।

এর পর মতামত দেওয়া বাহুল্য মাত্র।

"ঠিকানা" কবিতাটিও এক হিসাবে অতি চমৎকার! উভয় পক্ষের কথাগুলিই এমন রসিয়ে রসিয়ে বলা হয়েচে যে, পড়্‌তে পড়্‌তে হাসিও আসে, আবার কান্নার পায়! এ-কবিতাটি একাধারে একটি tragedy, comedy ও farce. Tragedy এই হিসাবে যে, জগমোহন আশ্বিনাথের মেসোর যেরূপ পরিচয় বুঝ্‌লেন, তার ঠিকানাও প্রশ্নকর্ত্তা ঠিক-ঠিক সেইরূপ জান্‌তে পার্‌লেন। কোনো পক্ষেরই জিৎ বা হার হ'ল না। তবু যা হোক্ শেষটা সুভালাভালি এক-রকম হ'য়ে গেছে তাই একে comedy-ও বলা চলে। আর, আসলে এ যে একটা বিশ্রী রকমের প্রহসন, তা কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন দেখি না। জগ-মোহনের ঠিকানা বলা শুনে Launcelot Gobbo তার অন্ধ বাপকে যে direction দিয়েছিল, তার কথা মনে পড়ে' যায় :—Turn upon your right hand at the next turning, but at the next turning of

all, on your left ; marry, at the very next turning, turn of no hand, but turn down indirectly to the Jew's house!" জগমোহনের পথ-নির্দ্দেশ এর চেয়ে অনেকটা গোলমেলে হ'লেও অনেক ভালো, কেন না, সেখানে আম্ড়াতলার মোড় থেকে যাত্রা করে' আবার আম্ড়াতলার মোড়ে ফিরে' আসার উপায় বলে' দেওয়া হয়েছে। তবু ভাল! •

দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতা হচ্ছে সত্যি-সত্যি অদ্ভুত ও আজগুবি। যথা :— "খিচুড়ি" "ছায়াবাজি" "কুমড়োপটাস্" 'হুঁকোমুখো "হ্যাংলা" "একুশে আইন" ইত্যাদি। প্রত্যেকটি কবিতা সম্বন্ধে আলাদা-আলাদা আলোচনা করতে গেলে, পুঁথিতে কুলোবে না। এ সব কবিতা অদ্ভুত ও অর্থহীন বলে'ই এত মনোরম, এত সুন্দর! সারবান সাহিত্যের গণ্ডী ছাড়িয়ে এই খামখেয়ালী পাগলামির মধ্যে প্রবেশ করা কল্‌কেতা ছেড়ে ওয়াল্‌টেয়ারে চেঞ্জে যাওয়ার মতই মধুর এবং উপাদেয়। এর মধ্যে "কুমড়োপটাশ" "একুশে আইন্" এবং "বোম্বাগড়ের রাজা" যে-কোনো দিক্ থেকে বিচার কর্‌লেও বাঙলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে আসন পাবেই। এদের কথাগুলি এত আজগুবি, এত সরস, এত অসম্ভব যে এর কাছে ঠান্‌দিদির থলে'র সব চেয়ে গাঁজাখুরি গল্পও হার মেনে যায়! "বোম্বা গড়ের রাজা"র রাজার আত্মীয়, পারিষদবর্গ ও স্বয়ং রাজার উপর যে সমস্ত উৎকট আচরণের অভিযোগ আনা হয়েছে, সত্যিকার মানুষের মধ্যে যাদের বহরমপুর, রাঁচি প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠানো হয়, তাদের মধ্যেও বোধ হয় অতটা হয় না। এ-সমস্ত জিনিষ কল্পনা করাও শক্ত, কেন না, আমাদের মন শতসহস্র নীতির সংস্কারে বাঁধা—সেই সব প্রচলিত সংস্কার অতিক্রম কর্‌তে আমাদের মন স্বভাবতই কেমন যেন সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে। মস্ত বড় কবির মস্ত বড় কল্পনা ছাড়া অন্য কোথাও এ সব ধারণার ভ্রূণ-সংস্কার হওয়া অসম্ভব। "প্যাঁচা ও প্যাঁচানী" কবিতায় সুকুমার রায় হয় তো প্যাঁচাকে বিদ্রূপ কর্‌তে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর লেখার গুণে ফল হয়েছে ঠিক উল্টো। আমার সত্যি মনে হয়, প্যাঁচার প্রতি অনেকখানি দরদ দিয়ে এ কবিতাটি লেখা। প্যাঁচানীর কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যের পরিচয় আমরা সকলেই কিছু না কিছু পেয়েছি; কিন্তু

এর মধ্যে "বাবুরাম সাপুড়ে" বলে ছোট কবিতাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। এও একটি পরিহাসের ঢাক-ঢাকা ভর্ৎসনা। "যে সাপের চোখ নেই শিং নেই, নোখ্ নেই,." যে সাপ কাউকে কখনও কাটে না, সেই সাপকে এক ঝাড়া মেরে ঠাণ্ডা করে' দেওয়াটা একটা মস্ত chivalry বটে!—

আমাদের পক্ষে যা খাট্‌বে, প্যাঁচার বেলায় তো তা খাট্‌তে পারে না। প্যাঁচার কাছে যে তার প্যাঁচানীর কণ্ঠই মধুর মত মনে হবে, এ তো নিতান্তই স্বাভাবিক। মানুষ যে গান শুনে আনন্দে অবশ হ'য়ে পড়ে, প্যাঁচা হয় তো তাই শুনে' "দুর ছাই" বলে' নাক সিঁট্‌কোয়। তার কাছে তার প্যাঁচানীর গিট্‌কিরির মত শ্রুতিমধুর আর কিছুই নয়!

"কিম্ভুত"কেও একটি satire বলা যেতে পারে। যারা একসঙ্গে সব কিছুই হ'তে চায়, তারা শেষ কালটায় কিছুই হতে পারে না। অর্থাৎ কি না—"many trade"-এ "Jack' হওয়ার চাইতে "one trade"-এ "master' হওয়া অনেক বেশি নিরাপদ ও সুবিধাজনক।

"কিম্ভুত" ও "খিচুড়ি"তে কবি কল্পনার প্রসার দেখিয়েছেন বটে! শিশু সাহিত্য লিখ্‌তে হ'লে শিশুর মত করে' ভাব চাই—নিজের সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি ঝেড়ে ঝুড়ে ফেলে শিশুর সরল, অজ্ঞান কুতূহলী মন দিয়ে জগৎটাকে দেখা চাই। এ ক্ষেত্রে সব চেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, তারপরই বোধ হয় সুকুমার রায়। "কিম্ভুত" আর "খিচুড়ি" পড়্‌লে তাই মনে হয়। "গন্ধবিচার" অতি অদ্ভুত কবিতা হ'লেও এক হিসেবে খুবই স্বাভাবিক। মানব-চরিত্রের একটি প্রধান দিক এতে খুলে দেখানো হয়েচে। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস এত বেশি যে, কেউ কোনো ভালো কথা বল্‌লেও লোকে সন্দেহ করে, এর তলে না জানি কি কু-মৎলব আছে! কেউ যদি গায়ে-পড়ে এসে বলে, "লক্ষ্মী ভাই, তুমি আজ বিকেলে রামঘোষের দোকান থেকে দু'গণ্ডা রসগোল্লা খেয়ে এসো তো!" তা হ'লে অতি লোভী ব্যক্তিও যেতে একটু ইতস্তত করবে—"তাই তো! লোকটা সেধে সেধে খাওয়াতে চায়! নাঃ—ব্যাপার সুবিধের মনে হচ্চে না।" এ রকম কাণ্ড তো সর্ব্বদাই ঘট্‌চে! অদ্ভুত কবিতার মধ্যে কতগুলো ভারি সুন্দর ছোট ছোট ছড়ার মত আছে। বাহুল্য ভয়ে সে-গুলোর কথা আর বিশেষ কিছু বল্‌লাম না।

তৃতীয় শ্রেণীর কবিতা হচ্চে Satire. Satire বইখানিতে ক'টি মাত্রই আছে:—"সৎ পাত্র," "হাতুড়ে" "রাম গরুড়ের ছানা," "কি মুস্কিল," "পেট বই," "বিজ্ঞান-শিক্ষা" ও "ট্যাশ্‌ গরু"। এর প্রত্যেকটিই বিশেষরূপে আলোচনা করে' দেখ্‌বার যোগ্য।

"সৎ পাত্রে" কবি আমাদের দেশের প্রচলিত কৌলিন্য প্রথার উপর বেশ

একটু মিষ্টি চাবুক চালিয়েছেন। মেয়ের বিয়ের পাত্র স্থির হয়েচে; তাঁর রং বেজায় কালো, মুখের গঠন অনেকটা প্যাঁচার মত, তিনি উনিশটি ম্যাট্রিকে ফেল্ করেচেন, ভাইগুলো তাঁর একটিও মানুষ নয়, অবস্থাও খুব খারাপ, তার উপর, নিজে সর্ব্বদাই পিলের জ্বর আর রোগে ভুগ্‌চেন। তা হ'লে কি হবে?

কিন্তু তারা উচ্চঘর,
কংসরাজের বংশধর,
শ্যাম লাহিড়ী বনগ্রামের,
কি যেন হয় গঙ্গারামের।
যা হোক্, এবার পাত্র পেলে,
এমন কি আর মন্দ ছেলে?

আজকালকার দিনেও যাঁরা পথে ঘাটে কৌলিন্যের গর্ব্ব করে বেড়ান্, এবং সেই গর্ব্বে বিয়ের সময় মেয়ের বাপের বুকের রক্ত বেশ ভালো করে' শোষণ করে' নিতে দ্বিধা করেন না, তাঁদের উদ্দেশ করে'ই কবি রসিকতার ভাণ করে তীব্র পরিহাসের বিষবাণ ফেলেচেন; তবে গণ্ডারের চাম্‌ড়া ভেদ করে সূঁচ ফুট্‌তে পারে কিনা, সে অবশ্য আলাদা কথা!

"হাতুড়ে" ও "বিজ্ঞান শিক্ষায়" ডাক্তারী শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের সঙ্গে কবি একটু রসিকতা করেচেন, তবে এ রসিকতা অত মারাত্মক নয়। তিনি নিজে যে বিজ্ঞানের কিরূপ একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন, তা মনে রাখ্‌লেই এ কথাটা বোঝা শক্ত হবে না। নতুন জামাইকে নিয়ে ছোট শ্যালিকারা যেরূপ আমোদ করে কবির বিজ্ঞানকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসাগুলিও অনেকটা ঐ রকম। সে ঠাট্টার আড়ালে সত্যি সত্যি আর গোপন বিষ লুকিয়ে নেই।

"কি মুস্কিল" কবিতাটিতে পুঁথিগত বিদ্যার প্রতি কটাক্ষপাত করা হয়েচে। কাজের বেলায় নিজের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার মূল্য যে বইয়ে-পড়া বিদ্যার চেয়ে অনেক বেশি, একবার পাগ্‌লা ষাঁড়ে তাড়া কর্‌লেই আমরা সবাই এ কথা মান্‌তে বাধ্য হবো। পুঁথিপত্রে আর যে কথাই থাক্ পাগ্‌লা ষাঁড়কে ঠেকিয়ে রাখ্‌বার কোনো উপায় বাৎলে দেওয়া নেই। "নোট বই"তেও সেই ভাদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েচে, যারা অত্যধিক পড়াশুনা, চিন্তাভাবনা করে, সময় নষ্ট করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে কাজও নষ্ট করে।

সংসারে এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা বড় হ'য়ে অবধি পৃথিবীটাকে একটা মস্ত কয়েদখানা ও জীবনটাকে একটা কদর্য্য বন্ধন বলে' ভাবতে শেখে।

তারা সংসারের দুঃখ কষ্টগুলিকে এত অসম্ভব বড় করে' দেখে যে, তাদের মনে হয়, এখানে জন্ম নিয়ে আসাটা ভয়ানক ভুল এবং অন্যায়। তাদের চারদিকে সমস্ত বিশ্ব-জগৎ, গাছপালা, আকাশ মেঘ—সমস্তই যেন অবিরত হাসছে, অথচ তারা তাদের হাসাকে "ধমক্ দিয়ে ঠাস।" করে' তার মধ্যে হাঁড়িপানা মুখ করে বসে' থাকে। এদের moralist কি puritan, sceptic কি cynic—যে যাই বলুন, কবি "রামগরুড়ের ছানা"য় যে এদেরই মূর্ত্ত্য করে তুলেচেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

"রামগরুড়ের ছানা" কবিতাহিসেবেও খাসা। এর কয়েকটি ছত্র এত মধুর যে, তা যে কোনো বাঙালী কবি লিখ্‌লে তাতে তাঁর যশ ক্ষুণ্ণ হ'ত না:—

যায় না বনের কাছে, কিংবা গাছে গাছে,
দখিন হাওয়ার সুড়সুড়িতে
হাসিয়ে ফেলে পাছে!
সোয়াস্তি নেই মনে— মেঘের কোণে কোণে
হাসির বাষ্প উঠছে ফেঁপে
কান পেতে তাই শোনে!

ঝোপের ধারে ধারে রাতের অন্ধকারে
জোনাক্ জ্বলে আলোর তালে
হাসির ধ'রে ধারে!

"রাম গরুড়ের ছানা"র সঙ্গে contrast কর্‌বার জন্যেই বোধ হয়, কবি পরের পৃষ্ঠাতেই "আহ্লাদী" কবিতাটি যোগ করে দিয়েচেন! একদিকে যেমন "হাসি নিষেধ" অন্যদিকে তেমনি "উঠছে হাসি ভস্‌ভসিয়ে সোডার মতন পেট থেকে।" Contrast-এর effect-টি বেশ সুন্দর হয়েচে!

"ট্যাশ্ গরু"র প্রথম চরণই হচ্চে, "ট্যাশ গরু গরু নয়, আসলেতে পাখী সে"—শুনেই আমাদের দেশের দো-আঁশলা ফিরিঙ্গি জাতের কথা মনে পড়ে—যে সব "সাহেব"রা সাহেব নন্, আসলেতে "নেটিভ"। তারপরেই পাওয়া যাচ্চে "যার খুসি দেখে এসো বারুদের আফিসে।" এর পরে তো আর কোনো সন্দেহই থাক্‌তে পারে না। পরে, আরো কতকগুলি symptom ট্যাশ ফিরিঙ্গির সঙ্গে একেবারে মিলে যাচ্ছে। 'একটুকু ছোঁও যদি, বাপরে কি চ্যাচান!" এ কথা গরুর পক্ষে সত্য হোক বা না হোক, 'সাহেব'দের

পক্ষে যে কতখানি সত্য, তা আমাদের দেশের লোককে বলা নিষ্প্রয়োজন। তারপর আরো আসচে ;—

খায় না সে দানাপানি ঘাস পাতা বিচালি
খায় না সে ছোলা ছাতু ময়দা কি পিঠালি ;
রুচি নাই আমিষেতে, রুচি নাই পায়সে
সাবানের সুপ্ আর মোমবাতি খায় সে।

আমাদের দিশী সাহেবদেরও মহা বিপদ্ ! তাঁরা না পারেন বাঙালীদের মত ডাল্-ভাত খেতে, আবার ওদিকে নিত্য নিত্য 'ফাউল্ রোষ্ট' আর 'মাটন্-চপে'র খরচ জোগানোও শক্ত। কাজেই তাঁদের মাঝামাঝি একটা পথ বেছে নিতে হয়। ফলে, তাঁদের নিত্যনৈমিত্তিক আহার সত্যি সত্যি "সাবানের সুপ্" আর "মোম্‌বাতি' না হ'লেও খুব উপাদেয় আর সুস্বাদু কিছু যে হয় না তা অনায়াসে বলা যেতে পারে।

এ ছাড়া সুকুমার রায়ের দু' চারটা বাস্তবিক "serious" কবিতা আছে, যার উল্লেখ না করলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। প্রথম ও শেষের "আবোল তাবোল" নামের কবিতা দু'টি "ভাল রে ভাল" এবং "দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম" এই শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যায়।

"আবোল তাবোল' দুটি ছন্দে ও ভাবে নিখুঁত, নিটোল দু'টি মণির মত ঝল্‌মল্ করচে ; শেষেরটিতে এমন একটি মধুর করুণ রস আছে, যা মন এবং চোখ দুই-ই সহজে আর্দ্র করে আনে। কবিতাটি বিগত দিনের সুখের স্মৃতির মত মনে পড়লেই চোখে জল আসে, কিন্তু সে অশ্রুর প্রান্তেও ক্ষীণতম হাসির লেশমাত্র স্মৃতিটুকু কণায় কণায় জড়িয়ে আছে। কেন জানি না, কবিতাটি যখনই পড়ি, তখনই আমার মন স্বপ্ন-সায়রে ডুবে যায় ;—"মেঘ মুলুকে ঝাপসা রাতে রামধনুকের আব্‌ছায়াতে'—স্বপ্নলোক ছাড়া এ আর কোথায় সম্ভব ? তারপর কবি বলচেন ;—

আজ্‌কে দাদা যাবার আগে
বল্‌ব যা মোর চিত্তে লাগে,
নাই বা তাহার অর্থ হোক্,
নাই বা বুঝুক্ বেবাক্ লোক,
আপ্‌নাকে আজ আপন হতে

ভাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে,
ছুট্‌লে কথা থামায় কে ?
আজকে ঠেকায় আমায় কে ?
আজকে আমার মনের মাঝে
ধাঁই ধপাধপ্‌ তবলা বাজে,
রাম ঘটাঘট ঘ্যাঁচাং ঘ্যাঁচ্‌
কথায় কাটে কথার প্যাঁচ,
আলোয় ঢাকা অন্ধকার,
ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার।
গোপন প্রাণের স্বপন-দূত,
মঞ্চে নাচেন পঞ্চভূত,
হ্যাংলা হাতী চ্যাং-দোলা,
শূন্যে তাদের ঠ্যাং তোলা,
মক্ষিরাণী পক্ষীরাজ
দস্যি ছেলে লক্ষ্মী আজ।
আদিম কালের চাঁদিম হিম,
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম,
ঘনিয়ে এলো ঘুমের ঘোর,
গানের পালা সাঙ্গ মোর।

কবিতাটির অধিকাংশই এখানে তুলে দিলুম ; কেন না, সত্যিকার হাসি কান্নায় জড়ানো এমন মধুর কয়টি ছত্র আর খুবই কম পাওয়া যায়। আর এটি যখন তিনি রচনা করেন তখন কবির চক্ষে বাস্তবিকই ঘুমের ঘোর ঘনিয়ে এসেচে, এ কথা ভাবলে এ কবিতাটি যেন বেদনায় নিবিড় ও সজল হয়ে ওঠে !

'ভাল রে ভাল'তে কবি কবিজনোচিত optimism-এর চূড়ান্ত করে ছেড়েচেন।—তাঁর দৃষ্টি মোহন ও সুন্দর, তাই তাঁর চক্ষে পৃথিবীর সব-কিছুই সুন্দর মনে হচ্চে। তাই তিনি বল্‌চেন্—

দাদা গো !
দেখ্‌চি ভেবে অনেক দূর,
কেবল যে, এই দুনিয়ার সকল ভালো।

হেথায় গানের ছন্দ ভাল
হেথায় ফুলের গন্ধ ভাল
মেঘ মাখান আকাশ ভাল
ঢেউ জাগান বাতাস ভাল,

তা নয় কিন্তু

ঠেলার গাড়ী ঠেল্‌তে ভাল,
খাস্তা লুচি বেল্‌তে ভাল,
পিটপিটি গান শুন্‌তে ভাল,
শিমুল তুলো ধুন্‌তে ভাল
ঠাণ্ডা জলে নাইতে ভাল,
কিন্তু সবার চাইতে ভাল—
—পাউরুটি আর ঝোলা গুড়।

শেষের লাইন দুটি পড়ে' আমার এক বন্ধু বল্‌ছিলেন, "কি beautiful suggestion!" বাস্তবিকই তাই। আমরা প্রতিদিন্‌কার জীবন-যাত্রায় কত ছোট খাটো সুবিধা, কত আরাম ভোগ কর্‌চি, অথচ সে-গুলো আমাদের নজরেও পড়ে না, কেননা, সে-গুলোতে আমরা এত বেশি অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েচি যে, সে সব সুবিধাকে আর সুবিধা বলেই মনে হয় না। কবি সে-গুলোর প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে' বলচেন, "এ সব আরামও কোনো কিছুর চেয়ে কম নয়। এ ও তো বেশ দিব্যি ভাল!" সংসারে অনেক উপেক্ষিত অথচ নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষের কদর আমরা বুঝি নে—সে সব জিনিষ দেখতে শুন্‌তে তত জাঁকালো না হলেও তারা আমাদের ঢের আনন্দ দিয়ে থাকে। তাই কবি "পাউরুটি আর ঝোলা গুড়ের মত" ওচা জিনিষকে সবার চাইতে ভাল বলেছেন। এ জিনিষটির সুস্বাদু বলে যশ হয় তো নেই, কিন্তু সময় সময় এই অখ্যাত জিনিষই অমৃত তুল্য হ'য়ে ওঠে, যখন—থাক্ সে দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আর ফল কি?

"দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম" কবিতাটি পড়্‌লে বোঝা যায়, কত বড় গভীর তত্ত্বকথা কি-রূপ সহজ, সুন্দর ও হাল্‌কা করে' প্রকাশ করা যায়! সংসারের কাজের হাটে যে সব লোক খেটে খেটে হদ্দ হচ্চে, ক্ষ্যাপার মত গাড়ি-ঘোড়া, মোটর হাঁকিয়ে ছুটচে এবং তার তলায় চাপা পড়ে' মর্‌চে, পড়াশুনা করে' ভেবে-চিন্তে সময় নষ্ট

কর্‌চে, কবি তাদের উদ্দেশ করে' বল্‌ছেন—এত ছুটোছুটি, হাঁকাহাঁকিতে কাজ কি ভাই? দাও, ও-সব ছেড়ে দাও—

তার চেয়ে ভাই, ভাবনা ভুলে' গাও না গলা ছেড়ে,
"দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম! দেড়ে দেড়ে দেড়ে!"

তিনি এই সব উন্মাদ রোগগ্রস্তদের জন্যে "চাঁদনী রাতের গান" কেড়ে এনেচেন;—সমস্ত আবর্জ্জনা, সমস্ত জঞ্জাল ঝেড়ে-ঝুড়ে ফেলে দিয়ে জীবনটাকে গানের সুরে ভাসিয়ে দিতে আমন্ত্রণ কর্‌চেন—সেখানে সকাল নেই, দুপুর নেই, বিকেল নেই, আপিস-যাওয়া নেই, জীবনের যত কিছু কৃত্রিম আয়োজন, কিছু নেই;—যেখানে অনবরত তব্‌লার তালে-তালে গিট্‌কিরি চল্‌চে—"দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্! দেড়ে দেড়ে দেড়ে!" ওমর খৈয়াম্ এই কথাটাকে একটু অন্যরকম করে' বলেচেন:—

মিশ্‌ব ধূলোয়, তার আগেতে সময়টুকুর সদ্-ব্যাভার
ফূর্ত্তি করে' নাই করি কোন্? দিন ব'য়েকেই সব কাবার!

তবে, এই "সদ্-ব্যাভারে"র উপায় স্বরূপ পারস্য-কবি বাৎলে দিয়েচেন সুরা, আর আমাদের বাঙালী কবি বল্‌চেন, সুর। মূলে, ও দুটো জিনিষ একই।

কবিতাগুলোর ছন্দ সম্বন্ধেও দু-একটি কথা বলা দরকার। বাঙ্‌লা ছন্দের উপর এমন একচ্ছত্র আধিপত্য ছন্দরাজ সত্যেন্ দত্তর পর এ-পর্য্যন্ত আর কেউ করেচেন বলে' মনে হয় না। সুকুমার রায়ের শব্দ-বিন্যাস অতি সুনিপুণ; মনে হয়, বাঙ্‌লা অভিধানের সেরা সেরা কথাগুলো তাঁর একেবারে করায়ত্ত ছিল। তাঁর হাতে পড়ে' বাঙ্‌লা কথাগুলো কিরূপ flexible হ'য়ে উঠেছিল, তা তাঁর "শব্দকল্পদ্রুম" এবং "সন্দেশে" প্রকাশিত "খাই খাই" "দাঁড়ি" ইত্যাদি কয়েকটি কবিতা পড়্‌লেই বোঝা যায়। নিপুণা নর্ত্তকী যেমন তার দেহকে যে-ভাবে ইচ্ছা সে-ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অপরূপ লাস্য-লীলায় দর্শককে মুগ্ধ করে, সেইরূপ কবিও তাঁর কথাগুলোকে যথেচ্ছভাবে আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে এক অপূর্ব্ব ঝঙ্কারের সৃষ্টি কর্‌তে পার্‌তেন। এই ক্ষেত্রে বাঙ্‌লা সাহিত্যে তিনি অদ্বিতীয়। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রত্যেকটি কথা এমন উপযুক্ত স্থানে বসানো হয়েচে যে, মনে হয় একটি শব্দকে স্থানান্তরিত কর্‌লে সমস্ত কবিতার সৌন্দর্য্যই নষ্ট হ'য়ে যাবে। তাঁর কথা তাঁর ছন্দকে অনুসরণ কর্‌তো। তিনি অনেক রকম ছন্দ নিয়েই নাড়াচাড়া করেচেন, কিন্তু আগাগোড়া একটি ছন্দ-পতন বা গোঁজামিল পাওয়া যায় না। আশ্চর্য্য তাঁর মিল দেবার শক্তি! এত অদ্ভুত ও চমৎকার মিল এমন রাশি-রাশি আর কারো মধ্যেই দেখা যায় না। আর, কখনো মনে

হয় না, এ সব মিল জোগাবার জন্য তাঁকে কিছুমাত্র ক্লেশ সইতে হয়েচে—বরং মনে হয়, এ-সব না হয়ে উপায় ছিল না—মিল-গুলোকে সুবোধ ছেলের মত সুড়্ সুড়্ করে ওঁর কাছে আস্‌তেই হ'ত। অনুপ্রাসও তাঁর কাছে আপ্‌না থেকেই এসে ধরা দিত; খাবার সময় যেমন চেষ্টা করে' বার-বার হাঁ করতে হয় না, মুখটা আপনিই খুলে আসে, সেইরূপ ওঁরও কবিতা লিখ্‌তে গেলেই অনুপ্রাস এসে পড়্‌তো—তাঁর জন্য তাকে কিছুমাত্র চেষ্টা কি চিন্তা কর্‌তে হ'ত না। তাঁর এক-একটি কবিতায় যে উন্মাদক ধ্বনি-ঝঙ্কার পাওয়া যায়, তাঁর সামিল সত্যেন্ দত্ত ছাড়া আর কোথায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, জানি নে। বইয়ের প্রথম কবিতা "আবোল্ তাবোল্" ছন্দের আদর্শরূপে প্রনিধানযোগ্য:—

আয়রে ভোলা খেয়াল-খোলা
স্বপন-দোলা নাচিয়ে আয়,
আয় রে পাগল আবোল-তাবোল
মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।
আয় যেখানে ক্ষ্যাপার গানে
নাইকো মানে নাইকো সুর।
আয় রে যেথায় উধাও হাওয়ায়
মন ভেসে যায় কোন্ সুদূর! ইত্যাদি।

সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করে' দেখা যেতে পারে—

চপল পায় কেবল ধাই
কেবল গাই চলার গান,
পুলক মোর সকল গায়
বিভোর মোর সকল প্রাণ। ইত্যাদি।

আরো দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে:—

ওরে আমার বাঁচন নাচন আদর গেলা কোঁৎকারে।
অন্ধ বনের গন্ধ গোকুল, ওরে আমার হোঁৎকারে।
ওরে আমার বাদ্‌লা রোদে জ্যৈষ্ঠি মাসের বিষ্টিরে,
ওরে আমার হামান্ ছেঁচা যষ্টিমধুর মিষ্টিরে।
ওরে আমার রান্নাহাড়ির কান্নাহাসির ফোড়নদার,
ওরে আমার জোছ্‌না হাওয়ার স্বপ্ন ঘোড়ার চড়নদার।
ওরে আমার গোবরাগণেশ ময়দাঠাসা নাদুস্‌রে,

ছিঁচ্‌কাঁদুনে ফোক্‌লা মাণিক্‌ ফের যদি তুই কাঁদিস্‌ রে—ইত্যাদি।

"হুলোর গান" ছন্দ অনুপ্রাসাদির দিক থেকে অনুপম, তা ছাড়া, কাব্যহিসেবেও অতি উঁচু দরের। বাঙলা কবিতায় পশু-মনস্তত্ত্বের এত সুন্দর বিশ্লেষণ আর পড়েচি বলে' মনে হয় না। সব চেয়ে লক্ষ্য কর্‌বার জিনিষ, কবি প্রথম ক'টি লাইনে atmosphere-টি কেমন জমিয়ে আন্‌চেন!—

বিদ্‌ঘুটে রাত্তিরে ঘুটঘুটে ফাঁকা,
গাছপালা মিশ্‌মিশে মখ্‌মলে ঢাকা,
জট্‌বাঁধা ঝুল্‌ কালো বটগাছ তলে,
ধক্‌ধক্‌ জোনাকির চক্‌মকি জ্বলে,
চুপচাপ চারদিকে ঝোপ্‌ঝাড় গুলো—
আয় ভাই গান গাই আয় ভাই হুলো।
গীত গাই কানে কানে চীৎকার করে',
কোন্‌ গানে মন ভেজে শোন্‌ বলি তোরে—

এই ক'টি কথায় এক বিদ্‌ঘুটে অন্ধকার রাত্রির এমন হুবহু চিত্র আঁকা হয়েচে যে, পড়্‌তে-পড়্‌তে সত্যি গা' ছম্‌ ছম্‌ করে' ওঠে; তারপর আসল কথা চ্চে:—

পুবদিকে মাঝরাতে ছোপ দিয়ে রাঙা
রাতকানা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা,
চট্‌ করে' মনে পড়ে মট্‌কার কাছে
মালপোয়া আধখানা কাল থেকে আছে।

লাল রঙের আধখানা চাঁদ দেখে হুলোর আধ খাওয়া মালপোয়ার কথা মনে পড়ে' গেল! আমাদের কাছে এ খুব অদ্ভুত শোনায় বটে, কিন্তু বেরালের কাছে এর চাইতে স্বাভাবিক আর কি হ'তে পারে? যাক্‌,—তারপর—

দুড়্‌ দুড়্‌ ছুটে' যাই দূর থেকে দেখি
প্রাণপণে ঠোঁট চাটে কানকাটা নেকী!
গাল ফোলা মুখ তার মালপোয়া ঠাসা
ধুক্‌ করে নিভে গেল বুক ভরা আশা!

আহা বাছা রে! কী পরিতাপ! যাঃ! মাল্‌পোয়াই চুরি হ'য়ে গেল, অমনি হুলোর মনে পরম বৈরাগ্যের উদয় হ'ল—

মন বলে আর কেন সংসারে থাকি
বিল্‌কুল্ সব দেখি ভেল্কির ফাঁকি।
সব যেন বিচ্ছিরি সব যেন খালি,
গিন্নীর মুখ যেন চিম্‌নির কালি।
মন ভাঙা দুখ মোর কণ্ঠেতে পূরে
গান গাই আয় ভাই প্রাণফাটা সুরে।

আমি চিত্রকর নই, তবু সুকুমার রায়ের শিল্প-নৈপুণ্যের প্রশংসা না করে'ও পারুচি নে। "আবোল্ তাবোল্" বইটির প্রচ্ছদপট থেকে সুরু করে "সমাপ্ত"পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ ভূষণের নির্ম্মাতা তিনি নিজে। রবীন্দ্রনাথ "গড্ডালিকা"র সমালোচনায় যতীন্দ্র সেন গুপ্তের ছবিগুলো সম্বন্ধে যে কথা বলেচেন, এখানেও ঠিক সেই কথাই খাটে! * সব ছবিই ভালো, তবে, "ট্যাশগরু" "রামগরুড়ের ছানা" "হেঁাকোমুখো" "হ্যাংলা" "ছলোর গান" "কাঁদুনে" "চোরধরা" "ভয় পেয়ো না" "খিচুড়ি" "কিম্ভুত", "আহ্লাদী"—এ সব কবিতার ছবিগুলোর বাস্তবিক তুলনা হ'তে পারে না। "ট্যাশ গরু" "রামগরুড়ের ছানা" হুঁকোমুখো" "হ্যাংলা" "ভয় পেয়ো না"— এই কটি কবিতায় যে সব জন্তুর ছবি আঁকা হয়েচে,তারা কোনান্ ডয়েলের কল্পনাতেই বিচরণ করে বলে' এতদিন জান্‌তুম! সত্যি, কবির imagination ও conception-কে ধন্য। "খিচুড়ি"তে permutation and combination করে' যে কটি জীব সৃষ্টি করা হয়েচে, তাদের ছবি দেখে খোদ্ বিশ্বকর্ম্মারও বোধ হয় তাক্ লেগে গিয়েছিল। একেই বলে "খোদার উপর খোদগিরি,"—কিম্ভুতে"র ছবিটাও ঐ ধরণের, তবে আরো বেশি fantastic. আহলাদীর ছবিটা দেখলে মৌন ব্রতাবলম্বী মুনির তপস্যা ভেঙে যাওয়াও অসম্ভব নয়। সে দিন আমার এক আত্মীয়া জিজ্ঞেস কর্‌ছিলেন, "এ সব লেখা কত বছর বয়েস অবধি লোকের ভালো লাগতে পারে?" আমি জবাব দিয়েছিলুম, "সব বয়সেই।" তখন মনে হয়েছিল, কথাটা বোকার মত হ'ল, কিন্তু এখন দেখচি ঠিকই বলেছিলুম। "আবোল্ তাবোল" শিশুপাঠ্য গ্রন্থ হ'লেও এ-থেকে

---

* "লেখনীর সঙ্গে তুলিকার কী চমৎকার জোড় মিলিয়াছে, লেখার ধারা রেখার ধারা সমান তালে চলে, কেহ কাহারো চেয়ে খাটো নহে। তাই চরিত্রগুলো ভাষায় ও চেহারায়, ভাবে ও ভঙ্গীতে ডাইনে বামে এমন করিয়া ধরা পড়িয়াছে যে, তাহাদের আর পলাইবার ফাঁক নাই।"

সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাবে পরিণত বয়সের লোকরাই ; কারণ এর humour এত subtle যে, তা বুঝতে পারার মত রসবোধ খুব অল্প শিশুরই হ'য়ে থাকে।

সঞ্চয়

হুমায়ুন কবীর

জীবনের শেষদিনে দাঁড়াইয়া মৃত্যুর সম্মুখে
আজি শেষ বোঝা।
তোমার নয়ন-কোণে প্রেমের অস্ফুট আলোরেখা
আজি শেষ খোঁজা।
যতদিন এ ভুবনে জীবন আছিল নিত্যনব
বন্ধু ছিল শত,
পরিত্যক্ত গৃহপ্রায় আজি এই বজ্রদগ্ধ তরু
দীর্ণ ব্যথাহত
ছেড়ে' সবে' চলে' গেছে যে যাহার আপনার পথে
বারেক না চাহি।
তাই ভগ্নদীর্ণ প্রাণে তোমার সজল আঁখিকোণে
রহিয়াছি চাহি।
বন্ধু ছিল যারা সবে জীবনের গৌরবের দিনে
কোথা তারা আজ ?
জীবনের সব সুখ নিঃশেষ হইয়া গেছে মোর,
আজি দুঃখ লাজ
শ্রাবণের মেঘ সম ঘনাইছে জীবন-গগনে,
দিক অন্ধকার—
তারি মাঝে গর্জ্জি ওঠে প্রলয়ের বহ্নি নিদারুণ
বজ্র বার বার।

অকূল সাগর-নীরে কূলহারা দিকহারা তরী
ভাসে জীর্ণ প্রাণ,
চারিদিকে পুঞ্জীভূত ঘনাইয়া আসিছে মরণ
আজি শেষ গান।
কে এসেছে, কে হেসেছে, কে গেছে করিয়া অবহেলা
দেখিব না আজি,
বিপদের বজ্রমুখে পার্শ্ব হতে কে সরি দাঁড়াল?
মৃত্যুমুখে ত্যজি—
জীবনের অবসানে কোন্ পূজা নহে সমাপন
তাহা দেখিব না,
কি বাঞ্ছা অপূর্ণ আজো, কি রয়েছে আকাঙ্ক্ষিত ধন
তাও খুঁজিব না।
তুমি যদি আসি শুধু দাঁড়াও আমার পাশে আজ
রাখো হাতে হাত,
তবে এই মৃত্যুসিন্ধু সন্তরিয়া সন্ধান করিব
জীবন প্রভাত।
সন্ধ্যা যদি নামে পথে চন্দ্র যদি পূর্ব্বাচল কোণে
না হয় উদয়,
তারকার পুঞ্জ যদি নিভে যায় প্রলয় জলদে—
না করিব ভয়।
হিংস্র ঊর্ম্মি ফণা তুলি, বিভীষিকা মূর্ত্তি ধরি যদি
গ্রাসিবারে আসে,
সে মৃত্যু লঙ্ঘিয়া যাব সিন্ধু পারে নব জীবনের
নবীন আশ্বাসে!
জীর্ণ তরী বাহি যাব উত্তরিয়া অকূল সাগর,
ফিরিব না চাহি,
অজ্ঞাত রহস্যঘেরা সৃষ্টির অনাদি সিন্ধু পানে
শেষ গান গাহি!

কবি

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

সাগর-কূলে বেড়াতে গিয়ে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। একদিন সন্ধ্যাবেলা সে এসে চুপি চুপি আমার পাশে বসলে। আমি তখন চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত সমুদ্র বক্ষের দিকে এক মনে চেয়েছিলেম। আকাশ পরিষ্কার, অগণিত নক্ষত্র ঝিক্‌মিক করচে। সাগর তখন শান্ত সুবোধ মেয়েটির মত এলিয়ে পড়েচে। দূরে শহরের অস্ফুট কলরব ক্রমে শান্ত হয়ে আসচে, ঘরে ঘরে কাসর ঘণ্টা দিয়ে গৃহ-দেবতার আরতি আরম্ভ হয়ে গেছে।

সাগর-কূলে যে কয়খানা বসবার আসন ছিল, তার সব কয়খানাই ভর্ত্তি হয়ে গেছে,—কেউ বসেচে যুগলে, প্রেমগুঞ্জন তাদের সুরু হয়ে গেছে; আর কেউ বা ভাবুকের মত উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। আমার আসনখানার পাশে খালি জায়গাটুকুতে এসে যে লোকটি বসলে তার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেম। তাকে দেখ্‌তে ঠিক ভবঘুরের মত, জামা কাপড় অতি জীর্ণ, ছিন্ন ও ময়লা, পায়ে ছেঁড়া এক জোড়া অতিপুরাতন জুতা। এর সঙ্গ, বলা বাহুল্য, আমার এতটুকু ভাল লাগছিল না এবং পাছে তখন উঠে গিয়ে আর এক জায়গায় বসলে বেচারার মনে লাগে, তাই কয়েক মিনিট থেকেই উঠে যাব মনে করলেম।

সে-ই প্রথম কথা কইলে। আমায় বল্লে, আমি আপনাকে চিনি মশাই। আপনি একজন কবি, বড় কবি।

তার দিকে চেয়ে দেখলেম, তার বার্দ্ধক্যে শীর্ণ দন্তহীন মুখখানা বড় ভাল লাগল, আর আসন ছেড়ে ওঠা হল না। জবাব দিলেম:

হাঁ, আমি লিখি বটে, তবে ছোট গল্প লিখে থাকি। কবিতা ত লিখি নে। আমায় চেনেন?

হাঁ। আপনি যে কবি তা জানি। সে আমার ভুল সুধ্‌রে দিলে। তারপর সংযত স্বরে ধীরে বল্লে:

আমিও একজন কবি।

এরপর আর কি আসবে তা বুঝলুম: এক অতি করুণ কাহিনী। ব্যর্থ

জীবনের আশা, দারুণ অভাব, কিছু চাই ইত্যাদি। আমি বড় জোর চুইচার আনা হয় ত দিতে পারি। নতুন লোক দেখে সবাই আমার দিকে একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, আমি তাই একটু অস্বস্তিই বোধ করছিলুম। তাই এ লোকটিকে ঘনিষ্ঠ ভাবে পেয়ে একটু নিশ্বাস ছাড়লুম। তার বয়স হয় ত ষাট হবে, তবে দেখতে ঢের কম দেখায়। কোটরগত গাঢ় কাল চোখ দুটি; ছোট মুখখানির হাসি মানুষের চোখ এড়িয়ে যায় না। হাত দুখানা রোদে জলে অযত্নে বিবর্ণ হয়ে গেলেও বেশ পাতলা, রগগুলি সব ফুলে উঠেছে। তা হলেও তা খেটে খাওয়া মজুর বা ভিখারীর হাতের মত নয়, বরং বিশ্বাস করা যায় যে, ওই হাতে একদিন হয় ত ছন্দ রূপ নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

তাই নাকি? সহৃদয়তার সঙ্গে জবাব দিলেম, আপনিও কি কবিতা লেখেন?

সে বল্লে, না। তার মুখে সেই হাসিটুকু! সে বলে যেতে লাগল, আমি কখনো লিখি নে, জীবনে একটি ছত্র কবিতা লিখি নি। কখনো একটি ছত্র কবিতা বা গদ্য লিখতে পারবো না। তবুও আমি কবি। আমি তা জানি, কেননা আমি যে কল্পনার ঘরে বসতি করি।

তার দিকে চেয়ে রইলুম, একটি কথাও কইলুম না। যাদের মানসিক রোগ আছে আমি ছেলেবেলা থেকেই তাদের ভারি ভয় পাই, তাই এ ক্ষেত্রেও নীরবে আত্মরক্ষা করতে লাগলুম।

সে আবার পুনরাবৃত্তি করলে, আমার কল্পলোক! আমি তারই কবি।

বলে সে আবার হাসতে লাগল এবং আমার দিকে বেশ সহানুভূতির চোখে চেয়ে রইল, যেন এমন ভাবখানা যে, তার কথা যে আমি বুঝবই সে বিষয়ে সে একেবারে নিঃসন্দেহ।

আমার নিজেকে নির্বোধ মনে হতে লাগল এবং কি জবাব দিব ঠিক পাচ্ছিলুম না। আমার উঠে গিয়ে আর একখানা আসনে বসে চন্দ্রালোকে সাগরের বিরাট শোভা দেখাই উচিত কিন্তু কারুর মনে দুঃখ দেওয়া আমার স্বভাবে নেই, তাই তার কথা বুঝেছি এই ভাবখানা দেখিয়ে হাসি মুখে তার দিকে চেয়ে রইলুম।

সে বলতে লাগল, যে লোক নিজের কল্পনা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, সে বড় সুখী। আমি তাই বড় সুখী।

তবু আমি জবাব দিলেম না, বলবার মত কিছু ভেবেও উঠতে পারলুম

না। মনে মনে একটু চঞ্চল হয়ে উঠলুম কিন্তু পাছে সে আঘাত পায় তাই সদয় হাসিতে তাকে সায় দিলুম।

সে পুনরাবৃত্তি করলে, আমি সুখী।

আমি নীরব।

সে আপনা থেকেই বলে যেতে লাগল, যেন এ রকম বলা তার নিজের পক্ষ সমর্থনের জন্য একান্ত আবশ্যক। সে বল্লে, খুব কম লোকেই সুখী হতে পায়; কিন্তু আমি—আমি সুখী। তুমি হয় ত এখনই বুঝতে পারবে না, কেননা আমার বাইরেটাকেই তুমি, তোমরা সকলে দেখচো, আমার যেটুকুকে নিয়ে আমি, আমার সেই ভিতর মহলের আমি রয়েচে তোমাদের দৃষ্টির অন্তরালে, আর সেইটুকুই সত্যকারের আমি, তাকে নিয়েই কল্পনায় একসঙ্গে ঘর করি। আমি যদি চিত্রী হতুম ত তোমায় আমার প্রতিকৃতি এঁকে দিতুম। আমার ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য না থাকলেও আমি গরীব নই; আমার অবস্থা যাকে বলে 'বেশ ভাল', তাই। আমার পোষাক পরিচ্ছদ তোমার চাইতে নিরেশ হবে না নিশ্চয়, আর এই দেখ আমার হাতে হীরার আংটি, এটি আমার জন্মদিনে আমার বন্ধু উপহার দিয়েছেন।

এই বলে সে আমাকে তার আংটিহীন আঙুলটি তুলে দেখালে এবং বেশ কায়দা করে হাতখানা ঘুরাতে লাগল, যেন চন্দ্রালোকে সত্যিই আংটির হীরাখানা ঝক্‌মক্ করচে। বল্লে:

আমি থাকি সমুদ্রের ধারের সব শেষের সেই সমুদ্রের ফেনার মত শাদা বাড়ীটায়। সেখানে অবশ্য একা থাকি নে—

এক মুহূর্ত্তের জন্য সে চুপ করে গেল। আবার পরক্ষণেই বল্লে:

সেখানে রয়েছে আমার অন্তর লক্ষ্মী,—অপূর্ব্ব ষোড়শী—

তাকে আঘাত দিবার ইচ্ছা না থাকলেও আমি একটু হাল্কা বিদ্রূপের সুরে জবাব দিলুম:

তোমার হাতের আংটি যেমন সত্যি, ওই বাড়ী আর স্ত্রীও কি তেমনি সত্যি?

সে রাগ করলে না, বরং ঘাড় নাড়লে।

সে বল্লে, কোন্‌টা সত্য? বাস্তব? কেন, আমার কল্পনা সত্য নয়? আমার কল্পলোক—আমি তারি অধিবাসী কবি। আমায় একটু বুঝতে চেষ্টা কর।

আমি কল্পনা দেখি না; আমি কল্পনায় বাঁচি, কল্পনায় মরি। আমার অন্তরাত্মার কাছে এই কল্পলোকের সীমানার বাইরে আর কোন দেশ নেই, কোন কাল নেই। আমার আবাস-ভবন সে আছে, সত্যিই আছে, আমি এই এখনি তোমার পাশে বসে তার প্রত্যেক জিনিষটির কথা তোমাকে বলতে পারি। আমি অতীতকে ভালবাসি, তাই আমার সেই ভবনে আছে অতি সযত্নে বহুমূল্য সব অতীতের স্মৃতি। তুমি তা বলে ভেবো না যে, আমার জগতকে কল্পনার খেয়ালে আমি আজ এক রকম, কাল অন্য রকম দেখি। না, তা নয়। আমার কল্প-লোকে আমার সে গৃহ অচল মূর্ত্তি নিয়ে জাগচে। আমায় যে ধরে নিয়ে গিয়ে এক মাসের জন্য একটা বদ্ধ ঘরে পুরে রেখেছিল— সেইটিই কি বাস্তব? ওই যে পুলের নীচে মাঝে মাঝে রাত কাটাতে হয়— ওইটিই কি আমার সত্যিকারের ঘর? ওই সমস্ত ক্ষণিক আবাসের স্থল নিত্য পরিবর্ত্তন হয়ে চলেচে, স্বপ্নের মত, ছায়ার মত, কিন্তু সাগরের ধারে সমুদ্রের ফেনার চেয়ে শাদা ধব্‌ধবে আমার আবাস-ভবন, সে অপরিবর্ত্তনীয় হয়ে আমার জন্যে রয়েচে। তুমি যদি তাকে দেখতে না পাও—তাতে আমার কি যায় আসে? তুমি দেখতে পাও না বলে কি আমার হাতে আমার বন্ধুর দেওয়া আংটি অদৃশ্য হয়ে যাবে? তুমি দেখতে পাও, আর না পাও, এই চন্দ্রালোকে আমার আঙুলের অঙ্গুরীয় থেকে আলো বেরোবেই! আমার বাড়ী? সে আমার বেণু-কুঞ্জছায়ার মত শীতল; শীতে সে কপোত-গ্রীবার অন্তঃস্থলের মত উষ্ণ— আর আমার প্রিয়া—

সে আমার কাছে আরো সরে এসে বসল। তাকে কষ্ট দেওয়া হবে ভেবে আমি আর সরে গেলুম না। সে বলতে লাগল:

—সে তন্বী। সুন্দরী, ষোড়শী; সে তার দেহকে জ্যোৎস্না-শুভ্র আবরণে ঢেকে আছে নিত্য। চোখেতে তার সোনার স্বর্গ জ্বলে। আমার তপ্ত চুম্বনে তার মুদ্রিত নয়ন ফুটে স্বর্গ জাগে। তার দুই হাতের আলিঙ্গনে যে আনন্দ আছে—তা অপরিমেয়। তার প্রেম আমায় নিত্য নব উন্মাদনায় টেনে নিয়ে চলেচে। সে প্রেমের প্রাচুর্য্য বওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তবে একটা দোষ তার ভয়ানক আছে—

সে চুপ করলে।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেম, সে কি?

সে ছলনাময়ী। বার বার সে আমায় ছলনা করে চলেচে।

বিস্ময়ে অবাক হয়ে আমি উত্তর দিলেম, সে তোমার সঙ্গে প্রতারণা করে? সে কি! আর তা হলেও সেও ত তোমারই হাতে, তুমি ইচ্ছা করলেই তার কাছ থেকে প্রতারণা না নিয়েও পার। এ ত তোমারই হাতে।

সে আমার দিকে সহানুভূতির সঙ্গে তাকিয়ে রইল। পরে বল্লে:

কল্পলোকে বাস করা জিনিসটি যে কি, তুমি দেখচি তা বুঝ নি। তোমার বিশ্বাস যা ইচ্ছা তাই কল্পনা করা যায় কেমন? ভুল, ভুল, হায় আমাদের কল্পনা— তারও ভাগ্য বিধাতা আছে। সে চলে তারই ইঙ্গিতে।

আমার শুধু মনে আমার কল্পনার নিদারুণ বাস্তবতার কথা। মানসলোকের কল্প-ভুবনে সে নারীকে যখনি গড়ে তুলি— অদৃষ্টের পরিহাস যে, সে নব-জীবনে জাগ্রত হয়েই আমায় ছলনা করে। সে ছলনা করে নিত্যকাল ধরে। সে আমায় ভুলিয়ে চলে যায়। সকলের সঙ্গে। পথের পথিকের সঙ্গে। তুমি জান না এ প্রতারণার বেদনা আমাকে কতখানি কষ্ট দেয়। পথ দিয়ে যে যায়—সে ধনী হোক, সে গরীব হোক, সে কুলী মজুর হোক, আমাকে ঠকিয়ে তারি সঙ্গে যায়। তারপরে আমি কত কাণ্ড করি; সে ছলনাময়ী হেসে সব অস্বীকার করে। সে মোহিনী, আমায় মিথ্যাবাদী বলে— এমনি কুহকিনী সে, তার দু'বাহু দিয়ে আমায় আবার জড়িয়ে ধরে—আমি আবার সব ভুলে যাই। তুমি জান না আমার জীবন নিয়ত কি প্রচণ্ড দোলায় দুলচে।

অনেকক্ষণ পরে গোপনে সে বল্লে, একমাত্র প্রতীকারের উপায় আছে। আমিও যদি অমনি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি তাহলেই ও জব্দ হয়। আমার চারিদিকে নৃত্য করুক আঙুর গুচ্ছের মত নারীর দল . . . কিন্তু একটা মুশ্‌কিল আছে—সে সকলকে জয় করে বসে। সে দুর্দ্দমনীয় শক্তির মত অনায়াসে চলে। দরজা বন্ধ করে রাখ—তবু সে চলবে। আমি যখন অন্য কোন নারীকে আলিঙ্গন দিতে যাই, সে সেই নারী ও আমার মাঝখানে কেমন করে এসে দাঁড়ায়, তখন দেখতে পাই আমি তারই আলিঙ্গনে বদ্ধ! সব সময়েই তারই আলিঙ্গনে আমি বদ্ধ। আজকের রাত্রিতে আমার দুঃখের আর সীমা নেই। তাই মনে করচি, আজ রাতে নাচ-গানের জলসা বসাব। তাতে দেশের যত সব সুন্দরীকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসব। কেবল নারী, পুরুষের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। তবে যদি সে ছলনাময়ী জব্দ হয়।

এই বলে সে তার জীর্ণ জামার পকেট হাতড়াতে লাগল। তারপর বল্লে:

আজকে দেখছি, ও-রকম বন্দোবস্ত করা সম্ভব হবে না, কেননা ঘর থেকে যখন চলে আসি তখন আর একটা জামার পকেট থেকে পকেট-বুকখানা আনতে ভুল হয়ে গেছে। আজকে যে শ'খানেক টাকা আমার চাই-ই, টাকা ত সব পকেট-বুকে রয়েচে।

আমি নিশ্চিন্ত ভাবে জবাব দিলেম, শ'খানেক টাকাতেই হবে? তাহলে আমিই এখন তা চালিয়ে দিচ্ছি। তার হাত এড়িয়ে অন্তত এক রাত্রির জন্যে তুমি একটু সুখ পাও। টাকাও ত দরকার, আচ্ছা আমি তোমায় এই একশ' টাকা দিচ্ছি, যেদিন হোক তুমি তা পরিশোধ করো।

এই বলে আমি পকেট থেকে একখানা একশ' টাকার নোট ও নগদ পাঁচটি টাকা ধরে দিলেম।

এক মিনিটকাল ইতস্তত কি ভাবলে, পরে মাত্র পাঁচটি টাকা তুলে নিয়ে গদগদ ভাবে বল্লে, তোমাকে ধন্যবাদ দিবার ভাষা আমার নেই। এই মাত্র বলতে পারি যে, তুমি সবার উপরে, মানুষের জনতা মানুষের সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনায় সমান নির্ব্বিকার, সমান উদাসীন, তোমার মন লোকের দুঃখে ব্যথিত হয়—তুমি কবি। একটা মাত্র কথা তোমায় বলচি, এই বৈচিত্র্যহীন নির্ম্মম জগতে বাস করতে হলে বাস্তবতার বাইরে কল্পনার দেশে বিচরণ করাই একমাত্র শান্তির সুখের পথ। তোমার কাছ থেকে এই পাঁচ টাকা নিচ্ছি—ধার। না... পাঁচ টাকা নয়, এ আমার কাছে হাজার টাকা। তোমার এই দাক্ষিণ্যে তুমি আমায় স্বর্গের দুয়ারে পৌঁছে দিলে, আবার নরকের দ্বারেও পৌঁছে দেবার সুযোগ করে দিলে। সে যাক গে, কল্পনা স্বর্গেই নিক, কি নরকেই নিক, তার জন্যে কখনো দুঃখ করো না।

এই বলে সে পথ-চলতি লোকদের দেখিয়ে বল্লে, এরা বেঁচে নেই—মড়া...

সগর্ব্বে হেসে সে উঠে দাঁড়াল—

আমরা কবি, আমরাই শুদ্ধ বেঁচে আছি...

গর্ব্বভরে সে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, একবার গা-মোড়া দিয়ে হাত জোড় করে আমায় নমস্কার করলে। দেখলুম, তার মাথার সবগুলি চুলই একেবারে দুধের মত শাদা।

সে ধীর পদবিক্ষেপে চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত সমুদ্র-কূলের পথ ধরে চলে গেল।

সে খুড়থুড়ে নুজ দেহ বৃদ্ধ হলেও আমার মনে হল, এই জ্যোৎস্নালোকেরই মত একটা নিষ্কলঙ্ক মহিমা ও গৌরব নিয়ে সে চলে গেল।*

যৌবন-প্রভাতে

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ

হেরিনু যেদিন আমি যৌবন-প্রভাতে
তরুণ তপনালোক—আর তারি সাথে
বিরাট্—বিপুল ব্যপ্ত মোর চারিপাশ
মেঘলোকী সীমাহীন অনন্ত আকাশ,—
বাহিরিনু সেদিন দুর্দ্দম গৃহ-হারা—
উল্কা সম বিশ্ব-বক্ষ' পরে, সৃষ্টিছাড়া
আমি রাতজাগা রজনী-গন্ধার গন্ধে
সুর গাঁথি সারা বেলা অপরূপ ছন্দে।
সর্ব্বশেষ দোল্ দিয়া তপ্ত মোর হিয়া
রঙীন্-সন্ধ্যায় সারা বুক আকুলিয়া
নীল দুটি আঁখি বেঁধে দিল রাঙা-রাখী;
বাতায়নে গেল ডাকি' আন্-মনা পাখী।
*   *   *   *
তরুনী সে নিল মো'র বুকে তার টানি'
পূর্ণ করি সম্ভোগেরি সুরা-পাত্রখানি!

---

* হল্যাণ্ডের বিখ্যাত লেখক Louis Couperus-এর একটি গল্প অবলম্বনে। ইনি ১৯২৩ সনের জুলাই মাসে আটষট্টি বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন।



উপন্যাস

দ্বিতীয় খণ্ড

(৩)

একদিন জিঠানি এসে উপস্থিত; ডাক্তার, আমাকে সারিয়ে দিতে হবে।

তাকে চেয়ারে বসিয়ে বল্লুম, তোমাকে সাহায্য করতে আমি প্রস্তুত; কিন্তু তোমার ব্যারামটা কি শুনি?

সে বল্লে, সে খুব ছোট্ট জিনিষ। পাঁচ মিনিটও লাগবে না।

হেসে বল্লুম, আচ্ছা তোমাকে পঁচিশ মিনিট সময় মঞ্জুর করলাম।

সাহেব বল্লে, কিন্তু সে কথা কি তুমি বিশ্বাস করবে?

অবিশ্বাস করার মত কিছু আছে না কি?

সায়েব হাসতে লাগলো, হিলা কিন্তু বিশ্বাস ক'রে না।

সায়েবের ব্যারামের ইতিহাস শুনে বাস্তবিক না হেসে থাকা যায় না। সাদা চামড়ার তলায় যে অতবড় একটা কুসংস্কার থাকতে পারে তা' সচরাচর আমরা বিশ্বাস করি নে। সায়েব বল্লে:—

এ দেশের এক শ্রেণীর লোক চিরদিনই সমুদ্রের জল থেকে নুন তৈরি করে নিজেদের জীবিকা অর্জ্জন করতো। সরকারের আইনে এমন নাকি আর করা যায় না। এই সকল লোকদের এই কর্ম্ম থেকে বিরত করেছি। তারা ভূত পূজো ক'রে আমার উপর ভূতের কু-দৃষ্টি করিয়ে দেওয়াতে আমার পেটের এই ব্যথার সৃষ্টি।

বল্লাম, সায়েব, ওটা যে তোমার লিভারের ব্যথা। ওর কারণ আমরা জানি।

কি?

অতিরিক্ত মদ্যপান।

কি-যে তোমরা বল! কোথায় আমি বেশী মদ খাই? অমন ত' চিরকালই খেয়ে আস্‌চি—কৈ এত দিন ত' ব্যথা হয় নি?

বল্লুম, শরীরের উপর যে দিন অত্যাচার করি সেই দিনই কিছু তার ফল ভোগ করতে হয় না। অপরাধগুলি সঞ্চিত হ'তে হ'তে—যে দিন পর্ব্বত-প্রমাণ হয়—সেদিন এমনি ক'রেই তারা আত্মপ্রকাশ করে।

তুমি কি মদ ছাড়তে পার?

ছাড়বো—একদিন এমন ভরসা ছিলো, ডাক্তার; কিন্তু আজ আর তা নেই।

জিঠানি হঠাৎ অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেল। তার গাম্ভীর্য্যের ধ্যান ভেঙ্গে দিতে আমার যেন ইচ্ছা হলো না; কেমন মায়া হ'তে লাগলো।

খানিক পরে হঠাৎ সে বল্লে, তুমি কি মনে কর আমি সুখী?

সুখের উপকরণগুলি তো তোমার সবই আছে, সায়েব!

সে কথা অনেকটা সত্যি। টাকার এখন আমার কোন অভাব নেই, ডাক্তার, কিন্তু টাকাতে কি সুখ বাড়ে? সুখের চেয়ে তাতে অসুখ বেশী। একদিন আমার অবস্থা এমন ছিল যখন দিন চল্‌তো না; কিন্তু সেইদিনই আমি সুখী ছিলাম, সত্যি ডাক্তার!

তারপর?

হঠাৎ হাতে অগাধ টাকা এসে গেল। আমার একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় অসম্ভব ধনী ছিলেন—তাঁর আর কেউ ছিল না। তিনি আমাকে উইল ক'রে সব দিয়ে গেছেন। এই বিপুল সম্পত্তির মালিক হওয়ার পর থেকে একদিনের জন্যেও আমি সুখী নই।

আমি সহানুভূতির হাসি হাস্‌লুম; কিন্তু জিঠানি তা বুঝতে পারলে না।

সে বল্লে, বিশ্বাস করছো না? চাকরি করি কেন?—ওইটের জন্যেই ত' বেঁচে আছি;—ওর দোহাই দিয়ে যতটুকু সম্ভব, সৎপথেই আছি।

বল্লুম, নইলে?

রসাতলের পথ ত' উন্মুক্তই!

এখন আর তত সহজ নয় সায়েব।

কেন?

এখন তুমি যে ওয়ারিস মাল নও, একজন গার্জেন আছে তোমার।

সায়েব একটা অদ্ভুত শব্দ মুখ দিয়ে করলে—তা ঠিক নয়, ডাক্তার।

তবে ?

এক বিন্দুও না ; হিলা আমাকে চায় না, সে যা চেয়েছিল—তা’ আমি তা’কে প্রচুর দিয়েছি। কিন্তু—বাবু, তুমি তার একজন প্রিয় বন্ধু।

বুঝলুম, সায়েব আমাকে ওর চেয়ে আর বেশী কিছু বল্‌তে সাহস করে না। মানুষের উপর বিশ্বাস গ’ড়ে উঠতে সময় লাগে।

সায়েব, আমিও তোমার একজন বন্ধু, আমার একান্ত অনুরোধ—তোমার রাখতেই হবে।

সায়েব হাস্‌তে লাগলো—আমাদের বন্ধুত্ব ! যুদ্ধে আরম্ভ এবং যুদ্ধেই শেষ হবে তার, বোধ করি।

ওটা তোমার একটা কুসংস্কার মাত্র।

আচ্ছা দেখা যাক্ কি হয় শেষ পর্য্যন্ত।

মিষ্টার জিঠানি—

মিষ্টার ডাক্তার—

এই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—

বল।

তোমাকে আজ থেকে মদ ছাড়তেই হবে।

বাবু, তোমাকে সোজা কথা বলি, ওটি আমার দ্বারা হবে না—অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব।

সায়েবের দুটো হাত চেপে ধরে বল্লুম, এমন ক’রে আত্মহত্যা করো না বলছি, সায়েব।

কিন্তু ও ছাড়া যে আমার উপায় নেই । . . . সায়েবের দু’চোখ যেন জলে ভ’রে এলো।

কি তোমায় দুঃখ—আমায় খুলে বল্‌তে পারো ?

সে বল্লে, আর কিছু না, হিলাকে ব’লো যেন আমার সঙ্গে একটু সদয় ব্যবহার করে।

আমি যথা-সাধ্য চেষ্টা ক’রবো।

আজই ?

বেশ আজই, সন্ধ্যার পর। তুমি কিন্তু সেখেনে থে’ক না।

সোৎসাহে সায়েব বল্লে, বেশ, বেশ,—আমি লিমাকে নিয়ে—একটু ঘুরে আসবো।

বেশ ত তাই হবে।

স্ফূর্তিতে তার দুটো চোখ যেন চক্ চক্ করতে লাগলো।

সায়েব, মনে রেখ মিস্ রায় কিন্তু মাতালকে বড় ঘৃণা করে—তুমি যদি মদ খাও ত সে তোমার সঙ্গে কিছুতেই যাবে না।

আমি তোমায় কথা দিচ্চি, ডাক্তার।

সায়েব লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে প্রফুল্লচিত্তে চলে গেল।

সন্ধ্যার পর আমাদের সমুদ্রতীরের বৈঠকে জিঠানি আস্তেই—আমি চুপি-চুপি ইলাকে জিজ্ঞাসা করলুম, সায়েব কি আজ মদ খেয়েছে?

আশ্চর্য্য, এক ফোটাও নয়।

আমি নীলিমার দিকে চেয়ে বল্লাম, তোমাকে আজ জিঠানির সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আস্তে হবে।

সে বল্লে, এ কি হুকুম?

না, একটি ক্ষুদ্র অনুরোধ।

হঠাৎ?

পরে বল্বো।

জিঠানি আর নীলিমা চ'লে গেলে বল্লুম, ইলা, তোমার সায়েবের মদ খেয়ে লিভার প'চে যাবার মত হয়েছে যে।

সেটা না হলেই একটা বিস্ময়ের ব্যাপার ঘট্তো, কিরণ।

তাকে মদটা ছাড়িয়ে দাও।

আমি? কি যে বল তুমি! সাধ্য কি তোমার-আমার?

আমি ভাবতে লাগলুম—ইলা ঐ লোকটির উপর এমন ধারণা কেন ক'রেচে—তার কি কারণ!

সে বল্লে,

চরিত্রহীন লোকের হাতে টাকা যে কত ভীষণ হয়—তা' আগে আমি কল্পনায় আন্তে পারতুম না। মাকে ব'লতে শুনেছি যে, আমাদের টাকা না থাকাটা, ভগবানের আশীর্ব্বাদ। সামান্য কিছু টাকা একদিন, বাবার হাতেও এসেছিল; কিন্তু তাতে আমাদের সংসারের দুঃখই বেড়ে গিয়েছিল কেবল। তারপর,—এই লোকটার টাকার মদোদ্ধতা দেখে-দেখে, হাড় কালি হয়ে গেল।

তুমি বড় কঠোর হয়ে গেছ—এই অল্প দিনের মধ্যে।

দিন অল্প হ'লেও দুঃখের বোঝা যা' এর ভেতর বইলাম—তা ত অল্প হয় নি, কিরণ।

কান্না যেন আমার বুকের ভেতর গলাটাকে চেপে ধরলে! চো'খের জলটা কোন ক্রমে সাম্‌লে নিয়ে বল্লুম, ইলা, দুঃখ আস্‌বেই—তাকে নিবারণ করার শক্তি মানুষের নাই। তার উত্তাপ আছেই—সেটা যদি আমাদের হৃদয়-মনকে দগ্ধ ক'রে দিয়ে যায় ত' জীবনে তার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কি আছে? সেই উত্তাপে, হৃদয়কে পরিণত ক'রে, রসিয়ে তুল্‌তে পারলে—তবেই দুঃখকে সার্থক করা হয়।

ইলা বল্লে, একদিন এমন ছিল কিরণ, যে এই সব কথা আমাকে অধীর ক'রে তুল্‌তো; যেন হাঁপিয়ে উঠতুম; কিন্তু আজ-কাল যেন মনে হয়—এগুলো একদম বাজে কথা নয়।..জীবনে একটা দুঃখই বোধ করি—আমার সবচেয়ে বড় হয়েচে; কিন্তু সেটা আমাকে অনেকখানি স্নিগ্ধ ক'রে দিয়ে গেছে।

আমার আবার গলা চেপে আস্‌তে লাগলো।

সে বল্লে, কিন্তু সবচেয়ে বড় দুঃখ হয়েচে আমার এই জানোয়ারটার সঙ্গে কারবার করা। এর ভদ্রের প্রচ্ছদ আছে—কথায় বার্ত্তায়—তার কোন ত্রুটি নেই; কিন্তু ভিতরে যে কি ভয়ানক—তা আমাদের দেশের লোকে সহজে ভেবে নিতে পারে না।

জানি নে খাঁটি ইংরেজের কি; কিন্তু এই দো-আঁশলার লালসায় বহ্নির বোধ করি নরকের অগ্নি-কুণ্ডের চেয়েও প্রখর-তাপ।..বাড়াতে একটিও মেয়ে-চাকর নেই দেখচ?

আমি মাথা নীচু ক'রে রইলাম।

লোকটা জীবনে অনেক কুকাজ ক'রেছে, সেইগুলোকে ভুলে থাকে নিত্য মদ খেয়ে। মদ বন্ধ ক'রে দিলে—পাড়া প্রতিবেশীরা টিঁক্‌তে পারবে না, কিরণ। অল্প খেলে আরো উত্তেজনা বেড়ে যায়—তাই তাকে আমি হাতে ক'রে বেশী দিয়ে, অচেতন ক'রে দি। সেটাও সে বোঝে!—আর তার জন্যে কি রাগ আমার উপর!

বুঝলাম, ইলার হৃদয়খানা দুঃখে দুঃখে শতধা হ'য়ে গেছে—তা থেকে যে রস নিঃসৃত হচ্চে—তা এখনো ঘোলা;—দিন গেলে হয় ত' থিতিয়ে অমৃতের মত নির্ম্মল হয়ে উঠবে।

তাহ'লে ইলা, তুমি বল্‌চো—মদ ও ছাড়বে না, তা ছাড়িয়ে কাজও নেই?

আর আমি কিছুই ব'লতে চাই নে। তোমাকে অবস্থা বুঝিয়ে দিলাম—ব্যবস্থা যা হয় কর।

কথার উত্তর দিলাম না।

চুপ ক'রে রইলে যে বড় ?

আমাকে কিছু সময় দিতে হবে—এত গুরুতর কথায় এত শীঘ্র কিছু মতামত দেওয়া যায় না।

বেশ, তাহলে তুমি ভেবে-চিন্তে যা স্থির ক'রবে তাই হবে।

ক্রমে চাঁদ উঠলো। দূরে দেখা গেল নীলিমা আর সায়েব আস্‌চে।

ইলা বল্লে, আজ এখুনি বাড়ী ফিরতে হবে; নইলে ও একলা বাড়ী ফিরে কি একটা কাণ্ড ঘটাবে।

কি করবে ?

মদ খেয়ে কার বাড়ীতেই হয় ত ঢুকে পড়বে।

মদ খাবে ?

নিশ্চয়। এখনো পায় নি—এটাই ভারি আশ্চর্য্য!

জিঠানি টল্‌তে টল্‌তে এসে বল্লে, হিলা, আমার ঘুম পাচ্চে।

চল; বলে ইলা জিঠানিকে সঙ্গে করে'—বাড়ী চলে গেল।

নীলিমা বেঞ্চের উপর বসে প'ড়ে বল্লে, খুব শাস্তি হলো আজ—

কি হয়েচে ?

কোত্থেকে মদ খেয়ে এসে— সে আর বল্‌তে পার্‌লে না।

নীলিমা, এ আমারই বুদ্ধির দোষে ঘটেচে—অপরাধ আমারই—

তোমারই ত—তাই আজ আমি একটুও সায়েবের উপর রাগ করি নি। তারপর বল্‌বে, আমায় ক্ষমা কর। ক্ষমা আমি তোমাকে কিছুতেই করব না আজ!

বল্লাম, ক্ষমা চাইবার সাহস যে আমার নেই—আর ক্ষমা পাওয়াও উচিত নয়।

নীলিমা আমার বাঁ হাতখানা টেনে নিয়ে বল্লে, আজ তোমার দণ্ড হলো এই বন্ধন, বলে একটা রিষ্ট-ওয়াচ হাতে বেঁধে দিলে।

একি!

জান না?

এ কেন?

ঐ উপহার সে আজ আমাকে দিয়েছে। ও আমি কিছুতেই নেব না।

সায়েবের কাছ থেকে নিলে কেন?

তোমারই উপর রাগ ক'রে।

এটা তোমার ফিরে দিতে হবে।

তা আমি পারবো না।

তবে তোমার কাছেই রাখ।

দাও, ওর যথা-স্থানে ওকে পাঠিয়ে দি।

ঘড়িটাকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিতে তার কোন দ্বিধা-বাধা ছিল না—এ আমি যেন বেশ জানতুম। তাই সেটা আর ফিরিয়ে দিলাম না।

দাও।

না থাক্—এটা কিছুদিনের জন্য আমার কাছেই থাক্।

নীলিমা বল্লে, থাকতে পারে, যদি একটা সর্ত্তে তুমি রাজি হও।

বল্লুম, জানি সে কি সর্ত্ত।

বল ত?

এটা আমাকে নিত্য ব্যবহার করতে হবে।

ঠিক। তাই যদি কর ত, রাখ; নইলে, দিয়ে দাও বল্‌চি—আমার জিনিষ।

আমি খানিকটা ভেবে বল্লুম—আচ্ছা এ শাস্তি, আমি মাথায় করে নিলুম।

ঘড়িতে দেখলুম—রাত সাড়ে নটা হয়েছে।

নীলিমা, এখন যাবো।

আরো আধ ঘণ্টা।

হুকুম?

না' ত কি?

আধ ঘণ্টা যেন দু-মিনিটে কেটে গেল।

নীলিমা বল্লে, আচ্ছা একটা কথা আমাকে বুঝিয়ে দেবে?

কি?

যাকে ভাল লাগে, তাকে কাছে পাবার এত ইচ্ছা হয় কেন?

আমি হাসতে লাগলুম, মনে করেছিলুম না জানি কি কথা;—এই? এর ত' উত্তর প'ড়েই আছে!

তবুও।

ভাল লাগে ব'লে।

ঠিক হলো না।

কি ভুল হলো?

হয় ত' ভুল একটুও হয় নি। আমার মন ওতে তুষ্ট হয় না।

বল্লুম, তাহ'লে হয় ত তুমি ঠিক কি জানতে চাচ্চ— আমি বুঝতে পরি নি।

আচ্ছা আরো পরিষ্কার ক'রে বলি তাহ'লে।

বল।

জিঠানি বলে, সে আমাকে ভালবাসে; তাই সে আমার কাছে সব সময়ে থাকতে চায়। আমি তাকে বল্লুম, তুমি আমাকে যে ভালবেসেচ—তা আমার মত না নিয়ে, অতএব, তোমাকে যে পাল্টা ভালবাসতেই হবে—এমন প্রত্যাশা না করাই তোমার উচিত।

সে কি বল্লে?

বল্লে, প্রত্যাশা করলে ক্ষতি কি?—মানুষের প্রত্যাশাগুলো প্রায়ই অপূর্ণ থাকে।

এ ত বেশ মানুষের মতই উত্তর।

নীলিমা হেসে বল্লে, সায়েব লোক ত মন্দ নয়।

তারপর?

বল্লুম, সায়েব, মানুষ মানুষকে ত বেশ জেনে শুনেই ভালবাসে?

তা কি সব সময়ে ঠিক?

মনে কর, তুমি আমাকে যখন ভালবেসেচ—তখন আমার কিছু-না কিছু জেনেচ ত।

তা ত জেনেছি।

তোমার মনের আমি, আর সত্যিকারের বাইরের আমি ত এক না হ'তেও পারে?

ঠিক কথা।

সত্যিকার আমির চেয়ে, তোমার আদর্শ আমি হয় ত—ঢের বেশী ভাল হ'তে পারে?

সায়েব বল্লে, তা নাও হ'তে পারে।

তুমি আমাকে কল্পনায় যত বড় যত ভাল মনে করচো—বাস্তবিক আমি কি তাই? কল্পনার মানুষ, আদর্শ-মানুষ কি বাস্তবিক মানুষের চেয়ে বড় হয় না?

আচ্ছা স্বীকার ক'রে নিলাম, তাই।

তবে এই দাঁড়াল যে, তোমার মনে যে, আমি আছি—বাস্তবিক আমার চেয়ে সেই ত' তোমার বেশী মনের মত?

সাহেব বল্লে, হুঁ।

তবে—যে নীলিমাকে তুমি ভালবাস সে ত' তোমার কাছেই আছে, তোমার মনের মধ্যেই আছে। তবে আর একজনকে—যে তোমার ঠিক মনের মত হয় ত নাও হ'তে পারে, যাকে কাছে পাওয়া শক্ত, যে তোমার কাছে আসতে হয় ত' ভয় পায়,—তাকে কেন কাছে চাও?

সাহেব বল্লে, তা জানি নে—কিন্তু তোমাকেই আমি চাই।

বল্লুম, বেশ, আমি তোমার না হয় হলুম, তা'হ'লে ইলাদিদির কি দশা হবে?

ইলা ডাক্তারকে বিয়ে করুক।

তাতে তারা রাজি হবে কেন?

আমি বলচি—তারা রাজি। অন্ততঃ আমি জানি ইলা ডাক্তারকেই ভালবাসে।

তুমি এটা নিশ্চয় জানো?

আমার এই বিশ্বাস।

তোমার বিশ্বাস? সাহেব, তোমার বিশ্বাসগুলো কি সব সত্যি হয়?

অনেক সময়েই তা হয় না কিন্তু—

তবে?

সে রাগ ক'রে বল্লে, তুমি সয়তানের মত বুদ্ধি ধর।

বল্লুম, আমি সয়তান তা জান না?

তুমি আমার উপাস্য দেবতা, বলে সে আমাকে ধরতে এলো—আমি এক ছুটে পালিয়ে চ'লে এলাম।

ঘড়িটা কখন দিলে?

সেটা যেতে যেতেই দিয়েছিল। ওটার জোরেই ত অত কথা মুখ দিয়ে ফুটলো।

মদ খেলে কোথায়?

মদের বোতল ওর লাঠিটার মধ্যে ছিল।

আমি হাসতে লাগলুম—কি যে বল তুমি নীলিমা।

বেশ আমাকে বিশ্বাস করতে তোমাকে কে বলচে শুনি?

আচ্ছা বিশ্বাস করলুম।

না—আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

কি প্রশ্ন?

কেন কাছে চাই? কেন কেবল-কেবল দেখতে ইচ্ছা করে? কেন অনেকক্ষণ না দেখলে মন কেমন-কেমন করে—কেন এত কান্না পায়?

বল্লুম, এতগুলো 'কেন'র উত্তর দেওয়া ত' আমার পক্ষে একদম অসম্ভব নীলু,—এরা প্রেম-সমুদ্রের এক-একটি ঢেউ, এদের নিয়ে বেশী কিছু করতে গেলে—জান ত' আমার হাত-পা ভেঙ্গে যাবে—শেষকালে তোমাকেই মেরামত করতে হবে।...কিন্তু আমি এই সমুদ্র-সমস্যার সমাধানও করতে পারি।

কি করে?

ইলাকে পত্নীত্বে বরণ ক'রে।

ও ব'লে তুমি আমাকে ভোলাতে পারবে না;—ইলা-দি তোমায় ভালবাসে জানি; কিন্তু—

কিন্তু কি?—আমিও তাকে ভালবাসি নীলমণি।

তবে শুভস্য শীঘ্রং।

তাহলে, তুমি কচ্চ সাহেবকে বিয়ে—আর আমি কচ্চি—ইলাকে।

নীলিমা বল্লে, এক গোণকার আমার হাত দেখে ব'লেচে যে,আমার দুটো বিয়ে—দ্বিতীয় বিয়ে ক'রতে বেশী দেরী লাগবে না, নিশ্চয়।

নীলিমা—

কি?

এই দেখো—এগারোটা...

যাও না...

আমি স্তব্ধ হ'য়ে তার পাশে ব'সে রইলুম।

(৪)

যাত্রীর ভিড় ক'মে যাওয়ার পর আমাদের ক্যাম্পও ধীরেধীরে উঠতে লাগলো।

আমিও বদলির চিঠির অপেক্ষায় রইলুম।

কিন্তু বদলির চিঠি না এসে—এলো যে, আমাকে সহকারী ডাক্তার হ'য়ে পুরীর হাসপাতালেই থাকতে হবে।

এ খবর শুনে মাসী-মা বল্লেন, কিরণ, মানুষের প্রার্থনা ব্যর্থ হয় না, বাবা! আমি যে কি মনে তাঁকে ডেকেছিলুম।

নীলিমা আমাকে চুপি চুপি বল্লে, আমি জানতুম যে, তোমার কিছুতেই যাওয়া হবে না।

ইলা বোধ করি মনে মনে বল্লে, বেল পাকলে কাকের কি? জিঠানি নির্ব্বাক কটাক্ষে আমার হাতের রিষ্ট-ওয়াচটা দেখে নিলে।

দায়িত্বহীন গায়ে হাওয়া লাগার চাক্‌রি। মেঘ-রোদের আলো-ছায়ার মধ্যে নিদ্রালস দিনগুলো অতি মন্থর গতিতে কাটতে লাগ্‌লো। বিকেলে সমুদ্র-তীরের বৈঠক, দিনের পর দিন—ক্রমেই চিত্তাকর্ষক হ'য়ে দাঁড়ালো। ইলার গান, জিঠানির মদের সফেন বাচালতা আর নীলমণির বাহুযুগলের সেবা-কৌশল—নিত্য নিজের কাজ ক'রে আমাদের যে জীবনের কোন্ তীরে উত্তীর্ণ করতে চল্লো—তার কোন চিন্তাই যেন রইল না।

হঠাৎ একদিন বিস্তৃত রাজপথের উপর চম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে দেখ্‌লাম যে, একটি ট্যাঁস আমার দিকে সবেগে ধাবিত হচ্চে—আর তীব্র গলায় চীৎকার ক'রে বলচে—হ্যালো কিরণ, গুড্ মর্ণিং!

সজোরে করমর্দ্দন ক'রে, সে বল্লে, হা-ডু-ডু।

আমি চিনেও যেন কিছুতেই আর চিনে উঠতে পারি নে।

বদন!

হাঁ গো, হাঁ।

তুমি! এ যে নটবর বেশ!

সায়েবের বাড়ীতে এসে উঠচি যে!

কে সায়েব?

আঃ একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়'লে, ঐ যে—মিষ্টার ঝিট্টানি—না চিট্টানি—কি যে মাথা-মুণ্ডু নাম—কিছুতেই আমার মনে থাকে না; বলে—পকেট থেকে এক টুক্‌রা কাগজ বার ক'রে বল্লে, ঠিক্ ঠিক্—জিঠানি।

কাগজের উপর হাবুদত্তের হাতের লেখা।

হঠাৎ যে?

হঠাৎ আর কি,—ইলা ত বরাবরই চায় যে, আমি তার কাছেই থাকি;—সময় করে উঠতে পারি নে।

কি ক'রে সময় এবার করলে?

ও: সে অনেক কথ।

বটে! তবুও—সংক্ষেপে?

বদনচন্দ্রের হঠাৎ পুরীতে উদয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে এই বুঝলুম্ যে, সে এখন দত্ত-সায়েবের এক-গ্লাসের ইয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি কিঞ্চিৎ অর্থের খাঁকৃতি হওয়াতে—দত্ত-সায়েবের প্ররোচনায় সে ইঙ্গ-বেশে ইলার কাছে উপস্থিত।

দত্ত-সায়েব নিজে না এসে যে বড় তোমাকে পাঠালেন?

বদন গম্ভীর ভাবে বল্লে, দত্ত-সায়েবের কি একটা যে-সে ব্রেন? তুমি তার বোঝ কি কিরণ?

সত্যই, ওটা বোঝবার আর চেষ্টা করি নি কোন দিন।

তারপর চলেছ কোথায়?

সহরটা দেখে শুনে নিতে চাই।

ক'দিন আছ?

খোদা জানে।

তবুও?

কার্য্যসিদ্ধি হ'লেই চল্‌তি।

বেশ, আবার দেখা হবে বোধ করি?

বদন কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে ফিরে এসে বল্লে, সায়েব বেটা লোক কেমন? কিছু সুবিধে-টুবিধে হবে?—কি বল?

হবে বৈ কি?

বদন খুসী হ'য়ে বল্লে, শুনেছি ইলার একেবারে কব্জির মধ্যে—না?

বল্লুম, নিশ্চয়।

বদন খুসী হয়ে শিশ্ দিতে দিতে চ'লে গেল।

সান্ধ্য-বৈঠকে দেখা গেল বদন, জিঠানির একান্ত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। সে মদের মুখে ইংরিজির আদ্য-শ্রাদ্ধ সুরু করে দিয়েছিল। বাবুদের মুখে ভুল ইংরিজি শুনে অনেক সায়েব খুসী হয়। বাঙ্গালীর ওটা যেন একটা অক্ষমতার অমোঘ পরিচয়!

নীলিমা একটু বিস্মিত হয়েছিল—সে আমায় চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা সায়েব, রাগ না করে—বেশ আমোদ পাচ্ছে ত?

রাগ করতে যাবে কেন?

কেন? কি ব'লচো তুমি? উঃ ইংরিজি ভুল হলে—আমাদের রাজকুমারী-দিদি কি রাগই না করতেন! তাঁর বকুনিতে আমাদের পিলে-লিবারে যেন ঠোকাঠুকি খেয়ে যেত! তিনি ত বাঙ্গালী, তাতেই এত রাগ, আর এ যে সাহেব, এর ত' সত্যিকার রাগ হবার কথাই।

আমি হাসলুম, নীলমণি, সাহেব যখন বাংলা ভুল করে তখন তোমার রাগ হয়?

না, হাসি পায়, আমোদ পাই।

তবে?

কি একটা, ব'লতে গিয়ে সে থেমে গিয়ে বল্লে, উঃ—আমি কি বোকা!

বল্লুম, ঐ বোধই জ্ঞানের উন্মেষের পরিচায়ক, সক্রেটিস্ একদিন অকপটে নিজেকে বোকা ব'লে স্বীকার করেছিলেন।

কিন্তু আমি যে কি ব'লতে যাচ্ছিলুম—তা' যদি তুমি জান্‌তে তাহলে অত বড় লোকটির কথা উল্লেখ ক'রতে না।

বল্লুম, জানি, তুমি কি ব'লতে।

প্রতিজ্ঞা, তুমি জান না।

প্রতিজ্ঞা! কিসের প্রতিজ্ঞা?

নীলিমা খুব হাস্‌তে লাগ্‌লো, তুমি বুঝবে না ও-কথা—ও আমাদের একটা মজার কথা।

বল্লুম, যদি বল্‌তে পারি—কি পাবো?

কথ্‌খোনো পারবে না।

আগে বল কি হারবে?

সে আমি বল্‌তে পারবো না।

নীলিমার সমস্ত মুখ একটা সলজ্জ সৌন্দর্য্যের সম্ভ্রম-লালিত্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌লো—যা বুঝে নিতে আমার একটুও দেরি হলো না।

আমার ওষ্ঠাধরে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখে সে রাগ করে বল্লে, যাও তুমি বড় দুষ্টু হচ্ছো—তোমাকে কিছু দিতে চাই না।

রসভঙ্গ ক'রে ইলা চেঁচিয়ে বল্লে, নীলি, শুনে যা।

আমাদের কিন্তু ঐ হট্ট-গোলের মধ্যে যেতে ইচ্ছা করছিল না। নীলিমা ধীরে ধীরে ইলার দিকে অগ্রসর হতে লাগ্‌লো—আমিও সেই সঙ্গে চল্লুম।

কি ইলা-দি ?

ইলা বল্লে, একটা কথা শুনেচিস্ ত'—যে কান টান্‌লে মাথা আসে ?

শুনেচি ত' ?

টেনে দেখেছিস্ ?

কই না।

আমি দেখলুম, সত্যিই আসে।

কৈ, কার কান টান্‌লে ? সায়েবের ?

কি ন্যাকা মেয়ে আমার—তুই কান, তোকে টান্‌লুম—কে তোর সঙ্গে এলো ?

সে ফিরে আমার মুখের দিকে চেয়ে এক ছুটে পালিয়ে যেতে যেতে বল্লে,—তুমি ভারি দুষ্ট হয়েচ।

ইলা হেসে বল্লে,—ওর একটু মাথাটা খারাপ।

বল্লুম, পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রেখে বুঝলে—এই বোঝা যায় যে, তুমি আর কারুর উপর কটাক্ষ করচো, যেহেতু ইতি পূর্ব্বেই নীলিমাকে কান বলেছ এবং আর একজনের সংজ্ঞা দিয়েছ—মাথা।

তুমি কি জ্যামিতির প্রতিপাদ্য প্রমাণ করচ, কিরণ ?

একটা কিছু করা ত চাই।

তা বটে—দেখ না, ঐ দুটো বাঁদরে কি ঢলা-ঢলিই করচে ; আজ নিকোর ফূর্ত্তির অবধি নেই . . . ব'স না কিরণ, আমার পাশে বসলে, মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

আমি কি তাই ব'লেছি ?

বাঃ! এই সুন্দর রিষ্ট ওয়াচটি কবে কিন্‌লে ?

কিনি নি।

তবে ?

পাওয়া।

কে দিয়েছে ? নীলু বুঝি ?

হুঁ।

সহসা ইলার মুখ অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে গেল।

খানিক কথা না ক'য়ে কাটলো।

আমার এ কি, বলতে পারো ?

কি ?

অন্য লোক হ'লে বলতে পারতুম না,—তোমাকে ব'লেই বলচি, নীলুর এই আতিশয্য আমার একটুও ভাল লাগে না। . . . যার সঙ্গে দেখা হবে তার সঙ্গেই সে যেন ঘরকন্না পাতিয়ে বসে! হাজার হোক মেয়েমানুষ ত'—অত নেটি-পেটি হবার দরকার কি ?

ইলা এমন গম্ভীর ভাবে এই কথাগুলো ব'লে গেল যে, মনে হয় যেন সে নীলিমার বহুদিনের অভিভাবক।

ও আমার কিন্তু ভাল লাগে না। নিজের ব্যক্তিত্ব, বিশেষত্ব, সব হারিয়ে ফেলে, অন্যের জুতোর সুক্‌তলা হয়ে যাওয়া। . . . শেষকালে অনেক দুঃখ পেতে হবে জীবনে।

হঠাৎ সে ঝাঁজিয়ে উঠে বল্লে, কথা কইচ না যে বড় ?

তুমি ত কইচ! দুজনে এক সঙ্গে কথা কইলে শুনে কে ?

সে আরো রাগ করলে ; ছাই একটা উত্তরও কি দিতে নেই ?

রামের সঙ্গে সুগ্রীব এসে জোটাতে, ইলার বোধ করি মানসিক উত্তেজনার কারণ হয়েছিল। তার উপর রিষ্ট-ওয়াচ ; আর নীলিমার সকলের সঙ্গে সহজ-সখ্য।

এ যেন সেই পাহাড়ের চূড়া, উনত্রিশ হাজার দু-ফিট্ উঁচু থেকে নদীর উপর অভিমান করচে। অহঙ্কারের তুঙ্গ-শৃঙ্গে ব'সে—কি বুঝবে তুমি, হৃদয়-গলা প্রেমে-চলা নির্ঝরিণীর পাদমূলের লীলা-খেলা!

আর একটা ধমক খাবার ভয়েই, আমি ধাঁ করে ব'লে বসলুম, বোধ করি, যেদিক দিয়ে যেমন ক'রেই যাই নে কেন, কোথাও না কোথাও দুঃখের সঙ্গে দেখা হবেই হবে।

এ কথা তোমার বলা সাজে না কিরণ, তোমায় আজ ক' বছর ধরে দেখচি। তোমাকে এমন কোন কাজ করতে দেখলুম না যে, তুমি তাতে দুঃখ পাও। সেদিনের সন্ধ্যা বেলায় হরিলাল বাবু যে কথাগুলি ব'লছিলেন—তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে!—চলার ছন্দে তোমার এমন সংযত সুন্দর যে কোথাও তুমি অচল হয়ে যাও না।

ইলা, নিশ্চয় তুমি আমাকে খুব স্নেহ কর,—তাই—

হঠাৎ ইলা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে উঠে বল্লে, আমি আশী বছরের বুড়ী

কি না, তাই কচি খোকাকে স্নেহ করি! উঃ কি অপমান করতে জান তুমি মানুষকে!

আমি যেন বজ্রাহতের মত আড়ষ্ট হ'য়ে বসে রইলাম—আর পাশে ব'সে ফোঁস ফোঁস ক'রে ইলা কাঁদতে লাগলো।

কি জানি কেন, ইলাকে সেদিন আমার একটা রহস্যের মত ঠেক্‌ছিল। কি গুরু ব্যথায় তার হৃদয়টা নিপীড়িত হচ্ছিল, তা ভগবানই জানেন! তাকে সান্ত্বনা দিলে ক্ষিপ্ত হয়,—আবার দূরে সরে গেলে রোষে প্রদীপ্ত হয়ে উঠে! সে কি চায়—কাকে চায়,—কিছুরই জানার ধৈর্য্য তার নেই আবার আর এক দিকে এই অশান্ত অধৈর্য্যের জন্য অসীম দুঃখ।

খানিক কেঁদে সে যেন একটু শান্ত হ'য়ে বল্লে, কিরণ, আত্ম-হত্যা করলে কি মানুষ সত্যি সত্যি অনন্ত নরক ভোগ করে?

করে বলেই ত জানি।

তুমি বিশ্বাস কর?

করি।

আহা! তোমার মত আমারও যদি একটু ভক্তি বিশ্বাস থাক্‌তো!

কি বল্‌চো ইলা?

কাকে বিশ্বাস করি, কাকে ভক্তি করবো?

ভগবানকে।

তিনি কি আছেন?

নেই?

কই, আমি ত' এত ডাকি, পাই নে, দেখা ত দেন না।

দেবেন, ইলা—একদিন তিনি—তোমার কাছে নিজেকে মুক্ত করে দেবেন।

ও কথার এক তিলও বিশ্বাস করি না।

তুমি নিজে যে আছ, বিশ্বাস কর কি?

করি।

তোমার ভিতরে একটা শক্তি কাজ করছে তা কি বুঝতে পার না?

পারি বৈকি—যা একান্তই প্রত্যক্ষ তাকে অস্বীকার করি কেমন করে?

মেঘের মধ্যে যে বিদ্যুৎ আছে, যে বজ্রশিখা আমাদের চোখের সামনে প্রদীপ্ত হয়ে উঠে—তাকেও মান?

তাও মানি, কিরণ।

তোমার মধ্যে নিহিত শক্তি কি ঐ বিদ্যুতের শক্তির চেয়ে অনেক ছোট নয়?

নিশ্চয়।

এমনি করে যদি ক্রমেই এগিয়ে যেতে থাকি,—যে শক্তি সূর্য্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রেখেচে, যাঁর ইচ্ছা-শক্তিতে গ্রহ তারা,—অনন্ত ব্যোমের মধ্যে নিত্য নিরত গতিমান্—সেই শক্তিকে যদি ঐশ শক্তি বলি তাতে তোমার কি আপত্তি, ইলা?

আপত্তি কিছু থাকে না, কিরণ, যদি একবার তাকে দেখ্‌তে পাই।

আমি হাস্‌তে লাগলেম; তোমার হাতের মধ্যে একটা টাকা অনায়াসে থাকে, ইলা, কিন্তু সেটা হাজার গুণ হ'লে—আর ত হাতের মধ্যে ধ'রে রাখা যায় না!

তোমায় ঠিক ক'রে বল্‌তে পারি নে কেন, কিন্তু এ রকম যুক্তির মধ্যে কোথায় যেন একটু ফাঁকি আছে—আমার মনে হয়।

ভগবান ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নন, ইলা।

তাই যদি সত্য, তবে ছাই ইন্দ্রিয়গুলো না থাকলেই ত পারত।

আমাদের জানার শক্তি সসীম, ক্ষুদ্র; কিন্তু তিনি জ্ঞানমনন্তম্। তাঁকে জানার শেষ নেই, নিত্যনতুন ক'রে জান্‌চি, জান্‌তে হবে—তা থেকে তোমার আমার নিষ্কৃতি কোথায়?

জান্‌চি, এ হয় ত সত্য; কিন্তু তাঁকেই যে তাই দিয়ে জানা হয়—কেমন করে বুঝব?

কোন জ্ঞানই ত ব্যর্থ নয় ইলা, এক জানা' তার চেয়ে বৃহত্তর জানার পথে আমাদের নিয়ে যায়, এমনি করে জ্ঞান অনন্তের পথে নিত্য ধাবিত হচ্চে—অনন্ত জ্ঞানই তিনি!

ও আমার ধারণার মধ্যে আসে না! সবাইকেই অম্‌নি করে' বল্‌তে শুনি। ও আমাদের শেখা কথা। স্বোপার্জ্জিত উপলব্ধি নয়!

তা বোধ করি বেশি পরিমাণে ঠিক, ইলা।

ইলা বল্লে, অন্যের অবধারিত ঈশ্বরের ধারণা নিয়ে আমার কি লাভ?

অন্যের দৃষ্টান্তে যা লাভ হয়।

ইলা মাথা নেড়ে বল্লে, না, অনেক সময় ক্ষতি হয় বলে আমার মনে হয়

তাই বটে। ধর, একজন বল্লেন, ঈশ্বর পরম করুণাময়! আমার অভিজ্ঞতায় কিন্তু ভগবানের করুণার চেয়ে অকরুণার ভাগই বেশী ;—কেমন করে আমি তাঁর গোড়ে গোড় দিয়ে বলি যে, তিনি করুণাময়? আমার কাছে যে সত্য এসে পৌছল—তাই ত আমার নিজস্ব ;—তা-থেকে আমাকে বল্‌তে হয়, ঈশ্বর নির্দ্দয়।...

ছিঃ ইলা, ও কথা বল্‌তে নেই।

কিরণ, তুমিও সাধারণ মানুষের মত এই কথা শুনে অসহ হয়ে উঠবে? ঈশ্বরকে যদি নির্দ্দয় বলেই বুঝে থাকি—তাই যদি বলি ত' অপরাধ হবে? ঈশ্বর কি কপটতার প্রশ্রয় দেন? তিনিও কি মানুষ?

মানুষের অনুভূতি দিয়েই তাঁকে বুঝতে হয় ইলা।

খুব সত্যি কথা—ঈশ্বরের মানুষের মত অনুভূতি—মানুষের মতই তিনি অপূর্ণ.. আচ্ছা কিরণ, বল ত—কেন বিশ্ব সংসার সৃষ্টি করলেন তিনি?

লীলার জন্য! আনন্দ এর উৎপত্তির মূলে, আনন্দে এর অবসান! কোন কিছুর উদ্দেশ্য-সাধনের প্রয়োজনের সঙ্গে সৃষ্টির যোগ নেই।

ও আমি বিশ্বাস করি নে।

কেন?

জানি নে।

স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ কাটলো।

সত্যিকার ঈশ্বর আছেন কি নেই, তা জানি নে কিরণ; কেউ জানতে পারে—তাও বিশ্বাস হয় না। লীলা, আনন্দ—ও সব যুক্তি-তর্ক কেবল পাশ কাটাবার কথা।

ইলার কি গাম্ভীর্য্য!

সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে হয় ত পূর্ণতার পথে, অনন্তের পথে তিনি আমাদের সহযাত্রী; কিন্তু তাতে তোমার আমার কি?

কিন্তু তবুও সমস্ত মন দিয়ে মানতে ইচ্ছা করে একজনকে—তাঁকে জানার সাধ বুঝি বা জীবনের কেবল-মাত্র বাসনা!

ইলা অনর্গল বলে যেতে লাগলো:—

তখন ফিরে জিজ্ঞাসা করি, কেন?

এই 'কেন'র বড় বিচিত্র উত্তর পাই।

কি সে ?

নিজের দেহ-মনের ভারে—একান্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে—যখন আর পেরে উঠি নে—তখন চিত্তের এক নিগূঢ়তম প্রদেশ থেকে করুণ মিনতি উচ্ছ্বসিত হয়ে—বার বার বলে—কোথায় আমার নির্ভর, ওগো কোথায় আমার আশ্রয় ! উঃ মানুষ কি অসহায় ! তখন মহাব্যোমের শূন্যতা যেন গম্ভীর রোলে পূর্ণ হয়ে উঠে;—আলো জলের উপর ঝিক্ ঝিক্ ক'রে কাঁপতে থাকে,—বাতাসে গাছের পাতা গুলোকে যেন জড়িয়ে ধরতে চায়। বুকভরা ব্যথা—দীর্ঘ নিশ্বাসের ভিতর দিয়ে হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে যায় ;—তখন মুখ থেকে আপনি বার হয়ে পড়ে, ভগবান !

অবাক হয়ে ব'সে রইলুম। দূরে সমুদ্রের মৃদু গর্জ্জন যেন এই কথাই বার বার ক'রে অবিরত ব'লে কিছুতেই তৃপ্ত হ'তে পারচে না ! পায়ের তলায় পৃথিবী এরি তন্ময়তায় হতচৈতন্য !

সংসারের আর সকল কথাই যেন সেদিন ঐ দুটো মাতালের অসঙ্গত প্রলাপের মত একান্ত অকিঞ্চিৎকর ঠেকলো !

—ক্রমশ

ডাকঘর

এই সংখ্যায় কল্লোলের তৃতীয় বর্ষ শেষ হোল। বৈশাখে চতুর্থ বর্ষ আরম্ভ হবে। যাঁরা কল্লোলের পুরাতন গ্রাহক তাঁদের কাছে বিশেষ একটা নিবেদন আছে। আমরা আশা করি তাঁরা সকলেই চতুর্থ বর্ষের জন্যও কল্লোলের গ্রাহক থাকবেন ; যাঁরা নিতান্ত গ্রাহক থাকতে না চা'ন তাঁদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ, তাঁরা যেন আগামী বৎসরেও কল্লোলের গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত থাকেন। সাহিত্যের প্রচারে সকলেরই সাহায্য ও সহানুভূতি প্রয়োজন। কল্লোল লাভের ব্যবসা করতে বসে নি, একথা আমাদের পাঠকবর্গ জানেন। আমরা এই কাগজখানিকে রক্ষা করতে ও তার উন্নতিকল্পে যে পরিশ্রম ও ক্ষতি স্বীকার করি তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পাঠকদেরও একে সার্থক করে তোলার

চেষ্টার প্রয়োজন। এত অল্প দিনেই কল্লোল বাংলাদেশে ও বাংলার বাহিরে মাসিক পত্রের ভিতর একটা খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। মানুষ কল্লোলকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখছে, তাই তার অতি ক্ষুদ্র ত্রুটিতেও মানুষ মনে মনে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করে এ কথা আমরা জানি। কল্লোলের যাঁরা পাঠক তাঁদের সঙ্গে আমাদের একটা অত্যন্ত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। যাঁরা নিজেদের কল্লোলের আত্মীয় মনে করেন, তাঁরা সময়ে সময়ে কল্লোল সম্বন্ধে তাঁদের মতামত পত্র দ্বারা জানিয়ে থাকেন। আমরা সে গুলি অত্যন্ত আদরের সঙ্গে গ্রহণ করি এবং সাধ্যমত, যদি ত্রুটি থাকে তার সংশোধন করতে চেষ্টা করে এসেছি। কল্লোলের পাঠক, লেখক ও সেবকদের ভিতর এই যে প্রীতির নিগূঢ় সম্বন্ধ এ একেবারে নূতন। এ পরিচয় দেশ হ'তে দেশান্তরে সমগ্র মানবতার মধ্যে সহানুভূতির পাখায় চ'ড়ে ব্যপ্ত হয়ে পড়ুক এ আমাদের কামনা।

ঝড়ে ঝঞ্ঝায় কল্লোলের যে ক্ষতি করেছে তাকে স্বীকার করেই অগ্রসর হয়ে চলেছি, মৃত্যু তার যে সম্পদ হরণ করেছে, তাও স'য়ে নিয়ে সম্মুখের দিকে চেয়েই চলি; নিন্দা, অপবাদ, হিংসা যেটুকু শক্তি হানি করেছে তাও বিনা আপত্তিতে যুদ্ধের ক্ষতচিহ্নের মত অগ্রাহ্য করেই কল্লোলের প্রতি মুহূর্ত্তের যাত্রাকে আনন্দময় ক'রে তুলতে চেষ্টা করেছি; কল্লোলের এই বিক্ষুব্ধ উর্ম্মি-রাশি অনন্ত প্রসারতার মধ্যে একদিন উপনীত হবে, সে দিন তার চিন্তা আরও সরস হবে, তার শক্তি অসীম হবে, তার চাঞ্চল্য গভীরতার গুণে স্তব্ধ হবে এই আশা করি।

কল্লোলের আরম্ভ থেকেই আমরা কোনও ছবি দেওয়ার পক্ষপাতি ছিলাম না। তাই তার প্রথম সংখ্যাই বিনা ছবিতে প্রকাশ করি। বাজারের অনেক কাগজের মত রঙ্গীন বিকৃত কতকগুলি ছবি দিলে হয় ত কল্লোল বিক্রয়ের দিক্ দিয়ে খুব সুবিধা হোত কিন্তু সে প্রলোভন আমরা এতকাল ধরে এড়িয়ে চলতে পেরেছি। আমাদের মনে হয়, ও ধরণের ছবি না থাকাতে চিত্র-শিল্পের কোনই ক্ষতি হয় নি, আমাদের পাঠকদেরও হয় নি। কারণ আমরা জানি, কল্লোলের যাঁরা পাঠক তাঁরা এই ধারণা ও মননের উপরে বলেই তাঁরা কল্লোলের পাঠক। তৃতীয় বৎসরে ছবি দিতে আরম্ভ করি। মনে হোল যাঁদের চেহারা দেখলে, যাঁদের বিষয় জানলে সাহিত্যের ও সাহিত্যানুরাগীদের কল্যাণ হবে তাঁদের ছবিই দেব। সেই থেকেই দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল প্রসিদ্ধ সাহিত্য-

সাধকদের আলেখ্য ও আলোচনা কল্লোলের প্রতি সংখ্যায় আমরা দিতে চেষ্টা করেছি। এটাও কল্লোলের একটা সুস্পষ্ট বিশেষত্ব।

কল্লোলে প্রাচীন, নবীন, কিশোর যে কেউ লেখা পাঠিয়েছেন, প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হ'লে আমরা খ্যাতি অখ্যাতির দিকে না চেয়ে তাদের অনেকের লেখাই প্রকাশ করেছি। প্রসিদ্ধ লেখকের লেখাও যদি ভাল না হয় কল্লোলে তা' ছাপা হয় না। অনেক দিন ধ'রে লেখারই দরুণ তাঁদের সব লেখাই প্রকাশযোগ্য হয় এমন লেখক বাংলা দেশে মাত্র দুই একটি থাকা সম্ভব। নূতন লেখক হ'লেও তাঁর রচনার ভিতরে যদি প্রকাশ কুশলতা ও বক্তব্য কিছু থাকার সম্ভাবনাও থাকে, তা' অনেকবার কল্লোলে ছাপা হয়েছে। তাই অনেক অখ্যাত তরুণ লেখক কল্লোলের ভিতর দিয়ে তাঁদের নিজ শক্তিকে বরেণ্য করতে পেরেছেন। এটা কল্লোলের সকলেরই গৌরবের কথা।

প্রথম থেকেই কল্লোল কোনও অন্য মাসিক পত্রিকার অনুকরণ করবে না এই তার সঙ্কল্প ছিল। সে সঙ্কল্প তার রক্ষা হয়েছে। অনুকরণ করে অনেকগুলি পত্রিকা থাকা, একই পত্রিকার duplication মাত্র। প্রত্যেক পত্রিকারই একটা ক'রে বিশেষত্ব থাকা বাঞ্ছনীয় ব'লে মনে হয় কল্লোলের একটা বিশিষ্টতা আছে, তা অনেককে আনন্দ দিয়েছে এবং সেই আনন্দ হ'তেই আরও দুই একখানা মাসিক পত্রিকা কল্লোলেরই ধারাকে লক্ষ্য ক'রে বের হয়েছে। হয় ত এ রকম ধরণের আরও পত্রিকা বের হবে, তাতে কল্লোলের আনন্দ বই দুঃখ নাই। কল্লোল যে তার আদর্শ নিয়ে বাংলার বক্ষে সৃষ্টির উল্লাস জাগ্রত করতে পেরেছে, এ তার সৌভাগ্যেরই কথা, তার সার্থকতার চিহ্ন।

কল্লোল এতদিন ডিমাই সাইজে পনেরো ফর্ম্মা ছিল। এ সাইজটা আমাদের খুব ভাল লেগেছিল। কাগজের আকার বড় হলে পড়তে বড় অসুবিধা হয়, তাই ছোট আকারে এই সুন্দর সাইজটি কল্লোলের করা হয়েছিল। কিন্তু এ তিন বৎসরে তার জন্ত কল্লোলের বিক্রীর দিক দিয়ে অনেক অসুবিধা হয়েছে। সে ক্ষতিও স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু বিজ্ঞাপনদাতাদের ব্লক ও বিজ্ঞাপন দিতে এই ছোট সাইজের কাগজে সত্যই বড় অসুবিধা হোত। কারণ তাঁদের সমস্ত ব্লক প্রভৃতিই বাংলার মামুলী ডবল ক্রাউন সাইজের কাগজের জন্ত তৈরী। তাই এবারে চতুর্থ বছরে কল্লোলের ডবল ক্রাউন সাইজ্ করা হবে, প্রবাসী ভারতবর্ষ প্রভৃতির আকারে। এতে আমাদেরও একটু সুবিধা হবে। ছোট সাইজ থাকার দরুণ অনেক লেখা

আমরা ইচ্ছা সত্ত্বেও মাসের পর মাস চেষ্টা করেও দিতে পারি নি, এখন আকার বড় হওয়াতে বেশী ক'রে লেখা দিতে পারব আশা করছি।

কল্লোলের চতুর্থ বৎসরের মূল্য সাড়ে তিনটাকাই থাকবে। আগামী বৎসরের বার্ষিক মূল্য গ্রাহকগণ আশা করি মনে ক'রে মনি অর্ডার যোগে পাঠিয়ে দেবেন। নূতন গ্রাহকগণও তাই করবেন এই আমাদের অনুরোধ।

ভিঃ পিঃ-তে কাগজ পাঠালে যে কত অসুবিধা তা গ্রাহকরা জানেন। খরচ বেশী পড়ে তা ত আছেই, তা ছাড়া অনেক সময় ডাকপিয়ন ভিঃ পি নিয়ে যখন বিলি করতে যায় তখন ঘটনাক্রমে গ্রাহক হয় ত উপস্থিত থাকেন না, পিয়নরা আর চেষ্টা না করেই পার্শেলটির ললাটে "not claimed" তিলক এঁকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। তাতে কাগজখানার ত দুরবস্থা হয়ই, তাছাড়া গ্রাহকরা মনে করেন আমরা তাঁদের বুঝি কাগজ পাঠাতে ভুলে গেছি। ভিঃ পিঃ রাখলেও সে টাকা আমাদের কাছে পৌছতে দুইমাস এমন কি অনেক সময় ছয়মাস পর্য্যন্ত হয়ে যায়। অথচ টাকা না পাওয়া পর্য্যন্ত গ্রাহকের পরের মাসের কাগজ আমরা পাঠাতে পারি না। উভয় পক্ষের অসুবিধার কথাগুলি বিবেচনা করে পুরাতন ও নূতন গ্রাহকরা যদি টাকাটা ২৫শে চৈত্রের মধ্যে মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দেন তাতে কাজের অনেক সুরাহা হয়। আশা করি অন্তত কল্লোলের গ্রাহকরা এ বিষয়ে অবহিত হবেন।

যাঁরা কল্লোলের নূতন গ্রাহক হবেন তাঁরা তৃতীয় বর্ষের (১৩৩২) সমগ্র সেট্ মনিঅর্ডার করে মাত্র তিনটাকা পাঠালেই পাবেন। আর "নূতন গ্রাহক" এই কথাটি যেন লিখতে ভুলবেন না। পুরাতন গ্রাহকরা টাকা পাঠাবার সময় তাঁদের গ্রাহক নম্বরটি অনুগ্রহ ক'রে দেবেন। তা নইলে তাঁদের নাম পুরাতন লিষ্টি থেকে খুঁজে বের করতে অসুবিধা, ভুলও হতে পারে।

পুরাতন বৎসরের কাগজ আমরা ভি পি করে পাঠাতে পারব না। কারণ ভি পি যদি ফেরত আসে তাহলে—কাগজগুলি একেবারে লোকশান হয় এবং আমাদের ভিঃ পিঃ খরচের পয়সাটা (প্রত্যেক সেটে আট আনা) একেবারে অদানে অব্রাহ্মণে যায়।

বৎসরান্তে আমরা কল্লোলের সমস্ত শুভানুধ্যায়ীদের আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আগামী বৎসরের জন্ত তাঁদের অপরিসীম সহানুভূতি ও সাহায্য ভিক্ষা করি। তাঁদের সাহায্যে আমাদের চেষ্টা সার্থক হউক।

কল্লোলের তৃতীয় বৎসরে আমরা কয়েকটি লেখককে বিশেষ করে পেয়েছি। তাঁদের প্রতিভা জয়যুক্ত হউক এই কামনা করি। সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যুবনাশ্ব, নির্ম্মলকুমার রায়, বিমলা দেবী, সুবোধ দাশ গুপ্ত, জসীম-উদ্দীন, চারুচন্দ্র ঘোষ, নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, সুধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, অজিতকুমার দত্ত, দীনেশচন্দ্র লোধ, জীবনানন্দ দাশ গুপ্ত, গোপাললাল দে প্রভৃতি।

এদের মধ্যে অনেকেই তরুণ, তবু এঁরা কল্লোলকেই অবলম্বন করে যথাসাধ্য তাঁদের সাহিত্য সাধনা দ্বারা একান্তভাবে কল্লোলেরই সেবা করছেন। তাঁদের এ নিষ্ঠা প্রশংসনীয়।

আজকাল লেখক ভাগিয়ে নেওয়াও সাহিত্যক্ষেত্রে আরম্ভ হয়েছে, এঁরা সে সকল প্রলোভন হ'তে নিজেদের দূরে রাখ্‌তে পেরেছেন, তরুণ হলেও, এটা তাঁদের স্বভাবের বিশেষত্ব প্রকাশ করছে। আমরা তাঁদের এই সাহস ও কল্লোলের প্রতি অবিচলিত অনুরাগকে বর্ষশেষে প্রকাশ্য ভাবে সম্ভাষণ জানাচ্ছি। লেখা নানা কাগজে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হবে এই প্রলোভন তরুণ কেন অনেক প্রবীণদেরও ঘায়েল করে। তবে একটা দুঃখের কথা, আমরা মুসলমান সমাজের লেখক বা লেখিকাদের বিশেষ কোনও সাহায্য পাই নি। আমাদের কল্লোলেরই গ্রাহক ও গ্রাহিকা অনেক মুসলমান আছেন। তাঁদের মধ্যে যদি কারো সাহিত্য-চর্চ্চায় অনুরাগ থাকে তা'হলে তাঁদের রচনা আমরা সাদরে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি। লেখা অমনোনীত হয়ে ফেরত গেলে তাঁরা যেন মনে না করেন যে, মুসলমান রচয়িতা বলেই তাঁদের অবহেলা করা হয়েছে।

একটা সুখের কথা', অনেক লিখে, অনেক বলে' কল্লোলের লেখকদের আমরা রচনার সঙ্গে টিকেট পাঠান অভ্যাস করাতে পেরেছি! তাতে তাঁদেরও সুবিধা আমাদেরও অনেক সুবিধা হয়েছে।

চতুর্থ বছরের জন্য কল্লোলের প্রত্যেক গ্রাহক যদি কয়েকজন করে গ্রাহক সংগ্রহ করতে পারেন তা'হলে কল্লোলের গ্রাহক-সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। গ্রাহক বাড়লে যে কাগজের ব্যবসার দিক্ দিয়ে লাভ হবে তা নয়। কারণ সকলেই জানেন, গ্রাহকের কাছ থেকে যে টাকা পাওয়া তার পরিবর্ত্তে বার মাস কাগজ দেওয়া চলে না। তবুও আমাদের ইচ্ছা কল্লোল আরও অনেক লোকে পড়ুক এবং এই সূত্রে বাংলায় একটি নামহীন সাহিত্যিক-গোষ্ঠী সৃষ্ট হউক।

কল্লোলের লেখক সুকুমারের মৃত্যুতে অনেকের কাছ থেকে সহানুভূতি—পূর্ণ পত্রাদি পেয়েছি, কিন্তু স্থানাভাববশতঃ সেগুলি কল্লোলের পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা সম্ভব হোল না। তাঁদের সকলকে আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সুকুমারের কোনও ফটো না পাওয়াতে ছাপ্‌তে পার্‌লাম না।

কল্লোল সকল প্রকার অহঙ্কার, নীচতা ও অন্যায় হ'তে মুক্ত থাকুক এই বর্ষশেষের আকিঞ্চন। যিনি এতকাল কল্লোলের সমগ্র শক্তিকে পরিচালনা করেছেন, তিনি অব্যয় ও তাঁর প্রীতি অহেতুক, তিনিই কল্লোলকে নববৎসরে শুষ্কতা, সঙ্কীর্ণতা ও ক্লান্তি হ'তে নবজীবনের পথে উল্লসিত করুন।

শরৎচন্দ্র।

(যৌবনে)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

মাঘের 'কল্লোলে' শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর সম্পর্কে যাহা বলিয়াছি তাহা ঠিক নয় এমন অনুযোগ পাইয়াছি। তাঁহার 'অনুপমা' নামটিই তিনি আত্ম-গোপনের জন্য সময়ে সময়ে ব্যবহার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইয়াছে এবং তাঁহার প্রকৃত নামটিই অবশেষে বাহাল থাকিয়া গেছে।

এই ভুল এবং ত্রুটির জন্য লেখিকার নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে মার্জ্জনা প্রার্থনা করি। অতীতের কথা বলিতে গিয়া দিয়া যদি কাহারো মনে দুঃখ যদি দিয়া থাকি—তাহা আমার ইচ্ছাকৃত নহে, অক্ষমতারই নিদর্শন। এই অক্ষমতার বহু পরিচয় আমার বর্ত্তমান লেখার মধ্যে থাকিয়া গেছে। আশা করি, পাঠকগণও আমাকে দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন।

চৈত্রের সংখ্যায় 'ত্রিসতক'-এর প্রথম খণ্ডের শেষাংশ সম্পূর্ণ দেওয়া হবে বলে লেখা হয়েছিল, কিন্তু এবারে স্থানাভাব হওয়াতে আংশিক ভাবে না দিয়ে আগামী বারেই সবখানি একসঙ্গে দেওয়া হবে। পাঠকগণ এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন। আশা করি, শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ ও শ্রীশান্তা দেবীও আমাদের এ অক্ষমতা ক্ষমা করবেন।

পরিশেষে জীবিত-অবস্থায় যাঁহার শ্রাদ্ধ করিতেছি—তাঁহার নিকটও ক্ষমা ভিক্ষা করি। সেদিন শরৎচন্দ্র বলিতেছিলেন, তোমার শক্তির অপব্যয় করিতেছ। শুনিয়াছি বৈজ্ঞানিকগণ শক্তির অপব্যয় স্বীকার করেন না। সহৃদয় পাঠকগণ কি করিবেন—জানি না।

* * * * *

গম্ভীরমতি লোকেরা মনে করেন সখের যাত্রার দল সমাজের ক্ষতি করে। তাঁহাদের সহিত যুক্তি-তর্কে পারিয়া উঠা শক্ত। কারণ মানুষের বিশ্বাস যুক্তির উপর বড় একটা নির্ভর করে না। বিশ্বাসের ভিত্তি কোথায় খুঁজিয়া বাহির করা সুকঠিন। সেদিন আমার একজন বিদেশী বন্ধু অনায়াসে বলিলেন যে, বিশ্বাসের মূল মানুষের অন্ধ অজ্ঞতার মধ্যে নিহিত থাকে। এই কথাও মানিয়া লইতে মন যেন চাহে না। মনে হয় বিশ্বাসের মূল মানুষের প্রবৃত্তি এবং সংস্কারের মধ্যে জড়িত।

সমাজের প্রায় সকল প্রচেষ্টাগুলি মানুষকে "ভালো মানুষ" করিয়া তুলিতে চাহে; কিন্তু:—

"মনে যবে মস্ত আশা
সর্পসম ফোঁসে,
দাপিয়া বৃথা রোষে
তখনো ভালো মানুষ সেজে
বাঁধান হুঁকো যতনে মেজে
মলিন তাস সজোরে ভেঁজে
খেলিতে হবে কসে?

ইহাও মানুষের মনের একটা মস্ত দুর্গম দিক। ইহাকে অবহেলা করিয়া বসিয়া নিশ্চিন্তে কাল কাটাইবার দিন বোধ করি আমাদের অদৃষ্টে ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে।

এই যাত্রার দলের ছিদ্র দিয়া সেদিন হয়ত শরতের জীবনের মস্ত আশা আনাগোনা করিত। অভিভাবকগণের ভয়ে সে যে ঐদিকে একদিনের জন্য দাঁড়াইল না—এমন কিছু মনে করিয়া লইবার সপক্ষে কোন কথাই বলা চলে না।

কিন্তু যাত্রাদলের প্রভাব তাহাকে সম্পূর্ণরূপে মাতাইয়া তুলিতে পারে নাই। তাহার মনের দিকের প্রধান কারণ, অনুমান করি যে সেখানের আনন্দ ছিল অতিশয় স্থূল ধরনের। সেখানে সৌন্দর্য্য-বোধের সূক্ষ্ম সম্ভোগের চেয়ে ভিড়ের মাতামাতিই ছিল বেশী পরিমাণে। মানুষের সুকুমার রস-বোধ সেখানে কিছুক্ষণের মধ্যে হাঁফাইয়া উঠিয়া খাবি খাইতে থাকিত।

যাত্রাকে সফল করিয়া তোলা কোন বাবু-প্রকৃতির কর্ম্ম নহে। লাগাতাড় দশ বার ঘণ্টা কুলি মজুরের পরিশ্রম করিলে তবে একটি 'পালা' জমে। এদিকে এমন নির্ব্বিকার ভাবে খাটিতে পারাও সহজ ব্যাপার নহে। তখন স্বতঃই নেশার শরণ গ্রহণ করিতে হয়। পয়সার অভাবে নিতান্ত পক্ষে, গাঁজা ভাঙ চলিতে থাকে। কাপ্তেন ভাল জুটিলে বোতল চলার বাধা হয় না।

তাহার উপর হাল সভ্যতার গতিবিধি অনুসারে এবং আমাদের আধুনিক শিক্ষার কতকটা প্রভাবেও, যাত্রার তাণ্ডব আমাদের আর ভাল লাগে না। এখন সৌখিন ভাবে ঐ রসের চর্চ্চা করিতে সকলেই চাহে।

এমনি করিয়া ভাগলপুরেও বাঙ্গালীদের সমাজে থিয়েটারের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। শৈশবে থিয়েটারে যোগ দেওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল বলিয়াই বোধ করি শরৎ আর্য্য-থিয়েটারের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া কোন দিন বাহির হয় নাই। কিন্তু তাহার সহিত তাহার মনের একান্ত যোগ ছিল।

কলেজে প্রবেশের পর রাজার নেতৃত্বে তাহারা একটি থিয়েটারের দল গড়িয়া তোলে। তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী বোধকরি প্রথম অভিনীত হয় এবং শরৎ স্ত্রীলোকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া গানে এবং একটিঙে সকলকে বিস্মিত করে। রাজু কিন্তু এই দুই বিষয়েই শরতের চেয়ে অধিক নৈপুণ্য প্রকাশ করে এবং পরে তাহারই জয়-জয়কার হইয়াছিল।

এই দলটি কিন্তু অভিভাবকগণের চক্ষুশূল হইল এবং কিছুদিনের মধ্যে তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণে ভাঙ্গিয়া গেল। অভিভাবকগণের জাত-ক্রোধ একদিন এমন অসম্ভব প্রাখর্য্যে প্রকাশ পাইয়াছিল যে কিছুদিনের জন্য যুবকের দলকে নিরস্ত থাকিতে হইল।

ভাগলপুরের লোকে থিয়েটার দেখিতে বড় ভালবাসে। যতই কেন মন্দ অভিনয় হউক—ভিড়ের কমি কিছুতেই হইবে না। সে রাত্রেও চারিদিকে লোক গম্-গম্ করিতেছে। একজন যুবক একটি স্ত্রী ভূমিকা লইয়া আসিয়া মধুর সঙ্গীতে শ্রোতার চিত্তাবনোদন করিয়া সবে মাত্র কথা কহিতে আরম্ভ

করিয়াছে—এমন সময় দেখা গেল যুবকের পিতাঠাকুর দর্শকের ভিড় হইতে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া মঞ্চের উপর ব্যাঘ্র-ঝম্প দিলেন। তামাক খাইবার কলিকা উপুড় করিয়া তাহাতে মোমবাতি বসাইয়া ফুট্-লাইট হইয়াছিল—সে গুলি একটি নিতান্ত ভঙ্গুর বেঞ্চের উপর সালু মুড়িয়া বসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার ধাক্কায় কোথায় গেল সেই বেঞ্চ, বাতি উল্টাইয়া সালুতে আগুন ধরিল। ষ্টেজের মধ্যে সেই অগ্নি-কাণ্ডের প্রদীপ্ত আলোকে দেখা গেল পিতা পুত্রকে বেদম প্রহার করিতেছেন। ইহার পর সে রাত্রে হরি বলিয়া পালা সায় করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না!

বয়স্কদের আর্য্য-থিয়েটার কিন্তু এই যুবক দলের পক্ষে উপযোগী হয় নাই। তাহার কারণ বোধকরি আর্ট সম্বন্ধে মতের গরমিল। আনন্দের জন্য আর্ট কিম্বা আর্টের জন্য আর্ট—এমন কোন কথাই বয়স্কের দল মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহারা মনে করিতেন, আমোদের ছলে যদি দুটি ধর্ম্ম কথা ফাঁকি দিয়া মানুষের কানে যায় তাহা হইলে—এ সংসারের কথা ছাড়িয়া দিলেও—পরকালে নিশ্চই খুব একটা বড় কাজে লাগিবে। তাহা ছাড়া সভ্যদের অভ্যাসের আবর্জ্জনা গুলাও বোধ করি যুবকদের বরদাস্ত হইত না।

ক্রমশ

Published by SJ. DINESH RANJAN DAS
10/2 Patuatola Lane, Calcutta.
and
Printed by S. K. CHATTERJI
at the BANI PRESS,
33A, Madan Mitra Lane, Calcutta.



শ্রীরমাঁ রলাঁ

(শ্রীকালিদাস নাগ ও শ্রীমতী শান্তাদেবী কর্তৃক অনূদিত)

ক্রিসতফ আনন্দে অধীর হইয়া বাড়ী ফিরিল। রাস্তার পাথরগুলাও যেন তার আনন্দের সঙ্গে তাল রাখিয়া নৃত্য করিতেছে। কিন্তু বাড়ীর লোকের কাছে সে যে রকম অভ্যর্থনা পাইল, তাহাতে যেন তার খানিকটা নেশা কাটিয়া গেল। ক্রিসতফ তার সঙ্গীতের বড়াই করিতেই বাড়ীর লোকেরা সমস্বরে ধমক দিয়া উঠিল! মা ত হাসিয়াই অস্থির; মেলশিয়র বলিয়া বসিল যে, বৃদ্ধ দাদা মশাই পাগল হইয়াছে, ছেলেটার মাথা ঘুরাইয়া না দিয়া তার নিজের কাজ করিলেই ভাল হইত। ঐ সব পাগলামী ছাড়িয়া ক্রিসতফকে নিয়মিত পিয়ানোর কাছে বসিতে হইবে এবং চার ঘণ্টা ধরিয়া বাজনার কসরত করিতে হইবে। আগে রীতিমত বাজাইতে শেখা দরকার, তারপর যখন বিশেষ কিছু করিবার থাকিবে না, তখন সঙ্গীত রচনা করিলেই চলিবে।

বালক ক্রিসতফকে আত্মগরিমায় অকালপক্ক করিয়া তুলিবার যে বিপদ আছে, তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্যই যে মেলশিয়র বিজ্ঞের মত কথা কহিতেছিল তাহা নহে। শীঘ্রই দেখা গেল যে, সে রকম কোন সাধু উদ্দেশ্যই তা'র মনে উদয় হয় নাই। মেলশিয়র ছিল একজন যন্ত্রী মাত্র, সঙ্গতটাই সে বুঝিত; সঙ্গীতের সৃজন-লীলাটি তার কাছে অপেক্ষাকৃত সামান্য ব্যাপার। যন্ত্রীই ত আলাপ-নৈপুণ্যে সঙ্গীতের আসল তাৎপর্য্যটি ফুটাইয়া তোলে; ইহার বেশী মেলশিয়র বোঝে না; কারণ সঙ্গীতের ভিতর দিয়া কিছু প্রকাশ করিবার প্রেরণা সে কখনও অনুভব করে নাই—প্রকাশের কোন ভাবই তার ছিল না। হাস্‌লেয়ারের মত সঙ্গীত রচয়িতারা উৎসাহী ভক্তদের নিকটে যে বিপুল সম্বর্দ্ধনা পাইয়া থাকেন তার কদর মেলশিয়র বেশ বোঝে, কৃতকৃত্য মানুষকে

সমাদরের অর্ঘ্য নিবেদন করা মানুষের স্বভাব এবং সেই ভাবেই মেলশিয়র তাঁদের সম্মান দেখাইত। তাহার মধ্যে হয় ত খানিকটা ঈর্ষাও প্রচ্ছন্ন ছিল, কারণ তাহার মনে হইত, তাহার প্রাপ্য সম্মান হইতেই কে যেন চুরি করিল। কিন্তু সে অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিয়াছে যে, ওস্তাদ-যন্ত্রীর দামও কম নয় বরং তাদের সাফল্যের একটা ব্যক্তিগত দিক আছে এবং সেই জন্যই সেখানে নানা রকম সুবিধার সম্ভাবনা। বড় বড় সঙ্গীত-শিল্পীদের প্রতি বাহ্য আড়ম্বরের সঙ্গে সে মহা সম্মান দেখাইত কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রচুর আজগুবী গল্পও রটাইত এবং তাঁহাদের মনীষা ও চরিত্রকে রঙচঙ দিয়া বিকৃত করিয়া দেখাইত। ওস্তাদ-যন্ত্রীকে সে মনে মনে শিল্প-জগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিত; তাহার মতে জিভটা যে দেহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় জিনিষ এটা স্বতঃসিদ্ধ; ভাষা না থাকিলে ভাব লইয়া কি হইবে? তেমনি ওস্তাদ-যন্ত্রীর অভাবে সঙ্গীতরচনা দাঁড়ায় কোথায়?

যাহা হোক, মেলশিয়র যে কারণেই ক্রিস্‌তফ্‌কে ধম্‌কাক্‌ না কেন, সেই বকুনির ফলে ছেলেটির চৈতন্য ফিরিবার মত হইল; দাদামশায়ের প্রশংসায় সে ত প্রায় মাটি হইতে বসিয়াছিল। আশানুরূপ ফল অবশ্য পাওয়া গেল না, কারণ ক্রিস্‌তফ্‌ স্থির করিয়া বসিল যে, তার বাবার চেয়ে দাদামশাই অনেক বেশী বুঝদার; এখন হইতে সে নির্ব্বিবাদে যে পিয়ানোর কাছে বসিত সেটা সে খুব বাধ্য হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া নয়; কলের মত পর্দ্দার উপর অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে সে বেশ স্বপ্নরাজ্যে মন ভাসাইয়া দিতে পারিত। তার সেই অন্তহীন কস্‌রতের মধ্যে সে শুনিত, কে যেন গর্ব্বিত কণ্ঠে বারবার তার মধ্যে বলিতেছে, আমি একজন গীত-রচয়িতা, আমি একজন মস্ত বড় শিল্পী।

নিজেকে এই ভাবে মানিয়া লইয়াছিল বলিয়া সে সঙ্গীত রচনা করিয়াই চলিল। ভাল করিয়া লিখিতে শিখিবার পূর্ব্বে সে বাড়ীর হিসাবের খাতা হইতে কাগজ ছিঁড়িয়া তাহাতে স্বরলিপির রেখা মাত্রাদির হিজিবিজি কাটিত। লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া সে শুধু এই টুকু শিখিল যে, লিখিবার মত কোন একটা জিনিষ ভাবিতে হইবে। ভাবিবার মত কিছু না জুটিলে সে দমিয়া যাইত না, ছোট খাট সুরের টুকরা সর্ব্বদা সে সৃষ্টি করিত এবং সঙ্গীত তার জন্মগত বলিয়া কিছু অর্থ ফুটাইতে না পারিলেও সে কোন রকমে সুর সৃষ্টি করিত।

তারপর তখনি সে ছুটিয়া তার রচনা দাদা মশাইকে গিয়া দেখাইত এবং বৃদ্ধ সহজেই অশ্রু বিগলিত হইয়া বলিত, অদ্ভুত—আশ্চর্য্য !

এই ভাবে ছেলেটি মাটি হইবার জোগাড় হইয়াছিল; সৌভাগ্যক্রমে তার স্বভাবসিদ্ধ কাণ্ডজ্ঞান তাহাকে খানিকটা রক্ষা করিত; আর একজন মানুষও করিত—যদিও সে কাহারো উপর কোন প্রভাব বিস্তার করার কল্পনাও করে নাই—মানুষের সাম্‌নে শুধু সহজ বুদ্ধির আলোকটুকু ফেলিত। এই মানুষটি লুইসার ভ্রাতা গড্‌ফ্রিড।

লুইসার মতই তার ভাইটি ক্ষুদ্র ও শীর্ণকায়, যেন একটু কোলকুঁজো। তার বয়স কত কেহই জানিত না; চল্লিশের বেশী হইবে না কিন্তু দেখাইত যেন পঞ্চাশেরও ঊর্দ্ধে। মুখখানা ছোট ও বলি-রেখাঙ্কিত, রঙ গোলাপী, চোখ নীল ও দয়ার্দ্র, ম্লান 'ভুল না আমায়' ফুলের মত। যেখানে সেখানে সে টুপিটা খুলিয়া আবার মাথায় বসাইত, পাছে ঠাণ্ডা লাগে; মাথাটি ছোট, টাকে ভরা ও ত্রিকোণ; দেখিয়া ক্রিস্‌তফ্‌ ও তার ভায়েরা মহা খুশী হইত। মামাকে তাহারা সর্ব্বদা ক্ষেপাইত ও জিজ্ঞাসা করিত, তার চুল গেল কোথায়? মেলশিয়রও বিদ্রূপে যোগ দিতেছে দেখিয়া ছেলেদের উৎসাহ বাড়িয়া যাইত এবং তাহারা মামার মাথায় চাঁটি মারিবার উদ্যোগ করিত। মামা এই সব অত্যাচার উৎপাত ধৈর্য্যের সঙ্গে হাসি মুখে সহিয়া যাইত। মামাটি ছিল ফেরিওয়ালা, গ্রামে গ্রামে সে ঘুরিয়া বেড়াইত, পিঠে থলির মধ্যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পুরিয়া ফেরি করিত। মুদিখানা, খাবারের দোকান, মনোহারীর দোকান—সব যেন সেই থলির মধ্যে। চাটনী ও টোট্‌কা ওষুধ হইতে সুরু করিয়া রুমাল, গলাবন্ধ, পাঁজী, স্বরলিপি, মায় জুতা পর্য্যন্ত তার ভিতর থাকিত! অনেকবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কোন একটা ছোট খাট দোকান বাঁধিয়া গড্‌ফ্রিড্‌কে গ্রামে বসাইতে। কিন্তু সে কিছুতেই এক জায়গায় স্থির হইয়া থাকিতে পারিত না। হঠাৎ একদিন রাতে ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া দোকানের চাবিটা ক্রিস্‌তফ্‌দের ঘরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া পিঠে থলি লইয়া মানুষটি কোথায় অন্তর্দ্ধান হইত। আবার কত মাসের পর মাস আর তাকে দেখা যাইত না। তারপর হঠাৎ একদিন আসিয়া হাজির! বাড়ীর লোকেরা শোনে কে যেন দরজা হাতড়াইতেছে; একটু খুলিতেই দেখা গেল, সেই চিরপরিচিত ছোট টাকে ভরা মাথাটি; সস্নেহ অথচ সসঙ্কোচ একটু হাসির সঙ্গে সকলকে

অভিবাদন করিয়া অনাবৃত মস্তকে মানুষটি সযত্নে জুতা মুছিয়া ঘরে প্রবেশ করে এবং জ্যেষ্ঠানুক্রমে সকলকে কুশল প্রশ্ন করিয়া ঘরের একটি কোণ আশ্রয় করিয়া বসে। সেখানে সে তামাকের পাইপ ধরাইয়া গুড়ি মারিয়া বসিয়া থাকে, যতক্ষণ না প্রথাগত প্রশ্নের ঝড় বহিয়া থামিয়া চায়। ক্রিস্তফের বাবা ও দাদামশাই বিদ্রূপ মিশ্রিত ঘৃণার সঙ্গে কথা বলে—মানুষটা যেন সঙ, তার উপর আবার ফেরিওয়ালা—সুতরাং ক্রাফ্‌টদের আত্ম-সম্মানে আঘাত করে। বেচারাকে সেটি বুঝাইতে তাহারা ছাড়ে না, কিন্তু মানুষটি যেন বুঝিয়াও বোঝে না।. সে গভীর শ্রদ্ধা দেখাইয়া সকলকে দমাইয়া দেয়, বিশেষত বৃদ্ধ মিশেল বিব্রত হয়, কারণ লোকে তাহার সম্বন্ধে কি ভাবে এই ভাবনা লইয়াই সে অস্থির। অতি মোটা রকম রসিকতা ও বিদ্রূপের আঘাতে তাহারা মানুষটিকে জর্জ্জরিত করে আর লুইসার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠে। ক্রাফ্‌ট্‌ বংশ যে মহান্ এটা স্বীকার করাই তার অভ্যাস; সুতরাং লুইসার স্বামী ও শ্বশুর যে ন্যায্য কথাই বলিতেছেন, এ বিষয়ে তার সন্দেহ হইত না। কিন্তু সে তার ভাইকে ভাল বাসিত এবং ভাইটিও কেমন এক মূক ভালবাসায় ভগ্নীকে যেন পূজা করিত। এই ভাই ও ভগ্নীই শুধু তাহাদের পরিবারের প্রতিনিধি হইয়া বাঁচিয়া আছে, দুইজনেই দীন দলিত ও পরিত্যক্ত হইয়া যেন জীবলোকে আছে। একটি গভীর সহানুভূতি ও প্রচ্ছন্ন বেদনার বন্ধনে তাহারা যেন বাঁধা, স্নেহ ও বিষাদে গড়া এই সম্বন্ধ; করুণার্দ্র, দুর্ব্বল এই দুইটি প্রাণী যেন জীবন-লোকের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে; উদ্দাম জীবনধর্ম্মী, প্রচণ্ড, গোলমালপ্রিয় পশু-প্রবৃত্তি, ভোগলালস ক্রাফ্‌ট্‌বংশের মধ্যে এই দুইটি প্রাণীকে যেন খাপছাড়া দেখাইত; নিবিড় সমবেদনায় উভয়ে উভয়কে বুঝিত কিন্তু কেহই এ বিষয়ে কোন কথা বলিত না।

শিশু জনোচিত নিষ্ঠুর উপেক্ষায় ক্রিস্তফ্‌ তাহার দাদা মশাই ও পিতার মতই ফেরিওয়ালা মামাকে ঘৃণা করিত। সে তাহাকে তাহার হাস্য বিদ্রূপের আধার বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল; অনর্থক তাহাকে যন্ত্রণা দিলেও মামা তার অটল নির্লিপ্ততায় সব সহ্য করিত। তবু ক্রিস্তফ্‌ না জানিয়াই তাহাকে ভাল-বাসিত। প্রথমটা তাহাকে সে একটা খেল্‌নার মত দেখিত; তাহাকে লইয়া যেন সে যা খুশী তাই করিতে পারে; তাহা ছাড়া মামাকে ভালও লাগিত; কারণ মামা সর্ব্বদাই তাহাকে একটা কিছু দেয়—কখনো খেল্‌না, কখনো ছবি,

কখনো খাবার জিনিষ! এই ছোট মানুষটি সর্ব্বদাই নূতন একটা কিছু লইয়া আবির্ভূত হয়; সেজন্য মামা আসিলেই ছেলেদের মহা আনন্দ। দরিদ্র হইলেও মামা প্রত্যেকের জন্যই উপহার আনে এবং বাড়ীর একজনেরও জন্মদিনে তাহাদের স্মরণ করিতে ভোলে না। এই সব মহাদিনে মামা আসিবেই এবং তার পকেট হইতে একটি চমৎকার জিনিষ বাহির করিয়া উপহার দিবে। এই সব উপহার পাওয়া ছেলেদের এমনই অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে, তাহারা তার জন্য প্রায় ধন্যবাদও দিত না।

এই ভাবে উপহার দেওয়াই যেন মামার পক্ষে স্বাভাবিক এবং মামাও তাহাদের যে আনন্দ দিতেন সেই আনন্দই ছিল যেন তার প্রতিদান। কিন্তু রাত্রে যখন ক্রিস্তফের ভাল ঘুম হইত না এবং দিনের ঘটনাগুলি মনের মধ্যে নাড়া চাড়া করিত, তখন তার সময় সময় মনে হইত যে, মামা যেন করুণার প্রতিমূর্ত্তি। তখন সেই দরিদ্র মানুষটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিত কিন্তু দিনের বেলা এই ভাবটা সে প্রকাশ করিত না, কারণ সে ভাবিত যে, হয়ত অন্যে ইহা লইয়া বিদ্রূপ করিবে। স্নেহ ও দয়া যে কি অমূল্য বস্তু তাহা বুঝিবার পক্ষে তাহার বয়স অল্প ছিল। ছেলেদের ভাষায় সদয় ও 'নির্ব্বোধ' যেন প্রতিশব্দবাচক এবং গডফ্রিড মামা যেন তার জীবন্ত উদাহরণ।

একদিন সন্ধ্যায় মেলশিয়র বাইরে নিমন্ত্রণে গিয়াছে, গডফ্রিড্ বাড়ীতে একা, লুইসা ছেলেদের ঘুম পাড়াইতেছে। মামা বাড়ীর অদূরে নদীটির ধারে আসিয়া বসিল, ক্রিস্তফ্ও কিছু করিবার নাই দেখিয়া মামার পিছন লইল। একটা কুকুর-ছানার মত নানা রকমে মামাকে নাস্তানাবুদ করিয়া শেষে নিজেই বে-দম হইয়া সে মামার পায়ের কাছে ঘাসের উপর শুইয়া পড়িল। পেটটা মাটিতে চাপিয়া ঘাসের মধ্যে তাহার নাকটা গুঁজিয়া দিল। খানিকটা দম লইয়া সে একটা কিছু নূতন পাগলামীর অবতারণা করিতে উন্মুখ হইল। কি একটা কথা মনে আসিতেই সে চীৎকার করিয়া সেটা বলিল এবং নিজে নিজেই হাসিয়া মাটিতে মুখ গুঁজিয়া লুটোপুটি খাইতে লাগিল। কিন্তু মামা কোন জবাব দিল না। তার সেই নীরবতায় বিস্মিত হইয়া ক্রিস্তফ্ মাথা তুলিয়া তার ঠাট্টার পুনরাবৃত্তি করিল। হঠাৎ সে দেখিল, মামা গডফ্রিডের মুখের উপর অস্তরবির শেষ রশ্মিচ্ছটা স্বর্ণ কুহেলিকা ভেদ করিয়া পড়িয়াছে। ক্রিস্তফের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। গডফ্রিডের অর্দ্ধ উন্মুক্ত মুখ ও

চোখ এক অপূর্ব্ব স্মিত হাস্যে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, অথচ সেই মুখে যেন এক অনির্ব্বচনীয় বিষাদের ছায়া! ক্রিস্তফ্ তার হাতের উপর মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া দেখিতেছিল; রাত্রি ধীরে ধীরে অন্ধকার যবনিকা টানিয়া যেন গডফ্রিডের মুখখানি আবৃত করিয়া দিল। চারিদিক নিস্তব্ধ, মামার মুখে যে রহস্য ঘনাইতে সে দেখিয়াছে তাহা যেন ক্রিস্তফের প্রাণকে পূর্ণ করিল। সে কেমন একটা অস্পষ্ট নিশ্চেষ্টতায় যেন আচ্ছন্ন। পৃথিবী অন্ধকার, আকাশ উজ্জ্বল, তারা ফুটিতেছে, নদীর ঢেউগুলি তটভূমির সঙ্গে যেন বচসা করিয়া ছুটিতেছে; বালক তন্দ্রাতুর হইয়া চোখ বুজিয়া ঘাস চিবাইতে লাগিল। একটা ফড়িং নিকটে ডাকিয়া উঠিল, মনে হইল যেন সেও ঘুমাইয়া পড়িতে চায়।

সহসা গডফ্রিড্ অন্ধকারে গান গাইয়া উঠিল। দুর্ব্বল ভাঙ্গা গলায় যেন নিজের কাছেই নিজে গাইতেছে। অল্প দূরে আর তাহা শোনা যায় না। কিন্তু তার গলায় কি সরল আবেগ, কি গভীর ভাবপ্রেরণা! যেন সে উচ্চ-কণ্ঠে চিন্তা করিতেছে; নির্ম্মল জলের ভিতর দিয়া যেমন সমস্ত দেখা যায় তেমনি তার গানের ভিতর দিয়া তার প্রাণের তলদেশ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল। ক্রিস্তফ্ এমন গান এমন গাওয়া কখনও শুনে নাই। শিশুর মত সরল, ধীর, গম্ভীর, বিষণ্ণ, এক টানা সুরে গান চলিতেছে—কোন তাড়া-তাড়ি নাই, দীর্ঘ বিরামের পর আবার সুর ছুটিতেছে—কোথায় যাইবে কোথায় থামিবে কিছুই ঠিক নাই—সব যেন রাত্রির বুকে মিলাইয়া যাইতেছে। কোন্ সুদূর হইতে যেন সেই সুর আসিতেছে, কোথায় যাইতেছে কেহই জানে না। ইহার সৌম্যতার তলে যেন গভীর বেদনা, অসীম প্রশান্তির বুকে যেন যুগযুগান্তের দুঃখভার। ক্রিস্তফ্ নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া পড়িয়া রহিল, কথা বলিতে তাহার যেন সাহস নাই; কি একটা আবেগের তাড়নায় তার শরীর যেন হিম হইয়া আসিতেছে; গান শেষ হইলে সে গুড়ি মারিয়া গডফ্রিডের কাছে যাইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে শুধু ডাকিল, মামা!

কোন উত্তর নাই! বালক তাহার মুখ ও হাত গডফ্রিডের কোলে চাপিয়া আবার ডাকিল, মামা!

কিরে বাচ্চা? স্নেহার্দ্র কণ্ঠে সাড়া জাগিল।

বল না ওটা কি? কি গান তুমি গাইছিলে?

জানি না ত।

বল, ও কি গান!

কি গান জানি না; ও একটা গান।

তুমি বুঝি ঐ গানটা লিখেছ?

আমি লিখব কি রে! কি তোর বুদ্ধি! ও একটা পুরানো গান।

তবে কার ওটা?

কেউ জানে না।

কখন্ লেখা হয়েছে?

তা ও জানা নেই।

তুমি তখন ছোট ছিলে বুঝি?

আমি জন্মাবার আগে, আমার বাবা, বাবার বাবা জন্মাবার আগে থেকে ও-গান চলে আস্‌ছে, বরাবর চলে আস্‌ছে।

কি অদ্ভুত! কেউ ত আমায় বলে নি।

একটু ভাবিয়া ক্রিস্তফ্ বলিল—

মামা ওরকম গান আরও জান?

হাঁ জানি।

তবে গাও না আর একটা!

আর একটা কেন? একটাই যথেষ্ট। যখন গান গাইতে ইচ্ছা করে, যখন গান না গেয়ে উপায় নেই, তখনই মানুষ গান গায়; শুধু গাইবার জন্যেই কেউ গায় না।

কিন্তু মানুষে গান তৈরী করে ত?

সে ত গান নয়।

বালক ভাবনায় পড়িল! সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, অথচ কোন জবাবও চাহিল না। সত্যই ত অন্য সব গানের মত ত ঐ গান নয়। সে আবার বলিল, মামা, তুমি কখনও গান লিখেছ?

গান? কেমন করে গান লিখ্‌ব? গান ত লেখা যায় না।

বালক তার স্বভাবসিদ্ধ যুক্তির অবতারণা করিয়া বলিল, কিন্তু মামা, কোনও সময় গানটা ত তৈরি হয়ে ছিল...

একগুঁয়ের মত মাথা নাড়িয়া গড্‌ফ্রিড বলিল, ও গান বরাবরই ছিল।

বালক ফিরাইয়া আবার জেরা করিল, আচ্ছা মামা, অন্য গান, নূতন গান ত তৈরি করা যায়?

আবার তৈরি করতে হবে কেন? সকল অবস্থার গানই ত রয়েছে; দুঃখের গান, সুখের গান, শ্রান্তির গান, সবই ত আছে: বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে? তার গান আছে; পাপ করেছ বলে নিজেকে ঘৃণা হচ্ছে? পৃথিবীর ক্রিমি কীট বলে বোধ হচ্ছে? তখনকারও গান আছে। লোকে তোমায় স্নেহ করে না বলে চোখ ছাপিয়ে জল আসছে? তখনকার গান আছে; এই পৃথিবী সুন্দর লাগ্‌ছে বলে বুকটা আনন্দে ভরে উঠ্‌ছে? তারও গান আছে। স্বর্গ যেন চোখের সামনে ভাসছে—ভগবানের মতন তাঁর স্বর্গ স্নেহভরে তোমার উপর আনত হয়ে যেন হাসছে? সব ভাব সকল অবস্থারই গান রয়েছে—আবার তৈরি কর্‌তে হবে কেন?

তৈরি করলে বড়লোক হওয়া যায়—

ক্রিস্‌তফ্‌ তার দাদামশাইয়ের শিক্ষা ও সরল কল্পনার অনুসরণ করিয়া বলিল।

গড্‌ফ্রিড অল্প একটু হাসিল। ক্রিস্‌তফ্‌ ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাস্‌ছো কেন মামা?

আমি? ওঃ আমি আবার একটা মানুষ!

তারপর ক্রিস্‌তফের মস্তক চুম্বন করিয়া সে বলিল, তোর বড়লোক হতে ইচ্ছা করে, ক্রিস্‌তফ্‌?

সে সগর্ব্বে বলিল, হাঁ; ভাবিল মামা তাহাকে তারিফ করিবে; কিন্তু মামা বলিয়া বসিল—

কেন বল্‌ ত?

ক্রিস্‌তফ্‌ দমিয়া গেল। খানিক ভাবিয়া বলিল, সুন্দর সুন্দর গান তৈরি করব বলে।

গডফ্রিড্‌ আবার হাসিয়া বলিল, বড়লোক হবার জন্যে সুন্দর গান তৈরি করবি? আর সুন্দর গান তৈরি করবার জন্য বড়লোক হবি—কেমন? তুই দেখছি কুকুরের মতন নিজের ল্যাজটার পিছনেই ছুট্‌চিস্‌!

ক্রিস্‌তফ্‌ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। যে মামাকে সে সর্ব্বদা বিদ্রূপ করিয়া আসিয়াছে তাহার বিদ্রূপ সে অন্য সময়ে হয় ত সহ্য করিত না। সে ভাবেও নাই যে, গডফ্রিড্‌ তাহাকে তর্কে পরাস্ত করিয়া দিবার মত বুদ্ধি রাখে। ক্রিস্‌তফ্‌ কোন একটা জবাব অথবা বেয়াদবী মনে আনিতে চেষ্টা

করিল, যাহাদ্বারা মামাকে আঘাত করিতে পারে, কিন্তু কিছুই খুঁজিয়া পাইল না।

গডফ্রিড বলিয়া যাইতে লাগিল,

যখন তুই বড় হবি তখন সহজে গান বাঁধ্‌তে চাইবি না।

ক্রিস্‌তফের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল,

যদি আমি পারি।

যতই চেষ্টা করবি ততই কম পারবি। গান বাঁধ্‌তে হলে তোকে ঐ জীবগুলোর মত হ'তে হবে—শোন্...

প্রান্তরের পার হইতে উজ্জ্বল সুঠাম চাঁদখানি উঠিতেছে; চক্‌চকে জল ও শান্ত ধরার বুকে রূপালী কুহেলিকা ভাসিতেছে। মাঠ হইতে দাদুরীর ডাক ও অন্য সব জীবজন্তুর ঐক্যতানবাদন সুরু হইয়াছে। ফড়িঙের তীব্র মীড় যেন তার স্পন্দনের প্রত্যুত্তর; গাছের শাখার ভিতর দিয়া হাওয়া ঝির ঝির করিয়া বহিতেছে; নদীর পাশের পাহাড় হইতে নাইটিঙ্গেলের স্নিগ্ধ মধুর কাকলী ঝরণার মত ঝরিতেছে।

গড্‌ফ্রিড্ বহুক্ষণ চুপ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,

গান গাইবার দরকার কি? মানুষ যে-কোন গানই রচনা করুক না কেন, ওদের গানের চেয়ে মিষ্টি করে কি গাইতে পারবে?

সে ক্রিস্‌তফকে বলিতেছে, কি নিজের সঙ্গে কথা কহিতেছে স্পষ্ট বোঝা গেল না।

ক্রিস্‌তফ্ এই নৈশ সঙ্গীত অনেকবার শুনিয়াছে এবং ভালবাসিয়াছে কিন্তু এমন করিয়া কোন দিনই শুনে নাই। সত্যিই ত, মানুষের গানের দরকার কি? এক অপূর্ব্ব বিষাদ ও স্নিগ্ধতায় তার হৃদয় ভরিয়া গেল; সে ঐ মাঠ, নদী, আকাশ, তারাদের যেন আলিঙ্গন করিতে চায়। তার গডক্রিড মামাকে এখন সব চেয়ে বিজ্ঞ সব চেয়ে সুন্দর মনে হইল; তাঁর প্রতি ভালবাসা উপছিয়া উঠিল। তার মনে পড়িল, সে মামাকে এতদিন কতটা ভুল বুঝিয়াছে অনুভব করিয়া যেন মামা সেই জন্য কত ব্যথা পাইয়াছেন। ক্রিস্‌তফ্ অনুশোচনায় অধীর হইল; যেন উচ্চকণ্ঠে সে বলিতে চায়,

মামা আমি আর অপরাধ করব না—তুমি কষ্ট পেয়ো না—ক্ষমা করো

কিন্তু বলিতে তাহার সাহস হইল না। হঠাৎ সে মামার কোলে

ঝাঁপাইয়া পড়িল কিন্তু তার মুখে কোন কথা জোগাইল না। সে শুধু মামাকে চুম্বন করিয়া বলিতে লাগিল, মামা, তোমাকে খুব ভালবাসি।

গডফ্রিড যুগপৎ বিস্ময় ও সমবেদনায় পূর্ণ হইয়া ক্রিসতফকে চুম্বন করিল। তারপর তার হাত ধরিয়া বলিল—বাড়ী ফিরতে হবে এবার।

মামা তাহাকে বুঝিল না ইহা কল্পনা করিয়া ক্রিস্তফ্ ব্যথিত হইল। কিন্তু বাড়ীর কাছে আসিতে গডফ্রিড বলিল

যদি তোর ভাল লাগে তাহলে দুজনে আবার যাব ভগবানের সঙ্গীত শুন্‌তে। আমিও তোকে আরো গান শোনাব।

তারপর যখন ক্রিস্তফ্ সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁকে চুম্বন করিল, সে অনুভব করিল যে মামা বুঝিয়াছে।

তারপর দুজনে প্রায়ই সন্ধ্যায় বেড়াইতে যাইত; কোন কথা না বলিয়া তাহারা নদীর ধারে অথবা মাঠের ভিতরে হাঁটিত। গডফ্রিড আস্তে আস্তে তাঁর তামাকের পাইপ্ টানিতেন এবং ক্রিস্তফ অন্ধকারে একটু ভয়ে ভয়ে তাঁহার হাত ধরিয়া চলিত। ঘাসের উপর বসিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া গডফ্রিড তারার কথা মেঘের কথা সুরু করিতেন; তিনি ক্রিস্তফকে নানা জিনিষ শিখাইতেন; পৃথিবী জল বাতাসের শ্বাস-প্রশ্বাস, গান, কান্না; যে প্রাণী-জগত অন্ধকারে উড়িতেছে, গুড়ি মারিয়া লাফাইয়া অথবা সাঁতরাইয়া চলিতেছে, তাহাদের বিচিত্র সুর ও ক্রিস্তফকে চিনাইতেন; পরিষ্কার দিন ও ঝড় বৃষ্টির নিশানাগুলি দেখাইতেন; রাত্রির বিরাট ঐক্যতান-সঙ্গতে যে অগণ্য যন্ত্রের আলাপ হইতেছে তাহা বুঝাইতেন। কখনও গডফ্রিড নিজেই গাহিয়া উঠিতেন—সে গান সুখেরই হউক অথবা দুঃখেরই হউক যেন একই রকমের এবং তার যেন একই পরিণতি—ক্রিস্তফের মন কেমন একটা বিষাদে ভরিয়া উঠিত। কিন্তু মামা একটির বেশী গান কোন সন্ধ্যায় গাহিতেন না; গাইতে বলিলে তিনি যে বেশ খুশী হইয়া আগ্রহের সঙ্গে গান না সেটা ক্রিস্তফ লক্ষ্য করিয়াছিল। ইচ্ছা হইলে তবেই আপনা হইতেই তাঁর গান জাগিত। কোন কোন দিন অনেক ক্ষণ তাহারা নিস্তব্ধ হইয়া থাকিত; এবং যখন ক্রিস্তফ প্রায় আশা ছাড়িয়া দিয়া ভাবিতেছে, আজ আর গান আসিবে না—গডফ্রিড গাহিয়া উঠিতেন।

একদিন সন্ধ্যায় কিছুতেই গান আসিতেছে না দেখিয়া ক্রিস্তফ ভাবিল,

মামাকে তার একটা ছোটখাট রচনা শুনাইয়া দিবে। ঐ রচনায় তার কত পরিশ্রম কত গর্ব্ব! সে দেখাইতে চাহিল সে কত বড় একজন শিল্পী। গডফ্রিড শান্ত ভাবে শুনিলেন এবং শেষ হইলে বলিলেন।

শুনে কষ্ট পাস্ নি বেচারা ক্রিস্তফ,—কিন্তু তোর ঐ রচনাটা অতি কদর্য্য! ক্রিস্তফ এতটা আঘাত পাইল যে, কথা বলিতে পারিল না। কৃপাপরবশ হইয়া গডফ্রিড বলিলেন—

কেন ঐ সব জিনিষ করে মরিস্—কেউ ত তোকে তাড়া দেয় নি ঐ রকম রচনা করতে—কি বিশ্রী জিনিষটা!

ক্রিস্তফ রাগে অস্থির হইয়া প্রতিবাদের স্বরে বলিল, দাদামশাই বলে আমার রচনা ভাল।

একটুও বিচলিত না হইয়া গডফ্রিড বলিলেন, তিনি হয় ত ঠিক বলেছেন, তিনি সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ, আমি ত কিছুই জানি না।

তারপর একটু থামিয়া বলেন—

কিন্তু আমার কাছে ঐ রকম রচনা ভারি বিশ্রী লাগে।

ক্রিসতফের ক্রুদ্ধ মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া আবার বলিলেন:

আর কিছু রচনা করেছিস্ না কি রে? হয় ত তার মধ্যে কিছু আমার ভাল লাগবে।

ক্রিস্তফ ভাবিল তার অন্য রচনাগুলি প্রথম রচনার দরুণ খারাপ ধারণাটা শুধ্রাইয়া দিবে। সুতরাং একে একে সবগুলাই সে গাহিয়া গেল। গডফ্রিড কিছুই বলিলেন না; সব শেষ হইলে তিনি বেশ জোরের সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, এগুলো আরো খারাপ।

ক্রিস্তফের ঠোঁট যেন বন্ধ হইয়া গেল; তার চিবুক কাঁপিতে লাগিল। গডফ্রিড যেন নিজে আঘাত পাইয়াছেন এমনি বিক্ষুব্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন, কি বিশ্রী—কি বিশ্রী!

ক্রিস্তফ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কেন তুমি বিশ্রী বল্‌ছ?

গড্‌ফ্রিড তাঁর প্রশান্ত, সরল দৃষ্টি ক্রিস্তফের মুখের দিকে রাখিয়া বলিলেন, কেন? আমি জানি না——দাঁড়া। কেন বিশ্রী লাগে জানিস্? একেবারে মাথামুণ্ড নেই বলে—হাঁ। ঠিক তাই, ঐ সব রচনার কোন অর্থই খুঁজে পাওয়া

যায় না। বুঝেছিস ত? যখন লিখেছিস্ তখন তোর বলবার কিছুই ছিল না। তবে কেন এগুলো লিখ্‌লি?

কাতরস্বরে ক্রিস্তফ বলিল, জানি না—আমি চেষ্টা করেছি একটা চমৎকার কিছু লিখ্‌তে...

"ঐ ত! লেখার জন্যেই শুধু লিখে গেছিস্ তারপর—বড় ওস্তাদ হব, খুব প্রশংসা লুটব এই সব ভেবে লিখেছিস্; তুই ত তাহলে অহঙ্কারী মিথ্যাবাদী; তার শাস্তি পেয়েছিস্...দেখ্‌লি ত? সঙ্গীতের রাজ্যে অহঙ্কারী মিথ্যাবাদী হলে শাস্তি আছেই। সঙ্গীতের প্রাণ হচ্ছে বিনয় ও সরলতা—তা না হলে আর রইল কি? যে ভগবান আমাদের গান দিয়েছেন সরল সত্যকে প্রকাশ করবার জন্যে, তাঁর কি বিষম অমর্য্যাদা, কি জঘন্য ধর্ম্মদ্রোহ!

বালক ভীষণ আঘাত পাইল দেখিয়া গডফ্রিড তাকে চুম্বন করিতে গেলেন কিন্তু সে রাগে দূরে সরিয়া গেল এবং কয়েক দিন দূরে দূরে থাকিল। মামাকে সে যেন সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করে! মামা একটা আস্ত গাধা! সে কিছু জানে না, দাদামশাই ওর চেয়ে ঢের ঢের বোঝে। সে ত আমার গান ভাল বলেছে ...এমন যতই সে মনে মনে বলে ততই তার হৃদয়ের ভিতর কে যেন বলিয়া উঠে, মামাই সত্য কথা বলেছে! তাঁর কথা যেন ক্রিস্তফের হৃদয়ে কাটিয়া বসিয়াছে; সে মিথ্যাবাদী! ভাবিতে লজ্জায় সে যেন মরিয়া যায়!

এখন হইতে রাগ যতই হোক, সঙ্গীত রচনা করিতে বসিলেই মামার কথা মনে পড়িয়া যায়। মামা কি ভাবিবে এটা মনে আসিতেই সে প্রায় তার লেখা লজ্জায় ছিঁড়িয়া ফেলে। এই মনের অবস্থাটা খানিক কাটিয়া গেলে যে সব সুরগুলি খানিক সাচ্চা খানিক মেকী মনে হইত সেগুলিকে সে লুকাইয়া রাখিত—মামার সমালোচনাকে সে ভয় করে! হঠাৎ একটি সুর সম্বন্ধে মামা বলিল, "ওটা মন্দ নয়, বেশ লাগ্‌ছে...ক্রিস্তফ আনন্দে ভরপুর! সময় সময় ক্রিস্তফ দুষ্টামী করিয়া মামাকে ঠকাইবার জন্য বড় ওস্তাদদের রচনা হইতে দু একটা সুর নিজের বলিয়া চালাইত; গডফ্রিড সে-গুলোকে খারাপ বলিলে ক্রিস্তফ হাসিত! কিন্তু মামা বিচলিত হইত না। দুষ্টু ক্রিস্তফ হাততালি দিয়া নাচিয়া ঠাট্টা করিলে মামাও খুব হাসিত কিন্তু শেষে সেই এক কথা, লিখেছে ভাল বটে কিন্তু ওর বলবার যে কিছুই নেই! মেলশিয়র বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে যে সব সঙ্গীতের আয়োজন করিত

তাহাতে মামা যোগ দিত না—উপস্থিত থাকিলেও বাজনা যতই ভাল হোক সে ঘুমে ও বিরক্তিতে আচ্ছন্ন হইয়া হাই তুলিত। ক্রমশ অসহ্য বোধ হইলে মামা আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িত। পরে ক্রিস্তফকে বলিত, ওরে তোদের বাড়ীতে যা কিছু হয় সবই ত সঙ্গীত নয়। ঘরের মধ্যে সঙ্গীত যেন বন্দী করা সূর্য্যের আলো। সঙ্গীত খোঁজ খোলা আকাশে, সেখানে দেখ ভগবানের উদার নির্ম্মল বাতাস কেমন সকলের প্রাণ পূর্ণ করছে!

মামা সর্ব্বদাই ভগবানের কথা বলেন, তিনি ধর্ম্মপ্রাণ। ক্রাফট্‌রা পিতা পুত্রে ছিল তার বিপরীত, অধার্ম্মিক হইলেও তারা উদার মতের দোহাই দিত এবং শুদ্ধ শুক্রবাসরে মাংস খাইয়া বাহাদুরী করিত।

হঠাৎ, কি কারণে জানা গেল না, মেলশিয়র ক্রিস্তফ সম্বন্ধে তার মত বদলাইল। বৃদ্ধ মিশেল যে বালকের প্রেরণাকে কেন্দ্রীভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সেটা মেলশিয়র ভাল বোধ ত করিলই, উপরন্তু কয়েকটা সন্ধ্যা খাটিয়া ক্রিস্তফের রচনার খাতাটা নকল করিল। ক্রিস্তফ ত অবাক! কেহ মেলশিয়রকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে সে শুধু গম্ভীর ভাবে বলিত, পরে দেখবে। কখনও সে হাত ঘসিয়া হাসিয়া অথবা ছেলের মাথায় চাঁটি মারিয়া তার স্ফুর্ত্তিটা প্রকাশ করিত। ক্রিস্তফ এই রকম রসিকতা পছন্দ করিত না; কিন্তু বুঝিত যে, তার বাবা কোন একটা কারণে খুশী হইয়াছেন।

তারপর বৃদ্ধ মিশেল ও মেলশিয়রে কি একটা রহস্যময় ষড়যন্ত্র যেন হইয়া গেল। একদিন ক্রিস্তফ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া শুনিল যে, সে (তার অজ্ঞাতসারে) মহামহিম ডিউক লিওপোল্ডকে তার প্রথম রচনা 'শৈশবের সুখ' উৎসর্গ করিয়াছে। মেলশিয়র ডিউকের ভাবে বুঝিয়াছে যে, তিনি এই ভক্তি অর্ঘ্য গ্রহণ করিতে সম্মত। মেলশিয়র আর কাল বিলম্ব না করিয়া স্থির করিল প্রথমত উপযুক্ত রীতিতে ডিউকের অনুমতি লইতে হইবে। দ্বিতীয়ত ক্রিস্তফের রচনাটি ছাপাইতে হইবে এবং তৃতীয়ত একটা যন্ত্র-সঙ্গতের আয়োজন করিয়া সাধারণকে তাহা শুনাইতে হইবে।

পিতা ও পিতামহের মধ্যে অনেক আলোচনা পরামর্শাদি চলিল। দুই তিন দিন তুমুল তর্ক বিতর্কও হইল। কেহ সে সময় কথা কহিতে সাহস পাইত না। মেলশিয়র লেখে, মোছে, আবার লেখে; বৃদ্ধ উচ্চকণ্ঠে

কি সব বলিয়া যায়, যেন কবিতা আবৃত্তি করিতেছে। কখনও কখনও তাহারা কথা উলট্ পালট করে অথবা ঠিক কথাটি না পাইয়া টেবিল চাপড়ায়।

ক্রিস্তফের ডাক পড়িল; কলম হাতে করিয়া সে টেবিলে বসিল; এক দিকে বাবা আর একদিকে দাদামশাই; বৃদ্ধ যে সব কথা লিখিতে বলিতেছে ক্রিস্তফ তাহা বুঝিতে পারে না; প্রকাণ্ড অক্ষরে সে সব কথা সে লিখিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, তার উপর মেলশিয়র কানের কাছে এমন চেঁচাইয়া বলিতেছে এবং বৃদ্ধ এমন জোরে সুর করিয়া পড়িতেছে যে, ক্রিস্তফ আর অর্থ খোঁজা সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিল; চীৎকারের চোটে তার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধও বড় কম উত্তেজিত হয় নাই; সে স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছে না; ঘরের এদিক ওদিক পায়চারী করিতে করিতে নানা ভঙ্গীতে যেন লেখার জিনিষটিকে মিশেল জীবন্ত করিতে চায়; মধ্যে মধ্যে বালক কি লিখিয়াছে তাহা দেখিতে ছিল। সেই দুটি মানুষ মস্ত মুখ বাড়াইয়া কাঁধের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এবং ক্রিস্তফ ভয়ে ভয়ে কলমটা আড়ষ্ট ভাবে ধরিয়া জিভ বাহির করিতেছে। তাহার চোখে যেন সব ধোঁয়া ঠেকিতেছে। হয় বেশী দাঁড়ি টানিয়া ফেলে, অথবা যা লেখে তা জুবড়াইয়া দেয়; মেলশিয়র গর্জ্জন করে, মিশেল ধমকায়; ক্রিস্তফ বার বার নূতন করিয়া আরম্ভ করে এবং যেই ভাবে আপদের শাস্তি হইল, লেখা শেষ হইল, হঠাৎ এক ফোটা কালি পড়িয়া সব মাটি! তারপর কান-মলা ও কান্না এবং তার উপর ধমক—খবরদার, কাঁদবি না—কাগজ নোংরা হবে! আবার নূতন করিয়া আরম্ভ—যেন আজীবন এই পরীক্ষা চলিবে।

যাহা হউক লেখাটা শেষ হইল; মিশেল ঝুঁকিয়া তাহাদের রচনাটি বার বার আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িল; মেলশিয়র চেয়ারে মজগুৎ হইয়া বসিয়া কড়িকাঠ গণিতে গণিতে দুলিতে লাগিল; এবং বেশ একজন বড় সমজদারের মত পরম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে উচ্চারণ করিতে লাগিল:—

মহত্তম উদারতম ডিউক!

পরম অনুগ্রহশীল প্রভু!

চারি বৎসর বয়স হইতে আমি সঙ্গীতে মাতিয়া আমার শৈশবের দিনগুলি কাটাইয়াছি। সুর-সরস্বতী আমার প্রাণে বিশুদ্ধ সঙ্গতের প্রেরণা জাগাইয়াছেন; তাঁহার সঙ্গে আমার যেমনই পরিচয় হইল অমনি তাঁর প্রতি

আমার ভক্তি ও প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল এবং মনে হইল, দেবীও আমায় তাঁর প্রেমাভিষেক দানে ধন্য করিলেন। আমার বয়স এখন ছয় বৎসর; কিছুদিন হইতে দেবী যেন আমার গভীর প্রেরণার মুহূর্ত্তে চুপি চুপি বলিতেছেন, সাহস কর্—সাহস কর্—তোর প্রাণের সুর-তরঙ্গগুলি অক্ষরের বন্ধনে স্থায়ী করিয়া রাখ্! ভাবিলাম কেমন করিয়া সাহস আনি? আমি যে ছয় বছরের শিশু! গুণীরা ওস্তাদেরা কি ভাবিবেন! সুতরাং আমি দ্বিধায় কাঁপিতে লাগিলাম কিন্তু দেবী আমায় ছাড়িলেন না; আমায় তাঁর আদেশ মানিতেই হইল, আমি লিখিয়া গেলাম।

এখন, হে মহাপ্রাণ ডিউক!

আপনার সিংহাসনের তলে আমার এই শৈশব সাধনের ফলগুলি অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করিবার দুঃসাহস করিতে পারি কি? আশা করিতে পারি কি যে তাহাদের উপর আপনার জনকোচিত স্নেহদৃষ্টি ও কৃপা কটাক্ষ বর্ষিত হইবে?

নিশ্চয়ই! কারণ শিল্প ও বিজ্ঞান চিরদিন আপনাকে প্রাজ্ঞ বন্ধুরূপে আশ্রয় করিয়াছে। আপনি তাহাদের মহানুভব রক্ষক, আপনার পবিত্র আনুকূল্যে কত মনীষা বিকশিত হইয়া নব নব সৃষ্টির পুষ্প সম্ভার উপহার দিয়াছে।

এই স্থির ও গভীর বিশ্বাসে আমি আপনার চরণ তলে আমার এই শৈশব রচনার ডালি উপস্থিত করিতেছি। শিশু-প্রাণের ভক্তি-অর্ঘ্যরূপে ইহা গ্রহণ করিয়া আমায় কৃতার্থ করুন এবং করুণা পরবশ হইয়া হে মহাত্মন! আপনি এই রচনাগুলি ও তাহাদের তরুণ রচয়িতাকে আপনার অনুগ্রহ দৃষ্টিতে ধন্য করুন। আপনার শ্রীচরণে গভীর প্রণতির সহিত অধীনের ইহাই বিনীত নিবেদন।

আপনার চির বিশ্বস্ত ভৃত্য
জঁা ক্রিস্তফ ক্রাফ্ট্ *

চিঠিখানা শেষ করিয়া ক্রিস্তফ মহা খুশী, সে অন্য কোন কথাই শুনে নাই;

* গ্রাণ্ড ডিউক লিওপোল্ডকে লেখা ক্রিস্তফের উক্ত চিঠিখানা আর একখানি প্রসিদ্ধ চিঠির আদর্শে লিখিত; এই চিঠি বেটোফেন্ (Beethoven) এগার বৎসর বয়সে বন্ (Bonn)-এর প্রিন্স ইলেক্টরকে লিখিয়াছিলেন।

পাছে আবার তাহাকে লিখিতে বলা হয়, সেই ভয়ে সে মাঠে পলাইল। কি যে সে লিখিয়াছে তাহা সে জানে না, জানিতে চাহেও না। কিন্তু বৃদ্ধ মিশেল আর একবার পড়িয়া তাহার রসাস্বাদ করিতে লাগিল; দ্বিতীয় বার পড়া হইলে পিতা পুত্রে স্থির করিয়া বসিল যে, চিঠিখানা একেবারে অপূর্ব্ব—অমূল্য! এই চিঠি ও রচনাগুলি উপহার পাইয়া গ্রাণ্ড ডিউকও সেইরূপ ভাবিলেন; তিনি জানাইলেন যে দুটি জিনিষ উপহার পাইয়া তিনি বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। কন্‌সার্টের অনুমতি দিয়া ডিউক তাঁর নিজের সঙ্গীত-সংসদের বাড়ীতে তাহার আয়োজন করিতে বলিলেন। এবং মেলশিয়রকে জানাইলেন যে, সঙ্গতের দিনে তরুণ শিল্পীকে সাধারণের সম্মুখে তিনি অভিনন্দন করিবেন।

অবিলম্বে কন্‌সার্টের আয়োজন করিতে মেলশিয়র লাগিয়া গেল। একটি দলের (Hof Musik Verein) সাহায্য সে পাইল এবং প্রথম হইতেই সাফল্য আসিয়া যেন তাহার মাথা ঘুরাইয়া দিল। সে স্থির করিল যে, **শৈশবের সুখ** লেখাটা বেশ একটু আড়ম্বরের সঙ্গে ছাপিতে হইবে; মলাটের উপর ক্রিস্‌তফের ছবি একখানা থাকিবে, সে পিয়ানোর কাছে বসিয়া আছে এবং মেলশিয়র বেহালা হস্তে তার পাশে দাঁড়াইয়া! এই প্লানটা কিন্তু ছাড়িতে হইল, পয়সার অভাবে নয়; কারণ এসব ক্ষেত্রে মেলশিয়র খরচ করিতে পিছপাও নয়, সময়ের অভাবে ছাড়িতে বাধ্য হইল। অবশেষে সে একটা রূপক-ভরা নক্সায় তার ভাবটা প্রকাশ করিতে গেল; একটা শিশুর দোলা, তূর্য্য, ঢোল, কাঠের ঘোড়া ইত্যাদির মধ্যে একটি বীণা এবং তাহা হইতে সূর্য্যের মত কিরণ-রেখা নির্গত হইতেছে। মলাটের উপর এক সুদীর্ঘ উৎসর্গ-লিপি, তাহার মধ্যে ডিউকের নাম প্রকাণ্ড অক্ষরে লিখিত এবং সেই সঙ্গে ইহাও লেখা আছে যে, "জাঁ ক্রিস্‌তফ ক্রাফটের বয়স ছয় বৎসর মাত্র"। সত্য কথা বলিতে কি, তার বয়স সাড়ে সাত বছর। নক্সাটা ছাপিতে বেশ খরচ হইল, তার ধাক্কা সামলাইতে একটা পুরাণ অষ্টাদশ শতাব্দীর খোদাই করা ভাল সিন্দুক বেচিতে হইল। পূর্ব্বে এক আসবাব বিক্রেতা অনেক দাম দিতে চাহিলেও মেলশিয়র তাহা বেচে নাই। কিন্তু এখন তার এতটুকুও সন্দেহ ছিল না যে, সিন্দুকের ন্যায্য দাম গ্রাহকদের চাদা হইতেই উঠিয়া উপরন্তু বইখানা ছাপার খরচও উঠিবে।

আর একটা সমস্যা মেলশিয়রকে বিব্রত করিয়াছিল—কন্‌সার্টের দিন ক্রিস্‌তফকে কি রকম পোষাক পরান হইবে। মীমাংসা করিবার জন্য

একটা পারিবারিক সভা বসিয়া গেল ; মেলশিয়রের ইচ্ছা ক্রিস্‌তফ চার বছরের ছেলের মত শাদা ফ্রক পরিয়া খালি পায়ে বাহির হয়, কিন্তু তার বয়সের পক্ষে ক্রিস্‌তফ একটু বেশী 'বাড়ন্ত' ছিল এবং সকলেই সেটা জানিত। সুতরাং সে-দিক দিয়া লোক ঠকাইবার উপায় ছিল না। মেলশিয়রের মাথায় আর একটা মতলব খেলিল ; সে ঠিক করিয়া বসিল যে, ক্রিস্‌তফ 'ড্রেসকোট' ও শাদা 'টাই' পরিয়া আবির্ভূত হইবে। লুইসা বৃথা আপত্তি করিয়া বলিল যে, তার ছেলেটাকে দেখে সকলে হাস্‌বে ; কিন্তু সেই অপ্রত্যাশিত পোষাকটার দরুণই যে সাধরণের স্ফূর্ত্তি বাড়িবে এবং মস্ত সাফল্য হইবে এটা পূর্ব্ব হইতেই মেলশিয়র আশা করিয়াছিল। সুতরাং মনস্থির করিয়া দরজীকে আনান হইল এবং ক্রিস্‌তফের মাপ লওয়ান গেল। উৎকৃষ্ট কাপড় এবং ভাল চামড়ার জুতা কিনিতে শেষ উদ্বৃত্ত খরচ হইয়া গেল। ক্রিস্‌তফ সেই নূতন পোষাকে মহা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। অভ্যাস করাইবার জন্য তার নানা-জাতীয় পোষাক বারে বারে তাহাকে পরাণ হইতেছিল। এক মাস সে যেন পিয়ানোর চৌকি ছাড়ে নাই! কত রকম নমস্কার অভ্যর্থনাদির ভঙ্গী তাহাকে শেখান হইতেছিল ; এক মুহূর্ত্তের জন্যও বেচারা মুক্তি পায় নাই। সে রাগে গজরাইত কিন্তু বিদ্রোহ করিতে সাহস পাইত না, কারণ সেও ভাবিয়া বসিয়া ছিল যে, একটা কিছু তাজ্জব ব্যাপার করিতে যাইতেছে। এই উপলক্ষ্যে তার গর্ব্ব ও ভয় যুগপৎ তাকে আকুল করিয়াছিল, বাড়ীর লোকেরা তার জন্য ভাবিয়া খুন! পাছে তার ঠাণ্ডা লাগে, তার গলায় তাই পটি জড়ান হইল, জুতা ভিজিলে আগুনে শুকাইয়া দেওয়া হইত এবং টেবিলে সব চেয়ে ভাল খাবার তারই ভাগে পড়িত।

শেষে সেই সুপ্রত্যাশিত দিনটি আসিল, নাপিত ক্রিস্‌তফের বিদ্রোহী চুলগুলাকে বাগ মানাইয়া কোঁকড়াইবার চেষ্টা করিল এবং তার বেশ বিন্যাসে সহায়তা করিল। যতক্ষণ না তার চুল ভেড়ার লোমের মত কোঁকড়া হয় ততক্ষণ সে ছাড়িল না। সমস্ত পরিবারটি ক্রিস্‌তফের চারদিকে ঘুরিয়া বলিল, চমৎকার দেখাইতেছে। মেলশিয়র আপাদমস্তক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিল এবং ছুটিয়া একটা মস্ত ফুল আনিয়া জামার বোতামে গুঁজিয়া দিল। কিন্তু লুইসা ক্রিস্‌তফকে দেখিয়া কাতরোক্তি করিয়া বলিল, তার ছেলেটাকে সকলে মিলিয়া বাঁদর সাজাইয়াছে! ক্রিস্‌তফ এ কথা শুনিয়া প্রাণে বড়ই

ব্যথা পাইল। সে ভাবিয়া পাইল না যে, সেই পোষাকে তার গর্ব্ব অথবা লজ্জাবোধ করা উচিত! কেমন আপনা হইতেই সে যেন দমিয়া গেল বিশেষতঃ কন্‌সার্টে উপস্থিত হইয়া। সেই মহাদিনে ক্রিস্‌তফের সর্ব্ব প্রধান ও স্থায়ী মনোভাব দাঁড়াইল গভীর অবসাদ।

কন্‌সার্ট আরম্ভ হইতে চলিল। হলটা অর্দ্ধেক খালি পড়িয়া আছে; গ্রাণ্ড ডিউক আসেন নাই। সবজান্তা হিতাকাঙ্ক্ষী একদল বন্ধু, যাঁরা এক্ষেত্রে সর্ব্বদাই আবির্ভূত হন, তাঁরা আসিয়া খবর দিলেন যে, প্রাসাদে এক মস্ত সভা বসিয়াছে এবং ডিউক আসিতে পারিবেন না, বিশ্বস্তসূত্রে এ খবর পাওয়া গিয়াছে। মেলশিয়র নৈরাশ্যে অধীর; সে কখনও পায়চারী করে কখনও হাত পা ছোড়ে এবং বার বার জানালা দিয়া দেখে। বৃদ্ধ মিশেলেরও যন্ত্রণা কম নয় কিন্তু সে ক্রিস্‌তফকে লইয়াই ব্যস্ত; হাজার রকম উপদেশে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত করিতেছে; সমস্ত পরিবারের সেই উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা যেন ক্রিস্‌তফের মনেও সংক্রামিত হইল। তার নিজের রচনা লইয়া সে মোটেই মাথা ঘামায় না; সে ভাবিতেছিল, শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে কত রকম অভিবাদন তাকে করিতে হইবে, সেই চিন্তায় তার প্রাণ অস্থির!

যাহা হউক ক্রিস্‌তফকে আরম্ভ করিতে হইল। লোকেরা অধৈর্য্য হইয়া উঠিতেছিল। যন্ত্রীর দল Coriolan Overture বাজাইতে আরম্ভ করিল। ক্রিস্‌তফ Beethoven-এর নাম শুনিয়াছে বটে কিন্তু তাঁহার কোন রচনা শোনে নাই সুতরাং বিশেষ কিছুই বুঝিল না; কোন রচনার নাম লইয়া সে মাথা ঘামাইত না; সে স্বরচিত নাম দিত ও নিজের মনে কত ছবি ও গল্প সেই সব রচনার চারিদিকে গড়িত; সাধারণত তিন জাতিতে সে সব রচনা ভাগ করিত—**আগুন, জল ও মাটি**; তাহাদের মধ্যে অসংখ্য সূক্ষ্ম স্তরভেদও ছিল। মোজার্টকে প্রায় পূর্ণমাত্রায় জল-জাতি বলিয়া ঠেকিত; তিনি যেন নদীর ধারের একটি প্রান্তর, অথবা জলের উপর ভাসমান স্বচ্ছ কুহেলিকা—বসন্তের বর্ষণ—অথবা ইন্দ্রধনু! Beethoven-কে ঠেকিত যেন আগুন—কখনও যেন একটা অগ্নিকুণ্ড হইতে ভীষণ অগ্নি-শিখা ও ধূমগুম্ভ উঠিতেছে; কখন যেন অরণ্যের অগ্নি-দাহ—ভারি জমাট মেঘ বিদীর্ণ করিয়া বিদ্যুৎ—কখনও উদার আকাশ ভরিয়া তারার স্পন্দন—হঠাৎ একটি তারা খসিয়া যেন শরতের সুন্দর স্নিগ্ধ আকাশের বুকে মরণ ঘুমে ঢলিয়া পড়িল—

দেখিয়া বুকটা কাঁপিয়া উঠে! Beethovenএর সেই বীর-হৃদয়ের বিরাট উত্তেজনা যেন ক্রিস্তফকে আগুনের মত পোড়াইত। আর সমস্তই তার মন হইতে মুছিয়া যাইত—এ সব কি হইতেছে? মেলশিয়র নৈরাশ্যে অধীর, মিশেল উদ্‌ভ্রান্ত, এই জনসঙ্ঘের চাঞ্চল্য, শ্রোতৃমণ্ডলী, গ্রাণ্ড ডিউক, ছোট্ট ক্রিস্তফ নিজে—এ সব কি? এ সব লইয়া সে কি করিবে? তাহার সঙ্গে ওদের কি সম্বন্ধ? সে কি সত্য নিজেই এখানে উপস্থিত? সে যেন কোন এক প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির টানে গা ভাসাইয়াছে, কে যেন তাকে টানিয়া লইয়া চলিতেছে; রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সাশ্রুনেত্রে সে অনুসরণ করিতেছে, পা তার অসাড়, আপাদ মস্তক যেন কম্পিত হইতেছে। তার রক্তের মধ্যে সাড়া জাগিল, 'ঝাঁপাইয়া পড়'; সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল; দরজার আড়াল হইতে একমনে সেই আদেশ-বাণী শুনিতে শুনিতে তার বুক যেন ধড়ফড় করিতে লাগিল। যন্ত্র-সঙ্গত বাজনার মধ্যেই একটু থামিল এবং মুহূর্ত্ত পরেই ধাতব বংশী করতাল প্রভৃতির রুদ্র ঝঙ্কারে সামরিক যাত্রা-সঙ্গীত মামুলী ছন্দে বাজিয়া উঠিল। এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনটা এমন অপ্রত্যাশিত ও বিকট লাগিল যে, ক্রিস্তফ দাঁতে দাঁত চাপিয়া রাগে পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে দেওয়ালের দিকে ঘুসি দেখাইল। কিন্তু মেলশিয়র আহ্লাদে আটখানা! গ্রাণ্ড ডিউক আসিয়াছেন সেই জন্যই যন্ত্রীরা জাতীয় সঙ্গীত দিয়া তাঁর অভিনন্দন করিতেছে। কম্পিত কণ্ঠে বৃদ্ধ মিশেল তাঁর উপদেশের ভার নাতির ঘাড়ে চাপাইলেন।

আরম্ভের সঙ্গীতটি আবার বাজান সুরু হইয়াছে এবার শেষ হইল। এবার ক্রিস্তফের পালা। মেলশিয়র প্রোগ্রাম এমন ভাবে সাজাইয়াছিল যে, পিতা ও পুত্রের নৈপুণ্য একসঙ্গে দেখান যাইতে পারে; দুজনে মিলিয়া বেহালা ও পিয়ানো সংযোগে Mozart-এর একটি Sonata বাজাইবে। স্থির হইয়াছিল যে ক্রিস্তফ একা প্রবেশ করিবে; তাহাতে বেশী তারিফ হইবার সম্ভাবনা; ষ্টেজের প্রবেশদ্বারের কাছে তাহাকে আনা হইল এবং সামনের পিয়ানোটি দেখাইয়া, শেষবার পরামর্শাদি দিয়া পাশ হইতে ঠেলিয়া দেওয়া হইল।

থিয়েটারে আসিতে সে অভ্যস্ত সুতরাং ক্রিস্তফ তেমন ভয় পায় নাই; কিন্তু যখন অনুভব করিল, সে একা রঙ্গমঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া আছে এবং সহস্র চক্ষু তার দিকে সংবদ্ধ, ক্রিস্তফ এমনই ভয় পাইল যে, সে পিছু হাঁটিয়া পাশে ঢুকিয়া পড়িতে চেষ্টা করিল। সেখানে দেখে আড়াল হইতে তার বাবা রক্ত-

চক্ষু হইয়া হাত-পা ছুঁড়িতেছে। সুতরাং সাম্‌নে আসিতেই হইল, শ্রোতৃমণ্ডলীও তাহাকে দেখিয়া ফেলিয়াছে। একটু অগ্রসর হইতেই কৌতুহলের কল কোলাহল, তার পর উচ্চ হাস্য বাড়িয়া চলিল; মেলশিয়র ভুল করে নাই, বালকের পোষাক আশানুরূপ কাজ করিয়াছে। লম্বা চুল, জিপসীর মতন মুখ ছোট্ট ছেলেটি ভদ্রলোকের সান্ধ্য পোষাক পরিয়া যখন ভয়ে ভয়ে হাঁটিতেছিল সে দৃশ্য দেখিয়া সকলে হাসিয়া লুটোপুটি! সকলেই দাঁড়াইয়া ভাল করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিতেছে—হাস্য পরিহাস সংক্রামিত হইয়া থিয়েটার তোলপাড়। তার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না, কিন্তু ইহা ঝানু ওস্তাদেরও মাথা ঘুরাইয়া দেয়। সেই গোলমাল, মানুষের তীব্র দৃষ্টি, অপেরা গ্লাসের টিপ, সব মিলিয়া ক্রিস্তফকে এমনই ভয় পাওয়াইল যে, তার মনে একটি মাত্র চিন্তা হইল, কোন প্রকারে ঐ পিয়ানোটার কাছে যাওয়া! সমুদ্রের মধ্যে সেটা যেন এক মাত্র আশ্রয় দ্বীপ। মাথা গুঁজিয়া, ডাইনে বাঁয়ে না চাহিয়া সে রঙ্গমঞ্চের উপর দিয়া ছুট দিল এবং মাঝখানে আসিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে পরামর্শমত অভিবাদন না করিয়া পিছন ফিরিয়া ঝপ্‌ করিয়া পিয়ানোতে বসিল। তার বসিবার চৌকিটা বেশী উঁচু, সুতরাং পিতা বা কাহারও সাহায্য ব্যতীত উঠিয়া বসা শক্ত; বিপদে পড়িয়া ক্রিস্তফ সাহায্যের অপেক্ষা করিল না, সে হাঁটুতে ভর দিয়া গুড়ি মারিয়া চৌকিতে উঠিয়া বসিল; সেই দৃশ্য দর্শকদের স্ফূর্তি বাড়াইয়া দিল; যাহা হউক ক্রিস্তফ এখন নিরাপদ; পিয়ানোর কাছে বসিয়া তাহার সব ভয় দূর হইল।

অবশেষে মেলশিয়র আসিয়া পাশে দাঁড়াইল, শ্রোতৃবর্গকে ক্রিস্তফ হাসাইয়া খোশমেজাজে রাখিয়াছিল, মেলশিয়র তার সুবিধা পাইল; সকলে উৎসাহের সঙ্গে তাহাকে অভিবাদন করিল। Sonata বাজান সুরু হইল; বালক ক্রিস্তফ অটল নিশ্চয়তার সহিত বাজাইতে লাগিল; একাগ্রতার ফলে তার ঠোঁট কামড়াইয়া পর্দার উপর চোখ নিবদ্ধ করিয়া সে বাজাইতেছে, চৌকি হইতে তার ছোট পা-দুটি ঝুলিতেছে। স্বরবিন্যাস যখন আপন ঝোঁকে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল, ক্রিস্তফ বেশ সহজ বোধ করিতে লাগিল, সে যেন বন্ধুবর্গের মধ্যে আসিয়াছে। প্রশংসার মৃদুগুঞ্জন তাহার কানে আসিতেছে; এত লোক তাহার বাজনা শুনিবার ও তারিফ করিবার জন্য নিস্তব্ধ হইয়া আছে, ইহা ভাবিতেই তাহার বুকে তৃপ্তি ও গর্ব্বের ঢেউ বহিয়া গেল; কিন্তু

বাজনা শেষ হইতেই ভয় আবার তাহাকে অভিভূত করিল; যতই প্রশংসা-ধ্বনি গর্জ্জাইয়া উঠিল ততই তাহার আনন্দের অপেক্ষা লজ্জাই বড় ঠেকিল; মেলশিয়র হাত ধরিয়া তাহাকে যখন টানিয়া রঙ্গমঞ্চের ধারে আনিল এবং সকলকে অভিবাদন করাইল তখন সে একেবারে আড়ষ্ট। কিন্তু পিতার হুকুম মানা ছাড়া গতি নাই; সে নমস্কার করিতে গিয়া এমন হাস্যোদ্দীপক ভঙ্গী করিল যে, সকলে হাসিয়া উঠিল এবং ক্রিস্তফ যেন একটা বড় রকম বোকামী অথবা অশিষ্টাচার করিয়াছে এই ভাবিয়া লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

আবার তাহাকে পিয়ানোতে বসিতে হইল; এবার সে তার নিজের রচনা **"শৈশবের সুখ"** বাজাইতে লাগিল, শ্রোতৃমণ্ডলী একেবারে মুগ্ধ! প্রত্যেক অংশটি বাজান হইতেছে আর সকলে মহা উৎসাহে চীৎকার করিতেছে। বার বার কোন কোন অংশ বাজাইবার তাগিদ আসিল; গর্ব্বে ক্রিস্তফ উৎফুল্ল; কিন্তু সেই প্রশংসা আবার কেমন যেন তাহাকে আঘাত করিতেছিল—সে যেন এক রকম জলুম। সমস্ত শেষ হইলে সমবেত সকলে দাঁড়াইয়া ক্রিস্তফকে অভিবাদন করিল, ডিউক নিজে সকলের সামনে দাঁড়াইয়া উচ্চ ধ্বনি করিতেছেন। কিন্তু ক্রিস্তফ এখন রঙ্গমঞ্চের উপর একা পড়ায় একটুও নড়িতে সাহস পাইল না। দ্বিগুণ জোরে জয়ধ্বনি উঠিল কিন্তু ক্রিস্তফ লজ্জায় অধীর হইয়া কুকুর ছানার মত ঘাড়টা বেশী করিয়া গুঁজিতে লাগিল; লোকেদের দিকে কিছুতেই সে চাহিবে না! শেষে মেলশিয়র আসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে চুম্বন ইঙ্গিতে সকলকে প্রত্যাভিবাদন করিতে বলিল। বিশেষ ভাবে ডিউকের বক্সের দিকে; কিন্তু ক্রিস্তফ কোন কথাই শোনে না, সে যেন কালা! মেলশিয়র তার হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া নীচু গলায় ভয় দেখাইল—তখন সে আদেশ মত কাজটা নিশ্চেষ্ট ভাবে করিয়া গেল; কোন দিকে চাহিল না, চোখও তুলিল না, নিরুৎসাহ হইয়া মুখ ফিরাইল। কেন সে বুঝিল না, তাহার কি একটা যাতনা হইতেছিল। তার আত্ম-মর্য্যাদায় যেন ঘা লাগিতেছিল। যে লোকগুলো সেখানে জয়ধ্বনি করিতেছে তাদের সে পছন্দ করে না, এখন বাহবা দিলে কি হইবে তাহারাই ত একটু আগে ক্রিস্তফকে নাকাল হইতে দেখিয়া হাসিয়াছে, মজা করিয়াছে—সেজন্য তাহাদের সে ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না। শূন্যে তাহাকে তুলিয়া ধরিয়া

চুম্বন সঙ্কেত করিতে হুকুম করা হইতেছে—এই হাস্যকর অবস্থায় কেন তাহারা তামাসা জুড়িয়াছে—কি করিয়া তাহাদের সে ক্ষমা করিবে ? বাহবা দেওয়ার জন্যই ক্রিস্‌তফ ডিউকটাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিল এবং মেলশিয়র তাহাকে নামাইয়া দিতেই সে ছুটিয়া পর্দ্দার পাশে অন্তর্দ্ধান হইল। একজন মহিলা একটা ভাইওলেট (Violet) এর তোড়া তার দিকে ছুঁড়িলেন সেটা তার মুখটা ছড়িয়া দিয়া গেল। ভয়ে সে প্রাণপণে ছুট দিল, ধাক্কা লাগিয়া একখানা চেয়ার উল্টাইয়া গেল ; যতই সে দৌড়ায় লোকেরা ততই হাসে এবং হাসি যতই বাড়ে ক্রিস্‌তফ ততই জোরে ছোটে !

শেষে বাহিরের দরজায় সে পৌঁছিল, সেখানেও লোক উৎসুক দৃষ্টিতে ভিড় করিয়া আছে ! ক্রিস্‌তফ ধাক্কা মারিয়া ভিড় ঠেলিয়া কোনমতে একটা পাশের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। সেখানে তার দাদামশাই মহা স্ফূর্ত্তিতে উৎফুল্ল হইয়া তাহাকে জড়াইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বাজনদারেরা উচ্চ হাস্যে তাহাকে অভিনন্দিত করিল কিন্তু সে প্রত্যভিবাদন ত করিলই না, এমন কি তাহাদের দিকে চাহিলও না। মেলশিয়র একমনে বাহবা ধ্বনি শুনিতেছিল এবং আবার ক্রিস্‌তফকে রঙ্গমঞ্চের উপরে লইয়া যাইতে চাহিল কিন্তু সে রাগে অধীর হইয়া তার দাদামশাইয়ের জামা চাপিয়া ধরিল এবং যে কেউ তার কাছে আসিতে চেষ্টা করে তার দিকে লাথি ছুঁড়িতে লাগিল ! শেষে যখন সে কাঁদিয়া ফেলিল তখন সকলে তাহাকে নিষ্কৃতি দিল।

এমন সময়ে একজন সৈনিক আসিয়া জানাইল যে, গ্রাণ্ড ডিউক ওস্তাদদের তাঁর বক্‌সে আহ্বান করিতেছেন ; কিন্তু এমন অবস্থায় ছেলেটাকে কি করিয়া সামনে আনা যায় ! মেলশিয়র রাগে গজরাইতে লাগিল এবং ক্রিস্‌তফের কান্নার স্রোতও বাড়িয়া চলিল। দাদামশাই শেষে লোভ দেখাইলেন, যদি সে কান্না থামায় তাহলে এক পাউণ্ড 'চকলেট পাইবে। ক্রিস্‌তফের লোভ যথেষ্ট ছিল সুতরাং তৎক্ষণাৎ ঢোক গিলিয়া সে কান্না বন্ধ করিল এবং যেখানে খুশী লইয়া যাইতে দিল ; কিন্তু তাহাকে যে আর রঙ্গমঞ্চের উপর লইয়া যাইবে না সেটা প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল।

গ্রাণ্ড ডিউকের বক্‌স্‌-এর পাশের ঘরে প্রথম তাহাকে আনা হইল একটি ভদ্রলোকের সাম্‌নে—ড্রেসকোট পরা—ডালকুত্তার মত মুখ, খোঁচা খোঁচা গোঁফ, ছোট ছুঁচল দাড়ি, বেশ একটু মোটা ও আরক্ত-মুখ ; তিনি বিদ্রূপ পূর্ণ

আত্মীয়তা দেখাইয়া ক্রিস্তফকে "Mozart-এর অবতার" বলিলেন। ইনিই গ্রাণ্ড ডিউক! ক্রমশ ডিউকের স্ত্রী কন্যা ও অনুচরদের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দেওয়া হইল! কিন্তু ক্রিস্তফ চোখ তুলিয়া দেখে নাই বলিয়া এই জমকাল দৃশ্যের শুধু যেটুকু তার মনে রহিল, সে হইতেছে ঝলমলে পোষাক গাউন ইত্যাদি কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত ঝুলিতেছে! রাজকুমারী তাকে কোলে তুলিয়া লইলেন, ক্রিস্তফ যেন নড়িতে বা নিশ্বাস ফেলিতে পারে না! রাজকুমারী অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন এবং মেলশিয়র খোসামুদী-ভরা গলায় কেতাদোরস্ত জবাব দিতেছে—তার মধ্যে সম্মান ও দাসভাব যেন মিশিয়া আছে। রাজকুমারী কিন্তু মেলশিয়রের কথায় কর্ণপাত না করিয়া ক্রিস্তফকে নানা রকমে খোঁচাইতেছিলেন, সে লজ্জায় যতই লাল হয় ততই ভাবে সকলে সেটা লক্ষ্য করিতেছে। একটা কিছু বলিয়া তার অবস্থাটা ঢাকা দিবার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—

উঃ বড় গরম—মুখটা লাল হয়ে উঠেছে!

কুমারীটি তাহাতে হাসিয়া উঠিল। এই হাসিটি কিন্তু ক্রিস্তফের বেশ ভালই লাগিল; দর্শকদের ভিড় যে ভাবে হাসিতেছিল এ সে রকম নয় সুতরাং সে আপত্তির ভাব দেখাইল না; কুমারী তাহাকে চুম্বন করিল এবং ক্রিস্তফ সেটা মোটেই অপছন্দ করিল না।

হঠাৎ দেখিল তার দাদামশাই সামনে দাঁড়াইয়া আছে, তাঁর মুখ সলজ্জ আনন্দে প্রদীপ্ত। বৃদ্ধের খুব ইচ্ছা একটু সামনে আসে ও একটা কথা বলে কিন্তু সাহস হইতেছিল না, কারণ কেহই তাহার সঙ্গে কথা কহে নাই। সে দূর হইতে নাতির গৌরব দেখিয়াই মুগ্ধ; তাহাকে দেখিয়া ক্রিস্তফের হৃদয় স্নিগ্ধ হইল; তার যে কতখানি মূল্য আছে সেটি বুঝাইয়া তার প্রতি সুবিচার করাইবার ইচ্ছা সে দমন করিতে পারিল না, তার জিভ ছুটিল এবং তার নূতন বন্ধু রাজকুমারীটির কানে কানে সে বলিল,

তোমাকে একটা গোপন কথা বল্‌ব, শুন্‌বে?

কুমারী হাসিয়া বলিল, কি বলত?

আমি যে গৎটা বাজালাম তার মধ্যে একটা ত্রিতালী আলাপ মনে পড়ে? সেটা আমি লিখি নি, দাদামশাই লিখেছে; অন্যগুলো আমার লেখা; কিন্তু দাদামশায়েরটাই সব চেয়ে ভাল, কিন্তু দাদামশাই ও কথা আমায় বল্‌তে

বারণ করেছে, তুমি কাউকে বল্‌বে না ত? ঐ দেখ আমার দাদামশাই, আমি ওকে খুব, ভালবাসি, আমাকে দাদামশাই কত ভাল বাসে...

তাহার কথা শুনিয়া রাজকুমারী ত হাসিয়া অস্থির; তাকে চুমো দিয়া আদর করিয়া শেষে সকলকে সেই গোপন কথাটি বলিয়া দিল। ক্রিস্‌তফ ত ভয়ে অস্থির; সকলেই হাসিয়া বৃদ্ধকে তারিফ করিল এবং বৃদ্ধ মুস্কিলে পড়িয়া কিছু একটা জবাব দিতে চেষ্টা করিয়া অপরাধীর মত এলোমেলো বকিয়া গেল। ক্রিস্‌তফ তারপর হইতে আর মেয়েটিকে কোন কথা বলিল না, সে নানা রকমে তাহাকে ভোলাইতে চেষ্টা করিয়া বিফল হইল; ক্রিস্‌তফ আড়ষ্ট বোবার মত রহিল। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার দরুণ সে মেয়েটিকে ঘৃণা করিতেছিল; এই অবিশ্বাসের জন্য রাজবংশীয়দের উপর তার অশ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। সে এত রাগিয়া ছিল যে, শুনিতেই পাইল না ডিউক পরিহাসচ্ছলে ক্রিস্‌তফকে তাঁর কন্‌সার্টের পিয়ানো বাদক বলিয়া সম্মানিত করিলেন।

তার আত্মীয়দের সঙ্গে সে বাহিরে আসিয়া দেখিল, থিয়েটারের বারান্দায় কত লোক দাঁড়াইয়া আছে। সকলে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল, এমন কি রাস্তার লোকে তাহাকে চুম্বন করিয়া তারিফ করিয়া গেল; সে ইহাতে মহা চটিয়া গেল। চুমো খাওয়াটা সে মোটেই পছন্দ করে না, তাছাড়া তার অনুমতি না লইয়া তাকে এমন বিব্রত করায় তার বিষম আপত্তি।

শেষে বাড়ী পৌঁছিয়া দরজা বন্ধ করিয়াই মেলশিয়র তাকে বাঁদর বলিয়া গালি দিতে সুরু করিল—কেন সে বলিয়া দিল 'ত্রিতালী'টা অন্যের রচনা! ক্রিস্‌তফ ভাবিয়াছিল বলিয়া সে ভাল কাজই করিয়াছে সুতরাং প্রশংসার বদলে গালি খাইয়া সে খুব চটিয়া গেল এবং বিদ্রোহীর মত বেয়াদবীও করিল। মেলশিয়রও রাগিয়া তাহার কান মলিয়া দিতে আসিল; ভাল বাজাইলে কি হইবে, বোকামী করিয়া কন্‌সার্টের সব উদ্দেশ্যটা সে মাটি করিয়া দিয়াছে। ক্রিস্‌তফের ন্যায়বুদ্ধিতে গুরুতর আঘাত লাগিল। সে কোণে আশ্রয় লইল এবং তার বাবা, রাজকুমারী এবং বিশ্বের লোকের উপর ক্ষোভ ও রাগের ঝাল ঝাড়িতে লাগিল। প্রতিবেশীরা আসিয়া তার বাড়ীর লোকদের সহাস্য মুখে তারিফ করিতেছে—যেন তাহারাই বাজাইয়াছে! এটা দেখিয়া ক্রিস্‌তফ আরও চটিয়া গেল।

এমন সময় রাজবাটী হইতে একজন কর্ম্মচারী আসিয়া হাজির—ডিউক

একটি সোনার ঘড়ি ও রাজকুমারী এক বক্স মিষ্টি খাবার পাঠাইয়াছেন। উপহার দুটি পাইয়া ক্রিস্তফ মহা খুশী, কোন্‌টা তাকে বেশী সুখ দিতেছে সে বুঝিতে পারিল না; কিন্তু রাগের বশে সে মুখে স্বীকার করিতেও পারিল না, শুধু খাবারগুলোর দিকে চাহিয়া গজরাইতে লাগিল—ভাবিল যে বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছে তার উপহার নেওয়া উচিত কিনা। প্রায় মনে মনে যখন সে রাজী হইয়াছে তার বাবা হঠাৎ হুকুম করিলেন, তখনই ধন্যবাদ দিয়া চিঠি লিখিতে; এটা যেন তার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিল; সারাদিনের উত্তেজনা, এবং "আপনাদের ক্ষুদ্র সঙ্গীতজ্ঞ ভৃত্য" বলিয়া পত্র আরম্ভ করা সব মিলিয়া ক্রিস্তফকে এমনই অস্থির করিল যে, সে কান্না জুড়িয়া দিল; কিছুতেই থামে না—রাজভৃত্য অপেক্ষা করিতেছে, পরিহাস করিতেছে; মেলশিয়রকে চিঠি লিখিতে হইল; সেজন্য তার মনের ভাব ঠিক স্নেহ বিগলিত হয় নাই এবং ক্রিস্তফের চূড়ান্ত দুর্ভাগ্য যে সে ঘড়িটা অসাবধানে মাটিতে ফেলিতে সেটা ভাঙ্গিয়া গেল। তার মাথার উপর গালাগালের ঝড় বহিল; মেলশিয়র বলিল, তার খাওয়া থেকে ভাল জিনিষ বাদ দেওয়া হইবে ক্রিস্তফ জবাবে বলিল, সে খেতে চায় না; লুইসা শাস্তি দিবার জন্য বলিল, তার উপহারের মিষ্টিগুলি কাড়িয়া লওয়া হইবে। ক্রিস্তফ বিষম রাগিয়া বলিল, মিষ্টিগুলি তার, কেউ তার কাছ থেকে নিতে পারে না! মার খাইয়া সে মিষ্টির বাক্সটা মা'র হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া মাটিতে আছড়াইয়া পায়ে মাড়াইতে লাগিল। তাহাকে ঘরে লইয়া গিয়া বেত মারিয়া কাপড় ছাড়াইয়া ঘুমাইতে হুকুম করা হইল।

সন্ধ্যায় ক্রিস্তফ শুনিল বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে তার মা বাবা ভোজে ব্যস্ত—কনসার্টের খাতিরে বিরাট ভোজের আয়োজন এক সপ্তাহ হইতে চলিতেছিল। তার প্রতি এই অবিচার করায় ক্রিস্তফ রাগে ইচ্ছা করিতেছিল যে, সে মরিয়া যায়! সকলে অট্টহাস্য করিয়া পান ভোজন করিতেছে; অতিথিদের বলা হইয়াছে, ক্রিস্তফ শ্রান্ত আছে—বাস্! আর কেহ তাহার সম্বন্ধে মাথা ঘামাইল না। ভোজের পর সকলে চলিয়া গেলে সে শুনিল, আস্তে আস্তে পা টিপিয়া কে তাহার ঘরে আসিল। বৃদ্ধ দাদামশাই বিছানার উপর ঝুঁকিয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া বলিতেছেন, ক্রিস্তফ! মাণিক আমার! পরক্ষণেই লজ্জা পাইয়া তিনি আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁর পকেটের মধ্যে যে মিষ্টিগুলি লুকান ছিল তাহা ক্রিস্তফের হাতে গুঁজিয়া দি

ক্রিস্তফ্ তাহাতে কতকটা ঠাণ্ডা হইল, কিন্তু সারাদিনের মানসিক উত্তেজনায় সে এত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল যে, দাদামশায়ের বিষয়ে ভাবিবার মত আর শক্তি ছিল না। এমন কি তিনি যে মিষ্টিগুলি দিয়া গেলেন তাহা হাতে করিবার মতও তার ধৈর্য্য ছিল না। শ্রান্তিতে যেন ভাঙিয়া পড়িয়া সে ঘুমে আচ্ছন্ন হইল।

তার ভাল ঘুম হইল না; শারীরিক উত্তেজনায় তার সর্ব্বশরীর যেন বৈদ্যুতিক স্পর্শে কাঁপিতেছিল। স্বপ্নে সারাক্ষণ যেন এক রুদ্র সঙ্গীত তার কানে বাজিতে লাগিল। রাত্রে একবার সে জাগিয়া উঠিল। Beethoven-এর যে সঙ্গীতটি সে প্রথমে শুনিয়াছে তাহা যেন কান বিদীর্ণ করিয়া বাজিতেছে। সমস্ত ঘর যেন তার প্রবল স্বরে ভরিয়া গিয়াছে। সে বিছানায় উঠিয়া বসিল; চোক কান ঘসিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিল—সে সুপ্ত, না জাগ্রত। না সে ত ঘুমাইয়া নাই। সে যে ঐ স্বরলহরী চিনিতে পারিতেছে—সেই যে ক্রোধের তর্জ্জন সেই ভীষণ গর্জ্জন, সেই দীপ্ত হৃদয়ের নর্ত্তন, সেই রক্তের ঢেউ, সে যে হৃদপিণ্ডে অনুভব করিতেছে; যেন দুর্দ্দান্ত ঝঞ্ঝাঘাত সব চূর্ণ ধ্বংস করিতে চায়, হঠাৎ এক অমোঘ দৈবীশক্তির প্রভাবে সব যেন শান্ত হইয়া গেল। সেই মহাপ্রাণের তাণ্ডব নৃত্য যেন তার ছন্দে ক্রিস্তফের শরীরকে নূতন করিয়া বাঁধিল, তাহার দেহ ও আত্মা যেন বিরাটকে স্পর্শ করিল—সে যেন সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করিতেছে, সে যেন এক মহান পর্ব্বত, ঝড় তার চারিদিকে হানা দিতেছে—রোষের ঝড়-দুঃখ বেদনার ঝড়! ওঃ কী দুঃখ! কিন্তু সেটা কিছুই নয়, কী শক্তি কী ধৈর্য্য তার! আসুক্ আঘাত—সহ্য কর্—সহ্য কর্—আঃ বলী হওয়া কি সৌভাগ্য, বলী হইয়া আঘাত সহ্য করা কত বড় গৌরব।...

সে হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসি রাত্রির নিস্তব্ধতাকে যেন চমকিত করিয়া দিল। তাহার পিতা জাগিয়া উঠিল, 'কে রে!' মা চুপি চুপি বলিল, 'চুপ, ছেলেটা স্বপ্ন দেখিতেছে।'

চারিদিক নিস্তব্ধ। সকলে চুপ হইল—সেই স্বপ্ন-সঙ্গীত কোথায় মিশাইয়া গেল, ঘুমন্ত মানুষগুলির নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নাই—সকলে ঘুমাইতেছে—দুঃখের সাথী সব—গভীর রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া ভঙ্গুর তরণীতে ভাসিতে ভাসিতে কোন্ দুর্দ্দম শক্তি-তাড়নে—যেন নিয়তির নির্দ্দেশে চলিয়াছে!

(উর্ব্বশী সমাপ্ত)